শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস

১

শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১

সম্পাদনা

অনীশ দেব

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২

ই-মেল : patrabha@vsnl.net

SHATABARSHER SERA RAHASYA UPANYAS 1
Edited by
Anish Deb

ISBN No. 81-86986-84-7

প্রচ্ছদ
সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ
বিজন কর্মকার

নামাঙ্কন
সৈকতশোভন পাল

মূল্য
৩০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabharati@vsnl.net
Price Rs. 300.00

পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

"I cannot live without brainwork. What else is there to live for ?"

—Mr. Sherlock Holmes
The sign of four (chapter I)
Sir Arthur Conan Doyle

"মাথার কাজ ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এ ছাড়া বেঁচে থেকে কী লাভ?"

—মি. শার্লক হোম্‌স
দ্য সাইন অফ ফোর (প্রথম অধ্যায়)
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল

কয়েকটি কথা

এই বইটির সঙ্গে আমার জীবনের বেশ কিছু কথা জড়িয়ে আছে—অনেকটা আইভিলতার মতো। যেমন, ছোটবেলায় স্কুলের বাংলা বইয়ের গদ্য-পদ্য ছিল, ছিল রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম—যেমনটা সবার থাকে। কিন্তু এর পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপার ছিল, যা সবার থাকে না। স্বপনকুমার ছিল, নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছিল, ছিল পাঁচকড়ি দে, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এ ছাড়া আরও অনেকে। ক্লাস থ্রি-তে যখন পড়ি তখন স্বপনকুমারের 'বাজপাখি' সিরিজ আমাকে রোমাঞ্চিত করত। পরের বছর নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র 'পিয়া মুখ চন্দা' পড়ে বাড়িতে বকুনি খেয়েছিলাম। তারপর কীভাবে যেন এই রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের পাঠক হয়ে গেলাম।

রহস্য-গোয়েন্দা-কাহিনী পেলেই ডাইনোসরের খিদে নিয়ে সেগুলো আমি গোগ্রাসে গিলতাম। তার মধ্যে রহস্য-রোমাঞ্চ খুঁজতাম, সাসপেন্স খুঁজতাম, আর প্রতি মুহূর্তে অপরাধীর সঙ্গে চলত আমার বুদ্ধির লড়াই। রহস্য ও রোমাঞ্চের 'পাল্প' ম্যাগাজিনগুলো নিয়মিত পড়তাম এবং, বেশ মনে পড়ে, এক-একদফায় এক-একটা সংখ্যা ঝটিতি পড়ে শেষ করতাম। ক্লাস এইটে যখন পড়ি, বয়েস তখন বারো প্লাস, তখন দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'সতীর দ্বিতীয় পতি' পড়ার জন্যে বাবা যাচ্ছেতাই বকাবকি করেছিলেন।

সুতরাং, রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা ও কল্পবিজ্ঞান গল্প আমার জীবনের সঙ্গে একেবারে ছোটবেলা থেকেই জড়িয়ে গিয়েছিল। আমিও বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেমন এক অলৌকিক টান আমাকে এই ধরনের সাহিত্যের সঙ্গে বেঁধে রাখছে। তখনও জানতাম না, একই ধরনের লেখালিখিতে কখনও চলে আসব। আমার ষোলো প্লাস বয়েসে লেখা 'ভারকেন্দ্র' নামে একটি দুর্বল গোয়েন্দা-কাহিনী সতেরো মাইনাস বয়েসে ছাপা হয়ে যায় বর্তমানে না-মিল 'মাসিক রহস্য পত্রিকা'র পাতায়। সেটা ১৯৬১ সালের আগস্ট মাস। ডাকে পাঠানো এই গল্পটি প্রকাশিত হওয়ায় উত্তেজিত হয়ে আবার লেখা শুরু করলাম, আবার পাঠালাম, এবং আবার ছাপা হল। বাস, শুরু হয়ে গেল লেখালিখির একটি প্রক্রিয়া—যা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

এই ধরনের সাহিত্যের প্রতি,সমালোচকদের চোখরাঙানি, উপেক্ষা, উন্নাসিকতা ইত্যাদি দেশে বা বিদেশে সবসময়েই ছিল, আছে। কিন্তু আমি থামতে পারিনি। এই ধরনের সাহিত্যের পাঠক এবং লেখক হয়ে এক অলৌকিক তৃপ্তি নিয়ে আমি আজও প্রতিটি মুহূর্তে জীবনযাপন করি। যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তাকে কি সহজে ছাড়া যায়!

এত কথা বলার কারণ এই যে, নিজের মনের অবস্থাটা যদি ঠিকমতো বোঝাতে না পারি তা হলে বোঝানো যাবে না কোন টান থেকে এই রহস্য- উপন্যাস সংকলনের কাজে আমি হাত দিয়েছি। বছরদশেক ধরেই একটা ভাবনা মাথায় ঘুরে বেড়াত ঃ সেই শুরু থেকে বাংলার সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলো সম্পাদনা করে একে-একে প্রকাশ করব। সিরিজের নাম দেব 'রহস্য-কাহিনী গ্রন্থমালা'। কিন্তু যখনই সেই সিরিজটি সম্পাদনার পরিশ্রমের কথা ভেবেছি, তখনই ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসেছি। কোনও প্রকাশককে প্রস্তাব দিতে পারিনি—পাছে তিনি রাজি হয়ে যান! বছরতিনেক আগে 'কিশোর ভারতী'-র সম্পাদক ও 'পত্র ভারতী'-র কর্ণধার শ্রীত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমি আমার ইচ্ছের কথা জানাই। পরিকল্পনাটিকে সামান্য বদলে ওঁকে বলি, আমার পছন্দের সেরা রহস্য-উপন্যাসগুলো বেছে নিয়ে আমি কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করতে চাই। ত্রিদিববাবু রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনীর মনোযোগী পাঠক, এ ধরনের গল্প-উপন্যাসও লিখেছেন। তিনি বোধহয় আমার আবেগ আর আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেছিলেন। তাই সঙ্গে-সঙ্গেই রাজি হলেন। আমিও পরদিন থেকে, বলতে গেলে ছোটবেলার উৎসাহ নিয়ে, কাজ শুরু করে দিলাম।

'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস' বইটি আনুমানিক তিনটি খণ্ডে পরিকল্পিত। প্রথম খণ্ডে আছে ১৫টি উপন্যাস। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় দিয়ে শুরু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র দিয়ে শেষ। বইয়ের নামের 'রহস্য' বিশেষণটি 'জেনারিক টার্ম' হিসেবে একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, রহস্য, রোমাঞ্চ, ভৌতিক, গোয়েন্দা, হরার, সব ধরনের উপন্যাসকেই আমি 'রহস্য' উপন্যাস বলেছি। রহস্য গল্প-উপন্যাস পড়তে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের সংখ্যা এখনও—এই টিভি সংস্কৃতির যুগেও—কিছু কম নয়। তাঁদের কথা ভেবেই এই বই। আমার পছন্দ তাঁদের পছন্দ হলেই পরিশ্রম সার্থক হবে। উৎসাহী পাঠকের জন্যে বইয়ের শেষে 'পরিশিষ্ট' অংশে লেখক ও লেখা সম্পর্কে কিছু তথ্য পেশ করা হয়েছে। আর লেখাগুলো সাজানো হয়েছে লেখকদের জন্মসাল অনুসারে।

এই বইটির লেখা সংগ্রহের সময় লেখকদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে বন্ধুর মতো সাহায্য পেয়েছি। আর জরুরি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্নেহভাজন অভ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী ধাপে, অর্থাৎ বই প্রকাশের কাজে, সবচেয়ে জরুরি ভূমিকা বন্ধুবর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। আমার রহস্য-কাহিনীর প্রীতিকে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। বর্ণসংস্থাপন ও বিন্যাসের কাজে অমানুষিক শ্রম দিয়েছেন অনুজপ্রতিম বরুণ রায়। আর প্রুফ সংশোধনে অসামান্য নিষ্ঠা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শ্রীমতী আরতি বসু। ধন্যবাদ ওঁদের সকলের অবশ্যই প্রাপ্য। তবে পাওনার চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে আরও ভালো লাগত। ইতি—

অনীশ দেব

অদ্ভুত হত্যা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শারদীয়া পূজার সময় প্রায় আশ্বিন মাস। সেই সময় গৃহস্থমাত্রেরই অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি যিনি সংসারে যেরূপ স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাঁহার অর্থেরও সেই পরিমাণে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই সময় জুয়াচোরের জুয়াচুরি বাড়িয়া যায়। সংসারী লোকের অপেক্ষা চোর-জুয়াচোরগণের খরচ তাহাদিগের অবস্থা অনুযায়ী না হইয়া প্রায় অধিক হইয়া পড়ে; সুতরাং, ওই সকল খরচের সংস্থান করিবার নিমিত্ত তাহারা যে কোনও উপায় অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। চুরি বলুন, ডাকাইতি বলুন, হত্যা বলুন, যাহা করিতে হয়, তাহা করিতেই তাহারা প্রস্তুত; কোনও গতিকে অর্থ উপার্জন করিতে পারিলেই হইল। এই নিমিত্তই পূজার পূর্বে হত্যা প্রভৃতি অপরাধের সংখ্যা এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সময় প্রায়ই একটি না একটি অদ্ভুত রকমের হত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহার ঘটনাবলী এরূপ অদ্ভুত ও বিস্ময়জনক যে, বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিয়াও সেই সকল হত্যার রহস্য সম্পূর্ণরূপে সমুদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। সময় সময় দুই একটি হত্যার রহস্য সকল উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা নিতান্তই সামান্য। আজ কয়েক বৎসর অতীত হইল, এই আশ্বিন মাসে পূজার কিছুদিবস পূর্বে একটি রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার আমার উপর পতিত হয় ও ঈশ্বরের নিতান্ত অনুগ্রহে সেই মকদ্দমার কিনারা হইয়াছিল। আজ সেই মকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে বিবৃত হইতেছে।

এক দিবস অতিশয় প্রত্যূষে এক ব্যক্তি আসিয়া থানায় উপস্থিত হইল। যে থানায় আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছিল, সেই থানা শহরের অন্তর্গত নহে, শহরতলীর মধ্যে সংস্থাপিত। ভারতীয় পুলিশ বিভাগের মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই 'প্রথম এতলা' চলিত আছে, তাহা পুলিশ কর্মচারীমাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় রাজধানীতে ওই 'প্রথম এতলা'র প্রয়োজন নাই। 'প্রথম এতলা কী?' এ কথা পুলিশ কর্মচারী ব্যতীত অপর পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; সুতরাং, তাঁহাদিগের নিমিত্ত উহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে দেওয়া আমার কর্তব্য। 'প্রথম এতলা' বা First Information আর কিছুই নহে, পুলিশের অনুসন্ধান উপযোগী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুযায়ী কোনওরূপ ঘটনা ঘটিলে, সেই ঘটনার সংবাদ সর্বপ্রথম যে থানায় আনিয়া থাকে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কর্তৃক তাহার একটি এজাহার লওয়া হয়। ওই এজাহার বা জবানবন্দী যে পুস্তকে লিখিত হয়, সেই পুস্তকের নাম প্রথম এতলা বা First Information Report। যে পুস্তকখানিতে ওই এজাহার লিখিত হয়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত; সুতরাং, প্রথম সংবাদদাতার সংবাদ ওই পুস্তকের এক অংশে লিখিত হয়; অপর দুই অংশে তাহারই ঠিক নকল হয়। নকলের একখানি থানায় থাকে, একখানি পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হয়; অবশিষ্ট একখানি বিচারকের নিকট প্রেরণ করা হয়। শহরতলীর মধ্যেও ওইরূপ প্রথম এতলার নিয়ম প্রচলিত আছে। যে মকদ্দমার অনুসন্ধানে আমাকে লিপ্ত হইতে হয়, তাহা শহরতলীর একটি থানার এলাকায় ঘটিয়াছিল। ওই থানায় গমন করিয়া প্রথমেই আমি প্রথম এতলাখানি পাঠ করিলাম। উহার সারমর্ম এইরূপ ঃ

আমার নাম শম্ভু; জাতিতে আমি উড়িয়া। আমি বিজয়বাবুর বাগানের মালি। প্রত্যহ রাত্রিতেই আমি বাগানে থাকি। কিন্তু কল্য রাত্রিতে আমি বাগানে ছিলাম না। আমার দেশের একটি লোকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পর অতিশয় বৃষ্টি হয় বলিয়া রাত্রিতে আমি বাগানে আর প্রত্যাগমন করিতে পারি না। যাইবার সময় আমি বাগানের সদর দরজায় তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম। অদ্য প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, সদর দরজার সেই তালা খোলা রহিয়াছে। বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে যে দোতালা পাকা বাড়ি আছে, তাহার নিকট আমি গমন করিলাম। দেখিলাম, তাহার দরজার চাবিও খোলা। আমি যে সময় বাগান হইতে গমন

করিয়াছিলাম, সেই সময় আমি নিজ হস্তে ওই তালা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম ও উভয় চাবিই আমি আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তালা খোলা দেখিয়া আমি অতিশয় বিস্মিত হইলাম। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রথমত নিম্নতলার ঘরগুলি দেখিলাম; কিন্তু কোনও দ্রব্যাদি অপহৃত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইল না। তাহার পর উপরে উঠিলাম। বিজয়বাবু বাগানে আসিয়া যেখানে উপবেশন করিতেন বা যে ঘরে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদ ও গীত-বাদ্য করিতেন, প্রথমেই আমি সেই ঘরে গমন করিলাম। সেই ঘরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল, ওই ঘরে কেহ আসিয়াছিলেন, নৃত্য-গীত প্রভৃতি হইয়াছিল, মদ্যপানও চলিয়াছিল; কারণ, দেখিতে পাইলাম, দুই তিনটি মদের বোতল ও গ্লাস সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে; বাদ্যযন্ত্র সকল যে স্থানে রক্ষিত ছিল, সেইস্থানে নাই; বসিবার বিছানার উপর রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ নৃত্য করিবার কালীন যে ঘুঙুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার বেশ অনুমান হইল যে, আমার অনুপস্থিতিতে আমার মনিব বাগানে আগমন করিয়াছিলেন। নৃত্য-গীত ও আমোদ-আহ্লাদ করিবার পর পুনরায় প্রস্থান করিয়াছেন। মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই ঘরের পার্শ্ববর্তী ঘরে গমন করিলাম। সেই ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিতেও আমার ভয় হয়। সেই ঘরের অবস্থা দেখিয়া আমি আরও ভীত হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক উলঙ্গ অবস্থায় সেই ঘরের মধ্যে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অনুমান হইল, সে মরিয়া গিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া অমি ঘর হইতে বহির্গত হইলাম ও একেবারে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সময় আমি যে কী করিব, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। বাগানের মধ্যে অপর কেহই ছিল না যে, কোনওরূপ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। আমি কিছুই বিবেচনা করিতে না পারিয়া দ্রুতগতিতে আমার মনিবের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি কলিকাতা শহরের মধ্যে বাস করেন। তাঁহার বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও যাহা যাহা আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার সমস্ত কথা আমি তাঁহাকে কহিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ও কহিলেন, 'আমি তো কাল বাগানে যাই নাই।' তাহার পরই তাঁহার গাড়ি প্রস্তুত হইল। তিনি ওই গাড়িতে বাগানে আগমন করিলেন। আমিও গাড়ির উপর বসিয়া আসিলাম। বাড়ি হইতে আরও দুই তিন জন তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। তাঁহারা সকলে বাগানে আসিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলেন। আমিও তাঁহাদিগের সঙ্গে-সঙ্গে গমন করিলাম। ঘরের ও মৃতদেহের অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই বাহিরে আসিলেন। আমি রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না বলিয়া আমার উপর নিতান্তই অসন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে সহস্র গালি দিয়া পরিশেষে কহিলেন, 'যাও, তুমি গিয়া থানায় এই সংবাদ প্রদান করো। যে পর্যন্ত পুলিশ আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত না হইবে, সেই পর্যন্ত আমরা এই স্থান হইতে গমন করিতেছি না।' মনিবের এই আদেশ শুনিয়া আমি থানায় আসিয়াছি ও এই সংবাদ প্রদান করিতেছি। আমি কাহারও উপর নালিশ করিতেছি না, বা কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয় না; কারণ, রাত্রিকালে আমি নিজেই সেইস্থানে উপস্থিত ছিলাম না। এই আমার এজাহার।

প্রথম এতলা পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম, এই মকদ্দমার অনুসন্ধান বা ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন নিতান্ত সহজ নহে। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে ও কষ্টভোগ করিয়াও যে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারা যাইবে, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, যখন অনুসন্ধানের ভার আমার উপর পতিত হইয়াছে, তখন সাধ্যমত চেষ্টা করিতেই হইবে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া থানায় সেই সময় যে সকল কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমাদিগের থানার ইন্সপেক্টার কোথায়?' উত্তরে একজন কর্মচারী কহিলেন, 'তিনি এখনই ওই খুনের মকদ্দমার সংবাদদাতার সহিত যে বাগানে সেই মৃতদেহ পড়িয়া আছে, সেই বাগানে গমন করিয়াছেন; বোধহয় এখনও সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই।'

কর্মচারীর এই কথা শুনিয়া আমি সেই স্থানে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলাম না। সেই থানা হইতে একটি লোক সঙ্গে লইয়া আমিও সেই বাগান অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমি সেই বাগানে উপস্থিত হইবার অতি অল্পক্ষণ পূর্বেই সেই থানার ইন্সপেক্টার সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বাগানের মধ্যবর্তী সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ওই মৃতদেহ দর্শন করিতেছেন, এরূপ সময় আমিও গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিবামাত্রই তিনি কহিলেন, 'আপনি এখানে কোথা হইতে?'

আমি। আপনি যেখান হইতে।

ইন্সপেক্টার। আমি তো আমার থানা হইতে আগমন করিতেছি।

আমি। আমিও আপনার থানা হইতে আসিয়াছি।

ইন্সপেক্টার। আপনি কি আমার থানায় আসিয়াছিলেন?

আমি। হাঁ।

ইন্সপেক্টার। কেন?

আমি। এই মকদ্দমার অনুসন্ধানের নিমিত্ত।

ইন্সপেক্টার। আপনি কীরূপে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন?

আমি। আপনি টেলিফোন করিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পাইয়া আগমন করিয়াছি। আমি প্রথমত আপনার থানায় গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে প্রথম এতলা পড়িয়া দেখিলাম ও শুনিলাম আপনি অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া গিয়াছেন; তাই আমি আপনার থানা হইতে এখানে আসিয়াছি।

ইন্সপেক্টার। আপনি যত শীঘ্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এত শীঘ্র আর কেহই উপস্থিত হইতে পারে না। সে যাহা হউক, আপনি যখন প্রথম হইতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আসুন, প্রথম হইতেই উভয়ে মিলিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করি।

বলা বাহুল্য, আমিও সেই ইন্সপেক্টারের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যে ঘরে মৃতদেহ পড়িয়াছিল, সেই ঘরের মধ্যেই অগ্রে প্রবেশ করিলাম; কারণ, সেই সময় ওই ঘরের মধ্যে সেই ইন্সপেক্টার উপস্থিত থাকিয়া মৃতদেহ দর্শন করিতেছিলেন।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মৃত্তিকার উপর একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার সমস্ত শরীর একেবারে উলঙ্গ। কোনও স্থানে বস্ত্রের চিহ্নমাত্রও নাই। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসরের অধিক হইবে না। গৌরাঙ্গ ও দেখিতে অতিশয় সুশ্রী, পরিধানে যেমন বস্ত্র নাই, তেমনি অঙ্গে কোনওরূপ অলংকারও নাই। পায়ে 'মেদি'র চিহ্ন আছে। ওই চিহ্ন নিতান্ত পুরাতন বলিয়া অনুমান হয় না; বোধহয় মৃত্যুর দিবসেই সে পায়ে 'মেদি' মাখিয়াছিল। সমস্ত শরীরের কোনও স্থানে কোনওরূপ অলংকার না থাকিলেও তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয়, তাহার অলংকার পরিধান করা অভ্যাস ছিল। নাসিকা ও কান দেখিয়া তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। মৃতদেহটি উত্তমরূপে দেখিলাম। তাহার কোনও স্থানে কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু, তাহার চক্ষুদ্বয় দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, উহা যেন দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া পতিত হইবার উপক্রম করিতেছে; সুতরাং, সেই মূর্তি দেখিতে অতিশয় ভয়াবহ হইয়া রহিয়াছে। শরীরের কোনও স্থানে কোনওরূপ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু তাহার গলার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত একটি কাল দাগ দেখিতে

পাওয়া গেল। উহা দেখিয়া আমাদিগের স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, বস্ত্র বা রজ্জু অথবা সেই প্রকারের অপর কোনওরূপ দ্রব্য দ্বারা উহার গলা বেষ্টনপূর্বক, উহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া, তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। আরও অনুমান হইল, উহাকে হত্যা করিয়া উহার পরিহিত অলংকার, এমনকী বস্ত্রখানি পর্যন্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পরিধানে যে বস্ত্রখানি ছিল, তাহাও বোধহয় বহুমূল্যের হইবে; নতুবা, উহাকে বিবস্ত্রাবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার আর কোনওরূপ কারণই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ওই ঘরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা অপর ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলাম। বলা বাহুল্য, যে সময় আমরা সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই সময় সেই বাড়ির অধিকারী বিজয়বাবুও আমাদিগের সঙ্গে সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ওই ঘরটি অতিশয় বিস্তৃত ও উহার মধ্যস্থল একটি প্রকাণ্ড গালিচার দ্বারা আচ্ছন্ন। ওই গালিচাখানি একখানি পরিষ্কার বড় চাদরের দ্বারা আবৃত। ওই গালিচার তিন পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বসিবার উপযোগী কয়েকখানি মখমলে মোড়া চেয়ার আছে। গালিচা-বিছানার উপরও কয়েকটি মোটা মোটা তাকিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ওই সকল দ্রব্য যেন শৃঙ্খলার সহিত রক্ষিত নাই; সেই দিবস বোধহয় কোনও ব্যক্তি ওই সকল দ্রব্য যেন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু, তাহাদিগের স্থানে আর তাহাদিগকে স্থাপিত করা হয় নাই। ওই বিছানার উপর তিন-চারটি বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। উহা হইতে এখনও পর্যন্ত মদিরার গন্ধ নির্গত হইতেছে। তিনটি কাচের গ্লাসও সেইস্থানে পড়িয়া রহিয়াছে ও সেইস্থানে বসিয়া মাংসাদি আহার করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়; কারণ, দুই এবং একখানি হাড় এদিক-ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া সহজেই অনুমান হয়, কয়েকজন লোক সেই স্থানে বসিয়া মদিরাদি পান করিয়াছে। তদ্ব্যতীত, ওই ঘরের যে স্থানে বাদ্যযন্ত্র সকল রক্ষিত থাকিত, তাহাও সেই স্থানে নাই। ওই সকল যন্ত্র সেই বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তদ্ব্যতীত, নৃত্য করিবার কালীন স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদিগের পায়ে যে ঘুঙুরগুচ্ছ বাঁধিয়া থাকেন, তাহারও একটি সেই স্থানে পড়িয়া আছে। এই সকল অবস্থা দেখিয়া সহজেই আমাদিগের মনে হইল যে, ওই স্থানে বসিয়া নৃত্য-গীত হইয়াছে, গান-বাদ্য হইয়াছে ও সুরাপানও চলিয়াছে; পরিশেষে এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হইয়াছে।

ওই ঘরের মধ্যে বিজয়বাবুর একটি আলমারি ছিল; তাহা চাবিবন্ধ অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। বিজয়বাবুর নিকট হইতে চাবি লইয়া ওই আলমারি খুলিলাম। দেখিলাম, উহার ভিতর মূল্যবান বস্ত্রাদি অনেক আছে, কিন্তু উহার একখানিও স্থানান্তরিত হয় নাই। অপরাপর স্থানে অপরাপর অনেক দ্রব্যাদিও রহিয়াছে; তাহাও কেহ স্পর্শ করে নাই।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। শম্ভু মালির নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে, ওই ঘরের সমস্ত দরজা ভিতর হইতে বন্ধ হয় ও পরিশেষে একটি দরজায় বাহির হইতে তালা বন্ধ করা হয়। ওই তালা-চাবিও শম্ভুর নিকটেই থাকে। গত কল্য যখন শম্ভু বাহিরে গিয়াছিল, সেই সময় ওই তালা সে নিজ হস্তে বন্ধ করিয়া, ওই তালার ও সদর দরজার চাবি সে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

ওই তালা ও সদর দরজার তালা দেখিয়া যেন অনুমান হইল যে, ওই তালাদ্বয়ের একটি তালাও কোনওরূপে ভাঙা হয় নাই, চাবি দ্বারা খোলা হইয়াছে। কারণ তালাদ্বয়ের কলের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ঠিক আছে; অথবা উহার উপরেও কোনও প্রকার চিহ্ন প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাগানের এই সকল অবস্থা উত্তমরূপে দেখিয়া আমরা সকলে বাহিরে আসিয়া উপবেশন করিলাম ও সেইস্থানে বসিয়া বসিয়া, এই মকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে হইলে, কোন পন্থা প্রথম হইতে অবলম্বন করা কর্তব্য, তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই মকদ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষরূপ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ১ম, ওই মৃতদেহটি কাহার। ২য়, কাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা। এই দুইটি বিষয় লইয়া একটু ভাবিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় আসিয়া মনে উদিত হইল।

১। ওই স্ত্রীলোকটি যেরূপ সুশ্রী ছিল বলিয়া অনুমান হইতেছে, তাহাতে কোনও বড় ঘরের গৃহস্থ রমণী যে এ না হইতে পারে তাহাই বা কী করিয়া বলা যায়?

২। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই রমণী বিজয়বাবুর পরিবারের মধ্যে বা তাঁহার আত্মীয়স্বজনের পরিবারের মধ্যস্থিত কেহ হইবার খুব সম্ভাবনা নয় কি? বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমত যদি এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে এই হত্যার উদ্দেশ্য চুরি নহে, ওই স্ত্রীলোকটির চরিত্র বা সেই প্রকার অপর কোনও বিষয়ই এই হত্যার কারণ।

৩। বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমত যদি এই কার্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে হত্যার পর উহাকে উলঙ্গ অবস্থায় রাখিয়া যাইবার কারণ কী? সময় সময় ভদ্রলোকের দ্বারা তাঁহাদিগের ঘরের মহিলার হত্যা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মৃতদেহ একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে কোনও ভদ্রলোককে দেখি নাই বা শুনি নাই। এরূপ অবস্থায় এই কার্য বিজয়বাবুর দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমতে যে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাই বা অনুমান করি কী প্রকারে?

৪। বিজয়বাবুর দ্বারা বা যদি তাঁহার জ্ঞানমতে এই কার্য না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর কাহার দ্বারা এই কার্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা? তাঁহার বিনা অনুমতিতে কে তাঁহার বাগানের মধ্যে গমন করিয়া এইরূপ ভয়ানক কার্য করিতে সাহসী হইতে পারে? আর তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার জ্ঞানমতেই যদি এই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলেই কি তিনি নিজের বাগানের মধ্যে এইরূপ কার্য সম্পন্ন করিবেন ও তাঁহার নিজের বাড়ির মধ্যে ওই মৃতদেহ এরূপভাবে রাখিয়া দিতে সাহসী হইবেন? ইহাই বা কীরূপে অনুমান করা যাইতে পারে?

৫। স্ত্রীলোকটি অতিশয় সুশ্রী বলিয়াই আমরা গৃহস্থ রমণী বলিয়া অনুমান করিতেছি; কিন্তু, এ যে বারবনিতা নহে, তাহাই বা অনুমান না করি কেন? গৃহস্থ রমণীগণ প্রায়ই অলক্তক রাগে তাঁহাদিগের পদযুগল রঞ্জিত করিয়া থাকেন, ইহাই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। মেদি পাতার রং ব্যবহার করিতে কোনও গৃহস্থ হিন্দু রমণীকে ইতিপূর্বে আমি কখনও দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয় না। ওই রং প্রায় বেশ্যাগণই অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। আরও ব্যবহার করেন—মুসলমান গৃহস্থ রমণীগণ। ভদ্রবংশীয় মুসলমানদিগের স্ত্রীলোকগণ মেদি পাতার রং যেরূপ পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন, ততদূর আর কেহ ব্যবহার করেন কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় ওই স্ত্রীলোকটি বারবনিতা হইলেও হইতে পারে বা কোনও ভদ্রবংশসম্ভূতা মুসলমান রমণী হইলেও হইতে পারেন।

৬। ইনি যদি ভদ্রবংশীয় কোনও মুসলমান রমণীই হন, তাহা হইলে ইঁহার অলংকার প্রভৃতি চুরি করিবার নিমিত্ত এ কার্য কাহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; ইঁহার চরিত্রের নিমিত্তই এই কার্য হইয়া থাকিবে। তাহা হইলেই বা ইঁহাকে একেবারে বিবস্ত্রা করিয়া রাখিয়া যাইবে কেন?

৭। যদি এই মৃতদেহ কোনও বারবনিতার হয়, তাহা হইলে এই হত্যার উদ্দেশ্য চুরি হইবারই খুব সম্ভাবনা ও তাহা হইলে উহাকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া রাখিয়া যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নহে। কারণ, বোধহয় উহার পরিধানে কোনও বহুমূল্য শাড়ি ছিল। চোরগণ সেই শাড়ির লোভ কোনওরূপে সংবরণ করিতে না পারিয়া, উহার অঙ্গ হইতে উহা উন্মোচিত করিয়া লইয়া গিয়াছে; সুতরাং, উহাকে বিবস্ত্রা অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে।

৮। চোরের দ্বারাই যদি এই কার্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা কোন সাহসে স্ত্রীলোকটিকে

এই অপরিচিত বাগানের মধ্যে আনিতে সাহসী হইবে ও কোন সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা উহার মৃতদেহ এইরূপ অবস্থায় পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করিতে সাহসী হইবে? বিশেষত, যেরূপ আমোদ-আহ্লাদ, নৃত্য-গীত ও সুরাপানাদি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে, তাহা চোরের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে বলিতে পারি না, সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চোরগণও যদি এইরূপভাবে কার্য করিতে সাহসী হয়, তাহা হইলে এরূপ কার্য অনায়াসেই হইতে পারে। কিন্তু বাগানের দরোয়ানের সহিত যোগ না করিয়া কোনও চোর যে এইরূপ কার্য করিতে সাহসী হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না।

৯। যদি চোরের দ্বারাই এই কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ও দরোয়ানের সহিত যদি তাহাদিগের কোনওরূপ ষড়যন্ত্র থাকে, তাহা হইলে শম্ভুর কথাই বা আমরা বিশ্বাস করি কী প্রকারে? যে ব্যক্তি ভয়ানক দুষ্কর্ম করিবার নিমিত্ত এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সে পূর্ব হইতে এই বাগানের অবস্থা না জানিলে, কখনওই ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই; কারণ, সে পূর্ব হইতে এই বাগানের অবস্থা জানিয়াছে; এই বাগানের ভিতর যে একজন দরোয়ান বা মালি থাকে, তাহাও তাহার জানিতে বাকি নাই; এরূপ অবস্থায় তাহাকে হাত না করিয়া কোন সাহসে সে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে? ওদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, দুইটি তালাদ্বারা বাগানের বাড়ি ও বাগানের দরজা আবদ্ধ ছিল, তাহা খোলা হইয়াছে অথচ উহার কোনওরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই; এরূপ অবস্থায় একেবারেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, শম্ভুর যোগে তাহারা এই বাগানের মধ্যে প্রবেশ করে নাই, তাহা নহে। শম্ভু ইহার সমস্ত বিষয় অবগত আছে। ভয়বশত কোনও কথা বলিতেছে না।

১০। শম্ভু যদি ইঁহার অবস্থা অবগত থাকে, বা তাহার চাবি দিয়া সে যদি বাগান ও বাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কতদূর অবগত থাকিবার সম্ভাবনা? এই বাগানের ভিতর যে খুন হইবে বা চুরি হইবে, ইহা পূর্ব হইতে অবগত হইতে পারিলে, সে বোধহয় কখনওই এরূপ কার্যে সম্মতি প্রদান করিত না। চোরগণ বোধহয় ভদ্রবেশে ওই স্ত্রীলোকটির সহিত এখানে আগমন করিয়াছিল, 'বাগানের মধ্যে কিয়ৎক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ করিয়া আমরা প্রস্থান করিব,' এইরূপ বলিয়া শম্ভুকে কিছু প্রদানপূর্বক, তাহার মতানুযায়ী তাহারা ওই বাগানের ভিতর প্রবেশ করে ও পরিশেষে আপন কার্য উদ্ধার করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে। পরিশেষে শম্ভু ভিতরে গমন করিয়া যখন এই ভয়ানক অবস্থা দেখিতে পায়, তখন অতিশয় ভীত হইয়া পড়ে ও মনিবের বাড়িতে গমন করিয়া এই সংবাদ প্রদান করে; কিন্তু নিজে বাগানে উপস্থিত ছিল ও তাহারই নিকট হইতে বাগানে আমোদ-আহ্লাদ করিবার নিমিত্ত কেহ যে উহা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা গোপন করিয়া রাখে। আমাদিগের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত শম্ভু প্রকৃত কথা না কহিবে সেই পর্যন্ত এই মকদ্দমার কোনওরূপেই কিনারা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় শম্ভুকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা আমাদিগের কর্তব্য; কারণ, তাহার মনিবকে দিয়া এই কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে কখনওই তাহার নিজের দোষ স্বীকার করিয়া মনিবের অপ্রীতিভাজন হইবে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব কথিতরূপ অনেক প্রকার ভাবনা-চিন্তার পর পরিশেষে শম্ভুমালিকে ডাকিয়া, তাহাকে উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিতেই মনস্থ করিলাম। আমরা যে স্থানে বসিয়াছিলাম, বিজয়বাবুও তাহার নিকটবর্তী স্থানে বসিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলাম। তিনি স্থানান্তরে গমন

করিলে আমরা শম্ভুমালিকে সেই স্থানে ডাকাইলাম। সে আমাদিগের সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার নাম কী?'

শম্ভু। আমার নাম শম্ভু।

আমি। শম্ভু কী? তুমি কোন জাতি?

শম্ভু। শম্ভু পয়ড়া, আমি উড়িয়া।

আমি। তাহা তো দেখিতে পাইতেছি। কোন জেলায় তোমার বাসস্থান?

শম্ভু। বালেশ্বর জেলায়।

আমি। তুমি বিজয়বাবুর মালি না দরোয়ান?

শম্ভু। আমি দুই কার্যই করিয়া থাকি।

আমি। দুই কার্য তুমি কীরূপে করিয়া থাকো?

শম্ভু। দিবাভাগে মালির কার্য করি। আমার থাকিবার ঘর বাগানের দরজায়। আমি সেই স্থানে থাকি। বাগানের দরজার চাবিও আমার নিকট থাকে।

আমি। বাড়ির চাবি?

শম্ভু। তাহাও আমার নিকট থাকে।

আমি। তুমি ব্যতীত এই বাগানে আর কয়জন মালি আছে?

শম্ভু। আমি ব্যতীত আর কেহই নাই।

আমি। এত বড় বাগান তুমি একলা পরিষ্কার রাখো কী প্রকারে?

শম্ভু। অপর লোকের আবশ্যক হইলে, ঠিকা লোক নিযুক্ত করিয়া বাগানের কার্য করানো হয়। তাহারা দিবাভাগে কার্য করিয়া সন্ধ্যার পুর্বেই চলিয়া যায়।

আমি। কাল কয়জন ঠিকা লোক এই বাগানে কার্য করিয়াছিল?

শম্ভু। কাল কেহ কাজ করে নাই। গত একমাসের মধ্যে অপর কোনও লোক কোনওরূপ কার্য করে নাই।

আমি। তুমি তো মালির ও দরোয়ানের উভয় কার্যই করিয়া থাকো; কিন্তু, বেতন পাও কয় টাকা?

শম্ভু। পাঁচ টাকা।

আমি। আর খোরাক পোশাক কিছু পাইয়া থাকো?

শম্ভু। না। কেবলমাত্র পাঁচ টাকাই পাইয়া থাকি।

আমি। কেবলমাত্র পাঁচ টাকার নিমিত্ত এই জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া থাকো কেন? শহরের মধ্যে কাহারও বাড়িতে থাকিলে অভাবপক্ষে সাত-আট টাকা অনায়াসেই পাইতে পারো।

শম্ভু। বাগানে থাকিলে খোরাকি খরচ অনেকটা কম হয় বলিয়াই আমরা বাগানে থাকিতে ভালবাসি।

আমি। কেবল খোরাকি কেন, আরও কিছু কিছু তো তোমরা অনায়াসেই উপার্জন করিয়া থাকো।

শম্ভু। আপনারা তো তা সবই জানেন।

আমি। জানি বলিয়া বলিতেছি। অপরাপর বাবুরা বাগানে আসিলে সময় সময় তাঁহাদিগের নিকট হইতে তোমরা প্রায়ই তো বকশিশ পাইয়া থাকো।

শম্ভু। কেহ কেহ কখনও কখনও কিছু দিয়া থাকেন। তাহা আমার মনিবও অবগত আছেন। যাহা আমরা পাইয়া থাকি তাহা তাঁহার সম্মুখেই পাইয়া থাকি।

আমি। তাঁহার অসাক্ষাতে?

শম্ভু। তাঁহার অসাক্ষাতে আর কোথা হইতে পাইব?

আমি। তাঁহার অসাক্ষাতে যাঁহারা বাগানে আসিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিয়া চলিয়া যান, তাঁহারা বকশিশ বলিয়া তো প্রায়ই কিছু না কিছু প্রদান করিয়া থাকেন।

শম্ভু। বাবুর সঙ্গে না আসিলে, আমি কাহাকেও বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতে দিই না।

আমি। মিথ্যা কথা।

শম্ভু। কীসে মিথ্যা হইল?

আমি। তোমার বাবু যদি নিজে বাগানে আসিতে না পারেন ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণকে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে দাও না?

শম্ভু। না।

আমি। মিথ্যা কথা। তোমার মনিব তো এইখানেই উপস্থিত আছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব?

শম্ভু। তিনি যদি চিঠি দেন বা তাঁহার কোনও লোককে সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বাগানে প্রবেশ করিতে দিই।

আমি। আর তাঁহারা প্রত্যাগমন করিবার সময় বকশিশ দিয়া যান না?

শম্ভু। কখনও কখনও কেহ কিছু দিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘটে না।

আমি। তোমার মনিব প্রত্যহ বাগানে অসিয়া থাকেন কি?

শম্ভু। না।

আমি। কোন দিন আসেন?

শম্ভু। শনিবার ও রবিবারে প্রায়ই আসিয়া থাকেন।

আমি। তিনি একাকী আসেন, না তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কেহ তাঁহার সহিত আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। কখনও চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া নিজেই আসেন, কখনও বা বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহার সহিত আসিয়া থাকেন। কখনও বা একাকী আসিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় চলিয়া যান।

আমি। স্ত্রীলোকগণ কখনও তাঁহার সহিত এখানে আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। কখনও-কখনও আসেন।

আমি। কোন স্ত্রীলোক আসিয়া থাকেন?

শম্ভু। তাঁহার বাড়ির স্ত্রীলোক। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার কন্যা ও বাড়ির অপরাপর স্ত্রীলোক।

আমি। তুমি তোমার মনিবের বাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে চেনো?

শম্ভু। চিনি।

আমি। কীরূপে তুমি তাহাদিগকে চিনিলে?

শম্ভু। আমি তরিতরকারি লইয়া প্রত্যহই বাবুর বাড়িতে গিয়া থাকি। অন্দরমহলে গমন করিতে আমার কোনওরূপ নিষেধ নাই; সুতরাং সকলকেই আমি বাড়িতে দেখিয়াছি ও সকলকে চিনি।

আমি। যে-স্ত্রীলোকটি ওই ঘরের মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে, সে তোমার বাবুর কে হয়?

শম্ভু। সে আমার বাবুর বাড়ির কোনও স্ত্রীলোক নহে।

আমি। তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ। তোমার বাবু যে এ-কথা আমাদিগের নিকট স্বীকার করিয়াছেন।

শম্ভু। তাঁহার বাড়ির কেহ নহে, তিনি স্বীকার করিবেন কোথা হইতে?

আমি। আর যদি স্বীকার করিয়া থাকেন?

শম্ভু। তাহা হইলে হয় মিথ্যা কহিয়াছেন, না হয় অপর কোনও স্ত্রীলোক সম্প্রতি তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছে, যাহাকে আমি দেখি নাই।

আমি। তোমার মনিবের বাড়ির স্ত্রীলোকগণ তো সময়-সময় এই বাগানে আসিয়া থাকেন; তদ্ব্যতীত আর কোনও স্ত্রীলোক এখানে আসিয়া থাকে কি?

শম্ভু। না, আর কোনও স্ত্রীলোক এখানে আসে না।

আমি। কোনও বেশ্যা?

শম্ভু। কোনও বেশ্যাকে আমি কখনও এখানে আসিতে দেখি নাই।

আমি। কোনও নর্তকী?

শম্ভু। তাহা তো আমি দেখি নাই।

আমি। তাহা হইলে যে-ঘরে বাদ্যযন্ত্র সকল পড়িয়া রহিয়াছে ওই ঘরে বসিয়া গান-বাদ্য কে করিয়া থাকে?

শম্ভু। তাঁহারা আপনারাই করিয়া থাকেন।

আমি। আর ঘুঙুরগুচ্ছ পায়ে দিয়া কে নৃত্য করিয়া থাকে?

শম্ভু। বাবুরা আপনারাই নৃত্য করিয়া থাকেন।

আমি। মিথ্যা কথা, ইহা একেবারেই হইতে পারে না। তুমি অনুমান করিয়া দেখো দেখি, ইহার পূর্বে তুমি আমাকে আর কখনও দেখিয়াছ?

শম্ভু। ঠিক মনে হয় না; যেন দেখিয়াছি বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু, কোথায় দেখিয়াছি তাহা ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

আমি। দেখো দেখি, এই বাগানে তোমার মনিবের সহিত আমাকে কখনও দেখিয়াছ কি না?

শম্ভু। মনে হয় না।

আমি। যে-দিন একটি বাইজি আসিয়া এখানে গীত-বাদ্য করিয়াছিল, সেইদিন আমিও যে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম তাহা বোধহয় এখন তুমি মনে করিতে পারিতেছ না?

এইস্থানে পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া কর্তব্য যে, ইতিপূর্বে আমি কখনও সেই বাগানের ভিতর প্রবেশ করি নাই।

শম্ভু। বোধহয় আপনি ছিলেন, কিন্তু আমার ঠিক মনে হইতেছে না।

আমি। বাইজির নাচ হইয়াছিল তাহা তোমার মনে হইতেছে?

শম্ভু। তাহা মনে পড়িতেছে।

আমি। তাহা হইলে ইতিপূর্বে তুমি কীরূপে বলিতেছিলে যে, তোমার বাবুর পরিবার ব্যতীত আর কোনও স্ত্রীলোক কখনও এই বাগানের ভিতর প্রবেশ করেন নাই।

শম্ভু। কোনও বেশ্যা কখনও এই বাগানের ভিতর আইসে নাই, তাহাই আমি বলিয়াছিলাম।

আমি। তবে বাইজি আসিল কী প্রকারে?

শম্ভু। সে তো আর বেশ্যা নয়, সে বাইজি।

আমি। ঠিক কথা, যে বাইজি সে বেশ্যা হইবে কীরূপে? আচ্ছা, শম্ভু, আমি তোমাকে এখন গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার যথার্থ উত্তর দিবে কি না?

শম্ভু। আমি মিথ্যা কহিব কেন? যথার্থ যাহা জানি তাহাই কহিব।

আমি। আমি তোমাকে পূর্বেই সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তুমি এখন বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার কথার উত্তর প্রদান করিও। আরও তোমাকে বলিয়া দিতেছি যে, তোমার মনিব রাত্রিকালে এই বাগানে ছিলেন না। তুমি ব্যতীত বাগানে আর কোনও লোকজন বা চাকর-চাকরানি কেহই থাকে না। বাড়ির চাবি তোমার নিকট থাকে; বাগানের দরজার চাবিও তুমি তোমার নিকট রাখিয়া থাকো। তুমি বাগানে সমস্ত রাত্রি উপস্থিত ছিলে; তোমার নিকট যে-চাবি থাকে তাহা দিয়াই বাগানের দরজা ও ঘরের তালা খোলা হইয়াছে এবং সেই ঘরের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় এই হত্যার নিমিত্ত তুমি সম্পূর্ণরূপে দায়ী। যদি এখনও সমস্ত কথা বলিয়া প্রকৃত

হত্যাকারীকে ধরিবার নিমিত্ত আমাদিগের সহায়তা না করো, তাহা হইলে জানিও, এই হত্যাপরাধে তুমি সর্বতোভাবে দোষী হও বা না হও, এই হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত তোমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে। আমি জানি, এই হত্যা তোমার জ্ঞানত হয় নাই; কিন্তু তুমি যতদূর অবগত আছ, তাহার আর এখন কিছুমাত্র গোপন করিও না। তোমার দ্বারা যাহা কিছু অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা প্রত্যেক বাগানের প্রত্যেক মালি বা দরোয়ানের দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা আমি বিশেষরূপ অবগত আছি; নতুবা, কেবলমাত্র পাঁচ টাকায় তোমাদিগের কোনওরূপেই ভরণপোষণ নির্বাহ হইতে পারে না। তুমি চাকরি যাইবার ভয়ে তোমার যে-সামান্য অপরাধ এখন স্বীকার করিতে সম্মত হও নাই, আমি বলিতেছি সেই অপরাধ এখন স্বীকার করিলেও তোমার মনিব কোনওরূপে তোমাকে কর্মচ্যুত করিতে পারিবেন না। তোমার চাকরি যাহাতে থাকে তাহা আমি করিব। কিন্তু এখনও যদি তুমি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, ওই স্ত্রীলোকটিকে হত্যা করার অপরাধে তোমাকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে।

আমার কথা শুনিয়া শম্ভু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রতীতি জন্মিল যে, এ যাহা বলিয়াছে, তদ্ব্যতীত অনেক কথা সে অবগত আছে। এখন সেই সকল কথা সে বলিবে কি না তাহা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে থাকিবার পর সে কহিল, 'আমি তো গত রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না। এখানে কী হইয়াছে না হইয়াছে, তাহা আমি কীরূপে বলিব?'

. তাহার কথা শুনিয়া আমি পুনরায় তাহাকে কহিলাম, 'এখনও দেখিতেছি তুমি মিথ্যা কথা পরিত্যাগ করিতেছ না। রাত্রিকালে তুমি যে-স্থানে গমন করিয়াছিলে বলিয়াছ ও যে-স্থানে ও যাহাদিগের নিকট রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছ বলিয়া আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে, অনুসন্ধানে তাহার সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; তুমি যাহাদিগের নাম করিয়াছিলে তাহাদিগকে থানাতে আনাও হইয়াছে; যদি ইচ্ছা করো তাহা হইলে তাহাদিগকে এখনই আমি এখানে আনাইয়া লইতেছি। তাহা হইলেই শুনিতে পাইবে তোমার সাক্ষাতে তাহারা কী বলে।'

আমার কথা শুনিয়া শম্ভু পুনরায় চুপ করিয়া রহিল। পুনরায় আমি তাহাকে কহিলাম, 'আমি তোমাকে যাহা-যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, এখনও তাহার যথাযথ উত্তর 'প্রদান করো; নতুবা, জানিও, নিশ্চয়ই তোমার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। ইহার পর সমস্ত কথা বলিলেও তোমার পরিত্রাণের আর কোনওরূপ উপায় থাকিবে না। এখনও আমার পরামর্শ শুনিয়া কার্য করো।'

শম্ভু। আমার মনিব শুনিলে আমার চাকরি যাইবে।

আমি। আমরা তোমার মনিবকে কোনও কথা বলিব না; তথাপিও যদি তিনি কিছু জানিতে পারেন, তাহা হইলেও যাহাতে তোমার চাকরি না যায়, আমরা তাহার বন্দোবস্ত করিব।

শম্ভু। আমি আপনাদিগের কথায় বিশ্বাস করিলাম; যাহা ভালো বিবেচনা হয় তাহা করিবেন। কিন্তু আমি তো তাহাদিগকে চিনি না।

আমি। কাহাদিগকে?

শম্ভু। কাল রাত্রিতে যাহারা বাগানে আসিয়াছিল।

আমি। কাহারা কাল রাত্রিতে বাগানে আসিয়াছিল?

শম্ভু। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি তাহাদিগকে চিনি না। ইতিপূর্বে আর কখনও তাহাদিগকে দেখি নাই বা তাহাদিগের কোনওরূপ পরিচয়ও আমি গ্রহণ করি নাই।

আমি। তাহা হইলে তাহাদিগকে বাগানের মধ্যে আসিতে দিলে কেন?

শম্ভু। আমার কুবুদ্ধি, তাহার উপর লোভ।

আমি। কয়টি টাকা তুমি পাইয়াছিলে?

শম্ভু। পাঁচটি।

আমি। এত অল্প টাকায় তুমি এরূপ কার্য করিতে মত দিলে কী প্রকারে?

শম্ভু। কী কার্য?

আমি। খুন।

শম্ভু। দোহাই ধর্মাবতার। আমি খুনের কিছুই অবগত নহি। আমি যাহা কিছু জানি তাহার সমস্তই এখনই আমি আপনার নিকট বলিতেছি; ইহার মধ্যে একটিও মিথ্যা কথা আপনি পাইবেন না।

আমি। আচ্ছা, যাহা জানো আনুপূর্বিক বলো দেখি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শম্ভু কহিল, 'কল্য সন্ধ্যার পর আমি এই বাগানের দরজায় বসিয়া আছি, এরূপ সময় একখানি গাড়ি আসিয়া হঠাৎ এই বাগানের দরজায় উপস্থিত হইল। ওই গাড়ির মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ও তিনটি পুরুষ ছিল। একটা পুরুষ সেই গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিল ও আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দরোয়ান, আজ তোমার মনিব এই বাগানে আসিবেন কি?"

আমি। না, তিনি শনিবার ও রবিবার ভিন্ন আর কোনও দিবস বাগানে আসেন না।

পুরুষ। তাহা হইলে তুমি আমাদিগের একটা অনুরোধ রক্ষা করিবে কি? সেই অনুরোধ রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে দুইটি টাকা প্রদান করিতেছি।

আমি। কী করিতে হইবে?

পুরুষ। আমরা একটু আমোদ-আহ্লাদ করিবার নিমিত্ত একটি বাগান স্থির করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই বাগানে হঠাৎ বাবুর পরিবারবর্গ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় আমরা সেই বাগানে প্রবেশ করিতে সমর্থ হই নাই; সুতরাং, আমাদিগকে অন্য স্থানের অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

আমি। আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত বাগানের মধ্যে আমোদ-আহ্লাদ করিবেন?

পুরুষ। দুই-তিন ঘণ্টার অধিক নহে। তাহার পর আমরা এই স্থান হইতে প্রস্থান করিব।

আমি। দুই টাকায় এ-কার্য কখনও হইতে পারে না।

পুরুষ। কয় টাকায় হইতে পারে?

আমি। যদি দশ টাকা পাই, তাহা হইলে দুই-তিন ঘণ্টার নিমিত্ত আমি এই বাগান ছাড়িয়া দিতে পারি।

পুরুষ। দশ টাকা কোনওরূপেই আমরা দিতে পারি না, নিতান্তপক্ষে পাঁচ টাকা পর্যন্ত প্রদান করিতে পারি।

তাহার সহিত এইরূপ কথাবার্তা হইবার পর, আমি পরিশেষে পাঁচ টাকাতেই স্বীকৃত হইলাম; কারণ, ভাবিলাম, 'মনিব কিছু আজ আসিবেন না; তবে কেন আমি পাঁচ টাকা পরিত্যাগ করি? ইহাতে আমার মনিবের কোনওরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। দুই-তিন ঘণ্টা পরেই যখন উহারা আমোদ-আহ্লাদ করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন এ-কথা কোনওরূপে প্রকাশিত হইতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় কেন পাঁচ-পাঁচটি টাকা পরিত্যাগ করি?' মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া, আমি তাহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাহারা গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমিও বাগানবাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাদিগের সঙ্গে-সঙ্গে যাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম ও আলো জ্বালিয়া দিয়া আমি আমার ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলাম। উহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া আমোদ-আহ্লাদে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হইবার পর আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমার ইচ্ছা ছিল যে-পর্যন্ত উহারা বাগান পরিত্যাগ না করিবে,

সেই পর্যন্ত আমি শয়ন করিব না; কিন্তু তাহা পারিলাম না। কোথা হইতে কালনিদ্রা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল। বাগানের দরজা খোলা ছিল; সুতরাং সেইরূপ অবস্থাতেই রহিয়া গেল। যখন আমার নিদ্রা ভাঙিল তখন দেখিলাম, রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। গান-বাজনা প্রভৃতি কিছুই হইতেছে না। তাহারা চলিয়া গিয়াছে কি না তাহা দেখিবার নিমিত্ত আমি সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, বাদ্যযন্ত্রাদি এদিক-ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে, লোকজন কেহই নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে। পার্শ্বের ঘরে গিয়া দেখিলাম, সেই স্ত্রীলোকটির মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমার অতিশয় ভয় হইল। কী করিব তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্রুতগতি আমার মনিবের নিকট গমন করিলাম ও 'আমি রাত্রিতে বাগানে উপস্থিত ছিলাম না।' এইরূপ মিথ্যা কথা বলিয়া আমার দোষ গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম। তিনি আমার সহিত এইস্থানে আগমন করিয়া স্বচক্ষে সমস্ত অবস্থা দর্শন করিলেন ও পরিশেষে এই সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আমাকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন। সেইস্থানে আমি ভয়ক্রমে যাহা-যাহা বলিয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন। ইহাই প্রকৃত কথা। ইহা ব্যতীত আর কোনও কথা আমি অবগত নহি।' এই বলিয়া শম্ভু নিরস্ত হইল।

আমি। তোমার কথা আমি এখন অনেকটা বিশ্বাস করিতেছি ও আরও দুই চারিটি কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসাও করিতেছি। ইহারও তুমি যথাযথ উত্তর প্রদান করিবে।

শম্ভু। জিজ্ঞাসা করুন, আমি কোনও মিথ্যা বলিব না। প্রকৃত যাহা অবগত আছি, তাহাই আমি বলিব।

আমি। উহারা কয়জন আসিয়াছিল?

শম্ভু। চারিজন।

আমি। তাহার ভিতর পুরুষ কয়জন ও স্ত্রীলোকই বা কয়জন?

শম্ভু। তিনজন পুরুষ, একটি মাত্র স্ত্রীলোক।

আমি। পুরুষ কয়টি কোন দেশীয় লোক বলিয়া অনুমান হয়?

শম্ভু। তিনজনই বাঙালি।

আমি। বাঙালি সত্য; কিন্তু কী প্রকারের বাঙালি? ছোটলোক না ভদ্রলোক?

শম্ভু। তাহাদিগের পরিধানে বেশ পরিষ্কার কাপড় ছিল। দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়াই অনুমান হয়।

আমি। তাহাদিগকে তুমি চিনো?

শম্ভু। না, তাহাদিগকে আমি চিনি না। ইতিপূর্বে তাহাদিগকে যে কখনও দেখিয়াছি তাহাও আমার বোধহয় না। এ-কথা আমি পূর্বেই তো আপনাকে বলিয়াছি।

আমি। যদি এখন তাহাদিগকে দেখিতে পাও তাহা হইলে চিনিতে পারিবে কি?

শম্ভু। বোধহয় দেখিলে চিনিতে পারিব।

আমি। তিনজনকেই চিনিতে পারিবে?

শম্ভু। তিনজনকেই চিনিতে পারিব; কিন্তু, যে-ব্যক্তি আমার সহিত কথা কহিয়াছিল ও যাহার নিকট হইতে আমি পাঁচ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাকে কখনওই ভুলিব না; যখন দেখিব তখনই তাহাকে চিনিতে পারিব।

আমি। যে-স্ত্রীলোকটি উহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল, সে ইতিপূর্বে কখনও এই বাগানে আসিয়াছিল?

শম্ভু। না, তাহাকে আর কখনও এখানে আসিতে দেখি নাই।

আমি। যাহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, ওই স্ত্রীলোকটিই কি তাহাদিগের সঙ্গে আসিয়াছিল?

শম্ভু। হাঁ, ওই স্ত্রীলোকটিই আসিয়াছিল।

আমি। যখন সে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার অঙ্গে কোনও অলংকার দেখিয়াছিলে?

শম্ভু। অনেক সোনার গহনা ছিল।

আমি। তাহার পরিধানে কীরূপ বস্ত্র ছিল?

শম্ভু। খুব একখানি ভালো কাপড় ছিল। বোধহয় মূল্যবান বেনারসী শাড়ি।

আমি। যখন তাহারা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, সেই সময় তাহাদিগের সহিত অপর কোনও দ্রব্যাদি ছিল?

শম্ভু। কয়েক বোতল মদ ছিল। কিছু খাবারও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল বলিয়া বোধহয়।

আমি। তাহারা যে-গাড়িতে আসিয়াছিল তাহা ঘরের গাড়ি না ভাড়াটিয়া গাড়ি?

শম্ভু। ভাড়াটিয়া গাড়ি; কারণ, আমার সম্মুখে তাহারা ওই গাড়ির ভাড়া দিয়া উহা বিদায় করিয়া দিয়াছিল।

আমি। কত ভাড়া দিয়াছিল, দেখিয়াছ?

শম্ভু। দুই টাকা আমার সম্মুখে দিয়াছিল; ইহার পূর্বে যদি কিছু দিয়া থাকে বলিতে পারি না।

আমি। গাড়োয়ান ভাড়া লইবার সময় কোনও কথা বলিয়াছিল?

শম্ভু। অপর কোনও কথা কহিতে শুনি নাই। যেমন তাহাকে ভাড়া দেওয়া হইল অমনি সে তাহার গাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

আমি। ওই গাড়োয়ান কোথা হইতে উহাদিগকে আনিয়াছিল, সেই সময় তাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলে?

শম্ভু। না।

আমি। এ-গাড়িতে ঘোড়া ছিল কয়টি, একটি না দুইটি?

শম্ভু। দুইটি।

আমি। কী রঙের ঘোড়া ছিল?

শম্ভু। দুইটি ঘোড়াই লাল রঙের।

আমি। ইহা ব্যতীত আর কোনও কথা তুমি অবগত আছ?

শম্ভু। আর যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হয় করুন, আমি যাহা অবগত আছি তাহা বলিব। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমি আর কোনওরূপ মিথ্যা কথা কহিব না, বা কোনও কথা গোপনও করিব না।

শম্ভুর নিকট এইসকল বিষয় অবগত হইয়া আমাদিগের মনে অনেক সাহসের উদয় হইল। কী কারণে ও কাহাদিগের দ্বারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে, তখন তাহার কতকটা অনুমান করিতে আমরা সমর্থ হইলাম। বিজয়বাবুর উপর আমরা যে একটু সন্দেহ করিতেছিলাম, সেই সন্দেহ এখন সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। এখন মনে হইল, শম্ভুর কথা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিশেষ চেষ্টা করিতে পারিলে যে এই মকদ্দমার অনুসন্ধান হইবে না, বা হত্যাকারীগণ যে ধৃতও হইবে না তাহা নহে। মৃতদেহ যে কাহার তাহাও জানিতে পারা যাইবে। হত্যাকারীগণ যে কাহারা তাহাও প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া আমি সেই স্থানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিলাম না। একখানি গাড়ি আনাইয়া যত শীঘ্র পারি সেই বাগান হইতে বহির্গত হইয়া গেলাম। কোথায় যে গমন করিলাম তাহা পাঠকগণ ক্রমে অবগত হইতে পারিবেন। থানার যে-কর্মচারী পূর্ব হইতেই এই অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি সেই বাগানের ভিতর অবস্থিতি করিয়া ওই মৃতদেহ সম্বন্ধে 'সুরতহাল' ও অপরাপর আবশ্যকীয় অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাগান হইতে বহির্গত হইয়া আমি আমার প্রধান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে এই মকদ্দমার সমস্ত অবস্থা বলিয়া তাঁহার দ্বারা শহর ও শহরতলীর সমস্ত থানায় একটা আদেশ প্রচারিত করাইলাম। টেলিফোন যোগে ওই আদেশ দেখিতে দেখিতে সমস্ত থানায় গিয়া উপস্থিত হইল। যে আদেশ আমার প্রধান কর্মচারী প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহার সারমর্ম এইরূপ—

বাগানের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া যতদূর অবগত হইতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুমান করা হইতেছে যে-ওই স্ত্রীলোকটি কোনও সম্ভ্রান্ত বারবনিতা। তাহার পরিধানে একখানি ভালো বস্ত্র ও অনেকগুলি অলংকার ছিল। অনুমান হয়, নৃত্য-গীত প্রভৃতি করিবার নিমিত্ত কোনও বাবু তাহাকে বাগানে আনিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত প্রত্যেক থানার ইন্সপেক্টারগণ তাঁহাদিগের এলাকার সমস্ত স্থানে ঢোল-সোরেত দ্বারা এই অবস্থা এরূপভাবে প্রকাশ করেন যে এলাকার সমস্ত লোক, বিশেষত, বারবনিতাগণ এই অবস্থা যেন অবগত হইতে পারেন। যদি কাহারও নিকট হইতে জানিতে পারা যায় যে, কোনও স্ত্রীলোক গতকল্য কাহার সহিত বাগানে গিয়াছিল ও এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই, তাহা হইলে সেই সংবাদ যত শীঘ্র হয় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরিত হইবে।

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার দুই ঘণ্টা পরেই সংবাদ আসিল সিমলার তিনটি স্ত্রীলোক কল্য সন্ধ্যার সময় বাগানে গমন করিয়াছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই। তাঁহাদিগের পরিধানে ভালো-ভালো কাপড় ও অনেকগুলি সোনা-রূপার অলংকার আছে।

এই সংবাদে পাইবামাত্রই আমি সিমলায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ি হইতে স্ত্রীলোক কয়েকটি গমন করিয়াছে সেই বাড়িতে গমন করিয়া জানিতে পারিলাম, সেই বাড়িতে নৃত্য নাম্নী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করে। গতকল্য সন্ধ্যার পূর্বে দুইটি বাবুর সহিত সে তাহার দুইটি কন্যাকে লইয়া বাগানে গমন করিয়াছে; কিন্তু, এখনও পর্যন্ত প্রত্যাগমন করে নাই।

এই কথা শুনিয়া আমার মনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, যদি শম্ভুর কথা প্রকৃত হয় তাহা হইলে যে-স্ত্রীলোকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সে নৃত্য বা তাহার কন্যা হইতে পারে না; কারণ, তাহারা যখন তিনজন একত্র গমন করিয়াছে তখন একজনের মৃতদেহ পাওয়া যাইবে ও অপর দুই জনের কোনওরূপ সন্ধান পাওয়া যাইবে না, ইহা কখনওই হইতে পারে না। তথাপি মনের সন্দেহ একবার মিটাইয়া লওয়াই কর্তব্য। মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া ওই বাড়িতে অপর যে সকল স্ত্রীলোক বাস করিত তাহাদিগের দুই-একজনকে সঙ্গে লইয়া আমি পুনরায় সেই বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ও ওই মৃতদেহটি তাহাদিগকে দেখাইলাম। ওই মৃতদেহ দেখিবামাত্রই তাহারা বলিয়া উঠিল, 'ইহা গৌরবের মৃতদেহ।'

আমি। গৌরব কে?

স্ত্রীলোক। নৃত্যর বড় কন্যা।

আমি। তাহার ছোট কন্যার নাম কী?

স্ত্রীলোক। তাহার নাম শৈরব।

আমি। কাল যখন উহারা বাগানে যাইবার নিমিত্ত বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তখন তোমরা বাড়িতেই ছিলে?

স্ত্রীলোক। আমরা বাড়িতেই ছিলাম, আমাদিগের সম্মুখে উহারা বাহির হইয়া আইসে।

আমি। কাহার সহিত উহারা গমন করিয়াছিল?

স্ত্রীলোক। চারিটি বাবুর সহিত।

আমি। তাহাদিগকে তোমরা চিনো?

স্ত্রীলোক। উহাদিগকে ইতিপূর্বে কখনও দেখি নাই।

স্ত্রীলোকগণের কথা শুনিয়া আমার মনে হইল শম্ভু বোধহয় এখনও সমস্ত কথা সত্য কহে নাই। যাহা হউক, তাহাকে আর-একবার ভালো করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই ভাবিয়া শম্ভুকে পুনরায় ডাকাইলাম ও তাহাকে অনেকরূপে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু, সে তিনটি স্ত্রীলোকের কথা কোনওরূপেই স্বীকার করিল না।

শম্ভুর কথা শুনিয়া, সে সত্য বলিতেছে কি মিথ্যা বলিতেছে, তাহা আমি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যদি তাহার কথা প্রকৃত হয়, যদি কেবলমাত্র একটি স্ত্রীলোকই ওই বাগানে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে অপর স্ত্রীলোক দুইটি কোথায় গেল? প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, দুইটি স্ত্রীলোক অলংকারে শোভিত হইয়া বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে একটিকে হত্যা অবস্থায় এইস্থানে পাওয়া যাইতেছে। তাহার পরিধানে একখানি অলংকার, এমনকী একখানি বস্ত্র পর্যন্ত নাই, সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় অপর স্ত্রীলোকদ্বয়ের অবস্থাও যে এইরূপ ঘটে নাই, তাহাই বা অনুমান করা যাইতে পারে কীরূপে?

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া, যে স্ত্রীলোক কয়েকটি আমার সহিত ওই বাগানে মৃতদেহ দেখিবার নিমিত্ত আসিয়াছিল তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, পুনরায় আমি তাহাদিগের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই বাড়িতে আরও অনেকগুলি স্ত্রীলোক বাস করিত। মনে করিলাম উহাদিগের প্রত্যেককেই উত্তমরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা কর্তব্য যে তাহারা কোনও কথা বলিতে পারে কি না।

মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া, এক-এক করিয়া আমি সেই বাড়ির প্রত্যেককেই অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু যাহাদিগের সহিত স্ত্রীলোকত্রয় বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগের সম্বন্ধে কেহই কোনওরূপ সংবাদ প্রদান করিতে পারিল না। এইসকল অনুসন্ধান করিতে দিবা তিনটা বাজিয়া গেল। তিনটার পর আমি সেই বাড়ি হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিতেছি, এরূপ সময় একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি আসিয়া সেই বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। দেখিলাম ওই গাড়ি হইতে দুইটি স্ত্রীলোক বহির্গত হইয়া সেই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল। উহাদিগের মধ্যে একজন প্রাচীনা ও একজন নবীনা। অনুমানে অবগত হইতে পারিলাম, প্রাচীনার নাম নৃত্য ও নবীনার নাম শৈরব। পাঠকগণ বোধহয় চিনিতে পারিয়াছেন, ইহারা দুইজন ও যাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে সে, একত্রে বাগানে যাইবার নাম করিয়া গতকল্য সন্ধ্যার সময় বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিল।

ইহাদিগকে দেখিয়া আমার মনের একটি আশঙ্কা অন্তর্হিত হইল। পূর্বে মনে করিয়াছিলাম ইহারাও হয়তো কোনও স্থানে হত্যা হইয়া পড়িয়া আছে; কিন্তু, ইহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া সে চিন্তা দূর হইল। তখন আমি শৈরবকে লক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি যখন বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া গিয়াছিলে, সেই সময় তোমার সমস্ত অলংকার পরিধান করিয়া গিয়াছিলে; কিন্তু, এখন তোমার অঙ্গে সেই সকল অলংকার দেখিতে পাইতেছি না; তাহা আছে তো?'

শৈরব কহিল, 'আমার সমস্ত অলংকার আমার মাতার নিকট আছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শৈরবকে আমি যে সময় অলংকারের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, সেই সময় নৃত্য বাড়ির স্ত্রীলোকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'গৌরব প্রত্যাগমন করিয়াছে কি?' কিন্তু তাহার কথায় কেহ কোনওরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া সকলেই আমাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, 'তোমার গৌরবের কথা ওই বাবুটি বলিতে পারেন, উহাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করো।' উহাদিগের কথা শুনিয়া নৃত্য আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও কহিল, 'বাবা, আমার গৌরব এখন কোথায়?'

নৃত্য বেশ্যা ও গৌরব বেশ্যার কন্যা হইলেও মাতা ও সন্তানের মধ্যে যেরূপ সম্পর্ক তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, ইহা সকলেই অবগত আছেন; সন্তানের মৃত্যুসংবাদ মাতার কর্ণগোচর করা যে কীরূপ লোমহর্ষক ব্যাপার, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই নিমিত্তই সেই বাড়ির সকলেই ওই সংবাদ মাতার কর্ণগোচর না করিয়া, সেই দুরূহ কার্যের বিষম ভার আমার স্কন্ধে অর্পণ করিল। যে অনুসন্ধান করিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহার নিমিত্ত আমি এত কষ্ট সহ্য করিয়া এই বারবনিতাগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছি, সেই কার্য যদি আমাকে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা হইলে সন্তানের মৃত্যুসংবাদ মাতার কর্ণগোচর করাও আমার একরূপ কর্তব্য-কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িল। যে কার্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আমাকে দিনযাপন করিতে হয়, তাহাতে হৃদয় একরূপ কঠিন হইয়াই পড়িয়াছে। তাহার উপর এই কঠিন হৃদয়কে আরও কঠিন করিয়া এই মর্মভেদী সংবাদ মাতার কর্ণগোচর করিতে বাধ্য হইলাম।

এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র নৃত্য একবার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল ও দেখিতে দেখিতে সেই স্থানে পতিত হইল। বাড়ির সকলেই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবল শোক যাহার হৃদয়ে একবার বিদ্ধ হইয়াছে, সান্ত্বনাবাক্যে তাহাকে প্রবোধ দেওয়া কাহার সাধ্য! নৃত্য কাহারও কথা শুনিল না, পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেলে পুনরায় আমাকেই কথা কহিতে হইল। আমিই তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম 'দেখো নৃত্য, তোমার হৃদয়ে মর্মান্তিক যাতনা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তুমি রোদন করিতেছ। কিন্তু এখন রোদন করিয়া কোনও ফল নাই। ঈশ্বর তোমার ও তাহার অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইয়াছে। রোদন করিলে সেই ফলের আর কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। আমার বিবেচনায় এখন তোমার নিরস্ত হইয়া, যাহাতে তাহার সংকার হয় এখন তাহারই উপায় বাহির করা উচিত ও আমাদিগকে সাহায্য করিয়া যে ব্যক্তি তোমার হৃদয়ে এই প্রবল যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, যাহাতে সে ধৃত হইয়া উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হয়, তাহার চেষ্টা করাই এখন তোমার কর্তব্য। গৌরব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর প্রত্যাগমন করিবার কোনওরূপ উপায় নাই; কিন্তু তোমার অসময়ের সম্বল যে সকল অলংকার অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুনঃপ্রাপ্তির উপায় এখনও আছে। আমাদিগকে বিশেষরূপ সাহায্য করিলে যদি আমরা সেই হত্যাকারীদিগকে ধরিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে গৌরবের পরিহিত অলংকারগুলি যে আমরা তাহাদের নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিতে পারিব না, এ কথা বলিতে পারি না।'

আমার কথা শুনিয়া নৃত্য চুপ করিল ও কহিল, 'আমাকে কী করিতে হইবে বলুন।'

আমি। বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না। কেবল গৌরব কাহার সহিত কোথায় গমন করিয়াছিল, তাহারই যথাযথ বর্ণন করিতে হইবে।

নৃত্য। মহাশয়, সে অনেক কথা। আমি আমার দুইটি কন্যাকে লইয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকি। ইহারা ব্যতীত আমার আর কেহই নাই। আমি ইহাদিগকে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে দিই নাই। শৈশবকাল হইতেই আমি ইহাদিগকে নৃত্য-গীত শিখাইয়াছি। কোনও ভদ্রলোক কোনও স্থানে আমোদ-আহ্লাদ করিবার ইচ্ছা করিলে, প্রায়ই ইহাদিগকে লইয়া গিয়া থাকেন; সুতরাং, বাগানে যাওয়া ইহাদিগের একরূপ প্রধান কার্যের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। কোনও ভদ্রলোক ইহাদিগকে কোনও বাগানে লইয়া যাইতে চাহিলে, আমি সাহস করিয়া ইহাদিগকে কখনওই ছাড়িয়া দিতে পারি না; কারণ, সামান্য পরিমাণে সুরাপান করিলেই ইহারা জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়। এই নিমিত্ত যখন ইহারা কোনও স্থানে গমন করে, তখন আমিও উহাদিগের সহিত গমন করিয়া থাকি। আমরা কেবল একজন কোনও স্থানে গমন করি না। যদি কোনও বাবু কেবল আমার একটিমাত্র কন্যাকে বাগানে লইয়া যাইতে চাহেন ও একজনের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করেন, তাহা হইলেও আমি আমার অপর কন্যাকে লইয়া

তাঁহার সহিত গমন করিয়া থাকি। এমনকী নিতান্ত পরিচিত লোক হইলেও আমার কোনও কন্যা কখনও কাহারও সহিত একাকী গমন করে না।

পরশ্ব সন্ধ্যার পর আমি আমার ঘরে বসিয়া আছি, কন্যাদ্বয় তাহাদিগের ওস্তাদের নিকট বসিয়া একটি নূতন গানের রাগ গতের সহিত মিলাইয়া শিক্ষা করিতেছে, এরূপ সময় একটি বাবু আসিয়া আমার ঘরে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত সোনাগাছির রামাদালালও আগমন করিয়াছিল। ওই বাবুটি আমাদিগের ঘরে আসিয়া উপবেশন করিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে আমাকে কহিলেন, 'বঙ্গদেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা তোমার একটি কন্যাকে তিনি একদিন বাগানে লইয়া যান। গীত-বাদ্য প্রভৃতির দ্বারা যদি তোমার কন্যা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে মাসিক তিরিশটি টাকা বেতন স্থির করিয়া দিব। ঘরে বসিয়া সে মাসে-মাসে বেতন গ্রহণ করিবে। কেবলমাত্র সপ্তাহে এক দিবস তাহাকে বাগানে গমন করিতে হইবে।' ওই বাবুটির কথা শুনিয়া আমি তাঁহাকে কহিলাম, 'বাগানে যাওয়াই আমার কার্য। তিনি একটিকে বাগানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আপনাকে বলিয়া দিয়াছেন; আমি দুইটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। ইহাদিগের মধ্যে যেটিকে তাঁহার পছন্দ হয়, সেইটিকেই তিনি চাকর রাখিতে পারেন। কবে যাইতে হইবে ও প্রথম দিবসের নিমিত্ত কী পাওয়া যাইবে, তাহা আমাকে বলিয়া যান; কারণ, সেই দিবস উহাদিগকে আমি আর অন্য কোনও স্থানে পাঠাইয়া দিব না।' আমার কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, 'আগামীকল্য সন্ধ্যার পর আমি পুনরায় আসিব। সেই সময় সেই জমিদারমহাশয়ের আরও দুই-একজন প্রিয় সহচর আগমন করিবেন; কারণ, তাঁহাদিগের পছন্দ না হইলে তোমাদিগকে আমি লইয়া যাইতে পারিব না। যদি তোমার কন্যাদ্বয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগের পছন্দ হয়, তাহা হইলে অদ্যই তোমরা আমাদিগের সহিত গমন করিতে পারিবে ও যদি যাওয়া হয় তাহা হইলে এক রাত্রির নিমিত্ত তোমাদিগকে পঁচিশ টাকা প্রদান করিব।' আমি কহিলাম, 'পঁচিশ টাকা তো যে সে ব্যক্তি আমাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। অত বড় জমিদার হইয়া যদি কেবলমাত্র পঁচিশ টাকা আমাদিগকে প্রদান করেন তাহা হইলে উহা আমাদিগের উপযুক্ত হইবে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু, তাঁহার মান কোথায় থাকিবে?' আমার কথাগুলি শুনিয়া সেই ব্যক্তি কহিলেন, 'জমিদারমহাশয়ের সহচরগণ যদি তোমার কন্যাদ্বয়ের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ করেন, তাহা হইলে টাকার জন্য আটকাইবে না। একরাত্রির নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমি তোমাদিগকে দেওয়াইয়া দিতে পারিব।' এই বলিয়া সেই ব্যক্তি সে-দিবস চলিয়া গেলেন। কল্য সন্ধ্যার সময় পুনরায় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত রামাদালালকে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু, তাঁহার সহিত অপর তিনটি বাবু আগমন করিয়াছিলেন। প্রথম ব্যক্তি অপর তিনজনকে সঙ্গে লইয়া আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলেন ও আমার কন্যাদ্বয়কে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যে দুইটি স্ত্রীলোকের কথা বলিয়াছিলাম তাহারা ইহারাই। ইহারা দুই সহোদরা। যদি জমিদারমহাশয় ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পছন্দ করেন, তাহা হইলে বলুন, আমি ইহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলি।' তাঁহার কথার উত্তরে ওই তিনজনের মধ্যে একজন অপর দুইজনের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন, 'ইহারা দুইজনই দেখিতেছি সমান রূপবতী; গুণবতী বোধহয় একরূপই হইবে; সুতরাং, ইহাদিগের মধ্যে যে কোনওরূপ পার্থক্য আছে তাহা আমার বোধ হইতেছে না। যাহার ইচ্ছা হয় সে-ই গমন করিতে পারে। তাহাকেই জমিদারমহাশয় পছন্দ করিবেন।' এই কথার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি কহিলেন, 'আমি ইহাদিগের দুইজনকেই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি। জমিদারমহাশয় নিজে দেখিয়া-শুনিয়া পছন্দ করিয়া লউন।' উত্তরে তিনি কহিলেন, 'এ উত্তম কথা।'

এইরূপ কথাবার্তার পর প্রথম ব্যক্তি আমার কন্যাদ্বয়কে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহারা প্রস্তুত হইল। একটি বড় জমিদারের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছে; বিশেষ তাঁহার পছন্দ হইলে মাসিক বেতন হইবার সম্পূর্ণরূপ সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া দুই ভগ্নীই দুইখানি অতি উৎকৃষ্ট বেনারসী শাড়ি পরিধান করিল ও উভয়ের যে-সকল অলংকার ছিল, তাহা দ্বারা উভয়েই আপনাপন অঙ্গ শোভিত করিল। আমি একখানি সাদা কাপড় পরিয়া তাহাদিগের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হইলাম। রাত্রিযাপন করিবার কালীন কন্যাদ্বয়ের যদি বস্ত্র পরিধান করিবার প্রয়োজন হয়, এই ভাবিয়া দুইখানি বেশি বস্ত্র আমার সহিত গ্রহণ করিলাম। দুইখানি গাড়িতে করিয়া তাঁহারা চারিজন আগমন করিয়াছিলেন, ওই গাড়ি দুইখানিই আমাদিগের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। গৌরব প্রথমেই বাড়ি হইতে বহির্গত হইয়া ওই গাড়ির একখানিতে গিয়া উপবেশন করিল। সে গাড়িতে বসিবামাত্রই যে তিন ব্যক্তি কেবলমাত্র সেই দিন আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও গিয়া সেই গাড়িতে উঠিলেন। প্রথম ব্যক্তি শৈরব ও আমাকে লইয়া অপর গাড়িতে উঠিলেন ও আমাদিগকে কহিলেন, 'উঁহারা যখন তোমার অপর কন্যার গাড়িতে উঠিয়াছেন, তখন আর তাহাকে এই গাড়িতে আনা ভালো দেখায় না।' আমাদিগকে এই বলিয়া তিনি দুই গাড়ির গাড়োয়ানকেই ডাকিয়া কহিয়া দিলেন, 'তোমরা কেহ অগ্র-পশ্চাৎ গমন করিও না, দুইখানি গাড়িই একত্রে লইয়া যাইও।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আর কোনওরূপ প্রতিবাদ করিলাম না। গাড়ি দুইখানি চলিতে লাগিল। দেখিলাম দুইখানি গাড়িই অনেক দূর পর্যন্ত একত্র গমন করিল। তাহার পর আমাদিগের গাড়ির ঘোড়ার রাশ ছিঁড়িয়া গেল। ওই রাশ বাঁধিয়া লইতে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইল। সেই সময় অপর গাড়িখানি যে কোন দিকে চলিয়া গেল তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদিগের সহিত যে ব্যক্তি গমন করিতেছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন, 'উঁহারা যে বাগানে গমন করিলেন সেই বাগান আমি চিনি। সেইস্থানে তোমাদিগকে লইয়া আমি অনায়াসেই গমন করিতে পারিব। তাহার নিমিত্ত তোমাদিগের চিন্তা নাই।' তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম ও সেই গাড়ির ভিতর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। শহর পরিত্যাগপূর্বক অন্ধকারের মধ্য দিয়া সেই গাড়ি নিতান্ত আস্তে-আস্তে চলিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল তথাপি আমরা সেই বাগানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিলাম না। এইরূপে আরও দুই ঘণ্টা গমন করিবার পর, একস্থানে গিয়া আমাদিগের গাড়ি থামিল। সেইস্থানে তিনি অবতরণ করিলেন ও আমাদিগকেও নামিতে কহিলেন। আমরা গাড়ি হইতে অবতরণ করিবার পর গাড়োয়ান তাহার গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। তিনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও কহিলেন, 'একটু গমন করিলেই আমরা বাগানে গিয়া উপস্থিত হইব।' এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে অগ্রে-অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুদূর গমন করিবার পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কত ডাকিলাম; কিন্তু, আমাদিগের কথার কেহই উত্তর দিলেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া যে স্থানে গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম সেই স্থানে প্রত্যাগমন করিলাম। সেই স্থানের অবস্থা দেখিয়া অনুমান হইল উহার চতুর্দিকে বাগান ও জল। নিকটবর্তী কোনও স্থানে কোনওরূপ লোকজনের বসতি নাই। এই অবস্থায় ফিরিতে হইয়া আমাদিগের মনের গতিক সেই সময় যে কী হইয়াছিল তাহা আপনারাই অনুমান করিয়া দেখুন। আমার নিকট যে আর দুইখানি বস্ত্র ছিল, তাহার একখানি আমার কন্যাকে পরিধান করিতে দিলাম; কারণ, সেই সময় পরিধানে ভালো কাপড় ও অলংকার দেখিতে পাইলে দুষ্ট লোকে নানারূপ বিপদ ঘটাইতে পারে। আমার কন্যা বস্ত্র পরিবর্তন করিলে তাহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলংকারগুলি খুলিয়া পরে কাপড়খানিতে বাঁধিয়া লইলাম। সেই স্থানের রাস্তাঘাট চিনি না, কোন দিকে যাইব জানি না, কোনও কথা

জিজ্ঞাসা করিবার লোক নাই, গাড়ি প্রভৃতি ভাড়া পাইবারও উপায় নাই; সুতরাং, অনন্যোপায় হইয়া একদিকে চলিতে লাগিলাম। এইরূপে চলিতে চলিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। সেই সময় দেখিতে পাইলাম আমরা একটি পাড়াগাঁয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সেই গ্রামের একটি ভদ্রলোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার নিকট আমাদিগের দুঃখের কথা কহি। তিনি আমাদিগকে এক স্থানে বসাইয়া অনেকরূপ চেষ্টা করিয়া একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া দেন। ওই গাড়িতেই আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের অবস্থা তো এইরূপ হইয়াছে; কিন্তু, ইহার পূর্বে আমার বড় কন্যার কী অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে না পারিয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, এরূপ সর্বনাশ ঘটিবে তাহা কিন্তু একবারের নিমিত্তও ভাবিয়াছিলাম না।'

নৃত্যর কথা শুনিয়া সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। চারিজন একত্রে মিলিত হইয়া এই কার্য করিয়াছে। তিনজন এই হত্যাকার্যে লিপ্ত ছিল। অপর একজন, যাহাতে ইহাদিগের দুইজনকে গৌরবের নিকট হইতে পৃথক রাখিতে পারা যায় সেই কার্য করিয়াছিল। কারণ, তিনটি স্ত্রীলোক একত্র থাকিলে এ কার্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না।

অনুসন্ধানের রাস্তা বাহির হইল। ক্রমে রামাদালালের অনুসন্ধান করিলাম ও সোনাগাছিতেই তাহাকে পাইলাম যাহার সহিত সে প্রথমে নৃত্যর বাড়িতে আসিয়াছিল, তাহাকে সে চিনিত; সুতরাং, তাহার সাহায্যে সেই আসামী ধৃত হইল, এই ব্যক্তি নৃত্য ও গৌরবকে জঙ্গলের ভিতর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। অনেক পীড়াপীড়ির পর সে সমস্ত কথা স্বীকার করিল, ও তাহার সঙ্গী অপর তিনজনেরও ঠিকানা বলিয়া দিল। বলা বাহুল্য, তাহারাও ধৃত হইল। অপহৃত অলংকারের মধ্য হইতে অনেক অলংকার তাহাদিগের নিকট হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

গাড়োয়ান দুইজনকে পাওয়া যায়। তাহারা ও শম্ভু এই মকদ্দমার সাক্ষী হইয়াছিল। বিচারে চারিজন আসামীর বিপক্ষে এই মকদ্দমা প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান বিচারালয় হইতে সকলেই আজীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ঝোপে ঝোপে নেকড়ে

দীনেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম প্রসঙ্গ ঃ পীত ইস্তাহার
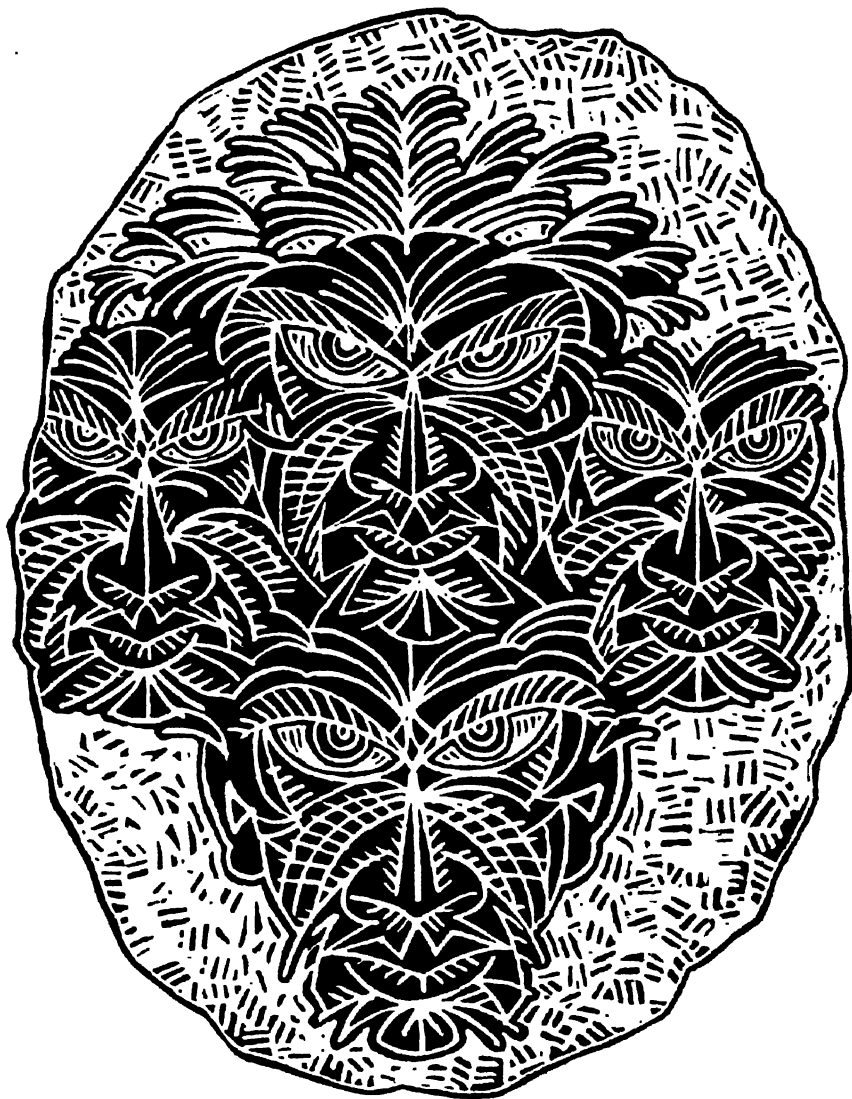
বিক্সটনের কারাগারের একটি কক্ষে দুইজন লোক মুখোমুখি উপবিষ্ট। হাজতের আসামীরা বাহিরের লোকের সঙ্গে এই কক্ষেই সাক্ষাৎ করে; সুতরাং এই কক্ষটিকে কয়েদীদের বৈঠকখানা বলা যাইতে পারে।

একজন কারারক্ষী সেই কক্ষের দ্বারে পাহারায় ছিল; কক্ষমধ্যে যে-দুইজনের আলাপ চলিতেছিল—তাঁহাদের একজন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর কুট্‌স, দ্বিতীয় ব্যক্তি হাজতের আসামী সেপটিমস কস।

ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর কুট্‌স, চেয়ারে ঠেস দিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টেবিলের অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট আসামীর মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—দেখ বাপু কস, সাইনস বা যাহাই তোমার নাম হউক, যদি তোমার ঘটে একবিন্দু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তুমি সকল কথাই প্রকাশ করিতে। যতই চালাকি আর ধাপ্পাবাজি করো, শেষে আইনের জয় সুনিশ্চিত। তোমার এক ভাই আত্মহত্যা করিয়াছে, আর-একজন ব্যাঙ্ক-লুণ্ঠনে সাহায্য করিতে গিয়া ধরা পড়ায় কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; আবার তোমরা দুই ভাই গ্রেপ্তার হইয়াছ। তোমাদের পরিবারের অবশিষ্ট যে-কয়েকজন কারাগারের বাহিরে আছে, তাহাদিগকেও আমরা, শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক, জেলে পুরিয়া নিশ্চিন্ত হইব, ইহাও বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ।

আসামী কোনও কথা বলিল না; সে টেবিলের উপর দুই হাত রাখিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিতে লাগিলেন,—তোমার পিতা পল সাইনসের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে; প্রতিহিংসার জন্য সে খেপিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে সাহায্য করিতে গিয়া তোমার নিজের, তোমার ভ্রাতৃগণের স্বাধীনতা কীজন্য নষ্ট করিতেছ? হ্যাঁ, তোমার পিতা সত্যই খেপিয়া উঠিয়াছে; এজন্য পুলিশ তাহাকে তাহার কুকর্মের জন্য দায়ী করিতে অনিচ্ছুক। পল সাইনসের মাথায় খুন চড়িয়াছে। তাহার প্রতি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে; অর্থাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারের পরিবর্তে ব্রডমুরের বাতুলাশ্রমে প্রেরণ করিতে হইবে। সেখানে তাহার পরিচর্যা চলিবে। কিন্তু পুলিশের এই সদুদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়, আমরা তোমার পিতার সন্ধান পাইতেছি না। তোমার পিতা এখন কোথায় লুকাইয়া আছে তাহা আমাকে বলিবে কি? আমার নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করিলে বিচারে তোমার দণ্ডের লাঘব হইবে—ইহা আমি অঙ্গীকার করিতে পারি।

প্রফেসর সেপটিমস কস পল সাইনসের পুত্রগণের অন্যতম। মিঃ ব্লেক তাহাকে কীভাবে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিদিত; সেই ঘটনার বিবরণ 'শকটে শয়তানীতে' প্রকাশিত হইয়াছে। সেপটিমস কস মুখ তুলিয়া অচঞ্চল দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমি অপরাধী কি না, বিচারক তাহা বিচার করিবে; তুমি পুলিশের গোয়েন্দা, আমার দণ্ডের লাঘব হইবে—কোন অধিকারে তুমি এরূপ অঙ্গীকার করিবে? বিচারক তোমার মুখ চাহিয়া আসামীর অপরাধের বিচার করিবে? তোমার অন্যায় অনুরোধও রক্ষা করিবে? কিন্তু তুমি আমাকে কোনও অঙ্গীকারেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে কোনও কথা বলিব না। পল সাইনস আমার পিতা—ইহাও আমি স্বীকার করি নাই; ইহা রবার্ট ব্লেকের অনুমান মাত্র, কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। তুমি আমাকে এখানে বসাইয়া রাখিয়া যে-সকল কথা বলিতেছ তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। নিজের সময় নষ্ট করিতেছ—আমাকেও বিরক্ত করিতেছ। যদি পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার ইচ্ছা থাকে, গোয়েন্দা তুমি—তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করো; আমাকে লোভ দেখাইয়া তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা নির্বোধ ইতরের কাজ। আমি তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি—পল সাইনস আজ লন্ডনেই থাকিবে। হ্যাঁ, সে তোমাদিগকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া লন্ডনের পথে-পথেই আজ ঘুরিয়া বেড়াইবে। সাধ্য হয়, তাহাকে গ্রেপ্তার করো। তুমি যাহাকে তাহার খ্যাপামি বলিতেছ—তাহারই সাহায্যে সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সকল পাকামাথার সম্মিলিত শক্তি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। সে পুনঃ-পুনঃ পুলিশকে অপদস্থ

ও পরাজিত করিয়াছে, এ-কথা তুমি স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ, ইন্সপেক্টর কুট্‌স! কিন্তু এই কাপুরুষসুলভ লজ্জা অপেক্ষা অধিক নির্লজ্জতা কোনও ভদ্রলোকের নিকট আশা করা যায় না!

এই সুতীব্র তিরস্কারে ইন্সপেক্টর কুট্‌সেরও বোধহয় লজ্জা হইল; তিনি মুখ লাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু লজ্জা অপেক্ষা রাগই তাঁহার অধিক হইল; তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! বেশ, দেখা যাইবে—কে জয়ী হয়। যুদ্ধের কি এখনই শেষ হইয়াছে? তোমার নিকট কোনও কথা বাহির করিতে পারিলাম না, কিন্তু তোমার যে-ভাই ম্যালকম বার্টনের ছদ্মনামে একটা বীমা কোম্পানিকে ফেরার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে যুক্তিতর্কের খাতির রাখিবে। তাহার স্ত্রী-পরিবার আছে কি না? তাহাদের মুখের দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে তো?

সেপটিমস কস পুনর্বার মৃদু হাসিয়া বলল,—তাহার ষোলো বৎসরের অভিজ্ঞতা বৃথা হইবে না। যদি তুমি ম্যালকমকে আমার ভাই বলিয়াই মনে করো তাহা হইলে আমার নিকট যাহা জানিতে পারিলে, তাহার নিকট তাহার অধিক কিছুই জানিতে পারিবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ওষ্ঠ দংশন করিয়া মানসিক উষ্মা প্রকাশ করিলেন। সেপটিমস কসের কথা সত্য—তাহা তিনি তৎপূর্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন; তিনি প্রথমে ম্যালকম বার্টনকেই জেরা করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার পিতার বিরুদ্ধে একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির করিতে পারেন নাই। পিতার প্রতি ইহাদের ভক্তি ও নির্ভর অসাধারণ। পিতার আদেশে পুত্রগণ বিনা প্রতিবাদে নির্বিকার চিত্তে প্রাণ বিসর্জন করিতেছে—একদিন ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডেরই মানব-চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল; কিন্তু পুত্রগণের উপর পল সাইনসের প্রভাব এইরূপই অসাধারণ ছিল।

দ্বারপ্রান্তে যে কারারক্ষী উপবিষ্ট ছিল—ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে বলিলেন,—আসামীকে উহার কুঠুরিতে লইয়া যাও।

কস উঠিয়া তাহার হাজত-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল; সে সেই কক্ষের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিল,—আমার অন্য তিন ভ্রাতার সহিত যদি কখনও তোমার সাক্ষাৎ হয়—তাহা হইলে আমার কথা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিও। তাহাদিগকে এ-কথাও বলিও যে, নেকড়েরা দলবদ্ধ হইয়া শিকার করিবার সময় যেরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠে; কোনও-কোনও মানুষ-নেকড়ে একাকীই তাহার শত্রুদলের পক্ষে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর বিপজ্জনক।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স এ-কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কোনও কথা বলিলেন না। তিনি কারাগারের বিভিন্ন কক্ষের দ্বার অতিক্রম করিয়া অবশেষে কারাধ্যক্ষ কাপ্তেন উইচারের খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। কারাধ্যক্ষ সেই কক্ষে বসিয়া প্রধান ওয়ার্ডারের সহিত কী পরামর্শ করিতেছিলেন। তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিয়াই বলিলেন,—মিঃ কুট্‌স, আপনি চলিয়া যাইবার পূর্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন, এইরূপই আশা করিয়াছিলাম। দুইখানি পত্র আমার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। একখানি সেপটিমস কসের এবং অন্যখানি ম্যালকম বার্টনের নামে আসিয়াছে। উভয় পত্রেরই মর্ম অভিন্ন। পত্র দুইখানি পাঠ করিয়া আপত্তিজনক মনে হওয়ায় আমি তাহা আসামীদের নিকট পাঠাই নাই। —তিনি টেবিলের দেরাজ হইতে পত্র দুইখানি বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে দিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পত্র দুইখানি পরীক্ষা করিয়া উভয় পত্রের মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত দেখিলেন; হস্তাক্ষর দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহা পল সাইনসেরই হস্তাক্ষর! পল সাইনসের হস্তাক্ষর তাঁহার সুপরিচিত।

প্রথম পত্রখানিতে লেখা ছিল ঃ

প্রিয় সেপটিমস, কারাগারে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে আপাতত যে অসুবিধা সহ্য করিতে হইতেছে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। তুমি বিচারাধীন কয়েদী, এজন্য তোমার সংবাদ-পত্র পাঠের অধিকার আছে। আগামী কল্য কাগজ খুলিয়া এরূপ কোনও বিষয় দেখিতে পাইবে, যাহা পাঠ করিয়া তুমি খুশি হইবে।

আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে কারামুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতেছি; এজন্য কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। —পল সাইনস।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স উত্তেজনাভরে নাক ঝাড়িলেন। পল সাইনসের এই স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা তাঁহার অসহ্য মনে হইল। তিনি মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিলেন,—ক্যাপ্তেন উইচার, এই পত্রের মর্ম কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি?

কারাধ্যক্ষ বলিলেন,—কাল সকালে দৈনিকের 'ব্যক্তিগত স্তম্ভে' সম্ভবত এরূপ কোনও সংবাদ প্রকাশিত হইবে, যাহার সাঙ্কেতিক অর্থ উহাদের দুইজনেরই সুবিদিত; কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। এইজন্য আমি কাল উহাদিগকে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনসের উদ্দেশ্য অত্যন্ত গর্হিত বলিয়াই মনে হয়। আমার বিশ্বাস, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে আবার কোনও নতুন চাল আরম্ভ করিবে; তাহা হইলে আমাদের সকলেরই সঙ্কট অপরিহার্য। তাহার মনের ভাব বুঝিবার উপায় নাই!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মন অজ্ঞাত ভয়ে পূর্ণ হইল; তিনি মন স্থির করিতে না পারিয়া কারাগারের বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি কারাগারের ফটকের বাহিরে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করিলেন এবং ব্রিক্সটন হিল অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি চঞ্চল চিত্তে গোঁফ চুলকাইতে-চুলকাইতে অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সাইনস আবার কী শয়তানি চাল চালিবার মতলব করিয়াছে, তাহা জানিতেই হইবে। সে শীঘ্রই আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিবে। এবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে।

বস্তুত ইন্সপেক্টর কুট্‌সের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ছিল। আটদিন পূর্বে পল সাইনস লন্ডন নগরে যে-ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন তখনও পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই; তখনও লন্ডনের বিভিন্ন রাজপথের দুই ধারে অনেক প্রকাণ্ড অট্টালিকার কাচের দ্বার-জানালাগুলির ভাঙা কাচ মেরামত হয় নাই; অনেক জানালা তখনও কাচহীন। কাঠের ও লোহার ফ্রেমগুলি যেন মুখব্যাদান করিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। তখনও রাশি-রাশি ভাঙা কাচ পথের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ছিল।

পল সাইনস লন্ডনের লক্ষ-লক্ষ পাউন্ড ক্ষতি করিলে মিঃ ব্লেক পুলিশের সাহায্যে সাইনসকে তাহার গুপ্ত আড্ডায় গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইবার পূর্বেই সে পলায়ন করিয়াছিল। তাহার পুত্র ধরা পড়িয়াছিল এবং তাহার আড্ডায় কাচধ্বংসকারী যন্ত্রটিও তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রফেসার সেপটিমস কসের আবিষ্কৃত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি বিধ্বস্ত করিয়া মিঃ ব্লেক লন্ডনবাসীদের আতঙ্ক দূর করিয়াছিলেন। কিন্তু পল সাইনসের সাত পুত্রের মধ্যে তখনও কয়েকজন জীবিত ছিল; পল সাইনস তখনও ধরা পড়ে নাই। সে লন্ডনের কোনও স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, লন্ডনে নূতন অরাজকতা বিস্তারের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। শক্তিশালী অসংখ্য দস্যু নানাভাবে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্থানে-স্থানে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার ইঙ্গিতে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য প্রস্তুত ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়াও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইয়াছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভেরা পল সাইনসকে লন্ডনের চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল।

পল সাইনস শীঘ্রই পুনর্বার সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিবে—এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না; কিন্তু এবার সে কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে? তাহার শত্রুগণের নামের তালিকায় সর্বপ্রথমে এবার কাহার নাম আছে? এই প্রশ্নই সকলের মন আলোড়িত করিতেছিল। যাহারা ষোলো বৎসর পূর্বে পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বিনা অপরাধে তাহার কারাদণ্ডের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও পর্যন্ত সাইনসের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাদের সকলেই আতঙ্কে অভিভূত হইয়া মনে-মনে বলিতে লাগিল,—এইবার আমার পালা, সেই শয়তান এবার আমাকেই চূর্ণ করিবে। হায়, তাহার কবল হইতে আর আমার পরিত্রাণ নাই!

যাহারা ষোলো বৎসর পূর্বে দায়রার মামলায় সাইনসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল—পুলিশ তাহাদের সকলেরই নাম জানিত। পুলিশ তাহাদিগকে অভয়-দানও করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা প্রথম হইতেই দেখিয়া আসিতেছিল পল সাইনস তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ভীষণ ষড়যন্ত্র-জাল প্রসারিত করিয়াছিল, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাদের একজনকেও রক্ষা করিতে পারে নাই। সাইনসের কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত, বিড়ম্বিত বা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এ-অবস্থায় পুলিশের আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সাইনসকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের অসাধ্য, এ-ধারণা সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

পল সাইনস তাহার গুপ্ত আড্ডা হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা জানিতে পারে নাই। তাহার গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক সহস্র পাউন্ড পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু এ-পর্যন্ত কেহই সেই পুরস্কারের দাবি করে নাই। পল সাইনসের অনুচরবর্গের অনেকেই এই ঘোষণার কথা জানিত; তাহাদের কেহ-না-কেহ সাইনসকে ধরাইয়া দিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের কেহই পুরস্কারের লোভে তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে সাহসী হয় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সিতে চলিতে-চলিতে সম্মুখে মুখ বাড়াইয়া ট্যাক্সিচালককে কী বলিলেন। ট্যাক্সি তখন রিজেন্ট স্ট্রিটের ভিতর দিয়া যাইতেছিল। পথের দুই ধারের দোকানগুলির ভাঙা জানালা তখনও সম্পূর্ণরূপে মেরামত হয় নাই; সেই অবস্থাতেই দোকানগুলিতে ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছিল। দোকান ও অন্যান্য অট্টালিকার অবস্থা দেখিলে মনে হইত—কেহ বোমা নিক্ষেপ করিয়া সেই সকল দোকানের দ্বার-জানালা ভাঙিয়া দিয়াছে।

ট্যাক্সি আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অক্সফোর্ড সার্কাসের নিকট হঠাৎ থামিয়া গেল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, সম্মুখে বহুসংখ্যক ট্যাক্সি, লরি, বাস পথ বন্ধ করিয়া দণ্ডায়মান, আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইবার উপায় নাই! সেখানে এইভাবে পথরোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স গাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একপাশের একখানি ভাঙা দোকানের সম্মুখে বিস্তর লোককে জটলা করিতে দেখিলেন, তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া গাড়িগুলি কোনও দিকে যাইতে পারিতেছিল না। ইন্সপেক্টর কুট্‌স কয়েক মিনিট পরে সেই দোকানের দেওয়ালে আঁটা হলদে কাগজে লাল কালিতে ছাপা মোটা-মোটা অক্ষরে একছত্র মাত্র লেখা দেখিলেন; সেই হলদে কাগজখানিতে লেখা ছিল—

তুমি কি পল সাইনস?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই প্ল্যাকার্ডখানি দেখিয়া নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সমাগত পথিকগণের ন্যায় তিনিও বিস্ফারিত নেত্রে পুনঃ-পুনঃ সেই প্ল্যাকার্ডে দৃষ্টিপাত করিয়া সেই একই লেখা দেখিলেন—তুমি কি পল সাইনস?

ট্যাক্সি ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, প্ল্যাকার্ডখানিও অদৃশ্য হইল; কিন্তু সেই প্ল্যাকার্ডের অদ্ভুত লেখাগুলি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া রহিল; তিনি মনে-মনে বলিলেন, —এ কী ব্যাপার? ইহা কি কোনও বিজ্ঞাপনদাতার চাতুরী? সে কি পাগল? এরূপ অদ্ভুত বিজ্ঞাপন তো পূর্বে কোনওদিন আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই! দুর্দান্ত দস্যু পল সাইনসের কথা যাহাতে জনসাধারণ শীঘ্র ভুলিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে —তুমি কি পল সাইনস? ইহার কি কোনও অর্থ আছে?

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের গাড়ি ঘুরিতে-ঘুরিতে অবশেষে বেকার স্ট্রিটে প্রবেশ করিয়া মিঃ রবার্ট ব্লেকের বহির্দ্বারের সম্মুখে থামিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের বন্ধু। তিনি যখন-তখন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; এজন্য তাঁহাকে অনুমতির প্রতীক্ষা করিতে হইত না। তিনি দ্বারে

ধাক্কা দিলে মিসেস বার্ডেল দ্বার খুলিয়া দিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিসেস বার্ডেলকে দেখিয়া অভিবাদনের ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়িলেন, তাহার পর কাঠের সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেন। মিঃ ব্লেকের উপবেশন-কক্ষ হইতে বেহালার একটি সুমিষ্ট গৎ ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কর্ণগোচর হইল। কুট্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে অগ্নিকুণ্ডের অদূরে বেহালা-হস্তে উপবিষ্ট দেখিলেন। মিঃ ব্লেকের পরিধানে ফিকে লাল ড্রেসিং-গাউন, পায়ে চটি, তিনি বেহালাখানি চিবুকের নিচে ধরিয়া উৎসাহ ভরে তাহাতে ছড় বুলাইতেছিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাঁহাকে সেইভাবে বেহালা বাজাইতে দেখিয়া দ্বারপ্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি পূর্বে কোনও দিন বেহালার এরূপ সুমিষ্ট ধ্বনি শ্রবণ করেন নাই। দীর্ঘকাল পুলিশের চাকরি করিয়া তাঁহার হৃদয় কঠিন হইয়াছিল, তথাপি বেহালার সেই সুমধুর করুণ স্বর-লহরী তাঁহার হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিল। মিঃ ব্লেকের হস্তে বেহালা যেন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর লাভ করিয়াছিল এবং তাহাতে হাসি, অশ্রু, আনন্দ ও বিষাদ পরিস্ফুট হইয়া যেন কোমল স্বরতরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেক বেহালাখানি টেবিলে রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—কুট্‌স, তোমার মতো কাজের লোক এতক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া বেহালা শুনিতেছিল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে নিষ্কর্মা দেখিয়া বোধহয় মনে-মনে চটিতেছিলে। একটা চুরুট ইচ্ছা করিবে কি?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটি অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছ; ইহাতেই দম বন্ধ হইবার জোগাড়! আবার চুরুট ইচ্ছা করিব?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—দোষ কী? তুমিও খানিক ধোঁয়া ছাড়ো। যদি জলপথে ভ্রমণের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে বোতল গ্লাস কোথায় থাকে তাহা তো তুমি জানো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে 'জলপথে' চলিবার জন্য কখনও দুইবার অনুরোধ করিবার প্রয়োজন হইত না; তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হুইস্কির ও সোডার বোতল লইয়া আসিলেন, তাহার পর আধগ্লাস হুইস্কি গলায় ঢালিয়া সশব্দে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন,—ব্রিক্সটনের জেলখানা হইতে আসিতেছি। পল সাইনসের যে-দুই অকালকুষ্মাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিয়াছি,—তাহাদের নাম মনে আছে তো? সেখানে কস ও বার্টনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলাম; কিন্তু কোনও ফল হইল না। তাহাদের বাপের সম্বন্ধে কোনও কথা তাহাদের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলাম না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহাদের নিকট কিছু জানিতে পারিবে—ইহা আমি বিশ্বাস করি নাই। এতদিনেও উহাদের গোষ্ঠীকে চিনিতে পারো নাই, ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় কুট্‌স! যদি উহারা সকলে সুপথে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে দেশের কত উপকার করিতে পারিত! কিন্তু উহাদের প্রতিভা দেশের সর্বনাশেই নিয়োজিত হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনস সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে। সে শীঘ্রই পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিবে। সে তাহার দুই পুত্রকে জেলখানায় যে-পত্র লিখিয়াছে,—তাহা কারাধ্যক্ষের নিকট দেখিয়া আসিলাম। সে লিখিয়াছে,—আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদিগকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিবে; এজন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। তাহার উদ্দেশ্য কী? সে কী কৌশলে কস ও বার্টনকে স্বাধীনতা দান করিবে, তাহা কি বুঝিতে পারিয়াছ?

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন,—সাইনস কস ও বার্টনকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে চাহিয়াছে? সর্বনাশ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিরক্তি ভরে বলিলেন,—তাহারা মুক্তিলাভ না করিতেই সর্বনাশ! ব্লেক, তুমি দিন-দিন ভয়ঙ্কর কাপুরুষ হইতেছ। সাইনসকে তোমার এত ভয়? আমি তাহাকে একবিন্দুও ভয় করি না। —কুট্‌স সদম্ভে গোঁফে তা দিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তুমি ভয়ঙ্কর সাহসী তাহা কি জানি না? কিন্তু তোমার সাহস, বল ও কৌশলে কোনও ফল হইবে না। কুট্‌স! পল সাইনস যাহা লিখিয়াছে, তাহা করিবেই। তাহার কথার কখনও খেলাপ হয় না, তাহা বোধহয় অস্বীকার করিবে না। হ্যাঁ, সে কৃতকার্য হইতে না

পারিলেও আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কস ও বার্টনকে ব্রিক্সটনের কারাগার হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে—এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। সে যে অবিলম্বে পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিবে—তাহার প্রমাণ আমিও পাইয়াছি। সে আমাকেও পত্র লিখিয়াছে।

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পত্রেরও মাথায় নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল; তদ্ভিন্ন হস্তাক্ষর দেখিয়াই ইন্সপেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন—পত্রখানি সাইনসেরই স্বহস্ত-লিখিত পত্র।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স রুদ্ধনিশ্বাসে পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা ছিল—

রবার্ট ব্লেক, আমি লন্ডন নগরের সমস্ত কাচের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইবার পূর্বেই তুমি তাহাতে বাধা দিয়াছ এবং আমার দুই পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছ। তোমার এই ধৃষ্টতায় আমার সহিষ্ণুতা বিলুপ্ত হইয়াছে; আর তুমি আমার দয়ার আশা করিতে পারো না। আমি বহুদিন পূর্বেই তোমার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা স্বাক্ষরিত করিতাম; কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা কীভাবে পূর্ণ করি, তাহা দেখিবার জন্য তোমার জীবিত থাকা প্রয়োজন বুঝিয়া এখনও তোমার প্রাণদণ্ডের বিধান করি নাই। তুমি আরও কিছুদিন জীবিত থাকিয়া আমার শক্তির পরিচয় গ্রহণ করো—ইহাই আমার ইচ্ছা। তুমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অকর্মণ্য কুকুরগুলাকে জানাইতে পারো, তাহারা আমাকে ধরিবার চেষ্টা না করিয়া, যেভাবে সাধারণের অন্ন ধ্বংস করিতেছে তাহাই করিতে থাকুক, তাহা হইলে তাহাদের সম্ভ্রম বজায় থাকিতেও পারে। আমি একমাত্র তোমাকেই আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী-বোধে সম্মান করি; কিন্তু তোমার ধৃষ্টতা আমার অসহ্য হইয়াছে। আর বারো-ঘণ্টার মধ্যে তুমি এবং ইংলন্ডের জনসাধারণ জানিতে পারিবে, পল সাইনস তাহার সঙ্কল্পের ব্যর্থতা ও অপমান সহ্য করিবার পাত্র নহে। আমি এই সময়ের মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এবং ব্রিটিশ বিচারপ্রণালীকে সমগ্র সভ্যজগতের নিকট উপহাসাস্পদ করিব। যাহারা আমার জন্য কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহাদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয় নাই, ইহাও অচিরে প্রতিপন্ন হইবে। নেকড়ে তাহার শাবকগণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্যে এখনও বঞ্চিত হয় নাই।

পত্রখানি পাঠ করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর হুইস্কির বোতলের দিকে হাত বাড়াইলেন। বোধহয় পত্রখানি পাঠ করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ অবসাদ বোধ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয়বার বারুণী-সেবনে মন কিঞ্চিৎ চাঙ্গা করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স গোঁফ ফুলাইয়া বলিলেন,—পাগল, নেকড়েটা একদম খেপিয়া গিয়াছে! জেলখানা হইতে বাহির হইয়া প্রথমে তাহার মস্তিষ্ক বোধহয় বিকৃত হয় নাই; কিন্তু এখন আর সে-কথা বলা চলে না। স্কট স্যান্ডার্সের হত্যার অভিযোগে অবিচারে তাহার কারাদণ্ড হইলে তাহার অন্যায় নির্যাতনে সকলেই তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু সে যাহাদিগকে তাহার দণ্ডের জন্য দায়ী মনে করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেককে অপদস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য যেরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে, তাহা জনসাধারণের মহাউৎকণ্ঠা ও বিভীষিকার কারণ হইয়াছে। এখন তাহাকে খ্যাপা কুকুরের মতো হত্যা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সাইনস আবার কী শয়তানী চাল চালিবে বুঝিতে পারিয়াছ কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা বুঝিতে পারিলে আমরা তাহার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিতে পারিতাম। তাহার পত্র পাঠ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী বুঝিবার উপায় নাই। সে কী কৌশল অবলম্বন করিবে তাহা অনুমান করা অসাধ্য।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কে একজন ফন্দিবাজ ব্যবসাদার সাইনসের নাম ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ে দাঁও মারিবার চেষ্টা করিতেছে! রাশি-রাশি প্ল্যাকার্ড ছাপিয়া তাহাতে লিখিয়াছে, 'তুমি কি পল সাইনস?' —এ যে কীরকম ব্যবসাদারী ফন্দি তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিতেছি না!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, অবিশ্বাস ভরে বলিলেন,—তুমি কী বলিলে? তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

কুট্‌স বলিলেন,—তোমার এখানে আসিতে-আসিতে অক্সফোর্ড সার্কাসের কাছে একখানা প্ল্যাকার্ড দেখিলাম; দুশো লোক পথে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া সেই প্ল্যাকার্ডের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহাতে মোটা-মোটা হরফে লেখা আছে—'তুমি কি পল সাইনস?'

স্মিথ বলিল,—হ্যাঁ, এ-নূতন রকম বিজ্ঞাপন বটে! বোধহয় আগামী সপ্তাহে ওই স্থানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে—যদি তুমি পল সাইনস না হও, তাহা হইলে আমাদের 'সিংহ-বিক্রম সালসা' খাও—তাহার ন্যায় বিক্রমশালী হইবে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—বিজ্ঞাপনে আর কোনও কথা দেখিলে না? কোন জিনিসের বিজ্ঞাপন তাহা বুঝিতে পারো নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—না, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কে পল সাইনস তাহাই যাচাই করিবার বিজ্ঞাপন। অদ্ভুত বটে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—বিজ্ঞাপনের নিচে বিজ্ঞাপনদাতার নাম থাকা তো উচিত। প্ল্যাকার্ডখানি দেখিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি পোশাকটা বদলাইয়া আসি, তোমার সঙ্গে অক্সফোর্ড সার্কাসে গিয়া এই অপরূপ বিজ্ঞাপন দেখিয়া আসিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বেশ, চলো। আমার বিশ্বাস, পল সাইনস আজকাল কীরকম খ্যাতিলাভ করিয়াছে—তাহা সকলেই সুবিদিত; এইজন্য কোনও ব্যবসায়ী বোধহয় মনে করিয়াছে—বিজ্ঞাপনে তাহার নাম ব্যবহার করিলে সহজেই সে তাহার ব্যবসায়ে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—সাইনস যে-পত্র লিখিয়াছে, উহা পাঠ করিয়া মনে হয়, আর বারো-ঘণ্টার মধ্যেই জনসাধারণ উহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা শুনিতে পাইবে। সাইনসের ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী লক্ষ্য করিবার আশা করা, আর আগ্নেয়গিরির ধারে দাঁড়াইয়া তাহার অগ্ন্যুদগমের প্রতীক্ষা করা অনেকটা একইরকম আতঙ্কজনক! তোমাদের চীফ কমিশনর এ-সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমাদের বড়সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা তোমার না শোনাই ভালো মনে হয়। আমি তোমাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, যদি সাইনস শীঘ্র ধরা না পড়ে তাহা হইলে মান বাঁচাইবার জন্য আমাদের অনেককেই ইস্তফানামা দাখিল করিতে হইবে। লন্ডনের অধিকাংশ বাড়ির দ্বার-জানালা চূর্ণ হইবার পর আমাদের চাকরি বজায় রাখা দায় হইয়া উঠিয়াছে! শুনিতেছি, শীঘ্রই হোম-অফিস হইতে তদন্ত আরম্ভ হইবে। সেই তদন্তের ফল আমাদের কাহারও পক্ষে কল্যাণজনক হইবে বলিয়া তো মনে হয় না।

স্মিথ বলিল,—কিন্তু হোম-অফিস পুলিশের ঘাড়ে দোষ চাপাইলে কাজটা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কাচ-ভাঙা ব্যাপারের তদন্তে যতখানি সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহাই কি যথেষ্ট নহে? সাইনস যেভাবে বাধা পাইয়াছে এবং পুলিশের তাড়া খাইয়া যন্ত্রপাতি ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে—তাহাতে আশা হয় সে আর কখনও ওইরূপ অপকর্মে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহসী হইবে না।

মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স যে-গাড়িতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতীক্ষায় রাখিয়া তাহার ভাড়া বহন করিবেন, কোনওদিন তাঁহার সেইরূপ অপব্যয়ের অভ্যাস ছিল না। তিনি তাহা পূর্বেই বিদায়

করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাদের তিনজনকেই পদব্রজে চলিতে হইল। তাঁহারা অক্সফোর্ড সার্কাস অভিমুখে অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে তত্দূর যাইতে হইল না। তাঁহারা প্রায় তিনশত গজ অগ্রসর হইয়া বহুসংখ্যক পথিককে পথের উপর দলবদ্ধ দেখিতে পাইলেন, তাহারা অদূরবর্তী গৃহপ্রাচীর-সংলগ্ন একখানি প্ল্যাকার্ড পাঠ করিতেছিল। সেই প্ল্যাকার্ডখানির বর্ণও পীত এবং তাহার আকার বৃহৎ। সেই প্ল্যাকার্ডে লালবর্ণ বৃহৎ অক্ষরে লেখা ছিল,—

'তুমি কি পল সাইনস?'

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নির্নিমেষ নেত্রে সেই প্ল্যাকার্ডখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। কী কারণে বলা যায় না, তাঁহার মন সন্দেহে ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল। সেই পীতবর্ণ প্ল্যাকার্ড তাঁহার মনশ্চক্ষে বিভীষিকার সঞ্চার করিল। পল সাইনস সেইদিনই তাঁহাকে জানাইয়াছিল, সে পুনর্বার কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবে। যেদিন সে তাহার পুত্রদ্বয়কে কারাগার হইতে উদ্ধারের সঙ্কল্প করিয়াছিল, ঠিক সেইদিনই পীত প্ল্যাকার্ডে তাহার নাম প্রকাশিত হইল; এই উভয় বিষয়ের মধ্যে কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পল সাইনসই লন্ডনের জনসাধারণকে আতঙ্কাভিভূত করিবার জন্য এই প্ল্যাকার্ড বাহির করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি জনতা ঠেলিয়া সেই দেওয়ালের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাচীর-সন্নিবিষ্ট প্ল্যাকার্ডখানি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার সঙ্গীদের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—বিজ্ঞাপন-প্রচারক বিলিংস কোম্পানি এই প্ল্যাকার্ড প্রচার করিতেছে। কুট্‌স, এই প্ল্যাকার্ড সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্ধান লওয়ার প্রয়োজন, তাহার ব্যবস্থা অবিলম্বেই করিতে হইবে। এই সকল প্ল্যাকার্ড দেখিবার জন্য যেরূপ জনসমাবেশ হইতেছে তাহা আপত্তিজনক বলিয়াই মনে হয়; শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিতেছি।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—যদি আমাকে এই—কী বলিব, বিজ্ঞাপন না ইঙ্গিতের প্রচার বন্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে আমাকে এই বিজ্ঞাপনের অর্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। আমি তো ইহার কোনও অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না! তুমি আমার সঙ্গে চলো, আগেই বিলিংস কোম্পানির কৈফিয়ৎ লওয়া প্রয়োজন।

তাঁহারা রিজেন্ট স্ট্রিটে উপস্থিত হইবার পূর্বেই পথের ধারে বিভিন্ন স্থানে ওইরূপ প্ল্যাকার্ড আরও কয়েকখানি দেখিতে পাইলেন, সেখানেও বিস্তর লোক দাঁড়াইয়া সেইসকল প্ল্যাকার্ড দেখিতেছিল। বিপুল জনসমাগমে সেইসকল স্থানে শকটাদির গমনাগমন বন্ধ হইয়াছিল।

স্মিথ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল,—কর্তা, ওদিকে ও কী ব্যাপার তাহা দেখিয়াছেন কি? বোধহয় কোনও নূতন কাগজ প্রকাশিত হইবে, তাহারই রাশি-রাশি অনুষ্ঠান-পত্র বিতরিত হইতেছে!

মিঃ ব্লেক স্মিথের অঙ্গুলি-নির্দেশে পথের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ছয়-সাতজন লোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অদ্ভুত বেশে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে! তাহাদের বুকে পিঠে সুদীর্ঘ তক্তার আবরণ; সেই তক্তায় মোটা-মোটা অক্ষরে লেখা ছিল ঃ

'তুমি কি পল সাইনস?'
২০০০ পাউন্ড পুরস্কার!
বিশেষ বিজ্ঞাপন দেখিতে চাহেন?
"হই-হই-রই-রই কাণ্ডে" দেখুন!
প্রথম সংখ্যা বিক্রয় হইতেছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিজ্ঞাপন-শোভিত তক্তার দিকে চাহিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—আরে বাপের বাড়ি গেল যা! এ আবার কী ব্যাপার? একি ফ্লিট স্ট্রিটের নূতন কোনও হুজুগে কাগজের বিজ্ঞাপন? কাগজের নাম 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ড'! এ নামের কোনও কাগজ আছে, তাহা তো পূর্বে জানিতাম না! হুই-হুই-রই-রই কাণ্ড! হ্যাঁ, নামটা জমকালো বটে; অনেক হুজুগে চাষাভুষো নগদ দুই পেনি ফেলিবে আর উহা কিনিবে। তাহার উপর দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কার! কচুপোড়া খাও! পুরস্কার কেন রে বাপু? —ইন্সপেক্টর কুট্‌স সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ঘরপোড়া গরুর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—পুরস্কার কেন, তাহা যদি জানিতে চাও তাহা হইলে দুই পেনি ফেলিয়া একখানি কাগজ কিনিয়া লও। দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কারের লোভ না দেখাইলে ও-কাগজ কি কেহ কিনিত? একটাকার জিনিস বিক্রয় করিতে তিনটাকার ফাউ উপহার দেওয়া হয়, তাহা কি জানো না? স্মিথ, ওই কাগজের দোকান হইতে একখানা 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ড' কিনিয়া আনো।

স্মিথ দোকানের সম্মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—আর এক কপিও নাই কর্তা! গরম গরম ফুলুরির মতো সব উঠিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, স্মিথ আরও কয়েকখানি দোকানে ঘুরিয়া অবশেষে হলদে মলাটের একখানি পত্রিকা কিনিয়া আনিল; সে তাড়াতাড়ি কাগজখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া পাঠ করিল এবং মিঃ ব্লেককে বলিল,—কাগজ বিক্রয়ের জন্য ইহারা চমৎকার ফন্দি বাহির করিয়াছে কর্তা! ইহারা কুড়িজন লোককে পল সাইনসের মতো চেহারায় সজ্জিত করিয়া আজ বেলা বারোটা হইতে একটা পর্যন্ত পথে বাহির করিবে, তাহাদের প্রত্যেকের পকেটে একশত পাউন্ডপূর্ণ এক-একটি থলি থাকিবে। সেই টাকাগুলি তাহারা পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যেই পকেটে রাখিবে। আপনি এই কাগজ একখানি কিনিয়া লইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং তাহা একজনের হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কি পল সাইনস?' যদি আপনি তাহাকে সাইনস বলিয়া সন্দেহ করেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পাঁচ পাউন্ডের একখানি খাসা আনকোরা নোট বাহির করিয়া দিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—কাগজের ব্যবসাটা জমকাইয়া তুলিবার জন্য এ আবার কীরকম ফিকির রে বাবা! উহারা ফৌজদারির আসামী পল সাইনসকে লইয়া টানাটানি করিতেছে কেন? কাজটা বেআইনি, ইহা কি উহারা বুঝিতে পারিতেছে না? এ রকম চালবাজি সরকার হইতে অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু ওই যে কাগজ—'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ড'—উহার সম্পাদক তোমার সঙ্গে একমত হইবে কি না সন্দেহ, কুট্‌স! সে এই সংখ্যাতে আত্ম-সমর্থনের জন্য যাহা লিখিয়াছে, তাহা অযৌক্তিক নহে। সে বলিতেছে—এই কার্যে পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে এবং সাইনসের চেহারার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। তাহারা এই কার্যে পুলিশকে সাহায্যই করিবে এবং নকলের পরিবর্তে আসল সাইনস একদিন ধরা পড়িতেও পারে। ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে খুঁজিতে-খুঁজিতে কোনও ঝোপে আসল নেকড়ে দেখিতে পাওয়াই সম্ভব। আর যদি সে ধরা পড়িবার ভয়ে বাহিরে না আসে, তাহা হইলে তাহার অত্যাচারের আশঙ্কাও হ্রাস হইবে। কেহই তাহার কথা ভুলিয়া থাকিবে না এবং যে-ব্যক্তি তাহার চেহারার সর্বাপেক্ষা অনুরূপ চেহারার লোককে প্রশ্ন করিবে, সে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার পাইবে; এজন্য তাহার ঠিক চেহারার দিকেই সকলের লক্ষ্য থাকিবে। যে-কুড়িজন সাইনস সাজিবে তাহাদের সকলেরই ছদ্মবেশ নিখুঁত হইবে—ইহা অবশ্যই আশা করা যায় না।

মিঃ ব্লেক নতমস্তকে কয়েক মিনিট কাগজখানি দেখিয়া পুনর্বার বলিলেন,—এই দেখো, ইহারা পল সাইনসের একখানি ফটোও প্রকাশ করিয়াছে;—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে পল সাইনসের যে-ফটো লওয়া হইয়াছিল—ইহা সেই ফটোর অবিকল প্রতিকৃতি। এই ফটোতে অসাধারণত্ব নাই, এরূপ চেহারার দুই-একডজন লোককে প্রতিদিন পথ দিয়া যাতায়াত করিতে দেখা যায়।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কিন্তু পল সাইনস একজনের অধিক নাই; যদি হাজার লোক

তাহার ছদ্মবেশে পথে বাহির হয়, তাহা হইলেও আমি আসল লোকটিকে তাহাদের ভিতর হইতে চিনিয়া বাহির করিতে পারিব। কাগজওয়ালা যে-ফন্দি খাটাইয়াছে তাহা নিতান্ত মন্দ বলিয়া মনে হইতেছে না! পল সাইনস যাহাতে ধরা পড়িতে পারে, এ-বিষয়ে পুলিশ ইহা দ্বারা কতকটা সাহায্য পাইবে না কি?

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—কিন্তু একটু আগে তুমি অন্য সুর বাহির করিয়াছিলে। আসল সাইনস ইহাদের এই ব্যবস্থায় উপকৃত হইবে বলিয়া কি তোমার মনে হয় না? পুলিশের কাজ আরও কঠিন হইবে না, এ-কথা কি জোর করিয়া বলিতে পারো?

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—তোমার কথার মর্ম ঠিক বুঝিতে পারিলাম না!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমার কথার মর্ম এই যে, পল সাইনসের চেহারার এত লোক লন্ডনের পথে-পথে বিচরণ করিবে যে, আসল সাইনস সেই দলে মিশিয়া সরিয়া পড়িলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা অসাধ্য হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্স ভ্রূভঙ্গি করিয়া ওষ্ঠপ্রান্ত এভাবে কুঞ্চিত করিলেন যে, তাঁহার গোঁফ সজারুর মতো কন্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,—বটেই তো, ও-কথা আমার মনে হয় নাই, পুলিশ সারাদিনে কতগুলো সাইনসকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করিবে? তাহাদের কাজ বিস্তর বাড়িয়া যাইবে না?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, পুলিশ সারাদিন 'ঝোপে-ঝোপে নেকড়ে' দেখিবে এবং তাহাদিগকে পালে-পালে গ্রেপ্তার করিয়া শেষে এরূপ বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হইবে যে, আসল সাইনস তাহাদের পাশ দিয়া নিরাপদে প্রস্থান করিবে। তাহার প্রতি আর তাহাদের লক্ষ্য থাকিবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—তুমি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছ ব্লেক! এই অদ্ভুত হুজুগের সঙ্গে পল সাইনস বা তাহার কোনও অনুচরের সংস্রব থাকা কি সম্ভবপর বলিয়া তোমার মনে হয় না?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনস বা তাহার দলের লোকেরাই কোনও দুরভিসন্ধিতে এই নূতন হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে—এ কথা নিশ্চিন্ত রূপে বলা কঠিন; তবে এই নূতন কাগজের মালিককে সতর্কভাবে দুই-একটি প্রশ্ন করা অসঙ্গত হইবে না। পল সাইনসকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য এই যে কৌশলপূর্ণ অনুষ্ঠানের অবতারণা হইয়াছে, ইহা রহিত করা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলিয়াই আমার মনে হয় কুট্স! 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অনুষ্ঠাতারা তাহাদের কাগজের বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য যে-সকল লোককে সাইনসের ছদ্মবেশে সাজাইয়া পথে বাহির করিয়াছে, তাহাদের সকলকে ফিরাইয়া লইবার জন্য উহাদিগকে বাধ্য করাই উচিত। উহারা পুলিশের কর্তব্যপালনে বাধা দিতেছে—এই অভিযোগে উহাদের আরব্ধ কার্য বন্ধ করিতে পারো। ও আবার কী? কী হইল তোমার?

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ইন্সপেক্টর কুট্স হঠাৎ এভাবে লাফাইয়া উঠিলেন যেন কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিল! তাঁহার দুই চক্ষু যেন অক্ষি-কোটর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইল; তিনি উত্তেজিতভাবে মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন,—ব্লেক, দেখো-দেখো! ওই লোকটা দোকানের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া আছে—দেখিয়াছ? ওই লোকটাই আসল পল সাইনস; উহার ছদ্মবেশ যেন সোনার উপর গিলটি! আমি উহাকে ঠিক চিনিয়াছি।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ ঃ কুট্সের ভাগ্যে পাঁচ পাউন্ড

ইন্সপেক্টর কুট্স দোকানের সম্মুখস্থিত যে-লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন, মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সেই লোকটির মুখের দিকে চাহিলেন। দশ-বারো গজ দূরে একখানি জহরতের দোকান ছিল, একজন লোক সেই দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালাস্থিত জহরতগুলি পরীক্ষা

করিতেছিল, তাহার মাথায় রেশমীবস্ত্র-মণ্ডিত টুপি, হাতে গজদন্তের হাতলের ছাতা, উভয় হস্ত দস্তানায় আবৃত। তাহার মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল না; মুখ বিবর্ণ, বার্ধক্যভরে তাহার দেহ ঈষৎ কুব্জ।

তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। লোকটা যে পল সাইনস—ইহা তিনিও অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

স্মিথ বলিল,—কর্তা, উহার মুখ দেখিলেন কি? আপনার কী মনে হইল? আমারও বিশ্বাস—ওই লোকটাই আসল সাইনস; ও সাইনস ভিন্ন ছদ্মবেশী অন্য লোক নহে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, ওই লোকটাই পল সাইনস। যদি আমার কথা মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমার কান মলিয়া দিও ব্লেক। সেপটিমস কস আজ জেলখানায় আমাকে বলিয়াছিল, পল সাইনসকে আজ লন্ডনের পথে হাঁটিয়া বেড়াইতে দেখা যাইবে। তাহার এ-কথা মিথ্যা নহে। আমি এই মুহূর্তেই পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিব। তুমি এখানে দাঁড়াইয়া মজা দেখো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে পথ পার হইলেন, এবং পূর্বোক্ত লোকটি যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তাহার ঠিক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সেই লোকটির দৃষ্টি তখনও জহরতের দোকানের বাতায়নে সন্নিবদ্ধ। একখানি থালায় কয়েকটি স্বর্ণমণ্ডিত ও হীরক-রত্ন-খচিত ঘড়ি সজ্জিত ছিল; সে কৌতূহলভরে সেই ঘড়িগুলি দেখিতেছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গ্রেপ্তারের ভঙ্গিতে তাহার স্কন্ধে আচম্বিতে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন,—রকম কী হে পল সাইনস? বেশ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের এই সম্ভাষণে লোকটির ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; তাহার মুখে ভয় বা বিস্ময়ের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না। সে ধীরে-ধীরে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কঠোর গম্ভীর ক্রূর নেত্রের উপর ভাবসংস্পর্শহীন অচঞ্চল নীল চক্ষু-তারকা স্থাপিত করিয়া মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ থাকিল, তাহার পর তাঁহার হাতের পীতবর্ণ কাগজখানি লক্ষ্য করিয়া যেন ঈষৎ বিরক্তিভরে মাথা নাড়িল, এবং অস্ফুট স্বরে বলিল,—কথাগুলি যেভাবে আপনার বলা উচিত ছিল, আপনি তাহা সেভাবে বলেন নাই; আপনি কাগজখানি কিনিয়াছেন, কিন্তু কীভাবে প্রশ্ন করিতে হয়—তাহা কি লক্ষ্য করেন নাই? আপনার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—'তুমি কি পল সাইনস?' তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপনি বলিলেন,—'রকম কী হে পল সাইনস?' যাহা হউক, আপনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় নিয়মের যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন, আপনার এই ত্রুটি আমি উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি। এতদ্ভিন্ন আপনার আরও একটু ত্রুটি হইয়াছে। ওইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য যে-সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, আপনি সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই আপনার ভাগ্য-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছেন। বারোটা বাজিবার পূর্বে আপনার আসা উচিত হয় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন; লোকটি তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিল—বারোটা বাজিয়া দুই মিনিট অতীত হইয়াছে। সে ঘড়িটি পকেটে রাখিয়া বলিল,—হ্যাঁ, বারোটা বাজিয়া গিয়াছে; সুতরাং আপনি নির্দিষ্ট সময়েই আসিয়াছেন। আমি আমাদের কাগজের পক্ষ হইতে আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি—আপনি এত শীঘ্র আমাকে পল সাইনসের অবিকল ব্যক্তিরূপে চিনিতে পারিবেন ইহা আশা করি নাই। আপনার চেষ্টা সফল হইয়াছে, সুতরাং 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র প্রতিশ্রুত পুরস্কার আপনার প্রাপ্য।

লোকটি পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোট বাহির করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুঠার ভিতর গুঁজিয়া দিল। কুট্‌স হতবুদ্ধি হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই নোটখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রচুর পুরস্কার লাভের আশা ছিল; ধরা পড়িয়া পল সাইনসই তাঁহাকে পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার দিল? অদ্ভুত! অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স লোকটির দস্তানা-ঢাকা হাতের দিকে চাহিয়া মুহূর্তে নিজের ভ্রম বুঝিতে

পারিলেন। তিনি পল সাইনস বলিয়া যাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিলেন—তাহার বাঁ-হাতের দুটি আঙুল নাই দেখিলেন। তাহার বাম হস্তে তিনটিমাত্র অঙ্গুলি বর্তমান! এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পল সাইনস নহে। সে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক নবপ্রকাশিত পত্রিকার কোনও প্রতিনিধি, পল সাইনসের ছদ্মবেশধারী কোনও কর্মচারী। তাহাকে পল সাইনস বলিয়া সন্দেহ করা অত্যন্ত লজ্জাজনক ভ্রম—ইহা বুঝিতে পারিয়া ইন্সপেক্টর কুট্স কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন,—কী বিড়ম্বনা! আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমিই পল সাইনস!

লোকটি হাসিয়া বলিল,—তোফা! আমার ছদ্মবেশের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রশংসাপত্র পাইবার আশা করি নাই দারোগা সাহেব! নমস্কার! লোকটা তৎক্ষণাৎ একখানি চলন্ত বাসে লাফাইয়া উঠিয়া বাসের আরোহীগণের ভিতর বসিয়া পড়িল। বাসখানি তাহাকে লইয়া পিকাডেলী সার্কাস অভিমুখে ধাবিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্স হতভম্বভাবে পথের অন্য ধারে মিঃ ব্লেক ও স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অপদস্থ ভাব দেখিয়া স্মিথ হাসি চাপিতে না পারিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল। মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—আসামী পাকড়াইলে না কুট্স?

ইন্সপেক্টর কুট্স বিব্রতভাবে বলিলেন,—এমন ঝকমারিতেও মানুষ পড়ে! লোকটা ছদ্মবেশ-ধারণে পাকা ওস্তাদ! প্রথমে দেখিয়া আমি উহাকে পল সাইনস বলিয়াই ভ্রম করিয়াছিলাম, অবিকল সেই চেহারা।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, দূর হইতে দেখিয়া উহাকে পল সাইনস বলিয়া ভ্রম হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক; কিন্তু নিকটে গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ভ্রম বুঝিতে পারা যাইত; বিশেষত পল সাইনসের বাঁ-হাতের কোনও আঙুল কাটা ছিল না।

স্মিথ বলিল,—আপনার তো আক্ষেপের কারণ কিছুই নাই; আপনি ফাঁকি দিয়া পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার আদায় করিয়াছেন, অথচ যে-কাগজ দেখাইয়া নোটখানি পাইলেন, সেই কাগজখানা পর্যন্ত আপনাকে কিনিতে হয় নাই! কাগজখানা লইয়া এবার আমি ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এবার আমার পালা।

ইন্সপেক্টর কুট্স নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিলেন,—এ-টাকায় আমাদের তিনজনের একরাত্রির খানার জোগাড় হইবে; কিন্তু ব্লেক, তোমার কথাগুলা খুব সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। ওই রকম কুড়িজন লোক পল সাইনসের ছদ্মবেশে লন্ডনের পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইলে লন্ডনের পুলিশ-প্রহরীদের দলে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। এক সাইনসে রক্ষা নাই, এককুড়ি সাইনস লন্ডনের বিভিন্ন পথে ভ্রাম্যমান! বাপ! লন্ডনের শান্তি-শৃঙ্খলা কিছুই বজায় থাকিবে না। উহাদের মতলবের মধ্যে বিলক্ষণ বদমায়েশি আছে—এ-বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নাই। এই হই চই কাণ্ডের অফিসটা কোন দিকে?

স্মিথ কাগজখানি পূর্বেই হস্তগত করিয়াছিল, সে তাহা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল,—এই যে ঠিকানা আছে, নিউটন স্ট্রিট—স্ট্র্যান্ড।

ইন্সপেক্টর কুট্স একখানি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার পাশে বসিলেন। গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে স্মিথ বলিল,—এরকম হুজুগ অল্পদিনের মধ্যে আপনারা দেখিয়াছেন কি? পথ দিয়া যত লোক যাইতেছে—তাহাদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনের হাতে এক-একখানি 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড'! পল সাইনসের ফটোর সঙ্গে যাহাদের চেহারার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আছে—তাহাদিগকেই উহারা চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে—'তুমি কি পল সাইনস?' ওই দেখুন, একজন কনস্টেবল একজন পথিককে ধরিয়া টানাটানি করিতেছে; অথচ যে-কোনও অন্ধজনও বলিতে পারে—ও-লোকটা সাইনস নহে।

মিঃ ব্লেক গম্ভীরভাবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি জানিতেন, পল সাইনসের চাতুর্য-

জাল ভেদ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; তাহার ফন্দি-ফিকির সাধারণের দুর্বোধ্য। 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক পত্রিকার বিপুল প্রচারের জন্য যে-কৌশল অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহার মূলে কোনও দুরভিসন্ধি আছে—ইহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবে না বটে, কিন্তু পল সাইনস কোনও গুপ্ত দুরভিসন্ধির বশবর্তী হইয়াই নূতন কাগজ প্রচারের ছলে এই হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইলেই কাগজখানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। এইসকল কথা চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—পুলিশকে অপদস্থ ও বিব্রত করিয়া পল সাইনসের স্বাধীনভাবে ও অসঙ্কোচে গমনাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই কাগজখানির আবির্ভাব! পুলিশ ভ্রমক্রমে একদল লোককে পল সাইনস মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিবে; কিন্তু তাহার ফলে তাহাদিগকে অপদস্থ হইতে হইবে। তখন কাহাকেও দেখিয়া সাইনস বলিয়া ধারণা হইলেও পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাস্যাস্পদ হওয়া সঙ্গত মনে করিবে না। যাহা হউক, এই অদ্ভুত কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। কাজটা তেমন কঠিন হইবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—নিউটন স্ট্রিটের একটা পুরাতন অট্টালিকার তেতলায় তাহার অফিস। তাহার অফিসে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হইবে না। আমি ভাবিতেছি —সম্পাদকটি পল সাইনসের আর-এক পুত্র নয় তো?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা জানিতে বিলম্ব হইবে না; তবে পল সাইনসকে ততদূর নির্বোধ মনে করিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে।

তাঁহারা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। তেতলার একটি প্রশস্ত কক্ষে একটি যুবতী একটা টাইপ-রাইটারের সম্মুখে বসিয়া খটাখট শব্দে একখানি চিঠি টাইপ করিতেছিল। সেই কক্ষের এককোণে একটি বালক কতকগুলি লেফাফা সাঁটিতেছিল; এবং তাহার কিছু দূরে একটি দীর্ঘদেহ যুবক একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া, কানে পেন্সিল গুঁজিয়া প্রুফ দেখিতেছিল। টেবিলখানি নানাপ্রকার কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন। মিঃ ব্লেক তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—যুবকটি ইংরেজ নহে, মার্কিন মুলুকের আমদানি!

যুবকটি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া খনখনে আওয়াজে বলিল,—ওয়াল! অচেনা মহাশয়েরা কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমি—কি বলে—'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' নামক নতুন হুজুগে কাগজের—ওর নাম কি—সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী।

যুবক বলিল,—সম্পাদকের দর্শনপ্রার্থী? তাঁহার দর্শনলাভ দুর্ঘট নহে, যেহেতু 'অহং' সেই ব্যক্তি অর্থাৎ সম্পাদক এবং আমার নাম কেন্নী—মিলট-ই কেন্নী। শুনিলেন তো আমিই সম্পাদক; এখন বলুন, আমাকে দেখিতে আসিবার কারণ কী? তাহার পর আস্তে-আস্তে খসিয়া পড়ুন, কারণ আজ এখনও পর্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভটি—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সরোষে বলিলেন,—তোমার সম্পাদকীয় স্তম্ভ চুলোয় যাক। তুমি সম্পাদক; তোমাদের কাগজের মালিক কে?

যুবক বলিল,—স্বত্বাধিকারী কে, তাহাও জানিতে চান? আপনার কৌতূহল যে—ওর নাম কি—বেজায় রকম বেশি! তা আপনার এই কামনা পূর্ণ করিতেও আমার আপত্তি নাই; আমি মিলট-ই কেন্নী এই কাগজের সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী! একাধারে আমিই সব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমি একজন পুলিশ অফিসার। আমার এখানে আসিবার কারণ—।

কেন্নী কাগজ কাটিবার নিকেলের লম্বা ছুরিখানি তাড়াতাড়ি টেবিল হইতে তুলিয়া লইয়া, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—তবে কি আমার আর-একজন অনুচরও পুলিশের মুঠোর ভিতর পড়িয়াছে? পল সাইনসকে লইয়া আমরা যে-চালটি চালিয়াছি তাহাতে আমাদের কাগজ সত্যই চারিদিকে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' উপস্থিত রিয়াছে। এ বড়ই সু-সংবাদ! কিন্তু গত আধঘণ্টা হইতে

পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে-দিতে আমি যে লবেজান হইলাম দারোগা সাহেব! ফোন মুখে লইয়া কেবলই আমাকে জবাবদিহি করিতে হইতেছে। আমি বলিয়াছি—পল সাইনস আমাদের অফিসে চাকরিতে বহাল হয় নাই; কোনওদিন সে আমাদের চাকর ছিল না—সম্পাদকীয় বিভাগেও নয়, বিজ্ঞাপন বিভাগেও নয়। পুলিশ দেখিতেছে—তাহার মতো চেহারার লোককে সাইনস সন্দেহে ধরিলেই তাহার নিকট হইতে পাঁচ পাউন্ডের নোট বকশিস মিলিতেছে! কিন্তু সাইনসের সহিত তাহাদের চেহারার সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের একজনও পল সাইনস নহে। কাগজখানাকে দাঁড় করাইবার জন্য যে-ফিকির খাটাইয়াছি—তাহা সফল হইয়াছে দেখিতেছি; চারিদিকে সত্যই 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' আরম্ভ হইয়াছে বটে!

ইন্সপেক্টর কুট্স গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ, তা হইয়াছে বটে; কিন্তু আমি তোমাকে একটু সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি পল সাইনসকে লইয়া এই রকম 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' চালাইতে থাকো—তাহা হইলে তোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে। আমরা তোমাকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দিব; তোমরা পথে অবৈধ জনতা ঘটাইয়া শান্তিভঙ্গ ও দাঙ্গার সূচনা করিতেছ বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। তোমাদের কার্যে রাজপথে সাধারণের গমনাগমন বন্ধ হইতেছে। এজন্য আমরা বন্ধুভাবে তোমাকে সতর্ক করিতে আসিয়াছি। যদি তোমার ঘটে একবিন্দু বুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে আমার উপদেশে তুমি কর্ণপাত করিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্সের কথা শুনিয়া সম্পাদক-প্রবরের চক্ষুতে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পরিস্ফুট হইল। সে যে-কাগজ-কাটা ছুরিখানি হাতে লইয়া আন্দোলিত করিতে-করিতে ইন্সপেক্টর কুট্সের কথাগুলি শুনিতেছিল—সেই ছুরি সে ক্রোধ ভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল,—কী! কী বলিলে? তোমার উপদেশে আমাকে কর্ণপাত করিতে হইবে? আমি যে-বিজ্ঞাপনের সাহায্যে আমার কাগজখানিকে জাঁকাইয়া তুলিতেছি, সেরূপ চটকদার বিজ্ঞাপন এই ফ্লিট স্ট্রিটের কোনও সম্পাদকের মাথায় গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে স্থান পায় নাই; সেই বিজ্ঞাপন আমি তোমার তাড়ায় বন্ধ করিব? তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ দারোগা সাহেব? আমি তোমার হুমকিতে ভয় পাইব?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন-প্রচারের কৌশলটা খুব চটকদার বটে, লক্ষণ ফন্দিপূর্ণ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই ফন্দিটা কি তোমার মাথা হইতে বাহির হইয়াছে—না কেহ তোমাকে ইহা শিখাইয়া দিয়াছে?

সম্পাদক বলিল,—হ্যাঁ, আলবৎ আমার মাথায় গজাইয়াছে। বিজ্ঞাপনের কৌশলে কাগজগুলা কীভাবে বিক্রয় হইতেছে তাহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না? কাল সকালে আমি কুড়ি লাখ কাগজ বিক্রয়ের আশা করিতেছি। এরূপ অব্যর্থ ফন্দি আমি আর কাহারও নিকট হইতে ধার করিয়াছি—ইহাই কি তোমাদের বিশ্বাস?

ইন্সপেক্টর কুট্স কোনও কথা না বলিয়া নতমস্তকে মিঃ ব্লেকের পায়ের দিকে চাহিলেন। তিনি দেখিলেন—সম্পাদক-নিক্ষিপ্ত কাগজ-কাটা নিকেলের ছুরিখানা মিঃ ব্লেক মেঝের উপর হইতে তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া জুতার সুকতলার উপর রাখিলেন, তাহার পর জুতা পরিয়া ফিতা বাঁধিলেন।

মিঃ ব্লেক চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—এরূপ অব্যর্থ ফন্দি তুমি আর কাহারও নিকট লাভ করিয়াছ কি না তাহা তুমি তো নিজেই জানো; তবে যদি আমাদের বিশ্বাসের কথা শুনিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে—তাহা হইলে তাহাও তোমাকে বলিতে বাধা নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই ফন্দিটি তুমি চতুর-চূড়ামণি পল সাইনসের নিকট লাভ করিয়াছ।

মুহূর্তের জন্য সম্পাদকের চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ অবজ্ঞাভরে বলিল,—কে জানিত যে তোমরা এরকম নিরেট! সাইনস যাহাতে সহজে ধরা পড়ে—এই উদ্দেশ্যেই আমি পুলিশকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছি; আর তুমি আমাকেই তাহার দলের লোক ভাবিয়া সন্দেহ করিতেছ, আবার ভয়ও দেখাইতেছ! পুলিশের অপার মহিমা!

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন,—তুমি বাজে কথায় আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না। তুমি যে-প্রণালীতে কাজ করিতেছ—ইহাতে সাইনসের অপকার না হইয়া উপকার হইবে এবং পুলিশ যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিবে; সাইনসকে গ্রেপ্তার করা তাহাদের অসাধ্য হইয়া উঠিবে।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কেনীর হাতের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি যাহাদিগকে সাইনসের দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ করিতেন, তাহাদের প্রত্যেকের হাত দেখিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন—সাইনসের প্রত্যেক পুত্রের বামহস্তে উল্কিদ্বারা নেকড়ের মস্তক অঙ্কিত আছে। বিশেষত, পল সাইনসের জীবিত বিশিষ্ট পুত্রেরা কোথায় কীভাবে বাস করিতেছিল—তাহা তিনি জানিতেন না।

মিঃ ব্লেক সম্পাদকের হাতে উল্কি-চিহ্নের সন্ধান পাইলেন না। সুতরাং সে পল সাইনসের পুত্র নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের কথাগুলি শুনিয়া নীরব রহিল দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিচলিতস্বরে বলিলেন,—হুম! আমার বন্ধুর কথা তোমার বোধহয় ভালো লাগিল না; বোবার শত্রু নাই ভাবিয়া মুখ বুজিয়া বসিয়া আছ! কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া যাইতেছি—যদি তুমি ওইরকম ইস্তাহার বন্ধ না করো—ওইভাবে পল সাইনসকে পলায়নে সাহায্য করো—তাহা হইলে আমরা আইনের সাহায্যে তোমার বুজরুকি বন্ধ করিয়া দিব। তোমাদের কোনও অনুচরকে পল সাইনস সাজাইয়া পথে আর বাহির করিতে পারিবে না।

সম্পাদক বলিল,—তোমার এই হুকুমই বলো, আর অনুরোধই বলো—আমি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিলাম; আমি আমার কাগজের প্রচার-বৃদ্ধির জন্য যে-উপায় অবলম্বন করিয়াছি তাহা বেআইনিও নয়, অসঙ্গতও নয়। আমার কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ বৈধ। তোমাদের কোনও-কোনও প্রধান সংবাদ-পত্র এই প্রণালীতে পসার জমকাইয়া আজ প্রচুর অর্থ ও মান-সম্ভ্রমের অধিকারী হইয়াছে। যদি এই ব্যাপার লইয়া কোনও বিভ্রাট ঘটে বা শান্তিভঙ্গ হয়, তাহা হইলে দারোগা আর মিঃ ব্লেক—তুমিও সেজন্য দায়ী হইবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমাকে কি তুমি চেনো?

সম্পাদক বলিল,—ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ রবার্ট ব্লেককে যে না চেনে—লন্ডনে সংবাদ-পত্রের সম্পাদকতা করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। হ্যাঁ, ইংলন্ডের সকল সম্পাদকই রবার্ট ব্লেককে চেনে। আমরা তোমার নিকট পল সাইনসের দুঃসাহস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাইবার আশা করিতে পারি কি? প্রবন্ধটিতে এক হাজারের অধিক শব্দ থাকিবে না। তাহার জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—তোমার কাগজে আমরা প্রবন্ধ লিখিব! তোমার স্পর্ধা তো অল্প নয়! আমরা এখন চলিলাম; কিন্তু স্মরণ রাখিও—এইভাবে তোমার কাগজের বিজ্ঞাপন-প্রচার বন্ধ না করিলে তোমার বিপদ অনিবার্য। আমি তোমার দলের প্রত্যেক লোককে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিব এবং তুমি যেভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছ—ওইভাবে বিজ্ঞাপন প্রচার বন্ধ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের আদেশ গ্রহণ করিব।

সম্পাদক বলিল,—তোমার যাহা সাধ্য করিও; আমাকে ওভাবে ভয় দেখাইয়া কোনও ফল হইবে না। চালবাজি ছাড়িয়া দিয়া দুই একখান কাগজ কিনিয়া একবার নিজেদের ভাগ্য-পরীক্ষা করিয়া দেখো—পাঁচ-পাঁচ পাউন্ড লাভ হইতেও পারে। আমরা দুই হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছি—তাহা বোধহয় বিজ্ঞাপনেই দেখিয়াছ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—হ্যাঁ, দেখিয়াছি; তোমাদের এই জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজি আমি আজই বন্ধ করিয়া দিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সবেগে সম্পাদকের অফিস পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিলেন এবং মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—বড়সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ না করিলে চলিতেছে না, ব্লেক! এই ইয়াঙ্কিটা সম্পাদক বলিয়া নিজের পরিচয় দিল। লোকটাকে তুমি চেনো কি?

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—না; তবে উহাকে পূর্বে কোথায় যেন দেখিয়াছি—এইরূপ

মনে হইতেছে। কিন্তু কবে কোথায় দেখিয়াছিলাম—তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না; সম্ভবত ফ্লিট স্ট্রিটেই দেখিয়া থাকিব।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—উহার কাগজ-কাটা ছুরিখান টেবিল ডিঙাইয়া মেঝের উপর পড়িবামাত্র তাহা জুতার ভিতর চালান করিলে! ইহার কারণ কী?

মিং ব্লেক বলিলেন,—অঙ্গুলি-চিহ্নের পরীক্ষা। কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; দাঁড়াও, ছুরিখানা বাহির করি। তিনি জুতা খুলিয়া ছুরিখানি জুতার ভিতর হইতে বাহির করিলেন এবং তাহা একখানি রুমালে মুড়িয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হাতে দিয়া বলিলেন,—এখানি তোমাদের অফিসে লইয়া যাও। কেনীর অঙ্গুলি-চিহ্ন তোমাদের অফিসের খাতায় আছে কি না মিলাইয়া দেখিও। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স রুমাল-মোড়া ছুরিখানি পকেটে ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতেই অদূরে একটি লোককে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই লোকটি ফ্লিট স্ট্রিট হইতে সেইদিকে আসিতেছিল। পল সাইনসের চেহারার সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না। ইন্সপেক্টর কুট্‌স কিছুকাল পূর্বে রিজেন্ট স্ট্রিটে যে-লোকটির নিকট পাঁচ পাউন্ডের নোট পাইয়াছিলেন, এ ঠিক সেই লোক বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; পরিচ্ছদও সেইরূপ। কিন্তু ইহার হাতে ছাতা বা আঙুল কাটা ছিল না।

স্মিথ লোকটিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল,—এ-লোকটা কি পল সাইনস, না তাহার ছদ্মবেশে অন্য কেহ?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুহূর্তকাল ইতস্তত করিয়া আগন্তুকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাহাকে বলিলেন,—তুমি কি পল সাইনস?

আগন্তুক বাতাসে মাথা ঠুকিয়া তাহার কোটের বোতাম খুলিয়া শার্টে আঁটা ধাতুনির্মিত একখানি পদক দেখাইল; তাহার উপর লেখা ছিল—'হই-হই-রই-রই কাণ্ড।' অনন্তর সে নিম্নস্বরে বলিল,—হ্যাঁ, তুমি পুরস্কার লাভের যোগ্য বটে, কিন্তু পুরস্কার লইতে হইলে আজকার 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' দেখাইতে হইবে, সেই কাগজখানি তোমার বাহির করা উচিত ছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হাতড়াইয়া কাগজ পাইলেন না, তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—কাগজখানি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছি।

তিনি কাগজখানি স্মিথের অনুরোধে তাহাকে দেখিতে দিয়াছিলেন। স্মিথ তাহা লইয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল; কিন্তু ট্যাক্সি হইতে নামিবার সময় তাহা সঙ্গে লইতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

আগন্তুক বলিল,—তোমার দুর্ভাগ্য! আজকার তারিখের কাগজ দেখাইতে না পারিলে তুমি পাঁচ পাউন্ড পুরস্কার পাইবে না। তোমার প্রশ্ন অসঙ্গত হয় নাই, কিন্তু কাগজের অভাবে পুরস্কারে বঞ্চিত হইলে; আশাকরি ভবিষ্যতে তোমার ভাগ্যে পুরস্কার মিলিবে।

লোকটা পাশ কাটাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স ক্ষুব্ধভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন।

স্মিথ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল,—বুদ্ধির দোষে পাঁচ পাউন্ড হাতছাড়া হইল!

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—কিন্তু আসল কি নকল তাহা ঠাহর হইল না।

তৃতীয় প্রসঙ্গ ঃ পিতার আদেশ

পল সাইনস নদীতীরবর্তী পথ ধরিয়া চেয়ারিংক্রশ অভিমুখে চলিতে লাগিল; সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল; সাফল্য-গর্বের হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের ন্যায় মহাশত্রুর শ্যেনদৃষ্টিকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে সে ছদ্মবেশ ধারণের সময় কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক চেহারার কিছু-কিছু পরিবর্তন করিয়াছিল। সে গালের ভিতর রবারের পুঁটুলি পুরিয়া দিয়াছিল এবং একপাটি বৃহদাকার কৃত্রিম দন্তও ব্যবহার করিয়াছিল। সে দক্ষিণ দিকের চোয়ালের উপর চর্বিদ্বারা একটি লাল আঁচুলি নির্মাণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে যে-সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা হঠাৎ দূর হইল না; সে আসল কি জাল সাইনস তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

সাইনস ট্রাফালগার স্কোয়ারে উপস্থিত হইবার পূর্বে দুইজন লোক পর-পর তাহার গতিরোধ করিল এবং কাগজ দেখাইয়া বলিল,—তুমি কি পল সাইনস? সে দুইবার সংবাদ-পত্রের নিয়োগ-চিহ্ন দেখাইয়া ও প্রত্যেককে পাঁচ পাউন্ডের নোট পুরস্কার দিয়া মুক্তিলাভ করিল। অবশেষে নীল পরিচ্ছদধারী একজন পুলিশম্যান তাহার সম্মুখে আসিয়া গতিরোধ করিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিল,—মহাশয়, আমার ধৃষ্টতা মাফ করিবেন, কিন্তু—।

পল সাইনস তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিল,—দেখো কনস্টেবল, আজ সকাল হইতে পর-পর ছয়বার আমাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু এই দেখো আমার চাকরির চিহ্ন। ইহা দেখাইয়া প্রত্যেকবার আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি। ব্যাপারটা এখন অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। এখন বেলা একটা বাজে, আমার কাছে আর-একখানি মাত্র পাঁচ পাউন্ডের নোট অবশিষ্ট আছে; তোমার কাছে যদি আজকার এক কপি 'হই-হই-রই-রই কাণ্ড' থাকে তাহা তুমি দেখাইতে পারিলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

কনস্টেবল তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত পুরিয়া হলদে মলাটের একখানি কাগজ বাহির করিল; পল সাইনস সেই কাগজখানি দেখিয়া, তাহার হাতে পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোট গুঁজিয়া দিল এবং হাসিয়া বলিল,—'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র সম্পাদকের সসম্মান উপহার গ্রহণ করো।

কনস্টেবলটা আনন্দে অভিভূত হইয়া হাঁ করিয়া সেই নোটখানি দেখিতে লাগিল; খবরের কাগজ দেখাইতেই পাঁচ পাউন্ড বকশিস মিলিল, ইহা কি অল্প ভাগ্যের কথা! পল সাইনস তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া দূরে প্রস্থান করিল।

পল সাইনস অদৃশ্য হইলে কনস্টেবলটা নোটখানি পকেটে ফেলিয়া বলিল,—কী সৌভাগ্য! দুই পেনির কাগজ দেখাইলেই যদি পাঁচ পাউন্ড পাওয়া যায়—তাহা হইলে আমি এই কাগজ কিনিবার জন্য প্রত্যহ দুই পেনি খরচ করিতে রাজি আছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, লোকটা আসল পল সাইনস নয়। সে আসল পল সাইনস হইলে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এরকম শত-শত পাঁচ পাউন্ডের নোট বকশিস পাইতাম!

পল সাইনস আরও কিছু দূরে গিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল এবং ধূমপান করিতে-করিতে মনে-মনে বলিল,—অতি চমৎকার কৌশল খাটাইয়াছি! বিপদের আশঙ্কা অল্প ছিল না; কিন্তু সে-ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছি। ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও গোয়েন্দা ব্লেক—দুজনেরই চোখে ধূলা দিয়াছি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একদল নির্বোধের আড্ডা। আমার মনে হয়, উহাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য এইভাবে চেষ্টা করা আমার সময়ের অপব্যয় মাত্র। আজ রাতটুকু কাটিবার পর রাজধানীর সমগ্র পুলিশবাহিনী সমস্ত পৃথিবীর নিকট হাস্যাস্পদ হইবে এবং পল সাইনসের নাম প্রত্যেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যাইবে।

মুহূর্তের জন্য পল সাইনসের চক্ষু ক্রোধে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইল; কিন্তু সে মানসিক উত্তেজনা দমন করিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তখন বেলা একটার পর পাঁচ মিনিট অতীত হইয়াছিল। সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। পল সাইনস জানিত—এক মুহূর্তের বিলম্বে তাহার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইতে পারে।

ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে চলিতে-চলিতে একখানি ট্যাক্সি পল সাইনসের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

শকটচালক পথের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইনস ভিন্ন অন্য কাহাকেও সেই পথে দেখিতে পাইল না; তখন সে গাড়ি হইতে মাথা বাড়াইয়া সাইনসের মুখের দিকে চাহিল। সাইনস পথের কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সেই গাড়ির দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

শকটচালক তৎক্ষণাৎ তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইল। পল সাইনস গাড়ির ভিতর বসিয়া নব বেশে সজ্জিত হইল; অবশেষে গাড়ি যখন বাকিংহাম প্রাসাদের দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিল—তখন পল সাইনসের কোট ও টুপি উভয়ই পরিবর্তিত হইল; তাহার মাথার পাকা চুলের উপর লম্বা পরচুলা কালো চুলের নিশান উড়াইতে লাগিল এবং তাহার নাকের ডগায় সোনা-বাঁধানো চশমার আবির্ভাব হইল। মুহূর্ত-পরে তাহার অধরের নিচে একদলা দাড়ি এরূপ ভঙ্গিতে আঁটিয়া বসিল যে, সাইনস তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি; তাহাকে পল সাইনস বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় রহিল না!

পল সাইনস এই নূতন ছদ্মবেশে ট্যাক্সিতে বসিয়া সংবাদ-পত্র পাঠ করিতে লাগিল; তাহাকে দেখিয়া ইংরেজ বলিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না। ট্যাক্সি তাহাকে লইয়া নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে একটি লৌহনির্মিত ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার সম্মুখেই কাচের ছাদবিশিষ্ট একটি প্রশস্ত অট্টালিকা। অট্টালিকার দ্বারে একখানি সাইন-বোর্ডে লেখা ছিল ঃ

সুইফট সিওর মোটরকার কোম্পানি
দিবারাত্রি মোটরগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়।

প্রকাণ্ড গ্যারেজ; গ্যারেজের ভিতর বহুসংখ্যক শকট সংস্থাপিত। পল সাইনস যে-গাড়িতে এই গ্যারেজে প্রবেশ করিল—সেই গাড়িখানি মাটির নিচে বিদ্যুতালোকিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে অনেকগুলি শকট শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ছিল। তাহাদের একপাশে একখানি ভাঙা গাড়ি; দুইজন মিস্ত্রি সেই গাড়িখানি নিবিষ্ট চিত্তে মেরামত করিতেছিল। তাহারা পল সাইনসের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিল না। পল সাইনস গাড়ি হইতে নামিয়া হল-ঘরের ভিতর দিয়া কিছু দূরে চলিয়া গেল। সেই কক্ষের দেওয়ালে একটি 'শো-কেস' সংস্থাপিত ছিল; তাহার সম্মুখভাগ কাচ-নির্মিত। সেই 'শো-কেসে' মোটর-গাড়ির টায়ার, টিউব, হর্ন, ল্যাম্প প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান পরিপাটিরূপে সজ্জিত ছিল।

পল সাইনস তাহার কাষ্ঠনির্মিত ফ্রেমের এক অংশ স্পর্শ করিয়া একটি ক্ষুদ্র বোতামে আঙুলের খোঁচা দিল; তৎক্ষণাৎ সেই 'শো-কেস' তাহার কেন্দ্রস্থিত দণ্ডের উপর আবর্তিত হইল। সঙ্গে-সঙ্গে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল। পল সাইনস সেই দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা রুদ্ধ করিল; তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখে একটি চৌকা হল-ঘর বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই হল-ঘরের চতুর্দিকে দ্বার; সেইসকল দ্বার দিয়া বাহিরে যাওয়া যাইত।

পল সাইনস সেই হল-ঘরে একটি ভৃত্যকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কোট ও টুপি খুলিয়া তাহার হাতে দিল, তাহার পর মাথা হইতে লম্বা কালো পরচুলা খুলিয়া ফেলিয়া একটি দ্বার দিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষটি উক্ত হল-ঘরের সম্মুখে অবস্থিত। গ্যারেজটি দেখিলে অসাধারণ বলিয়া মনে হইত না এবং তাহার নিচে এইসকল গুপ্ত কক্ষ ছিল তাহাও বুঝিবার উপায় ছিল না। সেখানে কয়েকটি 'ফায়ার-প্রুফ ট্যাঙ্ক' ছিল, তাহা পেট্রলে এবং মোটরে ব্যবহারোপযোগী তৈলে পূর্ণ ছিল। সেই কক্ষে যে-সকল ল্যাম্প ঝুলিতেছিল, তাহা হইতে আলোক-রশ্মি নিঃসৃত হইয়া চতুর্দিক উদ্ভাসিত করিতেছিল। লন্ডনের পার্ক লেনে কোনও কোটিপতির বাসভবন যেরূপ মূল্যবান আসবাবপত্রে সুসজ্জিত, পল সাইনসের এই বাস-কক্ষও সেইভাবে সুসজ্জিত। সেই কক্ষের প্রত্যেক দেওয়ালে মূল্যবান চিত্রসমূহ শোভা পাইতেছিল; এতদ্ভিন্ন বিজ্ঞান ও রসায়ন-সংক্রান্ত অনেক দুর্লভ গ্রন্থরাজিতে বিভিন্ন আলমারি পরিপূর্ণ ছিল; সম্মুখে বিদ্যুতালোকিত একটি সেলফের উপর ব্রোঞ্জ ধাতু-নির্মিত ন্যায়-দেবীর মূর্তি সংস্থাপিত; দেবীর চক্ষুদ্বয় বস্ত্রাবৃত, তাঁহার একহস্তে

তরবারি, অন্যহস্তে তুলাদণ্ড সংরক্ষিত; কিন্তু তরবারি ক্ষুরধারবৎ তীক্ষ্ণ, তুলাদণ্ডের উভয় 'পাল্লা' অসমান এবং চক্ষুর উপর বস্ত্র এরূপ আলগা করিয়া বাঁধা যে, তাহার ভাঁজের নিচ দিয়া দেবীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ অব্যাহত! বোধহয় বর্তমান কালের রাজকীয় বিচারপ্রথাকে উপহাস করিবার জন্যই এরূপ করা হইয়াছিল।

পল সাইনস একটি বৃহৎ ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিল। তাহার বাম হস্তের অদূরে এক শ্রেণীতে তিনটি গজদন্ত-নির্মিত বোতাম এভাবে সংরক্ষিত যে, অঙ্গুলির সামান্য চাপেই তাহা বসিয়া যায়। তাহার সম্মুখে তিনটি টেলিফোন পাশাপাশি সংরক্ষিত এবং একটি ফ্রেমের ভিতর একখানি 'ভলকানাইট' চক্র, দেখিলে মনে হয় তাহা বে-তারের লাউড স্পিকার অর্থাৎ উচ্চ-ধ্বনি-কারক যন্ত্র।

সাইনস একটি স্যুইচে অঙ্গুলির চাপ দিতেই ঊর্ধ্বস্থিত গ্যারেজ হইতে সকল প্রকার শব্দই তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বহু কণ্ঠের ধ্বনি, মোটরের ঘস ঘস শব্দ, পথে যে-সকল গাড়ি যাতায়াত করিতেছিল তাহাদের ইঞ্জিনের আওয়াজও—সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। অথচ যে-নিভৃত গুপ্ত স্থানে সে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল—সেখানে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাহার গুপ্ত সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্যই সুইফট সিওর মোটরকার কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই কোম্পানিতে যাহারা কর্মচারী ও কারিগর, মিস্ত্রি প্রভৃতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহারা সকলেই তাহার অনুচর, ছদ্মবেশী দস্যুর দল। কতকগুলি দ্রুতগামী শকট তাহার আদেশ-পালনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত, আর কতকগুলি তাহার আদেশে দিবারাত্রি লন্ডনের পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। সেইসকল শকটের সাহায্যে সে লন্ডনের সকল সংবাদ জানিতে পারিত, কারণ প্রত্যেক গাড়িতে এক-একটি মাইক্রোফোন যন্ত্র সুকৌশলে সংগুপ্ত ছিল; সেই যন্ত্রের সাহায্যে মোটরচালক মোটরের আরোহীগণের সকল গুপ্তকথাই শুনিতে পাইত। তাহারা প্রত্যহ নানা শ্রেণীর আরোহী সংগ্রহ করিত; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাহাদের ট্যাক্সিতে ভ্রমণ করিতে-করিতে যে-সকল গুপ্ত পরামর্শ করিতেন—তাহা অন্য কেহ শুনিতেছে—ইহা তাঁহারা মুহূর্তের জন্য ধারণা করিতে পারিতেন না; কিন্তু মাইক্রোফোনের সাহায্যে তাঁহাদের প্রত্যেক কথা ট্যাক্সিচালকের কর্ণগোচর হইত; সুতরাং পল সাইনসেরও তাহা অজ্ঞাত থাকিত না। একখানি গাড়ি বেকার স্ট্রিটের নিকট সর্বদা ভাড়া খাটিবার জন্য উপস্থিত থাকিত এবং সেই গাড়ির ড্রাইভার মিঃ ব্লেককে পাইলে অন্য কোনও আরোহী লইত না। অন্যান্য গাড়ির চালকেরা তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত—মিঃ ব্লেককে খুশি করিতে পারিলে তাঁহার নিকট প্রচুর বকশিস পাওয়া যায়; এ-কথা সত্য, কিন্তু সে ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পাইলেও অন্য আরোহী গ্রহণ করিত না—যদিও সে জানিত ইন্সপেক্টর কুট্‌স কখন কাহাকেও এক ফার্দিং পুরস্কার দিতেন না, বরং সময়ে-সময়ে তাঁহার নিকট ন্যায্য ভাড়া আদায় করাও কঠিন হইত।

পল সাইনসের আশ্রিত দস্যুদল এইসকল গাড়ি যখন ইচ্ছা ব্যবহার করিত, তাহারা ইঙ্গিত করিলেই শকটচালকেরা বিনা প্রতিবাদে এবং বিনা ভাড়ায় তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত, অথবা তাহাদের সদর আড্ডায় লইয়া যাইত। বস্তুত ভক্সহল ব্রিজ-রোডের অদূরবর্তী সেই গ্যারেজটি পল সাইনসের অর্থে ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইলেও কেহই তাহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না। পল সাইনস আধঘণ্টার মধ্যে অসংখ্য দস্যুকে তাহার নিকট আহ্বান করিয়া লন্ডনের সকল স্থানেই প্রেরণ করিতে পারিত এবং কোনও অপকার্যেই তাহারা কুণ্ঠিত হইত না।

পল সাইনস এই গুপ্ত গৃহে বসিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্রের ব্যবস্থা করিত এবং তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে অতি অল্প সময়েই তাহা কার্যে পরিণত করা সহজ হইত। সে যাহাদিগকে শত্রু মনে করিত, সুদীর্ঘ ষোলো বৎসর পূর্বে যাহাদিগের প্রতিকূলতায় তাহাকে বিনা অপরাধে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল—তাহাদিগকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে-সকল ষড়যন্ত্র করিত—তাহা সে এই স্থানে থাকিয়াই কার্যে পরিণত করিত; কেহই ইহা জানিতে পারিত না। সে এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই প্রস্তুত ছিল; এমনকী, তাহার পুত্রগণের জীবন

বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ইহার পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছে।

পল সাইনস অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ডেস্কের নিকট বসিয়াছিল; তাহার মুখ বিমর্ষ, ললাটে চিন্তার রেখা পরিস্ফুট। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ পর্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্য সে প্রচণ্ড আঘাত প্রয়োগে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু সে দুশ্চিন্তার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। সে বুঝিয়াছিল—সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সে যাহাই করুক, ভবিষ্যতে তাহাকে তাহার পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। সে পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিলেও তাহার শেষ পরাজয় ও পতন অপরিহার্য। অন্যায় চিরদিন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারে না, অধর্মের ক্ষয় অনিবার্য—ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা—তাহার শত্রুগণকে বিধ্বস্ত না করিয়া সে ধরা দিবে না, বা মৃত্যুকে বরণ করিবে না, দানবের মতো সে শেষপর্যন্ত যুদ্ধ করিবে।

পল সাইনস প্রায় একঘণ্টা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় সে বৈদ্যুতিক পাখার স্যুইচ টিপিয়া পাখা চালাইয়া দিল। পাখা তাহার মাথার উপর বন-বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

সহসা টেলিফোনের ঘণ্টা ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিলে, সে একটি রিসিভার তুলিয়া লইল। একজন টেলিফোনে বলিল,—কনোলী জাল গুটাইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সে পাঁচ নম্বর হইতে সংবাদ পাইয়াছে—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাহাকে ধরিতে আসিতেছে। সে কে, তাহা তাহারা জানিতে পারিয়াছে।

সাইনস বলিল,—কীরূপে জানিল?

উত্তর হইল,—রবার্ট ব্লেকের কৌশলে।

সাইনস হুঙ্কার দিয়া সক্রোধে বলিল,—আবার রবার্ট ব্লেক! এই লোকটাকে সাবাড় করিতে না পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাহার নিকট কোনও কথা গোপন করিবার উপায় নাই! আমাকে আমার ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী পরিবর্তিত করিতে হইবে। এই সঙ্কটজনক অবস্থায় রবার্ট ব্লেককে আমার কোনও কাজে হস্তক্ষেপণ করিতে দেওয়া হইবে না। আজ রাত্রেই তাহার অনধিকার চর্চা বন্ধ করিতে হইবে। তাহার মতো প্রতিভাসম্পন্ন ডিটেকটিভকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পদদলিত করিয়া চূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু উপায় কী? সে তাহার ধৃষ্টতার ফলভোগ করিতে বাধ্য, তাহার আর পরিত্রাণ নাই; সে বিলম্বে মরিত, কিন্তু নিজের দোষেই মৃত্যুকে সে এত শীঘ্র ডাকিয়া আনিল।

অতঃপর সাইনস তারের একটি ফাইল হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া লইল; সেই কাগজখানিতে কতকগুলি নাম ছিল, তন্মধ্যে কয়েকটি নাম লাল কালি দিয়া কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই তালিকার একটি নাম পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছিল; সাইনস একটি পেন্সিল লইয়া প্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের নামের পাশেও একটি চিহ্ন অঙ্কিত করিল। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই ব্যক্তিকেই সে কিঞ্চিৎ ভয় ও শ্রদ্ধা করিত।

পল সাইনস অস্ফুটস্বরে বলিল,—আজ রাত্রে আমার এক ঢিলে দুই পাখি মরিবে। রবার্ট ব্লেক ও বৃদ্ধ সোয়েন উভয়েই তাহাদের ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল পাইবে। ব্লেক কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিলে আমি সুখী হইতাম; সে আমার ক্ষমতার পরিচয় পাইত, আমার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইত; কিন্তু তাহা হইবার নহে, আজই তাহাকে মরিতে হইবে—ইহা সত্যই ক্ষোভের বিষয়।

পল সাইনস সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে তাহার ডেস্কের কাছে বসিয়া রহিল, টেলিফোনে অনেকের সঙ্গেই তাহার পরামর্শ চলিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে ও কথাবার্তা শুনিলে মনে হইত—সে সেই অফিসের অধ্যক্ষ এবং তাহার আদেশেই সকল কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

ক্রমশ সেই কক্ষে বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল; তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া অবনতমস্তকে তাহার উপদেশ অথবা আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাহার পর টেলিফোনে লন্ডনের পশ্চিম পল্লীতে, লাইম হাউসে, স্যাডওয়েল, ওয়াপিং এবং শহরতলীর বিভিন্ন অংশে যে-সকল সংবাদ প্রেরিত হইল তাহা বাহিরের যে-কোনও লোক শুনিতে পাইলে মনে করিত সেইসকল সংবাদ সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহাতে

কেহ কোনও অসাধু উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পল সাইনস সেই সাঙ্কেতিক ভাষায় তাহার দলভুক্ত বিভিন্ন স্থানবাসী দস্যুদের যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিল। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই তাহারা রাজবিধান ও শান্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার আদেশ পাইল।

রাত্রি নয়টার সময় পল সাইনস চেয়ার হইতে উঠিয়া অগ্নিকুণ্ড-সন্নিহিত কৌচে শয়ন করিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল। কিন্তু একঘণ্টার মধ্যেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাত্রি দশটার সময় একজন ভৃত্য তাহাকে এক পেয়ালা কফি ও কিছু খাবার আনিয়া দিল। কয়েক মিনিট পরে একটি খর্বকায় বিদেশি চেহারার লোক চর্মনির্মিত একটি এটাচিকেস লইয়া পল সাইনসের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে ডেস্কের উপর সেই ব্যাগটি রাখিয়া তাহার ভিতর হইতে কয়েকটি চর্বিনির্মিত রঙিন বাতি, তরল রঙের কয়েকটি কৌটা, পরচুলা, দাড়ি-গোঁফ, পাউডার, রবারের কয়েকখানি চাক্তি বাহির করিল।

· পল সাইনস জামা খুলিয়া আলোর ঠিক নিচেই একখানি চেয়ারে বসিল এবং আগন্তুককে বলিল,—মাসকোলো, আজ তোমার শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবে; তোমার দক্ষতার উপর আজ রাত্রে আমাদের কার্যের সাফল্য কী পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহা জানিতে পারিলে তুমি বিস্মিত হইবে।

সাইনসের কথা শুনিয়া আগন্তুক দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, সে মাথা নাড়িয়া সাইনসের উক্তির সমর্থন করিল; তাহার পর তাহার ব্যাগের ভিতর হইতে একখানি রঙিন ফটো বাহির করিল। এই ফটোখানি যাঁহার—তিনি ইংলন্ডের জনসমাজে সুপরিচিত ব্যক্তি; তাঁহার সেই দাড়ি-গোঁফ-সমলঙ্কৃত মুখ লন্ডনের অধিকাংশ লোকের, বিশেষত পুলিশ-কর্মচারী মাত্রেই সুপরিচিত। আগন্তুক সেই ফটো সম্মুখে রাখিয়া পল সাইনসকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিতে লাগিল। সাইনসের চেহারা ক্রমশ পরিবর্তিত হইয়া ফটোর চেহারা ধারণ করিল; সাইনস সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার লাভ করিল। ফটোর সহিত তাহার চেহারার বিন্দুমাত্র পার্থক্য রহিল না। বিবিধ বর্ণে, স্পিরিট-সংযুক্ত গঁদে, তুলির প্রত্যেক টানে এবং পূর্বোক্ত রবারের চাক্তিগুলির সাহায্যে আগন্তুক অসাধ্য সাধন করিল। অবশেষে সে তুলি ফেলিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সদম্ভে বলিল,—আমার যাহা সাধ্য, তাহার ত্রুটি করি নাই; আপনি আয়নায় আপনার মুখখানি দেখিলে আমার ক্ষমতার তারিফ করিবেন কর্তা!

পল সাইনস আয়না লইয়া ফটোর সহিত নিজের চেহারা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। উভয় চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইল; দিবসে উভয় চেহারা মিলাইয়া দেখিলে সামান্য কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা হয়তো কাহারও-কাহারও তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিত না, কিন্তু রাত্রিকালে তাহা ধরিবার উপায় ছিল না।

পল সাইনস মানসিক উল্লাস গোপন করিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিল,—হ্যাঁ, তোমার চেষ্টা যে সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে—এ-কথা বলিতে পারি না। এ-বেশ বোধহয় অচল হইবে না। তোমাকে যে-পুরস্কার দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তাহা তুমি অবশ্যই পাইবে। এখন তুমি যাইতে পারো মাসকোলো।

মাসকোলো তাহার জিনিসপত্রগুলি ব্যাগে পুরিয়া লইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। সাইনসও ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল এবং পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পোশাকে তাহার ডেস্কের নিকট ফিরিয়া আসিল।

এইবার সে লন্ডনের একখানি মানচিত্র খুলিয়া মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। সেই মানচিত্রের বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করিয়া কতকগুলি স্থানের উপর নীলবর্ণ এক-একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক বৃত্তে এক-একটি সংখ্যা লিখিয়া সেগুলি একটি রেখাদ্বারা সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

সাইনস অস্ফুট স্বরে বলিল,—ঠিক একই সময়ে সকল স্থানে কার্যারম্ভের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তি আমার আদেশ ঠিকভাবে পালন করিলে চেষ্টা বিফল হইবার আশঙ্কা নাই।

সাইনস সেই মানচিত্রখানি আরও কিছুকাল নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর ঘড়িতে এগারোটা বাজিল। মুহূর্তপরে নীলপরিচ্ছদধারী একজন সোফেয়ার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে সাইনসের নতুন রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল,—কর্তা, সমস্তই প্রস্তুত; এখন আপনার আদেশের প্রতীক্ষা।

সাইনস মানচিত্রখানি মুড়িয়া রাখিয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ ওভারকোটে সজ্জিত হইল, তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া গ্যারেজে প্রবেশ করিল। গ্যারেজের দীপালোক ম্লান; সাইনস সেই ম্লান দীপালোকে দেখিতে পাইল—কুড়িখানি মোটরকার গ্যারেজে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। প্রত্যেক কারের ড্রাইভার স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট। তাহারা সকলেই নিস্তব্ধ এবং সাইনসের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। সাইনস জানিত প্রত্যেক কারে দুইজন আরোহী উপবিষ্ট ছিল, তাহার ইঙ্গিত পাইলেই কারগুলি আরোহীসহ দ্রুতবেগে স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইবে; তাহার পর কারের আরোহীরা কী ভীষণ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তাহা সহজে কেহ ধারণা করিতে পারিবে না।

গ্যারেজের মধ্যস্থলে যে-কার দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সর্বপেক্ষা বৃহৎ এবং সুদৃশ্য। তাহার মাথায় উজ্জ্বল আলো দপ-দপ করিতেছিল এবং তাহার ইঞ্জিন হইতে 'ঘসর-ঘস' শব্দ উত্থিত হইতেছিল। তাহাতে যে-চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্ন লন্ডনের আর একখানি মাত্র কারে দেখা যাইত। তাহার ড্রাইভার স্যুইচ টিপিবামাত্র নম্বর-প্লেট উল্টাইয়া গেল এবং অন্য একটি নম্বর সেই স্থান অধিকার করিল। তাহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিকেরই নম্বর একসঙ্গে পরিবর্তিত হইল।

পল সাইনস কাহাকেও কোনও কথা না বলিয়া এই শেষোক্ত কারে প্রবেশ করিল। সোফেয়ার দ্বার রুদ্ধ করিল। অতঃপর সে তাহা চালাইতে আরম্ভ করিয়া নিঃশব্দে পথে উপস্থিত হইল।

সাইনস যে দুষ্কর কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, তাহা আরম্ভ হইল। সে গাড়িতে ঠেস দিয়া একটি চুরুট ধরাইয়া লইল। তাহার হাত সম্পূর্ণ অকম্পিত। তাহার পাশে চর্মনির্মিত একটি থলি ছিল—সেই থলির দিকে চাহিয়া তাহার মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটিয়া উঠিল। হঠাৎ অধিক ঝাঁকুনি লাগিলে সেই কার ও কারের আরোহীরা চূর্ণ হইয়া ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে, ইহা সে জানিত।

সাইনসের কার ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট অভিমুখে ধাবিত হইল। সোফেয়ার গাড়ির মোড় ঘুরাইবার পূর্বেই স্যুইচ টিপিল; তৎক্ষণাৎ গাড়ির নম্বরের প্লেটখানির নম্বরগুলি ঘুরিয়া গেল এবং নূতন নম্বর তাহাদের স্থান অধিকার করিল।

পথের মোড়ে একজন কনস্টেবল দাঁড়াইয়া ছিল। বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত কারের নম্বর-প্লেটের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং গাড়ি তাহার পাশ দিয়া চলিয়া যাইবামাত্র সে আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদন করিল। সেই দোদুল্যমান সাদা দাড়ির নিশান লন্ডনের কোনও পাহারাওয়ালার অপরিচিত নহে।

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির বিশাল গম্বুজ নৈশ আকাশে চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। বিগবেনের বিরাট ঘটিকা-যন্ত্র আকাশের কোলে পরিস্ফুট হইল এবং তাহার সুদীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কাঁটাদুটি আলোকোজ্জ্বল ডায়ালের উপর একটি সরলরেখার আকার ধারণ করিয়া জানাইয়া দিল—রাত্রি এগারোটা বাজিয়া কুড়ি মিনিট হইয়াছে।

সাইনসের শকট বাঁধের নিকট আসিলে তাহার গতি মন্দীভূত হইল; তাহার পর তাহা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির ভিতর দিয়া প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে আসিয়া থামিল।

একজন পুলিশম্যান রোঁদে বাহির হইয়া ক্যানন-রো অভিমুখে যাইতেছিল। গাড়িখানি সম্মুখে থামিতে দেখিয়া সে দাঁড়াইল এবং শকটের আরোহীর মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। সে জানিত রাত্রি এগারোটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ফটক বন্ধ হইয়া যায়। কেবল একজন মাত্র পাহারাওয়ালা পরদিন বেলা আটটা পর্যন্ত সেখানে পাহারায় থাকে; তাহার পর অফিসের কাজকর্ম যথানিয়মে আরম্ভ হয়।

পাহারাওয়ালা একবার আরোহীর মুখের দিকে, আর-একবার সেই গাড়ির নম্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল,—এ যে বড়সাহেবের গাড়ি! সাহেব এ-অসময়ে হঠাৎ অফিসে চলিলেন কেন? বোধহয় কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে!

পাহারাওয়ালা বড়সাহেবের চিরপরিচিত সাদা দাড়ির দিকে চাহিয়া সসম্মান অভিবাদন করিল; দাড়ি কিন্তু তাহার মুখের দিকে না চাহিয়া গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেও পাহারাওয়ালাটা দাঁড়াইয়া রহিল। বড়সাহেব কী উদ্দেশ্যে অসময়ে অফিসে আসিলেন তাহা জানিবার জন্য তাহার প্রবল কৌতূহল হইয়াছিল।

পাহারাওয়ালা চীফ কমিশনরের খাস-কামরায় হঠাৎ আলো জ্বলিতে দেখিয়া বুঝিল— বড়সাহেব খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়াছেন। সে ধীরে-ধীরে ক্যানন-রোর দিকে চলিয়া গেল।

পল সাইনস গাড়ি হইতে নামিবার সময় কনস্টেবলকে দেখিতে পাইয়াছিল। পাহারাওয়ালাকে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার বুকের ভিতর দুরু-দুরু করিয়া উঠিল; কিন্তু পাহারাওয়ালা তাহাকে অভিবাদন করায় তাহার আশঙ্কা দূর হইল। সে দ্বারের সম্মুখে গিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল।

অল্পক্ষণ পরে একজন দীর্ঘদেহ পুলিশ কর্মচারী দ্বার খুলিয়া সাইনসের সম্মুখে দাঁড়াইল। পল সাইনস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—শন্নি।

পুলিশ কর্মচারী বলিল,—পাঁচ নম্বর। সে তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলে সাইনস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল।

এই পুলিশ কর্মচারী যুবকটি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন, প্রকৃত নাম সার্ল সাইনস। সে পল সাইনসের করমর্দন করিয়া বলিল,—আপনার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে। আমার জানা না থাকিলে আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত হইতাম। কিন্তু আমরা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি। বাহিরে যে গাড়িখানি—।

পল সাইনস বলিল,—চীফ কমিশনরের গাড়ি বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে কেন—এ-কথা কি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিবে? সার-হেনরি ফেয়ারফক্সের গাড়ির সহিত আমার গাড়ির বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই; তাহার গাড়ি ও আমার গাড়ি দেখিয়াও কাহারও সন্দেহ হইবে না। আমার সোফেয়ার মাওসনকে জেরা করিয়া কেহ কোনও কথা জানিতে পারিবে না; কিন্তু এখন আমাদের আর এক মুহূর্তও বাজে কথায় নষ্ট করিবার উপায় নাই। আমাদের সঙ্কল্পানুযায়ী সকল কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করিতে হইবে। সময়ের মুহূর্তমাত্র ব্যতিক্রম হইলে আমার সমস্ত কাজ নষ্ট হইবে এবং তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে।

সার্ল সাইনস বিবর্ণ মুখে ও অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহার পিতাকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া সেই নিস্তব্ধ অট্টালিকায় উঠিতে লাগিল। সে দীর্ঘকাল দক্ষতার সহিত পুলিশের চাকরি করিয়াছে, কর্তব্যপালনে সে কখনও ত্রুটি করে নাই, কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই; কিন্তু আজ সে তাহার পিতার স্বার্থসিদ্ধির জন্য সকলই করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। পিতার আদেশ সে অলঙ্ঘনীয় মনে করিত। পিতৃভক্তির তুলনায় সে কর্তব্য-জ্ঞান, তাহার দায়িত্ব তুচ্ছ মনে করিত; কিন্তু পিতার আদেশে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তাহার নিষ্ঠুর পিতা প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া তাহাকে যে-বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার ফল কীরূপ ভীষণ হইবে তাহা চিন্তা করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইল; সে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে সমাজদ্রোহী, পুলিশের মহাশত্রু পল সাইনস ও তাহার পুত্র—পুলিশের সুদক্ষ কর্মচারী কর্তব্যনিষ্ঠ সার্ল সাইনস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঘরে উপস্থিত হইল। পল সাইনস প্রফুল্ল চিত্তে টেলিফোনের স্যুইচবোর্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিল—সে ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্তে লন্ডনের প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে তাহার অভিপ্রায়ানুযায়ী সংবাদ প্রেরণ করিতে

পারে; কেহই তাহার সঙ্কল্পে বাধা দিতে পারিবে না।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন যে-ডেস্কের নিকট বসিয়াছিল, সেই ডেস্কের ঊর্ধ্বে একটি আলো জ্বলিতেছিল। তাহার সম্মুখে একখানি খাতা খোলা ছিল, রাত্রিকালে বিভিন্ন থানা হইতে যে-সকল সংবাদ টেলিফোনের সাহায্যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট করা হইত—তাহা সেই খাতায় লিখিয়া রাখা হইত। পরদিন প্রভাতে আটটার সময় অফিস খুলিলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ সে-সকল রিপোর্ট পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা কর্তব্য তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতেন।

পল সাইনস তাহার হস্তস্থিত ভারী চামড়ার ব্যাগটা পাশে রাখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—তোমার বড়সাহেবের খাস-কামরার আলোটা এই মুহূর্তেই জ্বালিয়া দাও। উহা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত জ্বালাইয়া রাখিবে তাহার পর আলো নিবাইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবে।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন (সার্ল সাইনস) তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। পল সাইনস ডেস্কের নিকট বসিয়া পড়িল। সে রিপোর্ট বহিখানি কৌতূহলভরে পাঠ করিতে লাগিল; সেই রাত্রের কোনও-কোনও দুর্ঘটনার সংবাদ তাহাতে লিখিত ছিল।

'দীর্ঘকালের একজন ফেরারী আসামী উত্তর লন্ডনে ধরা পড়িয়াছে।' 'স্ট্রাটফোর্ডে একটি দুর্ভাগিনী অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছে।' —এইসকল বিবরণ পাঠ করিয়া পল সাইনস প্রফুল্ল চিত্তে দোয়াত-কলম লইয়া সেই পাতায় তাড়াতাড়ি কী কতকগুলি কথা লিখিয়া রাখিল এবং তাহার নিচে নিজের নাম লিখিল। —সে যখন খাতাখানি বন্ধ করিল, ঠিক সেইসময় তাহার পুত্র সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। সাইনস উঠিয়া তাহার পুত্রকে সেই আসনে বসিতে আদেশ করিল; তাহার পর পকেট হইতে কয়েকখানি কাগজ বাহির করিল। সেই কাগজগুলি টাইপ-করা। পল সাইনস সেই কাগজগুলি টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—এখন কী করিতে হইবে তাহা বোধহয় বুঝিতে পারিয়াছ। ইহাতে যাহা যেভাবে লেখা আছে—তাহা ঠিক সেইভাবেই পর-পর টেলিফোন করিয়া দাও। সিডেনহাম হইতে আরম্ভ করো।

সার্জেন্ট সিবর্ন সেই কাগজগুলি পাঠ করিল। তাহার মুখ ভয়ে নীল হইয়া গেল; কিন্তু সে তাহার পিতার আদেশের প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। সে টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া সিডেনহামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আহ্বান করিল, বলিল,—আপনি কি সিডেনহামের থানা অফিসার? আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ কর্মচারী; এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গেল—পলাতক আসামী পল সাইনস আপনার এলাকায় লুকাইয়া আছে! আপনি যতগুলি পুলিশ কনস্টেবল সংগ্রহ করিতে পারেন—তাহাদের লইয়া ৫৪নং সিলভেস্টর রোডের বাড়ি আক্রমণ করুন; হ্যাঁ, সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া আসামীকে গেপ্তার করা চাই। চীফ কমিশনর স্বয়ং এই আদেশ জানাইতে বলিলেন।

এক মিনিট পরে সার্ল সাইনস আর-একটি থানায় ঠিক এই সংবাদ প্রেরণ করিল; কেবল ঠিকানাটি স্বতন্ত্র। থানার কর্মচারীকে আরও বলা হইল—পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া যাইবে—ইহা বড়সাহেবেরই অঙ্গীকার।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন টেলিফোনে যে-সকল কথা বলিল, পল সাইনস তাহা সকলই শুনিল। তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল সে সুইফট সিওর গ্যারেজ হইতে যে-সকল ট্যাক্সি সহ অনুগত দস্যুদলকে উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে যাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিল—তাহারা অবিলম্বে লুণ্ঠন আরম্ভ করিতে পারিবে। সকল থানার পুলিশের প্রহরীরা সদলে বিভিন্ন আড্ডায় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবে, সুতরাং নগরের বিভিন্ন অংশ অরক্ষিত থাকিবে; তাহার অনুচরদের দস্যুবৃত্তিতে কেহই বাধা দিতে পারিবে না।

পল সাইনসের পুত্র বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করিয়া এই একই সংবাদ জানাইল। তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্মধারায় প্লাবিত হইল, তাহার ললাট হইতে টস-টস করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, ললাটের ঘর্ম অপসারিত করিয়া তাহার পিতাকে বলিল,—আপনার আদেশ পালন

করিলাম; এখন আমাকে কী করিতে হইবে বলুন।

পল সাইনস পুত্রের কাতরতা লক্ষ্য করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল,—তুমি এত ব্যাকুল হইয়াছ কেন মূর্খ! মন স্থির করো। আমার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। এখন উপরের ঘরে কাজ আছে; হ্যাঁ, যে কুঠুরীতে বেতারযন্ত্র পরিচালনের ব্যবস্থা আছে, সেই ঘরে যাইতে হইবে।

তাহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উপরতলায় চলিল। কয়েক মিনিট পরে তাহারা যে-কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই কক্ষটি বেতারের নানাবিধ যন্ত্রাদিতে আচ্ছন্ন। সেইসময় বিগবেনের ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

তাহারা সেই কক্ষ অতিক্রম করিয়া আর-একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের দেওয়ালগুলি ধাতুমণ্ডিত; কারণ সেই কক্ষে যে-সকল যন্ত্রাদি ছিল, তাহা এরূপ সূক্ষ্ম যে, সেই কক্ষটি ওভাবে সুরক্ষিত না হইলে বাহিরের বৈদ্যুতিক প্রভাবে তাহাদের কার্যোপযোগিতা নষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল। নগরের বিভিন্ন অংশে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভ্রাম্যমাণ পুলিশ ফৌজকে তাহাদের চলন্ত গাড়িতে এই কক্ষ হইতে সংবাদ দিয়া তাহাদের কার্য নিয়ন্ত্রিত করা হইত।

পল সাইনস সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উত্তেজিতস্বরে বলিল,—আমার বিশ্বাস, আমি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে নিস্তব্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব।

অনন্তর সে সেই কক্ষের যন্ত্রগুলির দিকে চাহিয়া তাহার হস্তস্থিত চর্মনির্মিত ব্যাগটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার ভিতর হইতে ধাতুনির্মিত একটি আধার বাহির করিল—সেই আধারটি একটি ক্ষুদ্র গ্যাস-মিটারের অনুরূপ। তাহার সম্মুখে ঘড়ির মুখের মতো একটি চাকা; সেই চাকাতে যে দুইটি কাঁটা ছিল, তাহা দেড়টার ঘরে সংস্থাপিত। সাইনস সেই যন্ত্রটির একটি দণ্ডে ঈষৎ চাপ দিতেই সেই যন্ত্রের ভিতর হইতে টিক-টিক করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে পল সাইনস ও তাহার পুত্র সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া আসিল। নিচের তলায় আসিয়া সাইনস ঘড়ি দেখিয়া তাহার পুত্রকে বলিল,—স্মরণ রাখিও, আজ রাত্রি একটার পূর্বে তোমাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সদর আড্ডায় যাইতে হইবে, হ্যাঁ, একটার পূর্বেই যাইবে এবং সেখানে আমার প্রতীক্ষা করিবে।

সার্ল সাইনস কোনও কথা বলিল না। সে তাহার পিতার মুখের দিকে অভিমানপূর্ণ কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পিতার কোনও অবৈধ আদেশেরই প্রতিবাদ করিবার তাহার শক্তি ছিল না; কিন্তু পিতার আদেশে সে কীরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং আত্মসম্মান নষ্ট করিয়া কীভাবে নিজের ভবিষ্যতের সকল আশা বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহা চিন্তা করিয়া ক্ষোভে, অভিমানে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

পল সাইনস পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; কিন্তু পুত্রের সর্বনাশ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্যান্য পুত্রেরও সর্বনাশ করিয়াছিল। তাহার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল। সে সঙ্কল্প-পথ হইতে বিচলিত হইল না; পুত্রের মঙ্গলকামনা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে তাহার শত্রুগণের বুকের উপর দিয়া 'জগন্নাথের রথ' টানিয়া লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প।

পল সাইনস তাহার পুত্রের করমর্দন করিল; কিন্তু তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সে বিস্মিত হইল না। সে জানিত—সে তাহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না; তাহার স্বার্থের যূপমূলে তাহার আর-একটি পুত্রের জীবন উৎসর্গ হইবে। সে দ্বার খুলিয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাহিরে আসিল এবং তাহার শকটের দিকে অগ্রসর হইল।

পল সাইনস গাড়িতে উঠিয়া বসিলে গাড়ি হোয়াইট হলের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু কিছু দূরে গিয়াই তাহার গাড়ির নম্বরগুলি হঠাৎ পরিবর্তিত হইল। তাহার গাড়িতে পুলিশ কমিশনর সার হেনরি ফেয়ারফক্সের মোটর-গাড়ির নম্বর ছিল, সেই নম্বর পরিবর্তিত হওয়ায় তাহা পুলিশ কমিশনরের

গাড়ি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। তাহার কাজ শেষ হইয়াছিল; তাহার অনুচরবর্গ ঠিক একই সময়ে শান্তিভঙ্গ করিয়া আইনের মর্যাদায় দণ্ডাঘাত করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা সে করিয়া আসিয়াছিল। তাহার ষড়যন্ত্রের সাফল্য-বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

পল সাইনস তাহার সোফেয়ারকে নূতন আদেশ দানে উদ্যত হইয়া মনে-মনে বলিল,—এইবার আমার মহাশত্রু গোয়েন্দা ব্লেক ও বুড়া শয়তান সোয়েনের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করি। প্রভাতের পূর্বেই এই একজোড়া প্রধান শত্রুর নাম শত্রুপক্ষের নামের তালিকা হইতে অপসারিত করিতে হইবে।

চতুর্থ প্রসঙ্গ ঃ কুট্সের আক্কেল-সেলামি

ইন্সপেক্টর কুট্স স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথসহ পথের ধারে দাঁড়াইয়া ছিলেন—একখানি ট্যাক্সি দৈবক্রমে অথবা কাহারও গুপ্ত ইঙ্গিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইল।

ট্যাক্সিখানি খালি, কিন্তু তাহা যে 'সুইফট সিওর' গ্যারেজের গাড়ি—ইন্সপেক্টর কুট্স তাহা জানিতে পারিলেন না; তাহা জানিতে পারিলেও সন্দেহের কারণ ছিল না। সকল ট্যাক্সিই তাঁহার নিকট সমান। তিনি সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মুহূর্তপরে তাঁহার পাশে বসিলে—তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—দেখো ব্লেক, ওই যে 'হুই-হুই' না 'হুই-চই' কাগজের সম্পাদক-বেটার—কী যেন নাম বলিল—কেনী না ফেনী,—উহার রকম-সকম আমার বড় ভালো বোধ হইল না! সে যে-লোকগুলাকে পল সাইনসের সাজে সাজাইয়া রাস্তা দিয়া চালান করিতেছে—তাহাদিগকে যদি ফিরাইয়া লইয়া না যায়—তাহা হইলে আমি তাহাদের প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করিয়া গারদে পুরিব। দেখো, ওই দলের আর-এক বেটা ভিলিয়ার্স স্ট্রিটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। উহার পশ্চাতে একদল লোক—যেন ফুটবলের বাজি দেখিতে চলিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সকলের আগে ওই সম্পাদক মিঃ মিলট-ই কেনীকে পাকড়াইবার ব্যবস্থা করাই প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে, অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতায় উহার সন্ধান পাইবে। সে যে-কাগজ-কাটা ছুরি ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সাহায্যে উহাকে শনাক্ত করা কঠিন হইবে না। অঙ্গুলি-চিহ্ন মিলিলেই জানিতে পারিবে—লোকটা কে! পল সাইনসের সঙ্গে উহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে রহস্য ভেদ করা অনেকটা সহজ হইবে। আরে! ট্যাক্সিওয়ালা কি আমাদিগকে পগারে ফেলিয়া জখম করিবে?

ট্যাক্সিওয়ালা হঠাৎ এত জোরে ট্যাক্সি চালাইতে লাগিল যে, তাঁহারা আসন হইতে ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে সামলাইয়া লইলেন; শেষে সে সেই প্রচণ্ড বেগ সংযত করিয়া হোয়াইট হলের দিকে চলিল। ইন্সপেক্টর কুট্সের মাথার সহিত স্মিথের মাথার ঠক্কর লাগিয়াছিল; ইন্সপেক্টর কুট্স শিরঃভ্রষ্ট টুপিটা তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন,—উঃ, মাথাটা যে ফুলিয়া উঠিল ছাই! কিন্তু কেনীর অঙ্গুলি-চিহ্ন আমাদের অফিসের খাতায় থাক না থাক—ওই পাগলামিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে আমি তাহাকে বাধ্য করিব। হ্যাঁ, আমি উকিল-সরকারের সাহায্যে উহার বিরুদ্ধে 'ইনজংশন' বাহির করিব।

ট্যাক্সি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সম্মুখে আসিয়া থামিল। ড্রাইভার ন্যায্য ভাড়া ও দুই পেনি বকশিস লইয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল; কিন্তু সে অধিক দূর না গিয়া অদূরবর্তী ভূগর্ভস্থ স্টেশনে উপস্থিত হইয়া গাড়ি থামাইল এবং ইন্সপেক্টর কুট্সের নিকট যে-দুই পেনি বকশিস পাইয়াছিল, তাহা টেলিফোনের কলে খরচ করিল।

সে টেলিফোনে সাড়া দিয়া বলিল,—আমি জ্যাকোবি কথা বলিতেছি। সতর্ক হউন, আপনাকে

সন্দেহ করা হইয়াছে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আপনার পশ্চাতে হুড়ো চালাইবার চেষ্টা হইবে।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে প্রবেশ করিয়া কুট্‌সের খাস-কামরায় উপস্থিত হইলেন; ইন্সপেক্টর কুট্‌স পূর্বোক্ত ছুরিখানি একখানি লেফাফায় পুরিয়া তাঁহাদের ফৌজদারি-মহাফেজখানায় পাঠাইয়া দিলেন। ফৌজদারির আসামীদের অঙ্গুলি-চিহ্ন সেই স্থানে রক্ষিত হয়।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে সেই ছুরির সহিত একখানি রোকা ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইল। সেই রোকাখানি পাঠ করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের দুই চক্ষু কপালে উঠিল! তিনি বলিলেন,—তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ব্লেক। অঙ্গুলি-চিহ্নের দপ্তর হইতে রোকায় কী লিখিয়া পাঠাইয়াছে শোনো—'কেনেথ মিলটন ওরফে ছিপছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন। পরিচয়—ইউনাইটেড স্টেটসের অধিবাসী; নরহত্যা ও জালিয়াতি অপরাধে বাউমের বিধানানুসারে আজীবন কারাদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত ফেরারি আসামী।'

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—উহা ছিপছিপে কনোলীর অঙ্গুলি-চিহ্ন? ঠিক হইয়াছে কুট্‌স! কনোলী পল সাইনসের দলভুক্ত দস্যু। এখন সে লন্ডনে আসিয়া হুজুগে কাগজের সম্পাদক সাজিয়াছে! অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে—সে সাইনসের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই এই হুজুগের সৃষ্টি করিয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণাই উহাদের উদ্দেশ্য।

স্মিথ বলিল,—বাউমের বিধানটা কী কর্তা?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—ইহা ইউনাইটেড স্টেটসের ফৌজদারি আইনের এক নূতন বিধান। পুরাতন অপরাধীদের দমনের জন্যই এই বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে। কোনও চোর তিনবার চৌর্যাপরাধে শাস্তি পাইবার পর, যদি চতুর্থবার কোনও অপরাধ করে—তাহা হইলে এই বিধান অনুসারে তাহার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। এই চতুর্থবার তাহার অপরাধের লঘুত্ব বা গুরুত্ব লক্ষ করা হয় না; অর্থাৎ সে সেই চতুর্থবার জালই করুক, নরহত্যারই চেষ্টা করুক, বা কোনও ডাকঘরে ঢুকিয়া চারি পয়সার একখানি টিকিটই চুরি করুক তাহাকে চিরজীবন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—যদি আমি কনোলীর হাতে হাতকড়ি দিতে পারি আর যদি সে বুঝিতে পারে—দেশে ফিরিলে অবশিষ্ট জীবন তাহাকে জেলে কাটাইতে হইবে—তাহা হইলে আমি তাহার মুখ হইতে কোনও-কোনও কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। উহাকে একটু পীড়াপীড়ি করিলেই সাইনসের ঠিকানা জানিয়া লইতে পারিব; সে কীভাবে আমাদের বিপন্ন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে—তাহাও জানিতে পারিব।

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িলেন; তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। যদি কনোলী পল সাইনসের বিরুদ্ধাচরণের সাহস করিত—তাহা হইলে পূর্বেই সে পুলিশকে তাহার গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দিয়া গভর্নমেন্টের প্রতিশ্রুত সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার গ্রহণ করিতে পারিত; কিন্তু দস্যু তস্করেরা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করিয়া চলে বলিয়া পুলিশ সহজে তাহাদিগকে ধরিতে পারে না। যাহা হউক, যখন তাঁহাদের মধ্যে এই তর্কবিতর্ক চলিতেছিল এই সময় ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ব্রাউন একখানি ট্যাক্সি লইয়া সবেগে নদীতীরবর্তী পথে অগ্রসর হইল। ক্ষণকাল পরে মিঃ ব্লেক ফায়ার-ইঞ্জিনের ঢং-ঢং শব্দ শুনিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া নিউটন স্ট্রিটের দিকে ধাবিত হইলেন। কিছুদূর গিয়াই তাঁহারা পথে বিপুল জনতা দেখিতে পাইলেন।

ট্যাক্সি আর চলিতে পারে না, পথ বন্ধ দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স ট্যাক্সি হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন এবং দুই হাতে ভিড় ঠেলিতে-ঠেলিতে সম্মুখে চলিলেন। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়াই জনতা ও কোলাহলের কারণ বুঝিতে পারিলেন।

তখন অদূরবর্তী একটি তেতলার দ্বার-জানালা ভেদ করিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম ও লোহিত অগ্নিশিখা উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল। তাঁহারা প্রায় একঘণ্টা পূর্বে যে সংবাদ-পত্রের অফিসে আসিয়া সম্পাদক-প্রবরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সেই অফিসেই আগুন লাগিয়াছিল! নবপ্রকাশিত 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে সম্পাদকের খাস-কামরাটি তখন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া বিমর্ষভাবে বলিলেন,—না, আর রক্ষা নাই। আমরা ছিপছিপে কনোলীর সহিত দেখা করিতে আসিলে সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আমরা তাহাকে সন্দেহ করিয়াছি এবং তাহার প্রকৃত পরিচয় শীঘ্রই জানিতে পারিব। সুতরাং পুলিশের কাজে লাগিতে পারে—এরূপ প্রমাণ সমস্তই নষ্ট করিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল; এই অগ্নিকাণ্ড তাহারই ফল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—তুমি কি মনে করো সে স্বেচ্ছায় তাহার অফিসে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তিনি আর কোনও কথা বলিবার পূর্বেই ইন্সপেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই অট্টালিকার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দ্বারের সম্মুখে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতীকে দেখিয়া অসঙ্কোচে তাহার হাত ধরিলেন। তিনি তাহাকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে টানিয়া আনিলে মিঃ ব্লেক দেখিলেন—যে-যুবতী সেই সংবাদ-পত্র সম্পাদকের অফিসে বসিয়া চিঠিপত্র টাইপ করিতেছিল—এ সেই যুবতী। যুবতী 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র সম্পাদকের টাইপিস্ট।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—তোমাদের কর্তা কোথায় পলাইয়াছে বলো।

যুবতী বলিল,—কর্তা কে? কাহার কথা বলিতেছেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—মিঃ কেনী বলিয়া যে নিজের পরিচয় দিয়াছিল; কিন্তু উহা যে তাহার আসল নাম নয়—তাহা এখন জানিতে পারিয়াছি। সেই পাজী বদমায়েশটা কোথায় পলাইয়াছে বলো। এই ঘরে কীরকমে আগুন লাগিল, তাহাও তোমার কাছে শুনিতে চাই।

যুবতী আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিল; তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। ভয়ে তাহার মূর্ছার উপক্রম হইল।

সে পড়িয়া যায় দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন,—তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও।

যুবতী অস্ফুটস্বরে কাতরভাবে বলিল,—ওই ঘরে কীরূপে আগুন লাগিল তাহা আমি জানিতে পারি নাই; মিঃ কেনী কোথায় তাহাও আমি জানি না। আমি টিফিনের সময় বাহিরে গিয়াছিলাম; টিফিন করিয়া অফিসে আসিলে দেখি ঘরে আগুন লাগিয়াছে। মিঃ কেনীর সন্ধান পাইলাম না; বোধহয় তাহার পূর্বেই তিনি সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই যুবতীকে জেরা করিয়া কোনও কথা বাহির করিতে পারিলেন না। তিনি শুনিতে পাইলেন—সে দুই সপ্তাহ পূর্বে একখানি দৈনিক সংবাদ পত্রে কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া টাইপিস্টের চাকরির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হওয়ায় সে 'হুই-হুই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে টাইপিস্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। সে এক সপ্তাহের বেতন পাইয়াছে, আর-এক সপ্তাহের বেতন এখনও বাকি। দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হইবার পূর্বেই এই অগ্নিকাণ্ড।

যে বালকটি বেয়ারার পদে নিযুক্ত হইয়াছিল—সে অদূরে দাঁড়াইয়া দমকলের সাহায্যে অগ্নিনির্বাপণের কৌশল লক্ষ করিতেছিল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাহাকেও মিঃ ব্লেকের সম্মুখে ধরিয়া আনিলেন; কিন্তু তাহাকেও জেরা করিয়া সম্পাদকের সন্ধান জানিতে পারিলেন না। সেই বালক বলিল—সম্পাদক মিঃ কেনী এক সপ্তাহ পূর্বে তাহাকে অফিসের বেয়ারা নিযুক্ত করিয়াছিল; তাহার এই এক সপ্তাহের বেতন বাকি আছে, তদ্ভিন্ন সে সম্পাদকের আদেশে নিজের

পকেট হইতে পাঁচ শিলিং খরচ করিয়া ডাক-টিকিট কিনিয়া আনিয়াছিল। সম্পাদক কেনী তাহার নিকট হইতে টিকিটগুলি লইয়াছিল—কিন্তু মূল্য বাকি রাখিয়াছে। সুতরাং 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসে চাকরি করিয়া তাহার এক সপ্তাহের বেতন ও নগদ পাঁচ শিলিং দণ্ড লাগিয়াছে। খবরের কাগজের অফিস পুড়িয়া গেল, সম্পাদক ফেরার; সুতরাং টাকাগুলি উদ্ধারের আশা নাই বুঝিয়া সে কেনীকে গালি দিতে লাগিল।

ফায়ার ইঞ্জিনগুলি অগ্নিনির্বাপণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কুড়ি মিনিটের মধ্যে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অফিসের ছাদ অগ্নিদগ্ধ হইয়া হুড়মুড় শব্দে ভাঙিয়া পড়িল। চারিদিকে যে-সকল লোক জমাট বাঁধিয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল—তাহারা প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করিল। তাহারা বুঝিল 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র নাম সফল হইয়াছে।

সার্জেন্ট ব্রাউন ইন্সপেক্টর কুট্সের সম্মুখে আসিয়া বলিল,—অফিস তো ভাঙিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে 'হই-হই-রই-রই কাণ্ডে'র অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইল। উহার প্রথম সংখ্যাই শেষ সংখ্যা; দ্বিতীয় সংখ্যা আর বাহির হইবে না। এরকম হুজুগে কাগজের পরিণাম এইরূপই হইয়া থাকে। পল সাইনস কী মতলবে এই কাগজ বাহির করিয়াছিল—তাহা আমার অনুমান করা অসাধ্য।

ইন্সপেক্টর কুট্স মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—পল সাইনস কী মতলবে কোন কাজ করে—তাহা অন্য কেহ বুঝিতে পারে না। আজ সকালে আমি যখন সেই হলদে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখিয়াছিলাম —তখনই বুঝিয়াছিলাম—কোনও একটা কাণ্ড-কারখানা ঘটিবেই ঘটিবে।

সার্জেন্ট ব্রাউনের নাকে-মুখে ধোঁয়া প্রবেশ করায় সে কাশিতে লাগিল; তাহার পর বলিল, —ধোঁয়ার চোটে গলা শুকাইয়া গিয়াছে; গলাটা একটু ভিজাইয়া লইতে না পারিলে শরীর চাঙ্গা হইবে না।

কী উপায়ে শরীর চাঙ্গা হয় তাহা ইন্সপেক্টর কুট্সের অজ্ঞাত ছিল না, তাঁহারও গলা শুকাইয়া গিয়াছিল। এজন্য তিনি সার্জেন্ট ব্রাউনের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিলেন,—কয়েক গজ দূরেই মদের দোকান আছে এবং আমার পকেটে পাঁচ পাউন্ডের একখানি নোটও আছে; সুতরাং আমাদের পিপাসা শান্তি করা কঠিন হইবে না। ছিপছিপে কনোলী ধরা পড়িবার ভয়ে চম্পট দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে যে পাঁচ পাউন্ডের নোট আদায় করিয়াছি, তাহা দিয়া শ্যাম্পেন কিনিয়া আমরা গলা ভিজাইতে পারিব—ইহাও মন্দের ভাল।

স্মিথ বলিল,—ও পল সাইনসের টাকা, হজম করিতে পারিবে না বাবা! একবার তাহার টাকায় ম্যাগনিফিসেন্টে খানা খাইতে গিয়া অতিকষ্টে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল; এবার কী হয় বলা যায় না! আমি উহার মধ্যে নাই।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ইন্সপেক্টর কুট্স অদূরবর্তী মদের দোকানে উপস্থিত হইলেন। কুট্স মহানন্দে শ্যাম্পেনের বোতল খুলিলেন। মিঃ ব্লেক চুরুট টানিতে-টানিতে পল সাইনসের স্বাক্ষরিত অদ্ভুত পত্রখানির কথা ভাবিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন পল সাইনস অসার দম্ভ ভালবাসিত না, সে পত্রে যাহা লিখিত, তাহা কার্যে পরিণত করিত; মিথ্যা কথায় কাহাকেও প্রতারিত করা তাহার অভ্যাস ছিল না। কিন্তু সে পত্রে যে-কথা লিখিয়াছিল—তাহা কীরূপে কার্যে পরিণত করিবে তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। বারোঘণ্টার মধ্যে সে তাহার শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন করিবে—ইহা অসঙ্কোচে তাঁহার গোচর করিয়াছিল, কিন্তু কোথায় কীভাবে সে তাহার অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে—তাহা সে ভিন্ন অন্য কাহারও ধারণা করিবার শক্তি ছিল না। মিঃ ব্লেক কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন—পল সাইনসের প্রচণ্ড আক্রমণ অব্যর্থ এবং তাহার সুতীব্র রোষানল উদ্যত বজ্রের ন্যায় অবিলম্বে তাহার শত্রুগণের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্স শ্যাম্পেনের গ্লাস খালি করিয়া বলিলেন,—চলো, এই মুহূর্তেই ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাই। কনোলীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে; যতগুলি লোক হাতে পাই

সকলকে চারিদিকে তাহার সন্ধানে পাঠাইয়া দিব। কনোলী তাহার কাগজের পসার-বৃদ্ধির জন্য যে-অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার সহিত পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের সম্বন্ধ আছে; সাইনসের সেই গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে হইবে। কিন্তু—ও আবার কী?

ঠিক সেই মুহূর্তে দোকানের আর্দালী একখানি ট্রে-র উপর ইন্সপেক্টর কুট্‌স-প্রদত্ত পাঁচ পাউন্ডের নোটখানি রাখিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত করিল। এই নোটখানি তিনি সাইনস-বেশধারী পূর্বোক্ত লোকটির নিকট পাইয়াছিলেন এবং তাহা দিয়া তিনি শ্যাম্পেনের বোতল ক্রয় করিয়া বাকি টাকা ফেরত চাহিয়াছিলেন।

আর্দালী বলিল,—ম্যানেজার এই নোট লইতে পারিবেন না বলিলেন, এইজন্য আমি ইহা ফেরত আনিলাম।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সক্রোধে বলিলেন,—গোল্লায় যাক তোমাদের ম্যানেজার! সে এ-নোট লইতে পারিবে না কেন? —নোটের অপরাধ কী? আমাকে কী করিতে হইবে বলো। উহার পিঠে কি আমার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিতে হইবে?

আর্দালী বলল,—ওই কার্যটি সুবিবেচনার কাজ হইবে না মহাশয়! অনর্থক কেন ফ্যাসাদে পড়িবেন? এ-নোট খারাপ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—কী বলিলে? তিনি তৎক্ষণাৎ নোটখানি টানিয়া লইয়া তাহা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্তে সার্জেন্ট ব্রাউন ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নোটখানি দেখিতে লাগিল। ব্রাউন জাল ও জালিয়াত সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল; কোনও জালিয়াৎ তাহাকে প্রতারিত করিতে পারিত না। জাল নোট সে একমাইল দূর হইতে দেখিলেও চিনিতে পারিত বলিয়া অহঙ্কার করিত। ইন্সপেক্টর কুট্‌স যখন এই নোট পুরস্কার পাইয়াছিলেন—সেইসময় সে ইহা দেখিলে জাল নোট বলিয়া চিনিতে পারিত।

ব্রাউন বলিল,—আর্দালীটা সত্য কথাই বলিয়াছে মহাশয়! আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। এ-জাল নোট। এই অচল নোট কে আপনার কাছে চালাইয়া গিয়াছে? দোকানদার ইহা লইয়া আপনাকে বাকি টাকা দিবে কেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কী বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তখন তাঁহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছিল; তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তিনি বহুদর্শী ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, তাঁহার কাছে একটা বাজে লোক জাল নোট চালাইয়া গিয়াছে! শ্যাম্পেনের দাম এখন তাঁহাকে নিজের পকেট হইতে বাহির করিয়া দিতে হইবে? কী বিড়ম্বনা! মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া চুরুট টানিতে লাগিলেন; তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিলেন না।

স্মিথ বলিল,—দুই পেনির কাগজ দেখাইয়া যখন ওই পাঁচ পাউন্ড মূল্যের উপহার লাভ করিয়াছিলেন—তখনই বুঝিয়াছিলাম উপহারে গলদ আছে। আপনি নোটখানি পাইয়াই বুঝি আনন্দে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়াছিলেন? উহা আসল কি জাল—তাহা পরীক্ষা করিবারও ফুরসৎ হয় নাই!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গর্জন করিয়া বলিলেন,—তুমি থামো হে ছোকরা! দুই পেনি দামের কাগজ দেখাইয়া যে-নোট পাওয়া গিয়াছিল—তাহা সচল কি অচল ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য কাহার আগ্রহ হয়? না, ইহা তখন আমি পরীক্ষা করি নাই। এই অচল নোট কি আমি ঘরে তুলিব ভাবিয়াছ? সেই ছিপছিপে কনোলীটাকে একবার হাতে পাইলে হয়; জাল নোট চালাইবার মজা তাহাকে বুঝাইয়া দিব। আমার সঙ্গে গোস্তাকি? বেটা চোর, ধাপ্পাবাজ, জালিয়াত, খুনে!

সার্জেন্ট ব্রাউন বলিল,—সে-পরের কথা পরে হইবে, এখন পকেট হইতে শ্যাম্পেনের দামটা দিয়া এখান হইতে সরিয়া পড়ুন। আপনি পুলিশের লোক; একে জাল নোট তাহার উপর মদ কিনিয়া মদের দোকানে তাহা ভাঙাইবার চেষ্টা—ইহা তো আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নয়!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে টাকার থলি বাহির করিয়া অত্যন্ত বিরাগভরে দোকানদারের প্রাপ্য টাকা প্রদান করিলেন। মিঃ ব্লেক ব্যাঙ্ক-নোটখানি টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, নোটখানি জাল নোট হইলেও জালিয়াতিতে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় ছিল। যে উহা জাল করিয়াছিল, সে যে প্রথম শ্রেণীর জালিয়াত, এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন; কিন্তু কে তাহা জাল করিয়াছিল তাহা তিনি কীরূপে বুঝিবেন? তিনি ভাবিলেন, পল সাইনস নানা প্রকার অপকর্মে অভ্যস্ত, অবশেষে সে জালিয়াতিও আরম্ভ করিয়াছে না কি? প্রত্যেক দুষ্কর্মের অনুষ্ঠানেই সে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিতেছিল। সুতরাং পল সাইনস নোট জালও আরম্ভ করিয়াছিল—বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; বিশেষত সেদিন যে-সকল পাঁচ পাউন্ডের নোট বিতরিত হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই জাল নোট—ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন, কনোলী ওরফে মিলট-ই কেনী জাল নোট চালাইয়া জনসমাজকে প্রতারিত করিয়াছে; সে বুঝিয়াছিল তাহার প্রতারণা ধরা পড়িতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এজন্য সে ঘরে আগুন লাগাইয়া আজই সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই একদিনেই তাহার দুরভিসন্ধি সফল হইয়াছে। তাহার এই দুরভিসন্ধিটি কী—তাহাও আমরা বুঝিতে পারিয়াছি!

স্মিথ বলিল,—এইভাবে সে তাহার মুরুব্বি পল সাইনসের পলায়নে সাহায্য করিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আমি ব্রাউনকে সঙ্গে লইয়া এখন ইয়ার্ডে চলিলাম ব্লেক; পুলিশ কমিশনরের নিকট আমাদের তদন্ত-ফল রিপোর্ট করিতে হইবে। আমাদের তদন্ত-ফল শুনিয়া তিনি খুব খুশি হইবেন। সময়ান্তরে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বেকার স্ট্রিটে যাত্রা করিলেন। পথে আসিয়া স্মিথ তাঁহাকে বলিল,—কর্তা, পল সাইনস চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই একটা উড়ো দমবাজিতে পুলিশকে থ বানাইয়া দিবে। আজ কয়েক ঘণ্টায় সে যে-হাত দেখাইয়াছে—তাহার ধাক্কা সামলাইতেই তাহারা লবেজান!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ স্মিথ, তোমার অনুমান সত্য। পুলিশ তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারে নাই; সাইনস ঝড়ের মতো বেগে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসের আমদানি করিয়া এরকম একটা বিকট হই-চই কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে যে, সেই ধাক্কা সামলাইয়া উঠা কঠিন হইবে।

স্মিথ বলিল,—আমরা যখন সম্পাদকের অফিসে গিয়াছিলাম—সেইসময় ইন্সপেক্টর কুট্‌স কনোলীকে গ্রেপ্তার করিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হইত কর্তা! বোধহয় সাইনসের গুপ্ত-সঙ্কল্পে কিছু বাধাও পড়িত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু তাহা হইলে কুট্‌স কনোলীর নিকট কোনও কথা জানিতে পারিত না। পল সাইনসের দলে বোধহয় একজনও বিশ্বাসঘাতক নাই। যদি তাহার কোনও অনুচর তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিত তাহা হইলে সাত হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা বিফল হইত না; সাইনসকে ধরা পড়িতে হইত। কনোলী পুরাতন পাপী, সে তিনবার জেল খাটিয়াছে, এই চতুর্থবার সে অপরাধ করায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ভয়ে এদেশে পলাইয়া আসিয়াছে। নিউ ইয়র্কের পুলিশ তাহার মুখ হইতে কোনও কথা বাহির করিতে পারিত না; লন্ডনের পুলিশ, এমনকী, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাহার মুখ হইতে একটি কথাও কোনও উপায়ে বাহির করিতে পারিবে না।

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিলেন এবং অগ্নিকুণ্ডের নিকটে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। তামাকের ধূমে সেই কক্ষ যেন আঁধার হইয়া গেল; তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন! কিন্তু দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও পল সাইনসের নূতন ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলেন না। সে কোন শত্রুকে চূর্ণ করিবার জন্য কী কৌশল অবলম্বন করিবে, অথবা সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার জন্য কী নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে—তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। সাইনসের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা কঠিন, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা অধিকতর কঠিন ছিল। সে ইচ্ছা করিলে বহু স্থানেই ঠিক এক সময়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়া লোমহর্ষণ ধ্বংসলীলা আরম্ভ করিতে

পারিত; ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক তাঁহার নোট-বহি খুলিয়া পল সাইনসের অপরাধের আমূল বৃত্তান্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। সে পার্কমুর কারাগার হইতে মুক্তিলাভের পর এ-কাল পর্যন্ত যে-সকল অপকর্ম করিয়াছিল এবং কর্তৃপক্ষকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল—তাহার ধারাবাহিক বিবরণ আলোচনা করিয়া, তিনি তাহার শত্রুগণের নামের তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি সাইনসের দুইজন প্রধান শত্রুর নাম দেখিতে পাইলেন—একজন তাহার কারবারের বখরাদার জাবেজ নোল্যান্ড, দ্বিতীয় ব্যক্তি সার হারলি জেমস। এই দুই ব্যক্তিকে তাহার ষড়যন্ত্রে চূর্ণ হইতে হইয়াছিল; কিন্তু সে তখন তাহার অনেক শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার অনেকগুলি শত্রুর পরিচয় জানিতেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় হউক বা ঘটনাচক্রে হউক, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সাইনস এবার তাঁহাদের মধ্যে কাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছিল—তাহা তিনি কীরূপে বুঝিবেন?

মিঃ ব্লেক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, পল সাইনসের কোনও-কোনও শত্রু পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল; কেহ-কেহ তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের আশায় দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা বহু দূরদেশে বাস করিতেছিল। অনেকে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; এজন্য তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না। পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করাও তাহার অসাধ্য হইয়াছিল।

পল সাইনস মিঃ ব্লেককেও মহাশত্রু মনে করিত এবং মিঃ ব্লেকেরও তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং পল সাইনস সুযোগ পাইলেই যে তাঁহাকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু তিনি নিজের অনিষ্টাশঙ্কায় মুহূর্তের জন্য বিচলিত হন নাই; এমনকী, সেইদিন প্রভাতে তিনি পল সাইনসের স্বাক্ষরিত যে-ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলেন—তাহার কথাও তিনি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চুরুট টানিতে-টানিতে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক এ-কথাও বুঝিতে পারিলেন যে, এবার পল সাইনস তাহার কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিয়াছে। পূর্বে সে যাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিত, তাহার নাম প্রকাশ করিত, তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ-ঘোষণা করিত; কিন্তু এবার সে সঙ্কল্প গোপন রাখিয়াছে। তাহার গুপ্ত-সঙ্কল্প প্রকাশিত হইলে তাহা কার্যে পরিণত করা কঠিন হইবে এবং মিঃ ব্লেক ও পুলিশ তাহা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিবেন; অধিকন্তু তাহাকে বিপন্ন হইতে হইবে, পূর্ব অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বুঝিতে পারিয়া সে সতর্ক হইয়াছিল।

স্মিথ হঠাৎ লাফাইয়া উঠিল এবং ব্যগ্রভাবে জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সে মিঃ ব্লেককে উত্তেজিতস্বরে বলিল,—কর্তা, কাগজ-বিক্রেতারা পল সাইনসের নাম করিয়া কী হাঁকিয়া যাইতেছে। সান্ধ্য দৈনিকে কি তাহার সম্বন্ধে কোনও নতুন সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে? —স্মিথ দুই-একমিনিট কান পাতিয়া কী শুনিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গিয়া পথ হইতে একখানি সান্ধ্য দৈনিক কিনিয়া আনিল। সেই দৈনিকখানি সে রুদ্ধনিশ্বাসে পাঠ করিতেছিল। সে কাগজখানি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া কৌতূহলভরে বলিল,—কর্তা, ইভিনিং নিউজে কী খবর বাহির হইয়াছে পড়িয়া দেখুন। অদ্ভুত ব্যাপার!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কী বাহির হইয়াছে?

স্মিথ বলিল,—পল সাইনসের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র। এই পত্রে সে পুলিশকে কঠোর ভাষায় গালি দিয়াছে; সদম্ভে লিখিয়াছে—আজ মধ্যাহ্নে সে পূর্ণ একঘণ্টা স্বাধীনভাবে পুলিশের চক্ষুর উপর বিচরণ করিয়াছে; কেবল তাহাই নহে—সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের একজন প্রধান কর্মচারীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছে এবং লন্ডনের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভের সম্মুখ দিয়া

অবলীলাক্রমে চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারা তাহাকে চিনিতে পারে নাই।

স্মিথের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইল; তিনি কাগজখানি খুলিয়াই প্রথমেই একখানি হাতে-লেখা পত্রের অবিকল নকল দেখিতে পাইলেন। পল সাইনস যে-পত্রখানি লিখিয়াছিল —তাহার ফটো প্রকাশিত হইয়াছিল; সুতরাং তাহা যে পল সাইনসের স্বহস্ত-লিখিত পত্র ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। পত্রের নিচে তাহার স্বাক্ষর ছিল। সেই হস্তাক্ষর মিঃ ব্লেকের সুপরিচিত। মিঃ ব্লেক রুদ্ধনিশ্বাসে পল সাইনসের পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ ঃ

'জনসাধারণের নিকট স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সত্য কথা গোপনের চেষ্টা করিলে তাহা কি তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে? না, সত্য-গোপনের অধিকার তাহাদের নাই। কিন্তু আজ বারোঘণ্টার মধ্যে তাহারা ঐরূপ চেষ্টা করিবে—এ-কথা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি এবং ইভনিং নিউজ ও অন্যান্য সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণকে অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা আগামী-কল্য বেলা নয় ঘটিকায় সময় সদলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মুদ্রাযন্ত্র বিভাগে উপস্থিত হইয়া সেখানে দাবি করিবেন—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যে-সকল রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা জানিতে পারিয়াছে—তাহা বিস্তারিতভাবে তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা হউক; কারণ সেইসকল ঘটনার বিবরণ তাঁহাদের জানিবার অধিকার আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্যনিষ্ঠ, দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, সুনিয়ন্ত্রিত পুলিশ বলিয়া যাহারা দম্ভ প্রকাশ করিতে লজ্জিত হয় না—সেই লন্ডন-পুলিশ যদি শান্তিরক্ষায় অসমর্থ হয়, জনসাধারণকে রক্ষা করিতে অকৃতকার্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সেই অসামর্থ্য ও অপদার্থতার পরিচয় গোপন করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অসঙ্গত এবং প্রকৃত সত্য জনসাধারণের গোচর করা অবশ্যকর্তব্য। পল সাইনস পুনর্বার যে-যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন—তাহাতে নিঃসন্দেহে জয়লাভ করিবেন। কিন্তু তিনি পুলিশের শক্তি ও সম্ভ্রমের বনিয়াদ পর্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্য যে-কঠোর দণ্ডাঘাত করিবেন—তাহার বিবরণ জনসাধারণের নিকট গোপন করিবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে—এ-কথা আমি—পল সাইনস দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করিতেছি।'

পঞ্চম প্রসঙ্গ ঃ নৈশ-আহ্বান

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্বাক্ষরিত সেই স্পর্ধাপূর্ণ পত্রখানি 'ইভনিং নিউজে' পাঠ করিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহা কি পল সাইনসের অসার ধাপ্পাবাজি, না স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে অপদস্থ ও বিপন্ন করিবার জন্য অব্যর্থ দণ্ডাঘাত—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু পুলিশকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য পল সাইনস যে কোনও বিরাট ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং বিপন্ন পুলিশ অপদস্থ হইয়া তাহাদের লাঞ্ছনার কথা সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করিবে, বুঝিয়া সে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়াছে—এ-কথা মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—দেশের লক্ষ-লক্ষ লোক স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে তাহাদের মুশকিল আসান বলিয়া মনে করে, বিপদে, সঙ্কটে তাহার অসাধারণ শক্তির উপর নির্ভর করে; সেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে যদি দেশের জনসাধারণের নিকট অসার, অপদার্থ, পঙ্গু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়—তাহা হইলে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলাকে সে বিশ্বের সম্মুখে উপহাস্যাস্পদ করিতে পারিবে। দেশের সর্বত্র অরাজকতা আরম্ভ

হইবে, সবেগে লুঠ-তরাজ চলিবে। পল সাইনসের কার্যে প্রতিপন্ন হইবে—গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী পুলিশ অপেক্ষা পল সাইনস অধিকতর বলবান! তাহার নেতৃত্বের নিকট সকলেরই মস্তক অবনত হইবে।

কিন্তু মিঃ ব্লেক এ-কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সাইনস প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া নানা স্থানে গোপনে বাস করিতেছিল, সে পুলিশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের অপদস্থ করিতে সাহস করিবে—ইহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই তাঁহার মনে হইল। তিনি তাঁহার হাতের কাগজখানি অবজ্ঞাভরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—সাইনস বোধহয় খেপিয়া গিয়াছে। সে পুলিশকে অপদস্থ করিয়া জনসমাজকে আতঙ্কাভিভূত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে এবং সংবাদ-পত্রে নিজের ঢাক বাজাইয়া সমাজে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে। আজ রাত্রে সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিকট হয়তো কোনওরকম 'নাটুকে ভড়ং' প্রকাশ করিবে; তাহার ফলে কাল সকালে সকল ঘটনার কথা জানিবার জন্য কোলাহল আরম্ভ হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

স্মিথ বলিল,—তা বটে, কিন্তু পল সাইনসের এরূপ ষড়যন্ত্রের ফল অনিষ্টজনক হইবে বলিয়াই মনে হয়। সাইনস কী মতলবে এই চাল চালিতেছে তাহা জানিতে পারিলে বোধহয় আমাদের ততদূর দুশ্চিন্তা হইত না; কিন্তু আমরা অন্ধকারে বসিয়া থাকিয়া কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই; তবে এ-কথা সত্য যে, সাইনস যখনই ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তখনই কোনও না কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে! সেইসকল কথা আপনারও বোধহয় স্মরণ আছে। সে চিঠি লিখিয়া জাবেজ নোল্যান্ডকে চূর্ণ করিয়াছিল। সাইনস প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিল—সে ন্যাশনাল ব্রিটিশ ব্যাঙ্কের দশ লক্ষ পাউন্ড লুঠ করিবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে দেখা গেল—সাইনসের চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছিল। তাহার পর সে যখন স্টেডফাস্ট লাইফ ইনসিয়োরেন্স কোম্পানিকে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল—তখন তাহা তাহার অসাধ্য বলিয়াই আমাদের মনে হইয়াছিল; কিন্তু সে তাহার সেই সঙ্কল্প প্রায় সফল করিয়াছিল—ইহা আমরা সকলেই জানি। এইবার আবার সে পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে। এক হুজুগে সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিয়া এরূপ কৌশলে তাহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, সে লন্ডনের রাজপথে প্রকাশ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কেহ তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না! সে নির্বিঘ্নে অন্তর্ধান করিয়া উৎকট দম্ভে পুলিশের মনে আতঙ্ক-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছে; জাল নোট চালাইয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মতো চতুর গোয়েন্দাকেও প্রতারিত ও অপদস্থ করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন, তিনি কী বলিবেন—তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস ছদ্মবেশে প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহাকে ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে প্রতারিত করিয়াছিল—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না; অথচ সে-সময় তাহাকে সাইনস বলিয়া গ্রেপ্তার করিতে তাঁহাদের সাহস হয় নাই! ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাহাকে কাগজ দেখাইয়া পাঁচ পাউন্ডের জাল নোট লইয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 'ইভনিং নিউজে' সাইনস যে-কথা লিখিয়াছিল—তাহা তো মিথ্যা নহে। সে দয়া করিয়া তাঁহার ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নাম উল্লেখ করে নাই; তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিলে তাঁহারা অধিকতর অপদস্থ হইতেন।

মিঃ ব্লেক পল সাইনসের স্পর্ধার পরিচয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওয়ার কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। সেইরাত্রে সাইনসের সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া তাঁহার অসাধ্য মনে হইল। লন্ডনের কোন অংশে সে কখন কীভাবে তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবে—তাহা তিনি কী উপায়ে জানিতে পারিবেন?

রাত্রি এগারোটা বাজিল। মিঃ ব্লেক তখনও চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে-করিতে নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্মিথ তাঁহার অদূরে বসিয়া কাগজ হাতে লইয়া পুনঃ-পুনঃ হাই তুলিতে

লাগিল, তাহার পর বিরক্ত হইয়া শয়ন করিতে চলিল।

আরও দশ মিনিট পরে বহির্দ্বারে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ঝনঝনি শুনিয়া মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলেন; তত রাত্রে কে দেখা করিতে আসিয়াছে বুঝিতে না পারিয়া তিনি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—কে তুমি?

উত্তরের পরিবর্তে বাহিরে দাঁড়াইয়া কে শিস দিল। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্স তাঁহার সঙ্গে দ্বিতলে চলিলেন। কুট্স চেয়ারে বসিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে চারিদিকে চাহিলেন, তাহার পর হুইস্কির বোতল ও গ্লাস টানিয়া লইয়া আধগ্লাস নির্জলা হুইস্কি গলাধঃকরণ করিলেন! এইভাবে গলা ভিজাইয়া লইবার পর তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল। মদ না গিলিলে অনেক মাতালের বাক্যস্ফূর্তি হয় না!

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—ব্লেক, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম—এখনও তুমি জাগিয়া আছ। আমি রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত অফিসেই ছিলাম। এগারোটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দরজা বন্ধ হইলে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অসময়ে যখন আসিয়াছ—তখন নিশ্চয়ই কোনও জরুরি সংবাদ আছে।

ইন্সপেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের টেবিল হইতে একটি চুরুট লইয়া বলিলেন,—ইভনিং নিউজে পল সাইনসের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা দেখিয়াছ কি? সেই পাজিটা আজ রাত্রে কী কাণ্ড করিয়া বসিবে বুঝিতে না পারায় আমার বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—হ্যাঁ, ইভনিং নিউজ দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সাইনসের পত্রের মর্মটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তবে তাহার কথাগুলি অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। আজ রাত্রে কী ঘটিবে না-ঘটিবে তাহা আমি বলিতে না পারিলেও—এ-কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, লন্ডনের অধিকাংশ সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার কাল সকালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া সাইনসের পত্রের মর্ম জানিবার জন্য তোমাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিবে। সংবাদ-পত্রগুলি অনেকসময় পুলিশকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু কখনও-কখনও বিড়ম্বনাজনকও হইয়া উঠে।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—এই ব্যাপারে আমি ভয়ঙ্কর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি; আজ রাত্রে আমি ঘুমাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছি। পল সাইনস কীরূপ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে তাহা জানিবার জন্য আমি আমার এক বৎসরের বেতন ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তোমাদের পক্ষ হইতে কীরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে?

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—যতটুকু করা যাইতে পারে—তাহাই করা হইয়াছে; প্রত্যেক থানায় সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ তো সর্বত্রই সতর্ক আছে; এ-অবস্থায় তাগিদ দিয়া আর কী অধিক সুফলের প্রত্যাশা করা যাইবে? সাইনস লন্ডনের কোন পল্লীতে উপদ্রব আরম্ভ করিবে—তাহা জানিতে পারিলে আমরা সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিতাম। তুমি কি কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারিয়াছ?

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আমি অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি; অনুমানে নির্ভর করিয়া কী সিদ্ধান্ত করিব বলো। সাইনস এবার তাহার মতলবের কথা তো প্রকাশ করে নাই। আমরা এইমাত্র জানিতে পারিয়াছি—সে লন্ডনের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে। ছিপছিপে কনোলী নিউটন স্ট্রিটের অফিসে আগুন লাগাইয়া অন্তর্ধান করিয়াছে; তাহার কোনও সন্ধান পাইয়াছ?

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—না, সে একদম ফেরার! আমি তাহার সম্পাদিত কাগজের মুদ্রাকর ও প্রকাশকের সহিত দেখা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা কনোলী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারিল না। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি—সেই প্রতারক সম্পাদকের অফিস হইতে যে-সকল পাঁচ পাউন্ডের নোট উপহারস্বরূপ বিতরণ করা হইয়াছিল—সেগুলি সমস্তই জাল নোট!

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তুমি তো নিজেই একজন ভুক্তভোগী। সাইনসের চাতুরী

ভেদ করা কীরূপ কঠিন তাহাও তুমি জানো।

ইন্সপেক্টর কুট্স নিস্তব্ধভাবে চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন; ক্রমে রাত্রি বারোটা বাজিল, তখনও তিনি উঠিলেন না। মিঃ ব্লেকও তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। পল সাইনস সেই রাত্রে লন্ডনের কোন অংশে কাহার কী সর্বনাশ করিবে—এই চিন্তায় তাঁহাদের চক্ষুতে নিদ্রার আবির্ভাব হইল না।

হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া টেলিফোনের কলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে—এরকম অসময়ে কে আমাকে টেলিফোনে ডাকিতেছে? এ-সময় আমি সাড়া দিতে চাহি না। লোকটা ডাকিয়া-ডাকিয়া হয়রান হউক।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—না, তোমার সাড়া না দেওয়া সঙ্গত হইবে না, বিশেষত আজ রাত্রে। কে কী উদ্দেশ্যে এই অসময়ে তোমার সন্ধান করিতেছে—তাহা জানিতে হইবে বইকী!

মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন এবং রাগ করিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্টস্বরে সাড়া দিলেন।

প্রশ্ন হইল,—মিঃ ব্লেক! আপনিই কি মিঃ ব্লেক? কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা ও ব্যাকুলতার অভাব ছিল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কী বিপদ! আমি তো বলিয়াছি—আমিই রবার্ট ব্লেক, আপনি কে?

উত্তর হইল,—আমি—বিচারপতি সোয়েন কথা বলিতেছি; হ্যাঁ, আমার নাম বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন। আমি এই মুহূর্তেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চাই মিঃ ব্লেক! আপনি দয়া করিয়া আসুন। আমার বিশ্বাস, অবিলম্বে কোনও সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা অপরিহার্য!

বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন এই রাত্রি বারোটার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে উৎসুক! কে তিনি? পল সাইনসের সঙ্গে তাঁহার কি কোনও সম্বন্ধ আছে? —মনে-মনে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক বাঁ-হাতে নোটবহিখানি টানিয়া লইয়া খুলিলেন, তাহার পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন—ষোলো বৎসর পূর্বে পল সাইনস নরহত্যার অভিযোগে দায়রা-সোপর্দ হইলে, যে-বিচারক নিরপরাধ পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন—তিনিই বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন! ভ্রান্ত জুরিদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য হওয়ায় সেই বিচার-বিভ্রাটের জন্য তিনিও আংশিকভাবে দায়ী ছিলেন। সুতরাং পল সাইনস যে তাঁহার নাম শত্রু-তালিকাভুক্ত করিয়া তাঁহাকেও বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিবে—এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পল সাইনস সর্বাগ্রেই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার দণ্ড উত্তোলিত করিলেও বিস্ময়ের কোনও কারণ ছিল না। মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে টেলিফোনের তারের ভিতর দিয়া বিচারপতি সোয়েনের কণ্ঠস্বরে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার আভাস পাইয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। তাঁহার ধারণা হইল—এবার বিচারপতি সোয়েনের পালা! পল সাইনস এতদিন পরে তাঁহাকেই চূর্ণ করিবার জন্য সংহারাস্ত্র উদ্যত করিয়াছে!

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, এখন অত্যন্ত অসময়; আপনার কি আশঙ্কার কোনও কারণ আছে?

বিচারপতি সোয়েন অধীর স্বরে বলিলেন,—মিঃ ব্লেক, আশঙ্কার কারণ না থাকিলে এই রাত্রি বারোটার সময় আপনাকে বিরক্ত করিতাম? হ্যাঁ, আমার জীবন বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই নরপিশাচ পল সাইনসের নিকট হইতে যে-সংবাদ পাইয়াছি তাহা অত্যন্ত আতঙ্কদায়ক। সে আমাকে যে-ভয় প্রদর্শন করিয়াছে—তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, প্রভাতের পূর্বেই সে আমার সর্বনাশ করিবে; বোধহয় আমার মৃত্যু অনিবার্য। আপনি দয়া করিয়া আসুন, আর একমুহূর্ত বিলম্ব করিবেন না।

ইন্সপেক্টর কুট্স বিচারপতির কথা শুনিতে না পাইলেও মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বুঝিলেন—

মিঃ ব্লেক টেলিফোনে কোনও দুঃসংবাদ পাইয়াছেন। তিনি ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—ব্যাপার কী ব্লেক, টেলিফোনে নিশ্চয়ই কোনও মন্দ সংবাদ পাইয়াছ। কে তোমাকে ডাকিয়া কী কথা বলিল?

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে নিস্তব্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিয়া টেলিফোনের রিসিভারের নিকট ওষ্ঠ স্থাপন করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—আপনি বলিলেন, পল সাইনসের নিকট হইতে আপনি সংবাদ পাইয়াছেন! কী সংবাদ পাইয়াছেন বলুন তো। সে আপনাকে কীরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়াছে?

বিচারপতি বলিলেন,—তাহা আমি ঠিক বলিতে পারিব না, কারণ আমি নিশ্চিত কিছুই জানিতে পারি নাই; তবে টেলিফোনে যে-সংবাদ পাইয়াছি—তাহা অত্যন্ত আতঙ্কজনক! আপনি আর বিলম্ব করিবেন না, দয়া করিয়া শীঘ্র—এই মুহূর্তেই আসুন মিঃ ব্লেক! আপনি এখানে আসিলে সকল কথা আপনাকে বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিব। টেলিফোনে সেইসকল কথা আপনাকে বলিতে আমার সাহস হয় না। আপনি আমার বাড়ির ঠিকানা জানেন না কি? আমার ঠিকানা—ডলউইচ পল্লীর রেড হাউস। আপনি এই মুহূর্তেই আসিবেন কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তা আসিতে পারি, তবে কি না—কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই খট করিয়া শব্দ হইল—সঙ্গে-সঙ্গে লাইন বন্ধ হইয়া গেল। মিঃ ব্লেক আর কোনও সাড়া পাইলেন না। বিচারপতির ভয়ার্ত কণ্ঠ নীরব! মিঃ ব্লেক অগত্যা রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

ইনসেপেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন,—এই রাত্রি বারোটার পর কে—।

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—বড় যে-সে লোক নহেন। যিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন—তিনি বিচারপতি এন্ড্রু সোয়েন। ষোলো বৎসর পূর্বে ইঁহারই বিচারে—অথবা অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছিল। উনি আজ রাত্রে পল সাইনসের নিকট হইতে অতি ভীষণ সংবাদ পাইয়াছেন; পল সাইনস উঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে! এজন্য বিচারপতি আতঙ্কে অধীর হইয়া আমাকে উঁহার বাড়িতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুখের অদ্ভুত ভঙ্গি করিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অর্থাৎ উনি বোধহয় আশা করিয়াছেন—পল সাইনসের পিস্তলের গুলি আমি 'গোলা খা-ডালা' করিয়া উঁহার প্রাণরক্ষা করিব!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হাত বাড়াইয়া টুপিটি তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এতক্ষণ পরে পল সাইনসের মতলব বুঝিতে পারা গিয়াছে। এইবার জজসাহেবকে সে সাবাড় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে! এই জজটি 'ঘটিরাম' না হইলে কি আমাদের এত দুর্গতি হয়? যদি তিনি অবিচারে পল সাইনসের প্রাণদণ্ডের আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে পল সাইনস ক্রুদ্ধ নেকড়ের মতো সমাজের বুকে বসিয়া এভাবে রক্তপান করিত না; আমাদেরও আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি প্রাণ হাতে করিয়া দৌড়াইয়া বেড়াইতে হইত না; কিন্তু বেচারার প্রাণরক্ষার উপায় করিতে হইবে তো? তোমার মতলব কী? তুমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলে যে! কী স্থির করিলে?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—জজ সোয়েনের কণ্ঠস্বর আমার অপরিচিত। তিনিই যে টেলিফোনে আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন—এ-বিষয়ে সর্বাগ্রে কৃতনিশ্চয় হওয়া প্রয়োজন। দেখো কুট্‌স, টেলিফোনের আহ্বানে কখনও-কখনও প্রতারিত হইতে হয়—ইহা বোধহয় তুমি অস্বীকার করিবে না; আমি একাধিকবার ঠেকিয়া শিখিয়াছি। বিপদে পড়িয়া বিচারপতি সোয়েনই এই রাত্রে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন—ইহার অকাট্য প্রমাণ না পাইলে আমি রাত্রিকালে বাহিরে যাইব না। বক্তার কণ্ঠস্বরে যে-আতঙ্ক ও বিহ্বলতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে হইল না; সুতরাং বিচারপতি সোয়েনই যে আমার সাহায্য-প্রার্থী, এ-বিষয়ে সন্দেহের তেমন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; বিশেষত পল সাইনস বিচারপতি সোয়েনকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে সে-সংবাদ অবিশ্বাসেরও যোগ্য নহে; তথাপি এ-বিষয়ে আমাকে নিঃসন্দেহ হইতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া টেলিফোনের

রিসিভারের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং টেলিফোনের অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যাহার সহিত তিনি অল্পকাল পূর্বে আলাপ করিলেন—তাহার ঠিকানা কী?

প্রায় দুই মিনিট পরে অপারেটর তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিল; তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া টেলিফোনের ডাইরেক্টরি দেখিতে লাগিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—সোয়েন—এন্ড্রুরেড হাউস, ডলউইচ পল্লী। শোনো কুট্স, বিচারপতি সোয়েনের বাড়ি হইতেই টেলিফোনে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অন্য কেহ কোনও দুরভিসন্ধিতে তাঁহার টেলিফোন ব্যবহার করিয়াছে ইহা বিশ্বাস হয় না; সুতরাং বোধহয় ইহার মধ্যে প্রতারণা নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—বিচারপতি সোয়েন বিপদের আশঙ্কায় তোমার সাহায্য প্রার্থনায় টেলিফোন করিয়াছেন; সাইনস আজ রাত্রে তাঁহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি সেখানে ঠিক সময়ে উপস্থিত হইতে পারিব? আমরা সেখানে গিয়া দেখিব—বিচারপতি হয় নিরুদ্দেশ, না হয় নিহত হইয়াছেন।

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন,—এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। বিচারপতি সোয়েন যদি জানিতে পারিতেন—তাঁহার বিপদ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—তাহা হইলে তিনি আমাকে টেলিফোনে সংবাদ দেওয়ার পূর্বেই স্থানীয় থানায় সংবাদ দিয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন। আমার সেখানে উপস্থিত হইবার অনেক পূর্বেই পুলিশ তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত। বিচারপতি সোয়েন আমাকে কীজন্য টেলিফোন করিলেন—তাহা বুঝিতে পারি নাই। তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা থাকিলে আমি তাঁহাকে পুলিশের অপেক্ষা অধিক সাহায্য করিতে পারিব না—ইহা তিনি কি জানেন না? তথাপি তাঁহার প্রার্থনা উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি?

ইন্সপেক্টর কুট্স এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ইন্সপেক্টর কুট্সের সঙ্গে গৃহত্যাগ করিলেন। স্মিথ তখন তাহার শয়ন-কক্ষে নিদ্রিত ছিল, মিঃ ব্লেক তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া তাহাকে ডাকিলেন না। তাঁহারা পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি পাওয়ায় তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক যে-ট্যাক্সিতে বাড়ি আসিয়াছিলেন, ইহা সেই ট্যাক্সি! ট্যাক্সিওয়ালা যেন জানিতে পারিয়াছিল—তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইবেন এবং তাঁহার প্রতীক্ষাতেই সে যেন গাড়ি লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু পূর্বপরিচিত ট্যাক্সিওয়ালাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। তিনি ট্যাক্সিতে উঠিয়া ইন্সপেক্টর কুট্সের পাশে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ট্যাক্সি দ্রুতবেগে নদী পার হইয়া লন্ডনের দক্ষিণাংশে ধাবিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্স অবসন্ন পদদ্বয় ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—দেখো ব্লেক, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছিলাম। তোমার বাড়িতে না আসিলে আমি কি জানিতে পারিতাম—শয়তান সাইনস আজ কাহার সর্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছে? বৃদ্ধ বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন প্রায় আশি বৎসর; অনেকদিন পূর্বে তিনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাকে এতদিন পরে নির্যাতনের চেষ্টা করিয়া সাইনস কীরূপ হীনতা ও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতেছে —ইহা চিন্তা করিয়া আমি কেবল বিস্মিত নহি, অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সাইনস কি মানুষ? সে এখন শোণিত-লোলুপ নেকড়ে; তাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই। বিচারপতি সোয়েনের বয়স এখন আশি বৎসরেরও অধিক, কারণ ষোলো বৎসর পূর্বে যখন তিনি পল সাইনসের মামলার বিচার করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছিল। তিনি বোধহয় সাইনসের পিতার সমবয়স্ক। তাঁহাকে উৎপীড়িত করিয়া সাইনস যদি আনন্দ লাভ করে—তাহা হইলে তাহার প্রকৃতি কীরূপ তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আমার মনে হয়—।

মিঃ ব্লেক সহসা নীরব হইলেন। তাঁহাকে নির্বাক দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—তোমার

কী মনে হয়—কথাটা শেষ না করিয়া হঠাৎ চুপ করিলে কেন?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমার মনে হয় এই বৃদ্ধ বিচারপতিকে উৎপীড়িত করিবার জন্যই সাইনসের এ-সকল যোগাড়-যন্ত্র ও ষড়যন্ত্র হইয়া থাকিলে তাহা তাহার পক্ষে মশা মারিতে কামান পাতা! জাবেজ নোল্যান্ড ও সার হারলি জেমসকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে যে-বিরাট আয়োজন করিয়াছিল, যেরূপ চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছিল—তাহার সহিত তুলনা করিলে মনে হয় এবার তাহার যথেষ্ট অবনতি হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সে ভাবিয়াছে, যদি সে বৃদ্ধ বিচারপতিকে হত্যা করিতে পারে—তাহা হইলে তাহার গৌরব-বৃদ্ধি হইবে! লন্ডনের সংবাদ-পত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে—যোলো বৎসর পূর্বে বিচারপতি সোয়েন বিনা অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করায় সে এই দীর্ঘকাল পরে তাঁহার অবিবেচনার প্রতিফল দিয়াছে। বিচারপতি সোয়েন রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জীবন-সায়াহ্নেও তাহার প্রতিহিংসা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ পাঠে সে ও তাহার অনুচরেরা আনন্দিত হইবে এবং মনে করিবে ব্রিটিশ বিচার-পদ্ধতির উপর প্রচণ্ড দণ্ডাঘাত করিয়াছে।

ট্যাক্সি ব্রিক্সটন অতিক্রম করিয়া হার্নি হিল অভিমুখে ধাবিত হইল। তাহার পর নানা পথ ঘুরিয়া ডলউইচ পল্লীতে প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্র পল্লী তখন নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন; সেই গভীর নিশীথে সেই শান্তিময় পল্লীতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনস কোনও নিষ্ঠুর কার্য করিবে—ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সেই পল্লীর পথ-ঘাট ট্যাক্সিওয়ালার সুপরিচিত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল, কারণ সে কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া বিচারপতি সোয়েনের বাসগৃহের সম্মুখবর্তী প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া গাড়ি থামাইল; বিচারপতির অট্টালিকার বহির্দ্বারে একখানি তাম্রফলকে খোদিত ছিল—'দি রেড হাউস' অর্থাৎ লালকুঠি।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স গাড়ি হইতে নামিয়া ট্যাক্সিচালককে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি সেই অট্টালিকার দিকে চাহিয়া কোনও দুর্লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার মানসিক উদ্বেগ ও আশঙ্কা দূর হইল। অনন্তর তিনি মিঃ ব্লেকের সঙ্গে দেউড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন এবং দেউড়ি পার হইয়া গৃহদ্বারের সম্মুখীন হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—আমরা ঠিক সময়েই এখানে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে ব্লেক! এখানে কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ওই দেখো জানালা দিয়া ঘরের আলো দেখা যাইতেছে। তুমিই আগে চলো ব্লেক! কারণ বিচারপতি সোয়েন তোমাকেই আহ্বান করিয়াছেন; আমার স্মরণ আছে—লোকটির প্রকৃতি উদ্ধত। আমাকে দেখিয়া তাঁহার মেজাজ গরম হইতে পারে; আমি পুলিশের লোক, বিনা আহ্বানে আমাকে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিলে তিনি হয়তো খেপিয়া উঠিয়া আমাকে বাহিরে যাইতে আদেশ করিবেন। আমি আগে যাইব না।

মিঃ ব্লেক অগ্রবর্তী হইলে কৃষ্ণ-পরিচ্ছদধারী একটি ক্ষীণকায় প্রৌঢ় দ্বার খুলিয়া দিল। সে তাঁহাদিগকে সুসজ্জিত হল-ঘরে লইয়া চলিল। লোকটির বিনীত ব্যবহারে ইন্সপেক্টর কুট্‌স আশ্বস্ত হইলেন। সেই ব্যক্তি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ইন্সপেক্টর কুট্‌সের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—আপনিই তো মিঃ ব্লেক? জজসাহেব আপনার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন মহাশয়! তিনি আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিবেন। আমার সঙ্গে আসুন।

মিঃ ব্লেক তাহার সহিত অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, ইন্সপেক্টর কুট্‌স তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু সেই কক্ষে তাঁহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের বাহিরের বারান্দা দিয়া কিছু দূরে আর একটি কক্ষ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই কক্ষটির দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, উভয় পার্শ্বস্থ বাতায়ন পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত। অর্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়া তাঁহারা সেই কক্ষে একটি বৃদ্ধের তুষারশুভ্র

কেশরাশি এবং একখানি হাতমাত্র দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ও কুট্স সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেও বৃদ্ধ সেইভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সাড়াশব্দ না পাইয়া ইন্সপেক্টর কুট্স দুই-এক পা অগ্রসর হইলেন এবং কাশিয়া সাড়া দিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আশাকরি আপনিই মিঃ জাস্টিস সোয়েন?

বৃদ্ধ তথাপি কথা কহিলেন না; তাঁহার কোনও অঙ্গ নড়িল না। সেই কক্ষে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত; কেবল ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

মিঃ ব্লেকের মন হঠাৎ গভীর সন্দেহ-পূর্ণ হইল। বৃদ্ধটি চেয়ারের হাতায় মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিলেন; মিঃ ব্লেক সেই চেয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে একটি ধাক্কা দিলেন। সেই ধাক্কায় চেয়ার কাত হইল, সঙ্গে-সঙ্গে বৃদ্ধের মস্তক চেয়ার হইতে মেঝের গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—বিচারপতি নিহত হইয়াছেন! আমরা আসিয়াছি বটে, কিন্তু বড়ই বিলম্বে আসিলাম!

সেই মুহূর্তে বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর হইল,—না মিঃ ব্লেক, একটুও বিলম্ব হয় নাই; ঠিক সময়েই আসিয়াছেন। হ্যাঁ, ঠিক দরকারের সময়টিতেই।

কী সর্বনাশ! এ-স্বর যে মিঃ ব্লেকের পরিচিত! মিঃ ব্লেক সেই কণ্ঠস্বরের অনুসরণ করিয়া পর্দা দ্বারা অর্ধাবৃত একটি বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সেখানে তিনি পল সাইনসকে ঈষৎ কুব্জভাবে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহার দৃষ্টি স্থির, তাহাতে নিষ্ঠুরতা ও দৃঢ়তা পরিস্ফুট। তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে কঠোর হাসি; কিন্তু তাহা পিশাচের হাসির ন্যায় ভীষণ! তাহার অস্থিসার শিরাবহুল শীর্ণ হস্তে একটি পিস্তল, সে সেই পিস্তলটি মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্সের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ধীরে-ধীরে আন্দোলিত করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক পল সাইনসকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া চক্ষুর নিমেষে বুকের পকেটে হাত তুলিলেন; কিন্তু তিনি পকেট স্পর্শ করিবার পূর্বেই সাইনস দৃঢ়স্বরে বলিল,—না-না, ওই কার্যটি করিও না, পকেটে হাত পুরিয়াছ কি তোমরা দুজনেই মরিয়াছ। তোমরা উভয়েই শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকো। আমি আশা করিয়াছিলাম—এক ঢিলে দুই পাখি মারিব; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক ঢিলে তিন পাখি বধ করিবার সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে! আমার এ-পিস্তল নিঃশব্দে গুলিবর্ষণ করে; আমি তোমাদিগকে এক ইঞ্চি নড়িতে দেখিলেই গুলি করিয়া মারিব। তোমরা বোধহয় এতদিনে জানিতে পারিয়াছ—পল সাইনসের কথার কখনও অন্যথা হয় না।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ ঃ সাইনসের হাত-সাফাই

মৃত্যু অপরিহার্য দেখিয়া সম্মুখ-মৃত্যুকে সদম্ভে আলিঙ্গন করিলেই যে অত্যন্ত সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করা হয় এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। তরবারি আস্ফালন করা অপেক্ষা তাহা কোষে আবদ্ধ করিয়া রাখাই অনেকসময় বীরত্বের নিদর্শন। যে-ব্যক্তি নিশ্চেষ্টভাবে বিপদের মুখে জীবন বিসর্জন করে—তাহাকে বীর না বলিয়া মূঢ় বলাই সঙ্গত। মিঃ ব্লেক পল সাইনসের গুলিতে নিহত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি ও ইন্সপেক্টর কুট্স সাইনসের আদেশে তৎক্ষণাৎ উভয় হস্ত মাথার উপর তুলিলেন। কিন্তু তিনি মাথার উপর হাত তুলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না; কী কৌশলে সাইনসের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি সাইনসের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার বিন্দুমাত্র অসতর্কতার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পল সাইনস এরূপ অতর্কিতভাবে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, তাঁহারা আত্মরক্ষার

জন্য প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা—আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কাও সামলাইতে পারেন নাই। তথাপি সাইনসের এইরূপ আক্রমণের সম্ভাবনা যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব ইহাও মিঃ ব্রেক মনে করিতে পারেন নাই। তিনি যে-মুহূর্তে বিচারপতি সোয়েনের নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেই মুহূর্তেই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—বিচারপতি সোয়েন তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—ইহা একটু অস্বাভাবিক, ভিতরে কোনও রহস্য আছে। তিনি বিপন্ন হইয়া থাকিলে নিকটস্থ থানায় সংবাদ না দিয়া বহুদূরবর্তী লন্ডনে টেলিফোন করিয়া মিঃ ব্রেকের সাহায্যপ্রার্থী হইবেন কেন? এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করিয়াছিলেন, বিচারপতির বাড়ি হইতে টেলিফোন করা হইয়াছিল—ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে ও ইন্সপেক্টর কুট্সকে পল সাইনসের কবলে পড়িতে হইল। এখন তাঁহাদের অবস্থা—'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'।

ইন্সপেক্টর কুট্স সেই কক্ষে মেঝের উপব নিপতিত বিচারপতি সোয়েনের প্রাণহীন দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাইনস্কে কঠোর স্বরে বলিলেন,—ওরে ইতর নরহন্তা, এই অপরাধে তোকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইবে। ইহার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। কিন্তু ক্রোধে কাঁপিতে থাকিলেও মাথার উপর হইতে তিনি হাত নামাইতে সাহস করিলেন না।

পল সাইনস তাঁহার কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—না ইন্সপেক্টর, বিচারপতি সোয়েন-হত্যাপরাধে আমার ফাঁসি হইবে না। তোমার অনুমান সত্য নহে। বিচারপতি সোয়েনকে আমি হত্যা করি নাই; এই হতভাগ্য বৃদ্ধ স্বাভাবিকভাবেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমি উহার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করি নাই। আমাকে হঠাৎ এখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া উহার মনে যে-আতঙ্ক হইয়াছিল, সেই আতঙ্কে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়াতেই উহার মৃত্যু হইয়াছে। উহার শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা আমার উক্তির যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্স সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,—চুলোয় যাক তোমার এখানে হঠাৎ উপস্থিতি! উনি জানিতেন, উঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। উনি তোমার নিকট হইতে আতঙ্কজনক সংবাদ পাইয়া যখন মিঃ ব্রেককে টেলিফোনে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন আমি মিঃ ব্রেকের ঘরে উপস্থিত ছিলাম। হ্যাঁ, উনি ব্রেককে জানাইয়াছিলেন—তোমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই উনি আতঙ্কে অধীর হইয়াছিলেন।

পল সাইনস তাহার হাতের পিস্তল উভয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বাগাইয়া ধরিয়াই মাথা নাড়িয়া বলিল,—না গো ইন্সপেক্টর সাহেব! তোমার কথা সত্য নয়। বিচারপতি সোয়েন তোমার বন্ধু মিঃ ব্রেককে টেলিফোনে কোনও কথা বলে নাই, এখানে উহাকে আসিতেও অনুরোধ করে নাই। বেকার স্ট্রিটে টেলিফোন করিয়া যিনি মিঃ ব্রেককে এখানে আহ্বান করিয়াছিলেন—তিনি মিঃ পল সাইনস অর্থাৎ স্বয়ং আমি, এই অধম। বিচারপতির ওই টেলিফোন আমিই ব্যবহার করিয়াছিলাম; নতুবা আমি কি আমার দুই মহাশত্রুকে এভাবে ফাঁদে ফেলিতে পারিতাম? তোমরা কোন কীটস্য কীট যে বিচারপতি সোয়েন তোমাদের সাহায্য প্রার্থনায় লন্ডনে টেলিফোন করিবে? আমার এই সামান্য চালাকি বুঝিতে পারো না, অথচ মাদার গাছে দাদ চুলকাইতে তোমাদের সাধ হয়!

পল সাইনসের কথা শুনিয়া ইন্সপেক্টর কুট্সের ঝাঁটার মতো কন্টকিত গোঁফ মনস্তাপে ঝুলিয়া পড়িল। মিঃ ব্রেক ঈষৎ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, এ-চালাকি আমাদের বুঝিতে পারা উচিত ছিল। আমাদের এই নির্বুদ্ধিতার মার্জনা নাই। বিচারপতি সোয়েন চেষ্টা করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন; এ-অবস্থায় লন্ডনে আমাকে কেন সংবাদ দিবেন—ইহা ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্স পল সাইনসকে বলিলেন,—আমাদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া তোমার মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইয়াছে। উত্তম, এখন বলো—তুমি কী উদ্দেশ্যে আমাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছ?

পল সাইনস বলিল,—তোমাদিগকে? না, আমি তোমাকে এখানে আহ্বান করি নাই। তোমাকে আমি মানুষ বলিয়াই গ্রাহ্য করি না; আমার নিকট তুমি একটা তুচ্ছ পতঙ্গ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। আমি কেবল মিঃ ব্লেককেই এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম। তুমি তাহার লেজ ধরিয়া আসিয়া আমার কৈফিয়ৎ চাহিতেছ কেন? তোমাকে কি আমি ডাকিয়াছি? তোমার নির্লজ্জতা ও স্পর্ধার পরিচয় পাইয়া হাসিতেও আমার লজ্জা হইতেছে। হ্যাঁ, আমি মিঃ ব্লেককেই বিচারপতি সোয়েনের নামে এখানে আহ্বান করিয়াছিলাম; তবে তুমিও স্বেচ্ছায় আসিয়া জুটিয়াছ—ইহাতে আমি অসুখী হই নাই, বরং আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদিগকে অনেক কথাই বলিবার ছিল, কিন্তু সে-অবসর আমার নাই; প্রভাতের পূর্বেই আমাকে বিস্তর কাজ শেষ করিতে হইবে, এজন্য আমাকে সংক্ষেপে সকল কথা বলিতে হইতেছে। যদি তোমরা ম্যান্টলপিসের ওই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখো তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, রাত্রি এখন একটা বাজিয়া নয় মিনিট হইয়াছে। একটা বাজিয়া বারো মিনিট হইলে এই কক্ষে একটির পরিবর্তে তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া থাকিবে—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই আমি কার্যারম্ভ করিয়াছি। আমি মনের কথা ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া বলিতে অভ্যস্ত নহি; এইজন্য সরলভাবে বলিতেছি তোমাদের দুজনকে আর তিন মিনিটের মধ্যেই ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ তোমরা এখনই মরিবে।

পল সাইনস এভাবে কথাগুলি বলিল, যেন সে তাঁহাদের সঙ্গে তামাশা করিতেছিল! কিন্তু মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সে সেই মুহূর্তেই তাঁহাদের উভয়কে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প। ইহা তাঁহাদিগকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন নয়। সে নিঃসন্দেহে নিশ্চিতই তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে। আর তিন মিনিট মাত্র সময় আছে! এখন কর্তব্য কী?

পল সাইনসের চক্ষুতে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল, সে অধর দংশন করিয়া পিস্তলের নল আর একটু উঁচু করিয়া লক্ষ্য স্থির করিল। তাহা দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সর্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল. (ট্রাউজারের অবস্থা কী হইল—তাহা অন্যের অজ্ঞাত) তবে তাঁহার দুই চক্ষু ভয়ে কপালে উঠিল, মুখ চুন হইয়া গেল। তিনি আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিলেন,—অ্যাঁ, তুমি বলিতেছ কী? তুমি আমাদিগকে গুলি করিয়া মারিবে? স্বেচ্ছায় নরহত্যা করিবে? ইচ্ছা করিয়া ফাঁসির দড়ি গলায় পরিবে? না, না, তুমি তত নির্বোধ নহ; আমাদিগকে তুমি ভয় দেখাইয়া কাহিল করিতে চাহিতেছ।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া পল সাইনস ক্ষিপ্তের ন্যায় হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল,—না, দুই মিনিট কাটিয়া গেল; কিন্তু তোমার কথার উত্তর না দিয়া গুলি করিলে তোমার মনে একটু আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে। আমার দয়ার শরীর, তোমার মৃত্যুকালে ওই আক্ষেপটুকু থাকিতে দিব না। আমি তোমাদিগকে বৃথা ভয় দেখাইতেছি না। সত্যই তোমাদিগকে গুলি করিব। আমি জানি, এই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ড হইবে; কিন্তু প্রাণদণ্ডের মতো কাজ অনেক করিয়াছি। একবারের বেশি দুইবার ফাঁসি হইবে কি? মিঃ ব্লেক, আমার শত্রুগণের নামের যে-তালিকা আছে—সেই তালিকার অনেক নিচে তোমার নাম ছিল; কিন্তু তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া আমার অনেক কাজ নষ্ট করিয়াছ, আমার অনেক সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়াছ। আমার যে-অনিষ্ট করিয়াছ তাহার প্রতিকার নাই; সে কীরূপ সাংঘাতিক ক্ষতি—তাহা তুমিও জানো। এইসকল কারণে তোমার নাম তালিকার অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে; এইবারই তোমার পালা। তোমাকে হত্যা করিলে আমার অবশিষ্ট অসম্পূর্ণ সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে। তোমাকে আমি অনেকবার সতর্ক করিয়াছি, অনধিকার-চর্চা করিতে নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য করো নাই। এখন তাহার ফলভোগ করো; তোমার সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ওই বেহায়া কুকুরটাও মরুক।

মিঃ ব্লেক কোনও কথা বলিবার পূর্বেই পল সাইনস তাহার হাতের পিস্তলটা ঈষৎ নামাইয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিল; তাহার পর সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল,—তোমারই অনধিকার-চর্চার ফলে আমার একটি পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে, আর তিনজন আজও জেলে পচিতেছে। আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কোনও কুকুরকে গ্রাহ্য করি না; কিন্তু তোমার

শক্রতায় আমার যে-ক্ষতি হইয়াছে—তাহা পূরণ হইবার নহে। এজন্য আমি নতুন কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার পূর্বে তোমাকে হত্যা করিতেছি। তোমার ধৃষ্টতার ফলভোগ করো।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—আর রক্ষা নাই, পল সাইনস খেপিয়া উঠিয়াছে; সে মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার বক্ষঃস্থলে গুলি করিবে—সঙ্গে-সঙ্গে তাঁহার ইহজীবনের অবসান হইবে। কিন্তু তিনি আত্মরক্ষার কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। পল সাইনস তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে একটু হটিয়া গিয়া গুলি করিবে—সেই মুহূর্তে মিঃ ব্লেক সম্মুখস্থ চেয়ারখানি উভয় হস্তে উর্ধ্বে তুলিলেন, পিস্তলের শব্দ হইল না, কিন্তু গুলি চেয়ার বিদীর্ণ করিয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স চিৎকার করিয়া বলিলেন,—ব্লেক, উহার গুলি ব্যর্থ হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সম্মুখে লাফাইয়া পড়িলেন, তাহার পর পল সাইনসকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িয়াছিল, তাহাতে বাধিয়া তিনি সেই মৃতদেহের উপর আছাড় খাইলেন। মিঃ ব্লেক একলম্ফে সাইনসকে আক্রমণ করিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিতে উদ্যত হইলেন।

কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কণ্ঠ স্পর্শ করিবার পূর্বেই সে বিদ্যুদ্বেগে সরিয়া গেল এবং তাহার হাতের পিস্তলটা উর্ধ্বে তুলিয়া সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক বাতির ফানুসের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল।

বাতিটা কড়িকাঠের সঙ্গে ঝুলিতেছিল। পল সাইনসসের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। বাতিটা সেই আঘাতে চূর্ণ হইল এবং কাচগুলা ভাঙিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িল। দীপ নির্বাপিত হওয়ায় সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত কক্ষ সহসা নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায় ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেও পল সাইনস তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। সে তখন একটি জানালার অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। সে সেই কক্ষের দীপ নির্বাপিত করিয়াই সেই জানালা খুলিয়া ফেলিল এবং সেইদিকের বাগানে প্রবেশ করিল।

পল সাইনসের আশা ছিল—সে সেই কক্ষেই মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে হত্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে; কিন্তু আশাপূর্ণ না হওয়ায় সে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল। সেই অট্টালিকায় আর মুহূর্তকাল বিলম্ব করা সে নিরাপদ মনে না করিয়া ডলউইচ পল্লী ত্যাগের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বিচারপতি সোয়েনের বাগানের বাহিরে আসিল।

পল সাইনস পথে আসিয়া, পকেট হইতে ফেল্টের টুপি বাহির করিয়া মাথায় আঁটিয়া দিল এবং একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া পথপ্রান্তবর্তী একখানি মোটরকারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌স এই গাড়িতেই বিচারপতি সোয়েনের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

এই গাড়িখানি সুইফট সিওর কোম্পানির আড্ডার গাড়ি—ইহা পাঠক-পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতে পারে। পল সাইনসের আদেশেই এই গাড়ির ড্রাইভার যথাসময়ে বেকার স্ট্রিটে মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল।

মোটরচালক পল সাইনসকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া দিল। পল সাইনস গাড়িতে উঠিয়া তাহার পাশেই বসিয়া পড়িল। মোটরচালক সেই মুহূর্তে গাড়ি চালাইয়া তাহাকে বলিল,—কর্তা, আপনি খুব সাফাই-হাতে কাজ শেষ করিয়াছেন। পিস্তলের আওয়াজ হয় নাই; কাজেই গোয়েন্দা দুটো বুড়ো জজের ঘরে অক্কালাভ করিয়াছে—ইহা কেহই জানিতে পারিবে না। কী চমৎকার পিস্তল, হাজার টাকা পাইলেও আমি কখনও উহা হাতছাড়া করিব না।

পল সাইনস যে-পিস্তলটি লইয়া গিয়াছিল, তাহা এই মোটরচালকেরই পিস্তল। মোটরচালকটি যে-সে লোক নয়; ইহারই নাম 'চটপটে' হ্যারিস। চিকাগো হইতে সে লন্ডনে আসিয়া পল সাইনসের দলে যোগদান করিয়াছিল। পিস্তলটি তাহার বড় শখের জিনিস ছিল। পল সাইনস সেই পিস্তল-নিক্ষেপে বৈদ্যুতিক দীপ নির্বাপিত করিতে গিয়া পিস্তলটি হারাইয়া আসিয়াছে; তাহা মিঃ ব্লেক বা ইন্সপেক্টর কুট্‌সের হস্তগত হইয়াছে—ইহা সে 'চটপটে' হ্যারিসের নিকট প্রকাশ করিল না। সে

বুঝিল—তাহা উদ্ধার করিতে হইলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাইতে হইবে।

পল সাইনস যে-সময় পিস্তল নিক্ষেপ করিয়া বিজলি-বাতির ফানুসটি চূর্ণ করিয়াছিল—সে-সময় মিঃ ব্লেক সেই আলোকাধারের ঠিক নিচেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আলোকাধারের কাচগুলি তাঁহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়ায় তাঁহার গাল কাটিয়া রক্তপাত হইল। অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কোনদিকে যাইবেন—তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; যাহা হউক, অবশেষে অগ্নিকুণ্ডের মৃদু আলোকে তিনি দিকনির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। কিন্তু তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে দেখিতে না পাইয়া বলিলেন,—কুট্‌স, কোথায় তুমি? তোমার সাড়া পাইতেছি না কেন?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অন্ধকারে চতুর্দিক হাতড়াইতে-হাতড়াইতে বলিলেন,—এই যে আমি আছাড় খাইয়াছি! সাইনস কোথায়? সে কোনদিক দিয়া পলায়ন করিল? তোমার কাছে বিজলি-বাতি নাই?

খোলা জানালা দিয়া বাতাসের একটা দমকা আসিয়া মিঃ ব্লেকের চোখে-মুখে লাগিল; তিনি বুঝিলেন সাইনস সেই পথে অন্তর্ধান করিয়াছে। তিনি পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ ভিন্ন সেই কক্ষে আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের প্রান্তবর্তী সেই খোলা জানালা দিয়া পার্শ্বস্থ বাগানের দিকে চাহিয়া সাইনসের পলায়ন সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সরোষে গর্জন করিয়া বলিলেন,—সে আবার আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে? কিন্তু সে আর অধিক দূর পলায়ন করিতে পারিবে না ব্লেক! তুমি বাগান দিয়া তাহার অনুসরণ করো, আমি সম্মুখের পথে যাইতেছি। আজ তাহাকে গ্রেপ্তার করাই চাই।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সেই খোলা জানালা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন; ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই কক্ষ হইতে সম্মুখস্থ হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ!

দ্বার রুদ্ধ দেখিয়াই ইন্সপেক্টর কুট্‌স বুঝিতে পারিলেন, যে-লোকটি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গিয়াছিল সে বিচারপতি সোয়েনের পরিচারক নহে, সে পল সাইনসেরই কোনও অনুচর। ইন্সপেক্টর কুট্‌স অসহিষ্ণুভাবে রুদ্ধদ্বারে দুমদাম শব্দে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। কয়েকবার পদাঘাতের পর দ্বারের অর্গল দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মুক্তদ্বার দিয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া চক্ষুর নিমেষে পথে নামিয়া আসিলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পথে আসিয়াই দেউড়ির অদূরে মিঃ ব্লেককে দণ্ডায়মান দেখিলেন। মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া পথের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্‌স একখানি ধাবমান মোটরগাড়ির পশ্চাতের লোহিতালোক দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—পল সাইনস সেই গাড়িতে উঠিয়া চম্পটদান করিয়াছে। মোটরকারের ইঞ্জিনের অস্ফুট শব্দ দূর হইতে বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক হতাশভাবে বলিলেন,—পল সাইনস আমাদের গাড়ি লইয়া পলায়ন করিল! সে এই গাড়িতে উঠিয়া-বসিয়া সোফেয়ারকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাইয়াছিল; সে প্রাণভয়ে সাইনসের আদেশ পালন করিয়াছে। সোফেয়ার যে সাইনসেরই অনুচর-–ইহা মিঃ ব্লেক তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিল,—সাইনস এখানে একাকী আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—না, যে-লোকটা আমাদিগকে বিচারপতি সোয়েনের সঙ্গে দেখা করাইতে লইয়া গিয়াছিল—সে সাইনসের দলভুক্ত দস্যু।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স পকেট হইতে একটি হুইসল বাহির করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলেন; তিনি ক্রমাগত পাঁচ মিনিট বোঁ-বোঁ শব্দে বংশীধ্বনি করিয়াও কাহারও সাড়া পাইলেন না। কোনও পাহারাওয়ালা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিল না। সেইরাত্রে সে-অঞ্চলে কোনও পাহারাওয়ালা রোঁদে বাহির হইয়াছিল—ইহারও কোনও প্রমাণ মিলিল না।

যাহা হউক, সেই হুইসল শুনিয়া সেই পল্লীর অনেক লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইল; তাহারা ঘরের জানালা খুলিয়া মাথা বাহির করিয়া পথের দিকে চাহিতে লাগিল। গৃহবাসীরা ব্যাপার কী বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া বংশীধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু কেহ কাহারও নিকট সদুত্তর পাইল না। অবশেষে একটি বৃদ্ধ চটি পায়ে দিয়া পায়জামার উপর একটা ভারি ওভারকোট চাপাইয়া ফটাফট শব্দে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ইন্সপেক্টর কুট্সকে পুলিশ-হুইসল মুখে গুঁজিয়া নিস্তব্ধ রাজপথে দণ্ডায়মান দেখিয়া বৃদ্ধ বিস্মিত হইলেন, কুট্সকে বলিলেন,—কোনও বিভ্রাট ঘটিয়াছে কি? আমি চিকিৎসক; যদি প্রয়োজন হয়—তাহা হইলে আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আপনারা বিচারপতি সোয়েনের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন যে! হ্যাঁ, উহা মিঃ সোয়েনেরই বাড়ি। বুড়া জজ পেনশন লইয়া বহুদিন হইতে এই বাড়িতেই বাস করিতেছেন। আমি অনেকবার তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছি; তিনি অসুস্থ হইলে মধ্যে-মধ্যে আমাকে ডাকাইতেন। বুড়া মানুষ, ইদানিং প্রায়ই অসুখে ভুগিতেছেন।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—আপনারই রোগী? দুঃখের বিষয় আপনাকে আর তিনি ডাকিবেন না; আর তাঁহার চিকিৎসাও আপনাকে করিতে হইবে না।

ডাক্তার বিস্ফারিত নেত্রে ইন্সপেক্টর কুট্সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—অর্থাৎ?

ইন্সপেক্টর কুট্স নির্বিকারভাবে বলিলেন,—অর্থাৎ তিনি শিঙা ফুঁকিয়াছেন; কিন্তু আমি যেভাবে শিঙা ফুঁকিতেছি—এভাবে নয়। তিনি এখন আরও বড় বিচারপতির আদালতের আসামী। আপনি তো তাঁহার চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার চিকিৎসা করিতেন বলিলেন; তাঁহার হৃদযন্ত্র কি দুর্বল ছিল?

ডাক্তার বলিলেন,—হ্যাঁ মহাশয়, তাঁহার হৃদযন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল হইয়াছিল। বয়স খুব বেশি হইয়াছিল কি না। হঠাৎ মারা পড়িবেন—আশ্চর্য কী?

ইন্সপেক্টর কুট্স মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সাইনস বোধহয় সত্য কথাই বলিয়াছিল। কিন্তু বিচারপতি সোয়েন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকিলেও তাঁহার মৃত্যুর জন্য নরপিশাচ সাইনসই দায়ী; হত্যার অপরাধ তাহারই ঘাড়ে চাপিয়াছে। সাইনস তাঁহাকে হাতে না মারিলেও তাহার হুমকিতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এ-অঞ্চলের পুলিশের সন্ধান নাই কেন? সব বেটা পাহারাওয়ালাই মরিয়াছে না কি? না, সকলেই নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে? বিচারপতির বাড়ির টেলিফোনটা কোথায় আছে বলিতে পারো?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাঁহার হল-ঘরে আছে—দেখিয়া আসিয়াছি। তিনি সেই ডাক্তারটিকে সঙ্গে লইয়া পুনর্বার বিচারপতির বাসভবনে প্রবেশ করিলেন; ইন্সপেক্টর কুট্স নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। ইন্সপেক্টর কুট্স টেলিফোনের রিসিভার লইয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। মিঃ ব্লেক বৈদ্যুতিক দীপের একটা ফানুস সংগ্রহ করিয়া তাহার সাহায্যে পূর্বোক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ আলোকিত করিলেন।

অতঃপর ডাক্তার বিচারপতি সোয়েনের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—দেহে আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই, আমার মতে বিচারপতি সোয়েন হৃদরোগেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সম্ভবত তিনি হঠাৎ মনে ভয়ঙ্কর আঘাত পাইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—সম্ভব বটে; পল সাইনসকে হঠাৎ সম্মুখে দেখিলে ভয়েই প্রাণত্যাগ করে—এরূপ লোকের সংখ্যা অল্প নহে।

কুট্স সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—বীটে একজনও কনস্টেবল উপস্থিত নাই; কারণ এদিকে যত পাহারাওয়ালা ছিল—সকলকেই কোনও জরুরি কার্যে স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইয়াছে। সেই জরুরি কাজটা কী বুঝিয়াছ ব্লেক? স্থানীয় পুলিশ সংবাদ পাইয়াছিল—পল সাইনস আজ রাত্রে এই অঞ্চলে আসিয়া লুকাইয়াছিল; কিন্তু তাহারা ঠিক বাড়ি

শনাক্ত করিতে না পারিয়া সিডেনহাম হিলের এক বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়াছিল; সুতরাং তাহারা পল সাইনসের সন্ধান পায় নাই। সেই বাড়িতে জনমানবের সমাগম ছিল না, একদম খালি বাড়ি।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনসকে সেই বাড়িতে পাওয়া যাইবে—এ-সংবাদ পুলিশ কোথায় পাইয়াছিল?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতেই না কি এই সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল—অথচ আমি পূর্বে তাহা জানিতে পারি নাই। আমি রাত্রি এগারোটার সময় ইয়ার্ড হইতে তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম, তখনও পর্যন্ত পল সাইনস সম্বন্ধে কোনও সংবাদ ইয়ার্ডে প্রেরিত হয় নাই। সে সময় ইয়ার্ডে একজন ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, তাহারই উপর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভার ছিল; সুতরাং এই সংবাদ সে ভিন্ন অন্য কেহ পাঠাইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মুহূর্ত পরে একখানি মোটর-গাড়ির ইঞ্জিনের ঘস-ঘস শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—এই পথে মোটরে কে আসিতেছে সন্ধান লইতে পারো?

কিন্তু ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে পথ পর্যন্ত যাইতে হইল না; মোটরখানি বিচারপতি সোয়েনের গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর একজন সার্জেন্ট ও দুইজন কনস্টেবল সহ সেই মোটর হইতে নামিয়া বিচারপতির অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন! তাঁহাদিগকে দেখিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌স নবাগত ইন্সপেক্টরকে বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যুসংক্রান্ত সকল কথা বলিলেন; তাঁহারা কী উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পল সাইনস কী উপায়ে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা শুনিয়া স্থানীয় ইন্সপেক্টর মিঃ কুট্‌সকে বলিলেন,—আমরা পল সাইনসেরই সন্ধানে আসিয়া অনর্থক হয়রান হইয়াছি—ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। সে যে এই লালকুঠিতে আসিয়া এরূপ ভীষণ কাণ্ড করিয়া গিয়াছে—ইহা কি একবারও কল্পনা করিতে পারিয়াছিলাম? পল সাইনসের পলায়নের পূর্বে যদি আমি সদলে এখানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ নিশ্চয়ই তাহাকে ধরা পড়িতে হইত। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে উপদেশ পাইলাম—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বাধা দিয়া বলিলেন,—আপনি কোন সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কী উপদেশ পাইয়াছিলেন?

স্থানীয় ইন্সপেক্টর বলিলেন,—রাত্রি বারোটা বাজিবার আট মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ-ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী টেলিফোনে আমাকে জ্ঞাপন করেন, আজ রাত্রে সিডেনহাম হিল পল্লীর একখানি বাড়িতে পল সাইনস লুকাইয়া থাকিবে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংবাদে নির্ভর করিয়া তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন—আমি যেন আমার থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাগুলিকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হই এবং সেই বাড়ি ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাশ আরম্ভ করি। কিন্তু আমার সকল শ্রমই বিফল হইল; কারণ সেই বাড়ি খালি পড়িয়াছিল। গত দুইমাসের মধ্যে সেই বাড়িতে কোনও লোক প্রবেশ করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আপনাকে ভুল সংবাদ দিয়া অনর্থক হয়রান করা হইয়াছে—এ-কথা আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে রিপোর্ট করিয়াছেন?

স্থানীয় ইন্সপেক্টর বলিলেন,—না, তাহার অবসর পাই নাই। আমি মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে সে-কথা জানাইতে উদ্যত হইয়াছি, ঠিক সেই সময় আপনি টেলিফোনে আমাকে আহ্বান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া আপনার সহিত দেখা করিতে আসিতেছি। এখানে আসিবার সময় আমার থানার সার্জেন্টকে বলিয়া আসিয়াছি—সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নৈশ-কর্মচারীকে আমাদের খানাতল্লাশির সংবাদ জ্ঞাপন করিবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—আমিই স্বয়ং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া যাহা বলিতে হয় বলিব। পল সাইনসের আবির্ভাব সম্বন্ধে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে আপনি যে-সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা যে সম্পূর্ণ অমূলক ইহা তো বলা যায় না—কেবল বাড়ি ভুল হইয়াছিল। যাহা হউক, স্কটল্যান্ড

ইয়ার্ড এ-সংবাদ কোথায় পাইয়াছিল—তাহাই আমি সর্বাগ্রে জানিতে চাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন; কিন্তু দুই-একমিনিট তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তিনি বিরক্তিভরে রিসিভারটা নামাইয়া রাখিলেন এবং ব্যাকুলভাবে গোঁফ টানিতে-টানিতে স্থানীয় ইন্সপেক্টরের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কোনও কথা বলিতে পারিলাম না। বোধহয় 'লাইন' খারাপ হইয়াছে; কিন্তু অপারেটর তাহা স্বীকার করিল না। আমরা আপনাদের সঙ্গে থানায় যাইব—ইন্সপেক্টর! আপনি একজন সার্জেন্টের উপর এই বাড়ির ভার দিয়া যাইতে পারেন। আজ রাত্রে এখানে আমাদের আর কিছুই করিবার নাই; পল সাইনস এতক্ষণ বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বেনসন বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু সম্বন্ধে যে-অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছি—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পল সাইনস সেইরাত্রির মতো কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেইরাত্রে সে আর কোনও স্থানে কোনওরূপ অত্যাচার উৎপীড়ন করিবে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিলেন না; কিন্তু তাঁহার সন্দেহ হইল—সে আরও নানাপ্রকার ফন্দি লইয়াই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছে এবং নূতন করিয়া যখন পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছে—তখন বিচারপতি সোয়েনের অপমৃত্যুতেই তাহার সকল চেষ্টার নিবৃত্তি হইবে না। সে সংবাদ-পত্রের সাহায্যে যে-দম্ভ প্রকাশ করিয়াছিল—বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যুতেই যে তাহার অবসান হইয়াছে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

বিচারপতি সোয়েনের মৃত্যু হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যদি হৃদরোগেই তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকে —তাহা হইলে পল সাইনসের শত্রুধ্বংসজনিত এই বিজয় তাহার পৌরুষ বা শক্তির পরিচায়ক নহে; তাহার একজন প্রধান শত্রুর আকস্মিক মৃত্যুতে তাহার যে-বিজয়লাভ হইল, তাহা শোণিতপাত-রহিত রণজয়—ইহা বুঝিয়া সে সন্তোষ লাভ করিতে পারিবে না। ডলউইচ পল্লীর লালকুঠি নামক ভবনে উপস্থিত হইয়া সে যে-সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের ও মিঃ ব্লেকের জীবন যে-ভাবে বিপন্ন করিয়াছিল, তাহাতে বাধা দেওয়ার জন্য পুলিশ কোনও চেষ্টা করিতে পারে নাই; কিন্তু সেজন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে অপরাধী করা সঙ্গত নহে। পরদিন সকালে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিবর্গ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইয়া যে-সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশের অক্ষমতা ও কলঙ্ক প্রচার-ভয়ে যে-সকল কথা তাহাদের নিকট গোপন করিতে বাধ্য হইবে—তাহা বিচারপতি সোয়েনের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ অপেক্ষা অনেক অধিক লোমহর্ষণ ও ভীষণতর ঘটনায় পূর্ণ—এইরূপই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল!

মিঃ ব্লেক এইসকল কথা চিন্তা করিয়া ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—পল সাইনস যদি আমাকে ও তোমাকে বিচারপতি সোয়েনের অনুসরণে পাঠাইতে পারিত তাহা হইলে সেই সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশের যোগ্য হইত বটে, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ সে-সংবাদ সংবাদ-পত্রসমূহের প্রতিনিধিগণের নিকট গোপন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেন। এ-অবস্থায় পল সাইনস কী উদ্দেশ্যে সংবাদ-পত্রে ওইরূপ স্পর্ধাপূর্ণ বাণী প্রচারিত করিয়াছিল—তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না! তবে এ-কথা সত্য যে, এখন হইতে আগামী-কল্য বেলা নয়টা পর্যন্ত এরূপ কোনও কার্য ঘটিতেও পারে—যাহার বিবরণ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড জনসাধারণের নিকট গোপন করাই সঙ্গত মনে করিবে।

অতঃপর মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত স্থানীয় ইন্সপেক্টর রোসির মোটরে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। মোটরখানি তাঁহাদিগকে লইয়া নিস্তব্ধ রাজপথ দিয়া সবেগে ধাবিত হইল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স মানসিক উত্তেজনা দমন করিতে না পারিয়া গোঁফ ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন! তিনি তাড়াতাড়ি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেইরাত্রে পল সাইনসের সহিত তাঁহাদের সঙ্ঘর্ষণ-কাহিনী কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্যই তাঁহার আগ্রহ হইয়াছিল এরূপ নহে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী পল সাইনসের গতিবিধির সংবাদ কীরূপে জানিতে পারিল —

তাহা জানিবার জন্যও তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাদের গতিরোধ হইল এবং তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে যে বিলম্ব হইল তাহা যেমন আকস্মিক সেইরূপ বিস্ময়াবহ। সহসা পুলিশ হুইসলের তীব্রস্বরে নিস্তব্ধ নৈশ-প্রকৃতি ঝঙ্কারিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি পথের একপাশ হইতে পথের মধ্যস্থলে লাফাইয়া পড়িল! সেই লোকটি পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া ট্যাক্সি থামাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল।

ট্যাক্সির মাথার সম্মুখে যে দুইটি উজ্জ্বল আলো ছিল তাহা সম্মুখস্থ পথের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করিতেছিল; মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীগণ সেই আলোকে পথিমধ্যবর্তী আগন্তুককে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—সে পুলিশ কনস্টেবল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান ও বিবর্ণ। তাঁহারা তাহার মস্তকে শিরস্ত্রাণ দেখিতে পাইলেন না; তাহার পরিচ্ছদ ধূলি-ধূসর ও স্থানে স্থানে কর্দমাক্ত! তাহার অবস্থা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—সে কোনও কারণে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনায় গাড়ি থামাইতে ইঙ্গিত করিতেছিল।

ট্যাক্সি পূর্ণবেগে চলিতেছিল, ট্যাক্সিচালক তাহাকে দেখিয়া গাড়ি থামাইবার চেষ্টা করিবার পূর্বেই সে সবেগে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—থামাও, গাড়ি থামাও; রাজার দোহাই দাঁড়াও!

ইন্সপেক্টর রোসি গাড়ির ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া সেই কনস্টেবলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিলেন,—কী সর্বনাশ! ও যে আমারই থানার কনস্টেবল কাইলী! ব্যাপার কী?

ট্যাক্সি অচল হইলে ইন্সপেক্টর রোসি কনস্টেবলটিকে বলিলেন,—খবর কী কাইলী? তোমার এরূপ দুর্গতির কারণ কী?

কাইলী স্খলিত পদে ঘুরিয়া পড়িতে-পড়িতে ট্যাক্সির দরজার হাতল দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাড়িতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কোনওরকমে সামলাইয়া লইল; সে তাহার উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরকে সেই গাড়িতে দেখিয়া কতকটা আশ্বস্ত হইল এবং আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিল,—ডাকাতি, কর্তা! ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা মেট্রপলিটান ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা লুঠ করিয়া চম্পট দিয়াছে। তাহারা ব্যাঙ্কের লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা ট্যাক্সিতে চড়িয়া ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল। ট্যাক্সিতে দুইজন ডাকাত—।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কনস্টেবলের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—কী বলিলে? দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে চাপিয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল? পল সাইনস ও তাহার অনুচরের কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি এই প্রশ্ন করিলেন।

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ হুজুর! দুইজন ডাকাত ট্যাক্সিতে ছিল; আর-একজন ট্যাক্সি চালাইতেছিল—সে-ও ডাকাত কি না বলিতে পারি না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—ডাকাত দুটোর চেহারা কীরূপ লক্ষ্য করিয়াছিলে কি?

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ, তাহাদের চেহারা দেখিয়াছিলাম। দুজনেরই চেহারা। আমি রোঁদে বাহির হইয়া ব্যাঙ্কের কোণে আসিয়া তাহাদের ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়াছিলাম; তাহা তখন ব্যাঙ্কের বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল! তত রাত্রে ব্যাঙ্কের সম্মুখে ট্যাক্সি দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইল, ট্যাক্সির আরোহীরা হাওয়া খাইতে আসিয়া ওখানে ট্যাক্সি দাঁড় করায় নাই, উহাদের মতলব খারাপ। আমি দৌড়াইয়া ট্যাক্সির কাছে চলিলাম; কিন্তু ট্যাক্সির কাছে আসিতে না-আসিতে দুইজন লোক ব্যাঙ্ক হইতে বাহির হইয়া ট্যাক্সির দিকে দৌড়াইয়া গেল। তাহারা দুজনে চামড়ার একটা ব্যাগ বহিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা ট্যাক্সিতে উঠিয়া ব্যাগটা ভিতরে ফেলিবামাত্র ট্যাক্সিচালক আমাকে দেখিয়াই ট্যাক্সি চালাইয়া দিল!

আমি ট্যাক্সি থামাইবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলাম, ট্যাক্সির গতিরোধ করিবার জন্য

পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দুই হাত উর্ধ্বে তুলিলাম; কিন্তু তাহারা লুঠ করিয়া পলাইতেছিল—আমার কথা শুনিবে কেন? আমার ঘাড়ের উপর গাড়ি তুলিয়া দেওয়ার উপক্রম করিল! আমি গাড়ি-চাপা পড়ি দেখিয়া একলাফে ট্যাক্সির ফুটবোর্ডে উঠিয়া দুই হাতে দরজা চাপিয়া ধরিলাম; ট্যাক্সির আরোহী দুজনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—দুই বেটারই ছোকরাটে চেহারা। আমাকে ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটা ডাকাত পকেট হইতে লোহার ডাণ্ডা কি হাতুড়ি কি ওইরকম আর কিছু—বাহির করিয়া আমার মাথায় খুব জোরে এক ঘা মারিল। উঃ, মনে হইল মাথায় আমার বজ্রাঘাত হইল! তাহার পর কী হইল—আমার স্মরণ নাই। যখন আমার জ্ঞান হইল—তখন আস্তে-আস্তে ঘাড়ে হাত দিয়া বুঝিতে পারিলাম ঘাড় ভাঙে নাই বটে, কিন্তু পড়িয়া কপাল ফুলিয়া উঠিয়াছে। পথের ধূলায় ও কাদায় পোশাকের এই অবস্থা হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া পথের দিকে চাহিলাম—কিন্তু ট্যাক্সিখানা তখন নিরুদেশ।

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কোথায়? তিনি কি ব্যাঙ্কের বাড়িতে রাত্রিবাস করেন না?

কনস্টেবল বলিল,—হ্যাঁ, তিনি ব্যাঙ্কের বাড়িতেই বাস করেন বটে, কিন্তু যে-সময় দস্যুরা ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছিল—সেইসময় তিনি ঘুমাইতেছিলেন। ডাকাত দুটো ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙিলেও তাঁহার ঘুম ভাঙাইতে পারে নাই! অবশেষে আমার হুইসলে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে; তিনি ব্যাঙ্কে আসিয়া এখন টেলিফোনে থানায় সংবাদ পাঠাইতেছেন।

ইন্সপেক্টর কুট্স অস্ফুটস্বরে বলিলেন,—ট্যাক্সিতে দুজন লোক ছিল, তবে কি পল সাইনস ও তাহার সঙ্গীই এই কর্ম করিয়া গিয়াছে! কিন্তু ডাকাত দুটো যে দেখিতে অল্পবয়স্ক; কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না! তিনি ইন্সপেক্টর রোসি ও মিঃ ব্লেকের সহিত ব্যাঙ্কের অট্টালিকায় প্রবেশ করিলেন। অট্টালিকার দ্বার খোলা ছিল; তাঁহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতেই একটা উগ্র গন্ধ পাইলেন। ব্যাঙ্কের সিন্দুক ভাঙিবার জন্য যে-বিস্ফোরক ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার তীব্রগন্ধী বাষ্প তখনও সেই কক্ষের বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

ইন্সপেক্টর কটস চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—ব্লেক, ইহা তো পল সাইনসের কাজ বলিয়া মনে হয় না। সে যখন লালকুঠি হইতে পলায়ন করে, তখন সিন্দুক ভাঙিবার কোনও উপকরণ তাহার সঙ্গে ছিল কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহার অথবা তাহার অনুচরের সঙ্গে উহা ছিল কি না তাহা আমাদের অজ্ঞাত; কিন্তু ইহাই প্রধান কথা নহে। যদি কনস্টেবলটার কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে সাইনস বা তাহার অনুচর এই ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সাইনসের যে অনুচর লালকুঠিতে আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহার চেহারা ছোকরার মতো নহে; আর সাইনসের বয়স তো ষাট বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহার মাথার একটি চুলও কালো নাই।

ব্যাঙ্কের ভিতর ডাকাতির বহু চিহ্ন বর্তমান। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা বিরাজিত। বিভিন্ন আলমারি ও কাবোর্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন; তাঁহার পরিধানে নৈশ পরিচ্ছদ, পায়ে চটি-জুতা। বিশৃঙ্খল কেশগুলি তাঁহার ললাট আচ্ছাদিত করিয়াছিল; তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু আতঙ্ক-বিস্ফারিত।

ম্যানেজার ইন্সপেক্টর রোসি ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন,—মহাশয়, এ-অতি ভীষণ ব্যাপার! কোষাগারের দ্বার উড়াইয়া দিয়া ডাকাতেরা সিন্দুক ভাঙিয়া সিন্দুকের সমস্ত টাকাই লুঠ করিয়াছে। কাল যখন সিন্দুক বন্ধ করিয়াছিলাম—তখন ত্রিশ হাজার পাউন্ডেরও অধিক অর্থ সিন্দুকে গচ্ছিত ছিল। দস্যুরা বোধহয় শেষ পেনিটি পর্যন্ত লুঠ করিয়াছে!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—তবে কি আপনি এখনও সিন্দুকটি পরীক্ষা করেন নাই?

ম্যানেজার বলিলেন,—না, পুলিশের অনুপস্থিতিতে সিন্দুকে হাত দেওয়া সঙ্গত মনে করি

নাই। আপনাদের প্রতীক্ষায় বিলম্ব করিতেছিলাম; এখন তাহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

মিঃ ব্লেক কোষাগারের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—কোনও বহুদর্শী দস্যু ভিন্ন অন্য কেহ তাহা সেভাবে ভাঙিতে পারিত না। কোষাগারের ইস্পাতনির্মিত দ্বার খুলিয়া একখানি কব্জায় ঝুলিতেছিল এবং তাহার একপাশ ভাঙিয়া ঠেলিয়া বাহির হইয়াছিল। দস্যু কোষাগারের ভিতর প্রবেশ করিয়া সিন্দুকটি সাধারণ টিনের ক্যানেস্তারের মতো ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল। ভাঙা সিন্দুকের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সভয়ে আর্তনাদ করিলেন। সিন্দুকের ভিতর হইতে গিনি, নোট প্রভৃতি সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছিল। খোলা সিন্দুক খালি পড়িয়াছিল।

ম্যানেজার হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—সর্বনাশ হইয়াছে, শেষ পেনিটি পর্যন্ত লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে! দস্যুরা নোটে ও নগদে একত্রিশ হাজার চারিশত পাউন্ড আত্মসাৎ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—একত্রিশ হাজার চারিশত পাউন্ড বলিতেছেন কেন? বলুন, একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং। কেমন, আমার কথা কি সত্য নহে? এ-মন্দ দাঁও নয়; কিন্তু পল সাইনসের ন্যায় দস্যুর পক্ষে ইহা 'সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য'!

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সিন্দুক হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল তাহার ঠিক পরিমাণ তিনি কীরূপে জানিলেন? এই বিপুল অর্থরাশি যে পল সাইনস কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে—ইহাই বা তিনি কীরূপে বুঝিলেন?

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—পল সাইনস! এই ব্যাপারের সহিত আপনি পল সাইনসকে জড়াইতেছেন কেন? সে ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়াছে—আপনি কি ইহার কোনও প্রমাণ পাইয়াছেন?

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আপনি কীরূপে জানিলেন—আমাদের সিন্দুক হইতে ঠিক একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং লুঠ হইয়াছে? দস্যু ও তাহার সহচর ভিন্ন বাহিরের অন্য কোনও লোকের তো এ-সংবাদ জানিবার উপায় নাই।

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া ভাঙা সিন্দুকের ঊর্ধ্বস্থিত দেওয়ালে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, ইন্সপেক্টর কুট্‌স, ইন্সপেক্টর রোসি প্রভৃতি সকলেই একসঙ্গে সেই দেওয়ালের সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহারা সেই স্থানে দেখিলেন—নীলবর্ণ চা-খড়ি দিয়া মোটা-মোটা অক্ষরে লিখিত ছিল—

একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড, দশ শিলিং
পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।

সপ্তম প্রসঙ্গ ঃ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্কট

ইন্সপেক্টর কুট্‌স দেওয়ালের গায়ে চা-খড়ির সেই লেখাটি পাঠ করিয়া একবার সশব্দে নাক ঝাড়িলেন, তাহার পর মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন,—এই লুণ্ঠন-ব্যাপারের সহিত সাইনসের কী সম্বন্ধ তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না! আমরা যে-ট্যাক্সিতে বিচারপতি সোয়েনের বাসভবন লালকুঠিতে আসিয়াছিলাম—পল সাইনস সেই ট্যাক্সি লইয়া পলায়ন করিয়াছে, ইহা আমাদের জানা আছে; কিন্তু সে দস্যুবৃত্তির এইসকল সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল—ইহা আমাদের অজ্ঞাত; বিশেষত, সিন্দুক ভাঙিবার জন্য যে-গ্যাসের চোঙ ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা একজন লোকের পক্ষে দুর্বহ।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—দেওয়ালে চা-খড়ি দিয়া যাহা লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে

পারা যায়—পল সাইনস স্বয়ং এখানে লুঠ করিতে আসে নাই; দেখুন লেখা আছে—'একত্রিশ হাজার চারিশত আটাশ পাউন্ড দশ শিলিং পল সাইনসের অনুকূলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইল।' সুতরাং ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে—পল সাইনসের অভিপ্রায় অনুসারে লুঠ হইলেও, তাহার দুইজন অনুচর ডাকাতি করিতে আসিয়াছিল, সে স্বয়ং এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিল না।

বীটের কনস্টেবল তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল,—আমি আমার বীটে উপস্থিত থাকিলে সেই দুইজন দস্যু ডাকাতি করিতে পারিত না। আজ রাত্রে সিডেনহাম হিলের একটা বাড়ি খানাতল্লাশ করিবার জন্য আমাদের থানার সকল কনস্টেবলকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে এবং লোকাভাবে আমাকে একাকী দুই বীটের কাজ চালাইতে হইবে—এ-সংবাদ ওই দুইজন ডাকাত বোধহয় পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—কিন্তু সেই খানাতল্লাশি নিতান্তই নিরর্থক হইয়াছিল। পল সাইনস এই অঞ্চলে থাকিলেও সে সিডেনহাম হিলের এক মাইলের ভিতর কোনও বাড়িতে ছিল না। আজ রাত্রে এই অঞ্চলের পুলিশ কোনও জরুরি কার্যে ব্যস্ত থাকিবে এবং প্রত্যেক বীটে পাহারাওয়ালার অভাব হইবে, এ-সংবাদ পল সাইনস পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—সাইনস এ-সংবাদ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল—ইহা কী করিয়া বিশ্বাস করি? ইন্সপেক্টর রোসি রাত্রি বারোটা বাজিবার আট মিনিট মাত্র পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই এই ডাকাতির ষড়যন্ত্র শেষ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর রোসিকে বলিলেন,—আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে যে-সংবাদ পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য তো?

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সত্য। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে আমাদের থানা পর্যন্ত টেলিফোনের যে স্বতন্ত্র তার আছে, সেই তারের সাহায্যেই ওই সংবাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। এমনকী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যে-কর্মচারী টেলিফোনে ওই সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিল—তাহাকেও আমি চিনি। তাহার নাম ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—হ্যাঁ, আপনার এ-কথা সত্যই বটে; গত রাত্রে এগারোটার পূর্বে আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে বাহিরে যাই নাই। তাহার পর আমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পরিত্যাগ করিবার সময় জানিতে পারি—ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন অবশিষ্ট রাত্রির জন্য অফিসের ভার পাইয়াছিল; আগামী-কল্য বেলা আটটা পর্যন্ত অফিসের সকল ভার তাহারই উপর ন্যস্ত থাকিবে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—তাহা হইলে তুমি প্রথমে যাহা স্থির করিয়াছিলে—তাহাই করো। পল সাইনস আজ রাত্রে সিডেনহাম হিলের কোনও বাড়িতে লুকাইয়া থাকিবে—এ-সংবাদ সার্জেন্ট সিবর্ন কীরূপে জানিতে পারিয়াছিল তাহাই তাহাকে সর্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। সে ইন্সপেক্টর রোসিকে সিডেনহাম হিলের সেই বাড়ি ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাশের জন্য টেলিফোনে উপদেশ পাঠাইয়াছিল; কাহার প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া সে এই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছিল—তাহা জানিতে না পারিলে কোনও ফল হইবে না।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ও মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর রোসির সহিত তাঁহার গাড়িতে থানায় উপস্থিত হইলেন; ইন্সপেক্টর রোসি তাঁহাদিগকে লইয়া অফিসঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন থানার সার্জেন্ট একজন কনস্টেবলের সহিত ব্যগ্রভাবে কী কথা কহিতে ছিল।

সার্জেন্ট ইন্সপেক্টর রোসিকে দেখিয়া আগ্রহভরে বলিল,—আজ রাত্রে আমাদের এই বিভাগে যেন ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইয়াছে। মেট্রপলিটান ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা-ব্যাঙ্কে আজ রাত্রে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সন্ডার্স এবং আর দুইজন কনস্টেবল সেখানে তদন্তে গিয়াছে।

ইন্সপেক্টর রোসি অবজ্ঞাভরে হাসিয়া বলিলেন,—চোর পলাইয়াছে দেখিয়া তাহাদের বুদ্ধি বাড়িয়া যাইবে। আমরা সেই ব্যাঙ্ক হইতেই ফিরিয়া আসিতেছি। সিডেনহাম হিলের যে বাড়িতে

খানাতল্লাশি করিবার কথা ছিল—সেই বাড়ির খানাতল্লাশি সম্বন্ধে তুমি কি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে।

সার্জেন্ট বলিল,—হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কোনও উত্তর পাইলাম না! আমি পাঁচ-সাতবার সাড়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কেহই সাড়া দিল না।

ইন্সপেক্টর কুট্স বলিলেন,—কেহই সাড়া দিল না? এ যে বড়ই অদ্ভুত কথা! রাত্রে যাহার উপর অফিসের ভার আছে, সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য; হ্যাঁ, যে হউক একজন উত্তর দিবেই। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের লাইন কোথায়?

ইন্সপেক্টর কুট্স দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইয়া টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইলেন। তিনি কয়েক মিনিট ধরিয়া হাঁকাহাঁকি করিলেন, কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে তিনি মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! কাহারও সাড়া পাইতেছি না, কেহ উত্তর দিতেছে না! ইহার কারণ কী? টেলিফোনের লাইন খারাপ হইয়াছে বলিয়াও তো মনে হয় না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—অন্য লাইনের চেষ্টা করিয়া দেখো। সাধারণ লাইন দিয়া সাড়া লও। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই থানা পর্যন্ত টেলিফোনের যে পৃথক লাইন আছে—তাহার কোথাও কোনও দোষ হইয়া থাকিতে পারে।

ইন্সপেক্টর কুট্স সাধারণ লাইনের সাহায্যে টেলিফোনে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ফল সেই যথাপূর্বং তথাপরম্! কেহই কোনও কথা বলিল না। অবশেষে তিনি হতাশভাবে রিসিভার ত্যাগ করিলেন; তিনি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—না, বৃথা চেষ্টা! আমি কাহারও সাড়া পাইলাম না; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে জনপ্রাণীও নাই, এইরূপ ভাব! অথচ লাইনের কোনও খুঁত নাই। অপারেটর আমাকে বলিল, সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের ঝনঝনি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছে, অথচ সকলেই নির্বাক! এ যে কী রহস্য—তাহা বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু রকম-সকম ভালো বলিয়া আমার মনে হইতেছে না! ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন নিশ্চয়ই অফিসে আছে; কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া দূরের কথা, সাড়া পর্যন্ত দিতেছে না—ইহার কারণ কী ব্লেক! তোমার কী অনুমান?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—আমি কিছুই অনুমান করিতে পারিলাম না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া সাড়া পাওয়া যায় না, সকলে মৃতবৎ অসাড়, ইহা খুব তাজ্জবের কথা বটে!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—সার্জেন্ট সিবর্ন নিশ্চয়ই ওখানে আছে; কিন্তু সে সাড়া না দেওয়ায় মনে হইতেছে—সে হয়তো হঠাৎ অসুস্থ হইয়াছে, উত্থানশক্তিরহিত। কিন্তু ইহাও তো আমার অনুমান মাত্র। এই অনুমান সত্য হউক, মিথ্যা হউক, ব্যাপার সহজ নহে। সদর হইতে যদি সংবাদ পাওয়া না যায়—তাহা হইলে কাজ চলিবে কীরূপে? বড়ই বিভ্রাটের কথা। আজ রাত্রে পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন, ঘটনাচক্র সকল দিকেই তাহার অনুকূল!

পল সাইনসের ভাগ্য প্রসন্ন—রোসির এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন; সত্যই কি ইহা তাহার সৌভাগ্যের ফল? স্থানীয় পুলিশ সাইনসের সন্ধানে সিডেনহাম হিলে খানাতল্লাশ করিতে চলিল, সেই সুযোগে সাইনস ডলউইচ গ্রামে বিচারপতি সোয়েনের গৃহে উপস্থিত হইল; তাহার দলের অন্যান্য দস্যুরা ঠিক সময় থানার প্রায় পাঁচশত গজ দূরবর্তী ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করিল, অথচ সে-সময় থানায় একজন কনস্টেবল রহিল না! —ইহা কি পল সাইনসের কোনও ষড়যন্ত্রের ফল? না তাহার সৌভাগ্যবশতই এতগুলি সুযোগ একসঙ্গে জুটিয়া গেল—ইহাই মিঃ ব্লেক চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইন্সপেক্টর রোসি সেইরাত্রে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে যে-ভুল সংবাদ পাইয়া সদলে সিডেনহাম হিল পল্লীতে পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন, সেই সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিবার কারণ কী—তাহা জানিবার জন্য স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে পুনঃ-পুনঃ ডাকিয়াও

সাড়া পাইলেন না! এজন্য তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু অতঃপর কী করা উচিত তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

রবার্ট ব্লেক অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া ইন্সপেক্টর রোসিকে বলিলেন,—আপনি অন্য কোনও থানায় সন্ধান লইয়া দেখুন। স্ট্রেথামের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করুন —স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে ডাকিয়া তিনি কোনও কথা জানিতে পারিয়াছেন, কি না।

ইন্সপেক্টর রোসি স্ট্রেথাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আহ্বান করিবার জন্য ফোনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন; তিনি মুহূর্ত-পরেই স্ট্রেথামের থানা হইতে সাড়া পাইলেন বটে, কিন্তু যে-উত্তর পাইলেন—তাহা যে তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই, ইহা মিঃ ব্লেক তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিতেন।

কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টর রোসি মিঃ ব্লেককে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—এ বড়ই বিষম ব্যাপার মিঃ ব্লেক! স্ট্রেথামের ইন্সপেক্টর বলিলেন—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে টেলিফোন করিয়া তিনিও কোনও সাড়া পান নাই; আধঘণ্টা ধরিয়া বৃথা হাঁকাহাঁকি করিয়াছেন! আরও এক অদ্ভুত সংবাদ পাইলাম; আমাদের মতো উহাদিগকেও অনর্থক বুনোহাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বুনোহাঁসের পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে—এ-কথার অর্থ কী ইন্সপেক্টর!

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—স্ট্রেথামের ইন্সপেক্টর আজ রাত্রি বারোটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়াছিলেন—পল সাইনস আজ রাত্রে 'স্ট্রেথাম কমনের' উত্তরাংশে অবস্থিত একটি বাড়িতে লুকাইয়া ছিল। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইন্সপেক্টর তাঁহার থানার সমস্ত কনস্টেবল লইয়া সেই বাড়ি ঘিরিয়া বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পল সাইনসের সন্ধান পান নাই। তাঁহাকে হতাশভাবে থানায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাই শেষ সংবাদ নহে; ইন্সপেক্টর যখন স্ট্রেথামের সেই বাড়িতে পল সাইনসের সন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনজন দস্যু স্ট্রেথাম হিলের একটি ব্যাঙ্ক হইতে পনেরো হাজার পাউন্ড লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে! সেই তিনজন দস্যু একখানি ট্যাক্সি লইয়া লুঠ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা চলিয়া যাইবার সময় পল সাইনসের নামের একখানি কার্ড ব্যাঙ্কে ফেলিয়া গিয়াছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ইন্সপেক্টর রোসির কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিলেন,—কী সর্বনাশ! এ যে অতি ভয়ানক কথা! কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিশ্চয়ই ওইরূপ সংবাদ স্ট্রেথামের থানায় পাঠাইতে পারে না। সে আপনাকে জানাইল—আজ রাত্রে পল সাইনস সিডেনহাম হিলের এক বাড়িতে লুকাইয়া আছে; সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনি উপদেশ পাইলেন, আবার সেইসময় স্ট্রেথাম থানার ইন্সপেক্টর তাহার নিকট হইতে ওইরূপ সংবাদ জানিতে পারিলেন; তাঁহাকেও সদলে স্ট্রেথামের সেই বাড়িতে উপস্থিত হইয়া পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করা হইল। আপনারা উভয়েই এই আদেশ পালন করিতে গিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন; ওদিকে আপনারা সকল পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া পল সাইনসকে ধরিতে যাইবার পর উভয় স্থানেরই ব্যাঙ্ক লুঠ হইল! ইহা নিশ্চয়ই পল সাইনসের ষড়যন্ত্রের ফল! আমার বিশ্বাস, পল সাইনস কোনও কৌশলে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের টেলিফোনের তার হস্তগত করিয়া আপনাদের নিকট সেই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়াছিল; সেই সংবাদে নির্ভর করিয়া আপনারা স্ব-স্ব থানার সমস্ত পাহারাওয়ালাদের জুটাইয়া লইয়া সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাহার দলস্থ দস্যুরা উক্ত উভয় ব্যাঙ্ক লুঠ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু উজ্জ্বল হইল; তিনি অধীরভাবে বলিলেন, —কেবল কি দুটি ব্যাঙ্ক? পল সাইনস যদি এইরূপ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহার অনুচরবর্গ দ্বারা দুইটি ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করাইতে পারে, তাহা হইলে লন্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা ব্যাঙ্কেও কি সে ওইভাবে লুণ্ঠন করাইতে পারে না? যদি দুইটি থানায় ওই মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করা তাহার পক্ষে সুসাধ্য

হইয়া থাকে—তাহা হইলে সে কি লন্ডনের বিভিন্ন অংশের কুড়িটা থানায় ওইরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সফল করিতে পারে নাই?

ইন্সপেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া হতাশভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন,—কী সর্বনাশ! ব্লেক তুমি বলিতেছ কী? না, না, তোমার এই অনুমান নিশ্চয়ই সত্য নহে। ইন্সপেক্টর রোসি বলিয়াছেন—সার্জেন্ট সিবর্ন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে টেলিফোনে উহাকে সংবাদ দিয়াছিল। সার্জেন্ট সিবর্নের উপদেশ উনি অবশ্য-পালনীয় বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন।

ইন্সপেক্টর রোসি বলিলেন,—হ্যাঁ, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সার্জেন্ট সিবর্নের নিকট হইতে টেলিফোনে ওইরূপ উপদেশই পাইয়াছিলাম এ-কথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি। আমি নানা উপলক্ষে অসংখ্যবার টেলিফোনে তাহার সহিত আলাপ করিয়াছি। পল সাইনস আমাকে কৌশলে প্রতারিত করিয়াছে—এ-কথা বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ সার্জেন্ট সিবর্ন আমাকে সাঙ্কেতিক ভাষায় উপদেশ প্রেরণ করিয়াছিল, সেই ভাষা পল সাইনসের বা বাহিরের কোনও লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—সে-কথা সত্য; কিন্তু আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও টেলিফোনে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সাড়া পাইতেছেন না, ইহা কি সন্দেহজনক নহে? যাহা হউক, এখানে আর বিলম্ব করিয়া কোনও ফল নাই। ইন্সপেক্টর রোসি, আমি আপনার ট্যাক্সি লইয়া এখান হইতে সোজা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে যাইতে চাহি; সেখানে না যাইলে এই রহস্যভেদের আশা নাই। কুট্‌স, তুমিও আমার সঙ্গে চলো। আমরা অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, অথচ কিছুই জানিতে পারিলাম না!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ইন্সপেক্টর রোসির ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে মিঃ ব্লেক স্বয়ং সেই গাড়ি চালাইতে লাগিলেন। ট্যাক্সি বন্দুকের গুলির মতো সবেগে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অভিমুখে ধাবিত হইল।

তখন রাত্রি অবসান-প্রায়; পল্লীপথ নিস্তব্ধ ও নির্জন। সম্মুখে কোনও বাধা না পাওয়ায় ট্যাক্সি বিভিন্ন পথ অতিক্রম করিয়া পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক অবাধে ব্রিক্সটনে উপস্থিত হইয়া ব্রিক্সটনের থানার অদূরে হঠাৎ ট্যাক্সি থামাইতে বাধ্য হইলেন, কারণ একদল পুলিশ-কনস্টেবল তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক সম্মুখের পথ রুদ্ধ দেখিয়া ট্যাক্সির ব্রেক করিয়া গাড়ি থামাইলেন; সঙ্গে-সঙ্গে একজন সার্জেন্ট গাড়ির পা-দানে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা কী উদ্দেশ্যে কোথা হইতে কোন স্থানে যাইতেছেন—তাহাও জানিতে চাহিল।

মিঃ ব্লেক ও ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই সার্জেন্টের নিকট জানিতে পারিলেন—রাত্রি বারোটা বাজিবার কয়েক মিনিট পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে ব্রিক্সটনের থানার ইন্সপেক্টরকে টেলিফোনে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল—ব্রিক্সটনের একার লেনের একটি বাড়িতে পল সাইনস লুকাইয়া আছে—এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; অতএব ব্রিক্সটন থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টরকে তাঁহার এলাকার সমুদয় পুলিশ কনস্টেবল সহ একার লেনে গমন করিয়া সেই অট্টালিকা ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে এবং সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিয়া পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। ব্রিক্সটন থানার ইন্সপেক্টর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড হইতে এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার এলাকার সমস্ত কনস্টেবল ও পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে লইয়া একার লেনের সেই বাড়ি খানাতল্লাশ করিতে গিয়াছিলেন; সেই সুযোগে কয়েকজন দস্যু ব্রিক্সটনের প্রধান রাজপথে অবস্থিত ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা সিন্দুক ভাঙিয়া নগদ কুড়ি হাজার পাউন্ড লুঠ করিয়াছে। এইসকল দস্যু পল সাইনসের অনুচর তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ব্রিক্সটন থানার সার্জেন্টের নিকট এইসকল কথা শুনিয়া বিচলিতস্বরে বলিলেন,—সাইনস ইভনিং নিউজে যে স্পর্ধাপূর্ণ পত্র প্রকাশিত করিয়াছে—সেই পত্রের উদ্দেশ্য এখন বুঝিতে পারা যাইতেছে! কাল সকালে বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে

আসিয়া আজ রাত্রির সকল সংবাদ জানিবার জন্য মহা কোলাহল আরম্ভ করিবে। আমরা কীভাবে প্রতারিত ও অপদস্থ হইয়াছি—ইহা তাহারা জানিতে পারিলে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না; জনসমাজে আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। এ-সকল কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করা কি সঙ্গ ত হইবে?

মিঃ ব্লেক কোনও মতামত প্রকাশ না করিয়া পুনর্বার চলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি চঞ্চল চিত্তে অদূরবর্তী আলোকিত ট্রাম-লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—তাঁহারা তখনও পর্যন্ত চরম দুঃসংবাদ জানিতে পারেন নাই। পল সাইনস টেলিফোনে লন্ডনের শহরতলীর কয়েকটি থানায় মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ করাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে এই কার্য কঠিন হয় নাই। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের শক্তি ও সম্ভ্রমে কঠোর দণ্ডাঘাত করিবার জন্য যে-ভয়-প্রদর্শন করিয়াছিল তাহার পরিণাম যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ—তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহা মিঃ ব্লেক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ওয়েস্টমিনস্টার সাঁকোর সম্মুখীন হইল। নদীর অন্য তীরে সুবিখ্যাত বিগবেন নামক ঘড়ির সমুন্নত সৌধ-চূড়া তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে সমুদ্ভাসিত হইল। সেই সৌধ-শিখর হইতে উজ্জ্বল বিদ্যুতালোক বিকীর্ণ হইতেছিল দেখিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন—পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় তখনও কাজ চলিতেছিল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে উপস্থিত হইতে পারিব। তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বোমা মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিল। সেই স্তব্ধ রাত্রে সেই শব্দ যেন শত কামান-নির্ঘোষবৎ প্রতীয়মান হইল। সেই ট্যাক্সির চাকার নিচের পথ সেই মহাশব্দে কাঁপিয়া উঠিয়া যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল এবং সঙ্গে-সঙ্গে অত্যুজ্জ্বল লোহিতানলের লেলিহান জিহ্বা আকাশের একপ্রান্ত লেহন করিতে-করিতে সবেগে নৃত্য করিতে লাগিল!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেই উজ্জ্বল আলোকরাশির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে ভগ্নস্বরে বলিলেন,—ও কী ব্যাপার ব্লেক! কী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড! চলো, শীঘ্র চলো, ওদিকে আগুন লাগিল কোথায়?

মিঃ ব্লেক কোনও কথা না বলিয়া দন্ত দন্তে নিষ্পেষিত করিয়া সবেগে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ পার হইলেন। ট্যাক্সি ক্রমশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সমীপবর্তী হইল। ইন্সপেক্টর কুট্‌স সেইদিকে চাহিয়া বিহ্বলস্বরে বলিলেন,—সর্বনাশ হইয়াছে ব্লেক! ওই দেখ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগুন লাগিয়াছে। উঃ, কী ভীষণ কাণ্ড! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডেই বোমা ফাটিয়াছে, বোমার আগুনে চতুর্দিক ধূ-ধূ করিয়া জ্বলিতেছে! উঃ, কী ভীষণ হৃদয়-বিদারক দুর্ঘটনা!

মিঃ ব্লেক নদী পার হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সেই বিরাট বিশাল হর্ম্যশ্রেণী[illegible]দিকে চাহিয়া তাঁহার বক্ষের শোণিত-স্রোত যেন স্তম্ভিত হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌সের অনুমান সত্য। তাঁহারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নিকট অগ্রসর হইয়া যে ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন—তাহা হইতে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না। শোণিতের ন্যায় সুলোহিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সৌধ-শিরে সশব্দে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল এবং সেই আলোকে আকাশের বহুদূর পর্যন্ত উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের মনে যে আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল তাহা তিনি ইন্সপেক্টর কুট্‌সের নিকট প্রকাশ করিবার পূর্বেই তাঁহার ট্যাক্সির ইঞ্জিন হঠাৎ ভস্-ভস্ শব্দ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল; পরমুহূর্তেই ট্যাক্সি অচল হইল, আর একইঞ্চিও তাহার নড়িবার সামর্থ্য রহিল না।

মিঃ ব্লেক বিরক্তিসূচক হুঙ্কার করিয়া পেট্রল ট্যাঙ্কে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাহার পর ইন্সপেক্টর কুট্‌সকে বলিলেন,—না, জুস-ট্যাঙ্ক শুকাইয়া খটখটে হইয়াছে। নামিয়া চলো কুট্‌স। এই অচল গাড়িতে

পুতুলের মতো বসিয়া থাকিয়া কোনও ফল নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন, তাহার পর সেতুর উপর দিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা বাঁধের উপর উঠিবার পূর্বেই ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ির ঘণ্টার ঢন-ঢন শব্দ ও পুলিশ-হুইসলের তীব্র ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

তখনও পূর্বাকাশ উষালোকে রঞ্জিত হয় নাই; কিন্তু রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। সেই অসময়েও নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অদূরে বাঁধের উপর বহু লোকের সমাগম দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। ক্যানন-রোর ফাঁড়ি হইতে কনস্টেবলেরা দলে-দলে বাহির হইয়া স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অগ্নিকাণ্ড দেখিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই বাঁধ অসংখ্য নর-নারীতে পূর্ণ হইল এবং বাঁধের উপর যেন নরমুণ্ডের স্রোত চলিতে লাগিল। তখন চতুর্দিক হইতে সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় কোলাহল উত্থিত হইল। সমাগত নগরবাসীরা সকল শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল; পুলিশ কোনওদিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারিল না। অগ্নিকাণ্ডের ভীষণতা দর্শনে সকলেই উন্মত্তবৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ বলিতেছিল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর রক্ষা পায় না; উঃ, কী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড!

আর-একজন উত্তেজিতস্বরে বলিল, খামকা রক্ষা পাইবে? স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ছাদে আগুন! ওই প্রকাণ্ড বাড়িটা হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িবে; আর উহার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

আর একজন বলিল,—চোর-ডাকাত-খুনি-বাটপাড়দেরই মজা! এতদিনে তাহাদের পুলিশের ভয় দূর হইল। পথেঘাটে যখন তখন লুঠ চলিবে। দেখো-দেখো, কী জোরে আগুন জ্বলিতেছে! যেন কেন হাজার হাউই একসঙ্গে আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছে! হ্যাঁ, আগুন বটে!

এইরূপ মন্তব্য সর্বত্রই শুনিতে পাওয়া গেল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স এইসকল মন্তব্য শুনিতে শুনিতে ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুকষ্টে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দেউড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহু সংখ্যক উর্দিধারী পুলিশ কর্মচারী সেইস্থানে দলবদ্ধ হইয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে! তাহাদের সর্বাগ্রে একজন ইন্সপেক্টর; তিনি রুদ্ধদ্বারে সজোরে ধাক্কা দিতেছিলেন। দেউড়ি ভিতর হইতে বন্ধ!

ইন্সপেক্টর কুট্‌স জনতা ভেদ করিয়া সেই ইন্সপেক্টরের পাশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ইন্সপেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,—এই যে মিঃ কুট্‌স! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার—দেখিতেছেন তো? কিছুকাল পূর্বে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে বোমা ফাটিয়াছে, তাহার পরেই এই অগ্নিকাণ্ড। ইয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডাকাডাকি করিয়া তাহার কোনও সাড়া পাইতেছি না। দেউড়ি বন্ধ, ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বলিলেন,—বড়সাহেবকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে?

অন্য ইন্সপেক্টর বলিলেন,—হ্যাঁ, তাঁহাকে ও সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানারকে অবিলম্বে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। দেউড়ির চাবি সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানারের কাছেই আছে বোধহয়।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স ভগ্নস্বরে বলিলেন,—ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্নের উপর অফিসের ভার আছে; তাহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! সে বেচারা আগুনে পুড়িয়া মরিল না কি? ব্লেক, তোমার কীরূপ অনুমান? তাহার সাড়া নাই; এ যে বড়ই ভয়ানক কথা!

মিঃ ব্লেক ইন্সপেক্টর কুট্‌সের পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন; তিনি ভারী গলায় বলিলেন,—সর্বনাশের আর বাকি কী?

মুহূর্তপরে একখানি স্টিমার ঢং-ঢং শব্দ করিতে-করিতে বাঁধের নিচে আসিয়া থামিল। তাহা দেখিয়া বাঁধের জনতা দুই পাশে সরিয়া গিয়া ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্মচারীদের পথ ছাড়িয়া দিল। ফায়ার-ইঞ্জিনের কর্মচারীর দল স্টিমার হইতে নিচে নামিয়া তাহাদের হাতিয়ার সহ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সদর

দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

পিতল-নির্মিত শিরস্ত্রাণমণ্ডিত এইসকল কর্মঠ ফায়ার-ব্রিগেড-কর্মচারী যখন দলবদ্ধ হইয়া কোনও স্থানে আগুন নিবাইতে যায়—তখন সেইসকল বাড়ি-ঘরের প্রতি তাহাদের মায়া-মমতা থাকে না; দরিদ্রের কুটির হইতে রাজপ্রাসাদ সকলই তাহারা সমান তুচ্ছ মনে করে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সেই সুবিশাল প্রাসাদতুল্য হর্ম্য তাহারা শহরতলীর একটা সাধারণ বাগানবাড়ি অপেক্ষা বিন্দুমাত্র অধিক মূল্যবান পদার্থ বলিয়া মনে করিল না। তাহারা প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড সুতীক্ষ্ণ কুঠার মাথার উপর তুলিয়া দরজার কপাট-চৌকাটে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে দ্বার খণ্ড-খণ্ড হইয়া মাটিতে পড়িল। দুই মিনিটের মধ্যে অর্গলরুদ্ধ সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় দ্বারের চিহ্নমাত্র রহিল না। তীক্ষ্ণধার কুঠারের আঘাতে মুহূর্তমধ্যে চিচিং-ফাঁক!

অনন্তর ফায়ার-ব্রিগেডের দল অগ্নি-নির্বাপণোপযোগী রাসায়নিক উপাদানসমূহ সঙ্গে লইয়া জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় সবেগে সেই বিশাল সৌধে প্রবেশ করিল। তাহারা নিচের তলায় ধূম অথবা অগ্নি-জিহ্বা দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিল—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের 'মটকায়' আগুন লাগিয়াছে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স অনেক বাজে লোককে ফায়ার-ব্রিগেডের দলে মিশিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন,—তফাৎ! বাজে লোক সব তফাৎ যাও; কেবল আগুন নিবাইবার কর্মচারী ছাড়া অন্য কাহারও ভিতরে যাওয়া নিষেধ। বড়সাহেব যতক্ষণ না আসেন—ততক্ষণ অন্য লোক সব বাহিরে থাক।

মিঃ ব্লেক সেই ভাঙা দরজার একপাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন; তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষুতে নিরাশার চিহ্ন পরিস্ফুট। এই আকস্মিক আঘাত এতই ভীষণ, এরূপ সুতীব্র যে, তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; ইহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে যেন তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। বহুকাল পূর্বে ফিনিয়ানদের দাঙ্গার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পর এ-পর্যন্ত আর কখনও এরূপ ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হয় নাই। ইহার পরিণাম কীরূপ শোচনীয় হইতে পারে—তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত হইলে লন্ডনের পুলিশ-ফৌজ নিরাশ্রয় হইবে। যেখানে যত থানা আছে পুলিশের সদর আড্ডার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সকল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তারগুলি বিধ্বস্ত হওয়ায় বহির্জগতের সহিত তাহার সংবাদ আদান-প্রদান রহিত হইবে। বেতারের যন্ত্রাদি চূর্ণ হওয়ায় তাহার কার্যকারিতা নষ্ট হইবে। ফৌজদারির আসামীদের অপরাধসংক্রান্ত নথিপত্রগুলি এবং অঙ্গুলি-চিহ্নের খাতাপত্রগুলি বিলুপ্ত হইলে পুনর্বার তাহা সংগ্রহ করিবারও উপায় থাকিবে না; সুতরাং বহু বৎসরের বহু পরিশ্রমে সংগৃহীত দলিলপত্র সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে। দেশের প্রত্যেক অপরাধী আনন্দে নৃত্য করিবে। আইনের শক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে এবং পুরাতন অপরাধীর দল আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া মহা-উৎসাহে দলবদ্ধ হইবে। তাহারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা-কল্যাণ সমস্তই অচিরে পদদলিত করিয়া সমগ্র দেশে ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিবে। দেশের সেই ভয়ানক অবস্থার কথা চিন্তা করিতেও মিঃ ব্লেকের লোমহর্ষণ হইল।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স হঠাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া হতাশভাবে জড়িতস্বরে বলিলেন,—ব্লেক, তুমি কি বলিবে এই ভীষণ সর্বনাশের জন্য নরপিশাচ সাইনস দায়ী? সে ভয় প্রদর্শন করিয়া যে-পত্র লিখিয়াছিল—তাহার মর্ম তো তোমার স্মরণ আছে। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিল; এখন দেখিতেছি তাহার—।

ইন্সপেক্টরের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক প্রচণ্ডবেগে মাথা নাড়িয়া এভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন যে, ইন্সপেক্টর কুট্‌সের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, কথাগুলি আর শেষপর্যন্ত বলা হইল না। মিঃ ব্লেক কোনও কথা বলিতে পারিলেন না; তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই ভীষণ পৈশাচিক কাণ্ডের জন্য পল সাইনসই দায়ী, তাহার দম্ভ ব্যর্থ হয় নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার

মনের কথা প্রকাশ করিতে সাহস করিলেন না। সে অন্য যে-সকল অপকর্ম করিয়াছিল, তাহা তাহার অসাধ্য নহে—ইহা তিনি জানিতেন; কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সে কী কৌশলে বিধ্বস্ত করিবার ব্যবস্থা করিল—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; এরূপ ভীষণ কাণ্ড তাঁহার কল্পনারও অতীত!

ফায়ার-ব্রিগেডের কাপ্তেন দ্রুতবেগে হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন; ধূমে তাঁহার মূর্তি কালো হইয়াছিল, আগুনের উত্তাপে তাঁহার চোখ-মুখ ঝলসাইয়া গিয়াছিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—অগ্নিনির্বাপণের উপকরণগুলি ফুরাইয়া গিয়াছে; এখন আরও চাই। উপরের তলায় বোমা ফাটিয়াছিল; তাহার পর অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল। এরূপ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড জীবনে আর কখনও দেখি নাই! আমরা যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিভাইতে পারি বটে, কিন্তু আপনাদের বেতারের যন্ত্রাদি রক্ষা পাইবে না। নানারকম কল ও যন্ত্রাদি বিভিন্ন কক্ষে খাটাইয়া রাখা হইয়াছে—সেগুলি নষ্ট হইবে।

ইন্সপেক্টর কুট্‌স বিহ্বলস্বরে বলিলেন,—এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কী, বলিতে পারেন? আকস্মিক দুর্ঘটনা?

কাপ্তেন বলিলেন,—আকস্মিক দুর্ঘটনা? অসম্ভব! কেহ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিবার দুরভিসন্ধিতেই এই কাজ করিয়াছে—এ-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থে নির্মিত বোমা দ্বারা, বা কোনও প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কলের সাহায্যে অর্ধেক ছাদ ভাঙিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আপনারা আমার সঙ্গে আসিতে পারেন, কিন্তু অন্য কাহাকেও এখন ভিতরে আসিতে দিবেন না।

একখানি সুবৃহৎ মোটরকার দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র লন্ডন পুলিশের চীফ কমিশনর সার হেনরি ফেয়ারফক্স ও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার সেই গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িলেন; তাহার পর ইন্সপেক্টর কুট্‌সের সহিত তাঁহাদের আলাপ চলিতে লাগিল। সার হেনরি যেন খেপিয়া উঠিয়াছিলেন; তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল কেহ ভুবড়িতে আগুন দিয়াছে। কিন্তু ফায়ার-ব্রিগেডের চেষ্টায় অগ্নিরাশি নির্বাপিত হইল; কেবল ছাদ হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূম্রকুণ্ডলী ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বায়ু-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ফায়ার-ব্রিগেডের যথাসাধ্য চেষ্টায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডে যে-ক্ষতি হইল—শীঘ্র তাহার পরিপূরণের সম্ভাবনা রহিল না। বহু সুদক্ষ ও দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন প্রতিভাবান কর্মচারীর দীর্ঘকালের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে যে-শৃঙ্খলা, যে-অনিন্দনীয় কার্যপদ্ধতি ধীরে-ধীরে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা যেন পিশাচের এক ফুৎকারে শূন্যে বিলীন হইল।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার মাথা নাড়িয়া বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে বলিলেন,—দৈব-দুর্ঘটনা, আলবৎ ইহা দৈব-দুর্ঘটনা; নতুবা এত স্থান থাকিতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের চূড়ায় আগুন লাগিবে কেন? সার্জেন্ট সিবর্ন কোথায়? আজ রাত্রে তাহার উপর অফিসের ভার ছিল যে! এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সে যাহা জানে, তাহাই সর্বাগ্রে শুনিতে হইবে।

সার হেনরি বলিলেন,—ঠিক, সিবর্ন কোথায়? তাহাকে এখানে দেখিতেছি না কেন?

তখন বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল,—সিবর্ন কোথায়? সার্জেন্ট সিবর্ন কোথায় গিয়াছে?

কেহই সার্জেন্ট সিবর্নের সন্ধান করিতে পারিল না। অবশেষে ক্যানন থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর সার হেনরির সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,—রাত্রে আপনার সঙ্গেই তো সকলের শেষে তাহার দেখা হইয়াছিল, মহাশয়! গত রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় আপনি এখানে আসিয়াছিলেন; তখন সার্জেন্ট সিবর্নের উপরেই অফিসের ভার ছিল।

সার হেনরি বিস্মিতভাবে বলিলেন,—তোমার এ-কথার মর্ম বুঝিতে পারিলাম না ইন্সপেক্টর। কাল রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় আমি এখানে আসি নাই; অথচ সে-সময় তুমি আমাকে এখানে দেখিয়াছিলে। নেশা করিয়াছিলে না কি?

ইন্সপেক্টর সার হেনরির তাড়া খাইয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু গোঁ ছাড়িলেন না; তিনি

বলিলেন,—কনস্টেবল হেনিস কোথায়? হেনিস, এদিকে এসো।

একজন কনস্টেবল সার হেনরির সম্মুখে আসিয়া যথানিয়মে তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল; তাহার পর বিনীতস্বরে বলিল,—হুজুরকে কাল রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় এখানে আসিতে দেখিয়াছিলাম। হুজুর এখন যে-গাড়িতে আসিয়াছেন—ওই গাড়িতেই আসিয়াছিলেন। গাড়ি যখন দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করে তখন আমি গাড়ির নম্বর দেখিয়াছিলাম; তাহা ওই নম্বরেরই গাড়ি। ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন দেউড়ি খুলিয়া দিলে হুজুর ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নিজের চক্ষুকে কী করিয়া অবিশ্বাস করি হুজুর?

স্যার হেনরি উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,—কনস্টেবলের মাথা খারাপ হইয়াছে। কাল রাত্রি নয়টার সময় আমি এখান হইতে বাড়ি গিয়াছিলাম; সমস্ত রাত্রি বাড়িতেই ছিলাম। এখান হইতে টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দেওয়ার পূর্বে আমি বাড়ির বাহিরে আসি নাই; অথচ তুমি বলিতেছ আমাকে আমার গাড়িতে এখানে আসিতে দেখিয়াছিলে। অসম্ভব। তুমি পাগলের মতো কথা বলিতেছ কনস্টেবল।

কনস্টেবল হেনিস দৃঢ়তার সহিত বলিল,—হুজুর আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া গালি দিতে পারেন, নিজের চক্ষুকে তো অবিশ্বাস করিতে পারি না। আপনি আপনার গাড়িতে ঠিক আসিয়াছিলেন; হ্যাঁ, আপনাকেই দেখিয়াছিলাম। হুজুর ভিন্ন আর কে ওই সময় অফিসে আসিবে? বিশেষত ওই গাড়ি—।

সার হেনরি বিরক্তিভরে বলিলেন,—থামো তুমি! আমার গাড়ি সারারাত্রি গ্যারেজে ছিল। তোমার কোনও কথা শুনিতে চাহি না; তুমি ঠিক খেপিয়া গিয়াছ। তোমাকে আমি বরখাস্ত করিব কনস্টেবল! —সিবর্ন কোথায়? তাহাকে শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস, কী একটা গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে। আমি সর্বাগ্রে সার্জেন্ট সিবর্নের কৈফিয়ৎ চাই। কোথায় সে? এই মুহূর্তে তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির করো সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার বলিলেন,—সে বোধহয় এখনও টেলিফোনের কামরায় আছে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলে সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিলেন; ধূমের গন্ধ তখনও দ্বিতলের বায়ুস্তরে পরিব্যাপ্ত ছিল। সেই গন্ধের সহিত নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের উগ্রগন্ধ মিশিয়া তাঁহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার টেলিফোনের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা দিলেন; কিন্তু দ্বার খুলিল না। তিনি অধীরভাবে বলিলেন,—এ কী! দরজা যে ভিতর হইতে বন্ধ? তিনি দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিতেই কপাটের মাথায় ছিটকিনিটা ঘুরিয়া নামিয়া পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল।

সেই কক্ষে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। সার্জেন্ট সিবর্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সম্মুখে একখানি চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু তাহার মাথা একপাশে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তাহার স্বচ্ছ সুনীল চক্ষুর দৃষ্টিতে জীবনের লক্ষণ ছিল না।

সার্জেন্ট সিবর্নের মুখের দিকে চাহিয়া সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার বিচলিতস্বরে বলিলেন,—দেহে প্রাণ নাই! হ্যাঁ, সিবর্নের মৃত্যু হইয়াছে। এ কী শোচনীয় দুর্ঘটনা!

চেয়ারের পাশে একটি ক্ষুদ্র শিশি পড়িয়াছিল। সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার শিশিটা তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিলেন; শিশিতে কিছুই ছিল না, কিন্তু তখনও গন্ধ ছিল। তিনি তাহার ঘ্রাণ লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পটাসিয়াম সায়ানাইড! আত্মহত্যা বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে! কিন্তু সিবর্ন কী দুঃখে আত্মহত্যা করিল? এ কী রহস্য?

মিঃ ব্রেকের মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর, চক্ষুতে দুশ্চিন্তা ঘনীভূত। সিবর্ন কীজন্য সাড়া দেয় নাই, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাহার আত্মহত্যার কারণ তখনও পর্যন্ত কেহ জানিতে পারিলেন না।

সার্জেন্ট সিবর্নের সম্মুখে রিপোর্ট-বহি খোলা ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট ট্যানার তাহা তুলিয়া লইলে তাহাতে কী লেখা ছিল—তাহা দেখিবার জন্য অন্য সকলেই সেই খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়েক দফা মন্তব্য সন্নিবিষ্ট দেখিলেন ঃ

সংবাদ-পত্রে সংবাদ পাঠাইতে হইবে—

'ডলউইচ গ্রামস্থিত লালকুঠিতে মিঃ জাস্টিস সোয়েনের আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু।'

'রাত্রি বারোটা হইতে দুইটার মধ্যে লন্ডনের শহরতলীর কয়েকটি ব্যাঙ্ক লুঠ, এবং সেইসকল ব্যাঙ্ক হইতে দুই লক্ষাধিক পাউন্ড অপহৃত।'

'রাত্রি দুইটার সময় বোমা দ্বারা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্তপ্রায়!'

এই সকল বিভিন্ন কার্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার পল সাইনস স্বয়ং গ্রহণ করিতেছেন; কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তাহাদের এই শোচনীয় পরাজয় ও হীনতার নিদর্শনসূচক এইসকল সংবাদ সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতে কখনও সাহস করিবে না। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই সকল সংবাদ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে, পল সাইনস প্রত্যেক সংবাদের বিস্তারিত বিবরণ জনসাধারণের অবগতির জন্য আগামী-কল্য বেলা নয়টার সময় সংবাদ-পত্র-সমূহে পাঠাইবেন।

পল সাইনস এই মন্তব্যগুলি রিপোর্ট-বহিতে স্বহস্তে লিখিয়া তাহার নিচে নাম-স্বাক্ষর করিয়াছিল।

এই মন্তব্যগুলি পাঠ করিয়া সকলেই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা জানিতে পারিলেন—পল সাইনস সার হেনরির ছদ্মবেশে রাত্রিকালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আসিয়া ইহা বিধ্বস্ত করিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিল।

সার হেনরি ফেয়ারফক্স মুখ চুন করিয়া বিষাদভরে বলিলেন,—কিন্তু সার্জেন্ট সিবর্ন কী কারণে পল সাইনসকে এইসকল কুকার্যে সাহায্য করিতেছিল? অবশেষে সে আত্মহত্যাই বা করিল কেন?

মিঃ ব্লেক সার্জেন্ট সিবর্নের মৃতদেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার বাঁ-হাতের আস্তিন বাহুমূল পর্যন্ত ঠেলিয়া তুলিলেন। তাহার বাহুর ঠিক নিচেই উল্কি দ্বারা নেকড়ের মুণ্ড অঙ্কিত ছিল—তাহা সকলেই দেখিতে পাইলেন।

ডিটেকটিভ সার্জেন্ট সিবর্ন সাইনসের সাত পুত্রের অন্যতম। সে তাহার পিতার আদেশ পালন করিয়া, বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আত্মহত্যা করিয়াছিল।

এইরূপে পল সাইনস জয়লাভ করিল। সে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বিধ্বস্ত করিয়া দেশের জনসাধারণকে আতঙ্কে অভিভূত করিবে বলিয়া যে-প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা আংশিকভাবে পূর্ণ হইল। আইনের শক্তি এইভাবে সে স্তম্ভিত করিল। সে যে পুলিশের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

রাত্রি তিনটার সময় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দীপালোকগুলি পুনঃ প্রজ্বলিত হইল। সার হেনরি ফেয়ারফক্স তাঁহার খাস-কামরায় মন্ত্রণা-সভা আহূত করিলেন। অতঃপর কী কর্তব্য, তাহাই নির্ধারণের জন্য এই পরামর্শ-সভার অধিবেশন। পুলিশ-ফৌজ মোটরে চাপিয়া নগরের ও শহরতলীর বিভিন্ন পথে সবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুনর্বার কোনও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত না হয়—সে দিকে তাহাদের দৃষ্টি রহিল। শহরতলীর বিভিন্ন অংশ হইতে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-লুঠের সংবাদ আসিতে লাগিল।

সার হেনরি ফেয়ারফক্স গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—পল সাইনস আজ যেভাবে জয়লাভ করিয়াছে, অপরাধের ইতিহাসে ইহা অতুলনীয়! তাহার আশ্রিত দস্যুদল আজ লন্ডনের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত যে-ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা আমাদের পরাজয়েরই চূড়ান্ত নিদর্শন। আমাদের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এই অফিসে বসিয়াই সে এইসকল অপকর্ম সংশাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই স্থানে আসিয়াই সে বিভিন্ন থানায় মিথ্যা সংবাদ প্রচাবিত করিয়াছিল। পল সাইনস কোনও পল্লীর

নির্দিষ্ট অট্টালিকায় লুকাইয়া আছে—এই মিথ্যা সংবাদ পাঠাইয়া সে প্রত্যেক থানার কর্মচারীদের ওইসকল বাড়ি খানাতল্লাশ করিতে আদেশ করিয়াছিল। থানার কর্মচারী ও পাহারাওয়ালারা এইভাবে এক-একস্থানে সদলে আবদ্ধ থাকায়—সাইনসের অনুচরেরা অরক্ষিত নগরের ব্যাঙ্কগুলি নির্বিঘ্নে লুঠ করিয়াছিল, তাহাদের লুণ্ঠনে কোথাও কেহ বাধা দিতে পারে নাই। জনসাধারণ যখন এইসকল সংবাদ জানিতে পারিবে—তখন আমাদের অবস্থা কীরূপ শোচনীয় হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল সংবাদ—আমাদের এই পরাজয়-কাহিনী গোপন রাখিবার উপায় নাই। না, কোনও উপায় নাই। আমি এইসকল সংবাদ চাপিয়া রাখিতে সাহস করি না। একজন লোক কীভাবে আমাদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করিল, আমাদের বিপুল শক্তি বিফল করিল—এ-সংবাদ প্রকাশিত হইলে সমগ্র জগৎ কী মনে করিবে? কী করিয়া আমরা জনসমাজে মুখ দেখাইব? দেশের লোক আর কি আমাদের বিশ্বাস করিবে? বিপদে আমাদের শক্তিতে নির্ভর করিতে পারিবে? কিন্তু উপায় নাই, এ-সকল সংবাদ প্রকাশিত করিতেই হইবে।

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিয়া বলিলেন,—আপনি ব্যাকুল হইবেন না সার হেনরি। এই পরাজয়ের পরও আমরা জয়লাভ করিতে পারিব—এ-আশা আপনি ত্যাগ করিবেন না।

সার হেনরি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া হতাশভাবে বলিলেন,—আবার জয়লাভ! এই শোচনীয় পরাজয়ের পর জয়লাভের স্বপ্ন দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি—তত উৎসাহ আমার নাই মিঃ ব্লেক!

সকলেই ব্যাকুলভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের ঘড়ির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—এখন রাত্রি তিনটা। আর পাঁচ ঘণ্টার পূর্বে সংবাদ-পত্রে এইসকল অপ্রীতিকর সংবাদ প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না; অর্থাৎ বেলা আটটা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টা সময় এখনও আপনার হাতে আছে। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অনেক অসম্ভব কার্য সংঘটিত হইতে পারে।

সার হেনরি বলিলেন,—অর্থাৎ? কীরূপ অসম্ভব কার্য সংঘটিত হইতে পারে বলিতেছেন মিঃ ব্লেক?

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—পল সাইনসকে গ্রেপ্তার করা।

অনন্তর তিনি উঠিয়া টুপি লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—আমার আর এখানে বসিয়া থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে চলিবে না; আমি চলিলাম। কিন্তু আপনার নিকট পাঁচ ঘণ্টা সময় চাহিতেছি; এই পাঁচ ঘণ্টার পর—বেলা আটটার সময় পল সাইনসকে বাঁধিয়া আনিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিব।

মিঃ ব্লেক প্রস্থান করিলেন। সকলেই স্তব্ধভাবে সেই কক্ষে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে ইন্সপেক্টর কুট্স মাথা তুলিয়া সশব্দে নাক ঝাড়িলেন। তাহার পর ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—ব্লেকের মাথা খারাপ হইয়াছে। আহা, ভাবিয়া-ভাবিয়াই বেচারা খেপিয়া গেল!

নিদারুণ পরাজয়ে সকলেই 'লজ্জানম্র নতশির'। কেবল মিঃ ব্লেক এই দুঃসময়ে একাকী পল সাইনসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন।

মিঃ ব্লেকের এই অঙ্গীকারের কোনও মূল্য আছে কি না দেখিবার জন্য আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি। আশাকরি, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ ও কৌতূহলও অল্প নহে। জানি না, কতদিন পরে লন্ডন হইতে এই সংবাদ পাওয়া যাইবে।

মায়াবী

পাঁচকড়ি দে

বিজ্ঞাপন

'মায়াবী' যে-সময়ে বাহির হইবার কথা ছিল, তাহার অনেক পরে বাহির হইল। এজন্য অনেকেই যে আমার উপরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা যে আমি বুঝি নাই, এমন নহে। এমনকী, এক বৎসরের মধ্যে 'মায়াবী'র জন্য প্রায় সহস্রাধিক গ্রাহকের আগ্রহপূর্ণ পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেহ-কেহ দুই-তিনবার করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও 'মায়াবী' প্রকাশের এই অযথাবিলম্বে তাঁহারা যে বিরক্ত হইয়াছেন, সেজন্য আমি দুঃখিত এবং তাঁহাদের নিকটে অপরাধী রহিলাম।

আশা করি, আমার সহৃদয় অনুগ্রাহক পাঠক মহাশয়দিগের নিকটে আমার অদ্যকার এই ক্ষুদ্র উপহার উপেক্ষিত হইবে না।

গ্রন্থকার

উপক্রমণিকা

সর্পিণী—পদদলিতা

Mel. No, curse me,

Thy curse would blast me less than thy forgiveness.

Pauline. (laughing wildly) * * * *

O fool ! O dupe—wretch ! —I see it all—
The by-word and the jeer of every tongue
In Lyons. Hast thou in thy heart one touch
Of human kindnes?

LYTTON
"The Lady of Lyons"
Act III Scene II.

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নদীতটে

মোহিনী ক্রমে আকুল হইয়া উঠিল। মোহিনী দিন-রাত কাহার কথা ভাবে, মোহিনী নির্জনে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে, মোহিনী কাঁদিবার সময়ে বুকে করাঘাত করে এবং দুই হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়িতে যায়। কখনও বা মোহিনী কাঁদিতে-কাঁদিতে হাসে, আবার হাসিতে-হাসিতে কাঁদে; মোহিনী পাগল হইয়াছে, অথবা হইতে বসিয়াছে; মোহিনীর আর সে-বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নাই; মোহিনীতে মোহিনী আর নাই। মোহিনীর এত দুঃখ কিসের? বলিতেছি।

অন্ধকার রাত্রি—পোহাইতে আর বড় বিলম্ব নাই। অনেকক্ষণ পূর্বে একবার বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে; তথাপি এখনও সমস্ত আকাশ মেঘ করিয়া রহিয়াছে, গগন ব্যাপিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইতেছে; দেখিয়া বোধহয়, আর-একপশলা না ঢালিয়া এক পা নড়িতেছে না। দুই-একটি রবের জন্য এই নীরব রজনীকে একেবারে নীরব-নিস্তব্ধ বলিতে পারা যায় না; সম্মুখস্থ নদীটির কলকলনাদ—নিরন্তর; নদীতীরস্থ লক্ষ ঝিল্লির সমবেত আর্তনাদ—(আর্তনাদই বটে!) ইহাও নিরন্তর; নীড়স্থ বিনিদ্র কোনও পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ—কদাচিৎ; পার্শ্ববর্তী লোকালয় হইতে কোনও নিদ্রোত্থিত শিশুর করুণ ক্রন্দন—ক্বচিৎ; অনতিদূরস্থ কুক্কুর-রব—ইহাও ক্বচিৎ। নদীবক্ষে তরঙ্গে-তরঙ্গে যে-মেঘের ছায়া ও অন্ধকার একসঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, তটে বসিয়া এক ব্যক্তি সেইদিকে অন্যমনে চাহিয়া ছিল। তখন মেঘের সঙ্গে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া অন্ধকারময় নদীবক্ষ আরও মসীময় করিয়া তুলিতেছিল। বায়ু নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য এক-একবার অল্প-স্বল্প চেষ্টা করিতেছিল—চেষ্টা মাত্র।

নদীতটস্থ লোকটির পশ্চাতে, কিছুদূরে মোহিনী শাণিত ছুরিকা-হস্তে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতেছিল; এবং পিশাচীর চোখের মতো তাহার চোখ দুইটা উল্কাপিণ্ডবৎ, সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বড় ভয়ানক জ্বলিতেছিল।

যখন মোহিনী প্রায় তাহার নিকটস্থ হইয়াছে, তখন সেই লোকটি মুখ না ফিরাইয়াই মৃদুহাস্যে বলিল, 'মোহিনী, আজ আবার জ্বালাইতে আসিয়াছ? আর নিকটে আসিয়ো না—আমাকে মারিবে কি? তাহা হইলে তুমি নিজেই মরিবে।'

হতাশ হইয়া বিস্মিতের ন্যায় মোহিনী সেইখানে দাঁড়াইল। আর অগ্রসর না হইয়া বলিল, 'আমি তো মরিয়াছি—এমন মরণ আর কি আছে? কিন্তু বিনোদ, আজও তুমি বড় বাঁচিয়া গেলে। একদিন—এমন দিন আসিবে, সেইদিন দেখিবে, এই ছুরিখানা তোমার বুকে আমূল বিদ্ধ রহিয়াছে।'

বিনোদলাল বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, 'পাঁচ বৎসরের ছেলেকে এমন ভয় দেখানো অসঙ্গত নয়; আমাকে কেন, মোহিনী?'

সে-কথায় মোহিনী কোনও উত্তর করিল না।

বিনোদলাল বলিল, 'দেখো মোহিনী! তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করো, তুমি আমাকে হত্যা করিবে কি? কোনওক্রমে তুমি আমার গায়ে একটি আঁচড়ও দিতে পারিবে না; কিন্তু আমি যদি একবার ইচ্ছা করি, তখন তোমার জীবনটা একেবারে শেষ করিয়া দিতে পারি; সে-ক্ষমতা আমার আছে কি না, তাহা যে তুমি না জানো, এমন নহে। তোমাকে যদি আমার তেমনই একটা শত্রু বলিয়া বোধ হইত—তোমার দ্বারা আমার কোনও একটা অনিষ্ট হইতে পারে, তাহার একটু সম্ভাবনাও থাকিত, তাহা হইলে বিনোদলাল এতদিন তোমার সকল অপরাধ উপেক্ষা করিয়া তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিত না। তুমি জানো, আমার সন্ধানে কত গোয়েন্দা ফিরিতেছে—জীবিত কি মৃত, যেরূপ অবস্থায় হউক, তাহারা আমাকে ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে; আমি কি সেজন্য একটু ভয় করি—না একটু ভাবি? আর তুমি তো একটা স্ত্রীলোক—তোমাকে দেখিয়া—না তোমার হাতের ওই ছুরিখানা দেখিয়া আমি ভয়ে হতজ্ঞান হইব? সেইজন্য বলিতেছি, মনে

করিয়ো না, আমি ভয় পাইয়া তোমাকে এ-কথা বলিতেছি—তোমাকে ভালোবাসি বলিয়াই বলিতেছি। এখনও আমি তোমাকে আগেকার মতো তেমনই সুখে রাখিতে প্রস্তুত আছি; সেইরূপ বড়ো বাড়িতে থাকিবে—দাস-দাসী থাকিবে; আর যাহা চাহিবে, তাহাই তখনি পাইবে—কিছুরই অভাব তোমাকে অনুভব করিতে হইবে না। এরূপ পথে-পথে ঘুরিয়া কতদিন কাটাইবে?'

মোহিনী এক-একটি করিয়া বিনোদের সকল কথাই অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, আর ক্রোধে তাহার আপাদমস্তক জ্বলিতেছিল—ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল; ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিল, 'পিশাচ, আবার প্রলোভন? মনে করিয়াছ মোহিনী আবার তোমার প্রলোভনে ভুলিবে? এখনও কি তৃপ্ত হও নাই? এখনও কি তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হয় নাই? কোন সুখের আশায় আবার আমি তোমার দয়া ভিক্ষা করিব? যে-ধর্ম একবার হারাইলে আর তাহা ফিরিয়া পাইবার নহে, তোমার কুহকে তাহাও গিয়াছে। মনে করিয়াছ, আবার তোমার মোহমন্ত্রে ভুলিয়া মুসলমানী হইব? কখনওই না। তুমি আমার কী সর্বনাশ না করিয়াছ? ধর্মভ্রষ্টা রমণীর পরিণাম যে কী, তাহা আমি এখন দেখিতেছি, তুমিও দেখিতেছ, জগতে সকলেই দেখিতেছে—কিন্তু তুমি যে একজন বিধবার সর্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে পথের ভিখারী করিয়াছ, ইহাতে কি তোমায় পাপের কোনও ফলভোগ করিতে হইবে না? আজ দশ বৎসরের কথা বলিতেছি, যখন আমার বয়স আঠারো বৎসর, যখন প্রবল পরাক্রমে যৌবন এ-অসহায় হৃদয়ে কী এক আত্মবিস্মৃতির তুমুল বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, যখন দিনান্তে একবারও মনে করিতে পারিতাম না যে—আমি বালবিধবা; কবে বিবাহ হইয়াছিল? কাহার সহিত? কে তিনি? কেমন? এখন কোথায়? এ-সকল স্মৃতি যখন উদ্দাম যৌবনের আত্মবিস্মৃতিময় সেই তুমুল বিপ্লবের ভিতর হারাইয়া গিয়াছিল, মনে পড়ে কি, তখন তুমি কোন নরকের সহস্র প্রলোভন লইয়া, আমার তৃষিত লালসাময় চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলে? সহজেই তুমি এ-অসহায় হৃদয় করতলগত করিলে। ক্রমে আমায় নরকের দিকে টানিয়া আনিলে, নিতান্ত মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় আমি তোমার অনুসরণ করিলাম। তখন একবার জন্মদাতা পিতার মুখ চাহিলাম না—স্নেহময়ী জননীর মুখ চাহিলাম না—উপরে যে ধর্ম রহিয়াছেন, সে-কথাও একবার ভাবিলাম না—কুক্কুরীর ন্যায় তোমার অনুসরণ করিলাম; শেষে স্বামীদত্ত প্রায় সাতহাজার টাকার গহনা লইয়া তোমার সহিত কুলের বাহির হইলাম। তুমি একে-একে দুই বৎসরের মধ্যে সে-সকলই আত্মসাৎ করিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করিয়া দিলে। এমনই অর্থপিশাচ তুমি, কিছুদিন পরে অর্থলোভে মুসলমান হইলে, একটা মুসলমান রমণীকে বিবাহ করিলে; শেষে আমার যে-দশা করিয়াছ, তাহারও সেই দশা করিলে। আমি পাপিনী—পাপের ফলভোগ করিতেছি, সে মরিয়া বাঁচিয়াছে। তাহার পর তুমি আট বৎসরের জন্য কোথায় চলিয়া গেলে, আর সন্ধান পাইলাম না। যখন ফিরিয়া আসিলে, তখন দেখিলাম, আবার আর একটিকে অঙ্কশোভিনী করিয়া ফিরিয়াছ। তুমি যেমন, এখন ঠিক তেমনই মিলিয়াছে; যেমন তুমি পিশাচ—তেমনি পিশাচী তোমার জুটিয়াছে; এখন তুমি সুখী হইয়াছ; কিন্তু বিনোদ, মনেও করিয়ো না, আমার সুখ নষ্ট করিয়া তুমি সুখী হইবে—আর আমি দুঃখের ম্লানদৃষ্টিতে তোমার সুখ-শান্তির দিকে নিরীহ ভালোমানুষটির মতো শুধু দিন-রাত চাহিয়া থাকিব। এই ছুরিতে ইহার একদিন ঠিক প্রতিশোধ হইবেই হইবে। আমাকে যতদূর সহজ মনে করো—ততদূর নয়, একদিন তোমার সে-ভ্রম ভালো করিয়া ঘুচাইয়া দিব; তখন দেখিবে, স্ত্রীলোক একবার ধর্মভ্রষ্টা পাপিষ্ঠা হইলে, তাহারা সকলই করিতে পারে; তাহাদের অসাধ্য এ-জগতে কিছুই থাকে না।'

ভ্রূকুটিকুটিলমুখে, সদর্প-পাদবিক্ষেপে মোহিনী তখনই তথা হইতে চলিয়া গেল। হাতে সেই উন্মুক্ত দীর্ঘ ছুরিখানা যেন তেমনি দর্পের সহিত ঘন-ঘন দুলিতে লাগিল।

বিনোদলাল নিতান্ত চিন্তিতের ন্যায় সেইখানে আপভাত বসিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গুমখুন

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন অরিন্দম বসু একজন প্রধান ডিটেকটিভ বলিয়া হুগলি জেলার আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার আফলোদয় অনুসন্ধিৎসা ও উদ্যম, প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা এবং অসাধারণ আগ্রহ ও অধ্যবসায় তখনকার দস্যু, জালিয়াত, খুনি ইত্যাদির নিকটে তাঁহাকে যথার্থই 'অরিন্দম' বলিয়া পরিচিত করাইয়া দিয়াছিল। আমাদের এই বক্ষ্যমাণ আখ্যায়িকায় তাঁহারই একটি ভীষণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিব।

হুগলি জেলার অন্তর্গত কামদেবপুর গ্রামে অরিন্দম বসুর বাসাবাটি। একদিন অতি প্রত্যুষে স্থানীয় থানার অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রনাথ তাঁহার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অরিন্দম তাঁহার বাসাবাটির বাহিরের একটি ঘরে বসিয়া ছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ আসিলে তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া যথেষ্ট সম্ভ্রমের সহিত বসিতে বলিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ না বসিয়া, দুই হাতে অরিন্দমের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, 'আপনি শীঘ্র আসুন—আসিয়াই যখন দেখা পাইয়াছি তখন আর বিলম্ব করা হইবে না।'

অরিন্দম তাঁহার সেই উৎকণ্ঠিত ভাব দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন, কী হইয়াছে? কোথায় যাইতে হইবে?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'থানায়। আপনি আসুন, সেখানে গিয়া সকলই দেখিবেন—সকলই শুনিবেন, এখানে আমি কিছুই বলিব না।'

এই বলিয়া যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া টানিয়া থানার দিকে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন।

অরিন্দমের বাটি হইতে থানা বড় বেশিদূর নহে। অল্পক্ষণেই অরিন্দমকে লইয়া যোগেন্দ্রনাথ থানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার একটি ঘর চাবিবন্ধ ছিল; যোগেন্দ্রনাথের নিকটেই চাবি ছিল, তিনি চাবি খুলিয়া অরিন্দমকে সেই কক্ষমধ্যে লইয়া ভিতর হইতে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই প্রকোষ্ঠের এক কোণে কাঠের একটি বড় সিন্দুক পড়িয়া ছিল। সিন্দুকটি নূতন ঝকঝকে; তথায় বসিবার উপযুক্ত আর কোনও সামগ্রী না থাকায় অরিন্দম সেইটির উপরে বসিতে যাইতেছিলেন; যোগেন্দ্রনাথ নিষেধ করিলেন এবং অতি দ্রুতহস্তে সেই সিন্দুকটি খুলিয়া অরিন্দমকে দেখাইলেন। দেখিয়া অরিন্দম শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ অনেকক্ষণের জন্য সেই সিন্দুকের মধ্যে নির্নিমেষ হইয়া রহিল; রুদ্ধশ্বাসে নিঃসংজ্ঞবৎ অরিন্দম প্রস্তর-গঠিতের ন্যায় নীরব নিস্পন্দ রহিলেন।

সেই সিন্দুক মধ্যে অন্যূন দ্বাদশবর্ষীয়া একটি বালিকার মৃতদেহ। সেই মৃতদেহের শতস্থানে অস্ত্রক্ষত, রক্তসিক্ত এবং অনেক স্থানে হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে; দক্ষিণ হস্ত একেবারে কাটিয়া লইয়াছে। কী ভয়ানক! কী ভয়ানক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় এ-বালিকাকে যে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হইতে থাকে। সেই মৃতদেহের দিকে চাহিয়া কখনওই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না যে, কোনও মনুষ্য হইতে ওই কার্য সম্ভবপর। কে এমন নৃশংস নরপ্রেত যে এই ক্ষুদ্র বালিকার শিরীষকোমলদেহে শাণিত শতছুরিকাঘাত করিতে কাতর হয় নাই?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খুনি কে?

অরিন্দম দুই হাতে ধরিয়া সেই মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়া সিন্দুক হইতে বাহির করিলেন। পার্শ্বের উন্মুক্ত

গবাক্ষ দিয়া প্রভাত-রবির রক্তাক্ত কিরণ সেই রক্তাক্ত মৃতদেহে পড়িয়া ভয়ানক দৃশ্য আরও ভয়ানক করিয়া তুলিল। অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে বলিলেন, 'যোগেন্দ্রবাবু, ব্যাপার কী?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ব্যাপার কী—আমি কী বলিব? যাহা দেখিতেছেন, তাহাই; এখন আপনাকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে, এ-ব্যাপার কী—সেইজন্যই আপনাকে আনিয়াছি।'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'সময়ে আমিই বুঝাইয়া দিব। এ-খুন কে করিল?'

যোগেন্দ্র। আপনি জানেন, আপনি তাহা বলিবেন।

অরিন্দম। ভালো, আমিই একদিন বলিব। এখন আপনি বলুন দেখি, এ-লাশ আপনি কোথায়, কীরূপে পাইলেন?

যো। এইখানে—থানায়। কাল রাত দুইটার পর মুটে-মজুরের মতো একটা হিন্দুস্থানী লোক এই সিন্দুকটা মাথায় করিয়া আমাদের এই থানার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। এতরাত্রে এতবড় একটা সিন্দুক লইয়া, তাহাকে যাইতে দেখিয়া আমাদের রামদীন পাহারাওয়ালার সন্দেহ হয়—সে তখনই আমাকে খবর দেয়। আমি তখন রামদীনকে সেই লোকটাকে গ্রেপ্তার করিতে বলিলাম। রামদীন লোকটাকে ধরিয়া আনিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কাছে সেই সিন্দুকের চাবি আছে কি না। তাহাতে সে বলিল, চাবি নাই। তখন চোর বলিয়া তাহার উপরে আমারও সন্দেহ হইল। সে-লোকটাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথা হইতে সে আসিতেছে, কোথায় যাইবে, কাহার সিন্দুক। তাহাতে সে আপনার নাম করিয়া বলিল, আপনার নিকটেই সে এই সিন্দুক লইয়া যাইতেছিল।

অ। (সবিস্ময়ে) আমার নিকট!

যো। তাহার মুখে শুনিলাম, কলিকাতায় আপনার কে বন্ধু আছে, তিনি আপনাকে এই সিন্দুকটি পাঠাইয়াছেন। লোকটার চেহারা দেখিয়া আমার মনে বড়ই সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া লোকটাকে ছাড়িয়া দিলাম না—আটক করিয়া রাখিলাম বটে, তবে আপনার লোক শুনিয়া সে-লোকটার উপর তেমন নজর রাখিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না। কেবল সিন্দুকটা এই ঘরে আটক করিয়া রাখিয়া দিলাম। তাহার পর দেখি, রাত্রি শেষ হইতে-না-হইতে সে-লোকটি পলাইয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া মনে করিলাম, সিন্দুকটি আপনার ওখানে পাঠাইয়া দিব; সিন্দুকটি বাহির করিয়া দেখি, তলার কাঠখানার জোড়ের চারিদিকে রক্তের দাগ। তখন আমি সিন্দুক ভাঙিয়া ফেলিলাম।

অ। যে-লোক এই সিন্দুক বহিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে কেমন? বয়স কত?

যো। বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে। লোকটা হিন্দুস্থানী। আকৃতি যতদূর বিকট হইতে হয়। মুখখানা দেখিতে আরও বেশি বিকট; তাহাকে দেখিলে মানুষ বলিয়া হঠাৎ বুঝায় না। নাকটা খুব মোটা, চোখ দুইটা ছোট, ঠোঁট দুখানি এমন পুরু, যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে, দেহখানা বেশ হৃষ্টপুষ্ট; রঙ এত কালো, তাহার মৃত্যুর পর গায়ের চামড়াখানা পাইলে বেশ বার্নিশ-করা কয়েকজোড়া জুতা তৈয়ারি হইতে পারে। কপালে তিন-চারিটি কাটা দাগ আছে।

অরিন্দম সেই বালিকার মৃতদেহ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মৃত বালিকার শিথিল কবরীতে দুইটি রূপার তৈয়ারি মাথার কাঁটা ছিল, তাহা তুলিয়া লইয়া নিজের নিকটে রাখিয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ খুনির বীরত্ব

এমনসময়ে একজন পাহারাওয়ালা বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল। যোগেন্দ্রনাথ দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পাহারাওয়ালা একখানি পত্র লইয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিল। যোগেন্দ্রনাথ তখনই পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। পত্র পড়িবার সময়টুকুর মধ্যে তাঁহার মুখের ভাব ক্ষণে-ক্ষণে

শতপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে লাগিল। পাঠশেষে তিনি সেই পত্রখানি অরিন্দমের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখুন, অরিন্দমবাবু, কাণ্ডখানা দেখুন; সে যে-ই হোক, সে বড় সহজ লোক নয়।'

'নতুবা কাহার এত সাহস, খুন করিয়া থানায় লাশ পাঠাইয়া রঙ্গ করে?' বলিয়া অরিন্দম পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

'যোগেন্দ্রবাবু,

'তুমি আমাকে জানো, আমিও তোমাকে জানি। ইহাতে যদি আমাকে ধরিবার জন্য তুমি কোনও সুবিধাই না করিয়া উঠিতে পারো, তাহা হইলে পুলিশে চাকরি করা তোমার মতন একটি নিপুণ অর্বাচীনের কর্ম নহে। সিন্দুকের মধ্যে তুমি যে একটি বালিকার লাশ দেখিতে পাইবে, সে আমারই হাতে ওইরূপ অবস্থায় মরিয়াছে, জানিবে। কে সেই বালিকা, কেন খুন হইল, কে আমি, আমিই বা কেন তাহাকে খুন করিলাম, ওই সকলের একটিরও সন্ধান বোধহয়, তুমি চিরজীবনেও করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমি জানি, ইহার জন্য তুমি তোমার প্রিয়মিত্র অরিন্দমের সাহায্য লইবে; কিন্তু স্থির জানিয়ো, সাতটা অরিন্দমেও কিছুই হইবে না। বর্তমান বালিকাকে হিসাবে ধরিয়া আমার খুনের সংখ্যা আঠারো। কখন—কোথায়—কীভাবে থাকিয়া আমি এইসব খুন নির্বিঘ্নে করিতেছি, সে-পরিচয় তোমাকে দিবার কোনও আবশ্যকতা দেখিতেছি না।

'এই বর্তমান সপ্তাহের মধ্যে যাহাতে আমার খুনের সংখ্যা পুরোপুরি কুড়িটি হয়, তাহা করিব; আগে অরিন্দমকে খুন করিব, তাহার পর তোমায় খুন করিব। তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়ো, আর তুমি নিজে সাবধান হইয়ো। তোমাদের মতো দুই-একটিকে যদি না খুন করিতে পারিলাম, তাহা হইলে করিলাম কী?

'ইচ্ছা ছিল, তুমি যখন আমার এই পত্রখানি পড়িবে, তখন তোমার মুখের ভাব কেমন হয়—কী করো, তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে-মজাটা প্রত্যক্ষ করিব। কোনও কারণবশত সে-ইচ্ছা আমাকে ত্যাগ করিতে হইল।

'আর দুই-একদিনের জন্য কেন এই বালিকার হত্যাকারীকে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিবে? দু-একদিন পরে একেবারে "অরিন্দম - হন্তা"র সন্ধান করিতে বাহির হইতে হইবে।

তোমার পরিচিত
শত্রু'

অরিন্দম পত্রখানি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে ফিরাইয়া দিলেন; কোনও কথা কহিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, আপনি আর কখনও এমন ব্যাপার দেখিয়াছেন কি?'

অ। না। লোকটি বড় সহজ নয়; যাই হোক, এখন যাহাতে তাহাকে সহজ করিয়া আনিতে পারি, তাহাই করিতে হইবে। পত্রখানি পড়িয়া দেখিলাম যে, লোকটি আপনাকে চেনে, আপনিও তাহাকে চেনেন। এই চেনাচিনির ভিতরেও লোকটা এত কাণ্ড করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য!

যো। আমার পরিচিতের মধ্যে কে এমন লোক, আমি তো ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। আবার দুই-চারিদিনের মধ্যে আপনাকে খুন করিবে বলিতেছে। আপনার সঙ্গে এমন কাহার শত্রুতা?

অ। কাহার শত্রুতা? অনেকেরই! যিনি চোর—তাঁহার, যিনি জালিয়াত—তাঁহার, যিনি খুনি—তাঁহার। এই তিন রকমের শত্রু লইয়া আমাকে সর্বদা ঘর করিতে হয়। সে যাহাই হোক, এখন এ লোকের-মতন-লোকটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের নৈপুণ্য

অরিন্দম তখন সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে একটি কালো বনাতের জামা এবং একগাছি কালো রঙের ভাঙা ছড়ি বাহির করিলেন। রক্তে সম্পূর্ণ ভিজিয়া সে কালো বনাতের জামাটি গাঢ় পাটকিলা রঙের মতো দেখাইতেছে। জামাটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'এই জামা পরিয়াই সে খুন করিয়া থাকিবে, জামাটি রক্তাক্ত হওয়ায় ও ছড়িটি কোনওরকমে ভাঙিয়া যাওয়ায় অব্যবহার্যবোধে এই সিন্দুকের ভিতরে চালান দিয়াছে। এই দুটিতে আমি সে-লোকটার চেহারা কিরূপ, মনে একটা অনুমান করিয়া লইতে পারিব। লোকটি লম্বায় পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি হইবে না।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'কেমন করিয়া আপনি জানিলেন?'

অরিন্দম সেই ভাঙা ছড়িটি দেখাইয়া বলিলেন, 'যে খুন করিয়াছে, এই ছড়িটি যদি তাহার হয় এবং ছড়িটি যদি তাহার মানানসহি হয়, তাহা হইলে আমার অনুমান মিথ্যা নহে। মাপে ছড়িটি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ওইরূপ পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি মাপের লোকেরই ব্যবহার্য। লোকটি আরও চারি-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হইলে ছড়িটি আরও দুই ইঞ্চি বড় হইত। লোকটি তেমন খুব বেঁটে নয়, খুব লম্বাও নয়, লোকটির বুক প্রশস্ত, স্কন্ধ বিস্তৃত, কোমর তেমন মোটা নয়, বুকের মাপের অপেক্ষা কিছু কম। ইহাতে বুঝাইতেছে, লোকটি সেরকমের মোটা নহে; মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত; গলাটা কিছু বেশি মোটা।'

যোগেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, 'বুঝিতে পারিলাম না, কীরূপে আপনি এমন অনুমান করিতেছেন।'

অরিন্দম বলিলেন 'এই জামার ছাঁট-কাট দেখিয়া আমি যাহা বলিলাম—আপনি জামাটি মাপিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। লোকটির চুলগুলি অল্প কুঞ্চিত। জামার বোতামের সঙ্গে দুই-চারিগাছি চুল জড়াইয়া আছে। বোধহয়, সেই লোকটা খুন করিয়া নিজের মুখে, চোখে, মাথায় যে রক্ত লাগিয়াছিল, তাহা এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে; সেই সময়েই বোতামের সঙ্গে দুই-চারিগাছি চুল জড়াইয়া উঠিয়া আসিয়াছে—সকলগুলিই একমাপের—অল্প-অল্প কোঁকড়া।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এইগুলি মাথার চুল না হইয়া যদি দাড়ি-গোঁফের চুল হয়? মাথা মুছিবার সময় অবশ্যই সে নিজের মুখখানাও একবার এই জামা দিয়া মুছিয়া থাকিবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, তাহা হইলে জানিতে পারিতাম। দাড়ি কিংবা গোঁফের চুল স্বভাবত গোড়া হইতেই ধনুকের মতো একদিকে কিছু বাঁকা হইয়া থাকে; কিন্তু মাথার চুল গোড়া হইতেই আগে খানিকটা কিছু কম আধইঞ্চি সোজা হইয়া থাকে। যদি কোঁকড়া চুল হয়, তাহার পর ডগার দিকে বাঁকা হইয়া থাকে; আর যদি কাফ্রীদের চুলের মতন খুব কোঁকড়ানো চুল হয়, সে স্বতন্ত্র কথা, তাহার আগাগোড়া প্রায় সমানই হয়। গোঁফ-দাড়ি আর মাথার চুলে কত তফাৎ একটু চেষ্টা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। আরও ইহাতে বুঝিতে পারিতেছি, লোকটার দাড়ি-গোঁফ কিছুই নাই, তাহা হইলে গোঁফ-দাড়ির চুলও দুই-একটি লাগিয়া থাকিতে দেখিতাম। অবশ্যই সে ইহাতে মুখ-মাথা ভালো করিয়া জোর দিয়া মুছিয়া থাকিবে, কারণ রক্তের দাগ শীঘ্র উঠে না; বিশেষত, খুন করিবার সময়ে মানুষের হাতে-পায়ে এমন এক পৈশাচিক শক্তির সঞ্চার হয় যে, মনুষ্য তখন যে কাজ করে, সকল কাজেই অনিচ্ছায় অযথা বলপ্রয়োগ করিয়া থাকে। অবশ্যই সে-সময়ের এই গাত্রমার্জনীরূপে ব্যবহৃত জামায় গোঁফ-দাড়ি হইতে দুই-একটি চুল উঠিয়া আসিত। এই-সকলের মধ্যে আরও একটি অনুমান করা যায় লোকটা গৌরবর্ণ।'

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন; কিন্তু শেষে গৌরবর্ণের কথা শুনিয়া তিনি একটা উপহাস করিবার সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিলেন না, 'কেন অরিন্দমবাবু, গায়ের রং কি একটু জামার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে না কি?'

অরিন্দম বলিলেন, 'নজর থাকিলে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু নজর দিয়া তুমি- আমি, গাছপালা-ঘরবাড়ি দেখিলে হয় না—চোখ বুজিয়া আরও এমন অনেক জিনিস দেখা যায়—যাহা খোলা-চোখের কর্ম নয়।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'জামার সঙ্গে গায়ের রঙ না উঠিয়া আসিলে আমি তো এমন কোনও উপায়ই দেখিতে পাই না, যাহাতে সেই লোকটাকে গৌরবর্ণ বলিয়া বুঝতে পারি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কৃষ্ণবর্ণ লোকে কৃষ্ণবর্ণ বড় বেশি পছন্দ করে না, তাহা না হইলে জামা, ছড়ি উভয়ই কালো রঙের হইত না। যদিও জামাটি কালো রঙের হইত, ছড়িটি নিশ্চয়ই অন্য কোনও রঙের হইত। লোকটার বয়স চল্লিশের কম নহে; তাহার এদিকে লোকে এত বড় একটা দুঃসাহসিকতার কাজ এমন নিপুণভাবে সম্পন্ন করিতে পারে—আমার এমন বিশ্বাস হয় না।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাহা হইলে আপনার অনুমানে লোকটার বয়স চল্লিশ বৎসর, গৌরবর্ণ, মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ স্ফীত, কেশ অল্প কুঞ্চিত, শ্মশ্রুগুম্ফহীন, লম্বা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চির বেশি নহে, গলাটা কিছু মোটা, কোমরটা কিছু সরু। যখন হত্যাকারী ধরা পড়িবে, তখন আপনার এই অনুমানগুলি কতদূর সত্য, বুঝিতে পারা যাইবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তাহাই হইবে; এখন চলিলাম।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আবার কখন দেখা করিবেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যখনই দেখা করিবার কোনও প্রয়োজন দেখিব। এই বালিকার একখানি ফোটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিবেন।'

অরিন্দম তথা হইতে বাহির হইলেন।

প্রথম খণ্ড

সর্পিণী—সিংহ-বিবরে

When ruth three seasons thus had lain,
There came a respite to her pain;
She from her prison fled,
But on the vagrant none took thought :
And where it liked her best she sought
Her shelter and her bread.

WORDSWORTH,

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রান্তরে

দ্বিপ্রহর রাত্রি। অবিশ্রান্ত ঝড়বৃষ্টিতে সে রাত্রি আরও কী ভয়ানক! আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন; আকাশের একপ্রান্ত অবধি অপর প্রান্ত পর্যন্ত মেঘ করিয়াছে; সে-মেঘ নিবিড়, ছিদ্রশূন্য, অন্ধকারময়। ভূতল হইতে আকাশতল পর্যন্ত অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। মুহুর্মুহু বজ্র গর্জিতেছে; সে-গর্জন এমন বিকট এবং এমন ভীতিপ্রদ শুনিয়া অতি সাহসীরও বুক কাঁপিয়া উঠে। এক-একবার বিদ্যুৎ ঝকিতেছে বটে; কিন্তু সে-আলোকের অপেক্ষা আঁধার অনেক ভালো। এই ঘোরতর দুর্যোগে ঝটিকাময়, শব্দময় এবং নানা বিভীষিকাময়, জনশূন্য, তারকাশূন্য ও দিগ্‌দিগন্তশূন্য সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা এক বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতেছিল। যখন তীব্রভাবে বিদ্যুৎ ঝকিতেছিল, তখন বালিকা সভয়ে প্রান্তরের একবার এদিক, একবার সেদিক করিয়া চারিদিকেই চাহিয়া দেখিতেছিল; ভয় হইতেছিল, পাছে কেহ তাহাকে সেই আলোকে দেখিতে পায়। আলো নিবিয়া গেলে, অন্ধকার পাইয়া বালিকা যেন তখন কতকটা নিঃশঙ্কচিত্তে আবার কিছুদূর অগ্রসর হইতেছিল। এই বিদ্যুচ্চকিত, মেঘকৃষ্ণ, বর্ষা-প্লাবিত নিশীথে জনহীন প্রান্তরে কে ওই বালিকা?

জানি না, কতক্ষণ সেই বালিকা এইরূপ কষ্টভোগ করিতেছিল; কিন্তু তখন সে একান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এবং তাহার নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দিয়া ঘন-ঘন শ্বাস বহিতেছিল। চেষ্টা করিয়া কিছুদূর কিছু দ্রুত চলিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে-গতির দ্রুততা আবার কমিয়া আসিতেছিল—আর পারে না। পা আর চলে না—যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বালিকা সেই বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে কতবার ভূতলাবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল—কতবার পড়িতে-পড়িতে রহিয়া গেল এবং ঝড়ে জলসিক্ত অঞ্চলও পায়ে-পায়ে জড়াইয়া বালিকাকে কতবার ভূতলে নিক্ষেপ করিল। উপরে মেঘ ছুটিতেছে—মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে—মেঘে-মেঘে মিশিয়া মেঘ আরও নিবিড় হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নিচে ঝড় ছুটিতেছে—ঝড়ে-ঝড়ে মিশিয়া ঝড় আরও ভয়ানক বেগে ছুটিতেছে, তাহার নিচে সেই অসহায়া বালিকা প্রাণভয়ে প্রাণপণে ছুটিয়াছে।

প্রান্তরের প্রান্তে আসিয়া বালিকা একখানি ছোট গ্রাম দেখিতে পাইল; কিন্তু সে-গ্রামও তখন মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে—জনপ্রাণীর অস্তিত্বের কোনও চিহ্নই নাই। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া, বালিকা হতাশ হইয়া সেই মৃতবৎ গ্রামের চারিদিকে সতৃষ্ণনেত্রে চাহিতে লাগিল। ক্রীড়াশীল বিদ্যুৎ সেই মৃতকল্প বালিকার হতাশদৃষ্টির সম্মুখে এক-একবার সেই মৃতবৎ গ্রামের ছবিখানি ধরিয়া কী রঙ্গ করিতেছিল, জানি না; কিন্তু তাহাতে বালিকার অবসন্ন, ক্লিষ্ট হৃদয় অনেকটা আশ্বস্ত হইল। সে সত্বর গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা অনেকক্ষণ জলে ভিজিয়াছে এবং অসহ্য শীতে তাহার আপাদমস্তক কাঁপিতেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ ও মুখশ্রী এখন পাণ্ডুর। সকল ইন্দ্রিয় এখন অবসন্ন এবং আর্দ্র; স্তূপীকৃত কৃষ্ণকেশদাম পৃষ্ঠে, বক্ষে, অংসে ও বাহুতে গুচ্ছে-গুচ্ছে জড়াইয়া লুটিতেছে।

বালিকা গ্রামের মধ্যে আসিয়া দেখিল, কিছুদূরে একটি গৃহে তখনও আলো জ্বলিতেছে। এই একমাত্র দীপালোক লক্ষ্য করিয়া বালিকা নূতন বলে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া দেখিল, সেটি একটি মুদির দোকান, তথায় চারি-পাঁচজন বসিয়া তাস পিটিতেছে, তামাক টানিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে এবং অন্যমনে গুনগুন করিয়া গীত গাহিতেছে। যাহার দোকান সে-লোকটাও ওই তাসখেলার দলের মধ্যে মিশিয়াছে, তাহার নাম বলাই মণ্ডল। আর তিন-চারিজন সেই পাড়ার; এই দুর্যোগে মুদি খদ্দেরের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আর সেই অপর তিনজন ঝড়বৃষ্টিতে ঘরে ফিরিয়া যাওয়া দুঃসাধ্যবোধে অনন্যোপায় হইয়া তাসখেলায় মনোনিবেশ করিয়াছে। খেলা এখনও চলিতেছে এবং বেশ জমিয়াও আসিয়াছে।

যখন খেলাটা বেশ জমিয়াছে, সেই বালিকা তথায় আসিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,

'তোমরা কেউ জানো গা—এখানে গোস্বামীপাড়া কোথায়?'

প্রথমে কেহই উত্তর করিল না। যে তাস পিটিতেছিল, তাহার তাস-পেটা বন্ধ হইল; যে তামাক টানিতেছিল, তাহার হাতের হুঁকাটা কাঁপিতে-কাঁপিতে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল; যে গল্প করিতেছিল, সে তখন একটা ভূতের গল্পের অর্দ্ধেকটা বলিয়াছিল, তাহার গল্প বলা ঘুরিয়া গেল; এবং যে অন্যমনে গুনগুন করিয়া গান করিতেছিল, সমের মাথায় আসিবার পূর্বে তাহার গান থামিয়া গেল; এবং সকলেই অবাঙ্মুখে সেই বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, তথাপি কেহ উত্তর করিল না। বিশেষত, যে ভূতের গল্প করিতেছিল, কিছুদিন আগে অমাবস্যার রাত্রে কোথায় সে স্বচক্ষে প্রেতিনী দেখিয়াছিল, সেই অদ্ভুত কাহিনী অতি সাহসের সহিত বলিতেছিল, ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল এবং বুকের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া ফুটিতে লাগিল। সুতরাং সে তখন মনে-মনে বারংবার অনতিপরিস্ফুটস্বরে আত্ম-সংরক্ষণে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল।

বালিকা কাতর্যে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে গোস্বামীপাড়া কোথায়?'

তাহাদিগের মধ্যে বলাইচন্দ্র বেশি সাহসের পরিচয় দিয়া প্রথমে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল, 'কে তুমি? কোথা থেকে আসছো?'

বালিকা সে-কথায় কোনও উত্তর না করিয়া বলিল, 'আমার বড় কষ্ট হইতেছে, আমি দাঁড়াইতে পারিতেছি না, যদি গোস্বামীপাড়া জানো, কোনদিকে—শীঘ্র আমাকে বলিয়া দাও। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।'

বলাইচাঁদের সাহস দেখিয়া হলধর নামে তথায় আর একজন ছিল, তাহারও সাহস শেষে সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিল। সে তখন একবার তাহার অতি সাহসের পরিচয় দিয়া প্রেতিনী-অনুমিত বালিকার সহিত কথা কহিল, 'গোস্বামীপাড়ায় কার কাছে যাবে?'

বালিকা একবার ইতস্তত করিল; নাম বলিল না।

হলধরের নাম জানিবার তেমন বিশেষ কোনও আবশ্যক ছিল না; সে বালিকার সহিত কথা কহিয়া, কেবল তাহার সঙ্গীদিগকে নিজের অতুল সাহস-বিক্রমের পরিচয় দিয়া চমৎকৃত ও মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিল মাত্র। বালিকাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া সে তখন তাহার অমানুষিক সাহসের পরিচয় দিল, 'গোস্বামীপাড়া এখান থেকে অনেকদূর; এইদিকের দিঘিটির পাড় দিয়া বরাবর দক্ষিণে প্রায় তিন-পো পথ গেলে—তারপর গোঁসাইপাড়া। এই ঝড়বৃষ্টিতে তুমি একা যেতে পারবে না, কোথায় পথ ভুলে বেঘোরে পড়ে প্রাণটা হারাবে।'

বালিকা আর কোনও কথা না কহিয়া চকিতে তথা হইতে বাহিরে আসিল। সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া দক্ষিণ মুখে আবার নূতন বলে চলিতে আরম্ভ করিল।

এ বালিকা কে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এ বালিকা কে?

দেখিতে-দেখিতে চক্ষের নিমেষে বালিকা বাহিরের সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কোথায় মিশিয়া গেল দেখিয়া, তথাকার সকলের—সাহসী বলাই মণ্ডল, কি তাহার-অপেক্ষা-অধিক সাহসী হলধর—সকলের মুখ ভয়ে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ নিশ্চেষ্ট রহিল।

যে ইতিপূর্বে ভূতের গল্প করিতেছিল, তাহার নাম হারানচন্দ্র। সে বলিল, 'এ আর কেউ নয় হে, হলধর; এ সে-ই, যার কথা আমি এখন বলছিলেম—সেই বাঁশঝাড়ের তলায় যাকে দেখেছিলেম, এ নিশ্চয়ই সে-ই। একবার জানানটা দিয়ে গেল। এখন দেখছি, এতরাত্রে, আর আজ

আবার শনিবার, যে জলঝড়, ও-কথাটা তোলাই ভালো হয় নাই; নইলে এত জলঝড়ে মানুষের বাবার সাধ্য কী যে বাহির হয়; আমি ঠিক চিনতে পেরেছি, এ সেই গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা গোয়ালাদের ছোট-বউ।'

আর একজন বলিল, 'দুর, সে কি এত সুন্দর দেখতে ছিল? এর মুখ-চোখ দেখলে না—যেন তুলি দিয়ে আঁকা—যেন দুগ্‌গো পিরতিমে?'

হারানচন্দ্র তখন দুই-একটা কঠিন প্রমাণ দিল, 'আমি বেশ করে দেখেছি, সে যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে ছিল, তার একটুও ছায়া পড়তে দেখিনি। ঘোষেদের গলায়-দড়ি-দিয়ে-মরা সেই ছোট-বউ না হয়ে যায় না; আমি আগে একদিন একে স্বচক্ষে দেখেছি; আর সুন্দর-অসুন্দরের কথা ছেড়ে দাও, এখন ওরা যেমনটি মনে করবে, তেমনটি হতে পারে; আজ ওকে কী-বা দেখলে, আমি সেদিন যা দেখেছিলেম যেন রূপ চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে; অন্য কেউ হলে সেই ফাঁদে পা দিত—আর মরত, আমি বাবা বড় শক্ত ছেলে!'

বলাই মণ্ডল আর এক পথে গেল, 'ওসব কাজের কথা নয়, গোঁসাইপাড়ার কোনও লোকের মেয়ে-টেয়ে হবে; শ্বশুরবাড়িতে বোধহয় জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়, তাই আজ জলঝড়ে সুবিধা পেয়ে বাপের বাড়িতে পালিয়ে আসছে।'

তামাক বন্ধ রাখিয়া, তাস-পেটা বন্ধ রাখিয়া, গল্প বন্ধ রাখিয়া এবং গুনগুন গান বন্ধ রাখিয়া, যখন অর্ধঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের মধ্যে কেবল এই বিষয়েরই আলোচনা চলিতে লাগিল, তখন তথায় দ্রুতপদে আর একমূর্তির উদয় হইল।

সেই আগন্তুকের চেহারা দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল। তেমন বিকট হইতেও বিকট এবং কদাকার হইতেও কদাকার আকৃতির লোক তাহারা জীবনে আর কখনও দেখে নাই বলিয়াই ভয় পাইল। তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘ-দীর্ঘ হস্তপদাদি, দেহের সেই সুকৃষ্ণবর্ণ ও সেই বর্ণের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যে যথেষ্ট চিক্কণ তেলকালিও অতিশয় লজ্জিত হয়। প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল, সেই প্রকাণ্ড মুখমণ্ডলে অতি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ চক্ষু, প্রশস্ত নাসিকা, বিকট দন্তশ্রেণী।

তাহার উপরে আবার তেমনি কর্কশকণ্ঠ, 'ওহে, তোমরা এদিক দিয়ে একটা মেয়েকে যেতে দেখেছ?'

কেহ কোনও কথা কহে না।

তখন সেই বিকট আগন্তুকের সুবিকট কর্কশকণ্ঠ সপ্তমে উঠিয়া আরও কর্কশ শুনাইল, 'কী হে, তোমরা যে কেহই কথা কও না? বোবা না কি? যদি সত্য কথা না বল, এই দেখেছ আমার হাতে কী?'

এই বলিয়া একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া দেখাইল।

তখন সেই অতি-সাহসী হলধর ভয়কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, 'হ্যাঁ, আধঘণ্টা হবে, একটা মেয়ে দক্ষিণদিকের বড় দিঘির ধার দিয়ে গোঁসাইপাড়ার দিকে গেছে।'

আগন্তুক আর তথায় মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিল না। বালিকার অনুসরণে বাহির হইয়া গেল। অতি-সাহসী হলধর তখন একটা সুদীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

হলধর বলিল, 'ব্যাপারটা কী বল দেখি?'

বলাই মণ্ডল বলিল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না, এর ভিতরে গূঢ় রহস্য আছে।'

হারানচন্দ্র বলিল, 'এ আর কিছু নয়—সবই ভূতের খেলা।'

বলাই মণ্ডল বলিল, 'না—না ভূত নয়। এ লোকটার কিছু মন্দ অভিসন্ধি আছে।'

কিছুক্ষণ ধরিয়া এইরূপ কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অকস্মাৎ অতি দূর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, 'ওগো কে আছ, শীঘ্র এসো, খুন—খুন করলে, খুন—খুন—'

বলাই মণ্ডল উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'ঠিক হয়েছে, সেই লোকটাই বুঝি সেই মেয়েকে খুন

করলে। চলো, চুপ করে বসে থাকলে চলবে না; এসো—সকলে মিলে যদি এখনও মেয়েটাকে বাঁচাতে পারি।'

তখন বলাই তিন-চারগাছা মোটা-মোটা লাঠি বাহির করিল।

এক-একজনের হাতে এক-একটা দিল; সকলেই লইল—লইল না কেবল বীরকুলর্ষভ হারানচন্দ্র। সে বলিল, 'তোমাদের কথায় ভুলিয়া আমি প্রাণ খোয়াইতে পারি না। যেতে হয়—তোমরা যাও; আমি তো প্রাণ থাকতে যাচ্ছি না। ভূতে ওইরকম অনেক মায়া জানে—ওইরকম করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার দিঘির ধারে নিয়ে যেতে পারলে হয়—তখন কত ধানে কত চাল, তা বেশ ভালো করে দেখিয়ে দেবে। কী বলো, হলধর?'

হলধর 'হ্যাঁ,' কি 'না', কিছুই বলিল না।

হারানচন্দ্রের বড় মুশকিল বাধিয়া গেল—সকলেই যদি চলিয়া যায়, তাহা হইলে তখনকার মতো তাহাকে সেইখানে একাকী থাকিতে হয়। আর তাহাদের সঙ্গে গেলে যে বিপদ সে অনুমান করিয়াছিল, তাহাও বড় সহজ নয়; সেইজন্য হারানচন্দ্র হলধরকে নিজের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল। তখনই সে-চেষ্টা এমনভাবে সফল হইল, কেহই তাহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতে পারিল না। অন্যের অলক্ষে চোখ টিপিয়া দুই-একবার হলধরের গা টিপিয়া, এমনভাবে হারানচন্দ্র তাহার আপাদমস্তকপূর্ণ করিয়া এমনই একটা মহা ভয় ঢুকাইয়া দিল যে, হলধর আর কিছুতেই তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহিল না। তখন হলধর আর হারানচন্দ্র ছাড়া অপর তিনজন একটা লণ্ঠন লইয়া লাঠি হস্তে লাফাইতে-লাফাইতে বাহির হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ যদুনাথ গোস্বামী

যখন বলাই মণ্ডল অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া সেই অনাশ্রিতা বালিকার সন্ধানে বাহির হইল, তখন আকাশ অনেক পরিষ্কার; ঝড়ের বেগ অপেক্ষাকৃত ভূতমন্দী এবং বৃষ্টি অল্প-অল্প পড়িতেছিল। হলধর যে দিঘির ধার দিয়া বালিকাকে গোস্বামীপাড়ার পথ দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া সকলে দক্ষিণ মুখে চলিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাহারা সেই দিঘির ধারে আসিয়া পড়িল। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইল না; দিঘির চারিধারে তাহারা সন্ধান করিতে লাগিল। প্রায় অর্ধঘণ্টাব্যাপী অনবসর পরিশ্রমের কোনও ফলই ফলিল না দেখিয়াও কেহ নিশ্চেষ্ট হইল না, তথাপি অনুসন্ধান করিতে লাগিল; হয় সেই বালিকাকে, নয় তাহার মৃতদেহ তাহারা যেমন করিয়াই হউক খুঁজিয়া বাহির করিবে।

এইরূপে আরও অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাহারা দেখিল, দীর্ঘিকার অপর পার্শ্ব দিয়া কে একটি লোক সত্বরপদে চলিয়া যাইতেছে। তখন সকলে মিলিয়া সেইদিকে ছুটিল। নিকটে গিয়া লণ্ঠনের আলো ধরিয়া চিনিল, সে-লোক তাহাদেরই পাড়ার যদুনাথ গোস্বামী। তখন সকলে তাঁহাকে এক-একটা প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

গোস্বামী মহাশয় তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, 'কী রে বলা, এত রাত্রে এখানে যে লাঠি হাতে করে ঘুরছিস?'

বলাইচাঁদ তখন তাঁহাকে একে-একে সকল কথাই বলিল। শুনিয়া গোস্বামী বলিলেন, 'তবেই ঠিক হয়েছে, আমিও আসিতে-আসিতে পথে একখানা রক্তমাখা কাপড় পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম।'

তখন বলাই বলিল, 'সে-কাপড়খানা যেখানে পড়ে আছে, সেখানে আমাদের নিয়ে চলুন; 'চলুন, সে-কাপড়খানা দেখিলেই আমরা চিনিতে পারিব।'

যদুনাথ গোস্বামী প্রথমে দুই-একবার অস্বীকার করিলেন; শেষে বলাইচাঁদের একান্ত পীড়াপীড়িতে যাইতে সম্মত হইলেন।

যদুনাথ গোস্বামী, বলাইচাঁদ ও বলাইচাঁদের সঙ্গী দুইজনকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। কিছুদূর আসিয়া যদুনাথ গোস্বামী সকলকে লইয়া নিকটস্থ এক জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশিদূর আর যাইতে হইল না, দুই-চারিপদ অগ্রসর হইয়া তাহারা লণ্ঠনের আলোকে সেই রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইল। কেবল রক্তমাখা কাপড় নহে, সেখানে আরও একখানা প্রকাণ্ড ছুরি, দুই-তিনটা রৌপ্যনির্মিত মাথার কাঁটা পড়িয়া থাকিতে দেখিল।

বলাই মণ্ডল কাপড়খানা দেখিয়াই চিনিতে পারিল, সেই নিরাশ্রিতা বালিকার। যদুনাথ গোস্বামী ছাড়া আর সকলে ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। সে-সকল রক্তমাখা কাপড়, ছুরি ইত্যাদি যাহা একটা ভয়ানক খুনের সাক্ষ্যস্বরূপ পড়িয়া ছিল, কেহই স্পর্শ করা দূরে থাক, অধিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহাদের ভয়ে হাত-পা কাঁপিতে লাগিল; রক্তের সঙ্গে এমনই একটা বিভীষিকা সকল সময়ে মিশিয়া থাকে। তখন তাহাদের হাতের লাঠি এবং হাতের লণ্ঠন হাতেই রহিল; কেবল তাহারা যে সাহসে ভর করিয়া এতদূর আসিতে পারিয়াছিল, সেই সাহসটি তাহাদের মনের ভিতর হইতে যাদুকরের হাত হইতে খেলার বর্তুলটির মতো অলক্ষ্যে কোথায় উড়িয়া গেল।

সকলে ফিরিয়া আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ বন্দিনী

হুগলি জেলার জীবন পালের বাগানের নাম অনেকেই জানেন। অনেকেই জানেন, একসময়ে সেই বাগানের নিকট দিয়া দস্যুভয়ে এমনকী দিবালোকেও কেহ যাইতে সাহস করিত না। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সেইদিকটা এমন বনজঙ্গলাবৃত ছিল যে, দিবসেও সেখানে যখন-তখন দস্যুরা তাহাদিগের হত্যাকাণ্ড নির্বিঘ্নে সমাধা করিত।

জীবন পালের বাগানের উত্তরপ্রান্তে একটি জীর্ণদশাগ্রস্ত, পুরাতন, পতনোন্মুখ ভাঙাবাড়ি ছিল। তাহার কোনও-কোনও অংশ একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোনও অংশ পড়ো-পড়ো। ছাদের উপর বড়-বড় বট, অশ্বত্থ মৌরসীপাট্টা লইয়া, পুত্র-পৌত্র-পরিবার-পরিবৃত হইয়া দখলীকার আছে। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, আবর্জনাবহুল, মনুষ্যসমাগম-চিহ্ন-বিরহিত।

সেই নির্জন ভাঙাবাড়ির অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার কোনও একটা প্রকোষ্ঠে অনিন্দিত-গৌরকান্তি, স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী, অনতীতবাল্যা একটি বালিকা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। হিমনিষিক্তপদ্মবৎ তাহার মুখ অশ্রুপ্লাবনে একান্ত মলিন; তাহার লাবণ্যোজ্জ্বল দেহ কালিমাবৃত এবং কঙ্কালাবশেষ। কেশরাশি রুক্ষ, জড়িত এবং বিশৃঙ্খল। বালিকা নতমুখে এক-একটি নিশ্বাস অতিকষ্টে দুইবারে-তিনবারে টানিতেছিল। বালিকার সেই পরমসুন্দর মুখখানি এক্ষণে কাঁদিয়া ম্লান হইলেও তাহার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু এবং সেই আয়ত চক্ষুর মধুরোজ্জ্বল লীলাচঞ্চল দৃষ্টি সেই ম্লানমুখখানিতে এক অননুভূতপূর্ব সৌন্দর্য বিকাশ করিয়া রাখিয়াছিল। যে কক্ষে সেই বালিকা বসিয়া ছিল, তাহা বাহির হইতে অবরুদ্ধ। বালিকা বন্দিনী।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হৃদয়ের বেগ কিছু শমিত হইলে বালিকা পশ্চিমদিকের একটা জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া বায়ুপ্রবাহ বালিকার রাশীকৃত রুক্ষ কেশভার উড়াইয়া-উড়াইয়া একবার তাহার সেই মুখখানির উপরে ফেলিতে লাগিল; পুনশ্চ উঠাইয়া ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া সেই বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মলিন অশ্রুবিবর্ণীকৃত মুখখানি ঢাকিতে লাগিল। এমন যে সুন্দর মুখ! এমন ম্লান? না দেখিয়া ঢাকিয়া রাখাই ভালো, ইহাই বুঝি, কি এইরকম কোনও একটা বায়ুর উদ্দেশ্য। বায়ুর যে উদ্দেশ্যই হউক, বালিকা তাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেছিল।

বালিকা একদৃষ্টে দেখিতেছিল, দৃষ্টি-সীমায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল রক্তাভ-নীলিমাময় বেলাপ্রান্তে কেমন

ধীরে-ধীরে আরক্তরবি ক্রমশ ডুবিয়া যাইতেছিল; এবং আরও কিছুদূরে কী ভয়ঙ্কর মূর্তিতে নিবিড় মেঘমালা গোধূলির হেমকিরণপরিব্যাপ্ত দিকচক্রবালে আকাশের সেই মধুর কোমলচ্ছবি ব্যাপিয়া, পুঞ্জীকৃত হইয়া, স্তূপীকৃত হইয়া অল্পে-অল্পে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। বালিকার দৃষ্টি সেই সকলের উপরে নিষ্পন্দ। অদূরস্থিত প্রচুর ভিন্ন জাতীয় সদ্য-প্রস্ফুট বন্যকুসুমের স্নিগ্ধ পরিমল একত্রে মিশিয়া, সেই সংমিশ্রণে আরও মধুর হইয়া, এক অপার্থিব উপহারবৎ নিদাঘসায়াহ্নসমীরণ বহিয়া যেখানে সেই রোরুদ্যমানা ধূলিধূসরিতা, বিগলিতাশ্রুনয়না, বিপদ-বিহ্বলা বালিকা প্রস্তরগঠিতের প্রায় একখানি মূর্তিমান দুঃখের জীর্ণ ছবিটির মতো, নীরবে ঈষদুত্তোলিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইখানে সেই অলোকসম্ভবারূপিণী কিশোরীর চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। দূর বনান্তর হইতে কোনও-কোনও মধুরকণ্ঠ পাখির অমৃতবর্ষিণী কলকণ্ঠগীতি সেই বালিকার নিকটবর্তী সকল স্থানই মুখরিত করিয়া রাখিয়া ছিল। বালিকার সেদিকে লক্ষ্য নাই। বালিকা সেইখানে সেইরূপ নিশ্চলভাবে পাষাণ-প্রতিমার মতো অনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে অবসন্ন বনতলে ধূসরবসনা সন্ধ্যার অন্ধকার অল্পে অল্পে যখন ঘনাইয়া আসিতে লাগিল এবং তখন সেই আসন্ন সন্ধ্যার অল্প-অল্প অন্ধকারে আর পশ্চিম গগনের নিবিড় জমাট মেঘের কালো ছায়ায় সায়াহ্নলীন অস্ফুট ম্রিয়মাণ দিবালোক আরও মলিন হইয়া আসিতে লাগিল, তখন বালিকার উদাসদৃষ্টি চঞ্চল হইয়া প্রকৃতির এই অপূর্ব পরিবর্তন-পারম্পর্যে সবিস্ময়ে ফিরিতে লাগিল; সহসা সেই আসন্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কী দেখিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল এবং মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল! বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় চকিতে তথা হইতে সরিয়া গৃহকোণে গিয়া দাঁড়াইল; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বালিকা সভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ মর্মাহতা

অনতিবিলম্বে রুদ্ধদ্বার উদঘাটন করিয়া এক ব্যক্তি সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকার শয়নের নিমিত্ত এক কোণে একটি কদর্য শয্যা ছিল, লোকটা তাহার উপরে বসিল। বালিকা সেই শয্যার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে নিকটস্থ হইতে দেখিয়া বালিকা অপর পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

সেই আগন্তুকের বয়স চল্লিশ বৎসরের কম নহে; কিন্তু তাহাকে দেখিয়া বত্রিশ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। তাহার দেহ বলিষ্ঠ, হস্তপদাদি মাংসপেশিতে স্ফীত, বক্ষ উন্নত, প্রশস্ত এবং অটুট স্বাস্থ্যের ও অতুল শক্তির পরিচায়ক। মুখাকৃতি মন্দ নহে; তবে একসময়ে যৌবনের প্রারম্ভে ওই মুখাকৃতি যে দেখিতে সুন্দর ছিল, সে অনুমানটা এখনও সহজেই করা যায়। দেহের বর্ণ গৌর।

বালিকাকে সম্বোধন করিয়া আগন্তুক বলিল, 'রেবতী, কতদিন আর এমন যন্ত্রণা ভোগ করিবে? আমার কথায় আর অমত করিয়ো না। তোমার জন্য আমি এতদূর লালায়িত দেখিয়াও কি তোমার মনে একটুমাত্র দয়া হয় না?'

রেবতী কোনও কথা কহিল না।

আগন্তুক আবার বলিল, 'রেবতী, কথা কও, এতদূর আসিয়া তোমার একটি মিষ্ট কথা শুনিব, এমন অদৃষ্টও কি আমার নয়?'

রেবতী মৃদুনিক্ষিপ্তস্বরে বলিল, 'আমি এখনও বলিতেছি, এ-জীবন থাকিতে আমি কখনওই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না। তোমাকে বিবাহ করিয়া, শত দাস-দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া অতুল ঐশ্বর্য উপভোগ করা অপেক্ষা এই বননিবাসে চিরবন্দিনী হইয়া থাকাও এখন আমার পক্ষে অতুল সুখ।'

আগন্তুক কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া, কী ভাবিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবে এই অতুল সুখেই চিরজীবনটা এইখানে কাটাও; কিন্তু নিশ্চয় জানিয়ো, আমার কথা না শুনিলে কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। তুমি যত কঠিন হইবে, আমিও কঠিন হৃদয়ে তোমার উপরে সেইরূপ কঠিন-কঠিন ব্যবস্থাও ক্রমে চালাইতে থাকিব। চিরদিন আমি তোমার নিকটে এমনই বিনীত, এমনই অনুগ্রহপ্রার্থী থাকিব না; যে কোনও প্রকারে হউক, আমি আমার কার্যোদ্ধার করিবই। এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া যে সুখভোগ করিতে অনিচ্ছুক, তখন আমার উপপত্নী হইয়া স্বেচ্ছায় সে সুখের জন্য লালায়িত থাকিবে। এখন বুঝিতেছি, যতদিন তুমি সেই দেবা ছোঁড়াটাকে ভুলিতে না পারিবে, ততদিন আমার কথায় কিছুতেই সম্মত হইবে না; ভালো, শীঘ্রই তাহার ছিন্নমুণ্ড এইখানেই তোমার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে দেখিবে।'

এই বলিয়া আগন্তুক এমন ভ্রূকুটিকুটিলমুখে সেই সরলা বালিকার দিকে চাহিল যে, বালিকা কী বলিতে যাইতেছিল, ভয়ে বলিতে পারিল না—ভয়ে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাহার শিরায়-শিরায় উচ্ছ্বসিত রক্তস্রোত বিদ্যুদ্বেগে বহিয়া হৃৎপিণ্ড পূর্ণ করিতে লাগিল। বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার নিষ্প্রভতার চক্ষু দিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

ভীতিবিহ্বলা রেবতী আগন্তুকের সম্মুখে আসিয়া, ক্ষিতিতলন্যস্তজানু হইয়া, বাত্যাবিচ্ছিন্নবাসন্ত্যবল্লরীবৎ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, বুকফাটা-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'কেশববাবু, আমি মাতৃপিতৃহীনা, দুর্ভাগিনী। আমার মুখ চাহিয়া, আমার এই যন্ত্রণা দেখিয়া কি তোমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না? দয়া হয় না? আমার কাকার সঙ্গে তোমার কত হৃদ্যতা—কাকা তোমায় কত যত্ন করেন, আমি তো তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রী। তবে কেন আমাকে এখানে রাখিয়া এমন অসহ্য পীড়ন করিতেছ? তুমি আজ প্রায় এক বৎসর ধরিয়া আমাদের বাড়িতে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে প্রত্যহ যাইতে; আমাকে—আমার ছোট বোনকে তুমি কতই না স্নেহ করিতে; কতই না ভালোবাসিতে; কিন্তু সে-ভালোবাসায় তো এমন কোনও অন্যভাব ছিল না। কাকাবাবু আমাদিগকে যেমন ভালোবাসিতেন, তুমিও আমাদের সেইরূপ ভালোবাসিতে; তখন তো তোমার চোখে একদিনের জন্য এ-কলুষিত স্পৃহার কোনও চিহ্নও ফুটিতে দেখি নাই। আমি তোমাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতাম; সে-ভক্তির বিনিময়ে আমি যে স্নেহ তোমার কাছে আকাঙ্ক্ষা করিতে পারি, তাহা না দিয়া তুমি আমার কাছে এ কী জঘন্য প্রস্তাব করিতেছ? কেশববাবু, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমাকে আমার বাড়িতে পাঠাইয়া দাও; আমি প্রাণান্তে এ-সকল কথার একটি বর্ণও প্রকাশ করিব না। না জানি, আমার জন্য সেখানে এখন কী হাহাকারই পড়িয়া গিয়াছে!'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ মুক্তি

রেবতীর সেই ব্যথাব্যঞ্জক কাতরোক্তিতে পাপান্তঃকরণ, নারকী কেশবচন্দ্র কর্ণপাত করিল না; বরং নিজের অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথমে বালিকার অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুছাইয়া দিল, তাহার পর টানিয়া আপনার বুকের উপর তুলিতে চেষ্টা করিল।

স্ফীতজটা সিংহীর মতো রেবতী তখন আপন বলে উঠিয়া দূরে দাঁড়াইল। তাহার শিশিরসিক্ত কমলতুল্য ও ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল রোষরক্তরাগরঞ্জিত হইয়া আর এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। দলিতফণা ফণিনীর ন্যায় বালিকা ফুলিতে-ফুলিতে রোষতীব্রকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'পিশাচ, ধিক তোকে! তোর মুখ দেখিতেও পাপ আছে; এখনি এখান থেকে দূর হ—তোর যা ইচ্ছা হয় করিস—যে যন্ত্রণা দিতে চাস—দিস, আমি তোকে আর ভয় করি না! তোর মতো নারকীর নিকটে দয়াভিক্ষা করা অপেক্ষা সহস্রবিধ যন্ত্রণাপ্রদ মরণও ভালো।'

বর্ধিতরোষা রেবতীর দীপ্ত চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল; নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর দিয়া ঘন-ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল এবং সেই দ্রুতশ্বাসে বক্ষস্থল ঘন-ঘন স্ফীত হইতে লাগিল।

বালিকার সেই ভাব দেখিয়া কেশবচন্দ্র কিছু বিস্মিত, কিছু স্তম্ভিত, কিছু বা ভীত হইল। তথাপি পাপী অস্খলিতসঙ্কল্পে সেই মুহ্যমানা বালিকার দিকে পুনরগ্রসর হইল। ব্যাধতাড়িত হরিণশিশুর ন্যায় বালিকা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কেশবচন্দ্রও বালিকাকে ধরিবার জন্য বাহিরে আসিতে গেল। বাহিরের কবাটের পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল। কেশবচন্দ্র যেমন বাহিরে আসিবে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে সজোরে এমন এক ধাক্কা দিল তাহাতে কেশবচন্দ্র পড়িয়া না গেলেও দশ পদ পশ্চাতে হটিয়া গেল। সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া এক মুহূর্তের জন্যও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সেইখানেই তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। সেই এক মুহূর্তের মধ্যে স্ত্রীলোকটি দুই হাতে তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া বাহির হইতে শিকল লাগাইয়া দিল। তারপর রেবতীর হাত ধরিয়া সেইখানে দাঁড়াইল, রেবতী বিস্ময়-স্থিরনেত্রে সেই স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বাঘ ও সাপিনী

'মোহিনী, মোহিনী, কেন মরিবি? দে, কবাট খুলে দে—কেন মরিবি?' বলিয়া ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষুধার্তব্যাঘ্রবৎ বিকট গর্জন করিতে লাগিল এবং বারংবার কবাটের উপর সবলে পদাঘাত করিতে লাগিল। শালকাঠের কবাট সেই শত পদ-প্রহারে কিছুমাত্র ভিন্ন না হইয়া, বোধহয়, সেই নিরাশ্রিতা বালিকার মুখ চাহিয়া পূর্ববৎ স্থির রহিল।

পাঠক বুঝিয়াছেন কি, যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিলাম, সে আমাদের সেই মোহিনী, সেই মরিয়া, দুঃখিনী, নৈরাশ্যপীড়িতা, লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পিণী, উন্মাদিনী।

ভিতর হইতে কেশবচন্দ্র সেই রুদ্ধদ্বারে দেহের সকল শক্তি একত্র করিয়া পদাঘাতের উপরে পদাঘাত করিতে লাগিল, আর বজ্রনিঃস্বনে বলিতে লাগিল, 'মোহিনী, পিশাচী, এখনই কবাট খুলে দে, কেন মরিবি!'

মোহিনী গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিদ্রূপের মৃদুহাসি হাসিয়া বলিল, 'আমার মরণের জন্য ইহার পর চিন্তিত হইয়ো—তখন অনেক সময় পাইবে। এখন নিজের মরণের ভাবনা ভাবিতে আরম্ভ করো। এ যে-সে মরণ নয়, এইখানে—অনাহারে—তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া মরণ—তোমার উপযুক্ত মরণ—তিল-তিল করিয়া অনেকদিনব্যাপী যন্ত্রণাময় সুদীর্ঘ মরণ। তোমার মরণ-প্রতীক্ষা করিয়া আমি এখনও মরি নাই। আগে যেমন দিন-রাত তোমার আরাধনা করিয়া মরিতাম—এখন তেমনি দিন-রাত তোমার মরণের আরাধনা করিয়া ঘুরিতেছিলাম। এখন তোমাকে সেই মরণের মুখে তুলিয়া দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম।'

যে তালা-চাবি কেশবচন্দ্র ব্যবহার করিত, তাহা শিকলের আংটায় লাগানো ছিল; মোহিনী সেই শিকলে সশব্দে তালাবদ্ধ করিয়া চাবিটি দূরবনমধ্যে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

কেশবচন্দ্র পুনরপি বলিল, 'মোহিনী, এখনও কবাট খুলে দে, কেন মরিবি?'

হাসিয়া মোহিনী উত্তর করিল, 'ভয় দেখাইতেছ কাকে? আমার আর মরণের ভয় নাই।'

কে। ইহাতে আমার কী ভয়ানক ক্ষতি হইবে, তুমি জানো না।

মো। তোমার ক্ষতিতে আমার কতখানি লাভ হইবে—তুমি তাহা জানো না।

কে। ইহার জন্য কখনওই আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।

মো। ক্ষমা করিবার জন্য কেহ তোমায় মাথার দিব্য দিবে না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : মোহিনী ও রেবতী

মোহিনী, রেবতীকে সঙ্গে লইয়া দ্রুত বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুদূর আসিয়া উভয়ে এক নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন বটবৃক্ষতলে দাঁড়াইল। সেখানে রেবতীর মুখ হইতে তাহার দুরবস্থার সকল কথা একে-একে মোহিনী শুনিল। শুনিয়া মোহিনী বলিল, 'এখন কী করিবে? কী করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? বেণীমাধবপুর এখান হইতে বিশ ক্রোশ, এতদূর পথ তুমি একাকী এখন যাইতে পারিবে না; তাহাতে বিপদও আছে, আর ধরা পড়িতে পারো! এ হুগলি জেলায় তোমার কেহ আত্মীয় নাই, যেখানে আপাতত কিছুদিনের জন্য লুকাইয়া থাকিতে পারো?'

রেবতী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'কে আছে? কই তেমন আত্মীয় কেহ নাই; তবে চন্দননগরে গোঁসাইপাড়ায় আমাদের এক গুরু আছেন, তাঁহার সহিত দেখা করিতে পারিলে তিনি আশ্রয় দিতে পারেন।'

মোহিনী। চন্দননগর এখান হইতে দুই ক্রোশেরও বেশি। আকাশ যেরূপ ঘোর করিয়া রহিয়াছে, এখনই বৃষ্টি আসিবে, পথে তোমার কষ্ট হইবে। যদি যাইতে সাহস করো, আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতে পারি। সে পথে গেলে তোমার কোনও বিপদ হইবে না।

রেবতী। তুমি এখানে থাকো কোথায়? নয় তোমার এখানে এ-রাত্রিটার মতো থাকিতাম।

মো। আমার থাকার নির্দিষ্ট কোনও স্থান নাই, যখন যেখানে যাই, সেইখানেই একটু থাকিবার সুবিধা করিয়া লই; এইরূপে বনে-বনে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াই।

রে। তোমার কি কেউ নাই?

মো। আছে—স্বামী।

রে। তিনি তোমার খোঁজ রাখেন না?

মো। তাঁহার অনুগ্রহ।

রে। তিনি কোথায় থাকেন?

মো। সেই যে তিনি—যিনি তোমাকে আমার সতীন করিবার জন্য খুব সাধ্য-সাধনা করছিলেন!

রে। (বিস্মিত হইয়া) তিনি? এমন স্বামী!

মো। (ছুরি দেখাইয়া) এমন স্বামী বলিয়াই তো এই ছুরিখানা লইয়া ঘুরিতেছি। এ-জন্মে তো তাঁহাকে পাইলাম না; পাইলাম না—অথচ কলঙ্ক কিনিলাম। ইহলোকে পাইলাম না বলিয়া পরলোকে তাঁহার আশা ত্যাগ করি কেন? একদিন—যেদিন পরলোক যাত্রার সময় আসিবে, তখন এই ছুরি তাঁহার হৃদয়-শোণিতে আর আমার হৃদয়-শোণিতে একটা অবিচ্ছেদ্য অক্ষয় মিলন করাইয়া দিবে। চলো, এখন আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিই। আমাকে এখনই ফিরিতে হইবে।

রে। তোমার কী হইবে? তিনি তোমার উপর যেরূপ রাগিয়াছেন, তাহাতে তোমার কী দশা হইবে—কে জানে? আমার জন্য তুমি কেন বিপদে পড়িবে?

মো। আমার এ-জীবনের উপর দিয়া আগে অনেক বিপদ গিয়াছে। এখন অনেক দিন হইতে খালি পড়িয়া আছে, সেইজন্য কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হয়, তুমি বিপদ ভালোবাসো না। কিন্তু আমি নিত্য-নিত্য বিপদের সঙ্গে থাকিয়া বিপদকে কেমন যেন একটু ভালোবাসিতে শিখিয়াছি। তাই আমি বিপদ ভালোবাসি। তোমার বিপদটা আমি যদি নিই, তাতে আর তোমার দুঃখ কী? এখন এসো, যতক্ষণ তোমাকে এখান হইতে না সরাইতে পারিতেছি—ততক্ষণ তোমার বিপদটা আমি সম্পূর্ণ দখল করিতে পরিতেছি না।

মোহিনী রেবতীর হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কেশবচন্দ্রের মুক্তি

বাহির হইবার আর কোনও উপায় না দেখিয়া কেশবচন্দ্র সেই অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং অন্ধকারমাত্রাত্মক হইয়া সম্মুখস্থ নিবিড় বনভূমি ভীষণ হইয়া উঠিল। ক্রমে গর্জন করিয়া প্রবলবেগে ঝটিকারম্ভ হইল এবং ঝটিকান্দোলিত অসংখ্য বন্যবৃক্ষের সহিত নিবিড়তর অন্ধকার সংক্ষুব্ধসমুদ্রবৎ তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। মেঘমণ্ডিত মসীমলিন আকাশের সহিত তদনুরূপ বনস্থলী একত্রে মিশিয়া নীলিমা ঢাকিয়া, তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র ঢাকিয়া প্রকৃতির বক্ষে চিত্রবৈচিত্র্যবিহীন, যতদূর-দৃষ্টি-চলে-ততদূর-বিস্তৃত একখানা কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল।

ক্ষণপরে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়া আর এক অন্ধকার-মূর্তি সেই অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইতে ডাকিল, 'রেবতী—রেবতী—'

তাহার কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি বলিতে-বলিতে উঠিল, 'কে রে, গোরাচাঁদ? এদিকে এক সর্বনাশ হয়ে গেছে,' বলিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

গোরাচাঁদ বলিল, 'এই যে আপনি এখানে আছেন, আপনাকে খুঁজতেই আমি এখানে এসেছি; দরজাটা খুলে দিন, অনেক কথা আছে।'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'দরজা বাহির হইতে বন্ধ; শীঘ্র দরজাটা খুলে দে।'

অন্ধকারে হাতড়াইয়া গোরাচাঁদ শিকল অনুসন্ধান করিল। দেখিল, তাহা তালাবন্ধ; বলিল, 'ডাক্তারবাবু, এ যে চাবি দেওয়া, কেমন করে খুলব? আপনার কাছে চাবি আছে?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'চাবি নাই। যেমন করিয়া হোক, এখন ভাঙিয়া ফেল।'

গোরাচাঁদ বিস্মিত হইয়া বলিল, 'ব্যাপার কী? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! কী হয়েছে?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'সর্বনাশ হয়েছে—পাখি উড়িয়াছে—ভরা জাহাজ ডুবিয়াছে—এক দম্‌সে বিশহাজার টাকা লোকসান। আগে দরজাটা খুলিয়া দে, সব কথা বলিতেছি।'

গোরাচাঁদ অনেক অনুসন্ধান সেই ভাঙাবাড়ির এদিক-ওদিক ঘুরিয়া জানালা ভাঙা একটা লোহার গরাদ সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহাতেই তাহার কার্যোদ্ধার হইল; শিকলের ভিতর সেই লৌহদণ্ড প্রবিষ্ট করাইয়া একপাক ঘুরাইতেই ভাঙিয়া খুলিয়া গেল—কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ মোহিনীর সন্ধান

কেশবচন্দ্র বাহিরে আসিয়া গোরাচাঁদকে বলিল, 'গোরাচাঁদ, রেবতী পলাইয়া গিয়াছে।'

সবিস্ময়ে গোরাচাঁদ বলিল, 'সে কী! কোথায় গেল? কখন?'

কেশবচন্দ্র বলিল, 'কোথায় জানি না—একঘণ্টা হইবে, আমার চোখের সামনে সে পলাইয়া গিয়াছে।'

কেশবচন্দ্র আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা গোরাচাঁদকে বলিল। শুনিয়া গোরাচাঁদ আরও বিস্মিত হইল। বলিল, 'কী সর্বনাশ! এখনি রেবতীর খোঁজ করতে হবে।'

'এখনি কী, এই মুহূর্তে তাকে যেমন্ করে হোক ধরতে হবে নতুবা সব পণ্ড হবে। তুই তো সব গোল বাধাস। তোর ফিরতে এত দেরি হল কেন, বল দেখি? বেটা, যদি একঘণ্টা আগে ফিরতিস তা হলে আর আমাকে বাইশ হাত জলে পড়তে হত না। এখন আমার এমন রাগ হচ্ছে তোর উপর যে—তোরই মাথাটা ভেঙে ফেলি।'

'হ্যাঁ, আমারই বেশি দোষ কি না; আটক হয়ে চুপ করে বসে ছিলেন, আমি এসে আপনাকে

বার করলেম—এই আমার অপরাধ।'

(সক্রোধে) 'অপরাধ না বেটা, তুই যেখানে যাবি, সেইখানেই বাঘের মাসি—একঘণ্টার জায়গায় দশঘণ্টা কাটিয়ে তবে ফিরবি, তোকে নিয়ে আমার কাজ চালানো ভার দেখছি।'

'আমি তো সন্ধ্যার আগেই ফিরেছিলেম, বিশ ক্রোশ পথ সহজ নয় তো; তারপর আপনার বাড়িতে যদি গেলাম, সেখানে আপনাকে দেখতে পেলাম না; সেখান থেকে আবার তমীজউদ্দীনের বাড়িতে গেলাম। তার মেয়েটির সঙ্গে দেখা হল, আপনার কথা জিজ্ঞাসা করতে সে বেটি 'নাই' বলে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। তারপর এখানে এসে যা শুনলেম—শুনেই চক্ষুস্থির।'

'এখন যেখানে তোকে পাঠিয়েছিলেম, সেখানে গিয়ে তুই কী করে এলি বল দেখি? সে কী বলিল?'

'আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি একটা নির্জনে ঘরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালে; সেখানে আমি সেটা তার হাতে দিলেম, দেখেই খুব আপ্যায়িত।'

'টাকার কথা কী হল?'

'সেইদিকেই গোল বেধে গেছে; দুটো কাজই শেষ করা চাই, তা না করতে পারলে টাকা-কড়ির বিষয় কিছু হবে না। আপনি মনে করছিলেন, আগে একটা কাজ শেষ করে, কিছু টাকা হস্তগত করে শেষে তাকে জড়িয়ে ফেলে এমন এক চাল চালবেন যে, তার জমিদারি তালুক-মুলুক সবগুলি আপনার হাতেই আসবে; তা আর হল কই? সে ভারি ধড়িবাজ লোক, আমাদের উপরের একচালে সে চলে; সে বললে, দুটোতে আমার যা আশঙ্কা, একটাতেও তাই; এতে আর কাজ হাসিল হল কই?'

'এত যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম সকলই পণ্ড হল দেখছি।'

'আমি বললেম, দুটোকে একেবারে শেষ করুন, তা তো আপনি শুনলেন না; এখনি ঘরে রোক বিশহাজার টাকার তোড়া তুলতেন। গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্ট লাগে। আপনি পড়লেন বেশি লোভে, কাজেই অতি লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু।'

'কেন? তুই বললিনি, তার সঙ্গে কথা ছিল কী? এক-একটা কাজ শেষ হবে, এক-একটা কাজে দশ-দশহাজার টাকা; এই কথাই তো বলা-কহা ছিল; লেখাপড়ার মধ্যেও তো তাই আছে যে, দুইটি কাজ দশহাজার টাকা হিসাবে বিশহাজার টাকা দেওয়া হবে।'

'তা তো বুঝলেম, কিন্তু সেই বিশহাজার টাকা যে দুই কিস্তি নয়, এক কিস্তিতে। তা এখানে এসে যা দেখছি তাতে তো আপনি একেবারে কিস্তিমাৎ করে বসে আছেন; এখন বিশহাজার টাকার জায়গায় বিশটা পয়সাও পাবেন না।'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া কেশবচন্দ্র ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, 'গোরাচাঁদ, তুই যা, যেমন করিয়া পারিস, রেবতীকে ধরিয়া আন। যদি তাকে জীবিত অবস্থায় আনতে পারিস, আগে সে চেষ্টা করিস—আমি তাকে স্বহস্তে খুন করব। যদি তেমন কোনও গোলযোগের সম্ভাবনা দেখিস, তা হলে খুন করে তার মৃতদেহ নিয়ে আসবি। জীবিত কি মৃত যে কোনও অবস্থায় রেবতীকে আমার চাই-ই চাই; নইলে বিশহাজার টাকা একেবারে ফাঁক হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি, অতি লোভটা করা আমার অন্যায় হয়েছে। তুই রেবতীর সন্ধানে যা, আমি মোহিনীর সন্ধানে যাই—এই বিশহাজার টাকার শোধ আমি মোহিনীর উপরে তুলব—তবে ছাড়ব; আগে আমি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেম; যা মনে করতেম, এখন দেখছি তা নয়; সে আমার একটা ভয়ানক শত্রু।'

তখন অদূরে থাকিয়া অন্তরাল হইতে স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, 'শত্রু বলে শত্রু—পরম শত্রু! সে শত্রুর সন্ধান করিতে কোথাও যাইতে হইবে না, এখানে আছে; তোমাকে ছাড়িয়া সে এক মুহূর্ত কোথাও থাকে না। তা যদি থাকিবে, তবে সে তোমার শত্রু কী? যদি দূরেই থাকিবে তবে বিনোদ, সে শত্রু তোমায় পদে-পদে শত্রুতা করিবে কী প্রকারে?'

পাঠক, বিনোদলাল আর কেশবচন্দ্র একই লোক।

কণ্ঠস্বরে কেশবচন্দ্র বুঝিতে পারিল, সে মোহিনী; কিন্তু চারিদিকে যে ভয়ানক অন্ধকার; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অন্ধকার ঠেলিয়া কোথাও তাকে দেখিতে পাইল না; তখন বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল এবং ঝড় তেমনি প্রবলবেগে তখনও গর্জন করিয়া ছুটিতেছিল। সেই ঝড়বৃষ্টির এলোমেলো শব্দে কেশবচন্দ্র কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না, মোহিনী কোথায় দাঁড়াইয়া তাহাকে উপহাস করিল। চারিদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল, যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাইল না।

'আমাকে দেখিতে পাইতেছ না? এই যে আমি।' বলিয়া তখনই মোহিনী একটি জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। ক্রুদ্ধ শার্দূলের মতন বিকট গর্জন করিয়া কেশবচন্দ্র মোহিনীকে ধরিতে গেল। সেই মুহূর্তেই মোহিনী চকিতে আবার সেই সর্পসঙ্কুল জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। একে নিবিড়তর অন্ধকার—সেই জঙ্গলের ভিতর যাইয়া কেশবচন্দ্র ও গোরাচাঁদ মোহিনীকে অনেক খুঁজিল; মোহিনীকে পাইল না।

কেশবচন্দ্র বলিল, 'এক কাজে দুজনে থাকিবার প্রয়োজন নাই। গোরাচাঁদ, তুই রেবতীর সন্ধানে যা, যেমন করিয়া পারিস, রেবতীকে আনিতে চাহিস। আমি এখানে রহিলাম—মোহিনীকে খুন না করিয়া আমি অন্য কাজে হাত দেব না। পিশাচী আমার বড় আশায় ছাই দিয়াছে।'

গোরাচাঁদ চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ জবানবন্দি

পাঠক, এখন কেশবচন্দ্র, গোরাচাঁদ, মোহিনী ইত্যাদির কথা রাখিয়া তৃতীয় পরিচ্ছেদে যে-দুর্ঘটনার কথা বলিতেছিলাম, তাহাই এখন আমাদিগের আখ্যায়িকার পুনরবলম্বন হইল। সেই দীর্ঘিকার অদূরবর্তী জঙ্গল-মধ্যে যে-রক্তমাখা কাপড়, দীর্ঘ ছুরি ইত্যাদি পড়িয়াছিল, তাহা লইয়া পরদিন প্রত্যুষে গ্রামমধ্যে এমন একটা হইচই পড়িয়া গেল যে, কথাটা রঞ্জিত—ক্রমে অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে-মুখে ফিরিতে লাগিল।

গোবর্ধনের ঘরের সম্মুখে স্নিগ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন বটগাছের তলায় তৃণাস্তরণে বসিয়া হুঁকা হস্তে, কাশিকণ্ঠে, গম্ভীরমুখে এবং স্তিমিতনেত্রে প্রাচীনেরা সেই কথারই আলোচনা করিতে লাগিল। ঘাটে কলসী-কক্ষে বামা, উচ্ছিষ্ট-মলিন তৈজসস্তূপহস্তে শ্যামা, একরাশি ক্ষারসিদ্ধ-বস্ত্রস্কন্ধে শম্ভুর মা এবং তৈলাক্তদেহে কামিনী সেই প্রসঙ্গের উপরে নিজেদের মতামতের এক-একটা অলঙ্ঘ্য দৃঢ় ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রভাতোদয়ের সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম ঘটনাস্থলে দেখা দিলেন। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালাও আসিল। বলাই মণ্ডল ও তাহার সঙ্গিগণের জবানবন্দি অরিন্দম একে-একে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। তাহারা যাহা জানিত, ঠিক-ঠিক বলিয়া গেল; সেবার ঘোর-ফেরে তাহাদের বড়-একটা পড়িতে হইল না। যেখানে একটু মিথ্যার গন্ধ আছে, সেইখানে গোলযোগ; সেই গোলযোগে যদুনাথ গোস্বামী একটু জড়াইয়া গেলেন। অরিন্দম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কাল রাত্রে তেমন দুর্যোগে কোথা হইতে আসিতেছিলেন?'

য। গোঁসাইপাড়ায় আমার ভগ্নীপতির বাড়ি, আমার ভগ্নী পীড়িতা, তাই তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেইখান হইতে ফিরিতেছিলাম।

অ। ফিরিয়া আসিবার সময়ে আপনি কি আগে এই রক্তমাখা কাপড় দেখিতে পাইয়াছিলেন? না, আপনার সঙ্গে আর কেহ তখন ছিল, সে আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছিল?

য। না, আমার সঙ্গে আর কেহ ছিল না, আমিই আগে দেখিতে পাই।

অ। ভালো, দেখিবার পূর্বে এই জঙ্গলের মধ্যে যাইবার আপনার তখন কোনও আবশ্যক হইয়াছিল কি?

য। না, আমি উহার ভিতরে যাইব কেন?

অ। তবে কেমন করিয়া আপনি যে তেমন অন্ধকারে ওই কাপড়খানা জঙ্গলের ভিতরে পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।

য। কেন? বিদ্যুতের আলোতে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম।

অ। কাপড়খানা দেখিবার পর, বলাই মণ্ডলের সঙ্গে দেখা হইবার আগে আপনি ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিলেন?

য। (ক্ষণেক চিন্তা)

অ। বলুন না, ইহাতে ভাবিয়া বলিবার কী আছে?

য। না।

অ। এই চল্লিশোর্ধ বয়সেও আপনার দৃষ্টিশক্তি এরূপ তীক্ষ্ণ আছে দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। দিবালোকে চেষ্টা করিয়া দেখিলে বাহির হইতে বোধহয় এ-কাপড়খানা কিছুতেই দেখিতে পাওয়া যাইত না; রাত্রে বিদ্যুতের আলোকে তাহাও আপনি দেখিতে পাইয়াছিলেন; তা ছাড়া কাপড়খানা যে রক্তমাখা, তাহাও বাহির হইতে আপনি স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। কেমন গোস্বামী মহাশয়, এ-সকল যেন কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে না?

য। আপনি কি মনে করিতেছেন যে, আমি আপনাকে মিথ্যা কথা বলিলাম?

অ। তা কি মনে করিতে পারি? তবে যে আপনি সত্য কথা বলিতেছেন, ইহাও মনে করিতে পারিতেছি না। দেখুন, গোস্বামী মহাশয়, আপনি আমাকে বলাই মণ্ডলের মতো একজন সরল বিশ্বাসী বলিয়া মনে করিবেন না যে, আপনি যাহা বলিয়া যাইবেন, তাহাই বিশ্বাস করিব। আর আমরা চোখ-বাঁধা বিশ্বাসেও কোনও কাজ করি না। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক কথাটির উপরে সন্দেহ করিয়া-করিয়া তবে একটি সূত্র পাই; সেই সূত্র ধরিয়াই আমাদের কাজ করিতে হয়। যতক্ষণ না লোকে কোনও বিষয় গোপন না করিয়া অকপটচিত্তে প্রকৃত কথা আমাদিগকে শুনাইয়া যায়, ততক্ষণ আমরা আমাদের কার্যোদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতে পাই না। তাহার ভিতর একটু মিথ্যার ছায়া দেখিতে পাইলেই অনেকটা আশা করিয়া থাকি; আপনার দুই-একটি কথা শুনিয়াই আমার মনে সেই রকমের অনেকটা আশা হইয়াছে যে, আমি আপনার সাহায্যেই শীঘ্র কৃতকার্য হইতে পারিব। আপনি যেন এ খুন-রহস্যের ভিতর একটু-না-একটু জড়িত আছেন, আপনার কথা শুনিয়া এমনও একটু বোধ হইতেছে। দেখা যাক, কী হয়।

য। (রাগভরে) না হয়, আমিই খুন করিয়াছি, আমাকেই তবে চালান দিন। সাত পো অধর্ম না হলে কেউ পুলিশের হাঙ্গামে পড়ে না। আপনারা থানার লোক, আপনারা সব করিতে পারেন।

অ। (মৃদুহাস্যে) আঃ! আপনি রাগ করেন কেন? আপনি এখন স্বচ্ছন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারেন, আপনাকে আর আমার কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার নাই।

যদুনাথ গোস্বামী মুখভার করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, অরিন্দম তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : পদচিহ্ন

যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যদুনাথ গোস্বামীকেই কি আপনি এ-খুন সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'খুন কোথায়, যোগেনবাবু? আপনি কি মনে করিয়াছেন, সেই বালিকাকে কেহ হত্যা করিয়াছে?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এই রক্তমাখা কাপড়, ছোরা দেখিয়া তাহা ভিন্ন আর কী মনে করা যাইতে পারে? বিশেষত একটা দস্যু ছুরি লইয়া সেই বালিকার অনুসরণ করিয়াছিল, শুনিলাম। আপনি কী বলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি যতটুকু বলিতে পারি, সেই বালিকা মরে নাই, কোথাও যায় নাই, এই গ্রামের মধ্যে আছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'বলাই মণ্ডল যে বালিকাকে "খুন করিল" বলিয়া বারংবার আর্তনাদ করিতে শুনিয়াছিল, সেটুকু কি বলাই মণ্ডলের একটা স্বপ্ন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'স্বপ্ন নহে, ওই জন্য আমারও মনের ভিতর একটু গোলযোগ বাধিয়াছে; নতুবা এখানে আসিয়া আর যাহা শুনিলাম, আর যাহা দেখিলাম, তাহাতে বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, বেশ বুঝা যাইতেছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সেই বালিকা যে এখনও বাঁচিয়া আছে, এমন কী প্রমাণ পাইলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যে দুই-চারিটি প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে আমি অনেকটা নির্ভর করিতে পারি। প্রথমত, এই জঙ্গলের ভিতরে ও বাহিরে কর্দমের উপর যে-সকল পদচিহ্ন রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোনওটিই বালিকার বলিয়া বোধ হয় না। সকলগুলিই যথেষ্ট লম্বা এবং যথেষ্ট চটলা।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তাহা যেন হইল, কিন্তু হত্যাকারী অপর স্থানে সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া সেই জঙ্গলের ভিতরে রক্তমাখা কাপড় আর ছুরিখানা লুকাইয়া রাখিতে পারে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'দ্বিতীয়ত, হত্যাকারীর কোনও চিহ্ন দেখিতেছি না; এই জঙ্গলের ভিতরে কেবল চারি রকমের পায়ের দাগ দেখিতেছি; চারিজনের মধ্যে একজন বলাই মণ্ডল, একজন সাধুচরণ, *একজন হরেকৃষ্ণ, *একজন আমাদের গোস্বামী প্রভু। এই চারিজনেই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছিল বলিতেছে; চারিজনেরই পায়ের দাগ পাওয়া যাইতেছে; এই চারিজন ছাড়া এই জঙ্গলের মধ্যে কেহ যায় নাই, তাহা হইলে চারিটা ছাড়া অপর রকমের দাগ একটি-না-একটি দেখিতে পাইতাম। আর সত্যই যদি বালিকা খুন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই চারিজনের মধ্যেই কেহ সেই বালিকার হত্যাকারী।'

এই বলিয়া অরিন্দম উঠিলেন, জবানবন্দি দিতে আসিয়া বলাই মণ্ডল, সাধুচরণ, হরেকৃষ্ণ ও যদুনাথ গোস্বামীর যে-সকল পায়ের দাগ ভিজা মাটিতে পড়িতে তিনি দেখিয়াছিলেন, সেইগুলির সহিত জঙ্গল-মধ্যস্থিত পায়ের দাগগুলি এক-একটি করিয়া মাপে মিলাইয়া যোগেন্দ্রনাথকে দেখাইলেন। সকলগুলিই মাপে ঠিক হইল। কোনটি কাহার পায়ের দাগ, তাহাও বলিয়া দিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টিতে অবাঙ্মুখে অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'আরও একটা কথা হইতেছে, এই কাপড়খানিতে যে ভাবে রক্ত লাগিয়াছে, তাহাতে হত্যাকাণ্ডের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয়, কেহ কাপড়খানাতে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছে। তা ছাড়া, যদি ওই ছুরি কিংবা ওইরূপ কোনও অস্ত্র দিয়াই সেই বালিকাকে খুন করা হইত, তাহা হইলে ওই কাপড়ের কোনও এক অংশ সম্পূর্ণরূপে রক্তে ভরিয়া যাইত; এমন এখানে একটু, সেখানে একটু করিয়া চারিদিকে রক্ত লাগিবে কেন? হত্যাকারীর কাপড়ে এরূপভাবে রক্ত লাগা অসম্ভব নহে। তা ছাড়া, খুন করিয়া মৃতদেহ হইতে কাপড়খানি খুলিয়া লইবারও কোনও কারণ দেখিতেছি না। কাপড়খানি এমন কিছু একটা ভারী জিনিস নয় যে, হত্যাকারী মৃতদেহের সহিত এ-কাপড়খানি বহন করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়াছিল।'

---

*বলাই মণ্ডলের সঙ্গিদ্বয়—যাহারা গতরাত্রে লাঠিহাতে বলাই মণ্ডলের অনুসরণ করিয়াছিল।

মুগ্ধচিত্তে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি যে এইসব সামান্য বিষয় হইতে এতদূর ঠিক করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য; আমি তো এ-সকলের বিন্দুবিসর্গ লক্ষ্য করি নাই।'

অরিন্দম বলিলেন, 'ইহাই বা কী, অনেকসময়ে একগাছি সামান্য চুলের উপর নির্ভর করিয়াও আমাদের চলিতে হয়; সন্দেহের একটি পরমাণু পাইলেও সেটি লইয়া আমাদের সহস্রবার নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে হয়।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'যদি খুনই হয় নাই, বালিকা বাঁচিয়া আছে, তবে যদুনাথ গোস্বামীর উপরে আপনি অনর্থক সন্দেহ করিতেছেন কেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'খুন হয় নাই বলিয়াই যে কাহাকেও সন্দেহ করিব না, এমন কী কথা? আমি তো গোস্বামীকে খুনি বলিয়াই সন্দেহ করি নাই। গোস্বামী এইসকল কাণ্ডের কিছু-না-কিছু জানেন বলিয়াই আমি তাঁহাকে সন্দেহ করিতেছি; নতুবা কোন প্রয়োজনে তিনি মিথ্যা বলিলেন? অবশ্যই মিথ্যা বলিয়া তিনি আমাদের দৃষ্টি হইতে কোনও বিষয় প্রচ্ছন্ন রাখিতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিলেন। গোস্বামী মহাশয় বলিলেন, তিনি একবার ভিন্ন এই জঙ্গলের ভিতর আর যান নাই; কিন্তু তিনি যে দুইবার এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই দেখুন, গোস্বামীর পায়ের দাগগুলি এক মুখে দুইবার অঙ্কিত হইয়াছে। এই দেখুন, গোস্বামী মহাশয়ের এইগুলি দক্ষিণ পায়ের দাগ, এইগুলি এক ইঞ্চি তফাতে ঠিক পাশাপাশি; দেখুন, ওই ভাবে ওই মুখে আরও এক-একটি ওই দক্ষিণ পায়ের দাগ। যদি এ-দাগগুলি বিপরীত মুখে পড়িত, তাহা হইলে মনে করিতে পারিতাম, এ-দক্ষিণ পায়ের দাগ ফিরিবার সময়ে পড়িয়াছে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'এরূপ তো হইতে পারে, হয়তো ভিতরে ঢুকিবারে সময়ে ওইখানে তিনি একবার দাঁড়াইয়াছিলেন, ওই কারণে আবার একবার একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাতে এক পায়ের দাগ একমুখে দুইবার ওইরূপ পাশাপাশি অঙ্কিত হওয়া বিচিত্র নহে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'শুধু একস্থানে ওইরূপ দাগ পড়িলে আপনার এ-যুক্তি অন্যায় বোধ করিতাম না; দেখুন, প্রত্যেক স্থানে ওইরূপ দাগ রহিয়াছে। কোনও-কোনও স্থানে দাগের উপরেও দাগ পড়িয়াছে, কোনও স্থানে বা একটু বেশি তফাত; কেবল ফিরিবার সময়ে দাগগুলি এরূপ একপায়ের দাগ একমুখে পাশাপাশি দেখা যাইতেছে না। তাহার কারণ, তিনি প্রথমবার এখানে আসিয়া এইদিক দিয়া বাহির হন নাই। এই দেখুন উত্তর মুখে এই যে সকল পায়ের দাগ ভিন্নদিকে চলিয়া গিয়াছে; এগুলিও গোস্বামী মহাশয়ের। তিনি একবার এই উত্তরদিক দিয়া জঙ্গল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। আমি এই দাগগুলি দেখিয়াই চিনিতে পারিতেছি, ইহা গোস্বামী মহাশয়ের; কিন্তু আপনাকে মাপিয়া না দেখাইলে চিনিতে পারিবেন না।'

এই বলিয়া অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে সেই দাগগুলি মাপিয়া দেখাইলেন। তাহার পর বলিলেন, 'গোস্বামী মহাশয় যে দুইবার এখানে আসিয়াছিলেন, সে-প্রমাণ তো এখন আপনি স্পষ্ট দেখিলেন; কিন্তু গোস্বামী মহাশয় একবার ভিন্ন আর ইহার মধ্যে যান নাই, এই মিথ্যা কথাটির ভিতরে অবশ্যই একটা গূঢ় অভিপ্রায় সংলগ্ন আছে। আর এই ছুরিখানা সম্বন্ধে দুই-একটি কথা আছে; ছুরিখানা যেরূপ লম্বা-চওড়ায় বড় দেখিতেছি—খুনির ছুরির মতনই বটে। হইলে কী হয়, ইহাতে কিছু দেখিতেছি না, যাহাতে এই ছুরিতে বালিকার কোনও অনিষ্ট হইয়াছে, এমন বোধ করিতে পারি। তাহা হইলে এই ছুরির একস্থানে না-একস্থানে কণামাত্রও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম।'

যোগেন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করিলেন, 'যেরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাতে রক্তের দাগ ধুইয়া যাইতে পারে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'ছুরিখানার যে-অংশ উপরের দিকে ছিল, সে-অংশের রক্তের দাগ বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ছুরিখানির যে অংশ নিচের দিকে ছিল, সেদিকে একটুকুও রক্তের দাগ দেখিতে পাইতাম। ছুরির বাঁটের খাঁজের ভিতরেও একটু-না-একটু রক্ত লাগিয়া

থাকিত। এই সকলের পর তেমন খুব বেশি বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধ হয় না। তেমন বৃষ্টি হইলে এ-সকল পায়ের দাগ এমন স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম না। আর কাপড়ে রক্তের দাগগুলি এমন গাঢ় থাকিত না, বৃষ্টির জলে বেশি রকমের ভিজিলে অবশ্যই অনেকটা ফিকা দেখাইত। এখন এই মাথার কাঁটা দুটির সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিবার আছে। এই দুটি কাঁটায় আমার অপর একটি কাজের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। যোগেনবাবু, দুইদিন পূর্বে থানায় সিন্দুকের ভিতরে আপনি যে-বালিকার মৃতদেহ দেখেছিলেন, সেই বালিকার হত্যাকাণ্ডের সহিত আজকার এ-ঘটনার কিছু সংস্রব আছে, বুঝিতেছি। সেদিন সিন্দুকের মধ্যে যে-দুটি কাঁটা পাইয়াছিলাম, আর আজ এখানে আসিয়া যে-দুটি কাঁটা পাইলাম, এক কারিগরের হাতেই তৈয়ারি, এক মাপ—এক ধরনের।'

তখন পূর্বের সেই দুটি কাঁটা বাহির করিয়া অপর দুইটির সহিত মিশাইয়া দিয়া যোগেন্দ্রনাথের সম্মুখে ধরিয়া অরিন্দম বলিলেন, 'এইবার আপনি এই কাঁটাগুলি হইতে আগেকার সেই দুটি চিনিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন কি?'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সকলগুলি তো একরকমের দেখিতেছি; কীরূপে চিনিব।''

তাহার পর অরিন্দম নিজের নোটবুকখানি বাহির করিয়া শেষের দিককার একখানি পাতা খুলিয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। তাহাতে এইরূপ একটি রজকের চিহ্ন অঙ্কিত কাপড়ের কোণ সংলগ্ন ছিল। যোগেন্দ্রনাথ দেখিয়া বলিলেন, 'এ আবার কী—বুঝিতে পারিলাম না। আপনার সকলই অদ্ভুত।'

অরিন্দম বলিলেন, 'এমন বিশেষ কিছু নয়, তবে ইহা এখন একটা বিশেষ উপকারে লাগিল। থানায় সেই মৃতা বালিকার কাপড়ে যে-রজকের চিহ্ন ছিল, ইহা তাহাই; আজ এখানকার ঘটনার এই রক্তমাখা কাপড়খানিতে যে মার্কা দেখিতেছি, ইহার সহিত এই মার্কারও কিছুই প্রভেদ নাই; তাই বলিতেছি, সেই ঘটনার সঙ্গে আজিকার এ-কাণ্ডের অনেকটা যোগাযোগ আছে। সেদিন সেই বালিকার মৃতদেহ দেখিয়া এই মাথার কাঁটা আর রজকের চিহ্ন ছাড়া হত্যাকারীকে ধরিবার কোনও সূত্র পাই নাই। আপনার মুখে সেদিন যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাও বড় জটিল বোধ হইয়াছিল। যেমন করিয়া হউক, পরে যে কৃতকার্য হইব, এখন এমন আশা করিতে পারি, কী বলেন?' বলিয়া অরিন্দম বিদায় লইলেন।
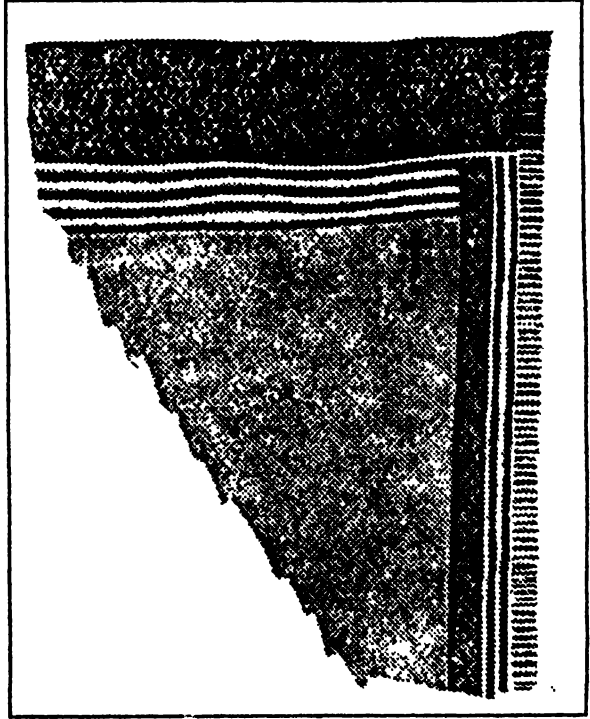
যোগেন্দ্রনাথ একজন পাহারাওয়ালাকে দিয়া সেই রক্তাক্ত কাপড়, ছুরিখানা থানায় লইয়া চলিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ এ সুন্দরী কে?

সেইদিন অপরাহ্নে অরিন্দম একাকী বাহির হইলেন। যদুনাথ গোস্বামীর বাটি অভিমুখে চলিলেন। সেখানে উপস্থিত হইতে বেলা পড়িয়া আসিল। যদুনাথ গোস্বামীর বাড়িখানি একতল, ছোটবড় চারি-পাঁচটি ঘর আছে; ঘরগুলি পুরাতন, বাহিরের চারিদিকে লোনা ধরিয়াছে। একদিক হইতে লাউগাছ, আর একদিক হইতে কুমড়াগাছ, এদিক হইতে পুঁই, ওদিক হইতে ধুতুল, সীম, শশাগাছ ছাদে উঠিয়া সমুদয় ছাদ ব্যাপিয়াছে—শেষে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ছাদের চারিদিক দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

সেই সকল দেখিতে-দেখিতে অরিন্দমের দৃষ্টি একটি উন্মুক্ত ক্ষুদ্র গবাক্ষের উপরে গিয়া পড়িল; দেখিলেন, তিনি দেখিতে-না-দেখিতে একটি স্ত্রীলোক সেখান হইতে চকিতে সরিয়া গেল। বিদ্যুৎও বোধহয়, তেমন চকিতে মিলায় না। সেই নিমেষমাত্র সময়ে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অরিন্দমের অনুভব হইল, স্ত্রীলোকটির বয়স বেশি নয়, আশ্চর্যরূপ সুন্দরী, মুখখানি অতীব সুন্দর; কিন্তু যেমন সুন্দর তেমন যেন প্রফুল্ল নহে। আবার তাহাকে দেখিবার জন্য অরিন্দম কিছুক্ষণ সেইদিকে নিমেষশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন, কে ইনি? হয়তো যদুনাথ গোস্বামীর কন্যা হইবেন; কিন্তু বলাই মণ্ডলের নিকটে শুনিয়াছি, যদুনাথ গোস্বামী নিঃসন্তান। এক স্ত্রী ব্যতীত সংসারে তাঁহার আর কেহই নাই। অনেক ব্রাহ্মণ কুলগৌরবের জোরে জীবনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াও বিবাহ করিয়া থাকেন, বিশেষত পঞ্চাশের অদৃষ্টে এখনও গোস্বামী মহাশয়ের পাদস্পর্শ লাভ হয় নাই। তাহা হইলে এখন যাঁহাকে দেখিলাম, তিনি কন্যা না হইয়া বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হইতে পারেন।

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময়ে সেই উন্মুক্ত গবাক্ষে আর একটি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোককেও দেখিতে পাইলেন। তিনিও একবার অরিন্দমের দিকে চাহিয়া তখনই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। অরিন্দমের সংশয় আরও বাড়িল। ভাবিলেন ইনিই গোস্বামী মহাশয়ের গৃহিণী হইবেন; ইহার পূর্বে যাহাকে দেখিলাম, সে নবীনা কে? গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার কী সম্পর্ক?

সেখানে সেরূপভাবে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা ভদ্রোচিত কার্য নহে বুঝিয়া, অরিন্দম তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। কেননা সে-দিকটা যদুনাথ গোস্বামীর ভিতর-বাটির পশ্চাদ্ভাগ। অরিন্দম তখন একবার গোস্বামী মহাশয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য সদর-বাটির সম্মুখে আসিলেন। সেদিকের সমুদয় গবাক্ষ ও দ্বার বন্ধ দেখিলেন। সেখানে আসিয়া কাহাদের কথোপকথনের অস্ফুট শব্দ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন তিনি একটি রুদ্ধ জানালার পার্শ্বে আসিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইলেন। দুই-একটি কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, ভিতরে আর এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতেছে। তখন তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলেন, সেই ঘরে দুইটি লোক বসিয়া। একজনকে চিনিলেন, যদুনাথ গোস্বামী; অপর লোকটি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিলেন, তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

প্রায় একঘণ্টা কাটিয়া গেল, তথাপি যদুনাথ গোস্বামীর সহিত সেই অপরিচিতের সেইরূপ গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। অরিন্দম অনন্যমনে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন; ক্রমশই তাহাতে অধিকতররূপে তাঁহার চিত্তাকৃষ্ট হইতে লাগিল। যখন ভিতরে সেই গুপ্ত মন্ত্রণার শেষ হইয়া আসিল, অরিন্দম বাহিরে একবার চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে; এবং শুক্লাষ্টমীর অর্ধচন্দ্র মধ্যগগন ছাড়াইয়া পশ্চিম আকাশের অনেকদূর অবধি নামিয়াছে। তাহার দূরে ও নিকটে জ্যোৎস্নাসমুজ্জ্বল তরল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি নির্মল আকাশের বুকে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অরিন্দম সেই জানালার ছিদ্রপথে দেখিলেন, তখন গোস্বামী ঝুঁকিয়া প্রদীপের সম্মুখে একখানি পত্র লিখিতেছেন; সেই অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার মুখের একপার্শ্ব দীপালোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। লোকটা দেখিতে একান্ত কুৎসিত, গঠন-প্রণালী দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ। অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন না; কখনও কোথায় দেখিয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। কোন উদ্দেশ্যে পত্রখানি লেখা হইতেছিল, অরিন্দম বুঝিতে পারিয়াছিলেন; ইতিপূর্বে তাহাদিগের মন্ত্রণার মধ্যে ওই সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল।

পত্র লেখা হইলে সেই অপরিচিত লোকটি সেখানি বুকপকেটে রাখিয়া দিল। অরিন্দম তাহা দেখিলেন। বুঝিলেন, লোকটি এখনই বাহিরে আসিবে; এইজন্য তিনি সেখান হইতে একটু দূরে একটি বটগাছের আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সেই লোকটি বাহিরে আসিল, একটু দূরে দাঁড়াইয়া বাড়িখানি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর আপনার গন্তব্যপথ ধরিল। অরিন্দম তাহার অনুসরণ করিলেন। তাহার অপেক্ষা দ্রুত চলিতে লাগিলেন। ক্রমে-ক্রমে তাহার সন্নিকটবর্তী হইলেন। সেই অপরিচিত লোকটি দুই-একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিল, কোনও কথা কহিল না—অরিন্দমও না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ অনুসরণে

যখন যদুনাথ গোস্বামীর বাড়ি হইতে অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকের অনুসরণে অনেকদূর আসিয়া পড়িলেন, তখন তিনি উপযাচক হইয়া তাহার সহিত এইরূপ প্রথম আলাপ করিলেন, 'মহাশয়কে যেরূপ দেখিতেছি, যদিও আপনার সঙ্গে আলাপ পরিচয় নাই; কিন্তু যেরূপ দেখিতেছি, সামনে বললে খোশামুদি করা হয়—অতি—অতি—'

অপরিচিত লোকটি এইরূপ আলাপে যত সন্তুষ্ট না হউক, বড় বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কে হে বাপু, তুমি?'

অরিন্দম আরও একটু স্বরটা গড়াইয়া বলিলেন, 'এই, এই কথাটা হচ্ছে যে, মহাশয়ের সামনে বললে খোশামোদ করা হয়—আপনি অতি—অতি—'

অপরিচিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কেবল "অতি-অতি"ই করছ যে—কী বলো না—অতি ভদ্রলোক, না অতি সদাশয় লোক?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আরে রাম রাম! তাও কি কখনও হতে পারে একজন অতি ধড়িবাজ লোক। সামনে বললে খোশামোদ করা হয়, তাই বলি-বলি করেও বলতে পারছিলেম না।' বলিতে-বলিতে অরিন্দম আরও একটু তাহার নিকটস্থ হইলেন। নিকটস্থ হইয়া তাহাকে—বিশেষত তাহার মুখখানি একবার ভালো করিয়া দেখিয়া লইলেন।

সেই অপরিচিত লোকটি ললাট কুঞ্চিত করিয়া একটু হাসিল। অরিন্দম দেখিলেন, তাহার মুখখানি গড়িতে বিধাতার কি জানি, এমনই এক সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা ছিল যে, সে-মুখখানিতে হাজার হাসি একসঙ্গে দেখা দিলেও বুঝাইত না, লোকটি হাসিতেছে, না কি এক অসহ্য অরুন্তুদ যন্ত্রণায় মুখবিকৃতি করিতেছে। লোকটি হাসিয়া—কি বিকৃত মুখে বলা যায় না—বলিল, 'তুমি কি পাগল না কি?'

অরিন্দম বলিল, 'এমন কথা পূর্বে আর কাহাকেও বলিতে শুনি নাই, এই প্রথম তোমার মুখে শুনিলাম। সে কথা যাক, এখন বলো দেখি, কী মনে করে আজ, আবার সন্ধ্যার পর বাহির হয়েছ? কাল রাতে তো একটাকে শেষ করেছ, আজ আবার কার বুকে ছুরি বসাবে, দাদা?'

অপরিচিত বলিল, 'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'মনে-মনে খুব বুঝতে পারছ; এই যে এত বড় একটা খুন হয়ে গেল, তার কি কোনও খবরই রাখো না?'

সেই লোকটি বলিল, 'না, কিছু না, আমি এখানে থাকি না। তুমি একজন গোয়েন্দা না কি?'

অরি। তা না হলে তোমার পিছু লইব কেন? আমি বেশ বলতে পারি, তুমিই সেই মেয়েটিকে খুন করেছ।

অপরিচিত। আমি কিছুই জানি না।

অরি। তুমিই না কাল রাতে একবার বলাই মণ্ডলের দোকানে আবির্ভূত হয়েছিলে?

অপ। না, আমি বলাই মণ্ডল নামে কাকেও জানি না।

অ। জানো বই কি, হয়তো এখন ভুলে গেছ। বলাই মণ্ডল মিথ্যা কথা বলবার লোক নয়, তার মুখেই আমি তোমার কথা শুনেছি।

অপ। সে কি তোমার কাছে আমার নাম বলেছিল?

অ। নাম না বললেও তোমার মুখখানি দেখে বেশ বুঝতে পারছি, তুমিই স্বয়ং সেই মহাপুরুষ।

অপ। মিথ্যা কথা; তবে আমি এ-খুনের কিছু-কিছু জানি বটে। তুমি এখন সেই বালিকার মৃতদেহের সন্ধান করছো না কি? তা হলে আমি তোমার কিছু উপকার করতে পারি।

অ। তা হলে আমি বাধিত হব।

অপ। মৃতদেহ বাহির করিতে পারলে তুমি বেশি রকমের একটা পুরস্কার পেতে পারো, এমন একটা সম্ভাবনা আছে কি?

অ। আছে বই কি, তা না হলে আর সেই সকাল অবধি এখনও পর্যন্ত ঘুরে-ঘুরে বেড়াব কেন, বল?

অপ। আমি যদি সেই মৃতদেহ বার করে দিই, তা হলে কিছু বখরা দিতে পার?

অ। তোমার দ্বারা যদি এতবড় একটি মহৎ কাজ হয়, তা হলে তা আর দিব না? তখনই।

অপ। আমি কাল রাত দুটার পর ওই দিঘির ধার দিয়ে যখন আসি ওই পশ্চিম দিককার একটা জঙ্গলের ভিতরে একটা বালিকার মৃতদেহ দেখেছি। আমার সঙ্গে গেলে দেখাতে পারি।

অ। এখনও এ-কথা গোপন করে রেখেছিলে কেন?

অপ। সাধ করে কে পুলিশের হাঙ্গামে পড়ে বলো। এখন আমার সঙ্গে যাবে কি?

অরিন্দম একবার কী ভাবিলেন। বলিলেন, 'চলো যাইব।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : মল্লযুদ্ধ

সেই অপরিচিত লোকটি অরিন্দমকে সঙ্গে লইয়া চলিল, উভয়েই নীরব; তিন-চারিটি বড়-বড় জলাভূমি পার হইয়া চলিল। অবশেষে এমন এক স্থানে উভয়ে আসিয়া পড়িল যে, সেখান হইতে লোকালয়ের কোনও চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। রাত্রিকালে—রাত্রির কথা দূরে থাক, কেহ কাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিলে, এমনকী সেখানে প্রশস্ত দিবালোকে সে নির্বিঘ্নে সে-কাজ সমাধা করিতে পারে।

সেই অপরিচিত ব্যক্তি সেইস্থানে আসিয়া মৃতদেহ খুঁজিবার ভানে নিকটস্থ একটি জঙ্গলের এদিক-ওদিক দেখিয়া বলিল, 'তাই তো বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার!'

অরিন্দম সে-কথার কোনও উত্তর করিলেন না।

অপরিচিত লোকটা আবার অরিন্দমকে শুনাইয়া বলিল, 'তাই তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!'

তখনও অরিন্দম নীরব।

অপরিচিত। কই হে, লাশটা যে দেখতে পাচ্ছি না।

অরিন্দম। কোথায় গেল?

অপ। কী করিয়া বলিব?

অ। তোমার মনের কথাটা কী, ভেঙে বলো দেখি?

অপ। তুমি কী মনে করো?

অ। আমি মনে করি, তুমি একটি ভয়ানক ধড়িবাজ লোক। এর বেশি আর কী মনে করতে পারি? এখন কী মনে করে আমাকে এখানে নিয়ে এলে, প্রকাশ করে বলো দেখি?

অপ। এই যে প্রকাশ করছি।

এই বলিয়া লোকটা একখানি দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের দিকে অগ্রসর হইল। অরিন্দম একান্ত ভয়ার্তের ন্যায় কাতরকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া বলিলেন, 'করো কী—করো কী—মেরো না—মেরো না—দোহাই তোমার—দোহাই তোমার!'

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'যদি তুমি আমার কথার ঠিক-ঠিক জবাব দাও আমি তোমায় কিছু বলিব না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'বলো, কী বলিতে হইবে?'

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'সকল কথাই তোমাকে বলিতে হইবে; তুমি কে, তোমার নাম কী, কোথায় থাক, কী করো, কেনই বা আমার পিছু নিয়েছ?'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমি আবার কে? দেখছ না, একটি লোক আর কি? নামটা বড় ভালো নয়, কৃতান্তবাবু। থাকি খুনে-লোকের সঙ্গে-সঙ্গে; করিবার মধ্যে তোমাদের মতন বদমায়েশদের ধরিয়া বেড়াই—আর তোমার যে পিছু নিয়েছি, কেবল তোমাকে ধরিবারই জন্য।'

অপ। কেন, আমি কি খুনি?

অ। সে-বিষয়ে আর সন্দেহ আছে? তা না, হলে এতবড় একখানা ছুরি নিয়ে তুমি দিনরাত ঘুরে বেড়াও।

অপরিচিত ব্যক্তি আবার সেই ছুরি লইয়া অরিন্দমকে মারিতে গেল। অরিন্দম আবার সেইরূপ—যেন কত ভয় পাইয়াছেন, এইরূপ ভাব দেখাইলেন; অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সেবারও পার পাইলেন। অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'এখন বল্, তুই কে, কোথায় থাকিস?'

অরিন্দম বলিলেন, 'বলছি-বলছি—ওই যে অনেক দূরে একটি নারিকেল গাছ দেখছ—তার পরে আরও দূরে একটি তালগাছ—ওই জ্যোৎস্নার আলোকে বেশ দেখা যাচ্ছে।' এই বলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া অরিন্দম অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইতে লাগিলেন। বস্তুত সেখানে তালগাছ কি নারিকেল গাছ—কিছুই ছিল না।

অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে চাহিতে-চাহিতে অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, 'কই হে, কোথায় তোমার তালগাছ?'

অরিন্দম পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন, তখনই সুবিধা বুঝিয়া আগে তাহার হাত হইতে সেই ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন; সেইসঙ্গে তাহার পায়ের উপর পা দিয়া চাপিয়া এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, সে-ধাক্কা তাহাকে আর সামলাইতে হইল না, সশব্দে সেইখানে পড়িয়া গেল। তাহার পর অরিন্দম তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিলেন। লোকটি জোর করিতে লাগিল। অরিন্দম তাহার গলাটি বাম হাতে চাপিয়া ধরাতে সে গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। লোকটি একটু অবসন্ন হইয়া পড়িলে, তাহার গলাটি ছাড়িয়া দিয়া অরিন্দম বলিলেন, 'কিগো, বড় যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিলে? এখন আমি কী করি বলো দেখি, তোমায় ছেড়ে দিই, না তোমার প্রাণটা এইখানকার বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যাই?'

অপরিচিত লোকটি কোনও উত্তর করিল না।

অরিন্দম বলিলেন, 'না, তোমার মতো একটি এতবড় কাতলাকে যেকালে ছিপে গেঁথেছি, তখন হঠাৎ তুলে ফেলা হবে না—ভালো করে না খেলিয়ে তুললে হাতের সুখ হবে না।' তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, 'মনে কোরো না, এখন ছাড়িয়া দিলাম বলিয়া তুমি আমার হাত হইতে নিস্তার পাইলে; যখনই মনে করিব, তখনই আবার তোমাকে ধরিব। কোনও একটু আবশ্যক ছিল বলিয়াই তোমাকে এতটা বিরক্ত করিলাম। আবার যখন কোনও আবশ্যক বোধ করিব, তখন তোমার সঙ্গে দেখা করিব। যাও, এখন কথা না কহিয়া এই সোজা পথটি ধরিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করো; নতুবা তোমার ছুরি তোমারই বুকে বসাইতে কুণ্ঠিত হইব না।'

অপরিচিত ব্যক্তি মাথা হেঁট করিয়া, কথাটিমাত্র না কহিয়া তথা হইতে খুব একটি নিরীহ ভালোমানুষের মতো ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ ছদ্মবেশ

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর অরিন্দম বৃদ্ধবেশে যদুনাথ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন।

নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণে অরিন্দমের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এমনকী তিনি যখন যে কোনও প্রকার ছদ্মবেশে বাহির হইতেন, কোনও পরিচিত ব্যক্তিও তাঁহাকে চিনিতে পারিত না; অনেক সময়ে পুলিশের অধ্যক্ষ যোগেন্দ্রবাবুও ভ্রমে পড়িতেন। অরিন্দমের বয়স পঞ্চাশের নিকটবর্তী। অনেকরকমের ছদ্মবেশ ধরিতে হয় বলিয়া, তিনি প্রত্যহ প্রাতে নিজ হস্তে নিজ শ্মশ্রুগুম্ফের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিয়া থাকেন। যদুনাথ গোস্বামীর সহিত অরিন্দমের সহজেই দেখা হইল। তখন যদুনাথ গোস্বামী আহারাদি শেষে বাহিরের ঘরে বসিয়া তাম্বুল-চর্বণ ও ধূমপানে রত ছিলেন। অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, একজন অপরিচিত বৃদ্ধকে সম্মুখীন দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন।

ছদ্মবেশী অরিন্দম বলিলেন, 'মশাই; বলতে পারেন, এখানে যদুনাথ গোস্বামী কোথায় থাকেন?'

যদুনাথ বলিলেন, 'আমারই নাম। কী আবশ্যক বলুন দেখি? কোথা হতে আপনি আসছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'অনেকদূর হতে আসছি, আপনারই এক শিষ্যের বাড়ি হতে। উঃ! বড় গরম, কী রোদ দেখছেন! উঃ! বড় সুখবর, তিনি শিব-প্রতিষ্ঠা করবেন, বড়লোক একেবারে বাঞ্ছাকল্পতরু হবেন; বিশেষত আপনি তাঁর গুরু, আপনার পাথরে পাঁচ কীল! উঃ! কী গরম—প্রাণ যে যায়!'

যদুনাথ অপেক্ষাকৃত আকৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'কে তিনি? আমার তো সকল শিষ্যই বড়লোক।'

অরিন্দম কপালের ঘাম মুছিতে-মুছিতে বলিলেন, 'বলছি—বড় গরম। উঃ! একটু জল; পিপাসায় বুক থেকে গলাটা অবধি শুকিয়ে উঠেছে।'—ঘরটির দুইটি দ্বার, একটি বাহিরের দিকে, অপরটি ভিতরের দিকে। শেষোক্ত দ্বার দিয়া যদুনাথ গোস্বামী জল আনিতে বাড়ির ভিতরে গেলেন। সেইদিকে আরও একটি গবাক্ষ ছিল; অরিন্দম দেখিলেন, সেই গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিষণ্ণমুখে সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী—যাহাকে পূর্বদিন একবার বাটির পশ্চাদ্ভাগের গবাক্ষে এক মুহূর্তের জন্য দেখিয়া ছিলেন। অরিন্দমকে তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া সেই ভুবনমোহিনী মূর্তি আর তথায় দাঁড়াইল না।

কিয়ৎপরে যদুনাথ গোস্বামী জল লইয়া আসিলেন। অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম এক

নিশ্বাসে যতটুকু পারিলেন, পান করিলেন।

যদুনাথ গোস্বামী সেইরূপ আগ্রহের সহিত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কাহার নিকট হইতে আপনি আসিতেছেন?'

অরিন্দম হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, 'বলছি হে, বলছি, ব্যস্ত হয়ো না। উঃ! বড় কষ্ট হচ্ছে। উঃ! সমস্ত শরীরটা কেমন করছে; মাথাটা যেন ঘুরছে, চোখে এমন ঝাপসা দেখছি কেন? সর্দিগর্মির লক্ষণ নয় তো? পাখা! পাখা নাই? একি হল! প্রাণটা যেন বের হবার জন্য আইঢাই করছে; বড় ভালো বুঝছি না, গোঁসাই ঠাকুর। জল, জল—আবার জল! বড় পিপাসা—উঃ! গেলেম যে!' বলিতে-বলিতে অরিন্দম সেইখানে শুইয়া পড়িলেন; মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। এবং এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিলেন—উঠিতে-পড়িতে লাগিলেন—শেষে নিঃসংজ্ঞ—মৃতবৎ। ব্যাপার দেখিয়া যদুনাথের ভয় হইল, ভয়ে মুখ শুকাইল এবং কী করিবেন ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। চিৎকার করিয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী আসিলে তাঁহাকে পাখার বাতাস করিতে বলিয়া নিজে কবিরাজের বাড়িতে ছুটিলেন। কবিরাজের বাড়ি নিকটে নহে।

সহসা একি বিপদ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ শুশ্রূষা

অরিন্দম তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন। যে-উদ্দেশ্যে তিনি ভান করিয়া মৃতবৎ মাটিতে পড়িয়াছিলেন, তখন তাহা সহজেই সফল করিতে পারিবেন বলিয়া আশা হইল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে আবার জল চাহিলেন। ব্রাহ্মণী জল আনিতে উঠিলে অরিন্দম কাতরকণ্ঠে বলিলেন, 'আপনি বসুন, যেমন বাতাস করিতেছেন, করুন। আমার সমস্ত শরীরটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। মা! আপনি আমার আর-জন্মের মা ছিলেন। আপনি আমার প্রাণরক্ষা করলেন।'

স্ত্রীলোকের মন নরম কথায় সহজে ভিজে। কাজেই ব্রাহ্মণী সেইখানে বসিয়া আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে আবার কিছুক্ষণ কাটিল। অরিন্দম আবার জল চাহিলেন। এইবার ব্রাহ্মণী আর একজনকে ডাকিয়া, তাহার হাতে পাখা দিয়া, বাতাস করিতে বলিয়া নিজে জল আনিতে গেলেন।

যে এখন পাখা লইয়া বসিল, অরিন্দম দেখিলেন, এ সেই অপরূপ—রূপলাবণ্যময়ী। দেখিয়া চিনিলেন; তিনি দুইবার ইহাকে বাতায়নে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'গোঁসাই মহাশয় তোমার কে হন?'

সে কোনও উত্তর করিল না; পূর্ববৎ বাতাস করিতে লাগিল।

অরিন্দম পূর্ববৎ মৃদুস্বরে নিজেই সে-প্রশ্নের উত্তর করিলেন, 'বোধহয় কেহই না; বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই তোমার কেহ নহেন। আমি তোমার বিষয় কিছু-কিছু জানি।'

শুনিয়া ব্যজনকারিণী সুন্দরীর ভয় হইল। সে পাখা ফেলিয়া, উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'ভয় নাই—আমি তোমার শত্রু নই, আমার কাছে কোনও কথা গোপন করিয়ো না। তোমার উপরে আবার এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলিতেছে। শীঘ্রই তুমি এমন বিপদে পড়িবে যে, তাহা হইতে তখন উদ্ধারের আশামাত্র থাকিবে না।'

ব্যজনকারিণী কী করিবে, স্থির করিতে না পারিয়া আবার বসিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি গোরাচাঁদ বলিয়া কাহাকেও চেনো কি? আমার কাছে লুকাইয়ো না।'

গোরাচাঁদের নাম শুনিয়া সেই নবীনার মুখ শুকাইল; আবার সে উঠিয়া যাইবার উপক্রম

করিল। অরিন্দম বলিলেন, 'বসো, আমার দ্বারা তোমার উপকার ভিন্ন কোনও অপকার হইবে না, নিশ্চয় জানিয়ো। আমার কাছে লুকাইয়ো না—তাহা হইলে তুমি ভালো কাজ করিবে না। আমাকে বিশ্বাস করো। গোরাচাঁদকে তুমি চেনো কি?'

নবীনা বলিল, 'চিনি।'

অরিন্দম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশবচন্দ্র নামে কোনও জমিদারকে চেনো?'

নবীনার শুষ্ক মুখ আরও শুকাইল। কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, 'হ্যাঁ চিনি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি শীঘ্রই আবার তাহাদিগের হাতে পড়িবে। তোমার গোস্বামী এই ষড়যন্ত্রে আছেন। গোরাচাঁদ নামে লোকটা কাল সন্ধ্যার পর এখানে এসে গোঁসাই মহাশয়ের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে গেছে; আজ রাত্রেই তোমাকে আবার তাহাদিগের হাতে পড়িতে হইবে। এই পত্রখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।' একখানি পত্র বাহির করিয়া নবীনার হাতে দিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

'মহাশয়,

যদিও আপনার সহিত আমার পরিচয় নাই, কিন্তু গোরাচাঁদের মুখে আপনার সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনিলাম, তাহাতে আপনাকে একজন মহৎ ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি। শুনিলাম, রেবতীর কাকা গোপালচন্দ্র বসু আপনার হস্তে রেবতীকে সমর্পণ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। রেবতীর নাকি এ-বিবাহে মত নাই, সেইজন্য তিনি এই শুভ-বিবাহ যাহাতে গোপনে সম্পন্ন হয়, সেজন্য রেবতীকে আপনার বাগান-বাটিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথা হইতে আপনার অসাক্ষাতে রেবতী পলাইয়া আসিয়াছে। বেশি বয়স অবধি মেয়েদের অবিবাহিত রাখাই এইসকল গোলযোগের একমাত্র কারণ। সেইজন্য আমাদের শাস্ত্রে মেয়েদের যত অল্প বয়সে বিবাহ দিতে পারো, ততই মঙ্গল বলিয়া উল্লেখ আছে। বেশি বয়স হইলে মেয়েরা নিজে-নিজে পছন্দ করতে শিখে, পাত্রাপাত্র বুঝে না। আপনার সম্বন্ধে রেবতী আমাকে অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছিল, আমি সে-সকল বিশ্বাস করিতে পারি নাই। যাহা হউক, যাহাতে এ-বিবাহ সুসম্পন্ন হয়, তাহাতে আমিও ইচ্ছুক। আর গোরাচাঁদের মুখে আপনার যেরূপ বিষয়-ঐশ্বর্যের কথা শুনিলাম, তাহাতে রেবতীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে। রেবতী এখন আমার কাছে আছে, গোরাচাঁদ আড়াইশত টাকা দিয়া রেবতীকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু এ-সকল বিবাহের কাজে তো গুরু-বরণ ইত্যাদিতে দুই-চারিশত টাকা আমার পাইবারই কথা, তা ছাড়া আমি যে রেবতীকে সন্ধান করিয়া ধরিয়া রাখিলাম, তাহার জন্য আপনার মতো জমিদারের নিকটে কি আর কিছু আশা করিতে পারি না? আপনি পত্র-প্রাপ্তে পাঁচশত টাকা গোরাচাঁদের হাতে পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহার সহিত তখনই রেবতীকে পাঠাইয়া দিব। ইতি—

আশীর্বাদক
শ্রীযদুনাথ শর্মা'

পাঠক মহাশয়কে আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না যে, এই রেবতীই জীবন পালের বাগান হইতে মোহিনীর সহায়তায় দুর্বৃত্ত কেশবচন্দ্রের হাত হইতে মুক্তি পাইয়া, সেইদিন রাত্রে ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া গোঁসাইপাড়ার পথ জানিতে বলাই মণ্ডলের দোকানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং ইহারই

রক্তাক্ত বস্ত্রাদি দেখিয়া পরদিন গ্রামমধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। যে-ব্যক্তি সেইদিন রাত্রেই রেবতী চলিয়া আসিলে অল্পক্ষণ পরেই বলাই মণ্ডলের দোকানে গিয়া বালিকার সন্ধান করিয়াছিল এবং পরদিন রাত্রে অরিন্দমকে জনমানবশূন্য প্রান্তরের মধ্যে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিল সে সেই কেশবচন্দ্রের বিশ্বস্ত অনুচর—সেই গোরাচাঁদ ব্যতীত আর কেহই নহে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ঃ রেবতীর সন্দেহ

পত্র পড়িয়া রেবতীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া যেন সমস্ত শোণিত হৃৎপিণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়া গুরুভারে বুকটা বড় ভারী করিয়া তুলিল। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, 'আমি যে কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'যদুনাথ গোস্বামীর হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই বিশ্বাস করিতে পারিবে।'

রে। আমি তাঁহার হস্তাক্ষর জানি।

অ। এ কি তাঁহার হাতের লেখা নয়?

রে। তাঁহারই হাতের লেখা, এই সইও তাঁহার। গোঁসাই-ঠাকুর আমাদের গুরু হন, আবশ্যকমতো আমাদের বাড়িতে পত্রাদি পাঠাইতেন, তাহাতেই আমি তাঁহার হাতের লেখা ও সই অনেকবার দেখিয়াছি। দেখিলেই বেশ চিনিতে পারি। আপনি এ-পত্র কোথায় পাইলেন?

অ। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারো, কোনও কথা গোপন করিয়ো না। তুমি কে, কোথায় তোমার বাড়ি, পিতার নাম কী, এই কেশববাবু কে, গোরাচাঁদ কে, তোমার অবস্থান্তরের কারণ কী, তুমি যাহা জানো, সমস্তই অকপটে আমাকে বলো, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।

রেবতী পুনরপি বলিল, 'আপনি এ-পত্রখানা কোথায় পাইলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'কাল রাত্রে গোঁসাই-ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করিয়া যখন পত্রখানি লইয়া গোরাচাঁদ বাহির হয়, তখন আমি এই পত্রখানি হস্তগত করিবার জন্য তাহার অনুসরণ করি। পথে দুই-একটি কথায় তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া তোমার কথা তুলি, তোমার মৃতদেহ দেখাইবে বলিয়া, সে আমাকে একটি নির্জন প্রান্তরে লইয়া গিয়া, হত্যা করিবে মনে করিয়া আমাকে তার সঙ্গে যাইতে বলে। আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার সঙ্গে যাই। সেখানে সেই নির্জনে আমাকে একা পাইয়া সে যেমন আমাকে ছুরি মারিতে আসে আমি তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসি; সেই সময়েই আমি তাহার অজ্ঞাতসারে এই পত্রখানি হস্তগত করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিই।'

রেবতী সন্দিগ্ধমনে বলিলেন, 'বুঝিতে পারিতেছি না, আপনার মনের অভিপ্রায় কী? কেনই বা আপনি এইসকল ব্যাপারে লিপ্ত হইয়াছেন?'

অ। আমি একজন পুলিশ-কর্মচারী। তোমার বিপদের কথা আমি অনুমানে কিছু-কিছু বুঝিতে পারিয়াছি। যে সঙ্কল্প করিয়া আমি এ-কাজে হাত দিয়াছি, তোমাকে এই উপস্থিত বিপদের মুখ হইতে দূরে রাখিতে পারিলে, তাহা অনেকটা সফল হইবে।

রেবতীর মনের অবস্থা তখন কীরূপ, তাহা ঠিক বর্ণনা করা যায় না। অবিশ্বাস এবং সংশয়, ভয় এবং বিস্ময়, উৎকণ্ঠা এবং হতাশা এবং ঘোরতর সন্দেহ এইসকল একত্রে মিলিয়া তাহার দুর্বল হৃদয়কে মথিত করিতেছিল। রেবতী অস্থিরচিত্তে বলিল, 'আপনি যদি পুলিশ-কর্মচারী তবে গোরাচাঁদকে ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলেন কেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ছাড়িয়া দিয়াছি বটে, যখনই মনে করিব, তখনই আবার তাহাকে

ধরিব; তাহার মুখখানি যখন একবার চিনিয়া লইতে পারিয়াছি সে তখন ধরা পড়াই আছে। শীঘ্র-শীঘ্র একটি লোককে গ্রেপ্তার করা আমার অভ্যাস নহে। তাহাতে শীঘ্র পাপী ধৃত হয় বটে, শীঘ্র বিচারে তাহার যাহা হয়, একটা দণ্ডও হয়; সে দণ্ড অনেক স্থলে কোথাও লঘু পাপে গুরু—কোথাও গুরু পাপে লঘু। যাহাকে বন্দি করিয়া বিচারালয়ে দিতে হইবে, তাহার যাহা কিছু জানিবার সমস্তটুকু যতক্ষণ না জানিতে পারি; নিজের পাপের কথা, নিজের স্বভাব-চরিত্রের কথা সে যেমন নিজে জানে, আমিও সেইসকল ঠিক তাহারই মতন যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, ততক্ষণ তাহাকে আমি গ্রেপ্তার করি না। বুঝিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি বলিয়া, তুমি আমাকে সন্দেহ করিতেছ। এখনও বলিতেছি, ইহাতে তোমার ভালো হইবে না। যদি আমাকে বিশ্বাস করিতে পারো, কোনও কথা আমার কাছে গোপন করিয়ো না—তুমি কে, তোমাদের বাড়ি কোথায়, তোমার পিতার নাম কী, তোমার এই দুরবস্থার কারণই বা কী, এ-সকল তুমি যাহা জানো, সমস্ত আমাকে অকপটে বলো; আমি বার-বার বলিতেছি, আমার দ্বারা তোমার কোনও অনিষ্ট হইবে না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ রেবতীর আত্মকাহিনী

রেবতী বলিতে লাগিল, 'আমাদের বাড়ি বেণীমাধপুর; আমার পিতার নাম জানকীনাথ বসু। প্রায় দুই বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর এক বৎসর পূর্বে মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। আমার আর একটি বোন আছে, তাহার নাম রোহিণী; আমরা দুই বোনে কাকার নিকটে থাকিতাম। কাকার নাম গোপালচন্দ্র বসু। কাকাবাবুর অবস্থা তেমন ভালো ছিল না। শুনিয়াছি, তিনি একবার বাবার সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমা করিয়া নিজের বিষয়ের সমস্ত অংশ নষ্ট করিয়া ফেলেন। তখন বাবা আবার তাঁহাকে ডাকিয়া নিজের জমিদারি হইতে চারি আনা অংশ দান করেন। তখন থেকে বাবার সঙ্গে কাকাবাবুর যে মনোমালিন্য ছিল, তাহা ঘুচিয়া যায়। বাবার মৃত্যুর পর হইতে আজ দুই বৎসরকাল কাকাবাবু সমস্ত জমিদারির কাজকর্ম নিজেই দেখিয়া আসিতেছেন। সন্তানাদি না থাকায় কাকা আর কাকিমা আমাদিগকে মাতাপিতার অধিক স্নেহ করেন। না জানি, আমার জন্য কাকামহাশয় কী কাণ্ডই না করিতেছেন! আপনি আমাকে কোনওরকমে কাকাবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার যথেষ্ট উপকার করিবেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সে-কথা পরে হইবে—এখন তোমার এ-দুরবস্থার কারণ কী বলো দেখি, যদি আমি কোনও প্রতিকার করিতে পারি।'

রেবতী বলিতে লাগিল, 'ইদানীং কেশবচন্দ্র নামে একটি লোক কাকাবাবুর সহিত প্রত্যহ দেখা-সাক্ষাৎ করিত। আগে তাহাকে কখনও দেখি নাই। লোকটা বড় মিষ্টভাষী; কাকাবাবুর সঙ্গে তাহার এমন ঘনিষ্ঠতা হইল যে, কোনওদিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইলে কাকাবাবু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আসিলে কখনও বা তাহার সঙ্গে গল্প করিতেন, কখনও বা দাবা খেলিতেন, কখনও বা বেড়াইতে বাহির হইতেন। যদি কোনওদিন কেশবচন্দ্র না আসিত, সেদিন কাকাবাবুকে বড়ই বিমর্ষ থাকিতে দেখিতাম। কেশবচন্দ্রও আমাদিগকে কাকাবাবুর মতো স্নেহ দেখাইত; কিন্তু সে মানুষ নয়, পিশাচ—তাহার মনের ভাব অন্য রকমের। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হইল, কী জানি কী ঔষধের সাহায্যে আমাকে অজ্ঞান করিয়া, চুরি করিয়া লইয়া আসে। যখন আমার প্রথম জ্ঞান হইল, তখন কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছিল; সমস্ত শরীরটা যেন কেমন একরকম অবশ হইয়া গিয়াছিল, এমনকী ভালো করিয়া চোখ চাহিতেও যেন কষ্টবোধ হইতেছিল। দেখিলাম, আমি নৌকার উপরে রহিয়াছি। নৌকাখানা গঙ্গার

একদিক্‌কার কিনারায় লাগানো রহিয়াছে। সে-দিকটা ভয়ানক বন, তেমন বন কখনও আমি দেখি নাই। নৌকার উপর কেশবচন্দ্র, আর চারি-পাঁচজন দাঁড়ি-মাঝি, তাহারা তামাক খাইতেছে, আর কী বলাবলি করিতেছে। তখন যেন আমার সমস্তই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মাথাটা আরও ভারী হইয়া উঠিল। তীরে একটা লোক দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গোরাচাঁদ। তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। সে বলিল, 'ইহাকে লইয়া যাইব কি? ইহার যে জ্ঞান হইয়াছে, দেখিতেছি।'' তাহার কর্কশকণ্ঠ আমার অবশ কর্ণে আরও কর্কশ শুনাইল; আমার বড় ভয় হইল—বিশেষত তাহার দস্যুর মতো বিকট চেহারা দেখিয়া ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলাম—পারিলাম না, বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাঁদিতে গিয়া বুকে বড় ব্যথা লাগিল; কাঁদিতে পারিলাম না। তখন কেশবচন্দ্র তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার নাকের কাছে একখানা রুমাল চাপিয়া ধরিল, মাথায় যেন বজ্র আসিয়া পড়িল; আবার আমি অজ্ঞান হইলাম। তাহার পর আবার যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, সে গঙ্গা নাই, সে বন নাই, নৌকা নাই, দাঁড়ি-মাঝি কেহ নাই। আমি একটা নিবিড় বনের মাঝখানে, দুর্গন্ধ আবর্জনাপূর্ণ একটা ঘরে একাকী পড়িয়া আছি। ঘরটি বাহির হইতে বন্ধ; বাহির হইবার আর কোনও উপায় নাই। তাহার পর কেশবচন্দ্র প্রত্যহ এক-একবার আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে লাগিল। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য যে সে এই কাজ করিয়াছে, একদিন তাহা প্রকাশ করিল। আমি কিছুতেই সে-পাপিষ্ঠের কথায় সম্মত হইতে পারিলাম না। সেজন্য আমাকে পিশাচ কত ভয় দেখাইত, কখনও বা ছুরি লইয়া কাটিতে আসিত—আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলাম না—কিছুতেই সম্মত হইলাম না। তেমন পাপিষ্ঠের স্ত্রী হইয়া আজন্ম মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা তাহার শাণিত ছুরির মুখে মুহূর্তের মৃত্যু শ্রেয় বোধ করিলাম। গোরাচাঁদের উপরে আমার রক্ষার ভার ছিল; সে সেই নরপ্রেতের বিশ্বস্ত অনুচর। শেষে একটা স্ত্রীলোক আমাকে উদ্ধার করে। শুনিলাম, সে কেশবচন্দ্রের স্ত্রী; সে-ই আমাকে এখানে আসিবার পথ দেখাইয়া দেয়। একটা বড় প্রান্তর পার হইয়া আমি এই গ্রামে আসি, তখন ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। এখানকার গোঁসাইপাড়ায় আমাদিগের গুরু যদুনাথ গোস্বামীর নিকটে যাইব মনে করিয়া এখানকার একটি মুদির দোকানে গোঁসাইপাড়ার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লই। সেখানে আরও অনেক লোক বসিয়া তাস খেলিতেছিল, তাহারা আমায় একটা দিঘির ধার দিয়া যাইতে বলিল। আমি আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। যখন দিঘির ধার দিয়া যাইতেছি, তখন পশ্চাদ্দিকে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। আগে বন ছাড়িয়া যখন প্রান্তরে পড়ি, তখন একবার গোরাচাঁদকে পথে আমার অনুসরণ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি ভয়ে একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া পড়ি, সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, সে আর একদিকে চলিয়া গেল। আমি প্রান্তরের মাঝখান দিয়া, সেই ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া এই গ্রামে আসিয়া পড়িলাম; দিঘির ধারে আসিয়া যে পদশব্দ শুনিয়াছিলাম, তাহা তখন গোরাচাঁদের বলিয়াই আমার বোধ হওয়ায় আরও ভয় হইল। আমি আবার প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলাম; এমনসময়ে আমার আঁচলখানায় টান পড়িল; আবার গোরাচাঁদের হাতে পড়িলাম ভাবিয়া, আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম; মাটিতে পড়িয়া গেলাম; এমনসময়ে কে আসিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল। বিদ্যুতের আলোকে তাঁহাকে চিনিলাম, তিনিই যদুনাথ গোস্বামী, ভরসা হইল। দেখিলাম, কেহই আমার আঁচল ধরে নাই, একটা কাঁটাগাছে আঁচলখানা জড়াইয়া গিয়াছিল; যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম, তাহা গোস্বামী মহাশয়েরই। পড়িয়া গিয়া কপালের একস্থানে কাটিয়া গিয়াছিল। ক্ষতমুখ দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। গোস্বামী মহাশয়কে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম, দুই-তিনদিনের জন্য আমাকে তাঁহার কাছে লুকাইয়া রাখিবার জন্য অনুনয় করিলাম।

তিনি সম্মত হইয়া আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া চলিলেন। তাঁহার নিকটে শুনিলাম, তিনি গোঁসাইপাড়ায় আজকাল থাকেন না; সে-বাড়ি তাঁহার ভগিনীকে থাকিতে দিয়া নিজে এখন এইখানে থাকেন। আমাকে এইখানে লইয়া আসিলেন। যাহাতে আর কেহ আমার সন্ধান করিতে না পারে, যাহাতে আমাকে খুন করিয়াছে বলিয়া লোকের মনে একটা ধারণা হয়, সেইজন্য আমার রক্তমাখা কাপড়, একখানা বড় ছুরি, আর দুই-তিনটা মাথার কাঁটা লইয়া গোস্বামী মহাশয়, যেখানে আমি পড়িয়া গিয়াছিলাম, সেইখানের একটা জঙ্গলে রাখিয়া আসিলেন। শুনিলাম, ফিরিয়া আসিবার সময়ে এখানকার দুই-একজন লোকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল; তাহারাও নাকি আমাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। যাই হোক, গোস্বামী মহাশয় যে আমাকে সামান্য টাকার লোভে আবার সেই বিপদের মুখে ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন, ইহা ভাবিতেও কষ্টবোধ হয়। যখন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন উনি তাঁহার নিকটে কত বিষয়ে কত টাকা পাইয়াছেন, সে-সকল কি একবারও এখন মনে পড়িল না! এ-সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই।' বলিতে-বলিতে রেবতীর ফুল্লেন্দীবরতুল্য সেই বড়-বড় চক্ষু দুইটি সজল হইল, হিমনিষিক্তপদ্মবৎ সে চক্ষু দুইটি পরম শোভাময়, দুইটি চক্ষে দুইটি বড়-বড় অশ্রুবিন্দু মুক্তার ন্যায় জ্বলজ্বল করিতে লাগিল; আবার ভাবনার অপার সমুদ্রে পড়িয়া রেবতী আকুল হইয়া উঠিল। রেবতী আর কথা কহিতে পারিল না, রেবতীর বুক কাঁপিতে লাগিল; রেবতী চোখে দেখিতে পাইল না, রেবতী নীরবে সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রেবতীর কথা শুনিয়া অরিন্দম নিজের সন্দেহের সহিত অনেকগুলি বিষয় মিলাইয়া পাইলেন। যেখানে রেবতীর রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি পড়িয়াছিল, সেই জঙ্গলমধ্যে যদুনাথের দুইবার যাতায়াতের পদচিহ্ন পড়িবার কারণও বুঝিলেন। একবার সেই রক্তাক্ত কাপড় ইত্যাদি রাখিতে গিয়াছিলেন, আর একবার বলাই মণ্ডল ও তাহার সঙ্গিগণকে সেই সকল দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। অরিন্দম রেবতীকে অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে আর কোনও কথা তুমি জানো?'

রেবতী চোখ মুছিয়া বলিল, 'না, আপনি এখন দয়া করিয়া এ-বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন; আবার যদি সেই পাপিষ্ঠের হাতে পড়ি, তাহা হইলে আর বাঁচিব না। আপনি আমার কাকার কাছে আমায় রাখিয়া আসুন।'

অরিন্দম সে-কথায় কোনও কথা না কহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত বয়সেও তোমার বিবাহ হয় নাই কেন? এখন বোধকরি, তোমার বয়স পনেরো বৎসরের কম নহে।'

রেবতী লজ্জিতভাবে বলিল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকিলে এতদিন তিনি আমার বিবাহ দিতেন। যখন আমার বয়স বারো বৎসর, তখন বাবা কলিকাতা শহরের দক্ষিণে ভবানীপুরে আমার বিবাহ দিবার জন্য ঠিকঠাক করিয়াছিলেন। তাহার পর হঠাৎ তাঁহার শরীর ভাঙিতে আরম্ভ হয়। কী এক উৎকট পীড়ায় হঠাৎ তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন; কোনও ডাক্তার কি কবিরাজ, কেহই সে রোগ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাবা প্রায় ছয়মাসকাল শয্যাশায়ী থাকিয়া ক্রমে আরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। কী রোগ কেহ ঠিক করিতে পারিল না; কাজেই চিকিৎসাও তেমন হইল না। বাবা অসময়ে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন।'

অ। তোমার কাকাবাবু তোমার বিবাহে এতদিন উদাসীন ছিলেন কেন?

রে। তিনি জমিদারি কাজকর্মে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এমনকী স্নানাহারেরও সময় পাইতেন না।

অ। এই বলিলে তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সদাসর্বদা গল্প করিতেন, দাবা খেলিতেন, তাস

পিটিতেন, বেড়াইতে বাহির হইতেন; তোমার উপরে তাঁহার যেরূপ স্নেহ—তোমার মুখে শুনিলাম—তাহাতে তিনি তোমার বিবাহের কোনও বন্দোবস্ত না করিয়া তাস, দাবা, গল্প, বেড়ানো দূরে থাক, তিনি যে কেমন করিয়া স্নানাহার করিতেন, বুঝিতে পারিলাম না। বোধহয়, কাকাবাবু, তোমায় এত অধিক পরিমাণে স্নেহ করিতেন, তিনি তোমাকে বিবাহ দিয়া, পরের ঘরে পাঠাইয়া, কেমন করিয়া প্রাণ ধরিবেন, সে-বিষয়ে তাঁহার একটু সন্দেহ ছিল।

রেবতী তাঁহার এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিল না। অরিন্দম তখন রেবতীকে যাহা-যাহা করিতে হইবে, সব বলিয়া দিলেন এবং এই চতুর্দিকব্যাপী বিপদের মুখ হইতে তাহাকে যে কৌশলে উদ্ধার করিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। আরও অনেকক্ষণ ওই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল, তাহাতে রেবতী অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিল। রেবতীর চক্ষু হইতে যেন আরও একটা আবরণ সরিয়া গেল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ ঃ সাফল্য

বৃদ্ধকে তৃষ্ণাতুর মৃতপ্রায় দেখিয়া ব্রাহ্মণী সেই যে জল আনিতে গেলেন এখনও ফিরিলেন না—কারণ? ব্রাহ্মণী যখন জল লইয়া আসিলেন, তখন রেবতী ও অরিন্দমকে পরস্পর কথোপকথন করিতে শুনিয়া ঘরের ভিতরে আর ঢুকিলেন না; জলের ঘটি হাতে, বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের কথাবার্তা একান্ত নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। শুনিতে লাগিলেন, আর জলপূর্ণ ঘটিটি তাঁহার হাতে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় বাড়িতে নাই, তিনি একাকী কী করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। স্ত্রীলোকের মন বড় কৌতূহলপ্রিয়। কুতূহলী মন বলিল, 'আগে শোনা যাক, তাহার পর যাহা করিতে হয়, করা যাইবে; তার আগে যদি তিনি আসিয়া পড়েন, তিনিই যাহা হয় করিবেন। এখন শুনিই না—কী কথা হয়।' ব্রাহ্মণী একমনে শুনিতে লাগিলেন। কতক শুনিতে পাইলেন, কতক বা না ; আবার যাহা শুনিলেন, তাহার কতক বা বুঝিতে পারিলেন, কতক বা না।

তাহার পর যখন অতি মৃদুস্বরে তাঁহাদিগের পরামর্শ চলিতে লাগিল, যাহা আমরাও এখন জানিতে পারি নাই, তখন ব্রাহ্মণীর কানে আর কিছুই আসিল না। কেবল জানালার ফাঁক দিয়া ব্রাহ্মণীর আগ্রহপূর্ণ চক্ষু এই সময়ে ক্ষণে-ক্ষণে রেবতীর মুখের রকম-রকম-ভাব দেখিতে লাগিল। সেই সময়ে সেই সকল বিষয়ে তাঁহার মন এমনই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, হাতের জলের ঘটির কথা কিছুই মনে ছিল না, কাঁপিতে-কাঁপিতে সেটি হাত হইতে সশব্দে ভূতলে পড়িয়া গেল। তখন অরিন্দম প্রস্থান করিবার জন্য উঠিয়াছেন; যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, 'আর জল খাইব না।'

অনতিবিলম্বে যদুনাথ গোস্বামী কবিরাজ সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! ব্রাহ্মণী তাঁহাকে কতক বা ঠিক, কতক বা বেঠিক অনেক কথা শুনাইলেন। শুনিয়া গোস্বামী মহাশয়ের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। কবিরাজ ম্লানমুখে ফিরিয়া গেল। তখন গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার পত্নী রেবতীকে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন, কে সে? কেন আসিয়াছিল? কোথায় থাকে? কী বলিয়া গেল? ইত্যাদি—ইত্যাদি।

রেবতী একটি কথারও উত্তর করিল না।

সেইদিন অপরাহ্নে আর এক কাণ্ড ঘটিল। রেবতীর মাতামহ (?) পুলিশ-প্রহরী সঙ্গে লইয়া রেবতীকে লইতে যদুনাথ গোস্বামীর বাটিতে উপস্থিত। রেবতী সেখানে আছে কি না, যদুনাথ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্বীকার করিবেন, কি অস্বীকার করিবেন, তাহা

ভাবিয়া দেখিবার পূর্বেই রেবতী ছুটিয়া বাহিরে আসিল। সে তাহার বৃদ্ধ মাতামহকে চিনিল। তখনই পালকি ডাকাইয়া রেবতীকে তন্মধ্যে উঠাইয়া লওয়া হইল। অরিন্দম ও যোগেন্দ্রনাথ উভয়েই তথায় উপস্থিত ছিলেন।

অরিন্দম যদুনাথ গোস্বামীকে বলিলেন, 'কী গোস্বামী মহাশয়, পাঁচশত টাকা যে একেবারে ফাঁক হইয়া গেল। যাহা হউক, রক্তমাখা কাপড়ের সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে যে মর্চেধরা ছুরিখানা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, যখন অবসর হইবে, সেখানা থানায় গিয়া লইয়া আসিবেন; অনর্থক আর কেন ঘর থেকে ছুরিখানা লোকসান দিবেন?'

গোস্বামী মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি একান্ত ভালোমানুষ, একটা খুব খেলাই খেলিলেন!'

ঠাকুর মহাশয় তথাপি কোনও উত্তর করিলেন না।

সকলে চলিয়া গেল।

ঠাকুর মহাশয় কিসে কী ঘটিয়া গেল, ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড

শোণিত-প্রবাহ

Moresco. Perished ?
Alh. He had perished ;
Sleep on, poor babes ; not one of you doth know
That he is fatherless—a desolate orphan ;
Why should he make them ? can an infant's arm
Revenge his murder ?
One Moresco. (to another) Did she say his murder ?
Nao. Murder ? Not murdered !

COLERIDGE
"Remorse"
Act IV. Scene III

অরিন্দম নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। যে-হত্যাকরী সেই বালিকার লাশ সিন্দুকের মধ্যে পুরিয়া, থানায় পাঠাইয়া একটা অতি বড় দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, যতক্ষণ না তাহাকে কোনওরকমে ধরিতে পারিতেছেন, তিনি কিছুতেই নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারিবেন মা। তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যত ঘটনা ঘটিতেছে, সকলের সঙ্গে সকলের যেন কিছু-না-কিছু সংশ্রব আছে। সকলেই যেন এক শৃঙ্খলে গ্রথিত; তথাপি তিনি সেই সকলের মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িলেন যে, কিছুকালের জন্য তিনি কোনও উপায় অবধারণে সমর্থ হইলেন না। যেখানে সন্দেহের একটু ছায়াপাত দেখিতেন, সেইখানেই যাইতেন, যতদূর সম্ভব সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেন; কিন্তু কাজে এ-পর্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অরিন্দমের ন্যায় একজন নামজাদা ডিটেক্‌টিভের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই একটা গুরুতর কলঙ্কের কথা।

একদিন অপরাহ্নে তিনি দূর লোকনাথপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বাটি ফিরিতেছেন। প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার আহারাদি হয় নাই। লোকনাথপুর তাঁহার বাসা-বাটি হইতে কিছু-কম এক ক্রোশ—বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। তখন পশ্চিম গগনে থাকিয়া কতকগুলি তরল নির্গলিতাম্বুগর্ভ শ্বেতাম্বুখণ্ড অস্তগত-প্রায় রবির স্বর্ণোজ্জ্বলকিরণ-রঞ্জিত সৌধ বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। আরও সুন্দর দেখাইতেছিল, তাহারই কোমলোজ্জ্বলচ্ছায়া বীচি-চঞ্চলবক্ষে ধরিয়া লোকনাথপুরের আম-জাম-নারিকেলবৃক্ষপরিবৃত স্বনামখ্যাত বিমলী * সরোবর। এ-সকল ফেলিয়া চাহিয়া দেখিতে হয়, এমন এক অপূর্ব শোভাময় তখন ওই সরোবরের পশ্চিমঘাটে বিকশিত ছিল, যেখানে অনেকগুলি সৌন্দর্যসমুজ্জ্বলা স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়রূপিণী নবীনা, কেহ আকণ্ঠনিমজ্জিত, উপরে অতি সুন্দর মুখখানি, সদ্যপ্রোদ্ভিন্নপদ্মবৎ, তাহারই উপরে একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। কেহ ডুবিয়াছে—কালো জলে তাহার রাশীকৃত কালো কেশগুলির উপরে তরঙ্গে-তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে—সেখানে একখণ্ড অতি সুন্দর হেমাভকিরণ। যেখানে কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ ঢেউ দিতেছে এবং কেহ জল ছিটাইতেছে, সেখানে সেই অতি সুন্দর হেমাভকিরণ খণ্ড-খণ্ড, চঞ্চল—তথাপি অতি সুন্দর।

যখন সকলে যে-যাহার কাজ সারিয়া, একে-একে উঠিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তখন সেই পুষ্করিণীর দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, সকলেই চলিয়া গেল, একজন গেল না; সে বসিয়া রহিল। তাহার রূপে সেখানটা আলো করিয়া সে বসিয়া রহিল। তাহার সে-রূপের বর্ণনা হয় না। বুঝি, সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুন্দরীই বিধাতার একমাত্র চরমোৎকৃষ্ট শিল্পচাতুর্য। এত অল্প বয়সে সর্বাঙ্গে এমন পরিণত ভাব বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। কী সেই স্নেহপ্রফুল্ল মুখখানি! কী সেই বিশালায়ত, ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, সেই চোখে পীযূষনিস্যন্দিনী দৃষ্টি! যেমন আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, তেমনি আকর্ণবিশ্রান্ত চিত্ররেখাবৎভ্রূযুগল, তেমনি চূর্ণকুন্তলাবৃত অর্ধপ্রকাশিত ললাট; তেমনি সেই সুগঠিত নাসিকা, তেমনি অধর নির্মল, স্ফুরিত, রক্তাভ; ললিত, নির্মল, আরক্ত সে-কপোলদুটির কমনীয়তা চোখে না দেখিলে লিখিয়া কি বুঝানো যায়! সে চিবুক দেখিয়া কে না বলিবে, যাহা কখনও দেখি নাই তাহা দেখিলাম? এ যে পুষ্পপরাগসমাচ্ছন্ন নবমীর সমষ্টি! সংসর্পী, দীর্ঘ অথচ কুঞ্চিত, রাশীকৃত সিক্ত কৃষ্ণকেশদাম গুচ্ছে-গুচ্ছে কতক বা পৃষ্ঠে, কতক বা ঈষদুন্নত বক্ষে সংলগ্ন রহিয়াছে। সেই শশাঙ্করশ্মিরুচির বর্ণবিভার নিকটে গোধূলির

*এইরূপ প্রবাদ, বিমলা নাম্নী কোনও বৃদ্ধা ওই পুষ্করিণীর তটে একখানি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া আমরণ বাস করিয়াছিল; সেইজন্য উহার এইরূপ অপূর্ব নামকরণ। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন সে বিমলা ছিল না এবং তাহার পর্ণকুটীরের কোনও চিহ্ন ছিল না। এখন সেই পুষ্করিণীরও চিহ্নমাত্র নাই।

উজ্জ্বলতম কাঞ্চনঘটাও ম্রিয়মাণ বোধ হইতেছিল। পাঠক! আপনি কি ভাদ্রের ভরা নদী কখনও দেখেন নাই? যদি দেখিয়া থাকেন, বুঝিতে পারিবেন, এই বরবপুতে কেমন সে অলোকসামান্য সৌন্দর্যরাশি সেইরূপ কূলে-কূলে উছলিতেছিল—অথচ সীমাতিক্রম করে নাই। সর্বাঙ্গ পূর্ণায়ত, পরিপুষ্ট, প্রসৃত, সেই সর্বাঙ্গ বহিয়া অপরূপ রূপরাশি উচ্ছ্বসিত। সেই নির্জনতার মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, গোধূলির করকরাগের মধ্যে; মৃদুমন্দ স্নিগ্ধসমীরণের মধ্যে, দিগ্‌দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত ফুলগন্ধ মধ্যে থাকিয়া ঘাটের শৈবালাচ্ছন্ন প্রস্তর চাতালে বসিয়া সেই বনদেবীমূর্তি চিত্রার্পিতপ্রায় ও নীরব।

যখন সেই সুন্দরী দেখিল, সেখানে সে ছাড়া আর কেহ নাই, তখন উঠিয়া তাড়াতাড়ি জলে নামিল এবং অধিক জলে গিয়া ডুবিল। অনেকক্ষণ গেল তথাপি উঠিল না। অরিন্দম দূরে থাকিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বড় কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি সেই সরোবরের পূর্ব-পশ্চিম কোণে বটবৃক্ষতলে গিয়া দাঁড়াইলেন; মনে কেমন একটা সন্দেহ হওয়াতে তিনি সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন, তথাপি সেই লোকললামভূতা সুন্দরী উঠিল না; অরিন্দম চিন্তিত হইলেন, এত অধিকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকা মনুষ্যমাত্রেরই অসাধ্য। তিনি দেখিলেন, যেখানে সে ডুবিয়াছিল, তাহার আরও অনেকটা দূরে দুইখানি হাত একবার ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার ডুবিয়া যাইতেছে, আবার কিছুদূরে গিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে।

তখন অরিন্দমের বুঝিতে আর বাকি রহিল না। তিনি তাড়াতাড়ি জলে নামিলেন। সেই হাত-দুখানি আবার ভাসিয়া উঠিতে ধরিলেন এবং নবীনাকে ঘাটে আনিয়া তুলিলেন। নবীনা যদিও সংজ্ঞাশূন্য হয় নাই, কিন্তু সে এত অবসন্ন হইয়াছিল যে, বসিতে পারিল না, ঘাটের চাতালের উপরে শুইয়া পড়িল। এবং জল এত অধিক পরিমাণে তাহার উদরস্থ হইয়াছিল যে, কথা কহিতে পারিল না—এমনকী নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছিল, একটা নিশ্বাস দুই-তিনবারে টানিতেছিল।

দেখিতে-দেখিতে সেখানে গ্রামের অনেকগুলি লোক আসিয়া পড়িল। অরিন্দম তাহাদের মুখে শুনিলেন, সেই জলমগ্না সুন্দরী সেইখানকার বিখ্যাত ধনী তমীজউদ্দীনের কন্যা—নাম কুলসম। তাহারা সকলেই সেই তমীজউদ্দীনের প্রজা; তাহাদের সাহায্য পাইয়া অরিন্দম কিছু সুবিধা বোধ করিলেন; কুলসমকে বারংবার ঘুরাইয়া ও উঠা-বসা করাইয়া, তাহার উদরস্থ সমস্ত জল বমন করাইয়া ফেলিলেন। কুলসম অনেকটা সুস্থ হইল। একবার অরিন্দমের মুখপানে চাহিয়া মৃদুনিক্ষিপ্তশ্বাসে বলিল, 'কেন আপনি আমার জন্য এত করিলেন? ভালো করিলেন না, আমার মরণই ভালো ছিল।'

অরিন্দম সে-কথায় কোনও কথা কহিলেন না। যখন কুলসমের শারীরিক অবসন্নতা অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন একদিকে অরিন্দম, অপরদিকে অপর একটি লোক কুলসমের হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। কুলসম তাহাদের সঙ্গে ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল। বেশি দূরে নয়, সেইখানেই সেই সরোবরের পূর্বপার্শ্বে তমীজউদ্দীনের প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নূতন বিপদ

অনতিবিলম্বে কুলসমকে লইয়া অরিন্দম ও প্রতিবেশিচতুষ্টয় তমীজউদ্দীনের বাটিতে উপস্থিত হইল। সে-সংবাদ অন্তঃপুরে পৌঁছাইতে বড় বেশি বিলম্ব হইল না। দুই-তিনজন ভৃত্য আসিয়া কুলসমকে লইয়া গেল। এমন সময়ে কুলসমের পিতা তমীজউদ্দীন সেখানে আসিলেন, পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রীও আসিলেন। তমীজউদ্দীনের বয়স পঞ্চাশ বৎসর হইবে, তাঁহার দেহ জীর্ণ-শীর্ণ; জরাতুর অশীতিপর বৃদ্ধের ন্যায় তাঁহার শরীর কটিদেশ হইতে ভাঙিয়া সম্মুখের দিকে অতিশয় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। চলিয়া আসিবার সময়ে মাতালের মতো তাঁহার পা টলিতেছিল।

কম্পিতকণ্ঠে তমীজউদ্দীন অরিন্দমের দিকে ম্লানদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছেন, আপনি যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে যে আজ আমার—' বলিতে-বলিতে—বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া সহসা ঘড়ঘড়ি উঠিল। আবার কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল এবং আপাদমস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে পতনোন্মুখ দেখিয়া অরিন্দম ধরিয়া ফেলিলেন। দুই হস্তে তাঁহাকে তুলিয়া বহির্বাটির একটি প্রশস্ত কক্ষে শয়ন করাইয়া দিলেন।

সশঙ্কচিত্তে আর সকলে সেইস্থলে প্রবেশ করিল। অরিন্দম দেখিলেন, ইতোমধ্যেই তমীজউদ্দীনের মৃত্যু হইয়াছে।

তমীজউদ্দীনের স্ত্রীর নাম মতিবিবি; তাঁহার বয়ঃক্রম অতি অল্প—পঞ্চবিংশতির বেশি নয়, বরং তাঁহাকে আরও ছোট দেখায়। মতিবিবি আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। চুল ছিঁড়িয়া, হাত-পা আছড়াইয়া, বুক চাপড়াইয়া, ডাক ছাড়িয়া উঠানে কাঁদিতে বসিলেন।

অরিন্দম একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ-বাড়িতে কোনও ডাক্তার চিকিৎসা করেন?'

ভৃত্যের নাম আমেদ। আমেদ বলিল 'ফুলসাহেব।'

অরিন্দম বলিলেন, 'এখনই তাঁহাকে ডাকিয়া আনো।'

ছুটিয়া আমেদ চলিয়া গেল। অরিন্দম তমীজউদ্দীনের দেহ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। মনে করিতে লাগিলেন, হয়তো তমীজউদ্দীন জীবিত আছেন; বোধহয়, এ একপ্রকার মৃগীরোগ হইবে। মতিবিবিকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। মতিবিবি আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

এমনসময়ে সেখানে দ্রুতপদে কুলসম প্রবেশ করিল। যেখানে তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, সেইদিকে অগ্রসর হইতে-হইতে বলিল, 'বাবা—বাবা—বাবা! কী হয়েছে তোমার? এই যে আমি, বাবা, কথা কও।' পিতার বুকে মাথা রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

অরিন্দম বলিলেন, 'বোধহয়, তোমার পিতা জীবিত নাই। একজন ভৃত্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে।'

শুনিয়া শিহরিত হইয়া কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল; কর্তৃত্বের ভাবে মাথা তুলিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, 'কোন ডাক্তার?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ফুলসাহেব নামে যিনি তোমাদের বাড়িতে চিকিৎসা করিয়া থাকেন।'

শুনিয়া এরূপ সময়েও কুলসমের মুখে হাসি আসিল। সম্মুখে তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া, পার্শ্বে মাতা আকুল হৃদয়ে রোদন করিতেছেন, এ-ভয়ানক সময়ে কুলসমের মুখে সেই হাসি যেন কেমন-এক-রকম বড় অস্বাভাবিক দেখাইল। তাহার পর সে অস্ফুটস্বরে একবার বলিল, 'ফুলসাহেব? হবে।' তখন আবার সে পিতার বুকের উপরে পড়িয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'বাবা! কোথায় তুমি? আর যে কেউ আমার নাই! বাবা! বাবা! আমার কী হবে!' তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। বলিল, 'ফুলসাহেব—শত্রু—আমার পিতার শত্রু—আমার শত্রু—এ-সংসারের শত্রু—পিশাচ—পিশাচ—কী সর্বনাশ!' আর বলিতে পারিল না—তাহার কাতরকম্পিত দেহলতা সেইখানে পড়িয়া মাটিতে লুটাইল; কুলসম মূর্ছিত হইল।

অরিন্দম তাড়াতাড়ি উঠিয়া কুলসমকে ধরিলেন। তাহার পর মতিবিবিকে বলিলেন, 'এ-সময়ে আপনি আকুল হইয়া কাঁদিলে চলিবে না। কুলসম অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে; এখন আপনাকেই সকল দিক দেখিতে হইবে।'

মতিবিবি কুলসমের পাশে আসিয়া বসিলেন—চোখে-মুখে জলের ছিটা দিতে কুলসমের শীঘ্র জ্ঞান হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ফুলসাহেব

অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার ফুলসাহেব উপস্থিত হইলেন। সর্বাগ্রে বৃদ্ধ তমীজউদ্দীনকে দেখিতে গেলেন। দেখিয়া বলিলেন, 'না, জীবিত নাই; বুঝিতে পারিতেছি না, কেন এমন হঠাৎ মৃত্যু হইল।'

মতিবিবি বলিলেন 'কুলসমই যত অনর্থের মূল; ও যদি না আজ জলে ডুবিয়া মরিতে যাইত, তাহা হইলে কি এমন সর্বনাশ হয়!' তাঁহার দরবিগলিতধারে দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল; তথাপি সেই মুখে একবার একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল।

অরিন্দম ডাক্তার ফুলসাহেবকে আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলেন। ফুলসাহেব মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিলেন। কেহ দেখিল না, তখন তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফশূন্য ওষ্ঠাধরের একপার্শ্বে একপ্রকার বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। অরিন্দমের কথা শেষ হইলে ফুলসাহেব নিতান্ত বিনীতের ন্যায় বলিলেন, 'মহাশয়ের নামটি কী, জানিতে পারি?'

অ। অরিন্দম বসু।

ফু। বটে!

সহসা ফুলসাহেবের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল এবং সে-ভাব সামলাইয়া তিনি আরও বিনীতভাবে বলিলেন, 'মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়? যদি কোনও বাধা না থাকে—'

অ। রঘুনাথপুর; এখান হইতে তিন ক্রোশ পথ হইবে, কোনও কাজে এখানে আসিয়াছিলাম। বলেন যদি আমি এখন যাইতে পারি।

ফুলসাহেব সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়া, কুলসমের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তুমি আর এখানে থাকিয়ো না, যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে তোমার স্বাস্থ্য এখন তেমন ভালো বোধ করি না। যাও, তোমার মাকে লইয়া তোমার ঘরে যাও।' তাহার পর অরিন্দমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আপনি অনুগ্রহপূর্বক আর একটু অপেক্ষা করুন।'

কুলসম উঠিয়া দাঁড়াইল। কোনও কথা কহিল না; কিন্তু সে এমনভাবে একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল—ডাক্তারই সে-দৃষ্টির অর্থ বুঝিলেন। তখন ফুলসাহেবের মুখের ভাব অন্য কোনও ভাবাপন্ন না হইলেও, একবার ক্ষণেকের জন্য ললাট কুঞ্চিত হইয়া মিলাইয়া গেল; সেইসঙ্গে তাঁহার সেই দৃষ্টিতে যেন একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া, সেইরূপ চকিতে মিলাইয়া গেল। ফুলসাহেব বলিলেন, 'যাও কুলসম, অবাধ্য হইয়ো না—তোমার মাকে সঙ্গে লইয়া তোমার ঘরে যাও।'

মতিবিবি উঠিয়া গেলেন। কুলসমও উঠিল। যাইবার সময়ে সে দ্বারসম্মুখে দাঁড়াইয়া অরিন্দমকে বলিল, 'মহাশয়, আমাকে যদি সেই সময়ে মরিতে দিতেন, ভালো করিতেন। এখনও বলিতেছি, আপনি ভালো কাজ করেন নাই।' কুলসম দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তখন ডাক্তার ফুলসাহেব একটা অতি দীর্ঘ আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'কেহ মরিলে স্ত্রীলোকেরা যেন কাঁদিবার একটা মহা সুযোগ পায়—কাঁদিয়া বাড়ি ফাটাইতে থাকে; যত শীঘ্র উহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়, সে-চেষ্টা আমি আগে করি।' বলিয়া তিনি ভৃত্যদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তিন-চারজন ভৃত্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। অরিন্দম দেখিলেন, তাহারা সকলেই সশঙ্ক, ত্রস্ত, সকলেই ডাক্তারবাবুকে অতিশয় ভয় করে। তাহাদের মুখভাবে ইহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়, যেমন অতিশয় ভয় করে, তেমনি তাঁহাকে তাহারা মনে-মনে অতিশয় ঘৃণাও করে।

ফুলসাহেব তখন ভৃত্যদের যাহাকে যাহা করিতে হইবে, বলিয়া দিলেন; তাহারা যে-যাহার কাজে চলিয়া গেল। অরিন্দম চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, দুইবার তিনি যাইবার জন্য উঠিলেন, ডাক্তার ফুলসাহেব দুইবারই তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

সেই মৃতদেহ সম্বন্ধে অন্যান্য বন্দোবস্ত করিতে ফুলসাহেবের আরও প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত

হইল। তাহার পর তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, আরও যদি আপনি একটু অপেক্ষা করেন, ভালো হয়; আমি একবার মতিবিবি ও কুলসমের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিতেছি; তাহার পর একসঙ্গে যাইব, কী বলেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ক্ষমা করিবেন, আমার কিছু আবশ্যক আছে—অধিকক্ষণ বসিতে পারিব না—আমি উঠিলাম।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'না না, বসুন আপনি, আমি এখনই আসিতেছি; আপনার সঙ্গে দুই-একটি কথা আছে। আপাতত মতিবিবি আর কুলসমকে এ-সময়ে যা-যা করিতে হইবে, বলিয়া আসিতেছি—এখনি আসিব।'

ফুলসাহেব উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সতর্কীকরণ

ডাক্তারের প্রস্থানের পরমুহূর্তেই কুলসম দ্রুতপদে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সেই কক্ষে এখনও তাহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। অরিন্দম মনে করিলেন, কুলসম বুঝি তাহার মৃত পিতাকে আবার দেখিতে আসিয়াছে; কিন্তু সে পিতার মৃতদেহের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না; যেখানে অরিন্দম বসিয়াছিলেন, সেইদিকে অগ্রসর হইয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। বলিল, 'অরিন্দমবাবু, সাবধান! ওই ডাক্তার বড় সহজ লোক নয়, আমি উহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, সে আপনাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টায় আছে।'

অরিন্দম তাহার কথা বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, শোকে-দুঃখে কুলসমের মতিভ্রম ঘটিয়া থাকিবে; কুলসম অরিন্দমকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব একরকম অনুভবে বুঝিতে পারিল। সেই সময়ে একটা দুঃখের হাসি সেই ম্লানমুখে একবার দেখা দিল। কুলসম বলিল, 'আমাকে পাগল মনে করিবেন না, আমি সকলই দেখিতেছি—সকলই শুনিতেছি—সকলই বেশ বুঝিতে পারিতেছি। আপনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি।' মৃত পিতার নিস্পন্দ কঠিন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, 'আমার পিতার এ-দশা কে করিল? কে? ওই পিশাচ—ডাক্তার, ডাক্তার ফুলসাহেব আমার পিতাকে খুন করিয়াছে। দুই বৎসর পূর্বে—যখন ফুলসাহেবকে আমরা জানিতাম না, তখন আমার পিতা কেমন দেখিতে ছিলেন! সেই সবল শরীর আজ দুই বৎসরের মধ্যে জরাতুর বৃদ্ধের অপেক্ষাও জীর্ণ-শীর্ণ। আজ দুই বৎসরের মধ্যে ফুলসাহেব এ-সোনার-সংসার শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে। এখনও বলিতেছি, অরিন্দমবাবু, আপনি আমাকে পাগল মনে করিবেন না। আমি আমার পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি, ফুলসাহেবকে যতদূর চিনিতে হয় চিনিয়াছি। আজ তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, এবার সে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছে। আমি তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে পারি। সেইজন্য আপনাকে সতর্ক করিলাম। সাবধান—খুব সাবধান—ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক!'

কুলসমের সেই আগ্রহাতিশয্যে, তাহার সেই সোজাসুজি সারল্যপূর্ণ কথায় অরিন্দমের মনে কেমন-একটা খটকা লাগিল। তিনি বলিলেন, 'সকল কথা খুলিয়া না বলিলে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।'

'না—না, এখন নয়; এখনই পিশাচ আসিয়া পড়িবে—এখন সে-সময় নয়।' এই বলিয়া কুলসম সভয়ে একবার ইতস্তত চাহিল।

অরি। যদি বা তিনি আসেন, তাহাতে কী হইয়াছে?

কুল। আমাকেই তার ফলভোগ করিতে হইবে।

অ। যতক্ষণ আমি উপস্থিত, ততক্ষণ বোধহয় নয়।

কু। ততক্ষণ না হইলেও হইতে পারে। এমন নারকী আর আছে কি? এদিকে কথাগুলি এমন মধুমাখা, ভাবভঙ্গিতে এমন সাধুতার ভান, কাহার সাধ্য তাহার মনের ভাব বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে? কখনও তাহার মুখে কর্কশ কথা শুনিতে পাওয়া যায় না, কখনও রাগিতে দেখা যায় না; আজ আপনার সহিত যেরূপ অতিশয় ভদ্রভাবে উহাকে আলাপ করিতে দেখিলেন, চব্বিশঘণ্টা ঠিক ওইভাবেই থাকে। আর আজ যাহাকে দেখিলেন, যাহার বয়স আমার বয়সের চেয়ে বড় বেশি হইবে না, উনি আমার বিমাতা—উনিও বড় সহজ নহেন। আমার পিতার মৃত্যুতে তিনি যে-শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ মৌখিক; তিনি ইহাতে বরং মনে-মনে বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছেন। হায়, আজ সকল রকমে আমার যতদূর সর্বনাশ হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। আজ আমার আপনার বলিতে কেহ নাই—পিতা নাই, মাতা নাই, ভ্রাতা নাই—জানি না, কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইব—আমার কী হইবে?'

কুলসমের চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে দুই হাতে মুখ চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি-সকলের পার্শ্ব দিয়া, অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইয়া তাহার হাত দুখানি প্লাবিত করিল। অরিন্দম প্রবোধ দিয়া তখন তাহাকে শান্ত করিলেন। কুলসম বলিতে লাগিল, 'ফুলসাহেব এ-সংসারে পদার্পণ করিবার দুইমাস পরে আমার মাতার মৃত্যু হইল। তাহার আরও দশমাস পরে আমার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট একটি ভাই ছিল, তাহার মৃত্যু হইল। তাহার পর আরও ছয়মাস গত হইতে-না-হইতে আমার পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। এ-সকলের ভিতরে পিশাচের আরও একটা অভিপ্রায় আছে; পাপিষ্ঠ যে, আমাকেও আর অধিকদিন জীবিত রাখিবে; এমন বোধ হয় না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কেন—এ-কথা বলিতেছ কেন?'

কুলসম বলিল, 'যদি না তাহাকে আমি বিবাহ করি, সে শীঘ্রই আমাকে হত্যা করিবে। তেমন নরাধমকে বিবাহ করিয়া আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা একদণ্ডের মৃত্যু-যন্ত্রণা সহস্রগুণে শ্রেয়। সেইজন্য পিশাচ—থাক, ও-কথা এখন থাক, আমি আমার দুঃখের কথা আপনাকে বলিব মনে করিয়া এখানে আসি নাই; আপনাকে সাবধান করিতে আসিয়াছি। এখনও আপনাকে বলিতেছি, ফুলসাহেবকে সাবধান; সম্মুখে সর্প দেখিলে লোকের যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, আপনি সেইরূপ সাবধানে থাকিবেন। যখন প্রথমেই সে এখানে আপনাকে দেখে, তখনকার মুখের ভাব দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছি, যদিও আপনি ফুলসাহেবকে চেনেন না, সে আপনাকে বেশ চেনে; শুধু চেনে না, আপনাকে সে যে তেমনি ঘৃণা করে, আপনার নাম শুনিয়া তাহার চোখ দুইটা একেবারে জ্বলিয়া উঠিতেই আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। যদিও ফুলসাহেব আপনার সহিত নম্রভাবে কথা কহিতেছিল, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন, তাহার বিনীত, মিষ্ট, হাসিমাখা কথার অপেক্ষা কালসাপের গর্জনও মঙ্গলজনক। এখন আমি চলিলাম।'

এই বলিয়া কুলসম উঠিল।

'বসো, আমারও একটি কথা আছে,' বলিয়া অরিন্দম একখণ্ড কাগজে নিজের ঠিকানাটি লিখিয়া কুলসমের হাতে দিলেন। বলিলেন, 'যদি কখনও দরকার হয়, এই ঠিকানায় সংবাদ দিতে বিলম্ব করিয়ো না।'

কুলসম মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। তাহার পর চঞ্চলপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ পথিমধ্যে

তখন অরিন্দমের মনের ভিতর কুলসমের কথাগুলি তোলাপাড়া হইতে লাগিল। একবার ভাবিলেন,

হয়তো কুলসম যাহা বলিল, সমস্ত সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপভাবে কুলসম ফুলসাহেবের পরিচয় দিল, ফুলসাহেব কি তেমনই একটা ভয়ানক লোক, তেমনই একটা পিশাচ-চেতা? আবার ভাবিলেন, কই, ফুলসাহেবকে তেমন তো দেখিলাম না; লোকটাকে ভালো বলিয়াই বোধ হইল। হয়তো বা কুলসমের কিছু পাগলের ছিট আছে; যেরূপভাবে সে আমার সহিত কথা কহিল তাহাকে পাগলই বা বলি কী করিয়া? যাই হোক, ব্যাপারটা ভালো করিয়া দেখিতে হইবে; বুঝিতেছি, ইহার ভিতর অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে; চেষ্টা করিয়া দেখিলে সময়ে সকলই বাহির হইয়া পড়িবে। দেখা যাক, ডাক্তার মহাশয় আসিয়া কী বলেন।'

অরিন্দম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময়ে নিঃশব্দে ফুলসাহেব তথায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে তখন বড় চিন্তান্বিতের মতো দেখাইল। অরিন্দম কোনও কথা কহিলেন না। ফুলসাহেব ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন, 'অরিন্দমবাবু, কিছু মনে করিবেন না, অনেকক্ষণ আপনাকে একলা বসাইয়া রাখিয়াছি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, সেজন্য আপনি কিছু মনে করিবেন না; যাহোক, বাড়ির স্ত্রীলোকেরা আপাতত অনেকটা শান্ত হইয়াছেন তো?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'হ্যাঁ, একরকম বুঝাইয়া আপাতত তাহাদিগকে অনেকটা শান্ত করিয়া আসিলাম। মতিবিবি আমারই একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া; এমন গুণবতী স্ত্রীলোক প্রায়ই দেখা যায় না। উহাকে আমি বড় স্নেহ করি। কই, কুলসমকে সেখানে দেখিলাম না, সে কি আবার এখানে কান্নাকাটি করিতে আসিয়াছিল না কি?'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে সত্য কথাই বলিলেন, 'কই না, সে আর এখানে কান্নাকাটি করিতে আসে নাই।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'এখন চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাক।'

অরিন্দম উঠিলেন। উভয়ে বাহির হইয়া একটা সোজা পথ ধরিলেন।

কিছুদূর আসিয়া অন্যান্য কথাবার্তার পর ফুলসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনাকে কতদূর যাইতে হইবে? এখন কি সেই রঘুনাথপুরেই ফিরিবেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, কামদেবপুরের বাসা-বাটিতে এখন যাইব।'

ফুল। সেইখানেই কি এখন কিছুদিন থাকিবেন না কি?

অ। হ্যাঁ, একটা কাজ আছে; বোধহয়, সেইখানে এখন কিছুদিন থাকিতে হইবে।

ফু। কামদেবপুরে আমার দুই-একজন রোগী আছে, মধ্যে-মধ্যে আমাকে যাইতে হয়। এবার যখন ওদিকে যাইব, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব।

অ। যে আজ্ঞা।

কিছুদূর যাইয়া ফুলসাহেব একটি চুরুট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তখন একবার অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়ের কি চুরুট খাওয়া অভ্যাস আছে?'

অরিন্দম একটু হাসিয়া বলিলেন, 'মধ্যে-মধ্যে খেয়ে থাকি বটে, তবে তেমন অভ্যাস নাই।'

ফু। আমার এই চুরুট একটি খেয়ে দেখুন। একটু নূতন বোধ হইবে।

এই বলিয়া ফুলসাহেব পকেট হইতে আর একটি চুরুট বাহির করিয়া অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম চুরুট লইয়া বলিলেন, 'এখন থাক, ইহার পর একসময়ে খাইব, এখন শরীরটা বড় ভালো নাই।'

ফু। বেশ, যখন ইচ্ছা আপনি খাইয়া দেখিবেন। তখন বুঝিতে পারিবেন, এরূপ উৎকৃষ্ট চুরুট আপনি আর কখনও ব্যবহার করেন নাই। নিজের ব্যবহারের জন্য আমি এই চুরুট স্বহস্তে তৈয়ার করিয়াছি। ইহার গন্ধ অন্যান্য চুরুটের মতো নয়। ইহার এমন অনেক গুণ আছে, যাহা অপর চুরুটে

নাই; বিশেষত মুখের দুর্গন্ধ ও দন্ত-সংক্রান্ত যে কোনও পীড়া সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে। একটা ব্যবহার করিয়া দেখিলে সে প্রমাণ পাইবেন।

তাহার পর তাঁহাদিগের অন্যান্য কথাবার্তায় আরও কিছু পথ অতিবাহিত হইল। যখন উভয়ে কামদেবপুরের পথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন অরিন্দম বলিলেন, 'তবে ডাক্তারবাবু, আমি এখন বিদায় লইতে পারি?'

ঘাড় নাড়িয়া, বিশেষ সৌজন্য দেখাইয়া ফুলসাহেব বলিলেন, 'ওঃ! এই পথেই আপনাকে যাইতে হইবে বটে। মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় হওয়ায় আমি বড়ই সুখী হইলাম। আসুন আপনি, এদিকেও সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আপনাকে অনেকদূর যাইতে হইবে।'

ফুলসাহেব গৃহাভিমুখে চলিলেন। অরিন্দম চিন্তিতমনে কামদেবপুরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কুলসম সম্বন্ধে

ফুলসাহেব যখন বলিলেন, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে বিলম্ব ছিল না। এ-সময়ে কামদেবপুরের পথ নির্জন, কদাচিৎ দুই-একজন লোকের গতিবিধি। পথের দুইধারে ছোট-বড় ডোবা, বনজঙ্গল, বড়-বড় গাছপালা, কোথাও বড়-বড় বাঁশঝাড় মাথার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেখানকার পথটা একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলিয়াছিল। বাঁশে-বাঁশে ঘর্ষণ হইয়া মধ্যে-মধ্যে এক-একবার বিকট শব্দ হইতেছিল। শৃগালেরা এদিক-ওদিক করিয়া সেই অন্ধকার পথের উপরে ছুটাছুটি করিতেছিল; কোনও-কোনওটা দূরবনমধ্যে গিয়া, হাঁকিয়া-হাঁকিয়া নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিতেছিল। এবং নিজেদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে দেখিয়া, পরিশ্রান্ত কুক্কুরেরা নিকটবর্তী গ্রাম হইতে তাহাদিগকে নীরব থাকিবার জন্য কর্তৃত্বের নিরতিশয় কর্কশকণ্ঠে বারংবার ভর্ৎসনা করিতেছিল। মাথার উপরে নিবিড় বাঁশঝাড়, অশ্বত্থ-বটের ঘনপত্রাচ্ছন্ন শাখা-প্রশাখা, তদুপরিস্থিত কৃষ্ণমেঘাবৃত নীরব আকাশ সন্ধ্যাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিবার পূর্বে কামদেবপুরের পথ হইতে বিদায় অভিনন্দনে পরিতুষ্ট করিয়াছিল। অরিন্দম সেই অন্ধকারময় পথ অতিক্রম করিতে-করিতে তখনও কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা ভাবিতেছিলেন। কুলসম তাঁহাকে ফুলসাহেবের সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছিল, কই, ফুলসাহেবকে তেমন ভয়ানক কিছুই দেখিলেন না; ফুলসাহেব পূর্বাপর নিতান্ত ভদ্রলোকেরই ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। কুলসমের কথা শুনিয়া আগে তাঁহার মনে হইয়াছিল, হয়তো পথে ফুলসাহেব তাঁহাকে একা পাইয়া ছুরি ধরিবেন, না হয়তো পিস্তল ধরিবেন, কি অন্য কোনওপ্রকারে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করিতে চেষ্টা করিবেন। সে রকম কিছুই দেখিলেন না; সুতরাং তখন তিনি মনে করিলেন, কুলসমের মস্তিষ্ক কোনও কারণে বিকৃত হইয়া থাকিবে; হয়তো ফুলসাহেবের উপরে তাহার কোনও কারণে দারুণ ঘৃণা জন্মিয়া থাকিবে। যাই হোক, ফুলসাহেবের কথা লইয়া এখন ভাবিলে চলিবে না। এখন তাঁহার হাতে অনেক কাজ আছে; সে-সকল কাজ আগে শেষ করিতে হইবে।

যথাসময়ে কামদেবপুর আসিয়া, বাসায় যাইবার পূর্বে অরিন্দম একবার যোগেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। তখন যোগেন্দ্রনাথ সেখানে বসিয়া দুই-একখানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখিতে নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। অরিন্দমকে দেখিয়া, তখনকার মতো লেখনী বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলেন; তিনি অরিন্দমকে উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহার নিকটে আর একখানি স্বতন্ত্র চেয়ারে উপবেশন করিলেন। বলিলেন, 'হঠাৎ কী মনে করিয়া, অরিন্দমবাবু? সেই বালিকার মৃতদেহের কেস্‌টার কিছু করিতে পারিলেন কি?'

অরি। না—এ পর্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই।

যো। রেবতী সংক্রান্ত ঘটনার, সেই কেশব নামে লোকটার কোনও সন্ধান হইল কি?

অ। না, তাহা হইলে আপনি সংবাদ পাইতেন। সে-কথা থাক, আমি এখন আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; ফুলসাহেব বলিয়া কোনও লোককে আপনি জানেন কি?

যো। ফুলসাহেব? এখানকার সকলেই তাঁহাকে জানে।

অ। সকলেই কেন যে তাঁহাকে জানে, তা আপনি জানেন কি?

যো। লোকটা চিকিৎসা-বিদ্যায় খুব পারদর্শী। এখানকার অনেকের বাড়িতে ফুলসাহেব চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কেন অরিন্দমবাবু, তাঁর কথা আপনি বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

অ। আগে আমার কথার উত্তর দিন, তাহার পর আপনার কথার উত্তর করিব। আপনি তমীজ-উদ্দীনকে চেনেন কি?

যো। চিনি বইকি, তিনি একজন বিখ্যাত জমিদার।

অ। তিনি প্রভূত ধনশালী, কেমন না?

যো। নিশ্চয়ই, তাঁহার বিষয় আমি কিছু-কিছু জানি।

অ। বলুন দেখি।

যো। আজ দুই বৎসর ধরিয়া তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি এখন শয্যাশায়ী। ইতিমধ্যে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়, তাহার পর তিনি আবার বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হন; কিন্তু তাঁহার কন্যা, যাহাতে তিনি আর বিবাহ না করেন, সেজন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তমীজউদ্দীন তাঁহার সেই কন্যাকে অতিশয় ভালোবাসেন; পাছে সে জানিতে পারে, এজন্য গোপনে বিবাহ করেন। এবং যাঁহাকে বিবাহ করেন, শুনিয়াছিলাম, তিনি ওই ডাক্তার ফুলসাহেবের একজন আত্মীয়ের কন্যা। সেইজন্য ফুলসাহেবই এ-বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বে ভিতরে-ভিতরে বৃদ্ধ তমীজউদ্দীন আর একটি বড় বুদ্ধিমানের মতো কাজ শেষ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মতো কিছু রাখিয়া স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার কন্যাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছেন; তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সে-সকল জানিতে পারেন। তখন তিনি আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া স্বামীকে বারংবার ভয় দেখাইতে লাগিলেন; কারণ বিবাহের পূর্বে দানপত্র সমাধা হইয়াছিল, স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার এক কপর্দকও পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কখনও তিনি রাত্রে দড়ি লইয়া ঘুরিতেন, কখনও তাঁহার বাক্সে আফিম থাকিতে দেখা যাইত, কাজেই তমীজউদ্দীন মহাবিভ্রাটে পড়িলেন। শুনিলাম, তাহার পর না কি তমীজউদ্দীন তাঁহার কন্যাকে অনেক বুঝাইয়া বলিয়া-কহিয়া একলক্ষ টাকা চাহিয়া লইয়াছেন; সেই টাকাটা তাঁহার স্ত্রীর নামে উইল করিয়া দিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ ফুলসাহেবের সম্বন্ধে

অরিন্দম বলিলেন, 'তমীজউদ্দীন যে মারা গিয়াছেন!'

সবিস্ময়ে যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সে কী! বলেন কী!'

অরি। আজ সন্ধ্যার পূর্বে আমারই হাতের উপরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যো। তারপর—তারপর—

অ। তারপর আর কী—এখন তাঁহার কন্যা সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইল।

যো। তাহাই তো হইবার কথা

অ। কত টাকার বিষয় হইবে?

যো। প্রায় বিশ লক্ষ টাকার।

অ। বিশ লক্ষ! বলেন কী? আচ্ছা, বিশ লক্ষই যেন হইল। এখন বলুন দেখি, ফুলসাহেব অবিবাহিত কি না?

যো। হয় অবিবাহিত, নয় তাঁহার স্ত্রী গতায়ু হইয়া থাকিবেন। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?

অ। জিজ্ঞাসা করিতে দোষ কী? হঠাৎ কথাটা মনে উঠিল, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

যো। আমার কাছে এতটা গোপন করা কি আপনার ভালো দেখায়?

অ। তমীজউদ্দীনের কন্যাকে ফুলসাহেব এখন বিবাহ করিবার চেষ্টায় আছেন।

যো। বটে, ফুলসাহেব বড় চতুর লোক! তাঁহাকে দেখিলেই সেটি বেশ বুঝা যায়। তবে শুনিয়াছি, তমীজউদ্দীনের মেয়েটা কিছু পাগলাটে ধরনের।

অ। যাক, ফুলসাহেব লোকটা কেমন বলুন দেখি? এমনভাবে বলিবেন, যে কখনও দেখে নাই, সে যেন দেখিলেই চিনিতে পারে। মধ্যে-মধ্যে আপনি পলাতক খুনি আসামীকে ধরিবার জন্য যেমন অবিকল রূপবর্ণনা করিয়া চারিদিকে হুলিয়া পাঠান, বর্ণনাটা যেন ঠিক সেই রকমের হয়।

যো। বলিতেছি, কিন্তু আমি যে আপনার এ-সকল কথার মানে কিছুই বুঝিতেছি না।

অ। ইহার পর বুঝিবেন। এখন একবার ফুলসাহেবের রূপবর্ণনা করুন দেখি।

যো। লোকটা মোটা—

অ। কী রকম মোটা বলুন, সাধারণত লোক যেরূপ মোটা হইয়া থাকে, সেইরূপ মোটা, না ব্যায়ামাদির দ্বারা যেরূপ চুয়াড় ধরনের মোটা হয়, সেইরূপ মোটা?

যো। মোটের উপরে এখন একরকম মোটা বলিয়াই মনে করুন না। লম্বায় পাঁচ ফুট ছয়-সাত ইঞ্চির বেশি নয়, গৌরবর্ণ, বয়স চল্লিশের মধ্যে, মুখখানি একটু গোলাকার, কপালের পাশে একটা বড় আঁচিল আছে, নাকটা টানা ও একটু লম্বা, গোঁফদাড়ি কামানো, সর্বদাই হাসিমুখ, চুলগুলি অল্প কোঁকড়া, চলিবার সময়ে একপাশে মুখখানি প্রায় বাঁকাইয়া চলেন, মুখে সর্বদাই মিষ্ট কথা লাগিয়া আছে, চোখদুটির দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ, ছোটর উপর টানা চোখ।

অ। কিছুক্ষণ পূর্বে ফুলসাহেবের সঙ্গে আমার যথেষ্ট আলাপ হইয়াছে; লোকটা খুব আলাপী বটে।

যো। ফুলসাহেবকে যদি আপনি দেখিয়াছেন, তখন আর তাঁহার রূপ বর্ণনা শুনিতে আপনার কী এত আবশ্যক, অরিন্দমবাবু?

অ। কিছুই না।

যো। আপনি আবশ্যক ছাড়া নিশ্বাসটি ফেলিতেও কুণ্ঠিত হন, আর বলিতেছেন, কিছুই না? আমি কি আপনাকে জানি না?

অ। কিছুই না, তবে এইটুকু জানিবেন, যদি আমার হাতে একটা উপস্থিত খুনি কেসের ভার না থাকিত, তাহা হইলে আমি একবার ডাক্তার ফুলসাহেবের চরিত্রটা সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিতাম।

যো। ফুলসাহেবের উপরে সহসা আপনার এমন কৃপাদৃষ্টিপাত কেন হইল?

অ। তিনি এখন তমীজউদ্দীনের মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন।

যো। ফুলসাহেব যেরূপ চতুর লোক—তাহাতে তাঁহার পক্ষে সেটা বড় আশ্চর্যের কথা নহে; তবে শুনিয়াছিলাম, তমীজউদ্দীনের মেয়েটি না কি কিছু মাথা-পাগলা গোছের।

অ। এই আপনি আর আমি যেরূপ মাথা-পাগলা গোছের—সেইরকম, তার বেশি বলিয়া আমার বোধ হয় না। আমি তাহাকে দেখিয়াছি, তাহার নাম কুলসম। যোগেন্দ্রবাবু, শীঘ্রই দেখিতে পাইবেন, কুলসমের অদৃষ্টে এই তিনটি ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিবে। হয়, কুলসম

ফুলসাহেবের স্ত্রী হইবে; সেটি যদি না ঘটিয়া উঠে, কুলসম মরিবে; সেটিও যদি না ঘটে—

যো। (বাধা দিয়া) তাহা হইলে কী হইবে?

অ। তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, অরিন্দমের এ-সম্বন্ধে একটু মাথাব্যথা পড়িবে; সে এ-বিপদের মুখ হইতে একদিন কুলসমকে উদ্ধার করিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের বিপদ

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া অরিন্দম বাসা-বাটিতে ফিরিলেন। বাটির বহির্দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ভিতর হইতে ভৃত্যের গম্ভীর, উচ্চ ঘন-ঘন নাসিকাধ্বনি অরিন্দমকে তাহার গভীর নিদ্রার পরিচয় দিল। তিনি অতিকষ্টে ভৃত্যের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মনে-মনে-বিরক্ত ভৃত্য উঠিয়া তাড়াতাড়ি দ্বারোন্মুক্ত করিল। অরিন্দম দ্বিতলে নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া আহারাদির জন্য সর্বাগ্রে ব্যগ্র হইলেন। উদরস্থ অগ্নিদেব সারাদিন একাদশী করিয়া বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিলেন; ইতিপূর্বে সুবুদ্ধি পাচক-ঠাকুর সে-ঘরে আহার্য প্রস্তুত রাখিয়া নিজের নির্বিঘ্ন দীর্ঘনিদ্রার সুবিধা করিয়া লইয়াছিল। অরিন্দমও তাহাতে তখন অনেকটা সুবিধা বোধ করিলেন। যত শীঘ্র সম্ভব, আহারাদি শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রা হইল না, তাঁহার মন কুলসম ও ফুলসাহেবের কথা লইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। তখন তিনি ফুলসাহেবের প্রদত্ত চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া টানিতে লাগিলেন—আর ভাবিতে লাগিলেন—নিদ্রার নামগন্ধ নাই; ভাবিতে লাগিলেন, 'বোধহয়, আমি যাহার সন্ধানে আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলিয়া দিবারাত্র ঘুরিতেছি, সে আর কেহই নয়—ওই ফুলসাহেব। ওই বোধহয়, সেই খুনি। অত সংশয়-সন্দেহের ভিতর হইতে মন যেন বলিতেছে, ওই ফুলসাহেব—আর কেহই নয়—সেই বালিকার হত্যাকারী।'

ভাবিতে-ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল; একটু তন্দ্রাবোধ হইল, মাথাটা একটু পশ্চাদ্দিকে ঢলিয়া পড়িল, সেইসঙ্গে একটা হাই উঠিল।

অরিন্দম আপনার মনে বলিলেন, 'এই যে দেখিতে পাই, এখন একটু ঘুম আসিতেছে। আকৃতিতে অনেকটা মিল আছে, লম্বা সাড়ে পাঁচ ফুট, মাংসপেশিতে বক্ষ ও স্কন্ধ অস্বাভাবিকরূপে প্রশস্ত, কোমরটা কিছু সরু, বয়সও চল্লিশ বৎসরের বেশি বলিয়া বোধ হয় না—।'

তাহার পর অরিন্দম আবার একটি জৃম্ভণ ত্যাগ করিলেন। পূর্বাপেক্ষা এবার কিছু বড়। অরিন্দম পূর্ববৎ বলিতে লাগিলেন, 'দেখিতে গৌরবর্ণ তেমন উজ্জ্বল না হইলেও—' আবার একটা হাই উঠিল—'পরিষ্কার বটে, বিশেষত মুখের চেয়ে হাত দুখানার রং কিছু বেশি পরিষ্কার—' এবার একটা বড় রকমের হাই উঠিল।

'একি! আজ এত ঘুম পাইতেছে কেন? বরং ইহা অপেক্ষা বেশিরাত্রেই প্রায় ঘুমাইয়া থাকি, কোনওদিন তো এমন হয় না।' এই বলিয়া অরিন্দম উঠিয়া গৃহমধ্যে পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেইরূপ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন, 'চুলগুলি একটু কোঁকড়া, খুব কালো—' আবার একটা হাই উঠিল, তাহার পর আর একটা—আর একটা—'চুলগুলি মাপেও সেইরূপ বড়—' আবার একটা হাই উঠিল,—'নিশ্চয়ই এই ফুলসাহেব সেই বালিকাকে হত্যা করিয়া সিন্দুক-মধ্যে লাশ চালান করিয়াছিল।'

অরিন্দম আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—বসিয়া পড়িলেন; হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঢুলিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—তারপর একটা—আর একটা—ক্রমান্বয়ে হাই উঠিতে লাগিল।

চিন্তামগ্ন অরিন্দম তন্দ্রাজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'ফুলসাহেবেরও দাড়ি গোঁফ নাই—' আবার হাই উঠিল—'লোকটা যেরূপ মিষ্টভাষী—' আবার হাই উঠিল—'দেখিলাম—' আবার

হাই উঠিল—'তাতে—' আবার একটা হাই উঠিল—'কী—' আবার একটা হাই উঠিল—'বো—' আবার একটা হাই উঠিল—'ধ—' আবার একটা—অরিন্দম শেষে আর কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি সেই অর্ধদগ্ধ চুরুট দূরে নিক্ষেপ করিলেন। মাথার উপরে দুইখানি হাত ঋজুভাবে তুলিয়া, দুই হাতের অঙ্গুলিগুলি পরস্পর সংবদ্ধ রাখিয়া উর্ধ্বমুখে কেবলই জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একটার পর একটা—একটার সঙ্গে আর একটা—সেইসঙ্গে আর একটা, এইরূপ জৃম্ভণের উপর জৃম্ভণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। একবার মুখ বন্ধ করেন, এমন অবসরটুকুও পাইলেন না। চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল; যদিও একবার জোর করিয়া চাহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চারিদিকে ঘন অন্ধকার; ঘরে যদিও দীপ জ্বলিতেছিল, তথাপি তিনি অন্ধের ন্যায় হাতড়াইয়া বিছানা খুঁজিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্কে তখন এমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল, তাঁহার সর্বাঙ্গ এমনই ভাবে অসাড় হইয়া আসিতেছিল যে, অপর কেহ হইলে এতক্ষণ তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইয়া যাইত। অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, 'অবশ্যই আমি কিছু খেয়েছি; নতুবা এমন হইবে কেন? ওঃ! ঠিক হইয়াছে! ওই চুরুটে কোনওরকম বিষ ছিল! কী সর্বনাশ! নিশ্চয়ই ফুলসাহেব নরঘাতী পিশাচ—এখন আর কোনও সন্দেহ নাই—এখন ঠিক বুঝিতে পারিয়াছি, বালিকার হত্যাকারী আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। পিশাচ পত্রে লিখিয়াছিল, একদিন অরিন্দমকে হত্যা করিবে, শীঘ্রই সে তার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছে!

নবম পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যুমুখে অরিন্দম

ঘরের এক কোণে একটা টেবিল ছিল; অরিন্দম দুই হাতে সেই টেবিলের একটা কোণ চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না—পড়িয়া গেলেন—আবার উঠিলেন—আবার পড়িয়া গেলেন, সেইরূপ অবস্থায় তিনি সেই উজ্জ্বল দীপালোকেও দুই চক্ষে ঘোরতর অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিছুতেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। হাই চাপিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। একটার পর একটা—তাহার পর আর একটা—তাহার পর আর একটা সেইরূপ হাই উঠিতে লাগিল। তিনি মর্মান্তিক যন্ত্রণায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'এখন না—এখন না—এখন কিছুতেই মরা হইবে না। মরিবার আগে যেমন করিয়া পারি, একটা কাজ শেষ করিবই।' এই বলিয়া তিনি টলিতে-টলিতে উঠিলেন; অন্ধকার গৃহমধ্যস্থবৎ তিনি হাতড়াইয়া টেবিলের ভিতর হইতে একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিলেন। অতিকষ্টে কলম ও দোয়াতের সন্ধান করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কী লিখিতেছেন দেখিতে পাইলেন না। অভ্যাস মতো লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন। যাহা লিখিলেন, তাহার কোনও অক্ষর খুব বড়, কোনওটি আবার তেমনি ছোট—কোনওটার সঙ্গে কোনওটা মিলে না। পংক্তিগুলি আঁকাবাঁকা হইল; ঠিক তাঁহার হস্তাক্ষর বলিয়া কিছুতেই বুঝাইল না। তিনি অতিকষ্টে লিখিলেন—

> *'যোগেন্দ্রবাবু,*
>
> *ফুলসাহেব বড় ভয়ানক লোক। যত শীঘ্র পারেন তাহাকে গ্রেপ্তার করুন। সে খুনে—সে-ই বালিকার হত্যাকারী। সে চুরুটের সঙ্গে আমাকে বিষ দিয়াছিল; আমি চুরুটের আধখানা মাত্র খাইয়াছি—বোধহয় বাঁচিব না। ফুলসাহেবকে শীঘ্র না ধরিতে পারিলে সে একদিন আপনাকে—'*

আর লিখিতে পারিলেন না। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্রমশ অসাড় হইয়া আসিতেছিল; সেই অসম্পূর্ণ পত্রে তিনি নিজের নাম সহি করিয়া পত্র শেষ করিলেন এবং একখানি খাম সংগ্রহ করিয়া পত্রখানি

তন্মধ্যে বন্ধ করিলেন। আর একটি বর্ণও লিখেন, এমন শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। এখনও শিরোনামা লিখিতে বাকি, ক্রমশ তিনি নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িতেছিলেন, আর তখন তাঁহার নড়িবার শক্তিমাত্র ছিল না। হাত-পা অবশ হইয়া আসিতেছিল; তিনি আর কোনও উপায় না পাইয়া করতলে সেই লৌহলেখনী বিদ্ধ করিলেন, তাহাতে হাতের সেই দারুণ অবসন্নতা তখনকার মতো একটু দূর হইল; লেখনী সেইরূপ বিদ্ধ রহিল। তিনি অপর লেখনী লইয়া শিরোনামা লিখিলেন। যাহা লিখিলেন, তাহা সহজে অপর কেহ পড়িতে পারিবে বলিয়া বোধ হইল না।

অরিন্দমের পত্রের প্রতিকৃতি

তখনই ভৃত্য দ্বারা যাহাতে যোগেন্দ্রনাথের নিকট পত্রখানি পাঠাইতে পারেন, সেজন্য অরিন্দম ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার যে স্বরভঙ্গও ঘটিয়াছে, তাহা তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন। স্বর এত মৃদু হইয়া আসিয়াছে, নিম্নতলে নিদ্রিত ভৃত্য শুনিবে কি, সে যদি তখন তাঁহার পার্শ্বে সম্পূর্ণ সজাগ দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহা হইলেও বোধহয়, শুনিতে পাইত না। এমনকী অরিন্দম নিজের স্বর নিজেই শুনিতে পাইলেন না। তখন তিনি নিজেই ভৃত্যের নিকট যাইবার জন্য সেই কক্ষ হইতে ছুটিয়া বাহির হইতে গেলেন। ইতিপূর্বে আহারাদি শেষে নিজ হস্তে তিনি দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন, কিছুতেই এখন তিনি সেই রুদ্ধদ্বারের সন্ধান করিতে পারিলেন না—তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে

নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। একপার্শ্বে একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত ছিল, তিনি তাহাই দ্বার মনে করিয়া তন্মধ্য দিয়া বাহির হইতে গেলেন, কপালে সজোরে আঘাত লাগিল; তিনি পত্রখানি সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। পত্রখানি বাহিরের বারান্দায় গিয়া পড়িল। অরিন্দম সেইখানে পড়িয়া গেলেন; মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

এ-সময়ে যোগেন্দ্রনাথ হয়তো পয়ঃফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কত সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কেমন করিয়া তিনি জানিবেন, আজ তাঁহার পরম বন্ধু অরিন্দম শত্রুর চক্রান্তে মরণাপন্ন নিঃসহায় অবস্থায় মরিতে বসিয়াছেন?

দশম পরিচ্ছেদ ঃ চিকিৎসক না মূর্তিমান মৃত্যু

পরদিন প্রভাতে পাচক-ঠাকুর অরিন্দমের নিকটে অন্যদিনের ন্যায় বাজার-খরচ লইতে আসিয়া দেখিল, তখনও অরিন্দম উঠেন নাই। তাঁহার শয়ন-গৃহের কবাট বন্ধ রহিয়াছে। বাহির হইতে দুই-চারিবার 'বাবু' 'বাবু' বলিয়া ডাকিল, কোনও উত্তর নাই। দ্বার ঠেলিল, তথাপি কোনও উত্তর নাই, তখন গবাক্ষ দিয়া দেখিল, গৃহতলে অরিন্দম পড়িয়া আছেন। তাঁহার ললাটের একস্থান কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছে, দেখিয়া পাচক-ঠাকুরের অত্যন্ত ভয় হইল। কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না; তাহার সেই ইতস্ততের সময়ে অরিন্দমের লিখিত সেই পত্রখানি তাহার নজরে পড়িল; তাহার একটু লেখাপড়া জানা ছিল, অনেক কষ্টে একটির পর একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া একটি শব্দ, সেইরূপে আর একটি শব্দ, এইরূপে শব্দে-শব্দে মিলাইয়া শিরোনামার কতক অংশ পাঠ করিল। কতক অংশ না পড়িতে পারিলেও আন্দাজে বুঝিয়া লইল।

পত্রখানি লইয়া নিম্নতলে আসিয়া গভীর নিদ্রা হইতে ভৃত্যকে জাগাইল। তাহাকে আগে তিরস্কার করিল; তাহার পব সে যাহা জানিত, তাহা বলিয়া নিজে সেই পত্র লইয়া থানায় যোগেন্দ্রনাথের নিকটে চলিল।

থানায় তখন যোগেন্দ্রনাথ ছিলেন না। একজন দারোগা আর দুইজন জমাদার বসিয়া ছিল। পাচক-ঠাকুর গিয়া দারোগাকে সেই পত্রখানি দিয়া যাহা ঘটিয়াছে, সংক্ষেপে বলিল। তখনই দারোগা একজন জমাদারকে দিয়া সেই পত্রখানি যোগেন্দ্রনাথের বাটিতে পাঠাইয়া দিল এবং নিজে অরিন্দমকে দেখিতে চলিল। অপর জমাদার থানা-রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সেইখানে বসিয়া রহিল।

পাচক-ঠাকুর দারোগাকে অরিন্দমের শয়ন-কক্ষের সম্মুখে লইয়া আসিল। দারোগা সেই উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া অরিন্দমকে যেরূপ অবস্থায় অনাবৃত গৃহতলে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিল, তাহাতে তাহার বড় ভয় হইল। তখনই রুদ্ধদ্বার ভাঙিয়া ফেলা হইল। সর্বাগ্রে দারোগা পাচক-ঠাকুর ও ভৃত্যের সাহায্যে অরিন্দমকে পার্শ্ববর্তী শয্যায় তুলিল। নাসিকায় হাত দিয়া দেখিল, নিশ্বাস পড়িতেছে না; কিন্তু দেহ শীতল নহে, বরং কিছু উষ্ণ। সেইজন্য তাহার মনে সন্দেহ হইল যে, অরিন্দমের তখনও মৃত্যু হয় নাই। দারোগা পাচক-ঠাকুরকে তখনই একজন ডাক্তার ডাকিতে অনুমতি করিল।

পাচক-ঠাকুর ছুটিয়া বাহির হইল। অনতিবিলম্বে সে একজন চিকিৎসককে সঙ্গে আনিল। চিকিৎসক আর কেহই নহেন—সেই ডাক্তার ফুলসাহেব। দারোগা তাঁহাকে দেখিয়া অত্যধিক আনন্দিত হইয়া বলিল, 'এই যে আপনি আসিয়াছেন, ভালোই হইয়াছে—আপনাকে দেখিয়া অনেকটা ভরসা হইল।'

ফুলসাহেব বলিল, 'হ্যাঁ, আমি এইখানে একজন রোগী দেখিতে আসিয়াছিলাম। পথ হইতে তোমাদের লোক গিয়া ডাকিয়া আনিল। এখন ব্যাপার কী, বলো দেখি।'

দারোগা অরিন্দমকে দেখাইয়া দিল। ফুলসাহেব অরিন্দমকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আর কী হইবে, লোকটার মৃত্যু হইয়াছে।'

মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া দারোগা চমকিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'মৃত্যু হইয়াছে! কী সর্বনাশ! কী রোগে হঠাৎ ইনি মারা পড়িলেন?'

ফুল। সম্ভব হৃদরোগে। ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে ঠিক বলিতে পারিতেছি না।

দারো। এমন বলবান ইনি, হৃদরোগে আচম্বিতে যে মারা গেলেন, কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব?

ফু। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) আমি কি মিথ্যাকথা বলিলাম?

দারো। আত্মহত্যা করেন নাই তো?

ফু। তাহাও হইতে পারে। কই, আপাতত তাহার কোনও প্রমাণ পাইলাম না।

দা। আপনি যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ নাই?

ফু। না।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মিত্রের কার্য

এমনসময়ে যোগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। তিনি অরিন্দমের পত্র পান নাই, জমাদার পত্র লইয়া তাঁহার বাটিতে উপস্থিত হইবার আগে, তিনি বাহির হইয়াছিলেন। থানাতে গিয়া—সেখানে সেই জমাদারের মুখে যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইয়া এখানে আসিতেছেন। দারোগাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে যাহা জানিত যোগেন্দ্রনাথকে বলিল। অরিন্দমের সেই পত্রের কথা বলিতে মনে হইল না।

যোগেন্দ্রনাথ বিশেষ ব্যস্ততার সহিত ফুলসাহেবকে বলিলেন, 'আপনি কি কোনওরকমে অরিন্দমবাবুকে রক্ষা করিতে পারেন না?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'আমার আর কোনও হাত নাই।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'তবে কি ইনি বাঁচিয়া নাই?'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'না, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিতেন না। কী করিব, এখন আর কোনও উপায় নাই।'

যোগেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'তবে আর কী হইবে! ডাক্তারবাবু, হঠাৎ এরূপ মৃত্যুর কারণ কী? বোধহয়, অরিন্দমবাবু আত্মহত্যা করিয়াছেন।'

ফুলসাহেব বলিলেন, 'সে কথা আমি ঠিক বলিতে পারিলাম না; আমার বোধ হয়, হৃদয়াঘাতেই মৃত্যু হইয়াছে।'

ফুলসাহেব তখন যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া উঠিল। যাইবার সময়ে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার হাসিল; সেই হিংসাতীব্র চিরাভ্যস্ত মৃদুহাসি—কেহ দেখিল না।

ফুলসাহেব চলিয়া গেলে অনতিবিলম্বে যোগেন্দ্রনাথ একখানি পালকিতে তুলিয়া অরিন্দমকে নিজের বাটিতে লইয়া গেলেন।

সেখানে অরিন্দমকে একটি প্রশস্ত পরিষ্কৃত গৃহমধ্যে রাখা হইল। বাটিতে আসিয়া অরিন্দমের সেই পত্র পাইয়া যোগেন্দ্রনাথ সকলই বুঝিতে পারিলেন। তখনই খ্যাতনামা চিকিৎসকদিগকে আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি তখন নিজে যাইয়া অরিন্দমের বাসা হইতে সেই অর্ধদগ্ধ বিষাক্ত চুরুট সন্ধান করিয়া লইয়া আসিলেন। কলিকাতা হইতে দুই-তিনজন নামজাদা ডাক্তারকে আনাইলেন।

সেইদিন রাত্রিশেষে তিনজন ইংরাজ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথের বাটি হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ কুলসমের উদ্বেগ

প্রভাতে যোগেন্দ্রনাথের গৃহদ্বারে একখানি পালকি আসিয়া দাঁড়াইল। তন্মধ্য হইতে একটি কৃতাবগুণ্ঠনা কিশোরী বাহির হইয়া বাটিমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন যোগেন্দ্রনাথ গৃহেই ছিলেন। বাটির বহিরঙ্গনে তাহার সহিত যোগেন্দ্রনাথের দেখা হইল। কিশোরী যোগেন্দ্রনাথকে দেখিয়া ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন আছেন তিনি?'

যোগেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে কহিলেন, 'কে কেমন আছেন? কাহার কথা আপনি বলিতেছেন?'

কিশোরী। অরিন্দমবাবুর। তিনি কি বাঁচিয়া নাই?

যোগেন্দ্র। ডাক্তার ফুলসাহেব তো তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

কি। (ক্রোধভরে) কে, ডাক্তাব ফুলসাহেব? সেই পিশাচ? সেই তো অরিন্দমবাবুকে খুন করিয়াছে।

যো। বটে! আপনি কে?

কি। আমি কুলসম—তমীজ্‌উদ্দীনের কন্যা।

এই বলিয়া কুলসম অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল। বলিল, 'আমি আগেই জানিতে পারিয়া অরিন্দমবাবুকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। হায়, হয়তো তিনি আমাকে পাগল মনে করিয়া আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই!'

যো। তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে, ডাক্তার ফুলসাহেব অরিন্দমবাবুকে হত্যা করিয়াছে?

কু। আমি ফুলসাহেবের মুখ দেখিলে, তাহার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারি; আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না?

যো। কেন বিশ্বাস করিব না? তুমি কী বলিতে আসিয়াছ বলো।

কু। অরিন্দমবাবু কি ফুলসাহেবের সেই বিষাক্ত চুরুট খাইয়াছেন?

যো। হ্যাঁ।

কু। (অধীর হইয়া) কী সর্বনাশ! কোথায় তিনি? আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চলুন। কেমন আছেন তিনি?

যো। তুমি সেখানে গিয়া কী করিবে?

কু। আমি তাঁহাকে বাঁচাইব। তিনি আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এ-সময়ে আমি তাঁহার জন্য প্রাণপণ করিব।

যো। কেমন করিয়া তুমি এখন তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিবে?

কু। তিনি এখনও মরেন নাই—বিষে মৃতবৎ হইয়াছেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে কোনও চিকিৎসক তাঁহাকে জীবিত বলিয়া বুঝিতে পারিবে না। আমি ওই বিষের সম্বন্ধে ফুলসাহেবের মুখে কিছু শুনিয়াছি। উহার প্রতিষেধক ঔষধের নামও তাহার মুখে শুনিয়াছি। একদিন আমার বিমাতাকে ওই কথা ফুলসাহেব বলিয়াছিল, আমি গোপনে থাকিয়া সব শুনিয়াছিলাম।

যো। তিনি মরেন নাই—অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছেন।

শুনিয়া কুলসমের মাথায় যেন কেমন একটা সুখের বজ্রাঘাত হইল। একটা নিরতিশয় আনন্দের বৈদ্যুতিক প্রবাহ সর্বাঙ্গ বহিয়া তাহার মস্তকের ভিতরে সঞ্চালিত হইতে লাগিল; ঠিক সেই সময়ে অরিন্দম তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অরিন্দমের মুখ ম্লান, জ্যোতির্হীন, দেহ

শীর্ণ, চোখদুটি ভিতরে বসিয়া গিয়াছে—যেন তিনি সে অরিন্দম নহেন, তেমন উজ্জ্বল বলময় দেহে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে! অরিন্দম মৃদু হাসিয়া কুলসমকে বলিলেন, 'কী কুলসম! আমাকে তুমি দেখিতে আসিয়াছ? আমি মরি নাই, বেশ বাঁচিয়া আছি। তুমি কেন কষ্ট করিয়া এতদূর আসিলে?'

কুলসম বলিল, 'আপনি একদিন আমার জন্য নিজের প্রাণ বিপদাপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন; আর আমি আপনার এরূপ দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া একবার দেখিতে আসিয়াছি, ইহা কি বড় বেশি হইল?'

অরি। কুলসম, তোমাকে আমার কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য আছে।

কুল। বলুন, আমি আপনার কাছে একটি বর্ণও গোপন করিব না। আমি মাতৃপিতৃহীনা, আপনার শরণাপন্না; আমি আপনার নিকট অনেক উপকারের আশা করি। এ-বিপদে আপনি যদি আমাকে না রাখেন, আমার আর অন্য উপায় নাই। আমি আবার ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি; যদি না আমি দুই-একদিনের মধ্যে ডাক্তার ফুলসাহেবকে বিবাহ করিতে সম্মত হই, তাহারা আমাকে খুন করিবে। তাহারা কাল যখন এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল, তখন আমি গোপনে থাকিয়া তাহাদের অনেক কথা শুনিয়াছি।

অরি। তাহারা কে? তুমি আর কাহার কথা বলিতেছ?

কু। আর আমার সেই রাক্ষসী বিমাতা—।

অ। তিনিও কি এই ষড়যন্ত্রের ভিতরে আছেন না কি?

কু। তাহারই তো এই ষড়যন্ত্র, ফুলসাহেব উপলক্ষ মাত্র। আমার বিমাতাকে বড় সহজ মনে করিবেন না। সে না করিতে পারে, এমন ভয়ানক কাজ পৃথিবীতে কিছুই নাই। শুনিয়াছি, আমার বিমাতা ফুলসাহেবের ভাগিনেয়ী। ফুলসাহেব জোগাড়-যন্ত্র করিয়া আমার পিতার সঙ্গে তাহার সেই ভাগিনেয়ীর বিবাহ দেয়; কিন্তু ফুলসাহেবের সহিত আমার বিমাতার যেরূপ ঘনিষ্ঠতা দেখি, তাহাতে মনে বড় ঘৃণা হয়—কখনও ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া বোধ হয় না।

অ। তুমি গোপনে থাকিয়া কাল তাহাদের মুখে কী শুনিয়াছ? আমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিয়াছিল কি?

কু। আগে আপনারই কথা হইতেছিল। ফুলসাহেব আপনাকে বিষাক্ত চুরুট খাওয়াইয়া, কেমন করিয়া আপনাকে মরণাপন্ন করিয়াছিল, তাহাই সে আমার বিমাতার কাছে হাসিতে-হাসিতে গল্প করিতেছিল। তারপর আমার কিসে সর্বনাশ হইবে, কেমন করিয়া আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফাঁকি দিয়া লইবে, এই সব গুপ্ত পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে স্থির হইল, যদি তাহাদের কার্যসিদ্ধি করিবার জন্য আমাকে খুন করিতে হয়, তাহাও করিবে। জানি না, বিধাতা কেন ফুলসাহেবরূপী পিশাচকে মনুষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন! ওই ফুলসাহেব আমার করুণাময় পিতাকে খুন করিয়াছে, স্নেহময়ী মাতাকে খুন করিয়াছে, আমার একমাত্র ভ্রাতাকেও খুন করিয়াছে; এমনভাবে খুন করিল—কেহ জানিল না—কেহ বুঝিল না; অথচ তিনটি প্রাণী খুনির বিষে এ-জগৎ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল। পিশাচ যে-বিষ দিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছে, তাহাতে মানুষ একদিনে মরে না—তিল-তিল করিয়া মরিতে থাকে; কেবল আমিই এতদিন বাবাকে মরিতে দিই নাই; আমার বিমাতা বাবার খাবারজলের সঙ্গে প্রত্যহ বিষ মিশাইয়া রাখিত, আমি সুবিধা পাইলেই, সেই জল ফেলিয়া দিয়া অন্য জল খাইতে দিতাম। সকল দিন সুবিধা হইত না, পিতা শয্যাশায়ী হইয়াও এতদিন সেইজন্য বাঁচিয়াছিলেন; নতুবা বোধহয়, তিনমাসের মধ্যে তাঁহাকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইত। বিষ খাইয়াও বাবাকে এতদিনে বাঁচিতে দেখিয়া ফুলসাহেব আর আমার বিমাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছিল। দুইজনে কেবল পরামর্শ করিত; মধ্যে-মধ্যে বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দিত। বাবার কাছে একদিন এ-কথা তুলিয়াছিলাম। তাঁহার যেরূপ সরল মন আপনার মতো সকলকেই সরল ভাবিতেন। নারকী ফুলসাহেবের উপরে, আমার

সেই দানবী বিমাতার উপরে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস। তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না—হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। হায়, এমন দুর্ভাগিনী আমি, এত করিয়া বাবাকে বাঁচাইতে পারিলাম না!'

কুলসমের আয়ত চোখদুটি অশ্রুসজল হইয়া লাসিল। বসনাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কুলসম আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ কুলসমের দুঃখ ও ক্রোধ

অরিন্দম বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কুলসম, যাহা হইয়া গিয়াছে, সেজন্য এখন কাঁদিলে কোনও ফল নাই। এখন যাহাতে এই সকলের ঠিক প্রতিশোধ হয়, তাহা করিবে না কি? যাহাতে তোমার সেই পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পাপী নিষ্কৃতি না পায়, তাহাই কি এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য নয়? উপযুক্ত প্রতিফল দিবে না?'

চক্ষু মুছিয়া, কুলসম মুখ তুলিয়া ক্ষণেক অরিন্দমের মুখের দিকে ক্রোধ-বিস্ফারিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'সেই পাপীর গায়ে একটি আঁকুড় লাগিবার জন্য আমি আমার সর্বস্ব ব্যয় করিব—উপযুক্ত প্রতিফল তো দূরের কথা। ফুলসাহেব আমাদের সোনার-সংসার শ্মশান করিয়া দিয়াছে, এখন আমাকে কোনওরকমে হত্যা করিতে পারিলে পিশাচ নিষ্কণ্টক হইতে পারে। আমাদিগের বাড়িতে আর একজন লোক থাকিতেন, তাঁহার নাম সিরাজউদ্দীন। আজ একমাস হইল, ওই পিশাচ আমার বিমাতার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকেও কোথায় সরাইয়াছে। আজও তাঁহার কোনও সংবাদ নাই। পিতা তাঁহাকে বড় স্নেহ করিতেন। তিনি ফুলসাহেবকে কখনও চিনিতে পারেন নাই; ফুলসাহেবের যড়যন্ত্রে যে সে-কাজ হইয়াছিল, তাহা তিনি একবার সন্দেহও করিতে পারিলেন না। নিজে বিছানায় পড়িয়া; কী করিবেন, ফুলসাহেবকেই সিরাজের সন্ধান করিতে বলিলেন, সুতরাং কাজে কিছুই হইল না। তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি, ফুলসাহেব তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে; এখনও তাঁহাকে খুন করে নাই। সম্ভব, সেই বিখ্যাত ডাকাত কালু রায়ের কাছে সিরাজকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সিরাজউদ্দীন তোমাদের কে হন?'

কুলসম বলিল, 'সিরাজউদ্দীনের পিতা বসিরুদ্দীন আমার পিতার জমিদারির প্রধান নায়েব ছিলেন; শুধু বসিরুদ্দীন কেন—বসিরুদ্দীনের পিতা, পিতামহ বংশানুক্রমে—আমাদিগের জমিদারি নায়েবী কাজে অনেক টাকা উপার্জন করিয়া গিয়াছেন। বসিরুদ্দীন আমার পিতামহের আমল হইতে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার সংসারে ওই একমাত্র পুত্র সিরাজ ছাড়া আর কেহই ছিল না। আজ পনেরো বৎসর হইল, বসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়; তখন তাঁহার পুত্রের বয়স দশ বৎসর মাত্র। মৃত্যুকালে বসিরুদ্দীন আমার পিতার হাতেই সিরাজউদ্দীনকে সমর্পণ করিয়া যান; সিরাজ আবার যেরূপ নম্র, বিনয়ী, বাধ্য, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমার পিতার খুব স্নেহভাজন হইয়া উঠিলেন। পিতা আপনার পুত্রের ন্যায় তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তিনি সিরাজউদ্দীনের ভরণপোষণের জন্য, বিদ্যাশিক্ষার জন্য কিছুতেই এ-পর্যন্ত তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে এক কপর্দক লইতেন না—নিজের ব্যয়ে সকলই নির্বাহ করিতেন। সিরাজ ইদানীং কলিকাতায় একজন বিখ্যাত সাহেব চিত্রকরের নিকটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন; সেজন্য বেতন ও বাসাখরচ ইত্যাদিতে প্রায় মাসে পঞ্চাশ টাকা লাগিত। তাহাও আমার পিতা তাঁহাকে দিতেন। সিরাজ ইদানীং কলিকাতা হইতে মধ্যে-মধ্যে এখানে আসিতেন, তিন-চারিদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যাইতেন। ফুলসাহেব হইতেই যে আমাদিগের সংসার ক্রমে ধ্বংসের দিকে যাইতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি বাবাকে কতবার বুঝাইয়াছিলেন; মায়াবী ফুলসাহেবের মোহমন্ত্রে বাবা এমনই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই ফুলসাহেবের উপরে তিলমাত্র সন্দেহ করিতে পারিতেন না; তথাপি সিরাজউদ্দীন যখনই এখানে

আসিতেন, বাবাকে ফুলসাহেব সম্বন্ধে অনেক বুঝাইতেন।'

অরি। এই একমাত্র কারণেই কি ফুলসাহেব তাঁহাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছেন, না তাঁহার আর কোনও উদ্দেশ্য আছে?

'আরও একটা উদ্দেশ্য আছে, সেইটিই বোধহয় প্রধান,' বলিয়া কুলসম একটু লজ্জিতভাবে নতমুখী হইল।

অরি। কী?

কুলসম উত্তর করিল না। সেইরূপ অবনতমস্তকে চুপ করিয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, 'কুলসম, লজ্জা করিয়া আমার কাছে কোনও কথা অপ্রকাশ রাখিয়ো না।'

কুলসম নতমুখে বলিল, 'তাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল।'

অরিন্দম বলিল, 'আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম। কালু রায় ডাকাতের কাছে তিনি যে এখনও বন্দি আছেন, এ-কথা তোমাকে কে বলিল?'

কু। একদিন ফুলসাহেবের সঙ্গে আমার বিমাতা এইরূপ পরামর্শ করিতেছিল। আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়াছিলাম।

অ। কালু রায় যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত দস্যু, তাহার হাত হইতে সিরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করা সহজ কাজ নয়; তথাপি আমি তাঁহার উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিব। এ-পর্যন্ত কোনও গোয়েন্দা কালু রায়কে ধরিতে পারে নাই। ধরা দূরে থাক, সে কোথায় থাকিয়া ডাকাতি করে, সে-সন্ধানও কেহ করিতে পারে নাই। অনেকে তাহাকে ধরিতে গিয়া তাহারই হাতে প্রাণ দিয়াছে। আমিও তাহাকে ধরিবার জন্য অনেকবার অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—কাজে কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই।

শুনিয়া কুলসমের মুখ শুকাইল। সে অরিন্দমের মুখে কালু রায়ের যে অখণ্ড প্রতাপের কথা শুনিল, তাহাতে তাহার হাত হইতে যে কখনও সিরাজ মুক্তি পাইবেন, এ-আশা তখন আর কিছুতেই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; নিরাশার অপরিহার্য উৎপীড়নে তাহার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়া উঠিল। কুলসম সিরাজকে কত ভালবাসে, তাহা সে নিজেও কিছুই বুঝিতে পারিত না; সে-ভালোবাসা উদ্দাম, পরিপূর্ণ, নিবিড়, অথচ অতি চঞ্চল, তথাপি ইহা অধীর যৌবনের একটা আরও অধীর, আরও চঞ্চল আবেগময় মদিরোচ্ছ্বাস নহে; তাহা তাহার আজীবন ধরিয়া তিল-তিল করিয়া, খেলায়-ধূলায়, হাস্য-পরিহাসে, গাথা-গল্পে একটা অতি প্রগাঢ় আত্মীয়তার মধ্য দিয়া, দিনে-দিনে তাহার হৃদয় এমন অল্পে-অল্পে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল যে, কুলসমকে তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে দেয় নাই। তাহাতে বড় আসে যায় না। কুলসমের সে অপার্থিব, অগাধ, অতি সরল একটা মনোবৃত্তি অটল নির্ভরতার সহিত প্রেমের মোহিনী মূর্তিতে বাহির হইয়া যাহার পদপ্রান্তে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছিল—সেই সিরাজ যে ইহার অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং বুঝিতে পারিয়া, তিনি যে তাঁহার হৃদয়ের সকল দ্বার উদঘাটন করিয়া, তাহারই জন্য সতত সমগ্র হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়াছিলেন, ইহাই কুলসমের যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত।

কুলসম শঙ্কাকুল হৃদয়ে অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তবে কি তাঁহার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?'

অরিন্দম বলিলেন, 'উপস্থিত কোনও উপায় দেখিতেছি না; সিরাজের উদ্ধারের জন্য শীঘ্রই আমি চেষ্টা দেখিব। তুমি ফুলসাহেবকে তোমার বিমাতার সঙ্গে আর কোনও বিষয়ে কোনও পরামর্শ করিতে কখনও শুনিয়াছ? কামদেবপুরের থানায় একটি বালিকার লাশ সমেত একটা কাঠের সিন্দুক চালান দেওয়া সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কখনও কি কোনও কথা উঠিয়াছিল?'

'তিন-চারদিন হইল, একদিন ফুলসাহেব আমার বিমাতাকে ওই রকমের একটা কী কথা বলিতেছিল, আমি তাহা ভালো বুঝিতে পারি নাই; সেই কথায় তখন তাহাদের মধ্যে একটা খুব হাসি পড়িয়া গিয়াছিল।'

'সেই সময়ে তাহাদিগকে কাহারও নাম করিতে শুনিয়াছ?'

'তিন-চারিজনের নাম করিয়াছিল, সে-সব নাম আমি আগে কখনও কাহারও মুখে শুনি নাই।'

'নামগুলি মনে আছে?'

'হ্যাঁ—গোরাচাঁদ, গোপালচন্দ্র।'

'আর কী? তুমি যে তিন-চারিজনের নাম শুনিয়াছ বলিলে?'

'আর দুইটি স্ত্রীলোকের নাম; বাঙালী স্ত্রীলোকদিগের নাম আমাদের বড় মনে থাকে না—বিশেষত, সে-নাম দুইটি যেন কেমন একটু নূতন রকমের।'

'রেবতী? রোহিণী?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলিয়াছেন, ওই দুইটি নামই তখন তাহাদের মুখে শুনিয়াছিলাম। এখন বেশ মনে পড়িতেছে।'

তখন অরিন্দমের চোখের উপর হইতে অত্যন্ত ভ্রমসঙ্কুল, সম্পূর্ণ রহস্যময় একটা অতি জটিল প্রহেলিকার দুর্ভেদ্য যবনিকা সহসা দূরে সরিয়া গেল—অরিন্দম স্তম্ভিত হইলেন। তিনি কুলসমকে বলিলেন, 'তোমার এখন বাড়িতে যাওয়া হইবে না, এইখানে থাক; সন্ধ্যার পূর্বেই তোমাকে আমি রাখিয়া আসিব।'

'কেন?'

'পরে জানিতে পারিবে,' বলিয়া অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'বন্ধুবর, কুলসমকে বাড়ির ভিতরে রাখিয়া আসুন।'

যোগেন্দ্রনাথ কুলসমকে অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে রাখিয়া আসিলেন। তাহার পর অরিন্দমকে লইয়া থানার দিকে চলিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্ত মন্ত্রণা

থানার একটি নিভৃত কক্ষে বসিয়া যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দমের একটা গুপ্ত মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে উভয়ে বাহিরে আসিলেন। যোগেন্দ্রনাথ একজন দারোগাকে ডাকিয়া তাহাকে ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশ ধরিতে অনুজ্ঞা করিলেন। সহজে কেহ না চিনিতে পারে, এমন একটা ছদ্মবেশে তিনি নিজেও সাজিলেন। অরিন্দম সেই বেশেই রহিলেন। তখনই তিনজনে একখানি গাড়িতে উঠিয়া অতি সত্বর ফুলসাহেবের গৃহাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময়ে যোগেন্দ্রনাথ দশজন পাহারাওয়ালাকে কিছুক্ষণ পরে ফুলসাহেবের বাটির নিকটবর্তী একটি গুপ্ত স্থানে উপস্থিত হইতে বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে সকলে ফুলসাহেবের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফুলসাহেবের বাড়িখানি মন্দ নহে, দ্বিতল—ছোটর উপরে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে একখানি ছোট ফুলের বাগান। বাগানে দুই-একটি করিয়া অনেক রকমের ফুলের গাছ। সেই বাগানের মধ্যে একজন মালী বসিয়াছিল—তাহাকে যোগেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডাক্তারবাবু এখন আছেন কি?'

মালী বলিল, 'উপরে আছেন, একটু পরে নিচে আসিবেন।'

বাহিরের একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া তিনজনে উপবেশন করিলেন। তখন সেখানে আর কেহই ছিল না। অরিন্দম নীরবে একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠিলেন। সেখানে গিয়া একটি অবরুদ্ধ কক্ষমধ্যে দুই ব্যক্তিকে কথোপকথন করিতে শুনিলেন। সেই দুইজনকে তিনি তখন না দেখিতে পাইলেও কণ্ঠস্বরে তদুভয়কে বেশ চিনিতে পারিলেন, একজন ফুলসাহেব, অপর লোকটি সেই গোরাচাঁদ। যে-কক্ষে বসিয়া তাহারা কথোপকথন করিতেছিল, সেই কক্ষের দ্বারে একটি অঙ্গুলি দিয়া ধীরে ঠেলিয়া দেখিলেন, তাহা ভিতর হইতে অবরুদ্ধ। তিনি

সেই কবাটের উপর কান রাখিয়া তাহাদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

ফুলসাহেব। কেমন, তুমি কি বোধ.কর, এদিকের কাজ অনেকটা শেষ করিয়া আনিতে পারি নাই?

গো। এখন এই শেষটা রাখাই বড় শক্ত কথা।

ফুল। তুমি সহায় রহিয়াছ, জুমেলিয়া সহায় রহিয়াছে, ইহাতেও যদি শেষরক্ষা শক্ত কথা হয়, তবে আর সহজ হইবে কিসে?

গো। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে বোধহয়, আপনি এত শীঘ্র এতটা কাজ কখনওই হাসিল করিতে পারিতেন না।

ফু। জুমেলিয়াই আমার দক্ষিণ হস্ত। সেইজন্যই তো কৌশল করিয়া আমি আগে তমীজউদ্দীনের স্ত্রীকে মারিয়া তাহারই আসনে জুমেলিয়াকে মতিবিবি করিয়া বসাই। তারপর সেই জুমেলিয়ারই খাতিরে তমীজউদ্দীনের সংসারে আমার একাধিপত্য; কিন্তু জুমেলিয়াকেও বিশ্বাস করিতে আমার প্রাণ চায় না—সে আমার একটা উপপত্নী ব্যতীত আর কেহই নয়। তা ছাড়া তার কূটবুদ্ধিতে, তার সাহসে, তার পরাক্রমে অনেক সময়ে সে আমাকেও ছাড়াইয়া অনেক দূরে উঠে। সেইজন্য একটু ভয় হয়, আমাকে আবার কোনওরকমে ফাঁকি না দেয়।

গো। একটা স্ত্রীলোক আপনাকে ফাঁকি দেবে? সেইজন্য আবার আপনার ভয় হয়? শুনে হাসি পায়।

ফু। জুমেলিয়াকে যে-সে স্ত্রীলোক মনে করিও না, জুমেলিয়ার যেরূপ ক্ষমতা—যেরূপ মনের বল, অনেক পুরুষেরও এমন নাই। সে না করিতে পারে, এমন কাজ কিছুই নাই। জুমেলিয়ার সাহায্য না পাইলে তমীজউদ্দীনের সংসার হইতে তিনটি প্রাণীকে এত সহজে আমি মৃত্যুমুখে তুলিয়া দিতে পারিতাম বলিয়া বোধ হয় না। দেখ দেখি, কেমন নির্বিঘ্নে তিন-তিনটি খুন হইয়া গেল; অথচ কেহ কিছুই জানিল না—কেহ একটু সন্দেহও করিতে পারিল না! এরূপ বেমালুম খুন করিবার একশত আট রকম বিষ আমার হাতে আছে; তমীজউদ্দীনের বাড়িতে যে-বিষ ব্যবহার করিয়াছিলাম, প্রত্যহ খাবার জলের সঙ্গে একবার একফোঁটা করিয়া দিলে ঠিক ছয়মাসের মধ্যে মানুষ মরে; খুব বলিষ্ঠ হইলে আটমাসও লাগে—স্ত্রীলোককে চারিমাসের অধিক খাওয়াইতে হয় না। তবে শীঘ্র কাজ শেষ করিতে হইলে রোজ দুই ফোঁটা এমনকী তিনফোঁটা করিয়া খাওয়ানো চলে—তার বেশি দেওয়া চলে না—তাহা হইলে জলটা একটু কষায় বোধ হয়। অরিন্দমকে চুরুটের সঙ্গে যে-বিষ দিয়া হত্যা করিলাম, উহাতে দশঘন্টার মধ্যে যেমন বলবান লোক হউক না কেন—নিশ্চয়ই মরিবে।

গো। অরিন্দমকে হত্যা করায় ওইখানেই সকল কার্যের গোড়া বাঁধা হইয়াছে; এখন আর কাহাকে ভয় করিব?

ফু। অরিন্দম বড় সহজ লোক ছিল না; আজ-কাল না হোক, দুদিন পরে না হোক, এক-সময়ে-না-একসময়ে সে আমাকে ধরিতে পারিত। লোকটি বড়ই তীক্ষ্ণবুদ্ধির ছিল, তা বলিয়া আমি তাহাকে কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ভয় করি নাই। ওই রকম সাতটা অরিন্দম যদি মিশিয়া একটা হইয়া আসিত—তাহা হইলেও ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া ভয় করিত না—ভয় কাহাকে বলে অদৃষ্টক্রমে এ-পর্যন্ত ফুলসাহেবের সে-শিক্ষা হয় নাই।

গো। অরিন্দম শুধু বুদ্ধিমান ছিল না—বলবানও যথেষ্ট ছিল, সেদিন সেই মাঠে লইয়া তাকে হত্যা করিতে গিয়া সে-প্রমাণ আমি বেশ পাইয়াছি। আগে আমার এমন বিশ্বাস ছিল না যে, কোনও লোক আমাকে এত শীঘ্র কাবু করিতে পারে। সে যাই হোক, আমার বোধহয়, সেই সময়ে যদুনাথ গোস্বামীর সেই পত্রখানি অরিন্দম আমার কাছ থেকে হস্তগত করিয়া থাকিবে; সে-পত্রে অনেক কথা খুলিয়া লেখা ছিল। তাহাতেই সে তখন রেবতীর মাতামহকে খবর দিয়া যদুনাথের বাড়ি থেকে রেবতীকে সরাইয়া দেয়।

ফু। তুমি ভুল বুঝিয়াছ, রেবতী মাতামহের নিকটে গিয়াছে, এ-কথা একটি ছলনামাত্র। রেবতীর সন্ধান করিতে না পারিলে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। যখন অরিন্দমকে এ-সংসার হইতে বিদায় করিতে পারিয়াছি, তখন আর ভয় কী? সকল কাজই আমরা নির্বিঘ্নে অথচ খুব শীঘ্রই শেষ করিয়া উঠিতে পারিব।

গো। এদিকে রেবতীকে সন্ধান করিয়া শীঘ্র বাহির করিতে না পারিলে, গোপালচন্দ্রের কাছে একটি পয়সাও পাওয়ার সম্ভাবনা নাই।

ফু। তাহা তো জানি, তুমি কি মনে কর, সেজন্য আমি কোনও চেষ্টা করিতেছি না? অরিন্দম যখন মরিয়াছে, তখন আর ভাবনা কী? আমি সকল সন্ধান রাখিয়া থাকি। ইদানীং যে অরিন্দম কেশবচন্দ্রের সন্ধানে ঘুরিতেছিল, তাহাও জানি; কিন্তু বোকারাম জানিত না যে, সেই কেশবচন্দ্র এদিকে ফুলসাহেব-মূর্তিতে তার চোখের উপরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অরিন্দম শুনিয়া বিস্মিত হইলেন বটে—ততদূর নহে, কারণ পূর্বেই তিনি অনেকটা এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। আরও মনোযোগের সহিত কবাটের উপর কান রাখিয়া রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিলেন।

গোরাচাঁদ বলিল, 'এখন কুলসম যদি আপনাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আপনি তো অনেকটা তফাতে পড়িলেন।'

ফুলসাহেব বলিল, 'না স্বীকার করে, তার পিতা, মাতা, ভ্রাতা যেখানে গিয়াছে, কুলসমকেও সেখানে পাঠাইব।'

গো। কুলসমকে হত্যা করিলেই একটা গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা।

ফু। কিছু না—কিছু না। এমনভাবে কাজ করিব যে, কেহ জানিতে পারিবে? হা—হা—হা (হাস্য) তা হলে তুমিও এখন আমাকে ঠিক চিনিতে পার নাই দেখিতেছি। দিনকে রাত করিতে পারে, রাতকে দিন করিতে পারে, এমন ক্ষমতা ফুলসাহেবের যথেষ্ট আছে।

গো। আমিও তা যথেষ্ট জানি। সিরাজউদ্দীনকে কতদিন সেইখানে রাখিবেন?

ফু। যতদিন আবশ্যক বোধ করিব।

গো। কুলসমকে আগে বিবাহ করিয়া তাহার পর তাহাকে কি ছাড়িয়া দিবেন?

ফু। তার কোনও ঠিক নাই; হয়তো সিরাজও মরিবে। তাহাকে যে এতদিন খুন করি নাই, তাহার একটা কারণ আছে। শুধু কুলসমের জন্য তাহাকে আমি সেখানে আটক রাখি নাই। ইহার ভিতরে আমার আর একটা গূঢ় অভিপ্রায় আছে।

গো। সে অভিপ্রায়টা কী?

ফু। পরে জানিতে পারিবে, এখন থাক।

এই বলিয়া ফুলসাহেব উঠিল; উঠিয়া বলিল, 'তুমি বসো, আমি নিচে হতে এখনই আসিতেছি।'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : ফুলসাহেব ধরা পড়িল

অরিন্দম তখনই তাড়াতাড়ি নিচের সেই বৈঠকখানায় আসিলেন। সেখানে ছদ্মবেশী যোগেন্দ্রনাথ ও সেই দারোগা বসিয়া ছিলেন। উভয়েই অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইল?'

'ডাক্তার আসিতেছে,' বলিয়া নিমেষ-মধ্যে অরিন্দম সেইখানে একখানা বেঞ্চের উপর নিজের দীর্ঘ দেহটি ছড়াইয়া দিলেন এবং নিমেষ-মধ্যে তখন তাহাদিগকে যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। তাহার পর নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চক্ষু মুদিলেন।

তখন ডাক্তার ফুলসাহেব সেই বৈঠকখানার দ্বারের উপর দেখা দিলেন।

ছদ্মবেশী দারোগা বলিল, 'আমরা অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। (অরিন্দমকে দেখাইয়া) এই লোকটির মূর্ছারোগ আছে ; প্রত্যহ দুইবার-তিনবার মূর্ছা যায়, এতক্ষণ ভালো ছিল—এখানে আসিয়া আবার রোগে ধরিয়াছে; ভালোই হইয়াছে, ইহাতে রোগ কী আমাদিগকে আর ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে, না—আপনি রোগীকে দেখিয়াই ঠিক করিতে পারিবেন?'

কোনও কথা না কহিয়া ফুলসাহেব রোগীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্তী হইয়া দেখিয়া চিনিল—এ যে অরিন্দম—অভাবনীয়রূপে চমকিত হইয়া দুই পদ পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। মুখ-চোখের ভাব বদলাইয়া গেল। সে ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত—তখনই তাড়াতাড়ি পকেটের ভিতর হইতে একখানি শাণিত দীর্ঘ ছুরি বাহির করিয়া অরিন্দমের বুকে বিদ্ধ করিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিল। বাতায়নপ্রবিষ্ট সূর্যরশ্মি লাগিয়া ছুরিখানা ঝকমক করিয়া উঠিল। যোগেন্দ্রনাথ পশ্চাদিক হইতে দুই হাতে ফুলসাহেবের সেই হাতখানি ঘুরাইয়া ধরিয়া ফেলিলেন। অরিন্দমও সহসা উঠিয়া তাহার অপর হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিলেন এবং দারোগা তদুভয়ের সাধ্যমতো সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল; তখন সেই ঘরের ভিতর চারিজনে একটা খুব ধস্তাধস্তি চলিতে লাগিল। ফুলসাহেব এত বলবান যে, অরিন্দম, যোগেন্দ্রনাথ আর দারোগা তিনজনে মিলিয়াও শীঘ্র তাহাকে বন্দি করিতে পারিলেন না। সেই ঘরের ভিতরে একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল—ফুলসাহেব সহজ নয়; প্রায় অর্ধঘণ্টার পরে সেই তিনজন পুলিশ-কর্মচারীর একান্ত জেদাজেদি ও আগ্রহাধিক্যে অতি পরিশ্রমের পর ফুলসাহেবের হাতে তিন জোড়া হাতকড়ি দৃঢ়সংলগ্ন হইল।

ফুলসাহেব ধরা পড়িল।

তারপর গোরাচাঁদের অনুসন্ধান করা হইল—তাহাতে পাওয়া গেল না। সে বাহিরের গোলযোগ শুনিয়া, ইতিমধ্যে ভিতর-বাটির একটা জানালা ভাঙিয়া, নিজের পলায়নের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছিল।

অরিন্দম উপহাসের মৃদুহাস্যে ফুলসাহেবকে বলিলেন, 'কেমন গো ডাক্তারবাবু, এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, অরিন্দম মরে নাই—ঠিক আগেকার মতো বাঁচিয়া আছে?'

অরিন্দমের কথা শুনিয়া ফুলসাহেবের মুখে একবার সেই চিরাভ্যস্ত অপূর্বভঙ্গিতে এক-অপূর্বরহস্য-প্রাপ্ত অমঙ্গলের মৃদু হাসি দেখা দিল। সদর্পে সেই হাসির সহিত মিষ্টকণ্ঠে বলিল, 'যতক্ষণ ফুলসাহেব বাঁচিয়া আছে, ততক্ষণ অরিন্দম না মরিলেও মরিতে বেশিক্ষণ নয়—ততক্ষণ নিজেকে নিরাপদ মনে করা অরিন্দমের মহাভ্রম।' তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, 'শোনো অরিন্দম, যদি কোনওরকমে কখনও তোমাদের হাত হইতে পালাইতে পারি, তখন দেখিয়ো, আবার এই ফুলসাহেব আরও কী নিদারুণভাবে—আরও কী আশ্চর্য কৌশলে তোমাকে মরণের মুখে তুলিয়া দেয়!' বলিয়া অয়স্কঙ্কণাবদ্ধ হাত দুইখানি রাগ ভরে সম্মুখে উৎক্ষিপ্ত করিল—হাতকড়িগুলি পরস্পর আঘাত পাইয়া সেইসঙ্গে ঝনঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল।

সকলে মিলিয়া ফুলসাহেবকে থানার দিকে লইয়া চলিলেন। পূর্বে যে দশজন পাহারাওয়ালাকে যোগেন্দ্রনাথ আসিতে বলিয়াছিলেন, পথে তাহাদের সহিত দেখা হইল।

অরিন্দম একজন পাহারাওয়ালা ও সেই দারোগাকে সঙ্গে লইয়া কুলসমের বাটি-অভিমুখে চলিলেন। আর সকলে ফুলসাহেবকে লইয়া থানায় গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ জুমেলিয়া ধরা পড়িল

ফুলসাহেব ধরা পড়িয়াছে। সে খুনি—সে দস্যু—সে জালিয়াত এবং সে ভয়ানক লোক, সুতরাং তাহার ফাঁসি হইবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে কথাটা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বাটিতে বসিয়া জুমেলিয়া

ওরফে মতিবিবি সে-কথা শুনিল। প্রথমে বিশ্বাস করিল না—হাসিয়া কথাটাকে মন হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিল। তাহার পর অনেকের মুখে সেই একই কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হইল। তখন আপন শয়ন-গৃহে যাইয়া, ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মতিবিবি ঝটিকাচ্ছন্ন মাধবীলতার ন্যায় নিজের অবসন্ন দেহখানিকে প্রশস্ত বিছানার উপরে বিস্তৃত করিয়া দিল। অনেক রকম দুর্ভাবনায় তাহার সমস্ত হৃদয় উপদ্রুত ও অত্যাচারিত হইলে লাগিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে সেই অবরুদ্ধ দ্বারের উপর করাঘাতের গুমগুম শব্দ হইতে লাগিল। জুমেলিয়া চকিতে উঠিয়া বসিল—(পাঠক, আমরা জুমেলিয়াকে আর মতিবিবি না বলিয়া এখন হইতে জুমেলিয়াই বলিব।) জুমেলিয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

বাহির হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর হইল, 'আমি আমিনা।'

আমিনা তমীজউদ্দীনের সংসারের নবীনা দাসী; কিন্তু সে দাসীর মতো থাকিত না—সে নিজের বুদ্ধিচাতুর্যে প্রভু-কন্যার সহচরীপদ লাভ করিয়াছিল।

জুমেলিয়া বলিল, 'কেন? কী দরকার?'

আমিনা বলিল, 'দরজা খোলো—বলিতেছি—অনেক কথা আছে।'

জুমেলিয়া উঠিয়া কবাট খুলিয়া দিল; দেখিল, বারান্দার উপরে দ্বারের সম্মুখে ভীষণ মূর্তিতে দাঁড়াইয়া অরিন্দম আর তাঁহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যমদূতাকৃতি একজন দারোগা, আর একজন পাহারাওয়ালা এবং আমিনা হাসিয়া পলাইয়া যাইতেছে—দেখিয়া, জুমেলিয়ার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। বুঝিতে বাকি রহিল না, ফুলসাহেব ধরা পড়ায় সকল কথা প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমিনা কৌশল করিয়া তাহাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিল। নিদারুণ রোষে তাহার মুখ-চোখ আরক্ত হইয়া গেল এবং চোখ দুটি উল্কাপিণ্ডবৎ জ্বলিয়া উঠিল। কোনও কথা কহিতে পারিল না; সেই মুহূর্তেই—এই অংশটি পাঠ করিতে পাঠকের যতটুকু সময় ব্যয়িত হইল—তাহার শতাংশের একাংশও লাগিল না—জুমেলিয়া সবেগে বাম হস্তে আমিনার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—সেইসঙ্গে অপর হস্তে কটির বসনাভ্যন্তর হইতে একখানি শাণিতোজ্জ্বল তীক্ষ্ণাগ্র অতি দীর্ঘ কিরীচ বাহির করিয়া তাহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল—পৃষ্ঠ ভেদ করিয়া কিরীচের কিয়দংশ বাহির হইয়া পড়িল; জুমেলিয়া তখনই কিরীচ টানিয়া তুলিয়া লইল। 'বাবা রে—মা রে—গেছি রে' বলিয়া আমিনা সেইখানে পড়িয়া শোণিতাক্ত কলেবরে লুটাইতে লাগিল এবং প্রবলবেগে রক্ত বাহির হইয়া সেখানকার অনেকটা স্থান প্লাবিত করিল। তখন সেই পিশাচীর সম্মুখীন হওয়া কতদূর শঙ্কাজনক তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা ভয়ে দুই পদ হটিয়া দাঁড়াইল। অরিন্দম বুঝিলেন, এ-সময়ে ভয় করিলে চলিবে না—বরং তাহাতে বিপদ আছে; যেমন বুক হইতে জুমেলিয়া কিরীচখানি টানিয়া তুলিয়াছে, অমনি ছুটিয়া গিয়া অরিন্দম তাহার সেই কিরীচ সমেত হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিলেন। দারোগা ও পাহারাওয়ালা তখন সত্বর হইয়া জুমেলিয়ার কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল; কিন্তু জুমেলিয়া সেই সময়ে অকর্মণ্য দক্ষিণ হস্ত হইতে বাম হস্তে সেই কিরীচখানি লইয়া ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি অরিন্দমকে আঘাত করিতে গেল; অরিন্দমকে না লাগিয়া, সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট কিরীচ পার্শ্ববর্তী পাহারাওয়ালার কটিদেশে লাগিয়া অনেকটা বিদ্ধ হইয়া গেল। দুই হাতে ক্ষতস্থান চাপিয়া আমিনার মতন সে-ও রক্তপ্লাবিত দেহে মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। দারোগা তখন দুই হাতে জুমেলিয়ার কিরীচ সমেত হাতখানি চাপিয়া ধরিল। অরিন্দম জোর করিয়া জুমেলিয়ার হাত হইতে কিরীচখানি কাড়িয়া লইলেন। তাহাতে নিজের হাতে দুই-একস্থান কাটিয়া গিয়া রক্তধারা বহিতে লাগিল; অরিন্দম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া জুমেলিয়ার হাতে ডবল হাতকড়া লাগাইয়া দিলেন।

জুমেলিয়া ধরা পড়িল।

অরিন্দম পূর্বে জুমেলিয়াকে যত সহজে গ্রেপ্তার করিবেন মনে করিয়াছিলেন, কার্যত তাহা ঘটিল না। অরিন্দম তখন বুঝিতে পারিলেন, জুমেলিয়ার মতো এমন প্রখরা, প্রবলা, দুর্দমনীয়া, মরিয়া

স্ত্রীলোক আর কখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই; দুইজনকে আহত করিয়া তাহার পর সে ধরা পড়িল। দৃঢ়স্বরে জুমেলিয়া অরিন্দমকে বলিল, 'বড় জোর কপাল তোমার অরিন্দম! তাই তুমি আমার হাত হইতে আজ পার পাইলে, যদি আর একটু অবসর পাইতাম—যদি এত শীঘ্র আমাকে নিরস্ত্র হইতে না হইত, তাহা হইলে দেখিতে পাইতে কেমন করিয়া আমি তোমার রক্তে স্নান করিতাম!'

অরিন্দম বলিলেন, 'ফুলসাহেবের উপপত্নীর পক্ষে এ-বড় আশ্চর্য কথা নহে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'আমি ফুলসাহেবের উপপত্নী? এ-মিথ্যা কথা তোমায় কে বলিল?'

অরিন্দম বলিলেন, 'জুমেলিয়া, আমি ফুলসাহেবের মুখে সব শুনিয়াছি; তুমি বিষ দিয়া কুলসমের পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছ, তাহাও আমি তাহার মুখে শুনিয়াছি।'

জুমেলিয়া বলিল, 'মিথ্যা কথা! ইহাও কি ফুলসাহেব স্বীকার করিয়াছে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

জুমেলিয়া বলিল, 'তবে আমিও স্বীকার করিতেছি। (ক্ষণপরে) এখন আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'যেখানে তোমার পাপের ঠিক প্রায়শ্চিত্ত হইবে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'চলো যাইতেছি; কিন্তু শুনিয়া রাখো, নির্বোধ অরিন্দম! সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী জুমেলিয়াকে ঘাঁটাইয়া তুমি ভালো কাজ করিলে না; তুমি সাধ করিয়া সাপের গায়ে হাত দিয়াছ—ইহার উপযুক্ত প্রতিফল তোমাকে একদিন ভোগ করিতেই হইবে।'

অরিন্দম ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, 'সেজন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবে না—আমার ভাবনা ভাবিতে আমার যথেষ্ট অবসর আছে। অরিন্দম তোমার মতো সাতটা জুমেলিয়াকে তৃণাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করে।'

জুমেলিয়া একটা উপহাসের অট্টহাসি হাসিয়া—হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'আরে যাও, অরিন্দম, আর মুখ তুলিয়া কথা কহিয়ো না, ছিঃ-ছিঃ—তাই একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে একা আসিতে সাহস করো নাই—দল বাঁধিয়া আসিয়াছ—ধিক তোমায়! এখন দেখিতেছি, তোমার মতো কাপুরুষের দেহে অস্ত্রাঘাত না করিয়া আমি ভালোই করিয়াছি—তাহাতে আমার হাত কলঙ্কিত হইত।'

জুমেলিয়াকে লইয়া অরিন্দম ও দারোগা থানায় চলিলেন। সেই কথা লইয়া তখনই গ্রামের মধ্যে আবার একটা হইচই পড়িয়া গেল।

অনতিবিলম্বে আহতা আমিনার প্রাণবিয়োগ হইল। আঘাত তেমন সাঙ্ঘাতিক না হওয়ায় সেই পাহারাওয়ালার প্রাণটা এবারকার মতো থাকিয়া গেল।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে তথাকার জেলখানার একটা ঘরে হাজত-বন্দি রাখা হইল; অধিকন্তু তদুভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে একজন প্রহরী চব্বিশ ঘণ্টা সেখানে ফিরিতে লাগিল।

তৃতীয় খণ্ড

সর্পিণী—সুবর্ণরূপা

Think not I love him, though I ask for him;
* * * * * * *
I love him not, nor hate him not; and yet
I have more cause to hate him then to love him;
For what had he to do to chide at me?
He said mine eyes were black, my hair black;
And now I am remember'd scorn'd at me.

—"Dodd's Beauties of Shakespeare."

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ মৃত্যু-চুম্বন

যেদিন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া ধরা পড়ে, সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর আকাশ মেঘ করিয়া বড় ভয়ানক হইয়া উঠিল। সেই দিগন্তব্যাপী মেঘে বাতাস বন্ধ হইয়া এমন একটা গুমোট করিল যে, নিশ্বাস ফেলাও একটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই অন্ধকারাকার কৃষ্ণমেঘ হইতে অন্ধকারের পর অন্ধকার নামিয়া পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঢাকিয়া—ভূতল হইতে আকাশতল ব্যাপিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল। সেই নিঃশব্দ অন্ধকারের মধ্যে উন্নত, দীর্ঘশীর্ষ, শাখাপ্রশাখাপল্লববহুল বৃক্ষগুলি বিকটাকার দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। জগৎ অন্ধকারমাত্রাত্মক, নিকটে অন্ধকার—দূরে আরও অন্ধকার—বহুদূরে তদপেক্ষা আরও অন্ধকার—সেখানে দৃষ্টি চলে না। সেই ভয়ানক বিভীষিকাময় অন্ধকারময়ী রাত্রি-দ্বিপ্রহরের শেষে হাজতঘরের ভিতরে হস্তপদবদ্ধ ফুলসাহেব একপাশে পড়িয়া অমানুষিক নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিজের গভীর নিদ্রার পরিচয় দিতেছিল। একটু দূরে জুমেলিয়া জাগিয়া বসিয়া ছিল—এবং বাহিরে একটা আলো জ্বলিতেছিল, তাহারই কতক অংশ লৌহনির্মিত গরাদযুক্ত দ্বারের ভিতর দিয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল; তাহারই একখণ্ড আলোক লাগিয়া জুমেলিয়ার মুখমণ্ডল বড় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল; সে-মুখ ম্লান নহে—বিষণ্ণ নহে—তাহাতে চিন্তার কোনও চিহ্নই নাই, বরং কিছু প্রফুল্ল। দ্বার-সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরী ঘন-ঘন পরিভ্রমণ করিতেছিল; আর সেই প্রফুল্ল মুখখানি সতৃষ্ণনেত্রে দেখিতেছিল। সেই চন্দ্রশূন্য, তারাশূন্য, দিগ্‌দিগন্তশূন্য, শব্দশূন্য, মেঘময়, অন্ধকারময়, বিভীষিকাময় রজনীর অনন্ত ভীষণতার মধ্যে সেই সুন্দর মুখখানি কত সুন্দর—পাঠক, তুমি-আমি ঠিক বুঝি না—প্রহরীর তখন সেই সৌন্দর্য বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। মুগ্ধ প্রহরীর মুখ-চোখের ভাবভঙ্গি দেখিয়া জুমেলিয়ার বুঝিতে বাকি ছিল না যে, প্রহরী-পতঙ্গ তাহার রূপাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিয়া, যখন প্রহরী আর একবার ঘুরিয়া আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, তখন জুমেলিয়া তাহার সেই যেমন-চঞ্চল-তেমনই-উজ্জ্বল নেত্রে প্রহরীর প্রতি এক বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। বেচারা বড় বিভ্রাটে পড়িল, সে সচেতন থাকিয়াও অচেতন মতো হইল-এবং তাহার আপাদমস্তক ব্যাপিয়া একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়া গেল। অহার মাথা ঘুরিয়া গেল, পা কাঁপিতে লাগিল, বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল, সে চোখে অন্ধকার দেখিল, কান ভোঁ-ভোঁ করতে লাগিল এবং দেহের লোমগুলি পর্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া—সেখান হইতে সরিয়া—দূরে গিয়া একটা আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বুকের ভিতরে সেই দবদবানিটা কিছুতেই গেল না। প্রহরী তখন নিজের অবস্থা যত বুঝিতে না-ই পারুক—জুমেলিয়া সম্পূর্ণরূপে পারিল। জুমেলিয়া ভাবিল, ঔষধ ধরিয়াছে।

প্রহরী আবার ঘুরিয়া দ্বার-সম্মুখে কম্পিতপদে ফিরিয়া আসিলে জুমেলিয়া তাহাকে বলিল, 'পাহারাওয়ালাজী, আমাদের জন্য তোমার কত কষ্ট হচ্ছে—।'

প্রহরী মোলায়েমস্বরে বলিল, 'আরে ন্যহি—ইয়ে হামরা আপনা কাম হৈ।'

জুমেলিয়া পূর্ববৎ মিষ্টকণ্ঠে বলিল, 'তা যাই বলো, পাহারাওয়ালাজী, এ মানুষের উপযুক্ত কাজ নয়—এই রাত্রে কোথায় স্ত্রীকে বুকে নিয়ে ঘুমুবে, না বন্দুক ঘাড়ে করে হরঘড়ি একবার এদিক, একবার ওদিক করে ঘুরছ।'

প্রভুভক্ত প্রহরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যিসকা নিমক খ্যায়, উসকা কাম জান দেকে করনা চাহিয়ে।'

তাহার পর জুমেলিয়া এ-কথা সে-কথা অনেক অবান্তর কথা পাড়িল, তাহার পর অনেক সুখদুঃখের কথা উঠিল, বিরহব্যথার কথা উঠিল, জুমেলিয়া প্রহরীর দুঃখে অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইল। তাহার সহানুভূতিসূচক কথাগুলি বীণাগীতিবৎ প্রহরীর শ্রুতিতে সুখজনক আঘাত করিতে লাগিল। জুমেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা পাহারাওয়ালা সাহেব, তুমি তো আজ তিন বৎসর বাড়ি যাও না—তোমার

স্ত্রী তোমাকে ছেড়ে কেমন করে আছে? আমি হলে তো তোমায় একদণ্ড চোখের তফাত করতেম না—তাতে খেতে পাই ভালো, বহুৎ আচ্ছা—না খেতে পাই, সেভি বহুৎ আচ্ছা।'

পাহারাওয়ালা সহাস্যে বলিল, 'আপলোগ বড়া আদমী; সবভি কর সকতে। আউর হমলোগ গরিব আদমী, আগে পেটকা ধান্দা করনে পড়তা।'

জুমেলিয়া বলিল, 'তোমার কয়টি ছেলে?'

প্রহরী। দো লেড়কা আউর ছও মাহিনেকী এক লেড়কী হুয়ি।

জু। তুমি তো আজ তিন বৎসর দেশে যাওনি, তবে এর মধ্যে আবার ছয় মাহিনেকী এক লেড়কী এল কোথা থেকে?

প্রহরী মাথা নাড়িয়া সগর্বে বলিল, 'আরে ক্যায়াবাৎ, হম হর মাহিনে চিঠি ভেজতা আউর জবাব ভি আতা, ইসি হালসে মেরা বড়া লেড়কা ভিখুরাম নৈ পয়দা হুয়া থা।'

জু। আরে পোড়ারমুখ, চিঠি লিখলে লেড়কা পয়দা হবে কী করে?

প্র। হামলোগকো চিঠিমে সব কাম হোতা।

কথা শুনিয়া জুমেলিয়া খুব একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, 'তুমি ভিখুর মাকে খুব ভালোবাসো?'

প্র। ভিখুমায়কি ক্যেয়া ভালা বুরা?

জু। না না—তোমরা যাকে পিয়ার করা বলো?

প্র। হাঁ হাঁ, বহুৎ পিয়ার করতে হেঁ।

জু। ভিখুর মা দেখতে আমার চেয়ে সুন্দরী?

প্র। আরে রাম রাম! তোমরে মাফিক খ্যপসুরৎ হোনেসে হামরা হাজার রূপিয়া তলব মিলনেসে এক ঘড়িভি নহি ছোড় দেতা।

জু। এখন এ-কথা বলিতেছ; তখন বোধহয়, আমার মুখের দিকে ফিরিয়াও চাহিতে না; হয়তো—হয়তো কেন? নিশ্চয়ই দেশে আমাকে একা ফেলে রেখে, এখানে এসে কোম্পানির সাজগোজের সঙ্গে, চাপরাসের সঙ্গে, আর সঙিনদার বন্দুকটির সঙ্গে প্রণয় বেশ জাঁকিয়ে ফেলতে পাহারাওয়ালাজী। তুমি তো এখানে কোম্পানি বাহাদুরের পাহারা দিচ্ছ। সেখানে ভিখুর মা-র পাহারার ভার কার উপরে দিয়ে এসেছ? সেখানে যদি লুঠ হয়ে যায়?

প্রহরী জুমেলিয়াকে নির্দেশ করিয়া কহিল, 'অ্যাসা জহরৎ ছোড়কে কোই সিসা লুঠনে যাতা হই?'

জু। আমি খুব ভালো জিনিস? একেবারে জহরৎ?

প্র। আলবৎ—ইসমে ক্যায়া সক হই?

জু। দেখ, দুর্বল সিং।

প্র। হামারা নাম দুর্বল সিং নাহি হই।

জু। তবে কি মরণাপন্ন সিং?

প্র। ন্যাহি ন্যাহি—হামার নাম লঙ্কেশ্বর সিং।

জু। বাহবাঃ কি বাহবাঃ! চমৎকার নাম! ওই যে কী বলছিলেম—ভালো, হ্যাঁ মনে হয়েছে, দেখ লঙ্কেশ্বর সিং, বলতে লজ্জা হয়—তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা যেন কিস মাফিক হচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার ওই আলু-চেরা চোখ, ওই হাতির মতো নাক, এই শতমুখীর মতো গোঁফ, আর ঝাউবনের মতো দাড়ি, আমার মাথা খেয়েছে—ইচ্ছা করে, তোমাকে নিয়ে বনে গিয়ে দুজনে মনের সুখে বাস করি। তা বিধাতার কী মরজি, তোমার হাতে আমাকে না দিয়ে (ফুলসাহেবকে দেখাইয়া) এই খুনির হাতে আমাকে তুলে দিয়েছে। তুমি যদি এখন পায়ে স্থান দাও, তবে এ-জীবনটা সার্থক হয়।

এই বলিয়া জুমেলিয়া আবার এক কটাক্ষ করিয়াছিল। তাহাতেও লক্ষেশ্বর সিং এখনও স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া; সুতরাং লক্ষেশ্বর ধন্যবাদার্হ। সে যে তখনও ঘুরিয়া পড়ে নাই, ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু সে ঘুরিয়া না পড়িলে তাহার মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল এবং প্রাণটা বুকের ভিতরে মূর্ছিত হইয়াছিল। সে শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া আবাঙ্মুখে জুমেলিয়ার কথা শুনিতেছিল। শুনিয়া হাতে স্বর্গ পাইল, এবং লোভটা অত্যন্ত প্রবল ও অদম্য হইয়া উঠিল। বলিল, 'আরে, ন্যহি ন্যহি, এয়সা বাৎ মৎ বোলো; তুম হামকো পাএর মে রাখখো, তো হম তুমকো শিরমে র‍্যখখে। মেরা নসিবকা জোর অ্যাসা হোগা, তুম হমকো এত্তা মেহেরবানি করেগী?'

জু। আমি তো মেহেরবানি করতে খুব রাজি আছি, এখন তুমি যদি একটু মেহেরবানি করো, তবে বুঝতে পারি।

প্র। তুম হামসে দিল্লগী করতী হৈ।

জুমেলিয়া বলিল, 'না লক্ষেশ্বর সিং, তোমার দিব্য—আমি একটুও দিল্লগী করিনি—আমি সত্যি কথাই বলছি, তোমাকে দেখে অবধি আমার মনটা একদম মজে গেছে। দেখো, লক্ষেশ্বর সিং, যদি কোনওরকমে তুমি একটা চাবি জোগাড় করতে পারো, তাহা হইলে এখানে যে-পাঁচ-সাতদিন থাকি, এমনি রাত্রে আমার স্বামী ঘুমাইলে রোজ দুই দণ্ড তোমার সঙ্গে আমোদ করতে পারি।'

প্রহরী অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'একঠো পুরানা চাবি হৈ, ও-চাবি সব হাতকড়িমে লাগতা যাতা।

তালার পরিবর্তে দ্বারে হাতকড়ি লাগানো ছিল। এখানে তালার পরিবর্তে হাতকড়ির ব্যবহারও হইয়া থাকে। লক্ষেশ্বর কোমর হইতে চাবি বাহির করিয়া, হাতকড়ি খুলিয়া জুমেলিয়াকে বাহিরে আনিল। আবার দ্বারে হাতকড়ি লাগাইয়া দিল।

জুমেলিয়া সর্বাগ্রে লক্ষেশ্বর সিংহকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল; ধরিয়া তাহার সেই শ্মশ্রুগুম্ফপরিব্যাপ্ত মুখমণ্ডলে ঘন-ঘন চুম্বন করিল। পরক্ষণেই প্রহরীর সংজ্ঞালুপ্ত হইল। সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল; পড়িয়া কৃষ্ণকে জবাব দিল।

জুমেলিয়ার চুম্বনে লক্ষেশ্বরকে মরিতে দেখিয়া পাঠক আশ্চর্যান্বিত হইবেন না—সে সাপিনী, তাহার নিশ্বাস লাগিয়াও শোণিত বিষাক্ত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ দানব ও দানবী

ভিতরে নিদ্রার ভানে পড়িয়া ফুলসাহেব সকলই দেখিতেছিল—শুনিতেছিল। প্রহরীকে পড়িতে দেখিয়া ফুলসাহেব কপট নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিল। বলিল, 'কাজ হাসিল?'

জুমেলিয়া প্রহরীর হাত হইতে সেই হাতকড়ির চাবিটি লইয়া, দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, ফুলসাহেবকে বাহিরে আনিয়া, তাহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া বলিল, 'এই এতক্ষণে হাসিল হইল।'

ফুলসাহেব জুমেলিয়াব কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া, সোহাগভরে বলিল, 'এত গুণ না থাকিলে, আমি তোমার এত অনুগত হইব কেন?'

জুমেলিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল, 'লক্ষেশ্বরের প্রাণটা আগেই আমি প্রায় সবটা হস্তগত করিয়াছিলাম—আর অমন একটা নির্বোধ মেড়ুয়াকে যদি ভুলাইতে না পারিব—তবে আর হইল কী? তাহার পর যখন দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া একটা চুম্বন দিলাম—তখন তার প্রাণের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু পর্যন্ত দখল করিলাম। যখন সব প্রাণটা হস্তগত হইল, তখন তাহাকে উকুনটির মতো নখে টিপিয়া অনায়াসে মারিব, তার আর আশ্চর্য কী? সেই বিষ-কাঁটাটি পিঠে ফুটাইয়া দিলাম।'

ফুলসাহেব বলিল, 'টের পায় নাই?'

জুমেলিয়া বলিল, 'টের পাইলেই বা ক্ষতি কী? যদি টের পাইয়া চিৎকার করিয়া উঠে, এইজন্য চুম্বনের ছলে মুখ দিয়া তার মুখটা জোরে চাপিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম—তা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতেই আনন্দে তার জ্ঞান লোপ পাইয়াছিল—একটা কাঁটা ফুটিলে কি—বোধহয়, তখন তাহার পিঠে সহস্র শেল ফুটিলেও অনুভবেই আসিত না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'চলো, এখনও অনেক কাজ বাকি।'

ফুলসাহেব জুমেলিয়ার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া চলিল; কিছুদূর গিয়া ফুলসাহেব সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'জুমেলিয়া, দাঁড়াও, তাড়াতাড়িতে একটা কাজ ভুল করিলাম, এখনই আসিতেছি।' বলিয়া জুমেলিয়াকে তথায় রাখিয়া ফুলসাহেব আবার সেই হাজতঘরের সম্মুখে আসিল; মৃত প্রহরীর বন্দুকের সঙ্গীন ও কোমর হইতে কিরীচখানি খুলিয়া লইল। তাহার পর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিরীচের মুখ দিয়া ভিতরের দেওয়ালে বড়-বড় অক্ষরে লিখিল—

'অরিন্দম! সাবধান, এক সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে খুন করিব, তবে আমার নাম—
তোমার চিরশত্রু ফুলসাহেব।'

তখনই ফিরিয়া আসিয়া ফুলসাহেব, জুমেলিয়াকে সেই কিরীচখানি দিল; নিজের হাতে সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীনটি রাখিল। তাহারা উভয়ে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের ভিতর দিয়া পূর্বদিকের প্রাচীর লক্ষ্য করিয়া চলিল।

ঘনান্ধতমোময়ী রাক্ষসী নিশা, নরপ্রেত ফুলসাহেবের ও রাক্ষসী জুমেলিয়ার সহায়তায় আরও ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে

সেই রাত্রি।

প্রলয়ঙ্করী মূর্তি ধরিয়া তখন সেই মেঘচ্ছায়ান্ধকারভীষণা রাত্রি সমস্ত জগৎ বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছে। প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে এবং ঝটিকাসংক্ষুব্ধ প্রকাণ্ড গাছগুলো মাতৃহারা দৈত্যশিশুর মতো বিকটরবে মর্মকাতরতা দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত করিতেছে; রূপকথার রাজ-অতিথি ছদ্মবেশী নিশীথে কর্তব্যপরায়ণ বুভুক্ষিত রাক্ষসের মতো ঝড় বিকট গর্জন করিয়া ছুটিতেছে। সেই প্রবল ঝড়ের সহিত মিলিয়া, কৃষ্ণ, নিবিড়, ছিদ্রশূন্য, অকাতরবর্ষণসচেষ্ট বৃষ্টি মেঘ—ও একটা তুমুল বিপ্লবের মধ্যে ফেলিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে একটা পৈশাচিক তাণ্ডবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

এমনসময়ে জেলখানার ভিতরে পূর্বদিককার অত্যুচ্চ প্রাচীরের কিঞ্চিদ্দূরে একটা বটগাছের তলে দাঁড়াইয়া, ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া, কাহারও মুখে কথা নাই—উভয়েই চিন্তামগ্ন। এখন কোনও রকমে এই শেষ বাধা অতিক্রম করিতে পারিলেই, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ হইতে পারে। প্রত্যেক দিকের প্রাচীরের উপরে সশস্ত্র প্রহরীরা নতশিরে দ্রুতপদে ফিরিতেছে। মস্তকের উপরে অনবরত ধারাপাত হইতেছে, ভীষণ ঝটিকায় তাহাদিগকে পতনোন্মুখ করিতেছে; তথাপি প্রভুভক্ত তাহারা কর্তব্যপরাঙ্মুখ নহে। এক-একবার গগনভেদী 'জুড়িদার হো' শব্দে পরস্পর-পরস্পরের অস্তিত্বের প্রমাণ লইতেছে।

এখন সকল কয়েদীই যে-যাহার ঘরে আবদ্ধ। সারাদিনের অস্থিভেদী উৎকট পরিশ্রমের পর তাহাদিগের এখনও যে কেহ জাগিয়া আছে, এমন বোধ হয় না; তথাপি প্রহরীরা আজ এত সাবধান কেন? কেবল সেই শঠ-শিরোমণি ফুলসাহেবের জন্যই তাহারা ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া, আজ এই

দুর্যোগেও কর্তব্যভ্রষ্ট হওয়া অনুচিত বোধে প্রাচীরের উপর সতর্কচিত্তে সত্বরপদে পরিক্রমণ করিতেছে।

এমন সময়ে জেলখানার ঘড়িতে একটা বাজিল। যে-প্রহরী পূর্বদিকে প্রাচীরের উপর পরিক্রমণ করিতেছিল, সে অভ্রভেদীকণ্ঠে হাঁকিল, 'জুড়িদার ভেইয়া হো।' প্রতিধ্বনির ন্যায় সেইসঙ্গেই বহুদূরে—অপর দিক হইতে পরবর্তী প্রহরী তীব্রতরকণ্ঠে হাঁকিল, 'জুড়িদার ভেইয়া হো।' তাহার পর একদিক হইতে অপর একদিকে—এইরূপ চারিদিকে 'জুড়িদার ভেইয়া হো' শব্দে বহুদূর পর্যন্ত সেই মেঘকৃষ্ণ নৈশগগন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শুনিয়া ফুলসাহেব একবার হাসিল; হাসিয়া বলিল, 'জুমেলা, আমি ঠিক সময়েই আসিয়াছি। এখন গোরাচাঁদ যদি নিজের কর্তব্য না ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্রই আমরা মুক্ত হইব। কাল হইতে অরিন্দম পলাতক কয়েদীর অনুসন্ধানে ফিরিবে।' শেষে শেষের দুই-একটি কথা ফুলসাহেবের মুখ হইতে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্যসর্পগর্জনবৎ বাহির হইল, তাহা কিছুতেই মনুষ্যের মুখনিঃসৃতের মতো শুনাইল না। যদি সেই অন্ধকারের মধ্যে কোনওরকমে ফুলসাহেবের মুখখানা তখন দেখা যাইত, তাহা হইলে পাঠক, দেখিতে পাইতেন, তখনও সেই দানবচেতার মুখে সেই অমঙ্গলজনক—বিভীষিকা ও মৃদুতার অপূর্ব সংমিশ্রণে অপূর্ব রহস্যপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ অশুভসূচক ভীতিপ্রদ হাসি লাগিয়াছিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে, সংযত নিশ্বাসে ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া, ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রাচীরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে প্রহরী তিমিরে অনন্যকায় তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে তাহাদিগের মাথার উপর দিয়া একদিক হইতে অপরদিকে চলিয়া গেল। প্রহরী অনেক দূরে চলিয়া গেলে ফুলসাহেব একখণ্ড ক্ষুদ্র ইষ্টক লইয়া প্রাচীর-গাত্রে ধীরে-ধীরে আঘাত করিল। তাহার পর প্রাচীরের উপর কান পাতিয়া দিল। তখন বাহির হইতে আবার সেইরূপ আঘাতের মৃদু শব্দ হইল। শুনিয়া অতি সাহসে ফুলসাহেবের বুক ফুলিয়া উঠিল এবং মুখ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইল। ফুলসাহেব আবার সেইরূপ শব্দ করিল। জুমেলিয়াকে বলিল, 'গোরাচাঁদ ভুলে নাই, সে-ই আসিয়াছে—আর ভয় করি না; একবার কোনওরকমে প্রাচীরটা ডিঙাইতে পারিলে হয়; তখন একবার অরিন্দম আর যোগেন্দ্রনাথকে ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিব, ফুলসাহেবকে ঘাঁটাইয়া ভালো কাজ করে নাই। আরও তাহারা দেখিবে ফুলসাহেব কেমন করিয়া অতি সহজে তাহার প্রতিজ্ঞা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে পারে। তাহারা ফুলসাহেবকে এখনও চেনে নাই, তাই তাহাদের মূর্খতা সীমা অতিক্রম করিয়া একেবারে এতদূর উঠিয়াছে।'

জুমেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'গোরাচাঁদ এখন কী উপকার করিবে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।'

ফুলসাহেব সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিল, 'আমি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম, যদি আমি কখনও জেলের ভিতর আটক পড়ি, সে যেন প্রত্যহ রাত্রে—রাত একটার পর এইদিকে প্রাচীরের উপর একগাছি দড়ি ঝুলাইয়া দেয়।'

বলিতে-না-বলিতে নৌকা বাঁধিবার কাছির মতো মোটা একগাছি দড়ি উপর হইতে তাহাদিগের নিকট ঝপ্ করিয়া পড়িল। ফুলসাহেব সেই দড়িটি ধরিয়া সাধ্যমতো জোরে একটা টান দিল, দড়ির অপর প্রান্ত বাহিরের দিকে ছিল, বাহির হইতে সেইরূপ একটা টান পড়িল। তখন ফুলসাহেব নিকটস্থ কোনও বৃক্ষের মূলে দড়িটা বাঁধিল; তাহার পর জুমেলিয়াকে কোমরের কাপড় আঁটিয়া ধরিতে বলিয়া জুমেলিয়াকে লইয়া ধীরে-ধীরে সেই দড়ি ধরিয়া উঠিতে লাগিল। জুমেলিয়া ফুলসাহেবের কটিদেশ দুই হাতে দৃঢ়রূপে বেষ্টন করিয়া, প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া প্রথমে ধীরে-ধীরে—তারপর দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—আরও দ্রুত—উপরে উঠিতে লাগিল। যখন সেই অত্যুচ্চ প্রাচীরের ঊর্ধ্বসীমার সন্নিকটস্থ হইয়াছে—তখন যে-প্রহরী প্রাচীরের উপরে পাহারা দিতেছিল, সে অপরদিক হইয়া সত্বরপদে ফিরিতেছিল।

ফুলসাহেবের মাথা ঘুরিয়া গেল। ভয় হইল, এইবার এইখানেই বুঝি তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। ঘাটের নিকটস্থ হইয়া যদি নৌকা ডুবিয়া যায়, তাহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কী হইতে পারে! এইবার এই বুঝি, প্রথমবার ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিল, চিরহাস্যময় মুখখানি হাস্যশূন্য হইয়া শুকাইয়া গেল। তখন একহস্তের উপর নিজের ও জুমেলিয়ার দেহভার বহন করিয়া অপর হস্তে কটিদেশ হইতে সেই বন্দুকের সঙ্গীনটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল। সেইরূপ অবস্থায় একগাছি দড়ির উপর নির্ভর করিয়া, একহস্তে দুইটি দেহভার বহন করিয়া এক মুহূর্ত অতিবাহিত করা যতদূর কষ্টকর ব্যাপার আমরা মনে করিতেছি, ফুলসাহেব যেরূপ অসীম ক্ষমতাশালী, তাহাতে ইহা তাহার নিকটে একটা কঠিন কর্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। তাহার মনে ভয় হইতেছিল, পাছে প্রহরী সেই দড়িগাছটি দেখিতে পায়। যদি অন্ধকারে দেখিতে না পায়, যাইবার সময়ে যদি তাহার পায়ে ঠেকে, তবে কী হইবে? তাহা হইলে—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীনটা প্রহরীর বুকে সমূলে বসাইয়া দিবে—তাহার পর যাহা অদৃষ্টে থাকে, তাহাই হইবে। একান্ত অকর্মণ্য বা নিশ্চেষ্টের ন্যায় বন্দী হওয়া নিতান্ত কাপুরুষতা। এইরূপ ভাবিয়া ফুলসাহেব সেই তীক্ষ্ণমুখ সঙ্গীনহস্তে প্রহরীর—কেবল প্রহরীর নহে, একটা আশু বিপদের—একটা ভয়ানক দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

নিজের অসাবধানতার জন্যই হউক বা ফুলসাহেবের সৌভাগ্যবশতই হউক, প্রহরী সেই দড়িটি দেখিতে পাইল না—পায়েও ঠেকিল না। সে সেই দড়িগাছটি পার হইয়া অপর দিকে অগ্রসর হইল।

পথ পরিষ্কার হইল। ফুলসাহেব তখন সেই সঙ্গীনটা দন্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিল। আর বেশি দূর উঠিতে বাকি ছিল না; এখন পাঁচহাত উঠিতে পারিলেই প্রাচীরের উপরিভাগে উপস্থিত হওয়া যায়। দুই-তিনবার হস্ত-চালনায় ফুলসাহেব প্রাচীরের উপরে উঠিয়া সেইরূপ অপর পার্শ্বে অবতরণ করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপ ফুলসাহেবের কটিদেশে সংলগ্ন রহিল।

অনেকদূর নামিয়া যখন আর দুই-তিনহাত মাত্র নামিতে বাকি আছে, তখন ফুলসাহেব লাফাইয়া ভূতলে পড়িল ; যেখানে পড়িল, সেখানে একটা ইষ্টকস্তূপ ছিল ও তদুপরি কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছিল। সেখানে লাফাইয়া পড়িতে ইষ্টকখণ্ডগুলি পরস্পরে ঠেকিয়া এবং আগাছাগুলির শুষ্ক শাখা-প্রশাখা ভাঙিয়া একটা শব্দ হইল। তেমন বেশি শব্দ না হইলেও শব্দটা প্রহরীর কানে গেল; সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। যেখানে শব্দ হইয়াছিল, সে স্থানটা নির্দেশ করিতে না পারিয়া, সেইখানে বসিয়া ঝুঁকিয়া নিম্নভাগে সতর্কদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। নিচে যেরূপ অন্ধকার, সেখানে দৃষ্টি চলে না; তথাপি প্রহরী সন্দিগ্ধমনে সেইরূপভাবে সেখানে বসিয়া, ঝুঁকিয়া পড়িয়া দৃষ্টিশক্তির উপরে সাধ্যমতো বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। নিচে যেমন অন্ধকার, উপরের উন্মুক্ত স্থানে সেরূপ নহে; ফুলসাহেব সেইখানে অদৃশ্য অবস্থায় থাকিয়া প্রহরীকে বেশ দেখিতে পাইতেছিল এবং তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার অভিপ্রায়টিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ প্রহরী-হত্যা

ফুলসাহেব আবার নিঃশব্দে উঠিতে লাগিল। আবার প্রাচীরের উপরে উঠিল। উঠিয়া প্রহরীর দিকে অগ্রসর হইল। একহাতে সেই শাণিত সঙ্গীন। নিঃশব্দে প্রহরীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল। প্রথম সুযোগেই বামহস্তে প্রহরীর গলদেশ সম্মুখদিক হইতে সবলে চাপিয়া ধরিল। প্রহরী একটিও শব্দ করিতে পারিল না; তৎক্ষণাৎ তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রহরীকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া ফুলসাহেব অপর হস্তে সেই সঙ্গীনটা প্রহরীর বুকে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। প্রহরী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। প্রহরীর হস্তপদাদির উৎক্ষেপে প্রাচীরগাত্রে দুম-দুম করিয়া শব্দ হইতেছে দেখিয়া, ফুলসাহেব বামহস্তে

তাহার গলদেশ ধরিয়া শূন্যে লম্বিতভাবে ঝুলাইয়া ধরিল, আর অপর হস্তে তাহার বক্ষে সেই তীক্ষ্ণাগ্র কিরীচ দিয়া সবলে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। প্রহরীর বক্ষোনিঃসৃত রক্তধারা বৃষ্টিজলের সহিত মিশিয়া প্রাচীর প্লাবিত করিতে লাগিল।

তখন ফুলসাহেবের সেই ভ্রূকুটিকুটিলমুখে সেই ভীষণ অমঙ্গলময় মৃদুতায় তীব্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। ফুলসাহেব মনুষ্যের মূর্তি ধরিয়া পিশাচ—এ-পিশাচে সকলই সম্ভব!

অনতিবিলম্বে প্রহরী মরিল। ফুলসাহেব তাহাকে সেই প্রাচীরের উপরে শোয়াইয়া দিল। তাহার বুক হইতে সঙ্গীনটা খুলিয়া লইয়া, তাহারই রক্তসিক্ত পরিচ্ছদে ভালো করিয়া মুছিয়া লইল। প্রহরীর কোর্তার ভিতরে একটা কিরীচ ছিল, সেটি বাহির করিয়া লইল। তাহার পর দ্রুতগতিতে সেইরূপ দড়ি বাহিয়া নিঃশঙ্কমনে নামিয়া আসিল।

নিচে নামিয়া আসিলে গোরাচাঁদ তাহার সম্মুখে একটা কাপড়ের বুঁচকি ফেলিয়া দিল। ফুলসাহেব বেশ পরিবর্তন করিয়া গোরাচাঁদকে বলিল, 'তুমি এখন এইখানে থাকো; কোথায় কী হয়—কাল আমাকে খবর দিবে—আমি এখনই জুমেলিয়াকে লইয়া পলাশীর বাগানে, সেই বাগান-বাড়িতে চলিলাম। সেইখানে দেখা করিয়ো, দেখা হইবে।'

গোরাচাঁদ বলিল, 'এখন যেরূপ স্রোতের টান—গঙ্গা যেরূপ কূলে-কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, কী করিয়া পার হইয়া যাইবেন? আপনি যদিও পারেন; কিন্তু জুমেলিয়াকে লইয়া কীরূপে পার হইবেন?'

ফুলসাহেব বিরক্তভাবে বলিল, 'সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না—আমার কাজ আমি বুঝি, তোমাকে যাহা বলিলাম, তুমি তাহা করো, এখন আর বেশি কথা কহিবার সময় নাই।'

'যে আজ্ঞা,' বলিয়া গোরাচাঁদ তথা হইতে চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ গঙ্গাবক্ষে

সম্মুখে গঙ্গা—বর্ষাকালে কূলে-কূলে পূর্ণ হইয়া অগাধ জলরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। ফুলসাহেব জুমেলিয়াকে লইয়া গঙ্গাতটে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝড়বৃষ্টিতে জলস্রোত দ্বিগুণবেগে—প্রচণ্ডরূপে তরঙ্গায়িত হইয়া শৃঙ্খলছিন্ন উন্মত্তের ন্যায় উধাও হইয়া ছুটিতেছে। সশব্দে সবেগ তরঙ্গ তটে ঘন-ঘন প্রহৃত হইতেছে। গাঢ় কৃষ্ণ মেঘের ছায়ায়, ঘনীভূত অন্ধকারের ছায়ায়—বিমল-শুভ্র গঙ্গাবক্ষ মসীময় হইয়া উঠিয়াছে। সেই মসীময় অন্ধকারমাত্রাত্মক গঙ্গাবক্ষে সহস্র বিভীষিকা একসঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে—এখানে অশ্রান্ত জল গর্জিতেছে—সেইসঙ্গে উন্মত্ত বায়ু গর্জিতেছে—সেইসঙ্গে অনবরত বর্ষণশীল মেঘ গর্জিতেছে—তিন গর্জনে মিলিয়া ধরণীর বিপুল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া সেই তৃণটি-পড়িলে-খণ্ড-বিখণ্ডকারী স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। উভয়েই সন্তরণপটু; তরঙ্গ ভাঙিয়া, স্রোত কাটিয়া, উভয়ে সন্তরণ করিয়া অপর তটাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। স্রোতের বেগ তাহাদিগকে পথ হইতে নিজের পথে অনেকটা করিয়া টানিয়া লইতেছিল। মাঝখানে গিয়া জুমেলিয়ার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল—সে আর সাঁতার দিতে পারে না। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া, তাহার মুখের উপর পড়িয়া তাহাকে একান্ত কাতর করিয়া তুলিল। সে স্রোতের মুখে পড়িয়া ফুলসাহেবের নিকট হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িল। ফুলসাহেব গিয়া তাহাকে ধরিল। বলিল, 'তুমি আমার কোমরে ভর দিয়া এসো।' জুমেলিয়া দুই হাতে ফুলসাহেবের কটির বসন ধরিল। ফুলসাহেবেরও হস্তপদাদি ক্রমশ অবশ হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে জুমেলিয়াকে লইয়া সন্তরণ করিতে তাহার কষ্টবোধ হইতে লাগিল। সন্তরণে পূর্বের ন্যায় বলপ্রয়োগ করিতে না পারিয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল, সেইরূপ অবস্থায় প্রাণপণ চেষ্টায় একটু করিয়া তটের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে ফুলসাহেব অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল—ঘন-ঘন

নিশ্বাস বহিতে লাগিল—তরঙ্গাঘাতে চোখে-মুখে জল ঢুকিতে লাগিল। অনেকদূরে আসিয়াছে—তট আর বেশি দূর নহে—কোনওরকমে আর এইটুকু যাইতে পারিলে হয়; কিন্তু সেখানে মাঝখানের অপেক্ষা টান বেশি; সেখানে ফুলসাহেবের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইতে লাগিল। তাহাকে প্রবলবেগে একদিক হইতে অপরদিকে টানিয়া লইয়া চলিল। ফুলসাহেব কিছুতেই একহাতমাত্রও আর অগ্রসর হইতে পারিল না; বারংবার বলপ্রয়োগে হাত দুখানা তখন একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল; ফুলসাহেব ভাসিয়া চলিল। অনেকদূরে ভাসিয়া গিয়া ফুলসাহেব একটা আশ্রয় পাইল। একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ তট হইতে জলের দিকে অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল; তাহার প্রকাণ্ড শাখা হইতে অনেকগুলি শিকড় জলের উপরে পড়িয়া লুটাইতেছিল; সেই শিকড় অবলম্বন করিয়া ফুলসাহেব সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। জুমেলিয়া সেইরূপভাবে তাহার পৃষ্ঠে সংলগ্ন রহিল। প্রবল জলস্রোত তাহাদিগকে অবলম্বনচ্যুত করিবার জন্য বারংবার সবেগে ধাক্কা দিয়া দূরে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দৃঢ়মুষ্টিতে সেই শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব একপ্রকার বিশ্রাম করিতে লাগিল। এখন একবার যদি হাত ছাড়িয়া যায়—ফুলসাহেব যেরূপ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতে সেই তরঙ্গায়িত ফেনিল জলরাশি তাহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া ফেলিবে, কে জানে? হয়তো তাহাতে জুমেলিয়াকে হারাইতে হইবে—এমনকী তাহাতে তাহারও জীবনের শেষ হইতে পারে। অবসন্ন হস্ত যেন ছিঁড়িয়া পড়িতেছে; তথাপি প্রাণপণে ফুলসাহেব সেই শিকড় ত্যাগ করিল না। বিশেষত, অদূরে একটা ঘূর্ণাবর্ত—সেখানে জল গর্জিতেছিল—ঘুরিতেছিল—উথলিতেছিল। উথলিয়া একপাশ দিয়া চর্তুগুণ বেগে ছুটিতেছিল। ফুলসাহেব বুঝিয়াছিল, যদি একবার হাত ছাড়িয়া যায়, তাহা হইলে স্রোতের মুখে তাহাদিগকে সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িতে হইবে; সেখানে পড়িলে জীবনের আশামাত্র থাকিবে না।

এমন সময়ে নিকটস্থ তটভূমির নিবিড়তম অন্ধকারের ভিতর হইতে প্রাকৃতিক তুমুল বিপ্লবের তীব্রতর কোলাহল ভেদ করিয়া নারীকণ্ঠ নিঃসৃত খল-খল তীব্রতম হাস্যধ্বনি সম্মুখস্থ অনন্ত বারিরাশি কাঁপাইয়া গঙ্গার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পার হইয়া, ঝড়ের বেগে বহিয়া, দূর দিগন্তে গিয়া মিলাইয়া গেল। সেই অট্টহাস্যের অতি তীব্রতায় চরাচর যেন পরক্ষণেই ক্ষণেকের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই নিভৃত বিপুল বিজনতার মধ্যে, এই তারাহীন, চন্দ্রহীন, মেঘময়, অন্ধকারময় গভীর নিশীথের ভীষণতার মধ্যে দাঁড়াইয়া সর্পসঙ্কুল দীর্ঘ-তৃণপরিব্যাপ্ত সিক্ত তটভূমিতে কে এ উন্মাদিনী, উদ্দাম ও প্রবল হাস্যের বেগ কিছুতেই বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে পারিতেছে না?

ক্ষণপরে সেইরূপ অট্টহাসির সহিত স্ত্রীকণ্ঠে কে বলিল, 'কি গো, প্রাণনাথ, কেমন আছ? এ দাসীকে কি এখনও মনে পড়ে?'

কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল; শুষ্কমুখ আরও শুকাইয়া গেল; দেহে যেটুকু বল ছিল, তাহা অন্তর্হিত হইল। সে-স্বর তাহার বহুদিনের পরিচিত—সেই মোহিনীর। যেখান হইতে মোহিনী এই প্রশ্ন করিল, সেইদিকে ফুলসাহেব ভ্রূকুটিসঙ্কোচ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। দেখিল, তটের উপরে সেই বটবৃক্ষের তলে অত্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে এক নারীমূর্তি একখানি অনৃজু দীর্ঘ ছুরিকাহস্তে দাঁড়াইয়া। অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে পারা গেল না; কিন্তু সে যে রাক্ষসী মোহিনী ছাড়া আর কেহই নহে—সে-বিষয়ে ফুলসাহেবের মনে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেই অন্ধকারের নিবিড়তার মধ্যে তাহার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকার অপেক্ষা তাহার উজ্জ্বল বড়-বড় চক্ষুদুটি ধক-ধক করিয়া বেশি জ্বলিতেছিল; তন্মধ্য হইতে প্রতিক্ষণে অমানুষিক ঈর্ষার অনলকণারাশি—জ্বলন্ত অন্তর্দাহের একটা ভীষণোজ্জ্বল দীপ্তিশিখা ও অতিশয় রোষতীব্রতা বিকীর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

দেখিয়া ফুলসাহেবের ভয় হইল। ভীতহৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, 'এখানে—এমনসময়ে—মোহিনী, তুমি কোথা হইতে আসিলে?'

মোহিনী বলিল, 'অনেক দূর হইতে। কেন আসিয়াছি, শুনিবে? শোনো, তুমি তোমার

প্রিয়তমাকে লইয়া জলকেলিতে কেমন মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছ, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।' বলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেরূপ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। সেই বিদ্রূপব্যঞ্জক অভ্রভেদী হাস্যধ্বনি গুরুগম্ভীর বজ্রনাদ ভেদ করিয়া, ঝটিকাগর্জন ভেদ করিয়া, অশ্রান্ত জলকল্লোল ভেদ করিয়া অনেক দূর পর্যন্ত উঠিল—অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল—ফুলসাহেবেরও কম্পিত, অবসন্ন হৃদয়ে প্রবলবেগে একটা দুঃসহ আঘাত করিল। তখন মোহিনী গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, 'বিনোদ, এখন কী হয়? এখন একবার সমস্ত জীবনের অশেষ পাপের কথা মহিমময়ী গঙ্গার সুশীতল অসীম পুণ্য-প্রবাহের মধ্যে দাঁড়াইয়া মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি, একটা অতি দুর্বল, ক্ষীণতম নারীহৃদয় সহস্র প্রলোভনের মধ্যে লইয়া গিয়া শেষে অক্ষালনীয় কলঙ্কের মধ্যে চির-বিসর্জন? আরও মনে পড়ে কি বিনোদ, একটি মুগ্ধা, সহজে প্রলুব্ধা, কর্তব্যহীনা, জ্ঞানহীনা, বিমূঢ়া অবলাকে সংসারের সহস্র স্নেহবাহুর দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, অপরিমেয় পবিত্রতা হইতে বিচ্যুত করিয়া, অগাধ-অসীম-অনন্ত-অভ্রান্ত ভালোবাসার স্বর্গীয়সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, চিত্রবিচিত্র স্নিগ্ধচ্ছায়াময় যবনিকার সূক্ষ্ম আবরণ হইতে উন্মুক্ত করিয়া নারী-জীবনের প্রিয়তম রত্ন—সকল সৌন্দর্যের সার—সকল পবিত্রতার কেন্দ্র—সকল ঐশ্বর্যের ঐশ্বর্য—সকল সুষমার ঔজ্জ্বল্য—সেই সতীত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অসহায় অবস্থায় উত্তপ্ত বালুকাময় দিগ্‌দিগন্তশূন্য, কর্কশতায় পরিশুষ্ক মরুভূমির স্নেহহীনতার মধ্যে—মমতা-হীনতার মধ্যে—প্রেম-পরিশূন্যতার মধ্যে চির-নির্বাসন? সে-সকল আজ মনে পড়ে কি? তাহার পর আবার লোভে পড়িয়া, তুমি একজন মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করিয়া জাতি ও ধর্মভ্রষ্ট হইলে; শেষে স্ত্রীর পৈতৃক বিষয় হস্তগত করিবার জন্য স্বহস্তে স্ত্রীহত্যাও পর্যন্ত করিয়াছ। একটি কন্যা হইয়াছিল, তাহাকেও গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়াছ—তোমার মুখ দেখিলেও পাপ আছে। তুমি কি মনে করিয়াছ, বিনোদ! এই সকল পাপের ফল তুমি কখনও এড়াইতে পারিবে? কখনও নয়। এখনও দিন রাত হয়—চন্দ্র-সূর্য উঠে—বায়ু বহে—এখনও বিশ্বেশ্বরের পবিত্র সিংহাসনতলে পাপপুণ্যের বিচার হয়।'

বলা বাহুল্য প্রথম পরিচ্ছেদোক্ত মোহিনীর সেই বিনোদ আর ফুলসাহেব একই ব্যক্তি। যৌবনে ফুলসাহেবের বিনোদ নাম ছিল, সেই সময়েই বিধবা মোহিনী আপনা হারাইয়া প্রাণ দিয়া তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল। তখন মোহিনীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে পাপ-লালসার বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এখন তাহাতে বিষময় ফল ধরিয়াছে। সে-সকল ঘটনার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমাদিগের আখ্যায়িকার প্রারম্ভেই মোহিনীর মুখেই সে-সকল কাহিনীর অনেকটা অবগত হইতে পারিয়াছি। এক্ষণে মোহিনী হতাশ হইয়া, ফুলসাহেব কর্তৃক শৃগাল-কুক্কুরের ন্যায় পরিত্যক্তা হইয়া, সমাজ-বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, দুর্বিষহ ক্রোধে, ঈর্ষায়, দ্বেষে মরিয়া—উন্মাদিনী। সে এখন কোনওরকমে ফুলসাহেবকে এ-জগৎ হইতে বিদায় করিতে পারিলে, তাহার নাম জীবিত মনুষ্যের তালিকা হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে তবে তৃপ্তচিত্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারে। তাহার বুকের ভিতরে রুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া একটা যে-প্রতিহিংসা মণিহারা ফণিনীর ন্যায় আপনা-আপনি দংশন করিয়া আপনার বিষে আপনি জ্বলিয়া, দিবারাত্র গর্জন করিয়া কুণ্ডলীকৃত হইতেছিল, সে ফুলসাহেবকে যতক্ষণ না দংশন করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হইতে পারিতেছে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সর্পিণী ও সর্পিণী

ফুলসাহেব মোহিনীর কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাহার পর বলিল, 'সে-সকল কথা এখন কেন? মোহিনী! এখন আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে রক্ষা করো; তোমার অঞ্চলটা ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আমার জীবনরক্ষা হয়; এখানকার জলের টান এত অধিক, কিছুতেই আমি উঠিতে পারিতেছি না। এরূপ অবস্থায় আর এক মুহূর্তও কাটে না—বড় কষ্ট হইতেছে। একবার

হাত ছাড়িয়া গেলে, সম্মুখের দহে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে। মোহিনী! বাঁচাও—রক্ষা করো—আমি এখন বড়ই বিপন্ন! এরূপভাবে আর মুহূর্তও থাকিতে পারিতেছি না।'

'এরূপভাবে যাহাতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে না হয়, তাহার উপায় করিতেছি,' বলিয়া মোহিনী সেই বটশাখার উপর একটি শিকড় ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যে-শিকড় ধরিয়া ফুলসাহেব অতিকষ্টে জীবনটাকে মৃত্যুর মুখ হইতে এতক্ষণ তুলিয়া রাখিয়াছিল, তদুপরি ছুরিকার আঘাত করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, 'সর্বনাশ! মোহিনী, তুমি কী করিতেছ, আমাকে জলে ডুবাইয়া মারিয়ো না—রক্ষা করো—বাঁচাও—মোহিনী, আমাকে ক্ষমা করো—বাঁচাও!'

মোহিনী সহাস্যে বলিল, 'তোমার অপরাধের ক্ষমা নাই—থাকিলে করিতাম। এমন এক বাণে দুটি পাখি মারিবার লোভ কি সহজে ত্যাগ করা যায়, বিনোদ? তোমাকে জলে ডুবাইয়া কি, যদি তোমাকে পুড়াইয়া মারিতে পারিতাম, তাহা হইলে আরও সুখী হইতাম।' সেইরূপ ভাবে মোহিনী আবার শিকড় ছেদন করিতে লাগিল।

ফুলসাহেব ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রাণভয়ে, প্রাণপণে, কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, 'মোহিনী! এখনও—এখনও এ-সঙ্কল্প ত্যাগ করো—এখনও বাঁচাও—এখনও রক্ষা করো—আমি করজোড়ে তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি, দয়া করো—ক্ষমা করো—'

বাধা দিয়া মোহিনী রোষতীব্রকণ্ঠে বলিল, 'কিসের দয়া—কিসের ক্ষমা? পাপী তুমি—তোমার মৃত্যু এ-জগতে বাঞ্ছনীয়। পাপী, পিশাচ, তুমি যে গঙ্গার পবিত্র জলে মরিতে পারিতেছ, ইহা একটা তোমার মতো নারকীর পরম সৌভাগ্য বিবেচনা না করিয়া কাতর হইতেছ? ধিক তোমায়!' মোহিনী পূর্ববৎ ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ের উপর আঘাতের উপর আঘাত করিতে লাগিল।

আসন্নবিপদে নিরুপায় হইয়া ফুলসাহেব আত্মহারা হইয়া উঠিল—মাথা ঘুরিয়া গেল। আঘাতপ্রাপ্ত স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল, 'মোহিনী—পিশাচী—রাক্ষসী—এখনও কথা রাখ—যদি কোনওরকমে বাঁচিতে পারি, ইহার সমুচিত প্রতিফল পাবি। ফুলসাহেবের হাত হইতে কখনওই রক্ষা পাইবি না।'

উন্মাদিনী মোহিনী ছুরিকা চালনায় পূর্ববৎ তৎপর থাকিয়া বলিল, 'এখন নিজেকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করো; ইহার পর আমার ভাবনা ভাবিবার অনেক অবসর পাইবে। পিশাচ, তুমি কতদিন প্রসন্নমুখে কত নিরপরাধের প্রাণ লইয়াছ; তোমার বিষে—ছুরিতে কত লোকের প্রাণ এ-পৃথিবী হইতে চির-বিদায় লইয়াছে, তাহাদের যন্ত্রণাময় মৃত্যু হাসিমুখে দেখিয়াছ। আর আজ তুমি কিনা, এতবড় একটা বীরপুরুষ হইয়া নিজের মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইতেছ? মৃত্যু তো নিশ্চয়ই একদিন হইবে, এখন আর ইহার পর—ইহার জন্য এত কাতরতা? ছিঃ—ছিঃ! তোমাকে এত শীঘ্র মারিবার আরও একটা প্রয়োজন—বড় দুঃখের বিষয়, কিছুতেই আমি তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তা যদি পারিতাম, তোমাকে এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে আসিতাম না। তোমাকে না মারিয়া আমি কিছুতেই মরিতে পারিতেছি না; এ-জগতে তোমাকে পাইলাম না। দেখি, তোমাকে মারিয়া তাহার পর আমি নিজে মরিয়া পর-জগতে—তা নরকেই হোক—আর যেখানেই হোক—তোমার সহিত মিলিত হইতে পারি কি না। দেখি, যে-ভাবে প্রথম একবার দেখা দিয়েছিলে, সেইভাবে তোমাকে পাই কি না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'মোহিনী, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার উপরে আমি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। আমাকে বাঁচাও—আবার আমি তোমারই হইব—সেইরূপ তোমাকে ভালোবাসিব।'

হাসিয়া মোহিনী বলিল, 'বিনোদ, আর ভুলাইতে চেষ্টা করিয়ো না। একবার ভুলিয়া নিজের মাথা নিজে খাইয়াছি। তুমি কি মনে করো, তোমার মতো একটা প্রতারকের কথায় মোহিনী আবার ভুলিবে? এ এখন আর সে-মোহিনী নাই—এ এখন তোমার ভালোবাসা চাহে না, তোমার আদর

চাহে না, তোমার স্নেহসিক্তস্বরের সুমধুর আলাপ চাহে না; চাহে তোমার রক্ত, তোমার মৃত্যু, তোমার পাপদেহ পদতলে দলিত করিতে। বড়ই দুঃখের বিষয় বিনোদ, সে-মোহিনীর এমনই একটা অসম্ভব পরিবর্তন ঘটিয়া গেছে।'

ফুলসাহেব তখন হতাশ হইয়া মর্মভেদীস্বরে বলিল, 'মোহিনী! পিশাচী—রাক্ষসী—কিছুতেই তোর দয়া হইল না!'

বিদ্রূপ করিয়া মোহিনী কহিল, 'রাক্ষসীর কাছে, পিশাচীর কাছে দয়াভিক্ষা করা তোমার যে একটা মস্ত ভুল, বিনোদ!'

জুমেলিয়া দেখিল, শিকড় দ্বিখণ্ড হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, অনতিবিলম্বে অদূরস্থ ঘূর্ণাবর্তের তিমিরময় গর্ভে তাহাদিগকে চির-আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এতক্ষণ নীরবে অন্তরস্থ শঙ্কার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল, আর থাকিতে পারিল না। একান্ত বিনীতভাবে স্নেহমধুর সম্বোধনে মোহিনীকে বলিল, 'ভগিনী, এ-বিপদে তুমি যদি আমাদিগকে দয়া না করো, আর কোনও উপায় নাই—'

বাধা দিয়া মোহিনী কহিল, 'চুপ কর, পিশাচী—মরিবার সময়ে আল্লার নাম নে—অনেক পাপ করিয়াছিস।'

জুমেলিয়া অপমানিত হইয়া শীঘ্র আর কোনও কথা কহিতে পারিল না। অপমানটা শক্তিশেলের মতো তাহার বুকে গিয়া বিঁধিল এবং বুকের ভিতরে তীব্রজ্বালাময় বিষ ঢালিয়া দিল। লাঙ্গুলাবমৃষ্ট সর্পিণীর ন্যায় সে গর্জন করিতে লাগিল। তাহার দীপ্তকৃষ্ণকায় চক্ষু দিয়া বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল! জুমেলিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া সরোষ-গর্জনে বলিল, 'যদি কোনওরকমে তোর কাছে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে এই পিশাচীর পরিচয় তোকে আজ ভালো করিয়া দিতাম; দেখতিস, এক পলকে কেমন করিয়া তোর রক্তাক্ত দেহ আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িত। দেখি, মরিতে বসিয়াও পিশাচী জুমেলিয়া তোর কোনও অপকার করিতে পারে কি না!'

এই বলিয়া জুমেলিয়া কটিদেশ হইতে মৃত প্রহরীর নিকটে প্রাপ্ত সেই কিরীচখানি লইয়া, সজোরে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। যে বামহস্তে শিকড় ধরিয়া মোহিনী নিজ দেহভার সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, সেই বামহস্তের মধ্যস্থলে কিরীচখানি আমূল বিদ্ধ হইয়া গেল। সেইসঙ্গে প্রবলবেগে রক্ত ছুটিতে লাগিল। মরিয়া উন্মাদিনী মোহিনী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া দ্বিগুণ উদ্যমে সেই শিকড় ছেদনে মনোনিবেশ করিল। তেমন আঘাতেও ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখে যন্ত্রণা-প্রকাশের কোনও চিহ্ন প্রকটিত হইল না। যেমনি নিরুদ্বিগ্ন, তেমনি অটল, স্থির ও অবিচলিতভাবে আপনার কর্তব্য কার্যে নিযুক্ত রহিল।

ফুলসাহেব দেখিল, মোহিনীর নিকটে তখন আর তিলমাত্র দয়ালাভের আশামাত্রও নাই; তখন সে মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া সেই বন্দুকের সঙ্গীনটা সজোরে ছুড়িয়া মারিল। অন্ধকারে লক্ষ্য ঠিক হইল না। সেটা সেই বটবৃক্ষমূলে সশব্দে—এত জোরে গিয়া পড়িল যে, কিয়দংশ তন্মধ্যে প্রোথিত হইয়া গেল।

মোহিনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অকৃতকার্য হইয়া ফুলসাহেব অবনতমস্তকে রহিল। মোহিনী তখন আরও জোরে ছুরিকা দিয়া সেই শিকড়ের উপরে আঘাত করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেই শিকড় দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। সেইসঙ্গে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়া প্রবল স্রোতের মুখে সবেগে ভাসিয়া গিয়া অদূরস্থ সেই ঘূর্ণাবর্তে পড়িল। দুই-একটা পাক খাইয়া অনন্ত জলরাশির মধ্যে তাহারা কোথায় বিলীন হইয়া গেল, আর দেখা গেল না।

তাহার পর জল সেইখানে পূর্ববৎ তেমনি ঘুরিতে লাগিল—তেমনি উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল এবং তেমনি গর্জন করিতে লাগিল; জল তেমনি অশান্ত, বেগবান, ঘূর্ণ্যমান, সশব্দ। তখন আর একবার মোহিনীর সেই অট্টহাস্য নৈশগগন কম্পিত করিয়া অনেকদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইল। দূর বনান্তের গঙ্গার অপর পারে তাহারই একটা প্রতিধ্বনি জাগিয়া ঝটিকা-গর্জনের সহিত, অবিরাম জলকল্লোলের সহিত মিশিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ শেষরাত্রে

সেই ঘটনাপূর্ণ রাত্রের কথা বলিতেছি।

যখন রাত দুইটা, তখন প্রহরী-সকল বদলি হইতে লাগিল। সুতরাং সেই পূর্বদিককার প্রাচীরের সেই নিহত প্রহরীর পরিবর্তে একজন প্রহরী সেইদিকে আসিল। সে যাহার বদলিতে আসিয়াছে, তাহাকে তথায় দেখিতে না পাইয়া বিস্মিত হইল। তাহার পর প্রাচীরের উপরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল। তথায় তাহার সম্মুখে, যাহাকে না দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহারই রক্তাক্ত শবদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া সে আরও বিস্মিত, স্তম্ভিত এবং ভীত হইল। দেখিল—বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত, কর্মঠ প্রহরী শতচ্ছিন্ন বক্ষে, অর্ধনিমীলিতনেত্রে, প্রাণহীন দেহে পড়িয়া। ভাবিয়া পাইল না—কে ইহাকে এমন নিষ্ঠুতার সহিত হত্যা করিল।

তখনও যে বৃষ্টি হইতেছিল না, তাহা নহে। তবে পূর্বাপেক্ষা বেগটা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ঝড়ের বেগও মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার কী হইল—মরিল কি উঠিল জানি না—তাহাদের দুইজনকে আর এই নিরীহ, নিরপরাধ, নিহত প্রহরী দুইজনকে গ্রাস করিয়া ক্ষুধাতুরা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী নিশা যেন কথঞ্চিৎ শান্ত ও সুস্থির হইতে পারিল। মেঘান্ধকারময় আকাশ এখনও পরিষ্কার হয় নাই; শীঘ্র যে হইবে, এমন সম্ভাবনাও নাই; এখনও তারা ঢাকিয়া, চন্দ্র ঢাকিয়া, কোমল নীলিমচ্ছবি ব্যাপিয়া মেঘ তেমনি পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তটিনীতীরবর্তী খদ্যোৎ-খচিত ঝিল্লিমন্দ্রিত সুদূরব্যাপী অরণ্যানী তেমনি বায়ুচঞ্চল হইয়া, আলোড়িত-বিলোড়িত হইয়া সেই অন্ধকারসমুদ্রে উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতেছে।

একটা যে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেই শোণিতাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া প্রহরীর বুঝিতে বাকি রহিল না। ফুলসাহেবকেই প্রথমে সে সন্দেহ করিল; কারণ এ-দুঃসাহসিকতা তাহাতেই সম্ভব। ফুলসাহেব বন্দি হওয়ায় এইরূপ একটা অবশ্যম্ভাবী দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়া কারাধ্যক্ষ হইতে প্রহরীরা পর্যন্ত পূর্ব হইতে সন্ত্রস্ত ছিল।

প্রহরীরা তখন ফিরিয়া গিয়া, সেখানে আর একজনকে মোতায়েন রাখিয়া ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে সংবাদ দিল। নিশ্চিন্ত জেলখানা পরিপূর্ণ করিয়া তখনই একটা ব্যাকুলতা, একটা অধীরতা সজীব হইয়া উঠিল। সর্বাগ্রে ফুলসাহেবের সন্ধান হইল—

সেখানে ফুলসাহেব নাই।

সে জুমেলিয়াও নাই।

প্রকোষ্ঠ শূন্য।

দ্বারসম্মুখে লক্ষেশ্বরের জীবনবিচ্যুত দীর্ঘদেহ ভূলুণ্ঠিত, নীরব এবং নিস্পন্দ। তখনই ফুলসাহেবের সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। থানায়-থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। শুনিয়া যত পুলিশের মস্তক অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল—যোগেন্দ্রনাথের মস্তক অধিকতর চঞ্চল হইল।

গ্রামের লোকেরা একদিনেই ফুলসাহেবের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিল; পরদিন প্রত্যূষে তাহার পলায়ন-কাহিনী সকলে সবিস্ময়ে শুনিল। শুনিয়া সশঙ্ক হইল, সাবধান হইল। পাছে গ্রামে আসিয়া ফুলসাহেব হঠাৎ কাহারও সর্বনাশ করে, এই ভয়ে সকলে উৎকণ্ঠিত হইল।

সকলেই একাগ্রমনে স্ব-স্ব ইষ্টদেবতার নিকটে কায়মনোবাক্যে তাহার পুনর্বন্দিত্ব প্রার্থনা করিতে লাগিল। কেহ মনে-মনে একেবারে তাহার ফাঁসিকাষ্ঠের আয়োজন করিতে লাগিল। সে যে জেলখানার তেমন অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে গিয়া পড়িয়া মরিল না—তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া, রেণু-রেণু হইয়া গেল না, সেজন্য দুই-চারিজন আন্তরিক আক্ষেপ করিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাসে বর্ষাপ্রভাতে শীতল বায়ু উষ্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রহরীর ছুরি ফুলসাহেবের বুকে না বিঁধিয়া, ফুলসাহেবের ছুরিখানা যে প্রহরীর বুকে বিঁধিয়াছিল এবং সেটা যে তেমন অন্ধকারে বিধাতারই একটা

মহাভ্রম ঘটিয়া গিয়াছিল, সেজন্যও আবার লঘুপাপে গুরুদণ্ডের বিধানে কেহ একেবারে বিধাতার মুখাগ্নির, কেহ দগ্ধ কচু ও রম্ভার, কেহ নিত্য-ব্যবহারে-অর্ধাংশ-ক্ষয়প্রাপ্ত পুরাতন সম্মার্জনীর, এমনকী কেহ-কেহ মৃত্যুর ব্যবস্থা করিয়া তবে কতকটা সন্তুষ্টচিত্ত হইতে পারিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রিশেষে

প্রত্যুষে যোগেন্দ্রনাথ অরিন্দমকে লইয়া জেলখানায় আসিলেন। ফুলসাহেবের একরাত্রের কার্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিয়া পাইলেন না, কেমন করিয়া, কোন কৌশলে দানব ও দানবী দুইজন প্রহরীকে খুন করিয়া, একমাত্র দড়ির সাহায্যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। বহির্জগতের একজনের সাহায্য ব্যতীত যে, কখনওই এতটা ঘটিতে পারে না, তাহা অরিন্দম অনুভবে বুঝিতে পারিলেন। অমানুষিক সাহসের জন্য, অমানুষিক বুদ্ধির জন্য, অমানুষিক বিক্রমের জন্য, অমানুষিক কৌশলের জন্য, আরও সেই প্রাচীরের উপস্থিত প্রহরীকে যেরূপ অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে, সেজন্য ফুলসাহেবকে তিনি কিছুতেই মনুষ্য-তালিকা-ভুক্ত করিতে পারিলেন না, দানবদলভুক্তের সে যে একজন প্রধান বলিয়াই ধারণা হইতে লাগিল এবং মনে-মনে তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

সেই হাজতঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেই ফুলসাহেবের লিখিত ভিত্তিগাত্রের বৃহদক্ষরগ্রথিত সেই তিনটি পংক্তি সর্বাগ্রে অরিন্দমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মৃদুহাস্যে অরিন্দম বলিলেন, 'যোগেন্দ্রবাবু, শীঘ্রই আমি আবার ফুলসাহেবকে ধরিতে পারিব। সে নিরুদ্দেশ হইবে না, শীঘ্রই এ-গ্রামে আবার আসিবে।'

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?'

অরি। সে আমাকে খুন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে কী লেখা রহিয়াছে, একবার পড়িয়া দেখুন।

যো। তাই তো! কী ভয়ানক লোক! এমন লোক আমি আর দেখি নাই।

অ। দিন-রাত চোর-ডাকাত-খুনিদের সন্ধানে থাকিয়া আমার এ-বিষয়ে এমন একটা অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছে, বোধহয়, আপনিও তাহা জানেন। আমি তাহাদের বলবুদ্ধির পরিচয় প্রথম দর্শনেই অনেকটা বুঝিতে পারি; তা ফুলসাহেবকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে উহাকে আমার একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই আমার স্থির বিশ্বাস।

যো। ফুলসাহেবের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে আপনার মত কী?

অ। আমাকে দুই দিয়া গুণন অঙ্কে কষিয়া দেখিলে, আমার কী মত বুঝিতে পারিবেন।

যো। এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, অরিন্দমবাবু!

অ। শুনিয়াছি, এখানে অনেকেই আমাকে বলবান দেখিয়া আমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে দ্বিতীয় ভীম বলিয়া সে-কথার উপসংহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা যদি ফুলসাহেবের সম্যক পরিচয় পাইত, তাহা হইলে তাহাকে আসল ভীম বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না; ফুলসাহেব শারীরিক বলে আমার অপেক্ষা দ্বিগুণ বলিষ্ঠ।

যো। আর মানসিক বলে তাহাকে কীরূপে বুঝিয়াছেন?

অ। সে আমার সমতুল্য। তাহার বুদ্ধিমত্তা, কার্যতৎপরতা, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদিতে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যাই হোক, বুঝিয়াছি সহজে কিছুই হইবে না—একদিন আমি আবার তাহাকে যেমন করিয়া হউক, গ্রেপ্তার করিবই—সে কখনওই আমার হাত ছাড়াইয়া পালাইতে পারিবে না। সে আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী—তাহার জন্য আমি প্রাণপণ করিব।

যো। যদি সে এমনিই ভয়ানক লোক হয়, তবে এক কাজ করুন, আপনি একা আর এ-কাজে হাত দিবেন না; আপনার সাহায্য করিতে যেরূপ লোকবল আবশ্যক মনে করেন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

অ। না, সেটি হবে না—তা যদি আপনি বলেন, তবে আমি এ-কাজে হাত দিব না। আমি একাকী এ-কাজ হাতে লইয়াছি, একাকী এ-কাজের নিষ্পত্তি করিতে চেষ্টা করিব; সেজন্য আপনি কোনও আপত্তি করিবেন না।

যো। কিন্তু অরিন্দমবাবু—

অ। (বাধা দিয়া) ক্ষমা করুন, কিছুতেই তাহা হইবে না; আপনি যখন আমাকে কাজের ভার দিয়াছেন—যখন যা করিতে বলিয়াছেন, আমি কখনও আপনার কোনও কথা অস্বীকার করি নাই, সেজন্যও অন্তত আপনি একবার আমার অনুরোধ রাখিতে স্বীকৃত হন—যতক্ষণ না আমি পরিত্যাগ করি, ততক্ষণ যেন এ-কেস কেবল আমারই হাতে থাকে।

যো। আমার কথা রাখুন, অরিন্দমবাবু। ফুলসাহেব যে বড় সহজ লোক নয় তাহা তো আপনি জানেন।

অ। জানি বলিয়াই তো আপনার কথায় কিছুতেই সম্মত হইতে পারিতেছি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, যদি কখনও কোনওরূপ সাহায্য আমার আবশ্যক হয়, আপনাকে তখনই জানাইব—সেজন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ কে এ সুন্দরী?

পূর্বোক্ত ঘটনার সপ্তাহ পরে।

একদিন শরতের নির্মলীকৃত আকাশে স্নিগ্ধকিরণময় চন্দ্র উঠিয়াছে। তাহার নিম্নে চঞ্চল, তরল, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি একখানির পর আর একখানি, তাহার পর আর একখানি চন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তচিত্তে দূর-দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর। এমনসময়ে একখানি নৌকা একটি যুবক আরোহীমাত্রকে লইয়া, হুগলির গঙ্গা বহিয়া কলিকাতা অভিমুখে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। পরিপ্লব চন্দ্রালোকে মুক্ত প্রকৃতি পরিপ্লাবিত। গঙ্গার উভয় তটে কোথায় অতি দূর-বিস্তৃত শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদু পবনে তরঙ্গায়িত এবং কোথায় অতি দীর্ঘ তাল, তমাল ও নারিকেলের ঘনশ্রেণী নিঃশব্দ; কোথায় দিগন্তবিস্তৃত নিবিড়-শ্যাম বনরেখা—চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত, বায়ুচঞ্চল, ঝিল্লিমন্দ্রিত, খদ্যোৎ-খচিত, পাখিকলগীতিমুখরিত। কোথায় আমের বাগান, ভিতরে বসিয়া দোয়েল শিস দিতেছিল এবং পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে কোমল আকাশ বিদীর্ণ হইতেছিল; কোথায় দীর্ঘতৃণময় সুদূরব্যাপী চন্দ্রালোকিত প্রান্তর—অতি মনোহর; সেখানে সেই শরৎ-প্রারম্ভে সুকোমল শ্যামল তৃণাস্তরণের উপর জ্যোৎস্না নিদ্রিত ছিল। সেখানে নিস্তব্ধতা এত নিবিড়, সেখানে কেবল একটি সীমাশূন্য, দিশাশূন্য, শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। নৌকারোহী যুবক মুগ্ধচিত্তে অন্যমনে ও অতিশয় বিস্ময়ের সহিত এই সকল দেখিতে-দেখিতে যাইতেছিল; গঙ্গাবক্ষ নিস্তরঙ্গ, জ্যোৎস্নাময়। নৌকা উজান ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিল; নৌকার দুই পাশে জল কল-কল ডাকিয়া ছুটিতেছিল। সেই জলকলতান, অপর পারস্থ জ্যোৎস্নামণ্ডিত ঝাউশ্রেণীর অনুচ্চ দূরাগত শন-শন শব্দ সেই প্রগাঢ় স্তব্ধতার মধ্যে, দিগন্তবিস্তৃত বিজনতার মধ্যে, এক অপূর্ব, অপার্থিব ও অচিরশ্রুত সঙ্গীত-স্রোত সুমধুরভাবে প্রবাহিত করিয়া দিতেছিল। তাহারই তালে-তালে মাত্রায়-মাত্রায় দাঁড় নিক্ষেপের ঝপ-ঝপ শব্দ মৃদুমন্দ আঘাত করিতেছিল। এক-একবার সেই ক্ষেপণীর শব্দ লয়চ্যুত ও তজ্জন্য শ্রুতিকটু হইয়া পরিশ্রান্ত নীড়স্থ কাকগুলিকে বিনিদ্র ও মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

গঙ্গার পূর্বতট ঘেঁষিয়া নৌকা যাইতেছিল। গঙ্গার সেদিকে তৃণাচ্ছাদিত সেই বিস্তৃত প্রান্তর। যুবক দেখিল, সেইখানে তটের উপরে দাঁড়াইয়া এক শুভ্রবসনাবৃতা নারীমূর্তি। নাসাগ্র অবধি লম্বিত অবগুণ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত। সেই সুন্দর মুখমণ্ডলের যেটুকু দেখা যাইতেছিল, তাহাতেই অপরিসীম সৌন্দর্যের বেশ-একটু আভাস হৃদয়ের মধ্যে অনুভূত হইতেছিল। যুবক ভাবিয়া পাইল না, কে এই শুক্লবসনা সুন্দরী, ভয়হীনা? এতরাত্রে, এমন নির্জনে, এই জনমানবশূন্য প্রদেশে? তাহার পশ্চাতে দূরব্যাপী প্রান্তর ধূ-ধূ করিতেছে। যুবক ভাবিল, মাথার উপরে অসীম নীলিমার বুকে তরল অনিবিড় শ্বেতাম্বুদ-আবৃত চন্দ্রেরই কি এই অসীম প্রান্তর প্রান্তে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মানা শুক্লবসনা নবীনা, একখানি অবিকল প্রতিচ্ছবি? না, ক্ষেপণী সঞ্চালনের শব্দে সেই প্রান্তরের সুকোমল তৃণশয্যা হইতে ঘুমন্ত জ্যোৎস্না জাগিয়া উঠিয়া এখানে মূর্তিমতী? ভাবিয়া যুবক ঠিক করিতে পারিল না; মনের ভিতরে বড় গোলমাল বাধিয়া গেল। যুবক নির্নিমেষ মুগ্ধনেত্রে, বিস্ময়-ব্যাকুল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। ধীরে-ধীরে নৌকা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

যখন নৌকা ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইল, তখন সেই অবগুণ্ঠিতা তটের উপর হইতে দ্রুতপদে নিম্নে আজানু জলে নামিয়া আসিল। তখন নৌকা দশহাত দূরে—ক্রমে তাহার সম্মুখবর্তী হইল, তখন কাতরকণ্ঠে সেই অবগুণ্ঠিতা রমণী নৌকারোহী যুবককে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'মহাশয়, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; এখানে এতরাত্রে আর কাহারও সাহায্য পাইব, এমন আশা নাই। একা আমি স্ত্রীলোক—আমার কী হইবে, কী করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি যদি এ-সময়ে আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ না করেন, তবে আমার অন্য উপায় নাই।'

কথাগুলি স্পষ্টরূপে যুবকের কর্ণে প্রবেশলাভ করিল। যুবক মাঝিকে কিনারায় নৌকা লাগাইতে কহিল। নৌকা মুখ ফিরাইয়া তটে গিয়া আঘাত করিল। যুবক সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, 'বলুন, আমাকে কী করিতে হইবে? আমার দ্বারা আপনার যে-কোনও উপকার সম্ভব হয়, তাহাতে আমি স্বীকৃত আছি।'

রমণী ব্যাকুলহৃদয়ে সবিনয়ে কহিল, 'আমি কুলস্ত্রী। এতরাত্রে একজন অপরিচিতের সঙ্গে নির্জনে কথা কহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অবিধি—বরং মৃত্যুও ভালো। কেবল নিজের জন্য হইলে কুলস্ত্রীর অমূল্য সম্মান খোয়াইয়া, এই অবিধেয় কার্যে প্রবৃত্ত হইতাম না। অসহায় অবস্থায় মরিতে হইত—মরিতাম; কেবল আমার স্বামী—তিনি পীড়িত, রুগ্ন—তাঁহাকে কে দেখিবে? তাঁহার কী হইবে? মহাশয়, দয়া করিয়া যদি আমাকে আমার বাড়িতে রাখিয়া আসেন, কী বলিব, তাহা হইলে আপনি এ-অসহায় স্ত্রীলোকের কতদূর উপকার করিবেন!'

যুবক বলিল, 'আপনার বাড়ি এখান হইতে কতদূর? নিকটে?'

রমণী বলিল, 'না, এই প্রান্তরের উত্তর দিকে অনেক দূরে। ওই যে একটা আমবাগান দেখা যাইতেছে, আপনি বোধহয়, আসিবার সময়ে দেখিয়া থাকিবেন; ওই আমবাগানের মাঝখান দিয়া পূর্বমুখে গ্রামের মধ্যে যাইবার একটা পথ আছে, ওই পথ দিয়া কিছুদূর যাইতে হইবে। আমি একাকী যাইতে ভরসা করিতেছি না, পথে সহায়হীনা স্ত্রীলোকের অনেক বিপদ আছে।'

কথা শুনিয়া, বেশভূষা দেখিয়া, ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে ভদ্রমহিলা বলিয়া যুবকের বোধ হইল এবং তাহার এরূপ অবস্থার কারণ জানিবার জন্য যুবকের মন অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কুলনারী হইয়া এই ভয়ানক স্থানে, এতরাত্রে কী জন্য আসিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না।'

দশম পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরীর অনুরোধে

সেই কৃতাবগুণ্ঠনা বলিতে লাগিল, 'আমার স্বামী আজ দুই বৎসর হইতে পীড়িত। অনেক চিকিৎসক

দেখিয়াছে; কিন্তু এ পর্যন্ত কী রোগ অথবা রোগের কারণ কী, কেহ কিছু ঠিক করিতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদিগের ঔষধেও কোনও ফল হইল না। দুই-একজন কবিরাজ এক-প্রকার বায়ুরোগ মনে করিয়া চিকিৎসা করিয়াছিল তাহাতেও কিছু উপকার হয় নাই; বরং আমার স্বামীর ব্যারাম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; আগে দিনে একবার মূর্ছা যাইতেন, এখন প্রতিদিন দুই-তিনবার মূর্ছা হইতে লাগিল; আগে একঘণ্টা মূর্ছিত থাকিতেন, মূর্ছা শেষে বেশ জ্ঞান হইত; এখন একবার মূর্ছিত হইলে দুই ঘণ্টায় সংজ্ঞালাভ করিতে পারেন না। মূর্ছা ভাঙিলেও তাহার পর আধঘণ্টা সে-ঘোর লাগিয়া থাকে, উন্মত্তের মতো প্রলাপ বকিতে থাকেন। কলিকাতার অনেক দক্ষিণে বেহালা নামে যে-একটি গ্রাম আছে, সেখানে মূর্ছা রোগের একটি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। কাল শনিবার প্রাতে সেই ঔষধ গ্রহণ করিতে হয়, তাই আজ রাত্রেই আমার স্বামীকে লইয়া, নৌকায় করিয়া সেখানে যাইতেছিলাম। এই প্রান্তরটি পার হইয়াই আমার স্বামী বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া পড়িলেন; আজ যাওয়া হইবে না বলিয়া, অনেক আপত্তি করিতে লাগিলেন; মাঝিকে নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। আমি মাঝিকে মানা করিয়া দিলাম। নৌকা ধার দিয়া যাইতেছিল, আমার স্বামী লাফাইয়া তটে উঠিলেন; উঠিয়া চিৎকার করিয়া বাড়ির দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। আমিও তখন সেইসঙ্গে নামিয়া পড়িলাম। সেখানে বড় বনজঙ্গল, তাহার ভিতরে তিনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন; আর দেখিতে পাইলাম না। সম্ভব, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া গিয়াছেন। হয়তো সেখানে গিয়া তিনি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন; অজ্ঞান হইবার কিছু পূর্বে তাঁহার মনের এইরূপ একটা চাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে।'

যুবক অনন্যমনে সেই অপরিচিতা সুন্দরীর কথাগুলি আকর্ণন করিলেন। তাহার কাতরোক্তিপূর্ণ কথা এবং উৎকণ্ঠিতভাব ইত্যাদিতে যুবক বিশ্বাসী ও দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'চলুন, আমি আপনাকে রাখিয়া আসিব। আমিও কিছু-কিছু ডাক্তারি জানি, যদি বলেন, আপনার স্বামীর রোগারোগ্যের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারি।'

রমণী বিস্মিতা হইয়া বলিল, 'আপনি ডাক্তার! ভালোই হইয়াছে; কিন্তু—কিন্তু—'

যুবক রমণীকে অর্ধসমাপ্ত বাক্যে নীরব হইতে দেখিয়া বলিলেন, 'বলুন, কী বলিতেছেন?'

রমণী বলিল, 'বহুদিন হইতে ডাক্তার-কবিরাজের চিকিৎসা করাইয়া কোনও উপকার দূরে থাকুক, বরং অপকার হওয়ায় আমার স্বামী আজকাল ডাক্তার-কবিরাজের নামে যেন জ্বলিয়া আছেন; এমনকী তাঁহারই দুই-একজন বন্ধু নামজাদা ডাক্তার। এখন তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাক্যালাপও করেন না—ডাক্তার-কবিরাজের উপরে আজকাল যেরূপ ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে পাছে তিনি আপনাকে কোনওপ্রকার অপমানের কথা বলিয়া বসেন, তাহাই ভাবিতেছি।'

যুবক কহিলেন, 'সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই।'

রমণী। এক কাজ করিবেন, আপনি যে ডাক্তার, এ-পরিচয় তাঁহাকে দিবেন না।

যুবক। সে যাহা ভালো হয়, আমি করিব।

র। না মহাশয়, আপনি তাঁহাকে জানেন না। তিনি বড় উগ্র-প্রকৃতির লোক, আপনি আমার কথা রাখিবেন।

যু। তাহাই হইবে।

এইরূপ কথোপকথনের পর যুবক সেই অপরিচিতা সুন্দরীকে আপনার নৌকায় উঠাইয়া লইলেন। মাঝি তাঁহাকে নিষেধ করিল। প্রেতিনীরা এইরূপভাবে সুন্দরী রমণীর মূর্তিতে পথিককে বিপথে চালিত করে, সে ভয় দেখাইল। এবং অনেক স্ত্রীলোক দস্যুর নিকটে অর্থসাহায্য পাইয়া এইরূপ নিশাচরীর ন্যায় সারারাত শিকার সন্ধান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, অনেকরকমে কৌশলে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া দস্যুপতির করতলগত করিয়া দেয়। প্রেতিনী বা অপদেবতার ভয় যুবকের হৃদয়ে মুহূর্তের জন্য স্থান পাইল না। তিনি মাঝির এই কুসংস্কারপূর্ণ যুক্তি যুক্তিযুক্ত বোধ করিতে পারিলেন না। তিনি শিক্ষিত, সাহসী, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, যৌবনোষ্ণ। তিনি সেই অপরিচিতা সুন্দরীকে নৌকায় উঠাইয়া

লইয়া নৌকা ফিরাইতে বলিলেন। মাঝি অনিচ্ছায় নৌকা ফিরাইয়া লইয়া চলিল। তাহার মনে বড় ভয় হইতে লাগিল, না জানি কী-একটা ভয়ানক কাণ্ডই ঘটিবে; হয়তো নৌকা বানচাল হইয়া যাইবে, নৌকা ডুবিবে, নৌকার সঙ্গে তাহাকে যে প্রেতিনী ডুবাইয়া মারিবে না, এমনও কী হইতে পারে? দম আটকাইয়া প্রাণটা যাইবে? তখন তাহার গৃহিণীর কথা মনে পড়িল, সন্তান-সন্ততির কথা মনে পড়িল। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে-ভাবিতে তাহার প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিল এবং শরাহত পক্ষীটির ন্যায় রুদ্ধ পঞ্জর-পিঞ্জরের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল।

তাহার পর যখন স্রোতোমুখে নৌকা দ্রুত চালিত হইয়া, অনতিবিলম্বে প্রান্তর পার হইয়া সেই আমবাগানের ধারে গিয়া উপস্থিত হইয়া কিনারায় লাগিল, যুবক সেই রমণীকে লইয়া তটে অবতরণ করিলেন। তখন সুদক্ষ মাঝি একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল ভাবিয়া ঈশ্বরকে মনে-মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

যুবক যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, যতক্ষণ না তিনি ফিরিয়া আসেন, নৌকা যেন সেইখানে বাঁধিয়া রাখা হয়।

যুবকের যে এই প্রত্যাগমন ঘটিবে না, মাঝি সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সুন্দরীর কৃতজ্ঞতা

আমবাগানের ভিতর দিয়া সেই স্ত্রীলোকটি অগ্রগামিনী হইল। যুবক তাহার সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

যুবকের বয়ঃক্রম আটাশ বৎসরের অধিক নহে। মুখশ্রী সুন্দর, সুকৃষ্ণ গুম্ফ ও অনিবিড় শ্মশ্রু, মস্তকের অনতিকুঞ্চিত ঈষদ্দীর্ঘ কেশ, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও দীর্ঘনেত্রে সে মুখমণ্ডলের সমধিক শোভাবর্ধন করিতেছে। দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব, বলময়, মাংসপেশিতে সকল অংশ স্ফীত ও পরিণত। বর্ণ গৌর। মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়াই বোধ হয়।

তাহারা আমবাগান পার হইয়া একটা বড় বনের ধারে আসিয়া পড়িল। বনের ভিতর দিয়া একটি শীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ কিছুদূরে গিয়াই দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেই অপরিসর দীর্ঘ বনপথে পত্রান্তরালচ্যুত শীর্ণ জ্যোৎস্নালেখাগুলি মূর্ছিতভাবে পড়িয়া। যুবকের চক্ষে সেই অতুল সৌন্দর্যময়ী নবীনার প্রতি পাদবিক্ষেপে, সুকোমল চরণস্পর্শে সেই মূর্ছিত জ্যোৎস্নালেখাগুলি যেন সজীব হইয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু-প্রবাহে তাহার চঞ্চল অঞ্চল উড়িয়া এক-একবার যুবকের গায়ে আসিয়া লাগিতেছিল। এবং ঝিল্লিরবে সেই বিজন বনপথ মুখরিত হইতেছিল এবং অরণ্য—বৃক্ষলতা-পরিব্যাপ্ত অরণ্যভূমি ছায়ালোক-চিত্রিত হইয়া একখানি উন্মুক্ত আলেখ্যবৎ অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রিমা, বনকুসুমের গন্ধ, মৃদুমন্দ মলয়ানিল এবং মধুরকণ্ঠে বনবিহগের স্বরলহরী, সেই চিত্রাঙ্কিতবৎ বনস্থলী প্রতিক্ষণে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছিল।

চুম্বকের সহিত একখণ্ড লৌহের যে-সম্পর্ক, আর নারী-সৌন্দর্যের সহিত একটা পুরুষ-হৃদয়েরও ঠিক সেই সম্পর্ক। চুম্বকের সহিত নারী-সৌন্দর্যের এমন একটা অব্যর্থ আকর্ষণী শক্তি আছে যাহাতে পুরুষের হৃদয় অতি সহজে ও অজ্ঞাতভাবে আকৃষ্ট হইতে থাকে। যুবক এতদূর পথ সেই আকর্ষণেই কথাটি না কহিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, যন্ত্রচালিতের ন্যায় অতিক্রম করিতেছিলেন। সেই আকর্ষণেই আমবাগানের অতি দীর্ঘপথ ছাড়াইয়া বনে পড়িলেন এবং সেই আকর্ষণেই সর্পসঙ্কুল ভীতিপূর্ণ বনের মধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না—সেইরূপ নীরবে। তাহার পর যখন সেই বনের বিপুল গভীরতার মধ্যে, একান্ত বিজনতার মধ্যে পড়িয়া আর পথ পাইলেন না, তখন স্বপ্নশেষে আকস্মিক চেতনার ন্যায়, অকস্মাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির ন্যায় একটা শঙ্কা আসিয়া যুবকের হৃদয়ে আঘাত করিল। তিনি তখন সেই অপরিচিতাকে বলিলেন, 'আমাকে আর কতদূর যাইতে হইবে? এ-গভীর

বনের ভিতরে আমাকে আনিলেন কেন? নিকটে যে কোনও লোকালয় আছে, এমন তো বোধহয় না। এ-বন যে কিছুতেই শেষ হয় না। শীঘ্র যে শেষ হইবে, এমনও বোধ হয় না। আমি কোন দিকে যাইতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। আপনি আমাকে এখন কোথায় লইয়া যাইতেছেন, এ কোনদিকে যাইতেছি—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণে?'

অগ্রগামিনী অনুচ্চস্বরে বলিল, 'এখন দক্ষিণ মুখে আমরা যাইতেছি, আর বেশি দূর নাই, দক্ষিণদিকে আর কিছুদূর গিয়া পূর্বদিকের একটা পথ পাইব সেই পথ ধরিয়া অল্পদূর গেলেই আমরা বন ছাড়াইয়া একটা বাগানে পড়িব, সেই বাগানে আমাদের বাড়ি।'

যুবক কহিলেন, 'তাহা যেন হইল; কিন্তু আপনি যেরূপ গোলমেলে পথ দিয়া আমাকে লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে ইহার পর পথ চিনিয়া একাকী নৌকায় ফিরিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব হইবে।'

কৃতাবগুণ্ঠনা পূর্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, 'সেজন্য আপনি ভাবিবেন না, আর একটি সোজা পথ আছে, সে-পথ দিয়া গেলে অনেকটা রাস্তা যাইতে হয়; বাড়িতে শীঘ্র পৌঁছাইবার জন্য আমার মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য এই বনজঙ্গল ভাঙিয়া যাইতেছি। মনেও বুঝিতেছি, আপনার ন্যায় ভদ্রলোককে এ-দুর্গম পথে আনিয়া ভালো করি নাই; কিন্তু কী করিব? আপনি আমার মনের উৎকণ্ঠা ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। যাই হোক, ফিরিবার সময়ে আমাদের একজন ভৃত্যকে আপনার সঙ্গে দিব; সে আপনাকে ওদিককার সোজা পথ দিয়া যাইয়া আপনার নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া যাইবে। না জানি, এ বনপথে আনিয়া আমি আপনাকে কত কষ্ট দিলাম! সেজন্য এ-দুর্ভাগিনীর সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন।'

যুবক তাহার বিনয়পূর্ণবচনে আত্মবিস্মৃত হইলেন। তাঁহার সরল হৃদয়ের মধ্যে দুঃসাহসিকতার উপরে যে একটা অশুভসূচক শঙ্কার অনিবিড় ছায়াপাত হইয়াছিল, সেই অবগুণ্ঠনমণ্ডিতা সুন্দরীর অত্যধিক শিষ্টতায় ও বাক্যের তদধিক মিষ্টতায়, তাহা বালুকাস্তূপের জলরেখার ন্যায় নিমেষে মিলাইয়া গেল। যুবক কহিলেন, 'না, সেজন্য আপনি কেন এত 'কিন্তু' হইতেছেন? আমার কোনও কষ্ট হইতেছে না। আমার দ্বারা যে আপনার সামান্য উপকার হইল, তাহাতে বরং আমি সুখী হইলাম। মানুষমাত্রেরই যাহা কর্তব্য, তাহার বেশি আমি কিছুই করি নাই।'

রমণী বলিল, 'মহাশয় আপনি এ-বিপদের সময়ে আমার কতদূর উপকার করিলেন, কেমন করিয়া জানাইব? যদি আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হই, তাহা হইলেও আপনার কথা বোধহয়, আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনার নিকটে আমি কতদূর ঋণী রহিলাম, বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। যদি আপনি এতদূর কষ্ট স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে আমার কী হইত, বলুন দেখি? হয়তো কোনও নারকীর হাতে পড়িয়া আমার কী সর্বনাশ হইত! এত রাত্রে এ-সকল ভয়ঙ্কর স্থান গৃহস্থ স্ত্রীলোকের পক্ষে কীরূপ বিপজ্জনক, তাহা আপনার ন্যায় হৃদয়বান ব্যক্তিকে বুঝাইয়া বলা বাহুল্য। আপনার চিত্ত অতিশয় উদার, মহৎ; আপনার ন্যায় পরোপকারী, দয়ালু ব্যক্তি এ-সংসারে খুব কমই আছে। আপনি যদি আমাকে এরূপ দয়া-প্রকাশ না করিতেন, তাহা হইলে কে বলুন দেখি, আমার এ-বিপদে মাথা দিত? কে বলুন দেখি, নিজের সময় নষ্ট করিয়া একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোকের জন্য এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে অগ্রসর হইত? সাহায্য করা দূরে থাক, এ-অপরিচিতার উপরে কেহ যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনা করিতে পারিত, এমন বোধ হয় না।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : বাগান-বাটি

তাহার পর সেই যুবক ও অবগুণ্ঠনবতী অনতিবিলম্বে একটি বাগানের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। বাগানটি

প্রকাণ্ড, এমনকী পঞ্চাশ বিঘার কম নহে; বাগানের চারিপ্রান্তের বড়-বড় জ্যোৎস্নাস্নাত গাছগুলি দৃষ্টিসীমার যবনিকার উপরে সুদৃশ্য রঞ্জিতবৎ অতি সুন্দর। কোথায় সুদীর্ঘ ঝাউ, কোথায় তদধিক দীর্ঘ নিবিড়তর দেবদারুর শ্রেণী চলিয়াছে। তাহার সম্মুখে আম, লিচু, কাঁটাল, তাল, নারিকেল আরও কত কি ফলের গাছ। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পুরাতন দ্বিতল অট্টালিকা, বহুদিন মেরামত না করায় একান্ত শ্রীহীন। অনেক স্থানে বালি খসিয়া পড়ায় তাহার ইষ্টকপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

রমণী যুবককে লইয়া সেই দ্বিতল অট্টালিকার দ্বার-সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুবক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বাড়ি কি আপনাদের?'

রমণী কৃতজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল। বলিল, 'অনেক রাত হইয়াছে, বোধহয়, চাকরেরা সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মনিবের শাসন না থাকিলে চাকর-বাকরদিগের স্পর্ধা এইরূপ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিয়া থাকে।' এই বলিয়া দ্বার ঠেলিয়া দিতে খুলিয়া গেল, তখন যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'বাঁচলেম, এই যে কবাট খোলা আছে, তবে তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়াছেন দেখিতেছি।'

যুবক বলিলেন, 'তবে আপনি বাড়ির ভিতরে যান, যদি তিনি আসিয়া মূর্ছিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে খবর দিবেন; আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।'

'সে কি—মহাশয়! তাহা হইবে না।' এই বলিয়া সেই রমণী চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে একটা দমকা বাতাস লাগিয়া তাহার অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখন সেই রমণী অতিশয় লজ্জিত ও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, অবগুণ্ঠনটি আবার বেশি করিয়া টানিয়া দিল। সেই ক্ষুদ্র অবসরে যুবকের সতৃষ্ণদৃষ্টি একবার সেই সুন্দরীর সুন্দর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্যসুধা ক্ষণেকের জন্য অতৃপ্তভাবে পান করিয়া লইল। রমণীর তখনকার ভঙ্গিটি যুবকের মুগ্ধ হৃদয়ে মৃদু-মৃদু আঘাত করিল। সেই ক্ষণেকের মধ্যে যুবক দেখিল, একটি মলিনতার ছায়াপাতে বিপুল কৃষ্ণচক্ষুর সলজ্জ অথচ উৎকণ্ঠাব্যঞ্জক চাঞ্চল্য এবং ঈষদ্‌প্রোদ্ভিন্ন অধরোষ্ঠের শ্রমজনিত মৃদুকম্পনে, সেই মাধুর্য-পরিপূর্ণ মুখশ্রী আরও উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহাতে যুবকের অপরিতৃপ্ত তৃষিত-নেত্রের তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিল।

পরস্ত্রী-দর্শনে এরূপ একটা অধৈর্য আকুল তৃষ্ণা একজন সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত যুবকের পক্ষে বড় পাপের বিষয় হইলেও তাঁহার মনে কোনওরূপ কলুষিত ভাব ছিল না। স্ত্রী-সৌন্দর্যের জন্য পুরুষ হৃদয়মাত্রেই যে একটি আকাঙ্ক্ষা সর্বদা সংলগ্ন থাকে, ইহা তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যখন বিন্দুবিসর্গ পাপ মিশিতে পারে, তখন ইহা মনুষ্যের একান্ত অদম্য ও অত্যন্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। যাই হোক, যুবকের সম্বন্ধে এত ওকালতি করিয়া পুঁথি বাড়ানো আমার ভালো দেখায় না, বরং তাহাতে অনেক পাঠকের বিরক্তির আশঙ্কা করিতে হয়। এই যুবক এজন্য দণ্ডার্হ কি মার্জনীয়, সে-বিচারের ভার সদ্বিবেচক পাঠক ও পাঠিকার উপরে; তাঁহাদিগের সদ্বিচারে যাহা হয়, আমাদের এ-যুবক তাহাই।

বাজে কথায় আমাদিগের দেরি হইতেছে। রমণী অবগুণ্ঠনের পুনঃস্থাপনা করিয়াই বলিল, 'আপনি ভিতরে আসুন, আপনি শ্রান্ত হইয়াছেন; বাহিরে একাকী এরূপ অবস্থায় কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন!'

যুবক দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটিমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেই সুন্দরীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমেই একটি প্রাঙ্গণে পড়িলেন। প্রাঙ্গণটি খুব বড়, বড় অপরিষ্কার। তাহার পূর্বপার্শ্বে একটি হলঘর, সেখানে আলো ছিল না। তথায় গভীর অন্ধকার আর একান্ত নিস্তব্ধতা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করিতেছিল। তন্মধ্যে উভয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে রমণীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না; নিজেকে নিজেই দেখিতে পাওয়া যায় না, স্থানটি এমনই অন্ধকারময়। মৃদু পদশব্দ, কঙ্কণের মৃদু মধুর কিঙ্কিণী সেই সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে, দুর্ভেদ্য তিমিররাশির মধ্যে অগ্রগামিনী অদৃশ্য সুন্দরীর অস্তিত্বের প্রমাণ দিতেছিল।

সেই হলঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে দ্বিতলে উঠিবার একটা সোপান ছিল। রমণী সোপানের উপর পদার্পণ করিয়া যুবককে বলিল, 'আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটা আলো আনিতেছি।' পরমুহূর্তে রমণীর চঞ্চল চরণবিক্ষেপের শব্দ ক্রমশ ঊর্ধ্বে মিলাইয়া গেল।

তখন যুবক সেখানে একা।

যুবকের চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগী-কক্ষে

সেইখানে সেইভাবে একাকী অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে যুবকের কষ্ট হইতে লাগিল। বিশেষত, সিক্তভূমিতল হইতে এমন একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছিল, যুবকের তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। বায়ুর গতিবিধির জন্য কোনও বন্দোবস্ত না থাকায়, সেই অসহ্য দুর্গন্ধে যুবকের শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। দিবারাত্র অবরুদ্ধ ও অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায় এই হলঘর যে এরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, তাহা যুবক সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রমণীর ফিরিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, যুবক রুদ্ধ বাতায়নের সন্ধানে ভিত্তিগাত্রে উভয় হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। যদিও সন্ধান করিয়া একটা রুদ্ধ গবাক্ষ দেখিতে পাইলেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাহা উন্মুক্ত করিবার কৌশল সেই অন্ধকারে তখনকার মতো অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল। সম্ভব তাহা বাহির হইতে বন্ধ। তখন ইহা অপেক্ষা তথা হইতে বাহির হইয়া—বাহিরে অপেক্ষা করা ভালো মনে করিয়া, যুবক যেমন দুই-একপদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে সহসা সোপানের ঊর্ধ্বভাগ হইতে একটা উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আসিয়া, সেই সুবৃহৎ হলঘরের কিয়দংশ আলোকিত করিল।

যুবক ঊর্ধ্বমুখে সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন, সেই রমণী সেইরূপ অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া, একটি লণ্ঠন লইয়া সত্বর নামিয়া আসিতেছে। সোপানের অর্ধাংশমাত্র নামিয়া আসিয়া রমণী উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, 'মহাশয়, শীঘ্র আসুন, এতক্ষণ যে-ভয় করিতেছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে; তিনি এখানে আসিয়াই মূর্ছিত হইয়াছেন। হায়-হায়, না জানি কতক্ষণ তিনি এইভাবে আছেন! কী হইবে?'

'ভয় নাই, ব্যস্ত হইবেন না,' বলিয়া যুবক সত্বর তাহার অনুসরণ করিলেন। সোপানাতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটা বারান্দায় পড়িলেন। তথা হইতে তিন-চারিটি ঘর পার হইয়া একটি প্রশস্ত ও উচ্চ প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী লণ্ঠনটি বারান্দার উপরে রাখিয়া দিল। সে-উজ্জ্বল আলোক রোগীর কক্ষে লইয়া যাইতে তাহার সাহস হইল না। সেই ঘরের একপার্শ্বে একটি অর্ধদগ্ধ মোমবাতি জ্বলিতেছিল। যুবক সেই ক্ষীণালোকে দেখিলেন, তথায় একপার্শ্বে একটি পরিষ্কৃত শয্যার উপরে একজন প্রৌঢ়ব্যক্তি—তাহার বয়স চল্লিশের কম নহে—নিস্পন্দদেহে মৃতবৎ পড়িয়া। তাহার মুখ মৃত্যুবিবর্ণীকৃত, চক্ষু নিমীলিত এবং হস্তপদাদি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিছানার অবস্থাও তদ্রূপ, বালিশগুলি বিশৃঙ্খলভাবে এখানে সেখানে ও মাথার বালিশটি কক্ষতলে পড়িয়া আছে। আচ্ছাদনের বস্ত্রখানা ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে।

যুবক সর্বাগ্রে সেই সংজ্ঞাশূন্য লোকটির নাড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া সহজ লোকের ন্যায় বোধ হইল; তখন তাঁহার মনে একটু সন্দেহও হইল; মনে হইল, লোকটির এ-একটা ভান মাত্র; নতুবা এ-রোগ এ-জগতে এই নূতন।

রমণী ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন দেখিলেন?'

যুবক। নাড়ি দেখিয়া রোগের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; সহজ লোকের নাড়ির গতি যেরূপ থাকে, ইঁহারও তদ্রূপ।

রমণী। অনেক ডাক্তার-কবিরাজ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আপনিও তাহাই বলিতেছেন।

যু। ইনি মূর্ছা যাইবার পূর্বে কি বড় ছটফট করিতে থাকেন?

র। হ্যাঁ, তখন কেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না।

যু। বিছানার অবস্থা দেখিয়া তাহাই বোধ হইতেছে। আপনি বাহিরের লণ্ঠনটি এইদিকে একবার লইয়া আসুন।

র। কেন?

যু। নাড়ি দেখিয়া যখন রোগ নিরূপণ হইল না, তখন অন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

র। ইহাতে আপনার কী রোগ পরীক্ষা হইবে?

যু। আমার বোধ হইতেছে, ইনি ভান করিয়া পড়িয়া আছেন।

র। এমনও কি হইতে পারে?

যু। সেটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কী?

রমণী লণ্ঠনটি আনিলে অগ্রে যুবক তন্মধ্যস্থিত শিখাটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। তাহার পর সেটি সেই মূর্ছিত ব্যক্তির মুখের উপরে তুলিয়া ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন।

তখন যুবক সেই নিঃসংজ্ঞ লোকটির চোখের পাতা দুইখানি তুলিয়া ধরিলেন; দেখিলেন, তাহার চোখের তারা দুটি স্থির, তেমন উজ্জ্বল আলোক লাগিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না, চিত্রলিখিতবৎ স্থির ও নিস্পন্দ। যুবক মনে করিলেন, সত্যই যদি লোকটি ভান করিয়া এরূপভাবে থাকে, তাহা হইলে লোকটি এ-বিষয়ে সুদক্ষ এবং এ-ভানও তাহার প্রশংসনীয়।

যুবক তাহাতেও নিরস্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহার আগ্রহ ও কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি সেই রমণীকে লণ্ঠনটি রোগীর চোখের নিকট সঞ্চালন করিতে বলিলেন। রমণী তদ্রূপ করিলে অচেতন লোকটির চোখের তারা দুটিও তদ্রূপ নড়িতে লাগিল। যুবকের সন্দেহ বদ্ধমূল হইল। তখন যুবক একটি চোখের পাতা ছাড়িয়া দিয়া, অপর চোখের তারা অঙ্গুলি দ্বারা যেমন স্পর্শ করিতে যাইবেন, তখন রোগী সভয়ে চোখ কুঞ্চিত করিল; ইহাই যথেষ্ট।

রমণী পূর্ববৎ সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী দেখিলেন?'

মৃদুহাস্যে যুবক উত্তর করিলেন, 'এ-রোগ আমি আরোগ্য করিয়া দিব—কোনও ভয় নাই।'

রমণী বলিল, 'এখন কী করিলে জ্ঞান হইবে?'

যুবক মনে করিলেন, জ্ঞান বেশ টনটনে আছে; রোগী নিজে ইচ্ছা না করিলে, অন্য কিছুতেই তাহার জ্ঞানলাভ হইবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন, 'এখন আপনি ইহার চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে পারেন। আরও পারেন, যদি আপনাদের নিদ্রাতুর কোনও ভৃত্যকে ডাকিয়া যতক্ষণ জ্ঞানলাভ না হয়, ততক্ষণ পাখার বাতাসের একটা বন্দোবস্ত করুন।'

রমণী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ : আশ্চর্য রোগী

রমণী চলিয়া গেলে, রোগী দুই-একটা যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিয়া স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিল। যুবককে দেখিয়া তাহার দৃষ্টিতে একটা বিস্ময়জনক ভাব প্রকটীকৃত হইল। অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে আপনি? আপনার নাম?'

যুবক। আমার নাম দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র।

রোগী। কই, এ-নাম তো কখনও পূর্বে শুনি নাই?

যু। আমি এখানে থাকি না; আমার বাড়ি ভবানীপুর; কলিকাতার কিছু দক্ষিণে।

রো। হবে, তা আপনি এখানে কীরূপে আসিলেন? কে আপনাকে এখানে আনিল?

যু। আপনি আপনার স্ত্রীকে নদীর ধারে একা ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এতদূর একা ফিরিয়া আসিতে সাহস করিতেছিলেন না। সেই সময়ে আমি সেইখান দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া আপনার স্ত্রী তাঁহাকে এখানে রাখিয়া যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বলেন; তাই তাঁহাকে রাখিতে আসিয়াছিলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম, আপনি পীড়িত। আমি ডাক্তার, সুতরাং একবার আপনাকে দেখিতে এখানে আসিলাম।

রো। ডাক্তার আপনি? ডাক্তারের উপরে যে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাহা কি আমার স্ত্রীর মুখে শুনেন নাই?

যু। হ্যাঁ, তিনি একবার বলিয়াছিলেন, বটে।

রো। তবে আবার আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন কেন? তিনিই বা আপনাকে অনর্থক আনিলেন কেন?

যু। আপনি মূর্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়াছিলেন। এখন আপনাকে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি, আর আমার এখানে থাকিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আমি এখন যাইতে পারি। (গমনোদ্যোগ)

রো। বসুন, রাগ করিলেন না কি? আমাকে মাপ করিবেন। আপনার সহিত যে-কালে সাক্ষাৎ পরিচয় হইল, তখন আপনার হাতে একবার ডাক্তারি চিকিৎসার শেষ পরীক্ষা লইতে পারি! আপনি আমার এ-রোগের যাহাতে শীঘ্র উপশম হয়, এমন কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারেন কি?

যু। একবার সাধ্যমতো চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। তবে কথা হইতেছে, আগে রোগী আর চিকিৎসকের পরস্পর পরস্পরকে বুঝিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক। তাহার পর রোগের চিকিৎসা। আপনি যদি আমার নিকটে রোগ গোপন করেন, আর আমি আজীবন ধরিয়া যদি অনবরত চেষ্টা করি, তথাপি আপনার রোগের কিছুই করিতে পারিব না। আমার মনের ভাব আমি আগেই বলিতেছি, আমি যখন প্রথমে আপনাকে আসিয়া দেখিলাম, তখন আপনি মূর্ছিতবৎ ছিলেন বটে, কিন্তু আপনি যথার্থ মূর্ছা যান নাই—ভান করিয়া পড়িয়াছিলেন। কী বলেন?

রো। আপনি ঠিক বলিয়াছেন। আমি অজ্ঞানের ভান করিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমার বেশ জ্ঞান ছিল।

যু। এরূপ করিবার কারণ কী?

যুবকের এরূপ প্রশ্নে রোগীর চক্ষু একবার ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া পূর্বভাব ধারণ করিল। তাহার পর শূন্যদৃষ্টিতে একবার দ্বারের দিকে চাহিয়া, চারিদিকে চাহিল; আবার সেই দ্বারের দিকে চাহিয়া, উদ্বেগ-কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'কেবল আমার স্ত্রীর জন্য—আর কিছু না। ডাক্তারবাবু, কোনওরকমে আমার এই মূর্ছাটি চব্বিশঘণ্টা স্থায়ী করিয়া দিতে পারেন, এমন কোনও উপায় আছে কি? যখন মূর্ছিত থাকি তখন আমি নীরোগ, তখন আমি বেশ ভাল থাকি! তাহার পর যখন বেশ জ্ঞান হয়, তখন কেবল যন্ত্রণা, বুকের যন্ত্রণা—মাথার যন্ত্রণা—বুক ফেটে যায়—মাথা ছিঁড়ে পড়ে—এমনই ভয়ানক যন্ত্রণা! আমি জানি, আমার এ-যন্ত্রণা ইচ্ছাকৃত। আত্ম-প্রবঞ্চনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাতেই যে একদিন আমার এ-জীবনের অবসান হইবে, তাহাও আমি জানি। সাধ করিয়া যে, আমি নরকাগ্নি বুকের মধ্যে জ্বালিয়াছি, তাহাও আমি জানি; কিন্তু প্রাণান্তেও আমি সে-কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করি নাই—পরেও করিব না। আপনিও এখন এক কাজ করুন, আপনি এখন অন্য ঘরে গিয়া বসুন। আমি এখন একা থাকিতে পারিলে অনেকটা সুস্থ হইব। আপনাকে যে-সকল কথা বলিলাম, অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রীর কাছে তাহার একটি বর্ণও প্রকাশ করিবেন না। তাঁহাকেও এখন এখানে আসিতে মানা করিবেন। আমি আপাতত কিছুক্ষণ একা থাকিতে চাই। একটু সুস্থ হইলে পরে আপনাকে ডাকিব।' এই বলিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়া একটা উন্মুক্ত গবাক্ষের সম্মুখে করতললগ্নশীর্ষ হইয়া বসিলেন; এবং ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

যুবক তাহার কথার ভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন লোকটার মাথা বোধহয় কোনওরকমে খারাপ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি সেই অদ্ভুত রোগীর কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। এমন সময়ে সেই রুগ্ন ব্যক্তির স্ত্রী দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবককে বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, 'আপনি যে একাকী এখানে দাঁড়াইয়া আছেন—তিনি কি—'

যুবক বাধা দিয়া বলিলেন, 'তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছেন। উঠিয়া জানালার নিকটে বাতাসের মুখে বসিয়াছেন; এখন তিনি একা থাকিতে চাহেন। বোধকরি, আপনার স্বামীর মনের ভিতরে কোনও শোক বা দুঃখের এমন একটা আঘাত লাগিয়াছে, যেজন্য তিনি একান্ত অধীর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন; বোধকরি, মাথাও কিছু বিগড়াইয়া গিয়াছে—কিছুতেই তিনি আপনাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : বিপদের ছায়া

রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিলেন, 'কই, তেমন তো কোনও ঘটনা ঘটে নাই। আপনি এখন (অঙ্গুলি নির্দেশে) বারান্দার ওদিককার কোণের ঘরে গিয়া বসুন; সে-ঘরে আলো জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইবেন; আপনার বড় বিলম্ব হইয়া পড়িতেছে, সেজন্য কিছু মনে করিবেন না; বড় দায়ে পড়িয়াই আপনাকে কষ্ট দিতেছি,' বলিয়া সেই অবগুণ্ঠনবতী রোগীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর যেমন যুবক দুই পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে সেই রোগীর কক্ষ হইতে দুই-একটি বড় ভয়ানক কথা তাঁহার কানে গেল। কথাগুলি খুব মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও, বেশ বুঝিতে পারা গেল। যুবক সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন।

রমণী বলিল, 'সেই লোক ঠিক? তুমি ঠিক চিনিতে পারিয়াছ?'

রোগী বলিল, 'হ্যাঁ, সেই লোকই ঠিক।'

রম। ইহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয়?

রোগী। ইহারই নাম।

রম। তবে আমার ভুল হয় নাই?

রো। কোনওদিন যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইবে?

এই বলিয়া রোগী অনুচ্চস্বরে হাসিল। সে-শব্দও যুবক বাহির হইতে বেশ শুনিতে পাইলেন। তাহার পর—

রম। এখন কী করিতে হইবে?

রো। যাহা তোমার অভিরুচি।

রম। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

রো। খুন করো।

রম। খুন করিব!

রো। আশ্চর্য হইয়া গেলে যে! কই, এমন কথা তো তোমার মুখে আর কখনও শুনি নাই? আজ খুনের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িতেছ! আগে খুন করিতে তোমারই আগ্রহ অধিক দেখিতাম। কী জানি যুবকের রূপ দেখিয়া সহসা আত্মহারা হইয়া পড়ো নাই তো? দেখিয়ো, আমাকে যেন শেষে পথে বসাইয়ো না।

রমণী। সে ভয় নাই, তাহা হইলে অসংখ্য বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া, তোমার সঙ্গে এতকাল ধরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতাম না। তুমি কি আমাকে এমনই মনে করিয়াছ? আগে এই লোকটির সম্বন্ধে যেরূপ পরামর্শ করা হইয়াছিল, সেই পরামর্শ মতে কাজ করিলে ভালো হইত না কি?

রোগী। সেই পরামর্শ মতেই কাজ করো। বিশেষত, সেইজন্যই লোকটাকে বেশি দরকার।

শুনিয়া যুবকের চক্ষুস্থির—শুনিয়া এক জটিল রহস্য হইতে তদধিক জটিল ও দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে তিনি নিমগ্ন হইলেন। মুখে তাঁহারই নাম। তাঁহারই নাম দেবেন্দ্রবিজয়—তাঁহাকেই খুন করিবার কথা—আগেকার পরামর্শ মতে কাজ হইবে! এ-সকল কথার অর্থ কী? যুবক কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল এবং বুকের মধ্যে রক্তস্রোত উত্তালভাবে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল।

সাহসে বুক বাঁধিয়া যুবক আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন তাহাদিগের আর কোনও কথা শুনা গেল না, তখন তিনি তথা হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, অপর পার্শ্বে বারান্দার রেলিং-এর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। সেখানেও অত্যন্ত অন্ধকার; যুবক সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আপনার অদৃষ্ট ও বিপদ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার তাঁহার চোখের উপরে আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ ভয় ও সন্দেহ

অগৌণে সেই রমণী একটি প্রজ্বলিত দীপহস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে উপস্থিত হইল। পূর্বাপেক্ষা তাহার অবগুণ্ঠনের দীর্ঘতার এক্ষণে অনেক হ্রাস হইয়াছে; তাহার স্বেদজড়িত চূর্ণালকবিশোভী অপ্রসর ললাটের কিয়দংশ আবৃত রাখিয়াছে মাত্র। কানের পাশ দিয়া তাহার বিপুলকৃষ্ণকেশরাশির একটা দীর্ঘ ও স্থুল গুচ্ছ, তাহার সেই সূক্ষ্ম বস্ত্রাবৃত পীন, পীবর ও উন্নত বক্ষের উপরে তরঙ্গায়িতভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই অপ্রশস্ত অবগুণ্ঠন ও কৃষ্ণকেশগুচ্ছে সেই আলোকোজ্জ্বল মুখখানি বোধ হইতেছে, যেন একখণ্ড শ্বেত ও একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ বসন্তপূর্ণিমার চন্দ্রকে উভয় পার্শ্ব হইতে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। হস্তস্থিত দীপালোকে রমণীর ঈষল্লোহিতাভ মুখমণ্ডল ব্যাপিয়া ও সেই চঞ্চল, হাস্যময় কৃষ্ণোজ্জ্বল আকর্ণ চক্ষুর, প্রাখর্যে মনোহর ও তীক্ষ্ণতায় মধুর ও চাঞ্চল্যে মধুরতর সে-দৃষ্টির মধ্য দিয়া একটা মুগ্ধকরী রমণীয়তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সেই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী বিলোলকটাক্ষশালিনীর আগমনে ও তাহার সেই ললিতকোমলভাবভঙ্গিতে মুগ্ধ দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা মুগ্ধ হইলেন। আপনার বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন; মনে আর পূর্বের ভাব কিছুই রহিল না। তখন মনে হইতে লাগিল, বৃহদরণ্যমধ্যবর্তী অন্ধকারময় ভগ্নপ্রায় সেই প্রকাণ্ড জনবিরল নির্বান্ধব পুরীটাই তাঁহার ভয়ের একমাত্র কারণ, আর সেইখানে সেই অপরিচিতা রমণীই তাঁহার একমাত্র পরিচিতা। আর মনে হইতে লাগিল, অলক্ষে থাকিয়া তাহার মুখে যে-সকল ভয়াবহ কথা শুনিয়াছিলেন, সে আর কিছুই নহে, তাঁহার অলস মনকে চঞ্চল করিতে একটা অমূলক কল্পনা কখন অন্ধকারে অদৃশ্য ও অজ্ঞাতভাবে তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশলাভ করিয়া, সেখানে একটা বাসা বাঁধিবার আয়োজন করিতেছিল। তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা ভুল—নিরর্থক—এবং তাহার কোনও মানে হয় না।

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের ভিতরে এইরূপ বিপ্লব, তখন রমণী তাঁহাকে মৃদুহাস্যে বলিল, 'আপনি যে এখানে দাঁড়াইয়া আছেন দেখিতেছি, আমার সঙ্গে আসুন।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আর কেন, অনেকক্ষণ আসিয়াছি—আপনি একজন ভৃত্যকে বলুন, আমাকে নৌকায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। নিজে পথ চিনিয়া যাইতে পারিব না।'

রমণী বিনীতভাবে বলিল, 'মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, কিছু জলযোগ না করিয়া আপনি কিছুতেই যাইতে পাইবেন না।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিল, 'সেজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।'

রমণী বলিল, 'তাহা হইলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। মহাশয়ের নামটি কী শুনিতে পাই না? এরূপ উপকারীর নাম আমাদের চিরকাল স্মরণ রাখা উচিত।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'দেবেন্দ্রবিজয়।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : সুন্দরীর মনের ভাব

দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া রমণী সেই সুদীর্ঘ বারান্দার শেষ-সীমা পর্যন্ত পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল। সেখানে একটি ঘর চাবি-বন্ধ ছিল। রমণীর নিকটে চাবি থাকায়, তখনই খুলিয়া ফেলিল; উভয়ে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। এবং রমণী ভিতর হইতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেখানে উপরে উঠিবার একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল, সেই সিঁড়ি দিয়া উভয়ে উপরে উঠিলেন। সেখানে মুক্ত প্রকৃতির এক অপূর্ব শোভা! জ্যোৎস্নালোকপূর্ণ উন্মুক্ত ছাদ অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সেখানে আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন?'

রমণী মৃদু হাসিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি একটা অত্যন্ত তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, 'আপনি এত ভীত হইতেছেন কেন? আমি কি আপনাকে খাইয়া ফেলিব? আমি স্ত্রীলোক, আপনি পুরুষ—আপনার সে-ভয় নাই, আসুন।'

দেবেন্দ্রবিজয় তাহার প্রশ্নের এইরূপ অনাকাঙ্খিত ও অপূর্ব সদুত্তর পাইয়া নিরুত্তরে রমণীর সহিত চলিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তিষ্ক তখন অসম্ভবরূপে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। এ-সকলই যেন একটা অভাবনীয় ও অনপেক্ষিত স্বপ্নের মতো তাঁহার মনোহর বোধ হইতেছিল—হইবারই কথা। সেই নির্জন নদীতীরে, প্রস্ফুটচন্দ্রালোকে, মধুর জলকলতানে, সহসা যে-মোহ একবার মুহূর্তের মধ্যে যুবকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়া তাঁহার বুকের মধ্যে যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখন তেমনই শীঘ্র অপনীত হইবার নহে।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রমণী বলিল, 'আপনি অপরিচিত, রূপবান যুবক, বিশেষত পরপুরুষ; আর আমি স্ত্রীলোক, আমারও রূপ আছে, যৌবন আছে বিশেষত পরস্ত্রী; এরূপ সময়ে কেহ যদি আমাদিগকে এই রাত্রে নির্জন ছাদের উপরে দেখিতে পায়, সে কী মনে করে, বলুন দেখি?'

এ কী প্রশ্ন? ইহার কী উত্তর করিবেন, ভাবিয়া না পাইয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে অস্থির হইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, কুলস্ত্রী বোধে তিনি যাহার বিপদে মাথা দিয়াছিলেন, সে অসচ্চরিত্রা পিশাচী—পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের মনোভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়া, সহসা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অন্য সুরে বলিল, 'আপনি হয়তো আমার এরূপ ব্যবহারে আমাকে মনে-মনে দোষারোপ করিতেছেন। আশ্চর্য নয়, ইহা আপনার দোষ নয়—নারীজাতিরই হৃদয় বড় দুর্বল। সামান্য আঘাতে ভাঙিয়া পড়িতে চায়—আপনার কর্তব্য ঠিক রাখিতে পারে না। যাই হোক, আপনি আমাকে অত্যন্ত নির্লজ্জ ভাবিতেছেন, সন্দেহ নাই। কী করিব, আমার এইরূপ বাচালতার জন্য আমি আজন্মকাল নিন্দাভোগ করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে এখনও পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া আমার এ-নিন্দনীয় স্বভাবের হস্ত হইতে আমি কিছুতেই মুক্তি পাইলাম না। এজন্য আপনি আমাকে দোষী ভাবিবেন না।

তখন সরলচিত্ত দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের উপর হইতে সহসা একখানা মেঘ কাটিয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : সুন্দরীর আত্মপ্রকাশ

সেই ছাদের দক্ষিণ কোণে আর একটি ছোট ঘর ছিল; রমণী যুবককে লইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরটির চারিদিক উত্তমরূপে বন্ধ। এক পার্শ্বে একটি পরিষ্কার ছোট শয্যা ছিল। অপর পার্শ্বে একটি আলমারি; রমণী যুবককে বসিতে বলিয়া সেই আলমারির ভিতর হইতে আপেল, নাসপাতি, নারাঙ্গী, আঙুর প্রভৃতি সুখাদ্য পরিপূর্ণ একখানি রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ধরিল। সেই সকল আহার্য-সামগ্রীর সুমিষ্ট গন্ধে জঠরের নিভৃত প্রদেশস্থ পরিতৃপ্ত ক্ষুধাও একবার অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে স্বপ্নোত্থিতবৎ চকিতে মাথানাড়া দিয়া স্পষ্টরূপে নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে।

দেবেন্দ্রবিজয় সে-সকলের কিছুই স্পর্শ করিলেন না এবং যতদূর সম্ভব, বিনীতভাবে অস্বীকার করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয়ের দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশত জানি না; কিন্তু রমণী সে-অস্বীকার কিছুতেই স্বীকার করিল না; আঙুরগুচ্ছ হইতে তাড়াতাড়ি একটি সুপক্ব আঙুর ছিঁড়িয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল। দেবেন্দ্রবিজয় মুখ সরাইয়া লইলেন; কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন সেই রমণী সহসা দীপ নিবাইয়া দিল এবং দুই হস্তে দেবেন্দ্রবিজয়ের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বারংবার সবেগে তাঁহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। রমণীর এইরূপ অসম্ভব, অযথা দুর্ব্যবহারে দেবেন্দ্রবিজয়ের হৃদয় হইতে মস্তিস্ক পর্যন্ত বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যে আলোড়িত হইয়া উঠিল। রমণীর সেই অজস্র চুম্বন-বর্ষণে তিনি বিস্ময় প্রকাশেরও এক বিপল মাত্র অবসর পাইলেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ে তাঁহাকে একেবারে নিঃসংজ্ঞ করিয়া দিল; কারণ একজন অপরিচিতার নিকটে এরূপ অযথা ব্যবহার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাহা হইলেও তাঁহার সেই নিঃসংজ্ঞভাব অনেকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না; অকস্মাৎ আলোক-রশ্মির ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে জাগরণের ন্যায়, তাঁহার মনের সেই অন্ধকার অচেতন অবস্থার ভিতর সংজ্ঞার জাগ্রতভাবের সঞ্চার হইল। তিনি রমণীকে জোর করিয়া, অদূরে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তথাপি তাঁহার দুই হস্ত দৃঢ়রূপে ধরিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা করুন—বলুন, ক্ষমা করিলেন, নতুবা আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। এ-হৃদয় যেমনি দুর্বল, তেমনি অদম্য, কিছুতেই বশ মানিবার নয়।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের বুঝিতে বাকি রহিল না, তিনি পিশাচীর হাতে পড়িয়াছেন, সহজে মুক্তি পাইবার আশা নাই। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের ন্যায় সচ্চরিত্র যুবকের মুখে যাহা ভাল শুনায়, তিনি তাহাই বলিলেন, 'আপনি ভদ্রমহিলা, আপনি এ কী করিতেছেন? আমি অপর লোক, আত্মীয় নই, অপরিচিত আমি, আমাকে স্পর্শ করিবেন না; তাহাতে আপনার স্ত্রী-ধর্মের হানি হইবে।'

রমণী দেবেন্দ্রবিজয়ের কথাগুলি মন দিয়া শুনিল এবং তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; কিন্তু তাহার কোনওরূপ ভাববৈলক্ষণ্য দেখা গেল না; না লজ্জিত, না সঙ্কুচিত, না অপ্রতিভ, না বিস্মৃত—কিছুই না! ক্ষণপরে বলিল, 'দেবেন্দ্রবাবু, আপনি যেকালে আমাকে সহসা এতগুলি কথা শুনাইয়া দিলেন, আমি সকলের উত্তর করিতেছি। বলুন দেখি, দেবেনবাবু, আপনি যে আমাকে ভদ্রমহিলা বলিলেন, কিসে আমি ভদ্রমহিলা? যে-লোক জীবনের শেষ-সীমায় দাঁড়াইয়া, মরিতে বসিয়া, আমার মতো একজন অযোগ্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ নারী-জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়া দিতে পারে, সে কিসে ভদ্রলোক? আমার এই বয়স, এই রূপ, এই যৌবন. একি একজন মরণোন্মুখ বৃদ্ধেরই যোগ্য? আর আপনি কিসে অপরিচিত? যিনি একবার সাক্ষাতেই হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানে একটা চিরস্থায়ী আসন পাতিতে পারেন, তিনি কিসে অপরিচিত? সেই এক মুহূর্তের সে-পরিচয়—তেমনটি যে সহস্র বৎসরের হয় না। আর ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী কিসে আমি? বরং ঈশ্বরই আমার নিকটে অপরাধী। তিনি আমাকে জগজ্জয়ী রূপ দিয়া, উদ্দাম যৌবন দিয়া, তাহার ভিতরে একটা চির-তৃষ্ণাতুর হৃদয় দিয়া, শেষে একটি অযোগ্য বৃদ্ধের হাতে সেই সকল সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, সেজন্য কি তিনি আমার নিকটে অপরাধী নহেন? যখন এ-সংসারে একজন জ্ঞানবান বৃদ্ধের ধর্ম নাই, ঈশ্বরের ধর্ম নাই, তখন আমি একটা সামান্য স্ত্রীলোক বই তো নয়—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ—তৃণাপেক্ষাও লঘু, আমার আবার ধর্মাধর্ম কী?'

রমণীর এইরূপ দুরভিসন্ধিপূর্ণ অপ্রত্যাশিতপূর্ব দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন,

তিনি পরের বিপদে মাথা দিতে আসিয়া নিজের বিপদটা অত্যন্ত গুরুতর ঘনীভূত এবং কাজটা অতিশয় অন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। বলিলেন, 'আপনি যা-ই হোন, যেরূপ প্রকৃতিরই হোন, আমার কাছে ও-সকল কথা না বলিলেই ভালো হয়। আমাকে পথ দেখাইয়া দিন। এমন জানিলে আমি কখনওই আপনার সঙ্গে আসিতাম না।'

রমণী বলিল, 'না আসিলে আমারও ভালো হইত। কে জানিত, আপনি এত অল্প সময়ের মধ্যে আমার হৃদয়ে এমন একটা সর্বনেশে পরিবর্তন ঘটাইয়া দিবেন? দেবেন্দ্রবাবু, সত্য বলিতে কি, আমি মরিতে বসিয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন; আমি আপনার পদাশ্রিতা—আমাকে এরূপ কঠিনভাবে ত্যাগ করিবেন না। তাহা হইলে আমি বাঁচিব না। আপনি আমার বিপদ-উদ্ধারের জন্য আসিয়া, এখন আমাকে সহস্রটা বিপদের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। আপনি এরূপ নির্দয়, জানিতাম না।'

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ উপেক্ষিতা

দেবেন্দ্রবিজয়ের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। তিনি একবার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার পর সেই ঘর হইতে বাহিরে আসিবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ঘর হইতে বাহির হইবার পূর্বেই রমণী দ্বারবদ্ধ করিয়া তদুপরি পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। এবং কটাক্ষের পর কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া মৃদুহাস্যে বলিতে লাগিল, 'আমার মুখে আগুন! তাই এমন একটা নিষ্ঠুর অরসিককে দেখিয়া আপনা ভুলিয়াছি!'

দেবেন্দ্রবিজয় কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, 'পথ ছাড়ুন, আমাকে বিপদে ফেলিবেন না।'

রমণী দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল, 'কখনওই না—যাইতে হয়, আমাকে খুন করুন। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একখানি বড় ছুরিকা বাহির করিয়া, দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া) এই ছুরি নিন—আমাকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলুন। এখানে কেহ আসিবে না—কেহ কিছু জানিবে না—কোনও ভয় নাই; তাহার পর আপনার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যান, আমি বাধা দিতে আসিব না। দেবেন্দ্রবাবু, আপনি কেমন জানি না; কিন্তু এরূপ আত্মহারা স্ত্রীলোককে প্রত্যাখ্যান করা অপরের পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইত।' এই বলিয়া সেই লীলাবতী সুন্দরী আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের হস্ত ধারণ করিয়া, যতদূর সম্ভব নিকটবর্তিনী হইয়া দাঁড়াইল।

এদিকে সেই ব্যাকুলা সুন্দরীর অবৈধ আবদার ও অনুচিত দাবি যত সীমা অতিক্রম করিয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে তেমনি আবার দেবেন্দ্রবিজয়ের অত্যধিক ঘৃণা ও বিরক্তি তদধিক সীমাতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইল। ক্রোধভরে দেবেন্দ্রবিজয় তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত রুক্ষস্বরে বলিলেন, 'তুমি পিশাচী, দূর হও—আমাকে স্পর্শ করিও না।'

রমণী আবার ছুটিয়া আসিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিল। অবিচলিতভাবে বলিল, 'ওঃ—দেবেন, তুমি কী নিষ্ঠুর! পুরুষমানুষ এতদূর নিষ্ঠুর হইতে পারে, তা আমি জানিতাম না।'

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা সজোরে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।'

তথাপি সে আবার ছুটিয়া আসিয়া, সেইরূপ আগ্রহভরে দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া, একটা বিদ্যুন্ময় সুতীব্র কটাক্ষপাত করিয়া নম্রস্বরে বলিল, 'তথাপি আমি তোমাকে সেইরূপ অত্যন্ত ভালোবাসি।'

রমণীর বক্ষের বসন শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। দীপালোকে তাহার পীবর যৌবনভারাবনত দেহ অনাচ্ছন্ন অবস্থায় অতিশয় সৌন্দর্যময় বোধ হইতে লাগিল। উন্মুক্ত কেশদাম বিশৃঙ্খলভাবে তাহার চোখ, মুখ, বুক ও পিঠের কোনও অংশ ঢাকিয়া ও কোনও অংশ কিঞ্চিন্মাত্র উন্মুক্ত রাখিয়া আর

একটা অপূর্ব শোভাময় প্রদীপের ক্ষীণালোকপূর্ণ সেই গৃহটি এককালে আলোকিত করিয়া তুলিল। সহনাতীত উৎকণ্ঠায় তাহার ললাটে স্বেদস্রুতি এবং ঘন শ্বাসে তাহার অনাবৃত পীবরোন্নত বক্ষঃস্থল ঘন-ঘন পরিস্পন্দিত হইতে লাগিল। সেই উপেক্ষিতা রমণী নিরুপেক্ষিত ও অনপ্রতিভভাবে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের উপরে তাহার দীপ্ত কৃষ্ণকায় চোখ দুটির চঞ্চল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া স্মিতমুখে বলিল, 'দেবেন্দ্রবিজয়, তুমি যতই আমাকে ঘৃণা কর না কেন, আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ভালোবাসি; কিন্তু আশা করি নাই, আমার এই স্বার্থশূন্য ভালোবাসা তোমার হাতে এরূপ কঠোরভাবে পুরস্কৃত ও উপেক্ষিত হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয় ক্রোধে অন্ধপ্রায় হইলেন, 'কুলটা, তোমাকে স্পর্শ করিতেও পাপ আছে,' বলিয়া তিনি সেই রমণীকে দুই হাতে এরূপ সজোরে ধাক্কা দিলেন, সে একরকম প্রহার করা; সুতরাং রমণী তাহা সামলাইতে পারিল না; ঘরের কোণে গিয়া পড়িল এবং দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া অত্যন্ত আঘাত পাইল। তখন সে লাঙ্গুলাবমৃষ্টা সর্পীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। তাহার প্রচুরায়ত রোষরক্ত চক্ষুদুটি উল্কাপিণ্ডবৎ অতি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল এবং তন্মধ্য হইতে যেন জ্বলন্ত বহ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। সেই বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয় স্তম্ভিত হইলেন, মুখে কথা সরিল না। রমণী তীব্রকণ্ঠে বলিল, 'নারকী, আপনার মৃত্যু আপনি ডাকিয়াছ, এ-অপমানের প্রতিশোধ এইরূপেই হইবে।' এই বলিয়া তখনই পরিত্যক্ত দীর্ঘ শাণিত ছুরিখানা ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া লইল এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের বুকে তাহা আমূল বিদ্ধ করিবার জন্য সবেগে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিল। তৎক্ষণাৎ দেবেন্দ্রবিজয় দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন এবং ছুরিখানা কাড়িয়া লইয়া রমণীকে পুনরায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

রমণী তখনই সবেগে উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। বাহির হইতে বলিল, 'তথাপি তোমার মৃত্যু অনিবার্য।' বাহির হইতে দ্বারে শিকল লাগাইয়া দিল।

দেবেন্দ্রবিজয় দ্বার উদ্‌ঘাটনের কোনও উপায় পাইলেন না। তিনি সেই নির্জন গৃহের মধ্যে এইরূপে বন্দি হইলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ : প্রাণনাশের চেষ্টা

দেবেন্দ্রবিজয় এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন, এ-বিপদ হইতে উদ্ধারের আশামাত্র নাই। সেখানে তাঁহাকে এমনসময়ে একটু সাহায্য করে, এমন কেহ নাই।

রমণী চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই দেবেন্দ্রবিজয় একটা কী অনাঘ্রাতপূর্ব অতি তীব্র গন্ধ অনুভব করিলেন। চারিদিক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াও কারণ নির্দেশ করিতে পারিলেন না। ক্রমশ গন্ধ আরও তীব্র হইতে লাগিল; এমনকী শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, সেখানে এক মুহূর্ত অবস্থান করা মনুষ্য মাত্রেরই সাধ্যাতীত। শেষে দেখিলেন, কোনও অদৃশ্য স্থান হইতে ধূমরাশি সেই ছোট রুদ্ধ ঘরের ভিতরে অল্পে-অল্পে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। এদিকে ঘরের ভিতরে যত অধিক পরিমাণে ধূম সঞ্চিত হইতে লাগিল, সেইসঙ্গে সেই প্রাণান্তকর দুর্গন্ধও তীব্রতম হইয়া উঠিতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, কোনও পার্শ্ববর্তী ঘরে আগুন লাগিয়াছে, অথবা সেই উপেক্ষিতা সর্পিণীসদৃশা স্ত্রীলোকটি সেই গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইতে অপমানকারীর মৃত্যুর পথ সহজ ও সরল করিয়া দিয়াছে; কিন্তু পরক্ষণেই সে ধারণা দেবেন্দ্রবিজয়ের মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল; কারণ ঘরে আগুন লাগিলে সে-ধূম এমন উত্তাপশূন্য কিংবা এমন একটা উগ্র গন্ধযুক্ত হইত না। সে-গন্ধ অত্যন্ত বিষাক্ত সন্দেহ নাই; নতুবা তাঁহার মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিয়া শাণিত ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে থাকিবে কেন? দেবেন্দ্রবিজয় তখন বুঝিলেন,

আর নিশ্চিন্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার এ সময় নহে। তিনি উঠিয়া দ্বারের নিকটে গেলেন, এবং উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া দ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন—চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি বাহির হইতে না পারেন, নাই—নাই, তখন সেই নিবিড়তর ধূমরাশির কতকটা বাহির হইয়া গেলে, তিনি তখনকার সেই শ্বাস-রাহিত্যের অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং ইহার পর অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে, মনে করিয়া তাড়াতাড়ি রুদ্ধ গবাক্ষগুলি উন্মোচন করিতে গেলেন; তাহাতেও তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন; সবগুলিই বাহির হইতে বন্ধ; এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ যে, কিছুতেই খুলিল না। তখন তিনি একান্ত নিরাশ ও নিরুপায় হইয়া ছুটিয়া গিয়া, দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া সেই রুদ্ধদ্বারে পদাঘাতের উপর পদাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র গৃহ সেই পদাঘাতের শব্দে যেন ফাটিয়া পড়িবার মতন হইল, তথাপি সেই কঠিন কবাট-জোড়াটা কঠোর ও অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া সেই দুঃসহ পদাঘাতগুলা অনায়াসে সহ্য করিয়া, পূর্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

এমন সময়ে বাহির হইতে কে বলিল, 'বৃথা চেষ্টা—দেবেন্দ্র, বৃথা চেষ্টা। স্ত্রীলোক উপেক্ষিতা হইলে পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী হয়। বিধির লিখন, তোমার মৃত্যু এইরূপেই হবে। মরিতে বসিয়াছ, নিজে মরো—কবাট-জোড়াটার অপরাধ কী?'

তাহার পর খল-খল—কী ভয়ানক অট্টহাস্য!

সেই তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্য বিদ্যুতের শিখার ন্যায় সেই ধূমময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরক্ষণেই বাহিরের মুক্তপ্রকৃতির দূর-দূরান্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে ক্ষীণ—ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া গেল। তারপর, সকলই নীরব।

দেবেন্দ্রবিজয় স্বর শুনিয়া বুঝিলেন, সেই তীব্র উপহাস এবং সেই উপহাসের অতি তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্যকল্লোল আর কাহারও নহে—এ-সেই দস্যু-রমণীর—সেই পিশাচীর!

রুদ্ধশ্বাসে সেই ক্ষুদ্র রুদ্ধকক্ষ-মধ্যে দেবেন্দ্রবিজয় ইতস্তত ছুটিতে লাগিলেন। পূর্বেই নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, এখন যে সামান্য জ্ঞান ছিল, তাহাও লুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। সেই বিষাক্ত গন্ধ দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গ ক্রমে অবশ করিয়া আনিল। তখন সেই দুর্গন্ধ ধূম গৃহের মধ্যে এত নিবিড় হইয়াছিল যে, তন্মধ্যে সেই দীপশিখা একান্ত ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল এবং তাহার ক্ষীণ আলোক-রশ্মি তন্মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহটি দেবেন্দ্রবিজয়ের চোখে আরও অন্ধকার দেখাইতেছিল। তিনি সহনাতীত যন্ত্রণায় আকুল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন এবং বুকফাটা-কণ্ঠে চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'কে আছ, শীঘ্র এসো, রক্ষা করো—বাঁচাও—বাঁচাও—মৃত্যু—মৃত্যু—ভয়ানক মৃত্যু!'

ক্রমে তাঁহার পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া আসিল; তিনি মাতালের মতো টলিতে-টলিতে পড়িয়া গেলেন। দুইবার পড়িলেন, দুইবারই উঠিলেন, তাহার পর আর উঠিতে পারিলেন না—সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিষের হল্কা ছুটিতেছিল, তাই দুর্বিষহ যন্ত্রণায় কক্ষতলে পড়িয়া তিনি ছটফট করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল।

সেই সময়ে তিনি স্বপ্নবৎ দেখিলেন, যেন একজন দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত যুবক একটা অত্যন্ত শব্দ করিয়া সেই গৃহমধ্যে দ্রুত প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

সেই সময়ে তিনি একেবারে নিঃসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন; যেন তাঁহার ক্ষীণতম দৃষ্টির ও সেই অপরিস্ফুট দৃশ্যের মাঝখানে সমস্ত ঢাকিয়া একখানা মসীময় যবনিকা-পাত হইল।

চতুর্থ খণ্ড

প্রতিহিংসা-মূর্তিমতী

Sacha. He catches her—
Melisa. And now he lets her go—
Again she's in his grasp—
Psyche. And now she is not !
He seizes her back hair—
Blanche. And it comes off ?

GILBERT
"The Princes"
Scene III

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারিত

যখন দেবেন্দ্রবিজয়ের জ্ঞান হইল, দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে মুক্ত পৃথিবীর চারিদিক প্রভাতরবির হিরণ্য-প্রবাহে পুলকিত এবং প্রদ্যোতিত; তিনি নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে, নৌকার উপরে। দাঁড়িরা অদূরে বসিয়া সশব্দে, দ্রুতহস্তে দাঁড় নিক্ষেপ করিয়া নৌকাখানাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে একদিক হইতে অপরদিকে লইয়া যাইতেছিল। নদীর দুই পার্শ্ব নীরব; কেবল দূর পল্লীমধ্য হইতে ক্রীড়াপরায়ণ বালকদিগের হাস্যকল্লোল এবং কোনও নিদ্রোত্থিত দুগ্ধপোষ্যের রোদনধ্বনি এক-একবার অস্ফুট শোনা যাইতেছিল। অনতিদূরস্থ একটি দেবদারুর শীর্ষদেশ হইতে করুণকণ্ঠ 'বউ-কথা-কও' পাখি, আলোকম্বরা ধরণীর নগ্ন বক্ষ শব্দ-তরঙ্গে প্লাবিত করিয়া অভিমানমৌন প্রিয়াকে অবিশ্রাম সপ্রেম-সম্ভাষণ করিতেছিল। তাহার সেই বেদনা-গীতি, সেই শোভন স্তব্ধ, সুন্দর কিরণোজ্জ্বল প্রভাতের অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে নিরতিশয় মধুর শুনাইতেছিল এবং তটস্থ সঙ্গীহীন দীর্ঘ গাছগুলার ছায়া দীর্ঘতর হইয়া নদীবক্ষে—অনেকদূর অবধি প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় মুগ্ধনেত্রে ও অতি বিস্ময়ের সহিত সেই-সকল দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন। কতক্ষণ পরে, কিরূপে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল, তাহা কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; এমনকী তখনও তিনি যে সসংজ্ঞ হইয়াছেন, সে-বিষয়েও তাঁহার মনে একটা দারুণ সন্দেহ হইতেছিল। মনে হইতেছিল, ইহাও একটা স্বপ্নের খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তিনি কিছুতেই তাঁহার সেই ভয়ানক বিপদের কথা আগাগোড়া মনে করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অতিকষ্টে তিনি সেইসকল একটু-একটু স্মরণ করিতেছিলেন; তথাপি তখন সেই দস্যু-রমণী ও আশ্চর্য রোগীর মুখ ভালোরকমে তাঁহার মনে আসিতেছিল না; তাঁহার অবসন্ন দেহ, যে দীর্ঘাকৃতি অপরিচিত ব্যক্তি গৃহতল হইতে আপনার বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহার মুখ যদিও এক-একবার মনে পড়িতেছিল, কিন্তু কিছুতেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না; একটা প্রহেলিকাময় অপূর্ব দৃশ্য যে, তখন হইতে এখন পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি-সম্মুখে অভিনীত হইতেছে, ইহাই যেন তাঁহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল। এখনও যেন সেই ধূম, সেই উগ্র গন্ধ তাঁহার শ্বাসরোধ করিতেছে। তিনি অতিকষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছিলেন। মাথা ও বুক অত্যন্ত ভারী বোধ হওয়ায় তিনি চেষ্টা করিয়াও সোজা হইয়া বসিতে পারিতেছিলেন না; একটা দুর্বিষহ উন্মাদক নেশা তাঁহার মস্তিষ্ক পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। তিনি সেই নেশার ঝোঁকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'একি ভয়ানক জটিল রহস্য! স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এইরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াই কি তাহারা দিনাতিপাত করে! সেই স্ত্রীলোকটি—কত সুন্দর দেখিতে সে! কে তাহাকে দেখিয়া বুঝিবে, তাহার হৃদয় এইরূপ কালকূটে ভরা; নিশ্চয় তাহারা দুইজনে মিলিয়া, আমাকে খুন করিয়া আমার নিকটে যা কিছু আছে, সমস্তই কাড়িয়া লইবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু আশ্চর্য! কে আমায় সেই ভয়ানক মৃত্যু হইতে, আরও সেই ভয়ানক খুনিদের হাত হইতে উদ্ধার করিল? এখন আমি কোথায়? কোথায় যাইতেছি? এ-নৌকার উপরেই বা আমাকে কে লইয়া আসিল?'

নৌকা দ্রুতগতিতে চলিতেছিল বলিয়া, নদীবক্ষের শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ প্রতিকূল বায়ু দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গে প্রবলবেগে সঞ্চালিত হইয়া ক্ষণে-ক্ষণে স্পষ্টরূপে তাঁহার দুর্বল মস্তিষ্কের বলীধান করিতেছিল। দেবেন্দ্রবিজয় একজন দাঁড়িকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ, এ-নৌকার উপরেই বা কে আমাকে লইয়া আসিল?'

নৌজীবীদের দল তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না—ঝপ্‌ঝপ্ শব্দে দাঁড় বাহিয়া সেইরূপ দ্রুততরবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রবিজয় পূর্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছ?'

নৌ-বাহকদের মধ্যে একজন বলিল, 'আমরা আপনাকে ঠিক নিয়ে যাব, সেজন্য আপনার কোনও চিন্তা নাই। আপনি একটু চুপ করে বসুন।'

যুবক বিরক্ত হইয়া মনে করিলেন, কোথায়? যমপুরীতে না কি? সেই ভয়ানক মৃত্যুর পর কি এ যমপুরী-যাত্রা না কি? প্রকাশ্যে বলিলেন, 'আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ, না বলিলে আমি কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে যাইব না। আমাকে এখানে নামাইয়া দাও।'

এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া মাঝি সেইখানে উপস্থিত হইল এবং দেবেন্দ্রবিজয়কে বিনীতভাবে বলিল, 'আপনার বাড়িতেই আপনাকে নিয়ে যাব, আমরা আপনার ঠিকানা জানি, আপনি এখন ব্যস্ত হবেন না—একটু স্থির হয়ে বসুন। আপনার এখনও নেশা আছে।'

মাঝি যদিও কথাগুলি যতদূর-সম্ভব মিষ্ট করিয়া বলিল, কিন্তু দুরদৃষ্টবশত তাহা দেবেন্দ্রবিজয়ের নিতান্ত নীরস ও অস্থিদাহকারীবৎ বোধ হইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সবেগে উঠিয়া মাঝিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা! মূর্খ, আমি কোথায় থাকি, তুমি কি তা জানো যে, আমাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে?' এই বলিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা করিলেন মাত্র, উঠিতে পারিলেন না, অর্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, মাঝি যে তখনও তাঁহার নেশা আছে বলিয়া ক্রোধোদ্রেক করিয়াছিল, সেটা নিতান্ত মিথ্যাপবাদ নহে; নিঃসন্দেহ সত্য। তখনও তাঁহার মাথাটা বেশ ঘুরিতেছিল এবং পা দুখানি তাঁহার দেহভার বহনে একান্ত অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত টলিতেছিল। মাঝির মূর্খতা হইতে তাঁহার মূর্খতা যে বহুপরিমাণে অধিক, বুঝিতে পারিয়া সর্বতোভাবে দুঃখিত হইলেন। হতাশভাবে একপার্শ্বে বসিলেন।

মাঝি দেবেন্দ্রবিজয়ের সেইরূপ ভাব দেখিয়া সেজন্য কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'আপনার বাড়ি ওপারে কামদেবপুরে; আপনার নাম তো অরিন্দমবাবু?'

দেবেন্দ্রবিজয় উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিলেন, 'আমার নাম অরিন্দমবাবু নয়—বাড়িও কামদেবপুরে নয়।'

মাঝি বলিল, 'তবে কি সেই ভদ্রলোকটি আমাকে মিথ্যা বলিলেন?' মাঝি মনে ভাবিল, 'বাবুর এখনও বেশ নেশা আছে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কে সে ভদ্রলোক? কে আমাকে নৌকায় তুলিয়া দিল? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি এখনই আমাকে সবকথা খুলিয়া বলো।'

মাঝি বলিতে লাগিল, 'বাবু, আপনি কাল রাতে বড় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন। এত মদ খেয়েছিলেন যে, আপনার একটুও জ্ঞান ছিল না। একটা বটগাছের তলায় মড়ার মতো পড়েছিলেন। সে যাই হোক, তাতে আর হয়েছে কী, আজকাল অনেক ভদ্রলোকেরই এমন হয়ে থাকে। সেখানকার একটি ভদ্রলোক সেইরূপ অবস্থায় আপনাকে দেখতে পেয়ে আমাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, মথুর, একটা কাজ কর দেখি, এই ভদ্রলোকটিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয়। যদি কোনও লোক দেখিতে পায়, তাহা হইলে এখনি ফাঁড়িতে টেনে নিয়ে যাবে। এ-লোকটি কোথায় থাকে, আমি জানি; এই চিঠিখানা জামার পকেটে পাওয়া গেছে, এই চিঠিতে ঠিকানা লেখা আছে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কে সে ভদ্রলোক, তুমি তাকে চেনো?'

মাঝি উত্তর করিল, 'না বাবু, আমি চিনি না।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'তবে সে কেমন করিয়া তোমার নাম ধরিয়া ডাকিল?'

মাঝি একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'তা কী করে জানব, বাবু—তার আগে সে-ভদ্রলোকটিকে আর কখনও কোথায় দেখেছি, আমার তো বাবু, ভালো মনে পড়ে না। কিন্তু তিনি আমাকে নিশ্চয়ই চিনেন তা না হলে, কেমন করে আমার নাম জানতে পারলেন। যাই হোক, লোকটি নিতান্ত ভদ্রলোক, খুব দয়ার শরীরও বলতে হবে; নইলে আজকালকার বাজারে কে কাকে দেখে, বলুন দেখি? আপনার

বাপ-ভাইকে কেউ দেখে না, তা পর। আপনার জন্য অনেক করেছেন! আপনাকে নিয়ে যাবার ভাড়াটি পর্যন্ত তিনি নিজের কাছে থেকে আমাদের আগে চুকিয়ে দিয়েছেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে ভদ্রলোকটির বয়স কত, কী রকম দেখতে—লম্বা না বেঁটে, মোটা না রোগা, দাড়ি-গোঁফ আছে, না নাই ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন। মাঝি সেইসকল প্রশ্নের যেরূপ উত্তর করিল, তাহাতে সর্বতোভাবে গত রাত্রের সেই অদ্ভুত অদৃষ্টপূর্ব রোগীকেই বুঝায়। দেবেন্দ্রবিজয় মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে-চিঠির কথা বলিতেছিলে, সে চিঠিখানা কোথায়? আমি সেখানা একবার দেখিতে চাই। আমাকে সেখানা দাও।'

মাঝি বলিল, 'সে-চিঠি আপনার জামার পকেটে আছে, তিনি ঠিকানাটা আমাদের একবার পড়ে শুনিয়ে দিয়ে, তখনই আবার আপনার জামার পকেটে রেখে দিয়েছেন।'

পকেটে হাত দিয়ে দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'মাঝি, সর্বনাশ হয়েছে! তারা চোর, তারা ডাকাত—তারা অতি ভয়ানক লোক—ঘোর বিশ্বাসঘাতক! তোমরাও সেই খুনিদের লোক দেখিতেছি। আমার হাতে কেহই নিস্তার পাবে না, এর ফল তোমরা নিশ্চয়ই পাবে।'

মাঝি সে-কথার কোনও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অত্যধিক বিস্মিত এবং কতক বা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বলিল, 'কী হয়েছে, বাবু? আমরা কিছুই জানি না।'

'সব জানো তোমরা,' বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মাঝির মুখ হইতে কথাটা যেন লুফিয়া লইলেন। ক্রোধভরে বলিলেন, 'আমার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটি, পকেটে নগদ তিনশতের অধিক টাকা ছিল, সব চুরি করে নিয়েছে—তারা সহজ লোক নয়। এখানে যদি কোনও থানা থাকে, আমাকে সেইখানে নিয়ে চলো। এখনই ইহার একটা প্রতিকার করা চাই।'

দেবেন্দ্রবিজয় এ-পকেট, সে-পকেট করিয়া তিনখানি অদৃষ্টপূর্ব পত্র বাহির করিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি তাঁহারই নামে লিখিত এবং বিভিন্ন হস্তাক্ষরে লিখিত। আর একখানির উপরে কামদেবপুরের ঠিকানা দিয়া অরিন্দমের নাম লিখিত ছিল। দেবেন্দ্রবিজয় অটল মনোযোগের সহিত তিনখানি পত্রই পাঠ করিলেন। পাঠশেষে তিনি মাঝিকে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমারই নাম অরিন্দম—আমার বাড়ি কামদেবপুর, যত শীঘ্র পারো, সেইখানে নৌকা লইয়া চলো।'

তাহাতে মাঝি কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না; কারণ তখনও তাহার একান্ত বিশ্বাসের সহিত বেশ মনে হইতেছিল, নেশাটা এখনও বাবুর মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

নৌকা সেইরূপ সবেগে চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পত্রাবলী

নৌকা যথাসময়ে হুগলির ঘোলঘাটে আসিয়া লাগিলে, দেবেন্দ্রবিজয় তন্মধ্য হইতে অবতরণ করিলেন। মাঝির মুখেই শুনিয়াছিলেন, নৌকার ভাড়া পূর্বেই তাহারা পাইয়াছে, সেজন্য এক্ষণে তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইতে হইল না। নৌ-বাহকদিগের নির্দোষতার প্রমাণ সেই পত্র-ত্রয়ের একখানির মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিল; দেবেন্দ্রবিজয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

অরিন্দমের বাটির অনুসন্ধান করিতে দেবেন্দ্রবিজয়কে কিছুমাত্র আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেখানকার সকলেই অরিন্দমকে চিনিত। যখন দেবেন্দ্রবিজয় অরিন্দমের বাটিতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া একান্ত মনঃসংযোগপূর্বক একখানি সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। সহজেই সাক্ষাৎ হইল। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বসিতে বলিয়া, সংবাদপত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া নিজে ভালো হইয়া বসিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, আপনার নাম কি অরিন্দমবাবু?'

অরিন্দম ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনার নামে একখানি পত্র আছে।'

এই বলিয়া তিনি সেই তিনখানি পত্রের ভিতর হইতে অরিন্দমের পত্রখানি বাছিয়া বাহির করিলেন।

অরিন্দম পত্রখানি পাঠ করিলেন, পত্রখানি এইরূপ—

'সুহৃদ্বরেষু—

বহুদিন হইতে তোমার কোনও সংবাদ না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি; আপাতত আমার কুশল জানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়ো। তুমি অযাচিতভাবে আমার যে কত উপকার করিয়াছ, তাহা আমি যতদিন তোমার মৃত্যু না হয়, ততদিন কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিব না।

কিন্তু যতদিন না বিস্মৃত হইতে পারিব, ততদিন আমি কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিব না; সেজন্য যাহাতে তোমার মৃত্যুটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী হয়, সেজন্য যত্নের ত্রুটি করিব না।

বুঝিয়াছি, তুমি কোনওরকমে আমার সন্ধান করিতে পারিতেছ না: সেজন্য এখনও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছ না দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পত্রবাহক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের নিকটে আমার সন্ধান পাইবে। উক্ত ভদ্রলোকটি আমার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছিলেন।

ফুলসাহেব।'

পত্রখানি পড়িয়া অরিন্দম বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জন্য ফুলসাহেব কর্তৃক আবার এক অভিনব রহস্যের সুচারু আয়োজন হইতেছে। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এ-পত্র কোথায় পাইলেন?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'পত্র আমি কোথায় পাইয়াছি, কখন পাইয়াছি, কে দিয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইবেন না—আপনাকে সকল কথা ভালো করিয়া বুঝাইয়া না বলিলে, আপনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবেন না: ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'কোনও বাধা না থাকিলে আপনি সে-সকল কথা আমাকে বলিতে পারেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় গতরাত্রের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। বিন্দু-বিসর্গ গোপন না করিয়া অকপটে সমুদয় বলিয়া গেলেন। সে-সকলের পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। শুনিয়া অরিন্দম কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না; তিনি জানিতেন, ফুলসাহেবে সকলই সম্ভব। দেবেন্দ্রবিজয় যে তাঁহার হাত হইতে প্রাণসমেত ফিরিতে পারিয়াছেন, এতবড় দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে ওইটুকু কিছু বিস্ময়জনক।

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি যে আরও দুইখানি পত্রের কথা বলিলেন, সেই দুইখানি বোধহয়, আপনি নষ্ট করেন নাই?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমার কাছেই আছে, আপনি পড়িতে পারেন।'

এই বলিয়া দেবেন্দ্রবিজয় নিজের সেই পত্র দুইখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন। অরিন্দম ব্যগ্রচিত্তে পড়িতে লাগিলেন—

'দেবেন্দ্রবিজয়!

তুমি আমাকে চেনো না, কিন্তু তোমাকে আমি খুব চিনি। তোমার বাড়ি ভবানীপুর এবং তুমি কীজন্য বেণীমাধবপুরে গিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি এবং সেখানে গোপালচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রেবতীর উদ্ধারের জন্য কোনও একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করিতে কলিকাতায় ফিরিতেছিলে, তাহাও জানি। যদি বাপু, আমার পরামর্শ শুনিতে চাও—যদি গোয়েন্দার মতো গোয়েন্দার হাতে কাজটি দিতে চাও তাহা হইলে হুগলি জেলার অরিন্দম বসুকে যাহাতে ঠিক করিতে পারো, আগে সে চেষ্টা দেখো। আমি জানি, তুমি রেবতীকে অত্যন্ত ভালোবাসো এবং তোমারই সহিত তাহার বিবাহ হইবার কথা ছিল। তোমার মামা মহাশয় সেজন্য যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন; কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। অত্যন্ত অর্থাভাব হইয়াছিল বলিয়া তোমাকে একটু কষ্ট দিলাম। বেণীমাধপুরের যে কেশববাবুর নাম শুনিয়াছ, আমি সেই কেশববাবু।'

অপর পত্রখানি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা, এইরূপ—

'দেবেন্দ্রবিজয়!

তোমাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইলে; মনে করিয়ো না, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। ছিপে মাছ ধরা পড়িলে, যেমন সেটাকে খেলাইয়া শেষে উপরে তুলিতে বেশি আনন্দ হয়, তোমার মৃত্যুতে আমার সেইরকমের একটু আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়াই, তোমাকে আপাতত ছাড়িয়া দিলাম। তুমি এখনও বুঝিতে পারো নাই, তুমি কাহার ক্রোধে পড়িয়াছ; যেদিন তোমার বুকের রক্তে জুমেলিয়া তাহার উভয় করতল ধৌত করিবে, সেইদিন হইতে সেই অপমান, সেই লাঞ্ছনা এবং সেই ঘৃণার ঠিক প্রতিশোধ হইবে এবং সেইদিন বুঝিতে পারিবে, উপেক্ষিতা রমণী সর্পিণী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী।

সর্পিণী জুমেলিয়া।'

অরিন্দম পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেশব আর ফুলসাহেব-সংক্রান্ত লীলা-খেলা একজনেরই। ইহাতে নূতনত্ব কিংবা আশ্চর্যের কিছুই নাই। পত্রপাঠ শেষে অরিন্দম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'দেবেন্দ্রবাবু, আপনার পূর্বজন্মের খুব একটা সুকৃতি ছিল, তাই আপনি এমন খুনিদের হাত থেকে নিজের দেহটাকে সচেতন অবস্থায় বাহির করিয়া আনিতে পারিয়াছেন।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনি কি ওদের চিনেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'ওই রকম দুই-একজন মহাত্মাকে না চিনিলে আমাদের পেশা চলে কই? আপনি রেবতীর কাকা গোপালবাবুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কোনও বিশেষ সংবাদ রাখেন কি?'

দেবেন্দ্র। তিনি মহৎ লোক; সেখানকার সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে।

অরিন্দম। আপনি যদি আমার সহিত দুই-চারিদিন থাকিয়া আমার কিছু সহায়তা করেন, আমি রেবতীর উদ্ধারের উপায় করিয়া দিতে পারি। সম্মত আছেন?

দেবেন্দ্র। আমার আপত্তি কিছুই নাই, তবে আমার দ্বারা আপনার এমন কী বিশেষ সাহায্য হবে, বলিতে পারি না।

অরি। (সপরিহাসে) যে-বাড়িতে কাল আপনি শুভ নিশিযাপন করেছিলেন, সেখানে আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে। পথ মনে আছে কি?

দেবে। না, বনের ভিতর দিয়া রাত্রে গিয়াছিলাম; এখন সে-পথ ঠিক করা কঠিন; তবে চেষ্টা করিলে সেখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

অরি। বেশ চলুন, আজ আহারাদির পর যাত্রা করা যাক। যেরূপে হউক, আজ সেখানে পৌঁছিতেই হইবে।

তখন তাঁহাদের মধ্যে ফুলসাহেব ও রেবতী সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। সে-সকলের উল্লেখ এখানে বাহুল্য বোধ করিলাম। অরিন্দমের মুখে ফুলসাহেবের অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক গুণগ্রাম শ্রবণে দেবেন্দ্রবিজয় অসম্ভবরূপে বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। এবং ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার মানবমূর্তি তাঁহার ধারণা-পটে ভীষণ আসুরিক বিভীষিকায় অবিকল চিত্রিত হইয়া গেল। অরিন্দম রেবতীর সম্বন্ধে কোনও কথাই তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে প্রকাশ করিলেন না; বরং তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকট হইতে রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ অত্যাশ্চর্য অন্তর্ধান

সেদিন দেবেন্দ্রবিজয় অনুরুদ্ধ হইয়া অরিন্দমের বাসায় আহারাদি শেষ করিলেন। আহারাদির পর অনতিবিশ্রামে উভয়ে ফুলসাহেব-সন্দর্শনে বাহির হইলেন। তাঁহারা যত শীঘ্র ফুলসাহেবের সহিত দেখা করিবেন, মনে করিয়াছিলেন, কাজে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। দেবেন্দ্রবিজয় অনেকবার পথ ভুল করিয়া ফেলিলেন। যখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন তাঁহারা ফুলসাহেবের বাগান বাটির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। একজন কৃষক সেখান দিয়া যাইতেছিল, অরিন্দম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ বাগান কার?'

কৃষক বলিল, 'জানকী বোসেদের।'

অরিন্দম একটু চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, 'কোন জানকী বসু? তিনি কোথায় থাকেন?'

কৃষক বলিল, 'তিনি মারা গেছেন, তেনার বাড়ি বেণীমাধবপুর, আমাদের জমিদার।' কৃষক চলিয়া গেল।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'রেবতীর পিতার নাম জানকীনাথ বসু না? দেবেন্দ্রবাবু, রেবতীর অপহরণ সম্বন্ধে অনেক রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে, বোধকরি। আপনিও এখন তাহা কিছু কিছু বুঝতে পারছেন। রেবতীর কাকা গোপাল বসুকে আপনি যতদূর সদাশয় মনে করেন, সন্দেহ হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি ঠিক তেমনটি নন। একদিন অরিন্দমের হাতে পড়লে তিনি রাং কি সোনা সহজেই জানা যাবে।'

তখনই দুইজনে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অযত্নে বাগান বনের মতো ভীষণ হইয়াছে, এবং বন্য আগাছায়, লতাপাতায়, কণ্টকাকীর্ণতায় মনুষ্যের দুরতিক্রম্য। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই গাছের আড়ালের ফাঁক দিয়া সেই বাগান-বাড়ির ছাদের কিয়দংশ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। উভয়ে দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া তাহারা দেখিলেন, বাড়িটির পশ্চিম পার্শ্বের দ্বিতলস্থ একটি গবাক্ষ উন্মুক্ত রহিয়াছে; সেখানে দাঁড়াইয়া রূপলাবণ্যময়ী মুক্তকেশী কোনও নারীমূর্তি। দূর হইতে দেখিয়াই অরিন্দম তাহাকে চিনিতে পারিলেন। এ সেই মতিবিবি—স্বামীহন্ত্রী, মানবী-মূর্তিতে দানবী, বিধাতার একটি অনাগত সৃষ্টি। দেবেন্দ্রবিজয়ও তাহাকে চিনিতে পারিলেন, চিনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়, এই সেই ডাকিনী, আমি ইহারই কথায় ভুলিয়াছিলাম।'

অরিন্দম মৃদুস্বরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমি উহাকে খুব জানি; তবে এখন এক কাজ করুন, এখন আমরা এদিক দিয়া না গিয়া ওই উত্তর দিকের পথ ধরিয়া যাই, তাহা হইলে জুমেলিয়া আমাদের দেখিতে পাইবে না; অথচ আমরা ওইদিক দিয়া অলক্ষ্যে বাড়ির ভিতরে যাইতে পারিব।'

অরিন্দমের কথামতো কাজ হইল। যাহাতে জুমেলিয়া তাঁহাদের দেখিতে না পায়, এরূপভাবে তাঁহারা অন্যদিক দিয়া বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এবং সরাসরি উপরে উঠিয়া—যে-ঘরে জুমেলিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সেই ঘরের ভিতরে ঢুকিলেন। অরিন্দম যেমন জুমেলিয়াকে ধরিতে যাইবেন, জুমেলিয়া ছুটিয়া গিয়া পার্শ্ববর্তী ঘরে এবং সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া, বাহিরের বারান্দায় পড়িয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পলাইতে লাগিল। অরিন্দমও তাহার পশ্চাতে-পশ্চাতে ছুটিতে লাগিলেন। অবশেষে জুমেলিয়া একটি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া দিল। সেই মুহূর্তেই অরিন্দম এমনি জোরে সেই কবাটের উপর পদাঘাত করিলেন যে, সেই একটি আঘাতেই কবাট-জোড়ার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল এবং বিকট শব্দ করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া গেল। একলম্ফে অরিন্দম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কী আশ্চর্য! সেখানে কেহই নাই—না জুমেলিয়া, না তাহার কোনও চিহ্ন। সেই ঘর হইতে বাহির হইবার আর কোনও দরজা ছিল না, যে দুই-একটা জানালা ছিল, তাহাও লৌহের গরাদ দেওয়া; এবং গরাদগুলি যেরূপ সুদৃঢ়ভাবে গ্রথিত, নাড়িয়া ভালোরকম করিয়া পরীক্ষা করিতে হতভম্ব, বিস্মিত অরিন্দমের আর সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ রহিল না। তন্ন-তন্ন করিয়া তিনি ঘরের চারিদিক দেখিতে লাগিলেন; জুমেলিয়ার সন্ধান হইল না। ঘরের ভিতরে এমন কিছু ছিল না, এক পার্শ্বেই একটি আলমারি ও একটি ছোট খাটে ছোট বিছানা। আলমারিটি খোলা ছিল, সেটাকে তিনি আরও ভাল করিয়া খুলিয়া দেখিলেন, সেখানেও জুমেলিয়ার অস্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব; এবং জুমেলিয়ার মানবীত্বের উপরে তাঁহার ঘন-ঘন সন্দেহ হইতে লাগিল।

এদিকে যেমন একটা অপূর্বদৃষ্ট রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত নাটকের একটা অলৌকিক দৃশ্য অভিনীত হইয়া গেল, ঠিক এই সময়ে অপর স্থানে এই রকমের আর একটা অভিনয় চলিতেছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ পাতাল-প্রবেশ

অরিন্দম যখন জুমেলিয়াকে ধরিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তখন দেবেন্দ্রবিজয় একটা স্ত্রীলোককে ধরিতে তাঁহার মতন দুইজন বীরপুরুষের অগ্রসর হওয়া অতিশয় লজ্জাজনক ও অনাবশ্যক মনে করিয়া, সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। হতভাগ্য দেবেন্দ্রবিজয় সেই 'একটা স্ত্রীলোকের' নিকটে তেমন উচ্চশিক্ষা পাইয়াও শিখিতে পারিলেন না যে, সে ঠিক 'একটা স্ত্রীলোকের' মতন নহে; সে মানবী-মূর্তিতে রাক্ষসী—রাক্ষসী অপেক্ষা ভয়ঙ্করী। দেবেন্দ্রবিজয় মনে করিলেন, অরিন্দম জুমেলিয়াকে নিশ্চয় ধরিবেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি যদি সেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারেন, তাহা হইলে একটা কাজের মতন কাজ হয় এবং অরিন্দম যেমন তাঁহার কিঞ্চিৎ সহায়তা ও কিঞ্চিৎ উপকার হইবে বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সাহায্যপ্রার্থী অরিন্দমেরও এই সময়ে যথেষ্ট উপকার এবং সাহায্য করা হইবে; এই মনে করিয়া তিনি ফুলসাহেবের সন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। এমন সময়ে নিম্নতলে কাহার পদশব্দ হইল, তখনই অনুসন্ধিৎসু দেবেন্দ্রবিজয় অনুসন্ধেয় ফুলসাহেবকে সমুচিত শিক্ষা দিতে দ্রুতপদে নিচে নামিয়া আসিলেন। সেখানে দেখিলেন, তাঁহার সেই গতরাত্রির অদ্ভুত রোগী মহাশয় তাঁহার দিকে না

চাহিয়া একটি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রবিজয় তখন ছুটিয়া গিয়া সেই ঘরের দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

ফুলসাহেব দেবেন্দ্রবিজয়কে সহসা সম্মুখীন দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'কী গো, দেবেন্দ্রবাবু যে, কী মনে করে আবার?'

দেবেন্দ্রবিজয় বজ্ররবে বলিলেন, 'কী মনে করে—এখনই জানিতে পারিবে; নারকী, আমার হাতে উপযুক্ত শিক্ষা পাইবে।'

ফুলসাহেব পূর্ববৎ মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, 'বটে, তুমি আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আসিয়াছ! বেশ—বেশ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আচ্ছা, শিক্ষাটা তুমি একাকী দিতে আসিয়াছ, না তোমার সঙ্গে আর কেহ আসিয়াছে? অরিন্দম আসে নাই?"

দেবেন্দ্রবিজয় সে-কথায় কর্ণপাত না করিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিলেন। সেই পিস্তল তিনি অরিন্দমের নিকটে পাইয়াছিলেন। পিস্তল ফুলসাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'যদি পলাইবার চেষ্টা করো, তাহা হইলে এই পিস্তলের গুলিতে তোমার মাথার খুলি উড়াইয়া দিব।'

ফুলসাহেব কিছুমাত্র ভীত না হইয়া পূর্ববৎ স্মিতমুখে বলিল, 'না, পলাইব কেন? তোমার ভয়ে? না তোমার ওই পিস্তলের ভয়ে? আমাকে গ্রেপ্তার করিবে মনে করিয়াছ?'

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ।

ফুল। কখন?

দেবেন্দ্র। এখনই।

ফুলসাহেব হাসিতে লাগিল—সেইরূপ বিদ্রূপের মৃদুহাসি। বলিল, 'তুমি কি মনে করিয়াছ, তুমি আমার হাতে হাতকড়া পরাইতে থাকিবে, আর আমি এমনি ভালোমানুষটির মতো চুপ করে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে থাকিব?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'তাই তোমাকে করিতে হইবে।'

ফুল। আর তা যদি না করি?

দেবেন্দ্র। তোমাকে হত্যা করিব।

ফুল। না, এতটা কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আমি এখান হইতে নড়িব না, তোমার মনের অভিলাষটা পূর্ণ করো; কিন্তু দেবেন্দ্র, আমি তো নড়িব না, কিন্তু তুমি যে আমাকে এখান থেকে একচুল নড়াতে পারবে, এমন বোধ হয় না।

দেবেন্দ্রবিজয় 'সে-বন্দোবস্ত আমি করিতেছি,' বলিয়া যেমন ফুলসাহেবকে ধরিতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন, সহসা একটা বিকট শব্দ হইল এবং সেইসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয়ের সর্বাঙ্গ সেখান হইতে এক নিমেষে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফুলসাহেব হাসিতে-হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কেশরী ও শার্দূল

দেবেন্দ্রবিজয়ের অকস্মাৎ পাতাল-প্রবেশের এবং নিজের বিজয়-বার্তা জুমেলিয়ার শ্রুতিগোচর করিবার জন্য তাড়াতাড়ি ফুলসাহেব দ্বিতলে উঠিয়া, যে-কক্ষে জুমেলিয়া অরিন্দমকে একদম বোকা বানাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই কক্ষের দিকে চলিল। সেইটি জুমেলিয়ার শয়ন-কক্ষ। যখন অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন ফুলসাহেব বাড়িতে উপস্থিত ছিল না, অতএব তাহার পরম শত্রু অরিন্দমের আগমন এবং জুমেলিয়ার অন্তর্ধান সম্বন্ধে ফুলসাহেব কিছুই জানিতে পারে নাই। ফুলসাহেব জুমেলিয়ার শয়ন-গৃহের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, সেখানে জুমেলিয়া নাই,

কবাট-জোড়া ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ফুলসাহেব বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া ঘরের ভিতরে গেল। ঘরের ভিতরে সম্মুখদিককার কোণে অরিন্দম দাঁড়াইয়া ছিলেন; সুতরাং ফুলসাহেব বাহির হইতে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই; কিন্তু ভিতরে গিয়া সহসা অরিন্দমকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে-ভাব দমন করিয়া পরিষ্কার স্বরে বলিল, 'একি—অরিন্দম বাবু যে! হঠাৎ কী মনে করে?'

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, 'অনেকদিন হইতে মহাশয়ের কোনও সংবাদাদি পাই নাই—একবার দেখা করিতে আসিলাম।'

ফুলসাহেব একবার হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, 'আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নামক পদার্থটি যেরূপ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পরের যথেষ্ট কষ্ট হইবারই কথা। আমিও তোমার অদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম। দেবেন্দ্রবিজয়ের নিকটে আমার স্নেহ-পত্র পাও নাই?'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, পাইয়াছি বইকি।'

ফুলসাহেব। সেই পত্র পাইয়াই তুমি আসিয়াছ। খুব শীঘ্রই আসিয়াছ; এত শীঘ্র তুমি যে আসিবে, আমি এরূপ আশা করি নাই। তুমি যে-কাজে নিযুক্ত, তাতে সকল বিষয়ে এরূপ তৎপর হওয়া তোমার খুবই আবশ্যক। যাই হোক, তুমি দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে আনিয়া ভালো করো নাই, তাহা হইলে আজ বেচারাকে এমন অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না। লোকটা এবার অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তা তাহাকে একবারেই ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি।

ফুলসাহেবের কথা শুনিয়া অরিন্দমের ভয় হইল। বলিলেন, 'তুমি কি তাহাকে খুন করিয়াছ?'

ফুল। আমি তাহাকে খুন করিতে যাইব কেন? সে নিজেকে নিজেই খুন করিয়াছে—লোকটা এমনই বুদ্ধিমান! আমি তাহাকে স্পর্শও করি নাই। সে যা হোক, অরিন্দমবাবু, তোমার নিকটে কোনও অস্ত্র-শস্ত্র আছে কি?

অরিন্দম। আছে। কেন?

ফুল। তা তো থাকিবারই কথা। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই, তা হলে বোধহয়, তন্মধ্য হইতে কোনও-না-কোনও একটির আস্বাদ আমাকে অনুভব করাইবে, মনে করিয়াছ? এমনকী আমাকে হত্যাও করিতে পারো?

অরি। সে ইচ্ছা আমার নাই।

ফু। (উপহাস করিয়া) সহসা এত দয়ালু কবে হইলে, অরিন্দম?

অ। আপাতত তোমার নিকটে কোনও অস্ত্র আছে?

ফু। দুর্ভাগ্য আমার—আমি এখন নিরস্ত্র; নতুবা সে-কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তোমাকে কষ্ট পাইতে হইত না।

অ। (সহাস্যে) কেন?

ফু। তাহা হইলে যে-মুহূর্তে তুমি আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলে, সেই মুহূর্তে আমি তোমাকে এ-সংসার হইতে বিদায় করিতাম।

অ। (সহাস্যে) কেন?

ফু। আরও জানো বোধহয়, তোমার প্রাণ নিতে আমি প্রাণ পণ করিয়াছি—হয় আমি মরিব, নয় তুমি মরিবে। আর তুমি মনেও স্থান দিয়ো না যে, জীবিত ফুলসাহেবকে তখন তুমি ধরিতে পারিবে।

অ। এখন যদি আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করি, তুমি কী করিবে মনে করিয়াছ?

ফু। অরিন্দমবাবু, সকল সময়েই আমি নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারি।

অ। আমি এখনই তোমায় গ্রেপ্তার করিব।

ফু। মুখের কথা নয়, মনে করিলেই ফুলসাহেবকে ধরিতে পারা যায় না। অনেকেই সে-

চেষ্টা করেছে।

অ। সে অনেকের মধ্যে আমি সে-চেষ্টা সফল করিতে পারিব। তুমি আমার কয়েকটা পরিচয় পূর্বে পাইয়াছ।

ফু। আমি তোমাকে খুব জানি; তোমার বুদ্ধি, কৌশল, কুখ্যাতি, নৈপুণ্য, শক্তি, সাহস, ক্ষমতা কিছুই আমার অপরিচিত নহে। আমি তোমাকে যতদূর জানি, তাতে তুমি যে আমার একজন যোগ্য প্রতিযোগী, সে-সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া ফুলসাহেব কোথাও কিছুই নাই, একেবারে লাফাইয়া আচম্বিতে অরিন্দমের ঘাড়ে পড়িল। ফুলসাহেব সহসা যে তাঁহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিবে, এ-কথা আগে অরিন্দম মনে করেন নাই। তিনি এক হাতে ফুলসাহেবের গলাটা টিপিয়া ধরিয়া, অপর হাতে তাহার ললাটে সজোরে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

তাহার পর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণটা প্রচুর পরিমাণেই হইতে লাগিল। এবং দুম-দাম, ঠক-ঠকাস শব্দে ঘরটা ক্ষণে-ক্ষণে প্রতিধ্বনিত এবং উত্থান-পতনের ও পদক্ষেপের দুপ-দাপ, ধপ-ধপাস শব্দে ঘন-ঘন কম্পিত হইতে লাগিল। এত চেষ্টা করিয়াও দুঃখের বিষয় কেহ কাহাকে সহজে বশে আনিতে পারিলেন না। প্রায় অর্ধঘণ্টা এইরূপে কাটিল। তথাপি মল্লযুদ্ধটা সমভাবেই চলিতে লাগিল।

এমন সময়ে সহসা ফুলসাহেব বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি তীক্ষ্নমুখ লৌহ-শলাকা বাহির করিল। সেটা দেখিতে অনেকটা দীর্ঘ সূচীর মতন, কেবল অগ্রভাগ একটু বাঁকা। দেখিয়াই অরিন্দমের বুঝিতে বাকি রহিল না, সেই লৌহ-শলাকা বিষাক্ত এবং তাহার এমন একটা শক্তি আছে যে, একটু আঘাতেই দেহ হইতে প্রাণটাকে অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে।

ফুলসাহেব যেমন সেই বিষাক্ত শলাকা অরিন্দমের দেহে বিদ্ধ করিতে যাইবে, অমনই অরিন্দম দুই হাতে ফুলসাহেবের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ফুলসাহেব অপর হস্তে অরিন্দমের মুখের উপরে, নাকের উপরে, যেখানে-সেখানে অবিশ্রান্ত ঘুষি চালাইতে লাগিল। সেই সকল ঘুষির মধ্যে একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট ঘুষি নিজের সেই লৌহ-শলাকার উপর পড়িয়া ফুলসাহেবের এত উদ্যম—এত আগ্রহ সমুদয় নিষ্ফল করিয়া দিল—সেই বিষ-শলাকা ফুলসাহেবেরই মণিবন্ধে বিদ্ধ হইল।

যেমন বিদ্ধ হওয়া, অরিন্দমকে আর কোনওরূপ কষ্টস্বীকার করিতে হইল না। ফুলসাহেব তখনই গৃহতলে পড়িয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই তাহার সবল ও সচল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে অসাড় ও অচল হইয়া আসিল।

বিস্মিত হইয়া, স্তম্ভিত হইয়া, শিহরিত হইয়া অরিন্দম সরিয়া দাঁড়াইলেন। এবং তাঁহার নিজের হৃষ্টপুষ্ট দেহের সমস্ত শক্তির অপেক্ষা, সুদীর্ঘ শাণিত ছুরি অপেক্ষা, অগ্নিগর্ভ সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য রিভলভারের অপেক্ষা সেই একখণ্ড অতি ক্ষুদ্র নগণ্য লৌহ-শলাকার কত বেশি শক্তি, মনে-মনে তাহারই সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ফুলসাহেবের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তাহার সেই নিস্পন্দ দেহ তখন অত্যন্ত শীতল এবং অত্যন্ত কঠিন। এবং তন্মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধি একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; তথাপি অরিন্দম ফুলসাহেবকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। হাতকড়া ও বেড়ি বাহির করিয়া ফুলসাহেবের হাতে-পায়ে সংলগ্ন করিলেন এবং খাটখানা টানিয়া আনিয়া তাহার একদিককার পায়া ফুলসাহেবের পিঠের উপরে চাপাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ যথা সময়ে অরিন্দম

ফুলসাহেবকে সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া অরিন্দম বাহিরে আসিলেন। এবং দেবেন্দ্রবিজয়ের অনুসন্ধান

করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে বাড়ির চারিদিকে ফিরিতে লাগিলেন। ফুলসাহেবের মুখে দেবেন্দ্রবিজয়ের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। কারণ ভীষণপ্রকৃতি খুনি ফুলসাহেবের অসাধ্য কর্ম কিছুই নাই।

উপরের সকল স্থান যখন তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের অথবা তাঁহার মৃতদেহের কোনও সন্ধানই হইল না, তখন অরিন্দম নিচে নামিয়া আসিয়া নিচের ঘরগুলিতে সন্ধান করিতে লাগিলেন। যে-ঘরে দেবেন্দ্রবিজয়ের পাতাল-প্রবেশ হইয়াছিল, অরিন্দম অবশেষে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন একটা অস্ফুট গোঙানির শব্দ অতি মৃদুভাবে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; কিন্তু কোথা হইতে সেই শব্দটা আসিতেছে, তিনি অনেকক্ষণ স্থিরকর্ণে থাকিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এক-একবার জলের ছপাৎ-ছপাৎ শব্দও শুনা যাইতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, অতি দূর হইতে সেইসকল শব্দ আসিতেছে; কিন্তু ঘরের বাহিরে আসিলে আর কিছুই শুনা যায় না। ভীতিবিহ্বল অরিন্দম ঘরের ভিতরে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। এক স্থানে দেখিলেন গৃহতলে একটি লৌহনির্মিত গুপ্তদ্বার রহিয়াছে; সেটি মাপে দুই হাতের অধিক নহে, সমচতুষ্কোণ। সেই গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিবার জন্য অরিন্দম শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়া, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া কিছুতেই সেটা টানিয়া তুলিতে পারিলেন না; কিন্তু পরক্ষণে উপর হইতে একটু চাপ দিতেই নিচের দিকে একটু ফাঁক হইয়া গেল। আর কিছু বেশি জোর দিতে একেবারে উন্মুক্ত হইয়া গেল। সেইসঙ্গে কী একটা ভয়ানক দুর্গন্ধ অরিন্দমের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি উঠাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল।

অরিন্দম অতি কষ্টে সেই দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া অবনতমস্তকে তীব্রদৃষ্টিতে নিচের দিকে চাহিতে লাগিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সেই গোঙানি শব্দটা এখন বেশ স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল। অরিন্দম পকেট হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিলেন এবং সেই আলোকরশ্মি অন্ধকূপমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখিলেন, নিচে—অনেক নিচে অস্পষ্ট এক মনুষ্য-মূর্তি, পঙ্কিল জলে আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। তন্মধ্য হইতে উপরে উঠিয়া আসিবার কোনও উপায় নাই। অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, 'দেবেন্দ্রবাবু—দেবেন্দ্রবাবু—'

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে উত্তর হইল, 'আপনি আসিয়াছেন! আমি মরিতে বসিয়াছি—আমাকে রক্ষা করুন—ওঃ ! প্রাণ যায়—উঃ! কী ভয়ানক—!'

অরিন্দম বলিলেন, 'ভয় নাই—দেবেন্দ্রবাবু, আমার পরম সৌভাগ্য আপনি এখনও জীবিত আছেন—আমি নিজের প্রাণ দিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিব।'

এই বলিয়া অরিন্দম গুপ্তদ্বার ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধকরি, ভিতরে স্প্রিং ছিল, তখনই ঝনাৎ করিয়া গুপ্তগৃহের কবাট আপনি রুদ্ধ হইয়া গেল।

অরিন্দম ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন। উঠানের একপার্শ্বে একখানা লম্বা মই ছিল, সেই মইখানা দুই হাতে তুলিয়া আনিলেন এবং সেই অন্ধকূপের মধ্যে সেটা নামাইয়া দিলেন। সেটা যে তখন তাঁহার এতবড় একটা উপকারে আসিবে, অরিন্দম প্রথমে তাহা ভাবেন নাই।

অরিন্দম প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন লইয়া সেই মই অবলম্বনে নিচে নামিয়া গেলেন; মধ্যে মই থাকায়, গুপ্তদ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হইয়া অর্ধোন্মুক্ত রহিল।

ভিতরে নামিয়া অরিন্দম দেখিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় ক্রমশই সেই কূপের গভীর পঙ্কের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছেন। তাঁহার মস্তকের একস্থান কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে; সে-আঘাত তেমন সাঙ্ঘাতিক না হইলেও অবস্থাটা অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। সেই ভয়ানক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অরিন্দম দুই হাতে দেবেন্দ্রবিজয়কে ধরিয়া প্রাণপণে টানিতে লাগিলেন। সেই আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্য হইতে একটা লোককে টানিয়া তোলা কি সহজ কথা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ যথা সময়ে জুমেলিয়া

ভিতরে যেমন দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া এইরূপ যমে-মানুযে টানাটানি চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক সেই গৃহমধ্যে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, অন্ধকূপের গুপ্তদ্বার-সম্মুখে একবার ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল এবং নীরব হাস্যের সহিত ক্ষণেক সেই অপূর্ব লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া সংযতপদে চুপিচুপি বাহির হইয়া গেল—সে জুমেলিয়া।

জুমেলিয়া বাহিরে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে একবার আপনমনে বলিল, 'আচ্ছা!' সেই 'আচ্ছা' শব্দটা স্পষ্ট ধ্বনিত না হইয়া অনেকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মতো শুনাইল। অরিন্দম অনেক কষ্টে দেবেন্দ্রবিজয়কে টানিয়া তুলিলেন। তখন দেবেন্দ্রবিজয়ের সংজ্ঞা নাই, অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের মৃতকল্প দেহ একহস্তে বুকে চাপিয়া ধরিয়া যেমন উপরের দিকে এক পা উঠিতে যাইবেন, শাণিত ছুরিকার ন্যায় তীক্ষ্ণকণ্ঠে কে বলিল, 'আমার হাতে দুইজনকেই আজ মরিতে হইবে। অরিন্দম, চাহিয়া দেখো, আমায় চিনিতে পারো কি?'

অরিন্দম চকিতহৃদয়ে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

'বাঃ! তুমি আমায় চেনো না?'

'না। কে তুমি?'

'আমি জুমেলিয়া। সেই তোমার পরিচিত মতিবিবি।'

সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলেও লোকে এত চমকিত হয় না, অথবা সেই কক্ষমধ্যে সহসা বজ্রপাত হইলেও অরিন্দম বোধকরি, এতদূর চমকিত হইতেন না, জুমেলিয়াকে দেখিয়া তিনি যেরূপ চমকিত হইলেন। দেখিলেন, সাক্ষাৎ মূর্তিমতী শত বিভীষিকার ন্যায় জুমেলিয়া অবনতমস্তকে উপরে দাঁড়াইয়া, এবং তাহার প্রচুরায়ত কৃষ্ণনয়নে প্রদীপ্ত নরকাগ্নি জ্বলিতেছে—কী ভীষণ! অধিক, উন্মুক্ত কেশদাম কৃষ্ণ, কুঞ্চিত, প্রচুর, সুদীর্ঘ, তেমনি ভীষণভাবে মুখের চারিপাশে ঝুলিতেছে। জুমেলিয়ার একহাতে একটি লণ্ঠন এবং অপর হাতে একটা ছোট শিশি; তন্মধ্যে লোহিত বর্ণের কী একটা তরল পদার্থ টলটল করিতেছে। কে জানে, পিশাচীর কী সঙ্কল্প!

নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া সত্যসত্যই অরিন্দম নিরতিশয় ভীত হইলেন। যদি দেবেন্দ্রবিজয় সে সময়ে মূর্ছিত না হইতেন, তাহা হইলেও সেই প্রলয়ঙ্করী পিশাচীর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটু সম্ভাবনা থাকিত। এখন তিনি কী করিবেন? দেবেন্দ্রবিজয়কে সেরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিতে পারেন না; ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যদি দেবেন্দ্রবিজয় মরেন, তাঁহার সঙ্গে আমাকেও মরিতে হইবে।'

ঝটিকান্দোলিতজলোচ্ছ্বাসকল্লোলতুল্য তরঙ্গায়িত হাস্যের সহিত জুমেলিয়া বলিল, 'অরিন্দম, এখন আর তোমার ন্যায় বুদ্ধিমানকে বেশি করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, এখন একমাত্র আমার অনুগ্রহের উপর, করুণার উপর, ইচ্ছার উপর তোমাদের ন্যায় দুই-দুইটি বীরপুরুষের জীবন নির্ভর করিতেছে।'

যেরূপ স্বরে কথাগুলি জুমেলিয়ার মুখ হইতে বাহির হইল, তাহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, জুমেলিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত কথাগুলি বলিতেছিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাহাই বটে।'

জুমেলিয়া ঘাড় নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'তবে অরিন্দম, আমার কাছে দয়াভিক্ষা করো, প্রাণভিক্ষা করো—ক্ষমা চাও; যদি দয়া হয়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'পিশাচীর নিকটে দয়াভিক্ষা! জুমেলিয়া, এমন নির্বোধ কে?'

তীব্রস্বরে জুমেলিয়া বলিল, 'তবে মজাটা দেখো।'

অরি। কী করিবে তুমি? মনের কথাটা কী?

জুমে। মনের কথাটা তোমাকে হত্যা করিব—এখনই—এই মুহূর্তে!

অ। কীরূপে?

জু। এইরূপে।

জুমেলিয়া হাতের সেই শিশিটা উপরে তুলিয়া ধরিল! তাহার পর খল-খল, অট্টহাসি হাসিয়া বলিল, 'ইহার ভিতরে কী আছে জানো? না, জানো না। ইহার ভিতরে যা আছে, তাই তোমার গায়ে ঢালিয়া দিব, অগ্নিশিখার ন্যায় তোমাকে পোড়াইতে থাকিবে, গলিত সীসা অপেক্ষাও ইহা ভয়ঙ্কর, তুলনায় ইহার নিকটে তাহা বরফ বলিলেও চলে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তোমার চিত্তবৃত্তিতে— তোমার কল্পনায়—তোমার নৃশংসতায় ও কুটিলতায় তুমি দানবী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করো—আমি মরিতে প্রস্তুত।'

জুমেলিয়া বলিল, 'শোনো অরিন্দম, মরণটা মুখে বলা যত সহজ, কাজে ঠিক তেমন সহজ হয় না। এ যে-সে মরণ নয়—জ্বলিয়া পুড়িয়া দগ্ধিয়া মরণ। মরো তবে, অরিন্দম। তুমি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, ডাক ছাড়িয়া চিৎকার করিতে থাকিবে, আর তেমনই উচ্চকণ্ঠে আমি হাসিতে থাকিব—হো—হো—হো। কী মজা! তোমার চোখে দুই বিন্দু ঢালিয়া দিব, অন্ধ হইবে—চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিলেও সে যন্ত্রণা যাইবে না; তাহার পর মরিবে—ধীরে—ধীরে—ধীরে—ভয়ানক যন্ত্রণায়—ভয়ানক মরণ!'

আবার জুমেলিয়া হাসিতে লাগিল। কী ভয়ানক অমঙ্গলজনক সেই তীব্র হাসি! সে-হাসি শুনিয়া অতি সাহসীরও বুক ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

অরিন্দমও ভয় পাইলেন। বুঝিলেন, জুমেলিয়া মুখে শুধু ভয় প্রদর্শন করিতেছে না, কাজে সে ঠিক তাহাই করিবে। এ-বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কী?

'এই দেখো, অরিন্দম,' বলিয়া জুমেলিয়া অল্পে-অল্পে শিশিটা কাৎ করিতে লাগিল। শিশির মুখের কাছে সেই তরল পদার্থ টলটল করিতে লাগিল। জুমেলিয়ার অলক্ষ্যে অরিন্দমের হাতে একবিন্দু পতিত হইল। গলিত সীসকের ন্যায় সেই একবিন্দু সেই স্থান দগ্ধ করিতে লাগিল। অরিন্দম নিজের অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া, নীরবে নিশ্বাস রোধ করিয়া অতিকষ্টে সে-যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণাসূচক একটিমাত্র শব্দও তাঁহার মুখ হইতে তখন বাহির হইল না।

জুমেলিয়া বলিল, 'দেখো অরিন্দম, আর বিলম্ব নাই, এই দেখো, ছিপি খুলিয়াছি, এখনই তোমার সর্বাঙ্গে ঢালিয়া দিব; এখনও সময় আছে, প্রাণভিক্ষা চাও।'

অরিন্দম দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'প্রাণ থাকিতে নহে।'

জুমেলিয়া বলিল, 'আমি তোমাকে মুক্তি দিলেও দিতে পারি, প্রাণভিক্ষা চাও।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি পিশাচী।'

জুমেলিয়া মৃদুহাস্যের সহিত বলিল, 'ছিঃ, অরিন্দম! চোখের মাথা একেবারে খাইয়াছ! এমন সুন্দরী আমি, এত রূপ আমার, আর আমি হলেম কি না পিশাচী!'

অরিন্দম কোনও কথা কহিলেন না।

জুমেলিয়া বলিল, 'প্রাণভিক্ষা চাও।'

তথাপি অরিন্দম নীরব।

জুমেলিয়া বলিল, 'আর বলিব না, এই শেষবার; এখনও প্রাণভিক্ষা চাও। তোমার ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ যদি আমার কাছে প্রাণভিক্ষা করিয়া লয়, আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মত

হইব, তাতে আমার যথেষ্ট সম্মান আছে, তাই বলিতেছি।'

তথাপি অরিন্দম নীরব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বিপৎকালে

জুমেলিয়া যখন দেখিল, অরিন্দম কিছুতেই তাহার নিকটে প্রাণভিক্ষা চাহিল না, দেখিয়া রাগিয়া যখন শিশি হইতে তরল অগ্নিবৎ ভিটরয়েল ঢালিবার উপক্রম করিল, এমনসময়ে তাহার পশ্চাৎ হইতে এক ব্যক্তি সেই শিশিটা জোর করিয়া তাহার হাত হইতে ছিনাইয়া লইল। সেই সময়ে শিশি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে খানিকটা সেই তরলাগ্নি জুমেলিয়ার হাতে লাগিয়া গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া জুমেলিয়া ছুটিয়া সে-ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অরিন্দম কূপের ভিতর হইতে সেই অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনা দেখিয়া মনে-মনে ঈশ্বরকে শতসহস্র ধন্যবাদ দিলেন। এতবড় একটা বিপদ যে, এত শীঘ্র এমন অল্পে-অল্পে কাটিয়া যাইবে, এ-কথা তিনি আগে মনেও স্থান দেন নাই। তিনি দেবেন্দ্রবিজয়ের মূর্ছিত দেহ বুকে লইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং সেই বিপদুদ্ধারক অপরিচিত লোকটির নিকটে যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন।

সেই অপরিচিত লোকটির বয়স সাতাশ বৎসর হইবে। তাঁহার দেহ সুগঠিত, দীর্ঘ ও প্রশস্ত। তাঁহার ভাবভঙ্গিতে, মুখাকৃতিতে, সকরুণদৃষ্টিতে যে-ভদ্রভাব লক্ষিত হয়, তাঁহার পরিহিত সেই মলিন বস্ত্র, মাথার উপর রুক্ষ, শুষ্ক অতি দীর্ঘ চুলগুলা, চোখের পার্শ্ববর্তী কালিমা ও হস্তপদদ্বয়ের বড়-বড় নখের সে-ভাবটুকু অনতিবিলম্বে মন হইতে মুছিয়া যায়। আরও গায়ে স্থানে-স্থানে শুষ্ক ময়লা জন্মিয়াছে; কানের নিচে, গলায় চারিধারে এবং কপালে এত ময়লা পড়িয়াছে যে, চিমটি কাটিলে খানিকটা উঠিয়া আসে। তাঁহার মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া তাঁহাকে জাতিতে মুসলমান বলিয়া অরিন্দমের বোধ হইল। কে জানে, তবে কি ইনি ফুলসাহেবের কেহ?

যাহা হউক, উভয়ে মিলিয়া নিঃসংজ্ঞ দেবেন্দ্রবিজয়কে সসংজ্ঞ করিয়া তুলিবার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক বিলম্বে তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইল। দেবেন্দ্রবিজয় উঠিয়া বসিলেন।

অরিন্দম সেই অপরিচিত লোকটির পরিচয় লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সেই লোকটিকে দেখিয়া অবধি তাঁহার মাথার ভিতরে একটা ঘোরতর সন্দেহ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সন্দেহটি যদি দৈবক্রমে সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি জুমেলিয়া ও ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য যে কষ্টটা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কতক পরিমাণে বৃথা হয় না। তিনি আশান্বিত হৃদয়ে নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে যে নামটি শুনিলেন, তাহাতে বাল্মীকিরের ভোজদগুস্পৃষ্ট এক গ্রাস মসীর, সহসা এক গ্রাস দুগ্ধমূর্তি ধারণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ চক্ষু পালটিতে একেবারে অটল সত্যে পরিণত হইতে দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া সবিস্ময়দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নাম সিরাজউদ্দীন; যাঁহার উদ্ধারের জন্য একদিন অরিন্দম কুলসমের নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন।

সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'আমি আপনাকে কখনও দেখি নাই; কিন্তু (দেবেন্দ্রবিজয়কে নির্দেশ করিয়া) এই ভদ্রলোকটিকে গতরাত্রে এখানে আর একবার দেখিয়াছিলাম। ধূমময় একটা রুদ্ধগৃহের মধ্যে ইনি মৃত্যু-যন্ত্রণায় ডাক-ছাড়িয়া চিৎকার করিতেছিলেন। সেই সময়ে আমি জানালা ভাঙিয়া ইঁহাকে

উদ্ধার করি। আমি সেদিন সেই ঘরের পাশের ঘরেই বন্দি ছিলাম; নতুবা সেইদিন জুমেলিয়ার হাতে ইঁহার জীবন শেষ হইত।'

অরিন্দম সিরাজউদ্দীনকে বলিলেন, 'আপনি বলিলেন, সেই সময়ে আপনি পাশের ঘরে বন্দি ছিলেন। কে আপনাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল?'

সিরাজ। ফুলসাহেব।

অরি। কোন অভিপ্রায়ে ফুলসাহেব আপনাকে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সিরাজ। না, তা জানি না, তবে ফুলসাহেব যেরূপ ভীষণ প্রকৃতির লোক, তাতে বোধহয় তার সেইরকমের একটা কোনও ভীষণ অভিপ্রায় অবশ্যই ছিল।

অরি। আজ আপনি কীরূপে মুক্তি পাইলেন?

সীরাজ। আজও আমি দ্বিতলের একটা রুদ্ধগৃহে আবদ্ধ ছিলাম, একখানা ভাঙা খাটিয়ায় শুয়ে নিজের অদৃষ্ট-চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে ঘরের বাহিরের কোণে কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম; সেই কোণে একটি ছোট দরজা ছিল, সেটা সহসা খুলিয়া গেল এবং জুমেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল; আমি সেই পিশাচীকে দেখিয়া নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া আমার ঘরে বসিয়া রহিল। তাহার পর একবার সেই ছোট দ্বার দিয়া ঘরের বাহিরে গেল, আবার ফিরিয়া আসিল; আবার গেল, আবার ফিরিয়া আসিল, তিন-চারিবার এইরূপ করিয়া সে আর আসিল না। জুমেলিয়াকে এরূপ ব্যস্ত-সমস্ত-ভীত অবস্থায় আর কখনও দেখি নাই। মনে একটু সন্দেহ হইল, অবশ্যই আজ আবার একটু নূতন রকমের একটা-না-একটা কিছু ঘটিয়াছে, অথবা ঘটিবার সূচনা হইতেছে। যখন দেখিলাম, জুমেলিয়া আর ফিরিল না; তখন আমি ধীরে-ধীরে উঠিলাম, দেখিলাম জুমেলিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে ঘরের কোণের সেই ছোট দরজাটি বন্ধ করিয়া যাইতে ভুল করিয়াছে; জুমেলিয়ার সেই ভুলে আমার অনেকটা আশা হইল, মনে হইল, এই সুযোগে যদি দুর্মদ ফুলসাহেব এবং দানবী জুমেলিয়ার অসাক্ষাতে পলাইতে পারি। এই মনে করিয়া আমি সেই দরজা দিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া অত্যন্ত অন্ধকারে পড়িলাম। সেখানে এমন অন্ধকার যে, নিজেকে নিজেই সেই অন্ধকারের ভিতরে হারাইয়া ফেলিলাম। তখন জুমেলিয়ার সেই ভুলটাকে আর ভুল মনে না করিয়া আপনার কর্তব্য ভাবিতে লাগিলাম। অনুভবে ঠিক করিলাম, জুমেলিয়া আমাকে সে-ঘর হইতে এই অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকিবে; তথাপি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলাম। খুব সঙ্কীর্ণ পথ, ঠিক মাঝখানে দাঁড়াইয়া, দুই হাত বাড়াইয়া, দুই পার্শ্বের দেয়াল একসঙ্গে সহজে স্পর্শ করা যায়। মাথার উপরে ছাদ কিংবা একটা কিছু ছিদ্রশূন্য আবরণ ছিল। আমি কিছুদূরে আসিয়া সম্মুখে বাধা পাইলাম। ধীরে-ধীরে তাহার উপরে আঘাত করিয়া দেখিলাম, সেটা দেওয়াল নহে, একটা কাঠের কবাট; কিছুতেই ধাক্কা দিয়া, ঠেলিয়া সেটি খুলিতে পারিলাম না; কিন্তু সম্মুখের দিকে একটু জোর দিয়া টানিতেই সেটা খুলিয়া গেল এবং দিনশেষের ম্লান আলো আসিয়া চোখে লাগিল। আমি তখন তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর একটা ঘরে পড়িলাম; তখনই সেই কবাট আপনি বন্ধ হইয়া গেল। তেমন আশ্চর্য ধরনের কবাট আমি আর কখনও দেখি নাই; বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দেখি, যে দরজা দিয়া বাহির হইলাম, সেটা একটি আলমারিতে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যাই হোক, সেই ঘরে কেহই ছিল না। আমি তখনই নিচে নামিয়া আসিলাম। বাহির হইতে এই ঘরের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া স্তম্ভিত হইলাম। ছুটিয়া আসিয়া, জুমেলিয়ার হাত হইতে শিশিটা কাড়িয়া লইলাম।

অরিন্দম বলিলেন, 'আপনি আমাদের যে-উপকার করিলেন, তাহা আজীবন স্মরণ থাকিবে। আপনি না আসিলে জুমেলিয়া নিশ্চয়ই ভিটরয়েল দিয়া আমাদের দুজনকে পুড়াইয়া মারিত। আপনি কুলসমকে চিনেন?'

অরিন্দমের মুখে সহসা কুলসমের নাম শুনিয়া সিরাজউদ্দীন যেন কেমন একরকম হইয়া গেলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, 'কে কুলসম?'

অরি। কেন, তমীজউদ্দীনের কন্যা।

সিরা। জানি; কিন্তু এই ফুলসাহেবের হাত হইতে তাঁহাদের কেহ যে রক্ষা পাইয়াছেন, এমন বোধ হয় না।

অ। কুলসম রক্ষা পাইয়াছে। কুলসমের পিতা আর জীবিত নাই।

সিরা। এ-কথা আমি এখানে ইহাদের মুখে কিছু-কিছু শুনিয়াছিলাম। আরও শুনিয়াছি, অরিন্দম নামে কোন ডিটেকটিভ না কি এদের সকল ষড়যন্ত্র ভাঙিয়া দিয়াছেন; আর তাঁহারই ভয়ে ইহারা এইখানে লুকাইয়া রহিয়াছে। যাই হোক, কুলসমের সংবাদ আপনি আর কিছু জানেন? কুলসমের সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন? শুনিলাম সেই ডিটেকটিভ না কি কুলসমকে রক্ষা করিয়াছেন। সত্য কি?

অ। আমারই নাম অরিন্দম। কুলসম নিরাপদে আছে, সেজন্য আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না।

তাহার পর কুলসম ও ফুলসাহেবের সম্বন্ধে অরিন্দম যাহা জানিতেন, সংক্ষেপে সমুদয় বলিলেন।

সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'এখন ফুলসাহেব ও জুমেলিয়াকে গ্রেপ্তার করিবার কোনও উপায় ঠিক করিয়াছেন?'

অরিন্দম বলিলেন, 'জুমেলিয়াকে যে আজ আর ধরিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার করিয়া উপরের ঘরে রাখিয়া আসিয়াছি। যখন তাহাকে গ্রেপ্তার করি, সে নিজের বিষ-কাঁটা নিজের হাতে বিদ্ধ করিয়াছিল। এতক্ষণে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, বোধকরি। চলুন, তিনজনে উপরে যাই।'

তিনজনে ফুলসাহেবকে দেখিতে চলিলেন। অরিন্দম ফুলসাহেবকে যে-ঘরে হাতকড়ি ও বেড়ি লাগাইয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, এখন সেই ঘরেই তিনজনে প্রবেশ করিলেন।

সকলেই অতিশয় বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, ফুলসাহেব নাই। দেখিয়া শুনিয়া—বিশেষত অরিন্দম যেন একেবারে বোকা বনিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্তদ্বার

অনেকক্ষণ পরে সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'আপনি কি এইখানে ফুলসাহেবকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন? আমি তো মধ্যে এই ঘরে একবার আসিয়াছিলাম, কই, তখন এ-ঘরে কাহাকেও দেখি নাই।'

অরিন্দম বলিলেন, 'এই ঘরটাই ঠিক। দেখিতেছেন না, কবাট ভাঙা রহিয়াছে। এই ঘরটার মহৎ গুণ আছে, এই ঘরে ঢুকিয়া ছায়াবাজির ন্যায় জুমেলিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল; এখন আবার এই এক অসম্ভব ব্যাপার দেখিতেছি।'

সিরাজ বলিলেন এ-ঘরের একটা গুণ আছে বইকি। আমি সেই অন্ধকারময় সুঁড়িপথ দিয়া এই ঘরের উঠিয়াছিলাম। এই যে আলমারিটা দেখিতেছেন, উহার ভিতর দিয়া একটা পথ আছে।

আমি আপনাকে যে গুপ্তদ্বারের কথা বলিয়াছিলাম, সেই গুপ্তদ্বার এই আলমারির ভিতরে আছে। এই দেখুন,' এই বলিয়া আলমারিটা টানিয়া খুলিয়া ফেলিলেন এবং ভিতরকার কাঠখানায় একটু ধাক্কা দিতেই সেটা ভিতরদিকে খানিকটা সরিয়া গেল; এবং ভিতরকার সেই অন্ধকার-পথ দৃষ্টিগোচর হইল। সিরাজউদ্দীন বলিলেন, 'এই পথ দিয়াই জুমেলিয়া তখন আপনার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়া আমার ঘরে গিয়া উঠিয়াছিল।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন তা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।'

এই বলিয়া অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয় ও সিরাজউদ্দীনকে সঙ্গে লইয়া সেই আলমারির গুপ্তদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। নিজে যে ঘরে বন্দি ছিলেন, সিরাজউদ্দীন অরিন্দমকে সেই রুদ্ধগৃহে লইয়া গেলেন। সে-রুদ্ধগৃহ হইতে বাহির হইবার কোনও উপায় না থাকায় সেই গুপ্তপথ অবলম্বনে সকলে বাহিরে আসিলেন।

তাহার পর তিনজনে মিলিয়া, পাতি-পাতি করিয়া বাড়িখানার সমুদয় অংশ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইলেন। ফুলসাহেব কিংবা জুমেলিয়াকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।
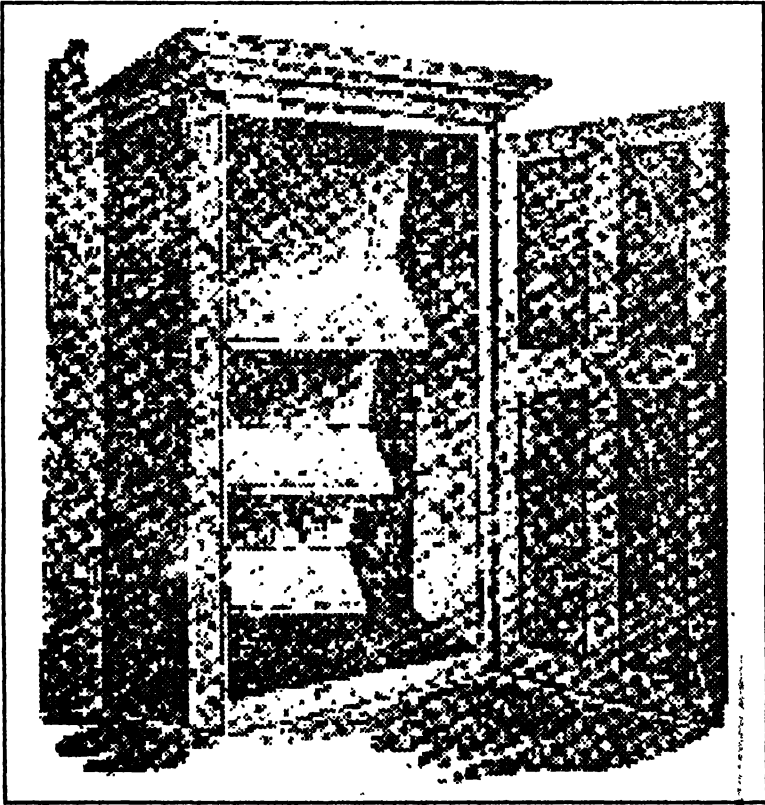
এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে দেখিয়া, রাত্রির অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া সমগ্র বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল এবং দূরগ্রামের কলরব ক্রমশ মন্দীভূত হইয়া আসিল। তখন সকলে নিরুদ্যমচিত্তে সেই বাগান-বাটি ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

সেদিনকার অনুসন্ধানের সেইখানে সমাপ্তি। সকলে হুগলি যাত্রা করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ ঃ ভূগর্ভে

এখানে ফুলসাহেব ও জুমেলিয়ার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা বোধকরি, অসঙ্গত হইবে না।

যখন জুমেলিয়াকে বাহির করিবার জন্য অরিন্দম, দেবেন্দ্রবিজয় ও সিরাজউদ্দীন তিনজনে মিলিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ঘুরিতেছিলেন, তখন পাতালপুরীর মধ্যে একটি কক্ষে জুমেলিয়া বিষণ্নমুখে দাঁড়াইয়া নতনেত্রে ফুলসাহেবের মূর্ছাপন্ন অচেতন দেহ অতি মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। সেই পাতালপুরীর একপাশে একটি ছোট দীপ তথাকার গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে অত্যন্ত নিস্তেজভাবে জ্বলিতেছিল এবং তাহার ক্ষীণ শিখাটা প্রচুর অন্ধকারের মধ্যে সিন্দূরের ন্যায় ঘোর আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই পাতালপুরীর চারিদিক বন্ধ, কোন পথে যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাহা জুমেলিয়াই জানে। আমাদের সেটা জানিবার তেমন কোনও আবশ্যকতা নাই।

দুই-তিনবার জুমেলিয়া শিশি হইতে ঢালিয়া দুই-তিনরকমের ঔষধ ফুলসাহেবের মুখে দিল। মুখের দুই পাশ দিয়া ঔষধ গড়াইয়া মাটিতে পড়িল।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না, তখন জুমেলিয়া একখানি বড় আকারের শাণিত ছুরি বাহির করিল এবং সেই ছুরিকা দিয়া ফুলসাহেবের দক্ষিণ হস্তে আঘাত করিল। প্রবলবেগে রক্তধারা বহিতে লাগিল। ক্রমে যখন রক্তপাত বন্ধ হইয়া আসিল, তখন জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থানে মুখ দিয়া রক্তশোষণ করিয়া বাহিরে ফেলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ করিলে ফুলসাহেবের একটু জ্ঞান হইল। সে আসন্নমৃত্যু রোগীর ন্যায় উঠিবার জন্য বারংবার ব্যর্থ বলপ্রয়োগ করিতে লাগিল। অবশেষে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় পড়িয়া, জুমেলিয়ার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, 'পিশাচী, তুই কে? তুই আমাকে এ কোন নরকে এনেছিস? সর—সর—সর, এখান হতে তুই দূর হয়ে যা; নরকে এসেছি, এখানেও আমাকে সুখী হতে দিবি নে?'

এই বলিয়া, ফুলসাহেব অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঘন-ঘন নিশ্বাস টানিতে লাগিল।

জুমেলিয়া সেই ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া ফুলসাহেবকে আবার একটা কী ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। তাহাতে অনতিবিলম্বে ফুলসাহেবের দুর্বল দেহের অবসন্নতা অনেকটা কাটিয়া গেল। ফুলসাহেব ধীরে-ধীরে উঠিয়া বসিল।

জুমেলিয়া বলিল, 'এখন কেমন আছ? আর কোনও কষ্ট হইতেছে?'

ফুলসাহেব ক্ষীণস্বরে বলিল, 'মাথার ভিতরে বড় যন্ত্রণা হইতেছে। জুমেলিয়া, তুমি আমাকে এখানে আনিয়াছ কেন?'

জুমেলিয়া বলিতে লাগিল, 'অরিন্দমের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? আগে অরিন্দম আমাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করে, তখন তুমি এখানে ছিলে না। এমনকী, সে আমার শোবার ঘর পর্যন্ত তাড়া করিয়া আসে। আমি সেই ঘরে সেই আলমারির গুপ্তদ্বার দিয়া সিরাজউদ্দীনের ঘরে পালিয়ে যাই; তখন সিরাজউদ্দীন ঘুমাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি আবার সেই গুপ্তদ্বারের পশ্চাতে থাকিয়া শুনিলাম, অরিন্দম আর তোমার কী কথাবার্তা হইতেছে। তখনই তোমাদের দুইজনে হাতাহাতি আরম্ভ হইল; আমি অন্তরাল হতে দেখিতে লাগিলাম। শেষে তুমি নিজের বিষ-কাঁটা নিজের হাতে বিঁধে অজ্ঞান হয়ে পড়লে। অরিন্দম তোমার হাতে-পায়ে হাতকড়ি ও বেড়ি লাগিয়ে তোমাকে ফেলে রেখে গেল। সে চলে গেলে আমি তোমাকে একা বুকে করিয়া এই ঘরে লইয়া আসিলাম। এখানে আসিয়া এই ঘরের পাশেই অন্ধকূপের ভিতরে একটা মানুষের গোঙানির শব্দ শুনিতে পাইলাম; কিন্তু এখান হইতে কিছুই দেখা যায় না; সেই গোঙানির কারণটাও ঠিক বুঝিতে না পারিয়া এখান হইতে উপরে গিয়া দেখিলাম, ইহার উপরের ঘরটার অন্ধকূপের দ্বারের ভিতরে

একটা মই লাগানো রহিয়াছে। ভিতরে উঁকি মারিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে সমুদয় বুঝিতে পারিলাম। তখন সেই ভিটরয়েল দিয়া অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয়কে পুড়াইয়া মারিতে গেলাম; কিন্তু কাজে কিছুই হইল না। সিরাজউদ্দীনের ঘর থেকে যখন বাহিরে আসি, তখন সে-গুপ্তদ্বারটা বন্ধ করিয়া আসিতে ভুল হইয়াছিল। সিরাজউদ্দীন এমনসময়ে আসিয়া শিশিটা আমার হাত থেকে ছিনাইয়া লইল। তখন প্রতিশোধ নেওয়াটা সহজ হইবে না মনে করিয়া, এখানে আসিয়া তোমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। অনেকরকম চেষ্টা করিয়া, কিছুতেই তোমার জ্ঞান হয় না দেখিয়া বড়ই ভাবনা হইল। শেষে তোমার হাতের যে শিরায় সেই কাঁটা ফুটিয়াছিল, সেই শিরাটা ছুরি দিয়া কাটিয়া দিলাম; সেই ক্ষতস্থানে মুখ লাগাইয়া রক্ত শুষিয়া ফেলিতে লাগিলাম। রক্তের সঙ্গে বিষের অনেকটা তেজ বাহির হইয়া গেল, তোমার জ্ঞান হইল।'

ফুলসাহেব বলিল, 'তবে সিরাজউদ্দীনও হাতছাড়া হইয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম, ওই সিরাজউদ্দীনকে মাঝে ফেলিয়া কুলসমের কাছ থেকে পাঁচ-সাতহাজার টাকা আদায় করিব; সেটা আর হইল না।'

জুমেলিয়া বলিল, 'অরিন্দম বাঁচিয়া থাকিতে আমাদের কোনও আশাই সফল হইবে না।'

ফুলসাহেব বলিল, 'সেটা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি; অরিন্দমকে খুন করিতে না পারিলে আমাদের অদৃষ্ট কিছুতেই সুপ্রসন্ন হইবে না। অরিন্দম যাহাতে শীঘ্র মরে, এখন আমি প্রাণপণ করিয়া সর্বাগ্রে সেই চেষ্টাই করিব।'

পঞ্চম খণ্ড

প্রতিহিংসা—রক্তে-রক্তে

Alh. I look far down the pit—
My sight was bouned by a jutting fragment :
And it was stained with blood. Then first I shrieked,
My eye-balls burnt, my brain grew hot as fire.
And all the hanging drops of the wet roof
Turned into blood — I saw them turn to blood !
And I was leaping wildly down the chasm.
When on the farther brink I saw his sword.
And it said, Vengeance ! Curses on my tongue?

COLERIDGE
"Remorse"
Act IV, Scence III.

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ভীষণ আয়োজন

তাহার পর দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই মাসের মধ্যে এমন কোনও ভীষণ রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে নাই, যাহাতে কোনও পাঠকের সুপ্ত বিস্ময় বিচলিত হইয়া উঠিতে পারে। ইতোমধ্যে সিরাজউদ্দীনের সহিত ফুলসমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা সুখে আছেন শুনিয়া সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা নিশ্চিন্ত হইবেন, আশা করি। এবং আরও আশঙ্কা করি, শুনিয়া দুঃখিত হইবেন যে, ফুলসাহেবের অন্বেষণে এই দীর্ঘ দুইটি মাস শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ অরিন্দমের একান্ত নিষ্ফলে কাটিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, তথাপি তিনি নিরুদ্যম বা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন নাই; যত সময় যাইতেছে, ফুলসাহেবের জন্য অরিন্দম তেমনি অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এই দুই মাস তাঁহার না আছে আহারের ঠিক, না আছে নিদ্রার ঠিক, না আছে মনের ঠিক এবং না আছে স্বাস্থ্যের দিকে দৃকপাত; অথচ এত পরিশ্রমে কাজ কিছুই হইতেছে না।

এদিকে অরিন্দম ফুলসাহেবকে ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে লোকালয়ের বহির্ভাগে এক গহন বনের মধ্যে তাঁহার মরণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র হইতেছে।

যে-বাড়ি হইতে অরিন্দম সিরাজউদ্দীনকে উদ্ধার করেন, তাহা অতিক্রম করিয়া পূর্বোক্ত মুখে আরও অনেক দূরে যাইলে প্রকাণ্ড আমবাগান দেখিতে পাওয়া যায়। সে-জায়গাটার নাম কাঁপা। কাঁপার চারিদিকে বড়-বড় গাছ, ঘন জঙ্গল এবং নিস্তব্ধতা। সে-নিস্তব্ধতা যেন সজীব, যেন চারিদিক ছমছম করিতেছে।

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে, কৃষ্ণাসপ্তমীর ম্রিয়মান চন্দ্র। তাহার আলো বনের ভিতর তেমন আসিতে পারে না, এক-আধ জায়গায় একটু-আধটু; দেখিয়া একান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু সেই বনের পার্শ্বে যেখানে কালু রায়ের জীর্ণ মন্দির, সেখানের অনেকটা স্থান উন্মুক্ত থাকায় নির্বিঘ্নে সেখানে চাঁদের আলো একেবারে প্লাবিত হইয়াছে; কিন্তু সে ভীষণ স্থানে চাঁদের আলোও যেন কেমন বড় ভয়ানক-ভয়ানক বলিয়া মনে হয়।

এই বনমধ্যস্থ নির্জন মন্দিরটি একজন ডাকাইতের স্থাপিত। অনেকদিন পূর্বে এই মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য নরবলি এবং কত লোকের মাথা দেহ হইতে পৃথক করিবার নিভৃত মন্ত্রণা হইয়া গিয়াছে। আজও এই কৃষ্ণাসপ্তমীর মধ্যরাত্রে অনেকগুলি লোক একসঙ্গে জটলা করিয়া, কবাট বন্ধ করিয়া সেইরূপ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। এবং সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া আপাতত রাশি-রাশি তামাক ও গাঁজা মুহুর্মুহু ভস্মীভূত হইতেছিল। চারিদিক বন্ধ থাকায় অনর্গল ধূম ভিতরে জমাট বাঁধিতেছিল। একপাশে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং সেই ধূমরাশি ভেদ করিয়া আলোক বিস্তার করা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া সেটা যেন ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। এমনসময়ে বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে করাঘাতের শব্দে মন্দিরের মধ্যভাগ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ভিতর হইতে একজন বলিল, 'কে ও?'

বাহির হইতে উত্তর হইল, 'আমি!'

বিকৃত মুখ আরও বিকৃত করিয়া দলের ভিতর হতে একটি তীক্ষ্ণ মেজাজের লোক অতিশয় বিরক্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, 'আরে বাপু, আমিও তো আমি; নম্বর কত?'

'নম্বর ১।'

'আমাদের নিয়ে মোটের উপর?'

'১৩।'

মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটা লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। লোকটা আমাদের অপরিচিত নহে—ফুলসাহেব।

ফুলসাহেব নিজের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিল। কেহ কোনও কথা কহিল না। কিয়ৎপরে ধূমাচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফুলসাহেব বলিল, 'আমাদের সকলেই কি আসিয়াছে?'

একজন গণনা করিয়া উত্তর করিল, 'হ্যাঁ।'

ফুল। আমাদের উদ্দেশ্যটা কী, তা বোধহয়, কাহারও জানিতে বাকি নাই?

সকলে। ঠিক প্রতিশোধ লওয়া।

ফুল। আমাদের লক্ষ্য কে?

সকলে। (সমস্বরে) অরিন্দম।

আবার সকলে নীরব।

বৃহৎ মন্দিরটা যেন গমগম করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ভীষণ ষড়যন্ত্র

ফুলসাহেব বলিল, 'তোমাদের সকলেই সেই অরিন্দমের হাতে কোনও-না-কোনওরকমে লাঞ্ছিত হয়েছ। তোমরা যদি তাহার প্রতিশোধের কোনও চেষ্টা না করো, ইহার অপেক্ষা কাপুরুষতা আর কী হইতে পারে? দুই নম্বর কে? আমার সামনে এসে দাঁড়াও।'

দলের ভিতর হইতে তালগাছের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ন্যায় একটি লোক উঠিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল। লোকটা অসম্ভব লম্বা, তেমন দীর্ঘ দেহ বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখখানা দেখিয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কথা স্বতই মনে পড়ে।

ফুলসাহেব তাহাকে কর্তৃত্বের স্বরে প্রশ্ন করিল, 'অরিন্দম তোমার কী করেছে?'

২নং। আমার বাঁ হাত ভেঙে দিয়েছে।

ফুল। কীরূপে হাতটা ভাঙলে?

২নং। অরিন্দমের সঙ্গে আমার একদিন হাতাহাতি হয়; শেষে বেটা আমার হাতটা ধরে কবজির কাছটায় এমন মুচড়ে দিলে যে, হাতটা কেটে বাদ দিতে হল।

ফুল। বটে! তবে তার উপরে তোমার খুবই রাগ থাকতে পারে?

২নং। সে-কথা আর একবার করে বলতে? বেটাকে একবার সুবিধায় পেলে মাথাটা চিবিয়ে খাই, তবে রাগ কতকটা যায়।

ফুল। আচ্ছা, তুমি বসো। এর মধ্যে তিন নম্বর কে?

'আমি,' বলিয়া একটি লোক দুই নম্বরের স্থান অধিকার করিয়া দাঁড়াইল। দুঃখের বিষয় দুই নম্বরের সমুদয় স্থানটি অধিকার করা তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। অন্যান্য দিকে যাহাই হউক, ঊর্ধ্বের অনেকটা স্থান খালি রহিয়া গেল। লোকটা লম্বায় দুই নম্বরের যেন সিকিখানা, কিন্তু প্রস্থে খুব স্ফীত। ওজনে বরং চতুর্গুণ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। মুখখানি এমন বদ্‌খৎ, যেন একটা অতি-বিরক্তিকর, অতি-বিকৃতভঙ্গি মুখের উপর জমাট বাঁধিয়া চির-অবস্থিতির একটা পাকা বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া লইয়াছে।

ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'অরিন্দম তোমার কী ক্ষতি করেছে?'

সে লোকটা নিজের ভগ্ন নাসিকা অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইল। সত্যই বেচারার নাসিকাটি একেবারে ভিতরে বসিয়া গিয়াছে।

ফু। ব্যাপার কী?

৩নং। এই নাকের শোধ তুলব—তবে ছাড়ব।

ফু। তুমি নাকের বদলে তার নাকটা চাও, কেমন?

৩নং। আমার নাকের বদলে আমি তার প্রাণটা চাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—চার নম্বরের কে আছে হে?

দলের ভিতর হইতে একটি বিশ্রী চেহারার লোক খোঁড়াইতে-খোঁড়াইতে আসিয়া ফুলসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ফু। তোমার কী হইয়াছে?

৪নং। আমার পা ভেঙে দিয়েছে। এ-পায়ের শোধ আমি না নিয়ে ছাড়ব না।

ফু। পাঁচের নম্বর কে?

৫নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কী, বলো?

সে-লোকটা নিজের দক্ষিণ হস্ত ফুলসাহেবের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়া সে-হাতে আর কোনও অঙ্গুলি বিদ্যমান ছিল না।

ফুলসাহেব বলিল, 'কী করে অরিন্দম একবারে তোমার চার-চারটে আঙুল ভেঙে দিলে?'

৫নং। পিস্তলের গুলিতে। যেমন আমি তাকে ঘুষি তুলে ছুটে মারতে যাব সে দূরে থেকে এমন একটা গুলি দাগলে যে, আমার ঘুষির আধখানা চোখের নিমেষে কোথায় উড়িয়ে দিলে, খোঁজ হল না।

ফু। নম্বর ছয়, উঠে এসো।

৬ নম্বরের প্রাণীটি সম্মুখীন হইলে ফুলসাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কী দুঃখে আমাদের দলে মিশেছ? অরিন্দম তোমার কী অনিষ্ট করেছে?'

৬নং। অরিন্দম আমার একপাটি দাঁত একবারে উড়িয়ে দিয়েছে।

ফু। আর কিছু?

৬নং। আর আমার দাদাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

লোকটার যেমন বিকট চেহারা, তাহার যিনি দাদা, তিনি যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী।

ফু। তবে দেখছি, তুমি অরিন্দমের রক্তদর্শন না করে কিছুতে সুস্থ হবে না।

৬নং। সে কথা আর মুখে প্রকাশ করে বলতে!

ফু। সাত নম্বর কে আছ, এসো।

৭নং। আমি সাত নম্বর।

ফু। অরিন্দম তোমার কিছু ভেঙেছে?

৭নং। কিছুই না।

ফু। তবে তোমার কী হয়েছে?

৭নং। কিছুই না।

ফু। তবে যে তুমি আমাদের দলে মিশেছ—কারণ কী?

৭নং। কারণ, আমি অরিন্দমকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করি।

ফু। কেন ঘৃণা করো?

৭নং। সে আমাকে একবার বোকা বানিয়ে নিজের একটা বড় কাজ হাসল করে নিয়েছিল।

ফু। কী রকম, শুনি?

৭নং। লোখে নামে আমার একটা স্যাঙাৎ একবার একটা লোককে খুন করেছিল। আমরা যে-যেখানে খুনটা-আসটা করতুম, তা কেউ কারও কাছে কোনও কথা লুকুতুম না। যা করা যেত, তা দুজনে পরামর্শ করেই হত। লোখে একবার একটা খুন করবার পর, একদিন সন্ধ্যার সময়ে বেটা অরিন্দম ঠিক লোখের মতো সেজে এসে আমার কাছ থেকে এ-কথা সে-কথার পর সেই খুনটার

সব কথা বার করে নিয়ে লোখেকে একেবারে বারো বৎসরের দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিলে। আমার জন্যই তাকে দ্বীপান্তরে যেতে হল বলে, যাবার সময়ে শাসিয়ে গেছে যে, ফিরে এসে সে আমাকে খুন করে ফাঁসি যাবে। তা সে যে-রকম ভয়ানক লোক, বেঁচে যদি ফিরে আসে, নিশ্চয় সে যা বলে গেছে, ঠিক তা করবেই করবে। এর মধ্যে যদি আমি অরিন্দমের একটা কিনারা করতে পারি, তার রাগটা আমার উপর থেকে কমে যেতে পারে।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও—আট নম্বরের লোক উঠে এসো।

সাতের স্থানে আট আসিয়া দাঁড়াইল।

ফু। তোমার ব্যাপার কী হে?

৮নং। বিষম ব্যাপার!

ফু। বটে! কী?

৮নং। আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না—ঘুমুতে গেলেই একটা-না-একটা স্বপ্ন লেগেই আছে; সকল স্বপ্নেই অরিন্দমের যোগাযোগ। কখনও স্বপ্ন দেখি, অরিন্দম আমাকে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছে; কখনও অরিন্দম আমাকে পচাপুকুরের পাঁকে চুবিয়ে ধরছে। কখনও বা আমাকে হাত-পায় বেঁধে জ্বলন্ত চিতার উপরে তুলে ধরছে। তা ছাড়া, কানমলাটা, চড়-চাপড়টা, লাথিটা-আসটা যেন লেগেই আছে; সেগুলো যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অরিন্দম না মরলে বোধহয়, এ স্বপ্ন-রোগ থেকে আমার কিছুতেই মুক্তি নাই।

ফু। আচ্ছা, তুমি যাও। নয় নম্বরের কে?

৯নং। আমি।

ফু। তোমার ঘটনা কী?

৯নং। তিন বৎসর ছয় মাস।

ফু। বটে!

৯নং। কঠিন পরিশ্রমের সহিত।

ফু। দশের নম্বর কে?

১০নং। আমি।

ফু। তোমার ব্যাপার কী?

১০নং। নয়ের চেয়ে আরও দেড় বৎসর বেশি; কিন্তু ভোগটা বেশিদিন হয় নাই। একমাস পরেই জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছি।

ফু। তবে তুমি খুব কাজের লোক হে! এগারো নম্বরের কে?

এগারো নম্বরে একটি বালক উঠিয়া আসিল। তাহার বয়স এখনও সতেরোর মধ্যেই আছে। তাহার মুখাকৃতি ও দৃষ্টি বড় ভয়ানক; কেউটে সাপের ছানা দেখিয়া ভয়ে বুকটা যেমন চমকে উঠে, তেমনি হঠাৎ যদি এর মুখখানি চোখের সামনে পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবের একটা ভীতি স্পষ্ট অনুভূত হয়। তাহার হাতে একখানা খুব ধারালো, খুব বড় ছুরি ছিল। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, সে নিজের ছুরিখানা নাড়িয়া-নাড়িয়া আরম্ভ করিয়া দিল, 'আমি অরিন্দমকে সহজে ছাড়ব না। আমার বাবা একটি লোককে ছুরি মেরে খুন করেছিল বলে, অরিন্দম আমার বাবাকে ফাঁসি দিয়ে মেরেছে; আজ তিন বৎসর হল, বাবা মরেছে। যেদিন বাবা মরে, সেইদিন থেকে আমি এই ছুরির সঙ্গে এমন বন্ধুত্ব করেছি যে, একদণ্ডও ছুরিখানা ছেড়ে থাকি না। অরিন্দমের বুকে না বসিয়ে এ ছুরি ত্যাগ করব না।'

এমন পুত্রের যিনি জনয়িতা, তাঁহার অন্তিমে যে ফাঁসিকাষ্ঠ অপরিহার্য, ইহা সর্ববাদীসম্মত।

তাহার পর বারো নম্বরের লোক উঠিয়া আসিল। সে বয়সে বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হইলেও এখনও যে তিন-চারজন সবল যুবককে আছাড় দিয়া ফেলিবার ক্ষমতা তাহার বেশ আছে, তাহার চেহারাখানার

বিপুল দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সেটা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেয়। এবং তাহার আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির যে খুব সৌসাদৃশ্য আছে, তাহার কালিমা-লেপিত কোটরবিবিক্ষু চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি, প্রকটগণ্ডাস্থি মুখের ভীষণ ভঙ্গিতে সে-সম্বন্ধে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। সে বলিল, 'অরিন্দমের উপর আমার রাগের কোনও কারণ আছে কি না, তা আমি বলতে চাই না। তোমাদের সকলের চেয়ে তাকে যে আমি অনেক বেশি ঘৃণা করি, সেইটুকু জেনে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো—হও, বিশ্বাস করতে পারো, ভালো—থেকে যাই; না হয় বলো, আমি আমার '-ক্তের পথ দেখি। অরিন্দমের যমের বাড়ি যাবার পথটা সহজ করে দিবার ক্ষমতা আমার একারই যথেষ্ট আছে।'

তাহার পর তেরো নম্বরের লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। ফুলসাহেব তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, 'তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার সম্বন্ধে আমি অনেক কথা জানি।'

লোকটা সেই গোরাচাঁদ। নামটা শুনিলে কাহারও লোকটাকে মনে করিতে বিলম্ব হইবে না।

গোরাচাঁদ বসিলে ফুলসাহেব নিজে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—বেশ হাসিমুখে মিষ্টকথায় শ্রোতাদের কর্ণে অমৃত-বর্ষণ করিয়া বলিল, 'আমি অরিন্দমকে কেন ঘৃণা করি, তোমরা কেহই জানো না। একমাত্র কারণ হচ্ছে, সে ঠিক আমারই মতো বলবান, আমারই মতো চতুর, আমারই মতো বুদ্ধিমান এবং আমারই মতো সকল কাজে তৎপর। আমি বেঁচে থাকতে আমার মতো আর একটা লোক যে পৃথিবীতে থাকে, সে-ইচ্ছা আমার একেবারে নাই। সেটা আমার একান্ত অসহ্য বোধ হয়ে আসছে; হয় সে পৃথিবী ত্যাগ করুক—আমি নিরাপদ হই, নয় আমি যাই—সে সুখী হোক। এ-দুটার একটা আমি না করে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারব না। দেখি, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! যাক, এখন তোমাদের মধ্যে এমন কেহ এখানে আছে, যে জীবনের মধ্যে কখনও একটা-না-একটা খুন করে নাই? কে আছ, বলো।'

কেহ কোনও উত্তর করিল না—সকলেই খুনি দস্যু।

ফুলসাহেব বলিল, 'ভালোই হয়েছে, এ-সব কাজে এইরকমই লোক দরকার। অরিন্দম-হত্যার জন্য এখন সকলকে শপথ করতে হবে।'

তখন সেই সকল খুনি লোক একমাত্র অরিন্দমের জীবন লক্ষ্য করিয়া শপথ করিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফুলসাহেবের নিকট হইতে এক-একখানি তীক্ষ্ণধার কিরীচ উপহার পাইল।

সেদিন এই পর্যন্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মোহিনীর শেষ উদ্যম

দেবেন্দ্রবিজয় আশ্বাসিত ও অনুরুদ্ধ হইয়া এখনও অরিন্দমের বাসায় অপেক্ষা করিতেছেন। যত দিন যাইতেছে, রেবতীর জন্য দেবেন্দ্রবিজয় ততই ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছেন। রেবতীর সন্ধানের জন্য অরিন্দমকে কোনও কথা বলিলে, অরিন্দম মুখে খুবই আশ্বাস দেন; কিন্তু কাজে তাঁহার কিছুই হয় না দেখিয়া, দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। এমনকী অরিন্দমের সংসর্গ তাঁহার এক-একবার বড় তিক্ত বোধ হইত। সেই সময়ে মনুষ্যোচিত বিরক্তি এবং রেবতী-উদ্ধারের জন্য অন্য ডিটেকটিভ নির্বাচনের কল্পনাটা তাঁহার মনের ভিতরে নিরতিশয় প্রবল ও তীব্র হইয়া উঠিত; মুখে কিছুই প্রকাশ করিতেন না। মুখে প্রকাশ না করিলেও মুখের ভাবটা সে-কথাটা যখন-তখন অরিন্দমের নিকট প্রকাশ করিয়া দিত। দুই-একটা কাজেও অরিন্দম তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেন; ফুলসাহেবের অনুসন্ধান সম্বন্ধে কোনও কাজ করিতে হইলে দেবেন্দ্রবিজয় পাঁচ-সাতবার 'হ্যাঁ' 'না' করিয়া কখনও কোনও কাজে 'হ্যাঁ' দিতেন, কখনও কোনও কাজে 'না' দিতেন। এক-একসময়ে অরিন্দমের মিথ্যা (?) আশ্বাসবাক্যে তাঁহার বিরক্তি ও ধৈর্য একেবারে সীমা অতিক্রম করিয়া এতদূরে উঠিত যে, তাহা একটা নীরব

ক্রোধে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। এবং সেইসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয় গৃহ-প্রত্যাগমনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতেন। অসহ্য বিরক্তি, দারুণ উৎকণ্ঠা, দুঃসহ উদ্বেগ এবং লুপ্তপ্রায় ধৈর্যের মধ্য দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের দীর্ঘ-দীর্ঘ দিনগুলি দীর্ঘতম হইয়া অতিবাহিত হইতেছে।

একদিন দেবেন্দ্রবিজয় কোনও কাজে বাহির হইয়াছেন, অরিন্দম মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর সংক্ষিপ্ত মধ্যাহ্ন-বিশ্রামের আয়োজনমাত্র করিয়াছেন, এমনসময়ে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, একটি স্ত্রীলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

অরিন্দম সেই স্ত্রীলোককে সেইখানে লইয়া আসিবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

অনতিবিলম্বে মুখের উপর অনেকখানি ঘোমটা টানিয়া একটি স্ত্রীমূর্তি অরিন্দমের সম্মুখীন হইয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ না করিয়া দ্বার-সম্মুখে বসিয়া পড়িল। তাহার বেশভূষা মলিন এবং বড় অপরিষ্কার। দুই-এক গুচ্ছ চুল—অতি রুক্ষ, কানের পাশ দিয়া, সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—সে গৌরবর্ণা হইলেও, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সে-বর্ণে কিছুমাত্র ঔজ্জ্বল্য ছিল না। সে-দেহ দাবাগ্নিদগ্ধকিশলয়সদৃশ কেমন যেন বিশুষ্ক ও শ্রীহীন, ঠিক বর্ণনা করা যায় না।

অরিন্দম তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি ঘরের ভিতরে শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন; উঠিয়া বসিয়া, একটি তাকিয়া টানিয়া তদুপরে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন, 'কে তুমি?'

ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে উত্তর হইল, 'আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী।'

ফুলসাহেবের স্ত্রী! শুনিয়া বিস্মিত অরিন্দম আরও বিস্মিত হইলেন। কতকটা যেন স্বপ্নের মতো বোধ হইল। একবার মনে হইল, ছদ্মবেশে জুমেলিয়া নহে তো? কিন্তু তার কণ্ঠস্বর তো এমন নহে, জুমেলিয়ার কণ্ঠস্বরে এমন একটা তীব্রতা মিশ্রিত আছে যে, একবার শুনিলে চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহা সহজে ভুলিতে পারে না। এ কে? সন্দিগ্ধ অরিন্দম কী উত্তর করবেন, ঠিক করিতে না পারিয়া, ললাট কুঞ্চিত করিয়া অবাঙ্মুখে তাহার দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন।

অরিন্দমকে নীরব দেখিয়া সেই কৃতাবগুণ্ঠনা রমণী বলিল, 'তুমি ফুলসাহেবকে কি জানো না?'

অরিন্দম। জানি।

রমণী। আমি তাহার স্ত্রী—আমার নাম মোহিনী।

অরিন্দম। ইহা এখন জানিলাম।

মোহিনী। ফুলসাহেব জেলখানা থেকে পালায়, সে-কথা তোমার মনে আছে?

অ। আছে।

মো। সে তোমাকে খুন করবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করেছে, তা এখনও তোমার মনে আছে কি?

অ। বেশ মনে আছে।

মো। তবে যে তুমি বড় ভালোমানুষটির মতো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ?

অ। চিন্তিত হইয়াই বা করিব কী? এই দুইমাস ধরিয়া কিছুতেই তাহার সন্ধান হইল না।

মো। তা না হলেও তোমার মতো একজন বড় গোয়েন্দার চুপ করে বসে থাকা কি ভালো দেখায়? দুই মাসে যা হয় নাই—দুই দিনে তা হতে পারে।

অ। তা যেন হল, তুমি ফুলসাহেবের স্ত্রী—তাতে তোমার লাভ কী?

মো। লাভ? অনেক। সে অনেক কথা—সে-কথা থাক। আসল কথাটা আগে শুনে যাও। ফুলসাহেব এখন তোমাকে খুন করবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এইবার সে যা হোক, একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বে না; তাই আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি। খুব সাবধান—ফুলসাহেব

বড় ভয়ানক লোক! সে শুধু মানুষ না—সে অনেক রকম; সে মানুষও বটে; সে পিশাচও বটে; সে দানবও বটে, সে ডাকাতও বটে; সে খুনেও বটে, সে সাপও বটে, সে বাঘও বটে, একটু অসাবধান হলে হয় সে সাপ হয়ে দংশন করবে—না হয় বাঘ হয়ে গিলে খাবে—না হয় পিশাচ হয়ে ঘাড় মটকাবে! না হয়—

অ। (বাধা দিয়া) আসল কথা কী বলবে বলছিলে না?

মো। হ্যাঁ, মনে আছে। ফুলসাহেব তোমাকে খুন করবার জন্য একদল দস্যু সংগ্রহ করেছে। তারা সকলেই তোমাকে খুন করবার জন্য ফুলসাহেবের কাছে শপথ করেছে। একটু অসাবধান হলে কখন কে এসে তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে, তুমি তা কিছুই জানতে পারবে না। খুব সাবধান—সারা দিনরাত সাবধান—বড় ভয়ানক লোক, তারা—সকলেই খুনি, খুন-জখম করতে তাদের একটুও সঙ্কোচ হয় না।

অ। তারা কে জানো?

মো। না, তারা দু-চারজন নয়, সর্বসুদ্ধ তেরো জন। সকলেই যেন যমের দূত।

অ। তাদের আড্ডা কোথায়, বলতে পারো?

মো। আড্ডার কোনও ঠিক-ঠিকানা নাই। যেখানে যখন তারা যেদিন একসঙ্গে জুটে, সেইদিন সেইখানে তাদের আড্ডা। তারা সকলেই দিনরাত যে-যার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অ। সে চেষ্টার লক্ষ্য আমার মৃত্যু, কেমন?

মো। তাতে আর সন্দেহ আছে?

অ। তাদের ভিতরকার আর কোনও কথা তুমি জানো?

মো। তাদের একটি পরামর্শের কথা আমি নিজের কানে শুনেছি; বড় ভয়ানক লোক তারা—বড় ভয়ানক কথা!

অ। কথাটা কী?

মো। আজ রাত্রে তোমাকে তারা এখানে খুন করতে আসবে।

অ। (বাধা দিয়া) এখানে! আমার বাড়িতে?

মো। কেন? বিশ্বাস হয় না?

অ। সকলেই আসবে?

মো। সকলেই—সকলেই শপথ করেছে।

অ। কখন আসবে?

মো। আজ রাত্রে।

অ। তা জানি। কত রাত্রে?

মো। রাত দুটার পর।

অ। বটে!

মো। শুধু নিজেকে রক্ষা করলে হবে না—দেখব তাদের ধরতে তবে জানব—গোয়েন্দার মতো গোয়েন্দা বটে! এখন থেকে পুলিশের লোকজন এনে বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে রেখে দাও—আমার পরামর্শ শোনো।

অ। তা হলে ফুলসাহেবও ধরা পড়বে—ফুলসাহেব যে তোমার স্বামী।

মো। ফুলসাহেব যে আমার স্বামী, সে-কথা আর আমাকে এত করে বুঝিয়ে দিতে হবে না। আমি ফুলসাহেবের স্ত্রী—আমি কি জানি না, ফুলসাহেব আমার স্বামী? নামজাদা বুদ্ধিমান গোয়েন্দা হয়ে তুমি সহসা এমন নির্বোধের মতো কথা কও কেন?

অ। তবে যে তুমি ফুলসাহেবের অমঙ্গল চেষ্টা করছ? কারণ কী?

মো। কারণ, সে আমার পরম শত্রু। মানুষ মানুষের এতদূর শত্রু হতে পারে, এ-কথা আগে জানতাম না। ফুলসাহেবের তুমি যেমন শত্রু, তার চেয়ে ফুলসাহেব আমার বেশি শত্রু। যখন সে

জেলে গিয়েছিল, তখন একবার আমি সুখী হয়েছিলাম; এখন আমার যন্ত্রণায় বুকটা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে!

অ। ফুলসাহেবকে গ্রেপ্তার করলে তুমি সুখী হবে?

মো। খুন করলে সুখী হব।

অ। স্বামীর উপরে এত রাগের কারণ কী?

মো। সে-কথায় তোমার কোনও দরকার নাই, তবে এখন আমি যাই। যা বললেম, সব যেন বেশ মনে থাকে।

মোহিনী চকিতে উঠিয়া, অতি দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া গেল।

অরিন্দম পথের দিককার একটা জানালায় মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, মোহিনী তখন ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছে—এমনকী অর্ধোলঙ্গভাবে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। দুই-একজন পথিক পথের ধারে দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া মোহিনীর দিকে চাহিয়া আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ অরিন্দমের আয়োজন

এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব ঘটনাটা অরিন্দমের নিরতিশয় অদ্ভুতরসাত্মক বলিয়া বোধ হইল। কথায়-বার্তায় পূর্বেই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, মোহিনীর পাগলের ছিট আছে। এখন তাহাকে পথের উপর দিয়া সেরূপভাবে ছুটিতে দেখিয়া, সে-ধারণাটা কিছুমাত্র অমূলক নহে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাহা হইলেও অরিন্দম তাহার কথাগুলি উন্মাদের খেয়াল মনে না করিয়া, সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। যদিও তাঁহার ন্যায় সাহসী, সুচতুর ও সদ্বিবেচক ব্যক্তির পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের উপর নির্ভর করা একান্ত নিন্দার কথা; তাহা হইলেও তিনি অনেক স্থলে দৈবের উপরেই সমধিক নির্ভর করিতেন। তিনি জানিতেন এবং এমন অনেক হইতেও দেখিয়াছেন যে, প্রথমে দৈবাৎ এমন এক-একটি ছোট ঘটনা ঘটে যে, একসময়ে তাহার পরিমাণ অদৃষ্টপূর্ব গুরুতর হইয়া উঠে।

তিনি সেই অপরিচিতা উন্মাদিনীর কথায় একান্ত আস্থা স্থাপনপূর্বক দস্যুদল-দলনের অচিন্তিতপূর্ব এক বৃহৎ আয়োজনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। আয়োজনটা নূতন রকমের, তাহাতে প্রচুর আমোদ আছে এবং ভয়, পরিশ্রম খুব কম আছে।

তিনি যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে থানায় উপস্থিত হইলেন। যোগেন্দ্রনাথ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে ফুলসাহেবের এই নূতন কল্পনার কথা বলিলেন বটে, কিন্তু নিজে তাহাকে ধরিবার জন্য যে উপায় স্থির করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে কোনও কথা তাঁহার নিকটে প্রকাশ করিলেন না।

যোগেন্দ্রনাথ বলিলেন, 'ব্যাপার তো বড় সহজ নহে, আপনার বাড়িতে ডাকাতি! এইবার আপনার বিদ্যাবুদ্ধি বাহির হইয়া পড়িবে।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তেরোজন ডাকাতকে ভয় করিতে অরিন্দমের এখনও শিক্ষা হয় নাই। কথাটা যদি ঠিক হয়, তা হলে কাল দেখবেন, অরিন্দম তেরোজনকেই অয়স্কঙ্কণভূষিত করে এখানে চালান দিয়েছে।'

যোগেন্দ্র। অরিন্দমবাবু, এ কি আপনি যে-সে তেরোজন মনে করেছেন? ফুলসাহেব তো তার মধ্যে আছেই; তা ছাড়া ফুলসাহেবের পছন্দ করা বারোজন। মনে থাকে যেন, তাদের এক-একজন দ্বিতীয় ফুলসাহেব।

অরিন্দম। নিঃসন্দেহ।

যো। তবে?

অ। তবে আবার কী?

যো। এখন কী উপায় স্থির করেছেন?

অ। আত্মরক্ষার না তাদের বন্দি করবার?

যো। দুই বিষয়েই।

অ। এখনও অনেক সময় আছে, একটা-না-একটা উপায় স্থির করতে পারব।

যো। সময় আর কোথায়? আজ রাত্রেই তো তারা আসবে। এখন কতগুলি লোক আমাকে দিতে হবে, বলুন দেখি?

অ। একজনও না।

যো। (সবিস্ময়ে) সে কী!

অ। লোক নিয়ে আমি কী করব?

যো। একাই বা কী করবেন?

অ। যতদূর সাধ্য।

যো। কী পাগলের মতো কথা বলেন, মানে হয় না। ভেবে-ভেবে আর ঘুরে-ঘুরে আপনার মাথাটা একেবারে বিগড়ে গেছে দেখছি, অরিন্দমবাবু!

অ। (সহাস্যে) তা হবে!

যো। আপনার সকল কথায় পরিহাস। কাজের কথায় পরিহাস করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। আপনি একা সেই তেরোজনের কিছুই করতে পারবেন না।

অ। দেবেন্দ্রবিজয় আছে।

যো। সেদিনকার ঘটনায় তার বলবুদ্ধির অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; সেদিনকার মতো আজ আবার সে আপনার সাহায্য করতে গিয়ে, আপনার বিপদ আর একদিকে না বাড়িয়ে দিলে হয়।

অ। নূতন লোক। তা যাই হোক, দেবেন্দ্রবিজয়ের মুখ-চোখের ভাব আর কথাবার্তা শুনে তার মাথাটা যে পরিষ্কার আছে, তা বেশ বুঝতে পারা যায়। আমার সঙ্গে এই দুইমাসে ঘুরে-ঘুরে গোয়েন্দাগিরি শিখতে তার একটু ইচ্ছা হয়েছে। মাথা পরিষ্কার না থাকলে এ-জঘন্য কাজে সহজে কাহারওই ইচ্ছা হয় না। যে একটু বুদ্ধিমান, যে একটু চতুর, যে একটু বলবান, এ-সব কাজে সে একটু আনন্দ বোধ করেই থাকে।

যো। না হয়, আপনার দেবেন্দ্রবিজয় চতুর, বুদ্ধিমান, বলবান সবই। তা হলেও দুইজনে কি সেই তেরোজনের সমকক্ষ হতে পারবেন? বিশেষত সেই তেরোজনের মধ্যে আবার স্বয়ং ফুলসাহেবের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব রয়েছে।

অ। একদিন আমি একা একুশজনের যে দুর্দশা করেছিলেম, তা বুঝি আপনার মনে নাই?

যো। তা জানি, আপনার বুদ্ধিবল অলৌকিক; কিন্তু ফুলসাহেব বড় সহজ লোক নয়, তাই বলিতেছি।

অ। একটা বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাই। কতকগুলি ইলেকট্রিক ব্যাটারি আবশ্যক। সন্ধ্যার পূর্বে সংগ্রহ করতে পারবেন?

যো। ইলেকট্রিক ব্যাটারি নিয়ে কী হবে?

অ। (সহাস্যে) একটু বিজ্ঞানের চর্চা করা যাবে।

যো। আপনার অন্ত পাওয়া ভার—আপনি লোকটা একান্ত দুর্জ্ঞেয়।

অ। আপনার কাছেও?

যো। তা বইকি! ইলেকট্রিক ব্যাটারি ছাড়া আর কিছু চাই?

অ। আর চৌদ্দ জোড়া হাতকড়ি ও বেড়ি। যেন সকলগুলি বেশ মজবুত হয়।

যো। একটা বেশি কেন?

অ। যদি সেই তেরোজনের সঙ্গে আমার বাড়িতে জুমেলিয়ারও শুভ পদার্পণ হয়। তা না হলেও ফুলসাহেবের জন্য জোড়া-দুই হাতকড়ি আবশ্যক করে।

যো। অরিন্দমবাবু, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার কথাগুলো আমার বড় ভালো ঠেকছে না। বেশি না হয়—আমি থানা থেকে বারোজন লোক দিচ্ছি, আজ রাত্রের জন্য আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দিন, এ-সময়ে অনেক কাজে লাগবে।

অ। একজনও না। আমাকে কি আপনার বিশ্বাস হয় না?

যো। আপনার যা খুশি, তা করুন, আমি আর কোনও কথা বলব না।

অ। আমি উঠলেম—আর সময় নষ্ট করব না। ইলেকট্রিক ব্যাটারি আর হাতকড়ি ও বেড়িগুলা যত শীঘ্র পারেন, পাঠিয়ে দেবেন।

যো। আধঘণ্টার মধ্যেই পাবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ******

যোগেন্দ্রনাথের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, অরিন্দম বাসায় আসিয়া দেখিলেন, তখনও দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসেন নাই। তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে একটা চুরুট টানিতে ও প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

যথাসময়ে মুটের মাথায় বোঝাই হইয়া যোগেন্দ্রনাথের প্রেরিত অনেকগুলি ইলেকট্রিক ব্যাটারি ও অনেকগুলি হাতকড়ি ও বেড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিন্দম প্রত্যেক জিনিসটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিয়া ঘরে তুলিলেন। হাতকড়ি ও বেড়িগুলি দ্বিতলের উপরে এমন একটা স্থানে রাখিলেন যে, দরকারের সময়ে সহজে পাওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইলেকট্রিক ব্যাটারিগুলি দ্বিতলে উঠিবার সোপানের নিচে বসাইলেন; এবং সেই ব্যাটারিগুলির সঙ্গে তার যোগ করিয়া সোপানের চারিদিকে এবং রেলিং-এর গায়ে সংলগ্ন করিয়া দিলেন। নিজের শয়ন-কক্ষের কবাটের কড়া দুইটির সহিতও একটি তার লাগাইয়া ইলেকট্রিক ব্যাটারির সহিত সংলগ্ন করিয়া দিলেন।

সমুদয় ঠিকঠাক করিতে অরিন্দমের রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। রাত্রি নয়টার পর দেবেন্দ্রবিজয় ফিরিয়া আসিলেন।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'ফুলসাহেবের আজ এখানে শুভাগমন হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয় সদ্য-আকাশ-বিদ্যুতের ন্যায় বলিলেন, 'ফুলসাহেব! এখানে কোথায় আসবে?'

'এখানে—আমার বাড়িতে।'

'এখন সে কোথায়?'

'যেখানেই থাক, আজ আমার বাড়িতে আসবে।'

'আপনার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ, আমার বাড়িতে।'

'ধরা দিতে নাকি?'

'অনেকটা সেইরকমেরই বটে।'

'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

(সহাস্যে) 'এসো, বুঝিয়ে দিই।'

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া, দ্বিতলে উঠিবার সোপানের সম্মুখে লইয়া আসিলেন; এবং ইলেকট্রিক ব্যাটারির সাহায্যে সিঁড়ির উপরকার তারগুলিতে সামান্যমাত্র বৈদ্যুতিক

প্রবাহের সঞ্চার করিয়া দিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'একবার তুমি সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়াও দেখি।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের অপেক্ষা অরিন্দম বয়সে অনেক বড় বলিয়া এবং এই দুই মাসের ঘনিষ্ঠতায় তাঁহার সহিত কথোপকথন কালে 'আপনি', 'আপনার' ইত্যাদি সম্ভ্রমসূচক শব্দের পরিবর্তে স্নেহসূচক 'তুমি', 'তোমার' শব্দ ব্যবহার করিতেন। অরিন্দমের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় তাড়াতাড়ি পাশের রেলিং ধরিয়া সদর্পে সিঁড়িতে উঠিলেন; তখনই যন্ত্রণায় তীব্রতর চিৎকারে সমস্ত বাড়িটা আর্তনাদ-প্রতিধ্বনিত করিয়া সিঁড়ি হইতে পাঁচহাত দূরে লাফাইয়া পড়িলেন।

অরিন্দম তখন দেবেন্দ্রবিজয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় বিস্মিত হইলেন। অরিন্দম বলিলেন, 'তুমি একটা ব্যাটারির তেজ দেখিলে; যথাসময়ে দশটা ব্যাটারি একসঙ্গে কাজ করবে। তখন একবার পা দিলে আর এক পা নড়তে হবে না। ফুলসাহেব যখন ধরা পড়বে, তখন যতক্ষণ না রেবতীর সম্বন্ধে সব কথা সে বলে, ততক্ষণ তাকে এরূপ যন্ত্রণাময় অবস্থায় সিঁড়ির উপরে ধরিয়া রাখিব। দারুণ যন্ত্রণায় তখনই তাকে তার সমুদয় গুপ্তকথা আমাদের কাছে প্রকাশ করতেই হবে।'

শুনিয়া দেবেন্দ্রবিজয় মনে-মনে খুব খুশি হইলেন। মুখের ভাব বুঝিয়া অরিন্দমও যে তাহা না বুঝিলেন, তাহা নহে। বলিলেন, 'যেরূপ দেখছি, তাতে রেবতীর উদ্ধারটা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে বলেই বোধ হয়।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনার কল্পনার ভিতরে আমি এখনও প্রবেশ করতে পারি নাই; আপনি যা বলছেন তা না বুঝবার মতন একরকম বুঝে যাচ্ছি। ফুলসাহেব এখানে কী করতে আসবে?'

অ। আমাকে খুন করতে।

দে। এত সাহস তার?

অ। ফুলসাহেবের পক্ষে এটা বড় বেশি সাহসের কথা নয়।

দে। কত রাত্রে?

অ। রাত দু'টার পর।

দে। কীরকম ভাবে আসবে?

অ। চোরের মতো চুপিচুপি আসবে না—ডাকাতেরা যেমন দলবল নিয়ে ডাকাতি করতে আসে, ফুলসাহেব তেমনি সদলবলে আসবে।

দে। সে আবার দলবল পেলে কোথায়?

অ। এই দুই মাস কি সে নিশ্চেষ্ট হয়ে চুপ করে বসেছিল? ভিতরে-ভিতরে এই সব করেছে।

দে। তবে তো বড় ভয়ানক কথা! আপনি এ-সংবাদ কোথায় পেলেন?

অরিন্দম তখন মোহিনীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, সমস্তই বলিলেন। মোহিনী নাম্নী একটা উন্মাদিনীর কথায় অরিন্দমের এতটা বিশ্বাস স্থাপন করা অনেকেই মনে করিবেন, কাজটা ঠিক হয় নাই; কিন্তু অনেক দিনের ডিটেকটিভ অরিন্দমের এমন একটা অসাধারণ নৈপুণ্য এবং অনন্যসুলভ অনুমান শক্তি ছিল যে, একটা কথা পড়িলে ভবিষ্যতে সেটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা তিনি ঠিক অনুভব করিতে পারিতেন। নিজের সম্বন্ধে মোহিনী কোনও কথা না খুলিয়া বলিলেও তাহার কথাবার্তার ভাবে তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, মোহিনী ফুলসাহেবের নিকটে কোনও বিষয়ে প্রতারিত হইয়াছে—এরূপ স্থলে অবশ্য সে-বিষয়টা আদিরসাত্মক এবং কিছু মর্মভেদী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ গুপ্তদ্বার

রাত্রি এগারোটার পূর্বে অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় আহারাদি শেষ করিলেন এবং সম্মুখ-দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া, দ্বিতলের একটা ঘরে বসিয়া উভয়ে দাবা-খেলা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় খেলিতে-খেলিতে বারংবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন। এক-একবার মনটা খেলা হইতে সরিয়া গিয়া ফুলসাহেবের পদধ্বনি শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছিল এবং ফুলসাহেবের দলবলের লোকগুলির ভীষণ চেহারা কল্পনা করিতে চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু অরিন্দম অত্যন্ত মনোযোগের সহিত খেলিতেছিলেন, সুতরাং বাজী জিতিতে ছিলেন। মাথার উপরে যে এতবড় একটা বিপদ, জীবন ও মৃত্যুর এবং ছুরি ও রক্তের একটা সংগ্রামাভিনয় যে আসন্ন, তথাপি সেজন্য তাঁহার মুখে উদ্বেগ, আশঙ্কা অথবা চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত নাই।

রাত্রি দুইটার সময়ে খেলা বন্ধ হইল। অরিন্দম বলিলেন, 'এইবার তাদের আসবার সময় হয়েছে, একঘণ্টার মধ্যেই তাদের শুভাগমন হবে; আমরা দুইজনে মিলিয়া এখন হতে তাদের অভ্যর্থনা করবার বন্দোবস্ত করি, এসো।'

দেবেন্দ্র। আমি কোথায় থাকব, বলুন দেখি?

অরি। নিচে, সিঁড়ির পাশের ঘরটায় এখন তোমাকে থাকতে হবে। যাবার সময়ে রবারের জুতা আর দস্তানা পরে যাবে। সেগুলি এত মোটা রবারের তৈয়ারি যে, ইলেকট্রিক তারে কিছুই করতে পারবে না।

এই বলিয়া অরিন্দম দুই জোড়া রবারের জুতা ও দস্তানা লইয়া আসিলেন। উভয়ে সেইগুলি লইয়া হাতে পায়ে পরিলেন।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'নিচের ঘরে গিয়ে আমায় কী করতে হবে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'সেই ঘরের দক্ষিণ কোণে দেখবে, একটি দড়ি ঝুলছে; যখন দেখবে যে, তেরোজন লোক সিঁড়ির উপরে উঠেছে, তখন সেই দড়িটি টেনে ধরবে। তারপর যা করতে হয়, আমি করব।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'হয়তো তেরোজনের একজন বাহিরে পাহারা দিতে পারে।'

অ। তাদের পাহারা দিবার আরও লোক আছে, সে-কাজ জুমেলিয়া বেশ পারবে। জুমেলিয়ার উপরে ফুলসাহেব যথেষ্ট নির্ভর করে থাকে।

দে। তা হলেও তেরোজন কি একসঙ্গে উপরে উঠবে?

অ। তেরোজনই উঠবে। ফুলসাহেব যে প্রকৃতির লোক, তাতে যে সে চোরের মতো চুপি-চুপি, ভয়ে-ভয়ে কোনও কাজ করবে বোধ হয় না; এমন বীরত্বের অভিনয়টা সে কখনওই একেবারে মাটি করে ফেলবে না। একেবারে সকলকে সঙ্গে নিয়ে, আমার শয়ন-গৃহে গিয়া বিছানার চারিদিক থেকে তেরোখানা ছুরি একসঙ্গে অমার বুকে বসিয়ে যাতে এ-বীরত্বের অভিনয়টা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়, বরং সে সেই চেষ্টা করবে, আমার তো এইরূপ অনুমান; তারপর তার মনে আর কী আছে, সে-ই জানে। তা সে যাহাই মনে করে আসুক, একবার এলে আর ফিরে যেতে হবে না। এই গোয়েন্দাগিরি কাজ বড় শক্ত, দেবেন্দ্রবাবু; যেখানে একটু সন্দেহের ছায়া আছে, সেই সন্দেহকে সত্যের আসনে বসিয়ে, সেখানে আমাদের এক প্রকাণ্ড আয়োজন ঠিক করে রাখতে হয়। তোমার যেরূপ উৎসাহ দেখছি, কিছুদিন আমার সঙ্গে থাকলে তুমি একজন বড় ডিটেকটিভ হতে পারবে। তোমার কিছু-কিছু ডাক্তারি জানা আছে, এ-কাজে ডাক্তারি শিক্ষাটাও সময়ে-সময়ে উপকারে আসে।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'কিন্তু ডাক্তারির মতো এ-কাজটা তেমন মান্য নহে। বিশেষত ডাক্তারিগিরি অনেক লোকের অনেক উপকারে আসে—এমনকী, কত লোককে আসন্ন মৃত্যুর হাত হতে উদ্ধার করাও হয়।'

অরিন্দম বলিলেন, 'তোমার এ-কথার উত্তরে আমাকে অনেক কথা বলতে হয়; গোয়েন্দাগিরিতে ডাক্তারি অপেক্ষা সহস্রগুণে লোকের উপকার করা হয়। এই গোয়েন্দাগিরি কত ধন-প্রাণে মরণাপন্ন ব্যক্তির ধন ও প্রাণ ফিরিয়ে এনে তার অবসন্ন দেহে নূতন জীবনসঞ্চার করে। গোয়েন্দাগিরি অপহৃত স্নেহের নিধি সন্তানে শোকাতুর পিতামাতার শূন্যক্রোড় পরিপূর্ণ করে। এই গোয়েন্দাগিরি দস্যুর হাত

থেকে, খুনির হাত থেকে কত নিরবলম্বন শিশুর পিতা, কত অভাগিনী স্ত্রীর স্বামীকে উদ্ধার করে থাকে; তাতে কি পরোপকারের কিছুই নাই? কেবল পশুশ্রম? বোধকরি, কোনও ডাক্তারকে পরোপকারের জন্য গোয়েন্দাদিগের মতো শ্রমস্বীকার করতে হলে, ডাক্তারি বিদ্যাটি মস্তিষ্ক হতে শীঘ্র বহিষ্কৃত করে ফেলবার জন্য স্মৃতিনাশক কোনও আশুফলপ্রদ নূতন ঔষধের আবিষ্কার করতে তিনি সচেষ্ট হয়ে উঠতেন। কতক বা কৌতূহল, কতক বা দয়া, কতক বা রোষপরবশ হয়ে ডিটেকটিভেরা শরণাপন্নের যে-সকল ভয়ানক-ভয়ানক বিপদ নিজের মাথায় নিয়ে নিজের অসহায় প্রাণটাকে খুনিদের ছুরির নিচে স্বচ্ছন্দে যেমন ছেড়ে দেয়, আর কেহ তেমন পারে, বলো দেখি? তথাপি এ-দেশের লোকেরা ডিটেকটিভদের সম্মান করে না। তা তাদের দোষ নয়, আমাদেরই অদৃষ্টের দোষ; নতুবা ইংলন্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার ডিটেকটিভেরা যেরূপ সম্মানিত হয়ে থাকে এবং আবালবৃদ্ধবনিতার এমন একটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে যে, সেখানকার বিচারপতিদিগের অদৃষ্টেও তেমনটি ঘটে না। যদিও আমার মুখে এ-সকল কথাগুলা ভালো শোনায় না—সম্পূর্ণ আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়; কিন্তু যখন অবসরে এক-একবার নিজেদের কথাগুলি ভাবি, তখন মনে যেমন দুঃখ হয়, তেমনি নিজেদের জীবনের প্রতি একটা ঘৃণাও জন্মে। আমরা অপরের জন্য দেহপাত ও প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত; কিন্তু অপরে সেটা স্বীকার করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত এবং একটু সম্মান দেখাতে একেবারে অপ্রস্তুত। আমরা যদি তাহাদের দুই চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিই, আমরা পরের জন্য জন্মিয়াছি এবং পরের জন্য বাঁচিয়া আছি; এবং যখন মরিতে হইবে, পরের জন্যই মরিব; তথাপি তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না! বোধকরি, বাংলাদেশের ডিটেকটিভশ্রেণীর উপরে বিধাতার একটা অমোঘ অভিসম্পাত আছে। যাক, সে-সকল কথা এখন থাক, তুমি নিচে যাও। ফুলসাহেবের আসবার সময় হয়ে এসেছে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ : নূতন প্রক্রিয়া

দেবেন্দ্রবিজয় নিচে নামিয়া গেলেন এবং সোপানের পার্শ্ববর্তী একটি অন্ধকারময় ঘরে নীরবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে একটা কী শব্দ হইল। দেবেন্দ্রবিজয় সেই ঘরের কবাটের ফাঁক দিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরের রাস্তার দিককার একটা জানালা দিয়া এক-একজন বিকটাকার দস্যু প্রবেশ করিতেছে; এবং একজন দুইহস্তে গবাক্ষের লোহার গরাদ দুইটি ফাঁক করিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। অন্ধকারে কাহারও মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু তাহারা যে ফুলসাহেবের দলবল, তাহাতে আর দেবেন্দ্রবিজয়ের তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, নিঃশব্দে অনেকগুলি লোক উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। এমনসময়ে তাহাদের ভিতর হইতে একজন লোক একবার একটা দিয়াশলাই জ্বালিয়া সকলে আসিয়াছে কি না, গণনা করিয়া দেখিল। সে গণনাকারী স্বয়ং ফুলসাহেব। সেই অবসরে দেবেন্দ্রবিজয়ও একবার তাহাদিগের গণনা করিয়া লইলেন। মোটের উপরে তাহারা তেরোজন। সকলের হাতে এক-একখানা তীক্ষ্ণধার কিরীচ।

তাহার পর তাহারা অন্ধকারে ধীরে-ধীরে সোপানারোহণ আরম্ভ করিল। নিঃশব্দে—কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দেবেন্দ্রবিজয় দেখিয়া ভীত হইলেন, যদি ইলেকট্রিক ব্যাটারি এ-সময়ে কোনও কাজ না করে, তাহা হইলে এখনই যে ভয়ানক ঘটনা ঘটিবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। এ-সময়ে তাহারা সকলেই মরিয়া—প্রাণের ভয় ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগের সকলেই যখন সিঁড়ির উপরে উঠিয়াছে, তখন দেবেন্দ্রবিজয় সেই ইলেকট্রিক ব্যাটারির দড়ি সজোরে টানিয়া ধরিলেন।

তখনই চক্ষুর নিমেষে কী ভয়ানক!

তখনই দস্যুদলের আর্তনাদে, চিৎকারে, তর্জনে-গর্জনে, গালাগালিতে সমস্ত বাড়িখানা যেন

ভাঙিয়া পড়িবার মতো হইল। তখনকার ব্যাপার বর্ণনায় পাঠকের ঠিক হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। পাঠক, পারেন যদি অশ্বশালায় অগ্নিসংযোগের কল্পনা করিতে একবার চেষ্টা করুন, অনেকটা সেই রকমের। অবশ্যই সেই দহ্যমান অশ্বশালায় অনেকগুলি অশ্ব আছে।

এমনসময়ে অরিন্দম একটা লণ্ঠন হাতে বাহিরে আসিলেন। এবং সেই সোপানের উপরে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। আর নিচে দেবেন্দ্রবিজয় ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া হাসিয়া হতজ্ঞান হইতেছেন।

কী সুন্দর দৃশ্য—সিঁড়ির উপর হইতে নিচে পর্যন্ত তেরোজন সারি-সারি দাঁড়াইয়া! তর্জন-গর্জনের তো কথাই নাই—তাহার পরে তাহাদের কী চমৎকার মুখভঙ্গি! যন্ত্রণায় কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ সেই উদ্যোগে আছে এবং কেহ রেলিং হইতে হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য মুখ বিকৃত করিয়া লাফাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছে না। যাহার যেখানে সেই ইলেকট্রিক ব্যাটারির সংস্পর্শ হইয়াছে, দেহ হইতে সেই অঙ্গটি যেন ছিঁড়িয়া উঠিয়া যাইতেছে।

ডাক্তার ফুলসাহেব সিঁড়ির উপরের শেষ সীমায় অরিন্দমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া; যদিও তাহার মুখে চিৎকার, গোঙানি কি কোনও যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি ছিল না, তথাপি তাহার মুখের ভাব এবং দেহের সুদৃঢ় মাংসপেশিগুলি যেরূপ স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা দেখিয়া তাহার ভীষণ যন্ত্রণা বেশ অনুভব করা যায়।

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো? অনেকদিনের পর একেবারে সবান্ধবে শুভাগমন করেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্যের কথা; বোধহয়, আপনাদের অভ্যর্থনার আয়োজনটা ঠিকই করা হয়েছে—কোনও ত্রুটি হয় নাই—কী বলেন?'

ফুলসাহেব কোনও উত্তর করিল না; অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অরিন্দম বলিলেন, 'আগে আপনার বন্ধুদের মুক্তি দিই, তারপর সকলের শেষে আপনার মুক্তিলাভ হবে।' এই বলিয়া অরিন্দম রাশীকৃত হাতকড়ি লইয়া নিচে নামিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে রবারের দস্তানা ও পায়ে রবারের জুতা থাকায় ব্যাটারিতে তাঁহার কিছুই হইল না।

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে কতকগুলি হাতকড়ি দিলেন এবং দুইজনে মিলিয়া দস্যুদের হাতে হাতকড়ি লাগাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে বারোজন এইরূপে বন্দি হইল—বাকি ফুলসাহেব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ খুনির আত্মকাহিনী

ফুলসাহেবের যন্ত্রণাটা এই দীর্ঘকালে অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল; তথাপি সে নীরব, এবং তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া গিয়াছিল।

অরিন্দম বলিলেন, 'ডাক্তারসাহেব, তোমার মুক্তির বিলম্ব আছে। আমি যে কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিব, যদি তুমি সত্য কথা না বলো, তা হলে তোমাকে এইরূপ অবস্থায় সারারাত এখানে কাটাইতে হইবে। সিন্দুকের ভিতরে যে বালিকার লাশ পাঠাইয়াছিলে, সে কে?'

ফুলসাহেব হাসিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু যন্ত্রণায় তাহা একটা ক্ষণস্থায়ী বিকৃত মুখভঙ্গিতে পরিণত হইল মাত্র।

ফুলসাহেব বলিল, 'তুমি যে রেবতীকে আমার হাত থেকে বাহির করে নিয়েছ, সেই রেবতীর ছোটবোন—রোহিণী।'

'কে তাহাকে খুন করিয়াছে?'

'আমি—স্বহস্তে।'

'কেন খুন করিলে?'

'খুন করা আমার একটা নেশা।'

'নেশাটা এখন ছুটেছে কি?'

'যতক্ষণ না ফাঁসির দড়িতে আমি ঝুলছি ততক্ষণ নয়।'

'রেবতীর কাকা কেমন লোক?'

'আমার চেয়ে ভয়ানক লোক।'

'কেন?'

'যে বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে চায়, সে কি আমার চেয়ে ভয়ানক লোক নয়? আমি তো অপরলোক—আমার তাতে কষ্ট কী?'

'তুমি রেবতীর কাকার নিকটে এই কাজের জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক ঠিক করিয়াছিলে?'

'বিশ হাজার।'

'কত আদায় হইয়াছে।'

'কিছুই না।'

'কেন?'

'রেবতীকে খুন করিতে পারি নাই বলিয়া।'

'পারো নাই কেন?'

'তুমি আমার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছ।'

'এতদিন খুন করো নাই কেন?'

'রেবতীর রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম—আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; মনে করিয়াছিলাম, রেবতীকে হস্তগত ও মনের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিলে রেবতীর কাকা ফাঁকে পড়িবে—সমস্ত বিষয়টা আমারই ভোগ-দখলে আসিবে।'

'রেবতী ও তাহার কাকার কাছে তুমি কেশববাবু নামেই পরিচিত?'

'হ্যাঁ, আমি একটা লোক, কিন্তু কাজের খাতিরে আমার অনেকগুলি নাম আছে।'

'মোহিনী তোমার কে হয়?'

'তুমি এত খবর কোথায় পাইলে?'

'মোহিনী তোমার স্ত্রী?'

'মোহিনী আমার যম।'

'কেন এ-কথা বলিতেছ?'

'নতুবা আমার এ-দুর্দশা হইবে কেন?'

'মোহিনী কিসে তোমার এ-দুর্দশার কারণ হইল?'

ফুলসাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'অরিন্দম, আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিয়ো না। তোমার মুখে মোহিনীর নাম শুনিয়া এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, রাক্ষসী মোহিনীই স্বহস্তে আমার এ-মৃত্যুর আয়োজন করিয়াছে; নতুবা এখন ইহার ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত—তুমি যেমন আমাকে এই দুরবস্থায় রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে উপরে দাঁড়াইয়া কর্তৃত্ব করিতেছ; তেমনি তোমাকে ভয়ানক মৃত্যুমুখে তুলিয়া ধরিয়া এখন আমিও তোমার উপরে এমনই কর্তৃত্ব করিতে পারিতাম। সর্বনাশী মোহিনী আমার সে-সাধে বাদ সাধিয়াছে। নিশ্চয় সে এখানে আসিয়া আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণার কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছে; অরিন্দম, আর না—তুমি আমাকে আপাতত এ অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও—প্রাণ যায়—বড় কষ্ট—'

অরি। আর একটু অপেক্ষা করো। তুমি রেবতীর কাকার সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিলে, সকলই সত্য?

ফুল। একবর্ণও মিথ্যা নহে। মরিতে বসিয়া মিথ্যা বলিয়া লাভ কী?

অরি। আর একটি কথা সত্য বলিবে?

ফু। কেন বলিব না?

অ। তুমি সিন্দুকে রেবতীর ভগিনীর লাশ পাঠাইবার সময়ে একখানা পত্রে লিখিয়াছিলে যে, সর্বসুদ্ধ তুমি তখন আঠারোজনকে খুন করিয়াছ, তাহার একটা তালিকা দাও দেখি।

ফু। ইহা তো আমার গৌরবের কথা। কেন মিথ্যা বলিব? যখন দেখিতেছি, আমার মৃত্যু নিশ্চিত, তখন আর এ-গৌরবের কথাটা অপ্রকাশিত না রাখাই ভালো। আঠারোটা খুনের জন্য আমাকে তো আঠারোবার ফাঁসি যাইতে হইবে না। আমার বাড়ি এলাহাবাদ—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। নাম বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়। বোধহয়, খুনি বিনোদ চাটুয্যের কথা তুমি শুনিয়াছ। যে বিনোদ চাটুয্যেকে ধরিবার জন্য কত পুলিশ-কর্মচারী, কত সুদক্ষ গোয়েন্দা এ-পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—আমি সেই লোক! যে মোহিনীর কথা তুমি বলিতেছ, ওই মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা, ভাই একরাত্রে আমার হাতে খুন হয়। সে আজ দশ বৎসরের কথা। বিধবা মোহিনীকে অমি কুলের বাহির করিয়া আনি—অবশ্যই অর্থলোভে; কারণ আমার মনের ভিতরে প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা এ-সকল বড় একটা স্থায়ী হতে পারে না। মোহিনীদের বাড়ি আমাদের পাড়ার ভিতরেই ছিল। মোহিনীকে বাহির করিয়া আনিলে মোহিনীর বাপ রাগে আমাদের ঘর জ্বালাইয়া দেয়। আমি সেই প্রতিশোধে মোহিনীর বাপ, কাকা, মামা আর ভাইকে একরাত্রে খুন করি। সেই রাত্রেই আমি মোহিনীকে নিয়ে সেখান হতে সরে যাই। তাহার পর নয়জন পুলিশের লোককে খুন করি—অবশ্যই যাহারা আমার সন্ধানে দুঃসাহসিক হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর আর এক মুসলমানের মেয়েকে অর্থলোভে বিবাহ করিয়া তাহার বাপকে খুন করি—তাহাকে খুন করি। কুলসমের মাকে, ভাইকে খুন করি; রেবতীর ভগিনীকে খুন করি, এই তো গেল আঠারো জন; এ ছাড়া পরে তমীজউদ্দীনকে খুন করিয়াছি, জেলখানার প্রহরীকে খুন করিয়াছি, আরও যদি কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম—আরও অনেক খুন করিতে পারিতাম। বিশেষত তোমাকে আর যোগেন্দ্রনাথকে খুন করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে আমার মরণে সুখ হইবে না। উঃ! বড় যন্ত্রণা! অরিন্দম, প্রাণ যায়—আমার শরীর অবসন্ন হয়ে এসেছে—কী ভয়ানক!

অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ফুলসাহেবের হাতে ডবল হাতকড়ি ও পায়ে ডবল বেড়ি লাগাইয়া দিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ ভীষণ প্রতিহিংসা

অরিন্দম যোগেন্দ্রনাথকে এ-শুভসংবাদ দিবার জন্য দেবেন্দ্রবিজয়কে থানায় পাঠাইলেন। একঘণ্টার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিয়া-শুনিয়া তিনি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত অরিন্দমের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সকলকে থানায় লইয়া চলিলেন। অরিন্দম ও দেবেন্দ্রবিজয় সঙ্গে চলিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় ও যে পাঁচ-সাতজন পাহারাওয়ালা যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা ফুলসাহেব ছাড়া অপর দস্যুদিগকে লইয়া আগে চলিয়া গেল। তাহাদিগের পশ্চাতে ফুলসাহেবকে লইয়া অরিন্দম ও যোগেন্দ্রনাথ থানার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দূরবর্তী আমগাছের ঘন পল্লবের ভিতর হইতে দুটো-একটা কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়া শেষরাত্রির স্নিগ্ধ বাতাস সর-সর শব্দে বহিয়া যাইতেছে; এবং অন্ধকারস্তূপবৎ গাছের ভিতরে অসংখ্য খদ্যোৎ জ্বলিতেছে, পথে জনপ্রাণী নাই। এমন সময়ে কে এই পিশাচী নিকটবর্তী বৃক্ষান্তরাল হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া

চক্ষুর নিমেষে একখানা দীর্ঘ ছুরিকা ফুলসাহেবের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি যোগেন্দ্রনাথ যেমন সেই নরহন্ত্রীকে ধরিতে যাইবে, সে তেমনি ক্ষিপ্রহস্তে সেই ছুরিখানা নিজের বুকে বসাইয়া দিল। এবং একটা খিল-খিল-খিল্ কলহাস্যে সুপ্ত নিশীথিনী অন্ধকার-নিস্তব্ধ-বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করিয়া যেন তেমনি একখানা শাণিত ক্ষিপ্র ছুরির ন্যায় তীব্রবেগে খেলিয়া গেল। আমগাছে কোকিল থামিয়া গেল; এবং বাতাস যেন রুদ্ধ হইয়া গেল, এবং আকাশের সমস্ত নক্ষত্র নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে রাক্ষসী নিশার এই একটা ক্ষুদ্র অভিনয়ের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। প্রলয়ঙ্করী নিশার শোণিতাক্ত মূর্তির সমক্ষে, এবং তাহার শব্দহীন গাম্ভীর্যের মধ্যে পড়িয়া এবং তাহার এই দুর্নিরীক্ষ্য বিভীষিকার মধ্যে পড়িয়া শাসনভীত অপরাধী ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সমগ্র প্রকৃতি থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং চারিদিক ছমছম করিতে লাগিল।

ফুলসাহেবের সর্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া রক্তস্রোত ছুটিতে লাগিল—তখনই সেখানে সে লুটাইয়া পড়িল। যাহার ছুরির আঘাতে জীবনের সহিত ফুলসাহেবের বন্দিত্ব মোচন করিয়া দিতেছে, অরিন্দম তাহার ভাবভঙ্গিতে চিনিতে পারিলেন—সে সেই মোহিনী।

মোহিনী নিজের বুকে যে আঘাত করিয়াছিল, বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও তাহা সাংঘাতিক হইয়াছিল। যোগেন্দ্রনাথ ও অরিন্দম তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার হাত হইতে সেই রক্তাক্ত ছুরিখানা কাড়িয়া লইলেন। ফুলসাহেবের রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না। সে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আবদ্ধ হস্তে তালি দিতে-দিতে, হাসিতে-হাসিতে মোহিনী ফুলসাহেবকে বলিল, 'কেমন, বিনোদ! আমি কি মিথ্যা কথা বলি? দেখো দেখি, কেমন সুখ! এই না হলে মজা!''

মোহিনী খুব হাসিতে লাগিল।

ফুলসাহেব বলিল, 'মোহিনী, তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করিলে, অরিন্দমের ফাঁসিকাঠের অপেক্ষা তোমার ছুরি অনেক ভালো।' তাহার পর অরিন্দমকে ডাকিয়া বলিল, 'অরিন্দম, আমি তো এখনই মরিব—তা বলিয়া মনে করিয়ো না, তুমি নিরাপদ হইতে পারিলে। জুমেলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে, সুবিধা পাইলে সে একদিন তোমাকে হত্যা করিবে। সে কোথায় লুকাইয়া আছে, আমি জানি না। জুমেলিয়াকে সাবধান—এখন হইতে তাহার সন্ধান করো—বিশেষত তোমাদের উপরে তার বড় রাগ আছে—সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তোমাদের রক্তদর্শন করিয়া ছাড়িবে। আমি তো মরিতে বসিয়াছি—এখন বুঝিতে পারিয়াছি—এত চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি—অধর্মের জয় কিছুতেই হইবার নয়।'

অজস্র রক্তস্রাবে ফুলসাহেবের সর্বাঙ্গ শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া আসিল। চক্ষুর দীপ্তি ম্লান হইয়া গেল এবং গলায় ঘড়ঘড়ি উঠিল। ফুলসাহেব মৃত্যুর পূর্বে অনেকক্ষণ অরিন্দমের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সে-দৃষ্টিতে এরূপ বুঝাইল, যেন অরিন্দমকে তাহার আরও কী বলিবার ছিল; বলা হইল না—ফুলসাহেব তখন বাক-শক্তি রহিত এবং কণ্ঠাগত প্রাণ। দুই-একবার কথা কহিবার জন্য মুখ খুলিল—কোনও কথা বাহির হইল না; একটি অব্যক্ত শব্দ হইল মাত্র; তাহার অনতিবিলম্বে দুর্দান্ত ফুলসাহেব এ-সংসার হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল; কিন্তু তাহার সেই সকল ভীষণ কীর্তি-কাহিনী অনেকেরই মনে চিরজাগরূক থাকিবে।

যথেষ্ট রক্তপাতে মোহিনীর মৃত্যুকালও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতে লাগিল। রক্ত কিছুতেই বন্ধ হইল না। ফুলসাহেবের মৃত্যুর অনতিবিলম্বে মোহিনীরও মৃত্যু হইল।

* * * * * * *

তাহার পর অরিন্দম ফুলসাহেবের জামার পকেট হইতে দুইটি বিষ-কাঁটা ও কয়েকখানি পত্র বাহির করিলেন। পত্রগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। অরিন্দম পত্রগুলি পড়িয়া যোগেন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। যোগেন্দ্রনাথও পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন, 'পত্রগুলি প্রয়োজনীয় বটে। এতদিনের পর এ গভীর রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইল।'

ফুলসাহেব ও মোহিনীর মৃতদেহ থানায় চালান দেওয়া হইল।

দশম পরিচ্ছেদ : ******

ফুলসাহেব ধরা পড়িল—মরিল। দস্যুরা ধরা পড়িল এবং তাহাদের সকলেই যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল। যখন সকলই হইল, অথচ রেবতীর সন্ধানের কোনও বন্দোবস্ত হইল না, তখন অরিন্দমের আশ্বাস-বাক্যগুলিকে দেবেন্দ্রবিজয়ের একান্ত নিরর্থক বোধ হইতে লাগিল। দেবেন্দ্রবিজয় একদিন স্পষ্টই অরিন্দমকে বলিলেন, 'সকলই তো হইল, তবে এখন আমি বাড়িতে ফিরিয়া যাই। আর আমাকে আবশ্যক কী?'

রাগের ভাবটা মুখে-চোখে খুব শীঘ্রই ফুটিয়া উঠে। অরিন্দম মুখ দেখিয়া দেবেন্দ্রবিজয়ের মনের কথা বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন, 'সে কী! আর দিনকতক তোমাকে থাকিতে হইবে—রেবতীর উদ্ধার এখনও হয় নাই।'

দে। সেজন্য কষ্টস্বীকার করা আপনার অনাবশ্যক।

অ। তুমি রাগ করিয়াছ, দেখিতেছি। রাগের কথা নয়, দেবেনবাবু! কেবল রেবতীর উদ্ধার করিলে হইবে না—যাহাতে তাহাকে তাহার বিষয়ৈশ্বর্যের সহিত উদ্ধার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিতে হইবে। রেবতীর কাকা কীরকম প্রকৃতির লোক, ফুলসাহেবের মুখে শুনিলে তো? তিনিও বড় সহজ নহেন—তিনিও একটি ডিক্সএডিসনের ছোটখাটো ফুলসাহেব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'এখন কী করিবেন, স্থির করিয়াছেন?'

অরি। একবার রেবতীর কাকার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। তুমিও আমার সঙ্গে যাইবে। রেবতীর সন্ধান করিতে তিনি তোমাকে ডিটেকটিভের জন্য বলিয়াছিলেন; তুমি আমাকেই সেই ভালো ডিটেকটিভ বলিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবে, তাহা হইলে যথেষ্ট। তাহার পর অগৌণে আমি নিজের পরিচয় তাঁহাকে ভালো করিয়াই দিব।

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'ওঃ! রেবতীর কাকা কী ভয়ানক লোক! বিষয়ের লোভে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অনায়াসে খুনিদের হাতে তুলে দিলেন! পাছে তাঁর উপরে লোকের সন্দেহ হয়, এজন্য আবার ডিটেকটিভ নিযুক্ত করছেন!'

অ। এ-সংসারে কত রকম লোক আছে, দেবেন্দ্রবিজয়! মানুষ চেনা বড় শক্ত কাজ। যে যতটা পরিমাণে মানুষ চিনিতে পারে, সে ঠিক ততটা পরিমাণে নিরাপদ। তোমার বয়স অল্প, এখনও এ-পৃথিবীর সকল সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছায় নাই।

দে। রেবতীর কাকার কথায়-বার্তায়, ভাবভঙ্গিতে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটা আসে, বুঝিতে পারি, ফুলসাহেবের মুখে যেমন শুনিলাম, তিনি তেমন ভয়ানক লোক নহেন। তিনি লোকের সহিত যেরূপভাবে কথা কন, যেরূপ ব্যবহার করেন, তাতে পরম শত্রু যে, সে-ও তাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারে না।

অ। তাই তো বলছি, তোমার বয়স এখন অনেক কম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে একবার তার কাছে চলো, লোকটাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, খাদ বাদ দিয়ে তোমার চোখের সামনে যখন ধরব, তখন তুমিও জানতে পারবে, লোকটি কী দরের লোক! তখন আমাকে বেশি বাক্যব্যয় করতে হবে না।

একাদশ পরিচ্ছেদ : সাধুতার ভান

সেইদিনেই দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম রেবতীর কাকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বেণীমাধবপুর যাত্রা করিলেন। দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের বাড়ি চিনিতেন। উভয়ে তাঁহার বহির্বাটিতে গিয়া বসিলেন

এবং একজন ভৃত্যকে দিয়া গোপালচন্দ্রের নিকটে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। গোপালচন্দ্র অন্তঃপুরে ছিলেন; সংবাদ পাইয়া বাহিরে আসিলেন। এবং উভয়কেই মিষ্ট-সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া দেবেন্দ্রবিজয়কে তাঁহার কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

গোপালচন্দ্রের বয়স হইয়াছে—বয়স আটচল্লিশের কম নহে—বর্ণ গৌর—দেহ স্থূল। উদরটি অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপেক্ষা দশগুণ স্থূল; যেন সে-সকলের সহিত সেটি ঠিক খাপ খায় না। মাথার চুল খুব ছোট করিয়া ছাঁটা, শ্মশ্রুগুম্ফ একেবারে নাই। নাই থাকুক, মাথায় টাক আছে, তাহার পাশেই দীর্ঘ অর্কফলা আছে, গলায় হরিনামের মালা আছে, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি আছে এবং তাহার সেই বিপুল দেহের চারিভিতে ছোটবড় অনেকরকমের হরিনামের ছাপ আছে।

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিলেন, 'মহাশয়, আপনি দেবেন্দ্রবাবুর মুখে আমার দুরদৃষ্টের সকল কথা বোধহয়, শুনিয়াছেন। আহা! রেবতী মা আমার—কাকা বলতে অজ্ঞান হত! আর রোহিণী—সে তো আমার ঘাড়ে-পিঠে মানুষ হয়েছে—একদণ্ড আমার কাছছাড়া হত না। হায়-হায়, মানুষের এমন সর্বনাশ হয়! না জানি, পূর্বজন্মে কী মহাপাতকই করেছিলেম, হরি হে—রাধাগোবিন্দ! রাধাগোবিন্দ!'

অরিন্দম বলিলেন, 'বড়ই দুঃখের বিষয়, আপনার ন্যায় মহাত্মা লোকের এমন বিপদ হয়! দেখি, মহাশয়ের আশীর্বাদে যদি আমি মহাশয়ের কোনও উপকারে আসিতে পারি। এখন মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ-কাজে নিযুক্ত করেন।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'এ আবার নিযুক্ত কী? আপনাকে সেইজন্য তো আহ্বান করা হয়েছে।'

অরিন্দম বলিলেন 'তাহা হইলে আমি আপনার কার্যোদ্ধার করিলে কিরূপ পারিশ্রমিক পাইব, তাহার একটা বন্দোবস্ত করিয়া একখানি স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিন।'

গো। ইহার জন্য আবার স্বীকার-পত্র কী; আপনি যাহা চাহিবেন, আমি আনন্দের সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা দিব। যাতে আপনি সুখী হন, তা আমি করিব, সে আমার কর্তব্য। যদি সর্বস্ব খোয়াইয়া তাদের দুটিকে পাই, তাতেও আমার বুক দশহাত হইবে।'

অরিন্দম বলিলেন, অবশ্যই মনে-মনে, 'আর তাদের দুটিকে না পেলে উদরটি যে আরও স্ফীত হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।' প্রকাশ্যে বলিলেন, 'একটা লেখাপড়া না থাকিলে কী করিয়া চলিবে? সেজন্য আপনি এত 'কিন্তু' হইতেছেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না।'

গো। না—না, 'কিন্তু' হইব কেন, আমি এখনই লিখিয়া দিতেছি। কী লিখিতে হইবে, আর কত টাকা হইলে আপনি সন্তুষ্ট হইবেন, বলুন?

অরি। একশত হইলে ঠিক হয় না?

গো। একশত! আমি আপনাকে পাঁচশত টাকা দিব।

অরিন্দম মনে-মনে হাসিলেন। বলিলেন, 'মহাশয়ের হৃদয় যথেষ্ট উদার। যাই হোক, আমি আপনার জন্য আরও উৎসাহের সহিত কাজ করিব।'

গো। কী লিখিতে হইবে?

অরি। বেশি কিছু লিখিতে হইবে না; লিখিয়া দিন, আপনার কার্যোদ্ধার হইলে আমাকে পাঁচশত টাকা দিবেন। আর আপনার নামটি সহি করিয়া দিন।

গোপালচন্দ্র সেই মর্মে একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং সেখানি অরিন্দমের হাতে দিলেন।

অরিন্দম 'ইহাই যথেষ্ট', বলিয়া সেখানি অবিলম্বে পকেটস্থ করিলেন। বলিলেন, 'তবে এখন হইতেই কাজ আরম্ভ করা যাক। মহাশয়, প্রথমে আপনার বাড়িখানা আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই।'

গোপালচন্দ্র হো-হো-হো করিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে বলিলেন, 'তবেই হয়েছে, আপনার মতো বুদ্ধিমান লোকের দ্বারা আমার যে-উপকার হবে, তা আমি

দিব্যচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি! এ-বাড়িতে অনুসন্ধান করে কী হবে? এখানে অনুসন্ধান করে তাদের কোনও সন্ধানই পাবেন না। তারা কি এতদিন বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে বসে আছে?'

অরিন্দম বলিলেন, 'তাদের সন্ধান না পাই, তাদের যাতে সন্ধান করতে পারি, এমন কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে; সেইজন্য বলিতেছি, তাহাতে আপনার আপত্তি কী?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'আপত্তি কী—আর কিছুই না, তবে বাজে কাজে অনর্থক একটা হাঙ্গাম করা।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হাঙ্গাম কিছুই নয়। আমি আপনার বাড়ির সকল ঘর অনুসন্ধান করিতে চাই না, বাড়ির মেয়েদের না সরালেও চলে। আমি একবার কেবল বাড়ির চারিদিকটা দেখতে চাই। এতে আর হাঙ্গাম কী?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, এতে আর হাঙ্গাম কী, তবে এ দেখায় যে কী ফল হবে, বুঝলেম না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, সেটা এখন আপনার বোঝবার কোনও দরকার নাই।'

'তবে আমি একবার বাড়ির ভিতর হয়ে আসি,' বলিয়া গোপালচন্দ্র নিজ স্থূল দেহভার বহন করিয়া মন্থরগতিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং অনতিবিলম্বে ফিরিয়া আসিয়া অরিন্দমকে বলিলেন, 'আসুন, মহাশয়।'

সকলে উঠিয়া ভিতর-বাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সাধুতার ভান

অন্তঃপুরের পশ্চাদ্ভাগে একটি অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তাহার চারিদিকে নানাবিধ ফলের গাছ। বাহিরের লোকের দৃষ্টি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারে, এমনভাবে সেই স্থানটা চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই পুষ্করিণীটি অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের জন্যই ব্যবহৃত হইত।

গোপালচন্দ্র ও দেবেন্দ্রবিজয়কে সঙ্গে লইয়া অরিন্দম এই ছোট বাগানটি বেশ করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া অরিন্দম স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সেখানে অনেকগুলি মানকচু গাছ সুপ্রশস্ত পত্রে অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্মধ্যে দুই-তিনটি গাছ অন্যান্য গাছগুলিকে ছাড়াইয়া অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বলিলেন, 'অন্যান্য গাছগুলির অপেক্ষা এই দুই-তিনটি গাছ অধিক তেজালো দেখিতেছি।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, হ্যাঁ, ওই গাছগুলি আলাদা জাতের। রামসনাতন নামে আমারই একজন প্রজা তার মামারবাড়ি থেকে আমাকে এনে দিয়েছে। চলুন, ওই দিকটা আপনাকে দেখাইয়া আনি।'

অরিন্দম বলিলেন, 'না, আমাকে আর কোথায় যাইতে হইবে না। এইখানে আমার কাজ মিটিবে। একটা কথা হইতেছে, মহাশয়, আপনার এই মানকচু গাছগুলি আমাকে বাধ্য হইয়া নষ্ট করিতে হইতেছে; আপনার কোনও আপত্তি আছে কি?'

গোপালচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, 'বিলক্ষণ, আপনি তো বড় মজার লোক!'

বলিতে-না-বলিতে অরিন্দম দুই-তিনটি গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন। তেমন বেশি বলপ্রয়োগও করিতে হইল না। গোপালচন্দ্র 'করেন কী' 'করেন কী' বলিয়া সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন।

অরিন্দম গোপালচন্দ্রের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ এবং একবার 'চুপ করুন' বলিয়া তাঁহার ধৈর্যবিধান করিলেন। তাহার পর কটিদেশ হইতে একখানি দীর্ঘফলক ছুরিকা বাহির করিয়া সেইখানটি খনন করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া শুনিয়া গোপালচন্দ্রের মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল এবং তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। এক পা-এক পা করিয়া—তিনি পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। সেদিকে অরিন্দমের দৃষ্টি ছিল, তিনি বলিলেন, 'মহাশয়, পলাইবেন না—স্থির হয়ে দাঁড়ান; নতুবা এই দেখিতেছেন? (পিস্তল প্রদর্শন) এক পা সরিলে, গুলি করিয়া পা ভাঙিয়া দিব।'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, পালাব কেন, ভয় এত কিসের? পুলিশের লোক হলেও আপনি আমাদেরই উপকারী বন্ধু।'

অরিন্দম হাসিয়া বলিলেন, 'তা তো বটেই! (দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রতি) এই পিস্তলটা তুমি ঠিক করিয়া ধরিয়া থাক, সাবধান, উনি এক পা সরিলে তৎক্ষণাৎ গুলি করিবে।'

দেবেন্দ্রবিজয় এ-অদ্ভুত রহস্যের মর্মোদঘাটন করিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া অরিন্দমের নিকট হইতে পিস্তল গ্রহণ করিলেন।

অরিন্দম দ্রুতহস্তে ছুরিকার দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দুই-তিনটি মানকচুর গাছ টানিয়া তুলিয়া ফেলিতে সেই স্থানটা পূর্বেই অনেকটা গভীর হইয়াছিল; এক্ষণে অল্প পরিশ্রমে অরিন্দম স্বকার্য উদ্ধার করিলেন। অনতিবিলম্বে সেখান হইতে তিনি একটি মনুষ্যের বাহুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল বাহির করিলেন। অঙ্গুলি অবধি স্কন্ধদেশের সন্ধিস্থল পর্যন্ত লইয়া সেই কঙ্কাল।

সেই কঙ্কাল দেখিয়া অরিন্দম আনন্দিত হইলেন; দেবেন্দ্রবিজয় শিহরিয়া উঠিলেন এবং গোপালচন্দ্র—তাঁহার চোখে সমুদয় পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র সহসা প্রকৃতিস্থ হইয়া, কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 'এ কী ব্যাপার! এ-হাড় এখানে কে আনিল? রাধামাধব!'

অরিন্দম বলিলেন, 'আর কে আনিবে? আপনি আনিয়াছেন—এ-কাজ আপনারই। মনে পড়ে না, ফুলসাহেব প্রদত্ত রোহিণীর মৃত্যুর প্রমাণ?'

গোপালন্দ্র আকাশ-বিচ্যুতের ন্যায় বলিলেন, 'সে কী কথা! আপনি মিথ্যা কথা বলিতেছেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমাদের দুজনের মধ্যে একজন যে খুব মিথ্যাবাদী, তা আপনি যেমন বুঝিতে পারিতেছেন, আমিও তেমনি বুঝিতে পারিতেছি। এখন বাধ্য হইয়া আপনার হাতে আমাকে হাতকড়ি লাগাইতে হইল।'

হাতকড়ির নাম শুনিয়া, গোপালচন্দ্র তাঁহার সুবৃহৎ ভুঁড়ি নাচাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে ইঙ্গিত করিলেন, দেবেন্দ্রবিজয় গোপালচন্দ্রের হস্তদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরিয়া ফেলিলেন এবং অরিন্দম হাতকড়ি লাগাইয়া দিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রমাণপত্র

গোপালচন্দ্র অরিন্দমকে বলিলেন, 'আপনি আমারই লোক হইয়া আমারই হাতে হাতকড়ি দিলেন!'

অরিন্দম বলিলেন, 'আমি আপনার নই—তাহার নই—আমি পুলিশ-কর্মচারী। যিনি দোষী, তাঁহার সহিত বাধ্য হইয়া আমাকে এইরূপ অভদ্র ব্যবহার করিতে হয়।'

গোপালচন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, 'কী প্রমাণে আপনি আমাকে দোষী স্থির করিলেন?'

অরিন্দম 'প্রমাণ আমার নিকটেই আছে' বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিলেন। সেই পত্রখানি গোপালচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, 'মহাশয়, এ-পত্রখানি কার—চিনিতে পারেন কি?'

এই পত্রখানি অরিন্দম ফুলসাহেবের নিকটে পাইয়াছিলেন। সহসা সম্মুখে সর্প দেখিলে পথিক যেরূপ ভীতিব্যঞ্জক ভঙ্গি করিয়া পশ্চাতে হটিয়া যায়, পত্রখানি দেখিয়া গোপালচন্দ্রের অবস্থা অনেকটা সেই রকমেরই হইল। গোপালচন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিলেন; এবং দৃঢ়স্বরে বলিলেন, 'কখনওই না—

এ-পত্র আমার নয়।'

অরিন্দম বলিলেন, 'চুপ করুন, বেশি গোলমাল করিবেন না। এ-পত্রখানি কি আপনার হাতের লেখা নয়? আর নিচে যে সহিটি রহিয়াছে দেখুন দেখি, এই সহিটি ঠিক আপনার কি না?'

গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'না, এ-লেখা আমার হাতের নয়—এ-সহিও আমার নয়।'

গোপালচন্দ্র ইতিপূর্বে অরিন্দমকে যে চুক্তিনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তিনি তখন সেই চুক্তিনামাখানি বাহির করিয়া বলিলেন, 'এ-লেখা তো আপনার? না, ইহাও আপনার লেখা নয়? দেখুন দেখি, আপনার হাতের লেখার সঙ্গে সহির সঙ্গে বেশ করে সব মিলাইয়া দেখুন দেখি?'

তথাপি গোপালচন্দ্র সেইরূপভাবে বলিলেন, 'জাল—জাল—এ-পত্র জাল—আপনারা বড় ভয়ানক লোক!'

অরিন্দম মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনার অপেক্ষা নয়।' তাহার পর গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'বিষয়ের লোভে পড়িয়া যে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিতে পারে, সে মনুষ্য-মূর্তিতে দানব।'

* * * * * * *

যে পত্র অবলম্বন করিয়া অরিন্দম গোপালচন্দ্রকে বন্দি করিলেন, সেই পত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। পত্রখানি এইরূপ—

'কেশববাবু,

আজ দুইদিন গত হইল, তোমার কোনও সংবাদ পাই নাই। সেজন্য অতিশয় উদ্বিগ্ন আছি, খুব সাবধান! যত শীঘ্র পারো, রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিবে। আমাকে খুনের কোনও নিদর্শন পাঠাইলেই, আমি তখনই তোমার প্রাপ্য মিটাইয়া দিব। ইতি

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

আর দুইখানি—

'কেশববাবু,

গোরাচাঁদের মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বেশ বুঝা যায় তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিতেছ। এখন আমি তোমাকে একটি পয়সা দিতে পারিব না—দিতে পারিব না কেন—দিব না—আগে কাজ শেষ হওয়া চাই। আমাকে তুমি সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তোমাকে যে-টাকা পারিশ্রমিক স্বরূপ দিতে স্বীকৃত আছি, তাহা তৎক্ষণাৎ দিব; তাছাড়া তোমাকে আরও কিছু পুরস্কার দিব। তুমি শীঘ্রই রেবতী ও রোহিণীকে খুন করিয়া যত শীঘ্র পার, গোরাচাঁদ মারফৎ প্রমাণ পাঠাইবে। তোমার এই অযথাবিলম্বে আমাকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতে হইয়াছে। তুমি একজন পাকা কাজের লোক হয়ে কাজের কিছুই করিতে পারিতেছ না—বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, তুমি আগামী সপ্তাহের মধ্যে তোমার প্রাপ্য আমার নিকট হইতে আদায় লইবে। ইতি—

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

'কেশববাবু,

তুমি অদ্যাবধি রেবতীর কিছুই করিলে না। পত্রপাঠ মাত্র রেবতীকে খুন করিবে এবং তাহার একটা প্রমাণ শীঘ্র পাঠাইবে। রোহিণীর লাশ থানায় পাঠাইয়া যেমন বাহাদুরি দেখাইতে গিয়াছিলে, রেবতীর লাশ লইয়া যেন সে-রকমের কোনও

একটা বাহাদুরি দেখাইতে যাইয়ো না। তাহাতে কোনও প্রয়োজন নাই, বরং বিপদের সম্ভাবনা। রেবতীর লাশ একেবারে গোপন করিয়া ফেলিবে। তুমি রোহিণীকে খুন করিয়া চুক্তির অর্ধেক টাকা পাঠাইতে বলিয়াছ। রোহিণীকে খুন করায় আমার যদি কাজের অর্ধেক সুবিধা হইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার অর্ধেক টাকা পাঠাইতে পারিতাম। রোহিণীকে খুন করিয়া তুমি আমার কিছু সুবিধা করিতে পারো নাই; সুতরাং আমি তোমাকে এখন কিছুই দিব না। রোহিণীর অবর্তমানে রেবতীই সমস্ত বিষয়ের মালিক হইবে, ইহাতে রেবতীরই বরং সুবিধা হইয়াছে। আমার তাহাতে লাভ কী? রোহিণীর মৃত্যু সপ্রমাণ করিতে তুমি যে তাহার একখানা হাত পাঠাইয়াছিলে সেটা আমি আমাদের ভিতর-বাটির বাগানে পুঁতিয়া ফেলিয়াছি। রোহিণীর ন্যায় রেবতীর একখানা হাত পাঠাইলে চলিবে না। রোহিণীর হাতে এক স্থানে একটা দগ্ধচিহ্ন ছিল বলিয়া সহজে চিনিতে পারিয়াছিলাম, রেবতীর ছিন্ন মস্তক পাঠাইবে। ইতি—

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু।'

একান্ত যত্ন, আদর ও আগ্রহের সহিত শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্রকে আপাতত স্থানীয় থানায় চালান দেওয়া হইল।

অধর্মের পরিণাম এইরূপই শোচনীয় হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ তুমি কি সেই?

বেণীমাধবপুরের গোলযোগ মিটাইয়া অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে লইয়া রঘুনাথপুরে আসিলেন। রঘুনাথপুর অরিন্দমের স্বদেশ। বেণীমাধবপুর হইতে হুগলি জেলায় ফিরিতে হইলে রঘুনাথপুরের নিকট দিয়াই আসিতে হয়। রঘুনাথপুরের মধ্যে অরিন্দম সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিসম্পন্ন। সেখানে তাঁহার যথেষ্ট ভূসম্পত্তিও আছে। তাছাড়া তাঁহার বসত-বাড়িখানিও প্রকাণ্ড। তেমন প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা সে-গ্রামের মধ্যে আর একখানিও নাই। বাটির পশ্চাদ্ভাগে লতাকুঞ্জবিশোভিত সুরম্য উদ্যান। উদ্যানে মৎস্যসঙ্কুল, স্বচ্ছবারিপূর্ণ সুবৃহৎ সরোবর। মোট কথা, এক সমৃদ্ধিসম্পন্নের যাহা কিছু আবশ্যক, অরিন্দমের তাহা সকলই ছিল।

দেবেন্দ্রবিজয় সেইখানে দুইদিন কাটাইলেন। খাওয়া-দাওয়ার ধূমটা রীতিমতোই চলিল। চোর-ডাকাত ধরার ন্যায় অরিন্দমের মাছ-ধরার শখ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ছিপ লইয়া বসিয়া মৎস্যকুল ধ্বংস করিতেন।

একদিন পূর্বাহ্নে নয়—অপরাহ্নে অরিন্দম দেবেন্দ্রবিজয়কে বলিলেন, 'তুমি যে-কালে দুইদিনেই বাড়ি যাইবার জন্য এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছ, তখন কাল প্রত্যুষেই রওনা করা যাইবে। তাহা হইলে আজ রাত্রের ভোজনের বন্দোবস্তটা পরিপাটি রকমের হওয়াই আবশ্যক। যেমন করিয়া হোক, আজ খুব কম করিয়া চার-পাঁচটি বড় মাছ ধরা চাই। ছিপ লইয়া তুমি বাগানে যাও, চার ফেলিয়া ঠিকঠাক হইয়া বসো—আমি এখনই যাইতেছি।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আজ আর থাক না।'

অরিন্দম বলিলেন, 'সে কি হয়, কাল যখন প্রাতে একান্তই রওনা হইতে হইবে, তখন আর না ধরিলে চলিবে কেন? তুমি যাও, আমি এখনই যাইতেছি।'

দেবেন্দ্রবিজয় মৎস্য ধরিবার উপকরণাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতে অরিন্দমের একটা উদ্দেশ্য আছে।

উদ্যানের ছায়াস্নিগ্ধ স্বচ্ছ সরোবর পত্রান্তরালচ্যুত সূর্যরশ্মিপাতে তকতক করিতেছে। বায়ুহিল্লোল-বিচলিত বীচিমালা হইতে অনুক্ষণ রবিকিরণ সহস্র-খণ্ডে প্রতিফলিত হইতেছে এবং সদ্যপ্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে সমুদয় উদ্যান ভরিয়া গিয়াছে।

দেবেন্দ্রবিজয় ধীরপাদবিক্ষেপে ঘাটের নিকটে গিয়া দেখিলেন, স্বচ্ছ কম্পিত জলে পা দুইখানি ডুবাইয়া নিম্নের মগ্নপ্রায় সোপানের উপরে বসিয়া এক অনিন্দ্যসুন্দরী নবীনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল, অদূরস্থিত এক আমগাছের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত শাখায় বসিয়া যে একটা সুকণ্ঠ পাপিয়া তাহার বিরহাকুল অশ্রান্ত বেদনা-গীতিতে উদ্যান প্লাবিত করিতেছিল, তাহার নিরলস দৃষ্টি, সেই ঝঙ্কৃত পাপিয়ার প্রতি সংস্থাপিত ছিল, সুতরাং সে দেবেন্দ্রবিজয়কে দেখিতে পায় নাই।

দেবেন্দ্রবিজয় দেখিলেন, সেই মূর্তিমতী সৌন্দর্যরানীর মেঘের মতো নিবিড়, শৈবালের ন্যায় তরঙ্গায়িত এবং ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ, বিমুক্ত কেশদাম গুচ্ছে-গুচ্ছে পৃষ্ঠদেশ ব্যাপিয়া লুণ্ঠিত এবং জলসিক্ত হইতেছে। সেইরূপভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা একান্ত গর্হিত মনে করিয়া দেবেন্দ্রবিজয় যেমন পশ্চাতে ফিরিবেন, একখণ্ড শুষ্ক পত্রের উপরে তাঁহার পাদক্ষেপ হওয়ায় একটা শব্দ হইল। নবীনা তাড়াতাড়ি সেইদিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল—দেখিয়া মুখ দিয়া তাহার কথা সরিল না। তাহার ভাব দেখিয়া এমন বোধ হইল, সে উঠিবে—ডুবিবে—কি পলাইবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না।

দেবেন্দ্রবিজয়ও সেই নিরুপমার মুখের দিকে চাহিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল এবং স্তম্ভিত। বিস্ময়াকুল দেবেন্দ্রবিজয় ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে বলিলেন, 'তুমি—তুমি এখানে!'

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ পরিশিষ্ট

ঠিক সেই সময়ে সেখানে অরিন্দম আসিয়া উপস্থিত। বোধহয়, তিনি এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নবীনা দ্রুতপদে সোপানারোহণ করিয়া সলজ্জভাবে চলিয়া গেল এবং দেবেন্দ্রবিজয় একান্ত অপ্রতিভের ন্যায় এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। অরিন্দমের মুখের দিকে চাহিতে আর তাঁহার সাহস হয় না।

অরিন্দম তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'চলো, এখন আর মাছ ধরা হইবে না—এখনই পাড়ার মেয়েরা এ-ঘাটে আসিবে—সন্ধ্যার পর যাহা হয় হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের মনে দারুণ উৎকণ্ঠা। তিনি অরিন্দমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে এখন চলিয়া গেল, উহাকে আপনি জানেন কি?'

অরিন্দম বলিলেন, 'কেন বলো দেখি?'

দেবেন্দ্রবিজয় চুপ করিয়া রহিলেন।

অরিন্দম বলিলেন, 'ঘাটে পাড়ার কত মেয়ে আসে, আমি তাহাদের কেমন করিয়া চিনিব? তবে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা কাহাকে-কাহাকেও চিনিতে পারে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আমি যাহাকে এখানে দেখিলাম, সে ঠিক রেবতীর মতো দেখিতে—সে রেবতী।'

অরিন্দম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 'বটে! তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'নাম জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি ঠিক চিনিয়াছি—সে রেবতী। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ভাব, সেই সব—আমার কখনও ভুল হয় নাই।'

অরিন্দম সহাস্যে বলিলেন, 'নিজের ভুল নিজে কেহই দেখিতে পায় না। বিশেষত এ-সব বিষয়ে ভুল হওয়া বড়ই দোষের কথা। যাই হোক, তোমাকে কোথায় মাছ ধরিতে এখানে পাঠাইলাম, আর তুমি কিনা একেবারে একটা আস্ত মেয়েমানুষ গাঁথিয়া ফেলিয়াছ—বাহাদুরি আছে বটে।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'আপনি সকলই জানেন—আপনি আমার নিকটে গোপন করিতেছেন। আমি এখন যাহাকে দেখিলাম, বলুন, সে রেবতী কি না?'

অরিন্দম বলিলেন, 'রেবতী! আমি তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম, যেমন করিয়া পারি, রেবতীর সন্ধান করিয়া দিব; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞার পূর্বেই আমি রেবতীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, একজন পুলিশের লোককে রেবতীর মাতামহ সাজাইয়া রেবতীকে অর্থপিশাচ যদুনাথের হাত হইতে বাহির করিয়া আনি। তাহার পর রেবতীকে আমি এখানে পাঠাইয়া দিই। সেই অবধি রেবতী এখানে আমাদের বাড়িতেই আছে। প্রত্যহ রেবতী এইসময়ে বাগানে একা আসিয়া থাকে। তাহার সহিত দেখা হইবে বলিয়াই আমি তোমাকে মাছ ধরিবার ছলে বাগানে পাঠাইয়া দিই। তুমি এখন রেবতীকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ—আর তো সন্দেহের কোনও কারণ নাই?'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'যেদিন ফুলসাহেব ধরা পড়ে, সেইদিন আপনি রেবতীকে খুন না করিবার কারণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় ফুলসাহেব আপনাকে বলিয়াছিল, "আপনি তাহার মুখের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন।" তখনই একবার আমার মনে খুব সন্দেহ হইয়াছিল যে, রেবতীকে আপনি কোনও নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছেন।'

অরিন্দম বলিলেন, 'যাই হোক, রেবতীর নিকটে এখন তাহার ভগিনীর খুনের কথা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা নাই। যতদিন গোপন থাকে, ভালো। রেবতীর মনের অবস্থা এখন ভালো নহে, বড় ভয়ানক এবং দুশ্চিন্তায় শরীরও একান্ত দুর্বল; এ-সময়ে কোনও একটা শোকের আঘাত লাগিলে হয়তো তাহার ফল পরে শোচনীয় হইতে পারে। বিশেষত রেবতী—রোহিণী-অন্ত-প্রাণ। তাহার কাকার সম্বন্ধেও এখন তাহাকে কোনও কথা না বলাই ভালো। আরও একটা কথা হইতেছে, দেবেন্দ্রবাবু! রেবতীর বিবাহে আমিই কন্যাকর্তা হইবার আশা রাখি।'

দেবেন্দ্রবিজয় বলিলেন, 'সেটা আপনার অনুগ্রহ।'

উপসংহার

একটা শুভদিন স্থির করিয়া অরিন্দম কোমর বাঁধিয়া রেবতীর বিবাহে উদ্যোগী হইলেন। তিনি ভবানীপুর হইতে দেবেন্দ্রবিজয়ের পিতাকে আনাইলেন।

দেবেন্দ্রবিজয়ের মাতুল মহাশয় বেণীমাধবপুরেই ছিলেন। বেণীমাধবপুরেই দেবেন্দ্রবিজয়ের সহিত রেবতীর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল।

দেবেন্দ্রবিজয়ের বিবাহ এবং নিজে অরিন্দম সে বিবাহে উদ্যোগী। নিমন্ত্রিত সিরাজউদ্দীন দেবেন্দ্রবিজয়কে, কুলসম রেবতীকে এক-একটি মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী যৌতুক দিয়াছিলেন।

গোপালচন্দ্র এবং ধৃত গোরাচাঁদ ও দস্যুরা আইনানুসারে যথোপযুক্ত দণ্ড পাইল।

আপাতত জুমেলিয়ার কোনও সন্ধান হইল না।

হত্যা-বিভীষিকা

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

এক

বৈশাখ মাস, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতি ভাব। আজ দশদিন ধরিয়া প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে। কদাচিৎ কোনও সময় একটু-আধটু রৌদ্র ফুটিতেছে—আর জল-বাতাসে একেবারে প্রকৃতিকে অতি শীতল করিয়া তুলিতেছে।

বেলা প্রায় দশটা বাজিয়াছে, এই সময় সুন্দরনগরের এক বিস্তৃত প্রাসাদের একটি প্রকোষ্ঠে বসিয়া গোবিন্দলাল একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন। পত্র পাঠ করিতে-করিতে তিনি তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন।

নামে সুন্দরনগর—কিন্তু কাজে সে নগর নহে, সামান্য ক্ষুদ্র পল্লী। পল্লীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য নানাবিধ জাতির বসতি। গোবিন্দলাল ব্রাহ্মণ—বয়স পঁচিশ বৎসরের উপরে নহে।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া পত্র পাঠ করিতেছিলেন, মেঘ-বিজড়িত দিবসে সমস্ত গ্রামখানি নিস্তব্ধতার কোলে বিশ্রান্ত। টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে; সমস্ত আকাশ জুড়িয়া মেঘখানা অতি ম্লান-মুখে বসিয়া আছে। গোবিন্দলাল যে-পত্র পাঠ করিতেছিলেন, তাহা এই ঃ

শনিবার; বেলা ১২টা

পাষাণ হৃদয়!

*আমি ঘুমাইতেছিলাম, * * দিদি আপনার হস্ত-লিখিত পত্রখানি লইয়া আমার ঘরে আসিয়া বলিল, এই যে * * * বাবু পত্র দিয়াছেন; আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সেই বিছানায় শুইয়া-শুইয়াই পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম। বৃহস্পতিবার সেই ঝড়-জলের সময় আলো জ্বালিয়া আপনাকে আপনার প্রথম পত্রের উত্তর লিখি, আপনি পাইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। প্রিয়তম! বাড়িতে বসিয়া-বসিয়াই কি আমায় পত্র লিখিবেন? কলিকাতায় কি আর আসিবেন না? এ-দাসী কি আর আপনাকে দেখিতে পাইবে না? পত্র পড়িয়া কি প্রাণ স্থির থাকে; প্রাণ যে আরও জ্বলিয়া যায়; আরও 'দেখিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে, কিছুতেই প্রবোধ মানে না—কী করি। ওগো আমার কী হইল? এ-জ্বালা জুড়াইবার স্থান কোথায় পাই? আর যে সহ্য করিতে পারি না। নিষ্ঠুর! এমনই করিয়াই কি কাঁদাইতে হয়? কতদিন যে দেখি নাই, একবার দেখা দিন। মিথ্যাবাদী, মনে নাই আমায় কী কথা বলিয়া বাড়ি গিয়াছেন, আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, "যদি আপনাকে কলিকাতায় আর না আসিতে দেয়?" আপনি বলিয়াছিলেন, "না, আসিতে দিবে না; বাড়িতে আমার কী করিয়া চলিবে!" আমি বলিলাম, "যদি পীড়াপীড়ি করে?" আপনি বলিলেন, "আমি কিছুতেই থাকিব না, শুক্রবারে নিশ্চয় আসিব, যদি কোনও কারণবশত না আসিতে পারি, শনিবারে নিশ্চয়ই আসিব।" আমার গা ছুঁইয়া বলিয়াছিলেন, তাহা কি আপনার মনে আছে? বোধহয় ওই কথা আমাকে প্রাণের সহিত বলেন নাই—বলিতে হয়, তাই মৌখিক বলিয়াছিলেন, নতুবা পাষাণ হইয়া ভুলিয়া রহিলেন কেমন করিয়া? নির্দয় হইয়া থাকিবেন না, কলিকাতায় আসুন। কলিকাতায় আসিতে আপনার মন নাই, আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, নতুবা যে-কোনও প্রকারেই হউক কলিকাতায় নিশ্চয় আসিতেন। অধিক আর কী লিখিব, যদ্যপি কখনও কলিকাতায় আসেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এ-দাসীকে দর্শন দানে চরিতার্থ করিবেন; মনে থাকে যেন। ভুলিবেন না। আপনার সময়মতো এ-দাসীকে একখানা পত্র লিখিবেন। আমি*

*বুঝিতে পারিলাম, এ-পৃথিবীতে প্রেম নাই—আছে কেবল প্রেমের লাঞ্ছনা। আমার শরীর একটু ভালো * * *।*

প্রিয়তম! কলিকাতায় আসিবেন। নিতান্ত পাষাণ হইয়া থাকিবেন না। আমার প্রণাম জানিবেন। এইবার আসা চাই-ই। শুধু পত্র লিখিলে আমি শুনিব না। না আসিলে আমি যাইব—বুঝিয়া কার্য করিবেন, নিবেদন ইতি—

আপনারই 'নীলিমা'

একই পত্র দশবার করিয়া পড়িয়া-পড়িয়া গোবিন্দলাল তাহার ভাবসাগরে ডুবিতেছিলেন — মজিতেছিলেন। এইসময় বৃষ্টিতে ভিজিতে-ভিজিতে তথায় একজন সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ন্যাসীর আগমনে গোবিন্দলালের চমক ভাঙিল। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া একখানা চৌকি আনিয়া সন্ন্যাসীকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী উপবেশন করিয়া মৃদু হাসিতে-হাসিতে কুক্ষিস্থ সাবধানরক্ষিত একখানা কাপড় বাহির করিয়া তদ্দ্বারা গাত্রাদি মুছিতে লাগিলেন। গোবিন্দলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কুশল তো?'

সন্ন্যাসী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'আমাদের আবার কুশালাকুশল কী বাবা? তুমি কেমন আছ?'

গো। আমার হৃদয়ে যে-নরকানল জ্বলিয়াছে, তাহা নিভিবার নহে।

স। নরকানল কী? প্রেমই জগতের সার।

গো। দরিদ্রের পক্ষে নহে। যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে যদি দিবারাত্রি বক্ষে রাখিতে না পারিলাম, তবে সুখ কোথায় প্রভু?

স। তাহাতে অন্তরায় কী?

গো। অর্থ।

স। সে কি তোমার নিকট কেবল অর্থই চাহে?

গো। না প্রভু। তাহা নহে। তবে যাহাকে ভালোবাসি, তাহাকে যদি সুখী করিতে না পারিলাম, যে যদি অন্য প্রকারে অর্থ উপার্জন করিয়া উদরের উপায় করিতে থাকিল, তবে আমার আশা পূর্ণ হয় কই?

স। সাধনায় সকলই সিদ্ধি হয়। সাধনা করো, অর্থও পাইবে।

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া কী ভাবিলেন। শেষে অতি গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'পরকালের পথ কণ্টকিত হইবে।'

স। কিন্তু ইহকালে পরম সুখে থাকিবে, ধন-ঐশ্বর্য প্রচুর হইবে। যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহা সাধনফলে সিদ্ধ করিতে পারিবে।

গো। কিন্তু বড়ই নিষ্ঠুরের কার্য।

স। সাধনার পথ কুসুমাবৃত নহে। আর শাস্ত্র বলিতেছেন, ক্রমে ইহকালের কাজ করিতে-করিতে ওই সাধনবলে পরকালের পথও পরিষ্কৃত হইবে।

গো। ওইরূপ কার্যে যে-অধর্ম হইবে, সে-পাপ কীরূপে স্খালন হইবে?

স। দেবীর কৃপায়।

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমার হৃদয়ে যে-নরকানল জ্বলিতেছে, তাহা হইতে পরকালের নরক অধিক কি না জানি না। যাহা অদৃষ্টে থাকে, হইবে। নীলিমাকে চাই—নিরবচ্ছিন্ন নীলিমাকে বক্ষে রাখিতে যদি আমাকে রৌরব নরকে ডুবিতে হয়, প্রস্তুত আছি। অর্থের প্রয়োজন—আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিব।'

সন্ন্যাসীর মুখে মৃদু হাসির রেখা অঙ্কিত হইল। সন্ন্যাসী কাপালিক—বামাচারী। যথার্থ শাস্ত্রার্থ

অজ্ঞাত, কন্দর্যার্থ পরিজ্ঞানে সাধনায় প্রবৃত্ত। গোবিন্দলালকে দিয়া কতকগুলি কার্য করাইয়া লইতে ইচ্ছুক—তাই তাঁহার এ-প্ররোচনা। গোবিন্দলাল কলিকাতার এক বেশ্যা-প্রণয়ে মুগ্ধ। বেশ্যার তুষ্ট্যর্থে অর্থের প্রয়োজন। সেই বেশ্যার লিখিত পত্রই গোবিন্দলাল পাঠ করিতেছিলেন। অর্থের জন্য গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কামার্ত ব্যক্তি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীর আজ্ঞা পালনে প্রতিশ্রুত হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া অতি ধীরে-ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেকগুলি কথা বলিয়া সেদিনকার মতো বিদায় হইলেন। বৃষ্টিটাও তখন একটু থামিয়াছিল।

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া চিন্তা করিলেন। শেষে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অন্যের অশ্রুত-স্বরে বলিলেন, 'নীলিমা, প্রাণাধিকে! তোমার জন্য আমি সব করিতে পারি। তোমারই সুখের জন্য সন্ন্যাসীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তোমারই সুখের জন্য ভীষণ বহ্নি হস্তে করিলাম। কেবল প্রচুর অর্থাভাব-জন্যই আমি তোমার নিকট সর্বদা থাকিতে পারি না—দেখিব অর্থ হয় কি না। সন্ন্যাসী কখনওই মিথ্যা বলিবেন না। আর সেদিন যাহা আমাকে দেখাইয়াছেন, তাহাতে সন্ন্যাসীকে মানব বলিয়াই বোধ হয় না—সন্ন্যাসী সব করিতে পারেন।'

দুই

গোবিন্দলালের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু আজ তিন বৎসর হইল, তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। এ-পর্যন্ত আর তিনি বিবাহ করেন নাই। বিবাহের জন্য অনেক ঘটক আসিয়াছিল, অনেক কন্যার বাপ, তাঁহার পিতার নিকট কন্যাভারের সহিত অনেক তৈল লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দলাল বেশ্যা নীলিমার প্রণয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়ায়, আর সে-বিবাহে স্বীকৃত হয়েন নাই। অবশ্য দেশের কেহই এ-সংবাদ জানিতেন না, তাঁহারা ভাবিতেন, মৃতা পত্নীর প্রণয়ই তাঁহাকে বিবাহে বিমুখ করিয়াছে। গোবিন্দলাল শিক্ষিত এবং কলিকাতায় মাসিক প্রায় শত মুদ্রা বেতনে চাকুরি করিতেন। সেই অর্থেই তাঁহার খরচপত্রের সঙ্কুলান হইত। কিন্তু যখন বারবিলাসিনীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, অফিসে সময়মতো উপস্থিত ও কর্তব্যকর্মে অবহেলা-জনিত অফিসের কার্যে অত্যন্ত গোলযোগ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কর্মচ্যুত করিলেন। আর চলে না—অগত্যা তিনি বাড়ি আসিলেন।

এতদিন পরে সহসা গোবিন্দলালের মত পরিবর্তন হইল। গোবিন্দলাল বন্ধুবান্ধবের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইতেছি।'

কথা সত্বরেই তাঁহার পিতা-মাতার কর্ণে উঠিল। তাঁহাদের আর আনন্দ ধরে না। পুত্রের বিবাহ দিবেন, বিবাহ করিতে পুত্রের মত হইয়াছে, তাঁহারা এ-ঘোষণা সর্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। মধুময়ী কুসুম প্রস্ফুটিত হইলে বরং ভ্রমরাপালের আনাগোনা হইতে বিলম্ব হয়, বরং ক্ষতস্থানে পুঁজ হইলে মাছির পাল একটু পরে আসে—কিন্তু মাসিক শত রৌপ্যমুদ্রা উপার্জন করিতে পারে, এমন মনুষ্য বিবাহ করিবে, এ-সংবাদ প্রচারিত হইলে, কন্যাভারগ্রস্ত মানবনিচয় অতি সত্বর আনাগোনা আরম্ভ করিয়া দেয়। গোবিন্দলালদের বাড়িতেও তাহাই হইল—দিন নাই, রাত্রি নাই—কেবলই কন্যাভারগ্রস্ত ম্লানমুখ মানবের যাতায়াত হইতে লাগিল। শেষে নিকটবর্তী গ্রামের শশীভূষণ চক্রবর্তীর কন্যার সহিত গোবিন্দলালের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

শশীভূষণ চক্রবর্তীর সংসারের আর্থিক অবস্থা ভালো নহে। কিন্তু কন্যাভারক্লিষ্ট মানবের অবস্থা দেখিলে চলে না—কন্যার বিবাহে যাহার বাস্তুভিটা বিক্রয় না হইল, তাহার মানবজন্মই বৃথা। শশীভূষণের একমাত্র কন্যা উমা, তাহার কি আর টাকার ভয়ে একটা মূর্খ ও কুরূপ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া চলে! বিশেষত আর তো কচিকাচা নাই—স্ত্রী-পুরুষের দুটা পেট; ভগবান যাহা করেন,

তাহাই হইবে, ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষ ফর্দমতো টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া গোবিন্দলালের পিতাকে কন্যা দেখিতে আমন্ত্রণ করিলেন।

গোবিন্দলালের পিতা ওরফে রামহরি ঘোষাল আজ কন্যা দেখিতে শশীভূষণের বাড়িতে গমন করিবেন। তিনি সংসার-অভিজ্ঞ লোক। পছন্দ-অপছন্দ অত বুঝেন না। ফর্দের টাকা মিলিলেই হইল। সে-অঙ্গীকারও পাইয়াছেন।

শশীভূষণের আশা-উৎকণ্ঠায় সমস্ত দিন বুকের ভিতর দুরদুর করিতেছিল। ভাবী বেহাইকে ভালোরূপ আদর অভ্যর্থনার যাহাতে ক্রটি না হয়, এই ভয়েই বেচারা সারা হইয়া যাইতেছিলেন। নিজে বাজারে গিয়া মৎস্য, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও সন্দেশ প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিয়াছেন, নিজে বাগানে গিয়া ফল পাড়িয়া আনিয়াছেন, নিজে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া বাহিরের ঘরের বিছানা করিয়া রাখিয়াছেন —বুঝি অপরে এ-সমস্ত কাজ করিলে বেহাই-এর পছন্দমতো হইবে না, আজ বুঝি তাঁহার মনোরঞ্জনই শশীভূষণের একমাত্র ভরসার স্থল।

গৃহিণীও শশীভূষণাপেক্ষা কম ব্যস্ত নহেন। তিনিও মধ্যাহ্নের আহারাদি তাড়াতাড়ি সম্পাদন করাইয়া সকাল-সকাল রান্নাঘরে ঢুকিয়াছেন। রন্ধন-শাস্ত্রে তাঁহার এতদিনের অভিজ্ঞতার যেন আজ একটা মহা পরীক্ষা হইবে। আর এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর যেন একটা মস্ত লাভ-লোকসান নির্ভর করিতেছে। নতুবা এত যত্ন, এত পরিশ্রম সব মিথ্যা। গৃহিণীর সঙ্গে পাড়ার পাঁচ মেয়ে আসিয়া যোগ দিয়াছেন—কুটনা কুটা, বাটনা বাটা প্রভৃতির ভার তাঁহারা নিজ স্কন্ধে লইয়াছেন।

বেলা পাঁচটা বাজিতে গোবিন্দলালের পিতা রামহরি ঘোষাল মহাশয় পুরোহিত সঙ্গে করিয়া শশীভূষণের বাড়িতে আসিয়া দর্শন দান করিলেন। কীরূপে অভ্যর্থনা করিলে যথেষ্ট শীলতা, নম্রতা ও সৌজন্য প্রকাশ পাইবে, শশীভূষণ প্রায় দু'তিনঘণ্টা ধরিয়া আপনার সহিত সে-সম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছিলেন। অনেকগুলা ভালো-ভালো কথাও জিহ্বাগ্রে জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন ঘোষাল মহাশয় তাঁহার ভুঁড়ি, রেলির থান, গরদের চায়না-কোট আর মোটা ঘড়ির চেইন লইয়া হাজির হইলেন এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার যাতনা-ক্লিষ্ট শশীভূষণকে দেখিয়া কাঁচাপাকা গোঁফের পাশ হইতে খুব গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'নমস্কার মহাশয়', তখন শশীভূষণ একটা বড় রকমের ঢোক গিলিয়া ফেলিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে অত যত্নে সংগৃহীত ভালো কথাগুলা সহসা ধাক্কা পাইয়া মসৃণ জিহ্বার উপর গড়াইতে-গড়াইতে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। শশীভূষণ যখন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে গেলেন, তখন তাহারা নাগালের অনেক বাহিরে। শশীভূষণের ইচ্ছা ছিল, সৌজন্যের একটা রীতিমত অভিনয় করিয়া ভাবী বৈবাহিককে আপ্যায়িত করেন। কিন্তু শেষে? —'আজ্ঞা হাঁ', 'পরম সৌভাগ্য', 'মহাশয়ের পদধূলি' ইত্যাদি ভগ্নপদ, ন্যুব্জদেহ দু-একজন মাত্র অনেক সাধনার পর জিহ্বামঞ্চে দেখা দিয়া কতকটা মান রাখিল। অভিনয়ের যেটুকু অঙ্গহানি হইয়াছিল, অতিরিক্ত মাত্রায় হাত কচলাইয়া শশীভূষণ সেটুকু সারিয়া লইলেন।

ঘোষাল মহাশয় বরের বাপ, কাজেই শশীভূষণের স্বহস্ত-পাতিত বিছানার উপর বড় তাকিয়ায় কনুইয়ের ভর দিয়া আড় হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গড়গড়ার নলে মুখ লাগাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। শশীভূষণ তৎপার্শ্বে উপবেশন করত অনুগ্রহ-পয়োধিমন্থিত ঘোষাল মহাশয়ের মুখভাণ্ড-ক্ষরিত একবিন্দু সুধার লালসায় তৃষিত হইয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। তখন ঘোষাল মহাশয় একবার চোখ মেলিয়া চাহিলেন। গড়গড়ার নলে একটা লম্বা টান দিয়া, একটা ছোট হাসির কিরণে শশীভূষণের সন্দেহ-কণ্টকিত অন্ধকার পথ আলোকিত করিয়া নলটা তাঁহার হাতে দিলেন।

অনেকটা ভাবনা-চিন্তার পর সুখসেব্য তাম্রকূট পাইয়া শশীভূষণ ভাবিলেন, ঘোষাল মহাশয়ের মুখ না হউক, অন্তত এই গড়গড়ার নলটা সুধাভাণ্ড!

তাম্রকূট! তুমি সন্তাপীর তাপহারক, তোমাকে নমস্কার। তুমি না থাকিলে আমি হয়তো এতদিন চির-বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতাম। তুমি আমার দৈহিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—ত্রিতাপ নষ্ট করিয়া থাকো, তোমাকে নমস্কার। তোমার প্রসাদে আমি উত্তমর্ণের তাড়না, অধমর্ণের অসাধুতা ভুলিয়া

যাই, তোমার প্রসাদে রাগ দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি রিপুর প্ররোচনা বিস্মৃত হই। তোমারই প্রসাদে বসন্তকাল, কোকিলের পঞ্চম, পাপিয়ার সপ্তম, ফুলের পরিমল, চাঁদের সুধা, চাঁদবদনীর আড়নয়ন—এ-সকলে আমার কিছুই করিতে পারে না। অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমারই প্রসাদে কাহারও শ্লেষ, কাহারও বিদ্রূপ আমার কর্ণে পৌঁছায় না—তোমাকে নমস্কার। হে তাম্রকূট! আমি তোমার উপাসক ও একান্ত ভক্ত—কিন্তু তুমি তেমন ভক্তবৎসল নহ। কেন আমার তাম্রকূটাধার মধ্যে-মধ্যে শূন্য হয়, কেন তুমি অক্ষয় হও না। তোমার জন্য আমি সকলই সহিতে পারি, সকলই পরিত্যাগ করিতে পারি। নিস্তব্ধ নিশীথ রাত্রি, শয্যা'পরি প্রণয়িনী আসীনা, আমি ধীরে-ধীরে—হে তাম্রকূট! তবানুসন্ধানে নিরত। ভৃত্য কি এ-রাত্রে থাকে! বড় বিপদ। তাম্রকূট না সেবন করিলে যে প্রাণ যায়। প্রণয়িনী রাগিতেছেন—সকোপ-দৃষ্টিতে মিটিমিটি চাহিয়া দীপক রাগের কোমলসুরে বলিলেন, 'ও গো! সারাদিন খাটুনি, রাত্রেই বা কোন সোয়াস্তি যে একটু আলো নিভাইয়া ঘুমাই!' কিন্তু আমি কি, হে তাম্রকূট! তোমার সেই প্রকার ভক্ত যে, এই সামান্য বাধায় তোমার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারি? আমি কি জানি না যে, 'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।' সৎকার্যের বহু বিঘ্ন। প্রণয়িনী শেষে সুর বদলাইয়া পার্শ্বপতিত পুস্তকখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, 'ও গো, আমায় এইটুকু বুঝাইয়া দাও।' ততক্ষণ আমি, হে তাম্রকূট! তোমার বক্ষে ভাঙা টিকা কুড়াইয়া আরোপিত করিয়া ফুৎকার পাড়িতেছি—পাছে নিভিয়া যায়। প্রণয়িনী বিড়বিড় করিয়া বলিলেন, 'গুলিখোর, গুলিখোর'—শুনিয়াও শুনিলাম না। প্রেম করিতে হইলেই লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। হে তাম্রকূট! তোমার উপর আমার অহেতুকী প্রেম, দেখো, যেন ভুলো না।

শশীভূষণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তামাকু-রসে অভিসিঞ্চিত হইয়া, ভাবী বৈবাহিকের মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, 'মেয়ে-দেখা কি এখন হইবে?'

ঘোষাল মহাশয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হানি কী? তবে আগে দেনাপাওনার ফর্দটা সহি হইয়া গেলেই ভালো হয় না?'

শ। তবে তাহাই হউক।

দেনাপাওনার ফর্দে সহি হইয়া গেল। তৎপরে কন্যা দেখা হইল। মেয়ে দেখিয়া ঘোষাল মহাশয়ের বড় পছন্দ হইল। শশীভূষণের কন্যা উমা যখন তাহার সেই ঝুমরো-ঝুমরো চুল-ঘেরা পুরন্ত, নিটোল পানপানা মুখখানা তুলিয়া সলজ্জ ছলছল চোখ মেলিয়া একবার ভাবী শ্বশুরের মুখের দিকে চাহিল, তখন বুড়োর মনে হইল, অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছি—কিন্তু এমন শ্যামা, সুকেশী, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে তো দেখি নাই। এই মেয়েটিকেই বৌ করিয়া ঘরে লইয়া যাইতে হইবে। এতটা মনে হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শশীভূষণকে বলিতে পারিলেন না যে, আমার ছেলে তোমাকে দিতেছি, শুধু তোমার মেয়েটিকে আমাকে দাও। অন্য দেনাপাওনায় আর কাজ নাই। তাহা হইবার নহে—কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে ভিটাচ্যুত করাই যে ভদ্রতা!

যাহা হউক, কন্যা পছন্দ হইল। সন্ধ্যার পর আশীর্বাদ হইবে। শশীভূষণ স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। সংবাদটা শীঘ্রই বাড়ির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল—গৃহিণীর আর আনন্দ ধরে না, শশীভূষণ বাজার হইতে দধি, সন্দেশ, পান, সুপারি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যসমুদয় ক্রয় করিয়া অনিয়াছিলেন, গৃহিণী প্রতিবাসিনী কুটুম্বিনীদের নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে আনিলেন। সন্ধ্যার পরেই বাড়িটি আলোময় হইয়া উঠিল—চারিদিকে কলরব। চারিদিকে বাক্যস্রোত। ঘন ঘন উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতেছে। মুখুয্যেদের মেজমেয়ে নারায়ণী আসিতেই শঙ্খটা হাতে লইয়াছে—শঙ্খটা তাহার একচেটিয়া হইয়াছে। সন্ধ্যা না লাগিতেই গরীব শঙ্খের উপর সে এত জুলুম করিতেছে যে, সে-বেচারা ভাবিতেছে, হায়! কেন সমুদ্র-স্বদেশ ছাড়িয়া দুখানি কচি, পাতলা ঠোঁটের লোভে বাংলা দেশে আসিয়াছি! বড় ভুল করিয়াছি—কিন্তু আর উপায় নাই। মরিয়াছি যে—নহিলে ফিরিতাম।

সন্ধ্যার পর যথাসময়ে আশীর্বাদ আদি হইয়া গেল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মিষ্টান্নাদি লইয়া স্ব-স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তিন

আশীর্বাদের কয়েক দিন পরেই গোবিন্দলালের সহিত উমার বিবাহ হইয়া গেল। শুভদৃষ্টির সময় গোবিন্দলাল দেখিলেন, দুইটি কামকটাক্ষশূন্য পটল-চেরা চোখ তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। বুকটা যেন একবার কেমন করিয়া উঠিল। যাহা হউক, বৈবাহিক কার্য সমাপ্ত হইলে, গোবিন্দলাল সস্ত্রীক গৃহে গমন করিলেন।

আজ ফুলশয্যা। শশীভূষণ বাস্তুভিটা বিক্রয়ার্থ দিয়া ভারে-ভারে ফুলশয্যার জন্য দ্রব্য পাঠাইয়াছেন। বিকাল হইতে গ্রাম্য যোষিৎগণ আসিয়া গোবিন্দলালদিগের বাড়িতে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন, আজ তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ, ফুলশয্যার ফলারে তাঁহাদিগের পরিতুষ্টি সম্পাদন হইবে; আর তাঁহাদিগের রচিত কুসুম-শয়নে গোবিন্দলালদিগের দাম্পত্য-প্রেমের পরিবর্ধন হইবে।

যথাসময়ে আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ফুলশয্যার ফুলভূষণে ভূষিত হইয়া গোবিন্দলাল ও তদীয় নবোঢ়া পত্নী কিশোরী উমা একত্রে একগৃহে অবস্থান করিলেন। কৌমুদী-বিভূষিতা রজনী—মধুর মলয়ানিলে দিগন্তানুপ্রাণিত, কুসুম-সুগন্ধে চারিদিক আমোদিত। গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নবদম্পতি শয়ন করিলেন, ক্রমে যামিনী দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিল, বালিকাও নিদ্রিতা হইয়া পড়িল—গোবিন্দলালের নিদ্রা নাই। গৃহের দীপ নির্বাপণ করিয়া দিয়া তিনি কী ভাবিলেন। ভাবনা যেন অত্যন্ত গভীর। সুগভীর চিন্তায় তাঁহার কপালপ্রদেশে স্বেদবিন্দু দেখা যাইতেছে—মুখভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন।

সহসা তাঁহার গৃহের দরজায় খটখট শব্দ হইল। গোবিন্দলালের চিন্তাভঙ্গ হইল; তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গবাক্ষ-প্রবিষ্ট কৌমুদী-মাখা নববধূর মুখখানির প্রতি একবার চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, অতঃপর স্পন্দিত-হৃদয়ে দরজা খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে সেই সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন।

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালকে কহিলেন, 'আইস, বাহিরে যাই।' নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে-ধীরে উভয়ে বাড়ির বাহির হইলেন। বাড়ির পার্শ্বে পুকুরের ধারে একটা আম্র-বাগান—উভয়ে সেই আম্র-বাগানে গিয়া উপবেশন করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আজই দিন, কেমন পারিবে তো?'

গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'আহা, নিতান্ত বালিকা—নিতান্ত সরলা।'

স। মায়া হইতেছে? একদিনে এত ভালোবাসিয়াছ, একদিনে পূর্ব প্রণয়িনীকে একেবারে ভুলিয়াছ! মহাজনেরা যথার্থই বলিয়াছেন যে, যুবকগণের ভালোবাসা অন্তরের নহে, চোখের। ভালোবাসিতে বা ভুলিতে অধিকক্ষণ লাগে না।

গো। না ঠাকুর, আমি নীলিমাকে ভুলি নাই; এ-জীবনে কখনও তাহাকে ভুলিতে পারিবও না।

স। তবে তাহাকে যাহাতে সর্বদা বুকে রাখিতে পারো, যাহাতে তাহাকে সুখী করিতে পারো—মোটকথা, ইহকালে মনের যে-কোনও সুখ উপভোগ করিয়া অন্তে পরমা গতি লাভ করিতে পারো, এমন কাজে তোমার অপ্রবৃত্তি হইতেছে কেন?

গো। অপ্রবৃত্তি বা অনিচ্ছা নহে ঠাকুর। নীলিমার জন্য আমি সকলই করিতে পারি, তাহাকে পাইবার জন্য আমি সমস্ত বিষয়ে প্রস্তুত আছি। তবে ওই বালিকাটির লাজভরা সুন্দর মুখখানি, আর বলি-বলি বলিতে পারি না ভাবে অর্ধস্ফুট দুই-একটি কথাতে উহার উপরে আমার কেমন একটা মোহ জন্মিয়াছে।

স। সাধনা-ভজনা মায়ামোহের কর্ম নহে। শ্রেয় লাভ করিতে হইলে কঠোর ব্রতাবলম্বন অবশ্য-কর্তব্য।

গো। প্রস্তুত হইলাম—অস্ত্র দিন।

সন্ন্যাসী একখানি ক্ষুদ্র খড়্গ গোবিন্দলালের হস্তে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল তাহা গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি মুণ্ডটি এইস্থানে আনিয়া আপনার নিকট দিব, কি অন্যত্র যাইতে হইবে?'

স। হাঁ, এইখানেই আনিবে।

গো। এই একটি মুণ্ডতেই কার্যোদ্ধার হইবে তো?

স। না; আরও চারিটি চাই, মহা শ্মশানে পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর সিংহাসন স্থাপন করিয়া সাধনা করিতে হইবে।

গো। আর মুণ্ড কোথায় পাইব?

স। সে আমি ঠিক করিয়া দিব।

গোবিন্দলাল অতি বিষণ্ণ বদনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গৃহের দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলিয়া গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালিকার ঘুমন্ত মুখখানির প্রতি চাহিয়া গোবিন্দলাল অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'তোমাকে বলি দিয়া আমি তাহাকে লাভ করিব। হায়! তুমি জানিতে পারিলে না যে, আমি তোমাকে বিবাহ করিয়াছি প্রেমের জন্য নহে, বলির জন্য। করালবদনী কালিকে! আমার সহায় হও—আমার মনাভীষ্ট সিদ্ধ করো।'

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী-প্রদত্ত খড়্গোত্তোলন করিলেন। পার্শ্বের বাঁশবাগান হইতে একটা পেচক অতি কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—একদল শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে ডাকিয়া অশিব ঘোষণা করিয়া দিল। আর বিলম্ব হইল না, গোবিন্দলালের খড়্গ বালিকার কণ্ঠদেশে আপতিত হইল। নববিবাহিতা বালিকার কণ্ঠদেশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। দেহটা ছটফট করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, তিনি একখানা বস্ত্রের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া লইয়া কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, যাইবার সময় খড়্গখানি লইয়া যাইতে ভুলেন নাই।

যেখানে সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কার্যোদ্ধার হইয়াছে দেখিয়া, অতি হৃষ্ট মনে মুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দলাল গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শিক্ষা-মতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার চিৎকারে বাড়ির সকলে জাগ্রত হইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিল। আসিয়া তাহারা দেখিল, নববধূর দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন ও অপহৃত হইয়াছে—রক্তে গৃহখানি ভাসিয়া গিয়াছে। সকলে এই হত্যাকাণ্ডে শোকাকুল ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া পড়িল। অচিরেই থানায় সংবাদ গেল।

প্রভাত হইতেই থানা হইতে দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন কনেস্টবল ও আট-দশজন চৌকিদারের শুভাগমন হইল।

দারোগাবাবু বয়সে প্রবীণ। গায়ে যথেষ্ট বল, পেটে ভুঁড়ি, মুখে শজারুকন্টকবিনিন্দিত একরাশ গোঁফ, দাড়ি কামানো, বর্ণ কৃষ্ণ, পরিধান খাকি ড্রিলের কোট-পেন্টুলান। দারোগাবাবু আসিয়াই মৃতদেহ দর্শন করিলেন। দেহ আছে, মুণ্ড নাই। দারোগাবাবুর বুদ্ধিতে ইহার কারণ এই নির্ণয় হইল যে, এই স্ত্রীলোকটিকে অন্য একজন ভালোবাসিত, সে বিবাহ করিতে না পারিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছে— এবং সেই আক্রোশে হত্যা করিয়া মুণ্ডটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। তিনি গোবিন্দলাল ও বাড়ির অন্যান্য লোকের এজেহার ও জবানবন্দী লইয়া সিদ্ধান্তে পাকারূপেই উপনীত হইলেন।

গোবিন্দলাল দারোগাবাবুর সাক্ষাতে এইরূপ বলিলেন, 'আমি ও আমার পত্নী উভয়ে অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়াছিলাম। প্রথমে সে কিছুতেই মুখ তুলিবে না, কিন্তু আমি ছাড়িলাম না—ঘোমটা খুলিয়া দিয়া হাত কাড়াকাড়ি করিয়া, ছলেবলে কথা কহাইলাম। তাহার পর ধীরে-ধীরে, সাবধানে, সভয়ে সে আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিয়াছিল। ক্রমে অনেক রাত্রি হইল, আমার অত্যন্ত নিদ্রাকর্ষণ হইল; সেও ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পরে একবার দরজা ঝনাৎ করিয়া উঠিল—আমি

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে-ও?" আমার স্ত্রী থতমত খাইয়া বলিল, "আমি বাহিরে যাইব।" আমি আর কোনও কথা কহিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী ঘরে না-আসিতেই আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, আমার স্ত্রী ফিরিয়া আসিয়া দুয়ার দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং যে হত্যা করিয়াছে, সে তাহা দেখিয়াছিল—সে গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া আমার এই সর্বনাশ সংসাধন করিয়া গিয়াছে।'

দারোগাবাবু সেইরূপ লিখিয়া পড়িয়া লইয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

চার

পুলিশ-হাঙ্গামা অতি সহজেই মিটিয়া গেল বটে, কিন্তু গোবিন্দলালের বুকের হাঙ্গামা সহজে মিটিল না। সেই সংসারানভিজ্ঞা বালিকার ঘুমন্ত মুখখানি, নিরপরাধে তাহাকে পিশাচের ন্যায় হত্যা করা, তাহার মৃতদেহের ছটফটানি—এই সমুদয় মনে পড়িয়া গোবিন্দলালকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মনে-মনে ভাবেন, হায়! সন্ন্যাসীর পরামর্শে কী সর্বনাশই করিয়াছি! কেন তাঁহার পরামর্শে বিবাহ করিলাম, কেন তাঁহার পরামর্শে একটি বালিকাকে নিরপরাধে নিহত করিলাম—কেন নারীহত্যা মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম; হায়! আমার গতি কী হইবে?

গোবিন্দলাল বাহিরের ঘরে বসিয়া-বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন সময় ডাকপিওন আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি খামে-আঁটা, লাল-কালিতে লিখিত, এবং পার্শ্বে একটি সবুজ ও লোহিত রঙে ছাপানো সুন্দর ফুল, তৎপার্শ্বে ক্ষুদ্রাক্ষরে ইংরেজিতে দুইটি ক্ষুদ্র কথা লেখা—তাহার বঙ্গানুবাদ এই যে, 'শান্তি ও সুখে থাকো।'

গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন। খুলিয়া পাঠ করিতে বুঝি তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি অর্থশূন্য চাহনিতে দূর পানে চাহিয়া-চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিলেন—ভাবিতে লাগিলেন, আমি কী করিয়াছি, কীসের জন্য এই মহাপাতকে লিপ্ত হইলাম, কীসের জন্য পিশাচেও যাহা পারে না, তাহাই করিয়া বসিলাম! বেদমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাহার পাণিগ্রহণ করিলাম, যাহাকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিব বলিয়া অগ্নি-সমক্ষে প্রকাশ করিলাম—হায়! ছার বেশ্যার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে স্বহস্তে হত্যা করিলাম! আমার কী হইবে?

গোবিন্দলাল! একা তুমি নহ; তোমার মতো শত-শত যুবক ওই পাপ-কুহকে মজিয়া পরিণীতা পত্নী হত্যা করিতেছে। তুমি না-হয় একেবারে এককোপে কাটিয়াছ, আর অন্যান্য ধুরন্ধরেরা পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতেছে।

গোবিন্দলাল ভাবিলেন, আর না, আর সন্ন্যাসীর সহিত মিশিব না, সন্ন্যাসীর পরামর্শ শুনিব না। বেশ্যার সহিত আর দেখা করিব না—আর তাহার জন্য কাঁদিব না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব—সন্ন্যাসী হইয়া পথে-পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

অনেকক্ষণ এইরূপ ভাবিয়া ভাবিয়া হস্তস্থিত পত্রখানির প্রতি চাহিলেন। দুই-তিনবার চাহিয়া-চাহিয়া শেষে খুলিয়া ফেলিলেন। খুলিয়া ফেলিয়া ধীরে-ধীরে অল্পে-অল্পে তাহার সমস্তটুকু পাঠ করিলেন। সে পত্র কলিকাতা হইতে তাঁহার পাপপন্থা-প্রবর্তিকা বা প্রণয়িনী নীলিমা লিখিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ

৫ই জ্যৈষ্ঠ; বেলা ৩।।০ টা

পাষাণ-হৃদয়!

আপনি আমায় বলিয়াছিলেন, বাড়ি পৌঁছিয়াই চিঠি লিখিব। অদ্য নয় দিবস হইল একখানিও চিঠি লিখিলেন না। কলিকাতায় আসিলেই

ভালোবাসা উথলিয়া উঠে, আর বাড়ি গেলেই সব ভুলিয়া যান! প্রেমিকবর, আমার না অসুখ দেখিয়া গিয়াছেন! আমার সহিত আপনি আলাপাদি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমাকে বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি কেমন আছি, একখানি পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে নাই? এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিতেছি, আপনি আত্মসংযম করিয়া আছেন। তবে দুইদিনের জন্য কেন মিছামিছি লাফালাফি করিলেন? পূর্বেই সাবধান হইতে পারিতেন তো। এখন আমায় বিশেষরূপে মজাইয়া আমার হৃদয়ের মরমে-মরমে আগুন জ্বালিয়া দিয়া আত্মসংযমে বসিলেন? ধন্য আপনি! আমার সাধ্য কী যে আপনাকে চিনিতে পারি। হায় হায়! অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কেন আপনার ছলনায় মজিলাম! এখন যে প্রাণ যায়! হায় প্রিয়তম, আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমায় ছাড়িব না এবং ছাড়িতেও পারিব না।" পাষাণ! প্রাণের পাষাণ! এখন কেন ভুলিলেন? আপনার প্রাণ কি এতই কঠিন! মনচোর! সত্যই কি এ দাসীকে পদদলিত করিবেন? আর কি এ-দাসীর প্রতি করুণা-কটাক্ষে চাহিবেন না? আপনাকে দেখিয়া আমি যে সকল যাতনা ভুলিয়াছিলাম। হৃদয়নিধি! নিষ্ঠুর হইবেন না, আমার কাতর অনুরোধ ভুলিবেন না। আমি তো আপনার কোনও অনিষ্ট করিতেছি না। তবে কেন এ-দাসীর প্রতি বিরূপ হইতেছেন? বিমুখ হইবেন না, মনে রাখিবেন। আমার মাথা খান, মরা মুখ দেখেন, পত্রপাঠ উত্তর লিখিবেন, প্রণাম নিবেদন ইতি।

আপনার পদদলিতা—
'নীলিমা'।

গোবিন্দলাল পত্রখানি দুই-তিনবার পাঠ করিলেন, শেষে এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'হায়! মানুষকে এমনই করিয়াই কি মজাইতে হয়? মানুষকে এমনই করিয়াই কি অধঃপাতে দিতে হয়? যাহা হউক, আমি আর তাহার নিকট যাইব না। আর এ-পত্রের উত্তর দিব না। কিন্তু প্রাণ বুঝে না—ওঃ! আমার সে যে বড় সুন্দর। আমি যে তাহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। তাহার কথা মনে হইলে, আমি যে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া যাই—তবে তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিব! কিন্তু সে যদি এখন মরিয়া যায়, তবে তাহাকে কোথায় পাইব, কেমন করিয়া তাহাকে দেখিব! তাই ভাবি না কেন, সে আমার নাই।

গোবিন্দলাল মাথামুণ্ড ছাইভস্ম এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোবিন্দলাল অন্যান্য দিন যেমন তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থানাদি করিয়া থাকেন, আজি আর তাহা করিলেন না। সম্মুখে একখানা চৌকি ছিল, তাহাতে বসিতে বলিলেন। চতুর সন্ন্যাসী ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, গোবিন্দলালের চিত্ত এই হত্যাজন্য কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়াছে। মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে সন্ন্যাসী বলিলেন, 'গোবিন্দলাল, কেমন আছ বাবা?'

গো। ভালো নাই, প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি।

স। কীসে আঘাত পাইয়াছ?

গো। পাপে।

স। সে পাপ নহে।

গোবিন্দলাল গলার স্বর অতি মৃদু করিয়া বলিলেন, 'নরহত্যা যদি পাপ না হয়, বালিকাকে আজন্ম রক্ষা করিব, ভরণ-পোষণ করিব, লজ্জা-শরম-মান-সম্ভ্রম সমস্তই রক্ষা করিব বলিয়া ধর্মত

প্রতিজ্ঞা করিয়া লইয়া আসিয়া স্বহস্তে বলি দিলে যদি পাপ না হয়, তবে জগতে আর পাপ কীসে আছে?'

সন্ন্যাসী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'জগজ্জননী জগদম্বার তুষ্ট্যর্থ যাহা করা যায়, তাহা পাপ নহে।'

গো। পাপ-পুণ্য বুঝি না। কীসে কী হয় জানি না—তবে আমি বুঝিতেছি, আমি মহা পাপে লিপ্ত হইয়াছি।

স। তোমার হাতে ও কীসের কাগজ?

গো। একখানা চিঠি।

স। কোথা হইতে আসিয়াছে? বলিতে বাধা আছে কি?

গো। হাঁ। সেদিন বিবাহের বাজার করিতে গিয়া তাহার ওখানে গিয়াছিলাম, বাড়ি আসিয়া চিঠি লিখিব কথা ছিল, লিখি নাই—তাই লিখিয়াছে।

স। পত্রখানি আমি শুনিতে পাই না?

গোবিন্দলাল পত্র পাঠ করিলেন। সন্ন্যাসী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 'আহা! বেশ্যার হৃদয়ে এমন প্রেম, এমন ঐকান্তিকতা আমি কখনও শুনি নাই। যর্থাথ ভালোবাসা জন্মিলে বারবনিতাও নিষ্কৃতি পায় না। পত্রে যাহা লিখিয়াছে, তুমি তাহাকে যথার্থই তাহা বলিয়া আসিয়াছিলে?'

গো। কী বলিয়া আসিয়াছিলাম?

স। আমি তোমাকে ভুলিব—আমি তোমাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব?

গো। হাঁ, বলিয়াছিলাম। আপনার পরামর্শে এই বিবাহ করা স্থির করিয়া অবধি আমার প্রাণে কেমন একটা অশান্তির বহ্নি জ্বলিয়াছে, যেন তখন হইতেই আমার মনে হইতেছে, হায়! আমি বুঝি মরণের পথে—নরকের পথে অগ্রসর হইতেছি। ভাবিলাম, এ-সকলের মূল কারণই বেশ্যার প্রণয়—তাই তাহাকে ওই কথাই বলিয়াছিলাম।

স। বলিতে তোমার কষ্ট হয় নাই? যে তোমাকে এত ভালোবাসে, তাহার মুখের উপর এতবড় কথাটা বলা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম নহে কি?

গো। আমি নিষ্ঠুর নহি? হাঁ ঠাকুর। আমি পিশাচ, আমি ঘোর নারকী।

স। কিন্তু ভালোবাসার নিকট বড় কঠিনও কোমল হয়, তাই তোমার প্রাণের কথা বলিতেছি। কী করিয়া বলিলে যে, আর তোমাকে ভালোবাসিব না?

গো। আমি বলিলাম, "দেখো, খেঁদু—"

স। খেঁদু কি? তুমি যাহাকে ভালোবাস, সে কি খাঁদা?

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'না ঠাকুর, সে খাঁদা নহে, বাঁশির মতো তাহার সুন্দর নাক, একদিন তাহাদের বাড়ির দুইটি স্ত্রীলোকে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, একজন আমাকে সুন্দর বলিতেছিল, আর একজন নীলিমাকে সুন্দর বলিতেছিল—শেষে আমাদের দুইজনকে ডাকিয়া ইহারা মীমাংসা করিতে লাগিল। আমরা ওই কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া দুইজনে হাসিয়া মরিতে লাগিলাম। একটা ব্যঙ্গভাবের গান গাহিয়া-গাহিয়া আরও হাসিতে লাগিলাম, গানটা এই—

'ইডি-ন বন-বিলাসিনী খেঁদি আমাদের,
খেঁদি আমাদের, আমরা খেঁদির, খেঁদি সকলের।
শুক বলে, আমার খাঁদা কল্কি অবতার,
শারী বলে, আমার খেঁদি কিম্ভূত, কিমাকার,
নইলে মানাবে কেন?
শুক বলে, আমার খাঁদা কেমন সাবান মাখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি পাউডারে রং ঢাকে,

কোথায় সাবান লাগে?
শুক বলে, আমার খাঁদা খবরের কাগজ লেখে,
শারী বলে, আমার খেঁদি প্রেমের নাটক লেখে,
ইহার কোনটা ভালো?"

সেই অবধি আমি তাহাকে খেঁদি বলিয়া ডাকি, কখনও-কখনও পত্রেও খেঁদু বলিয়া লিখি—সেও আমাকে উহা বলে বা লেখে।

স। যাক; তারপরে?

গো। তারপরে আমি বলিলাম, "খেঁদু। তোকে ভালোবাসিয়া আমি সব ভুলিলাম—আমার বুঝি ইহকাল-পরকাল সকলই নষ্ট হইল, আমার উপায় কী খেঁদু?" সেও বলিল, "আমার উপায় কী খেঁদু; আমি তো এমন ছিলাম না।"

স। আহা! তাহাকে কী করিয়া বলিলে, তোমায় ভালোবাসিব না?

গো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "খেঁদু! তুই আমাকে ভালোবাসিস?" বেশ্যার হৃদয় বুঝা ভার। সে ছলছল নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খেঁদু! আমি তোমায় ভালোবাসিয়া মরিয়াছি—প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি। যতদিন এ-দেহ পতন না হইবে, ততদিন বুঝি তোমায় ভুলিতে পারিব না।"

স। তারপর তুমি কী বলিলে?

গো। আমি বলিলাম, "খেঁদু! যাহাকে ভালোবাসিতে হয়, তাহার যাহাতে ভালো হয়, তাহা করা কি কর্তব্য নহে?" উত্তরে সে বলিল, "প্রাণপণে কর্তব্য।" আমি বলিলাম, "আমার মান, সম্ভ্রম, কাজকর্ম সমস্তই যায়, অতএব আর আমাকে চিঠিপত্র লিখিও না, আর আসিতে অনুরোধ করিও না, আমি আর তোমার এখানে আসিব না।"

স। শুনিয়া সে কী বলিল?

গো। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধ থাকিল—মূর্তি বড় স্থির, বড় গম্ভীর। শেষে ছলছল নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি না আসিতে বলিলে তুমি আর আসিবে না? আমি পত্র না লিখিলে তুমি আর লিখিবে না? কেবল আমি আসিতে বলি বলিয়াই তুমি আইস? কেবল আমি পত্র লিখি বলিয়াই তুমি লেখ? হা ভগবান!"

স। তারপর?

গো। তারপর আমি বলিলাম, "না, খেঁদু। আমার প্রাণের আকুল বাসনাতেই আসি—কিন্তু চিত্ত-সংযম করিব।" সে আমার এই কথা শুনিয়া আবার কী ভাবিতে বসিল, ভাবিয়া-চিন্তিয়া আমায় বলিল, "তুমি আমায় ভালোবাস?" আমি বলিলাম, "বড় ভালোবাসি বলিয়াই তো চিত্ত-সংযমের কথা বলিতেছি, যদি এত ভালো না বাসিতাম—তবে আসিতে আপত্তি কী ছিল?" সে বলিল, "তুমিই না বলিলে, যাহাকে ভালোবাসা যায়—তাহার উপকার করিতে হয়?"

স। ইহার অর্থ কী?

গো। শুনিয়া যান। আমি বলিলাম, "ভালোবাসিলে তাহার উপকার করিতে হয় বইকী।" সে বলিল, "আমার একটা উপকার করো—আমি তোমা ভিন্ন অন্যকে চাহি না, আমাকে দুইটা পেটের ভাত দিবে? আমি তোমাকে লইয়া থাকিব। যদি তুমি না আইস, আমি হতভাগিনী, পতিতা রমণী—যদি আমার সংসর্গে আসা একান্ত মহা পাতক বলিয়া আর না আইস—তবু আমাকে দুইটা পেটের ভাত দিবে, আমি তোমারই রূপধ্যানে জীবনাতিবাহিত করিব।" আমি কোনও কথা কহিলাম না।

সন্ন্যাসী—চতুর সন্ন্যাসী বলিলেন, 'গোবিন্দলাল! সে তোমাকে বড় ভালোবাসে, তাহার প্রাণে ব্যথা দিও না। আমার পরামর্শমতো কার্য করো। দেবীর দয়া হইলে টাকার অভাব তোমার

হইবে না। তাহাকে রানির মতো রাখিতে পারিবে। টাকা, স্বাস্থ্য, মান, সম্ভ্রম ও বিপুল প্রতিপত্তি হইবে।'

গোবিন্দলালের চিত্তভাব পরিবর্তন হইল। কাহার না হয়! একদিকে বিবেকের মৃদু আঘাত, অপরদিকে বেশ্যার প্রণয়-কুহক, ধনের বিপুল প্রলোভন। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আপনার পরামর্শ মত কার্য করিতে আমি অপ্রস্তুত নহি, তবে কার্য বড় নৃশংসের।'

সন্ন্যাসীর কক্ষদেশে একটা সুরাপূর্ণ বোতল ছিল, তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, 'ইহাতে মায়ের প্রসাদ কারণবারি আছে, পান করো।'

গোবিন্দলাল গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ পান করিলেন। সুরাবিষ মস্তকে উঠিল। তখন সন্ন্যাসীর দুই পায়ে ধরিয়া সজল নেত্রে গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ঠাকুর! প্রতারণা করিবেন না। ডুবিয়াছি তো পাতাল কত দূরে দেখিব—আমার খেঁদুকে সুখে রাখিবার জন্য আমি সব করিব, কিন্তু যেন প্রতারিত না হই।'

সন্ন্যাসী পা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, 'তুমি দেখো, আমি তোমাকে রাজা করিয়া দিব।'

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি রাজা হইতে চাহি না। আমার খেঁদুকে রানি করিব।'

অতঃপর সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কানের কাছে মুখ লইয়া কতকগুলি কথা বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন।

পাঁচ

স্বরূপনগরের নিম্ন দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত। ভরা ভাদ্রের খরস্রোত বুকে করিয়া ইছামতী কাহার উদ্দেশে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে! সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইছামতীর কলকল, শনশন গতি-শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—ক্বচিৎ দূরে মৎস্যজীবীর উচ্ছ্বসিত আনন্দ-সঙ্গীতের শেষ তানটুকু বড় মধুর শুনাইতেছিল। এমনসময় সেই তীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল কী ভাবিতেছিলেন, ঊর্ধ্বে—আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠিয়া তাহার তরল রজত-কিরণে সমস্ত বিশ্ব বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিতেছিল, আর-একটা নাছোড়বান্দা পাখি তাহার প্রাণের অত্যন্ত করুণ কাহিনী ডাকিয়া-ডাকিয়া বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া দিতেছিল।

গোবিন্দলাল একা দাঁড়াইয়া কী ভাবিতেছিলেন, এমনসময় তথায় আর-একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, সে স্ত্রীলোক। বয়স চল্লিশেরও উপরে হইবে। বর্ণ কালো, মোটাসোটা, হাসি-চাহনিতে ভরা-ভরা। তাহার কাঁখে কলসী—হাতে একটা চুপড়ি।

গোবিন্দলাল তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছি। তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আমার কাজ কি সহজ?'

গোবিন্দলাল মৃদু হাসিয়া কহিলেন, 'এত কঠিনই বা কিসে?'

স্ত্রী। সে কি সহজ মেয়ে!

গো। কী বলিল?

স্ত্রী। স্বীকার করে না।

গো। একদম না?

স্ত্রী। একদম না।

গো। বুঝিলাম, এ-জগতে প্রেম নাই—প্রাণ দিয়াও প্রাণ মিলে না।

স্ত্রী। অন্য চেষ্টা দেখিব?

গো। না।

স্ত্রী। কেন?

গো। ইহা কি মাছ শাক? একটা না হইল, আর-একটার খোঁজ করা গেল।

স্ত্রী। ইহা হইবার কোনও উপায় দেখি না।

গো। আমার অদৃষ্ট। তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দিতাম।

'আচ্ছা, আর-একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। অন্য একদিন আমার সহিত দেখা করিও।' এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি চলিয়া গেল, গোবিন্দলালও চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল পথে যাইতে-যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, আমি কোথায় চলিলাম, ক্রমে যে নরকের অতি নিম্নদেশে নামিয়া পড়িলাম, আমার গতি কী হইবে?/

গোবিন্দলাল দাঁড়াইয়াছিলেন, সেখানে বসিয়া পড়িলেন। খরস্রোতা নদী-পানে উদাস নেত্রে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! আমি কী করিতেছি? কেন সন্ন্যাসীর পরামর্শে আমি এ কু-কাণ্ডে মাতিতেছি? কেন আমি ডাকিয়া ডাকিয়া নিরয়বহ্নি বুকে লইতেছি? কীসের জন্য আমার এ-সকল করা? আমার খেঁদু—খেঁদুকে না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না। ভালো আমি তো চাকুরি করিলে মাসে কিছু না হইলেও একশত টাকা উপার্জন করিতে পারি। খেঁদু আমার নিকট জোর করিয়া কিছুই চাহে না, তবে আমি চাহি খেঁদুকে আমার একার করিয়া রাখিতে। ভালো, আমার উপার্জিত অর্থে কি তাহার চলিতে পারিবে না। আমি চাহি, তাহাকে রানির মতো রাখিতে। সন্ন্যাসীর কথা কি সত্য হইবে? এই পঞ্চ মুণ্ডের উপর দেবীর আসন স্থাপন করিয়া শ্মশানে তাঁহার সাধনা করিলে, যথার্থই কি আমি মনোমতো বরলাভ করিতে পারিব? যথার্থই কি অতুল ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইব?

খেঁদু! প্রাণাধিকে! তোমার জন্য আমি আমার মান-সম্ভ্রম, জাতি-কুল-জ্ঞান-ধর্ম সমস্তই বিসর্জন দিতেছি, স্বহস্তে পরিণীতা পত্নীর মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছি—আবার এই মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি। তুই আমায় ভুলিস না। তোকে সুখে রাখিবার জন্যই আমার এই সমস্ত মহাপাতকে পরিলিপ্ত হওয়া।

প্রেম বোধহয় চিত্তের মধুরতম বৃত্তি। তাই মাধুর্যের স্রষ্টা কবির প্রেম অবশ্যম্ভাবী অবলম্বন। অনাদিকাল হইতে প্রেম কাব্যের উপাদান। কিন্তু বুঝিতে পারি না, পাপেও কেন প্রেমের বীজ উপ্ত হয়! কেন এত কঠোর, এত নৃশংস হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর ফুটিয়া উঠে! কেন এমন মরুভূমে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়! ইহাকে প্রেম না বলিয়া যদি রূপজ মোহ বলা যায়, তাহাতে একটা ঘোর সন্দেহ আসিয়া পড়ে। রূপজ মোহ কয়দিন থাকে, রূপ-সম্ভোগের সহিত সে-পিপাসা কেন মিটে না—ইহা বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি না বলিয়াই—এই খেলা।

গোবিন্দলাল সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদী-সৈকতে বসিয়া ভাবিতে-ভাবিতে সকল ভাবনা ভুলিলেন—তাঁহার প্রাণের ভিতর সেই কুহকিনীর মুখখানি ফুটিয়া উঠিল। গোবিন্দলালের কণ্ঠে মিষ্ট স্বর ছিল, তিনি সেখানে বসিয়া গান গাহিতে লাগিলেন। গানে বুঝি প্রাণের ভাব বাহির হয়। গানে বুঝি প্রাণের আগুন একটু কমে। গোবিন্দলাল গাহিতে লাগিলেন,

"হরষ আকুল পিকস্কুল গাহিছে;
দশদিক পুলকিত, তরুলতা হরষিত,
হরষে আকাশে শশী হাসিছে।
তটিনী হৃদয়-পরে, জোছনা পুলক-ভরে
হের সুখে খেলিছে।
যুগল মিলন হেরে, আমার পরাণ যে রে,
'সে কোথা', 'সে কোথা' ব'লে কাঁদিছে।"

ছয়

সতীশচন্দ্র মিত্র জাতিতে কায়স্থ। বাড়ি স্বরূপনগর—আসামে চা-বাগানে ডাক্তারি কার্য করেন; বাড়িতে দূরসম্পর্কীয়া বিধবা মাসিমাতা ও স্ত্রী আছেন। স্ত্রী সুন্দরী ও যুবতী, একটি মাত্র কন্যা-সন্তান হইয়াছে। কন্যাটির বয়স চারি বৎসর। সতীশের স্ত্রীর নাম মালতী।

মালতীর উপর গোবিন্দলালের পাপদৃষ্টি পতিত হইয়াছে; ভগবান জানেন, এ-প্রেমের কোন প্রকার বিকাশ। একজনে মন সঁপিয়া আবার অন্যের উপরে কীরূপে আকৃষ্ট হয়! আমরা বুঝি, এ যে-শ্রেণীর প্রেম, তাহার পরিণতিই এইপ্রকার; কিংবা বুঝি উদ্দেশ্যই পৃথকরূপ আছে!

সেদিন ইছামতী নদীতীরে সেই স্ত্রীলোকের সহিত গোবিন্দলালের এই কথাই হইয়াছিল। তৎপরে কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকটি যে বলিয়াছিল, কাজ বড় শক্ত, কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু পাপের প্রলোভন, রূপের আকুলতা সহ্য করা, দমন করা কিঞ্চিৎ কঠিন। মালতী স্ত্রীলোকের পাপ-প্রস্তাবে কিছুতেই স্বীকৃতা হয় নাই।

মালতীর কন্যার একদিন ভারি জ্বর হইল, গোবিন্দলাল সে-সংবাদ পাইয়া ডাক্তার লইয়া তাহাদের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন, যে-কয়দিন তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইয়াছিল, সে-কয়দিন যাতায়াত করিয়া, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া বড় ঘনিষ্ঠতা করিলেন। মালতী এক-একবার তাঁহার দিকে চাহিত, সেই স্ত্রীলোকটির কথা স্মরণ করিত—স্বামীর মুখ মনে পড়িত—আর শিহরিয়া উঠিত; সে বুঝিতে পারিতেছিল, গোবিন্দলাল আটাকাটি দিয়া তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। কী জানি, বিধাতার মনে কী আছে! সে অন্তরে শিহরিয়া উঠিত।

একদিন গোবিন্দলাল তাহাদিগকে দেখিতে গেলেন। একেবারে বাড়ির ভিতর উঠানে গিয়া দাঁড়াইলেন। মালতী তখন আদুড় গায়ে কন্যাকে স্তন দিতেছিল। গোবিন্দলালকে দেখিবামাত্র গায়ে-মাথায় কাপড় দিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিল। গোবিন্দলাল তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই সর্বনাশা হাসি! শিহরিয়া মালতী ছুতা করিয়া গৃহমধ্যে উঠিয়া গেল।

তারপর হইতে গোবিন্দলাল ঘন-ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। মালতী দেখিতে পাইল, ক্রমে গোবিন্দলালের সহিত তাহার মাসশাশুড়ীর বড় ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল, সে-ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মালতীর মনে সন্দেহ হইল। সন্দেহ হইবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, একদিন তিনি মালতীকে বলিলেন, 'হ্যাঁগা, বউমা! ও তোমার কীরকম আক্কেল? গোবিন্দলাল তোমার দেওরের মতো! তা, দেওরের সঙ্গে কথা কহায় দোষ কী?' মালতী বুঝিতে পারিল, ব্যাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। বলিতে কি, গোবিন্দলালকে ঘন-ঘন দেখিতে-দেখিতে, মালতীর আবার ভালো করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। মালতী বুঝি আর সামলাইতে পারে না। সে ঘরে গিয়া ঊর্ধ্বমুখে যুক্তকরে সজল নেত্রে মাঝে-মাঝে ভগবানকে কতই ডাকিত, 'হে দুর্বলের বলদাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, এ-দুর্বলকে বল দাও। এই আশ্রয়হীনের সহায় হও।'

একদিন গ্রীষ্মকালের দিবা দুই প্রহরের সময় বালিকা কন্যাকে কোলে লইয়া মালতী ঘরের মেঝেতে আলুথালু অবস্থায় ঘুমাইতেছিল, নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিল, পার্শ্বে বসিয়া গোবিন্দলাল ধীরে-ধীরে তাহাকে ব্যজন করিতেছে। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। নির্লজ্জ গোবিন্দলাল, তাহার হস্ত চাপিয়া ধরিল। সেই স্পর্শে মালতী কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সর্বশরীর কেমন করিতে লাগিল। একটিও কথা কহিতে পারিল না। হাতের ভিতর হাতখানি ঘামিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল বলিলেন, 'আমি তোমাকে ভুলিতে পারিব না। আমাকে যদি নিরাশ করো, তোমার সম্মুখে ব্রহ্মহত্যা হইবে। তোমাকে ভুলিবার উপায় আমার নাই।'

মালতীর দুর্বল চিত্ত তখন বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে তখন চেতন ছিল, কি অচেতন ছিল, কিছুই মনে করিতে পারিল না। বুঝি চোখ দিয়া আরও জল পড়িয়াছিল, বুঝি মাথা ঘুরিয়া

পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল; সহসা মালতীর পতনোন্মুখ দেহ গোবিন্দলাল দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন। মাথা ঘুরিয়া গিয়া মালতী গোবিন্দলালের বুকের উপর পড়িল।

সে তাহার সর্বস্ব ধন হারাইল।

দশ-বারোদিন পরে, একদিন রাত্রে গোবিন্দলাল মালতীর গৃহে আগমনপূর্বক শয়ন করিলেন। মালতী এবং মালতীর কন্যাও সেই গৃহে শয়ন করিল। ক্রমে রাত্রি মধ্যযামে গত হইলে, মালতী ঘুমাইয়া পড়িল। কন্যাটি অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মালতীকে নিদ্রাগত দেখিয়া গোবিন্দলাল পা টিপিয়া-টিপিয়া উঠিয়া তাহার নাসারন্ধ্র-সমীপে একখানি রুমাল ধারণ করিলেন। সম্ভবত তাহাতে উগ্র ক্লোরোফরমের গন্ধাপ্লুত ছিল, সেই গন্ধে মালতীর চক্ষুতারা প্রসারিত ও নিশ্বাসবায়ু হ্রাস হইয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল সেই রুমালখানি মালতীর চারি বৎসরের নিদ্রিতা কন্যার নাসারন্ধ্রে ধারণ করিলেন, তাহারও অজ্ঞানতা আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নির্মম—নরপিশাচ গোবিন্দলাল তাহাকে বুকের উপর করিয়া লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে একটি বাগানের ভিতর প্রবেশ করিলেন—সেখানে বালিকাকে বৃক্ষতলে শায়িত করিলেন। একটা গাছের গোড়ায় একখানা খড়্গ লুকান ছিল, সেখানা বাহির করিয়া বালিকার কণ্ঠদেশে তদ্দ্বারা সজোরে আঘাত করিলেন—এক আঘাতে গলা কাটিল না, দুই-তিন আঘাতে দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল। তখন গোবিন্দলাল খড়্গ ও মুণ্ড লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন—নদীতীরে একটা ঝোপের মধ্যে সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, গোবিন্দলাল তাঁহাকে হাতের মুণ্ড ও খড়্গ প্রদান করিয়া, সেই বাগানে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে একটা গর্ত কাটা ছিল, তন্মধ্যে বালিকার দেহ প্রোথিত করিয়া, গোবিন্দলাল নদীতীরে চলিয়া গেলেন। পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া দেখিলেন, তাঁহার পায়ের জুতায় রক্ত লাগিয়াছে। ধুইয়া ফেলিলেন, ধুইয়াও যখন রক্তের দাগ গেল না, তখন জুতা দুইখানি নদীতীরে পঙ্কবালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া মালতীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—এবং গৃহের দরজা খুলিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বেই মালতীর চৈতন্য হইল। সে ভাবিল, আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল, গোবিন্দলাল নিদ্রাভিভূত—বস্তুত গোবিন্দলাল নিদ্রিত নহেন, পরে তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শান্তি বা নিদ্রা তাঁহার নাই। তিনি গাঢ় নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া আছেন। যাহা হউক, মালতী দেখিতে পাইল, গোবিন্দলাল ঘুমাইয়া আছেন। কিন্তু তাহার কন্যা? মালতী গোবিন্দলালের গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ও-গো আমার মেয়ে?'

দুরাত্মা গোবিন্দলাল নিদ্রোত্থিতের ভান করিয়া বলিলেন, 'কেন, সে তো তোমারই পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে।'

মালতী পাগলিনীর ন্যায় চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। গোবিন্দলাল অনুসন্ধানে যোগ প্রদান করিলেন। কিন্তু আর তাহা কোথায় মিলিবে? নিশিপ্রভাত হয় দেখিয়া, গোবিন্দলাল মালতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। মালতী কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিল, 'ও-গো! আমার মেয়ে কোথায় গেল?'

গোবিন্দলাল কৃত্রিম করুণস্বরে বলিলেন, 'আমার আর থাকিবার উপায় নাই। যতদূর সম্ভব খুঁজিয়া দেখিও। আমি আবার কাল সকালে আসিয়া সন্ধান করিব এবং গ্রামের অন্যত্রও সন্ধান করাইব। এ-সম্বন্ধে থানাতেও একটা সংবাদ দিতে হইবে।'

গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন। মালতী কাঁদিয়া মাসশাশুড়ীকে ডাকিয়া সমস্ত বলিল। এদিকে রজনীও প্রভাত হইয়া গেল। মালতীর কন্যা হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া গ্রামের মধ্যে একটা হইচই পড়িয়া গেল—কিন্তু কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না।

অতঃপর থানায় সংবাদ দেওয়া হইল। দারোগা আর ইহার তদন্তের জন্য গ্রামে আসিলেন না, ডায়েরিতে লিখিয়া রাখিলেন মাত্র। ইহাই পুলিশের নিয়ম।

মালতী কন্যাকে না পাইয়া কাঁদিয়া-কাঁদিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। শোকে পাগলিনী প্রায় হইয়া উঠিল—হায়! তাহার হৃদয় হইতে কে তাহার সর্বস্ব ধন কাড়িয়া লইয়াছে! গোপনে এই শোকের সময় মালতী অনেকবার গোবিন্দলালকে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছে, কিন্তু আজি দশ-বারো দিনের মধ্যে তিনি আর একদিনও মালতীকে দর্শন দান করেন নাই। বুঝি গোবিন্দলালের যে-জন্য মালতীর সহিত প্রণয় করা, তাহা সংসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

মালতী এখন বুঝিল, স্বামীই তাহার সব। যাহা শীতল সলিল বলিয়া পান করিয়াছিল, তাহা গরল। নতুবা এমন দুঃসময়ে কি গোবিন্দলাল তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন? মালতী বুঝিতে পারিল, এ-প্রণয় সুখের সময়ের, অসময়ের নহে। হায়! সে কেন মজিল, কেন নরকে নামিল! তাহার স্বামীর সে পবিত্র প্রণয়—সে স্নেহ-মায়া-মাখানো প্রীতি, সে কেন ভুলিল! বুঝি তাহারই মহাপাতকে তাহার অপাপবিদ্ধ কন্যাকে কোনও দেবতা হরণ করিয়া লইয়াছেন। মালতী গৃহাঙ্গনের একধারে একটা ভাঙা প্রাচীরের নিকট বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেদিন শুক্লপক্ষের নিশি, কিন্তু আকাশে অল্প-অল্প মেঘ থাকায়, জ্যোৎস্না কিছু ঘোলাটে-ঘোলাটে হইয়াছে।

মালতী কাঁদিতে-কাঁদিতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সেই ভগ্ন প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া তাহার মেয়ে দাঁড়াইয়া, তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। মালতী পাগলিনীর মতো ছুটিয়া কন্যাকে কোলে লইতে গেল, কিন্তু কোথায় কন্যা? মালতী ভাবিল, আমার কি ভ্রম হইল! আবার স্পষ্ট—স্পষ্টতর—দূরে ওই মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। এবার মালতী সেই স্থান হইতেই সেই মেঘাবিল জ্যোৎস্নালোকে ব্যাকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিল, তাহারই কন্যা—কিন্তু তাহার কেশপাশ উন্মুক্ত ও আলুলায়িত! উন্মুক্ত কেশগুচ্ছে অবিরামবাহী রুধিরধারা! কণ্ঠদেশে ভয়াবহ অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। ওই সকল ক্ষতমুখ হইতে, যেন ঝলকে-ঝলকে রক্ত উছলিয়া উঠিতেছে। মালতী আর চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সামলাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল; তাহার সে-চিৎকার কেহ শুনিতে পাইল না। বাড়ির নিকট অন্য কোনও লোকের বাড়ি ছিল না, তাহার মাসশাশুড়ী তখন বাড়ি ছিলেন না। সেই ছায়ামূর্তি তখন অতি গভীর ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট কাতর কণ্ঠে কহিল, 'মা, ও-মা! চিৎকার করিও না, তোমার ভয় নাই। আমি আর সে-দেহে নাই, তোমাদের ভাষাতে আমি মরিয়াছি। আমি মরিয়াছি, তোমারই পাপে। যেদিন গোবিন্দলাল, তুমি ও আমি একঘরে শয়ন করিয়াছিলাম, দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল ঔষধের আঘ্রাণে তোমাকে ও আমাকে অজ্ঞান করিয়া, আমাকে লইয়া গিয়া আম্র-বাগানে খড়্গাঘাতে অতি কঠিন রূপে হত্যা করিয়াছিল। হায়! আমি তখন একটু শব্দ করিবারও সময় পাইলাম না। দুঃসহ যাতনায় মুহূর্তমাত্র হাত পা আছাড়িয়া অচেতন হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য জন্মিল, তখন দেখিলাম আমার সেই ছিন্ন-কণ্ঠ-দেহ মাটিতে পড়িয়া রহিয়াছে। দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল, মুণ্ড চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমি দেহ হইতে বাহির হইয়া রক্ষা পাইয়াছি। এই যে আমার গলদেশে তিন চারিটা ক্ষত দেখিতে পাইতেছ, এই সমস্তই সেই নিষ্ঠুর অসুরের খড়্গাঘাতের ফল। কিয়ৎক্ষণ পরে গোবিন্দলাল ফিরিয়া আসিয়া আমার সেই মুণ্ডহীন দেহটিকে মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়া নদীতীরে চলিয়া গেল। গোবিন্দলালের জুতায় রক্ত লাগিয়াছিল, সে উহা ধুইয়া ফেলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল; কিন্তু রক্তের দাগ কিছুতেই উঠিল না, সুতরাং জুতা সেইস্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।'

বালিকা অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, 'আমি ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে অহোরাত্র দগ্ধ হইতেছি। মা! তুমি যদি দয়া করিয়া আমার এই কথা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে সংবাদ দাও—তাহা হইলে আমার এই জ্বালা জুড়ায়—পাপীর শাস্তি হয়। তুমি না পারো, এই সমস্ত কাহিনী বাবাকে লিখিয়া পাঠাও এবং তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিয়া পাঠাও, যেন এই সমস্ত ঘটনা তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে লেখেন। ইহা করিলে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিব—আমি এখন মুক্তাত্মা, ইহা না করিলে তোমাকে অভিসম্পাত করিব।'

ছায়ামূর্তি শেষোক্ত কথা কয়টি একটু কর্কশকণ্ঠে বলিয়া, চক্ষের পলকে বাষ্পে পরিণত হইয়া

শূন্যে মিশিয়া গেল, কোথায় বা সেই রুধিরধারা, কোথায় বা সেই আলুলায়িত কুন্তল, কোথায় বা সেই ভীষণ ক্ষতের ভয়াবহ দৃশ্য—আর কোথায় বা সেই অমানুষ-কণ্ঠের কাতর স্বর! সমস্তই সে-ছায়ার সঙ্গে শূন্যে মিশিয়া গেল। মালতী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আড়ষ্ট ও স্তম্ভিতভাবে আত্মবিস্মৃতের মতো রহিল।

রাখো বাপু তোমার গল্প লেখা। এ কি আরব্য উপন্যাস—না, পেত্নীর কাহিনী! মানুষ মরিয়া ভূত হইল, ভূত হইয়া আবার তাহার সেই সূক্ষ্ম শরীরে ক্ষতের চিহ্ন থাকিল, রুধিরের ধারা বহিল, চুলগুলা এলাইয়া পড়িল, মায়ের সঙ্গে আসিয়া বেশ করিয়া দাঁড়াইয়া কথা কহিল—আর জ্বলন্ত প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য তাহার খুনের কথা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিতে অনুরোধ করিল। এ সকল কাহিনী কী? এই সভ্যতালোক-প্রাপ্ত পাঠক-পাঠিকার নিকট এই জ্ঞান-বিজ্ঞানমণ্ডিত নর-নারী সমাজের—এই পাশ্চাত্য সায়েন্সজ্ঞ মানব-মানবীর সম্মুখে এমন কথা কি লিখিতে আছে! বন্ধ করো তোমার কলম। সন্ধ্যার সময় ঈষচ্চঞ্চল মৃদু-মলয়-প্রবাহিত বারান্দায় বসিয়া খোকা-খুকিকে ওই গল্প শুনাইয়া ঘুম পাড়াইও, আমাদের নিকট কেন বাপু!

কথাটা ওই প্রকারেরই বটে। কিন্তু মানুষ কি ভূত হয় না? এ-বিশ্বাস কি আপনাদের নাই? ব্যাস-বাল্মীকির কথা ছাড়িয়া দিই, কেন না সে-সকল কথায়, সে-সকল প্রমাণে এখন আর বড় একটা কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপের বর্তমান কালের অন্যতম বিজ্ঞান-গুরু, বিখ্যাতকীর্তি, এলফ্রেডরাসের ওয়ালেসের সাক্ষ্য বোধহয় অগ্রাহ্য হইবে না। ডক্টর ওয়ালেস যুগতত্ত্ব-প্রবর্তক ডারউইনের সহযোগী ও সমান পদবীরূঢ় বৈজ্ঞানিক। তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে যে-সকল তত্ত্ব আবিষ্কার ও গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা আজিকালিকার বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে সম্পদরূপে আদৃত রহিয়াছে। ওয়ালেস এখনও জীবিত আছেন এবং এখনও বিজ্ঞানসাহিত্যের অনুশীলন করিয়া ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বৃত্তি ভোগ করিতেছেন।

ডক্টর ওয়ালেস আগে প্রেততত্ত্ব মানিতেন না; যাহারা উহা মানিত, তাহাদিগকে তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, পরে কিন্তু তাঁহার বিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, ভূত আছে, পরলোক আছে এবং মনুষ্য পৃথিবীর দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে যাইয়া সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে ও সেখানে সূক্ষ্মদেহী আত্মিকরূপে অবস্থান করিয়া আপনার পার্থিব জীবনের কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। আরও তিনি এ বিশ্বাস করেন যে, পরলোকগত আত্মা অবস্থা-বিশেষে ও অধ্যাত্মজগতের বিশেষ-বিশেষ নিয়মানুসারে বিশিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনজন্য সময়-সময় মানবদিগকে দর্শন দান করিয়া থাকে এবং কথাবার্তাদি কহিয়া থাকে।

ডক্টর ওয়ালেস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা যে-প্রকার প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে ভরসা করা যায় যে, এই অপ্রত্যক্ষ অপরিদৃশ্যমান জড় জগতের কার্যপ্রণালী কিংবা নিয়মাবলীও অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সর্বত্র পরিজ্ঞাত কথার মধ্যে পরিগণিত হইবে।

এখন, কথা হইতে পারে, সূক্ষ্ম শরীরেই না-হয় আত্মা থাকিল, না-হয় কথাই কহিল, কিন্তু পার্থিব দেহের রুধিরধারা, ক্ষতচিহ্ন থাকে কী করিয়া, আর চুলই বা এলাইয়া পড়ে কী করিয়া? এ-বিষয়েও বিজ্ঞেরা বহু অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জড় শরীরের ক্ষতচিহ্ন বা রোগ ও যন্ত্রণার কোনও নিদর্শন সে অধ্যাত্ম শরীরে থাকে না। কিন্তু আত্মিকগণ, অবস্থা-বিশেষে কখনও-কখনও পরিত্যক্ত পার্থিব শরীরের অবস্থা-জ্ঞাপক-মূর্তি পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হয়েন।

সাত

মালতী ভয়ে, বিস্ময়ে ও শোক-মোহে একেবারে মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেকক্ষণ তাহার জ্ঞান ছিল না, যখন সুস্পষ্ট জ্ঞান হইল, তখন আর সে-ছায়ামূর্তি দেখা গেল না। মালতী কম্পান্বিত কলেবরে

গৃহে গমন করিল। ঘরের ভিতর বসিয়া দ্রুতস্পন্দিত হৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কী দেখিলাম? এ কী শুনিলাম? ও কি আমার মেয়ে? ও কী বলিল? গোবিন্দলাল তাহাকে তুলিয়া লইয়া গিয়া খড়্গাঘাতে অসুরের মতো হত্যা করিয়াছে! এ কথা কি সত্য? সত্যই কি আমার পাপে আমার প্রাণের কন্যা নিহত? এ-সমস্ত কি প্রকৃত ঘটনা, এ-সমস্ত কথা কি প্রকৃত? না-আমার চোখের ধাঁধা? যদি ধাঁধা হয়, ধাঁধা শুধু চোখের নহে। চোখের ধাঁধা, কানের ধাঁধা এবং সঙ্গে-সঙ্গে বুদ্ধি ও মনের ধাঁধা। সমস্ত ধাঁধাই কি একসঙ্গে আসিয়া মিলিল? যদি মানুষের সমস্ত ইন্দ্রিয়েই এরূপে একই সময়ে সুসঙ্গত ধাঁধা লাগিতে পারে, তাহা হইলে নিজের অস্তিত্বকেও ওইরূপ একটা ধাঁধা বলিয়া গণ্য করা যাইবে না কেন? ক্ষুদ্র পল্লীর একটা ক্ষুদ্র গৃহকোণে বসিয়া একটি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোকের মনে এই বিশাল তত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু সে বড়ই কাতর হইয়া পড়িল।

তাহার মেয়ের মূর্তি সে কীরূপ দুর্ধর্ষ দর্শন করিয়াছে! হায়! মালতী কেন মরিল না। হায়! গোবিন্দলাল, একি তোমারই কর্ম!

তাহার মেয়ের ছায়ামূর্তি এ-কথা বিচারকের কাছে বলিতে অনুরোধ করিয়াছে, না পারিলে মালতীর স্বামীর কাছে বলিতে বলিয়াছে। কিন্তু মৃত্যু হইলেও তো মালতী তাহা বলিতে পারে না। এ-কথা বলিলে, আসল কথা, তাহার মহাপাতকের কথা প্রকাশ হইতে কি বাকি থাকে! কিন্তু গোবিন্দলাল! তুমি যেমন বিশ্বাসঘাতক, যেমন পিশাচ—তোমার কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া তোমাকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করাই কর্তব্য। হায় নরাধম! আমার বুকের ধন, স্নেহের প্রতিমা কন্যাটিকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া স্বহস্তে নিধন করিয়াছ? মা! মা! একি সত্য? মা! আয় মা! আমার কোলে আয়। দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিহিংসায় তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার যে সবদিকে গোলযোগ। মস্তকে ক্ষত হইলে কুক্কুরী যেমন কী করিবে কিছুই স্থির করিতে পারে না, মালতী তেমনি কী করিবে কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। সে তখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিয়া, গালে মুখে চড়াইয়া, কাঁদিয়া মেঝে ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

হায়! সত্যই কি তাহারই মহাপাতকে তাহার এই দুর্দশা ঘটিল? সে কেন মরে না? মরণ কি তাহার নাই?

এই ঘটনার পর চার-পাঁচদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, মালতী বড়ই বিষণ্ণ ও ভয়-বিহ্বল চিত্তে কাল কাটাইতেছে, মেয়ের সে-ভীষণ ছায়ামূর্তি আর তাহার নয়নপথে পতিত না হয়, এজন্য সে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। কিন্তু কোনও সতর্কতায় কোনওই কাজ হইল না। ইহার পর আর-একদিন মালতী তাহাদের গৃহাঙ্গনে দাঁড়াইয়া আছে, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু তখনও অন্ধকারের গাঢ় ছায়াপাত হয় নাই। মালতী সহসা চমকিয়া উঠিল। আবার সেই ভীষণ ছায়ামূর্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আইজ আর সে-মূর্তির মুখে কাতরতার লেশমাত্রও নাই। সে-মূর্তি মালতীর সেই চারি বৎসরের কন্যার অবিকৃত প্রতিচ্ছবি। মূর্তি রুক্ষস্বরে বলিল,' মা, রাক্ষসি! তুমি আমার কথা রাখিলে না। আমার কথা ম্যজিস্ট্রেটের নিকট বলিলে না বা বাবার কাছে লিখিলে না, আচ্ছা থাকো।' বলিতে-বলিতে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং অধিকতর ক্রোধের সহিত বলিল, 'আবারও বলি, এখনও আমার কথা রাখো, নচেৎ তোমার ভারি অকল্যাণ।' মূর্তি আবার অদৃশ্য হইল। মালতী ভয়ে থরথর কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহে আসিল; সারানিশি ভয়ে, যন্ত্রণায় জাগিয়া কাটাইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া আপনার পাপকথা সম্বলিত এ-কথা কোথাও প্রকাশ করিতে পারিল না।

আর-একদিন মালতী অতি বিষণ্ণ চিত্তে বাড়ির অঙ্গনে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছে, নিকটে অন্য কেহ নাই। সহসা অদূরে আবার সেই দৃশ্য। মালতী চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে সেই করাল মূর্তি সন্ধ্যার রক্তিমরাগে, অধিকতর ভীষণ ভঙ্গিতে, তাহার সম্মুখে উপস্থিত। আজি তাহার চক্ষু, চক্ষু নহে যেন দুইটা জ্বলন্ত অগ্নিখণ্ড ধকধক করিতেছে। মুখচ্ছবি ক্রোধোদ্দীপ্ত, বিকট ও ভয়ঙ্কর। বালিকার ছায়ামূর্তি মর্মভেদী তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, 'পাপিয়সি! নিজ-কৃত অপরাধ প্রকাশ-ভয়ে এ-পাপও গোপন করিবি, আমার কথা প্রকাশ করিবি না! আজি আর তোর কিছুতেই আমার হাতে অব্যাহতি নাই।'

দেখিতে-দেখিতে সে-ছায়ামূর্তি আরও দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মালতী আর তাহার দিকে চাহিতে পারিল না। সে মর্মভেদী স্বরও কানে সহিল না। ভয়ে মন ও প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়িল—ছায়ামূর্তিও দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

মালতী কাঁপিতে-কাঁপিতে গৃহে গমন করিল। মাটিতে পড়িয়া চিত্ত একটু স্থির করিল। ভাবিল, আজি না হয় কাল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। আমার মেয়ের ওই প্রেত-আত্মাই প্রকাশ করিবে। আমার সতীত্ব-নষ্টের কথা স্বামী জানিতে পারিলে, কখনওই আমায় গ্রহণ করিবেন না। সমাজেও মুখ দেখাইতে পারিব না। স্নেহের বন্ধন কন্যাটিকেও জন্মের মতো হারাইয়াছি, তবে আর কী সুখে কাহার জন্য জীবন রাখিব? গোবিন্দলাল—পাপিষ্ঠ দুরাত্মা গোবিন্দলাল—তাহার নাম করিতেও এখন ঘৃণা হয়, তাহার জন্য মায়া-মমতা কী? কথাটা না প্রকাশ করিলে ওই প্রেতমূর্তি যেরূপে লাগিয়াছে, তাহাতে একটা বিপদও ঘটিতে পারে, তবে এক্ষণে মৃত্যুই মঙ্গল। মালতী তাহাই স্থির করিল, সে মরিবে। যেমন সংকল্প অমনই কার্য। গৃহের একটা আড়ার গায়ে কাপড় বাঁধিয়া, তদগ্রভাগ নিজ গলদেশে বন্ধন করিয়া মালতী ঝুলিয়া পড়িল, কিয়ৎক্ষণ হাত-পা আছড়াইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল।

একটু রাত্রি অধিক হইলে মালতীর মাসশাশুড়ী মালতীকে আহারের জন্য ডাকিতে আসিয়া দেখেন—সে উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি তখনই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রতিবাসীগণ আসিয়া জুটিয়া পড়িল, সকলে বুঝিল, কন্যার শোক সামলাইতে না পারিয়া মালতী আত্মহত্যা করিয়াছে। অল্পক্ষণ মধ্যেই এ-সংবাদ সমস্ত গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

আট

তৎপরদিবস প্রভাতেই গোবিন্দলাল শুনিতে পাইলেন, মালতী কন্যা-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কথাটা শ্রবণ করিয়া গোবিন্দলালের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। প্রাণের ভিতর কেমন একটা দুর্বিষহ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল। গোবিন্দলাল মনে মনে ভাবিলেন, হায়! আমি কী নারকী! আমি কী বিশ্বাসঘাতক! ভালোবাসি ভান করিয়া একটি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ সাধন করিলাম, তাহার কন্যাটিকে স্বহস্তে নিধন করিলাম, আর সেই অপত্য-শোকে শেষে সে আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইল। হায়! আমার উপায় কী হইবে?

গোবিন্দলাল মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ-মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিব। পথে-পথে আত্মানুশোচনা করিয়া বেড়াইব।

গোবিন্দলাল একান্তে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় তাঁহার উপদেষ্টা সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী মৃদু-মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'গোবিন্দলাল! কী ভাবিতেছ?'

অতি কাতর কণ্ঠে, বিষাদ-বিহ্বল করুণ স্বরে গোবিন্দলাল বলিলেন, 'গ্রামের মধ্যে সংবাদ রাখেন?'

স। মালতী মরিয়াছে, সেই কথাই বলিতেছ, না?

গো। হাঁ।

স। আত্মঘাতী হইয়া মরা উহার প্রারব্ধের ফল; তুমি কী করিবে?

গো। হেতু কে?

স। হেতু কর্মফলদাত্রী শক্তি। তুমি-আমি কী করিতে পারি গোবিন্দলাল?

গো। তবে আমাদের সাধনসিদ্ধি-বাসনা কেন? কেন পুরুষকারের চেষ্টা?

স। তুমি শাস্ত্রবাক্য বিশ্বাস করো?

গো। শাস্ত্র-বিষয়ে আমার কী জ্ঞান আছে যে, বিশ্বাস-অবিশ্বাস করিতে পারি? আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ, যাহা বলেন—বিষয়ী আমরা তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি কই?

স। তবে তাহাই করো—আমি তোমাকে যে-পথে লইয়া যাই, তুমি সেই পথে চলো—ইহকালে অনন্ত ধনসঞ্চয় করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করত অন্তে কৈলাসধামে গমন করিতে সক্ষম হইবে।

গো। আর-একদিন বলিয়াছি—আবার আজও বলিতেছি, এইরূপে মহাপাতক করিলে কি দেবীর দয়া হইতে পারে?

স। সেদিনও বুঝাইয়াছি, আবার আজিও বলিতেছি—আত্মজন্য যে হননাদি করা যায়, তাহাই হিংসা-পদবাচ্য—আর দেবোদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহা হিংসা বা হনন নহে।

গো। আমার চিত্ত অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আমি আর নরহত্যা করিতে পারিব না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, শ্মশানে পঞ্চ মুণ্ডের উপর পঞ্চ মকারে দেবীর সাধনা করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং বিগত-পাতক হইয়া ইহলোকে সর্বৈশ্বর্য-সম্পন্ন ও অন্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে।

গো। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, নরহত্যা করিয়া, মদ-মাংস খাইয়া, দেবীর তুষ্টি-সম্পাদন করিব?

স। তন্ত্রের তাহাই বিধান—কলিতে একমাত্র তন্ত্রোক্ত ধর্মই ধর্ম; আর সমুদয়ই নিষ্ফল।

গো। তন্ত্রে কি এইরূপ বিধানই আছে?

স। নতুবা আমি কি তোমাকে প্রতারণায় মুগ্ধ করিতেছি? তন্ত্রে আছে,—

'মদ্য মাংস তথা মৎস্য মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম না বিদ্যতে।'

অর্থাৎ পঞ্চ মকারে সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারে।

গো। যদি উহা পুণ্যই হইবে, তবে আমার হৃদয়ে এত আত্মানুশোচনা উপস্থিত হয় কেন? আমরা সাধারণত জানি, যাহাতে হৃদয়ে গ্লানি উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ। আর যাহাতে হৃদয়ের বিমলতা সম্পাদিত হয়, তাহাই পুণ্য।

স। এখন কি সাধনা করিয়াছ যে, চিত্তে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত হইবে?

গো। বুঝিলাম না, তবে আমি আর কাহারও নিকট এ-বিষয়ে মীমাংসা না করিয়া, এ-মহাপাতকে লিপ্ত হইব না। আমাকে একটু সময় প্রদান করুন।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'এদিকে যে দুইটি মুণ্ড সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা নষ্ট হয়। আর তিনটি শীঘ্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই সমুদয় কার্য সফল হয়। অন্নাদি রন্ধন করিয়া আহারের সময় কষ্ট ভাবিলে চলিবে কেন?'

গোবিন্দলাল কোনও কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসীও নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্যন্ত এইরূপে কাটিয়া গেল। অতএব সন্ন্যাসী কহিলেন, 'তুমি কলিকাতার কোনও চিঠিপত্র পাইয়াছ?'

গো। হাঁ, পাইয়াছি—সে চিঠি প্রায়ই পাই।

স। কী লিখিয়াছে?

গো। সে যাহা লিখিয়া থাকে, তাহাই লিখিয়াছে। আমাকে যাইতে লিখিয়াছে!

স। তুমি তাহাকে ভুলিয়াছ?

গো। না ঠাকুর। জীবন থাকিতে ভুলিতে পারিব না। আমি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসি।

স। তবে যে বৈরাগ্য-ব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছ?

গো। প্রাণের শান্তিই সুখ—আমি সে-শান্তি হারাইয়াছি। দিবানিশি মরমের পরতে-পরতে নিরয়-বহ্নি ধু ধু জ্বলিতেছে।

স। একটু মনোযোগ করিয়া কার্যগুলি সম্পন্ন করো—এবং দেবীর প্রসাদ লাভপূর্বক ঐশ্বর্যবান হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়া তাহাকে লইয়া সুখী হও।

গো। এখন কিন্তু আমার অন্য ধারণা জন্মিয়াছে, যেমন ছিলাম তেমনই থাকিলে বুঝি সুখী হইতে পারিতাম, যেমন চাকুরি করিতেছিলাম—মধ্যে-মধ্যে তাহাকে দেখিয়া যেমন আনন্দলাভ করিতাম, তেমনই করিলে বোধহয় আমার শান্তি বজায় থাকিত।

স। সুখলাভ করিতে হইলে প্রথমে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় বইকি। আমার সঙ্গে কারণ-বারি আছে, পান করিবে?

গো। তাহাতে একটু চিত্ত ভালো থাকে, কিন্তু অধিকক্ষণ নহে। দিউন।

সন্ন্যাসী মদ্যের বোতল গোবিন্দলালের হাতে দিলেন, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন।

যখন সুরাবিষ তাঁহার মস্তিষ্কে উঠিয়া ক্রিয়ারম্ভ করিল, তখন তিনি তাঁহার প্রণয়িনী বেশ্যা নীলিমার বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। সে কী প্রকারে তাঁহাকে ভালোবাসিত, কী প্রকারে তাঁহাকে যত্ন করিত—অর্থাৎ তাহার অভিসারিকা, মিলন, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, কুঞ্জভঙ্গ, রসোদ্গার প্রভৃতি সমস্ত ভাবই একে-একে বর্ণিত হইতে লাগিল। শেষে সন্ন্যাসীকে বলিলেন, 'গতকল্য তাহার একখানা পত্র পাইয়াছি, পাঠ করিব, শুনিবেন?'

মুচকি হাসিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আমি ওইরূপ প্রণয় বড়ই সুন্দর দেখি। ওইরূপ প্রেমের কথা শুনিতে বড়ই ভালোবাসি। কারণ ওই ক্ষুদ্র প্রেম হইতেই মহান প্রেমের সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শক্তির সহিত প্রেম করিতে-করিতে মহাশক্তির প্রেমের দিকে মানুষ চলিয়া যায়। তুমি পত্র পাঠ করো। আমি শুনিব।'

গোবিন্দলাল একখানি পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন,

প্রাণের প্রিয়তম!

আপনি কি আর কলিকাতায় আসিবেন না? কলিকাতায় আসিতে আর বিলম্ব করিবেন না। ও গো! আর যে পারি না, আর যে সহে না, শীঘ্র আগমন করুন, নতুবা আমায় হুকুম করিলেই যাইতে প্রস্তুত আছি। আশা করি, অতি শীঘ্রই কলিকাতায় আগমন করিবেন। প্রিয়তম, আপনি আসিবেন না, আমিও লিখিয়া-লিখিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আর কী লিখিব, ভাবিয়াও ঠিক করিতে পারিতেছি না, কলমও রাখি-রাখি করিয়া রাখিতে পারিতেছি না—

প্রণাম নিবেদন ইতি।
আপনারই 'নীলিমা'

স। যে এরূপ ভালোবাসে, তাহাকে সুখী করা আবশ্যই কর্তব্য।

গো। আমিও তাহা জানি, সেইজন্যই তো এ-নরকে ঝাঁপ দিয়াছি।

স। এখনও বলিবে নরক?

গোবিন্দলাল বোতলস্থ মদ্য আর একটু পান করিলেন। এবার প্রাণের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া প্রবল বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। সন্ন্যাসীর পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঠাকুর! পাপ যাহা, তাহা চিরকালই পাপ। বেশ্যা-প্রণয়ে মত্ত হইলে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা, যে-অশান্তি আসিয়া থাকে, তাহা আমার ষোলো আনাই আসিয়াছে। জানি, আমি মরিতেছি—তবু মরণের পথ হইতে দূরে যাইতে পারিতেছি না। জানি, আমি মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছি, তবু সরিতে পারি না। সরিবার সাধ্য নাই বলিয়াই সরিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমায় যেন প্রতারণা করিবেন না। আমি বড় অকূলে ভাসিয়াছি। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ-হলাহল পান করিয়াছি। নতুবা আমার

সোনার সংসার ছিল, উত্তম চাকুরি ছিল, হৃদয়ে শান্তি ছিল, গৃহে স্নেহ-ভালবাসা-প্রেম ছিল—কিন্তু নিজেই তাহা নষ্ট করিয়াছি, নিজেই তাহা ধ্বংস করিয়াছি।'

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের পৃষ্ঠদেশে হস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, 'তোমাকে আমি অতুল সুখী করিব। মায়ের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি রাজার মতো ধনসম্পত্তিশালী হইয়া পরম সুখে থাকিবে। তবে আমার অনুরোধ, তৎপর হইয়া কার্য করো—বিলম্বে শ্রেয়-হানি হইবার সম্ভাবনা।'

গো। আমাকে এখন কী করিতে হইবে?

সন্ন্যাসী গোবিন্দলালের কানের কাছে মুখ লইয়া কী বলিলেন, গোবিন্দলাল শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'এমন পারিব না।'

স। শীঘ্র কার্যোদ্ধার হইবে।

'ভাবিয়া দেখি।' এই কথা বলিয়া, গোবিন্দলাল টলিতে-টলিতে উঠিয়া চলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'তবে আমি আবার কাল আসিব।'

গো। হাঁ, আসিবেন।

উভয়েই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

নয়

প্রাগুক্ত ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় গোবিন্দলালদিগের বাড়ি গুরুদেব আসিয়াছেন। গুরুদেবের বয়স প্রায় ষাট বৎসর, বর্ণ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়, নাতি-স্থূল নাতি-ক্ষীণ দেহ। মুখভাব অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। দীর্ঘ বাহু, দীর্ঘ ললাট, দীর্ঘাবয়ব। কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা। গলদেশে ও বাহুদ্বয়ে রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহার নাম হরিহর তর্কপঞ্চানন।

সন্ধ্যার পর তর্কপঞ্চানন মহাশয় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে কুশাসনে উপবেশনপূর্বক মধুর উচ্চ-কণ্ঠে গান গাহিতেছিলেন—

মা আর কবে কী হবে,
পলে-পলে কমছে আয়ু
দু'দিন বাদে ফুরিয়ে যাবে।
অজ্ঞান-জলদ-রাশি
ক্রমে ঢাকছে যে মা জ্ঞানশশী,
তাই বলি মা মুক্তকেশী;
মলে কি গো সাধন হবে?
ভাই-বন্ধু-সুত-দারা,
আপন কাজে রত তারা,
অহং জ্ঞানে হৃদয় ভরা,
ফেলে সবাই পালিয়ে যাবে।
কৃপা করি মা ত্রিনয়না,
সবল থাকতে রসনা,
কালী কালী বলতে দে না।
কালের ভয় সুরেনের যাবে।

তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সুগভীর মধুর কণ্ঠে গানটি গীত হইয়া স্তব্ধতার প্রাণে মিশিয়া গেল। গান থামিয়া গেল, কিন্তু শ্রোতাগণের শ্রবণ-বিবরে তাহার রেশ লাগিয়াই রহিল। অদূরে গোবিন্দলাল হৃদয়ের নিরয়-বহ্নি লইয়া বসিয়াছিলেন—তিনিও গানে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। হৃদয় পাপে-তাপে বড় জ্বলিয়া উঠিলে, একমাত্র ভগবানের নামেই সেখানে শান্তি-বিন্দু পতিত হয়। বিশেষত ভক্তকণ্ঠ-বিনিঃসৃত স্বরে ভগবানের মহিমা কীর্তিত হইল, তাহাতে মুগ্ধ না হয় কে?

গোবিন্দলাল তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের অতি নিকটে আসিয়া উপবেশনপূর্বক কহিলেন, 'গুরুদেব, প্রাণের অশান্তি কীসে নিবারণ হয়, প্রভু?'

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'তাপেই প্রাণে অশান্তি হয়। জগতে তাপ ত্রিবিধ প্রকারের—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। মানব এই ত্রিবিধ তাপাতীত হইলে, হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গো। তাপাতীত হওয়া যায় কীসে?

ত। জ্ঞানার্জন, সাধুসঙ্গ ও ভগবানে নিষ্ঠা-ভক্তি—এই সমুদয়ে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

গো। সমস্তই জানি প্রভু। কিন্তু জানিয়াও কিছু করিতে পারি না। যাহাতে পাপ আছে, তাহাতেই মতি হয় কেন? কেন প্রভু? এ বৈষম্য—কেন প্রভু হৃদয়ের এ-প্রকার অবনতি? জানিয়া-শুনিয়া মানব কেন মজে? জানিয়া-শুনিয়া মানুষ কেন না ভজে? জ্ঞান আছে, জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না কেন?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় মৃদু হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, 'জ্ঞান আছে, যাহা বলিতেছ, তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। এই সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে অতি বিশদভাবেই বিবৃত হইয়াছে। সুরথ নামক রাজা শত্রু কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া বনগমনপূর্বক মেধস নামক মহামুনির দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলেন,

'"প্রভো! আমাকে হৃতধন ও হৃতবল জানিয়া আমার স্ত্রী-পুত্র শত্রুকে ভজনা করিয়াছে, ইহাতে আমি তাহাদিগের চরিত্রাদি উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিয়াছি, অধিকন্তু আমার প্রতি তাহাদিগের যে-প্রেম তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু তথাপি পোড়া মন তাহাদিগের জন্য এত কাঁদে কেন? মনকে বুঝাইতে পারি না কেন?"

'জ্ঞানযোগী মেধস প্রশান্তস্বরে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

'"হে মনুজ-ব্যাঘ্রে! তুমি যে বলিতেছ, আমার বিষয়গোচর জ্ঞান থাকিয়াও কেন আমি অজ্ঞানের মতো মুগ্ধ হইতেছি? কেন পুত্র-কলত্রাদির দুর্ব্যবহার অবগত হইয়াও, তথাপি মমতাগর্তে নিপতিত হইতেছি? তোমার এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃষ্ট নহে। এরূপ জ্ঞান প্রাণীমাত্রেরই বিদ্যমান আছে। আহার- নিদ্রা, সন্তান-স্নেহ এই যে জ্ঞান, ইহা প্রকৃতিজ, ইহা সকলেরই আছে। পতঙ্গাদিও নিজে ক্ষুধায় পীড্যমান হইয়াও সংগৃহীত কণাদিতে সন্তান প্রতিপালন করিয়া থাকে। মনুষ্যগণ তবুও সন্তানের দ্বারা উপকারের আশা করিতে পারে, কিন্তু পশুপক্ষীগণের তাহার কিছুই নাই—তথাপি তাহারা সন্তানাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে। কেন করে, জানো, রাজা? এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, সেই মহামায়ার মহা প্রভাবে সংস্থিত, এবং মুহ্যমান। বুঝিয়াও মানুষে বুঝিতে পারে না, জানিয়াও জানিতে পারে না—সে কেবল সেই মহামায়ার ধাঁধা। সেই মহামায়াই এই চরাচর জগতের সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই পালন করিতেছেন, আবার তিনিই ধ্বংস করিতেছেন। তিনিই অবিদ্যারূপে বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই পরমা বিদ্যা, মুক্তির একমাত্র হেতুভূতা সনাতনী।"

'সুরথ কহিলেন, "প্রভো! সেই দেবী কে? তাঁহার স্বরূপ কী?"

'ঋষি কহিলেন, "তিনি নিত্যা, নিরাধারা—এই জগতই তাঁহার মূর্তি—এই দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত পদার্থই তিনি। তাঁহার সাধনে সমস্ত বন্ধন বিদূরিত হয়।'"

গো। বুঝিলাম না প্রভো! সমস্ত জগৎ তাঁহার মূর্তি, জগতের সমস্তই তিনি। কিন্তু বিজ্ঞানে একথা টিঁকে কই? বিজ্ঞানে নাস্তিকতা আনিয়া দেয় না কি?

তর্কপঞ্চানন মহাশয় হাসিয়া কহিলেন, 'ধিক তাহাদিগকে, যাহারা বিজ্ঞানের উপর এ-কলঙ্কারোপ করে। বিজ্ঞানের নাস্তিকতা! যাহারা বিজ্ঞানের অনুস্বর-বিসর্গও শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাও কি এমন কথা মুখে আনিতে পারে? যদি আস্তিকতার নির্ভর-স্থিতির কোনও দৃঢ় ভিত্তি কিংবা দৃঢ় স্থান থাকে, তবে সে-স্থান বিজ্ঞান। কেন না, বিজ্ঞানে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আকাশের ওই অনন্তকোটি সূর্য অবধি মানুষের পদতলস্থ ধূলিকণাটি পর্যন্ত সমস্তই এক পদার্থ ও নিয়মের একই সূতায় গ্রথিত। আর যে-শক্তি সেই সূতা, অথবা নিয়মের অভ্যন্তরে প্রাণরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাই চৈতন্যময়ী মহাশক্তি। সেই মহাশক্তিই জীবের প্রাণের উপাস্য দেবী।'

গো। বুঝিলাম, কিন্তু আর-একটা সন্দেহ আছে ঠাকুর। এই দেবীকে তুষ্ট্যর্থ মদ্য-মাংস প্রভৃতি পঞ্চ মকারের কী প্রয়োজন?

ত। সাধনা-ভজনার একটা কথা কী জানো, যে যে-বিষয়ে সাধনা করে, সে সেইপ্রকার ফল লাভ করিয়া থাকে। তুমি যদি লেখাপড়া শিখিতে গিয়া অঙ্ক-বিষয়ে খাটিয়া থাকো, তাহাতে যদি তোমার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে, চাকুরি করিবার সময়েও তোমার প্রভু তোমাকে সেই বিভাগেই চাকুরি দিবেন। এইরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞানেও। যাঁহারা রজোগুণে সাধনাসিদ্ধ বিষয়ে প্রয়াসী, তাঁহারা ওই পঞ্চ মকারে সাধনা করিয়া থাকেন? আর যাঁহারা সালোক্য, সাযুজ্য প্রভৃতি লাভে আশান্বিত, তাঁহারা সত্ত্বগুণের সাধনায় নিযুক্ত—তাঁহারা উহা করিবেন কেন?

গো। মদ্য-মাংস বিনা নাকি দেবীর দয়াই হয় না? আমি তন্ত্রের এইরূপ একটি বচন জানিতাম, মনে আসিতেছে না।

ত। হাঁ, তন্ত্রাদিতে ওইরূপ বহুল বচন আছে। যথা—

'মদ্য মাংস বিনা দেবি কুলপূজাং সমারভেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতং তস্য নশ্যতি।'

কিন্তু আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি, প্রয়োজন ভেদে সাধনা, এবং সাধনা ভেদে ফললাভ। তন্ত্রে কুলাচার সাধনার এই প্রকরণ। কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণাদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট মানবগণকে এই কুলাচার সাধনাতে মদ্যপান নিষেধ আছে। শ্রীক্রমে—

'ন দদ্যাৎ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চন।
বামো কামো ব্রাহ্মণো হি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ।'

তবে যদি কোনও ব্রাহ্মণ এই আচারে লিপ্ত হয়েন এবং মদ্য দেওয়ার একান্ত প্রয়োজন হয় তবে সে স্থানে—

'যত্রাসবমাবশ্যন্তু ব্রাহ্মণস্তু বিশেষতঃ।
গুড়ার্দ্রকং তদা দদ্যাত্তাম্রে বারি সৃজেন্মধু।
ইতি কুল চূড়ামণৌ।'

কুল-চূড়ামণি গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, যেখানে ব্রাহ্মণের অবশ্যই মদ্য দিবার প্রয়োজন হইবে, যেখানে গুড় ও আর্দ্রক এবং তাম্রপাত্রে মধু প্রদান করিবে।

ফল কথা—দ্রব্যজাত গুণের ধ্বংস নাই, অতএব সত্ত্বগুণাভিলাষী ব্যক্তিগণ কখনওই মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করিবে না, তাহাতে পুণ্যও নাই। অধিকন্তু মহাপাতক আছে।

গো। আমার উপায় কী হইবে? আমার চিত্ত মহাপাপভারে বড় ভার হইয়া পড়িয়াছে। বুঝি মাকে ডাকিবার ক্ষমতাও আমার বিলুপ্ত হইয়াছে। আমার চিত্তকে কিছুতেই স্থির করিতে পারি না। আমার উপায় কী দেব?

ত। দীর্ঘ প্রণব দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্থির হয়। আর সাধুসঙ্গে শমদমাদি গুণের বৃদ্ধি-সাধন, এই সমুদয় অবলম্বনেই চিত্ত স্থিরতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তুমি সেই সমুদয় অভ্যাস করো, উদ্ধারপ্রাপ্ত হইবে।

গো। দীর্ঘ প্রশবাদি দ্বারা চিত্তবৃত্তি স্থিরতা-প্রাপ্ত হয়—কিন্তু প্রেম বিনা কি চিত্তের আনন্দ জন্মে? ভগবৎ প্রেমলাভের উপায় কী?

ত। কিয়দ্দিবস শাস্ত্রাধ্যয়ন করো। এতদর্থে তুমি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহানির্বাণ-তন্ত্র, বৈশেষিক অথবা সাংখ্যদর্শন, আপাতত পাঠ করো। তাহা হইলেই তোমার জ্ঞান লাভ হইবে। সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবে। শাস্ত্রে আছে, মহাশক্তিই এই নিখিল জগদ্‌যন্ত্রের নিত্য সিদ্ধা, কর্ত্রী ও নিয়ন্ত্রী। তিনি সেইভাবেই মানবের হৃদয়দেশে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং সূত্রধার যেমন কলের পুতুলকে সূতায় টানিয়া ক্রীড়ার পথে চালনা করে, তিনিও সেইরূপে সকলকে প্রকৃতি অথবা স্বভাব-জনিত প্রবৃত্তির সূত্রে সতত আকর্ষণ করিয়া কর্মপথে চালাইতেছেন। মানব তাহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহারই প্রসাদৎ পরমা শান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

মনে হয়, গঙ্গা ও যমুনার কুলুকুলু ধ্বনি বিহঙ্গ-নিচয়ের প্রভাতী বন্দনা ও সায়ং সঙ্গীত ওই কথাগুলিরই আবৃত্তি করিতেছে; এবং ঊর্ধ্বে আকাশের অনন্ত নক্ষত্রমালা এবং অবনীতে মানুষের প্রাণ ও মনুষ্যের অনন্ত তৃষ্ণামমী হৃদয়বৃত্তি ওই কথা কয়টিই ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। আগে জ্ঞানের অন্বেষণ করো—জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ভক্তি ও প্রেম আপনিই পৌঁছিবে।'

গোবিন্দলাল কথাগুলি শুনিতে-শুনিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, সে-রাত্রে গোবিন্দলাল ঘুমাইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রাণে সে-রাত্রিতে কেমন একটা পাপ-পুণ্যের মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়া বড় গোল পাকাইয়া দিয়াছিল।

দশ

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া গোবিন্দলালের হস্তে ডাকপিওন এক পত্র দিয়া গেল। পত্রখানি খামে আঁটা, উপরে লালকালিতে শিরোনাম দেওয়া। পত্রের শিরোনাম দেখিয়াই গোবিন্দলাল বুঝিতে পারিলেন, পত্র কলিকাতা হইতে নীলিমা লিখিয়াছে। তাঁহার চিত্ত আজি বড় ম্রিয়মাণ—পাপের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত। অনেকক্ষণ পত্রখানি হাতে করিয়া রাখিলেন, যে-পত্র পাঠ করিতে ইত্যগ্রে তাঁহার প্রাণের আকুল বাসনা ছিল, আজি যেন সে-পত্র খুলিতেও তাঁহার আর ইচ্ছা করিতেছে না। অনেকক্ষণ পরে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

পাষাণ হৃদয়!

আর কতদিন আসিবেন না? যদি আসিবেন না মনে ছিল, এমন করিয়া মারিলেন কেন? আপনি যদি না আসিতে পারেন, আমাকে অনুমতি করিলে আমি নিকটে পৌঁছিতে পারি। যদি অনেকদিন ধরিয়া মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইয়া রাখেন, আমি থাকিতে পারিব না, আপনি না বলিলেও আপনার ওখানে যাইব। যদি মনে ছিল এমন করিবেন, তবে মজাইতে নাই। ওগো, এখন যে আমার প্রাণ যায়। আপনি কেমন আছেন লিখিবেন। প্রণাম, নিবেদন ইতি।

আপনার 'নীলিমা'

কেমনই কুহক লইয়া জগতে নারীজাতি বিদ্যমান রহিয়াছে, বুঝিতে পারে এমন সাধ্য কাহার! গোবিন্দলালের হৃদয়ে বৈরাগ্যের যে-বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, এই পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা যেন নিভিয়া গেল। গোবিন্দলাল একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে-মনে বলিলেন, 'রাক্ষসি, আমাকে কি এমন করিয়া মজাইতে হয়? পাপে যে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। হৃদয় পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছে। আমি যে এখন অনুতাপ-প্রায়শ্চিত্তে চিত্ত সমর্পণ করিতেছিলাম, পাষাণি! তোর কথা মনে

হইলে যে আমার রৌরবেও ভয় থাকে না। তোর মুখখানি মনে হইলে আমি যে জগৎ-সংসার ভুলিয়া যাই। তোর পত্র পাঠ করিলে, তোর হাতের লেখা দেখিয়া, তোর লেখার মতো তোকে দেখতে ইচ্ছা করে। প্রাণাধিক! একবার এসো, দেখিবে! তোমার হাতের লেখা দেখিতে পাইতেছি—লেখা দেখিয়া তোকে দেখার সাধ হইতেছে, কিন্তু প্রিয়তমে! লেখার মতো কেন দেখা দিতেছ না?'

এই সময় তথায় সেই সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দলাল তাঁহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুর! আমাদের গুরুদেব আসিয়াছেন, তিনি কহিলেন পঞ্চ মকারের সাধনা মোক্ষপ্রদ তো নহেই, অধিকন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য-মাংসাদি দেবীকে প্রদান বা ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, কিন্তু আপনি আমাকে এ কী পাপে মজাইতেছেন!'

স। তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, তুমি বর্তমানে মোক্ষ-প্রয়াসী নহ, ধনৈশ্বর্য ও পার্থিবসুখ-প্রয়াসী। অধিকার ও কর্মভেদে সাধন-প্রণালী ভেদ হইয়া থাকে।

গো। আপনি বলিয়াছেন, এই পথে গেলেই তুমি ইহকালে ধনৈশ্বর্য ও পরকালে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে।

স। এখনও বলিতেছি।

গো। কী প্রকারে তাহা সম্ভব হইবে?

স। দুগ্ধপানে প্রথমে রসনা পরিতৃপ্ত করো—এবং সুপেয় ও সুরস বলিয়াই লোকে পান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা যেমন আপনিই শরীর-পোষণ ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার করিয়া দেয়, তদ্রূপ কুলাচারমতে দেবীর আরাধনা করা হইলে, প্রথমে বাঞ্ছাসিদ্ধ হইয়া পরে শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গো। তবে সকলেই এই পথ আশ্রয় না করে কেন? কেন লোকে ইন্দ্রিয়াদি সংযমময় বৈরাগ্যের পথে যায়?

স। রোগ হইলে চিকিৎসকে এমন ঔষধের ব্যবস্থা করেন, যাহাতে পথ্য, ঔষধি উভয়ই হয়—কিন্তু সাধারণ বৈদ্যে কেবল উপবাস দেওয়াইয়া তীব্র তিক্ত ঔষধিই ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

গো। আমি এখন কী করিব?

স। জানি না তুমি কী করিবে, ইচ্ছা হইলে অদ্য হইতেই এ-পথ পরিত্যাগ করিতে পার।

গো। আপনি বোধহয় রাগ করিতেছেন?

স। রাগ করি নাই। তবে প্রত্যহই তুমি ওই রূপ বলিয়া থাক। সাধনা-ভজনায় ঐকান্তিকতা চাই, তোমার কার্য বেগার দেওয়া।

গো আমার প্রাণে অত্যন্ত জ্বালা হয়।

স। তাই বলিতেছিলাম—যদি তোমার ঐকান্তিকতাই না হয়, এ-পথ পরিত্যাগ করো।

গো। কতদিনে ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারিবে?

স। আসনের জন্য বাকি তিনটা সংগ্রহ করিতে পারিলে, একদিনেই কার্যসিদ্ধি হইবে।

গো। উহা সংগ্রহই যেন আমার পক্ষে বড় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

স। আমি যেরূপ পরামর্শ দিয়াছি, তাহাতে অতি সহজেই হইবে।

গো। হাঁ, সংগ্রহ সহজেই হইতে পারিবে, কিন্তু কার্য শেষ হইলে আমার প্রাণে বড় পাপবহ্নি জ্বলিতে থাকে।

স। দেবীর দয়া হইলে, সমস্ত জ্বালাই জুড়াইয়া যাইবে।

গো। যত শীঘ্র দেবীর দয়া হয়, আমি ধনৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতায় যাইতে পারি, দয়া করিয়া আপনি তাহার উপায় করুন। আমি আমার খেঁদুকে না দেখিয়া আর অধিক দিন থাকিতে পারিতেছি না।

স। আমিও সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। আগামী ২০শে আষাঢ় মঙ্গলবারে অমাবস্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ওই দিনে আমাদের কার্য করিতে হইবে। ইহার মধ্যে তুমি আসনের

অবশিষ্ট দ্রব্য তিনটি সংগ্রহ করিয়া দাও।

গোবিন্দলালের হৃদয়বৃত্তি অন্যমুখী হইয়া পড়িল। পাপের প্রলোভন, পুণ্যের ক্ষীণালোক আবৃত করিয়া দিল। গোবিন্দলালের প্রাণের দেবভাব দূর হইয়া অসুরভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'ঠাকুর! সঙ্গে কারণবারি আছে কি?'

স। হাঁ, আছে।

গো। আমাকে দিন।

সন্ন্যাসী তাহা সযত্নে প্রদান করিলেন। গোবিন্দলাল আকণ্ঠ পান করিলেন। তাঁহার চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

সন্ন্যাসী উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় রক্তিম রাগে দিগন্ত সমুচ্ছ্বাসিত। সবুজ খণ্ডবিখণ্ড মেঘের কোলে সমুজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেখা সকল ভাসিয়া-ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তন্নিম্নে দিগন্তপ্রসারিত শ্যামবর্ণের আকাশ—তন্নিম্নে শ্যাম-সবুজ পত্রদলে শোভিত নিথর নিশ্চল দণ্ডায়মান বৃক্ষরাজি, তন্নিম্নে তটভূমি চুম্বন করিয়া খরস্রোতা ইছামতী নদী প্রবাহিতা, তীরে শ্যাম শোভায় সুশোভিত কাশফুল।

এই সময়ে সেই নদীতীরে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল আকাশপানে চাহিয়া কী ভাবিতেছিলেন। ভাবিতে-ভাবিতে সেখানে বসিয়া পড়িলেন, এমনসময় দূরে একখানা ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া পা'শ জালে মাছ ধরিতে-ধরিতে একটা জেলে গান গাহিতেছিল—

'কৃষ্ণ-কাঙালিনী আমি কৃষ্ণ বিনা রইতে নারি।
করে ধরি বিনয় করি, এনে দে মোর বংশীধারী,
ব'লে গেল যাবার বেলা, ভেবনাকো কুলবালা,
এল না সে চিকণ-কালা, আমার দু'নয়নে বহে বারি।
শয়নে স্বপনে হেরি, আঁখির পলক নাহি নাড়ি।
জীবনের জীবন আমার, তার মরণে আমি মরি।
এবার যদি পাই তারে, করের উপর দিয়া করে,
বাঁধব আমি প্রেমডোরে, রাখব নয়ন প্রহরী।'

অদূরে তীরভূমিস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর হইতে একটা মেটে চিল, সেইদিকে চাহিয়া একান্ত-মনে জেলের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। আর বক তাহার বুকের ধনকে না পাইয়া ওই গানে জেলের উপর বড়ই চটিতেছিল—কেননা, সে ভাবিতেছিল, মানুষে বিরহের গান গাহিয়াই জগতে বিরহের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। গভীর জলে শুশুক ভাসিয়া-ভাসিয়া উঠিয়া জেলেকে উপহাস করিতেছিল—কেননা, সে জানে প্রেম দু'দিনের লাফালাফি বই তো নহে। প্রেম এই আছে এই নাই—যাহার স্থিরতা এতটুকু, তাহার জন্য আবার কান্নাকাটি কেন? আজি তোমার বিরহে আমার বুক ঝলসিয়া যাইতেছে, মুখে অন্ন-জল উঠিতেছে না, চক্ষুর শতধারায় বক্ষ বিপ্লাবিত, তোমাকে পাইলে আমার সকল দুঃখ দূরে যায়, তোমায় কোথায় রাখিব স্থির করিতে পারি না। বুঝি বুকের মধ্যে পুরিলেও বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। দু'দিন বাদে কোথায় সে প্রেম! যদিও দেখিয়া ঘৃণায় বদন ফেরানো পর্যন্ত না-ও হয়—যেন কত অপরিচিত, কেহ যেন কাহারও কেহই নহে। তাই শুশুক উপহাস করিয়া বুঝি বলিতেছে, মানব! মানবের প্রেমে কেন মুগ্ধ হইয়া অত চিৎকার করিতেছ—যে-প্রেম নিত্য, যাহা একবার পাইলে আর পরিত্যাগ করিতে হয় না, যাহার ধারায় রসের শতধারা প্রবাহিত হয়, সেই প্রেম-সুধা পান করো। আমরা তো তাহাই করিয়া থাকি।

প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ সকলে যাহাই বলুক বা করুক—গোবিন্দলালের মনে তাহার কোনও কিছুই স্থানপ্রাপ্ত হইতেছিল না। তিনি সেই সমস্ত সৌন্দর্যরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই প্রণয়িনী নীলিমার মুখখানি ভাবিতেছিলেন। জানি না, জগতে ইহা অপেক্ষা আর কোনও মোহ অধিক আছে কি না। জানি না, এই পার্থিব প্রেম বা মোহ মানবকে স্বর্গের দিকে বা নরকের দিকে লইয়া যায়। যতদূর দেখি, যতদূর শুনি—এক দাম্পত্য প্রেম ভিন্ন মানুষের এই প্রেম বা মোহ নরকের দিকেই অধিকাংশ স্থলে লইয়া গিয়া থাকে। তবু মানব জানিয়াও জানে না, বুঝিয়াও বুঝে না। পাপ পুরুষের বুঝি, মানবগণকে পাপের দিকে লইয়া যাইবার এই প্রেম বা মোহই প্রধান অস্ত্র।

গোবিন্দলাল এক্ষণে এই মোহের ছলনায় নরকের কীট হইতে অধিকতর দূরে গমন করিয়াছেন। জানি না, তাঁহার উদ্ধারের উপায় আছে কি না। একে তো গোবিন্দলাল এই মোহের ছলনে একান্ত মুগ্ধ—তাহাতে আবার সন্ন্যাসীর পাপ-ছলনে একান্ত বিড়ম্বিত। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ মুগ্ধ মানবগণকে ভণ্ড, ধর্মধ্বজী, পাষণ্ডগণ আরও মহাপাতকে লিপ্ত করিয়া দেয়। এই ধর্মধ্বজীগণ ধর্মের মর্ম কিছুই অবগত নহে, শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত, সদ্গুরূপদেশে বঞ্চিত, অথচ উপদেষ্টা, অথচ গুরুপদবীতে আরূঢ়। ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক উভয়ই আছে। ইহারা কত প্রকারে কত নির্মল চরিত্র যুবককে ব্যভিচারে লিপ্ত করিতেছে, কত সতীর সর্বস্ব ধন সতীত্ব-রত্ন বিনষ্ট করিতেছে, কত সোনার সংসার ছারখার করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অখাদ্য খাইয়া, অপেয় পান করিয়া, পরস্ত্রীর সর্বনাশ সাধন করিয়াই ইহাদের ধর্ম। এই স্বেচ্ছাচারের দিনে কেহ ইহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, কেহই কোনও কথা কহেন না—যাহার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনই করিয়া যায়।

গোবিন্দলাল একান্ত মনে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখচ্ছবি ভাবিতেছেন, এমনসময় তথায় একটি অনুমান অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। যে আসিল, তাহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। নাম অমরনাথ।

অমরনাথ আসিয়াই গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'আপনি এখানে কতক্ষণ আসিয়াছেন?'

গো। অধিকক্ষণ নহে, ঘণ্টাখানেক হইবে।

অ। আমার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; আপনার বোধহয় সেজন্য কষ্ট হইয়াছে?

গো। না, আমার কষ্ট কিছুই হয় নাই। তোমার বিলম্ব হইল কেন?

অ। মামা একটা কথা বলিতেছিলেন, তাই শুনিয়া আসিতে এত বিলম্ব।

গো। কী ঠিক করিতেছ?

অ। নিশ্চয়ই যাইব।

গো। তোমার স্ত্রী?

অ। তিনিও যাইবেন।

গো। তাঁহাকে বলিয়াছ?

অ। হাঁ, বলিয়াছি বইকী—এখানকার অপমানে, ঘৃণায় তিনি যাইতে এখনই প্রস্তুত। বিশেষত আপনার নাম শুনিয়া বলিলেন, তিনি সুশিক্ষিত ও উদার-চরিত্র লোক, তিনি আমাদের আশ্রয় দিলে ও অনুগ্রহ করিলে আর ভাবনা কী?

গো। আগামী কল্যই যাওয়া স্থির। কারণ, অদ্যও আমার বন্ধুর পত্র পাইয়াছি, তোমার জন্য যে চাকুরিটি স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, দুই-একদিনের মধ্যে সে-কার্যে নিযুক্ত না হইলে, অন্য লোক নিযুক্ত হইয়া যাইতে পারে।

অ। সেই ভালো, কালই যাওয়া যাইবে।

গো। তোমার মামা আমাদের আত্মীয়। তিনি তোমাদিগকে যে-অবস্থাতেই রাখুন—আমি যে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তাঁহাদিগের নিকট হইতে তফাৎ করিতেছি, ইহা জানিতে

পারিলে, তিনি জন্মের মতো আমার উপর চটিয়া যাইবেন অতএব তোমরা এক কাজ করো —স্বামী-স্ত্রীতে অদ্য রাত্রেই গৃহ হইতে যথাসম্ভব কাপড়চোপড় লইয়া বাবুদের বাগানের মধ্যে যে পুরাতন দালানটি পড়িয়া আছে, তথায় গিয়া থাকো—কাল দিনমানে খাওয়া চলে, এমন কিছু খাওয়ার জিনিসও সঙ্গে লইও। তৎপরে আমি রাত্রে তোমাদিগের সহিত মিলিত হইব এবং আমার বিশ্বাসী জনৈক মাঝির নৌকাতে করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইব, এমন করিলে আমার আর দুর্নামটা হইবে না।

অ। বাগানের সেই স্থলে আমাদিগকে যদি কেহ দেখিতে পায়?

গো। সেখানে কেহ কখনও যায় না।

অ। যদিই যায়?

গো। তাহাতেই বা দোষ কী? তোমরা তো স্বামি-স্ত্রীতে থাকিবে, লোক বলিবে, মামা-মামির বাক্যযন্ত্রণায় পলায়ন করিতেছিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান চাকুরির আশায় মুগ্ধ যুবক, রাক্ষসের কথায় ভুলিয়া গেল। সে বলিল, 'এইরূপ প্রস্তাবে আমার স্ত্রী স্বীকৃত হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই। তবে সে যেরূপ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছে, সহজেই স্বীকৃত হইতে পারিবে।'

গো। তিনি স্বীকৃত হইলেন কি না, তোমরা বাগানে গেলে কি না, জানিতে পারিব কী প্রকারে?

অ। যদি যাওয়া না হয়, আপনাকে আসিয়া বলিয়া যাইব। আর যদি রাত্রি বারোটার মধ্যে আপনার নিকট আমি না আসিলাম, তবে জানিবেন, আমরা সেই বাগানে চলিয়া গিয়াছি।

গো। তবে তাই; মনে থাকে যেন, অন্তত পরশু অফিসের সময়ের পূর্বেই না পৌঁছিলে, এ-কার্য হওয়া দুর্ঘট হইবে।

অ। যে আজ্ঞা। আর-একটি কথা।

গো। কী বলো?

অ। আমি স্ত্রীকে লইয়া গিয়া এখন কোথায় রাখিব?

গো। তাহার আর ভাবনা কী? সেই বন্ধুটিও স্ত্রী-কন্যাদি লইয়া আছেন, আমি বলিয়া দিব, তোমরা তাঁহার বাসায় একটা ঘর লইয়া থাকিও—তৎপরে একমাস চাকুরি করিয়া বেতন পাইলে, যেরূপ সুবিধা বোধ করো, সেইরূপই করিও।

অ। আপনি আমার ভরসা ও বল-বুদ্ধি—যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিব।

অতঃপর অমরনাথ চলিয়া গেল। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ সেখানে বসিয়া কত কী ভাবিতে লাগিলেন, শেষে যখন সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে জগৎ বিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল—আকাশপটে নক্ষত্রমালা উজ্জ্বল কিরণ বিকীর্ণ করিয়া উদ্ভাসিত হইল, শন্‌শন বাতাস প্রবাহিত হইয়া জগতে পরিবর্তনের পারিপাট্যতা বিঘোষণ করিয়া দিল, নদীতীরের দূরভূমিস্থ বাঁশবাগানের মধ্য হইতে শিবাকুল ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া পড়িল, দূরে নদীগর্ভ হইতে পাইল-তোলা নৌকার মধ্যে বসিয়া পশ্চিমদেশীয় দাঁড়ি মাঝিরা—'ও পরদেশী সৈঁইয়া দিনুয়া বহুত গেয়ি বি'—গাহিয়া-গাহিয়া স্বর-লহরি বাতাসের কোলে ঢালিয়া দিতে লাগিল এবং নোঙর-করা নৌকায় বসিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা রন্ধন করিতে-করিতে জলদিন্ধনের নিকট উপুড় হইয়া পড়িয়া তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছিল—তখন গোবিন্দলাল অতি ম্লানমুখে গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে জনমানবশূন্য ক্ষুদ্র পথ বড় ব্যথিত-প্রাণে মূর্ছিতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। পার্শ্ব দিয়া একটা শৃগাল ছুটিয়া একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। গোবিন্দলালের হৃদয়টা ভয়ে বড় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কম্পিত হৃদয়ে বল-সঞ্চার করিয়া দ্রুতপদে বাড়ি চলিয়া গেলেন,—যাইতে-যাইতে গোবিন্দলাল স্পষ্টত অনুভব করিলেন, যেন তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঝুমর-ঝুমর চুল-মাথায় একটি বালিকা ছুটিয়া-ছুটিয়া আসিতেছে। মন্দ-মন্দ নিশ্বাসে, ঘামিতে-ঘামিতে তিনি চলিয়া গেলেন, একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন না।

এগারো

মানুষে কঠিন মাটির উপর ঘর বাঁধিয়া বেশ সুখে এবং নিশ্চিন্ত মনে ঘরকন্না করে—কিন্তু কোথা হইতে একটা আচম্বিতপূর্ব ঝড় আসিয়া ঘর-দ্বার ভাঙিয়া সমভূমি করিয়া দেয়! বাহ্য প্রকৃতিতেই যে শুধু এমন হয়, তাহা নহে। মানবজীবনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

অতি শৈশবকালে অমরনাথ মাতৃপিতৃহীন হইলে, তাহার মাতুল শ্যামাচরণবাবুই তাহাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন এবং এই কার্য তাহার মাতুলানীর চক্ষে কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইলেও, অমরনাথের স্নেহবঞ্চিত দুর্বল শিশুহৃদয় তাহার মাতুলের দীপ্ত স্নেহালোকে ক্ষুদ্র পল্লবের ন্যায় বাড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তিনিই বিশেষ আড়ম্বরে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমরনাথের মাতুল শ্যামাচরণবাবু কলিকাতায় কোনও ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার আর্থিক স্বার্থও এই ব্যাঙ্কের সহিত সম্পূর্ণরূপে বিজড়িত ছিল। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন, সংসারখরচ যাহা লাগিত, তদ্বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা তিনি ওই ব্যাঙ্কেই জমা রাখিয়া দিতেন। আশা ছিল বার্ধক্যে ওই সঞ্চিত অর্থে তিনি সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, কর্মফল হইয়া যায় আর-এক। হঠাৎ একদিন ব্যাঙ্ক ফেল হইয়া শ্যামাচরণবাবুকে পথে বসাইয়া দিল। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি গবেষণা দ্বারা স্থির করিলেন, শ্যামাচরণবাবু যখন ব্যাঙ্কেরই একজন প্রধান কর্মচারী, তখন পূর্ব হইতেই তিনি ফেল হইবার সংবাদ অবশ্যই অবগত ছিলেন—এই সুযোগ ও সুবিধায় তিনি কোন পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া না লইয়াছেন। কিন্তু তাহা হয় নাই, বৈষয়িক বুদ্ধির কুটিলতার অভাবেই হউক, আর অন্যবিধ কোনও কারণেই হউক, শ্যামাচরণবাবু তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঘরে এক পয়সাও আইসে নাই, তাঁহার যাহা কিছু পূর্ব-সঞ্চিত ছিল, ব্যাঙ্কের সহিত তাহাও চিরজীবনের জন্য অন্তর্ধান হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এরূপ বেকার-অবস্থায় রিক্ত-হস্তে থাকা চলে না, কাজেই তিনি গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দেশে চলিয়া আসিলেন—তাঁহার বাড়িও এই স্বরূপ গাঁয়ে। বৎসর-বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যে-গ্রাম তাঁহাকে মহা সমারোহে এবং উচ্ছ্বসিত প্রীতিভরে অভ্যর্থনা করিত, আজ তাঁহার এই দুর্দিনেও সে তাঁহাকে তাহার ছায়াস্নিগ্ধ ক্রোড়ে সস্নেহে গ্রহণ করিল। প্রতিদিন প্রভাতের তরুণ সূর্য তেমনই নবীন রাগে পূর্বদিক উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপ্রান্তে উঠিতে লাগিল, তরুশাখায় বিহঙ্গের তেমনই আনন্দকাকলী, গ্রামপ্রান্তবর্তী ইছামতী নদী তেমনি চঞ্চল স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল এবং নদীতীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখালের দল পূর্ববৎ গরু চরাইয়া গান গাহিয়া ফিরিতেছিল; কিন্তু শ্যামাচরণবাবুর হৃদয়ে ঝটিকার বিরাম ছিল না।

যে-সকল বন্ধুবান্ধবের বিশ্বাস ছিল, তাঁহার হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহারা দুই-চারিদিন তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বাটিতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে ম্লান দীপালোকে বহির্মণ্ডপের এক সতরঞ্চির উপর বসিয়া তাম্রকূট-ধূমের সহিত প্রচুর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল, কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, লোকটা বাস্তবিকই শূন্য হস্তে বসিয়া আছে এবং পরিবার প্রতিপালনের উপায়ান্তর না দেখিয়া বাক্স-চৌকি বিক্রয়পূর্বক মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান করিতেছে, তখন সেই শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং আত্মীয়-প্রতিবেশীগণ মধুহীন মধুচক্রের ন্যায় তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে লাগিল। যাহারা গোপনে তাঁহাকে ভয় করিত, তাহারা এখন প্রকাশ্যে অসম্মান দেখাইতে লাগিল। নবীন ভট্টাচার্য বিজয়া-দশমীর দিন তাঁহার দরজা দিয়া অন্যান্যবার অপেক্ষা বেশি ঘটা করিয়া ঢাক বাজাইয়া গেল। তাঁহার দরজায় আসিয়া ঢাকীদিগের ঢাকে কিঞ্চিৎ জোরে কাঠি দিবার কী আবশ্যকতা ছিল, তাহা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, শ্যামাচরণবাবু অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া নিজের পূর্বকথা ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু বেচারা অমরনাথের বিপদই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। মাতুলের উপর নির্ভর করিয়াই

সে প্রতিদিন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া আসিয়াছে, কোনওদিন কাহারও নিকট মস্তক অবনত করা আবশ্যক বোধ করে নাই এবং সম্মুখে যখন যে-বাধা আসিয়া পড়িয়াছে, বিলাতি জুতার তলায়-তাহাই নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে; এখন ক্ষুদ্রের অপেক্ষাও সামান্য-সামান্য বাধা তাহার পক্ষে অসহ্য এবং দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া পড়িল এবং যে-পর্বতের সুশীতল শৃঙ্গকে অটল মনে করিয়া সে তাহার উপর নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি নিতান্ত উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, সেই পর্বত-শৃঙ্গের পতনের সঙ্গে তাহার উন্নত মস্তক একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

মাতুলানী তাহাকে স্পষ্ট বলিলেন, 'এতদিন আদরে প্রতিপালিত হইয়াছ, যাহা ইচ্ছা খাইয়াছ, পরিয়াছ, এখন আমাদের দিনচলা ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে—আমারই ছেলেমেয়েগুলি কী খাইয়া বাঁচিবে, তাহার ঠিক নাই—কেমন করিয়া আর তোমাদের স্ত্রী-পুরুষকে আমরা প্রতিপালন করিব? বরং তোমার এখন কর্তব্য রোজগার করিয়া আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করা। তাহা যখন পারিবে না, তখন তোমাদের যাহাতে পেট চলে, তাহার উপায় দ্যাখো, আমাদের সংসার পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও।'

অমরনাথ এ-কথায় অত্যন্ত ব্যথিত ও কাতর হইল, সংসারের কোন দিকে কী আছে—কেমন করিয়া কোথায় কী করিতে হয়, সে তাহার কিছুই জানে না। সহসা সে কোথায় যায় কী করে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। মামার নিকট কথা কয়টা একদিন বলিয়া ফেলিল, ছলছল চক্ষুতে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে মাতুলের নিকট বলিয়া ফেলিল, 'মামি-মা, আমাদিগকে আর এ-বাড়িতে রাখিতে একেবারে নারাজ, কিন্তু এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন, এখন সহসা যাইব কোথায়? একটা পথ করিয়া দিয়া পৃথক করিয়া দিলে, সে-পথে যাইতে পারিতাম।'

শ্যামাচরণবাবুও সজল নেত্রে কহিলেন, 'তুমি অবশ্যই এখন সমস্ত বু[illegible] পারো, আমার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। দিনচলা ভার, এ-অবস্থায় তোমার অন্য উপায় দেখাই কর্তব্য। কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণে যে কী বেদনা লাগিতেছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিবে না।'

অ। সকলই বুঝি, কিন্তু একটা পথ করিয়া দিলে, সেই পথে যাইতাম।

শ্যা। আর আমার কোনওই ক্ষমতা নাই। যখন স্বপদে ছিলাম, টাকাকড়ির সংস্থান ছিল, তখন একজনকে বলিয়া দিলেই তোমার মোটা চাকুরি হইত, কিন্তু তখন যাহারা বন্ধু ছিল, এখন তাহারা ফিরিয়াও চাহে না।

অ। তবে আমি কী করি?

শ্যা। নিজে বাহির হইয়া একটা চাকুরির চেষ্টা দ্যাখো।

অ। মেয়ে-মানুষ লইয়া চাকুরির চেষ্টায় বাহির হই কেমন করিয়া?

শ্যা। যতদিন তোমার চাকুরির ঠিক না হয়, ততদিন বধূমাতা এইখানেই থাকুন।

অ। মামি-মা তাহাতেও অসম্মত।

শ্যা। না, তিনি ততদিন থাকিবেন, কেহ আপত্তি করিবে না।

অ। চাকুরির জন্য কোথায় যাই, কোথায় গেলে সুবিধা হইতে পারে?

শ্যা। কলিকাতাতেই যাওয়া কর্তব্য। ভারতের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বহুবিধ কার্যের সুযোগ আছে। আর মফঃস্বলে কার্য করা একরূপ উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া, কলিকাতায় একটা যেমন-তেমন কার্য হাতে করিয়া বসিয়া, তৎপরে ভালো কার্যেরও চেষ্টা দেখিতে পারিবে।

অ। তবে তাহাই হইবে।

শ্যামাচরণবাবু অমরনাথের স্ত্রীকে অমরনাথের চাকুরির সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাড়িতে স্থান দিতে ও আহারাদি প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরানী একেবারে জ্বলিয়া গিয়াছেন, তিনি স্পষ্টত বলিলেন, 'যখন রোজগার করিয়াছ, তখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছ, আমি নিষেধ করি নাই। এখন রোজগার-পত্র নাই, আমার শ্বশুরের দুই বিঘা ধানের জমির আয় হইতে যে-সাতপাল বাজে লোক প্রতিপালন করিতে হইবে, আর আমি কাচ্চাবাচ্চা লইয়া শুকাইয়া মরিব, তাহা হইবে না। অমর উহার স্ত্রী লইয়া চলিয়া যাউক।'

অমরনাথের স্ত্রী মোহিনী সে-কথা শুনিতে পাইয়াছিল; যথাসময়ে সে-কথা সে স্বামীর নিকট বলিয়া দিল।

শুনিয়া অমরনাথ মহা বিপদ গনিল, মোহিনীও বলিল, 'তুমি যেখানে যাইবে, আমাকেও লইয়া চলো।'

অমরনাথ একান্ত বিপদগ্রস্ত হইল। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইবে—এ-জগতে এক মাতুল ভিন্ন অমরনাথ আর কাহাকেও যে জানে না।

ভাবনা-চিন্তায় দশ-পনেরো দিন কাটিয়া গেল। অমরনাথের মাতুলানী দেখিলেন, এত বলা-কহাতেও অমরনাথ তাহার স্ত্রীকে লইয়া চলিয়া গেল না। তখন তিনি তাহাদিগের আহার বন্ধের সংকল্প ও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

একদিন রাত্রে মোহিনী রাঁধিতে গিয়াছে, ব্যঞ্জনাদি রন্ধন সমাপ্ত করিয়া মামিশাশুড়ীর নিকট অন্নপাকের জন্য চাউল চাহিল, মামিশাশুড়ী সামান্য কিছু চাউল আনিয়া দিলে, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এই কয়টি চাউলে হইবে মা?'

তিনি বলিলেন, 'হইলেও হইবে, না-হইলেও হইবে। আজ আর চাউল নাই। ছেলেপুলেগুলির তো হউক।'

মোহিনী সেইগুলিই রাঁধিয়া নামাইল। গৃহিণী ঠাকুরানী ছেলেদের থালা এবং কর্তার থালা দিয়া অন্ন পরিবেশন করিতে বলিলেন। সেই কয়খানি থালায় অন্ন দিয়া দেখিল, হাঁড়িতে আর অল্প চারিটি আছে। বলিল, 'এগুলি কী হইবে?'

গৃ। কর্তার থালাতেই দাও—পাতে দুইটা থাকে, গালে দেব এখন।

মোহিনীর চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অমরনাথের ভাগ্যে আজি আর ভাত নাই। কী করিবে? তাহাই করিয়া হস্তাদি প্রক্ষালনানন্তর তাহাদের বাসের নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া, শয়ন করিয়া রহিল।

অমরনাথ পাড়ার মধ্যে বেড়াইতে গিয়াছিল; রাত্রে প্রায় দশটা উত্তীর্ণ হইলে, সে গৃহে ফিরিল। আসিয়া দেখে, মোহিনী শয্যায় শায়িতা আছে, প্রায়ই শয়ন-ঘরে রাত্রের আহারীয় আনিয়া মোহিনী শয়ন করিয়া থাকিত, অমরনাথ পাড়া হইতে আসিয়া আহারাদি করিত। অমরনাথ আসিয়া মোহিনীকে ডাকিল, মোহিনী উঠিল।

অমরনাথ বলিল, 'ভাত দাও।'

মো। ভাত নাই।

অ। কী আছে?

মো। কিছু নাই।

অ। কিছু নাই—কী? বুঝিতে পারিলাম না।

এবার মোহিনী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে-কাঁদিতে সমস্ত কথা স্বামী-সমীপে নিবেদন করিল। শেষ বলিল, 'আমি হতভাগিনী স্বহস্তে রাঁধিয়া-বাড়িয়া অপরাপরকে খাওয়াইয়া, কেবল তোমায় একমুঠা ভাত দিতে পারিলাম না।' —বলিতে-বলিতে দুই চক্ষুর জলে তাহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

অমরনাথও তাহার আদরের মোহিনীর কিছুই খাওয়া হইল না, এজন্য একান্ত কাতর হইল। তাহারা অনাহারে শয্যায় শুইয়া পড়িল, দুঃখে-কষ্টে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অমরনাথ গভীর চিন্তায় মগ্ন—শুধু এক-একটি উচ্চ দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, ক্ষুদ্র গ্রাম নিঃশব্দ। সকলেই নৈশ আহার শেষ করিয়া, নিরুদ্বেগচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিল, শুধু একটি বাড়ির একটি নির্জন কক্ষে এই শান্তিহীন ব্যথিত দম্পতি বিনিদ্র-রজনী অতিবাহিত করিতেছিল ঃ দুজনের কাহারও মুখ দিয়া একটিও সান্ত্বনার কথা বাহির হইল না।

অমরনাথ এতদিন সহিয়া আসিয়াছে, আর অধিক সহ্য করা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইল;

অর্থোপার্জনের চেষ্টায় বিদেশে যাইবে, স্থির করিল। কিন্তু যায় কাহার সহিত, ভাবিয়া-চিন্তিয়া একবার গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করা শ্রেয় বোধ করিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই অমরনাথ গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিল এবং জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলিকাতায় এখন যাবেন কি?'

গো। কেন?

অ। আমি বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছি—মামা আমাকে তাঁহার সংসার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। এমনকী গতকল্য রাত্রে মামিঠাকুরাণী আমাদের আহার পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

গো। আমাদের! কাহার-কাহার কথা বলিতেছ?

অ। আমার ও আমার স্ত্রীর।

গো। কলিকাতায় আমি কল্যই যাইব।

অ। কল্যই? কল্য কখন?

গো। সম্ভবত রাত্রে। তুমি অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অ। কলিকাতায় গেলে, আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারিবেন?

গো। হ্যাঁ—তোমার কপাল ভালো। একটা চাকুরি খালিই আছে। আমার একটি আত্মীয়ের জন্য একটি বন্ধুকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহার অফিসে চাকুরি খালি ছিল না, বলিয়াছিলেন—খালি হইলে সংবাদ দিব। এখন খালি হইয়াছে, গতকল্য তাই পত্র দিয়াছেন, কিন্তু আমার সে-আত্মীয়টিকে অন্য একটা কাজে ভর্তি করিয়া দিয়াছি। তুমি যদি যাও—এই কার্যই হইতে পারিবে।

অ। আপনার দয়া। বেতন কত?

গো। মাসিক পঁচিশ টাকা।

অমরনাথ মহা আনন্দিত হইলেন। গোবিন্দলাল একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'একটা কথা আছে, তোমার মাতুলানী লোক ভাল নহেন, তাঁহার ইচ্ছা নহে যে, তুমি ভাত করিয়া খাও। তাঁহার একটি ভ্রাতার চাকুরির জন্য তিনি আমাকে কয়দিন ধরিয়া নিতান্ত অনুরোধ করিতেছেন। তাহাকে ফেলিয়া তোমাকে আমি চাকুরি করিয়া দিয়াছি, ইহা যদি জানিতে পারেন, তবে আমাকে তিনি নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিবেন। অতএব যাহাতে তুমি আমার সঙ্গে গিয়াছ, আমি চাকুরি করিয়া দিয়াছি, ইহা জানিতে না পারেন, তাহা করিতে হইবে।'

অ। আমি বড় কষ্টে ও নিরাশ্রয়ে পড়িয়াছি, আমার প্রতিকার করিলে ভগবান আপনার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।

গো। তুমি সন্ধ্যার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

অমরনাথ চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ইছামতী নদীতীরে গোবিন্দলাল ও অমরনাথে যে-সকল কথা হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন।

গোবিন্দলালের সহিত বাবুদের বাগানের কুঠিতে সস্ত্রীক রাত্রি-যাপন করার পরামর্শ স্থির করিয়া অমরনাথ মাতুলালয়ে গমন করিল। নিজ নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে গমন করিয়া মোহিনীকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বলিল। বিদগ্ধ-হৃদয়া মোহিনী স্বামীর পরামর্শে স্বীকৃত হইল। সে অশ্রু-আপ্লুত নয়নে গদগদ-কণ্ঠে কহিল,—'তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার ছায়া, আমিও তোমার সঙ্গে-সঙ্গে যাইব। তুমি যাহা উপায় করিবে, অমৃত-বোধে তাহাই তোমাকে ভোজন করাইয়া, তোমার উচ্ছিষ্ট-ভোজনে কৃত-কৃতার্থ হইব। যেখানে তোমার অপমান—সে রাজপুরী হইলেও, আমার পক্ষে নরক।'

অমরনাথের বক্ষ স্নেহ-প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আজ তাহার মুহূর্তের জন্য মনে হইল, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিক সুখী কেহ নাই। স্বামী স্ত্রীর প্রেম এবং স্ত্রী স্বামীর ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া সেই অন্ধকার নিশীথে সংসার-সমুদ্রের আবর্তের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

উভয়ে একবার নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চাহিল; আকাশ মেঘনির্মুক্ত, নদীর বক্ষ দিয়া

বায়ু-প্রবাহ হুহু স্বরে বহিয়া বৃক্ষশাখা কম্পিত করিতেছিল, অদূরে বনান্তরালে শৃগালের দল একবার চিৎকার করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং বকুল বৃক্ষের আগডালে বসিয়া একটা পেচক বড় কর্কশকণ্ঠে দুই-তিনবার ডাকিয়া-ডাকিয়া থামিয়া পড়িল। টিকটিক করিয়া একটা টিকটিকি দুই-তিনবার ডাকিয়া উঠিল।

ব্যথিত-দম্পতি নৈশ অন্ধকারে মিশিয়া কম্পিতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ক্রমে গ্রামাতিক্রম পূর্বক প্রান্তরে পতিত হইল। চারিদিকে নিস্তব্ধ নৈশান্ধকার—কেবল বায়ুপ্রবাহ শনশন স্বরে প্রবাহিত। মোহিনী বলিল, 'আমার বড় ভয় করিতেছে, এই অন্ধকার রাত্রে আমাদিগকে আর কতদূর যাইতে হইবে?'

অ। আর অধিক দূর নহে। সম্মুখে ওই যে অন্ধকারের জমাটটা দেখিতে পাইতেছ—ওই স্থানেই থাকিব।

মো। ওখানে অত অন্ধকার; আর-কেহ ওখানে নাই?

অ। না; ওখানে আর-কেহই থাকে না।

মো। জনমানব-শূন্য বাগান ও পুরাতন ঘর—সাপ থাকিতে পারে।

অ। আমি দিবাভাগে গিয়া গৃহটি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

মো! আমার বড় ভয় করিতেছে। প্রাণটা যেন কেমন কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে।

অ। আমি সঙ্গে থাকিতে তোমার কোনও ভয় নাই।

কথা কহিতে-কহিতে তাহারা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আম্র, কাঁটাল, কুল, লিচু, নারিকেল, গুবাক প্রভৃতির বৃক্ষের বাগান। বৃক্ষ সমুদয় খুব বড়-বড় হইয়াছে। তাহাদিগের চারাবস্থায় নিম্নস্থ জমি পাইট হইত, এক্ষণে বৃক্ষটি বড় হওয়ায়, তথায় আর বহুদিন হইতে পাইট হয় নাই—তলভূমিতে শেওড়া ভাঁট প্রভৃতি আগাছা সমুদয় জন্মিয়া পথ বন্ধুর করিয়া রাখিয়াছে। বাগানের মধ্যে একটা পুষ্করিণী আছে, কিন্তু সে বহুদিনের সংস্কারাভাবে পানা ও শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে—এই বাগানের বৃক্ষাবলীর গলিতপত্র পচিয়া তাহার জল জীব-মাত্রেরই অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। একটি সামান্য ইষ্টকালয় ছিল—যখন প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন সেই সামান্য দুইটা কুঠরিতেই সুন্দর শোভা ছিল, এখন বহুদিনের অসংস্কৃতাবস্থা বলিয়া বৃদ্ধা মানুষের দন্তের ন্যায় তাহার ইষ্টকরাশির মূল পর্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে—খাঁজে-খাঁজে অশ্বত্থ-চারা জন্মিয়াছে। আর গৃহের মধ্যে চর্মচটিকাকুল একচেটিয়া বসতি আরম্ভ করিয়াছে। ফলকথা, রামহরিবাবু শখ করিয়া যখন এই উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তখন ইহার শোভা-সৌন্দর্য সকলই ছিল, এখন তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তৎপুত্র এখন বাগানের মালিক। ফলভোগ করা ভিন্ন, তিনি ইহার সৌন্দর্যোপভোক্তা নহেন, কারণ তিনি মুনসেফি করেন—আশ্বিন মাসে পূজার সময় মাত্র বৎসরে একবার বাড়ি আসেন, সুতরাং ইহার অন্য কোনওরূপ মেরামত আদি হয় না।

এবম্ভূত দুরধিগম্য ঘনান্ধকারময় বাগানে দম্পতিযুগলে প্রবেশ করিল। চারিদিকে অন্ধকারের দুর্ভেদ্য জমাট, কোনও বৃক্ষে খদ্যোতিকাকুল ঝাঁক বাঁধিয়া ঝিকিমিকি করিতেছে, কোথাও বা এক-একটা উড়িয়া উড়িয়া বাগানের আলোক দর্শনেচ্ছার সাধ পূর্ণ করিয়া দিতেছে। অমরনাথ উদ্যানপ্রান্তে পৌঁছিয়া একটু দাঁড়াইল—পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া হস্তস্থিত লণ্ঠনটা জ্বালিল। সেই আলোকে-পথ দেখিয়া উভয়ে ধীরে-ধীরে বাগানের সেই অসংস্কৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

সংসার-সাগরে ভাসমান বিষণ্ণ-হৃদয় দম্পতি, সেই ভয়াবহ উদ্যান, সেই অন্ধকারময়ী নিশীথে বিনিদ্র বসিয়া প্রেম-ভালবাসা, ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার কথা কহিতে লাগিল।

সহসা বাহির হইতে কে অনুচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, 'অমর আসিয়াছ?'

অ। আজ্ঞা হাঁ, আসিয়াছি, আপনি ঘরে আসুন।

সে আসিল, সে গোবিন্দলাল। গোবিন্দলাল গৃহ-প্রবেশ করিল। গৃহে লণ্ঠনের মৃদু আলো

জ্বলিতেছিল, গোবিন্দলালকে গৃহ-প্রবেশ করিতে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিয়া মোহিনী এককোণে সরিয়া গেল।

অমর বলিল, 'আমাদের বড় ভয় করিতেছিল। আপনি আসাতে একটু সাহস হইল।'

গো। ভগবান ভয় নিবারণ করিলেন।

অ। ভগবান জীবের প্রতি কৃপা করেন, কিন্তু তাহার উপলক্ষ থাকে—আমাদের আশ্রয়ের উপলক্ষ বুঝি আপনি।

গো। তোমরা আসিয়াছ, কেহ জানিতে পারিয়াছে কি?

অ। কেহ না।

গো। পথে কাহারও সহিত সাক্ষাতাদি হয় নাই?

অ। না। যে অন্ধকার! এরূপ পাড়া-গাঁয়ে, এত রাত্রে এ-অন্ধকারে কি জনমানব পথ চলে?

গোবিন্দলাল বলিলেন, অমর! তোমার স্ত্রী কি একটু এই ঘরে একা থাকিতে পারিবেন না, তুমি আমার সঙ্গে দণ্ড-দুইয়ের জন্য মতিমালার কাছে যাইতে।'

অ। মতিমালা কোথায়? গ্রামের মধ্যে কি?

গো। না, এই বাগানের নিচের নদীতে মাছ ধরিতেছে।

অ। তাহার কাছে কেন?

গো। আমি বিবেচনা করিতেছি কি—এইরাত্রেই তোমরা তাহার নৌকায় উঠিয়া চলিয়া যাও, আমি ঠিকানা লিখিয়া আনিয়াছি—কলকাতায় গিয়া আমার বন্ধুর বাসায় উপস্থিত হইও। তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া আনিয়াছি, এই চিঠি দিলে তিনি অপত্যবৎ যত্ন করিয়া তোমাদিগকে রাখিবেন। আমার আর তিনদিন পরে ভিন্ন কলকাতায় যাওয়ার সুযোগ হইতেছে না।

অ। তবে সেই ভালো। আমাদের আর তিনদিন এ-বাগানে অপেক্ষা করা চলিবে না।

গো। আমি বাহিরে যাই, তুমি তোমার স্ত্রীকে একটু এখানে থাকিতে বলো।

গোবিন্দলাল বাহিরে গেলেন। অমরনাথ তাহার স্ত্রীকে সেই ঘরে কিয়ৎক্ষণের জন্য একা থাকিতে অনুরোধ করিলে মোহিনী শিহরিয়া উঠিল—সে বলিল, 'বরং বাড়ি ফিরিয়া গিয়া মামিশাশুড়ীর নিকট লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও শত প্রকারে অপমানিত হইব, তথাপি আমি এই গৃহে একা থাকিতে পারিব না।'

কিন্তু অমরনাথ তাহাকে পুনঃ-পুনঃ থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিল। যখন কিছুতেই মোহিনী তাহার স্বামীকে একা রাখিয়া যাওয়ার পক্ষে নিবৃত্ত করিতে পারিল না, তখন স্পষ্টত বলিল, 'এই সকল কার্য আমার মনে ভালো বলিয়া বোধ হইতেছে না। আমার হৃদয় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে।'

অমরনাথ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া বলিল, 'কোনও ভয় নাই। গোবিন্দলালবাবু পরম ধার্মিক ও সুশিক্ষিত, তুমি নিশ্চিন্ত মনে একটুকু অপেক্ষা করো।'

মোহিনী আর এ-অবস্থায় কী করিবে? অগত্যা স্বীকৃতা হইল। অমরনাথ বাহিরে আসিয়া গোবিন্দলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আলোটি লইয়া গেলে, আমার স্ত্রী ও-ঘরে থাকিতে পারে না, আমরা কী লইয়া যাইব? আপনি কি অন্ধকারেই আসিয়াছেন?'

গো। না, আমি আলো আনিয়াছিলাম—কিন্তু আলো লইয়া এ-বাগানে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া পথে একটা গাছে লণ্ঠনটি ঝুলাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি। অবশ্য তন্মধ্যস্থ আলোটি নিভাইয়াই রাখিয়া আসিয়াছি।

অ। তবে কী প্রকারে যাইব?

গো। ধীরে-ধীরে বাগানের বাহির হইলে বেশ পথ দেখা যাইবে এখন। আর এই তো নদী।

গোবিন্দলাল ও অমরনাথ বাহির হইলেন। মোহিনী ভিতর হইতে গৃহের সেই কীটভুক্ত, ভগ্ন দরজা টানিয়া দিল।

উভয়ে কিয়দ্দূর যাইয়া পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত হইল। অমরনাথ অগ্রে-অগ্রে যাইতেছিল,

আর গোবিন্দলাল পশ্চাৎ-পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, সহসা দুর্বৃত্ত গোবিন্দলাল ভীষণ খড়্গোত্তোলনপূর্বক সজোরে অমরনাথের গলদেশে আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই অমরনাথ ছিন্নকণ্ঠ হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। কোনওপ্রকার চিৎকারাদি কিছুই করিতে পারিল না। ছিন্নকণ্ঠ দেহটি মাটিতে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল মুণ্ডটি কুড়াইয়া লইয়া দ্রুতপদে বাগানের বাহির হইলেন, একটা বৃক্ষান্তরালে সন্ন্যাসী অপেক্ষা করিতেছিলেন, গোবিন্দলাল তদীয় হস্তে মুণ্ডার্পণ করিলেন।

সন্ন্যাসী মুণ্ড গ্রহণ করিয়া, কক্ষস্থ বোতল গোবিন্দলালের হস্তে অর্পণ করিলেন, গোবিন্দলাল বোতলের কানায় মদ্য ঢালিয়া অনেকখানি পান করিলেন। বোতলটি সন্ন্যাসীর হস্তে প্রদান করিয়া, খড়্গ-হস্তে পুনরায় বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গোবিন্দলালের সর্বাঙ্গে রক্ত লাগিয়া গিয়াছে—নরহত্যা ও সুরাপানজনিত চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, মস্তকের কেশরাশি ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—তিনি সেই গৃহ-সন্নিধানে গমনপূর্বক দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন 'ও গো! শীঘ্র দুয়ার খোলো।'

মোহিনী চমকিয়া উঠিল। তাহার স্বামী তাহাকে দুয়ার খুলিতে না বলিয়া, গোবিন্দলাল বলে কেন? সে দুয়ার খুলিতে ইতস্তত করিতে লাগিল। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'শ্রীঘ্র দুয়ার খোলো। বিশেষ দরকার।'

মোহিনী কথা না-কহিয়া পারিল না। বলিল, 'আমার স্বামী কোথায়? তিনি কি আপনার সঙ্গে আসেন নাই?'

গো। হাঁ, তিনিও আসিতেছেন, তুমি শীঘ্র দুয়ার খোলো, বিশেষ দরকার আছে।

মো। আমার বড় ভয় হইতেছে, আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেই আমি দুয়ার খুলিয়া দিব।

গো। আমাকে অবিশ্বাস! এই মুহূর্তে দুয়ার না খুলিলে তোমার স্বামীর সমূহ বিপদ।

মোহিনী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। সে দুয়ার খুলিয়া দিল। গোবিন্দলাল অতি দ্রুত গৃহপ্রবিষ্ট হইলেন। একি দৃশ্য! গোবিন্দলালের এ কী রাক্ষস-মূর্তি! হায় তবে কি মোহিনীর একমাত্র অবলম্বন অমরনাথ নাই?

মোহিনী চিৎকার করিতে যাইতেছিল, গোবিন্দলাল খড়্গোত্তোলন করিলেন। দৃঢ়স্বরে কহিলেন, 'চিৎকার করিয়া ফল নাই, এখানে চিৎকার করিলে, কেহ শুনিতে পাইবে না।'

মোহিনী স্থিরভাবে দাঁড়াইল। তাহার মস্তকের কেশদাম খুলিয়া পৃষ্ঠলম্বিত হইয়া পড়িল। অসাবধানে বক্ষের বসন বক্ষবিচ্যুত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। চক্ষুদ্বয় জলভরে নম্র হইয়া পড়িল, গৃহস্থিত লণ্ঠনের সেই মৃদু আলোকে গোবিন্দলাল দেখিলেন, কামমোহিনী মোহিনী মূর্তি বড় সুন্দর দেখাইতেছে। একবার সে-কঠোর হৃদয়ও যেন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে-ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

মোহিনী বলিল, 'তুমি কি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ? আমার নিকট মিথ্যা বলিও না। আমি অসহায়া রমণী, আমি তোমার কী করিতে পারিব?'

গোবিন্দলাল কহিলেন, 'হ্যাঁ, তাহাকে আমি হত্যা করিয়াছি।'

মো। কেন, তিনি তোমার নিকট কী অপরাধ করিয়াছিলেন? কেন এ-সমস্ত ছলনা করিয়া তাঁহাকে এই ভীষণারণ্যে আনিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিলে?

গো। তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই। আমি তাহা বলিব না।

মো। আমার রূপই কি তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে? তুমি কি আমার রূপে মজিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া আমাকে লাভ করিবার আশা করো?

গো। না।

মো। তবে কী?

গো। আমি বলিব না!

মো। আমাকে এখন কী করিবে?

গো। তোমার স্বামী যে-পথে গিয়াছেন, তোমাকেও সেই পথে পাঠাইব, এই খড়্গে তোমাকে দ্বিখণ্ড করিব।

মো। আমরা বড় কষ্টে তোমার শরণ লইয়াছিলাম, দেবতা ভাবিয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমাদিগকে হত্যা করিয়া কী সুখ পাইলে, কোন অভীষ্ট তোমার পূর্ণ হইবে?

গো। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা বলিব না, তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও।

মো। আমাকে খুন করিও না। আমার নবীন বয়স, নূতন জীবন। তোমার স্ত্রী নাই—আমাকে লইয়া কলিকাতায় চলো, দুই জনে তথায় সুখে বসতি করিব।

গো। আমি আমার খেঁদুকে যেমন দেখি, আর কাহাকেও তেমন দেখি না—খেঁদুর জন্যই আমার সকল কার্য।

গোবিন্দলাল আর বিলম্ব করিলেন না। সজোরে মোহিনীর কণ্ঠদেশে খড়্গাঘাত করিলেন। কিন্তু খড়্গের ধারদিক না লাগিয়া উল্টাইয়া গেল, তাহার পশ্চাৎদিক মোহিনীর কণ্ঠদেশে লাগিয়া পৃষ্ঠদেশে লাগিল, সে আঘাতে মোহিনী মাটিতে পড়িয়া গেল। দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, 'নরাধম। ইহার প্রতিফল অবশ্যই পাইবি। আমি সতী; সতীর রত্ন কাড়িয়া লইলি—নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিলি, বড় আশায় তোর শরণাগত হইয়াছিলাম, ভালোরূপেই শরণাগতের আশ্রয় দিলি। আমি বাঁচিতে চাহি না,—তোর সঙ্গে যে কলকাতায় যাইতে চাহিতেছিলাম, তোকে ভালোবাসিতে নহে—প্রতিহিংসানল নির্বাপিত করিতে। আমি পুলিশে তোকে ধরাইয়া দিতাম। সময় দিলি না—কিন্তু ভগবানকে ডাকিয়া বলিয়া গেলাম; অবশ্যই—।'

গোবিন্দলাল আর সময় দিলেন না, তাঁহার হস্তস্থিত খড়্গ এবার সজোরে সমভাবে মোহিনীর কণ্ঠদেশে আঘাত করিল। দেহ হইতে কণ্ঠ বিচ্ছিন্ন হইল, ত্বরিত গতিতে মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল চলিয়া গেলেন এবং সন্ন্যাসী যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন তথায় গিয়া তাঁহার হস্তে মুণ্ডার্পণ করিলেন। শবদেহ সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। গোবিন্দলাল রক্তাক্ত বস্ত্রাদি সমুদয় নদীতীরে পুঁতিয়া রাখিয়া অন্য বস্ত্র পরিধান-পূর্বক গৃহে গমন করিলেন।

বারো

প্রভাতকালে সন্ন্যাসী অসিয়া গোবিন্দলালের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। গোবিন্দলালের তখন মদ্যের অবসন্নাবস্থা, তাঁহার মনটা তখন তত ভালো ছিল না। সন্ন্যাসী আসিয়া কিঞ্চিৎ কারণবারি প্রদান করিলে, গোবিন্দলাল তাহা পান করিলেন এবং সুরার উত্তেজনাক্রিয়া আরম্ভ হইলে, গোবিন্দলাল সুস্থতানুভব করিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আর-একটি মুণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের সাধনারম্ভ হইতে পারে।'

গো। আজি বোধহয় পুলিশ আসিতে পারে।

স। হাঁ, মানুষে শবদেহ দেখিতে পাইলেই থানায় সংবাদ দিবে:

গো। মনে-মনে এক-একবার ভয়ও হয়, হয়তো-বা ধরা পড়িয়া শেষে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হয়।

স। দেবোদ্দেশে হত্যায় পাপ নাই, সুতরাং ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই।

গো। আমাদের গুরুদেব সেদিন বলিয়াছিলেন, যাহা পাপ—তাহা চিরকাল এবং সর্বত্রই পাপ; চিরদিনই অকল্যাণকর। পাপে কখনইই শান্তি এবং সিদ্ধি নাই।

স। তাঁহারা একদেশদর্শী। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করো। অধিক দিন গিয়াছে, অল্প দিন

বাকি আছে, সত্বরেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।

পাপে যখন মানুষ মজিয়া পড়ে, তখন আর তাহার বিবেক-চৈতন্য আদৌ থাকে না। প্রথমে মজিবার সময়, মধ্যে-মধ্যে যে-অনুতাপ উপস্থিত হয়, ক্রমে-ক্রমে অধিকরূপে মজিয়া বসিলে, ক্রমে-ক্রমে একটু-একটু করিয়া সে আত্মগ্লানিও কমিয়া যায়। গোবিন্দলালেরও তদ্রূপাবস্থা, তাহার হৃদয়ে আগে যে-আত্মগ্লানির বহ্নি মধ্যে-মধ্যে জ্বলিয়া উঠিত, এখন আর তাহা নাই—এখন সে-হৃদয় পাপে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গোবিন্দলাল বলিলেন, 'গ্রামে পুলিশ আসিয়া পড়িলে আর মুণ্ড সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে।'

স। আমি আর তোমার সহিত অধিকতররূপে ঘনিষ্ঠতা রাখিব না, তুমিও একটু সতর্কতাবলম্বন করিয়া থাকিও। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন, সাধনার দিন অতি সন্নিকট। ইহার মধ্যে আর-একটি মুণ্ড চাই।

গো। পুলিশ গ্রাম হইতে না চলিয়া গেলে, কেমন করিয়া কী হইবে?

স। দুই-দুইটা খুন, তাহারা কি শীঘ্র গ্রাম ছাড়িয়া যাইবে?

গো। দুই-তিনদিনের অধিক থাকিবে না।

স। দুই-তিনদিনেই কি তদন্ত পরিসমাপ্ত হইবে?

গো। তাহারা অধিক দিন থাকিয়া আর কী করিবে?

স। খুনের কিনারা করিতে না পারিলে উপরওয়ালারা কী বলিবে? এইরূপ খুন পূর্বে আর একটা হইয়া গিয়াছে।

গো। দারোগার রিপোর্ট যাইলে উপরওয়ালারা যদি সন্তুষ্ট না হয়, অন্য কোনও কর্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবে। কিন্তু বর্তমান তদন্তকারী পুলিশ চলিয়া গেলে, চারি-পাঁচদিন আর বড় কেহ আসিবে না।

স। মায়ের ইচ্ছায় তুমি সিদ্ধিলাভ করো, অদ্য আমি চলিলাম, তোমার সংবাদ পাইলে, আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।

গোবিন্দলাল সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন।

এদিকে প্রভাতে উঠিয়া শ্যামাচরণবাবুর স্ত্রী দেখিলেন, অমরনাথ যে-গৃহে শয়ন করিতেন, সে গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ। গৃহমধ্যে গমন করিয়া দেখিলেন, তাহাদের জিনিসপত্র সমস্তই পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল কয়েকখানি কাপড় ও ব্যাগ নাই। অমরনাথের স্ত্রীরও সন্ধান নাই, তিনি বুঝিলেন, তাহারা তাঁহাদিগকে না বলিয়াই কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মনে-মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহিরে একটু ভাবান্তর দেখাইয়া তাড়াতাড়ি গিয়া সংবাদটা কর্তাকে প্রদান করিলেন। সংবাদটা শুনিয়া কর্তার চক্ষুতে দুই বিন্দু জল দেখা দিল, আর পূর্বাবস্থা ও পূর্বস্মৃতি মনে জাগরূক হইয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল।

এইসময় গ্রামের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, বাবুদের মাঠের বাগানে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষের মুণ্ডহীন মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সকালবেলা সাধু মণ্ডল ও বাবাচরণ ভুঁইয়া লাঙল লইয়া যাইতে প্রথমে দেখিতে পায়, তৎপরে সেখানে অনেক লোক জুটিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য চৌকিদারও সেখানে গিয়া তাহা দেখিয়াছে এবং গ্রামের মাতব্বর প্রজাকে ডাকিয়া সেখানে রাখিয়া সংবাদ দিতে থানায় দৌড়িয়াছে।

শ্যামাচরণবাবুও অতি সত্বর এ-সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মাতৃ-পিতৃহীন তাঁহার পালিত অমরনাথই কি তবে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করিয়াছে? হায়! কেন তিনি গৃহিণীকে ধমক না দিলেন, কেন তাঁহার কষ্টসঞ্চিত অন্ন একমুঠা খাওয়াইয়া তাহাদিগকে গৃহে স্থান না দিলেন!

তিনি তাড়াতাড়ি বাবুদের বাগানে গমন করিলেন। সেখানে তখন লোকে লোকারণ্য। একটা বৃক্ষতলে মুণ্ডহীন পুরুষ-দেহ—আর সেই বাগান-মধ্যস্থ ভগ্নগৃহে মুণ্ডহীন স্ত্রী-দেহ। পুরুষ-দেহটি স্থানে-স্থানে শৃগাল খাইয়া ফেলিয়াছে—স্ত্রী-দেহটি অবিকৃতই আছে।

শ্যামাচরণবাবু প্রথমে ভালো করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কারণ, দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তৎপরে কিয়ৎক্ষণ দেখিয়া তিনি উত্তমরূপেই চিনিতে পারিলেন যে, এ-দুইটি দেহই তাঁহার যত্ন-পালিত অমরনাথ ও অমরনাথের স্ত্রীর, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন!

বেলা প্রায় সার্ধ-প্রহরের সময় কয়েকজন কনেস্টেবল সঙ্গে লইয়া সংবাদদাতা চৌকিদারসহ একটা খুব বড় সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া দারোগাবাবু আসিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন।

দারোগাবাবু আসিয়া প্রথমেই এক হুঙ্কার ছাড়িলেন, বলিলেন, 'গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া খুনের আশকারা করিব।' বলিতে-বলিতে পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া অতি জোরে একটা কাঠি জ্বালিয়া ফেলিলেন। যে-দর্শকেরা দর্শন করিয়াছিল, তাহারা ভাবিল, বুঝি ওই কাঠির আগুন জ্বালিয়াই গ্রাম দগ্ধ করিবে, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তাহাদের ভ্রম নিবারণ হইল। দেখিতে পাইল, সেই আগুনে চুরুট ধরাইয়া একগাল ধোঁয়া দর্শকদিগের মুখের দিকে ছাড়িয়া দিয়া ধীর পদবিক্ষেপে দারোগাবাবু শবদ্বয়সন্নিধানে গমন করিলেন। শবদেহ দেখিয়া বলিলেন, 'এ কাহার-কাহার দেহ? এবং কাহার কাহার দ্বারা ও কী উদ্দেশ্যে খুন করা হইয়াছে?'

কে তাহার উত্তর দিবে? কেবল শ্যামাচরণবাবু বলিলেন, 'মৃতদেহ দুইটি আমারই আত্মীয়ের। পুরুষ-দেহটি আমার ভাগিনেয়ের এবং স্ত্রী-দেহটি আমার ভাগিনেয়-বধূর।'

দারোগাবাবু চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, 'তাহা তো বুঝিলাম, ইহাদের মুণ্ড কোথায়? মুণ্ড চুরি কে করিল এবং খুনই বা কে করিয়াছে? যখন তোমার আত্মীয়, তখন এ-সংবাদ রাখা তোমার একান্তই উচিত।'

শ্যামাচরণবাবু কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, 'আমি যদি সে-সকলই জানিতে পারিতাম, তবে কি আমার স্নেহের ধনেরা ওইরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইত?'

দারোগাবাবু তাঁহার সে-উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ শ্যামাচরণকে লইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন। শেষে অন্যান্য দর্শকগণের উপরও যথেষ্ট অনুগ্রহ ও আপ্যায়িত করিয়া, শেষে শবদেহ দুইটি গ্রামের মধ্যে লইতে আদেশ দিয়া, স্নানাহারজন্য গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন।

দুই-তিনদিন গ্রাম হুলস্থূল করিয়াও দারোগাবাবু খুনের কোনওরূপ কিনারা করিতে না পারিয়া, নিতান্ত হতাশ হইয়া থানায় ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমনসময় সংবাদ পাইলেন, তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী স্বয়ং এই খুনের তদন্তজন্য আগমন করিতেছেন। কারণ, অল্পদিন মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রামে কতকগুলি খুন ও তাহাদের মুণ্ড চুরি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পুলিশের দ্বারা তাহার কোনওরূপ অনুসন্ধান হয় নাই।'

সংবাদ পাইয়া দারোগাবাবুর থানায় যাওয়া স্থগিত হইল। তখন অতি ব্যস্তভাবে তিনি গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী মহাশয়ও আজি দুইদিন হইল, এখানে আগমন করিয়াছেন, কিন্তু খুনের কোনও প্রকার আশকারা করিতে না পারিয়া, তিনিও হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া রাত্রিকালে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মচারী মহাশয় গ্রামের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, মনের ভাব, যদি কেহ গোপনে এই হত্যাদি সম্বন্ধে কোনওপ্রকার আলোচনাদি করে; এবং তাহা শুনিয়া যদি কোনওপ্রকার সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্ত রাত্রি সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়াও তাহার কোনওপ্রকার কিছুই জানিতে বা শুনিতে পাইলেন না। নিশিশেষে তিনি অতি বিষণ্ন মনে বাসায় ফিরিতেছিলেন—সেদিন শুক্লপক্ষের নিশি, দশমী কি একাদশী তিথি হইবে। এইমাত্র শশধর

অস্তগত হইয়াছেন, ভাসা-ভাসা অন্ধকার-রাশি জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে—শনশন করিয়া বাতাস বহিতেছিল। সহসা ইংরেজ কর্মচারী মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

তিনি সভয়ে দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে একটি বালিকা দাঁড়াইয়া। বালিকার সমস্ত কণ্ঠদেশে অস্ত্রাঘাত-চিহ্ন—সে-সমুদয় স্থল হইতে রুধিরধারা বাহির হইতেছে। মস্তকের চুলরাশি বাতাসে দুলিতেছে—বালিকা বলিল, 'আপনি ইংরেজ; আপনি ভূত মানেন?'

কর্মচারী মহাশয় হৃদয়ে বলসঞ্চার করিয়া বলিলেন, 'না।'

বা। আমি ভূত হইয়াছি। আপনি কেন ভূত মানেন না? দেশের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা তো ভূত মানেন। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি আপনার খুনের সন্ধান করিয়া দিতেছি।

ক। ভালো—তাহাই বলো।

বা। গোবিন্দলাল নামক এক ব্রাহ্মণ-যুবক এই গ্রামে বাস করে, সেই এ-সকল খুন করিয়াছে।—প্রথমে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়া মুণ্ড চুরি করে। তাহারপর আমার মায়ের সহিত প্রণয় করিয়া, আমাকে চুরি করিয়া লইয়া কাটিয়া মুণ্ড চুরি করে—আমি ভূত হইয়া মাকে সমস্ত কথা বলি এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট সমুদয় ঘটনা জানাইতে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করি—তিনি নিজ কুকর্ম প্রকাশভয়ে তাহা প্রকাশ করেন না, আমার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে ভীত হইয়া তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে এই দম্পতিকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া চাকুরি দিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া, এই বাগানে আনিয়া হত্যা করিয়া মুণ্ড লইয়া গিয়াছে।

ইংরেজ কর্মচারী মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন, ছায়ামূর্তি সেই সমুদয় কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, 'মুণ্ড লইয়া গোবিন্দলাল কী করিবে?'

বা। সে পঞ্চমুণ্ডী করিয়া তদুপরি কালিদেবীর মূর্তি স্থাপন করিয়া সাধনা করিবে।

ক। তাহাতে কী হয়?

বা। নরক হয়। শয়তানে বোঝে—শয়তানের খেলা।

ক। যে-সকল কথা বলিলে, তাহার সাক্ষীআদি মিলিবে?

বা। বড় না। গোবিন্দলাল খুন করিয়া তাহার বস্ত্রাদি যেখানে যেখানে পুঁতিয়া রাখিয়াছে তাহা আমি বলিয়া দিতেছি।

ছায়ামূর্তি সন্ন্যাসীর কথা এবং যেখানে-যেখানে গোবিন্দলাল বস্ত্রাদি পুঁতিয়া রাখিয়াছেন ও যাহা করিয়াছেন, সমস্ত বলিয়া দিল। তৎপরে বলিল, 'এই মোকদ্দমা জজসাহেবের নিকট উঠিলে, আমি গিয়া সাক্ষ্য দিব, প্রতিহিংসানলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে।'

এই কথা বলিয়া ছায়ামূর্তি শূন্যে মিশিয়া গেল। কর্মচারী মহাশয়, অনেকক্ষণ অবাক হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। সে-রাত্রে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না। বিবিধ প্রকারের ভাবনা-চিন্তায় নিশি প্রভাত হইয়া গেল।

ছায়ামূর্তির কথা পুলিশ কর্মচারী মহাশয়ের প্রথমে প্রহেলিকা বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। কাহার না হয়? প্রহেলিকার উপরে বিশ্বাস করিয়া কার্য করিতে তাহার প্রথমত খুব বেশি সাহস হইল না। কিন্তু তথাপি তিনি অন্য সূত্রাভাবে একান্ত অনিচ্ছায় অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধানের আরম্ভটা হেলায় তাচ্ছিল্য ও অনিচ্ছার ভাবে হইলেও উহার পরিসমাপ্তি যারপরনাই বিস্ময়কর হইয়া পড়িল। ছায়ামূর্তির কথিত সমস্ত স্থানে সমস্তই পাওয়া গেল।

পুলিশ কোম্পানি এইরূপ হত্যার সূত্র পাইয়া গোবিন্দলাল ও সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার করিলেন। পরবর্তী সেশনে তাহাদিগের বিচার হইল। বিচারে গোবিন্দলাল আত্মদোষ স্বীকার করিলেন, কিন্তু সে-প্রকার সাক্ষী মিলিল না। সন্ন্যাসী দোষ স্বীকার করিলেন না, কিন্তু গোবিন্দলাল তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষী, তথাপি সে দোষী—দুই-একটা সামান্য-সামান্য সাক্ষী তাঁহাদিগের বিপক্ষে যাহা মিলিল, তাহারই বলে জজসাহেব সন্ন্যাসীকে পাঁচ বৎসরের জন্য জেলে পাঠাইলেন এবং গোবিন্দলালকে যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা করিলেন।

এই ভয়ঙ্কর হত্যা ও ছায়াদর্শনের এই ভয়াবহ ও অদ্ভুত কাহিনী দেশের লোকের মুখে-মুখে আলোচিত হইতে লাগিল। সমস্ত সংবাদপত্রে লিখিত হইতে লাগিল।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার মানিকতলা স্ট্রিটের রামবাগান একটা প্রসিদ্ধ বেশ্যাপল্লী। এই পল্লীতে নীলিমা নাম্নী একটি বেশ্যা বসতি করে। বেলা দশটা বাজিয়াছে, নীলিমা স্নানাদি করিয়া বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে, এমন সময় একখানা বাঙলা খবরের কাগজ হাতে করিয়া একটি যুবক হাসিতে-হাসিতে তাহার গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী গো! অত হাসি কেন? হাতে ও কীসের কাগজ?'

যিনি আসিলেন, তিনি একজন অ্যাটর্নি, নামটি ঠিক মনে নাই, হরেন্দ্রনাথ, যদুনাথ, শ্যামধন কি জ্ঞানেন্দ্রনাথ হইবে।

তিনি তদ্বৎ হাসিতে-হাসিতে সুর করিয়া বলিলেন, 'সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা। তোমার পীরিতের কানাই যে দ্বীপান্তর চলিল। এই পড়ো।'

নী। কে দ্বীপান্তরে চলিল?

আগন্তুক। তোমার গোবিন্দলাল। এই দ্যাখো।

নী। ওমা সে কী!

সে আসিয়া কাগজখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল

আগন্তুক কাগজখানি খুলিয়া গোবিন্দলালের মোকদ্দমা, ভৌতিক সংবাদ ও খুনের কথা পাঠ করিলেন এবং তাহার দ্বীপান্তরের আজ্ঞাও শুনাইলেন। সে-দ্বীপান্তর যাইবার দিন অদ্য, শুক্রবার, এগারোটার সময় আন্দামানগামী জাহাজ খুলিবে। সেই জাহাজেই গোবিন্দলাল জন্মের মতো ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবেন।

নীলিমা মূর্ছিতা হইয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। আগন্তুক যতটা রহস্য করিয়া নীলিমাকে সংবাদ প্রদান করিলেন, শেষে দেখিলেন, ব্যাপারটা তত সহজ নহে।

অনেকক্ষণ পরে নীলিমার জ্ঞান হইল, সে চাহিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, 'আমার গোবিন।'

নীলিমা উঠিয়া বসিল। তাহার প্রাণের ভিতর অসহ্য যাতনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, 'আপনি আমার বন্ধুর কাজ করুন, জন্মের শেষ একবার গোবিনকে দেখান। এখনও সময় আছে—এখনই একখানা দ্রুতগামী গাড়ি ডাকাই, একবার জাহাজের কাছে চলুন—জন্মের শোধ একবার গোবিনকে দেখিয়া আসি।'

বেহারা তখনই গাড়ি ডাকিয়া আনিল। আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া নীলিমা জাহাজের ঘাটে চলিল। তাহারা যখন ঘাটে উপস্থিত হইল, তখন এগারোটা বাজিয়াছে, জাহাজে হুইসেল দিতেছিল। জাহাজ খুলিবার আর বিলম্ব নাই। গোবিন্দলাল বন্দি-অবস্থায় একধারে দাঁড়াইয়া দীন-নয়নে জন্মের মতো জন্মভূমি দর্শন করিতেছিলেন। সহসা তীরে নীলিমাকে দেখিতে পাইলেন, উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন, 'নীলিমা, জন্মের মতো চলিলাম, আর দেখা হইবে না। হৃদয়ের সদ্বৃত্তি হারাইয়াই এ-পাপ করিয়াছি। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম, কিন্তু চিরদিন ও-মূর্তি এ-হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।'

তারকার মৃত্যু

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়

শীতের রাত।

সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে জোর হাওয়া; ঘরের বাইরে পা দেওয়া অসম্ভব।

ঢং-ঢং করে এগারোটা একটু আগেই বেজে গেল 'জুবিলী স্টুডিয়ো'র পেটা ঘড়িটায়।

গঙ্গারাম রাতে স্টুডিয়োর চারদিকে পাহারা দিত; শীতে কাঁপতে-কাঁপতে দরোয়ান বাহাদুরের ঘরের কাছে এসে বলল, এরকম রাত বাবা হামার বাপ চোদ্দ পুরুযে দেখেনি। মানুষ মারার রাত আছে। তুমি ফটক এখনও খুলে রেখেছ কেন বাহাদুর?

বাহাদুরের অবস্থা তখন তার চেয়ে একচুলও সরেশ ছিল না, বৃষ্টি থেকে কোনওরকমে মাথা বাঁচিয়ে সে নিজের ছোট ঘরটার ছাঁচের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল; ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে বলল, না খুলে রেখে উপায় কী? শেখরবাবু রাত অবদি আজ কাজ করছেন—।

গঙ্গারাম কণ্ঠ বিকৃত করে বলল, তোমরাও যেমন, তেমনিই হইয়েসে ওই শেখরবাবু। হামি যদি 'পিলে' করতুম তো কবে শেখরবাবুর নাকে এক ঘুষি দিয়ে সব তোড় দিতুম—।

বাইরে থেকে একখানা মোটর চারদিকে জল ছিটোতে-ছিটোতে ফটকের ভেতর এসে ঢুকল। গাড়ির ভেতর থেকে সুন্দর একটি নারীর মুখ বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, বাহাদুর নাকি? কেউ আছে এখন স্টুডিয়োতে?

বাহাদুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লম্বা সেলাম ঠুকে উত্তর দিল, শেখরবাবু একা কাম করছেন হুজুর! গাড়ি ভেতরেই নিয়ে যান।

অলকা হেসে উঠে বলল, যা রাত্তির—একলা ঢুকতেও যেন ভয় করে। কিন্তু এমন পোড়া ছাই ভুল! কাল যে নাগরমলবাবুর কাছে নতুন পার্টটা বলতে হবে, তা একেবারে ভুলেই গেছলুম, তাই এমন রাতেও লেপের মায়া ছেড়ে উঠতে হল—।

গাড়ি অন্ধকারের মাঝে স্টুডিয়োর ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল। বাহাদুর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখল, অদূরে ভূতের মতো সুবৃহৎ বাড়িটার দোতলায় উঠে গিয়ে, অলকা তার নিজের ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বেলে দিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাহাদুর তার ঘরে ঢুকে তেলের দাগ-ধরা খাতাখানা টেনে বার করে লিখল :

অলকাদেবী—১১-১৫ মিনিটে স্টুডিয়োতে আসেন।

লিখল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা সন্দেহ তার খচখচ করতে লাগল, অলকা যা বলে গেল, সব সত্যি কি না।

ফটকের বাইরে থেকে আবার ডাক এল, বাহাদুর, দরজাটা খুলে দাও—।

গলা শুনেই বাহাদুর বুঝল, আগন্তুক বিনয় মজুমদার—ডিরেক্টার শেখরনাথের সহকারী। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দরজাটা খুলে ধরতেই, বিনয় একছুটে একেবারে বাহাদুরের ঘরে ঢুকে পড়ল। একটা সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, শীতের দিনে রাতে এমন দুর্যোগ কখনও দেখেছ বাহাদুর? শেখরবাবু কি এখনও কাজ করছেন নাকি?

বোধহয় করছেন। তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখিনি তো হুজুর!

বিনয় অসন্তোষের সঙ্গে বলে উঠল, পাগলার পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল। তাড়াতাড়িতে 'সিনারিও স্ক্রিপ্ট'টা আবার 'সেটে'ই ফেলে গেছি বোধহয়। কাল বই শেষ করবে, কাজেই আজ রাতে খাতা না পেলে আবার তালে তাল দিতে পারব না। দেখি কর্তা কখন আবার শেষ করেন আজ—।

স্টুডিয়োতে খেয়ালী বলে শেখরনাথের দুর্নামের অন্ত ছিল না। কখনও-কখনও সে একলা কাজ করত; তখন কারও, এমনকী তার সহকারীরও সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সিগারেটের বাকি অংশটুকু ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিনয় ঘর থেকে বেরিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে অন্ধকারের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যাবার আগে সে যে তার খাতার দিকে আড়চোখে চেয়ে গেল, সেটা বাহাদুরের দৃষ্টিতে যেমন এড়ায়নি, তেমনই তার গল্পটাও বাহাদুর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারেনি। তবু সে একটু খুশিই হল, কারণ সে জানত বিনয় অলকাকে অত্যন্ত ভালোবাসে। খাতাতে সে আবার লিখল ঃ

বিনয় মজুমদার—১১-৩০ মিনিটে স্টুডিয়োতে আসেন।

আধঘণ্টাটাক পর আর-একবার রোঁদ সেরে গঙ্গারাম তার কাছে এসে হাজির। আসর জমানো ভাবে সে বলল, চাকরি না ছেড়ে উপায় নেই বাহাদুরজি! এমন রাতে সব দানা-পিরেত ঘুমতে বেরোয়। এক্ষুনি হামি একটাকে পিছনের মাঠটায় চলে বেড়াতে দেখলুম।

বাহাদুর বিদ্রূপভরা কণ্ঠে বলল, দানা-পিরেত সব তোমার মাথায় চলাফেরা করছে।

গঙ্গারাম প্রতিবাদ করে বলল, ঠাট্টা নয় বাহাদুর, হামি স্পষ্ট দেখলুম, একজন মেয়েলোক ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিলাসবাবুর ঘরের দিকে চলেছে দেখলুম।

বাহাদুর একটু ইতস্তত করে বলল, অলকাদেবী ছাড়া আজ রাতে স্টুডিয়োতে আর কোনও মেয়েলোক আসেনি, তুমি তা জানো। অলকাদেবীও দেখছি তাঁর ঘরেই বসে খাতা পড়ছেন। ঝড়-জলের রাতে অনেকরকম ভুল দেখে লোকে। তোমারও তাই হয়েছে।

গঙ্গারাম তার কোনও যুক্তিই মানতে রাজি নয়; বলল, আচ্ছা, তাই যদি হবে, তা হলে আমি যখন তিন নম্বর স্টুডিয়োর কাছে গেছি, শেখরবাবু সেখানে কাম করছেন—দেখি না দপ-দপ করে সব আলো বুতে গেল আর অমনি তিন নম্বরের পাশেই যে ফুলগাছের ঝোপ আছে তার আড়াল থেকে একটা পিরেত তিন নম্বরের দিকে ছুটে গেল। ভাবলুম কি, কিসের জন্যে বাতি বুতে গেল দেখি; কিন্তু তিন নম্বরের কাছে পা দোব কি—শেখরবাবু বাঘের মতো চিল্লাতে লাগলেন যেন স্টুডিয়োর ভেতর না ঢুকি। আলো বুতে গেছে বলতে তিনি চিল্লে উঠে বললেন, তাঁর ভি আঁখ আছে। ঘুমকে চলে এলুম।

বাহাদুর হেসে বলল, ডর নেই। পিরেত আর কেউ নয়, বিনয়বাবু। খাতা নিতে তিন নম্বরের কাছে গেছেন।

গঙ্গারাম মাথা নেড়ে বলল, তভ্‌ভি হামি বুঝবে না। অন্দর-বাহার সব বাতি বুতল কেন?

বাহাদুর উত্তর দিল, বাইরের বাতি ঝড়-জলে হয়তো পুড়ে গেছে, আর ঠিক সেই সময় শেখরবাবু ভেতরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছেন।

ঠিক এই সময় ভেতর থেকে একখানা মোটর গেটের কাছে এসে দাঁড়াল। বাহাদুর তাড়াতাড়ি ফটকের দরজা দুটো খুলে ধরে সেলাম ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি চালাচ্ছিল যে, সে প্রাণীটি বলল, চললুম বাহাদুর! এবং তার পাশেই যে লোকটা বসেছিল সে হাত তুলে বলল, এমন দুর্যোগের রাতেও তোমাদের অনেকখানি কষ্ট দিলুম বাহাদুর!

মোটর বাইরে বেরিয়ে যেতে গঙ্গারাম ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলল, তাজ্জব ব্যাপার বাহাদুর! বাদলার রাত বলে কি আমাদের মতো গরীব আদমিদের সঙ্গে উনি বাতচিজ করলেন?

কে?

শেখরবাবুর বাত বলছি। কোনও আদমির সঙ্গে কি উনি বাতচিজ করেন? হামার সঙ্গে কিন্তু বাবা—।

বাহাদুর কোনও জবাব না দিয়ে তার খাতায় লিখল ঃ

শেখরবাবু আর বিলাসবাবু—১২-১৫ মিনিটের সময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান।

গঙ্গারাম আবার বলল, চলিয়ে যাক, একটু চাপিয়ে লেবে। বড় কড়া শীত আছে।

বাহাদুর প্রশ্ন করল, তুমি আলো ঠিক্ করতে যাবে না?

গঙ্গারাম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিল, দেখা যাক।

জুবিলী স্টুডিয়ো তখন সারা ভারতবর্ষে সেরা ছবি প্রস্তুতের জন্যে বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। সুবৃহৎ বাগানের ভেতর চারটি স্টুডিয়ো। স্টুডিয়োর পেছনে অনেকটা জায়গা পড়েছিল প্রাকৃতিক দৃশ্য তোলবার জন্যে। আলোর বন্দোবস্ত থাকলেও সে-স্থানটা সচরাচর অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন।

এই পথ দিয়েই গুদাম-ঘরে নতুন আলোর খোঁজে যাবার সময় অকস্মাৎ গঙ্গারামের কানে ভেসে এল আর্তকণ্ঠ। কোনও স্ত্রীলোক যেন ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। সে-শব্দে দুর্যোগময়ী নিশীথিনী যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল।

গঙ্গারাম স্থাণুর মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

২

পরদিন সকালের দিকে শিবানী তার বুড়ো বাপের সঙ্গে স্টুডিয়োতে এসে যখন পৌঁছল, তখনও কর্তারা কেউ আসেনি।

স্টুডিয়োর একজন ওপরওয়ালার নামে শিবানীর চিঠি ছিল একখানা—যদি কোনও কাজের সন্ধান মেলে।

একজন অল্পবয়স্ক চাকর তাদের নিয়ে স্টুডিয়োর চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখিয়ে বেড়াতে লাগল।

শিবানীর বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। সমস্তটাই তার কাছে যেন ইন্দ্রজালের মতোই মনে হচ্ছিল।

তার বাপ অক্ষয় তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, এখানেই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? চল, ছেলেটি আমাদের একটা 'ডামি' দেখাবে বলছে।

শিবানীর স্বপ্নের ঘোর তখনও কাটেনি; বলল, 'ডামি' কী বাবা?

অক্ষয়ের বিদ্যার যতটা পুঁজিপাটা ছিল, তাই থেকেই বলল, নকল মূর্তি—যেখানে এক্টোররা পেরে ওঠে না, সেখানেই নকল মূর্তি দিয়ে ছবি তোলা হয় কিন্তু তা বলে আসল-নকল চিনতে পারবি না।

বালক-ভৃত্য নুটু তাদের তিন নম্বর স্টুডিয়োর ভেতর নিয়ে এল। দু-নম্বর সেটের পর্দাটা সরাতে-সরাতে বলল, দেখেই যেন চিৎকার করে উঠবেন না। মনে হবে, সত্যিই লোকটা বুঝি মারা গেছে।

সেটের ভেতরটা অর্ধ-অন্ধকারাচ্ছন্ন; তারই মাঝে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়া মূর্তিটার পানে তাকিয়ে শিবানী শিউরে উঠল। বলল, কিন্তু—কিন্তু সারা গা-ময় রক্ত আর দেখতেও—

নুটু গর্বভরে বলল, ওটা রক্ত না, তবে ছবিতে রক্তের মতো দেখাবার জন্যে আমরা ব্যবহার করি।

অক্ষয় আর শিবানী একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

মূর্তিটার মুখে কী সুগভীর আতঙ্কের ছায়া! শুধু আতঙ্ক নয়, দুর্বার বিস্ময় সেই স্থিরদৃষ্টির মাঝে এমনই সুস্পষ্ট হয়ে ফুটেছিল যাতে মনে হয়, নিজের এই ভাগ্যের জন্যে লোকটি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তার দেহের কাছেই পড়েছিল রক্তাক্ত ছোরা একখানা। মূর্তিটির প্রসারিত হাতের মাঝে ছিল আর-একটা ছোরা।

শিবানী অস্ফুটকণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক বলছ নুটু, ও সত্যিকার লোক নয়?

নুটু ঠোঁট উল্টে বলল, আপনি কি বলতে চান, সেটের মধ্যে আমরা মড়া ফেলে রাখি? বিশ্বাস না হয়, আপনি কাছে গিয়ে দেখুন না; দেখবেন মোমের তৈরি।

শিবানী আস্তে-আস্তে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে হাত দিল। ঠিক সেই সময় নুটুও মূর্তিটার পায়ের দিকে সজোরে একটা পদাঘাত করল।

মুহূর্তে দুজনেরই চোখের দৃষ্টি আতঙ্কে যেন ঠিকরে পড়ার মতো হল।

শিবানী ছুটে এসে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল, বাবা, বাবা, সত্যিকার মানুষ গো! ওরে বাপরে! চলো পালাই—

নুটু কিন্তু তাদের আগেই ছুটতে আরম্ভ করল। স্টুডিয়োর বাইরে হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল সে নাগরমল সিঙ্ঘিয়ার বিপুল উদরের ওপর।

নাগরমল তাকে ধরে ফেলে বজ্রকণ্ঠে বলল, আরে রহো-রহো বাচ্চা! ঘোড়দৌড় লাগিয়ে দিয়েস যে? কী হয়েছে?

নুটু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, মরে গেছে। আমি ছুঁয়ে দেখেছি হুজুর, একেবারে মরে গেছে—

নাগরমল জুবিলী স্টুডিয়োর প্রেসিডেন্ট। পদের আভিজাত্যটা তার নেহাৎ কম ছিল না। নুটুর পিঠে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে বলল, আরে আমি বলছি, ঘাবড়াও মৎ বেটা! কী হয়েসে সব খুলে বলো।

নুটু বলে উঠল, মরে গেছে হুজুর, ডামিটা মরে গেছে!

নাগরমল ধমক দিয়ে উঠল, তিন বরষ হামার স্টুডিয়োতে কাম করছ, আর এখন বলছ, ডামি মরে গেছে! যাও, অফিসে গিয়ে মাইনে চুক্তি করে লিয়ে সরে পড়ো।

নুটু চঞ্চল হয়ে বলল, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না হুজুর, আমরা ডামিই মনে করেছিলুম, কিন্তু ছুঁয়ে দেখলুম—সত্যিকার লোক।

নাগরমল ভ্রূ কুঁচকে বলল, তুমি কি বলতে চাও, হামার স্টুডিয়োতে মরা লোক পড়ে আছে?

হ্যাঁ, হুজুর।

নাগরমল নুটুর দুই কাঁধে হাত দুখানা রেখে বলল, খবরদার! তুমি গিয়ে চুপটি করে আমার অফিসে বসে থাকো। বাইরের কোনও লোকের কানে যেন এ-খবর না যায়। আর আমি দুজন লোককে পাঠিয়ে দিচ্ছি তিন নম্বর স্টুডিয়োতে পাহারা দিতে, কাউকে যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় সেখানে। তোমার মুখ থেকে যদি একটা কথা বেরোয়, তা হলে দফা নিকেশ করে দোব মনে থাকে যেন।

৩

নাগরমল তার অফিসে বসেছিল। কত চিন্তাই তার মাথার ভেতর দিয়ে খেলে যাচ্ছিল। হয়তো এই হত্যা উপলক্ষ্য করেই তার এত সাধের ব্যবসার আজ সব শেষ!

দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্রিজনাথ। বেঁটে ছোটখাটো লোকটি। উত্তেজনায়, আবেগে সে থরথর করে কাঁপছিল; বলল, নাগরমল, আমাদের তিন নম্বর স্টুডিয়োতে খুন!

নাগরমল আর ব্রিজনাথ দুজনেই, শোনা যায়, গঙ্গার ধারে কোনও ইটখোলায় কাজ করত। ব্রিজনাথই প্রথম এই স্টুডিয়োতে চাকরি জুটিয়ে আসে। পরে নাগরমলকে তার অধীনে একটা কাজ দিয়ে আনে। নাগরমলের ব্যবসা-বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, তাই ধীরে-ধীরে সে একসময় স্টুডিয়োর সর্বময় কর্তা হয়ে জেঁকে বসে। ব্রিজনাথ আজ তারই অধীনে একজন বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র।

নাগরমল তার দিকে তাকিয়ে বলল, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে এসে বসো, গাধা কোথাকার! মাথায় তোমার একটু যদি ঘিলু থাকে! খুনের কথা তুমি জানলেই বা কী করে?

ব্রিজনাথ যেন আকাশ থেকে পড়ল। অসহ্য বিস্ময়ে বলে উঠল, আমি স্টুডিয়োর প্রোডাকশন ম্যানেজার, আর আমি জানব না? স্টুডিয়োতে কী হয়-না-হয়, সেটা আমার জানা দরকার নয় তুমি মনে করো?

নাগরমল মুখ বিকৃত করে বলল, খুব কাজের লোক তুমি! আর চিৎকার করে কাজ নেই; বাইরে জানাজানি হলেই বুঝতে পারছ তো কী অবস্থা হবে! বাইরের লোকের নানারকম মন্তব্য আর খবরের কাগজওলাদের টিপ্পনী ব্যবসার দফাটিকে একেবারে খেয়ে দেবে!

ব্রিজনাথ বলল, পুলিশে তো একটা খবর দেওয়া দরকার।

নাগরমল টেবিলের ওপর একটা প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করে বলে উঠল, থামো, থামো, তোমার আর মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই, আমি দিয়েছি পুলিশে খবর। পুলিশ না-আসা পর্যন্ত তুমি দেখো কেউ যেন তিন নম্বর স্টুডিয়োতে না ঢোকে বা খুন নিয়ে কোনও হইচই না করে।

ডিরেক্টার শেখরনাথের গাড়ি এসে যখন স্টুডিয়োর ফটকের সামনে দাঁড়াল, দরজা দুটো তখন বন্ধই ছিল। ইলেকট্রিক হর্নটা তীব্র শব্দে বেজে উঠতেই দরোয়ান ছুটে এসে দরজা দুটো খুলে দিয়ে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল, হুজুর যে আজ এত সকালেই আসবেন আশা করিনি!

শেখরনাথ কঠিন কণ্ঠে বলল, আমি যখন আসব, ঠিক তখনই আশা করবে আমায়—এক মিনিট আগেও না, পরেও না।

মোটরখানা ঢুকে সোজা তার বসবার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই শেখরনাথ নেমে ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল ঃ শেখরবাবু নাকি?

শেখরনাথ জবাব দিল, হ্যাঁ মিস্টার সিঙ্ঘিয়া। শুনুন, আজকেই আমার ছবি শেষ করতে চাই—

নাগরমল বলল, তার আগে সোজা একবার আমার অফিসে আসুন।

একটুখানি স্তব্ধ থেকে শেখরনাথ কঠিন কণ্ঠে বলল, আমি আমার অফিসে আছি।

তার মানে শেখরনাথ যেন বলতে চাইল, তুমি প্রেসিডেন্ট হতে পারো; কিন্তু জানো বোধহয়, খুশি না হলে আমি কারও অফিসে যাই না। দরকার হলে তোমরা আমার এখানে স্বচ্ছন্দে আসতে পারো।

কিন্তু আজকে ফল ফলল বিপরীত। নাগরমল গর্জন করে উঠল, আপনি জানেন আমি আমার অফিসেই বসে আছি। আপনাকে এখানে আসতে হবে, খুব জরুরি দরকার। কথাশেষে সে ফোন রেখে দিল।

শেখরনাথ গুম হয়ে হাতের দস্তানাটার দিকে তাকিয়ে রইল। শীতকালে বরাবরই সে সাদা দস্তানা ব্যবহার করত। কোনও জটিল দৃশ্য কীভাবে নেওয়া হবে—ভাবতে-ভাবতে কত দস্তানাই যে ছিঁড়ে ফেলত, তার আর ইয়ত্তা নেই। এটা তার প্রায় অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছল।

একটু পরেই লিকলিকে ছড়িটা তুলে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুকোমল ঘাসে-মোড়া লনটুকু পার হয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োর ভেতর ঢুকতে যাবে, দরজাগোড়ায় বাধা দিল তারই অধীনস্থ একজন প্রপার্টি বয়। বলল, আমার ওপর হুকুম আছে হুজুর, কাউকে স্টুডিয়োর ভেতর ঢুকতে না দেবার—

শেখরনাথের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাতের বেতটা দিয়ে ছেলেটিকে কয়েক ঘা আঘাত

করে গর্জন করে উঠল, সরে দাঁড়া! তোর তো খুব আস্পর্ধা হয়েছে দেখছি—

এই সময় সেটের ভেতর থেকে গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বলল, ছেলেমানুষ পেয়ে খুব তো ঘা-কতক দিলেন। কিন্তু ওর দোষ কী? কর্তার হুকুম, আমরা কিছুতেই ঢুকতে দিতে পারব না।

পাঁসনেটা নাকের ওপর লাগিয়ে শেখরনাথ স্থির দৃষ্টিতে গঙ্গারামের মুখের পানে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আচ্ছা, তোমার ব্যবস্থা আমি করছি।

যে-পথে সে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরল।

এই নিন আপনার কনট্রাক্ট। আজ থেকে আমাদের মধ্যে সব সম্বন্ধ শেষ। শেখরনাথ কারও হুকুমের চাকর নয়।

নাগরমল টেবিলের ওপর থেকে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো জড়ো করতে-করতে বলল, আপনাকে রুপেয়া দিয়ে রেখে, আপনি কি বলতে চান, দরকার-টরকার পড়লে আপনার অফিসে গিয়ে আমাকে মোলাকাৎ করতে হবে?

শেখরনাথ রুদ্ধকণ্ঠে বলল, সেকথা হচ্ছে না. আমাকে আমার সেটে ঢুকতে না দেবার কী মানে? আপনি জানেন, আজকে আমার ছবি শেষ করবার দিন। আর এই ছবির ওপর আপনার কোম্পানির ভাগ্য কতখানি নির্ভর করছে? তা সত্ত্বেও শেখরনাথকে সাধারণ চাকর-বাকরের মতো অপমান করানোর সাহস হল আপনার?

নাগরমল জবাব দিল, হামি তো আপনাকে ফোনে সোজাসুজি আমার অফিসেই আসতে বলেছিলুম। লেকিন আপনি না শুনে সোজা আমার অফিসের সামনে দিয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োর দিকে চলে গেলেন। হামি বেয়ারা পাঠিয়ে আপনাকে বারণ করতে পারতুম, কিন্তু ভাবলুম, একটু শিক্ষা হোক আপনার।

শেখরনাথ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, থামান আপনার লম্বা বক্তৃতা! আপনার এরকম ব্যবহারের কারণটা কি বলবেন আমায়?

নাগরমল টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কারণটা বলবার জন্যেই তো ডেকেছিলুম আপনাকে। আপনার সেটে একটা মড়া পড়ে আছে, যাবেন না ও-সেটে এখন।

শেখরনাথ কী একটা বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে নাগরমল আবার বলে উঠল, পুলিশ না আসা পর্যন্ত ওখানে কেউ আর ঢুকতে পাবে না। আপনিও এ-নিয়ে কোনও চেঁচামেচি করবেন না —এই আমার হুকুম। এখন যেতে পারেন।

নড়বার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে শেখরনাথ সংযত কণ্ঠে বলল, আপনার অ্যাকটিন থামিয়ে ব্যাপারটা আমায় ভালো করে খুলে বলুন; কে মারা গেছে?

বিলাসবাবু—বিলাসবাবু—।

বিলাস! শেখরনাথ চিৎকার করে উঠল, আর-একদিন হলেই যে আমার ছবি শেষ হয়ে যেত! এত বড় অকৃতজ্ঞ সে? দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দিয়ে আমি আমার সমস্ত সাধনা সফল করে তোলবার চেষ্টা করছি—।

নাগরমল ঈষৎ কোমল কণ্ঠে বলল, আমি যতদূর শুনেসি, তাতে বাকিটুকু না নিলেও ছবির কোনও মারাত্মক ক্ষতি হবে না শেখরবাবু।

শেখরনাথ হতাশ কণ্ঠে বলল, এখন আর বাদ না দিয়েই বা উপায় কী? তবে একজনের জন্যে আর সব নষ্ট করতে চাই না আমি। ওই সেটে আর সবায়ের যে সীন আছে, আজই আমি তা শেষ করতে চাই।

নাগরমল একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আজও ওই সেটে কাজ করবেন আপনি?

আপনার কি একটু মায়া-দয়া নেই?

শেখরনাথ বলল, ভাবপ্রবণতাকে আমি কোনওদিনই প্রশ্রয় দিই না। আর তা ছাড়া একজন অভিনেতা মরেছে বলে আমাদের কাজ বন্ধ রাখার কোনও মানেই হয় না। আজ যে জীবিত, কাল সে মৃত—।

নাগরমল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি মানুষ নন। কিন্তু আপনি যতই বলুন, হামি কিছুতেই আজকে ও-সেটে আপনাকে কাজ করতে দেবে না।

আমিও দোব না। —বলে অপরিচিত একজন ঘরে প্রবেশ করল।

৪

একজন অপরিচিত লোককে এভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে নাগরমলের আত্মসম্মানবোধ আবার জেগে উঠল। টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে বলল, না বলে কয়ে আমার অফিসে ঢোকবার অনুমতি কে দিলে আপনাকে? নাম কী আপনার? দরকারই বা কী এখানে?

আগন্তুক একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, আমার নাম প্রতুল—প্রতুল লাহিড়ী। আর দরকার কী—জিগ্যেস যখন করলেন, তখন বলি, আমার কাজে আর দরকারে মেলে কম। মনে করেছিলুম, শীতের দিনে দিব্যি তোফা লেপ-মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকব; কিন্তু ডাক পড়ল আপনার এখানে, নাগরমলবাবু। আর বিলাসবাবুরই বা গত রাতে মারা যাবার কী দরকার পড়েছিল?

নাগরমল দু-হাতে প্রতুলের ডান হাতখানা চেপে ধরে বলে উঠল, ওঃ, আপনি তা হলে গোয়েন্দা অফিস থেকে আসছেন? আমার এখানে ভয়ানক বিপদ—।

প্রতুল মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, শেখরবাবু, এই ব্যাপারে আমাকে বোধহয় একটু সাহায্য করতে পারবেন।

শেখরনাথ ছোট্ট করে বলল, পারলে খুশিই—।

প্রতুল নাগরমলকে বলল, পুলিশ-অফিস থেকে খবর পেয়ে আমার দুজন অনুচর রাখাল আর হরেনকে নিয়ে সোজা আপনার তিন নম্বর স্টুডিয়োতে উপস্থিত হলুম বটে, কিন্তু মশাই, সে কী বিপদ! আপনার প্রোডাকশন ম্যানেজার ব্রিজনাথের 'ব্রিজ' আর কিছুতেই পেরোতে পারি না। এবার দয়া করে বলুন তো, বিলাসবাবুকে সবচেয়ে শেষে কে দেখেছিলেন?

আমি বলতে পারব না। সকালে স্টুডিয়োতে এসে যা আমি শুনিয়েসে—বলে নাগরমল আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনাটা বিবৃত করল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, এ-ছবিতে ডামির কী দরকার, বলুন তো আমায়?

নাগরমল জবাব দিল, মোটামুটি বলছি, বিলাসবাবু এ-ছবিতে দুশমনের পাঠ করিয়েসে। বইয়ের হীরো শেষ সিনে তার বুকে ছোরা মেরে হত্যা কিয়া হ্যায়। সেই ছোরা-মারার একটা ক্লোজ আপ হামাদের লেনে হোগা জরুর, কাজেই ডামির দরকার। তারপর এই দুশমনের আর-একটা দুশমন এসে দেখে না—দুশমন মরে পড়ে আছে। তার একবারটি ইচ্ছে ছিল, সেই দুশমনের ছাতিমে ছোরা বসায়। এ-সিনটা সচরাচর যেমন করে ছাতির পাশে ছোরা চালানো হয়, আমাদের সে রকমভাবে নেবার ইচ্ছে ছিল না। যাতে লোকে ঘটনাটা হুবহু সাঁচ মনে করে, তাই করবার ইচ্ছে ছিল। ডামির ছাতির তলায় একটা পাত্রে এমনভাবে লাল রং রাখা আছে যে, ছোরা বসালেই রংটা রক্তের মতন গা-ময় ছড়িয়ে পড়বে।

প্রতুল হেসে বলল, কিন্তু এটা ভারি আশ্চর্য যে, স্টুডিয়োতে কাজ করেও আপনার ছোকরা চাকর নুটু ডামি আর সত্যি মানুষের তফাৎটা বুঝতে পারল না।

নাগরমল বলল, ওঃ, আপনিও তা হলে ডামি দেখেননি কখনও। দেখলে আপনি সুদ্ধ পহচান নেই সেকতে।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, কাল যে-জায়গায় ডামিটা পড়েছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই বিলাসবাবুর পড়ে-থাকাটা কি আশ্চর্য নয়?

নাগরমল মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলিয়েসেন, আপনি বলতে মনে হচ্ছে—।

প্রতুল জিগ্যেস করল, আপনি কাল বিলাসবাবুকে কখন শেষ দেখেন শেখরবাবু?

শেখরনাথ উত্তর দিল, ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় বারোটা কুড়ি-পঁচিশ হবে।

কীসে আপনার তা মনে হয়?

শেখরনাথ জবাব দিল, বারোটার সময় বিলাস আমাকে বলে যে, বারোটা বেজে গেছে, আর কত রাত পর্যন্ত রিহার্সাল হবে? তারপরই আমরা মোটরে করে বেরিয়ে পড়ি। পথে তার বাড়ির কাছে তাকে নামিয়ে দিই।

প্রতুল ভারি গলায় বলল, বেশ। কাল রিহার্সাল শেষ হবার পরে বিলাসের এখান থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত কী-কী ঘটেছিল, দয়া করে বলবেন কি? সংক্ষেপে বলবার কোনও আবশ্যকতা নেই, বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বলুন।

পাঁসনেটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে মুছতে-মুছতে শেখরনাথ বলল, আমার মনে হয়, আপনি বোধহয় শুনে থাকবেন প্রতুলবাবু যে, বেশিরভাগ অভিনেতার মতোই ডিরেক্টাররা অত্যন্ত খেয়ালী হয়। আমিও অবিশ্যি সে-দুর্নামটা থেকে রেহাই পাইনি। সত্যি কথা বলতে কি, সারা সিনেমা-জগতের মধ্যে সবচেয়ে খেয়ালী যে আমি, এটা আমিও যেমন জানি, আমার সব লোকরাও তেমনি জানে। আমি হয়তো খামকাই লোকদের গালাগালি করি, সময়-সময় যে মেয়েরাও বাদ যায়, এমন নয়। শুনি লোকে বলে, অমি নাকি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর।

নাগরমল শেখরনাথের এই সরল স্বীকারোক্তি শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

শেখরনাথ বলে চলল, বিলাসকে নিয়ে আমি বড়ই মুশকিলে পড়েছিলুম। কাল সারাদিন তার মৃত্যুর দৃশ্যটা নিয়ে আমাকে বড্ড ভুগতে হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, অভিনয়ের সে কিচ্ছুই জানে না। কিন্তু দৈহিক সৌষ্ঠবে সে আদর্শ ভিলেনের উপযোগী। দিনেরবেলা কিছু না করতে পেরে তাকে আমি রাত্রে আসতে বলেছিলুম। ভেবেছিলুম, সারারাত চেষ্টা করেও যদি হয়, সেও ভালো, এই মৃত্যু-দৃশ্যটা আমি এমনভাবে তুলব—যাতে দর্শকদের তাক লেগে যায়।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়নি যে, সারাদিন খেটেখুটে রাত্রে তার অভিনয় করার মতো মানসিক অবস্থা থাকা সম্ভব নয়?

শেখরনাথের মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল। বলল, এই জিনিসটা ঠিক আপনারা বুঝবেন না। অভিনেতারা অভিনয় করতে-করতে যখন ক্লান্তির চরমে এসে পৌঁছয়, ঠিক সেই সময়েই তাদের দ্বারা ভালো অভিনয় হয়। কারণ, তখন তারা নিজেকে ভুলে যায়, নিজের মনের মধ্যে চরিত্রটাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে।

প্রতুল হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ধন্যবাদ, আমি বুঝেছি। এখন কী-কী ঘটেছিল, তাই বলুন দয়া করে।

শেখরনাথ আবার শুরু করল, খেয়ে-দেয়ে আমরা দুজনে ন'টা নাগাদ স্টুডিয়োতে ফিরে এসেছিলুম। বিলাস তার ঘরে গেল মেক আপ করতে, আমি সোজা তিন নম্বরে আমার সেট-এর কাছে হাজির হলুম।

প্রতুল সহসা প্রশ্ন করল, আপনার সেট? একই সময়ে একই স্টেজে কি অনেক সেট থাকতে পারে?

এর উত্তর দিল নাগরমল; ভারিক্কি চালে বলে উঠল, ছবি তৈরি সম্বন্ধে আপনার দেখসি

বিশেষ কিসসু জ্ঞান নেই। আমার স্টুডিয়ো খুব বড়। তার প্রত্যেকটা স্টেজ অন্তত তিন-চার বিঘা মালুম হবে। অনেকগুলো সেট একসঙ্গে তৈরি হয়; রাখা হয় সেগুলোকে ক্যানভাস দিয়ে আড়াল করে।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, কাল সেখানে ক'টা সেট ছিল? মানে, আপনারা যখন রিহার্সাল দিচ্ছিলেন, তখন কতগুলো লোক আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল?

স্টেজ তখন ছিল অন্ধকার—।

অন্ধকার!

শেখরনাথ বলল, তার মানে, আমার সেট-এর কথাই বলছি। সেটা যে একেবারে অন্ধকার ছিল, তা নয়—।

প্রতুল বলে উঠল, আচ্ছা, কীরকম অন্ধকার ছিল, সে-সম্বন্ধে একটু ধারণা—।

সামান্য নীল আলো দিয়ে স্টেজটাকে তখন আলোকিত করা হয়েছিল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, অপর সেটগুলো? সেগুলো কি অন্ধকারেই ছিল?

নাগরমল বলে উঠল, না, না, সারারাতই আলো জ্বলে সেখানে। আলো অবিশ্যি খুব জোরালো নয়। তবে তাতেও সেটের সব জিনিসগুলো বেশ দেখা যায়।

সে-আলোগুলো কাল রাতেও জ্বলেছিল?

হ্যাঁ।

আলোগুলো তদারক করবার জন্যে একজন ইলেকট্রিশিয়ান ছিল নিশ্চয়ই, কী বলেন?

শেখরনাথ বলল, না। কোনও বিশেষ দৃশ্য মহলা দেবার সময় সাধারণত আমি একলাই থাকি। সেইজন্যে অনেকগুলো আলোর স্যুইচ আমি একসঙ্গে করে নিয়েছি—যাতে আমি নিজেই আলোগুলো আয়ত্তে আনতে পারি।

প্রতুল নাগরমলের দিকে তাকাতেই সে ঘাড় নেড়ে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি ওইরকম ভাবেই কাজ করেন বটে!

প্রতুল বলল, তা হলে আমি বুঝতে পারছি, রিহার্সাল দেবার সময় আপনি আর বিলাসবাবু ছাড়া আর কেউ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল না। আর আপনাদের বিঘে তিন-চার জমি নিয়ে ওই যে স্টেজটা—তখন প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, কী বলেন?

শেখরনাথ শান্ত কণ্ঠেই জবাব দিল, হ্যাঁ, তাই। প্রায় বারোটার সময় আমাদের কাজ শেষ হল—সে-কথা তো আগেই বলেছি আপনাকে। গঙ্গারাম তখন স্টুডিয়োর দিকে আসছিল, আমি তার পায়ের শব্দ পেয়ে তাকে আসতে বারণ করে আলোগুলো নিবিয়ে দিলুম।

প্রতুল জিগ্যেস করল, আপনি তাকে আসতে বারণ করলেন কেন?

আগেই তো বলেছি, আমি বড্ড বেশি খেয়ালী। তা ছাড়া গঙ্গারাম বড় বেশি কথা বলে। হয়তো এসেই সে নানান কথা বলতে শুরু করবে, সেইজন্যেই। তারপরই হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে বললে, জানেনই তো, মানুষ যখন খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন কারণে-অকারণেই মেজাজটা তার খাপ্পা হয়ে ওঠে।

প্রতুল যেন সবটাই বুঝে নিয়েছে—এমনই ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, তা হয়। কিন্তু আলো নিবিয়ে দিয়ে, তারপর আপনি কী করলেন?

তারপরই আমরা গাড়িতে উঠে পশ্চিম দিককার গেটটা দিয়ে চললুম। বিলাস এত ক্লান্ত হয়েছিল যে মেকআপ না খুলেই সে আমার সঙ্গে চলেছিল। আমার যতদূর মনে হয়, তার ঘরের আলোটাও সে নিবোয়নি। যখন আমরা গেটটা পার হয়ে গেলুম, তখন আন্দাজ বারোটা পনেরো হবে।

প্রতুল জিগ্যেস করল, বেরোবার সময় গেটে যে-লোক ছিল, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনাদের

কোনও কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। বাহাদুর বোধকরি তখন গেটে ছিল। আমি হয়তো তার সঙ্গে কথা কয়েছিলুম, হয়তো কইনি। সাধারণত চাকর-দরোয়ানদের সঙ্গে আমি খুব কমই কথা বলি। আর তা ছাড়া যে বৃষ্টি, আর যে ঠাণ্ডা কাল রাতে! তবে আমার মনে হয়, বিলাস বোধকরি বাহাদুরকে কিছু বলেছিল।

প্রতুল পুনরায় প্রশ্ন করল, তারপর?

আমি তাকে রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে নামিয়ে দিই, তখন আন্দাজ বারোটা পঁচিশ। ওটুকু যেতে সাধারণত মিনিট দশেকই লাগে, তবে কাল রাতে একটু-আধটু দেরি হওয়া বিচিত্র নয়, রাস্তা যেরকম পিছল হয়ে পড়েছিল—।

আচ্ছা, আপনার সঙ্গে রাস্তায় আর কারও দেখা হয়েছিল, যে প্রমাণ দিতে পারে আপনি যা বলছেন, সত্যি?

আমাকে চেনে—এমন কোনও লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আপনি নিজেই কি গাড়ি চালান?

প্রায়ই। মনে হয়, ওতে যেন আমি একটু বিশ্রাম পাই। তবে অন্যসময় আমার ড্রাইভারই গাড়ি চালায়।

কাল রাতে সে কোথায় ছিল?

অনেক রাত হয়ে গেছল, তাই তাকে ছুটি দিয়েছিলুম।

যখন বাড়ি ফিরলেন আপনি, তখন কেউ জেগেছিল?

না। ড্রাইভার কেবল তখনও আমার আর-একটা গাড়ি পরিষ্কার করছিল। সে ওটা মাঝে-মাঝে নিজেই ব্যবহার করে।

আপনি তাকে কিছু বলেছিলেন?

হ্যাঁ।

তখন ক'টা বাজে?

দুটো বেজে গেছল।

তাহলে আপনিই বোধহয় বিলাসবাবুকে শেষ জীবিত দেখেন? অন্য সাক্ষী না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের তাই বিশ্বাস করতে হবে, কী বলেন?

আমরা যে-হোটেলে খাই, তার ম্যানেজারকে জিগ্যেস করলেই ব্যাপারটা আগাগোড়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কোন হোটেল সেটা?

সিটি রেস্তোরাঁ।

আচ্ছা, মনে করুন, ম্যানেজার যদি ব্যাপারটার কিছু না বলতে পারে?

শেখরনাথ প্রতুলের চোখের দিকে চেয়ে বলল, তা হলে আমাকেই সন্দেহ করবেন। কারণ সাধারণত তাই ঘটে কিনা!

প্রতুল বলে উঠল, তা ছাড়া আর কি।

শেখরনাথ নির্বিকার মুখে বলল, তা হলে আর-একটা সাক্ষী আমাকে খুঁজে বার করতে হবে—

প্রতুল চট করে বলল, সেটা আমার কর্তব্য, আমিই যা-হয় করব।

শেখরনাথ প্রকাণ্ড একটা সিগার ধরিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, আমি কি যেতে পারি এখন? ছবিখানার অনেক কিছুই তো আবার বদলাতে হবে দেখছি।

হ্যাঁ, আমি বুঝেছি; আর একটু। আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন, বিলাসবাবু কীরকম লোক ছিলেন? অবিশ্যি সিনেমা জগতের নয়—কিন্তু আপনার সিগারের ধোঁয়ায় ঘর যে অন্ধকার হয়ে গেল!

শেখরনাথ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, লোকটা যাকে বলে একেবারে ইতর।

প্রতুল মাথা দুলিয়ে বলল, ইতর তো লোকে অনেক রকমেরই হতে পারে। আমি জানতে চাই, তিনি কী ধরনের ইতর ছিলেন?

নাগরমল বলে উঠল, জেনানা লিয়ে বহুৎ হুজ্জৎ করত।

প্রতুল হেসে বলল, ও।

শেখরনাথ স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল, এই তো আপনার সূত্র মিলে গেল। যে-লোক অনেকগুলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে একই সময়ে ঘনিষ্ঠতা করে, তার ওপর হিংসে করবার লোকের অভাব কী? অবিশ্যি আমি এরকম কাউকে যে চিনি, তা বলছি না। তবে তাদেরই একজন হয়তো হত্যা করতে পারে...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, পারে নয়, পেরেছে! অবিশ্যি আমরা যদি এটাকে আত্মহত্যা বলে গ্রহণ না করি। কিন্তু আঘাত দেখে মনে হয়, আত্মহত্যা হতেই পারে না।

শেখরনাথ মাথা নেড়ে বলল, যখন এখনও পর্যন্ত দেখিনি, তখন এ-ব্যাপারে চুপ করে থাকাই ভালো।

কিন্তু ঘটনাটা দেখে আমাদের বিচার করতে হবে। আপনারা দুজনে খুব ভালো করে একটু ভেবে দেখুন না। এমন কাউকে কি আপনারা সন্দেহ করতে পারেন না, যে এরকম কাজ করতে পারে?

নাগরমল সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল, শেখরনাথের মুখে একটা কথাও ফুটল না।

কিছুক্ষণ প্রগাঢ় স্তব্ধতা...।

শেখরনাথ আবার একবার তার পাঁসনেটা মুছে নিয়ে বলল, মাস দশেক আগেকার ঘটনা ভেবে দেখলে বিলাসের মতো লোকের ভাগ্যে এরকম যে ঘটবে, তা অনুমান করে নেওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে দু-একটা সামান্য ঘটনা ছাড়া আমি বিশেষ কিছুই জানি না, আর সেই সামান্য ঘটনাই যে এতবড় হয়ে উঠতে পারে, এও আমি কোনওদিন কল্পনা করিনি।

সে দু-একটা ঘটনা কি আমি শুনতে পাই না?

সে-ও অবশ্য স্ত্রীলোকঘটিত। সেটা হচ্ছে—বাহাদুরের মেয়ে উলকি সম্বন্ধে। তার সঙ্গে অনেকদিন ধরেই এটা-ওটা চলছিল। কিন্তু উলকি বুঝতে পারেনি, বিলাস কী চরিত্রের লোক।

কাল রাতে বাহাদুরই কি গেটে ছিল?

শেখরনাথ জবাব দিল, হ্যাঁ।

নাগরমল বলে উঠল, দেখুন শেখরবাবু, উলকি বাচ্চা লেড়কী। লেকিন ঝুটা নয়, সাচ্চা। ওসব নোংরা কাম সে করতেই পারে না। প্রতুলবাবু, আপনি এসব বাত শুনবেন না।

প্রতুল বলে উঠল, যা হোক, শুনলে ক্ষতি কী?

শেখরনাথ বলে চলল, একদিন সেটের একটা অন্ধকার কোণে হঠাৎ আমি তাদের কথা শুনতে পাই। উলকি বোধহয় বিলাসকে তিরস্কার করছিল। সে যে বিশ্বাসঘাতক, একটা কথাও সে যে ভুলে সত্যি বলে না, এই ছিল উলকির বক্তব্য। মেয়েটা ছোট হলেও তার মধ্যে তেজ আছে।

হঠাৎ নাগরমল চিৎকার করে বলে উঠল, এ যদি হামি আগে জানতুম, তা হলে বিলাসকে লাথ মেরে দূর করে দিতুম, না-হয় উলকিকে সাদী করতে বাধ্য করতুম।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, আর কোনও স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে কিছু জানেন?

ওরকম ব্যাপার প্রতিমাসেই দু-একটা করে ঘটে, তাতে আমরা নতুনত্ব কিছু দেখিনি।

আপনাদের স্টুডিয়ো তা হলে ব্যতিক্রম নয়!

নাগরমলের মুখ লাল হয়ে উঠল; উচ্চকণ্ঠে বলল, এত ইতর!

শেখরনাথ জবাব দিল, দিন কয়েক আগে এই ছবিখানারই নায়িকা অলকার সম্বন্ধে তার

একটু দুর্বলতা দেখা গেছল।

নাগরমল ক্রোধে ফেটে পড়ে বলল, অলকার মতো মেয়ের সম্বন্ধে এমন যা-তা আলোচনা —হামি এখানে বসে কিছুতেই শুনতে পারব না। হামার স্টুডিয়োতে যত মেয়ে আজ পর্যন্ত এসেছে, ওর মতো লছমী একটিও আসেনি।

নাগরমলের কথায় কান না দিয়ে প্রতুল জিগ্যেস করল, অলকাকে নিয়ে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি?

শেখরনাথ জবাব দিল, আমাকে যদি ভুল না বোঝেন, তা হলে বলি। অলকা একটু অন্য ধরনের মেয়ে। তার মধ্যে ফ্লার্ট করবার ঝোঁকটা একটু বেশিমাত্রায় আছে। মুখে তার হাসি লেগে থাকলেও ভেতরে যে দুষ্টুমি একেবারেই নেই, তা নয়। বিলাসের অসম্ভব খ্যাতিই বোধহয় তাকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাহলেও এটা বেড়ালের ইঁদুর নিয়ে খেলা-করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রতুল গম্ভীর ভাবে বলল, হুঁ।

নাগরমল পুনরায় প্রতিবাদ করে উঠল, আপনি প্রতুলবাবুকে বড় ভুল সড়কে নিয়ে চলেছেন শেখরবাবু! হামি তো জানি, বিনয় আর অলকা—দুজন দুজনকে কীরকম ভালোবাসে!

প্রতুল বলল, তা হলে এই বিনয়বাবু তো বিলাসের ওপর একটু...।

তাকে বাধা দিয়ে নাগরমল বলে উঠল, নেই, নেই, কভি নেই! এইসা বাত মৎ বলিয়ে। হাম উন্‌কে আচ্ছা মাফিক পছন্তা, বড় ভালা ছোকরা আছে।

প্রতুল হেসে বলল, আমি তো দেখছি, স্টুডিয়োর সব লোকেরই ওপর আপনার খুব ভালো ধারণা। তাহলে কেউই এ-কাজ করতে পারে না। কিন্তু একজন তো করেছে? আমি তা বলে কারও ওপর সন্দেহ করছি না। শুধু আলোচনা করছি—এই মাত্র। আপনাদের মতামতটা জানব বলেই আমি এখনও সেটে গিয়ে মৃতদেহটা দেখিনি। আচ্ছা শেখরবাবু, আপনার সঙ্গে বিলাসবাবুর কোনওদিন কোনও গোলমাল হয়েছিল? মানে কোনও ঝগড়াঝাটি?

শেখরনাথ জবাব দিল, আপনার কথার উত্তরে আমাকে 'হ্যাঁ'ও বলতে হয়, 'না'ও বলতে হয়। একসঙ্গে কাজ করতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন খুঁটিনাটি বেধে থাকে, তেমন দু-একবার হয়েছে বইকী। কিন্তু সাধারণত যেমন হয়, তারচেয়ে বেশি কিছু কোনওদিনই হয়নি।

যথা?

বেশির ভাগ অভিনেতাই ছবি তোলবার সময় চরিত্র, দৃশ্য, ভাবভঙ্গি সব ভুলে যায়। মনে তাদের জাগতে থাকে শুধু ক্যামেরাভীতি। দর্শকের তীব্র সমালোচনা আর কোন কোণ থেকে নিলে মুখখানা তাদের নিখুঁত আসবে—এই নিয়ে দিনের মধ্যে অন্তত একশোবার তাদের বকতে হয়।

তাহলে ছবি তোলবার সময় অভিনেতাদের আপনি স্বাধীনভাবে অভিনয় করতে দেন না?

শেখরনাথ মৃদু হাসল; বলল, যুদ্ধের সময় সৈনিকরা যদি সেনাপতির কথা না শোনে, তা হলে যুদ্ধের ফল যেরকম হয়, ডিরেক্টারের কথা না শুনলে ছবির দুর্দশাও সেইরকম দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, বুঝেছি। তা হলে বিলাসের ওপর ব্যক্তিগত আক্রোশ আপনার কোনওদিন ছিল না?

না, না, কোনওদিনই না।

প্রতুল একটু ভেবে নিয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, বিলাসবাবু আবার কোন সময় স্টুডিয়োতে ফিরে আসেন? আর কেনই বা এসেছিলেন?

তা আমি বলতে পারি না। তবে দরোয়ানের কাছেই রেকর্ড পাবেন।

প্রতুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আপনারা যে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে এইসব আলোচনা করলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ।

শেখরনাথ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না, ধন্যবাদ দেবার এতে কী আছে? এসব কথা তো আমাদের বলাই উচিত।

নমস্কার জানিয়ে শেখরনাথ বিদায় দিল।

নাগরমল প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, কোনও কথা বলবার সুযোগ খুঁজে পাচ্ছিল না।

প্রতুল হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা, শেখরবাবু আজ যেরকম ভদ্রভাবে কথা বললেন, এরকম ভাবে বোধকরি উনি প্রায়ই বলেন না, নয়?

নাগরমল জবাব দিলে, এরকম ভদ্র ব্যবহার উনি যে করতে জানেন, এর আগে হামি জানত না।

সিগারেট একটা ধরিয়ে নিয়ে প্রতুল বলল, উনি নিজে একজন খুব ভালো অভিনেতা বোধহয়? আচ্ছা, আজকে অন্যদিনকার মতো মেজাজ থাকলে উনি আমার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতেন?

ওঁর মেজাজ অনেকটা বোমার মতো। কখন কী কারণে যে ফেটে পড়ে, বলা কঠিন। অন্যদিন হয়তো এই সমস্ত জিগ্যেস করলে অপমানিত মনে করে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু আজ আপনি তাঁকে একটু সন্দেহ করেছিলেন কিনা—তাই বুঝতে পেরে উনি এমন ব্যবহার করেসেন।

হতে পারে। কিন্তু তা হলেও আমি যখন সেটটা দেখতে যাব, তখন উনিও কি আমার সঙ্গে যাবেন না?

তা যাবেন বইকি। তবে হামি ওঁকে সেটে ঢুকতে বারণ করিয়ে দিয়েসে...আচ্ছা, হামি সেক্রেটারিকে দিয়ে বলে পাঠাচ্চি জরুর।

৫

রহস্যময় চির-অজ্ঞাত রাজ্য!

তার বুক থেকে ফুটে ওঠে কত বিচিত্র কাহিনী। স্বপন-দেশের কত রাজপুত্র দানবপুরীর মাঝে বন্দিনী রাজকুমারী কেশবতীকে উদ্ধার করে নিয়ে পক্ষীরাজ করে উড়ে চলে; সওদাগর পুরন্দরের বাণিজ্যপোত অথই সাগরজলে পড়ে ঝড়ের মতো দুলতে থাকে; পাহাড়ের বুক-চেরা ঝরনার ধারে নেমে আসে জলবালার দল গীতকণ্ঠে...।

দর্শকের আসনে বসে নর-নারীর দল বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে পর্দার দিকে, চোখে ঘনিয়ে ওঠে রঙিন নেশা, দেহ রোমাঞ্চিত হয়, মন ভেসে যায় এই মাটির পৃথিবী ছেড়ে কোন সুদূর কল্পলোকে।

প্রতুল নাগরমলের সঙ্গে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

নাগরমল গর্বস্ফীত কণ্ঠে বলল, কী দেখসেন প্রতুলবাবু? আমার আর-একজন ডিরেক্টার রাজেশ্বর পরসাদ তার হিন্দি ছবি তুলছে। এ-ছবি তোলবার ব্যবসায় খালি জলের মতো রুপেয়া খরচ করিয়ে যাও। ব্যস, কুচ্ছু মিলল তো ভালো, না মিলল তো লাখ রুপেয়া জল হল...

স্টুডিয়ো-প্রাঙ্গণে ছবির একটা দৃশ্য তোলা হচ্ছিল—পল্লীপথ।

প্রতুল একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়েছিল। কৃত্রিম হলেও এমন সুন্দর পল্লীর আবহাওয়াটি সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, প্রতুলের মনে হল, ভারতের দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ালে এমন বহু পল্লী নজরে পড়বে।

নাগরমল তার একখানা হাত ধরে টান দিয়ে বলল, চলুন, আমরা ওপাশে যাই, নইলে রাজেশ্বর পরসাদের ছবিতে হামরা দাগী হয়ে যেতে পারি।

প্রতুল চলতে-চলতে প্রশ্ন করল, আচ্ছা, এই যে এত লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা সবাই কি মাইনে করা লোক?

না। এদের আমরা বলি একস্ট্রা। দিনভোর কাম করবে, দু-এক রুপেয়া লিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আপনার লোকদের একটু বলিয়ে দেবেন প্রতুলবাবু, তারা যেন কাউকে না বলে যে, তিন নম্বরমে খুন হইয়েসে; আর স্টুডিয়োর ভেতর খুনি ঘোরাফেরা করসে; তা হলে একদম ঘড়বড় হইয়ে যাবে।

প্রতুল হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এই নিয়ে আপনি তিনবার আমাকে এই কথা বললেন, নাগরমলবাবু!

কী কথা?

যে খুনি স্টুডিয়োর ভেতর ঘোরাফেরা করছে। আপনি কি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছেন?

নাগরমল তার চকিত দৃষ্টি দুটো প্রতুলের মুখের পানে ধরে বলল, আরে রাম, রাম, একী বাত বলসেন!

প্রতুল বলল, তা হলে ও-কথাটা বারবার আপনার মনে আসছে কেন?

নাগরমল মাথা চুলকে আমতা-আমতা করে বলল, কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না; এমনি খেয়াল মাফিকই বলে থাকব। শির আমার একদম গোলমাল হয়ে গেছে।

প্রতুল ঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, বারোটা বেজে গেছে, এতক্ষণ বোধহয় তিন নম্বর স্টুডিয়োতে করোনারের তদন্ত শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। স্লিপে আমি শেখরনাথকে স'বারোটার সময় তিন নম্বরে আসতে লিখে দিয়েছি।

নাগরমল বলল, ঠিক বাত! চলুন, চলুন।

ঘুরতে-ঘুরতে খানিকটা এসেই প্রতুল বলল, ঘুরে গিয়ে আমরা ফটক দিয়ে ঢুকি।

স্টুডিয়োর সম্মুখভাগটা সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

প্রতুল জিগ্যেস করল, স্টুডিয়োর চারদিকটাই কি এইরকম পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আছে?

মাথা নেড়ে নাগরমল জবাব দিল, না, দরকার হয় না। সামনে পাঁচিল, দু-দিকে আমাদের অফিস, মেক-আপ রুম, লেবরেটারি—এই সব আছে, আর পিছনের দিকটা কাঁটার তার দিয়ে ঘেরা, তার সঙ্গে ইলেকট্রিক চার্জ করা আছে; নইলে বাইরের লোক ভেতরে ঢোকবার জন্যে ভারি জুলুম করে।

ফটকে ঢুকতে-ঢুকতে প্রতুল বলল, এখানে আলোর বন্দোবস্ত নেই কেন?

ঠিক ভেতরেই খুব জোরালো একটা আলো আছে বলেই আর এখানে দেবার দরকার মনে হয় না।

তারা ভেতরে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে দরোয়ান তার ঘরে ঢুকে খাতায় তাদের প্রবেশের সময়টা টুকে রাখল।

প্রতুল সেটা লক্ষ করে বলল, বাঃ! আপনাদের এ-বন্দোবস্তটা বেশ ভালো দেখছি।

নাগরমল খুশি মুখে বলল, সব আদমির যাওয়া-আসা আমরা টুকে রাখি, তাতে হামার অনেক কামের সুবিধা হয়।

ডানহাতি সোজা রাস্তাটা বরাবর স্টুডিয়োর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেছে। দুইদিকে একই ধরনের সাদা বাড়িগুলো দিনের আলোয় ঝকঝক করছে; প্রত্যেকটার সামনে একটু করে লন, দু-চারটে ফুল গাছ।

প্রতুল জিগ্যেস করলে, এগুলো কী?

নাগরমল বলল, এগুলো সব অফিস, পোশাকের ঘর, লেবরেটারি—এই সব আছে। আর ওই শেষ বাড়িটা দেখসেন—ওটা হাসপাতাল।

প্রতুল সত্যিই বিস্মিত হল; বলল, সর্বনাশ! আপনি আবার হাসপাতাল সুদ্ধ রেখেছেন!

নাগরমল টেনে-টেনে হাসতে-হাসতে বলল, নাগরমল সিঙ্ঘিয়া না পারে কী? সে বড় মজার বাত। দোসরা আদমির রুপেয়ায় বানিয়ে লিয়েসে। ডাংদার, নার্স—সব খরচ তার, হামি খালি বাড়িটা বানিয়ে দিয়েছি এই শর্তে যে, হামার কাম করে যারা—তাদের বেমার হলে সব যাবে ওখানে, থাকবে, ওষুধভি মিলবে।

পাশে টিনের একটা প্রকাণ্ড ঘর দেখে প্রতুল জিগ্যেস করল, এটা কিসের?

এটা হামার দু-নম্বর প্রপার্টি গুদাম আছে। যত মূর্তির ছাঁচ সব বানানো হয় এইখান থেকে। নয়া এক আর্টিস্ট লিয়ে এসেছি হাজার রুপেয়া মাইনে দিয়ে; সে আপনাকে এমনিতর মূর্তি বানিয়ে দেবে যে আসল-নকল সমঝাতেই পারবেন না।

পাশেই একটা সরু সুরকি-ঢালা পথ।

সেটা দিয়ে প্রতুল সামনের বাড়িটার সিঁড়ির ওপরে উঠে এল। সেই বাড়িরই পিছনে তিন নম্বর স্টুডিয়ো।

আরও কয়েক ধাপ সে উঠেছে, এই সময় একজন সুন্দরী অবাঙালি তরুণী তার গা ঘেঁষে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

প্রতুল ওপরের বারান্দায় এসে পৌঁছল। সামনের ঘরটার দরজা খোলা ছিল; দেখা গেল, ঘরের ভেতর একটি মেয়ে একান্ত মনে সাজসজ্জা করছে।

প্রতুল অন্যমনস্কের মতো তাকিয়ে রইল।

নাগরমল তার কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে কুণ্ঠিত স্বরে বলল, দেখুন প্রতুলবাবু, এটা মেয়েদের মেক-আপ বাড়ি। পুরুষ লোকদের উঠতে দিই না এখানে। তারা সব হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। মেয়েরা এখন তাদের কী করতে হবে, তাই ভাবছে...

প্রতুল সচকিত হয়ে তার পানে ফিরে বলল, আপনি কী করে জানলেন, আমাকেও কী করতে হবে তাই ভাবছি না? আমার কী মনে হয় জানেন, এই বাড়ি থেকে একজন মেয়েছেলে অনায়াসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সরু রাস্তাটা দিয়ে তিন নম্বর স্টুডিয়োতে যেতে পারে। দরোয়ান গেটে থাকলেও তাকে দেখতে পাবে না। আচ্ছা, আমি জিগ্যেস করলেই জানতে পারব, কাল রাতে এখানে কে কে ছিল। ...না, না, ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

নাগরমল বলল, খালি মেয়ের কথাই কেন বলসেন? পুরুষমানুষও তো ঠিক এইভাবে লুকিয়ে তিন নম্বরে যেতে পারে?

কেন বলছি তা এখন আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না!

তিন নম্বর স্টুডিয়োর সামনে এসে ভেতরে না ঢুকে প্রতুল দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ে জিগ্যেস করল, বড়-বড় দরজা দুটো বুঝি মালপত্তর এনে গাড়িসুদ্ধ ভেতরে নিয়ে যাবার জন্যে? আর ছোট দরজাগুলো লোকজনের যাতায়াতের জন্যে বুঝি? এগুলো কি চাবিতালা দেওয়া থাকে রাতে?

না, দরজায় চাবিতালা দেবার রীতি নেই। দিনরাতভোর আমাদের পাহারা থাকে, চাবিতালার আর দরকার হয় না। চলুন, ভেতরে যাবেন তো।

দাঁড়ান, শেখরনাথের জন্যে একটু অপেক্ষা করা যাক। ওই যে—উনি বোধহয় আসছেন।

অদূরে দেখা গেল, শেখরনাথ তার ছড়িটা ঠুকতে-ঠুকতে আসছে। কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, কারও সঙ্গে বাক্যালাপ নেই, দু'পাশে লোক সরে গিয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

শেখরনাথ এসে দাঁড়াতেই প্রতুল বলল, এই যে—আপনি এসেছেন। চলুন... কিন্তু ভাবছি, এতগুলো দরজা কেন?

নাগরমল আবার এ-প্রশ্ন তাকে করতে শুনে বিস্মিত হলেও কোনও কথা কইল না।

শেখরনাথ তাকে বুঝিয়ে দিল।

সেটের ভেতরে যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি আলোকের স্বল্পতা।

প্রতুল শেখরনাথকে পথ ছেড়ে দিয়ে বলল, আপনি আগে চলুন। আপনার সেটের সঙ্গে আমি পরিচিত নই।

শেখরনাথ চলল বটে, কিন্তু প্রতুল দু-পা যেতে না-যেতেই হোঁচট খেল।

শেখরনাথ সাবধান করে দিয়ে বলল, ইলেকট্রিকের তারটা আছে কিন্তু, আমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে বলে আটকায় না।

সেটের দরজার কাছে এসে শেখরনাথই আগে ভেতরে ঢুকল।

প্রতুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল।

এদিক থেকে অনুজ্জ্বল একটা নীলাভ আলো এসে মৃতের মুখে-চোখে পড়ে অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে।

প্রতুল আপনমনে বলে উঠল, না, বিলাসবাবু দেখছি অত্যন্ত ভয় পেয়েই মারা গেছেন।

৬

শেখরনাথ কিন্তু সে-মুখ দেখে মোটেই চঞ্চল হল না; বললে, আপনারা একটা ভুল করেন। এটা হচ্ছে আলোর খেলা।

প্রতুল মৃতের দিকেই তাকিয়ে বলল, তাই নাকি! দয়া করে একবার এগিয়ে এসে দেহটা পরীক্ষা করে দেখুন না।

শেখরনাথ কিন্তু নড়বার কোনও লক্ষণ দেখাল না; চোখে-মুখে তার আবার সেই কাঠিন্য ফুটে উঠেছিল।

প্রতুল বলল, আমার ইচ্ছে যে, আপনি এই ছোরাখানা পরীক্ষা করে দেখেন শেখরবাবু! এইটাই কি আপনি রিহার্সালে ব্যবহার করেন?

চোখের দৃষ্টি তার আবার উগ্র হয়ে উঠল। আবার সেই অনিশ্চিত মুহূর্ত। তারপরই শেখরনাথ এগিয়ে এসে মৃতদেহের পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং ছোরাখানা হাত দিয়ে তুলে নিতে যাবে...।

প্রতুল চিৎকার করে বলে উঠল, ছোঁবেন না, ছোঁবেন না...।

মাফ করুন আমায়, আমি ভুলে গেছলুম যে, আঙুলের ছাপের দরকার আপনাদের। তবে এটা ঠিক যে, এই ছোরাই আমরা রিহার্সালে ব্যবহার করি।

এমনসময় তাদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল, প্রতুলের অন্যতম সহকারী রাখালের প্রবেশে। বলল, স্যার, চারদিক রক্তে মাখামাখি...

প্রতুল জিগ্যেস করল, সবগুলোর ফটো নিয়েছ?

নিশ্চয়ই।

প্রতুল নাগরমলের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার আমাকে একটু ক্ষমা করতে হবে। আমি মৃতদেহটা আর সেটটা পরীক্ষা করে দেখব একবার, তারপর করোনারের সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে।

তাকে দেখেই বেঁটে মোটা ডাক্তারটি বলে উঠলেন, আমরা মৃতের শেষ ফটো নিয়েছি প্রতুলবাবু।

প্রতুল প্রশ্ন করল, হত্যা বলে আপনার মনে হল?

নিশ্চয়ই।

মরবার পর বিশেষ নড়ে-চড়েছে?

সামান্য একটু।

কতক্ষণ মরেছে বলে মনে হয়? আমার হিসেবে দেড়টার আগে...।

ডাক্তার চিন্তাপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, ঠিক সময়টা বলতে গেলে আমাকে আর-একবার ভালো করে দেখতে হয়। তবে এখন দেখে যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় দেড়টার আগেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রতুল বললে, বেশ, একটু পরেই আপনি আমাকে জানাবেন। কিন্তু মনে থাকে যেন, সময়টা এর তদন্তে প্রধান সূত্র হবে।

ক্যামেরা-প্ল্যাটফরমের ঠিক পাশেই দুখানা চেয়ার ছিল। মৃতদেহের পাশ থেকে একসার রক্তমাখা পায়ের দাগ সেই চেয়ার দুখানা পর্যন্ত গেছে দেখে প্রতুল বিস্মিত হল।

করোনার বললেন, শুধু ওই না, ওরকম পায়ের দাগ দু-দিকেই আছে। এ-দাগ যারই হোক, সে মেঝের রক্ত মাড়িয়ে লাশ পর্যন্ত গেছে, তারপর তাকে ডিঙিয়ে ওই চেয়ার পর্যন্ত গেছে।

প্রতুল পরীক্ষা করতে-করতে বলল, হুঁ, পুরুষের জুতোর দাগ। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ছোট একটা ক্ষত থেকে কতক্ষণ ধরে রক্ত বেরোলে তবে এই দাগগুলো হতে পারে?

এর দুটো উত্তর আছে। দাগ যে-ই করে থাক, বিলাসবাবু মরবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রক্ত মাড়াতে পারে; কিন্তু আমার মতে রক্ত ততক্ষণে যথেষ্ট জমে যেত।

আমারও তাই মত। কতক্ষণ লাগে? ধরুন মিনিট পনেরো কুড়ি?

ঠিক তাই। দেখছেন না, লোকটা পায়ে রক্তের দাগ লেগেছে দেখে আবার মুছে ফেলবার চেষ্টা করেছিল? কিন্তু দাগগুলো তুলে ফেলবার কোনও চেষ্টাই করেনি।

প্রতুল বলল, যা দেখা যায় সবই প্রমাণ নয়। ডাক্তারবাবু, আমি আর-একটা কিছু চাইছি।

সেট পরীক্ষা করতে-করতে ক্যানভাসের দেওয়ালে একটা দাগ দেখতে পেয়ে মুখটা ডাক্তারের খুশি হয়ে উঠল। ফিরে এসে বললেন, কীরকম আঘাতে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয় আপনার? হাড়ের ভেতর দিয়ে আমূল ছোরাখানা বুকে বিঁধেছে। পায়ের সামনাসামনি থেকে নয়, ওপর থেকে...

ওপর থেকে! আপনি কি বলতে চান বিলাসবাবু মেঝেতে শুয়েছিলেন?

আমি যা বলতে চাই প্রতুলবাবু, শুনলে হয়তো আপনি আমাকে পাগল ভাববেন। আমার মতে মারা যাবার আগে বিলাসবাবু ঠিক ওইভাবে ওইখানেই শুয়েছিলেন। আর আমার মনে হয় না, মৃত্যুর সময় অতখানি ভয়ের ভাব ফুটে ওঠার যথেষ্ট সময় ছিল। মৃত্যুটা এমনভাবে এসেছিল যে, দেখছেন না ওঁর হাতে ছোরাখানা ব্যবহার করবারও সুযোগ পাননি?

প্রতুল জিগ্যেস করল, কোনও মেয়েছেলের দ্বারা এ-আঘাত সম্ভব?

নিশ্চয়ই। সাধারণ মেয়ের গায়ে যা শক্তি থাকে তাই যথেষ্ট।

অকস্মাৎ হাঁফাতে-হাঁফাতে আবার রাখাল এসে হাজির। বলল, স্যার, নতুন ঘটনা! বিলাসবাবুর সাজঘরে একটা লোককে ধরে ফেলে এটা ছিনিয়ে নিয়েছি। আপনার কথামতো ঘরটা দেখতে গিয়ে দেখি না লোকটা এটা ছিঁড়ছে। কথাশেষে প্রতুলের হাতে সে একটা চিঠি দিল।

চিঠিতে শিরোনামা বা তলায় স্বাক্ষর ছিল না। ছিন্ন যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে, তাতে লেখা ছিল ঃ

চিঠিগুলোর জন্যে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসে দেখছি আমি ভুল করেছি। চিঠিগুলো আমার, সেগুলো আমি চাই। আজ থেকে আমাদের মধ্যেকার সব সম্বন্ধ শেষ।

প্রতুল বুঝল, এইখানে অলকার এই বিয়োগান্ত নাটকে প্রবেশ। রাখালকে সে বলল, অলকাদেবীর ঘরে সন্ধান নিয়ে দ্যাখো, এরকম আরও চিঠির কাগজ নিশ্চয়ই পাবে। দামি কাগজ। হয়তো তাঁর নামও ছাপা থাকবে। কাল রাতে তিনি কোথায় কী করেছেন, সেটাও জানবার চেষ্টা

করবে। আর অনর্থক এখানে ছুটে এসে তুমি বা হরেন কেউ আমাকে বিরক্ত করো না, বুঝলে?

ডাক্তার এবং রাখাল বিদায় হলে প্রতুল আবার সেটের চারদিকে পরীক্ষা করতে শুরু করল।

দরজাগোড়া থেকে আহ্বান এল : স্যার!

প্রতুল কঠিন দৃষ্টিতে ফিরে তাকাল।

রাখাল মাথা চুলকে 'ঢোক গিলে বলল, বলতে ভুলে গেছি স্যার! লোকটার নাম বিনয় মজুমদার—স্টুডিয়োর একজন অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টার। অলকাকে ভালোবাসে। কাল রাতে তার পেছনে-পেছনেই স্টুডিয়োতে আসে।

তুমি কি এখনই সেটা আবিষ্কার করলে?

না স্যার। আর তাই যদি হয়, ক্ষতি কী? অলকাদেবীর ঘর থেকে স্যার, একগাদা চিঠির কাগজ পেয়েছি। এই লোকটার সঙ্গে স্যার, অলকাদেবীর গল্পটা স্টুডিয়োর দরোয়ান-চাকর সবাই জানে...।

তা জানুক। তোমার কর্তব্যটা ভোলোনি তো? গঙ্গারাম আর বাহাদুরকে আর-একটু পরে আমি ডেকে পাঠাব। তারা যেন কোথাও না যায়, দেখো।

রাখাল চমকে উঠল, মুখ দিয়ে তার আপনা-আপনিই বেরিয়ে এল : ওই যাঃ! ভুলে গেছলুম স্যার! ভাগ্যিস বললেন। তবে ক্ষতি নেই, পালাবার লোক তারা নয়। আর কেনই বা পালাবে? এদের দুজনের কেউই...।

প্রতুলের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হয়ে উঠল। তাই দেখে রাখাল ধীরে-ধীরে সরে পড়ছিল।

রাখাল...!

স্যার!

কে একজন নাকি বিলাসবাবুর মৃতটাকে ডামি ভেবে ভুল করে লাথি মারে। তোমার ভাগ্যেও যেন আবার তাই না হয়, মনে থাকে যেন।

৭

প্রতুল অফিস-ঘরে পদার্পণ করতেই নাগরমল সাগ্রহে জিগ্যেস করল, কিছু পেলেন কি?

প্রতুল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, এটা কি বায়োস্কোপের ছবি যে একখানা টিকিট করলেই এক্নিশ্বাসে সব গল্পটা দেখে ফেললেন?

একটু অপ্রতিভ হয়ে নাগরমল বলল, তা বটে! তবু কিছু কি আবিষ্কার করতে পারেননি?

কিছু কেন, পেয়েছি অনেকই। ব্যাপারটা বেশ জটিল। আমাকে অনেক কাঠখড়ই পোড়াতে হবে। উপস্থিত আর বেশি বলতে পারব না, মাফ করবেন।

নাগরমল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সে আমি বলতে বলছি না। লেকিন কি জানেন, যদি জলদি খুনের কিনারা না করতে পারেন, তাহলে আমার সব নষ্ট হবে। দুশমন তো আছেই, তারপর লোকে ছিঁড়ে খাবে; কাগজওয়ালারা আমাকে সব কিছু বলবে। কোনও অ্যাকটার-অ্যাকট্রেস পাব না। আমাকে ফিন লোটা-কম্বল লিয়ে মুলুকে ফিরতে হবে।

প্রতুল হেসে বললে, ঘাবড়াবেন না। খুন সব জায়গাতেই হতে পারে—আমাদের মন্দিরেও হতে পারে, মসজিদেও হতে পারে। আপনি বেশি হইচই করবেন না; আর আজকের দিনটার মতো আপনার অফিসটা আমাকে দয়া করে ছেড়ে দেবেন, দু-একজনকে কিছু-কিছু জিগ্যেস করবার আছে আমার।

নাগরমল বলে উঠল, বেশ তো, বেশ তো। আমি বাহার যাব?

না, আপনাকে এখানে থাকতে হবে, আপনার লোকজনকে আমার চেয়েও আপনি ভালো বুঝবেন।

নাগরমল টেবিলের ওপরের ঘণ্টাটা টিপতেই সেক্রেটারি এসে ঘরে ঢুকল। নাগরমল তাকে বলে দিল, এখন আমার একটু কাজ আছে, কোই যেন না ঘরে ঢুকে।

সেক্রেটারি বলল, ব্রিজনাথ দেখা করতে চান।

ইচ্ছে না থাকলেও নাগরমল সেক্রেটারির মনে আঘাত দিতে চাইল না; বলল, আচ্ছা, পাঠিয়ে দাওগে।

ব্রিজনাথ ঘরে আসতেই নাগরমল বলে উঠল, তুমি আজ বাড়ি যেতে পারো।

ব্রিজনাথ চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল, বাড়ি যাব আমি? কী যে বলো নাগরমল! তারচেয়ে বলো না কেন, স্টুডিয়োর দরজা বন্ধ করে সকলে মিলে বাড়ি চলে যাই। এদিককার খবর শুনিয়েছ? তিন নম্বরে ভিড় জমে গেছে। কী করে জানি না, খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

বেশ, তুমি গিয়ে তাদের হটিয়ে দাও হুঁয়াসে। এর জন্যে আমার কাছে আসিয়েছ?

ব্রিজনাথ সবেগে মাথা নেড়ে বলে উঠল, আরে না, ও কাম তো হামি সেকব। পুলিশে লাশ নিয়ে যেতে চায়, লেকিন নিয়ে যাবার বকৎ বহুৎ ভিড় জমবে!

কথাটা সত্য। নাগরমল বিপন্ন দৃষ্টিতে প্রতুলের দিকে তাকাতে সে বলে উঠল, এমন কোনও বন্দোবস্ত করতে পারেন না যাতে সকলে মনে করে—এও ছবি তোলারই একটা অংশ?

নাগরমল বলল, এখন আর তা কী করে হবে প্রতুলবাবু? আপনি রাতমে লাশ নিয়ে যাবার বন্দ্‌বস করতে পারেন না?

প্রতুল ঘাড় নেড়ে বলল, তা সম্ভবপর নয়। আপনি বরং আপনার লোকজনদের একটা নোটিশ দিয়ে দিন যে, বিলাসবাবুর মৃত্যুর জন্যে আজকে স্টুডিয়ো বন্ধ। তারপর সকলে চলে গেলে ধীরে-ধীরে লাশ চালান করা যাবে।

নাগরমল খুশি হয়ে বলল, বহুৎ আচ্ছা। ব্রিজনাথ, তুমি আমার নাম সই করিয়ে দিয়ে একটা নোটিশ দিয়ে দাও।

ব্রিজনাথ চলে গেলে প্রতুল বললে, আমি কি আবিষ্কার করেছি, এবার বোধহয় তার কিছু-কিছু শুনতে চান?

জরুর।

কাল রাত্রে তিন নম্বর স্টুডিয়োতে চারজন লোক উপস্থিত ছিল।

নাগরমল কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, চারজন লোক বলছেন? হয়তো শেখরবাবু, বিলাসবাবু বিনয়, কিন্তু না—শেখরবাবু তো একলাই কাম করতেন। আপনি তা হলে বলছেন...।

আমি বলছি বিলাসবাবু ছাড়া আরও চারজন, তার মধ্যে আমার মনে হয়, চতুর্থটি একটি মেয়েছেলে।

নাগরমল চোখ বড়-বড় করে বললে, তার মানে আপনি বলতেসেন আরও একজন জেনানা আছে।

প্রতুল বলল, অলকাদেবী যে কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েইছি, আর দেখে যা মনে হয়—।

বাধা দিয়ে নাগরমল বললে, না, না, আপনি অলকাকে চিনেন না; চিনলে ও-কথা বলতেন না...।

প্রতুল তাকে চিঠির কথাটা খুলে বলতেই নাগরমল বলে উঠল, চিঠিটা পাওয়া গেল বলেই আপনারা তাকে খুনি বলে ধরিয়ে নিচ্ছেন?

প্রতুল বললে, ধরে আমরা কিছু নিচ্ছি না। তবে সন্দেহ করতে বাধ্য; কারণ সেটের ক্যানভাসের দেওয়ালে স্ত্রীলোকের রক্তমাখা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। যদি চিঠির আঙুলের ছাপের সঙ্গে সেগুলো মিলে যায়... কিন্তু তৃতীয় একজন লোক এর ভেতর আছে—পায়ে যার বুটজুতো ছিল। রাতে আপনার স্টুডিয়ো পাহারা দেয় যে-লোক—সে কি বুটজুতো পরে?

বলতে পারিনে।

প্রতুল বলল, খুনি যদি সে-ই হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে, বিলাসবাবুকে হত্যা করে কিছুক্ষণ সে সেটেতেই ছিল, আর না-হয় চলে গিয়ে ফের ফিরে এসেছিল। এবার চতুর্থ লোকটির কথা—হত্যার সময় সে-ও সেটেতেই ছিল। হয় সে নিজে করেছে, না-হয় হত্যাকাণ্ড দেখেছে। কী করে জানলুম তা এখন বলব না। তবে একসময় ভয় পেয়ে তাকে লুকোতে হয়েছিল, পরে বিলাসবাবুর মৃতদেহের কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে তাকে স্পর্শ করে। আঙুলে রক্ত লাগতেই ভয় পেয়ে ছুটে পালায়। দরজায় তার রক্তমাখা আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

নাগরমল গুম হয়ে বসে রইল; পরে আপনমনে বলে উঠল, হায় ভগবান! হামার সব লোকই কি খুনি?

প্রতুল ভারী গলায় বলল, হ্যাঁ, নাগরমলবাবু, দুনিয়ার সব লোকই খুনি। মানুষের জীবনে এমন সময় আসে, যখন আইন-শৃঙ্খলার সব বাঁধন সে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। তখন কাজে না হোক, চিন্তাতেও সে অনায়াসে অপরকে খুন করবার সঙ্কল্প করতে পারে। আমার মনে হয়, প্রত্যেক মানুষই একসময়ে না একসময়ে অপরকে হত্যা করবার জন্যে লোলুপ হয়ে ওঠে, এরই ফলে এমন অনেক হত্যাকারী দেখা যায়, যারা মুহূর্তের এই তীব্র বাসনাটাকে দমন করতে পারে না। হয়তো তাদের জীবনে ভবিষ্যতে কোনওদিন এ-উত্তেজনা আসবে না, শুধু ক্ষণিকের দুর্বলতায়—।

বাধা দিয়ে নাগরমল বলে উঠল, না, না, এ আপনার ভুল কথা প্রতুলবাবু, আমার জীবনে কোনওদিনই এরকম দুর্বলতা আসেনি।

হেসে প্রতুল বলল, এটা আপনার ঠিক কথা হল না। আমি আপনার পূর্ব ইতিহাস জানি। গতদিনকার কথা মনে করুন, যখন আপনি দুর্দিনের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতেন, তখন মোটরে চড়ে হেসে-খেলে বেড়াত যারা, তাদের দেখে আপনার কি মনে হত? তখন হাতের কাছে পেলে অনায়াসেই তাদের খুন করতে পারতেন। আইনকানুনের যত শক্ত শেকলই আমাদের হাত-পা বেঁধে রাখুক না কেন, তবু মুলে মানুষ তার জিঘাংসাটা ছাড়তে পারেনি। যুদ্ধই তার প্রমাণ।

নাগরমল মাথা হেঁট করে রইল।

প্রতুল ঘড়ি বার করে বলল, রাখালের তো এতক্ষণ গঙ্গারামকে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

কথার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজায় আঘাত হল।

প্রতুল গিয়ে দরজা খুলে দিতেই গঙ্গারামকে নিয়ে রাখাল ঘরে ঢুকল।

তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কঠিন কণ্ঠে প্রতুল জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম গঙ্গারাম?

হ্যাঁ হুজুর, গঙ্গারাম তেওয়ারী।

রাত্রে তুমি এই স্টুডিয়ো পাহারা দাও?

জী হুজুর।

তোমার কাঁধে যে ঘড়িটা ঝুলছে, কাল রাত্রে পাহারা দেওয়ার সময়ে ওটাই কি সঙ্গে ছিল?

হ্যাঁ হুজুর, সবসময় এটা আমার সাথে থাকে।

বেশ। রাখাল, ঘড়িটা নিয়ে খুলে ফেলে, ভেতর থেকে রেকর্ডটা বার করে নাও তো।

রাখাল ঘড়ির জন্যে হাত বাড়াতেই গঙ্গারাম চকিতের মতো দূরে সরে দাঁড়াল। চোখে-মুখে আগুনের হলকা যেন বয়ে যেতে লাগল। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, আইনের ভয় দেখিয়ে

তাকে কোনও লাভ হবে না।

নাগরমল বলল, গঙ্গারাম, বাবুকে তোমার ঘড়িটা দাও, আর প্রতুলবাবু যা পুছবেন, তার সাচ্চা জবাব দেবে।

গঙ্গারামের মেজাজ বিশেষ নরম ছিল না; বলল, আমার গায়ে হাত দিয়ে ঘড়ি নেবে কেন? আর এই আদমিই বা হামাকে নিদসে টানিয়ে লিয়ে আসবে কেন?

নাগরমল কী বলতে যাচ্ছিল, প্রতুল হাত তুলে নিরস্ত হতে ইঙ্গিত করল। সে বুঝেছিল, এই পশ্চিমাটিকে ভয় দেখিয়ে কোনও কাজ আদায় করা যাবে না। বরং চালাকির দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। গলার স্বর কোমল করে তাই সে বলল, গঙ্গারাম, আমি কেন এখানে এসেছি, সে জেনে তোমার কোনও লাভ হবে না। তবে তোমার দ্বারা আমাদের যদি কোনও সাহায্য হয়, তা হলে ভারি খুশি হব। কাল রাতে যা ঘটেছে এমন ঢের জিনিসই ইচ্ছে করলে, তুমি আমায় বলতে পারো। সত্যি যে আমি আবিষ্কার করতে পারব না, তা নয়, তবে অনর্থক আমার সময় নষ্ট করার আশা করি কোনও বাসনাই নেই তোমার?

গঙ্গারাম চুপ করে রইল; অকস্মাৎ তার মুখের পানে তাকিয়ে প্রতুল প্রশ্ন করল, আচ্ছা গঙ্গারাম, তুমি ভূত বিশ্বাস করো? আমি করি। মাঝে-মাঝে তাদের কান্নার শব্দও শুনতে পাই...

গঙ্গারাম তার চকিত দৃষ্টিটা প্রতুলের মুখের পানে তুলে ধরল, যেন বুঝতে চায় সে বিদ্রূপ করছে কি না। কিন্তু সেখানে রহস্যের কোনও ছাপই দেখতে না পেয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, হামি আপনা কানমে দানার কান্না শুনিয়েসে হুজুর—।

কোথায় শুনেছ বলো দিকিনি?

এই স্টুডিয়োমে, কালরোজ রাতমে—।

তাই নাকি! কীরকম শুনলে?

কীরকম আসে—তা বলতে পারব না। মালুম হল কি এক জেনানা ভয় পেয়ে চিল্লোচ্ছে। বহুৎ ডর লাগিয়েছিল হুজুর!

প্রতুল খুশি হয়ে বলল, তখন রাত ক'টা বলতে পারো?

বারা বাজকে বিশ পঁচিশ মিনিট হোয়েগা, আউর কেয়া। রোঁদমে ঘুমতে আছি, তিন নম্বরের কাসে গিয়েসে, দেখি বাতি বিলকুল আঁধিয়ার। নয়া বাতি নিয়ে আসতে যাচ্ছি—ওই বকৎ দানা চিল্লোল...।

তখন ঠিক ক'টা বলতে পারো না?

বারা বাজকে পঁচিশ মিনিট হোবে। সাড়ে বারাভি হো স্যাকতা। বারা বাজকে পনেরো মিনিটকা টাইনমে শেখরবাবু আউর বিলাসবাবু স্টুডিয়োসে নিকাল গেল।

তোমার ঘড়িতে দেখলে বুঝি?

জী হুজুর!

আচ্ছা, রোঁদ দেবার সময় কীভাবে কোথায় যাও?

গেটসে সিধা যাই। তিন নম্বর স্টুডিয়োর পিছন দিক হোকে ফিন বাহাদুরকা সাথ থোড়া বাতচিজ চালাই। কুছু-কুছু কামভি কোরতে হয়। কোই বাতি বুততে ভুল গিয়া, কোই পাখা বন্ধ নেই কিয়া, কোই খাতা-কাগজ ছোড়কে চল যাতা...।

প্রতুল সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকেই ওরকম অন্যমনস্ক থাকে বটে, কোনও দিকে তারা খেয়াল রাখে না। আচ্ছা, কাল রাতে যা-যা করেছিলে, খুলে বলো দিকি?

গঙ্গারাম বলল, আট বাজে ডিউটিতে আসি; ওই বকৎ বহুৎ পানি পড়তেসিল। বহুৎ রাত তক্ শেখরবাবু তিন নম্বরমে আপনা কাম করসিলেন। তারপর অলকাবিবি আর বিনয়বাবু স্টুডিয়োমে আসেন—বাহাদুর বলিয়েসে আমায়—তব বহুৎ গড়বড় শুরু হল...।

তারপর কী শুরু হল?

সব হামি বলতে পারব না হুজুর, বিশওয়াসও করবেন না। সাড়ে গারা, রোঁদমে ঘুমতে আসি, আপনা আঁখসে দেখলুম এক আওরৎ বিলাসবাবুকা ঘরকো পাশ ছুটিয়েসে; বাহাদুর আমাকে ঝুটা বাৎ বলে ঠাট্টা কোরল, লেকেন ফিন থোড়া বাদ এক কালা দানাকে হামি আপনা আঁখসে তিন নম্বরকো পাশ ঘুমতে দেখিয়েসে।

তখন কি প্রায় বারোটা হবে?

জী হুজুর। তিন নম্বরকো পাশ আসিয়েসে, বারা বাজ গেল, দরজাকা নগিজমে গিয়েসে, ব্যস, কালা দানা কাঁহা মিলিয়ে গেল। হামার মালুম হোল কি উও স্টুডিয়োকা অন্দরমে ঢুকিয়েসে। হামি ভি ভিতর ঘুষব, শেখরবাবু চিল্লোতে শুরু করলেন...।

তিনি কি প্রায়ই এরকম করেন?

জী হুজুর। ভালা মুখে আমাদের সাথ উনি বাত কভি নেহি বলতা। ভগবান ভালা করে। উসকে বাদ ফটকে হামি গিয়ে বাহাদুরকো সাথ বাত বোলেসে। এই বকৎ শেখরবাবু বিলাসবাবুকো লিয়ে মোটরমে বাহার হয়ে গেল। দোনো আদমি আমাদের সাথে কথা কইয়েসে। বিলাসবাবু হরবকৎ বলতা হ্যায় লেকিন শেখরবাবু কক্ষনো বলেন না...।

প্রতুল ব্যগ্র কণ্ঠে বলল, তুমি ঠিক বলতে পারো, ওই সময় শেখরবাবু আর বিলাসবাবু একসঙ্গে স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে গেলেন?

আপনা আঁখসে দেখিয়েসে বাবুজী।

বেশ, তারপর আর সেই কালো মূর্তিকে দেখেছ?

চিল্লানো বাদ একজনকে হামি তিন নম্বরের দিকে যেতে দেখিয়েসে।

তুমি পাহারাদার। এসবের খোঁজখবর নিলে না কেন?

লিব তো ভাবিয়েসিলুম হুজুর; লেকিন বাহাদুরকে বলতে সে ঠাট্টা করল। বলল, অলকামায়ী ছাড়া দোসরা কোই আওরৎ স্টুডিয়োমে ঘুসেনি, আমার বাত হেসে উড়িয়ে দিল...।

প্রতুল জিগ্যেস করল, তা হলে বলো সে তোমাকে খোঁজ নেবার জন্যে কোনওরকম উৎসাহ তো দেয়নি, বরং বাধা দিয়েছে?

জী হুজুর, হামি হামার সাথ আসতে বললুম, আমাকে জংলি বলে উড়িয়ে দিলে...।

আচ্ছা, শেষকালে যে মূর্তিটাকে দেখেছ, সে কে বলে তোমার মনে হয়?

আঁধার ছিল, ভালো দেখতে পাইনি; তবে হামার মনে লিচ্ছে কি উও বাহাদুরের লেড়কী উলকি। উসি লিয়ে আগাড়ি বাহাদুরকে যখন দানার কথা বললুম, এত্ত গোসা করল!

তুমি কি তাকে বলেছ যে তার মেয়ের মতো মনে হল?

নাম করিনি, তবে বুঝিয়েসে—।

উলকি আর বিলাসবাবু সম্বন্ধে কোনও কিছু শুনেছ কখনও?

গঙ্গারাম এই প্রথম হেসে ফেলল; বলল, কেতনা রাত আপনা আঁখসে দোনোকো দেখিয়েসে হুজুর...।

নাগরমল চিৎকার করে উঠল, আমার স্টুডিয়োর ভেতর এইসব কাণ্ড...।

প্রতুল আবার জিগ্যেস করল, বাহাদুর যখন অত চটে উঠেছিল, তখন মনে হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে তার মেয়ের নাম শোনাটা সে পছন্দ করত না, কী বলো?

জী হুজুর। কত রোজ আমাদের বলিয়েসে, বিলাসবাবুকে পাকড়াও করতে পারলে সে জান লিয়ে লেবে...।

তাই নাকি! তুমি নিজে শুনেছ?

হামি নয় হুজুর, স্টুডিয়োর আউর বহুৎ আদমি শুনিয়েসে...।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আর তোমায় উপস্থিত কিছু জিগ্যেস করার নেই। এখন যেতে পারো তুমি।

গঙ্গারাম বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রতুল প্রশ্ন করল, আচ্ছা গঙ্গারাম, তুমি যখন রোঁদে ঘোরো, তখন বাহাদুর এমনভাবে ফটক ছেড়ে তিন নম্বরের কাছে যেতে পারে কি—যাতে তোমার নজরে পড়বে না?

জী হুজুর।

নাগরমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রতুলের পানে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, আপনি কী করে জানলেন প্রতুলবাবু, যে, গঙ্গারাম মেয়েছেলের চিৎকার শুনতে পেয়েছে?

হেসে প্রতুল জবাব দিল, এ তো সোজা কথা নাগরমলবাবু। যে মেয়ে অত ভয় পেয়ে পালাতে গিয়ে ক্যানভাসের দেওয়ালে আর দরজায় আঙুলের ছাপ রেখে গেল, সে যে ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠবে এটা ভেবে নেওয়া আর শক্ত কী?

নাগরমল মাথা চুলকে বলল, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে কোনওরকমে মেয়েটি নিজের আঙুল নিজে কেটে ফেলে। শেখরবাবুর কথায় আমরা জানতে পারলুম যে, গঙ্গারাম যখন আওরতের চিল্লোনো শুনেছিল, তখন তাদের কেউই স্টুডিয়োতে ছিল না; তবে কী করে বিলাসবাবুর খুন দেখে আওরৎটি চিল্লোতে পারে! ওদের বাত যদি সাচ বলে বিশ্বাস করতে হয়, তবে আপনি যে-সময় বিলাসবাবু খুন হয়েসে বলে মনে করলেন, সে-সময়ে তিনি নিজের মোকামে বসিয়ে আছেন...।

প্রতুল চিন্তিত কণ্ঠে বলল, এইখানেই একটা গলদ থেকে গেছে সময়ের। সেইটাই একবার দেখতে হবে। একবার বাহাদুরের সঙ্গেও বোঝাপড়া করা দরকার; বিশেষত তার মেয়ে যখন...।

নাগরমল চট করে বলে উঠল, বড় ভালা লেড়কী। আমার কমিক ছবিতে একটা ছোট পার্ট করেসে। হামি বিশওয়াস...।

বাহাদুরের মেয়ে...। বলে প্রতুল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাগরমল ইতস্তত করে বলল, বাহাদুর ভি বড় ভালা আদমি। লেকিন ও একটু-একটু...।

৮

প্রতুল একলাই স্টুডিয়ো ঘুরতে বেরিয়ে পড়ল।

চারদিকে আনন্দ—হাসি; বেশ একটা মাদকতা আছে। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হল তার, চিত্রজগতে জাত-বিচার দেখে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ভেদ হয়তো নেই, কিন্তু ছোট-বড়য় এতখানি পার্থক্য সে আর কোথাও দেখেছে বলে মনে হল না; নামজাদা অভিনেতা বা অভিনেত্রী সাধারণের সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, মুখের একটা কথা খসাতেও যেন একান্ত নারাজ।

আরও অনেক কথাই তার মনে জাগছিল; হঠাৎ একটি ছেলে হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে বলল, আপনার নাম প্রতুলবাবু? ফোনে ডাকছে আপনাকে।

অফিসে এসে প্রতুল রিসিভারটা তুলে নিতেই রাখালের গলা শোনা গেল ঃ প্রতুলবাবু... ও! আমি রাখাল। বাহাদুরকে কোনওরকমে ধরেছি। নিয়ে যাচ্ছি।

কী জন্যে তাকে দরকার—সে কি জানতে পেরেছে কিছু?

না, বাড়িতে মশগুল হয়ে সে তখন সবুজ চা খাচ্ছিল...।

বেশ, তাকে কিছু ভেঙো না এখন। আমি এখুনি নাগরমলবাবুর ঘরে যাচ্ছি; সেখানে নিয়ে এসো।

চেহারা দেখেই প্রতুল বুঝতে পারল, এবার তাকে ভিন্ন ধাতুর লোক নিয়ে কারবার করতে হবে।

বাহাদুর পাহাড়ি হলেও লম্বায় সমতলভূমির কোনও জাতের লোকের চেয়েই খাটো নয়। পেশিবহুল বলিষ্ঠ গঠন, বুকখানা বিশাল, ছোট-ছোট চোখ দুটো সদা আরক্ত।

তাকে দেখেই প্রতুল বলে উঠল, আগে বোধহয় সৈন্যবিভাগে কাজ করতে, না বাহাদুর?

হ্যাঁ হুজুর, অনেক দিন করেছি। আপনি কি আমার সঙ্গে...

নাগরমল বলে উঠল, প্রতুলবাবু তোমাকে দু-একটা কথা জিগ্যেস করতে চান।

উত্তরে বাহাদুর শুধু একবার বিচিত্র মুখভঙ্গি করল।

প্রতুল বলল, সকালে ডিউটি সেরে তুমি তো চলে যাও রোজ, কাজেই জানো না বোধহয় যে, গত রাতে স্টুডিয়োতে একটা খুন হয়ে গেছে?

বাহাদুর যে একবার দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, সেটা প্রতুলের দৃষ্টি এড়াল না। একটুখানি চুপ করে থেকে বাহাদুর জিগ্যেস করল, কে খুন হয়েছে?

বিলাসবাবু।

বিলাসবাবু! বিলাসবাবু তো কাল রাতে শেখরবাবুর সঙ্গে একইসময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান! রাতে তো আর ফিরে আসেননি!

সেইটেই তো জানতে চাই আমরা। তুমি বলছ, তিনি আর ফিরে আসেননি। অথচ আজ সকালে মৃতাবস্থায় তাঁকে তিন নম্বরে পাওয়া গেছে। কাজেই বুঝতে পারছ তো, ফিরে তিনি এসেছিলেনই। কথাশেষে সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বাহাদুরের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

বাহাদুর তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কিন্তু আসলেও, গেট দিয়ে যে আসেননি, তা আমি জোর করে বলতে পারি।

অন্য কোনও পথ দিয়ে তাঁর আসার সম্ভাবনা আছে?

কই, সে রকম কোনও পথ তো দেখছি না হুজুর।

প্রতুল একটু ভেবে নিয়ে বলল, আচ্ছা, গঙ্গারামের সঙ্গে মাঝে-সাঝে চা-টা খেতে যাও না? এমন শীতের দিন...।

মাঝে-সাঝে যাই না হুজুর, তবে কাল রাত্রিতে গেছলুম; জবর ঠাণ্ডা ছিল কাল, তার ওপর বৃষ্টি। একটু গরম না হয়ে আর...।

যখন চা খেতে গেছলে, গেটে কি তখন চাবি দিয়েছিলে?

বাহাদুর জবাব দিল, গেলে চাবিই দিয়ে যাই, তবে কাল রাতে তখনও সেটে লোক ছিল বলে বন্ধ করিনি—যদি কোনও সময় কারও যাওয়ার-আসবার দরকার লাগে। বড় দরজা বন্ধ করে লোক ঢোকবার ছোট দরজাটা খুলেই রেখেছিলুম।

কে-কে স্টুডিয়োতে ছিল তখন?

অলকাদেবী আর বিনয়বাবু।

আর কেউ নয়? অন্য কোনও স্ত্রীলোক?

বাহাদুর স্থিরদৃষ্টিতে প্রতুলের চোখের পানে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ, হাসপাতালের নার্স।

প্রতুল বলল, তোমায় খাতায় টোকা আছে দেখলুম, অলকাদেবী একটার পর স্টুডিয়ো থেকে যান, তারও খানিকটা পরে বিনয়বাবু...।

ঠিক বলেসেন হুজুর।

তাহলে বলো যে, তুমি তাঁদের স্টুডিয়ো থেকে যেতে দেখনি? তুমি বোধহয় তখন চা খেতে

গেছলে?

না হুজুর, দেখিনি।

পথের দিকে তুমি পিছন ফিরে বসেছিলে? আর কেউ গেটের কাছে আসলে, তোমার পিঠে কি আর একটা চোখ গজিয়ে ওঠে?

বাহাদুর ভেবে পেল না, হঠাৎ কী উত্তর দেবে; তারপরই কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, আমার কী ডিউটি, এতদিন মিলিটারি কাজ করে আমি কি তা শিখিনি ভেবেছেন? যতক্ষণ চা খাচ্ছিলুম, তার মধ্যে একবারও গেটের দিক থেকে আমার চোখ সরাইনি।

তার মধ্যে কেউ কি গেট দিয়ে বেরোয়নি বলতে চাও?

না, হুজুর।

প্রতুল ঘুরিয়ে আবার প্রশ্ন করল, কাউকে যদি গেট দিয়ে বেরোতে না দেখে থাকো, তা হলে কেউ ঢুকল কি না কী করে জানতে পারবে? আদত কথা হচ্ছে, সেখান থেকে ঝড়-জলে তোমার নজরটা ঠিকমতো চলেনি।

বাহাদুর নীরস কণ্ঠে বলল, যদি তাই বলতে চান, তবে তাই।

প্রতুল প্রশ্ন করলে, এ-পর্যন্ত শেখরবাবুর কথাতেই আমরা পেয়েছি যে, বিলাসবাবুকে তিনি বাড়ির কাছে নামিয়ে দেন। ধরো, যদি সেখান থেকেই তিনি ফিরে এসে থাকেন, আর স্টুডিয়োর ভেতরে তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে থাকে—।

কথাটা বলে প্রতুল অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। দেখতে-দেখতে বাহাদুরের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি দুটো শাণিত অস্ত্রের মতো চকচক করতে লাগল। হাত দুটো মুঠো করে একবার সে নড়েচড়ে উঠল, তারপর অনেকক্ষণ বাদ যখন সে কথা কইল, তখন আত্মদমন করে ফেলেছে; বলল, আমার মেয়েকে এ-ব্যাপারে টানবার কোনও অধিকারই নেই আপনার। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, বিলাসবাবুকে বাড়ির কাছে শেখরবাবু নামিয়ে দিতে পারেন, তিনি আবার ফিরেও আসতে পারেন, কিন্তু কেন এসেছিলেন সে-সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।

প্রতুল তার চোখের দৃষ্টি কিন্তু বাহাদুরের মুখের ওপর থেকে সরাল না। এ-লোকটিকে সহজে পরাস্ত করা সম্ভবপর হবে না ভেবেই সে সোজাসুজি প্রশ্ন করল, আচ্ছা বাহাদুর, চা খেয়ে ফেরবার পর তুমি যদি তিন নম্বরে যেতে, তা হলে গঙ্গারাম কি সেখান থেকে তোমায় দেখতে পেত?

আলোটা ঠিক করবার জন্যে গঙ্গারাম নিজেই তক্ষুনি তিন নম্বরের দিকে যায়, তারপর সে ভাঁড়ার-ঘরের দিকে যায় একটা নতুন বালব আনবার জন্যে। তখন যদি আমি তিন নম্বরের দিকে যেতুম, তাহলে সে না-ও দেখতে পেত।

প্রতুল সহজ কণ্ঠে বলল, আমিও তাই ভেবেছিলুম। এই জুতো-জোড়াই কি কাল রাতে তোমার পায়ে ছিল?

না, কাল রাতে বৃষ্টি দেখে রবারের তলাওয়ালা জুতোটা পরে এসেছিলুম।

নাগরমল উত্তেজিত হয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, চোখের ইশারায় প্রতুল তাকে সতর্ক করে দিয়ে আবার বলল, বাহাদুর, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, বিলাসবাবুর মৃতদেহের পাশে একজন রবারের জুতোওলা লোক দাঁড়িয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি; সে মৃতদেহ ডিঙিয়ে গিয়েছিল, তার পায়ের রক্তমাখা অনেক ছাপও পাওয়া গেছে।

বাহাদুর একটুও না দমে চট করে জবাব দিল, সেটা আপনাদের সূত্রও হতে পারে, আবার কারও সাজানো হতে পারে?

পারে যে তা আমি স্বীকার করছি, কিন্তু যতক্ষণ না সাজানো বলে সেটা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ সূত্র বলেই ধরব। কাল রাতে তুমি যে জুতো-জোড়াটা পরেছিলে, আমি সেটা একবার দেখতে চাই।

নিশ্চয় দেখতে পাবেন।

আচ্ছা, গঙ্গারাম যখন কাল রাতে কী সব ছায়ামূর্তি দেখেছে বলে খোঁজ নেবার জন্যে তোমার সাহায্য চায়, তুমি তখন তার সঙ্গে যেতে রাজি হওনি কেন?

বাহাদুর ঘৃণা-মাখা মৃদু হেসে বলল, গঙ্গারামকে আপনি চেনেন না, কিন্তু আমি ভালোই চিনি। যে যাহোক, তার সঙ্গে যেতে তো অস্বীকার করিনি আমি; কারণ তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে মোটে বলেইনি সে আমায়। আর তা ছাড়া তার সব পাগলামি যদি শুনতে হয়...।

বুঝলুম। তার দেখা একটা মূর্তিকে তুমি বিনয়বাবু বলেছিলে; আর দুজনের কথা কিচ্ছু বলইনি। চিৎকার শোনার পর গঙ্গারাম যে-মূর্তিটাকে দেখে, আমার বিশ্বাস সে তোমার মেয়ে।

বাহাদুর কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল, আমার মেয়ে কাল স্টুডিয়োতেই ছিল না।

প্রতুল সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, তুমি বোধহয় তার নামটা খাতাতে লেখইনি?

বাহাদুর জ্বলে উঠল; রুষ্টকণ্ঠে বলল, আপনি কি বলতে চান, বাপ হয়ে আমি নিজের মেয়েকে বিলাসবাবুর মতো লোকের সঙ্গে রাতে একলা দেখা করতে দেব? আবার সেটা ঢাকবার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে? আমি তাকে রাতে স্টুডিয়োতে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি।

তার কথার মধ্যে যে-বেদনা আর ঋজু আত্মসম্মানের সুরটুকু ফুটে উঠল, তাতে প্রতুল বুঝতে পারল, মেয়ের জন্যে কী গভীর স্নেহ এই বলিষ্ঠ-গঠন লোকটার কঠিন বুকের ভিতর সঞ্চিত আছে। গলাটা কোমল করে সে বলল, খুনের তদন্ত করতে গেলে আমায় অনেক কিছুই ঘাঁটতে হবে বাহাদুর, তাতে মনে তোমার যতখানিই আঘাত লাগুক না কেন। কাল রাতে তোমার মেয়ে কোথায় ছিল?

এক লহমার জন্যে ইতস্তত করে বাহাদুর জবাব দিল, জানি না।

আজ সকালে যখন বাড়ি ফিরলে, তখন সে কোথায় ছিল?

ছোট-ছোট কমিক বইতে মাঝে-মাঝে সে দু-একটা খুচরো পার্ট করে, তাই একটু সকাল করেই স্টুডিয়োতে চলে এসেছিল, আমি গিয়ে দেখতে পাইনি।

তোমার কি তাই বিশ্বাস?

না বিশ্বাস করার তো কোনও কারণ নেই হুজুর।

ওটা আমাদের একবার জানা দরকার, নাগরমলবাবু।

নাগরমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, তার জন্যে আর কী? আমি এক্ষণে আমার সেক্রেটারিকে ডাকিয়ে সব বন্দ্‌বস করিয়ে দিস্‌সি...।

প্রতুল ফিরে তাকাতেই দেখল, বাহাদুরের মুখটা ছাইয়ের মতো সাদা হয়ে উঠেছে। বলল, তুমি খাতায় লিখেছ অলকাদেবী একটার পর আর বিনয়বাবু তারও মিনিট পনেরো পর স্টুডিয়ো থেকে যান। অত রাত অবধি ওঁরা স্টুডিয়োতে কী করছিলেন বলতে পারো?

অলকাদেবী তাঁর নতুন বইয়ের পার্ট পড়তে এসেছিলেন; বোধহয় নিজের ঘরে বসে-বসে পড়ছিলেন; আজকেই তাঁর শেষ করে দেওয়ার কথা ছিল। তবে বিনয়বাবুর অত দেরি করে যাবার কী কারণ থাকতে পারে জানি না; তিনি তাঁর সিনারিও খাতাখানা সেটে ফেলে গেছলেন, তাই নিতে এসেছিলেন। শেখরবাবু সেটে কাজ করছিলেন, মাঝে-মাঝে তিনি কাউকে ঢুকতে দেন না সেখানে, তাঁর সহকারীকেও না; তাই বিনয়বাবুকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তার পরেও কেন ছিলেন বলতে পারব না।

বেরিয়ে যাবার সময় দুজনের কারও মধ্যে তুমি কোনও বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলে?

অলকাদেবী সবসময়েই একটু হাসি-খুশিভাবে থাকেন; সকলের সঙ্গে ডেকে-ডেকে কথা বলেন। কালকে, যেন একটু দমে যাওয়া মতন মনে হল। ভালো কথাবার্তা বলেননি। তবে সেটা অতক্ষণ পর্যন্ত নিজের পার্ট পড়ে হয়েছিল কি না বলতে পারব না।

আর বিনয়বাবু?

বিনয়বাবুর কোনও তফাৎ দেখিনি হুজুর; খালি মনে হয়েছিল, তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সারাদিন শেখরবাবুর সঙ্গে কাজ করে ওরকম হওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। তাঁর সঙ্গে যে কাজ করেছে, সে-ই স্বীকার করবে।

প্রতুল এতক্ষণ তার সামনে খোলা খাতাটার পানে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ একসময় মুখ খুলে বলল, আচ্ছা বাহাদুর, অলকাদেবী কাল রাতে সবসময় তাঁর ঘরে ছিলেন কি না, ঠিক করে বলতে পারো? গঙ্গারাম যে তাঁকেই সিঁড়ি দিয়ে বিলাসবাবুর ঘরের দিকে ছুটে যেতে দেখেনি, সে-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?

এ-সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না হুজুর!

বিনয়বাবু সবসময় তাঁর অফিসে ছিলেন কি না, বলতে পারো?

না হুজুর, তাও বলতে পারি না।

তোমরা যখন চা খাচ্ছিলে, বিলাসবাবু তখন ফিরে এসেছিলেন কি না, তাও জোর করে বলতে পারো না?

না, পারি না।

ফিরে এসে তুমি যে তিন নম্বরে যাওনি, গঙ্গারামের পক্ষে তাও জোর করে বলা বোধহয় সম্ভবপর নয়?

যদি না নজর রাখব বলে আমার গতিবিধি লক্ষ্য করে—আমার মনে হয়, তা সে করেনি—তাহলে বলা সম্ভবপর নয়।

প্রতুল জিগ্যেস করল, কেন তোমার মনে হয় যে, সে করেনি?

আমার বলা ভুল হয়েছে। আমার বিশ্বাস, তা সে করবে না।

তিন নম্বর থেকে যখন চিৎকারটা আসে, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

এমন কোনও চিৎকারই আমি শুনিনি।

এইসময় নাগরমলের সেক্রেটারি ঘরে প্রবেশ করল; বলল, উলকি কাল বিকেলে শরীর খারাপ বলে স্টুডিয়ো থেকে চলে যায়। তারপর আজ মোটেই আসেনি।

৯

রাখালের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় যেটুকু অংশমাত্র সে ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল, সেটা অম্লান মুখে তৎক্ষণাৎ বিনয় গলাধঃকরণ করে ফেলল। তার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল অলকার নত দেহটা সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বিলাসের ঘরে টেবিলের ওপর চিঠিখানা রেখে দিচ্ছে। কাজটা সে ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিল; পরক্ষণে এর নিরর্থকতাটা বুঝতে বাকি রইল না তার। স্বাক্ষর বা শিরোনামা চিঠিতে থাক আর না-ই থাক, চিঠিটুকু পেলেই পুলিশে সত্য কথাটা আবিষ্কার করে ফেলবেই। গতকালও যদি তাকে কেউ এরকম নির্বুদ্ধিতার কোনও কাহিনী শোনাত, তা হলে বিদ্রূপভরে সে নিশ্চয়ই হেসে উঠত। আর আজ? চিঠির শেষ অংশটুকু যেন আর তার গলা দিয়ে নামতে চাইছিল না।

নিজের ওপরই অকারণ ক্রোধে বিনয় ঘরময় ছোটাছুটি করে বেড়াতে লাগল; যে-ভুলটুকু সে করে ফেলেছে, সেটাকে সংশোধন করে নিতেই হয়তো এখন তার সমস্ত ক্ষমতা এবং উদ্ভাবনী শক্তিটুকু নিয়োজিত করতে হবে।

অন্যমনস্কের মতো দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো ছবিগুলোর পানে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল।

কাল এগুলোর দাম ছিল তার কাছে, আর আজ? আজ ওগুলো শুধু তার অতীত জীবনের সাক্ষ্য দেবে। অদূর ভবিষ্যতে ঘনিয়ে উঠেছে ঘন কালো যবনিকা। হত্যার সন্দেহে আজ সে নিজের ঘরেই নজরবন্দি—বাইরের পদচারণারত পুলিশ প্রহরীটি অনবরত এই কথাটাই বিঁধে থাকা কাঁটার মতো তাকে খোঁচা দিতে লাগল।

বিলাসের জন্যে কোথাও তার দুঃখ করার মতো কিছু নেই; দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা যা কিছু—তা শুধু অলকাকে ঘিরেই। তার পেলব তনুটাই বারে-বারে চোখের সামনে ভেসে ওঠে—অপূর্ব ভঙ্গিতে টেলিফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর মনে পড়ল তার নুটুর কথা। সকালে স্টুডিয়োতে পদার্পণের সঙ্গে-সঙ্গে যে-দৃশ্যের অভিনয় হয়।

নুটু শেখরনাথকে বিশেষ সুনজরে না দেখলেও, বিনয়কে সে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত।

বিনয় যখন স্টুডিয়োতে এল, নাগরমলের অফিস-ঘরের পাশে তখনও সে মুহ্যমানের মতো বসে। তার কাছে গিয়ে বিনয় রহস্যতরল কণ্ঠে হিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে নুটু? এখানে বসে?

কিছু হয়নি।

বিনয় হেসে বলল, দেখে মনে হচ্ছে যেন বেজায় অসুখ। উচিত তোমার হাসপাতালে গিয়ে একদাগ জোর জোলাপ মেরে দেওয়া।

নুটু করুণ মুখভঙ্গি করে বলল, সত্যি বলছি হুজুর, আমার কিচ্ছু হয়নি। আর কোনও মিথ্যা তার মুখে জোগাল না।

বিনয় এগিয়ে এসে খপ্ করে তার একখানা হাত ধরে ফেলে বলল, নিশ্চয় কিছু হয়েছে। ছিঃ, আমার কাছেও লুকোচ্ছিস?

নুটু প্রায় কেঁদে ফেলল। হায়, সে যে প্রতিজ্ঞা করেছে, কারও কাছে কিছু প্রকাশ করবে না বলে। কাতর কণ্ঠে বলল, আমার কোনও দোষ নেই হুজুর। আমার যে বলতে বারণ—

বিনয় শুধু বলল, বেশ তো, তা হলে বোলো না—

কথাটা ছোট, কিন্তু নুটুর মনে হল কে যেন তাকে ঘা কয়েক চাবুক কষিয়ে দিলে। কোনও কথা প্রকাশ করবে না বলে নুটু কিছু নাগরমলের কাছে শপথ করেনি, জানতে পারলে বড়জোর না হয় চাকরি যাবে; কিন্তু বিনয়ের কাছে এই সেদিনও সে প্রতিজ্ঞা করেছে, বকশিস পাওয়া পয়সায় সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত আর কোনওদিন বিড়ি কিনে খাবে না।

মনস্থির করে নিয়ে একনিশ্বাসে সে বলে ফেলল, বিলাসবাবু তিন নম্বরে খুন হয়ে পড়ে আছেন; আমিই আগে তাঁকে... কথাটা সে শেষ করতে পারল না। অকস্মাৎ তার হাতের ওপর বিনয়ের মুষ্টিটা বজ্র হয়ে উঠতেই, থেমে পড়ে হাঁ করে সে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মরা মানুষের মতো সেটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, চোখ দুটো দিয়ে বেরোচ্ছে আগুন। অকস্মাৎ তার হাত দুটো ঠেলে দিয়ে বিনয় যে-পথে এসেছিল, সে তার বিপরীত পথে ছুটল।

টেলিফোনটা বেজে উঠতেই নাগরমল তাড়াতাড়ি রিসিভারটা তুলে নিল, প্রতুল বসে-বসে শুনতে লাগল তার পারিবারিক ইতিহাস।

না, না, এখন আমি ভয়ানক ব্যস্ত আসি ভেইয়া। হামার কাসে বসে আসেন প্রতুলবাবু...হ্যাঁ, পুলিশের গোয়েন্দা। ...ভয় পাবার কী আসে? আরে ছ্যোঃ! এখন মোকাম যেতে পারব না। আজ পারব কি না সন্দেহ। ...দুর্গা আসে? ...আজ কোঠী যেতে পারব না মাইয়া। ...হ্যাঁ, কাল যাব। তুমি নিদ যাও।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই প্রতুল জিগ্যেস করল, অলকাদেবী কোথায়, কোনও খবর

পেয়েছেন?

হাঁ, হাঁ, আজ কোনও কাম নেই বলে এক বন্ধুর সাথ তিনি ডায়মন্ডহারবারে ঘুমনে গিয়েসেন। আমি লোক পাঠিয়েসে, আট বাজে এখানে চলিয়ে আসবেন বলে পাঠিয়েসেন। সাত বেজে গিয়েসে, আর একটু বাদ...

প্রতুল বলল, তার আগে বিনয়বাবুকে আমি গোটা কয়েক কথা জিগ্যেস করে নিতে চাই। একটু চা পেতে পারি কি তার আগে?

জরুর। হামি আভি বলিয়ে দিসসে।

চা-পান করতে-করতে নাগরমল প্রশ্ন করল, বাহাদুরের কথা শুনে আপনার কী মালুম হল প্রতুলবাবু?

দলের মধ্যে সে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী।

বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত শব্দ মুখ দিয়ে বার করে নাগরমল প্রতুলের মুখের পানে তাকিয়ে রইল।

অবাক হবার কিছু নেই নাগরমলবাবু। এমন অনেক জিনিস সে জানে, অথচ কিছুতেই বলছে না। যে-মুহূর্তে আমি খুনের দায়টা তার মেয়ের কাঁধে চাপাব, সেই মুহূর্তেই সে এমন একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে যে আসল দোষীকে ধরা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে।

হয়তো তার লেড়কী এ-কাজ করেনি!

হতে পারে। এমন কথা তো আমি কিছু বলিনি যাতে সে এ-কাজ করেছে প্রমাণ হয়। মুশকিল হচ্ছে যত সাক্ষী-প্রমাণ পাচ্ছি, সূত্রও তত পাওয়া যাচ্ছে—সেইটাই হচ্ছে সবচেয়ে গোলমেলে কথা।

নাগরমল কুণ্ঠিতস্বরে বলল, বাহাদুর কিন্তু খুন করার আদমি নয়।

না, খুন করার নয়—মারার।

তার মানে?

মানে আমিও হত্যাকারী নই, তবে দরকার হলে এখনই মেরে ফেলতে পারি। ধরুন, পথে একটা সাপ পড়ে আছে। এমন একদল লোক আছে যারা অম্লান মুখে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে; আর একদল লোক আছে, যারা সাপটাকে না মেরে ফেলা পর্যন্ত যেন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারবে না। বাহাদুর যেমন চালাক, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সে জানে, কোথাকার জল কোথায় গড়াবে; কী করতে হবে না হবে, ভেবেও রেখেছে সেই মতো; আইন-কানুনও ভালোমতোই জানে।

চায়ের কাপটা শেষ করে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে আবার বলল, যদি কিছু মনে না করেন, বিনয়বাবুকে এবার তা হলে ডেকে পাঠাই। অলকাদেবী এসে পড়ার আগেই তাঁর কাছ থেকে যা কিছু জানবার আমি জেনে নিতে চাই।

জরুর। বলেই নাগরমল টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

বিনয় দেখতে সুশ্রী। গভীর কালো চোখে একটা স্বচ্ছ সরলতা খেলা করতে দেখা যায়।

তাকে দেখেই প্রতুল আপনমনে বলে উঠল, হুঁ, ইনি দেখছি যা জানেন, তার অনেক কিছুই বলতে রাজি নন। অকস্মাৎ তার ব্যবহার এমনই রুক্ষতায় নির্মম হয়ে উঠল যে, নাগরমল আপত্তি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কঠোর কণ্ঠে প্রতুল তাকে থামিয়ে দিল। নাগরমল আর কিছু বলতে সাহস পেল না বটে, কিন্তু এই লোকটির স্টুডিয়োয় পদার্পণের ক্ষণটিকে মনে-মনে অভিশাপ না দিয়ে পারল না।

প্রতুল কঠোর কণ্ঠে বলল, আপনি বলতে চান, সিনারিও খাতাখানার জন্যেই আপনি সেটের দিকে যান? তাতে কি আপনার দু-ঘণ্টা লেগেছিল?

বিনয় শান্ত কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, খাতা নেবার পর কী করেছি না-করেছি, সেটা আমার ব্যক্তিগত কথা।

ভুল কথা। আশাকরি, হাজতে এক রাত্তির থাকলেই আপনার বুদ্ধির বন্ধ চোখটা একটু খুলবে।

আমার বিরুদ্ধে আশাকরি, আপনি এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাননি, যাতে এখনই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।

আপনাকে ঢের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাখাল সেটা করেছে। কথা হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে আমরা এখনও এমন কোনও প্রমাণ পাইনি—যাতে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারি।

বুঝলুম; কিন্তু মুখে যা বলছেন, কাজে তো তা প্রমাণ করতে হবে?

হবে বইকী। শেখরবাবু আর বিলাসবাবু স্টুডিয়ো থেকে চলে যাওয়ার পর অলকাদেবী কোথায় ছিলেন?

বিনয় চুপ করে রইল।

প্রতুল আবার বলল, আচ্ছা, ওটার উত্তর না দিলেও এটার দিতে আশাকরি, কোনও আপত্তি হবে না। শেখরবাবুরা চলে যাওয়ার পর যে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল আপনার—কে সে?

কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গেই আমি কথা কইনি।

প্রতুল কর্কশকণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু আমি একজন স্ত্রীলোকের রক্তমাখা আঙুলের ছাপ সেটের ক্যানভাসের দেওয়ালে পেয়েছি।

বিনয় শিউরে উঠল। তার এই কম্পনটা অতি স্থূলদৃষ্টি লোকেরও চোখ এড়াত না। প্রতুল বুঝল, এ রকম প্রশ্নের জন্য এই লোকটি প্রস্তুত ছিল না। বলল, ওই আঙুলের ছাপগুলো, আর অলকাদেবীর লেখা চিঠির ছাপ—যেটা আপনি অমন সযত্নে খেয়ে ফেলে বাঁচতে চেয়েছিলেন—এই দুটো মেলালেই বুঝতে পারব, আঙুলের ছাপটা কার। বাহাদুরের লেখা খাতামতো দেখা যায়, অলকাদেবী ছাড়া আর কোনও স্ত্রীলোকই কাল রাতে স্টুডিয়োতে আসেননি, কাজেই...।

বিনয়ের মনে হল, একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত ক্রমাগত যেন তাকে তলের দিকে টানছে; নিজেকে আর সে কোনওমতে স্থির রাখতে পারছে না। মুখ-চোখ তার আরও শুষ্ক হয়ে উঠল।

প্রতুল এ-সুযোগ ছাড়ল না। বলল, অলকাদেবীর সঙ্গে আপনার কী সম্বন্ধ—সেটা আমাদের অজানা নেই। চিঠিতে তিনি হত্যাটা স্বীকার করা ছাড়া আর বড় বেশি কিছু বাকি রাখেননি। চিঠিটা পড়েছেন বোধহয়? সময় পাননি? খালি তলায় তাঁর নামের স্বাক্ষরটা দেখেই ছোঁ মেরে সরিয়ে ফেলবার সাধ জাগল? পড়লে হয়তো আপনি জানতে পারতেন...।

দয়া করে থামুন আপনি। আমি সব স্বীকার করছি; আমিই করেছি এ-কাজ।

প্রতুলের মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র একটা হাসি।

নাগরমল একান্ত শ্রান্তভাবে হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে পড়ল। একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে বলল, তুমি করিয়েস বিনয়বাবু? কেন করলে এমন কাজ? বিলাসবাবু পয়লা নম্বর বদমাশ ছিল। তার জন্যে তুমি কেন এইসা কাম করলে?

বিনয় ম্লানভাবে মৃদু হেসে বলল, ব্যস্ত হবেন না নাগরমলবাবু! যা হয়ে গেছে, তার তো আর কোনও চারা নেই।

বিনয়বাবু, হাতে—হাতে আপনার হাতকড়া কেন?

ঘরের সকলে চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিবর্ণ মুখে অলকা। দীর্ঘপল্লব চোখের পাতে গভীর আতঙ্কের ছায়া, রাঙা ঠোঁট দুটো মৃদু-মৃদু কাঁপছে।

নাগরমল উঠে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে বলল, ঘাবড়ো মত লেড়কী।

অলকা নিজের হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে বলল, আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না নাগরমলবাবু।

আমি ঠিক আছি। শুধু আদত ব্যাপারটা আমি জানতে চাই বিনয়বাবু! স্টুডিয়োয় ঢোকবার মুখেই আমি শুনেছি যে, বিলাসবাবু খুন হয়েছেন। আপনি—আপনি বলুন... চোখ ছেপে তার জল এল।

প্রতুল সংযত কণ্ঠে বলল, উনি স্বীকার করেছেন যে, এ-কাজ ওঁরই...

বিদ্যুতের বেগে অলকা তার পানে ঘুরে দাঁড়াল। ঝড়ের মতো একনিশ্বাসে বলে চলল, উনি স্বীকার করেছেন? আপনি না গোয়েন্দা? বাজারে না আপনার প্রশংসা ধরে না? আপনি ওঁর কথা বিশ্বাস করে স্বচ্ছন্দে ওঁর হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিলেন? বাঃ! আমাদের দেশ বলেই তাই—অন্য কোনও দেশ হলে...।

ধীরকণ্ঠে প্রতুল বলল, আমি জানি অন্য দেশে পাকা গোয়েন্দার অভাব নেই, কিন্তু কী করব? নিজে স্বীকার করলে অন্য কোনও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ-ব্যবস্থা করতে বাধ্য আমরা।

বাধ্য আপনারা? জিগ্যেস করি, নিজের মুখের দুটো বাজে কথা ছাড়া আর কী প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা?

একটা প্রমাণ হল—বিলাসবাবুর ঘরে ঢুকে ইনি আপনার লেখা একখানা চিঠি তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন...।

অলকা ঘৃণার হাসি হেসে বলল, আর সেইটে অবলম্বন করেই আপনারা এঁকে ভাবতে বাধ্য করেছেন যে এ-কাজ আমারই। কাজেই উনি স্বীকার করেছেন অপরাধটা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে। জিগ্যেস করি, এমন ব্যাপার কি এর আগে আর কেউ কোনওদিন করেনি? আপনারা বিশ্বাস করলেন এ-কথা? বিনয়বাবু, দোহাই আপনার, আমার জন্যে মিথ্যে বলবেন না, পরের জন্যে নিজের সর্বনাশ টেনে আনবেন না। সত্যি ঘটনাটা এঁদের খুলে বলুন।

অলকা! —একটা কী বলতে গিয়ে বিনয় আবার স্তব্ধ হয়ে গেল। কী বলবে সে? বলবার আছেই বা কী? সত্যি ঘটনা প্রাণান্তেও সে প্রকাশ করতে পারবে না।

অলকা স্থিরদৃষ্টিতে প্রতুলের মুখের পানে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, বেশ, সত্যি কথা তা হলে আমিই বলছি। বিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে কাল রাতে আমি স্টুডিয়োতে ইচ্ছে করেই এসেছিলুম প্রতুলবাবু, কারণ তার কাছে আমার লেখা কতকগুলো চিঠি ছিল—

অলকা—অলকা, দোহাই তোমার—থামো, থামো...।

না, থামব না আমি। আমি...।

বিনয় প্রতুলকে বলল, উনি যা বলছেন, সব আমাকে বাঁচাবার জন্যে। ও-সব শুনে আপনার তদন্তের কোনও সাহায্য হবে না। আপনার যা জিগ্যেস করবার আছে, স্বচ্ছন্দে আমাকে করুন; আমার অপরাধের প্রমাণ পাবার চেষ্টা করুন। সেটে আমি কাল রাতে গিয়েছিলুম। আমার আঙুলের ছাপও ক্যানভাসের দেওয়ালে পাবেন—এটা আপনার মস্ত বড় প্রমাণ।

প্রতুল বলল, সেটা আমি বুঝি। আপনার পায়ে কি কাল রাতে রবারের জুতো ছিল?

হ্যাঁ, ছিল।

প্রতুল উঠে গিয়ে নাগরমলের টেবিলের ওপর থেকে একখানা কাগজ তুলে নিল। খুলতেই দেখা গেল, ভেতরে লাল কাদার ছাপ। বলল, পা থেকে জুতোটা আপনার খুলে ফেলুন বিনয়বাবু।

না, না, দোহাই আপনার বিনয়বাবু! অবরুদ্ধ অশ্রুবেগে ফুলতে-ফুলতে অলকা বলে উঠল।

প্রতুল বিনয়ের জুতোটা পা থেকে খুলে নিয়ে একটা ছুরি দিয়ে গোড়ালি থেকে কতকটা ধুলো বার করে নিল। পাশের কাদাটার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে। আপনি নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে বিলাসবাবুর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বিনয়বাবু, যার ফলে রক্তটা বেশ করে আপনার জুতোর গোড়ালির গর্তে প্রবেশ করেছে, মেঝেতেও বেশ স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়—।

অলকা আকুল ক্রন্দনে লুটিয়ে পড়ল একখানা চেয়ারের ওপর। নাগরমল হতবুদ্ধির মতো বিনয়ের পানে তাকিয়ে শুধু বসে রইল।

প্রতুল বলল, এর পরেও আপনার স্বীকার করার মতো আর কিছু আছে বিনয়বাবু?

বিনয় হাতটা একবার তার উষ্ণ কপালের ওপরে বুলিয়ে নিল। একটা কী জিগ্যেস করবার জন্যে ঠোঁট দুটোও তার স্ফুরিত হয়ে উঠল; কিন্তু পরক্ষণে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে অতি ধীর এবং স্পষ্টভাবে বলল, না, আর কিছু নেই...।

১০

দু-হাতে চেয়ারখানা শক্ত করে ধরে অবরুদ্ধ কণ্ঠে অলকাদেবী বলে উঠল, আপনারা—আপনারা সকলেই কি পাগল হয়েছেন?

রাখাল একটু আগেই ঘরে ঢুকেছিল। ঘরের দৃশ্যটা যে উপভোগের সে-বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না। প্রতুলের আহ্বানে সচেতন হয়ে উঠে সে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলল, কী বলছেন স্যার?

শেখরবাবুর কথা সত্যি কি না জেনেছ?

হ্যাঁ স্যার। তাঁর সোফার বলল, শেখরবাবু ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলেন, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আলো জ্বেলে বই পড়তে বসেন।

দৃষ্টিটা তার ঘুরে-ফিরে ঘন-ঘন বিনয়ের ওপর পড়ছে দেখে প্রতুল মৃদু হেসে বলল, উনি সব স্বীকার করেছেন।

ও। —বলে রাখাল এমনভাবে মুখভঙ্গি করল, যেন এত সহজে শিকার করতলগত হওয়ায় সে মোটেই সুখী হতে পারেনি। বিনয়ের হাতকড়া ধরে টানতে-টানতে আপনমনেই সে বলে উঠল, নাঃ, হাত এখনও পাকেনি দেখছি। গায়ের ঝালে পড়ে কাজটা করে ফেলেছে...

বিনয়ের ইচ্ছে করছিল, বজ্রমুষ্টিতে লোকটার দাঁত ক'টা সব উপড়ে আনতে। হাতকড়া-বদ্ধ হাত দুটো অতর্কিতে একবার শূন্যে উঠলও; কিন্তু এরকম সম্ভাবনার জন্যে রাখাল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। চকিতের মতো এক-পা পিছু হটে গিয়ে, সবলে ধাক্কা দিয়ে সে বিনয়কে চেয়ারে বসিয়ে দিল। ভারিক্কি চালে বলল, ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না। সুড়সুড় করে ভালোমানুষের মতো যদি আসো তো তোমারই মঙ্গল, নইলে মাথাটা ছাতু বানিয়ে লঙ্কা মেখে খেয়ে ফেলব।

প্রতুল কঠিন কণ্ঠে ডাকল, রাখাল!

রাখালের অত বীরত্ব-দর্পে কে যেন এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল। বলল, দেখুন না স্যার, কেউটের মতো আবার ছোবল তোলে! তারপর বিনয়ের দিকে ফিরে, হাতকড়াতে একটা প্রবল টান দিয়ে বলল, চল হে গোঁসাইঠাকুর—

বিনয়ের চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরোতে লাগল। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতুলকে বলল, এগুলো আমার হাত থেকে খুলে নিতে বলুন; নইলে কারও সাধ্য নেই, এখান থেকে আমায় এক-পা-ও নড়ায়! সুন্দর তদন্তের কায়দা আপনাদের। একদিন স্টুডিয়োতে পদার্পণ করেই শিকারের তাক করলেন একটি অসহায়া স্ত্রীলোকের ওপর। কে আপনাদের বলল, কাকে কান নিয়ে গেছে, আর হস্‌সি-দীঘ্‌ঘি জ্ঞান হারিয়ে অমনি ছুটলেন আপনারা কাকের পেছন-পেছন। খুনি আসামি পাকড়াবার চমৎকার ব্যবস্থা বটে! জানেন আমি স্বীকার করবই, তা করেওছি; কিন্তু তাই বলে এরকম একটা ফেউকে পেছনে ছেড়ে দেবার কোনও অধিকারই নেই আপনাদের। হাতকড়া খুলে দিতে বলুন। যদি যেতেই হয়, ভদ্রলোকের মতো যাব। এরকম জানোয়ারের সঙ্গে যাবার কোনও অভিরুচিই নেই আমার।

প্রতুল ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, রাখাল, বাইরে গিয়ে হরেনকে পাঠিয়ে দাও।

রাখাল আর দ্বিতীয় কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু যাবার সময় দু-চোখের অগ্নিশিখায় বিনয়কে দগ্ধ করে যাবার চেষ্টা করতে ভুলল না। পৌরাণিক যুগ হলে হয়তো বিনয়ের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া ওইখানেই সমাপ্ত হয়ে যেত।

হরেন আসতেই প্রতুল বলল, হরেন, বিনয়বাবুকে নিয়ে যাও হাজতে। তোমার কড়া নজর রাখবার দরকার নেই। পালাবার কোনও চেষ্টাই উনি করবেন না।

হরেন মাথা দুলিয়ে বলল, আচ্ছা স্যার। আপনি তা হলে চলুন বিনয়বাবু—

সম্বিৎহারার মতো অলকা কতক্ষণ চেয়ারে পড়ে রইল, তার চোখের সামনে দিয়েই বিনয় ধীরে-ধীরে হরেনের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কতক্ষণ পর অকস্মাৎ সচেতন হয়ে সে প্রতুলের দিকে ফিরে বলল, আপনি... আপনি জানেন, উনি করেননি, তবু ওঁর ভাগ্যে এই লাঞ্ছনা জুটল। ভেবেছেন এর কি কোনও প্রতিফল নেই? এর চেয়ে ঢের বেশি শাস্তি ভগবানের কাছে তোলা আছে আপনাদের জন্যে।

প্রতুল মৃদু কণ্ঠে বলল, আপনি একটু ভুল করছেন; ভগবানের হাত থেকে পাওনা শাস্তি নিতে কোনওদিনই আমার কোনও আপত্তি নেই; কিন্তু এ-হত্যা-রহস্যের এখনও আমি কিছুই জানি না।

নাগরমল গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আহা বেচারা! কিন্তু বিনয় স্বীকার করার সঙ্গে-সঙ্গে যদি সব গোল মিটিয়ে যায়, আমার জানটা বাঁচে। কিন্তু ছোকরা বড় ভালো লোক আসিল।

অনেকটা রাত।

গঙ্গারাম স্টুডিয়োর পেছন দিকে রোঁদে গেছে।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি হানতে-হানতে বাহাদুর ছোট হাসপাতাল-বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল এবং বন্ধ দরজায় করাঘাত করার সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা খুলে গেল, কারণ নার্স লতিকা তারই প্রতীক্ষা করছিল।

ভেতরে ঢুকেই বাহাদুর পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, উলকি যে এইখানেই আছে, এ-কথা আমাকে আগে জানাননি কেন?

লতিকা তেমনিই দীপ্তকণ্ঠে জবাব দিল, বেচারা তোমার ভয়েই কাঁটা; তোমাকে খবর দিতে তার মানা ছিল।

কাল রাতে সে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল?

লতিকা বলল, তা বলতে পারব না; কাল রাতে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যাই; আজ সকালে এসে দেখি না ভুল বকছে; মাথার বোধহয় কী গণ্ডগোল হয়েছে।

তার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পাব না?

উলকির অসুখ ভারি বলেই মনে হয়। তার ওপর মাথার গোলমাল। যদি ভালোমানুষের মতো কথাবার্তা বলো তো রাজি আছি, নইলে ডাক্তারবাবুকে সব বলতে আমি বাধ্য হব।

বাহাদুর আর কোনও কথা না বলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লতিকা কতক্ষণ সেদিক পানে তাকিয়ে থেকে, আপনমনেই বলে উঠল, আমি আর কী করতে পারি? ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই! যদি বাহাদুর বাঁচায়, তবেই... ঘুরে সে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

বিছানার ওপর রোগ-মলিন-মুখে উলকি পড়েছিল; চোখের কোণে তখনও তার জলের রেখা। কিন্তু জ্ঞান ছিল না।

বাহাদুর স্তব্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল; মা-মরা এ-মেয়েটি আজ নতুন করে তার বুকে বেদনা জাগাল। কত যত্নে—কত আদরেই না সেই ছোট্ট মেয়েটিকে সে আজ এতবড় করে তুলেছে। চোখে তার জল এসে গেল।

চেয়ারের ওপর একখানা শাড়ি পড়েছিল, বাহাদুরের দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই সন্দিগ্ধের মতো গিয়ে সে কাপড়খানা তুলে নিল; না, সন্দেহ তার মিথ্যে নয়। রক্ত—শুষ্ক রক্ত জমাট বেঁধে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি কাপড়টা ভাঁজ করে সে তার মোটা কোটটার আড়ালে লুকিয়ে ফেলল।

১১

করোনারের তদন্ত নিয়ে সংবাদপত্রগুলোর মাতামাতির আর সীমা রইল না।

বাংলায় চিত্র-প্রতিষ্ঠানের পরমায়ু খুব বেশিদিনের নয়; তাকে ঘিরে আজও সাধারণ নর-নারীর মনে বেশ একটু কৌতূহল জমা হয়ে আছে। নামজাদা তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেন একটা বিশেষ জগতের জীব। তাই তাদেরই একজনের এই রহস্যজনক মৃত্যু যে পাঠকবর্গকে বেশ একটা সরস খোরাক জোগাবে—এটা ভেবে নিতে সংবাদপত্রজীবীদের বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি।

পরদিন প্রভাতে বড়-বড় হরফে প্রত্যেক কাগজের প্রথম পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হল :

অভিনেতা হত্যার মামলায় তিনজনের স্বীকারোক্তি

এই রহস্যজনক মৃত্যুতে বিশেষজ্ঞদের মত—সমস্ত চিত্র-ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জুবিলী স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ কী বলেন? এই মৃত্যু-রহস্য অপ্রকাশ রাখায় তাঁদের কোনও হাত নাই তো?

তারপরই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। একটি সংবাদপত্রে দেখা গেল :

গতকল্য করোনারের তদন্ত অভিনেতা বিলাসবাবুর হত্যারহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে শুরু করিয়াছে। যতদূর জানা যায়, এরূপ নৃশংস হত্যা বাংলাদেশে খুব বেশি পরিমাণে সংঘটিত হয় নাই।

অন্ধকার সেটের মাঝে, ক্যানভাসের প্রাচীরের অন্তরালে হতভাগ্য অভিনেতা বিলাস রায়কে গতকল্য প্রাতে একখানা রক্তমাখা ছোরা হাতে নিহতাবস্থায় দেখা যায়। সকলের অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় যে, তাঁহার প্রাণহীন নকল মূর্তিটি আগের দিন যে-অবস্থায় শায়িত ছিল, তাঁহাকেও ঠিক সেই অবস্থাতেই আবিষ্কার করা হয়।

সুবিখ্যাত গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী তদন্ত করিতে গিয়া বহু সূত্রেরই সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু কোনওটার সহিত কোনওটার মিল নাই।

আজ পর্যন্ত যে-সকল চমকপ্রদ ঘটনা এই হত্যা উপলক্ষে ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে সহকারী পরিচালক বিনয় মজুমদারের স্বীকারোক্তি অন্যতম। সেটের মাঝে যে-রক্তাক্ত পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, তাহা বিনয় মজুমদারেরই; তবে প্রাচীন-গাত্রে আঙুলের ছাপ কোনও স্ত্রীলোকের। রাতের প্রহরী গঙ্গারাম পূর্বদিন রাত্রে স্ত্রীলোকের আর্তধ্বনিও শুনিতে পায়। আবার স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে লেখা একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা :

আজ থেকে আমাদের মধ্যকার সব সম্বন্ধ শেষ...

এই চিঠি—প্রকাশ, জুবিলী স্টুডিয়োর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুন্দরী অলকাদেবীর এবং জানা গেল, ইহারই প্রেমে হাবুডুবু খাইতে-খাইতে বিনয় মজুমদার প্রেমের পাত্রীকে রক্ষা করিবার জন্যই নাকি স্বীকারোক্তি দিয়াছে।

ব্যাপারটার জটিলতার শেষ কিন্তু এখানেই নয়। বিয়োগান্ত নাটকটির এই অঙ্কে দ্বিতীয় একটি রহস্যময়ী নারীর প্রবেশ।

কে সে?

পরিচালক শেখরনাথই বিলাস রায়কে সর্বশেষ দেখেন। তিনি বলেন ১২-১৫ মিনিটে বিলাসবাবুকে সঙ্গে লইয়া তিনি স্টুডিয়ো হইতে বাহির হন এবং বিলাসবাবুর বাড়ির অনতিদূরে নামাইয়া দেন। দ্বারবান বাহাদুরের খাতা মিলাইয়া তাঁহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে।

তবে বাহাদুর এবং গঙ্গারাম উভয়ে মিলিয়া কি প্রকৃত অপরাধীকে গোপন করিতেছে?

ইহার পর যে-ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা আরও রোমাঞ্চকর।

করোনারের বিচার-কক্ষে দেখা গেল, দুইটি নর-নারী বসিয়া আছে। পুরুষটির মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ হইলেও স্থির, গম্ভীর; কিন্তু সুন্দরী তরুণীটির বৃহৎ চোখ দুইটিতে আতঙ্কের ছবি; রক্তহীন ঠোঁট দুইটি ঘন-ঘন কাঁপিতেছিল।

ইহারা বিনয় এবং অলকা।

করোনার তাঁহার তদন্ত শেষ করিতেছিলেন। গঙ্গারাম, বাহাদুর প্রভৃতির জবানবন্দি লওয়া শেষ হইলে অবশেষে বিনয় মজুমদারের বিবৃতি লইবার সময় অকস্মাৎ দেখা গেল, অলকার চোখ দুইটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে; ললাটদেশে স্ফীত শিরা এবং ঘন-ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস দেখিয়া মনে হইল, বুকের ভিতর তাহার তুমুল ঝড় বহিয়া চলিয়াছে।

ইহার পর বিনয় মজুমদার সিনারিও খাতা আনিতে একাকী সেটের ভিতর গিয়াছিল—যখন প্রমাণিত হইল, সেই সময় অলকা অকস্মাৎ তাহার আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে করোনারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনারা বিচারপতি; এ-ব্যাপারের ফলাফল নির্ভর করছে আপনাদের ওপর। তাই আমার প্রার্থনা, আমার বক্তব্যটা আপনারা দয়া করে শুনুন। প্রথমটা আপনারা বিশ্বাস নাও করতে পারেন, কিন্তু সবটা শুনলে প্রকৃত ঘটনাটা বুঝতে পারবেন বলেই আমার মনে হয়। স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, একসময় বিলাসবাবুকে আমি—আমি—মানে—একটু সুনজরেই দেখেছিলুম। কিন্তু তাই বলে সত্যিকার ভালো আমি তাঁকে কোনওদিনই বাসিনি। তাঁকে নিয়ে শুধু একটু খেলা করারই ইচ্ছা ছিল আমার; কারণ স্টুডিয়োতে পা দিয়েই শুনেছিলুম, বিলাসবাবু নাকি এর আগে অনেক রমণীর প্রাণ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন। কাজেই তাঁকে জয় করবার, তাঁকে নিয়ে ঠিক সেইরকমভাবে খেলা করার যে একটা বাসনা জাগবে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই।

একটুখানি দম লইয়া অলকা একবার চারিদিকে তাকাইয়া পুনরায় আরম্ভ করিল, কিন্তু তিনি যে অতবড় শয়তান, তা আমি কোনওদিন কল্পনা করিনি। খেলা করতে গিয়ে যেদিন দেখলুম, নিজেরই পাতা জালে নিজে জড়িয়ে পড়েছি, সেদিন আমার খুব ভয় হল; কিন্তু দিনরাত তাঁর উৎপাতের হাত থেকে নিষ্কৃতি ছিল না।

আবার স্তব্ধ হইয়া গিয়া অলকা একবার সপ্রেম দৃষ্টিতে বিনয়ের পানে তাকাইয়া শুরু করিল, তাঁর উৎপাত আমার আরও অসহ্য হল সেইদিন থেকে, যেদিন বুঝলুম, নিজের অজ্ঞাতেই আর-একজনের পায়ের তলায় মন আমার ডালি দিয়েছি। ভয় ছিল আমার সেইজন্যেই, পাছে আমার মনের দেউলের নতুন দেবতা বিরূপ হন।

অলকা চুপ করিতেই সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি গিয়া পড়িল বিনয় মজুমদারের ওপর। অলকা সমস্তই বুঝিল; কিন্তু অকম্পিত কণ্ঠে নিজের কাহিনী বলিয়া চলিল, বিলাসবাবুও যে আমার এই পরিবর্তন বুঝতে পারেননি তা নয়। আমার খানকয়েক চিঠি তাঁর কাছে ছিল; তিনি ক্রমাগত আমায়

ভয় দেখাতে লাগলেন—যদি আমি মত পরিবর্তন না করি, তা হলে চিঠিগুলো তিনি বিনয়বাবুকে দেখাবেন। অথচ তাঁর আগে আর কোনও পুরুষকে আমি সত্যিকার কোনওদিন ভালোবাসিনি, এ-কথা বিনয়বাবুকে কতদিন বলেছি, চিঠি দেখার পর আর কি তিনি আমার কোনও কথা বিশ্বাস করবেন? কাজেই বাধ্য হয়ে ওই দিন রাত্রে চিঠির জন্যেই আমি স্টুডিয়োতে গেছলুম। বিলাসবাবু বলেছিলেন, চিঠিগুলো সবসময় সঙ্গে করেই তিনি স্টুডিয়োতে আসেন। বিলাসবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর নামে একখানা চিঠি লিখলুম। ইচ্ছে ছিল, তারপর আমার চিঠিগুলো নিয়ে বাড়ি চলে যাব, কিন্তু সেগুলো কোথাও খুঁজে পেলুম না। কাজেই বাধ্য হয়ে আমায় অপেক্ষা করতে হল। কারণ আমি জানতুম, কাজ শেষ হলে জামাকাপড় ছাড়বার জন্য তিনি ঘরে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন না। কতক্ষণ কেটে গেল। তখন বাধ্য হয়ে সেটের দিকে চললুম; ভয় ছিল পাছে শেখরবাবু দেখে ফেলেন। কাজের সময় বাধা পেলে তিনি ভয়ানক চটে যান। তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত স্টুডিয়োর পেছনে ফুলগাছগুলোর আড়ালে লুকিয়ে রইলুম। বিলাসবাবু কিন্তু ঘরের দিকে না এসে, শেখরবাবুর সঙ্গে চলে গেলেন। তাঁদের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারলুম, কিন্তু দেখবার ভরসা হল না আমার। কী করব ভাবছি—দেখি না বিলাসবাবু সেদিকে আসছেন। সেটে ঢুকে তিনি একটু পরেই আবার চলে গেলেন; খানিক পরে আবার ফিরে এলেন—কেন তা বলতে পারব না। আস্তে-আস্তে তাঁর পেছন-পেছন সেটে গিয়ে দেখি, তিনি 'পড়া'টা রিহার্সাল দিচ্ছেন। খড়ি দিয়ে দাগ কেটে যে-জায়গায় ডামিকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, বিলাসবাবুকে ঠিক সেই জায়গায় পড়তে হবে। আগের দিন শেখরবাবু অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বিলাসবাবু কিছুতেই পারেননি। রাত্রে ফিরে এসেই তাই তিনি আবার রিহার্সাল দিচ্ছেন। আমি গিয়ে চিঠিগুলো চাইতেই তিনি হেসে উঠলেন; আবার চিঠির কথা বলতেই...।

পুনরায় অলকা স্তব্ধ হইয়া গেল। বোঝা গেল, দুঃসাহসিকা হইলেও ইহার পরের অংশটুকু প্রকাশ করিতে সম্ভ্রমে তাহার বাধিতেছে। কতক্ষণ পর বোধকরি কতকটা সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া সে আবার কহিল, হঠাৎ বিলাসবাবুর মূর্তি গেল বদলে; তারপর যেসব কথা আমাকে বলতে লাগলেন, তা আপনাদের কাছে বলবার ক্ষমতা নেই আমার। আমি দস্তুরমতো ভয় পেয়ে গেলুম; পালাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তার আগেই বিলাসবাবু আমাকে ধরে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে জোরে পারব কেন? তাই মুক্তি পাবার জন্যে আঁচড়াতে—কামড়াতে—হাত-পা ছুড়তে লাগলুম। বিলাসবাবু দৈত্যের মতো ততই হাসেন আর আমাকে বলেন, কাল আর তোমার এ-আপত্তি থাকবে না।

তাহার দুঃখের কাহিনীতে সারা ঘরখানা থমথম করিতেছিল; বহু শ্রোতার চোখে দেখা গেল সমবেদনার অশ্রু। ঘরের চারদিকে একবার তাকাইয়া লইয়া অলকা ভগ্ন কণ্ঠে কহিতে লাগিল। এরপর অলকা সাজল হিংস্র পশু; রক্তে সিক্ত করল তার হাত। কোনওরকমে তার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েই আমি তাড়াতাড়ি আর-একখানা যে-ছোরা পড়েছিল, সেটা তুলে নিয়ে ভয় দেখালুম—যদি আর এক পা-ও তিনি এগিয়ে আসেন, তা হলে তাঁকে খুন করতেও ইতস্তত করব না আমি। আমার কথা শুনে তিনি হেসে উঠলেন; বললেন, এ-কাজ আমি করতেই পারি না। কিন্তু বিলাসবাবু ভুল করেছিলেন। ছেলেবেলায় স্কুলে ছোরাখেলায় আমি যে বরাবরই সবচেয়ে ভালো ছিলুম, তা তিনি জানতেন না। তারপর—তারপর বাধ্য হয়েই আমাকে ছোরাখানা তাঁর বুকে...।

কথা শেষ হইবার পূর্বেই অলকাদেবী জ্ঞান হারাইয়া চেয়ারের উপর ঢলিয়া পড়িল। শ্রোতাদের ভিতর একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল। সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল, এইসময় জুবিলী স্টুডিয়োর দ্বারবান বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল, নির্দোষ লোক যাতে না অনর্থক শাস্তি পায়, সেইজন্যে হুজুরের কাছে এটা পড়ে দেখার প্রার্থনা জানাচ্ছি আমি।

করোনার কাগজটা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সকলে উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তিনি পড়িলেন ঃ

১১ই পৌষ রাত্রে আমি, বাহাদুর রাণা, জুবিলী স্টুডিয়োর অভিনেতা বিলাস রায়কে হত্যা করিয়াছি। আমার এই স্বীকারোক্তি আমি সুস্থ দেহ ও মনে করিতেছি এবং আমার স্বাক্ষর ও টিপসহি দিতেছি।

ইহার পর ঘরের মাঝে যে দৃশ্যের অবতারণা হইল, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। সকলেরই মুখে এক কথা। প্রকৃত অপরাধী কে? কতদিনে এ-রহস্যের মীমাংসা হইবে? গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী ইহার জবাব দিবেন কি?

সংবাদপত্রখানা হাতে নিয়ে প্রতুল হাসতে লাগল।

হরেন কী একটা সংবাদ দিতে একটু আগে ঘরে ঢুকেছিল; বলল, ওদের আর দোষ কী বলুন। আমরাই ঘাবড়ে যাচ্ছি কে খুনি তার হিসেব কষতে। আপনার কী মনে হয়?

প্রতুলের চোখ দুটো ছিল খবরের কাগজের পাতার ওপর। তেমনিভাবেই বলল, আমার মনে হয়, সবকটাই মিথ্যেবাদী।

হরেন চোখ দুটো বড়-বড় করে তার মুখের পানে চেয়ে রইল।

প্রতুল বলল, তিনজনের মধ্যে অলকাদেবীর স্বীকারোক্তির গল্পটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য; কিন্তু চোখ যাদের আছে, তারা দু-বার এটা পড়লেই বুঝতে পারবে গলদ কোথায়।

কেন স্যার?

প্রতুল হেসে ফেলল। বলল, বিয়ে হলে কথাটা আমার বুঝতে পারবে। পৃথিবীতে এমন মেয়ে কম দেখা যায়, যারা জন্ম-অভিনেত্রী নয়। তার ওপর অলকাদেবী তো পেশাদার। নাগরমলের মতো পাকা ব্যবসায়ী কি বলতে চাও, না বুঝেই ওঁর পেছনে মাসে-মাসে অতগুলো করে টাকা ঢালছেন? যাক, তুমি শেখরবাবুর ওখানে কদ্দুর কী করে এল বলো।

তিনি যা বলছেন সবই সত্যি, স্যার। রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে তিনি একবার থেমেছিলেন না? আমি খবর নিয়েছি, সেটা মিথ্যে নয়। মোড়ের কাছেই একটা চেনা দোকানদারের কাছ থেকে তিনি এককৌটো সিগারেট কেনেন।

দোকানদার শপথ করে বলতে পারে?

হ্যাঁ, স্যার। বিলাসবাবুকেও সে দেখেছে। তিনিও এককৌটো সিগারেট চান। দোকানদার তার ছোকরা চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ছেলেটা গিয়ে পেছনের সিটে সিগারেটটা দিলে তিনি তাঁর নামে লিখে রাখতে বলেন।

প্রতুল বলল, অলকাদেবীর কথা যে মিথ্যে, আশাকরি তা বুঝতে পেরেছ? চিৎকার শোনার কোনও কথাই তিনি উল্লেখ করেননি; সেটের মধ্যে ধস্তাধস্তির কোনও চিহ্নই আমরা পাইনি; অথচ তিনি বললেন, বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর ধস্তাধস্তি হয়েছিল। তিনি বলেছেন, বিলাসবাবু একটু পরেই ফিরে আসেন। অথচ বাহাদুর বলে, আসেননি তিনি। অথচ খুন যখন হয়েছেন, তখন এসেছিলেন, তাতে আর কোনও ভুল নেই। কিন্তু কী করে এসেছিলেন—সেইটে জানতে পারার সঙ্গে-সঙ্গেই হত্যা-রহস্যের কিনারা হয়ে যাবে আমাদের। তারপর ধরো বিনয়বাবুর কথা। তাঁর খুন করার উদ্দেশ্য অবশ্য একটা খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু অলকাদেবীকে বাঁচাবার চেষ্টাটাও তুমি বাদ দিতে পারো না। দেখতে নিরীহ প্রকৃতির লোক হলেও, সত্যিকার কাদা যে তিনি নন, সেদিন রাখাল ইচ্ছে করে উস্কে দিতেই আমি তা আবিষ্কার করেছি। তা ছাড়া ভাববার ক্ষমতাও তাঁর তীক্ষ্ণ।

হরেন মাথা চুলকে বললে, তাই তো, বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি! আপনি তো একে-একে সবাইকেই বাদ দিচ্ছেন। রইল তো একা বাহাদুর। সে-ও কি—

প্রতুল বলে উঠল, তার সম্বন্ধে একটা কথা বলতে পারি আমি যে, সে একটা কিছু গোপন করতে চায়; অথচ সেটার হদিস পায় প্রথম আমার কথাবার্তাতেই। আমি ইচ্ছে করেই সেটা তার কাঁধে চাপিয়েছিলুম। খুব নিকট একজনকে সে বাঁচাতে চায়; নিজের মেয়ে ছাড়া আর কে হবে? নইলে দুজনের স্বীকারোক্তির পর আবার তার স্বীকারোক্তির কোনও মানেই হয় না।

হরেন হতাশার মুখভঙ্গি করে বলল, আপনি যে সকলের কথাই উড়িয়ে দিচ্ছেন স্যার, কিন্তু একজন কেউ তো এ-কাজ করেছে?

প্রতুল অন্যমনস্কভাবে বলল, হ্যাঁ, তা করেছে বইকী, যদি ছোরাখানা বিলাসবাবু নিজেই না নিজের বুকে বসিয়ে থাকেন। আচ্ছা, তোমার সিগারেটের দোকানদার ক'টার সময় শেখরবাবু আর বিলাসবাবুকে দেখেছে বললে?

সে বললে সাড়ে বারোটা নাগাদ।

আচ্ছা, অলকাদেবী, বিনয়বাবু—এঁদের হাতে দস্তানা ছিল কি না জেনেছ?

ছিল স্যার।

প্রতুল আর কোনও কথা না বলে গভীর দৃষ্টিতে বাইরের পানে চেয়ে বসে রইল।

১২

পরদিন। উপরওয়ালার সঙ্গে প্রতুলের কথা হচ্ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন, স্টুডিয়ো খুনটার কতদূর কী হল মিস্টার লাহিড়ী?

এখনও পাকাপাকি অবশ্য কিছু হয়নি; তবে অনেকটা...।

কমিশনার সাহেব তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, দেখবেন আবার আলিপুরের সেই কেসটার মতো না হয়!

একটা দামি চুরুটের শেষ প্রান্তটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে-ফেলতে প্রতুল বলল, এ-খুনটা হচ্ছে ঠিক এই চুরুটটার মতো দামি, তৃপ্তিপ্রদ, অথচ বেশ একটু কড়া। হত্যাটা যে-ই করুক, তার রহস্যজ্ঞানটা যে বেশ তীক্ষ্ণ তা অস্বীকার করা চলে না। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বুঝি কোনও ছেলেমানুষের কাণ্ড। চারদিকে সূত্রের ছড়াছড়ি, কিন্তু সবগুলো মিলে এমন একটা জট পাকিয়ে তুলেছে যে মনে হয়, এর নিরাকরণ কোনওদিনই সম্ভব নয়। কাজেই বাধ্য হয়েই আমায় আদত ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়ে বাইরের জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। কদ্দিন যে লাগবে...

কমিশনার সাহেব উঠে সোজা হয়ে বসে বললেন, দেরি যদ্দিনই হোক, রহস্যের কিনারা আপনাকে করতেই হবে; নইলে বুঝছেন তো লোকের কাছে অবস্থাটা আমাদের কী হয়ে দাঁড়াবে? আপনার যা সাহায্যের দরকার, আমাকে জানাবেন, আমি যেমন করেই হোক তার ব্যবস্থা করে দেব। এটা পড়ে দেখলেই আমার বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন।

প্রতুল তাঁর হাত থেকে কাগজখানা নিয়ে পড়ল ঃ

হত্যাকারী কি এতই দুর্ধর্ষ?

সে কি চিরদিন আইনের কবল হইতে অব্যাহতি পাইয়া নির্বিবাদে ঘুরিয়া বেড়াইবে?

পুলিশ এবং স্টুডিয়োর কর্তৃপক্ষ কি ইহার পরও নাকে সর্ষপ তৈল দিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া থাকিবেন?

কমিশনার মৃদু হেসে বললেন, শুনতে নিশ্চয়ই মিষ্টি লাগে না?

তা হয়তো লাগে না, কিন্তু অপরকে বলতে যত মিষ্টি লাগে, কাজের সময় নিজেকে হাতে-কলমে করতে হলে আবার ঠিক ততটা মিষ্টি লাগে না।

কমিশনার সাহেব খুশি হলেন। এরপর অবিলম্বে প্রতুলের কাছ থেকে একটা কিছু মীমাংসার আশা করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মুখে প্রকাশ করে বললেন, বাহাদুরের মেয়ের কোনও খবর পেলেন?

প্রতুল জবাব দিল, হ্যাঁ, কাল রাতে লুকিয়ে-লুকিয়ে বাহাদুরকে হাসপাতালের দিকে যেতে দেখে রাখাল তার অনুসরণ করে। একটু বাদেই তার কাছ থেকে পাকা খবর আশা করছি।

আচ্ছা, রাখাল ফিরলে আমার কাছে নিয়ে আসবেন; আমিও শুনব।

একটু পরেই রাখাল হাজির; চোখে-মুখে তার একটা গর্বের ছাপ।

প্রতুল প্রশ্ন করল, ধরতে পেরেছ ওদের?

রাখালের মুখটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; বলল, আপনি কি আমাকে ওদের ধরবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন স্যার? তবে পেয়েছি ওদের। কথা শেষে সে একখানা খাম প্রতুলের হাতে দিয়ে বলল, কোণের দিকটা ধরবেন।

খামের ওপর লেখা ছিল ঃ

শ্রীমতী উলকি রাণা

রাখাল বলল, এতেই মনে হয় অনেক কাজ হবে, স্যার!

প্রতুল বলল, তা হবে বটে, তবে এটা আরও অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে পাওয়া উচিত ছিল রাখাল। তুমি উলকির সন্ধান কোথায় পেলে?

রাখাল একবার সলজ্জ দৃষ্টিতে কমিশনারের পানে তাকিয়ে নিয়ে বলল, সে বড় মজার কথা, স্যার! উলকি এতদিন বরাবর স্টুডিয়োর হাসপাতালেই ছিল। দিনের খাতাখানা হাঁটকাতে-হাঁটকাতে দেখি, উলকির আসাটা খাতায় লেখা আছে, কিন্তু যাওয়াটা নেই। তবে স্যার, বাহাদুরের এতে কোনও কারসাজি নেই। সে দিনে থাকে না কিনা! কাজেই রাতে তাকে যেতে দেখেনি বলে...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, তার কাছ থেকে কী জানতে পেরেছ, আগে তাই বলো।

সে বেচারা নির্দোষ, স্যার। আপনারা যা মনে করেছেন, মোটেই তা নয়। একেবারে ছেলেমানুষ, স্যার। তার ওপর আবার ভয়ানক অসুখ...।

কমিশনার ধমক দিয়ে উঠলেন, আমরা কী মনে করি না-করি সে নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অসুখ তার কোনও দুশ্চিন্তার জন্যেও হতে পারে। যা জেনেছ সেইটুকুই বলে যাও।

রাখাল থতমত খেয়ে বলল, না স্যার, তাই বলছি। সকালে তো গেলুম। নার্স বেটি স্যার, শক্ত ঝানু। ঢুকতে কিছুতেই দেবে না। শেষকালে আমাদের চিহ্নটা দেখিয়ে একরকম জোর করেই ঢুকলুম। চোখের তার কী দৃষ্টি! পিঠটা মনে হল যেন আমার চিড়বিড় করছে। আহা, উলকি বেচারা জানে না যে, তার বাবা খুনের কথা স্বীকার করেছে। আমাকে দেখেই তো ভয়ে বিছানার মধ্যে যেন সেঁধিয়ে গেল। এমন কাঁপছিল স্যার, যখন খামখানা তার হাতে দিলুম, খামখানা খুলেই দেখল, ভেতরে কিছুই নেই। তখন এমন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। পাছে আমাদের উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলে, তার আঙুলের ছাপটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি খামখানা তার হাত থেকে নিয়ে নিলুম। চোখ-মুখ তার কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল; বলল, কেন এসব করছেন? কী আর বলি? বললুম, তোমার আঙুলের ছাপটা দরকার আমাদের। ভয় নেই কিছু—বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তাড়াতাড়ি সে বালিশের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসে বলল, আঙুলের ছাপ? হা ভগবান!

রাখাল অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

কমিশনার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তারপর বলে যাও রাখাল।

মুখটা তার আরও সাদা হয়ে গেল—আরও...।

টেবিলের ওপর সবেগে মুষ্ট্যাঘাত করে কমিশনার বলে উঠলেন, অসম্ভব। বারবার সে সাদাই হয়ে উঠতে লাগল?

রাখাল সচকিত হয়ে উঠে বলল, না স্যার! তারপরই সে কাঁদতে লাগল, সারা গা-টা তার থরথর করে কাঁপতে লাগল। আপনি স্যার, দেখেছেন কি না জানি না, ঠিক যেন কালীঘাটের বলি দেবার জন্যে নিয়ে আসা পাঁঠা। আমি স্যার, অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগলুম যাতে একটু সুস্থির হয়ে মুখ খুলতে পারে...।

প্রতুল তার বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেছিল; বলল, তোমার সান্ত্বনা না দিলেও ক্ষতি ছিল না। এখন আদত ব্যাপারটা বলে ফ্যালো।

রাখাল বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলল, কী আর করি বলুন, স্যার। যাই হোক, অনেকক্ষণ বাদে সে থামল; তারপর বলল... কী বলল স্যার?

সেইটেই তো তোমার কাছ থেকে এতক্ষণ ধরে শুনতে চাইছি...।

রাখাল ঈষৎ গর্বিতভাবে উভয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, বিছানার চাদরটা চোখের ওপর চাপা দিয়ে সে কাঁদতে-কাঁদতে বলে উঠল, হায় ভগবান, কেন যে পুরুষ জাতটাকে সৃষ্টি করেছিলে?

প্রতুল জিগ্যেস করল, শুনে নিশ্চয় তোমার রাগ হল?

না স্যার! তার কথা শুনে আমি স্যার, বেশ বুঝতে পারলুম, বিলাসবাবুকে সে খুব ভালোবাসত। যাক, তারপর ওর বাপের কথাটা আস্তে-আস্তে শোনালুম। হলে কী হবে? আমি জোর করে বলতে পারি স্যার, বাবার স্বীকার করার কথা সে কিছুই জানে না। আমি বেশ ভালোভাবেই তার দিকে চেয়েছিলুম; দেখলুম, শুনে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল...।

কমিশনার শ্লেষভরা কণ্ঠে বললেন, আরও সাদা হয়ে গেল না?

রাখাল তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, হয়েছিল বইকি স্যার! তারপরই বালিশে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে সে কী কান্না! মনে হল, বুকের শিরগুলো তার যেন ভাঙা বেহালার তারের মতোই সব ছিঁড়ে গেছে...।

প্রতুল প্রশ্ন করল, কিছু বললে সে?

বলবার সময় পেল কোথায়, স্যার! তক্ষুণি রাক্ষসীর মতো নার্স বেটি ছুটে এল। আমাকে এই মারে তো এই মারে। উলকির নাড়ী-টাড়ী টিপে আমার মুখের কাছে এসে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করে বলল, দেখো, তোমার পুলিশ-টুলিশ বুঝি না; যদি এর ভালো-মন্দ কিছু হয়, দুনিয়ার রাজা এসেও তোমায় বাঁচাতে পারবে না।

একবার কমিশনারের দিকে আর একবার প্রতুলের দিকে মুহূর্তের জন্যে তাকিয়ে নিয়ে রাখাল আবার শুরু করল, ঘর থেকে আমাকে জোর করেই একরকম তাড়িয়ে দিলে। বললে, আর যদি কিছু জানবার থাকে, তা হলে উলকি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করতে হবে। কী অসুখ হয়েছে তার—তা জানি না স্যার, তবে নার্স বললে, এরপর যদি উলকি আর উত্তেজিত হয় কোনও কারণে—তা হলে শেষ পর্যন্ত মারা যেতে পারে।

কী হয়েছে তা জানতে পারলে না?

না স্যার। অসুখ হয়েছে তার, এটা যেমন সত্যি—তেমনি সে যে নির্দুষী—সেটাও তেমনি সত্যি। আমি হলঘরে বসে-বসেই শুনতে পেলুম, ছোট মেয়ের মতোই বাপের জন্যে ডুকরে-ডুকরে কাঁদছে সে। দু-একটা কথা তার বুঝতে পারলুম, 'ওরা বাবাকে ফাঁসি দেবে—বাবাকে মেরে ফেলবে। কেন মরতে আমি এ-কাজ করতে গেলুম!'"

কমিশনার একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে প্রতুলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ঠিক বলছ তুমি, এ-কথাগুলোই বলেছে সে?

আমি যে নিজের কানে শুনলুম স্যার! কিন্তু তাই বলে ওরকম মেয়ে খুন করতেই পারে না স্যার! ভারি ভালো মেয়ে স্যার!

কমিশনার ধমক দিয়ে উঠলেন, খুব হয়েছে। এখন যাও এখান থেকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রাখাল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কমিশনার বললেন, আপনি গিয়ে মিস্টার লাহিড়ী, মেয়েটির কাছ থেকে স্বীকারোক্তিটা নিয়ে নিন।

প্রতুল কতক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, তা হলে স্বীকারোক্তিটা হবে চারজনের। বায়োস্কোপের গল্প হিসেবে ব্যাপারটা মন্দ দাঁড়ায় না বটে, কিন্তু অন্য দিকটাও ভেবে দেখবেন। একজন অসুস্থ মেয়ের কাছ থেকে জোর করে স্বীকারোক্তি নেওয়াটা...।

কমিশনার চুপ করে রইলেন।

প্রতুল আবার বলল, আর নিয়ে বিশেষ লাভ হবে না। বাহাদুর 'তার মেয়ে অসুস্থ, মাথার ঠিক নেই এখন' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবে। নার্সটিও যা শুনলুম, তাতে মনে হয় এ-ব্যাপারে ওদের সাহায্য করবে।

কমিশনার বললেন, ঠিক। আর স্বীকারোক্তি নেওয়ার দরকার নেই! যথেষ্ট হয়েছে। এখন দরকার আমাদের প্রমাণ। আপনি বরং স্টুডিয়োতে গিয়েই মাল-মশলার চেষ্টা করুন। হাসপাতালের জন্যে যদি পাহারার দরকার হয়, অন্য যত লোক বা টাকা লাগে আমি ব্যবস্থা করব। মনে রাখবেন, আপনার ওপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করছি।

প্রতুল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরই আপনি করতে পারেন।

১৩

বাহাদুরকে সন্দেহের অব্যাহতিতে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করে প্রতুল পরদিন সকালে স্টুডিয়োর পেছনে এসে দাঁড়াল।

স্থানটা নির্জন। আগের দিন বোধহয় কোনও শহরের পথের দৃশ্য তোলা হয়ে থাকবে। কৃত্রিম বড়-বড় বাড়ি, গ্যাসপোস্ট ইত্যাদিতে অনেকটা জায়গা জুড়েছিল। তারই ভেতর দিয়ে প্রতুল একলা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ তার নজরে পড়ল, সামনের দেওয়ালের গায়ে ঈষৎ হলদে একটু কাপড়; সেটা যে কারও জামা থেকে ছিঁড়ে ওইখানটায় আটকে গেছে, তাতে আর কোনও ভুল নেই। চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে প্রতুল কাপড়ের টুকরোটা পকেটে ভরে নিল।

হত্যাকাণ্ডের অনেকটাই তার কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। চিন্তাটা সরল পথে চালিত করার চেষ্টায় সে আপনমনেই কতক্ষণ ঘুরে বেড়াল।

ব্রিজনাথ প্রবলবেগে মাথা নেড়ে জানাল, না, জোর করে ভেঙে না গেলে, কেউই স্যুইচবোর্ডের কাছে যেতে পারে না।

নাগরমল প্রতুলকে লক্ষ্য করে বলল, আপনি যখন দেখসিলেন, বাক্সটা কি ভাঙা ছিল?

প্রতুল ঘাড় নাড়ল : না।

নাগরমল গম্ভীর ভাবে বলল, ভাঙুক আর নেই ভাঙুক, একজন কেউ স্যুইচের বাক্সটার কাছে গিয়েসিল ব্রিজনাথ।

ব্রিজনাথ কী বলবে ভেবে পেলে না। নাগরমল আবার বলল, চাবি সব তো আসে?

ব্রিজনাথ বলল, না, সব চাবি তো নয়। মাত্তর একটা চাবিই আছে।

একটা চাবি? যদি হারিয়ে যায়? কী বলস তুমি ব্রিজনাথ? তোমার মাথা কি খারাপ হইয়ে গিয়েসে?

ব্রিজনাথ জবাব দিল, মাথা আমার মোটেই খারাপ হয়নি, নাগরমল। আপ্তে কাম ছেড়ে দিয়ে বোম্বে চলে যাবার সময় একটা চাবি ভুলে নিয়ে গিয়েসে। আর-একটা খুঁজে পাওয়া যাসসে না। বহুৎ রোজ আগেই সেটা হারিয়ে গিয়েসে।

প্রতুল প্রশ্ন করল, আর-একটা যে চাবি, সেটা থাকে কার কাছে?

নাগরমল বলল, আমার ইলেট্রিশিয়ানের কাসে...।

বেশ, তাঁকে একবার ডাকান এখানে।

ইলেকট্রিশিয়ান লোকটা যে মিথ্যে বলছে না, প্রতুল তা বুঝল। চাবি—সে জানাল, বরাবর তার কাছেই আছে; কোনও সময়ের জন্যে খোয়া যায়নি বা অন্য কাউকে দেয়নি।

লোকটা বিদায় নিলে প্রতুল উঠে দাঁড়াল। নাগরমল সতৃষ্ণ নয়নে তার পানে তাকিয়ে বলল, আজ সকালে ভারি খুশি হয়েসিলুম প্রতুলবাবু। মনে করেসিলুম, এবার খুনি ধরা পড়বে। লেকেন জান তো আর বাঁচে না। আমার ব্যবসা ভি মাটি হতে বসিয়েসে।

প্রতুল সস্নেহে তার পিঠে চপেটাঘাত করে বলল, ঘাবড়াবেন না নাগরমলবাবু! আমি যখন ভরসা দিচ্ছি আপনাকে, তখন আবার ঘাবড়াবার কী আছে?

নাগরমল ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলল, স্যুইচবক্সের চাবিটা দিতে পারলুম না বলে কুছু মনে করবেন না প্রতুলবাবু।

কিচ্ছু না। আমার যা জানবার, হলদে কাপড়ের টুকরোটুকুই আমায় তা জানিয়েছে। অবশ্য ইলেকট্রিকের বাক্সটা কে খুলেছে আমি তা জানতে চাই; রসটুকু নিংড়ে নিয়ে বাক্সটা আবার বেমালুম বন্ধ করে রেখেছে। ...অবশ্য কাল সবই জানা যাবে।

নাগরমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, বাঁসালেন প্রতুলবাবু।

তিন নম্বর স্টুডিয়োতে ঢোকবার সময় রাখাল আর কৌতূহল দমন করতে পারল না। একগাল হেসে বলল, এরা সব আপনাকেও হার মানিয়েছে স্যার! ওই যে ঢকঢকে বুড়োটা দেখছেন না, ওর দাড়িগুলো গজাতে কতদিন লেগেছে বলুন তো?

প্রতুল তাকিয়ে দেখল, অনতিদূরে একটা সেটের মাঝে বসে বৃদ্ধবেশী একজন লোক হরদম কাশছে। লোকটার রূপসজ্জার বাস্তবিকই প্রশংসা করতে হয়। সে হেসে বলল, তা অন্তত ঘণ্টাখানেক তো বটেই...।

রাখাল সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, দু-ঘণ্টা স্যার! আমি জিজ্ঞেস করলুম। বয়েস কত হবে বলে আপনার মনে হয়?

প্রতুল জবাব দিল, এদিকে সাতানব্বই বলে মনে হলেও, মোটমাট সাতাশের বেশি নয়।

রাখাল চোখ দুটো বড়-বড় করে বলল, কী করে জানলেন স্যার? আমি জিগ্যেস করেছি—ঠিক সাতাশ।

প্রতুল স্টুডিয়োর দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে বলল, প্রপার্টি বয়টা বোধহয় আজ থেকে আবার কাজ শুরু করেছে। তুমি তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো।

ভেতরে অর্ধ অন্ধকার। মাথার ওপর শুধু অনুজ্জ্বল আলো একটা জ্বলছিল। তাতে সেটের সব জায়গা থেকে অন্ধকারটা দূরীভূত হয়নি, বরং স্থানে-স্থানে আরও যেন জমাট বেঁধে উঠেছে।

শেখরের চেয়ারটায় গিয়ে প্রতুল অলসভাবে বসে পড়ল। চোখ দুটো একসময় তার মুদেও এল। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু কাজের চাপটা যখন দেহ ছেড়ে মাথার ভেতর গিয়ে বাসা বাঁধে, তখনই চোখ দুটো মুদে আসে তার গভীর চিন্তায়। মাঝে-মাঝে চোখ মেলে সে একান্ত শ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাচ্ছিল, আর যতবারই তাকাচ্ছিল, সম্মুখে রক্ষিত ক্যামেরাটা ততবারই তার নজরে পড়ছিল।

কেমন যেন অস্বস্তি একটা সে বোধ করতে লাগল। সে জানে—ভালোমতোই জানে, আলো-ছায়ার বিচিত্র খেলায় গড়ে ওঠে রূপ, রস, যা কিছু। চিত্রজগতের সে-রূপের ছবি লোকের চোখের সামনে ধরে ক্যামেরা। তার অবস্থিতির ওই বিশেষ ভঙ্গিটুকু যেন কী একটা নির্দেশ করতে চায়। কিন্তু কী নির্দেশ করতে চায়? যার বুকের ভেতর দিয়ে এরকম শত-সহস্র হত্যালীলা অভিনীত হয়ে গেছে, আজ তারই কাছ থেকে বিশেষ একটা হত্যা-রহস্যের কী নির্দেশ পাওয়া যাবে?

প্রপার্টি বয়কে নিয়ে রাখাল প্রবেশ করতেই প্রতুল সচকিত হয়ে উঠে বসে জিগ্যেস করল, তোমার নাম কী?

আজ্ঞে, রামচন্দর জানা।

আচ্ছা, আমি শুনেছি, শেখরবাবু নাকি সেদিন তোমাকে মারধোর করেছিলেন? তুমি চুপ করে গেলে কেন? তোমাকে মারবার কোনও অধিকার তো নেই তাঁর?

হ্যাঙ্গাম করে শুধু-শুধু চাকরি খুইয়ে কী লাভ হুজুর! আমার এ-লাইনের চাকরি খুব ভালো লাগে। একবার বদনাম নিয়ে গেলে আবার কোথাও জোগাড় করা শক্ত। তা ছাড়া আমরা জানি, সবসময় ওঁর মাথার ঠিক থাকে না। মেজাজ বেগড়ালে একবার কী যে করেন আর না করেন, তার ঠিক নেই।

তাঁর কি সত্যিই মাথার ঠিক নেই বলতে চাও?

এ-কথা তো সক্কলেই জানে হুজুর! তা ছাড়া একটু পরেই তিনি দশটা টাকা বকশিস দেন আমাকে। তারপর আবার মিথ্যে ধোঁয়ার পেছনে দৌড়োদৌড়ি করে লাভ কী?

ক'বছর শেখরবাবুর সঙ্গে কাজ করছ তুমি?

রামচন্দ্র একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে, তা বছর দুই হবে বইকী।

এর আগে তিনি কোনওদিন তোমার গায়ে হাত তুলেছিলেন?

না, কক্ষনও না।

প্রতুল জিগ্যেস করল, সাধারণত লোকের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করেন তিনি?

মারধোর করেন না বটে, তবে ধরে ঝাঁকানি-টাকানি দেন। একবার তো বেলা দিদিমণিকে নিয়ে কী নাড়াচাড়া দিলেন! উনিও ছাড়বেন না, বেলা দিদিমণির চোখ দিয়েও পোড়া ছাই কিছুতেই একফোঁটা জল বেরুবে না।

প্রতুল হেসে উঠে বলল, আচ্ছা, এবার সেটের চারদিকটা একবার তাকিয়ে দেখো তো, খুনের আগের দিন যেমন সাজিয়ে রেখেছিলে, ঠিক তেমনি আছে কি না?

সতর্ক দৃষ্টিটা একবার চারদিকে বুলিয়ে নিয়ে ছোকরা বলল, উল্টোনো চেয়ারটার মুখ ছিল এদিকে; তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই...।

ছোরাগুলো?

শেখরবাবুই বলেন, ওগুলো সেটে রেখে দিয়ে যেতে—রাত্তিরে রিহার্সাল দেবেন বলে।

তাহলে ওঁর কিছু নিজে থেকে আনবার দরকার হয়নি?

হলেই বা পাবেন কী করে? বাক্সতে তো চাবি দেওয়া থাকে। আর চাবি মাত্তর দুটো।

তার একটা ডিরেক্টারের কাছে থাকে, না?

তার এই অজ্ঞতা দেখে প্রপার্টি বয় হেসে ফেলল। বলল, কী দরকার থাকার? থাকে আমার

কাছে একটা, আর একটা ব্রিজনাথবাবুর কাছে।

প্রতুল গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, বেশ। একটু আগেই তুমি আমাকে বললে যে, ক্যামেরাম্যান শিবেনবাবু বিলাসবাবুর মূর্তি থেকে ডামিটার ডিজলভ করেন সবচেয়ে শেষে—শেখরবাবু তখন উপস্থিত ছিলেন?

না, ওরকম টুকরো-টাকরা কাজের সময় শেখরবাবু প্রায়ই থাকেন না। শিবেনবাবুর মেজাজও আবার অনেকটা শেখরবাবুর মতোই। ছবি-টবি গুনতে পাছে ভুল হয়ে যায়, সেইজন্যে কাজের সময় একলা থাকতেই তিনি পছন্দ করেন।

ডিজলভের সময় ক্যামেরা হাতে ঘুরিয়েছিলেন, না মোটরে?

বলতে পারব না; তার আগে আমাকে সেট থেকে বার করে দিয়েছিলেন। তিনি আবার ডিরেক্টারকেও পোঁছেন না কিনা। বলেন, ডিরেক্টারের আবার কেরামতি কী? কেরামতি ক্যামেরার।

প্রতুল গিয়ে প্ল্যাটফরমটার ওপর উঠে ক্যামেরার ভেতর তার কৌতূহলী দৃষ্টিটা চালিয়ে দিল। তারপর হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বলল, তোমার প্রপার্টি বাক্সটা একবার দেখব, চলো।

প্রপার্টি বয় বলল, যদি জিনিস-পত্তর যা ব্যাভার করা হয়েছে দেখতে চান, তা হলে এখানেই পাবেন; কারণ প্রপার্টি ঘরটা অনেক দূরে বলে দরকারি জিনিসপত্তরগুলো এনে স্টুডিয়োরই ভেতর একটা ছোট কাঠের ঘরে রাখা হয়।

সেদিকে যেতে-যেতে প্রতুল জিগ্যেস করল, আচ্ছা, খড়ির দাগগুলো কেন বলতে পারো?

পারি। বিলাসবাবু যে জায়গায় পড়বেন, ঠিক সেই জায়গাতেই দাগ দিয়ে ডামিকে শোয়ানো হবে, যাতে ডিজলভ করার সময় কোনও গণ্ডগোল না হয়।

ছোট একটা কাঠের ঘরের দরজা খুলে ছোকরাটি ডাকল, ভেতরে আসুন।

প্রতুল ভেতরে পদার্পণ করেই দেখল, একটা কাঠের বাক্সের ওপর বিলাসের নকল মূর্তিটা শোয়ানো আছে। মুখে তেমনই অকথ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। হঠাৎ দেখলে আসল-নকল চেনা যায় না।

ঝুঁকে পড়ে প্রতুল কতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা ডামির আপাদমস্তকে বুলিয়ে নিল; একটা জিনিস তার দৃষ্টি এড়াল না যে, ডামির অঙ্গে যে-বেশভূষা—তার কোথাও কোনও ছেঁড়া বা কাটা নেই। জিগ্যেস করল, আচ্ছা, ডামির কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?

না।

এখান থেকে সরানো হয়েছিল কি না ঠিক করে দেখে বলো।

প্রপার্টি বয় দেখে বলল, না স্যার। নড়ানো হয়নি। আমি এনে শুইয়ে দেবার সময় মাথার পরচুলোটা একটু সরে যায়। দেখুন, ঠিক তেমনই আছে।

আর কোনও জিনিস কেউ ছুঁয়েছে বলে মনে হয়?

না স্যার। কেউ না। আর ছোঁবেই বা কে আমি ছাড়া? আর একটা চাবি তো ব্রিজনাথবাবুর কাছেই থাকে। তিনি না দিলে কারও পাবার উপায় নেই।

১৪

সংবাদপত্রে উলকির যে ফটোটা ছেপেছিল, ঘরে বসে-বসে রাখাল সেইটেই দেখছিল; এমনসময় প্রতুল ঘরে ঢুকে বলে উঠল, ওটা মন দিয়ে দেখলেই কি খুনের কিনারা হবে?

রাখাল থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রতুল বসে জিগ্যেস করল, উলকির সঙ্গে দেখা করার কী হল?

রাখাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, নার্স বেটি স্যার, বড় ঝামেলা বাধাচ্ছে। বলে, ডাক্তারের হুকুম নইলে উলকির সঙ্গে কেউ দেখা করতে পাবে না। এ-অবস্থায় উত্তেজনা যদি কোনওরকমে হয়, তা হলে বাঁচানো একেবারে অসম্ভব।

নার্সের কাছ থেকে কিছু জানতে পারার সম্ভাবনা আছে?

রামঃ। ও বেটি একেবারে ঝানু; তার ওপর আবার উলকির বন্ধু!

প্রতুল ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, আর কিছু খবর আছে?

নার্স বেটি তো মহা খাপ্পা। বলে, বিলাসবাবুকে ভালোবাসাটা কি এমন মহাপরাধ? ওদের পয়সা আছে, তাই সবাই সরে গিয়ে, তাল ফেলল বেচারা উলকির ওপর...।

প্রতুল কতকটা আপনমনেই বলে উঠল, মনে হচ্ছে সে-রাতে উলকি কী করেছে না-করেছে নার্স তা জানে।

এইসময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। কথাবার্তা কয়ে ফিরে এসে প্রতুল বলল, বিলাসবাবু মারা যাবার আগে, শেখরবাবু যে-ছবি তোলেন, দেখবে নাকি?

রাখাল লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

দ্বিতলের অন্ধকার প্রজেকশন ঘরে নাগরমলের পাশে প্রতুল এসে বসতেই সে বলল, আপনি এসে ভালোই করেসেন। শেখরবাবুর সঙ্গে শেষ দৃশ্যটা লিয়ে আমার থোড়া ঝোগড়া আসে।

কীরকম?

আমি বলি ঠিক আসে। উনি বোলসেন, না, বিলকুল ভুল। আপনি আঁখসে দেখুন। বলুন কী হোবে?

অন্ধকারের মাঝেই প্রতুলের মনে হল, আরও কেউ যেন ঘরে প্রবেশ করেছে। মুখ ফিরিয়ে দেখল, স্টুডিয়োরই একজন কর্মচারী কাগজ-পেন্সিল হাতে তাদের পাশে এসে বসল, কিন্তু বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার বিশাল-বপু ক্যামেরাম্যান শিবেন কর। সেই প্রায়-অন্ধকারের মাঝে তাকে একটি বিরাটকায় দৈত্যের মতোই মনে হচ্ছিল।

নাগরমল পরিচয় করিয়ে দিতে শিবেন প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, বাইরের পেশা আমাদের আলাদা হলেও মিস্টার লাহিড়ী, ভেতরের কথা প্রায় একই। দুটোতেই চাই তীক্ষ্ণ আর সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

প্রতুল উত্তরে শুধু একটু হাসল। নাগরমলকে বলল, আপনার সব তৈরি? তা হলে আমি যেখানে হাত তুলব, সেখানেই আপনি থামাতে বলবেন।

ঘর ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল। রাখাল গভীর অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসে প্রতুলের কানে-কানে বলল, গা-টা কেমন-কেমন করছে স্যার! এই অন্ধকারের মধ্যে বসে মরা মানুষের ছবি দেখা...

প্রজেকশন ঘর থেকে অস্ফুট একটা শব্দের সঙ্গে-সঙ্গেই আলোকরশ্মি একটা সাদা পর্দার গায়ে গিয়ে পড়ল। চোখের সামনে ফুটে উঠল তিন নম্বর স্টুডিয়োর মাঝের পরিচিত সেটটা। একখানা ঘরের দৃশ্য। নায়িকা-বেশি অলকা আগে থেকেই ঘরে ছিল, দেখা গেল বিলাস ঢুকছে। অলকা তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে। যদিও এটা ছবি, তবু প্রতুলের মনে হল, এর মধ্যে সত্যের আমেজও আছে। বিলাসকে অলকা সত্যিকারই ঘৃণা করে। হঠাৎ দেখা গেল, অলকা একখানা ছোরা তুলে নিয়েছে। চোখের পাতে জ্বলে উঠল তার প্রতিশোধ গ্রহণের অত্যুগ্র দীপ্তি একটা।

প্রতুল ভেবে পেলে না, এটা অভিনয় হচ্ছে, না বাস্তব ঘটনা। অকস্মাৎ একসময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল : আপনাদের ছবিতে অলকাদেবী যে বিলাসবাবুকে ছোরা মারছেন—আছে, তা

তো জানতুম না!

নাগরমলের চোখটা পর্দার ওপরেই ছিল। সেইভাবে থেকেই সে জবাব দিল, অলকাদেবী ছোরা খেলতে জানেন বলেই আমরা ওটা লাগিয়ে দিয়েসে।

বিলাসের মৃত্যু-দৃশ্য এসে গেল। নায়ক এইসময় ঘরে প্রবেশ করে প্রেমাস্পদাকে দুর্বৃত্তের হাতে বিপন্না দেখে ছোরাখানা তার হাত থেকে কেড়ে নিল। তারপর আমূল বসিয়ে দিল বিলাসের বুকে।

যন্ত্রণায় বিলাসের সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল অকথ্য যন্ত্রণার ছবি। ঠিক যেমন ছবি মৃত বিলাসের মুখে দেখা গিয়েছিল।

ছবি শেষ হয়ে গেল। একজন. সহকারীর হাতের স্লেটে লেখা আছে দেখা গেল ঃ

কাঁটা ও ফুল। সিন নং ২১৬; টেক নং ৫।

তারপরই ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

প্রতুল প্রশ্ন করল, এই শেষ?

শিবেন বলে উঠল, না, এরপর ডিজলভটা আছে। দেখবেন? ক্ষতি কী?

শিবেন উঠে প্রজেকশন ঘরে গেল। একটু পরেই পর্দায় আবার ফুটে উঠল বিলাসের মাটিতে লুণ্ঠিত দেহটা। একটুখানি ক্লোজ-আপ। তারপর বিলাসের শত্রু ঘরে প্রবেশ করে ছোরাখানা বারংবার তার বুকে বিদ্ধ করতে লাগল।

প্রতুল হেসে বলল, আপনাদের ছবি নেওয়ার প্রশংসা করতে হয়। কোনটা আসল বিলাস আর কোনটা নকল বিলাস বোঝা মুশকিল। শিবেনবাবু, মিনিট দশেক পরে আপনি একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর রাখালকে সে একরকম জোর করেই ঘর থেকে টেনে নিয়ে গেল।

বাইরে আসতেই রাখলের উদ্‌গত বাক্যস্রোতকে আর ধরে রাখা গেল না। বলল, না, এ স্যার ষড়যন্ত্রের ফল। সব্বাই মিলে ছবি নেবার জন্যে বেচারাকে খুন করে এখন ঢাকার চেষ্টা করছে। নাগরমলবাবু সুদ্ধ এর ভেতর আছেন।

তোমার কি এই মত রাখাল?

হ্যাঁ, স্যার। এর আর ভুল হতে পারে না। হয়তো ওই লোকটা—বিলাসবাবুর শত্রু ছবিতে যে সেজেছে—সেই খুন...।

বাধা দিয়ে প্রতুল বলল, না স্যার, খুন তখন হয়নি। এইসময় শিবেনকে আসতে দেখে সুর বদলে সে বলল, কিন্তু সাবধান, তোমার সন্দেহের কথা নিয়ে যেন কোনও হইচই করো না।

প্রতুলের প্রশ্নের উত্তরে শিবেন জবাব দিল. না, ক্যামেরা আমি এখানে বসিয়ে যাবার পর কেউ-ই নড়ায়নি।

রাত্তিরে কি ক্যামেরা এইভাবে আপনি সেটেই রেখে যান?

না, তবে মৃত্যু-দৃশ্যটা শেখরবাবু আবার নেবেন বলায় ফোকাস ঠিক করে ওই জায়গাতেই বসিয়ে রাখি।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, যদি সম্ভব হয়, তাহলে খুনের আগের দিন আপনি যতটা ফিল্ম তোলেন, সেটা আমি একবার দেখতে চাই।

সেটা অসম্ভব কিছু নয়, তবে একটু দেরি হবে। ফিল্ম ভরবার সময় ক্যামেরা বেধে যাওয়ায় মাঝে-মাঝে অনেকটা ফিল্ম যায়। সেটা হিসেব করে বলতে হবে।

ও-দিনেও কি ওসব ঘটেছিল?

হ্যাঁ।

কতবার?

তা বলা মুশকিল।

আচ্ছা, আমি এখানেই অপেক্ষা করব। আপনি দয়া করে আমায় হিসেব করে যদি ফিল্মের হিসেবটা বলেন...।

শিবেন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে একটুকরো কাগজ প্রতুলের হাতে দিল।

প্রতুল পড়ে দেখল :

কাঁটা ও ফুল। ফিল্ম ৮০০ ফিট। প্যানক্রোম্যাটিক ৪০০ ফিট। প্রিন্ট হয়েছে ৬০০ ফিট। এন. জি. ৫০০। বাদ ১০০।

প্রতুল কতক্ষণ কী একটা ভাবল; তারপর বলল, আচ্ছা, যাবার সময় ক্যামেরাটা আপনি কী অবস্থায় রেখে যান? ইচ্ছে করলে কি তখন ছবি তোলা যেত?

হ্যাঁ, যাবার একটু আগেই আমার সহকারি নতুন ফিল্ম ভর্তি করেছিল।

আচ্ছা, তাহলে ম্যাগাজিনটা এখন ক্যামেরায় নেই কেন?

শিবেন বিস্ময়ের সুরে বলল, ও, আপনি ক্যামেরাও দেখে নিয়েছেন? আচ্ছা, একবার দেখে নিয়ে বলছি...।

ক্যামেরাটা একবার পরীক্ষা করে নিয়ে শিবেন বলল, আপনার ধারণাই ঠিক। কিন্তু কেন নেই, তা আমি বলতে পারব না। হয়তো আমারই ভুল।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, আর-একটা ক্যামেরা আপনি আনতে পারেন এখানে?

নিশ্চয়ই। —বলে শিবেন বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে আর একটা ক্যামেরা এনে যথাস্থানে বসিয়ে কুলিরা বিদায় নিতেই প্রতুল বলল, এইবার ম্যাগাজিন বদলাবার কৌশলটা একবার আমায় দেখান।

শিবেন ম্যাগাজিন বক্সের পেছনের অংশটা চেপে ধরে একটা স্ক্রু খুলতে-খুলতে বলল, স্ক্রুটা খুলে নিয়ে এই চেনটাও খুলে ফেলবেন; তারপর নতুন বাক্সটা বসিয়ে আবার সেগুলো এঁটে দিলেই ব্যস...।

প্রতুল কৌতূহলীর ভঙ্গিতে বলে উঠল, যতটা মনে করেছিলুম, জিনিসটা তত শক্ত নয়। আর দু-একবার দেখিয়ে আমাকে ফিল্ম খোলার কায়দাটা শিখিয়ে দিন—।

ক্যামেরার পাশের দিকে ছোট কপাট একটা খুলে ফেলে শিবেন প্রতুলকে কাছে ডাকল। ফিল্ম বদলাবার কৌশলটা দেখবার পর প্রতুল জিগ্যেস করল, আচ্ছা, পাটে আটকে যায় বলে ক্যামেরা পরিষ্কার করেন আপনারা নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, প্রথমে ঝেড়ে তারপর আস্তে-আস্তে মুছতে হয়—।

শেষ যে-ক্যামেরাটা ব্যবহার করেছিলেন, তখনই কি সেটা মোছা হয়েছিল?

নিশ্চয়।

আচ্ছা, ধন্যবাদ। এবার আপনি যেতে পারেন।

রাখালকে ডেকে প্রতুল তার গাড়িখানা তিন নম্বর স্টুডিয়োর গায়ে আনতে বলল। গাড়ি এলে কালো বনাতে ক্যামেরা ঢেকে নিয়ে প্রতুল সেটা হাতে ঝুলিয়ে নিল।

সেটে ঢুকল ব্রিজনাথ। গভীর বিরক্তির সঙ্গে প্রতুলের পানে তাকিয়ে বলল, ওটা কি মোশাই?

একটা ক্যামেরা আছে; কিনবেন?

আপনি কি নিয়ে যাসসেন নাকি? আরে না, না, আমার অর্ডার না নিয়ে কেইসে আপ লে

যাতা হ্যায়?

তার কথা বলার বহর শুনে প্রতুল বুঝল, ব্রিজনাথ মর্মান্তিক চটেছে। ক্যামেরাটা গাড়ির ওপর তুলে দিতে-দিতে সে হেসে বলল, যেইসা আপ দেখতা হ্যায়—।

ব্রিজনাথ রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠল, ঠাট্টা-তামাশাকা বাত ছেড়ে দিন। লিখাপড়া বেগর আমি স্টুডিয়োসে কুছু লিয়ে যেতে দিতে পারবে না।

গাড়িতে উঠে বসে প্রতুল বলল, যা-লেখবার লিখে রাখবেন।

অসহায়ের মতো একবার চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে ব্রিজনাথ বলল, ও আপনি ঘুরাতে সেকবেন না। আপনি জানেন না কেতনা রুপেয়াকা মাল...।

প্রতুল গাড়ি চালাতে আদেশ দিয়ে বলল, আপনিও জানেন না বোধহয় কেতনা রুপেয়াকা খুন...।

১৫

সুদীর্ঘ দিন প্রবাসবাসের পর ডাঃ অমলকিশোর দত্ত সবেমাত্র কলকাতায় ফিরে এসেছেন। বাইরের ঘরে বসে সন্ধ্যাবেলা তিনি কয়েকটা প্রয়োজনীয় নতুন সংগ্রহ নিয়ে গবেষণা করছেন, এইসময়ে প্রতুল সোজা ঘরে ঢুকে ক্যামেরাটা টেবিলের ওপর রাখল।

অমল সাদরে তার করমর্দন করে রহস্য-তরল কণ্ঠে বললেন, পেশাদারীভাবে এসেছেন, না বন্ধুভাবে? ওটা কী? দেখে মনে হচ্ছে, ব্যাপারটায় কিছু খোরাকের সন্ধান পাওয়া যাবে।

আপনার মতন ভোজন-বিলাসীর কাছে খোরাক মিলবে আশাতেই তো আমি এসেছি।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে অমল বললেন, বলুন এবার।

প্রতুল বিলাসের হত্যাকাণ্ডটা খুলে বলে জিগ্যেস করল, এই যন্ত্রটার ভেতর থেকে আঙুলের ছাপগুলো পাওয়া কি অসম্ভব হবে?

কতগুলো আঙুলের ছাপ আছে বলে মনে হয়?

ধোঁয়া-মোছার পরে আমার মনে হয়—অবশ্য নিছক আমার ধারণা, দুজন লোক ছুঁয়েছে এটা; হয়তো তিনজন। অবশ্য খুনির হাতে যদি দস্তানা পরা থাকে, তা হলে নিরুপায়; তবু একটা আশা...।

অমল মৃদু হেসে বললেন, দস্তানাতেও আজকাল আটকায় না প্রতুলবাবু! দস্তানার তলায় যেটুকু ফাঁক থাকে, আজকাল সেইটুকুই যথেষ্ট। এই নিয়ে গবেষণা করতেই গেছলাম আমি।

প্রতুল বলল, পরীক্ষার ফলটা জানতে পারব কখন?

ফোন করে জানাব। দেরি বেশি হবে না।

বিদায় নিয়ে প্রতুল বাড়ি ফিরল; কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ মিলল না। ফোনের পর ফোন তাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। অবশেষে নাগরমল ফোন করল, কী হল প্রতুলবাবু? কোঠী থেকে আমি বাহার হতে পারি না।

প্রতুল সান্ত্বনা দিয়ে বলল, শিগগিরই আপনার শাপ-বিমোচন হবে সিঙ্ঘিয়া সাহেব। কাল যাচ্ছি ওখানে...।

রিসিভার রাখতে না-রাখতে আবার বেজে উঠল। শিবেন করছে। বলল, ফিল্মের যতটুকু মিলছিল না তার হদিস পাওয়া গেছে...।

প্রতুল জবাব দিল, আচ্ছা, কাল সকালেই যাচ্ছি আমি।

তারপরই ডাঃ অমল দত্ত। তাঁর বক্তব্যটা প্রতুল শুনে নিয়ে বলল, ফোনে এসব কথাবার্তা

না হওয়াই ভালো। ঘণ্টাখানেক-দুই বাদে আপনার ওখানেই যাচ্ছি...।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রতুল ফিল্ম বিক্রয় করে যারা—এরকম একটি বৈদেশিক অফিসে এসে বলল, আপনার কাছ থেকে কিছু জানবার আছে। কিন্তু জিগ্যেস যা করব, তা চটপট ভুলে যেতে হবে...।

ম্যানেজার হেসে বললেন, এরকম মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করেই ভুলে যেতে হয় আমাদের...।

প্রতুল বলল, আচ্ছা, যত ফিল্ম আপনারা বেচেন বা যদ্দিন সেগুলো ভালো থাকবে, তার একটা রেকর্ড রাখেন আপনারা নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ, থাকে।

আচ্ছা, এরকম কোনও পার্টিকে গত কয়েক মাসের মধ্যে কোনও ফিল্ম...।

আচ্ছা, আমি দেখে আসছি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে ম্যানেজার বললেন, না, আমরা বেচিনি, তবে আর-একটা কোম্পানি আছে, আমি ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। সেখানে খোঁজ করে দেখুন...।

বিদায় নিয়ে প্রতুল দ্বিতীয় কোম্পানিতে এল এবং তার জ্ঞাতব্য বিষয়টার সন্ধানও পেতে বিলম্ব হল না।

ডাঃ দত্তের সঙ্গে প্রতুল দেখা করতেই তিনি বললেন, ক্যামেরার ভেতর যাঁর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে, দেখে মনে হল তিনি সেটা ইচ্ছে করেই গোপন করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সকলের হাতের ছাপ তো পাইনি আমি, তাই কার সেটা বলতে পারব না।

প্রতুল বলল, এবার স্টুডিয়োতে গিয়েই আমি সেটা ঠিক করে নেব। আপনি দয়া করে প্রকাশ করবেন না কারও কাছে।

স্টুডিয়োতে এসে প্রতুল সোজা হাসপাতালে গিয়ে উঠল; ডাক্তারের আদেশ নিয়ে দেখা করল উলকির সঙ্গে। জিগ্যেস করল, আলো নেভবার পর তুমি লুকিয়ে-লুকিয়ে বিলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছলে?

হ্যাঁ।

কিন্তু দেখা না পেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলে, ভেবেছিলে নিজের ঘরে তিনি পোশাক ছাড়তে গেছেন?

হ্যাঁ।

তারপর বিলাসবাবু ফিরে আসেন; কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই আর-একজন তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে, পাছে তোমায় দেখতে পায়, তাই তুমি উল্টোনো বড় চেয়ারটার আড়ালে লুকিয়েছিলে?

উলকি মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

প্রতুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, তারপরই তুমি দেখলে বিলাসবাবু খুন হলেন...

না, আমি তাঁকে খুন হতে দেখিনি।

পকেট থেকে একখানা তোয়ালে বার করে প্রতুল বলল, হাতের রক্তটা তুমি এখানে এসে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করো; কিন্তু তার আগে তোয়ালেতে হাত মুছেছিলে? তোমার নার্সের উচিত ছিল এখানা পুড়িয়ে ফেলা...

উলকির চোখে জল এসে গেল; রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, লুকোবার চেষ্টা করে আর লাভ নেই। বাবাই...

বাধা দিয়ে প্রতুল জিগ্যেস করল, তোমার বাবাকে তুমি খুন করতে দেখেছ?

না। তবে আমি বুঝতে পেরেছি এ-কাজ তাঁরই, কারণ তিনি জীবনে কখনো মিথ্যে বলেননি...।

না বলতে পারেন, কিন্তু তোমাকে বাঁচাবার জন্যে জীবনে হয়তো এই প্রথম বললেন, এমনও তো হতে পারে?

উলকি চট করে ফিরে তাকিয়ে বলল, আমাকে বাঁচাবার জন্যে? তার মানে?

মানে তোমার বাবার বিশ্বাস যে, তুমিই খুন করেছ।

উলকি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, আমি—আমায় বিশ্বাস করুন—এ-কাজ করিনি আমি; আমি শুধু বিলাসবাবুর সঙ্গে একটা কথা বলতে গেছলুম, বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বা কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আমার উপায় ছিল না। ইচ্ছে না থাকলেও তাঁর সঙ্গে বিয়ে না হলে...

প্রতুল কোমল কণ্ঠে বলল, থাক, বুঝেছি। তারপর?

উলকি বলল, আমি দাঁড়িয়ে আছি তাঁর জন্যে। হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলুম। দেখি বিনয়বাবু। এদিক-ওদিক খুঁজতে-খুঁজতে চেয়ারের ওপর থেকে খাতাখানা নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তারপরই গেটের দিক থেকে মনে হল যেন কে আসছে। বাবা মনে করে লুকোবার জন্যে অন্ধকার সেটের দিকে ছুটলুম। এখানে দেখতে পেলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখতেন না। অন্ধকারের মধ্যে কিসে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। দেখি—বিলাসবাবু মরে পড়ে আছেন...

প্রতুল বলল, তাইতেই বোধহয় রক্তটা হাতে লেগেছিল?

হ্যাঁ, আমার প্রথম মনে হয়েছিল, বিলাসবাবু বেঁচেই আছেন। তাই মুখে-চোখে হাত দিয়ে পরীক্ষা করছিলুম।

প্রতুল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলছ বিনয়বাবু ছাড়া আর কেউ সেটে যায়নি; অথচ বিনয়বাবুও খুন করেননি?

না, না, বিনয়বাবু খুন করেননি।

আচ্ছা, গঙ্গারাম যে-চিৎকারটা শুনেছিল, সেটা কার?

আমিই চিৎকার করেছিলুম। বিলাসবাবুকে মরে পড়ে থাকতে দেখে ভয়ে আমিই কখন যে চেঁচিয়ে উঠেছিলুম, প্রথমটা নিজেই তা বুঝতে পারিনি।

প্রতুল আর কোনও কথা না বলে অন্যমনস্কের মতো বিদায় নিল।

মোটরখানা রাসবিহারী অ্যাভেনিউর মোড়ে থামিয়ে প্রতুল সিগারেটের দোকানটায় গিয়ে বলল, বিলাসবাবুর খুনের কথাটা নিশ্চয়ই আপনারা কাগজে পড়েছেন? সেদিন রাতে শেখরবাবুর সঙ্গে মোটরে করে বিলাসবাবুও কি এসেছিলেন?

দোকানদার বলল, হ্যাঁ। শেখরবাবু সিগারেট নিলেন, তারপর গাড়ি ছাড়বার সময় বিলাসবাবুও সিগারেট চাইতে আমার বয় গিয়ে ছুটতে-ছুটতে তাঁকে এককৌটো সিগারেট দিয়ে এসেছিল।

আরও দু-এক জায়গায় খবর নিয়ে প্রতুল জানতে পারল, শেখরনাথ মিথ্যা বলেনি। বিলাসকে সকলেই তারা সে-রাতে শেখরের সঙ্গে দেখেছে।

স্টুডিয়োয় ফিরে এসে প্রতুল শুনল, নাগরমল কোথায় বেরিয়েছে। তার অফিস-ঘরে বসে-বসে সে কতগুলো পুরোনো কাগজ উল্টে দেখতে লাগল, হঠাৎ একজায়গায় এসে তার দৃষ্টি আটকে গেল। আগ্রহের সঙ্গে সামনে ঝুঁকে পড়ে সে পড়তে লাগল :

সমস্ত ইয়োরোপ, আমেরিকা ঘুরে বেড়িয়েছেন, স্টেজেও অভিনয় করেন। বছর দশেক হল চিত্রজগতে যোগ দেন।

প্রতুলের মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে; শ্বাস-প্রশ্বাসও তার সঘন হয়ে উঠল। পড়ে চলল :

সামাজিক আবহাওয়া কোনওদিনই তাঁর ভালো লাগে না। পরলোকতত্ত্ব এবং আজও পর্যন্ত মানুষের কাছে যে-রহস্য অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে, সেইসব আবিষ্কারে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়।

এরকম অনেক সম্প্রদায়েরই সভ্য তিনি। শোনা যায়, নিজের বাড়িতেও এ-সম্বন্ধে তাঁর অনেক বই আছে।

প্রতুল নিজের মনেই বলে উঠল, পেয়েছি। এতক্ষণে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না।

ঠিক সেই সময় নাগরমল ঘরে ঢুকছিল। বলে উঠল, কী হইয়েসে প্রতুলবাবু?

প্রতুল উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, আপনার খুনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কী করতে হবে বলছি, কিন্তু তার জন্যে হয়তো আপনার মোটামুটি কিছু খরচ হতে পারে।

নাগরমল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, আমার ব্যবসাটা মাটি হতে বসিয়েসে, এত লাখ রুপেয়া পানিতে পড়তে চলিয়েসে, দু-চার-দশ-বিশ হাজারে কী যাবে আসবে?

খুশিমুখে প্রতুল বলল, বেশ। তা হলে কী করতে হবে বলি, শুনুন।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে প্রতুল নাগরমলকে বোঝাতে লাগল। আনন্দে নাগরমল আর একটু হলেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিল। এমনসময় দরজায় করাঘাত হল।

প্রতুল গিয়ে দরজা খুলতেই দেখা গেল, বাইরে দাঁড়িয়ে শেখরনাথ।

শেখরনাথ বলে উঠল, ও, আমার ধারণা ছিল, এত রাতে আমি একলাই কাজ করছি। মাপ করবেন, না জেনে আপনাদের কথাবার্তায় বাধা দিলুম। তারপরই ধীরে-ধীরে সে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল।

১৬

আবার ঝড়-জলের রাত্রি। যেন সেইদিনকারেরই পুনঃ সূচনা। স্টুডিয়োর ভেতরেও প্রতুলের আদেশ মতো সেইদিনকার অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল।

ফটকে বাহাদুর আর গঙ্গারামের সেই সুখদুঃখের কথা, জল্পনা-কল্পনা। তার মধ্যেই জলকাদা ছিটোতে-ছিটোতে একখানা মোটর স্টুডিয়োর ভেতর থেকে এসে গেটের কাছে থামতেই বাহাদুর দরজা দুটো খুলে দিল।

যে-প্রাণীটি গাড়ি চালাচ্ছিল, সে বলে উঠল, চললুম বাহাদুর! তার পাশেই যে লোকটি বসেছিল সে হাত তুলে বলল, এমন দুর্যোগের রাতে তোমাদের অনেকখানি কষ্ট দিলুম বাহাদুর।

গাড়িখানি ধীরে-ধীরে বেরিয়ে গেল।

গঙ্গারামের দাঁতে দাঁত ঠেকে যেতে লাগল। ভাঙা গলায় সে বলল, রাম, রাম, রাম, রাম! দেখলে বাহাদুর, বিলাসবাবু! ভূত হইয়েছে! আমি কালই স্টুডিয়োর কাম ছেড়ে দোব।

বাহাদুর কোনও জবাব না দিয়ে তার খাতায় লিখল ঃ

শেখরবাবু আর বিলাসবাবু ১২-১৫ মিনিটের সময় স্টুডিয়ো থেকে চলে যান।

গঙ্গারাম রাতের পাহারা সেরে ভাবতে লাগল, কখন নাগরমলকে ধরে কাজের ইস্তফা দেবে।

নাগরমল তখন প্রতুলের সঙ্গে তার অফিস-ঘরে বসেছিল, এ-কথা কেউই জানত না। প্রতুলের হাত দুটো চেপে ধরে আনন্দচপল কণ্ঠে সে বলছিল, আপনার বাহাদুরি আসে প্রতুলবাবু! যেমন আপনার মেক-আপ করার ক্ষমতা, বিশুবাবুরও তেমনি গলা নকল করবার ক্ষমতা। কেউ সমঝাতেই পারল না।

উত্তরে প্রতুল শুধু একটু হাসল।

পরদিন খুব সকালেই প্রতুল স্টুডিয়োয় এসে হাজির হল, হাতে তার একটা চারটৌকো বাক্স।

নাগরমল জিগ্যেস করল, ওটা কী?

পরে বলব। আপনার আর-সবাই তৈরি আছে?

হ্যাঁ। পেছনের ঘরে চাবি দেওয়া।

বেশ। এটা কতক্ষণের মধ্যে ডেভলপ করা, প্রিন্ট করা হতে পারে বলুন তো?

বড়জোর দু-তিনঘণ্টা।

প্রতুল গম্ভীরভাবে বলল, কিন্তু যাকে-তাকে দিয়ে এটা করাতে পারি না। আপনার ল্যাবরেটরি-ইনচার্জ যে, সে আর আমি থাকব সে-ঘরে। আর-একটা কথা, বিকেলের দিকে এইসব লোককে আপনি প্রজেকশন ঘরে হাজির থাকতে বলবেন। আমার অনুচর রাখাল আর হরেনকে যেন কেউ কোনও কাজে বাধা না দেয়। আর অপারেটরকে বলে দেবেন, কোনওরকম শব্দ যেন সে না করে বা কোনও লোককে ঘরে ঢুকতে না দেয়, তা হলে তাকেই খুন করব আমি। তারপর আপনি হরেনকে নিয়ে গিয়ে পেছনের ঘর থেকে সেটা বার করে নিয়ে আসবেন। কথাশেষে একটা নামের তালিকা সে নাগরমলের হাতে দিল।

অন্ধকার প্রজেকশন ঘর।

যেসব লোক এসে জমেছিল, তাদের অনেকেই জানে না, কেন তাদের এখানে ডাকা হয়েছে। বিনয় এসেছিল শুষ্ক মুখে; তার পাশেই অলকা—চোখে-মুখে তার রক্ত ছিল না। গম্ভীর বাহাদুর আর তার পাশে ভীত গঙ্গারাম দাঁড়িয়েছিল।

প্রতুলের পাশে বসেছিল শেখরনাথ আর ক্যামেরাম্যান শিবেন।

প্রতুল বলল, ছায়া-জগতের রূপালি পর্দার সঙ্গে আপনাদের সবাইয়ের পরিচয় ভালোমতোই আছে। তারই সাহায্যে আমি আপনাদের আজ দেখাব, কী করে বিলাসবাবু হত হন। আমাদের সিনারিও আরম্ভ হল তিন নম্বর সেট থেকে—বিলাসবাবুর মৃত্যু-দৃশ্যের পর। আমার বন্ধু বিশু পার্ট করেছে শেখরবাবুর; আর বিলাসবাবুর পার্ট যিনি করেছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আপনাদের কোনও সম্বন্ধ নেই বলেই পরিচয়টা তাঁর দিলাম না। নাগরমলবাবু, সব যদি প্রস্তুত থাকে, তা হলে এবার আপনি আরম্ভ করতে পারেন।

ছবি আরম্ভ হল। তিন নম্বর সেট—বিলাস মেঝের ওপর পড়ে আছে। মুখে-চোখে তার অকথ্য যন্ত্রণার ছাপ। তারই দেহের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে শেখরনাথ। চোখে-মুখে গভীর বিরক্তির চিহ্ন। টাইটেল ফুটে উঠল ঃ

দীর্ঘদিন পরিশ্রমের পরও শেখরনাথ হতাশ হইলেন।

হাতের ছোরাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শেখরনাথ ঘরের চারদিকে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। বিলাসকে উঠতে বলে নিজে একবার তার জায়গায় শুয়ে পড়ে অভিনয় করে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার বিলাসের পালা। বিলাস আগের জায়গায় শুয়ে পড়তেই শেখরনাথ ক্যামেরার কাছে গিয়ে ম্যাগাজিন বাক্সটা বদলে দিল। ফিল্মটা পরানো হতেই বিলাসকে আদেশ দিল অভিনয় করতে। আবার বিলাসের মুখে ফুটে উঠল সেই যন্ত্রণাকাতর ছবি। প্রসারিত হাত দুটো কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শেখরনাথ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ক্যামেরা ঘোরাবার মোটরটা চালিয়ে দিল। বিলাসের কাছে ফিরে এসে আদেশ দিল মুখের অভিব্যক্তিটা আরও সুস্পষ্ট করে তোলবার জন্যে। সঙ্গে-সঙ্গে নিজেও ঝুঁকে পড়ল তার ওপর। ছোরাখানা তার বুকের ওপর বসিয়ে ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগল। তীক্ষ্ণমুখ অস্ত্রখানা গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেল বিলাসের বুকের মাঝে। তবু হতভাগা অভিনেতার নিষ্কৃতি নেই, তখনো পরিচালকের মুখের পানে তাকিয়ে আছে তাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে!

ঘরের সকলের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ডের গতি মনে হল বুঝি তখনই স্তব্ধ হয়ে

যাবে। নিশ্বাস নিতেও মনে হল যেন তাদের কষ্ট হচ্ছে।

বিলাসের ক্লোজ-আপ। বুকের ওপর উদ্যত ছোরাখানা সবেগে তার বুকের মাঝে প্রোথিত হয়ে গেল। সাদা দস্তানা-পরা হাত একখানা বিদ্যুৎবেগে শূন্যে উঠল...।

প্রতুল চিৎকার করে বলল, এইবার বিলাসের মৃত্যু-দৃশ্য—সত্যকার বিলাসই যা অভিনয় করেছে।

বিশ্বাস যার ওপর করেছিল, তার কাছ থেকে এই আঘাত পেয়ে বিলাসের মুখে-চোখে ফুটে উঠল একটা অসহায় কাতরতা। ভীত করুণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল শেখরনাথের মুখের দিকে। ছোরাখানা খুলে নেবার সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসবার একবার ব্যর্থ চেষ্টা করে সে আবার লুটিয়ে পড়ল।

উলকি চিৎকার করে উঠল, বন্ধ করতে বলুন প্রতুলবাবু, আর দেখা যায় না...

ছবি বন্ধ হল। আলো জ্বালবার আগেই শেখরনাথ দস্তানাটার ভেতর থেকে কী একটা বার করে ক্ষিপ্রহস্তে মুখে ফেলে দিল। তার দিন যে ঘনিয়ে এসেছে, সেটা বুঝতে বাকি ছিল না।

প্রতুল বলে উঠল, নড়বার চেষ্টা করবেন না শেখরবাবু। ঘরে আসার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। কেউ একজন আলোটা জ্বেলে দাও।

আলো জ্বালবার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল, উদ্যত পিস্তল হাতে বিশু শেখরনাথের পেছনে দাঁড়িয়ে।

মাতালের মতো টলতে-টলতে শেখরনাথ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

প্রতুল বলল, ওঠবার চেষ্টা করবেন না।

হো-হো করে হেসে উঠে শেখরনাথ বলল, আমাকে আর ভয় দেখিয়ে লাভ কী? চোর-চোর খেলতে গিয়ে বুড়ি কখন ছুঁতে হয়, আমি তা জানি। আপনাদের অনেকেরই ধারণা, আমি পাগল। হয়তো তাই। সফলতার কোনও দাম আমি জীবনে দিইনি; তবু ব্যর্থতার বেদনা বুকে বড় বাজে... তারপরই সে পাশের কোচটার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

প্রতুল বলল, শেখরবাবু আত্মহত্যা করে আইনের হাত এড়িয়েছেন। তাঁর অপরাধের যথার্থ প্রমাণ তো আপনারা পেলেন?

নাগরমল জিগ্যেস করল, কিন্তু ওই ক্লোর্জ-আপের ছবিটা কোথায় পেলেন আপনি? আমরা তো ওটা তুলিনি!

না। ওটা শেখরবাবু নিজেই তোলেন। বিলাসবাবুর আসল মৃত্যু-দৃশ্য—অবশ্য আপনাদের জন্যে নয়। ওঁর নিজের জন্য। ক্যামেরায় ওঁর হাতের ছাপটা পেয়েই আমার সন্দেহ হয়। খুঁজতে-খুঁজতে এই ফিল্মের টুকরোটা ওঁর ঘর থেকেই আবিষ্কার করি। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন না যে শেখরবাবু বহু গুপ্ত সভার সদস্য। তাদেরই একটাতে তিনি এই ফিল্মটা পাঠাবার মতলবে ছিলেন। মৃত্যুর পরে মানুষের আত্মার কী হয়, এইসব সভার সভ্যরা তারই গবেষণা করেন।

গঙ্গারাম বলে উঠল, কিন্তু হামি যে আপনা আঁখসে বিলাসবাবুকে যেতে দেখিয়েসে?

হেসে প্রতুল বলল, সেটা ডামি। শেখরবাবু তাকে বিলাসের পোশাক পরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে কথাটা বিলাসের গলা অনুকরণ করে তিনিই বলেন।

নাগরমল উঠে পড়ে বলল, নাঃ, স্টুডিয়ো হামি এখন কয়েক রোজ বন্ করিয়ে রাখবে। হামার লাখো লাখো রুপেয়া...।

রহস্যের আলো-ছায়া

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মুখপাত

গোয়েন্দা-কাহিনীর জন্ম বোধহয় ইতিহাস-পূর্ব যুগে। অন্তত খ্রিস্টানদের প্রাচীন রচনা 'আপক্রিয়া'র মধ্যেও গোয়েন্দা-কাহিনীর অভাব নেই।

কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীকে সর্বপ্রথম আর্টের রাজ্যে দেখতে পাওয়া গেছে আধুনিক যুগে। এটা সর্বাগ্রে সম্ভবপর হয়ে উঠেছে আমেরিকান লেখক এডগার অ্যালেন পো-র প্রতিভার প্রসাদে। তারপর অল্পবিস্তর তাঁরই পদানুসরণ করে দেখা দিয়েছেন স্যার কন্যান ডইল ও ডাঃ অস্টিন ফ্রিম্যান প্রমুখ।

বিলাতের একটি বিখ্যাত অতি-আধুনিক রচনা অবলম্বন করে আমরা এই গোয়েন্দা-কাহিনীটি পাঠকের হাতে উপহার দিলুম।

এটি একটি বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভের গল্প। এর প্রধান নূতনত্ব ও বিশেষত্ব হচ্ছে, লেখক অপরাধীকে লুকিয়ে রেখে সর্বশেষে পাঠকদের চমকে দেবার জন্যে গভীর রহস্য সৃষ্টি করতে চাননি। অপরাধের দৃশ্যপট উজ্জ্বল রেখায় খুলে রাখা হয়েছে সকলের চোখের সামনেই। আধুনিক পুলিশকে ঠকাবার জন্যে অপরাধী কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে, তাও গোপন করা হয়নি।

তারপর দেখানো হয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ডিটেকটিভ কী অপূর্ব কৌশলে অপরাধীর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলেন এবং অপরাধ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কত তুচ্ছ সূত্রকেও করে তুলতে পারে কতখানি মূল্যবান।

এটি গল্প বটে, কিন্তু য়ুরোপের সত্যিকার ডিটেকটিভরা আজকাল ঠিক এই পুস্তকে বর্ণিত উপায়েই কাজ করে থাকেন। সুতরাং গল্পটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রথম অংশ

অপরাধের কলাকৌশল

প্রথম

অক্ষয়কুমার চৌধুরী পণ্ডিতদের একটি মস্তবড় উক্তি ব্যর্থ করে দিয়েছে। পণ্ডিতরা বলেন, 'মানুষের মুখ হচ্ছে মনের আয়না।'

কিন্তু অক্ষয়ের মুখের পানে তাকিয়ে তার চরিত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে, এমন লোক কেউ আছে বলে জানি না। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে পণ্ডিতদের মুখ হবে বন্ধ।

কী হাসি-হাসি সরল মুখ তার! সে-হাসির ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে যেন সদাশয়তা আর ন্যায়পরায়ণতা! বসুধার সবাই যেন তার কুটুম্ব!

কিন্তু অক্ষয় নিজেই জানে, কেউ যদি তাকে চোর, জুয়াচোর, অসাধু বা দাগাবাজ বলে ডাকে, তবে একটুও মিথ্যা বলা হবে না।

তার ছোট বাড়িখানিতে থাকে একটি মাত্র আধবুড়ো লোক—একাধারে সেই-ই হচ্ছে পাচক ও বেয়ারা। নাম রামচরণ। সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায়, 'আমার মনিবের মতন সৎ, আমুদে আর ভালোমানুষ লোক আর দেখা যায় না। মুখে তাঁর গান আর মিষ্টি কথা লেগেই আছে।'

কিন্তু রামচরণ যদি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে পারত, অক্ষয় তার মাইনের টাকা জোগাড় করে বড় বিদ্যা চুরি-বিদ্যার দ্বারা, তা হলে ব্রহ্মাণ্ডেও তার প্রকাণ্ড বিস্ময়ের স্থান-সংকুলান হত না।

চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা হতে পারে, কিন্তু বিপজ্জনকও বটে। এ-সত্য অক্ষয়ের অজানা ছিল না। চোরের পক্ষে কেউ নেই—বিপক্ষে সবাই।

কিন্তু অক্ষয় এ-ও জানে, মাথা খাটাতে আর অতি-লোভ সামলাতে পারলে, চুরি-বিদ্যাও লাভজনক হতে পারে।

অক্ষয় অতি-লোভী নয়। তার মাথাও আছে। তার দলবল নেই—সে একলা চুরি করে। তার বিরুদ্ধে কেউ 'রাজার সাক্ষী' হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে ঘন-ঘন চুরি করে না। অনেক বুঝে-সুঝে ফন্দি এঁটে মাঝে-মাঝে চুরি করে, তারপর চোরাই মাল বেচে যে-টাকা পায়, তা নানাবিধ বৈধ উপায়ে খাটায়। আমাদের অক্ষয় চৌধুরী ভারি হুঁশিয়ার লোক। পুলিশ তার কাছে হার মেনেছে।

সে প্রকাশ্যে জহুরীর কাজ করত। কিন্তু তার কোনও-কোনও সম-ব্যবসায়ীর বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়ের কারবার নাকি চোরাই পাথর নিয়ে। তবে এ হচ্ছে সন্দেহ মাত্র। কেউ তাকে হাতে-নাতে ধরতে পারেনি। কাজেই অক্ষয় হাসিখুশি অম্লানই আছে আজ পর্যন্ত।

সুবিধা পেলেই সে চোরাই হীরা-পান্না-মুক্তা নিয়ে কাজ গোছাতে ভোলে না।

গল্পের আরম্ভেই দেখতে পাবেন, অতি-গুণধর অক্ষয় সান্ধ্যবায়ু সেবন করছে বাড়ির সামনেকার বাগানে।

এটি একটি গ্রামের বাড়ি। গ্রামের আসল নাম বলব না, আমরা চাঁদনগর নামেই ডাকব। এখান থেকে কলকাতা খুব বেশি দূরে নয়।

বাড়িতে অক্ষয় আজ একলা। রামচরণ ভিন-গাঁয়ে কী কাজে গেছে, ফিরবে বেশি রাতে। অক্ষয়কে যখন-তখন হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে যেতে হত, তাই সে বাড়ির সদরের চাবি করেছিল দুটি। একটি থাকত তার নিজের কাছে, আর একটি থাকত রামচরণের জিম্মায়। যে যখন আসত, তার নিজের চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভিতরে ঢুকত। আজও রামচরণ জেনেই গিয়েছে যে, রাত্রে বাড়িতে এসে সে তার মনিবকে দেখতে পাবে না। অক্ষয়কে খানিক পরেই কলকাতায় যেতে হবে।

উদ্দেশ্য, খানকয় ছোট-বড় হীরা বেচা। সেগুলি চোরাই বলে অক্ষয়ের মানহানি করব না। কিন্তু সে হীরাগুলি কোথায় আছে জানেন? তার জুতার গোড়ালির ভিতরে!

অবাক হওয়ার কিছুই নেই। অক্ষয়ের একপাটি জুতার গোড়ালি হচ্ছে দেরাজের পুঁচকে সংস্করণ। কৌশলে টানলে তার একটি অংশ 'টানা'র মতন বেরিয়ে আসে। এই উপায়ে পকেট-কাটার ও পুলিশের অন্যায় জব্দ হয়।

সন্ধ্যা। বাতাসে বন্য গন্ধ, অন্ধকারের গায়ে চুমকির মতন জোনাকি। চারিদিক নিঃসাড়। অক্ষয় বাইরে যাবার পোশাক পরেই বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। এখনও ট্রেনের সময় হয়নি।

হঠাৎ অদূরে রাস্তায় জাগল কার পায়ের শব্দ।

অক্ষয় ভাবতে লাগল। কোনও অতিথি আসছে না কি? কিন্তু তার বাড়িতে অতিথি আসে তো কালেভদ্রে! ...এখানে কাছাকাছি অন্য কারুর বাড়ি নেই। তার বাড়ির পরেই হচ্ছে পোড়ো জমি —একটা অর্ধ-নির্মিত রাস্তা শেষ হয়েছে সেখানে গিয়েই। এ-নতুন পথে তো গাঁয়ের লোক আসে না!

বাগানে ঢোকাবার মুখেই ছিল একটি বেড়া। কৌতূহলী অক্ষয় তার উপরে ঝুঁকে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতরে চোখ চালাবার চেষ্টা করলে।

অন্ধকারের বুকে জ্বলল একটা দেশলাইয়ের কাঠি, দেখা গেল একখানা মুখ, অস্পষ্ট দেহ। আগন্তুক সিগারেট ধরাচ্ছে।

অক্ষয় শুধোলে, 'কে?'

আগন্তুক এগিয়ে এল। কাছে এসে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলে, 'এই পথ দিয়ে কি চাঁদনগর জংশনে যাওয়া যায়?'

অক্ষয় ইংরেজিতে বললে, 'না; স্টেশনে যাওয়ার অন্য রাস্তা আছে।'

'আবার অন্য রাস্তা! রক্ষে করুন মশাই, যথেষ্ট হয়েছে! কে এক বোকা আমায় এমন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, ঘুরে-ঘুরে পায়ের নাড়ী ছিঁড়ে গেল।'

'মশাইয়ের কোথা থেকে আসা হচ্ছে?'

'কলকাতা থেকে এসেছিলুম এখানকার জমিদার-বাড়িতে। যাব আবার কলকাতায়। এখন পথ হারিয়ে অন্ধের মতন ঘুরে মরছি। একে আমি চোখে খাটো, তায় এই অন্ধকার। আর পারি না!'

'আপনি ক'টার ট্রেন ধরতে চান?'

'সাড়ে আটটার।'

'তাই নাকি? আমিও ওই ট্রেনে আজ কলকাতায় যাব। কিন্তু এখন সবে সাতটা, আমি আটটা-পনেরোর আগে বাড়ি থেকে বেরুব না। আপনি যদি আমার বৈঠকখানায় এসে খানিকক্ষণ বসেন, তা হলে আমরা একসঙ্গেই স্টেশনে যেতে পারি। স্টেশন এখান থেকে আধ মাইলের বেশি হবে না।'

মুখখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে চশমা-পরা চোখে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আগন্তুক কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললে, 'ধন্যবাদ মশাই, ধন্যবাদ।'

অক্ষয় বেড়ার দরজা খুলে দিলে। আগন্তুক একটু ইতস্তত ভাব দেখালে। তারপর মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে।

দ্বিতীয়

বৈঠকখানা অন্ধকার ছিল। অক্ষয় কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো একটা ল্যাম্পে অগ্নিসংযোগ করল।

এতক্ষণ পরে দুজনেরই দুজনকে ভালো করে দেখবার সুবিধা হল।

অক্ষয় সচমকে নিজের মনে-মনে বললে, 'ও হরি, এ যে দেখছি জহুরী মণিলাল বুলাভাই! হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আমাকে চেনে না।'

প্রকাশ্যে বললে, 'বসুন মশাই, আরাম করে বসুন। অনেক হাঁটাহাঁটি করেছেন, একটু চা-টা ইচ্ছা করেন?'

মণিলাল ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তার পরনে কোট-পেন্টুলুন। মাথায় ধূসর রঙের নেমদার টুপি—অর্থাৎ 'ফেল্ট হ্যাট'। সে টুপিটা ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপরে রাখলে এবং হাতের ছোট ব্যাগটা রাখলে একটা টেবিলের উপরে। ছাতাটাও তার গায়ে ঠেসিয়ে দাঁড় করিয়ে সোফার উপরে বসে পড়ল।

বৈঠকখানার একপাশে রান্নাঘর। উনুনে আগুন ছিল। চায়ের জল গরম করতে দেরি লাগল না। চা তৈরি করে অক্ষয় আবার বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। চায়ের ট্রে-খানা টেবিলের উপরে রাখলে। একখানা থালায় দুটি রসগোল্লা ও আর একখানা থালায় খানদুই ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট দিতেও ভুলল না।

একটি তারা-কাটা দামি কাচের গেলাসে জল ঢেলে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, বাড়িতে আপাতত আর কিছু খাবার খুঁজে পেলুম না।'

মণিলাল বলল, 'সঙ্কোচের কারণ নেই। যে-দুটি খাবার দিয়েছেন, ও-দুটিই আমি ভালোবাসি' —বলেই একটি রসগোল্লা তুলে মুখের ভিতর ফেলে দিলে।

মণিলাল যে কেন জমিদার-বাড়িতে গিয়েছিল, এ-কথা জানবার জন্যে অক্ষয়ের মনে আগ্রহ হল। কিন্তু অক্ষয় এ-সম্বন্ধে তাকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না বরং মণিলালও প্রায় নীরবেই নিজের চা ও খাবার নিয়েই ব্যস্ত হয়ে রইল।

অক্ষয় ভাবতে লাগল ঃ মণিলাল বুলাভাই হচ্ছে একজন নামজাদা জহুরী। সে যখন নিজে জমিদার-বাড়িতে এসেছে তখন কাজটা নিশ্চয়ই জরুরি!

কিন্তু কীরকম জরুরি...? হুঁ, বোঝা গেছে।

দিন দশ পরে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে! এতবড় ডাকসাইটে জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়ে, না জানি কত হাজার টাকার জড়োয়া গহনা যৌতুক দেওয়া হবে। মণিলাল নিশ্চয়ই রাশি-রাশি হীরা-চুনি-পান্নার নমুনা নিয়ে এসেছে। ওর জামার আর ব্যাগের ভিতরে খুঁজলে পাওয়া যাবে হয়তো লক্ষপতির ঐশ্বর্য!

অক্ষয় ছিঁচকে চোর নয়। তার মূলমন্ত্র—মারি তো হাতি, লুঠি তো ভাণ্ডার! সোনা-দানা সে অপছন্দ করে না বটে, কিন্তু হীরা-পান্নার দিকেই ঝোঁক তার বেশি। হীরা-পান্না বড় ভালো জিনিস; ভার নয়, মস্ত নয়, হাতের মুঠার ভিতরে লুকিয়ে রাখা যায় দস্তুরমতন সাত রাজার ধন।

অক্ষয় ভাবতে লাগল, মণিলালের কাছে কত টাকার পাথর আছে?

মণিলাল বললে, 'আজ ভারি শীত পড়েছে!'

অক্ষয় বললে, 'হ্যাঁ, বড্ড।' তারপর আবার ভাবতে লাগল ঃ কত টাকার পাথর আছে? পাঁচ হাজার? দশ হাজার? ...উহুঁঃ তার চেয়েও বেশি! জমিদার যত টাকার পাথর কিনবেন, তাঁকে দেখাবার জন্য মণিলাল নিশ্চয়ই তার ঢের-ঢের বেশি টাকার জিনিস এনেছে। নইলে ও নিজে আসত না। ওর কাছে বোধহয় পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে।

অক্ষয় কেমন অস্থির হয়ে উঠল। নিজের অস্থিরতা ঢাকবার জন্যে বলল, 'আপনি ফুলের বাগান ভালোবাসেন?'

মণিলাল শুষ্কস্বরে বলল, 'মাঝে-মাঝে পার্কে হাওয়া খেতে যাই। আমি কলকাতায় থাকি কি না।'

আবার সে বোবা। এইটেই স্বাভাবিক। অক্ষয় বুঝল, মণিলাল বেশি কথা কইতে নারাজ, হাজার-হাজার টাকার সম্পত্তি যার সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে, মুখরতা তার সাজে না।... 'ধরলুম, ওর কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার পাথর আছে। পঞ্চাশ হাজার অর্থাৎ আধ লক্ষ টাকা! ও-টাকায় কোম্পানির কাগজ কিনলে মাসে কত টাকা আয় হয়? তার সঙ্গে যদি আমার জমানো টাকা যোগ করি—তা হলে? ওঃ! তা হলে আর আমাকে চুরি-চামারি করতে হয় না—সারাজীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে-বসে খেতে পারি।'

অক্ষয় একবার আড়চোখে মণিলালের দিকে তাকিয়ে চট করে আবার নজর ফিরিয়ে নিলে। তার মনের ভিতরে জেগে উঠছে একটা বিশ্রী ভাব—একে দমন করতেই হবে! 'আমি চুরি করি বটে, কিন্তু খুন? না, না, এ হচ্ছে ভয়াবহ পাগলামি! ...হ্যাঁ, একবার শ্যামবাজারের একটা পাহারাওয়ালাকে ছোরা মারতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে তো হচ্ছে তার নিজেরই দোষ! তারপর হাটখোলার সেই বুড়োটা। তার মুখ বন্ধ না করলে উপায় ছিল না, আমাকে দেখে সে যা ষাঁড়ের মতন চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল! এ-দুটো হচ্ছে দৈব-দুর্ঘটনা—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে কাজ করতে হয়েছিল। এজন্যে আমি নিজেও কম দুঃখিত নই। কিন্তু স্বেচ্ছায় নরহত্যা! খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া! উন্মত্ত না হলে এমন কাজ কেউ করে...!'

'তবে এ-কথাও ঠিক, আমি যদি খুনি হতুম এমন সুযোগ আর পেতুম না। এত টাকার সম্পত্তি, খালি বাড়ি, পল্লীর বাইরে নির্জন ঠাঁই, রাত্রিবেলা, ঘুটঘুটে অন্ধকার...।'

'কিন্তু এই লাশটা! খুনের পরে যত মুশকিল বাধে এই লাশ নিয়ে। লাশের গতি করা বড় দায়—।'

এমনি সময়ে হঠাৎ একখানা চলন্ত রেলগাড়ির শব্দ শোনা গেল। বাড়ির পিছনকার পোড়ো জমির ওপাশ দিয়ে লাইন যেখানে মোড় ফিরে গিয়েছে, গাড়ি আসছে সেইখান দিয়ে।

অক্ষয়ের মাথার ভিতর দিয়ে ধাঁ-করে একটা নতুন চিন্তা খেলে গেল। সেই চিন্তা-সূত্র ধরে তার মন হল অগ্রসর এবং তার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল মণিলালের দিকে—সে নিজের মনেই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে মাঝে-মাঝে।

অক্ষয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি উঠে মণিলালের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল। তার মন যেন বললে—'অক্ষয়, শিগগির বাড়ির বাইরে পালিয়ে যাও!'

যদিও অক্ষয়ের দেহ হয়ে উঠেছিল তখন উত্তপ্ত, তবু তার বুকের ভিতরে জাগল যেন শীতের কাঁপন! মাথা ঘুরিয়ে দরজার পানে তাকিয়ে সে বলল, 'কী কনকনে হাওয়া! আমি কি ভালো করে দরজা বন্ধ করে দিইনি?' এগিয়ে গিয়ে দু-হাট করে দরজা খুলে বাইরে উঁকি মারল। তার ইচ্ছা হল দৌড়ে খোলা বাতাসের কোলে গিয়ে পড়ে, একেবারে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, এই আকস্মিক খ্যাপামির কবল থেকে মুক্তিলাভ করে।

বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে বললে, 'এইবার স্টেশনের দিকে পা চালালে কেমন হয়, তা-ই ভাবছি।'

মণিলাল চায়ের শূন্য পেয়ালাটা রেখে দিয়ে মুখ তুলে বললে, 'আপনার ঘড়ি কি ঠিক?'

অক্ষয় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘাড় নেড়ে জানালে, 'হ্যাঁ।'

মণিলাল বললে, 'স্টেশনে গিয়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

'বড়জোর দশ মিনিট।'

'এই তো সবে সাতটা-বিশ! এখনও একঘণ্টারও বেশি সময় আছে। বাইরের ঠাণ্ডায় অন্ধকারের চেয়ে এ-ঘর ঢের ভালো। মিছে তাড়াতাড়ি করবার দরকার আছে কি?

'কিছু না, কিছু না।' অক্ষয়ের কণ্ঠস্বর খানিক খুশি, খানিক বিষাদমাখা। আরও খানিকক্ষণ

সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—কালো রাত্রির মধ্যে দুই চোখ ডুবিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো। তারপর দরজা বন্ধ করে দিলে, নিঃশব্দে।

তারপর সে নিজের চেয়ারে বসে বাক্যব্যয়ে নারাজ মণিলালের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কথাগুলো হল কেমন যেন বাধো-বাধো, অসংলগ্ন! সে অনুভব করলে, তার মুখ যেন ক্রমেই তপ্ত, তার মস্তিষ্ক যেন ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং তার কান যেন করছে ভোঁ-ভোঁ! তার চোখ যেন কী এক ভয়াবহ একাগ্রতার সঙ্গে মণিলালের দিকে নজর দিতে চায়! প্রাণপণে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরালে বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই আরও ভয়ানকভাবে আবার তার দিকেই তাকাতে বাধ্য হল এবং তার মনের ভিতরে কেবল এই প্রশ্নই চলাফেরা করতে লাগল—এমন অবস্থায় পড়লে অন্য কোনও খুনি কী করত, কী করত, কী করত? ...দেখতে-দেখতে সে ধীরে-ধীরে প্রত্যেক দিক থেকে নিজের ভীষণ সংকল্পকে পরিপূর্ণ করে তুললে,—কোনও দিকেই কোনও ছিদ্র রাখল না।

তার মনে জাগল অস্বস্তি। মণিলালের দিকে খর-নজর রেখেই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পকেটে যার অতুল ঐশ্বর্য তার সুমুখে সে আর বসে থাকতে পারল না। সভয়ে অনুভব করল, তার মনের ঝোঁকটা ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠছে। এখানে বসে থাকলে সে হঠাৎ নিজের উপরে সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলবে এবং তারপর—।

তারপর যা হতে পারে সেটা ভাবতেই অক্ষয়ের সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল, কিন্তু সেইসঙ্গে রত্নের পুঁজি হাতাবার জন্যে তার হাত যেন নিশপিশ করতেও লাগল।

হাজার হোক, অক্ষয় অপরাধী ছাড়া কিছুই নয়। এইসব কাজেই অভ্যস্ত। সে হচ্ছে শিকারী বাঘ! সৎপথে কোনওদিন অর্থোপার্জন করেনি—তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হচ্ছে হিংস্র। সুতরাং এমন সহজলভ্য ঐশ্বর্যকে ত্যাগ করবার প্রবৃত্তি তার হতেই পারে না। এত হীরা-পান্না তার হাতের কাছে এসেও হাত ছাড়িয়ে যাবে, এই সম্ভাবনা অক্ষয়ের চিত্তকে ক্রমেই বেপরোয়া করে তুলতে লাগল।

এই বিষম লোভের নাগাল থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সে আর-একবার শেষ চেষ্টা করবে স্থির করল, যতক্ষণ-না ট্রেনের সময় আসে ততক্ষণ মণিলালের সামনে থাকবে না।

অক্ষয় বলল, 'মশাই, আমি জামা-জুতো-কাপড় বদলে আসি। যে রকম ঠাণ্ডা পড়েছে, এ-পোশাকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়।'

মণিলাল বললে, 'নিশ্চয়ই নয়। অসুখ হতে পারে।'

বৈঠকখানার একপাশে ছিল দালান, ঘর থেকে বেরিয়ে অক্ষয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। তার জামা-কাপড় বদলাবার দরকার নেই—ওটা বাজে ওজর মাত্র। তবু সে আলনার কাছে গিয়ে অকারণেই পোশাক পরিবর্তনে নিযুক্ত হল। ভাবলে, এইখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই বাকি সময়টা কাটিয়ে দেবে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে—অস্বস্তির! 'ওঃ, ও-ঘর হচ্ছে অভিশপ্ত—ওখানকার বাতাস বিষাক্ত। ওখান থেকে পালিয়ে এসে বাঁচলুম—নইলে এখনি হয়তো কী করতে গিয়ে কী করে ফেলতুম! এখানে থাকলে প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না।'

তৃতীয়

'এখানে থাকলে হয়তো প্রলোভন আর আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না—হয়তো সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে মণিলাল নিজেই চলে যাবে। হ্যাঁ, সে একলা চলে গেলেই খুশি হই, তা হলে সমস্ত আপদই চুকে যায়—অন্তত এই ভীষণ সুযোগ বা সম্ভাবনার দায় থেকে আমি রেহাই পাই—আর ওই হীরা-পান্নাগুলো—।'

একজোড়া নতুন জুতো পরতে-পরতে অক্ষয় ধীরে-ধীরে মাথা তুললে...।

খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে মণিলাল। কাগজ আর তামাক দিয়ে আপন মনে সে নতুন সিগারেট পাকাচ্ছে।

অক্ষয় আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তার জুতো পরা আর হল না। মণিলালের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইল সে মূর্তির মতো, তারপর দৃষ্টি না ফিরিয়েই পা থেকে জুতোজোড়া খুলে ফেললে!

মণিলাল নিশ্চিন্তভাবে সিগারেট পাকিয়ে তামাকের রবারের থলিটা পকেটের ভিতরে রেখে দিলে। তারপর জামার উপর থেকে তামাকের গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলে দেশলাই বার করল।

আচম্বিতে কী এক প্রবল ঝোঁকের তাড়নায় অক্ষয় চট করে দাঁড়িয়ে উঠল এবং চোরের মতন গুড়ি মেরে পা টিপে-টিপে বৈঠকখানার ভিতরে গিয়ে ঢুকল। তার পায়ে এখন জুতো নেই, কোনও শব্দ হল না। বিড়ালের মতন চুপিচুপি সে এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে। তার মুখ চকচকে, তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল ও বিস্ফারিত এবং নিজের কানে সে শুনতে পেলে ধমনীর রক্ত-চলাচল-ধ্বনি!

মণিলাল দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল এবং তারপর ধূমপান করতে লাগল।

ধাপে-ধাপে নিঃশব্দে এগিয়ে অক্ষয় গিয়ে দাঁড়াল একেবারে মণিলালের চেয়ারের পিছনে। পাছে তার নিঃশ্বাস মণিলালের মাথার উপরে গিয়ে পড়ে, সেই ভয়ে সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিল। এইভাবে কেটে গেল আধমিনিট! সে যেন সাক্ষাৎ হত্যার মূর্তি—বলির জীবের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়াল প্রদীপ্ত চক্ষে, উন্মুক্ত মুখবিবর দিয়ে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে নীরবে, দুই হাতের আঙুলগুলো যেন ধড়ফড় করছে বহুমুখ সর্পের মতো!

তারপর আবার তেমনি নিঃশব্দেই অক্ষয় ফিরে গেল দালানের দিকে। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলল। 'একটু হলেই হয়েছিল আর কী! মণিলালের জীবন ঝুলছিল একগাছা সরু সুতোর ডগায়! সত্যিকথা বলতে কী, আমি যখন চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, তখন যদি আমার হাতে কোনও অস্ত্র থাকত,—এমনকী একটা হাতুড়ি বা একখানা পাথর—'

হঠাৎ অক্ষয়ের চোখ পড়ল দালানের কোণে। সেখানে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে একটা লোহার গরাদে। বাড়ির জানলা থেকে এটা কবে খুলে পড়েছিল, ভৃত্য রামচরণ এখানে এনে রেখেছিল? 'একমিনিট আগে এইটেই যদি আমার হাতে থাকত!'

অক্ষয় লোহাগাছা তুলে নিলে। হাতের উপরে রেখে তার ভার পরীক্ষা করল... 'হুঁ, এটা হচ্ছে দস্তুরমতো অস্ত্র, ব্যবহার করবার সময় বন্দুক বা রিভলভারের মতন চিৎকার করে পাড়া জাগায় না। আমার কার্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু না, না, এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামানো ভালো নয়। এটাকে যথাস্থানে রেখে দেওয়াই উচিত!'

কিন্তু লোহার ডান্ডা সে রেখে দিলে না। উঁকি মেরে দেখলে, মণিলাল তখনও সেইভাবে বসেই সিগারেট টানছে।

আবার অক্ষয়ের ভাব-পরিবর্তন হল! আবার তার মুখ হয়ে উঠল রাঙা-টকটকে ও ভ্রূকুটিকুটিল এবং গলার উপরে ফুলে উঠল একটা শির এবং পায়ে-পায়ে আবার সে এগিয়ে এল বৈঠকখানার ভিতরে।

মণিলালের চেয়ার থেকে কিছু তফাতে দাঁড়িয়ে সে মাথার উপরে তুললে লোহার ডান্ডা! একটা অস্পষ্ট শব্দ হল। ডান্ডাটা যখন নিচে নামছে, মণিলাল হঠাৎ ফিরে দেখল। তাইতেই অক্ষয়ের লক্ষ্য আংশিকভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল—ডান্ডাটা মণিলালের মাথার উপরে না পড়ে একপাশ ঘেঁষে নেমে গেল, একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য রকম আঘাত দিয়ে।

ভয়ার্ত বিকট চিৎকার করে মণিলাল লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল এবং প্রাণপণে চেপে ধরল অক্ষয়ের দুই হাত।

তারপর আরম্ভ হল বিষম ধস্তাধস্তি! দুজনেই দুজনকে চেপে ধরল সাংঘাতিক আলিঙ্গনে এবং দুজনেই কখনও দুলতে থাকে এপাশে-ওপাশে, কখনও এগিয়ে বা কখনও পিছিয়ে যায়! চেয়ার

পড়ল উল্টে, টেবিলের উপর থেকে ঠিকরে পড়ল একটা কাচের গেলাস, মণিলালের চশমারও হল সেই দশা, দুজনের পায়ের চাপে গেলাস ও চশমা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এবং তারপরেও আরও বার-তিনেক জাগল মণিলালের সেই বিকট চিৎকার—বিদীর্ণ করে রাত্রির স্তব্ধতা! সেই উন্মাদগ্রস্ত অবস্থাতেও অক্ষয়ের বুক আতঙ্কে শিউরে উঠল। যদি কোনও পথিক দৈবগতিকে এদিকে এসে পড়ে, যদি সে শুনতে পায়?

নিজের দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে অক্ষয় তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেলে নিয়ে টেবিলের উপর ফেলে চেপে ধরল এবং টেবিলের আচ্ছাদনের এক অংশ তুলে পুরে দিল তার মুখের ভিতরে। এইভাবে তারা নিশ্চল হয়ে রইল পূর্ণ দুই মিনিট ধরে—সে এক ভয়াবহ নাটকীয় দৃশ্য!

দেখতে-দেখতে মণিলালের দেহ পড়ল এলিয়ে, ক্রমে-ক্রমে তার মাংসপেশির সমস্ত স্পন্দন থেমে গেল। তখন অক্ষয় তাকে ছেড়ে দিল, মণিলালের জীবনহীন দেহটা মাটির উপরে এলিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

যা হবার তা হয়ে গেল। এতক্ষণ যে-সম্ভাবনাকে অক্ষয় ভয় করছিল, তা পরিণত হল নিশ্চিত সত্যে! যাক, এ-বিষয় নিয়ে আর অনুতাপ করা মিথ্যা। অনুতাপের দ্বারা মড়াকে আর করা যাবে না জীবন্ত।

চতুর্থ

অক্ষয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। শীতকালেও সে ঘেমে উঠেছে।

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ঘড়ির দিকে তাকাল।

সবে সাড়ে সাতটা!

এই ক'মিনিটের মধ্যে এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল! এতক্ষণ প্রত্যেক মিনিটই ছিল যেন একঘণ্টার মতন দীর্ঘ।

সাড়ে সাতটা! ট্রেন আসবে সাড়ে আটটায়, হাতে সময় আছে আর-একঘণ্টা! এর মধ্যেই বাকি সমস্ত কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। তা একঘণ্টা সময় নিতান্ত অল্প নয়।

অক্ষয়ের ভাবভঙ্গি এখন শান্ত। তার একমাত্র দুর্ভাবনা, মণিলালের চিৎকার কেউ শুনতে পেয়েছে কি না! কেউ যদি না শুনে থাকে, তা হলে তাকে আর পায় কে!

সে হেঁট হয়ে মৃতব্যক্তির দাঁতের ভিতর থেকে টেবল-ক্লথখানা আস্তে-আস্তে টেনে বার করে নিল। তারপর তার জামাকাপড় খুঁজতে আরম্ভ করল। বেশিক্ষণ লাগল না যা খুঁজছিল তা পেতে।

একটি ছোট্ট চামড়ার বাক্সের ভিতরে আলাদা-আলাদা কাগজের মোড়কে রয়েছে হীরা, চুনি, পান্না ও মুক্তা প্রভৃতি অনেক দামি জিনিস। তা হলে তার শ্রম সার্থক! মানুষের প্রাণবধ করেছে বলে তার মনে আর কোনওরকম অনুশোচনার সঞ্চার হল না। বরং নিজেই নিজেকে দিতে লাগল অভিনন্দন।

তারপর সে সুপটু হাতে কর্তব্য-সম্পাদনে নিযুক্ত হল। টেবল-ক্লথের উপরে পড়েছিল কয়েব ফোঁটা রক্ত। লাশের মাথার তলায় কার্পেটেরও উপরে লেগেছে রক্তের ছোপ। জল ও ন্যাকড়া এনে সে আগে সাবধানে রক্তচিহ্নগুলো ধুয়ে-মুছে ফেলল। তারপর লাশের মাথার তলায় একখানা খবরের কাগজ রেখে দিল—নতুন রক্ত লেগে যাতে আর কার্পেট কলঙ্কিত না হয়।

তারপর টেবিল-কাপড়খানা আবার টেবিলের উপরে পেতে দিল, উল্টানো চেয়ারখানা দাঁড় করিয়ে দিলে সোজা করে।

কার্পেটের উপরে পড়েছিল একটা পায়ের চাপে চ্যাপ্টা সিগারেটের ধ্বংসাবশেষ ও একটা

দেশলাইয়ের কাঠি। সে দুটো তুলে ছুড়ে দালানের দিকে ফেলে দিলে। কার্পেটের উপরে একরাশ কাচের গুঁড়ো পড়েছিল। সেই তারামার্কা গেলাসের ও মণিলালের চশমার ভাঙা কাচ। সেগুলো তুলে আগে সে একখানা কাগজের উপরে জড়ো করলে। তারপর যতদূর সম্ভব যত্ন করে বেছে-বেছে চশমা-ভাঙা কাচের টুকরোগুলো আর-একখানা কাগজের উপরে তুলে রাখল। চশমার ফ্রেম ও কাচের চূর্ণগুলো মোড়কে পুরে রাখল নিজের পকেটের ভিতরে। যেগুলোকে গেলাসের ভাঙা কাচ বলে মনে হল, সেগুলো কাগজে করে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির খিড়কির দিকে গেল। সেখানে একটা আঁস্তাকুড় ছিল—কাগজে-মোড়া কাচগুলো তার ভিতরে ফেলে দিয়ে আবার ফিরে এল।

এইবারে আসল কাজ। টেবিলের টানার ভিতর থেকে সে একটা ফিতার কাঠিম বার করল। খানিকটা ফিতা ছিঁড়ে নিয়ে মৃতের ছাতা ও ব্যাগটা বেঁধে নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে রাখল, তারপর ভূমিতল থেকে মৃতব্যক্তিকে টেনে তুলল আর-এক কাঁধের উপরে। মণিলাল ছোটখাটো মানুষ, তার দেহও ভারি নয় এবং অক্ষয় হচ্ছে দীর্ঘদেহ, হৃষ্টপুষ্ট, বলবান ব্যক্তি—সুতরাং তার পক্ষে বড়জোর একমণ পনেরো বা বিশ সের ওজনের একটা দেহের ভার বহন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়।

শীতার্ত অন্ধ রাত্রি—চারিদিক নিঝুম।

অক্ষয় খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে পোড়ো জমির উপরে গিয়ে পড়ল। কুয়াশায় অন্ধকারকে যেন আরও ঘন করে তুলেছে—চোখ চেয়েও কিছু দেখা যায় না।

অক্ষয় খানিকক্ষণ কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। একটা ভীত শিয়াল বা কুকুরের দ্রুত পদশব্দ ছাড়া আর জনপ্রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

অক্ষয় তখন দৃঢ়পদে অগ্রসর হল। পোড়ো জমিটা এবড়ো-খেবড়ো ও কাঁকর-ভরা হলেও আঁধার রাতে তার খুব অসুবিধা হল না—কারণ এ-মাঠ তার বিশেষ পরিচিত।

ঘাসের উপর তার পায়ের শব্দ হচ্ছিল না বটে, কিন্তু সেই সূচিভেদ্য স্তব্ধতার মধ্যে তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর ছাতা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে তুলছিল একটা বিরক্তিজনক আওয়াজ। মণিলালের দোদুল্যমান মৃতদেহের চেয়ে সেই ব্যাগ ও ছাতাকে সামলাবার জন্য অক্ষয়কে বিশেষ বেগ পেতে হচ্ছিল।

এই পোড়ো জমির পাশেই রেল-লাইন। সাধারণত জমিটুকু পার হতে তিন-চারমিনিটের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে পিঠে একটা মড়া নিয়ে অতি সাবধানে চারিদিকে চোখ ও কান রেখে, চলতে-চলতে মাঝে-মাঝে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আবার অগ্রসর হতে গিয়ে অক্ষয়ের প্রায় আট-নয়মিনিট লাগল।

তারপর পাওয়া গেল রেল-লাইনের তারের বেড়া। আবার সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজতে লাগল কোনও জীবন্ত ছায়া, তার কান খুঁজতে লাগল কোনও জীবনের সাড়া। কিছু নেই। খালি অন্ধকার, খালি নীরবতা।

হঠাৎ দূর থেকে জেগে উঠল চলন্ত রেলগাড়ির চাকার গড়গড় আওয়াজ—তারপর অতি-তীব্র বাঁশির চিৎকার!

অক্ষয় সজাগ হয়ে উঠল—আর দেরি নয়! সে তাড়াতাড়ি তারের বেড়া পার হল। তারপর যেখানটায় লাইন বেঁকে মোড় ফিরেছে সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। লাশটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এমনভাবে উপুড় করে রাখল, যাতে দেহের কণ্ঠদেশটা পড়ে ঠিক লাইনের উপরে।

তারপর সে পকেট থেকে ছুরি বার করে ছাতা ও ব্যাগের ফিতা কেটে ফেলল। ছাতা ও ব্যাগটাকে রাখলে ঠিক লাশের পাশে। সযত্নে ফিতাটাকে আবার পকেটে পুরল, লাইনের কাছে পড়ে রইল কেবল ফিতার ফাঁসটুকু। সেটা তার চোখ এড়িয়ে গেল।

গাড়ির শব্দ কাছে এগিয়ে এসেছে। এখানা নিশ্চয়ই মালগাড়ি।

অক্ষয় শীঘ্রহস্তে পকেট থেকে কাগজের মোড়কটাকে বার করল। চশমার তোবড়ানো ফ্রেমটা রেখে দিলে মৃতের মাথার পাশে। এবং কাচের টুকরোগুলো ছড়িয়ে দিল তারই চতুর্দিকে।

ইঞ্জিনের ধূম্র-উদ্গিরণের ভোঁস-ভোঁস শব্দ শোনা যাচ্ছে অতি নিকটে! অক্ষয়ের ইচ্ছা হল, সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। স্বচক্ষে দেখে যায়, যবনিকা-পতনের পূর্বে এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটা—কেমন করে নরহত্যা পরিণত হয় আত্মহত্যায় বা দৈব-দুর্ঘটনায়।

কিন্তু না, এখানে তার উপস্থিতি নিরাপদ নয়। তা হলে হয়তো অদৃশ্য হবার আগে কেউ তাকে দেখে ফেলবে। চটপট সে আবার বেড়া পার হল, দ্রুতপদে পোড়ো জমির উপর দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে ফিরতে লাগল—পিছনে যথাস্থানে আগতপ্রায় রেলগাড়ির বজ্রধ্বনি শুনতে-শুনতে।

রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে!

শ্বাস রুদ্ধ করে ভূপ্রোথিত মূর্তির মতন স্তম্ভিত হয়ে অক্ষয় দাঁড়িয়ে পড়ল—মুহূর্তেকের জন্যে। তারপর সে প্রায় দৌড়ে নিজের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। নীরবে দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

সে ভয় পেয়েছে। ব্যাপার কী? গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল কেন? নিশ্চয়ই লাশটা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু, এখন কী হচ্ছে ওখানে? ওরা কি তার বাড়িতে আসবে? রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে সে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল। হয়তো এখনই কেউ এসে তার দরজার কড়া নাড়বে।

বৈঠকখানায় ঢুকে পড়ে সে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে দেখলে চারিদিকে। সমস্তই বেশ গোছালো।

কিন্তু লোহার ডান্ডাটা এখনও ঘরের মেঝেয় পড়ে আছে।

সে ডান্ডাটা তুলে নিয়ে ল্যাম্পের আলোয় পরীক্ষা করে দেখলে। তার উপরে কোনও রক্তের দাগ নেই। কেবল দুই-একগাছা চুল লেগে আছে।

রেলগাড়ির ব্যাপারটা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কের মতন সে টেবিল-কাপড় দিয়ে ডান্ডাটা একবার মুছে ফেললে।

সেটাকে নিয়ে আবার বাড়ির পিছন দিকে দৌড়ে গেল। পাঁচিলের উপর দিয়ে ডান্ডাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সেটা পড়ল গিয়ে পোড়ো জমির বিছুটির ঝোপের ভিতরে।

ডান্ডাটার ভিতরে তাকে ধরিয়ে দেবার মতন কোনও প্রমাণ ছিল না। কিন্তু সেটাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে বলেই অক্ষয়ের চক্ষে তা ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

সে বুঝল, এইবার তার স্টেশনের দিকে যাত্রা করা উচিত। যদিও এখনও গাড়ির সময় হয়নি তবু আর বাড়ির ভিতরে থাকতে তার ভরসা হল না। সে চায় না, এখানে এসে কেউ তাকে দেখতে পায়।

অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাইরে বেরুবার আয়োজন সেরে নিলে। তারপর একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে পড়তে গেল।

কিন্তু আবার ফিরে এল ল্যাম্পটা নিবিয়ে দেওয়ার জন্যে।

আলো নেবাবার জন্যে হাত তুলেছে—হঠাৎ তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলঘরের একদিকে। কী সর্বনাশ!

পঞ্চম

মণিলালের টুপিটা তখনও পড়ে রয়েছে চেয়ারের উপরে!

তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে গেল—একেবারে আড়ষ্ট! সে মারাত্মক আতঙ্কে ঘেমে উঠল।

আর একটু হলেই তো সে আলো নিবিয়ে চলে যাচ্ছিল—পিছনে তার বিরুদ্ধে এতবড় প্রমাণ ফেলে রেখে! বাইরের কেউ যদি এসে এই টুপিটা এখানে দেখতে পেত, কী হত তা হলে?

চেয়ারের কাছে গিয়ে নেমদার টুপিটা তুলে নিয়ে সে তার ভিতর দিকে দৃষ্টিপাত করে শিউরে উঠল!

টুপিটা না দেখে চলে গেলে কি আর রক্ষে ছিল? এখনই যদি কারা এসে পড়ে, তার হাতে বা ঘরে এই টুপিটা দেখতে পায়, তা হলে কেউ তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাতে পারবে না।

এই কথা ভেবেই সে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু দারুণ আতঙ্কে বুদ্ধি হারাল না।

রান্নাঘরের উনুনের কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখল, আগুন নিবে গেছে। তখনই কতকগুলো জ্বালানি কাঠ জোগাড় করে এনে অক্ষয় আবার অগ্নি সৃষ্টি করল। তারপর ছুরি দিয়ে টুপিটা খণ্ড-খণ্ড করে কেটে সমর্পণ করল আগুনের কবলে। তার হৃৎপিণ্ড তখনও যেন দুপ-দুপ করে লাফিয়ে উঠছে। যদি কেউ এসে পড়ে—যদি কেউ এসে পড়ে! তার হাতের কাঁপুনি যেন আর থামতেই চায় না—এখনই এত সাবধানতা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল আর কী!

নেমদা বা 'ফেল্ট' সহজে পোড়বার জিনিস নয়। টুপির খণ্ডগুলো ধিকি-ধিকি করে আস্তে-আস্তে পুড়ে প্রচুর ধোঁয়ার জন্ম দিয়ে অঙ্গারের মতন হয়ে যাচ্ছে—সত্যিকার ভস্মে পরিণত হচ্ছে না। তার উপরে চুল-পোড়া গন্ধের সঙ্গে রজনের গন্ধ মেশানো এমন একটা বিষম দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল যে, অক্ষয় ভয় পেয়ে রান্নাঘরের জানলাগুলো খুলে দিতে বাধ্য হল।

তখনও সে কান পেতে শুনছে আর ভাবছে, বাইরে বুঝি জাগল কার পদশব্দ, ওই বুঝি নড়ে ওঠে সদরের কড়া, ওই বুঝি আসে নিয়তির নিষ্ঠুর আহ্বান!

ওদিকে সময়ও আর নেই। সাড়ে আটটা বাজতে বাকি আর বিশ মিনিট মাত্র! আর মিনিট-কয়েকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে না পারলে ট্রেন ধরা অসম্ভব হবে!

আরও অল্পক্ষণ অপেক্ষা করে দেখল, টুপির খণ্ডগুলোকে আর চেনা যায় না। তখন সে একটা লোহার শিক নিয়ে অঙ্গারগুলোর উপরে সজোরে আঘাত করতে লাগল। পোড়া কাঠ ও কয়লার সঙ্গে টুপির দগ্ধাবশেষ নেড়ে-নেড়ে এমনকরে মিশিয়ে দিলে যে, সন্দেহজনক কোনও কিছু চোখে পড়বার উপায় আর রইল না। এমনকী ভৃত্য রামচরণ পর্যন্ত কিছু বুঝতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। খুব সম্ভব, সে যখন ফিরে আসবে অঙ্গার তখন ভস্মে পরিণত হবে। অক্ষয় ভালো করেই দেখে নিয়েছে, টুপির মধ্যে ধাতু দিয়ে তৈরি এমন কোনও বস্তু নেই, আগুনের কবলেও যা নষ্ট হবার নয়।

আবার সে ব্যাগ তুলে নিল, আবার সে তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে বৈঠকখানার চতুর্দিক পরীক্ষা করল, তারপর ঘর ছেড়ে বাড়ির বাইরে গেল। সদর দরজার কুলুপে চাবি লাগাল। তারপর হনহন করে চলল স্টেশনের দিকে। কিন্তু এবার সে ভুলে গেল, বৈঠকখানার আলো নিবিয়ে দিতে!

ট্রেন আসবার আগেই অক্ষয় স্টেশনে গিয়ে পৌঁছল। টিকিট কিনল। তারপর যেন নিশ্চিন্তভাবেই প্ল্যাটফর্মের উপরে পায়চারি করতে লাগল।

সে আড়চোখে বেশ লক্ষ্য করল, ট্রেনের সিগন্যাল দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু চারিদিকেই যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে! যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে গিয়ে দলবেঁধে রেল-লাইনের একদিকেই দূরে তাকিয়ে আছে।

সঙ্কোচ-ভরা কৌতূহলের সঙ্গে অক্ষয় সেইদিকে এগিয়ে গেল পায়ে-পায়ে।

অন্ধকার ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করলে দুইজন লোক। প্ল্যাটফর্মের ঢালু প্রান্ত দিয়ে উপরে উঠে এল। তারা তের্পলে ঢাকা স্ট্রেচারে করে কী যেন বয়ে আনছে।

সেটা যে কী, তা বুঝতে অক্ষয়ের দেরি লাগল না। তার বুক করতে লাগল ছাঁৎ-ছাঁৎ।

তের্পলের তলা থেকে একটা অস্পষ্ট দেহের গঠন ফুটে উঠছে—যাত্রীরা তাড়াতাড়ি এপাশে-ওপাশে সরে গিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল আড়ষ্ট, মন্ত্রমুগ্ধ চোখে।

বাহকরা চলে গেল। পিছনে-পিছনে আসছিল একটা কুলি। তার হাতে একটা ব্যাগ আর ছাতা।

হঠাৎ যাত্রীদের ভিতর থেকে একটি ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে-লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি বললে, 'হাঁ বাবু!' ছাতাটা সে ভদ্রলোকের চোখের সামনে তুলে ধরল। দামি ছাতা। তার হাতলটা বিশেষ ধরনের রুপো দিয়ে বাঁধানো।

ভদ্রলোক সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বল কী?'

তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আর-একটি দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। তিনি শুধোলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ-কথা বলছেন কেন?'

বসন্তবাবু বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দ্বিতীয় অংশ

অপরাধ আবিষ্কারের কলাকৌশল

প্রথম

ডাক্তার দিলীপ চৌধুরীর এত নামডাক ডাক্তারির জন্যে নয়। তিনি সুবিখ্যাত রসায়নতত্ত্ববিদ। এবং তাঁর আসল খ্যাতির কারণ, বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচিত্র উপায়ে তিনি বহু কঠিন ও রহস্যপূর্ণ পুলিশ-কেসের কিনারা করেছেন। শ্রীমন্ত সেন হচ্ছেন তাঁর বিশেষ বন্ধু ও নিত্যসঙ্গী। নিচেকার অংশ শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি থেকে তুলে দেওয়া হল।

সকলেই জানেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে, সেখানে পুলিশের মাথাওয়ালারা আমার বন্ধু ডাক্তার দিলীপ চৌধুরীর সাহায্য লাভ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

কলকাতার বিখ্যাত জহুরী মণিলাল বুলাভাইয়ের মৃত্যুরহস্যের মধ্যে বন্ধুবর দিলীপের কৃতিত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাঁর ওই Medico-legal পদ্ধতির কোনও-কোনও বিশেষত্ব পুলিশকে খুশি করতে পারেনি। বিশেষত্বগুলি যে কী, যথাস্থানে দিলীপের মুখেই তা প্রকাশ পাবে। আপাতত, কেমন করে আমরা এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লুম, গোড়া থেকে সেই কথাই বলব।

শীতের কুয়াশামাখা সন্ধ্যা যখন অন্ধকারে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে, আমাদের ট্রেন গতি কমিয়ে ধীরে-ধীরে চাঁদনগরের ছোট স্টেশনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দিলীপ কামরার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আরে-আরে, বসন্তবাবু যে!'

সঙ্গে-সঙ্গে একটি সহজে-উত্তেজিত-হওয়ার-মতন চেহারার ছোটখাটো, চটপটে অথচ হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক আমাদের কামরার কাছে এসে বললেন, 'অ্যাঁ! দিলীপবাবু? জানলার ধারে আপনার মুখ দেখেই চিনেছি! ভারি খুশি হলুম মশাই, ভারি খুশি হলুম! কিন্তু আপনারা হচ্ছেন মস্তবড় বিজ্ঞ লোক, আমাকে আপদ ভাববেন না তো?'

দিলীপ হেসে বললেন, 'আপনার দীনতা দেখে লজ্জা পাচ্ছি! কিন্তু যাক সে-কথা। এখানে আপনি কী করছেন বলুন দেখি?'

'আমার ছোটভাই এখান থেকে কিছুদূরে একটা জমি কিনেছে। আমি তাই দেখতে এসেছিলুম। এই ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব?' বলেই বসন্তবাবু দরজা খুলে কামরার ভিতরে উঠে এলেন, তারপর

বসে পড়ে বললেন, 'কিন্তু আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন? সঙ্গে ওই রহস্যময় ছোট বাক্সটিও এনেছেন দেখছি! ও বাক্সটি দেখেই নতুন অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি! আমার কাছে ওটি হচ্ছে ম্যাজিক-বাক্স!'

দিলীপ বললেন, 'ও-বাক্সটি সঙ্গে না নিয়ে আমি কখনও বাড়ির বাইরে পা বাড়াই না। হঠাৎ কখন কী দরকার হতে পারে কে জানে? ছোট বাক্স, বইতে কষ্ট নেই, কিন্তু দরকারের সময়ে ওটিকে হাতের কাছে না পেলে নাকালের একশেষ হতে হয়!'

বাক্সের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসন্ত বললেন, 'সেই ব্যাঙ্কে খুনের মামলায় ওই বাক্স থেকে যন্ত্রপাতি বার করে আপনি যে-আশ্চর্য ভেলকি-বাজি দেখিয়েছিলেন, আমার এখনও মনে আছে। অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স! ওর মধ্যে কী জাদু আছে, কে জানে!'

দিলীপ মৃদু হেসে সস্নেহে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে তার ডালা খুলে ফেললেন। একরত্তি বাক্স —চৌকো একফুট মাত্র। দিলীপ এটিকে বলেন, 'আমার পকেট-রসায়নশালা!' এর মধ্যে ক্ষুদে-ক্ষুদে যে-জিনিসগুলি আছে, তার সাহায্যে যে-কোনও রসায়নতত্ত্ববিদ অনায়াসেই প্রাথমিক পরীক্ষা-কার্য সম্পাদন করতে পারেন।'

'অদ্ভুত বাক্স, অদ্ভুত বাক্স!' —বলে বসন্তও মুগ্ধচোখে তার ভিতর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ভিতরে যা-কিছু আছে সব এতটুকু-এতটুকু—যেন গলিভারের ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত কড়ে-আঙুলের মতন ছোট্ট মানুষের দেশ লিলিপুটের ব্যবহারযোগ্য, অথচ তার মধ্যে নেই কী? নানা রাসায়নিক তরল পদার্থে ভরা 'পরীক্ষক'-শিশি, কাচনল, 'স্পিরিট-ল্যাম্প,' অণুবীক্ষণ প্রভৃতি!

বসন্ত বললেন, 'এ যেন পুতুল-খেলার বাক্স! কিন্তু মশাই এত ছোট-ছোট জিনিস নিয়ে কী কাজ করা যায়? ধরুন, ওই অণুবীক্ষণটি—।'

দিলীপ বললেন, 'ওটিকে খেলনার মতন দেখতে বটে, কিন্তু ওটি খেলনা নয়। ওর বীক্ষণ-কাচ ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। অবশ্য বড় যন্ত্রে কাজের সুবিধা হয় বেশি, কিন্তু পথে-বিপথে যেখানে বড় যন্ত্র পাওয়া অসম্ভব, সেখানে তার অভাব এর দ্বারা যথাসম্ভব পূরণ করা চলে। এগুলি হচ্ছে মধুর অভাবে গুড়ের মতো—কিচ্ছু-নেইয়ের মধ্যে তবু-কিছু!'

বসন্ত হাত দিয়ে এক-একটি জিনিস তোলেন, আর বালকের মতন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। তাঁর অসীম কৌতূহল চরিতার্থ করতে-করতে গাড়ি এসে পড়ল চাঁদনগর জংশনে।

বসন্ত বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও দিলীপবাবু, এইখানেই আমাদের গাড়ি-বদল করতে হবে না?'

দিলীপ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ।'

আমরা তিনজনেই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লুম। এবং নেমেই বুঝলুম, এখানে কোনও অসাধারণ ঘটনা ঘটেছে। যাত্রী এবং স্টেশনের লোকজনরা প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে সমবেত হয়েছে—চারিদিকেই যেন কেমন একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব।

স্টেশনের একটি লোককে ডেকে বসন্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী মশাই?'

'লাইনের ওদিকে একটি লোক রেলগাড়ি-চাপা পড়েছে। দূর থেকে ওই যে একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে, খুব সম্ভব স্ট্রেচারে করে লাশ নিয়ে আসা হচ্ছে।'

আমরা যখন সেই অন্ধকারে দোদুল্যমান আলোটার দিকে তাকিয়ে আছি, তখন টিকিট-ঘর থেকে একটি লোক বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

লোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুই কারণে। প্রথমত, তার মুখ হাসিখুশিমাখা হলেও কেমন যেন বিবর্ণ এবং তার চক্ষে ছিল একটা বন্য ভাব; দ্বিতীয়ত, সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে রেল-লাইনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকলেও সে কারুকে কোনও প্রশ্ন করছিল না।

দুলন্ত আলোটা কাছে এগিয়ে এল। তারপর দেখা গেল, দুজন লোক তের্পলে ঢাকা একটা স্ট্রেচার নিয়ে প্লাটফর্ম-এর ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তের্পলের তলায় যে একটা মনুষ্যদেহ আছে, সেটাও আমরা বুঝতে পারলুম।

একটা ছাতা ও একটা ব্যাগ নিয়ে আসছিল একজন কুলি। বসন্তবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যে লোক কাটা পড়েছে, ওটা কি তারই ছাতা?'

কুলি ছাতাটা তুলে ধরে বললে, 'হ্যাঁ বাবু!'

বসন্ত সচমকে বলে উঠলেন, 'হা ভগবান! বলো কী?'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন বসন্তবাবু, আপনি এ-কথা বলছেন কেন?'

বসন্ত বললেন, 'ওটা হচ্ছে মণিলাল বুলাভাইয়ের ছাতা। আমি ওর বাঁট দেখেই চিনেছি!'

দিলীপ বললেন, 'জহুরী মণিলাল বুলাভাই?'

বসন্ত বললেন, 'হ্যাঁ। মণিলালের একটা অভ্যাস ছিল, টুপির তলায় নিজের নাম লিখে রাখা। ওহে বাপু কুলি, লাশের টুপিটা একবার দেখাও দেখি!'

কুলি বললে, 'কোনও টুপি পাওয়া যায়নি। স্টেশনমাস্টার আসছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

স্টেশনমাস্টার এসে বললেন, 'ব্যাপার কী?'

বসন্ত বললেন, 'এই ছাতা আর এর মালিককে আমি চিনি।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'তাই নাকি, তাই নাকি? তা হলে একবার আমার সঙ্গে আসুন, লাশটাও শনাক্ত করতে পারেন কি না দেখি!'

বসন্ত সভয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ও বাবা!!'

'ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'রেলে কাটা পড়ে মণিলালের চেহারা কীরকম বিশ্রী হয়েছে, কে জানে!'

'চেহারা মোটেই ভালো হয়নি, ছ'খানা মালগাড়ির চাকা বেচারার ওপর দিয়ে চলে যাবার আগে ড্রাইভার গাড়ি থামাতে পারেনি। ধড় থেকে মুণ্ডটা একেবারে আলাদা হয়ে গিয়েছে।'

খাবি খেতে-খেতে বসন্ত বললেন, 'বাপ রে, কী বীভৎস কাণ্ড! মাপ করবেন মশাই, ও-দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারব না। হ্যাঁ দিলীপবাবু, আপনি কী বলেন?'

'আমি বলি, তাড়াতাড়ি দেহ শনাক্ত করতে পারলে পুলিশের খুব সুবিধা হয়।

বসন্ত ম্লানমুখে বললেন, 'তা হলে আর উপায় নেই, আমাকে দেখতেই হবে।'

স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে বসন্ত একটি ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন—যার-পর-নাই অনিচ্ছুকভাবে। কিন্তু একমিনিট যেতে না-যেতেই তিনি দৌড়তে-দৌড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর মুখ-চোখ ভীত, উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

দিলীপের কাছে ছুটে এসে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিলাল বুলাভাই-ই বটে! হায় রে বেচারা! ভয়ানক, ভয়ানক!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মণিলালের সঙ্গে কোনও দামি পাথর-টাথর ছিল?'

(এই সময়ে একটু আগে আমি যে-হাসিমুখ অথচ ছন্নছাড়ার মতন লোকটাকে লক্ষ্য করেছিলুম, সে একেবারে আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনতে লাগল।)

বসন্ত বললেন, 'দামি পাথর? থাকাই সম্ভব, কিন্তু আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না, তবে মণিলালের কর্মচারীরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে।... হ্যাঁ, একটি কথা আমার রাখবেন?'

'বলুন।'

'যদি আপনার সময় থাকে, এই মামলাটার দিকে একটু লক্ষ্য রাখতে পারবেন? মণিলাল আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন।'

'বেশ বসন্তবাবু, তাই হবে। আমার হাতে আজ আর কোনও কাজ নেই, আমি না-হয় কাল সকালেই কলকাতায় ফিরব। কী হে শ্রীমন্ত, তোমার কিছু অসুবিধা হবে না তো?'

'কিছু না।'

বসন্ত বললেন, 'ধন্যবাদ। ওই কলকাতার গাড়ি এসে পড়েছে। কাল দেখা হলে অন্য সব কথা।'

'কালকেই আপনি সব খবর পাবেন।'

সেই যে-অদ্ভুত লোকটা আমাদের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, দিলীপের মুখের দিকে সে একবার অত্যন্ত উৎসুক চোখে তাকাল, তারপর যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসন্তবাবুর পিছনে-পিছনে কলকাতার গাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

কলকাতার গাড়ি চলে যাবার পর দিলীপ স্টেশনমাস্টারের কাছে গিয়ে জানালেন, বসন্তবাবু তাঁর উপরে কোন ভার অর্পণ করে গিয়েছেন। এবং সেইসঙ্গে বললেন, 'অবশ্য পুলিশ না-আসা পর্যন্ত আমি কিছুই করব না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ। পুলিশ খুব শীঘ্রই এসে পড়বে। পুলিশকে আপনার কথা জানাব।' স্টেশনমাস্টার এই বলে চলে গেলেন।

আমি আর দিলীপ প্ল্যাটফর্ম-এর উপরে পদচারণা করতে লাগলুম।

দিলীপ বললেন, 'এ-ধরনের মামলায় তিনরকম ব্যাখ্যা থাকে। দৈব দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, হত্যা। আর এই তিনরকম তথ্যের সিদ্ধান্ত থেকেই আমাদের একটা মীমাংসায় এসে পৌঁছতে হবে। প্রথম, মামলার সাধারণ তথ্য; দ্বিতীয়, দেহ পরীক্ষা করে যে-সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে; তৃতীয়, ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে জানা যাবে যে-সত্য। আপাতত, আমরা যে-সাধারণ তথ্যটুকু জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে এই ঃ মৃতব্যক্তি হীরক-ব্যবসায়ী। নিজের ব্যবসার জন্যেই যে সে এমন জায়গায় এসেছিল, এটুকু আমরা ধরে নিতে পারি। হয়তো তার সঙ্গে ছিল দামি-দামি পাথর। এই তথ্য হচ্ছে আত্মহত্যার বিরোধী। মনে সন্দেহ আনে, হয়তো এর মধ্যে হত্যাকারীর হাত আছে। তারপর প্রশ্ন ওঠে, এটা দৈব-দুর্ঘটনা কি না? তালে জানতে হবে, যেখানে দেহ পাওয়া গিয়েছে সেখানে কোনও লেভেল-ক্রসিং কি লাইনের কাছে কোনও রাস্তা আছে কি না? কিংবা ঘটনাস্থলে মৃতব্যক্তির আকস্মিক উপস্থিতির কোনও সঙ্গত কারণ আছে কি না? এসব তথ্য এখনও আমরা জানতে পারিনি। কিন্তু এগুলি আমাদের জানা উচিত।'

আমি বললুম, 'যে-কুলিটা ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে আসছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারো! ওই দেখো, একদল লোকের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব সম্ভব আজকের ঘটনাই বর্ণনা করছে। আমাদের মতন নূতন শ্রোতা পেলে তার উৎসাহ আরও বেড়ে উঠতে পারে!'

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার কথাই শুনব। দেখা যাক ও কী বলে!'

আমরা কুলিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম—সত্য-সত্যই সে গল্পের ভার নামাবার জন্যে অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে!

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কেমন করে ঘটল বলতে পারো?'

সে বলল, 'ড্রাইভার যা বললে তা আমি শুনেছি। ওখানে এক জায়গায় লাইনটা বেঁকে গিয়েছে। মালগাড়ি যখন সেই বাঁকের মুখে এসে পড়ে, ড্রাইভার তখন হঠাৎ দেখতে পায়, লাইনের উপরে কী যেন পড়ে আছে! সে তখনি বাষ্প বন্ধ করে দেয়, বাঁশি বাজায় আর ব্রেক কষে। কিন্তু জানেন তো মশাই, এত তাড়াতাড়ি মালগাড়ি থামানো সোজা ব্যাপার নয়। থামবার আগেই ছ-খানা গাড়ি লোকটার উপর দিয়ে গড়গড় করে চলে যায়!'

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকটা কীভাবে শুয়েছিল, ড্রাইভার সে-কথা কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। হেড-লাইটে সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, লোকটা লাইনের ওপর গলা দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছিল। লোকটা ইচ্ছে করেই প্রাণ দিয়েছে মশাই!'

'সেখানে কোনও লেভেল-ক্রসিং ছিল?'

'না বাবু। সেখানে কোনও রাস্তা-টাস্তাও ছিল না। লোকটা নিশ্চয়ই মাঠের ভেতর দিয়ে এসে, তারের বেড়া টপকে লাইনের ওপরে এসেছিল। সে আত্মঘাতী হবে বলে পণ করেছিল।'

'এত কথা তুমি জানলে কেমন করে?'

স্টেশনমাস্টার আমাকে বলেছেন।'

দিলীপের সঙ্গে আমি ফিরে এসে একখানা বেঞ্চির উপরে বসে পড়লুম।

দিলীপ বললেন, 'একদিক দিয়ে লোকটার কথা খুব ঠিক। এটা দৈব-দুর্ঘটনা নয়। তবে লোকটা যদি রাতকানা, কালা বা নির্বোধও হত হয়তো বেড়া ডিঙিয়ে লাইনে নেমে মারা পড়তেও পারত। কিন্তু মণিলাল বুলাভাই সে-শ্রেণীর লোক নয়। মণিলাল লাইনের উপরে গলা দিয়ে শুয়েছিল। এ-থেকেও আমরা দু-একটা অনুমান করতে পারি। হয় সে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করেছে; নয়, মৃত বা অজ্ঞান অবস্থাতেই তার দেহ পড়েছিল লাইনের উপরে। যতক্ষণ আমরা লাশ পরীক্ষা করবার সুযোগ না পাব, ততক্ষণ এর বেশি আর কিছু জানতে পারা যাবে না। ...ওই দ্যাখো শ্রীমন্ত, পুলিশ এসে পড়েছে! চলো, ওরা কী বলে শোনা যাক।'

দ্বিতীয়

স্টেশনমাস্টার একজন ইউনিফর্ম-পরা পুলিশ ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা কইছিলেন।

দিলীপ ও আমাকে দেখেই তাঁদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল এবং দুজনেই একবাক্যে জানালেন, এসব ব্যাপারে তাঁরা বাইরের লোকের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নন।

দিলীপ এতক্ষণ আত্মপরিচয় দেননি। তিনি জানতেন, বাংলা দেশের যেসব পুলিশ কর্মচারী তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত নন, তাঁরাও অন্তত তাঁর নামের সঙ্গে সুপরিচিত। তিনি তাঁর কার্ড বার করে ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন।

কার্ডখানা হাতে করে ইন্সপেক্টর নিজের মনে বিড়বিড় করে কী যেন বকতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।'

ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখা গেল স্ট্রেচারটা রয়েছে মেঝের উপরে—সেইভাবেই তের্পল-ঢাকা। কাছেই একটা বড় বাক্সের উপরে রয়েছে ব্যাগ ও ছাতাটা। তাদের পাশেই একটা চশমার তোবড়ানো ফ্রেম, তার কাচ নেই।

দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই চশমার ফ্রেমটা কি লাশের সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। ফ্রেমটা ঠিক লাশের পাশেই ছিল আর তার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল ভাঙা কাচের টুকরো।'

দিলীপ নোটবুক-এ কথাগুলো টুকে নিলেন।

এদিকে ইন্সপেক্টর লাশের উপর থেকে সরিয়ে দিলেন তের্পলের আচ্ছাদন।

দৃশ্যটা ভীষণ, সন্দেহ নেই। মৃতদেহটা এলিয়ে পড়ে আছে স্ট্রেচারের উপরে। বিচ্ছিন্ন মুণ্ড —ভাবহীন চোখদুটো দৃষ্টিহীন স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। মুণ্ডহীন দেহ অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে—দেখলেই শরীর শিউরে ওঠে।

দিলীপ পূর্ণ এক মিনিটকাল ধরে নীরবে হেঁট হয়ে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইলেন, ইন্সপেক্টর লণ্ঠনের আলো ফেললেন লাশের উপরে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'শ্রীমন্ত, আমরা তিনটে অনুমানের ভিতরে দুটোকে বাদ দিতে পারি।'

ইন্সপেক্টর কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল দিলীপের হাত-বাক্সের দিকে।

দিলীপ সেটি খুলে একজোড়া শব-ব্যবচ্ছেদে ব্যবহার করবার মতো ছোট্ট সাঁড়াশি বার করলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'শব-ব্যবচ্ছেদ করবার হুকুম আমরা পাইনি।'

'আমি তা জানি মশাই! আমি কেবল মৃতের মুখের ভিতরটা পরীক্ষা করব।' এই বলে দিলীপ সাঁড়াশি দিয়ে মুণ্ডের ঠোঁট টেনে তুললেন এবং মুখের ভিতরটা ভালো করে দেখে একমনে দাঁতগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'শ্রীমন্ত, তোমার আতসী-কাচখানা একবার আমাকে দাও তো!'

দিলীপ কী করেন দেখবার জন্যে ইন্সপেক্টর লন্ঠন নিয়ে আগ্রহভরে ঝুঁকে পড়লেন।

দিলীপ মৃতের অসমোচ্চ দাঁতের সারির উপর দিয়ে আতসী-কাচখানা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে দাঁতের উপর থেকে সযত্নে খুব সূক্ষ্ম কী একটা জিনিস তুলে নিলেন এবং আতসী-কাচের ভিতর দিয়ে জিনিসটা দেখতে লাগলেন।

অনেককাল দিলীপের সঙ্গে-সঙ্গে আছি, এরপর তাঁর কী দরকার হবে আমি জানি। আমি তখনি অণুবীক্ষণে ব্যবহার্য একখানা কাচের স্লাইড ও শব-ব্যবচ্ছেদের শলাকা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম। তিনি সেই সূক্ষ্ম জিনিসটা স্লাইডের উপরে রেখে শলাকা দিয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ততক্ষণে আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা প্রস্তুত করে রাখলুম।

দিলীপ বললেন, 'একফোঁটা Farrant আর-একটা Cover-glass দাও।'

দিলুম।

দিলীপ তাঁর অণুবীক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। আমি ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে তাকালুম —তাঁর মুখে বিদ্রূপ-হাস্য! আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই তিনি হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন— বোধহয় ভদ্রতার অনুরোধেই!

অপ্রস্তুতভাবে তিনি বললেন, 'এসব আমার বাহুল্য বলে মনে হচ্ছে মশাই! ভদ্রলোকটি মারা যাবার আগে কী খেয়েছিলেন, সেটা জেনে কিছু লাভ আছে কি? আমার বিশ্বাস, ভদ্রলোক কুখাদ্য খেয়ে মারা পড়েননি।'

দিলীপ সহাস্য মুখ তুলে বললেন, 'মশাই, এ-শ্রেণীর মামলায় কিছুই বাহুল্য নয়। প্রত্যেক তথ্যের কিছু-না-কিছু মূল্য আছে।'

ইন্সপেক্টর দমলেন না, বললেন, 'যার মুণ্ড কাটা গেছে, তার শেষ-খাবারের কথা জেনে কোনও লাভ নেই।'

'তাই নাকি? যে অপঘাতে মারা পড়েছে, তার শেষ-খাবারের কথাটা কি এতই তুচ্ছ? মৃতের ফতুয়ার গায়ে এই যে গুঁড়ো-গুঁড়ো কী জিনিস লেগে রয়েছে, দেখছেন? এ-থেকে আমরা কি কিছুই জানতে পারব না?'

ইন্সপেক্টর অবিচলিতভাবে বললেন, 'এমন কী আর জানতে পারবেন?'

দিলীপ প্রথমে নিরুত্তর হয়ে মৃতের ফতুয়ার উপর থেকে সাঁড়াশির সাহায্যে গুঁড়োগুলো একে একে তুলে নিলেন। তারপর সেগুলো স্লাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

তারপর মুখ তুলে বললেন, 'এই জানা যাচ্ছে যে, ভদ্রলোক মারা যাবার আগে ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট খেয়েছিলেন।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার মতে, ও-কথা না জানলেও চলত। মৃত কী খেয়েছিলেন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনওই দরকার নেই। এখানে একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটা মারা পড়েছে কেন? সে কি আত্মহত্যা করেছে? দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে? না কেউ তাকে খুন করেছে?'

দিলীপ বললেন, 'মাপ করবেন মশাই! একমাত্র যে-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাচ্ছে না তা হচ্ছে, এই লোকটিকে খুন করেছে কে? আর কেনই বা খুন করেছে? অন্য সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে —অন্তত আমি পেয়েছি!'

ইন্সপেক্টর সবিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন—সে-দৃষ্টিতে ছিল অবিশ্বাসের ছায়াও।

অবশেষে বললেন, 'মামলার কিনারা করে ফেলতে আপনার দেরি লাগেনি দেখছি।' তাঁর কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের ভাব।

দিলীপ দৃঢ়স্বরে বললেন, 'দেরি লাগবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে খুনের মামলা। খুনের কারণ আন্দাজ করাও শক্ত নয়। মণিলাল বুলাভাই ছিলেন নামজাদা জহুরী আর খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে অনেক দামি পাথরও ছিল, আপনি বরং মৃতের পোশাক একবার খুঁজে দেখুন।'

মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ হচ্ছে আপনার বাজে আন্দাজ। মৃত ব্যক্তি জহুরী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে দামি পাথর ছিল, অতএব ধরে নিতে হবে তিনি খুন হয়েছেন? এ-ও যুক্তি নাকি?'

তিরস্কার-ভরা কঠিন দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ দিলীপের দিকে চেয়ে থেকে আবার বললেন, 'মৃতের জামাকাপড় খোঁজার কথা বলছেন? হ্যাঁ, আমরা এসেছি সেইজন্যেই। মনে রাখবেন মশাই, এটা হচ্ছে বিচারাধীন মামলা—খবরের কাগজের পুরস্কার-প্রতিযোগিতা নয়।' বলেই তিনি সদর্পে আমাদের দিকে পিছন ফিরে লাশের পোশাকের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এবং যা-যা পেলেন, বড় বাক্সটার উপরে ব্যাগের পাশে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

এদিকে দিলীপ পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন লাশের সমস্ত দেহটা নিয়ে। বিশেষভাবে আতসী-কাচ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন মৃতের পাদুকা। ইন্সপেক্টর মাঝে-মাঝে তাঁর দিকে তাকান আর তাঁর মুখ হয়ে ওঠে কৌতুকহাস্যে সমুজ্জ্বল।

তারপর নিজের কাজ সেরে ফিরে বললেন, 'আমি হলে মশাই, খালি চোখেই জুতোটা দেখতে পেতুম! (সহাস্যে স্টেশনমাস্টারকে ইঙ্গিত করে) তবে আপনি হয়তো খালি চোখে ভালো দেখতে পান না!'

দিলীপ কিছু বললেন না, মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলেন।

তারপর তিনি বড় বাক্সটার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, মৃতের জামাকাপড়ের ভিতর থেকে কী-কী জিনিস পাওয়া গিয়েছে।

মানি-ব্যাগ, পকেট-বুক, একখানা চশমা (বোধহয় লেখাপড়ার জন্যে), পকেট-ছুরি, দেশলাইয়ের বাক্স, তামাকের রবারের থলি ও কার্ড কেস প্রভৃতি ছোট-ছোট আরও দু-একটি জিনিস।

দিলীপ প্রত্যেক জিনিসটা ভালো করে উল্টে-পাল্টে পরীক্ষা করতে লাগলেন এবং ইন্সপেক্টর তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলেন কৌতুক ও অবহেলাপূর্ণ চোখে।

দিলীপ চশমার কাচ-দুখানা আলোর বিরুদ্ধে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা করলেন। থলি থেকে তামাকের গুঁড়ো তুলে দেখলেন। সিগারেট পাকাবার কাগজ ও দেশলাইয়ের বাক্সটাও তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এড়াল না।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'তামাকের থলি দিয়ে এত নাড়াচাড়া করছেন, ওর ভেতরে আপনি কী দেখতে চান?'

'তামাক। এর ভেতরে স্টেট-এক্সপ্রেস তামাক রয়েছে।'

'তাও বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। বাজারে যেসব তামাক চলে তা দেখলেই আমি বলে দিতে পারি সেগুলোর নাম কী? এ-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি অনেক পরীক্ষার পর।'

'আপনার বাহাদুরি আছে।'

'বিনয় দেখাবার জন্যে সেটা অস্বীকার করতে চাই না। কিন্তু আপনি দেখছি মৃতের পকেট থেকে দামি পাথর-টাথর কিছুই পাননি।'

'না। ওসব কিছু ছিল বলেও মনে হয় না। তবে দামি পাথর না পেলেও দামি জিনিস পেয়েছি বটে। সোনার ঘড়ি আর চেন, একটি গলাবন্ধের হীরার পিন, দুখান একশো আর চারখানা দশ

টাকার নোট। বুঝতেই পারছেন, খুন হলে খুনি এসবের মায়া ত্যাগ করত না। আপনার খুনের মামলা ফেঁসে গেল। কী বলবেন মশাই?'

দিলীপ বললেন, 'ওই ভেবে আপনি যদি খুশি হতে চান, খুশি হোন! কিন্তু আমার মত একটুও বদলায়নি। এইবারে কি ঘটনাস্থলটা দেখা উচিত নয়?'

'চলুন।'

'হ্যাঁ, আর-এক কথা। মালগাড়ির ইঞ্জিনটা কি ভালো করে পরীক্ষা করা হয়েছে?'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'হ্যাঁ। সামনের আর পিছনের চাকায় রক্তের দাগ লেগে আছে।'

দিলীপ বললেন, 'দেখা যাক, রেল-লাইনেও রক্তের দাগ পাওয়া যায় কি না।'

স্টেশনমাস্টার বিস্মিত হয়ে কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ইন্সপেক্টর তাঁকে আর প্রশ্ন করবার অবসর দিলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন—আমাদেরও পাত্তাড়ি গুটোতে হল।

দিলীপ নিজেও একটা লন্ঠন চেয়ে নিলেন। তাঁর হাতে রইল লন্ঠন, আমার হাতে তাঁর বাক্স। ইন্সপেক্টর আর স্টেশনমাস্টার যেতে লাগলেন আগে-আগে।

আমি চুপিচুপি বললুম, 'দিলীপ, আমি এখনও অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুমি তো দেখছি এরই মধ্যে একটি সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছ! এ-ব্যাপারটাকে তুমি আত্মহত্যা না বলে হত্যা বলছ কেন?'

দিলীপ উত্তরে বললেন, 'প্রমাণ খুব ছোট, কিন্তু অকাট্য। মৃতের বাঁ-রগের উপরে মাথার চাঁদিতে একটা ক্ষত আছে, তুমি দেখেছ? ইঞ্জিনের আঘাতে ওরকম ক্ষত হলেও হতে পারে। কিন্তু এই ক্ষত দিয়ে রক্ত পড়েছে—আর অনেকক্ষণ ধরেই পড়েছে। ক্ষত থেকে নেমে এসেছে দুটো রক্তের ধারা। দুই ধারার রক্তই ডেলা বেঁধে আর আংশিকভাবে শুকিয়ে গিয়েছে। মনে রেখো, এটা হচ্ছে ছিন্নমুণ্ড। আর এই ক্ষতের জন্ম হয়েছে নিশ্চয়ই মুণ্ডচ্ছেদের আগে, কারণ যেদিক থেকে ইঞ্জিনটা আসছিল, ক্ষতটা সেইদিকে নেই। তারপর ভেবে দেখো, ছিন্নমুণ্ডের ভিতর থেকে এ-রকম রক্তপাত হয় না। অতএব মুণ্ডচ্ছেদের আগেই এই ক্ষতের সৃষ্টি।

'ক্ষত থেকে শুধু রক্ত পড়েনি, রক্তের ধারা হয়েছে দুটি। প্রথম ধারাটি মুখের পাশ দিয়ে বয়ে জামার কলারকেও রক্তাক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষত থেকে চলে গিয়েছে মাথার পিছন দিকে। শ্রীমন্ত, নিশ্চয়ই তুমি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়ম মানো? রক্ত যদি চিবুকের দিকে নেমে গিয়ে থাকে—প্রথম ধারায় যা হয়েছে—তা হলে বলতে হবে, মণিলাল তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আর রক্ত যদি সম্মুখ থেকে মাথার পিছন দিকে গড়িয়ে গিয়ে থাকে—দ্বিতীয় ধারায় যা হয়েছে—তা হলে বলতে হবে, মণিলাল তখন উপর দিকে মুখ তুলে চিৎ হয়ে শুয়েছিল।

'এখন ড্রাইভারের কথা মনে করো। সে দেখেছে, মণিলাল মাটির দিকে মুখ করে উপুড় হয়ে লাইনের উপরে শুয়েছিল। এক্ষেত্রে রক্তের একটা ধারা বাঁ-গাল বয়ে কলার পর্যন্ত এবং আর একটা ধারা মাথার নিচে থেকে উপরে উঠে পিছন দিকে নেমে আসতে পারে না। আসল ব্যাপার কী হয়েছে জানো? মণিলাল যখন সোজা হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে ছিল, তখন কেউ আঘাত করেছিল তার মাথার উপরে—আর রক্তের প্রথম ধারা নেমে এসেছিল তার গাল বয়ে। তারপর সে চিৎ হয়ে মাটির উপরে পড়ে যায়, আর রক্তের দ্বিতীয় ধারা চলে যায় তার মাথার পিছন দিকে।'

'দিলীপ, আমি ভারি বোকা লোক! এসব কিছু ভাবতে বা লক্ষ করতে পারিনি।'

'অভ্যাস না থাকলে কেউ তাড়াতাড়ি অনুমান বা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে না!... আচ্ছা শ্রীমন্ত, মৃতের মুখ দেখে তোমার কোনও কথা মনে হয়েছে?'

'হয়েছে। মনে হয়, ও যেন শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার দরুণ মারা পড়েছে।'

'ঠিক বলেছ। ও মুখ হচ্ছে শ্বাসরুদ্ধ-হওয়া মানুষের। তুমি বোধহয় আরও লক্ষ করেছ, ওর জিভ ফোলা-ফোলা, আর ওর উপর-ঠোঁটের ভিতরে দাঁত বসে যাওয়ার দাগ—তার কারণ, মুখের উপরে পড়েছিল প্রবল চাপ। এখন এইসব তথ্য আর অনুমানের সঙ্গে মাথার ক্ষতের কথা মিলিয়ে

দ্যাখো। খুব সম্ভব, মণিলাল মাথায় আঘাত পাবার পর হত্যাকারীর সঙ্গে যোঝাযুঝি করেছিল, তারপর হত্যাকারী তার মুখ চেপে ধরে শ্বাসরোধ করে তাকে মেরে ফেলে।'

আমি চমৎকৃত হয়ে নীরবে কিছুক্ষণ অগ্রসর হলুম!

তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, 'মৃতের দাঁতের ভিতর থেকে তুমি সাঁড়াশি দিয়ে কী বার করে নিয়েছিলে? অণুবীক্ষণে সেটা দেখবার সুযোগ আমি পাইনি।'

দিলীপ বললেন, 'ও, সেটা তুমি জানতে চাও? তার দ্বারা আমাদের অনুমান আরও বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে একগোছা বোনা কাপড়ের অংশ। অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে দেখে বুঝেছি আলাদা-আলাদা তন্তুর দ্বারা তা বোনা হয়েছে, প্রত্যেক তন্তুর রং ভিন্ন। তার বেশিরভাগই হচ্ছে রাঙা পশমী তন্তু। সেইসঙ্গে তার মধ্যে আছে কাপড়ের নীলরঙা তন্তু, আর কতকগুলো হচ্ছে হলদে পাটের। এটা হয়তো কোনও মেয়ের রঙিন কাপড়ের অংশ। তবে পাট আছে বলে সন্দেহ হয়, হয়তো এটা কোনও পর্দা বা কম-দামি অন্য কিছুর অংশ।'

'এ-থেকে কী বুঝতে হবে?'

যদি এটা পরনের কাপড়ের অংশ না হয়, তবে বুঝতে হবে এটা এসেছে কোনও আসবাব থেকে। আর আসবাব মানেই বোঝায় গৃহস্থালী।'

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, 'এ-যুক্তি অকাট্য বলে মনে হচ্ছে না!'

'না। কিন্তু এর দ্বারা আমার একটা মত রীতিমতো সমর্থিত হচ্ছে।'

'কী!'

'মৃতের জুতোর তলা দেখে আমি যে-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি। খুব ভালো করে জুতোর তলা পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু তাতে বালি, কাঁকর, মাটি বা টুকরো ঘাসের কোনও চিহ্নই পাইনি। অথচ মৃতকে রেল-লাইনের উপরে আসবার জন্যে নিশ্চয়ই এবড়ো-খেবড়ো মাঠ পার হয়ে আসতে হয়েছে—কারণ ঘটনাস্থলের আশপাশে না কি কোনও রাস্তা নেই। তার বদলে জুতোর তলায় পেয়েছি তামাকের ছাই আর একটা পোড়া দাগ—যেন সেই জুতো দিয়ে কোনও জ্বলন্ত চুরোট বা সিগারেট মাড়ানো হয়েছে। জুতোর তলায় একটা পেরেক একটু বেরিয়ে পড়েছিল, তার ডগায় লেগেছিল একটুখানি রঙিন তন্তু—তা কার্পেটের অংশ ছাড়া কিছুই নয়। এর দ্বারা বেশ বোঝা যাচ্ছে, লোকটি মারা পড়েছিল কোনও কার্পেট-পাতা ঘরের ভিতরে। তার জুতোর তলায় সেই ঘরে ঢোকবার আগে যে-সব দাগ ছিল, কার্পেট বা পাপোশের সংঘর্ষে সব বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঘর থেকে সে আর পায়ে হেঁটে বেরোয়নি, কারণ মৃত্যুর পর কেউ পায়ে হাঁটতে পারে না। নিশ্চয়ই কেউ তার মৃতদেহ বহন করে রেল-লাইনের উপরে রেখে এসেছিল।'

আমি একেবারে নীরব হয়ে রইলুম। দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ, তবু যতবারই তাঁর সঙ্গে যাই, ততবারই আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে নতুন-নতুন বিস্ময়! অতি তুচ্ছ সব তথ্য থেকে তিনি সকল দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এমন একটি সত্যিকার ও অপূর্ব গল্প খাড়া করে তোলেন, যা শুনলে পরম বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না; মনে হয়, দিলীপ যেন মায়াবী।

অবশেষে আমি বললুম, 'যদি তোমার সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, তা হলে তো বলতে হয় আমাদের সমস্ত সমস্যারই সমাধান হয়ে গেল। কোনও বাড়ির ভিতরে আসল ঘটনাস্থল হলে সেখানে নিশ্চয়ই আরও অনেক সূত্র পাওয়া যাবে। এখন প্রশ্ন থাকল খালি একটা। সেই বাড়িটা কোথায়?'

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে এখন শুধু ওই প্রশ্নই জাগছে। কিন্তু ওইটেই হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। সেই বাড়িটার ভিতরে একবার উঁকি মারতে পারলে সমস্ত রহস্যই পরিষ্কার হয়ে যায়! কিন্তু উঁকি মারি কেমন করে? আমরা খুনের তদন্ত করছি বলে বাড়ির পর বাড়ি খানাতল্লাশ করতে পারব না। আপাতত আমাদের সমস্ত সূত্রই এক জায়গায় এসে হঠাৎ ছিঁড়ে যাচ্ছে। ছিন্নসূত্রের অপর অংশ আছে কোনও অজানা বাড়ির মধ্যে, আর আমরা যদি দুই সূত্রকে একসঙ্গে বাঁধতে না পারি

তা হলে সমস্যার কোনও সমাধানই হবে না। কারণ, আসল প্রশ্ন হচ্ছে, মণিলাল বুলাভাইয়ের হত্যাকারী, কে?'

'তা হলে তুমি কী করতে চাও?'

'এর পরের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, কোনও বিশেষ বাড়িকে এই অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা। ওই দিকেই দৃষ্টি রেখে এখন আমাকে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে আর সেই সব নিয়ে বিচার করতে হবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওই বাড়িখানাকে যদি আবিষ্কার করতে না পারি, তা হলে এদিক দিয়ে আমাদের সমস্ত অনুসন্ধানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন বেছে নিতে হবে আবার কোনও নতুন পথ।'

আমাদের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। আমরা যথাস্থানে এসে পড়েছি। স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়ে আছেন। ইন্সপেক্টর লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে রেল-লাইন পরীক্ষা করছেন।

তৃতীয়

ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করে স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এখানে রক্ত পাওয়া গেছে অত্যন্ত কম। এটা বড়ই আশ্চর্য! এরকম আরও অনেক দুর্ঘটনা আমি দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মাটির উপরে আর ইঞ্জিনের গায়ে দেখেছি প্রচুর রক্ত। কিন্তু এবারকার ব্যাপারে আমি অবাক হয়েছি।'

দিলীপ রেল-লাইনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। ওখানে রক্ত আছে কি নেই, এ-প্রশ্ন তাঁর কাছে যেন নিরর্থক।

তাঁর লণ্ঠনের আলো পড়ল গিয়ে লাইনের পাশের জমির উপরে। কাঁকর-ভরা জমি এবং কাঁকরের সঙ্গে মিশানো রয়েছে খড়ি বা খড়ির মতন সাদা কীসের চূর্ণ।

ইন্সপেক্টর তখন হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়েছেন। তাঁর পায়ের জুতোর তলা দেখা যাচ্ছিল। আলোটা ইন্সপেক্টরের জুতোর উপরে ফেলে দিলীপ চুপিচুপি আমাকে বললেন, 'দেখছ?'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম। ইন্সপেক্টরের জুতোর তলায় লেগে রয়েছে ছোট-ছোট কাঁকর ও সাদা-সাদা চূর্ণের চিহ্ন। দিলীপের অনুমানই ঠিক। মণিলাল পদব্রজে এখানে এলে তাঁরও জুতোর তলায় থাকত সাদা দাগ ও কাঁকর।

হেঁট হয়ে জমির উপর থেকে একটি ফাঁস-দেওয়া ফিতের মতন কী কুড়িয়ে নিয়ে ইন্সপেক্টরকে ডেকে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মৃতের টুপিটা এখনও খুঁজে পাননি?'

'না! টুপিটা নিশ্চয় কাছেই কোথাও পড়ে আছে।' তারপর দিলীপের হাতের দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি মুখ টিপে হেসে বললেন, 'আপনি দেখছি একটা নতুন প্রমাণ হস্তগত করেছেন!'

দিলীপ বললেন, 'হতেও পারে। এটা হচ্ছে কোনও দু-রঙা ফিতার ছোট্ট টুকরো—মাঝখানটা সবুজ, দু-পাশে খুব সরু সাদা রেখা। হয়তো পরে এটা কাজে লাগবে। অন্তত এটিকে আমি ত্যাগ করব না।' তিনি পকেট থেকে একটি ছোট টিনের বাক্স বার করলেন—তার মধ্যে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছিল খানকয় একরত্তি খাম। একখানা খামের ভিতরে ফিতার টুকরাটি পুরে খামের উপরে পেন্সিল দিয়ে কী লিখলেন।

করুণাপূর্ণ হাসিমাখা মুখে ইন্সপেক্টর দিলীপের কার্যপদ্ধতি লক্ষ করলেন। তারপর আবার নিযুক্ত হলেন রেলপথ পরীক্ষায়। এবারে দিলীপও যোগদান করলেন তাঁর সঙ্গে।

ইন্সপেক্টর চশমার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাঁচচূর্ণের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'বেচারা চোখে বোধহয় ভালো দেখতে পেত না। তাই ভুলে বিপথে এসে পড়েছিল।'

দিলীপ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'হবে।'

একখণ্ড স্লিপারের (যে কাঠের বা তক্তার উপরে রেল-লাইন পাতা হয়) উপরে ও তার

পার্শ্ববর্তী স্থানে কাচচূর্ণগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপ আবার বার করলেন তাঁর টিনের বাক্স এবং আবার বেরুলো একখানা খাম।

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'আর-একবার সাঁড়াশিটা চাই। তুমিও আর-একটা সাঁড়াশি নিয়ে আমাকে একটু সাহায্য করো।'

'কী সাহায্য?'

'এই কাচের টুকরোগুলো কুড়োতে হবে।'

দুজনে সাঁড়াশি দিয়ে কাচের টুকরো সংগ্রহ করতে লাগলুম।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'এই কাচের গুঁড়ো যে মৃতের চশমা থেকে পড়েছে, সে-বিষয়েও কোনও সন্দেহ আছে নাকি? লোকটি যে চশমা পরত, তার নাকের দাগ দেখেই আমি বুঝে নিয়েছি।'

'ও-তথ্য যে সত্য, সেটা প্রমাণ করতে কোনও দোষ নেই।' তারপর দিলীপ নিম্নস্বরে আমাকে বললেন, 'কাচের প্রত্যেকটি কণা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করো।'

দৃষ্টিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে তুলে কাচের কণা খুঁজতে-খুঁজতে বললুম, 'এর কারণ আমি বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ বললেন, 'পারছ না? বেশ, টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখো। এদের মধ্যে কতকগুলো, আকারে বড়, কতকগুলো কণা-কণা। তারপর পরিমাণটাও লক্ষ করো। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে-অবস্থায় চশমাখানা ভেঙেছে, তার সঙ্গে এই কাচের গুঁড়োগুলো ঠিক মিলছে না। এগুলো হচ্ছে পুরু নতোদর (concave) কাচ, ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন করে ভেঙেছে? কেবল যে পড়ে গিয়েই ভেঙেছে তা মনে হয় না। তা যদি ভাঙত তা হলে এখানে মাত্র খানকয়েক বড় বড় টুকরো কাচ পাওয়া যেত। এগুলো ভারী মালগাড়ির চাকার চাপেও ভাঙেনি। কারণ তাহলে কাচগুলো হয়ে যেত পাউডারের মতন আর সেই পাউডার আমরা লাইনের উপরেও দেখতে পেতুম। কিন্তু লাইনের উপরে তার কোনও চিহ্নই নেই! সেই চশমার ফ্রেমখানার কথাও ভেবে দ্যাখো। সে-ক্ষেত্রেও এমনি অসঙ্গতি। কেবল পড়ে গেলে ফ্রেমখানা এত বেশি মুচড়ে ভাঙত না, আবার তার উপর দিয়ে রেলগাড়ির চাকা চলে গেলে ফ্রেমখানার অবস্থা যত-বেশি শোচনীয় হত তা-ও হয়নি।'

'তা হলে তুমি কী বলতে চাও দিলীপ?'

'মনে হয়, চশমাখানা মানুষের পায়ের তলায় দলিত হয়েছে। আমাদের অনুমান যদি ভুল না হয়, তা হলে বলতে হবে, দেহটাকে যখন এখানে বহন করে আনা হয়েছে, চশমাখানাকেও আনা হয়েছে, সেই সময়ে। আর ভাঙা অবস্থাতেই। সম্ভবত, হত্যাকারীর সঙ্গে যখন মণিলালের ধস্তাধস্তি চলছিল চশমাখানা পদদলিত হয়ছিল সেই সময়ই, তারপর মৃতদেহের সঙ্গেই হত্যাকারী চশমার চূর্ণাবশেষও এখানে নিয়ে এসেছে।'

আমি বোধকরি বোকার মতোই জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু কেন?'

'এটুকু তোমার বুঝে নেওয়া উচিত। এখন দ্যাখো। আমরা যদি এখানকার প্রত্যেক কাচ-কণা কুড়িয়ে নিয়েও দেখি পুরো চশমার কাচ পাওয়া গেল না, তা হলে বুঝতে হবে বাকি কাচচূর্ণ আছে আসল ঘটনাস্থলেই। কিন্তু আমাদের সংগৃহীত কাচের কণার দ্বারা যদি দুখানা পরকলা সম্পূর্ণ হয় তা হলে মানতেই হবে যে, চশমাখানা ভেঙেছে এইখানেই।'

আমরা যখন কাচচূর্ণ সংগ্রহ করছিলুম, ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার তখন এক-একটা লণ্ঠন নিয়ে মণ্ডলাকারে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন অদৃশ্য টুপিটাকে দৃশ্যমান করবার জন্যে।

লণ্ঠনের আলোয় আতসী-কাচের সাহায্য নিয়েও আর-এককণা কাচও পাওয়া গেল না। স্টেশনমাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে ইন্সপেক্টর তখন লাইন ধরে অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছেন—অন্ধকারের মুল্লুকে তাঁদের হাতে ঝোলানো লণ্ঠন দুটো দেখাচ্ছিল নৃত্যশীল আলেয়ার মতো।

দিলীপ বললেন, 'আমাদের বন্ধুরা ফিরে আসবার আগেই এখানকার কাজ শেষ করে ফেলতে

হবে। তারের বেড়ার কাছে চলো। ঘাসের ওপরে হাত-বাক্সটা রাখো, আপাতত ওটাই হবে আমাদের টেবিল।'

বাক্সের উপরে দিলীপ আগে একখানা কাগজ পাতলেন, পাছে বাতাসে সেখানা উড়ে যায়, সেই ভয়ে চারখানা পাথর কুড়িয়ে কাগজের চার কোণে চাপা দেওয়া হলো। তারপর খামের ভিতর থেকে কাচের কণা ও চূর্ণগুলোকে কাগজের উপরে ঢেলে দিলীপ কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা অদ্ভুত ভাব। নিজের কার্ডকেসের ভিতর থেকে তিনি দুখানা ভিজিটিং কার্ড বার করলেন। তারপর অপেক্ষাকৃত বড় কাচের টুকরোগুলোকে একে-একে বেছে নিয়ে দুখানা কার্ডের উপরে সাজিয়ে রাখতে লাগলেন।

চটপটে কৌশলী হাতে দুখানা কার্ডের উপরে তিনি ডিম্বাকারে কাচের কণাগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গড়ে তুললেন প্রায়-সম্পূর্ণ দুখানা পরকলা। দিলীপের মুখের ভাব দেখে আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম। বেশ বোঝা গেল, এখনি একটা কোনও নতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা।

কাগজের উপরে তখনও অনেকখানি কাচের কুচি পড়ে রয়েছে। কিন্তু তা এত সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে, তার দ্বারা আর কিছু গড়ে তোলা অসম্ভব।

দিলীপ হাত গুটিয়ে বসে মৃদুস্বরে হাস্য করলেন।

তারপর বললেন, 'এতটা আমি আশা করিনি।'

আমি বললুম, 'কী?'

'তুমি কি দেখেও বুঝতে পারছ না? বড় বেশি পরিমাণে কাচ রয়েছে! আমরা দুখানা পরকলা প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছি, তবু এতখানি কাচের গুঁড়ো ব্যবহার করতে হল না।'

চেয়ে দেখলুম, সত্যিই তাই! যে চূর্ণগুলো ব্যবহার করা হয়নি, তার দ্বারা হয়তো আরও দু-তিনখানা পরকলা তৈরি করা যায়। বললুম, 'ভারি আশ্চর্য তো! এর মানে কী?'

দিলীপ বললেন, 'আমরা যদি বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করি, কাচের কুচিগুলোই হয়তো সঠিক উত্তর দেবে!'

দিলীপ কাগজ ও কার্ড দুখানা তুলে সাবধানে জমির ওপরে রাখলেন। তারপর বাক্সের ডালা খুলে বার করলেন অণুবীক্ষণ। তারপর একখানা স্লাইডের উপরে বাড়তি কাচচূর্ণগুলোকে রেখে, লণ্ঠনের আলোতে অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর তিনি উচ্চস্বরে বললেন, 'হুঁ, রহস্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠল। এখানে কাচ দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি আর খুব কম। অর্থাৎ এর ভিতরে চশমার কাচ আছে মাত্র দু-এক টুকরো। এই দু-এক টুকরো গ্রহণ করলেও আমাদের পরকলা দুখানা সম্পূর্ণ হবে না; কারণ বাকি কাচচূর্ণগুলো চশমার নয়—তা হচ্ছে কোনও ছাঁচে তৈরি জিনিসের। ওগুলো কোনও নলাকার অর্থাৎ চোঙার মতন জিনিস থেকে ভেঙে পড়েছে—খুব সম্ভব কোনও গেলাসের অংশ।'

স্লাইডখানা দু-একবার সরিয়ে আবার বললেন, 'আমাদের বরাত ভালো শ্রীমন্ত! যা খুঁজছি, পেয়েছি, এক-একটা টুকরোর উপরে কোনও নকশার অংশ ক্ষোদা রয়েছে। এই যে আর-একটা টুকরো—এই উপরে নকশার বেশ খানিকটা বোঝা যাচ্ছে! এইবার ধরতে পেরেছি! তারার নকশা-আঁকা কোনও কাচের গেলাস ভেঙে এই কাচচূর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমন্ত, তুমিও একবার দেখে নাও!'

আমিও অণুবীক্ষণে দৃষ্টি সংলগ্ন করতে যাচ্ছি, এমনসময়ে এসে পড়লেন ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার। কাচের গুঁড়ো, বাক্স ও অণুবীক্ষণ নিয়ে আমাদের চুপ করে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে ইন্সপেক্টর উচ্চহাস্য সংবরণ করতে পারলেন না।

তারপর বোধকরি অভদ্রতা হচ্ছে ভেবেই কিঞ্চিৎ লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমি হেসে ফেললুম বলে কিছু মনে করবেন না, মশাই! পুলিশের কাজে চুল পাকিয়ে ফেললুম কিনা, কাজেই এসব

যেন কেমন-কেমন লাগে! অণুবীক্ষণ ভারি মজার জিনিস বটে, কিন্তু এরকম মামলায় আপনাদের একধাপও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—পারবে কি?'

দিলীপ বললেন, 'হয়তো পারবে না। কিন্তু ও-কথা যাক। টুপিটা কোথাও খুঁজে পেলেন?'

ইন্সপেক্টরের মুখ যেন চুন হয়ে গেল। মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বললেন, 'খুঁজে পাইনি।'

'আচ্ছা, তা হলে একটু অপেক্ষা করুন, আমরাও আপনাদের সাহায্য করব।'

দিলীপ দুখানা কার্ডের উপরে ফোঁটা-কয়েক Xylolbalsam ফেললেন—পরকলায় কাচের কুচিগুলো যাতে স্থানচ্যুত না হয়। তারপর সমস্ত জিনিস বাক্সের মধ্যে পুরে স্টেশনমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে সবচেয়ে কাছে আছে কোন গ্রাম?'

'আধ-মাইলের ভিতরে কোনও গ্রাম নেই।'

'রাস্তা?'

'একটা নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে বটে। এখান থেকে একটু দূরে একখানা মাত্র বাড়ি আছে, রাস্তাটা তার সামনে দিয়েই গিয়েছে।'

'কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি আছে?'

'না। আধ-মাইলের মধ্যে ওইখানাই হচ্ছে একমাত্র বাড়ি।'

'আচ্ছা, তা হলে বোধহয় ওইদিকেই যাওয়া উচিত। সম্ভবত মণিলাল ওই অসম্পূর্ণ রাস্তা দিয়েই এদিকে এসেছিল।'

ইন্সপেক্টরও এই মতে সায় দিলেন।

চতুর্থ

পোড়ো জমি। কোথাও আদুড় মাটি, কোথাও বুনো ঘাস, কোথাও কচুবন, কোথাও বিছুটির জঙ্গল। পথ বা রাস্তা নেই। ঝিঁঝি ডাকছে আড়াল থেকে। জোনাকি জ্বলছে মাথার উপরে। চারিদিকে অন্ধকার—কেবল আমাদের সুমুখ ও আশপাশ থেকে অন্ধকার সরে-সরে যাচ্ছে—যেন আলো দেখে ভয় পেয়ে।

যেখানে ঝোপ পান, ইন্সপেক্টর তার ভিতরেই পা ছোড়েন, পদাঘাত করেন—যদি তার ভিতরে হারানো টুপিটা আত্মগোপন করে থাকে!

খানিকক্ষণ পরে আমরা একখানা বাড়ির পিছনদিকে এসে দাঁড়ালুম। চারিধারে তার নিচু দেওয়াল-ঘেরা বাগান।

বাগানের পিছনকার দেওয়ালের তলায় ছিল আর একটা বিছুটির জঙ্গল ঃ ইন্সপেক্টর তারও এখানে-ওখানে পা ছুড়তে লাগলেন!

আচমকা আর্তনাদ শুনলুম—'ওরে ব্বাপ রে, গেছি রে, উ-হু-হু-হু!'

'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার?'

ইন্সপেক্টর একখানা পায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে কাতরস্বরে বললেন, 'কোন হারামজাদা, কোন রাস্কেল, কোন গাধা বিছুটির জঙ্গলে এটা ফেলে রেখেছে?'

দিলীপ হেঁট হয়ে জিনিসটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা লোহার গরাদ।... এর গায়ে মর্চে-টর্চে কিছুই নেই। তার মানে বিছুটির গাদায় এ বেশিক্ষণ থাকেনি।'

ইন্সপেক্টর গর্জন করে বললেন, 'বেশিক্ষণ কি অল্পক্ষণ আমি জানতে চাই না মশাই, কিন্তু আমার ঠ্যাং আর একটু হলেই খোঁড়া হয়ে যেত। ওই ডান্ডাটা যে ফেলেছে, তাকে যদি একবার হাতের কাছে পাই!'

ইন্সপেক্টরের দুর্ভাগ্যে কোনওরকম সহানুভূতি প্রকাশ না করে দিলীপ একমনে ডান্ডাটা পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু কেবল সেই পরীক্ষাতেই তাঁর মন বোধকরি তুষ্ট হল না, কারণ তারপর তিনি আবার আতসী-কাচ বার করে ডান্ডাটাকে আরও ভালো করে দেখতে লাগলেন।

তাই দেখে ইন্সপেক্টর এত বেশি উত্যক্ত হয়ে উঠলেন যে, সে-দৃশ্য আর সহ্য করতে পারলেন না। খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে বাড়ির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্টেশনমাস্টারও করলেন তাঁর অনুসরণ—ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল, তিনি আমাদের অদ্ভুত জীব বলেই মনে করছেন। অল্পক্ষণ পরেই শুনলুম, বাড়ির সদরের কড়া ঘন-ঘন নড়ছে—সঙ্গে-সঙ্গে ইন্সপেক্টরের হাঁক-ডাক!

দিলীপ বললেন, 'শ্রীমন্ত, একফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড দাও। এই ডান্ডার ওপরেও দেখছি গাছকয় তন্তু লেগে আছে।'

আমি কথামত স্লাইড, Cover-glass, সাঁড়াশি ও শলাকা এগিয়ে দিলুম এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রাখলুম বাগানের নিচু দেওয়ালের উপরে।

অণুবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে দিলীপ বললেন, 'ইন্সপেক্টরের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু ঝোপের উপরে তাঁর পা ছোড়াটা আমাদের পক্ষে হয়েছে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। একবার অণুবীক্ষণের ভিতরে তাকিয়ে বলো দেখি, কী দেখতে পাচ্ছ?'

দেখতে-দেখতে বললুম, 'রাঙা পশমী তন্তু, নীল কার্পাসসুতোর তন্তু আর কতকগুলো হলদে উদ্ভিজ্জ—বোধহয় পাটের তন্তু।'

দিলীপ প্রফুল্লকণ্ঠে বললেন, 'হ্যাঁ। মনে আছে তো, মণিলালের দাঁতের ভিতরেও ঠিক এই তিনরকম তন্তু পাওয়া গিয়েছে? তা হলে বোঝা যাচ্ছে, দুই ক্ষেত্রেই তন্তু এসেছে এক জায়গা থেকে। ব্যাপারটাও অনুমান করতে পারছি। যে কাপড় চাপা দিয়ে হতভাগ্য মণিলালের শ্বাসরোধ করা হয়েছিল, এই ডান্ডাটা মোছা হয়েছে বোধহয় সেই কাপড় দিয়েই! আচ্ছা, ডান্ডাটা আপাতত পাঁচিলের ওপরই তোলা থাক—যথাসময়ে এটা কাজে লাগবে। অতঃপর ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করেই হোক, আমাদের ঢুকতে হবে এই বাড়ির ভিতরে। যে-ইঙ্গিত পেলুম, তাই যথেষ্ট। এসো।'

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে আমরা বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো।

ইন্সপেক্টর বললেন, বাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু বাড়িতে কেউ নেই, সদরে কুলুপ দেওয়া। এত ডাকলুম, এত কড়া নাড়লুম—কেউ সাড়া দিল না। আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বা কী স্বর্গলাভ হবে, তা জানি না। টুপিটা নিশ্চয়ই রেল-লাইনের কাছাকাছি কোথাও পড়ে আছে, কাল সকালের আলোয় খুঁজে পাওয়া যাবে।'

দিলীপ কোনও কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আরও দু-চারবার কড়া নাড়লেন।

ইন্সপেক্টর বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'আমি বলছি বাড়ির ভিতরে কেউ নেই, তবু আপনার বিশ্বাস হল না?' বলেই তিনি ক্রুদ্ধভাবে স্টেশনমাস্টারের হাত ধরে চলে গেলেন।

দিলীপ হাসিমুখে লণ্ঠন তুলে এদিকে-ওদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করতে-করতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে মাটির উপর থেকে একটা জিনিস তুলে নিলেন।

'শ্রীমন্ত, এটি হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ জিনিস।' এই বলে দিলীপ আমার সামনে যা তুলে ধরলেন, তা হচ্ছে একটা আধপোড়া সিগারেট।

'শিক্ষাপ্রদ জিনিস? এর দ্বারা তুমি কী জ্ঞানলাভ করবে?'

'অনেক। চেয়ে দ্যাখো, এটা হচ্ছে হাতে-পাকানো সিগারেট। বাজারে হাতে-পাকানো সিগারেটের জন্যে যে জিগ-জ্যাগ কাগজ পাওয়া যায়, তাই এতে ব্যবহার করা হয়েছে। মণিলালেরও পকেট থেকে এই কাগজের প্যাকেট পাওয়া গিয়েছে। এইবার দেখা যাক, সিগারেটের তামাক কোন শ্রেণীর।'

দিলীপ একটি আলপিন দিয়ে সিগারেটের একপ্রান্ত থেকে খানিকটা তামাক বার করে নিয়ে দেখে বললেন, 'স্টেট-এক্সপ্রেস টোবাকো! চমৎকার! মণিলালের রবারের থলির ভিতরেও ঠিক এই তামাক পাওয়া গিয়েছে! কে বলতে পারে, মণিলালই এই সিগারেটটা নিজের হাতে পাকায়নি!... আরে, মাটিতে ওটা আবার কী পড়ে রয়েছে?' হেঁট হয়ে সেটা তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা দেশলাইয়ের কাঠি! শ্রীমন্ত, মণিলালের পকেট থেকে কোন মার্কার দেশলাই বেরিয়েছিল লক্ষ করেছিলে কি?'

'না।'

'Wimco-র Club Quality দেশলাই, উপরে ঘোড়ার মুখের ছবি। সে-দেশলাই কিঞ্চিৎ অসাধারণ, কলকাতার বাঙালি পাড়ায় বিকোয় না, সাহেবরা খুব ব্যবহার করে। বাংলার পল্লীগ্রামেও সে-দেশলাই কেউ দেখেনি। তার কাঠিগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মোটা, Wimco-র অন্য কোনও মার্কার দেশলাইতেই অত মোটা কাঠি থাকে না। আমার হাতের কাঠিটিও তাই। এটাও যে মণিলালের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে বেরিয়েছে, পরে মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। ....শ্রীমন্ত, আমার অত্যন্ত সন্দেহ হচ্ছে যে, মণিলালকে খুন করা হয়েছে এই বাড়ির ভিতরেই।'

আমরা আবার বাড়ির খিড়কির দিকে গিয়ে হাজির হলুম।

সেখানে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর অসন্তুষ্টস্বরে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমাদের দেখে বললেন, 'চলুন, এইবারে ফিরে যাই। মিছে কাদা ঘেঁটে মরবার জন্যে কেনই-বা এখানে এলুম —আরে, আরে, ও কী! না, মশাই খবরদার!'

দিলীপ তখন লাফিয়ে উঠেছেন বাগানের নিচু পাঁচিলের উপরে। ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হওয়ার আগেই তিনি ওপাশে নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'বিনা হুকুমে পরের বাড়িতে আপনাকে আমি ঢুকতে দিতে পারি না।'

দেওয়ালের উপরে মুখ তুলে দিলীপ বললেন, 'শুনুন মশাই, শুনুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মণিলাল বুলাভাই মৃত্যুর ঠিক আগেই এই বাড়ির ভিতরে এসেছিলেন—আমি তার অনেক প্রমাণ পেয়েছি। হয়তো তাঁকে এই বাড়ির ভিতরেই খুন করা হয়েছে। সময় হচ্ছে মূল্যবান, দেরি করলে সমস্ত সূত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপাতত না দেখে-শুনে আমি একেবারে বাড়ির ভিতরেও ঢুকতে চাই না। এখানে দেখছি একটা আঁস্তাকুড় রয়েছে। আমি আগে ওই আঁস্তাকুড়টা পরীক্ষা করতে চাই!'

পঞ্চম

ইন্সপেক্টর চমকে উঠে সবিস্ময়ে বললেন, 'আঁস্তাকুড়! আপনি আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে চান? বলেন কী মশাই? আপনার মতন আশ্চর্য লোক আমি জীবনে দেখিনি! ভালো, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে আপনার কী লাভ হবে শুনি?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই আঁস্তাকুড়ের ভিতরে আমি একটা তারার নকশা-কাটা ভাঙা কাচের গেলাসের টুকরো পাব। আঁস্তাকুড়ে বা এই বাড়ির ভিতরে ওই গেলাসের টুকরো পাওয়া যাবে বলেই মনে করি।'

ইন্সপেক্টর হতভম্বের মতন বললেন, 'ভাঙা গেলাসের টুকরোর সঙ্গে এ-মামলার কী সম্পর্ক, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে কি স্টেশনমাস্টারমশাই?'

স্টেশনমাস্টার বোকার মতন ঘাড় নেড়ে বললেন, 'উঁহু!'

'বেশ, দেখা যাক দিলীপবাবুর অবাক-কাণ্ড-কারখানা!' ইন্সপেক্টরও পাঁচিল ডিঙোলেন। স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বাগানের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সামনেই রয়েছে একটা আঁস্তাকুড়ের মতন জায়গা—তার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব নোংরা জঞ্জাল।

দিলীপ বাঁ-হাতে লণ্ঠন নিয়ে ডানহাতে একটা কাঠি দিয়ে মিনিটখানেক জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করে কতকগুলো ছোট-বড় কাচের টুকরো টেনে বার করে আনলেন।

তারপর ফিরে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন।'

স্পষ্ট দেখা গেল, দুই-তিনটে বড় টুকরোর উপরে রয়েছে নকশা-কাটা তারকা।

ইন্সপেক্টর প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তিনি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তারপর বললেন, 'কী করে যে আপনি জানলেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এরপর আপনি যে আরও কী ভেলকি দেখাতে চান, তাও বুঝতে পারছি না।'

দিলীপ জবাব দিলেন না। নিজের মনেই আঁস্তাকুড় ঘাঁটতে লাগলেন। সাঁড়াশি দিয়ে দুই-তিনটে কাচের কুচি তুলে, ভালো করে দেখে আবার ফেলে দিলেন। একটু পরে খুঁজে-খুঁজে আরও দুই-তিনটে কুচি বার করলেন, তারপর সেগুলো আতসী-কাচের সাহায্যে পরীক্ষা করে বললেন, 'যা খুঁজছিলুম এতক্ষণ পরে তা পেয়েছি। শ্রীমন্ত, সেই কাচের কুচি বসানো কার্ড দুখানা বার করো তো!'

আমি সেই প্রায়-সম্পূর্ণ পরকলা বসানো কার্ড দুখানা বার করে দিলুম। তারপর তার দু-দিকে রেখে দিলুম দুটো লণ্ঠনও।

দিলীপ কিছুক্ষণ সেইদিকে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে-পাওয়া কাচের কুচি-কয়টা আর একবার পরীক্ষা করতে-করতে ইন্সপেক্টরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আপনি স্বচক্ষে দেখলেন তো, এই কাচের কুচি আমি এইখান থেকে পেয়েছি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আর কার্ডে বসানো পরকলার কাচ আমি কোথা থেকে পেয়েছি তাও জানেন তো?'

'হ্যাঁ মশাই। ওগুলো হচ্ছে মণিলালের চশমার কাচ। ওগুলো আপনি রেলপথ থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।'

'বেশ! এইবারে ভালো করে দেখুন।'

ইন্সপেক্টর ও স্টেশনমাস্টার আরও সামনের দিকে এগিয়ে এলেন, সাগ্রহে।

কার্ডের একখানা পরকলার দুই জায়গায় ও আর-একখানা পরকলার এক জায়গায় ফাঁক ছিল।

দিলীপ হাতের তিনটে কাচের কুচি দুখানা পরকলার ফাঁকে-ফাঁকে বসিয়ে দিলেন—সঙ্গে-সঙ্গে কার্ডের চশমার কাচ দুখানা হয়ে উঠল একেবারে সম্পূর্ণ।

ইন্সপেক্টর রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'হে ভগবান, এ কী ব্যাপার? ওই কাচের কুচি যে এখানে পাওয়া যাবে, কেমন করে জানলেন?'

'সে-কথা পরে সব শুনবেন। আপাতত, আমি বাড়ির ভিতরে যেতে চাই। ওখানে গিয়ে আশাকরি আমি একটা পোড়া সিগারেট বা সিগারেটের খানিকটা দেখতে পাব। আরও কী-কী পেতে পারি জানেন? ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট, হয়তো Wimco-র ঘোড়ামুখওয়ালা Club Quality দেশলাইয়ের কাঠি এমনকী হয়তো মণিলালের হারানো টুপিটাও। এখনও বাড়িতে ঢুকতে আপনার আপত্তি আছে? মনে রাখবেন, আজ বাদে কাল এলে হয়তো আমরা জিনিসগুলোর কোনওটাই আর দেখতে পাব না।'

ইন্সপেক্টর পুলিশের সমস্ত আইন-কানুন বিলকুল ভুলে গেলেন। বিপুল আগ্রহে বাড়ির পিছনকার দরজার উপরে ধাক্কা মেরে বললেন, 'ভিতর থেকে বন্ধ। ঢুকতে গেলে ভাঙতে হবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে সেটা নিরাপদ নয়।'

'তবে সদরের দিকে চলুন।'

'কিন্তু সেখানকার দরজায় তো কুলুপ লাগানো।'

'আসুন না।'

সবাই আবার পাঁচিল টপকে সদরের দিকে এলুম। দিলীপ আমাদের দিকে পিছন ফিরে সদর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং পকেট থেকে কী যেন একটা বার করে নিলেন।

পর-মুহূর্তে দিলীপের হাতের ঠেলায় দরজাটা দু-হাট হয়ে খুলে গেল। ইন্সপেক্টর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, 'আঁ!'

'ভিতরে আসুন।'

'দিলীপবাবু, আপনি যদি চোর হতেন—।'

'তা হলে আপনাদের চাকরি হয়তো থাকত না। এখন ভিতরে আসুন।'

দিলীপের পিছনে-পিছনে আমরা সবাই বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলুম।

ঢুকেই ডানদিকে একটি ঘর—বৈঠকখানা। একটা ঝোলানো ল্যাম্প জ্বলছে। নিচে কার্পেট পাতা। সোফা, কৌচ ও টেবিল প্রভৃতি দিয়ে ঘরখানা সাজানো। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই।

এক কোণে একটা তেপায়ার উপরে রয়েছে একটি বিস্কুটের বাক্স। তার উপরে বড়-বড় ছাপানো হরফে বিস্কুটের নাম—'ক্রিম-ক্র্যাকার'।

দিলীপ আঙুল দিয়ে সেইদিকে ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

ইন্সপেক্টর একেবারে থ। বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, 'অবাক কাণ্ড বাবা!'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'এ-বাড়িতে যে ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট পাওয়া যাবে, এ-কথা কে আপনাকে বলল?'

'কেউ বলেনি।'

'তবে কী করে জানলেন?'

'খুব সহজে। শুনলে আপনি হতাশ হবেন।' বলেই দিলীপ এদিকে-ওদিকে তাকাতে-তাকাতে ঘর ছেড়ে একটা দালানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর হেঁট হয়ে দুটো কী কুড়িয়ে নিলেন।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কী পেলেন?'

'যা পাবার আশা করেছিলুম। একটা পায়ে থ্যাঁতলানো পোড়া সিগারেটের অংশ, আর একটা দেশলাইয়ের কাঠি।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'না মশাই, এইবারে আমি হার মানলুম। এমন ব্যাপার কস্মিনকালেও দেখিনি।'

দিলীপ বললেন, 'মণিলালের স্টেট-এক্সপ্রেস তামাকের থলি, জিগ-জ্যাগ সিগারেটের কাগজ আর কিঞ্চিৎ অসাধারণ দেশলাইয়ের বাক্স আপনার কাছেই আছে তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে তাদের সঙ্গে এখানে পাওয়া এই জিনিসগুলি মিলিয়ে দেখুন।'

ইন্সপেক্টর কথামতো কাজ করে সচিৎকারে বলে উঠলেন, 'একই তামাক, একই কাগজ, একই দেশলাইয়ের কাঠি। দিলীপবাবু, আপনি কি জাদুকর? বাকি রইল খালি টুপিটা! সেটাও কি এখানে আছে?'

'জানি না। অন্তত, এ-ঘরে বলে মনে হচ্ছে না। তবে এখনও আমি হতাশ হইনি। আসুন, খুঁজে দেখি।'

ঘর থেকে গেলুম দালানে। সেখানেও টুপির চিহ্ন নেই।

পাশেই আর-একটি ঘর। দিলীপ উঁকি মেরে দেখে বললেন, 'রান্নাঘর। একবার ঢুকেই দেখা যাক না।'

রান্নাঘরের চারিদিকে একবার ঘুরে উনুনের কাছে গিয়ে দিলীপ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'উনুনের ভিতরটা দেখুন। ওগুলো কী?'

ইন্সপেক্টর স্বহস্তে উনুনটা পরীক্ষা করতে-করতে বললেন, 'উনুনটা এখনও তপ্ত! একটু আগেও এর মধ্যে আগুন ছিল। কয়লার সঙ্গে এখানে কাঠও পোড়ানো হয়েছিল দেখছি। কিন্তু এগুলো কী? এই ডেলা-পাকানো কালো জিনিসগুলো কাঠও নয়, কয়লাও নয়। খুনি টুপিটা উনুনে পুড়িয়ে ফেলেনি তো? কে জানে? পুড়িয়ে ফেলে থাকলে আর উপায় নেই! আপনি কাচচূর্ণ দিয়ে পরকল্লা খাড়া করেছেন বটে, কিন্তু খানিকটা অঙ্গার থেকে একটা আস্ত টুপি তো আর গড়তে পারবেন না? অসম্ভব আর কেমন করে সম্ভব হবে বলুন!' তিনি একমুঠো কালো স্পঞ্জের মতন অঙ্গার তুলে দিলীপের সামনে ধরে দেখালেন। তারপর আবার বললেন, 'পারেন এ-থেকে একটা গোটা টুপি সৃষ্টি করতে?'

দিলীপ বললেন, 'আবার একটা টুপি সৃষ্টি করতে পারব না, সে-কথা বলাই বাহুল্য! তবে এটা কীসের অবশিষ্টাংশ, তা বলতে পারি! হয়তো ওর সঙ্গে টুপির কোনওই সম্পর্ক নেই। আসুন বৈঠকখানায়।'

বৈঠকখানায় ফিরে এসে তিনি একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে অঙ্গারের তলায় ধরলেন। অমনি সেটা বেজায় পট-পট শব্দ করে গলে যেতে লাগল এবং তা থেকে খুব ঘন ধোঁয়া উঠল—সঙ্গে-সঙ্গে পাওয়া গেল একটা উগ্র গন্ধ!

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'গন্ধটা বার্নিসের মতো।'

দিলীপ বললেন, 'হ্যাঁ। গালার গন্ধ। আমাদের প্রথম পরীক্ষা সফল হয়েছে। এর পরের পরীক্ষায় কিছু সময়ের দরকার।'

তিনি হাত-বাক্সের ভিতর থেকে Marsh-এর আর্সেনিক-পরীক্ষার উপযোগী একটি ছোট ফ্লাস্ক একটি Safety Funnel, একটি Escape Tube, একটি দু-পাট তেপায়া, একটি স্পিরিট-ল্যাম্প ও একটি অ্যাসবেসটসের চাক্তি বার করলেন। ফ্লাস্কের মধ্যে সেই অঙ্গারীভূত জিনিসের খানিকটা ফেলে তা পরিপূর্ণ করলেন, অ্যালকোহলের দ্বারা। তারপর তেপায়ার উপরে অ্যাসবেসটসের চাক্তিখানা রেখে তার তলায় স্পিরিট-ল্যাম্পটি জ্বেলে দিলেন।

দিলীপ বললেন, 'অ্যালকোহল গরম হতে থাকুক, ততক্ষণে আমরা আর একটি সন্দেহ মিটিয়ে ফেলতে পারি। শ্রীমন্ত, আবার একফোঁটা Farrant ঢেলে আমাকে একখানা স্লাইড এগিয়ে দাও।'

দিলুম। দিলীপ টেবিলের ধারেই বসেছিলেন। একটা ছোট সাঁড়াশি দিয়ে টেবিলের আচ্ছাদনী থেকে একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে, এই কাপড়ের নমুনা আমরা আগেই পেয়েছি।'

কাপড়ের টুকরো স্লাইডের উপরে রেখে তিনি অণুবীক্ষণের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক! এর সঙ্গে আমাদের আগেই চেনাশোনা হয়ে গিয়েছে—নীল পশমী তন্তু, নীল কার্পাস, হলদে পাট। আচ্ছা, এবারের নমুনাকে নম্বর মেরে আলাদা করে রাখা যাক, নইলে অন্যগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে।'

ইন্সপেক্টর চমৎকৃত হয়ে দিলীপের কার্যকলাপ লক্ষ করছিলেন। তারপর বললেন, 'আমি এখনও অন্ধ হয়ে আছি, কিছুই দেখতে বা ভালো করে বুঝতে পারছি না। মণিলাল কেমন করে মারা পড়েছেন, আপনি কি তা আন্দাজ করতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার অনুমান হচ্ছে, হত্যাকারী মণিলালকে যে-কোনও অছিলায় ভুলিয়ে বাড়ির ভিতরে আনে, তাকে জলখাবার খেতে দেয়। মণিলাল হয়তো, আপনি যে-চেয়ারে বসে আছেন, সেইখানেই বসেছিল। হত্যাকারী সেই লোহার গরাদ নিয়ে তাকে আক্রমণ করে, কিন্তু প্রথম আঘাতেই মণিলালকে বধ করতে পারেনি। তার সঙ্গে হত্যাকারীর ধস্তাধস্তি হয়, তারপর মণিলালকে সে টেবল-ক্লথ চাপা দিয়ে মেরে ফেলে। ...ভালো কথা, আর-একটা মীমাংসা এখনও হয়নি। আপনি এই ফিতার খণ্ডটি চিনতে পারেন?'

'হ্যাঁ, ওটি আপনি ঘটনাস্থলে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

'আর সেইজন্যে আপনি আমাকে ঠাট্টা করেছিলেন। যাক, আমি দুঃখিত হইনি। এখন টেবিলের টানার ভিতরে দৃষ্টিপাত করুন। ওই ফিতার কাঠিমটা তুলে নিন। তারপর আমার হাতের এই ফিতার ফাঁসের সঙ্গে ওই কাঠিমের ফিতা মিলিয়ে দেখুন!'

ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি কাঠিমটা তুলে নিলেন। দিলীপ ফিতার ফাঁসটা রেখে দিলেন টেবিলের উপরে।

দুই ফিতা মিলিয়ে দেখে ইন্সপেক্টর বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'দুটো ফিতেই এক! মাঝখানটা সবুজ—দু'পাশে সরু সাদা রেখা! বাহবা কী বাহবা! মস্তবড় প্রমাণ! দিলীপবাবু, না-জেনে আপনাকে ঠাট্টা করেছি বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

দিলীপ হাসতে-হাসতে বললেন, 'ক্ষমা প্রার্থনার দরকার নেই। ওই নিয়ে খুনি কোন কার্যসাধন করেছিল, আন্দাজ করতে পারেন? তাকে একা লাশটা সামলাতে আর বইতে হয়েছিল। তাই হাত খালি রাখবার জন্যে নিশ্চয়ই সে ছাতা আর ব্যাগটা ফিতা দিয়ে বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল।'

স্টেশনমাস্টার বললেন, 'আপনি যেভাবে বর্ণনা করছেন, মনে হচ্ছে যেন আপনিও নিজে ঘটনাস্থলে হাজির ছিলেন! কিন্তু টুপির কী ব্যবস্থা করলেন?'

দিলীপ একটি ছোট্ট নল ও একখানা কাচের স্লাইড তুলে নিয়ে বললেন, 'একটা মোটামুটি পরীক্ষা বোধহয় করতে পারব।'

তিনি নলিকাটি ফ্লাস্কের অ্যালকোহলে চুবিয়ে স্লাইডের উপরে ধরলেন। কয়েক ফোঁটা অ্যালকোহল পড়ল। তারপর তার উপরে Cover-Glass বসিয়ে স্লাইডখানা অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন।

যন্ত্রে চক্ষু রেখে নিবিষ্ট মনে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'মশাই, ফেল্ট বা নেমদ কী দিয়ে তৈরি, জানেন?'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'না।'

'উচ্চশ্রেণীর ফেল্ট তৈরি হয় খরগোশের চুলে। গালার লেপন দিয়ে চুলগুলো বসানো হয়। যে অঙ্গার আমরা পরীক্ষা করছি তার মধ্যে গালা আছে। অণুবীক্ষণের সাহায্যে বেশ কয়েক গাছা খরগোশের চুলও দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এই অঙ্গারগুলো হচ্ছে কোনও ফেল্ট-হ্যাটের দগ্ধাবশেষ। খরগোশের চুলগুলো যখন রং করা নয়, তখন এ-কথাও বলতে পারি, টুপিটার রং ছিল ধূসর।'

ঠিক এইসময়ে পদশব্দ শুনে আমরা চমকে উঠে ফিরে দেখি, ঘরের ভিতরে হয়েছে একটি নতুন লোকের আবির্ভাব।

বিপুল বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'কে আপনারা? কী করছেন এখানে?'

ইন্সপেক্টর একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমরা পুলিশের লোক। তুমি কে?'

পুলিশের নাম শুনেও লোকটা একটুও দমল না। বললে, 'আমি অক্ষয়বাবুর বেয়ারা।'

'এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

'অন্য গ্রামে গিয়েছিলুম।'

'কখন?'

'বৈকাল থেকেই আমি বাইরে আছি।'

'তোমার মনিব?'

'আজ সন্ধের গাড়িতে তাঁর কলকাতায় যাবার কথা।'

'কলকাতায় কোথায়?'

'জানি না।'

'তিনি কী কাজ করেন?'

'তাও ঠিক জানি না। তবে তিনি বোধহয় জহুরী।'

'কখন ফিরবেন?'

'বলতে পারি না। সময়ে-সময়ে তিনি তিন-চারদিন বাড়িতে ফেরেন না।'

'এ-বাড়িতে আজ কোনও নূতন লোক এসেছিল?'

'আমি বাড়িতে থাকতে কেউ আসেনি।'

'কলকাতায় তোমার মনিবের কোনও বাসা নেই?'

'জানি না। তবে শুনেছি তিনি কলকাতার বড়বাজারে কোথায় গিয়ে ওঠেন।'

দিলীপ গাত্রোত্থান করে ইন্সপেক্টারকে নিয়ে দালানে গেলেন।

চুপিচুপি বললেন, 'এখানে আর বেশি সময় নষ্ট করবেন না, আসামী একেবারে গা-ঢাকা দিতে পারে। তার কার্যকলাপ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বিষম চতুর ব্যক্তি। অক্ষয়ের বেয়ারাকে নজরবন্দি রাখুন। বাড়িটা পুলিশের হেপাজতে থাকুক। এখান থেকে এককণা ধুলোও যেন না সরানো হয়। আপনি আর একটু অপেক্ষা করুন। ইতিমধ্যে আমরা থানায় খবর দিয়ে আপনার মুক্তির ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। নমস্কার।'

আমরা সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

যেতে-যেতে দিলীপ বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস অক্ষয় কালকেই ধরা পড়বে। সে যখন জহুরী, তখন তার বড়বাজারের ঠিকানা জানা অসম্ভব হবে না। অক্ষয়ের সম-ব্যবসায়ীদের কেউ-না-কেউ তার ঠিকানা বলতে পারবে। ...তারপর শ্রীমন্ত, কর্তব্য তো শেষ হল। অতঃপর?'

আমি বললুম, 'অতঃপর? আমি বেশ বুঝতে পারছি, এইবার তুমি তোমার হাত-বাক্সের জয়গান আরম্ভ করবে!'

'তাই নাকি? অসীম তোমার বোঝবার শক্তি! যাক। আপাতত ভেবে দ্যাখো, এই মামলা হাতে নিয়ে আমরা কী-কী শিক্ষালাভ করলুম? ...প্রথমত, একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আর ঘণ্টা কয়েক পরে এলে বাড়ির ভিতরে ঢুকেও আমরা আর কোনও সূত্রই খুঁজে পেতুম না—সমস্তই উপে যেত কর্পূরের মতো। দ্বিতীয়ত, খুব তুচ্ছ সূত্রকেও অগ্রাহ্য করতে নেই, তাকে অবলম্বন করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই উচিত। দৃষ্টান্ত চাও, যদি, ভাঙা চশমার কথা বলতে পারি। তৃতীয়ত, পুলিশের অনুসন্ধান-কার্যে একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের সাহায্য অত্যন্ত দরকারি এবং চতুর্থত, আমার এই হাত-বাক্সটি হচ্ছে অমূল্য নিধি, একে ছেড়ে বাড়ির বাইরে পা বাড়ানো উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'অতএব, জয় হাত-বাক্সের জয়!'

শ্রীমন্ত সেনের ডায়ারি সমাপ্ত

অবশিষ্ট

বড়বাজারের একটা ছোট অন্ধকার রাস্তা—চার-পাঁচ হাতের বেশি চওড়া নয়। কিন্তু তার মধ্যে প্রতিদিন জনস্রোত যেন উপচে পড়ে। প্রত্যহ কত হাজার লোক যে সেখান দিয়ে আনাগোনা করে, কেউ তার হিসাব রাখেনি।

রাস্তা সরু হলে কী হয়, দু'পাশের বাড়িগুলোর অধিকাংশই পাঁচ-ছয়তলার কম নয়। যেন নিচে আলোকের অভাব দেখে মুক্ত আকাশ-বাতাসকে খোঁজবার জন্যে তারা উপরে—আরও উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

প্রত্যেক বাড়ির তলায়-তলায় যেন পায়রার খোপের পর খোপ সাজানো হয়েছে। এইসব খোপে যারা বাস করে, তাদের মধ্যে বাঙালির দেখা পাওয়া যায় না।

অথচ এমনি একখানা মস্ত বড় বাড়ির সব চেয়ে উপরতলার একটি ঘরে চৌকির উপরে যে বসে আছে, সে আমাদের অক্ষয় ছাড়া আর কেউ নয়।

শহরে এত জায়গা থাকতে এখানে এসে কেন যে সে বাসা বেঁধেছে তা বলা কঠিন। হয়তো তার অসাধু—কিন্তু সুচতুর মন বুঝেছে, চৌর্য-ব্যবসায় কোনওদিনই নিরাপদ নয়; বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও যে-কোনও বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা; পুলিশকে ঠকাবার জন্যে যারা নির্জন জায়গায় আশ্রয় নেয়, তারা হচ্ছে নির্বোধ, কারণ পুলিশের দৃষ্টি সর্বাগ্রে তাদেরই আবিষ্কার করতে পারে; কিন্তু জনতাসাগরে হারিয়ে গেলে সহজে কেউই তার পাত্তা পাবে না!

এইটেই তার বড়বাজারে বাসা নেওয়ার একমাত্র কারণ কি না জানি না; কিন্তু সেই অন্ধকার রাস্তার এই ছ'তলা বাড়ির উপরতলায় সত্য-সত্যই বাসা বেঁধেছিল আমাদের অক্ষয়। কলকাতায় এলে সে এইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করত।

অক্ষয় চৌকির উপরে বসে আছে। ঘরের অন্য সব দরজা-জানলা বন্ধ। কেবল একটি খোলা জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে আসছে অপরাহ্ণের রৌদ্রপীত আলো এবং বড়বাজারের বিপুল মানব-মধুচক্রের অশ্রান্ত গুঞ্জন।

তার সামনে একখানা কাগজের উপরে ছড়ানো রয়েছে নানা রঙের নানা আকারের রত্ন! হীরা, পান্না, চুনি, মকরত, মুক্তা প্রভৃতি। তাদের উপরে এসে দিনের আলো পড়ছে যেন ঠিকরে-ঠিকরে!

অক্ষয় বসে-বসে ভাবছে ঃ 'একে-একে হিসাব করে দেখলুম, এগুলোর বাজারদর ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আশা করেছিলুম আরও বেশি লাভ হবে, কিন্তু মানুষের সব আশা সফল হয় না।

'তবু যা পেয়েছি তার জন্যে নিজের সৌভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারি। নিজের বাড়িতে বসে মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ, এটা কল্পনার অতীত! যদিও মণিলালের উচিত ছিল, আরও বেশি দামের পাথর সঙ্গে করে আনা! এ তো সামান্য চুরি নয়, আমাকে দস্তুরমতন নরহত্যা করতে হয়েছে। নরহত্যায় আরও বেশি লাভ হওয়া উচিত। কারণ, নরহত্যায় নিজের জীবন বিপন্ন হয়।

'কিন্তু আমার জীবন কি বিপন্ন হয়েছে? নিশ্চয়ই নয়। ঠিকমতো মাথা খাটাতে পারলে নরহত্যার মতন সহজ ও নিরাপদ ব্যবসা আর নেই। খুনিরা ধরা পড়ে নিজেদের বোকামির জন্যেই। তেমন বোকামি করবার পাত্র আমি নই।

'পুলিশ কেমন করে আমাকে ধরবে? এমন কোনও সাক্ষী নেই যে বলতে পারে কাল সন্ধেবেলায় মণিলাল বুলাভাই এসেছিল আমার বাড়িতে। পুলিশ আমার বাড়িতে এলেও, আমাকে সন্দেহ করলেও এমন কোনও সূত্র খুঁজে পাবে না, যার জোরে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

'চারিদিকে দৃষ্টি রেখে ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে আমি কাজ করেছি। সেই সর্বনেশে টুপিটা আর একটু হলেই আমার নজর এড়িয়ে যেত বটে, কিন্তু যায়নি! সেও এখন আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। আমার আবার ভয় কী?

মণিলালের লাশ পাওয়া গিয়েছে—তা তো যাবেই। নির্বোধের মতন আমি তার লাশ লুকোবার চেষ্টা করিনি। রেলগাড়ির চাকার তলায় সে কাটা পড়েছে! মণিলালের সব জিনিসই—এমনকী ছাতা আর ব্যাগ থেকে চোখের চশমা পর্যন্ত তার সঙ্গেই পাওয়া গিয়েছে। অতি-লোভী মূর্খ চোরের মতন মণিলালের সোনার ঘড়ি, চেন, হীরার পিন আর নগদ দুশো চল্লিশ টাকাও আমি নেওয়ার চেষ্টা করিনি। পুলিশ নিশ্চয়ই স্থির করবে, মণিলাল মারা পড়েছে রেল-দুর্ঘটনায়। কিংবা সে আত্মহত্যা করেছে।

'আমি নিরাপদ। আমি সাধারণ খুনি নই।

'কিন্তু স্টেশনে সেই ঢ্যাঙা লোকটা কে?

'সেই যার হাতে বসন্ত নামে লোকটা মামলা তদ্বিরের ভার দিল? লোকটা কি ডিকেটটিভ? তার মুখ যতবারই মনে করি, ততবারই আমার বুক ধড়াস করে ওঠে কেন? সে আমার কী করতে পারে! যদিই সে এটাকে খুনের মামলা বলে ধরে নেয়, তা হলেই বা আমার ভয়টা কী? আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? মণিলালের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আবিষ্কার করবে কে?

'কোনও ভয় নেই, কোনও ভয় নেই, আমার কোনও ভয় নেই! যা হওয়ার নয়, তাই যদি হয়, তা হলেই-বা আমাকে ধরবে কে? আমার কলকাতার ঠিকানা কেউ জানে না। তোড়জোড় করে তদন্ত শেষ করতেও পুলিশের বেশ কিছুদিন কেটে যাবে। আর আমি কলকাতা থেকেও সরে পড়ছি আজ সন্ধ্যার গাড়িতেই। ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা আমি তুলে নিয়েছি। দূর বিদেশে অদৃশ্য হব—এখন কিছুদিনের জন্যে। আমাকে ধরবে কে?

'সিঁড়ির ওপর অমন ভারি-ভারি পায়ের শব্দ কাদের? যেন অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে! উপরতলার ঘরগুলো তো খালি। নতুন ভাড়াটে আসছে না কি...?'

ঘরের দরজায় হল করাঘাত।

অক্ষয় সচমকে রত্নগুলো মুড়ে পকেটে রেখে দিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কে?'

'দরজা খুলুন।'

'কে আপনি?'

'দরজা খোলো, দরজা খোলো বলছি!'

কেমন যেন বেসুরো কণ্ঠস্বর! এখানে কোনও বাঙালিই তো তাকে ডাকতে আসে না।

অক্ষয় উঠল। একমুহূর্তে তার মুখ হয়ে গেল রক্তহীন—যেন সে নিয়তির আহ্বান শুনতে পেয়েছে!

'দরজা খোলো, দরজা খোলো।'

অক্ষয় দরজা খুলল না। দরজা থেকে তিন হাত তফাতে একটা জানলা ছিল। তারই একটা পাল্লা খুলে, বাইরে একবার উঁকি মেরেই দুম করে জানলাটা আবার বন্ধ করে দিল।'

ইন্সপেক্টর! পাহারাওয়ালার দল!

অক্ষয় উদ্‌ভ্রান্তের মতন চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। কোনও দিকেই পালাবার পথ নেই।

দরজার উপরে দুমদাম পদাঘাত আরম্ভ হল। দরজা এখনি ভেঙে পড়বে।

দাঁতে দাঁত চেপে অক্ষয় নিজের মনেই বললে, 'ধরা দেব? কখনও নয়, কখনও নয়।' তার মুখের ভাব হয়ে উঠল ঠিক সেইরকম—মণিলালকে খুন করবার জন্যে যখন সে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল!

দুম-দুম-দুম—দরজায় পদাঘাত!

ওদিকে রাস্তার ধারের বারান্দা—ওদিকেও বাইরে যাওয়ার জন্যেও একটা দরজা।

'না, না, পালাবার পথ আছে, ওই দরজা দিয়েই আমি পালাব—দরজা দিয়েই।'

দুম-দুম-দুম-দুম!

অক্ষয় উন্মত্তের মতন ছুটে গিয়ে ছ-তলা বারান্দার দরজা খুলে ফেলল।

দুম-দুম—হুড়মুড় করে ঘরের দরজা ভেঙে পড়ল!

এবং সঙ্গে-সঙ্গে অক্ষয় একলাফ মেরে বারান্দা ডিঙিয়ে নিচের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অক্ষয়ের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার আত্মা তখন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

বেণীসংহার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিতকে দিয়ে ব্যোমকেশের গল্প লেখানো আর চলছে না। একে তো তার ভাষা সেকেলে হয়ে গেছে, এখনও চলতি ভাষা আয়ত্ত করতে পারেনি, এই আধুনিক যুগেও 'করিতেছি' 'খাইতেছি' লেখে। উপরন্তু তার সময়ও নেই। পুস্তক প্রকাশকের কাজে যে-লেখকেরা মাথা গলিয়েছেন তাঁরা জানেন, একবার মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ পেলে মা-সরস্বতীর দিকে আর নজর থাকে না। তা ছাড়া সম্প্রতি অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে; শিগগিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ি তৈরির তদারক করছে; গল্প লেখার সময় কোথায়?

দেখে শুনে অজিতকে নিষ্কৃতি দিলাম। এখন থেকে আমিই যা পারি লিখব।

এক

সকালবেলা ব্যোমকেশ তার কেয়াতলার বাড়িতে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল। শীতের সকাল, বেলা আন্দাজ আটটা। অজিত ইতিমধ্যেই তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে, একজন প্রখ্যাত লেখকের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। লেখক মহাশয় একটি নতুন বই দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রখ্যাত লেখকদের অনেক উমেদার, বইটা আগেভাগে হস্তগত করা দরকার।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি শেষ করে ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা তুলে নিল। পেয়ালার অবশিষ্ট চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, সে এক চুমুকে পেয়ালা নিঃশেষ করে আবার কাগজ তুলে নিল। এবার খবর পড়তে হবে।

আজকাল খবরের কাগজ পড়লেই বোঝা যায় পৃথিবীর অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। ভূমিকম্প-জলোচ্ছ্বাস-অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি তো আছেই, তা ছাড়া মানুষগুলোও যেন খেপে গেছে। যুদ্ধ, বিপ্লব, অন্তর্বিবাদ, ধর্মঘট, ঘেরাও, বোমা, কাঁদানে গ্যাস, লাঠালাঠি। পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে বলেই বোধহয় কারুর প্রাণে শান্তি নেই। যেখানে এত গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি সেখানে শান্তি কোথা থেকে আসবে?

কাগজের পাতা ওল্টাতে হল না। প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখা গেল এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। পরশু রাত্রে খুন হয়েছে, কাল সকালে জানাজানি হয়, আজ কাগজে বেরিয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার ঘটনা, ব্যোমকেশের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়; সদর রাস্তায় বেরিয়ে দক্ষিণে কিছুদূর গেলেই তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা চোখে পড়ে, তার কপালের ওপর বড়-বড় অক্ষরে লেখা—বেণীমাধব। ব্যোমকেশ অনেকবার বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করেছে, কিন্তু বাড়ির অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ ছিল না। কাগজ থেকে জানা গেল, বাড়ির মালিক বৃদ্ধ বেণীমাধব চক্রবর্তী এবং তাঁর দেহরক্ষীকে কেউ নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট মনে হত্যার বিবরণ পড়ল, তারপর অন্যমনস্কভাবে সিগারেট ধরাল। পরশু রাত্রে পাড়াতে এমন একটা লোমহর্ষণ খুন হয়ে গেছে, অথচ সে খবর পায়নি! রাখাল এই এলাকার দারোগা, সে নিশ্চয় তদন্তের ভার নিয়েছে; কিন্তু ব্যোমকেশকে কিছু জানায়নি। হয়তো সোজাসুজি ব্যাপার, রহস্য বা জটিলতা কিছু নেই, তাই রাখাল আসেনি। আজকাল জটিল রহস্যও বড়ই দুর্লভ হয়ে পড়েছে—।

টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ হাত বাড়িয়ে ফোন কানের কাছে ধরতেই ওপার থেকে আওয়াজ এল—'ব্যোমকেশদা? আমি রাখাল। আজকের কাগজ পড়েছেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'পড়েছি। বেণীসংহার?'

'কী বললেন—বেণীসংহার? ওঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেণীসংহারই বটে, তার সঙ্গে মেঘরাজবধ। আমি অকুস্থল থেকে কথা বলছি।'

'কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার একটু প্যাঁচালো ঠেকছে। কাল সকাল থেকে তদন্ত শুরু করেছি। এখনও কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন?'

'না।'

'তা হলে একবারটি এদিকে আসবেন? আপনার বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। বাড়ির নাম বেণীমাধব।'

'জানি।'

'কখন আসছেন?'

'অবিলম্বে।'

দুই

বেণীমাধব চক্রবর্তী সরকারি সামরিক বিভাগে কন্ট্রাক্টরি কাজ করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন। দক্ষিণ কলকাতায় সদর রাস্তার ওপর তাঁর প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িটা সেই অর্থের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন।

বেণীমাধব সতর্কবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ঠিকেদারি করার ফলে মনুষ্য-জাতির সততায় তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। কিন্তু সেজন্যে তাঁর হৃদয়ধর্ম সংকুচিত হয়নি। সংসারের এবং সেইসঙ্গে নিজের দোষত্রুটি তিনি হাসিমুখে গ্রহণ করেছিলেন।

বেণীমাধবের পোষ্য বেশি ছিল না। যৌবন উত্তীর্ণ হওয়ার পরই তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন; পত্নী রেখে যান একটি পুত্র ও একটি কন্যা। তারা বড় হলে বেণীমাধব তাদের বিয়ে দিলেন। ছেলে অজয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি আস্ত অকর্মার ধাড়ি; ব্যবসা-বাণিজ্যের চেষ্টা করে বাপের কিছু টাকা নষ্ট করে পিতৃস্কন্ধে আরোহণ করেছিল; বেণীমাধব আর তাকে কাজে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করেননি। তিনি বেশিরভাগ সময় বাইরে থাকতেন, বাড়ির দ্বিতলে অজয় বাস করত তার স্ত্রী আরতি এবং পুত্র-কন্যা মকরন্দ ও লাবণিকে নিয়ে। বেণীমাধব তার সংসারের খরচ দিতেন।

মেয়ের বিয়ে বেণীমাধব ভালোই দিয়েছিলেন; জামাই গঙ্গাধরের পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু বড়মানুষ শ্বশুর পেয়ে তার মেজাজ চড়ে গেল, সে রেস খেলে যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দিল। মেয়ে গায়ত্রী বাপের কাছে এসে কেঁদে পড়ল। বেণীমাধব মেয়ে-জামাই এবং দৌহিত্রী ঝিল্লীকে নিজের বাড়িতে তুললেন; ছেলেকে যেমন মাসোহারা দিচ্ছেন মেয়ের জন্যেও তেমনি মাসোহারা বরাদ্দ হল।

বেণীমাধবের বাড়িটা তিনতলা, আগেই বলেছি। তেতলায় মাত্র তিনটি ঘর, বাকি জায়গায় বিস্তীর্ণ ছাদ। এই তেতলাটা বেণীমাধব নিজের জন্যে রেখেছিলেন, তিনি না থাকলে তেতলা তালাবন্ধ থাকত। দোতলায় আটটি ঘর, সামনে টানা বারান্দা; এই তলায় বেণীমাধব তাঁর ছেলে অজয় ও মেয়ে গায়ত্রীকে পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাদের হাঁড়ি-হেঁশেল অবশ্য আলাদা। দুই সংসারে মনের মিল ছিল না; কিন্তু প্রকাশ্যে ঝগড়া করবার সাহসও কারুর ছিল না। ছেলেমেয়ের প্রতি বেণীমাধবের স্নেহ ছিল; কিন্তু তিনি রাশভারি লোক ছিলেন, কড়া হতে জানতেন।

নিচের তলায় প্রকাণ্ড একটি হলঘর বিলিতি আসবাব দিয়ে ড্রয়িংরুমের মতো সাজানো; মাঝখানে নিচু গোল টেবিল, তাকে ঘিরে দুটো সোফা এবং গোটা কয়েক গদি-মোড়া ভারি চেয়ার, তা ছাড়া আরও কয়েকটি কেঠো চেয়ার দেওয়ালের গায়ে সারি দিয়ে রাখা। কিন্তু ঘরটি বড় একটা ব্যবহার হয় না, কদাচিৎ কেউ দেখা করতে এলে অতিথিকে বসানো হয়। বাকি পাঁচখানা ঘর আগন্তুক-অভ্যাগতদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকলেও অধিকাংশ সময় তালাবন্ধ থাকত।

কিন্তু বেশিদিন তালাবন্ধ রইল না। বেণীমাধবের দুই মামাতো ছোটবোন ছিল, বহুদিন মারা গেছে; তাদের দুই ছেলে সনৎ গাঙ্গুলি ও নিখিল হালদার—পরস্পর মাসতুতো ভাই—কলকাতায় চাকরি করত; তাদের ভালোবাসা ছিল না, তাই বেণীমাধব তাদের নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। নিচের দুটি ঘর নিয়ে তারা রইল।

দেখা যাচ্ছে, বেণীমাধবের ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী এবং দুই ভাগনে মিলে সাতজন পোষ্য। বাড়িতে চাকর নেই, দুটো দাসী দিনেরবেলা কাজ করে দিয়ে সন্ধের সময় চলে যায়।

নিতান্তই বৈচিত্র্যহীন পরিবেশ। শালা-ভগ্নীপতির বয়স প্রায় সমান, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ; কিন্তু তাদের মধ্যে মানসিক ঘনিষ্ঠতা নেই, দুজনের আকৃতি-প্রকৃতি দু-রকম। অজয় সুশ্রী ও শৌখিন গোছের মানুষ, গিলে-করা ধুতি-পাঞ্জাবি ও পালিশ-করা পাম্প-শু ছাড়া সে বাড়ির বার হয় না। রোজ সকালে গড়িয়াহাটে বাজার করতে যাওয়াতে তার ঘোর আপত্তি, অধিকাংশ দিন তার স্ত্রী আরতিই বাজার করতে যায়। অজয় সন্ধের পর ক্লাবে যায়; শখের থিয়েটারের প্রতি তার গাঢ় অনুরাগ। অভিনয় ভালোই করে। ক্লাবটা শখের থিয়েটারেরই ক্লাব, প্রতি বছর তারা চার-পাঁচখানা নাটক অভিনয় করে।

গঙ্গাধরের চেহারাটা কাপালিক ধরনের; মুখে এবং দেহে মাংস কম, হাড় বেশি। চোখের দৃষ্টি খর। নিজের বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়ে শ্বশুরের স্কন্ধে আরোহণ করার পর সে অত্যন্ত গম্ভীর এবং মিতভাষী হয়ে উঠেছে। সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, সন্ধের পর লাঠি হাতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়। ঘণ্টা দেড়েক পরে যখন ফিরে আসে, তখন তার মুখ থেকে ভুরভুর করে মদের গন্ধ বের হয়।

ননদ-ভাজের মধ্যে প্রকাশ্যত সদ্ভাব ছিল, যাওয়া-আসা গল্পগুজবও চলত; কিন্তু সুবিধে পেলে কেউ কাউকে চিমটি কাটতে ছাড়ত না। গায়ত্রী হয়তো পাশের ফ্ল্যাটে গিয়ে বলল—'বউদি, আজ কী রান্নাবান্না করলে?'

আরতি রান্নার ফর্দ দিয়ে বলত—'তুমি কী রাঁধলে ভাই?'

গায়ত্রী বলল—'রান্না আর হল কই! ভাতের ফ্যান গেলে মাংস চড়াতে গিয়ে দেখি গরমমশলা নেই! জানো তো, তোমার নন্দাই শাক-ভাত খেতে পারেন না। ওঁর মাছ না হলেও চলে, কিন্তু রোজ মাংস চাই। তাই খোঁজ নিতে এলুম তোমার ভাঁড়ারে গরমমশলা আছে কি না। নইলে আবার ঝিকে বাজারে পাঠাতে হবে।'

আরতি বলল—'আছে বইকী, এই যে দিচ্ছি।'

গরমমশলা এনে দিয়ে আরতি হাসি-হাসি মুখে বলল—'নন্দাই মাংস ভালোবাসেন তাতে দোষ নেই, কিন্তু ভাই, ও-জিনিসটা না খেলেই পারেন।'

গায়ত্রীর দৃষ্টি অমনি কড়া হয়ে উঠল—'কোন জিনিস?'

আরতি ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল—'তোমার দাদা বলছিলেন, সেদিন সন্ধের পর নন্দাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, তা নন্দাই-এর মুখ থেকে ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুল। নন্দাই-এর বোধহয় পুরনো অভ্যেস, ছাড়তে পারেন না, কিন্তু কথাটা যদি বাবার কানে ওঠে—।'

গায়ত্রীর কঠিন দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল, সে মুখে একটু বাঁকা হাসি টেনে এনে বলল—'বাবার কানে যদি কথা ওঠে তা হলে তোমরাই তুলবে বউদি। কিন্তু সেটা কি ভালো হবে? তোমরা মেয়ের জন্য নাচের মাস্টার রেখেছ তাতে দোষ নেই, কিন্তু লাবণি রাতদুপুর পর্যন্ত মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরে, সেটা কি ভালো? লাবণি কচি খুকি নয়, যদি একটা কেলেঙ্কারি করে বসে তাতে কি বাবা খুশি হবেন?' গায়ত্রী আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেল।

সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি।

লাবণি মেয়েটি দেখতে ভালো; ছিপছিপে লম্বা গড়ন, নাচের উপযোগী চেহারা। একটু চপল প্রকৃতি, লেখাপড়া স্কুলের সীমানা পার হবার আগেই শেষ হয়েছে; নৃত্যকলার প্রতি তার দুরন্ত অনুরাগ। অজয় মেয়ের মনের প্রবণতা দেখে তার জন্যে নাচের মাস্টার রেখেছিল। মাস্টারটি বয়সে তরুণ, সম্পন্ন ঘরের ছেলে, নাম পরাগ লাহা; হপ্তায় দু-দিন লাবণিকে নাচ শেখাতে আসত। বাপ-মায়ের চোখের সামনে লাবণি নাচের মহলা দিত। কদাচিৎ পরাগ বলত—'একটা নাচ-গানের বিলিতি ছবি এসেছে, দুটো টিকিট কিনেছি রাত্রির শো-তে। লাবণিকে নিয়ে যাব? ছবিটা দেখলে ও অনেক শিখতে পারবে।'

গোড়ার দিকে আরতি রাজি হত না। পরাগ বলত—'থাক, আমি অন্য কোনও ছাত্রীকে নিয়ে যাব।'

ক্রমে আপত্তি শিথিল হয়ে আসে, লাবণি পরাগের সঙ্গে ছবি দেখতে যায়; দুপুর রাত্রে পরাগ লাবণিকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

কালধর্মে সবই গা-সওয়া হয়ে যায়।

লাবণির দাদা মকরন্দ কলেজে পড়ে। কিন্তু পড়া নামমাত্র; কলেজে নাম লেখানো আছে

এই পর্যন্ত। তার মনের দিগন্ত জুড়ে আছে রাজনৈতিক দলাদলি, দলগত প্রয়োজনে যদি কলেজে যাওয়া প্রয়োজন হয় তবেই কলেজে যায়। তার চেহারা ভালো, কিন্তু মুখে-চোখে একটা উগ্র ক্ষুধিত অসন্তোষ। সে বাড়িতে বেশি থাকে না; বাড়ির সঙ্গে কেবল খাওয়া আর শোয়ার সম্পর্ক। মাঝে-মাঝে আরতির সংসার-খরচের টাকা অদৃশ্য হয়; আরতি বুঝতে পারে কে টাকা নিয়েছে, কিন্তু অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকে। মকরন্দ তার থিয়েটার-বিলাসী বাপকে বিদ্বেষ করে, অজয়ও ছেলের চালচলন পছন্দ করে না; দুজনে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। মকরন্দ যেন তার বাপ-মায়ের সংসারে অবাঞ্ছিত অতিথি।

পাশের ফ্ল্যাটে সংসার ছোট; কেবল একটি মেয়ে ঝিল্লী। ঝিল্লী লাবণির সমবয়সী, লাবণির মতো সুন্দরী নয়, কিন্তু পড়াশোনায় ভালো। চাপা প্রকৃতির মেয়ে, কলেজে ভর্তি হয়েছে, নিয়মিত কলেজে যায়, লেখাপড়া করে, অবসর পেলে মাকে সংসারের কাজে সাহায্য করে। তার শান্ত মুখ দেখে মনের খবর পাওয়া যায় না।

এই গেল দোতলার মোটামুটি খবর।

নিচের তলার দুটি ঘরে সনৎ আর নিখিল থাকে। সনতের বয়স ত্রিশের ওপর, নিখিলের ত্রিশের নিচে। চেহারার দিক থেকে দুজনকেই সুপুরুষ বলা চলে। কিন্তু চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। সনৎ সংবৃতচিত্ত ও মিতবাক, বিবেচনা না করে কথা বলে না। নিখিলের মুখে খই ফোটে, সে চটুল ও রঙ্গপ্রিয়। দুজনেই সাংবাদিকের কাজ করে। সনৎ প্রেস-ফটোগ্রাফার। নিখিল খবরের কাগজের সংবাদ সম্পাদন বিভাগে নিম্নতর নিউজ এডিটর-এর কাজ করে। সে নিশাচর প্রাণী। দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন, দেবতা জাগিলে মোদের রাতি। ঋষ্যশৃঙ্গকে যারা প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।

এরা কেউ বিয়ে করেনি। নিখিলের বিয়ে না করার কারণ, সে যা উপার্জন করে তাতে সংসার পাতা চলে না; কিন্তু সনতের সে রকম কোনও কারণ নেই। সে ভালো উপার্জন করে; মাতুলগৃহে তার বাস করার কারণ অর্থাভাব নয়, ভালো বাসার অভাব। তার বিবাহে অরুচির মূল অনুসন্ধান করতে হলে তার একটি গোপনীয় অ্যালবামের শরণ নিতে হয়। অ্যালবামে অনেকগুলি কুহকিনী যুবতীর সরস ফটো আছে। ফটোগুলি দেখে সন্দেহ করা যেতে পারে যে, সনৎ অবিবাহিত হলেও ব্রহ্মচারী নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত সাবধানী লোক। সে যদি বিবাহের বদলে মধুকর-বৃত্তি অবলম্বন করে থাকে, তা হলে তা সকলের অজান্তে।

এই সাতটি মানুষ বাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বেণীমাধব ন-মাসে ছ-মাসে আসেন, দু-দিন থেকে আবার দিল্লি চলে যান। দিল্লিই তাঁর কর্মক্ষেত্রের কেন্দ্রবিন্দু।

হঠাৎ সাতষট্টি বছর বয়সে বেণীমাধবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হল। তাঁর শরীর বেশ ভালোই ছিল। অসম্ভব পরিশ্রম করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রিয় ভৃত্য এবং দীর্ঘদিনের অনুচর রামভজনের মৃত্যুর পর তিনি আর বেশিদিন খাড়া থাকতে পারলেন না। তিনমাসের মধ্যে তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেললেন। তাঁর টাকার দরকার ছিল না, বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত কাজের ঝোঁকেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এখন দিল্লির অফিস তুলে দিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরে এলেন। সঙ্গে এল নতুন চাকর মেঘরাজ।

রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব মেঘরাজকে খাস-চাকর রেখেছিলেন। মেঘরাজ ভারতীয় সেনাদলের একজন সিপাহী ছিল; চীন-ভারত যুদ্ধে আহত হয়ে তার একটা পা হাঁটু পর্যন্ত কাটা যায়। ভারতীয় সেনাবিভাগের পক্ষ থেকে তাকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছিল এবং সামান্য পেনশন দিয়ে বিদায় করা হয়েছিল। সে বেণীমাধবের দিল্লির অফিসে দরোয়ানের কাজ পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করেছিল; রামভজনের মৃত্যুর পর বেণীমাধব তাকে খাস-চাকরের কাজ দিলেন। মেঘরাজ অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং কড়া প্রকৃতির মানুষ; সে বেণীমাধবের একক সংসারের সমস্ত কাজ নিজের

হাতে তুলে নিল; তাঁর দাড়ি কামানো থেকে জুতা বুরুশ পর্যন্ত সব কাজ করে। তার বয়স আন্দাজ চল্লিশ; বলিষ্ঠ চেহারা। কৃত্রিম পায়ের জন্য একটু খুঁড়িয়ে চলে।

যাহোক, বেণীমাধব এসে কলকাতার বাড়িতে অধিষ্ঠিত হলেন। তেতলার অংশে নিত্য ব্যবহারের সব ব্যবস্থাই ছিল, কেবল ফ্রিজ আর টেলিফোন ছিল না। দু-চারদিনের মধ্যে ফ্রিজ এবং টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত হল। ইতিমধ্যে মেয়ে গায়ত্রী এসে আবদার ধরেছিল—'বাবা, এবার আমি তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা করব। আগে তুমি যখনই আসতে দাদার কাছে খেতে। আমরা কি কেউ নই?'

বেণীমাধব বলেছিলেন—'আমি তো একলা নই, মেঘরাজ আছে।'

'মেঘরাজ বুঝি নতুন চাকরের নাম? আহা, বুড়ো রামভজন মরে গেল! তা মেঘরাজকেও আমি খাওয়াব।'

বেণীমাধব বিবেচনা করে বললেন—'বেশ, কিন্তু তাতে তোমার খরচ বাড়বে। আমি তোমার মাসিক বরাদ্দ আরও দেড়শো টাকা বাড়িয়ে দিলাম।'

গায়ত্রী হেসে বলল—'সে তোমার যেমন ইচ্ছে।' তার বোধহয় মনে-মনে এই মতলবই ছিল; সে মাসে সাড়ে সাতশো টাকা পেত, এখন ন'শো টাকায় দাঁড়াল।

কলকাতায় এসেই বেণীমাধব তার পুরনো বন্ধু ডাক্তার অবিনাশ সেনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ডাক্তার অবিনাশ সেন নামকরা ডাক্তার, বয়সে বেণীমাধবের চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তিনি একদিন বেণীমাধবকে নিজের ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন; এক্স-রে, ই সি জি প্রভৃতি যান্ত্রিক পরীক্ষা হল। তারপর ডাক্তার সেন বললেন—'দেখুন, আপনার শরীরে সিরিয়াস কোনও ব্যাধি নেই, যা হয়েছে তা হল বার্ধক্যের স্বাভাবিক সর্বাঙ্গীন অবক্ষয়। আমি আপনাকে ওষুধ-বিষুধ কিছু দেব না, কেবল শরীরের গ্রন্থিগুলোকে তাজা রাখবার জন্যে মাসে একটা করে ইনজেকশন দেব। আসলে আপনি বয়সের তুলনায় বড় বেশি পরিশ্রম করছিলেন। এখন থেকে পরিপূর্ণ বিশ্রাম; বই পড়ুন, রেডিও শুনুন, রোজ বিকেলে একটু বেড়ান। এখনও অনেক দিন বাঁচবেন।'

বেণীমাধব ইনজেকশন নিয়ে সানন্দে বাড়ি ফিরে এলেন।

তারপর দিন কাটতে লাগল। গায়ত্রী নিজের হাতে থালা সাজিয়ে এনে বাপকে খাইয়ে যায়। অন্য সকলে আসা-যাওয়া করে। মকরন্দ বড় একটা আসে না, এলেও দু-মিনিট থেকে চলে যায়। নাতনীরা থাকে, বেণীমাধবের সঙ্গে গল্প করে। ঝিল্লী পড়াশুনায় ভালো জেনে বৃদ্ধ সুখী হন; লাবণি নাচ শিখছে শুনেও তিনি অপ্রীত হন না। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও প্রাচীনপন্থী নন। সব মেয়েই যখন নাচছে, তখন তাঁর নাতনী নাচবে না কেন?

দিন কুড়ি-পঁচিশ কাটবার পর হঠাৎ একদিন বেণীমাধবের শরীর খারাপ হল; উদরাময়, পেটের যন্ত্রণা। ডাক্তার সেন এলেন, পরীক্ষা করে বললেন—'খাওয়ার অত্যাচার হয়েছে, খাওয়া সম্বন্ধে ধরা-বাঁধার মধ্যে থাকতে হবে।'

বাড়ির সকলেই উপস্থিত ছিল। গায়ত্রী শুকনো মুখে বলল—'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি তো বাবাকে এমন কিছু খেতে দিইনি যাতে ওঁর শরীর খারাপ হতে পারে।'

ডাক্তার কোনও কথা বললেন না, ওষুধের প্রেসক্রিপশন ও পথ্যের নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন—'কেমন থাকেন আমি টেলিফোন করে খবর নেব।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বেণীমাধব আরতির পানে চেয়ে বললেন—'বউমা, আমার পথ্য তৈরি করার ভার তোমার ওপর রইল।'

আরতি বিজয়োল্লাস চেপে বলল—'হ্যাঁ বাবা।'

তিন-চারদিনের মধ্যে বেণীমাধব সেরে উঠলেন, তাঁর পেট ধাতস্থ হল। পথ্য ছেড়ে তিনি স্বাভাবিক খাদ্য খেতে লাগলেন। আরতিই তাঁর জন্যে রান্না করে চলল।

কিন্তু বেণীমাধবের মন শান্ত নয়। চিরদিন নানা লোকের সঙ্গে নানা কাজে দিন কাটিয়েছেন, এখন তাঁর জীবন বৈচিত্র্যহীন। সকালে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দেয়, তিনি স্নানাদি করে চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসেন। তাতে ঘণ্টাখানেক কাটে। তারপর রেডিও চালিয়ে খানিকক্ষণ গান শোনেন। গান বেশিক্ষণ ভালো লাগে না, রেডিও বন্ধ করে বই এবং সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টান।

একদিন কলকাতার পুরনো বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যায়। টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজে তাঁদের নাম বার করেন, টেলিফোন করে কাউকে পান না, কাউকে পান; কিছুক্ষণ পুরনো কালের গল্প হয়। এগারোটার পর আরতি ভাতের থালা নিয়ে আসে। আহারের পর তিনি ঘণ্টাখানেক বিছানায় শুয়ে দিবানিদ্রায় কাটান।

বিকেলবেলা ঝিল্লী কিংবা লাবণি আসে, তাদের সঙ্গে খানিক গল্প করেন। লাবণিকে বলেন—'কেমন নাচতে শিখেছিস দেখা।'

লাবণি বলে—'আমি এখনও ভালো শিখিনি দাদু, ভালো শিখলে তোমাকে দেখাব।'

বেণীমাধব বলেন—'তোর মাস্টার ভালো শেখাতে পারে?'

লাবণি গদগদ হয়ে বলে—'খু-ব ভালো শেখাতে পারেন। এত ভালো যে—' লজ্জা পেয়ে সে অর্ধপথে থেমে যায়।

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'কত বয়স মাস্টারের?'

'তা কি জানি! হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। যাই, মা ডাকছে।' লাবণি তাড়াতাড়ি চলে যায়।

সূর্যাস্তের পর বেণীমাধব খোলা ছাদে অনেকক্ষণ পায়চারি করেন। ইচ্ছে হয়, রবীন্দ্র সরোবরে গিয়ে লোকজনের মধ্যে খানিক বেড়িয়ে আসেন; কিন্তু তিনতলা সিঁড়ি ভাঙা তাঁর পক্ষে কষ্টকর, তাই ছাদে বেড়িয়েই তাঁর ব্যায়াম সম্পন্ন হয়।

রাত্রি ন'টার সময় আহার সমাপন করে তিনি শয়ন করেন। এই তাঁর দিনচর্যা। মেঘরাজ হামেহাল তাঁর কাছে হাজির থাকে; কখনও ঘরের মধ্যে, কখনও দোরের বাইরে। তিনি শয়ন করলে মেঘরাজ নিচে গিয়ে আহার সেরে আসে; বেণীমাধবের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার বাইরে আগড় হয়ে বিছানা পেতে শোয়।

এইভাবে দিন কাটছে। একদিন এক অধ্যাপক বন্ধুকে টেলিফোন করে বেণীমাধবের মুখ গম্ভীর হল। টেলিফোন রেখে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'তুমি নিচে গিয়ে মকরন্দকে ডেকে আনো।'

কয়েক মিনিট পরে মকরন্দ এসে দাঁড়াল। চাকরের মুখে তলব পেয়ে সে খুশি হয়নি, অপ্রসন্ন মুখে প্রশ্ন নিয়ে পিতামহের মুখের পানে চাইল। বেণীমাধব কিছুক্ষণ তার উসকোখুসকো চেহারার পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর জিগ্যেস করলেন—'তুমি কলেজে ঢুকেছ, লেখাপড়া কেমন হচ্ছে?'

মকরন্দর মুখ ভ্রূকুটি-গভীর হল—'হচ্ছে একরকম।'

বেণীমাধব বললেন—'শুনলাম, তুমি ক্লাসে যাও না, দল পাকিয়ে পলিটিক্স করে বেড়াও, এ-কথা সত্যি?'

উদ্ধত স্বরে মকরন্দ বলল—'কে বলেছে?'

বেণীমাধব কড়া সুরে বললেন—'কে বলেছে সে-কথায় তোমার দরকার নেই। কথাটা সত্যি কি না?'

'হ্যাঁ সত্যি।' মকরন্দ চোখ লাল করে ঠাকুরদার পানে চেয়ে রইল।

'বটে!' বেণীমাধবের চোখেও রাগের ফুলকি ছিটকে পড়ল—'তুমি বেয়াদবি করতে শিখেছ! মেঘরাজ!'

মেঘরাজ দোরের বাইরে ছিল, ঘরে ঢুকল। বেণীমাধব আঙুল দেখিয়ে বললেন—'এই ছোঁড়ার কান ধরে গালে একটা থাবড়া মারো, তারপর ঘাড় ধরে বার করে দাও।'

মেঘরাজ সিপাহী ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করবার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে-খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা চাপা রইল না। অজয় আর আরতি ছুটে এসে বেণীমাধবের কাছে ক্ষমা চাইল। বেণীমাধব গম্ভীর হয়ে রইলেন, শেষে বললেন—'বংশে একটা মাত্র ছেলে, সে বেল্লিক-বেয়াদব হয়ে উঠেছে। দোষ তোমাদের, তোমরা ছেলে-শাসন করতে জানো না।'

ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়াল না।

তারপর একদিন বিকেলবেলা সনৎ এল মামার সঙ্গে দেখা করতে। সনৎ আর নিখিল মাঝে-মাঝে এসে মামার কাছে বসে, সসম্ভ্রমে মামার কুশল প্রশ্ন করে চলে যায়। আজ সনৎ তার ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, বলল—'মামা, আপনার একটা ছবি তুলব।'

বেণীমাধব হেসে বললেন—'আমি বুড়োমানুষ, আমার ছবি তুলে কী হবে!'

সনৎ বলল—'আমার অ্যালবামে রাখব।'

'কিন্তু এখন আলো কমে গেছে, এ-আলোতে ছবি তোলা যাবে?'

'যাবে। আমি ফ্ল্যাশ বালব এনেছি।'

'বেশ, তোলো।' বেণীমাধব একটি হেলান দেওয়া চেয়ারে বসলেন।

সনৎ ছবি তোলার উপক্রম করছে এমনসময় নিখিল এসে দাঁড়াল। সনৎ এদিক-ওদিক ঘুরে শেষে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি তুলল; বালবটা একবার জ্বলে উঠেই নিভে গেল। নিখিল বলল—'সনৎদা, ছবি তৈরি হলে আমাকে একখানা দিও, আমি কাগজে ছাপব। মামা কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন, কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে আছেন, খবরটা প্রকাশ করা দরকার।'

বেণীমাধব মনে-মনে ভাগনেদের ওপর খুশি হলেন।

পরদিন সনৎ ছবি এনে বেণীমাধবকে দেখাল। ছবিটি ভালো হয়েছে; বেণীমাধবের জরাক্রান্ত মুখ শিল্পীর নৈপুণ্যে শান্ত কোমল ভাব ধারণ করেছে। সনৎ যে কৌশলী শিল্পী, তাতে সন্দেহ নেই।

বেণীমাধব বললেন—'বেশ হয়েছে। এটাকে বাঁধিয়ে কোথাও টাঙিয়ে রাখলেই হবে।'

সনৎ বলল—'আমি এনলার্জ করে ফ্রেমে বাঁধিয়ে এনে দেব। নিখিলকে এক কপি দিয়েছি, সে কাগজে ছাপবে।'

অতঃপর বেণীমাধবের কর্মহীন মন্থর দিনগুলি কাটছে। সনৎ বড় ছবি ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঘরের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। কাগজে তাঁর ছবি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বেরিয়েছে। এরকম অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মানুষ শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করে। কিন্তু বেণীমাধবের মনে শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আসছে না। ছেলে ও মেয়ের পরিবারের সঙ্গে একটানা সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করতে পারছেন না। পারিবারিক জীবনের স্বাদ ভুলে গিয়ে যাঁরা দীর্ঘকাল একলা পথে চলেছেন তাঁদের বোধহয় এমনিই হয়।

ওদিকে ছেলে এবং মেয়ের পরিবারেও সুখ নেই। গায়ত্রীর মেজাজ সর্বদাই তিরিক্ষি হয়ে থাকে। গঙ্গাধর সারাদিন বসে একা-একা তাস খেলে, সলিটেয়ার খেলা; সন্ধের সময় চুপিচুপি বেরিয়ে যায়, আবার বেশি রাত্রি হওয়ার আগেই ফিরে আসে। অজয় ক্লাবে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত আড্ডা জমাত কিংবা রিহার্সেল দিত; এটা ছিল তার জীবনের প্রধান বিলাস। এখন তাকে রাত্রি ন'টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হয়, কারণ কর্তার হুকুম—ন'টার পর সদর দরজা খোলা থাকবে না। ন'টার পর বাড়ি ফিরে দোর-ঠেলাঠেলি করলে তেতলায় শব্দ যাবে, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সকলেরই একটা চোখ এবং একটা কান তেতলার দিকে সতর্ক হয়ে থাকে। আরতি যদিও সর্বদাই শ্বশুরকে খুশি করবার চেষ্টা করছে, তবু নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

নিশ্চিন্ত আছে কেবল দোতলায় দুটি মেয়ে, লাবণি আর ঝিল্লী এবং নিচের তলায় সনৎ ও নিখিল। ঝিল্লী আর লাবণির বয়স মাত্র আঠারো, বিষয়বুদ্ধি এখানো পরিপক্ক হয়নি। সনৎ আর

নিখিলের বেলায় পরিস্থিতি অন্যরকম; মামা তাদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন বটে, কিন্তু তারা মামার কাছে অর্থ-প্রত্যাশী নয়। সনতের গোপন নৈশাভিসারের কথা বেণীমাধব জানতে পারবেন এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। নিখিলের ওসব দোষ নেই, উপরন্তু কয়েক মাস থেকে সে এক নতুন ব্যাপারে মশগুল হয়ে আছে।

বেণীমাধব কলকাতায় এসে বসবার আগে একদিন নিখিল হঠাৎ ডাকে একটা চিঠি পেল, খামের চিঠি। তাকে চিঠি লেখবার লোক কেউ নেই, সে একটু আশ্চর্য হয়ে চিঠি খুলল। একপাতা কাগজের ওপর দু-ছত্র লেখা আছে—

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালোবাসি।

চিঠির নিচে লেখিকার নাম নেই।

নিখিল কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে রইল। তারপর তার মুখে গদগদ হাসি ফুটে উঠল। একটা মেয়ে তাকে ভালোবাসে! বা রে! ভারি মজা তো!

কিন্তু কে মেয়েটা?

নিখিল খামের ওপর পোস্ট অফিসের সীলমোহর পরীক্ষা করল; সীলমোহরের ছাপ জেবড়ে গেছে, তবু কলকাতায় চিঠি ডাকে দেওয়া হয়েছে এটুকু বোঝা যায়। কলকাতার মেয়ে। কে হতে পারে? চিঠিই বা লিখল কেন? ভালোবাসা জানাবার আরও তো অনেক সোজা উপায় আছে। মুখে বলতে লজ্জা হয়েছে, তাই চিঠি। কিন্তু নিজের নাম লেখেনি কেন?

নিখিল অনেক মেয়েকে চেনে। তার অফিসেই তো গোটা দশেক আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে। তা ছাড়া বন্ধুবান্ধবের বোনেরা আছে। মেয়েরা তার চটুল রঙ্গপ্রিয় স্বভাবের জন্যে তার প্রতি অনুরক্ত, তাকে দেখলেই তাদের মুখে হাসি ফোটে। কিন্তু কেউ তাকে চুপিচুপি ভালোবাসে বলেও তো মনে হয় না। আর এত লজ্জাবতীও কেউ নয়।

হাতে চিঠি নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এইসব ভাবছে এমনসময় পিছন দিক থেকে লাবণির গলা শুনতে পেল—'কী নিখিল কাকা, কার চিঠি পড়ছ?'

নিখিল ফিরে দাঁড়াল। ঝিল্লী আর লাবণি কখন দোতলা থেকে নেমে এসেছে; তাদের হাতে কয়েকখানা বই। তারা একসঙ্গে লাইব্রেরিতে যায় বই বদল করতে।

নিখিল হাত উঁচুতে তুলে চিঠি নাড়তে-নাড়তে বলল—'কার চিঠি! একটি যুবতী আমাকে চিঠি লিখেছে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল।

লাবণি বলল—'যুবতী লিখেছে! কী লিখেছে!'

নিখিল বলল—'হুঁ-হুঁ, দারুণ ব্যাপার, গুরুতর ব্যাপার। লিখেছে সে আমাকে ভালোবাসে।'

লাবণি আর ঝিল্লী অবাক হয়ে পরস্পরের পানে তাকাল, তারপর হেসে উঠল। লাবণি বলল—'কেন গুল মারছ নিখিল কাকা। তোমাকে আবার কোন যুবতী ভালোবাসবে?'

নিখিল চোখ পাকিয়ে বলল—'কেন, আমাকে কোনও যুবতী ভালোবাসতে পারে না! দেখেছিস আমার চেহারাখানা।'

'দেখেছি। এখন বলো, কার চিঠি।'

'বললাম না যুবতীর চিঠি!'

ঝিল্লী প্রশ্ন করল—'যুবতীর নাম কী?'

নিখিল মাথা চুলকে বলল—'নাম! জানি না। চিঠিতে নাম নেই।'

ঝিল্লী আর লাবণি আবার হেসে উঠল। লাবণি বলল—'তোমার একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় পাওনাদারের চিঠি।'

'পাওনাদারের চিঠি। তবে এই দ্যাখ।' নিখিল চিঠিখানা তাদের নাকের সামনে ধরল।

দুজনে চিঠি পড়ল। লাবণি বলল—'হুঁ। কিন্তু চিঠি পড়েও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, একটা মেয়ে তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। আমার মনে হয়, কেউ তোমার ঠ্যাং ধরে টেনেছে, মানে লেগ-পুলিং।'

নিখিল একটু গরম হয়ে বলল—'যা-যা, তোরা এসব কী বুঝবি! এসব গভীর ব্যাপার। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, শুনেছিস কখনও?'

'শুনেছি।' ঝিল্লী আর লাবণি মুখ টিপে হাসতে-হাসতে চলে গেল।

এরপর থেকে যখনই কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, নিখিল উৎসুক চোখে তার পানে তাকায় কিন্তু কোনও সাড়া পায় না। তার মন আরও ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কে মেয়েটা? নিশ্চয় তার পরিচিত। তবে এমন লুকোচুরি খেলছে কেন?

মাসখানেক পরে দ্বিতীয় চিঠি এল। এবার একটু বড়।

আমি একটি মেয়ে। তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না?

চিঠি পেয়ে নিখিলের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। লাবণি আর ঝিল্লী হাতের কাছে নেই, কিন্তু কাউকে না বলেও থাকা যায় না, তাই সে ঝোঁকের মাথায় সনতের ঘরে গেল।

সনতের ঘরটি বেশ বড়; এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চিত আছে। একপাশে খাটের ওপর পুরু গদির বিছানা পাতা; খাটের শিথানের কাঠের ওপর বিচিত্র জাফরির কারুকার্য। ঘরের অন্য পাশে জানলার সামনে দেরাজযুক্ত টেবিল, তার ওপর ফটোগ্রাফির নানা সরঞ্জাম সাজানো; তিনটি হাতে-তোলা ক্যামেরা, তার মধ্যে একটি সিনে-ক্যামেরা। ঘরে একটি আয়নার কবাটযুক্ত আলমারিও আছে। ঘরটি ছিমছাম ফিটফাট, দেখে বোঝা যায়, সনৎ গোছালো এবং শৌখিন মানুষ।

নিখিল যখন ঘরে ঢুকল তখন সনৎ টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে একটা ক্যামেরার যন্ত্রপাতি খুলে পরীক্ষা করছিল, চোখ তুলে চেয়ে আবার কাজে মন দিল। নিখিল গম্ভীর মুখে বলল—'সনৎদা, গুরুতর ব্যাপার।'

সনৎ একবার চকিতে চোখ তুলল, বলল—'তোমার জীবনে গুরুতর ব্যাপার কী ঘটতে পারে! আমাশা হয়েছে?'

নিখিল বলল—'আমাশা নয়, একটা মেয়ে আমার প্রেমে পড়েছে।'

এবার সনৎ বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। শেষে বলল—'আমাশা নয়, দেখছি তোমার মাথার ব্যারাম হয়েছে। বাংলাদেশে এমন মেয়ে নেই যে তোমার প্রেমে পড়বে।'

নিখিল বলল—'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখো চিঠি। মাসখানেক আগে আর একটা পেয়েছি।'

চিঠি নিয়ে সনৎ একবার চোখ বুলিয়ে ফেরত দিল, প্রশ্ন করল—'মেয়েটাকে চেনো না?'

'না, সেই তো হয়েছে মুশকিল।'

সনৎ একটু চুপ করে রইল, তারপর বলল—'বুঝেছি। তোমার চেনা-শোনার মধ্যে কোনও কালো কুচ্ছিত মেয়ে আছে?'

নিখিল হেসে বলল—'বেশির ভাগই কালো-কুচ্ছিত সনৎদা।'

সনৎ বলল—'তা হলে ওই কালো-কুচ্ছিত মেয়েদের মধ্যেই একজন বেনামী চিঠি লিখে রহস্য সৃষ্টি করছে। তোমাকে তাতাবার চেষ্টা করছে। তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে ওদের এড়িয়ে চলবে।'

কিন্তু এড়িয়ে চলার ক্ষমতা নিখিলের নেই। তা ছাড়া কালো-কুচ্ছিত মেয়ের প্রতি তার বিরাগ

নেই। তার বিশ্বাস কালো-কুচ্ছিত মেয়েরা ভালো বউ হয়। সে চতুর্গুণ আগ্রহে অনামা প্রেমিকাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর বেণীমাধব এলেন, বাড়ির আবহাওয়া বদলে গেল। কিন্তু নিখিলের কাছে নিয়মিত চিঠি আসতে লাগল। তৃতীয় চিঠিতে লেখা হয়েছে—

আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে চিনতে পারলে না? আমি কিন্তু সুন্দর মেয়ে নই।

নিখিল ভাবল, সনৎদা ঠিক ধরেছে। কিন্তু সে দমল না। তার জীবনে এক অভাবিত রোমান্স এসেছে; একে তুচ্ছ করার সাধ্য তার নেই।

ওদিকে বেণীমাধব হপ্তা তিনেক পুত্রবধূর হাতের রান্না খেয়ে বেশ ভালোই রইলেন। তারপর একদা গভীর রাত্রে ওঁর ঘুম ভেঙে গেল; পেটে দারুণ যন্ত্রণা। যাতনায় ছটফট করতে-করতে মেঘরাজকে ডাকলেন। বেণীমাধব দু-হাতে পেট চেপে ধরে বসেছিলেন, বললেন—'মেঘরাজ, শিগগির ডাক্তার সেনকে ফোন করো, বলো, আমি পেটের যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি, এখনই যেন আসেন।'

মেঘরাজ ফোন করল, আধঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে চিকিৎসা আরম্ভ করলেন। পেটের প্রদাহ কিন্তু সহজে উপশম হল না; রাত্রি পাঁচটা পর্যন্ত ধস্তাধস্তির পর ব্যথা শান্ত হল। বেণীমাধব নির্জীব দেহে বিছানায় শুয়ে বিস্ফারিত চোখে ডাক্তারের পানে চাইলেন —'ডাক্তার, কেন এমন হল বলতে পারো?'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে ক্ষণেক চুপ মেরে রইলেন, তারপর অনিচ্ছাভরে বললেন—'নিঃসংশয়ে বলা শক্ত। অ্যালারজি হতে পারে, শূল ব্যথা হতে পারে, কিংবা—'

'কিংবা—?'

'কিংবা বিষের ক্রিয়া। —আমি বলি কি, আপনি কিছুদিন আমার নার্সিংহোমে থাকবেন চলুন। চিকিৎসা-পথ্য দুই-ই হবে।'

বেণীমাধবের কিন্তু নার্সিংহোমে বিশ্বাস নেই; তাঁর ধারণা, যারা একবার নার্সিংহোমে ঢুকেছে তারা আর ফিরে আসে না। তিনি যথাসম্ভব দৃঢ়স্বরে বললেন—'না ডাক্তার, আমি বাড়িতেই থাকব।'

ডাক্তার উঠলেন—'আচ্ছা, এখন চলি। যদি আবার কোনও গণ্ডগোল হয় তৎক্ষণাৎ খবর দেবেন। কাল আর পরশু স্রেফ দই খেয়ে থাকবেন।'

মেঘরাজ ডাক্তারের সঙ্গে নিচে পর্যন্ত গিয়ে সদর দরজা খুলে দিল, ডাক্তার চলে গেলেন। মেঘরাজ দরজা বন্ধ করে আবার ওপরে উঠে এল। বাড়ির অন্য মানুষগুলো তখনও ঘুমোচ্ছে, ডাক্তারের আসা-যাওয়া জানতে পারল না।

বিছানায় শুয়ে বেণীমাধব তখন শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে চিন্তা করছিলেন। দুরূহ, দুর্গম চিন্তা। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতি। একবার নয়, দু-দুবার এই ব্যাপার হল... ছেলে আর মেয়ে অপেক্ষা করে আছে আমি কবে মরব... আমি মরছি না দেখে অধীর হয়ে উঠেছে। কিন্তু ছেলে-মেয়ে-জামাই-পুত্রবধূ এমন কাজ করতে পারে? কেন করবে না, সংসারে টাকাই খাঁটি জিনিস, আর যা-কিছু সব ভুয়ো। ডাক্তারের মনেও সন্দেহ ঢুকেছে...।

সকাল সাতটার সময় বেণীমাধব বিছানায় উঠে বসলেন, মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিল। তারপর তিনি তার হাতে টাকা দিয়ে বললেন—'যাও, বাজার থেকে দই কিনে নিয়ে এসো। এক সের ভালো দই।'

টাকা নিয়ে মেঘরাজ চলে গেল। সে সৈনিক, হুকুম তামিল করে, কথা বলে না। তার মুখ দেখেও কিছু বোঝা যায় না।

সাড়ে সাতটার সময় আরতি এল, তার সঙ্গে ঝি ট্রে-র ওপর চা ও প্রাতরাশ নিয়ে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই আরতি চমকে উঠল; বেণীমাধব বিছানায় বসে একদৃষ্টে তার পানে চেয়ে আছেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলল—'বাবা—।'

বেণীমাধব ধীর স্বরে বললেন—'বউমা, খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আজ থেকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি নিজেই করব।'

আরতির মুখে ভয়ের ছায়া পড়ল—'কেন বাবা?'

বেণীমাধব গত রাত্রির ঘটনা বললেন। আরতি শুনে মুখ কালি করে চলে গেল।

কথাটা ঝিয়ের মুখে অচিরাৎ প্রচারিত হল। শুনে গায়ত্রী ছুটতে-ছুটতে বাপের কাছে এল —'বাবা, বউদির রান্না তোমার সহ্য হবে না আমি জানতুম। আজ থেকে আমি আবার রাঁধব।'

বেণীমাধব মেয়েকে আপাদমস্তক দেখে কড়া সুরে বললেন—'না—।'

বেলা তিনটের সময় তিনি কর্তব্য স্থির করে বিছানায় উঠে বসে ডাকলেন—'মেঘরাজ!'

মেঘরাজ এসে দাঁড়াল—'জি।'

বেণীমাধব প্রশ্ন করলেন—'তোমার বউ আছে?'

মেঘরাজ ভ্রূ তুলে খানিক চেয়ে রইল, যেন প্রশ্নের তাৎপর্য বোঝবার চেষ্টা করছে—'জি, আছে।'

'ছেলেপুলে?'

'জি, না।'

'স্ত্রী নিশ্চয় রসুই করতে জানে?'

'জি, জানে।'

'বেশ। এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো। নিচের তলায় খালি ঘর আছে, তার একটাতে তোমরা থাকবে। তোমার ঔরৎ আমার রসুই করবে। আমি তোমার মাইনে ডবল করে দিলাম। তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লি চলে যাও, বউকে নিয়ে যত শিগগির পার ফিরে আসবে; প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেব। কেমন?'

'জি।'

'বেশ; নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু তুমি যতদিন ফিরে না আসছ ততদিনের জন্যে আমার রসদ দরকার। এই নাও টাকা, বাজারে গিয়ে আরও সের দুই দই, কড়াপাকের সন্দেশ, গোটা দুই বড় পাঁউরুটি, মাখন, মারমালেড, টিনের দুধ, আঙুর, আপেল—এইসব কিনে নিয়ে এসো, ফ্রিজে থাকবে। তুমি বাজারে যাও, আমি ইতিমধ্যে টেলিফোনে তোমার এয়ার-টিকিটের ব্যবস্থা করছি—।'

পরদিন মেঘরাজ চলে গেল। বেণীমাধব একলা রইলেন। দই এবং অন্যান্য সাত্ত্বিক আহারের ফলে দু-তিনদিনের মধ্যেই তাঁর পেট সুস্থ হল। তিনি অবসর বিনোদনের জন্য ডাক্তার সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে টেলিফোনে গল্প করেন। ঘরের মধ্যে কারুর যাওয়া-আসা নেই। দরজা সর্বদা বন্ধ থাকে।

চতুর্থ দিনে মেঘরাজ ফিরে এল। সঙ্গে বউ।

বউ-এর পরনে রঙিন শাড়ি, মুখে ঘোমটা। মেঘরাজ বেণীমাধবের ঘরে গিয়ে বউ-এর মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে দিল। বেণীমাধব দেখলেন, একটি মিষ্টি হাসি-হাসি মুখ। রঙ ময়লা, কাজল-পরা চোখে যৌবনের মাদকতা। মেঘরাজের অনুপাতে বয়স অনেক কম, কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। বউ দু-হাত দিয়ে বেণীমাধবের পা ছুঁয়ে নিজের মাথায় ঠেকাল।

বেণীমাধব প্রসন্ন হয়ে বললেন—'বেশ-বেশ। কী নাম তোমার?'

বউ বলল—'মেদিনী।'

অতঃপর বেণীমাধবের স্বাধীন সংসারযাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল। নিচের তলায় কোণের একটা ঘরে মেঘরাজ ও মেদিনীর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। তেতলায় একটা ঘর রান্নাঘরে পরিণত হয়েছে, বাসন-কোসন এসেছে; সকালবেলা মেদিনী নিচের ঘর থেকে ওপরে উঠে এসে বেণীমাধবের চা টোস্ট তৈরি করে দেয়। ইতিমধ্যে মেঘরাজ গড়িয়াহাট থেকে বাজার করে আনে। রান্না আরম্ভ হয়; তিনজনের রান্না। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মেদিনী নিচে নিজের ঘরে চলে যায়, মেঘরাজ ওপরে পাহারায় থাকে। বিকেলবেলা থেকে আবার চা ও রান্নার পর্ব আরম্ভ হয়; রাত্রি আটটার সময় সকলের নৈশাহার শেষ হলে মেদিনী রাত্রির মতো নিচে চলে যায়; বেণীমাধব তুষ্ট মনে শয্যা আশ্রয় করেন, মেঘরাজ দরজা ভেজিয়ে দিয়ে দরজার সামনে নিজের বিছানা পাতে।

এই হল তাদের দিনচর্যা।

মেদিনীর দুপুরবেলা কোনও কাজ নেই, সেই অবসরে সে বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট; বিশেষত পুরুষেরা। তার আচরণে শালীনতা আছে, সংকোচ নেই; তার কথায় সরসতা আছে, প্রগলভতা নেই। সকলেই তার কাছে স্বচ্ছন্দতা অনুভব করে। সে আসার পর থেকে বাড়িতে যেন নতুন সজীবতা দেখা দিয়েছে। গায়ত্রী এবং আরতির মন আগে থাকতে মেদিনীর প্রতি বিমুখ ছিল, কিন্তু ক্রমশ তাদের বিমুখতা অনেকটা দূর হয়েছে। কেবল মকরন্দ মেদিনীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন; মেদিনীর যখন অবসর মকরন্দ তখন বাড়িতে থাকে না।

বাড়িতে আস্তে-আস্তে সহজ ভাব ফিরে এল। বেণীমাধব এখন নিজেকে অনেকটা নিরাপদ বোধ করছেন। তবু তাঁর মনের ওপর যে-ধাক্কা লেগেছে, তার জের এখনও কাটেনি। গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে তিনি ভাবেন—আমার নিজের ছেলে, নিজের মেয়ে আমার মৃত্যু কামনা করে! এ কী সম্ভব, না আমার অলীক সন্দেহ? অনেকক্ষণ জেগে থেকে তিনি নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠেন, নিঃশব্দে ভেজানো দরজা একটু ফাঁক করে দেখেন, বাইরে মেঘরাজ দরজা আগলে ঘুমোচ্ছে। আশ্বস্ত মনে তিনি বিছানায় ফিরে যান।

মেদিনী আসার পর আর-একটা সুবিধা হয়েছে। কলকাতার রেওয়াজ অনুযায়ী সদর দরজা সবসময়েই বন্ধ থাকে, কেবল যাতায়াতের সময় খোলা হয়। আগে বাইরে থেকে কেউ এলে দোর-ঠেলাঠেলি, হাঁকাহাকি করতে হত, এখন তা করতে হয় না। মেদিনীর ঘর সদর দরজার ঠিক পাশেই, রাত্রিবেলা বাইরে থেকে কেউ দরজায় টোকা দিলেই মেদিনী এসে দরজা খুলে দেয়।

মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—হ্রদের প্রসন্ন উপরিভাগ দেখে বোঝা যায় না তার গভীর তলদেশে হিংস্র জলজন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাসখানেক কাটল। ইতিমধ্যে বাড়িতে ছোটখাটো কয়েকটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য—।

নিখিল আবার অদৃশ্য নায়িকার চিঠি পেয়েছে—।

আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি হাসতে জানো, হাসাতে জান। আমাদের বাড়িতে কেউ হাসে না। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

চিঠি পেয়ে নিখিল আহ্লাদে প্রায় দড়ি-ছেঁড়া হয়ে উঠল; চিঠি হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নিজের ঘরে পাগলের মতো দাপাদাপি করল, তারপর সনতের ঘরে গেল। নিখিলের ঘরটা আকারে-প্রকারে সনতের অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত অগোছালো। তক্তপোশের ওপর বিছানাটা তাল পাকিয়ে আছে, টেবিলের ওপর ধুলোর পুরু প্রলেপ। দেখে বোঝা যায়—এ-ঘরে গৃহিণীর করস্পর্শের প্রয়োজন আছে।

সনৎ তখন ক্যামেরা নিয়ে বেরুচ্ছিল। নিখিল বলল—'এ কী সনৎদা, সজ্জিত-গুজ্জিত হয়ে চলেছ কোথায়?'

সনৎ বলল—'গ্র্যান্ড হোটেলে পার্টি আছে। হাতে ওটা কী?'

নিখিল চিঠি তুলে ধরে বলল—'আবার চিঠি পেয়েছি, পড়ে দ্যাখো। এ-মেয়ে কালো-কুচ্ছিত হোক, কানা-খোঁড়া হোক, একেই আমি বিয়ে করব।'

সনৎ চিঠি পড়ে বলল—'হুঁ, কানা-খোঁড়াই মনে হচ্ছে। তা বিয়ে করতে চাও করো না, কে তোমাকে আটকাচ্ছে। কিন্তু তার আগে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতে হবে তো!'

সনৎ নিজের ঘরে তালা বন্ধ করল। মেঘরাজের ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল মেদিনী ঘরে রয়েছে। সনৎ একবার দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে। একটা পার্টিতে ফটো তুলতে যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই। আমি দোরে টোকা দিলে দোর খুলে দিয়ো।'

মেদিনী নিজের দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন বাংলা ভাষা বেশ বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না। চোখ নিচু করে সে নম্রস্বরে বলল—'জি।'

সনৎ বেরিয়ে যাওয়ার পর নিখিল মেদিনীর কাছে এসে দাঁড়াল, বলল—'মেদিনী, তুম জানতা হ্যায়, একঠো লেড়কি হামকো ভালোবাসামে গির গিয়া। হাম উসকে শাদি করেগা।'

মেদিনীর চোখে কৌতুক নেচে উঠল, সে আঁচল দিয়ে হাসি চাপা দিতে-দিতে দোর ভেজিয়ে দিল।

মেদিনী আসার পর থেকে গঙ্গাধরের চিত্ত চঞ্চল হয়েছে। বয়সটা খারাপ; যৌবন বিদায় নেওয়ার আগে মরণ-কামড় দিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাধর যখন বিকেলবেলা বাইরে যায় তখন মেদিনীর দোরের দিকে তাকাতে-তাকাতে যায়, কদাচ মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নেয় না, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; মেদিনী চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চোখ নিচু করে তার দৃষ্টিপ্রসাদ গ্রহণ করে। পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টিতে সে অভ্যস্ত।

অজয়ের ভাবভঙ্গি একটু অন্যরকম। সে যেন মেদিনীকে দেখে বাৎসল্য স্নেহ অনুভব করে; তার সঙ্গে পাটিচাটি গল্প করে, তার দেশের খবর নেয়। মেদিনী সরলভাবে কথা বলে, মনে-মনে হাসে।

মকরন্দ প্রথমদিকে কিছুদিন মেদিনীকে দেখেনি। একবার তিন-চারদিন সে বাড়ি ফিরল না; জানা গেল পুলিশ-ভ্যান লক্ষ্য করে ইট ছোড়ার জন্যে পুলিশে ধরে দিয়ে গেছে। চতুর্থ দিন সে মুক্তি পেয়ে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় এসে বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা দিল। মেদিনী গিয়ে দোর খুলল। মকরন্দর চেহারা শুকনো, জামা ছেঁড়া, চুল উসকোখুসকো; সে তীব্রদৃষ্টিতে মেদিনীর পানে চেয়ে রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করল—'তুমি কে?'

'আমি মেদিনী।'

'অ—মেঘরাজের বউ।' কুটিলভাবে মুখ বিকৃত করে সে মেদিনীকে আপাদমস্তক দেখল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল। মেদিনী জানত মকরন্দ কে, সে মুখ টিপে হেসে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

তিনমাস কেটে যাবার পরও যখন বেণীমাধবের পেটের আর কোনও গণ্ডগোল হল না, তখন তিনি নিঃসংশয়ে বুঝলেন, তাঁর পেটের কোনও দোষ নেই, হজম করার শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। পুত্রবধূ এবং মেয়ের প্রতি তাঁর সন্দেহ নিশ্চয়তায় পরিণত হল। তারপর একদা গভীর রাত্রে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। কে যেন ছুরি দিয়ে পোঁচিয়ে-পোঁচিয়ে তাঁর গলা কাটছে।

তারপর তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। বাকি রাত্রিটা চিন্তা করে কাটালেন। মৃত্যুভয়-জড়িত ঐহিক চিন্তা।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় তিনি তাঁর সলিসিটারকে টেলিফোন করলেন—'সুধাংশুবাবু, আমি উইল করতে চাই। বেশি নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই, আপনি একবার আসবেন?'

বেণীমাধব পুরনো মক্কেল, মালদার লোক। সুধাংশুবাবু বললেন—'বিকেলবেলা যাব।'

বিকেলবেলা সুধাংশুবাবু এলেন। দোর বন্ধ করে দুজনে প্রায় দেড় ঘণ্টা উইলের শর্তাদি

আলোচনা করলেন; সুধাংশুবাবু অনেক নোট করলেন। শেষে বললেন—'পরশু আমি উইল তৈরি করে নিয়ে আসব, আপনি উইল পড়ে দস্তখত করে দেবেন। দুজন সাক্ষীও আমি সঙ্গে আনব—।'

সন্ধের পর সনৎ আর নিখিল বেণীমাধবের কাছে এসে বসল, কুশল প্রশ্ন করল। মেদিনী পাশের ঘরে রান্না করছিল; বেণীমাধব ভাগনেদের চা ও আলুভাজা খাওয়ালেন।

ওরা চলে যাবার পর বেণীমাধব মেঘরাজকে ডেকে বললেন—'দোতলা থেকে সকলকে ডেকে নিয়ে এসো।'

দোতলায় মকরন্দ ছাড়া আর সকলেই ছিল, সমন পেয়ে ছুটে এল। ঝিল্লী আর লাবণিও এল। বেণীমাধব খাটের ধারে বসেছিলেন, দুই নাতনীকে ডেকে নিজের দু-পাশে বসালেন, তারপর ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই-এর পানে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন—'আমি উইল করতে দিয়েছি। উইলের ব্যবস্থা আগে থাকতে তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই।'

সকলে সশঙ্ক মুখে চেয়ে রইল। বেণীমাধব ধীরে-ধীরে বলতে লাগলেন—'আমার মৃত্যুর পর আমার নগদ সম্পত্তি তোমরা হাতে পাবে না। অ্যানুইটির ব্যবস্থা করেছি; তোমরা এখন যেমন মাসোহারা পাচ্ছ তেমনি পাবে। কোনও অবস্থাতেই যাতে তোমাদের অর্থকষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে মাসোহারার টাকার অঙ্ক ধার্য করেছি। বাড়িটা যতদিন তোমরা বেঁচে থাকবে ততদিন সমান ভাগ করে ভোগ করবে, বিক্রি করতে পারবে না।'

চারজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বেণীমাধব দুই নাতনীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—'ঝিল্লী আর লাবণির জন্যে আমি আগে থেকেই মেয়াদী বীমা করে রেখেছি, একুশ বছর বয়স পূর্ণ হলে ওরা প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। তা ছাড়া আমি ঠিক করেছি, ওদের বিয়ে দিয়ে যাব। তোমাদের মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না। লাবণির জন্যে একটি ভালো পাত্র আছে; ছেলেটি মিলিটারিতে লেফটেনেন্ট। ঝিল্লীর জন্যে মনের মতো পাত্র এখন পাইনি, পেলেই একসঙ্গে দুজনের বিয়ে দেব।' তাঁর মুখে একটু প্রসন্নতার ভাব এসেছিল, আবার তা মুছে গেল; তিনি ভ্রূকুটি করে বললেন—'মকরন্দকেও আলাদা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে বড় অসভ্য বেয়াদব হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে কিছু দেব না।'

বেণীমাধব চুপ করলেন, তাঁর শ্রোতারাও চুপ করে রইল; কারুর মুখে কথা নেই। শেষে গঙ্গাধর একটু কেশে অস্পষ্টভাবে বলল—'আপনার সম্পত্তি আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন, আমাদের বলবার কিছু নেই। তবে টাকার দর আজ একরকম কাল একরকম—'

গায়ত্রী স্বামীর কথায় বাধা দিয়ে ভারি গলায় বলল—'বাবা, তুমি যা দেবে তাই মাথা পেতে নেব। উইল কি সই হয়ে গেছে?'

বেণীমাধব কারুর দিকে তাকলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—'উকিলকে উইল তৈরি করতে দিয়েছি, কাল-পরশু সই-দস্তখত হবে। হ্যাঁ, একটা শর্তের কথা তোমাদের বলা হয়নি। উইলের শর্ত থাকবে, যদি আমার অপঘাত মৃত্যু হয় তা হলে তোমরা কেউ আমার একপয়সা পাবে না, সব সম্পত্তি পাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এই কথা শুনে সকলে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রি হল। যথাসময়ে বেণীমাধব নৈশাহার সম্পন্ন করে শয্যা নিলেন। মেঘরাজ ও মেদিনী পাশের ঘরে খাওয়াদাওয়া করল; মেঘরাজ সামনের দরজা ভেজিয়ে দরজা আগলে বিছানা পাতল, মেদিনী নিজের ঘরে গেল।

ওদিকে দোতলায় থমথমে ভাব। লাবণির নাচের মাস্টার এসেছিল, কিন্তু বাড়িতে কারুর নাচের প্রতি রুচি নেই। পরাগ আর লাবণি আড়ালে কথা বলল, তারপর চুপিচুপি নিঃশব্দে সিনেমা দেখতে চলে গেল। কেউ তাদের যাওয়া লক্ষ্য করল কি না সন্দেহ।

নিখিল সন্ধের পরই কাজে চলে গিয়েছিল; সে নিশাচর মানুষ, সারারাত কাজ করে, সকালবেলা ফিরে আসে।

রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় সনৎ ক্যামেরা নিয়ে বেরুল, মেদিনীর দোরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল—'মেদিনী, আমি বর্ধমানে যাচ্ছি, কাল সকালে সেখানে একটা নাচগানের মজলিশ আছে। কাল বিকেলের দিকে কোনও সময় ফিরব। আমার জন্যে আজ রাত্রে তোমাকে দোর খুলতে হবে না।' বলে একটু হাসল।

মেদিনী ক্ষণকাল তার চোখে চোখ রেখে বলল—'জি।'

সনৎ চলে গেল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকে মকরন্দ এল, মেদিনীকে কড়া সুরে বলল—'দোর বন্ধ করে দাও। রাত্রে কেউ যদি বাইরে থেকে এসে আমার খোঁজ করে, বলবে আমি বাড়ি নেই।' উত্তরের অপেক্ষা না করে সে ওপরে চলে গেল। মেদিনী সদর দরজায় খিল লাগাল।

তারপর বাড়ির ওপর রাত্রির রহস্যময় যবনিকা নেমে এল।

পরদিন ভোরবেলা মেদিনী সদর দরজা খুলতে গিয়ে দেখল, কবাট ভেজানো আছে কিন্তু খিল খোলা। সে ভুরু কুঁচকে একটু ভাবল, তারপর কবাট একটু ফাঁক করল; বাইরে নিখিলকে দেখা গেল, সে কাজ শেষ করে ফিরছে। মেদিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে বলল—'তোমরা কাম শুরু হুয়া, হামরা কাম শেষ হুয়া। এবার খুব ঘুমায়গা।'

নিখিল নিজের ঘরে চলে গেল। মেদিনী দরজা ফাঁক করে রাখল, কারণ দোতলায় ঝি কাজ করতে আসবে। তারপর সে কর্তার চা তৈরি করার জন্যে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় চলল।

মিনিটখানেক কাটতে না কাটতে তিনতলা থেকে স্ত্রীকণ্ঠের তীব্র আর্তনাদ এল, তারপর ধপ করে শব্দ। নিখিল তার ঘরে গায়ের জামা খুলে গেঞ্জি খোলবার উপক্রম করছিল, তীব্র চিৎকার শুনে সেই অবস্থাতেই ওপরে ছুটল। দোতলা থেকেও সকলে বেরিয়ে এসেছিল, সকলে প্রায় একসঙ্গে তেতলায় গিয়ে পৌঁছল। তারপর বেণীমাধবের দোরের সামনে ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মেঘরাজ বিছানার ওপর ঊর্ধ্বমুখে পড়ে আছে, তার গলা এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কাটা; বালিশ এবং বিছানার ওপর পুরু হয়ে রক্ত জমেছে। মেদিনী তার পায়ের দিকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ কারুর মুখ দিয়ে কথা সরল না, তারপর নিখিল চেঁচিয়ে উঠল—'মামা—মামা বেঁচে আছেন তো?'

গায়ত্রী, আরতি এবং ঝিল্লী কেঁদে উঠল, অজয় এবং গঙ্গাধর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল; কারুর যেন নড়বার শক্তি নেই। নিখিল তখন মেঘরাজকে ডিঙিয়ে বন্ধ দোরে ঠেলা দিল। দোর খুলে গেল; খোলা দোর দিয়ে দেখা গেল, বেণীমাধব খাটের ওপর শুয়ে আছেন, তাঁর গলার নিচে গাঢ় রক্তের চাপ জমা হয়ে আছে। মেঘরাজকে যেভাবে যে-অস্ত্র দিয়ে গলা কাটা হয়েছে, বেণীমাধবকে ঠিক সেইভাবে সেই অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

কান্নার একটা কলরোল উঠল। নিখিল ক্ষণিকের জন্য জড়বৎ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে ছুটে গিয়ে টেলিফোন তুলে নিল। প্রথমে নিজের সংবাদপত্রের অফিসে ফোন করল, তারপর থানায়।

তিন

ব্যোমকেশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখল, সদর দরজায় পুলিশ-পাহারা। কনস্টেবল ব্যোমকেশকে দেখে স্যালুট করল, বলল—'ইন্সপেক্টর সাহেব নিচের তলায় বসবার ঘরে আছেন।'

প্রশস্ত ড্রয়িংরুমে ইন্সপেক্টর রাখাল সরকার এবং দুজন সাব-ইন্সপেক্টর উপস্থিত ছিলেন; মধ্য টেবিল ঘিরে একটা ফাইল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। ব্যোমকেশ প্রবেশ করতেই রাখালবাবু তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, করুণ হেসে বললেন—'জড়িয়ে পড়েছি ব্যোমকেশদা। বেণীসংহার নামটা আপনি ঠিকই দিয়েছেন। বেণীসংহার শব্দের আসল মানে শুনেছি খোঁপা বাঁধা; মেয়েরা প্রথমে চুলের বিনুনি করে, তারপর বিনুনি জড়িয়ে খোঁপা বাঁধে। এ-ব্যাপারও অনেকটা সেইরকম; এমন জটিল কুটিল তার বাঁধুনি যে বেণীসংহার উন্মোচন করা দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। খুনের মোটিভ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সন্দেহভাজন লোকের সংখ্যাও পাঁচজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ; তবু ঠিক কোন লোকটি এ-কাজ করেছে তা ধরা যাচ্ছে না।'

'এসো, বসা যাক।' দুজনে দুটো চেয়ারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসলেন—'এবার বলো।'

রাখালবাবু কাল থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা ব্যোমকেশকে শোনালেন, প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়েও কয়েকটি তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যোমকেশ বলল—'মোটিভ কী?'

'বুড়োর অগাধ টাকা। ছেলে এবং মেয়েকে মাসোহারা দিত, কিন্তু তাতে তাদের মন উঠত না। ডাক্তার অবিনাশ যেন সন্দেহ করেন, মেয়ে এবং পুত্রবধূ বিষাক্ত খাবার খাইয়ে বুড়োকে মারবার চেষ্টা করছিল, তা যদি হয়, তা হলে ছেলে এবং জামাইয়ের মধ্যে ষড় আছে। যা দিনকাল পড়েছে, কিছুই অসম্ভব নয়।'

'মেঘরাজকে মারবার উদ্দেশ্য কী?'

'মেঘরাজ রাত্রে বেণীমাধবের দোরের সামনে বিছানা পেতে শুত। দোর ভেজানো থাকত, যাতে বেণীমাধব ডাকলেই সে ঘরে ঢুকতে পারে। সুতরাং তাকে বধ না করে ঘরে ঢোকা যায় না। তাকে ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকতে গেলে সে জেগে উঠবে। তাই তাকে আগে মারা দরকার হয়েছিল।'

'মারণাস্ত্রটা পাওয়া যায়নি?'

'না। তবে ময়না তদন্ত থেকে জানা গেছে যে, অস্ত্রটা খুব ধারালো ছিল। একই অস্ত্র দিয়ে দুজনকে মেরেছে। অস্ত্রের এক টানে গলা দু-ফাঁক হয়ে গেছে।'

'হত্যার সময়টা জানা গেছে?'

'স্থূলভাবে রাত্রি বারোটা থেকে তিনটের মধ্যে।'

'হুঁ। সন্দেহভাজন পাঁচজন কারা?'

'অজয় ও তার স্ত্রী আরতি, গায়ত্রী ও তার স্বামী গঙ্গাধর। এবং অজয়ের ছেলে মকরন্দ। মকরন্দকে মেঘরাজ একদিন বেণীমাধবের হুকুমে চড় মেরেছিল। ঝিল্লীকে বাদ দেওয়া যায়, সে ছেলেমানুষ, তার কোনও মোটিভ নেই।'

'মকরন্দ ছেলেটা করে কী?'

'পলিটিক্সের হুজুগ করে। কলেজে নাম লেখানো আছে, এই পর্যন্ত। সে রাত্রে আন্দাজ ন'টার সময় বাড়িতে এসেছিল, তারপর রাত্রেই কখন বেরিয়ে গেছে কেউ জানে না। সেই যে পালিয়েছে আর ফিরে আসেনি। তার নামে হুলিয়া জারি করেছি।'

'বাড়িতে এখন কে-কে আছে?'

'অজয়, আরতি, গঙ্গাধর, গায়ত্রী, ঝিল্লী, নিখিল, সনৎ, গাঙ্গুলি আর মেঘরাজের বিধবা মেদিনী। অজয়ের মেয়ে লাবণি সে-রাত্রে তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, আর ফিরে আসেনি। নিখিল আর সনৎ রাত্রে কাজে বেরিয়েছিল, তারা পরদিন ফিরে এসেছে। যারা বাড়িতে আছে তাদের বাইরে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

'সকলের আঙুলের ছাপ নিয়েছ নিশ্চয়।'

'তা নিয়েছি।'

'খানাতল্লাশ করে কিছু পেলে?'

'সন্দেহজনক কিছু পাইনি।'

'বেশ; এবার জবানবন্দির নথিটা দেখি।'

'এই যে।' রাখালবাবু টেবিল থেকে ফাইল তুলে নিয়ে ব্যোমকেশকে দিলেন। এইসময় সদর দরজার কনস্টেবল এসে জানাল যে, সলিসিটার সুধাংশু বাগচী নামে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। রাখালবাবু বললেন—'নিয়ে এসো।'

সুধাংশুবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, হাতে পাট-করা খবরের কাগজ। রাখালবাবুর পানে চেয়ে বললেন—'আমি বেণীমাধববাবুর সলিসিটার। আজ খবরের কাগজ খুলেই দেখলাম—।'

'বসুন।'

সুধাংশুবাবু একটি চেয়ারে বসলেন। রাখালবাবু তাঁর সামনে দাঁড়ালেন, ব্যোমকেশও এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'বেণীমাধববাবুর সঙ্গে কবে আপনার শেষ দেখা হয়েছিল?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'পরশু। আমরা অনেকদিন ধরে তাঁর বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করে আসছি। পরশু তিনি আমাকে ফোন করে জানালেন যে, তিনি উইল করতে চান। আমি বিকেলবেলা এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উইলে কী-কী শর্ত থাকবে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আমি উইল তৈরি করে আজ তাঁকে দলিল দেখিয়ে সহি-দস্তখত করিয়ে নেব বলে সব ঠিক করে রেখেছিলাম, তারপর আজ সকালে কাগজ খুলে এই সংবাদ পেলাম।'

রাখালবাবু চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চেয়ে বললেন—'উইলে কী-কী শর্ত আছে আমাদের বলতে বাধা আছে কি?'

সুধাংশুবাবু বললেন—'অন্যসময় নিশ্চয় বাধা থাকত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাধা নেই। বরং আপনাদের সুবিধা হতে পারে।'

তিনি উইলের শর্তগুলি শোনালেন; অপঘাতে মৃত্যু হলে সমস্ত সম্পত্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে সে-কথাও উল্লেখ করলেন।

বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি উঠলেন, বলে গেলেন—'যদি আমার কাছ থেকে আরও কিছু জানতে চান কিংবা উইল পড়ে দেখতে চান, আমার অফিসে খবর দেবেন।'

তিনি চলে যাবার পর রাখালবাবু বললেন—'মোটিভ আরও পাকা হল। বুড়োকে আর দু-দিন বাঁচতে দিলেই এতবড় সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যেত।'

ব্যোমকেশ বলল—'হুঁ। আমি এবার উঠব। কিন্তু আগে বেণীমাধবের ঘরটা দেখে যেতে চাই।'

'চলুন।'

দোতলার সিঁড়ির মাথায় একজন কনস্টেবল। তেতলায় বেণীমাধবের দরজায় তালা লাগানো, উপরন্তু একজন কনস্টেবল টুলে বসে পাহারা দিচ্ছে। মেঘরাজের রক্তাক্ত বিছানা পরীক্ষার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

রাখালবাবু পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুললেন, দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে খাটের ওপর বিছানা নেই, আর-সব যেমন ছিল তেমনি আছে। ব্যোমকেশ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে চোখ ফেরাল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলল—'তোমরা অবশ্য সবই দেখেছ, তবু—।'

রাখালবাবু ঘাড় নাড়লেন—'অধিকন্তু ন দোষায়।'

'লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় ছিল?'

'লোহার সিন্দুকের গায়ে লাগানো ছিল। সিন্দুকের মধ্যে তিনখানা একশো টাকার নোট ছিল, পাঁচ টাকা দশ টাকার নোট বা খুচরো টাকা-পয়সা একটাও ছিল না। মনে হয়, খুনি সিন্দুক খুলে টাকা-পয়সা নিয়েছে কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে নম্বরী নোট নেয়নি।'

'হুঁ। সিন্দুকে আর কী ছিল?'

'কিছু দলিলপত্র, কিছু রসিদ, ব্যাঙ্কের খাতা ও চেকবুক। দুটো ব্যাঙ্কে টাকা আছে, সাকুল্যে প্রায় চল্লিশ হাজার। তা ছাড়া শেয়ার সার্টিফিকেট ও fixed deposit আছে আন্দাজ এগারো লাখ টাকার। মালদার লোক ছিলেন। ছেলে আর মেয়েকে সাড়ে সাতশো টাকা হিসেবে মাসোহারা দিতেন। তাঁর নিজের খরচ ছিল সাতশো টাকা, মেঘরাজকে মাইনে দিতেন আড়াইশো টাকা। চেকবুকের counter foil থেকে এইসব খবর জানা যায়।'

'সিন্দুকের ভিতরে কি বাইরে বেণীমাধব ছাড়া অন্য কারুর আঙুলের ছাপ আছে?'

'কারুর আঙুলের ছাপ নেই, একেবারে লেপা-পোঁছা।'

'হুঁ, আততায়ী লোকটি বেশ হুঁশিয়ার।' ব্যোমকেশ সিন্দুক খুলল না, ফ্রিজের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—'ফ্রিজে কারুর আঙুলের ছাপ ছিল?'

'ছিল। বেণীমাধব, মেঘরাজ এবং মেদিনী—তিনজনের আঙুলের ছাপ ছিল। আর কারুর ছাপ পাওয়া যায়নি।'

হাতল ধরে ব্যোমকেশ ফ্রিজ খুলল, ভিতরে আলো জ্বলে উঠল; ফ্রিজ চালু আছে। ভিতরে নানা জাতের ফলমূল। সারি-সারি ডিম, মাছ, মাংস, দুধের বোতল রয়েছে। ব্যোমকেশ আবার দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরের পিছন দিকের দেওয়ালে একটা লম্বা ধরনের আয়না টাঙানো ছিল, তার নিচে তাকের ওপর চিরুনি, বুরুশ, চুলের তেল ও দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। দাড়ি কামাবার সরঞ্জামের বিশেষত্ব এই যে, ক্ষুরটা সেফটি রেজর নয়, সাবেক কালের ভাঁজ-করা লম্বা ক্ষুর। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে খাপসুদ্ধ ক্ষুর তুলে নিয়ে বলল—'ক্ষুরটা বের করে দেখেছ নাকি?'

রাখালবাবু চক্ষু একটু বিস্ফারিত করলেন, বললেন—'না। বেণীমাধব নিজের হাতে দাড়ি কামাতেন না, মেঘরাজ রোজ সকালে দাড়ি কামিয়ে দিত।'

ব্যোমকেশ সাবধানে ক্ষুরটি খাপ থেকে বের করে দু-আঙুলে ধরে জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল। তারপর বিস্মিত স্বরে বলল—'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ ক্ষুরটি তাঁর হাতে দিয়ে বলল—'দেখো, কোথাও আঙুলের ছাপ নেই।'

ক্ষুর নিয়ে রাখালবাবু পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করলেন, তারপর ক্ষুর ব্যোমকেশকে ফেরত দিয়ে তার মুখের পানে চাইলেন; দুজনের চোখ বেশ কিছুক্ষণ পরস্পর আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর ব্যোমকেশ ক্ষুরটি খাপের মধ্যে পুরে নিজের পকেটে রাখল, বলল—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

'কী করবেন?'

'দাড়ি কামাব।'

তেতলার অন্য ঘর দুটিতে দর্শনীয় কিছু ছিল না। তবু ব্যোমকেশ ঘর দুটিতে ঘুরে-ফিরে দেখল; তারপর নিচের তলায় নেমে এসে রাখালবাবুকে বলল—'আমি এখন চললাম। বিকেলবেলা আবার আসব। জবানবন্দির ফাইলটা দাও, বাড়ি গিয়ে পড়ব।'

রাখালবাবু বললেন—'আমাকে একবার থানায় যেতে হবে, চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। কীরকম মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ মুচকি হেসে বলল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া—।'

রাখালবাবু জবানবন্দির ফাইল ব্যোমকেশকে দিলেন, তাকে নিয়ে পুলিশ-ভ্যানে চলে গেলেন। দুজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং কয়েকজন নিম্নতর কর্মচারী বাড়িতে মোতায়েন রইল।

বিকেল তিনটের সময় ব্যোমকেশ ফিরে এল। রাখালবাবু আগেই ফিরেছিলেন, তাঁকে ক্ষুর আর জবানবন্দির নথি ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে বসল। রাখালবাবু প্রশ্ন করলেন—'কেমন দাড়ি কামালেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'ভালো নয়।'

'আর জবানবন্দি?'

'মেদিনীর জবানবন্দি সবচেয়ে তথ্যপূর্ণ। তাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে চাই।'

'বেশ তো, তাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। সে নিজের ঘরেই আছে।'

কিন্তু মেদিনীকে ডেকে পাঠাবার আগেই দুজন সাদা পোশাকের পুলিশ কর্মচারী মকরন্দকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মকরন্দর কাপড়-জামা ছিঁড়ে গেছে, গায়ে মুখে ধুলোবালি, চোখ জবাফুলের মতো লাল। বেশ বোঝা যায়, সে স্বেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে পুলিশের হাতে ধরা দেয়নি। একজন সাদা পোশাকের পুলিশ বলল—'মকরন্দ চক্রবর্তীকে ধরেছি স্যার?'

রাখালবাবু মকরন্দর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন—'ইনিই মকরন্দ চক্রবর্তী! কোথায় ধরলে?'

'ঘোড়দৌড়ের মাঠে। রেস খেলছিল স্যার। পকেটে অনেক টাকা ছিল। এই যে।'

একতাড়া পাঁচ টাকা ও দশ টাকার নোট। রাখালবাবু গুনে দেখলেন, পৌনে দু'শো টাকা। তিনি মকরন্দকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করলেন—'তোমার নাম মকরন্দ চক্রবর্তী?'

মকরন্দ রক্তরাঙা চোখে চেয়ে রইল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'তুমি পৌনে দু'শো টাকা কোথায় পেলে?'

উদ্ধত উত্তর হল—'বলব না।'

'যে-রাত্রে তোমার ঠাকুরদা খুন হন সে-রাত্রে ন'টার সময় তুমি বাড়ি এসেছিলে, তারপর শেষরাত্রে চুপিচুপি দোর খুলে বেরিয়ে গিয়েছিলে—।'

'মিছে কথা। মেদিনী মিছে কথা বলেছে।'

'মেদিনী বলেছে জানলে কী করে?'

মকরন্দ অধর দংশন করল, উত্তর দিল না। রাখালবাবু আবার প্রশ্ন করলেন—'কতরাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলে?'

'বলব না।'

'তারপর আর বাড়ি ফিরে আসোনি কেন?'

'বলব না।'

রাখালবাবু তার খুব কাছে এসে বললেন—'একদিন বেণীমাধববাবুর হুকুমে মেঘরাজ তোমার কান ধরে গালে চড় মেরেছিল, গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিল।'

'মিছে কথা।'

'বাড়িসুদ্ধ লোক মিছে কথা বলছে?'

'হ্যাঁ।'

রাখালবাবু ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে বসলেন, গলা খাটো করে বললেন—'এটাকে নিয়ে কী করা যায় বলুন দেখি?'

ব্যোমকেশও নিচু গলায় বলল—'যুগধর্মের নমুনা। ওকে বাড়িতেই আটক করে রাখো।'

'তাই করি।' রাখালবাবু উঠে গিয়ে মকরন্দকে কড়া সুরে বললেন—'যাও, দোতলায় নিজের ঘরে থাকো গিয়ে। বাড়ি থেকে বেরুবার চেষ্টা করো না, চেষ্টা করলে হাজতে গিয়ে লপ্‌সি খেতে হবে। যাও।'

সাদা পোশাকের পুলিশ দুজন মকরন্দকে দোতলায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। রাখালবাবু বললেন—'মেদিনীকে ডেকে পাঠাই?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'না, চলো আমরাই তার ঘরে যাই। এখানে অনেক বাধাবিঘ্ন।'

মেদিনীর দোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখা গেল মেদিনী মেঝেয় মাদুর পেতে শুয়ে আছে। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবুকে দেখে সে উঠে বসল। তার পরনে ধূসর রঙের একটা শাড়ি,

কপালে সিঁদুর নেই, হাতে-গলায়-কানে গয়না নেই। মুখের ভাব একটু ফুলো-ফুলো; শোকের চিহ্ন এখনও মুখ থেকে মুছে যায়নি, কিন্তু শোকের অধীরতা দূর হয়েছে। সে আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা চোখে দুজনের পানে চাইল।

রাখালবাবু সদয় কণ্ঠে বললেন—'মেদিনী, ইনি আমার বন্ধু। আমি তোমাকে যেসব প্রশ্ন করেছি তার ওপর ইনি আরও দু-চারটে সওয়াল করতে চান।'

মেদিনী ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল—'জি।'

ব্যোমকেশ একদৃষ্টে মেদিনীর মুখের পানে চেয়ে ছিল, আরও কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল —'কতদিন আগে মেঘরাজের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল?'

মেদিনী অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'পাঁচ বছর আগে।'

'তুমিই তার প্রথম স্ত্রী?'

'জি, না। আগে একজন ছিল, সে মারা গেছে।'

'হুঁ।' ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চাইল। ঘরে ফার্নিচারের মধ্যে একটা তক্তপোশ, একটা কাঠের আলমারি এবং একটা খাড়া আলনা। তক্তপোশের তলায় গোটা দুই বড় তোরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। বাইরের দিকের জানালার পাটার ওপর একটা কাঠের চ্যাপটা বাক্স। পশ্চিমা মেয়েরা প্রসাধনের জন্যে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করে; বাক্সের মধ্যে সিঁদুর কৌটো, চিরুনি, তেল, কাজল প্রভৃতি থাকে, ডালা খুললে ডালার গায়ে আয়না বেরিয়ে পড়ে। সব মিলিয়ে নিতান্ত মামুলি পরিবেশ।

ব্যোমকেশ এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে জিগ্যেস করল—'বাড়ির সকলকেই তুমি চেনো। কে কেমন মানুষ বলতে পারো?'

মেদিনী একটু চুপ করে থেকে হাতের নখ খুঁটতে-খুঁটতে বলল—'বুঢ়া বাবা বড় ভালো আদমি ছিলেন, দিলদার লোক ছিলেন। তাঁর ছেলে আর দামাদও ভালো লোক। মেয়ে আর পুতহু আমাকে পছন্দ করেন না। ঝিল্লী দিদি আর লাবণি দিদি ভারি ভালো মেয়ে।'

'আর মকরন্দ?'

মেদিনী চকিতে চোখ তুলেই আবার নিচু করল—'উনি আমাকে দেখতে পারেন না। ভারি কড়া জবান।'

'মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো?'

'জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।'

'নিখিল আর সনৎ?'

'নিখিলবাবু মজাদার লোক, খুব ঠাট্টা-তামাশা করেন। আর সনৎবাবু গম্ভীর মেজাজের মানুষ। কিন্তু দুজনেই খুব ভদ্র।'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। মেঘরাজ সৈন্যদলের সিপাহী ছিল, তার সিপাহী-জীবন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিশ্চয় তোমার কাছে আছে?'

'জি আছে, তার বাক্সের মধ্যে আছে।'

'আমি একবার কাগজপত্রগুলো দেখতে চাই।'

'এই যে বার করে দিচ্ছি।'

সে গিয়ে তক্তপোশের তলা থেকে একটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করল, আঁচল থেকে চাবি নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ট্রাঙ্ক খুলতে লাগল। ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে ঘরের এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার ওপর প্রসাধনের বাক্সটা রাখা রয়েছে। ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করে বাক্সের ডালা তুলল। বাক্সের মধ্যে মেয়েলি প্রসাধনের দ্রব্য ও টুকিটাকি; আয়নার এককোণে মেদিনীর একটি ছবি আঁটা রয়েছে। পোস্টকার্ড আধখানা করলে যত বড় হয় তত বড় ছবি; মেদিনী খাটের ধারে বসে রয়েছে। নিতান্তই ঘরোয়া ছবি, মেদিনীর মুখের প্রাণখোলা হাসিটি

ব্যোমকেশের গায়ে কাঁটার মতো বিঁধল। মেদিনীর বর্তমান চেহারা দেখে ভাবা যায় না, সে এমনভাবে হাসতে পারে। ব্যোমকেশ নিঃশব্দে বাক্স বন্ধ করল।

মেদিনী ট্রাঙ্ক থেকে কাগজপত্র নিয়ে যখন ফিরে এল, তখন ব্যোমকেশ রাখালবাবুর কাছে ফিরে এসে নিম্নস্বরে কথা বলছে, মেদিনীর হাত থেকে কাগজপত্র নিয়ে সে মন দিয়ে পড়ল। রাখালবাবুও সঙ্গে-সঙ্গে পড়লেন। তারপর কাগজ মেদিনীকে ফেরত দিয়ে ব্যোমকেশ মেদিনীকে বলল—'এগুলো যত্ন করে রেখে দাও, হয়তো পরে দরকার হবে। চলো রাখাল।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশের দিকে চোখ বেঁকিয়ে তাকালেন—'কী মনে হল?'

ব্যোমকেশ বলল—'খুব ভালো। এবার বাড়ির বাকি লোকগুলিকেও একে-একে দেখতে চাই। সবাই বাড়িতেই আছে তো?'

'সবাই আছে, কেবল অজয়ের মেয়ে লাবণি ছাড়া। যে-রাত্রে খুন হয়, লাবণি সেদিন সন্ধের সময় তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে পালিয়েছে, এখনও তার সন্ধান পাইনি। অন্য যারা আছে তাদের মধ্যে আগে কাকে দেখতে চান?'

'আমার কোনও পক্ষপাত নেই। নিচের তলা থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

নিখিলের দোরে রাখালবাবু টোকা দিলেন, নিখিল এসে দোর খুলে দাঁড়াল। তার গালে সাবানের ফেনা, হাতে সেফটি রেজর; সে ফেনায়িত হাসি হাসল—'আসুন দারোগাবাবু।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন, প্রশ্ন করলেন—'বিকেলবেলা দাড়ি কামাচ্ছেন?'

নিখিল বলল—'আমি নিশাচর কিনা তাই বিকেলবেলা দাড়ি কামাই। যারা দিনেরবেলা কাজ করে তারা সকালবেলা দাড়ি কামায়।' তারপর সে ব্যগ্রস্বরে বলল—'দারোগাবাবু, একঘণ্টার জন্য আমাকে ছেড়ে দিন, একবারটি অফিস ঘুরে আসি। মাইরি বলছি, পালাব না। বিশ্বাস না হয় দুজন পেয়াদা আমার সঙ্গে দিন।'

রাখালবাবু হেসে বললেন—'অফিসে যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? বেশ তো আছেন।'

নিখিল বলল—'না দারোগাবাবু, বেশ নেই। কাজের নেশা আমাকে অফিসের দিকে টানছে, রাত্তিরে ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কী?'

নিখিল একটু সলজ্জভাবে বলল—'অফিসে অনেকগুলো আইবুড়ো মেয়ে কাজ করে, তাদের মধ্যে একটাকে আমি খুঁজছি, পেলেই তাকে বিয়ে করব।'

'ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ঠেকছে।'

'ঠেকবেই তো। ঘোর রহস্যময় ব্যাপার।'

'ঘোর রহস্যময় যদি হয় তা হলে এঁর শরণাপন্ন হোন। ইনিই হলেন শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।'

নিখিলের গালে সাবানের ফেনা শুকিয়ে ঝরে-ঝরে পড়ছিল, সে প্রকাণ্ড হাঁ করে ব্যোমকেশের পানে তাকাল—'অ্যাঁ, আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী! এতক্ষণ লক্ষই করিনি।' সেফটি রেজরসুদ্ধ হাতজোড় করে বলল—'আমার রহস্যটা আপনাকে ভেদ করতেই হবে ব্যোমকেশবাবু। নইলে আমার প্রাণের আশা নেই।'

'সব কথা খুলে বলুন।'

নিখিল তড়বড় করে একনিশ্বাসে তার রহস্য শোনাল। শুনে ব্যোমকেশ বলল—'চিঠিগুলো দেখি।'

নিখিল বিছানার কাছে গিয়ে বালিশের তলা থেকে কয়েকখানা খাম এনে ব্যোমকেশকে দিল। ব্যোমকেশ খামগুলি খুলে একে-একে চিঠি বার করে পড়ল, তারপর আবার খামের মধ্যে পুরে নিজের

পকেটে রাখল—'এগুলো আমি রাখলাম। দেখি যদি সন্ধান পাই। আপনি আপাতত এই বাড়িতেই থাকুন, আমি আপনার অফিসে খোঁজ-খবর নেব। —ভালো কথা, আপনার বর্ষাতি আছে?'

'বর্ষাতি—ওয়াটারপ্রুফ? আছে একটা। কেন বলুন তো?'

'দেখি একবার।'

নিখিল সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে একটা পুরনো খাকি রঙের বর্ষাতি নিয়ে এল। ব্যোমকেশ সেটা রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এটাও আমরা নিয়ে চললাম। এটা আপনি শেষবার কবে ব্যবহার করেছেন?'

নিখিল কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে মাথা চুলকে বলল—'গত বর্ষাকালে, মানে পাঁচ-ছয় মাস আগে। আপনি যে ভেলকি লাগিয়ে দিলেন, ওয়াটারপ্রুফ থেকে আমার—মানে মেয়েটার ঠিকানা বার করবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ কেবল মুখ টিপে হাসল, বলল—'আপনি দেখছি সেফটি রেজর দিয়ে দাড়ি কামান।'

'তবে কী দিয়ে দাঁড়ি কামাব?'

'ঠিক কথা। আপনি যখন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করেছেন তখন সাবেক ক্ষুরের রেওয়াজ উঠে গেছে। আচ্ছা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে বক্র কটাক্ষপাত করল। রাখালবাবু অপ্রতিভভাবে বললেন—'খেয়াল হয়নি। হওয়া উচিত ছিল। যে-লোক ছুরি কিংবা ক্ষুর দিয়ে গলা কাটতে যাচ্ছে, সে জানে গলা কাটলে চারদিকে রক্ত উথলে পড়বে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। তার নিজের গায়েও রক্ত লাগবে। তাই সে বর্ষাতি কিংবা ওইরকম একটা কিছু গায়ে দিয়ে খুন করতে যাবে, যাতে সহজে রক্ত ধুয়ে ফেলা যায়।'

এইসময় সদর দোরের কনস্টেবল এসে একখানা পোস্টকার্ড রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'পিওন দিয়ে গেল।'

রাখালবাবু নির্দ্বিধায় পোস্টকার্ড পড়লেন। অজয় চক্রবর্তীর নামে চিঠি, তারিখ আজ সকালের, ঠিকানা টালিগঞ্জ। চিঠিতে কয়েক ছত্র লেখা আছে—

শ্রীচরণেষু মা,

কাল রাত্তিরে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তোমরা রাগ করো না। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি খুব ভালো লোক। পরশু রাত্রে আমি শাশুড়ির কাছে শুয়েছিলাম। দাদু অন্য একজনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিলেন তাই আমরা লুকিয়ে বিয়ে করেছি।

প্রণতা
লাবণি

চিঠিতে চোখ বুলিয়ে রাখালবাবু ব্যোমকেশের হাতে চিঠি দিলেন, ব্যোমকেশ সেটা পড়ে ফেরত দিল। বলল—'বোধহয় ঠাকুরদার মৃত্যু-সংবাদ পায়নি। যাক, বিয়ে করেছে ভালোই করেছে, নইলে—।'

চিঠি পকেটে রেখে রাখালবাবু একজন সাব-ইন্সপেক্টরকে ডাকলেন—'এই বর্ষাতিটা রাখো। আরও বোধহয় জুটবে; সবগুলো জড়ো হলে পরীক্ষার জন্যে পাঠাতে হবে। এটাতে টিকিট সেঁটে রাখো—নিখিল হালদার।'

তারপর তিনি সনতের দোরে টোকা দিলেন। সনৎ এসে দোর খুলল; তার হাতে একটা ইংরেজি রহস্য উপন্যাস পাতা-ওল্টানো অবস্থায় রয়েছে। রাখালবাবুকে দেখে বলল—'ইন্সপেক্টরবাবু, আমার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, একটিন আনিয়ে দেবেন? গোল্ড ফ্লেক।'

'নিশ্চয়। টাকা দিন, আনিয়ে দিচ্ছি।'

সনৎ একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বার করে দিল। রাখালবাবু টাকা সাব-ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়ে বললেন—'একটিন গোল্ড ফ্লেক সিগারেট সামনের হোটেল থেকে আনিয়ে দাও।'

তিনি ব্যোমকেশকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। সনৎ বলল—'আর কতদিন ঘরে বন্ধ করে রাখবেন? কাজকর্ম আটকে রয়েছে। তা ছাড়া মামা মারা যাবার পর তাঁর উত্তরাধিকারীরা এখানে আর থাকতে দেবে না, মাথা গোঁজবার একটা জায়গা খুঁজতে হবে তো।'

'থাকতে দেবে না কী করে জানলেন?'

'আজ দুপুরবেলা গায়ত্রীর স্বামী গঙ্গাধর এসেছিল, বলল—এবার পাতাতাড়ি গোটাতে হবে।'

'তাই নাকি! বেশি দিন আপনাদের কষ্ট দেব না, দু-একদিনের মধ্যে ছাড়া পাবেন। ইনি ব্যোমকেশ বক্সী, প্রখ্যাত সত্যান্বেষী।'

সনৎ নির্লিপ্ত চোখে ব্যোমকেশের পানে চাইল, নীরস স্বরে বলল—'নাম শুনেছি, বই পড়িনি। বাংলা রহস্য-কাহিনী আমি পড়ি না। বসুন।'

ব্যোমকেশের চোখ ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে অলসভাবে বলল—'আপনার বর্ষাতি আছে?'

সনৎ ভ্রূ তুলে একটু বিস্ময় প্রকাশ করল—'আছে। এটা বর্ষাকাল নয়, তাই তুলে রেখেছি। দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

সনৎ আলমারি খুলে একটা প্লাস্টিকের মোড়ক বার করল। মোড়কের মধ্যে একটি শৌখিন স্বচ্ছ বর্ষাতি পাট করা রয়েছে। রাখালবাবু সেটি নিয়ে মোড়ক থেকে বার করলেন, তারপর লম্বা করে ঝুলিয়ে দেখলেন। দামি বর্ষাতি, প্রায় নতুন। তিনি সেটিকে পাট করে আবার মোড়কের মধ্যে রেখে বললেন—'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি দু-দিন পরে ফেরত পাবেন। রসিদ দিচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন উদাস কণ্ঠে বলল—'রসিদ কী হবে! আপনাদেরই রাজত্ব, যা ইচ্ছে করুন।'

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল—'আপনার জবানবন্দিতে দেখলাম, যে-রাত্রে বেণীমাধববাবু খুন হন সে-রাত্রে আপনি বর্ধমানে গিয়েছিলেন। কোন ট্রেনে গিয়েছিলেন?'

সনৎ বলল—'রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেনে।'

'পরদিন ভোরের ট্রেনে না গিয়ে রাত্রির ট্রেনে গেলেন কেন?'

'ভোরের ট্রেনে গেলে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারতাম না। সকালবেলা মজলিশ ছিল।'

'বর্ধমানে আপনার কোনও আস্তানা আছে?'

'না, স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রাত কাটিয়েছি।'

'চায়ের স্টলে গিয়ে চা খেয়েছিলেন নিশ্চয়?'

'চা আমি খাই না।'

'তা হলে আপনি যে সাড়ে দশটার গাড়িতে বর্ধমান গিয়েছিলেন তার কোনও সাক্ষি-সাবুদ নেই?'

সনতের ভুরু আবার উঁচু হল—'সাক্ষি-সাবুদের কী দরকার? আপনাদের কি সন্দেহ আমি মামাকে খুন করেছি?'

ব্যোমকেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল—'তা নয়। কিন্তু সকলের সম্বন্ধেই আমাদের নিঃসংশয় হওয়া দরকার।'

সনৎ শুকনো গলায় বলল—'মামাকে খুন করে যাদের লাভ আছে তাদের অ্যালিবাই খুঁজুন গিয়ে। তাতে কাজ হবে।'

'তা বটে। চলো রাখাল, এবার দোতলায় যাওয়া যাক।'

প্রথমে ড্রয়িংরুমে গিয়ে রাখালবাবু সনতের বর্ষাতি সাব-ইন্সপেক্টরকে সমর্পণ করে বললেন—'টিকিট মারো—সনৎ গাঙ্গুলি।' তারপর ব্যোমকেশকে নিয়ে দোতলায় উঠলেন।

অজয় সামনের ঘরে বসে সায়াহ্নিক চা-জলখাবার খাচ্ছিল, সশঙ্ক মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মুক্তকচ্ছ অশৌচের বেশ, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। রাখালবাবু গম্ভীর মুখে বললেন—'আপনার একখানা চিঠি এসেছে।' তিনি পোস্টকার্ড পকেট থেকে নিয়ে অজয়কে দিলেন।

ব্যোমকেশ নিবিষ্ট চোখে অজয়ের পানে চেয়ে ছিল; সে দেখল চিঠি পড়তে-পড়তে অজয়ের মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত পরম্পরায় বিচিত্র ভাবের অভিব্যক্তি খেলে গেল ঃ আশঙ্কা—বিস্ময়—স্বস্তি—উৎফুল্লতা। তার মধ্যে স্বস্তির আরামই বেশি। অজয়ের মতো প্রকৃতির লোকের পক্ষে এটাই বোধহয় স্বাভাবিক; বিনা খরচে বিনা ঝঞ্ঝাটে যদি মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তা হলে আনন্দ হওয়ারই কথা।

কিন্তু সে যখন মুখ তুলল তখন তার মুখে একটি বিষণ্ণ করুণ ভাব, তাতে রঙ্গমঞ্চের আভাস পাওয়া যায়। সে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল—'মেয়ে! দারোগাবাবু, আমার একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বড় নিষ্ঠুর, বড় স্বার্থপর, তারা বাপ-মায়ের কথা ভাবে না। যাক, যা করেছে ভালোই করেছে। তবু যদি জাতের মধ্যে বিয়ে করত। যাক, ভালো হলেই ভালো।' সে আবার নাটকীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

রাখালবাবু বোধকরি অভিনয়ের পালা শেষ করার জন্যেই বললেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী। বোধহয় নাম শুনেছেন।'

অজয় তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ বিস্ফারিত করে চেয়ে রইল; তার ভাবভঙ্গিতে ভয় কিংবা বিস্ময় কিংবা আনন্দ কোনটা প্রকাশিত হল ঠিক বোঝা গেল না। তারপর সে গদগদ স্বরে বলে উঠল—'নাম শুনিনি! বলেন কী আপনি, নাম শুনিনি! আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার। ব্যোমকেশবাবু এসেছেন, এবার বাবার মৃত্যু-রহস্যের একটা কিনারা হবে।' সে অন্দরের দরজার দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল—'ওগো শুনছ, শিগগির দু-পেয়ালা চা নিয়ে এসো। বসুন-বসুন, আমি নিজেই দেখছি।' সে দ্রুত অন্দরের দিকে অন্তর্হিত হল।

সমাদরের আতিশয্য দেখে ব্যোমকেশ রাখালবাবর পানে মুখ টিপে হাসল; দুজনে পাশাপাশি চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

কিছুক্ষণ পরে অজয় ফিরে এল, তার পিছনে মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়ে আরতি; আরতির হাতে থালার ওপর দু-পেয়ালা চা এবং বিস্কুট। তার মুখ ভয়ে শীর্ণ হয়ে গেছে, সে থালাটি ব্যোমকেশের সামনে রেখেই ফিরে যাচ্ছিল, অজয় বলল,—'ওকী, চলে যাচ্ছ কেন? ব্যোমকেশবাবুর সঙ্গে কথা কও।'

আরতি থমকে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তার অবস্থা লক্ষ করে সদয় কণ্ঠে বলল—'না-না, উনি কাজকর্ম করুন গিয়ে, ওঁকে আমার কিছু জিগ্যেস করার নেই।'

আরতি চলে গেল। অজয় আমতা-আমতা করে বলল—'আমার স্ত্রী বড় লাজুক, কিন্তু আমরা দুজনেই আপনার ভক্ত।' অজয় আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বলল—'আপনার ছেলে মকরন্দ বাড়িতেই আছে তো?'

অজয় চকিত হয়ে বলল—'আছে বইকী। তাকে ডাকব?'

ব্যোমকেশ বলল—'ডাকবার বোধহয় দরকার হবে না। সে কলেজে পড়ে, বর্ষাকালে নিশ্চয় তার বর্ষাতি দরকার হয়। তার বর্ষাতিটা একবার দেখতে চাই।'

অজয় একটু চিন্তা করে বলল—'বছর দেড়েক আগে তাকে একটা ওয়াটারপ্রুফ কিনে দিয়েছিলাম। আছে নিশ্চয়, আমি দেখছি।'

অজয় অন্দরের দিকে চলে গেল। ব্যোমকেশ ও রাখালবাবু চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন। মিনিট পাঁচেক পরে অজয় ফিরে এসে বিমর্ষ মুখে বলল—'ওয়াটারপ্রুফটা খুঁজে পেলাম না। মকরন্দকে

জিগ্যেস করলাম, সে বলল—জানি না।'

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালা রেখে মুখ মুছতে-মুছতে বলল—'আপনার নিজের ওয়াটারপ্রুফ আছে?'

'আছে। এনে দেব?'

'আপনার স্ত্রীর এবং মেয়ের ওয়াটারপ্রুফ?'

'মেয়েদের জন্যে একটাই মেয়েলি ওয়াটারপ্রুফ আছে।'

'দয়া করে ও-দুটো এনে দিন, আমরা নিয়ে যাব। দু-চারদিনের মধ্যেই ফেরত পাবেন।'

'নিয়ে যাবেন, বেশ তো, তা এনে দিচ্ছি।'

অজয় অন্দরে গিয়ে দু-হাতে দুটি ওয়াটারপ্রুফ ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরে এল। রাখালবাবু সে-দুটি পাট করে বগলে নিলেন, বললেন—'আচ্ছা, আজ উঠি। চায়ের জন্যে ধন্যবাদ।'

অজয় কাঁচুমাচু হয়ে ব্যোমকেশকে বলল—'চললেন? একটা অনুরোধ ছিল, সাহস করে বলতে পারছি না—।'

'কী অনুরোধ?'

'আপনার একটা ফটো তুলব। আমার ক্যামেরা আছে, যদি অনুমতি করেন একটা তুলে নিই। আপনার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখব।'

ব্যোমকেশ হেসে উঠল—'ফটো তুলবেন! তা—আপত্তি কী। আমার ছবি এনলার্জ করে ঘরে টাঙিয়ে রাখার আগ্রহ আজ পর্যন্ত কারও দেখা যায়নি।'

অজয় দ্রুত গিয়ে ক্যামেরা নিয়ে এল। সাধারণ বক্স-ক্যামেরা। সে বললে—'এখনও যথেষ্ট আলো আছে। আপনি জানলার কাছে দাঁড়ান, আমি ছবি তুলে নিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ জানলার পাশে পড়ন্ত আলোয় দাঁড়াল। ক্যামেরায় ক্লিক করে শব্দ হল।

'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! অশেষ ধন্যবাদ!' শুনতে-শুনতে ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাইরে এসে দুজনের কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে কথা হলো; তারপর ব্যোমকেশ বর্ষাতি দুটো নিয়ে নিচে নেমে গেল. রাখালবাবু তেতলায় উঠে গেলেন। ওপরে কনস্টেবল টুলের ওপর বসেছিল, উঠে দাঁড়াল।

চাবি দিয়ে ঘরের দোর খুলে রাখালবাবু ঘরে প্রবেশ করলেন, কয়েকবার এদিক-ওদিক ঘুরলেন। তারপর দোরের বাইরে ফিরে এসে দেখলেন, মেদিনী ক্লান্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন—'মেদিনী, তোমাকে কয়েকটা কথা জিগ্যেস করা হয়নি তাই ডেকেছি।'

মেদিনী ব্যায়ত বিহ্বল চোখে চাইল, তারপর চোখের ওপর আঁচল চাপা দিল। রাখালবাবু বললেন—'বলো দেখি, সেদিন সকালে তুমি যখন তোমার স্বামীর মৃতদেহ প্রথম দেখলে তখন সে কি চিৎ হয়ে শুয়েছিল?'

অবরুদ্ধ উত্তর এল—'জি, হ্যাঁ।'

রাখালবাবু তাড়াতাড়ি বললেন—'আচ্ছা-আচ্ছা, ও-কথা থাক। এবার একবার ঘরের মধ্যে .এসো।'

মেদিনী চোখের জল মুছে থমথমে মুখ নিয়ে ঘরের মধ্যে এল। রাখালবাবু চারিদিকে হাত ঘুরিয়ে বললেন—'ঘরটা ভালো করে দেখো। তুমি আগে অনেকবার দেখেছ। কোথাও কোনও তফাত বুঝতে পারছ?'

মেদিনী বলল—'খাটের ওপর বিছানা নেই।'

'তা ছাড়া আর কিছু?'

মেদিনী চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে মাথা নাড়ল—'আর কোনও তফাত বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ। আচ্ছা হয়েছে, এবার নিচে চলো।'

মেদিনীকে নিয়ে রাখালবাবু নিচে নেমে গেলেন। মেদিনী নিজের ঘরে চলে গেল। রাখালবাবু ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করে দেখলেন ব্যোমকেশ একটা চেয়ারে অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টানছে। দুজনের চোখাচোখি হল। ব্যোমকেশ বাঁকা হেসে ঊর্ধ্বদিকে ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর খাড়া হয়ে বসে বলল—'শুভকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। রাখাল, এবার আমি বাড়ি ফিরব। তোমার কতদূর?'

রাখাল বললেন—'গঙ্গাধর ঘোষালকে দর্শন করবেন না?'

'ওহো তাই তো, গঙ্গাধরকে দর্শন করা হল না। আজ থাক, সন্ধে হয়ে গেছে, তিনি হয়তো ভূমানন্দে আছেন। কাল সকালে তাঁকে দর্শন করা যাবে।' ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়াল, পকেট থেকে নিখিলের চিঠিগুলি নিয়ে রাখালবাবুর হাতে দিয়ে বলল—'এগুলোতে মেয়েলি আঙুলের ছাপ আছে কি না পরীক্ষা করে দেখো। আজ চলি।'

'চলুন, আমিও যাই। বর্ষাতিগুলো পরীক্ষা করতে হবে।'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে গিয়ে দেখল, রাখালবাবু সদর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিখিল এবং সনতের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্যোমকেশ যেতেই তিনি বললেন—'শুনেছেন ব্যোমকেশদা, মেদিনীর ঘর থেকে একটা বাক্স চুরি গেছে, টয়লেটের বাক্স।'

ব্যোমকেশ ভুরু উঁচু করে বলল—'টয়লেট-বক্স। সে কী, কী করে চুরি গেল?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে কাল সন্ধেবেলা মেদিনীকে আমি তেতলায় ডেকেছিলাম, ওর ঘর খোলা ছিল, সেইসময় হয়তো কেউ সরিয়েছে। তাই এঁদের জিগ্যেস করছিলাম এঁরা কিছু জানেন কি না।'

সনৎ বলল—'আমি কী করে জানব বলুন। মেদিনীর ঘরের মধ্যে কখনও পদার্পণ করিনি, কোথায় কী আছে কোত্থেকে জানব?'

নিখিল বলল—'দোহাই দারোগাবাবু, আমি টয়লেট-বক্স চুরি করিনি। আমার ঘরে চুল বেঁধে টিপ পরার মানুষ নেই।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুকে প্রশ্ন করল—'মকরন্দকে জেরা করেছিলে?'

'করেছিলাম। তাদের ফ্ল্যাট আবার খানাতল্লাশ করেছিলাম, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।'

'এঁদের ঘর?'

'এইবার করব।' রাখালবাবু একজন জমাদারকে এবং সাব-ইন্সপেক্টরদের ডেকে বললেন—'তোমরা এঁদের ঘর দুটো আবার ভালো করে খানাতল্লাশ কর, মেদিনীর চুল-বাঁধার বাক্সটা পাও কি না দ্যাখো। আমরা দোতলায় গঙ্গাধরবাবুর ফ্ল্যাটে যাচ্ছি।'

সনৎ অপ্রসন্ন মুখে বলল—'করুন, করুন, যত ইচ্ছে খানাতল্লাশ করুন, কিন্তু আমার দামি ক্যামেরাগুলো ভাঙবেন না।'

ব্যোমকেশকে নিয়ে রাখালবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

দোতলায় উঠে তাঁরা দেখলেন বারান্দার অপর প্রান্তে গঙ্গাধরের ফ্ল্যাটে সদর দরজা খুলে তার মেয়ে ঝিল্লী বেরিয়ে এল, দরজা ভেজিয়ে দু-পা এসে তাদের দেখে সংকুচিতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাখালবাবু তার কাছে এসে ব্যোমকেশকে বললেন—'এর নাম ঝিল্লী, গঙ্গাধরবাবুর মেয়ে। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?'

ঝিল্লী সলজ্জ অস্ফুটস্বরে বলল—'মামিমা ডেকে পাঠিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ ঝিল্লীর সংকোচনম্র কমনীয় মুখের পানে চেয়ে হাসল—'আমাদের দেখে এত লজ্জা কিসের? আমরা বাঘ-ভাল্লুক নয়, কামড়ে দেব না।'

ঝিল্লী একটু হেসে চোখ তুলল। ব্যোমকেশ দেখল চোখ দুটি সুন্দর এবং বুদ্ধিদীপ্ত। রাখালবাবু পরিচয় দিলেন—'ইনি ব্যোমকেশ বক্সী।'

ঝিল্লীর চোখে উৎসুক আলো ফুটে উঠল, তারপর আস্তে-আস্তে তার মুখের ওপর অরুণাভা ছড়িয়ে পড়ল। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছে দেখে ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে কিছু জানবার আছে।'

ঝিল্লী দাঁড়াল, কিন্তু ব্যোমকেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'লাবণির সঙ্গে তোমার খুব ভাব ছিল?'

একটু দ্বিধার পর ঝিল্লী ঘাড় নাড়ল।

'সে তোমাকে নিজের মনের কথা বলত, তুমি তাকে নিজের মনের কথা বলতে। কেমন?'

ঝিল্লী উত্তর দিল না, সতর্কভাবে অপেক্ষা করে রইল।

'লাবণি নিশ্চয় তোমাকে বলেছিল, সে তার নাচের মাস্টার পরাগ লাহাকে ভালোবাসে।'

ঝিল্লী ঘাড় নিচু করে অস্ফুটস্বরে বলল—'বলেছিল।'

'সে পালিয়ে গিয়ে পরাগকে বিয়ে করবে বলেছিল?'

ঝিল্লী উৎফুল্ল চোখ তুলল—'লাবণি ওকে বিয়ে করেছে!'

'হ্যাঁ। তুমি দেখছি জানতে না।'

'না।'

'কিন্তু জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছ।'

ঝিল্লী হেসে ফেলল।

ঝিল্লীকে ছেড়ে গঙ্গাধরের দোরের দিকে যেতে-যেতে রাখালবাবু খাটো গলায় বললেন—'আপনার মন বিচিত্র কুটিল পথে চলেছে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসল। রাখালবাবু গঙ্গাধরের দোরে টোকা দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ভিতর থেকে কড়া আওয়াজ এল—'কে? ভেতরে এসো।'

দুজনে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের মাঝখানে গোল টেবিল, তার সামনে চেয়ারে বসে গঙ্গাধর তাস নিয়ে সলিটেয়ার খেলছিল, রাখালবাবুর দিকে বিরক্ত চোখে চেয়ে বলল—'আবার কী চাই?'

গঙ্গাধরের ভাবভঙ্গি এখন অন্যরকম। নিজের টাকাকড়ি উড়িয়ে শ্বশুরের গলগ্রহ হবার পর সে কচ্ছপের মতো হাত-পা গুটিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু শ্বশুরের মৃত্যুর পর হালের আইন অনুযায়ী সে অর্ধেক রাজত্ব পাবে এই অনিবার্য সম্ভাবনার ফলে সে আবার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে, তার আচার-আচরণে বনেদী বড়মানুষের মজ্জাগত আত্মম্ভরিতা আবার ফুটে উঠেছে।

তার কথা বলার ভঙ্গিতে ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর রাখালবাবু যখন বললেন—'ইনি আমার সহকারী শ্রীব্যোমকেশ বক্সী।' তখন গঙ্গাধর উদ্ধতকণ্ঠে বলে উঠল—'তাতে কী হয়েছে? So what?'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল, সে গঙ্গাধরের মুখোমুখি চেয়ারে বসে বলল—'আপনার নাম গঙ্গাধর ঘোষাল, কয়েক বছর আগে আপনি রেস-কোর্সের এক জকিকে ঘুষ খাওয়াবার চেষ্টা করার জন্যে আইনের হাতে পড়েছিলেন?'

গঙ্গাধর আরক্ত চোখে গর্জে উঠল—'তাতে আপনার কী?'

ব্যোমকেশ আঙুল তুলে বলল—'আপনি দাগী আসামী. আপনাকে খুনের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা যায়। আপনার শ্বশুর উইল দস্তখত করার আগের রাত্রে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। কে তাঁকে খুন করেছে?'

বেগবান ঘোড়া হোঁচট লেগে যেন ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। গঙ্গাধরের দম্ভস্ফীত মুখ তুবড়ে গেল, সে ভীতস্বরে বলল—'আমি কী জানি! আমি কী জানি!'

ব্যোমকেশ এবার একটু ঠাণ্ডা হল, বলল—'বেণীমাধববাবুকে খুন করার স্বার্থ আপনারও আছে, অজয়বাবুরও আছে; কিন্তু আপনি জামাতা, দশম গ্রহ।'

উত্তরে গঙ্গাধর দু-বার কথা বলবার জন্যে মুখ খুলল, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ব্যোমকেশ তখন সহজ সুরে বলল—'আপনার মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে, বেশি তেজ দেখাবেন না।'

এই সময় গায়ত্রী ভিতর দিক থেকে ঘরে প্রবেশ করল। আঁচলটা কোমরে জড়ানো, চোখে তীব্র দৃষ্টি, যুদ্ধং দেহি ভাব। সে একটা চেয়ারে বসে ব্যোমকেশকে কড়া সুরে বলল—'কী জানতে চান আমাকে বলুন।'

ব্যোমকেশ গায়ত্রীকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল—'আপনি বেণীমাধববাবুর মেয়ে গায়ত্রী দেবী। আপনাকেও কিছু প্রশ্ন আছে। আপনার বাবা উইল সই করবার আগেই কেউ তাঁকে খুন করেছে। কিন্তু তাঁর আগের কোনও উইল আছে কি না আপনি জানেন?'

এতক্ষণে গঙ্গাধর কতকটা ধাতস্থ হয়েছে, সে বলে উঠল—'আমার শ্বশুর ইনটেসটেট মারা গেছেন।'

গায়ত্রী অমনি ধমক দিয়ে উঠল—'তুমি চুপ করো। আমার বাবার অন্য কোনও উইল নেই। তিনি যা রেখে গেছেন নতুন আইনের জোরে তার অর্ধেক আমি পাব।'

'বেণীমাধববাবু বিষয়ী লোক ছিলেন, এত বয়স পর্যন্ত তিনি উইল করেননি এ কি সম্ভব? হয়তো পুরনো উইল বেরুবে, যাতে তিনি অন্য কাউকে যথাসর্বস্ব দিয়ে গেছেন। হয়তো আপনার জন্য মাসোহারা বরাদ্দ করে বাকি সব টাকা অজয়বাবুকে দিয়ে গেছেন।'

ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে গায়ত্রী প্রায় চিৎকার করে উঠল—'না-না-না, বাবা কখনও আমাকে বঞ্চিত করবেন না। তিনি দাদার চেয়ে আমাকে ঢের বেশি ভালোবাসতেন।'

'বসুন-বসুন। আমি বলছি না যে, বেণীমাধববাবুর অন্য উইল আছেই। কিন্তু তিনি ভাগনেদেরও ভালোবাসতেন, বাড়িতে এনে রেখেছিলেন; তাদের কি কিছুই দিয়ে যাননি?'

গায়ত্রী আবার চেয়ারে বসে বলল—'ওরা বাবার আসল ভাগনে নয়, মামাতো বোনের ছেলে। সনতের বাপ দুশ্চরিত্র ছিল, স্ত্রীকে খুন করে ফাঁসি যায়; নিখিলের বাপ সার্কাসের পেশাদার ক্লাউন ছিল। ওদের কেন বাবা টাকা দিয়ে যাবেন?'

'আচ্ছা, ও-কথা থাক। বলুন দেখি, আপনার বাড়িতে ক'টা বর্ষাতি আছে।'

গায়ত্রী হঠাৎ যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল, কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল—'দুটো আছে। একটা ওঁর, একটা ঝিল্লীর।'

'ও দুটো বার করে দিন, আমরা নিয়ে যাব।'

'নিয়ে যাবেন! কেন?'

'দরকার আছে। দু-চারদিন পরে ফেরত পাবেন।'

গায়ত্রী আবার কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ উঠে চলে গেল, বলল—'কী দরকার জানি না। এনে দিচ্ছি।'

নিচে নেমে এসে রাখালবাবু ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করলেন—'এবার?'

ব্যোমকেশ বলল—'চলো আমার বাড়ি। নিভৃতে পরামর্শ করা যাক। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।'

'চলুন।'

বাড়িতে এসে ব্যোমকেশ চায়ের ফরমাস দিল। সত্যবতী চা এবং আলুর চপ রেখে গেল। অতঃপর পানাহার এবং সিগারেট সহযোগে পরামর্শ শুরু হল।

একঘণ্টা পরে রাখালবাবু বললেন—'বেশ, এই কথা রইল। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে আপনার রাহাখরচ ইত্যাদি দেওয়া হবে, আমি তার ব্যবস্থা করব। আজ বিকেলে পাকা খবর পাবেন।'

রাখালবাবু চলে যাবার পর সত্যবতী ঘরে ঢুকল, ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে উৎসুক

স্বরে বলল—হ্যাঁ গা, কী তোমাদের এত ষড়যন্ত্র হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ উঠে দাঁড়িয়ে আলস্য ভাঙল। —'আমাকে বোধহয় কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হবে।'

'কোথায় যাবে?'

'তা কি জানি!'

'তুমি জানো না তা কি কখনো হয়। নিশ্চয় জানো।'

ব্যোমকেশ সত্যবতীর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল—'বেশ, জানি কিন্তু বলব না।'

সত্যবতী রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

বিকেল চারটের সময় রাখালবাবুর ফোন এল—'সব ঠিক। আপনি একটা সুটকেস নিয়ে সটান থানায় চলে আসুন।'

ব্যোমকেশের অনুপস্থিতিকালে বেণীমাধবের বাড়ির কর্মসূচী আগের মতোই বলবৎ রইল। কারুর বাইরে যাবার হুকুম নেই। একজন সাব-ইন্সপেক্টর, একজন জমাদার এবং চারজন কনস্টেবল হামেহাল মোতায়েন রইল। রাখালবাবু দু-বেলা এসে পরিদর্শন করে যেতে লাগলেন। বেণীমাধবের মৃত্যু সম্বন্ধে নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হল না। মেদিনীর সাজের বাক্সটা অদৃশ্য হয়েছিল, অদৃশ্যই রয়ে গেল।

একদিন লাবণি তার স্বামীকে নিয়ে বাপ-মা'র সঙ্গে দেখা করতে এল। রাখালবাবু তাদের দেখা করতে দিলেন। বন্ধ দরজার অন্তরালে অজয়-পরিবার কীভাবে মেয়ে-জামাইয়ের সংবর্ধনা করল তা জানা গেল না। লাবণিরা যখন বেরিয়ে এল তখন লাবণির মুখে হাসি, চোখে জল। বারান্দায় ঝিল্লীর সঙ্গে লাবণির দেখা হল; দুই বোন পরস্পর গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর হাত-ধরাধরি করে নিচে নেমে এল। নিচের বারান্দায় নিখিল ছিল, সে নবদম্পতিকে দেখে হো-হো করে হেসে বলল—'এই যে পলাতক আর পলাতকা! দুজনে মিলে খুব নাচছ তো?'

পরাগ কপট বিষণ্ণতায় ম্রিয়মাণ মুখভঙ্গি করে বলল—'দুজনে মিলে নাচা আর হচ্ছে কই? এখন আমি নাচছি, লাবণি নাচাচ্ছে।'

লাবণিরা চলে যাবার পর নিখিল ঝিল্লীকে বলল—'কী, তুমি আর দেরি করছ কেন? একজন তো নাচিয়েকে নিয়ে কেটে পড়ল, এবার তুমি একটা গাইয়েকে নিয়ে কেটে পড়ো।

ঝিল্লী ভুরু বেঁকিয়ে নিখিলের পানে তাকাল—'আমি কেটে পড়ব না। কিন্তু তোমার খবর কী? যে তোমাকে চিঠি লেখে তাকে ধরতে পারলে?'

নিখিল বলল—'ধরিনি এখনও, কিন্তু আর বেশি দেরি নেই। ব্যোমকেশবাবু বলেছেন শিগগির ধরে দেবেন। যেই ধরব অমনি পটাস করে বিয়ে করে ফেলব। আমার সঙ্গে চালাকি নয়।'

'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।' মুচকি হেসে ঝিল্লী ওপরে চলে গেল।

পাঁচদিন পরে ব্যোমকেশ ফিরে এল, তার সঙ্গে একটি মানুষ। নিম্নশ্রেণীর পশ্চিমা যুবক। ব্যোমকেশ যুবককে নিয়ে সোজা থানায় উপস্থিত হল, রাখালবাবুর সঙ্গে কথা বলল। তারপর যুবককে রাখালবাবুর জিম্মায় রেখে বাড়ি গেল। রাখালবাবুকে বলে গেল—'আজ বিকেল চারটের সময় বেণীমাধবের ড্রয়িংরুমে থিয়েটার বসবে, তুমি হবে তার স্টেজ ম্যানেজার।'

বিকেল চারটের সময় ব্যোমকেশ বেণীমাধবের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখল, ড্রয়িংরুমে বাড়ির ন'জন লোক উপস্থিত আছে; অজয়-আরতি-মকরন্দ একটা সোফায় বসেছে, অন্য সোফায় বসেছে গঙ্গাধর-গায়ত্রী আর ঝিল্লী। সনৎ আর নিখিল দুটো চেয়ারে দূরে-দূরে বসেছে; আর মেদিনী মেঝের

ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে উদাসভাবে বসে আছে। সকলের মুখেই বিরক্তি ও অবসাদের ব্যঞ্জনা। ড্রয়িংরুমের দোরে ও বারান্দায় পুলিশ গিজগিজ করছে। রাখালবাবু একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে অধীরভাবে বারান্দায় পায়চারি করছেন।

ব্যোমকেশ পৌঁছুতেই রাখালবাবু তাকে বললেন—'সব তৈরি, এবার তবে আরম্ভ করা যাক।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল—'হিম্মৎলাল?'

রাখালবাবু বললেন—'তাকে লুকিয়ে রেখেছি। যথাসময়ে সে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে।'

'বেশ, এসো তা হলে। তোমার হাতে ওটা—? ও বুঝেছি।'

রাখালবাবু ব্যোমকেশকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলেন। সকলে নড়েচড়ে বসল, মকরন্দর মুখের ভ্রূকুটি গভীরতর হল। রাখালবাবু মাঝখানের নিচু টেবিলটাকে একপাশে টেনে এনে দুটো হাল্কা চেয়ার তার সামনে রাখলেন; হাতের সুটকেস টেবিলের ওপর রেখে ব্যোমকেশকে বললেন —'বসুন।' নিজে সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিমুখে একবার সকলের মুখের দিকে তাকাল, বলল—'আপনারা শুনে সুখী হবেন বেণীমাধববাবুর হত্যাকারী কে তা আমরা জানতে পেরেছি, আততায়ীর বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। আসামী এই ঘরেই আছে, এখনই তার পরিচয় পাবেন।'

সকলে সন্দেহভরা চোখে পরস্পর তাকাতে লাগল; বেশি দৃষ্টি পড়ল গঙ্গাধরের ওপর। ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলে চলল—'আমরা গোড়াতেই একটা ভুল করেছিলাম, ভেবেছিলাম বেণীমাধববাবুই আসামীর প্রধান লক্ষ্য। ভুলটা অস্বাভাবিক নয়; বেণীমাধববাবু বড়মানুষ ছিলেন, তিনি এমন উইল করতে যাচ্ছিলেন যাতে তাঁর উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ছিল; মেঘরাজ ছিল বেণীমাধবের দ্বাররক্ষী, বেণীমাধবকে যে-ব্যক্তি মারতে চায় সে মেঘরাজকে না মেরে ঘরে ঢুকতে পারবে না তাই তাকে মেরেছে। মেঘরাজের মতো লোক যে হত্যাকারীর প্রধান লক্ষ্য হতে পারে তা ভাবাই যায় না।

'আমি একদিন বেণীমাধববাবুর ঘরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলাম তাঁর ক্ষুর রয়েছে; সাবেক কালের লম্বা ক্ষুর, যে-ক্ষুর দিয়ে মেঘরাজ তাঁর দাড়ি কামিয়ে দিত। ক্ষুরটা খাপ থেকে বের করে পরীক্ষা করলাম, তাতে কোথাও একটিও আঙুলের ছাপ নেই; কে যেন খুব সাবধানে ক্ষুরটি মুছে খাপের মধ্যে রেখেছে। কিন্তু কেন? স্বাভাবিক অবস্থায় অন্তত মেঘরাজের আঙুলের ছাপ তাতে থাকা উচিত।

'সন্দেহ হল। সেই ক্ষুর দিয়ে আমি নিজে দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখলাম ক্ষুর একেবারে ভোঁতা, তা দিয়ে দাড়ি কামানো দূরের কথা, পেন্সিল কাটাও যায় না। তখন আর সন্দেহ রইল না যে, এই ক্ষুর দিয়েই দুজন লোকের গলা কাটা হয়েছে এবং তার ফলেই ক্ষুরটি ভোঁতা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষাতেও প্রমাণ হল যে, ওই ক্ষুর দিয়েই দুজনের গলা কাটা হয়েছিল।

'কিন্তু ক্ষুর ছিল ঘরের মধ্যে, আসামী এসেছিল বাইরে থেকে ; ঘরে ঢোকবার আগেই সে ক্ষুর পেল কোথা থেকে? নিশ্চয় কেউ ক্ষুরটি আগেই ঘর থেকে সরিয়েছিল।

'কে সরাতে পারে? সেদিন সকালে মেঘরাজ ওই ক্ষুর দিয়ে বেণীমাধবের দাড়ি কামিয়ে দিয়েছিল; তারপর সারাদিনে তাঁর ঘরে যারা এসেছিল তারা কেউ ক্ষুরের কাছে যায়নি। ও-ঘরে নিত্য আসে যায় কেবল দুজন ঃ মেঘরাজ আর মেদিনী। মেঘরাজ নিজে গলা কাটবার জন্যে ক্ষুর চুরি করবে না। তাহলে বাকি রইল কে?'

সকলের দৃষ্টি মেদিনীর ওপর গিয়ে পড়ল। মেদিনী দেওয়ালে ঠেস দিয়ে আগের মতোই বসে আছে, মাথার ওপরকার আঁচলটা দু-হাতে একটু তুলে ধরে নির্নিমেষ চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ সনৎ কথা বলল—'একটা কথা বুঝতে পারছি না। হত্যাকারী মামার ক্ষুর দিয়ে গলা

কাটতে গেল কেন? অন্য অস্ত্র কি ছিল না?'

ব্যোমকেশ বলল—'আসামী লোকটা ভারি ধূর্ত। সে জানে যে-অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয় সে-অস্ত্রকে বেবাক লোপাট করে দেওয়া সহজ নয়। তাই সে মতলব করেছিল, বেণীমাধবের ক্ষুর দিয়ে গলা কাটবার পর ক্ষুরটি ভালো করে মুছে যথাস্থানে রেখে দেবে, ওই ক্ষুর দিয়ে যে খুন হয়েছে এ-কথা কারুর মনেই আসবে না, পুলিশ অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াবে। বুঝতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। এবার আপনার বক্তৃতা শেষ করুন।'

ব্যোমকেশ আবার নির্লিপ্ত স্বরে বলতে আরম্ভ করল—'মেদিনী ছোটঘরের মেয়ে, কিন্তু পুরুষের চোখ দিয়ে যারা ওর পানে তাকিয়েছে তারাই জানে কী প্রচণ্ড ওর দেহের চৌম্বক শক্তি। সে সুচরিত্রা মেয়ে কি না তা আমরা জানি না। যদি কুচরিত্রা হয় তা হলে মনে রাখতে হবে যে, মেঘরাজ ও বৃদ্ধ বেণীমাধব ছাড়া বাড়িতে আরও পাঁচজন সমর্থ পুরুষ আছে। স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ আসক্তির ফলে অসংখ্য ট্র্যাজেডি ঘটেছে, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

'আমরা মেদিনীর ঘরে গিয়ে তাকে জেরা করেছিলাম; মেঘরাজের সৈনিক জীবনের দলিলপত্র থেকে তার দিল্লির ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। তারপর একটা প্রত্যাশিত জিনিস পেলাম। মেদিনীর একটি চুল-বাঁধার কাঠের বাক্স ছিল, তার ডালা খুলে দেখলাম আয়নার ওপর একটা ফটো আঁটা রয়েছে। মেদিনীর ফটো, সাম্প্রতিক ছবি। সে খাটের ধারে বসে হাসছে। আমি আবার বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিলাম, মেদিনী কিছু জানতে পারল না। পরদিন শুনলাম বাক্সটা চুরি গিয়েছে।' ব্যোমকেশ ঘাড় তুলে রাখালবাবুর পানে চাইল।

রাখালবাবু টেবিলের ওপরে সুটকেসটা খুলতে-খুলতে অবিচলিত মুখে বললেন—'চুরি গিয়েছিল, আমরা খুঁজে বার করেছি।' তিনি সুটকেস থেকে প্রসাধনের বাক্সটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন।

ব্যোমকেশ বলল—'ছবিটা আছে নিশ্চয়।'

রাখালবাবু ডালা খুলে বললেন—'আছে।' কে চুরি করেছিল, কোথায় পাওয়া গেল এ-সম্বন্ধে তিনি নীরব রইলেন। মনে হয়—চুরির ব্যাপারটা নিছক ধোঁকার টাটি।

ব্যোমকেশ বলল—'বেশ। তারপর আমরা বাড়ির অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে একে-একে দেখা করলাম। বাড়িতে যতগুলো বর্ষাতি ছিল সংগ্রহ করলাম; কেবল মকরন্দর বর্ষাতি পাওয়া গেল না। মকরন্দ সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখা দরকার—বেণীমাধবের হুকুমে মেঘরাজ তার গালে চড় মেরেছিল; অর্থাৎ দুজনেরই ওপর তার গভীর আক্রোশ। সে-রাত্রে ন'টার সময় সে বাড়িতে এসেছিল, তারপর গভীর রাত্রে কখন চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কেউ জানে না। সে যখন রেস-কোর্সে ধরা পড়ল তখন তার পকেটে পৌনে দুশো টাকা ছিল। কোথা থেকে সে এত টাকা পেল তা বলতে চায় না।

'যাহোক, বর্ষাতি কেন সংগ্রহ করলাম সেই কথা বলি। যারা মতলব এঁটে ঘুমন্ত লোকের গলা কাটতে যায় তারা জানে এই উপায়ে নিঃশব্দে খুন করা যায় বটে, কিন্তু আততায়ীর নিজের কাপড়-চোপড়ে প্রচুর রক্ত লাগার সম্ভাবনা। কাপড়-চোপড়ে রক্ত লাগলে সহজে ধোয়া যায় না, রক্তের দাগ থেকে যায়। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে খুন করবার সময় খুনী গায়ে বর্ষাতি চড়িয়ে নেয়; বর্ষাতির তেলা গায়ে যেটুকু রক্ত লাগে তা সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। পাশ্চাত্য রহস্য-রোমাঞ্চের বই যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই এ-কথা জানেন। আমরা বর্ষাতিগুলোকে মালিকের নামের টিকিট মেরে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দিলাম।

'তারপর আমি গেলাম দিল্লি। এতক্ষণে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আসামী কে, কিন্তু আরও পাকা প্রমাণের দরকার ছিল। দিল্লিতে গিয়ে যে-বস্তিতে মেঘরাজ থাকত, সেখানে খোঁজখবর নিতেই অনেক কথা বেরিয়ে পড়ল। মেদিনী মেঘরাজের স্ত্রী নয়। মেঘরাজ বিপত্নীক ছিল; বেণীমাধব যখন

তাকে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে এসো, তখন সে দিল্লি গিয়ে মেদিনীকে স্ত্রী সাজিয়ে নিয়ে এল। মেদিনীর স্বামী আছে, কিন্তু তার চরিত্র ভালো নয়; মেঘরাজের সঙ্গে আগে থাকতেই তার ঘনিষ্ঠতা ছিল; সে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এল। বুঝে দেখুন, মেদিনী কীরকম মেয়েমানুষ।'

মেদিনীর চোখ আতঙ্কে ভরে উঠেছিল, সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—'না, না, ঝুট বাত।'

ব্যোমকেশ রাখালবাবুর পানে চোখ তুলল, তিনি দোরের দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন—'হিম্মৎলাল!'

যে-পশ্চিমা যুবককে ব্যোমকেশ দিল্লি থেকে সঙ্গে এনেছিল সে ঘরে প্রবেশ করল; চুড়িদার পায়জামা ও শেরোয়ানি পরা ক্ষীণকায় যুবক। ব্যোমকেশ তার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেদিনীকে জিগ্যেস করল—'একে চিনতে পারো?'

মেদিনী তড়িৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভয়ার্ত চোখে হিম্মৎলালের দিকে একবার চেয়ে আবার মাটিতে আছড়ে পড়ল, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

'হিম্মৎলাল, মেদিনী তোমার কে?'

'জি, মেদিনী আমার বিয়াহী ঔরৎ, আমাকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, তুমি এখন বাইরে যাও।'

হিম্মৎলাল মেদিনীর পানে বিষদৃষ্টি হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল—'দেখা যাচ্ছে মেদিনীই যত নষ্টের গোড়া। সে স্বামীকে ছেড়ে মেঘরাজের সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল, তারপর এখানে এসে আর-একজন উচ্চতর বর্গের মানুষকে তার মোহময় কুহকজালে জড়িয়ে ফেলল। কিন্তু মেঘরাজ কড়া প্রকৃতির লোক, সে জানতে পারলে মেদিনীর উচ্চাশা ধূলিসাৎ হবে; তাই তাকে সরানো দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু একলা মেঘরাজকে খুন করলে ধরা পড়ার ভয় আছে, তাই মেঘরাজের সঙ্গে বেণীমাধবকেও খুন করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বেণীমাধবের সঙ্গে তাঁর ছেলেমেয়েদের বিরোধ যে বেশ ঘনিয়ে উঠেছে তা মেদিনীর অজানা ছিল না।

'কিন্তু সত্যিই কি মেদিনী নিজের হাতে দুর্জনের গলা কেটেছে? ছোরা-ছুরি-ক্ষুর মেয়েদের অস্ত্র নয়, মেয়েদের অস্ত্র বিষ; বিষ খাওয়াবার সুযোগ থাকলে তারা ছোরা-ছুরি ব্যবহার করে না। মেদিনীর বিষ খাওয়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সে বেণীমাধব ও মেঘরাজের খাবার নিজের হাতে রান্না করত।

'দেখা যাক, মেদিনীর সহকারী কে। মেদিনী, তোমার চুল-বাঁধার বাক্সে আয়নার গায়ে একটা ফটো লাগানো আছে। কে ফটো তুলেছিল?'

মেদিনী উত্তর দিল না, মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ব্যোমকেশ তখন সনতের দিকে ফিরে বলল—'সনৎবাবু, আপনি ফটোগ্রাফির বিশেষজ্ঞ, দেখুন তো একবার ছবিটা।'

সনৎ ব্যোমকেশের পানে সন্দেহভরা ভ্রূকুটি করল, তারপর অনিচ্ছাভরে উঠে এল। রাখালবাবু বাক্সের ডালা খুলে ধরলেন। সনৎ সামনে ঝুঁকে ছবিটা দেখল; তার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'মেদিনীর ছবি।'

ব্যোমকেশ বলল—'কে ছবি তুলেছে বলতে পারেন।

'তা কী করে বলব!'

'ভালো করে দেখুন। মেদিনীকে খাটে বসিয়ে ছবি তোলা হয়েছে, মেদিনীর পেছনে খাটের মাথায় কারুকার্য দেখা যাচ্ছে। কার খাট চিনতে পারছেন না?'

সনতের চোখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল—'কী বলতে চান আপনি?'

ব্যোমকেশ বলল—'আপনি নিজের ঘরে রাত্তির বেলা ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে মেদিনীর ছবি তুলেছিলেন। আপনি মেদিনীর গুপ্ত-প্রণয়ী। মেঘরাজ যখন বেণীমাধবের দোরের সামনে শুয়ে ঘুমোত তখন মেদিনী আপনার ঘরে যেত।'

সনৎ কিছুক্ষণ জবাফুলের মতো লাল চোখে চেয়ে রইল, শেষে বিকৃত গলায় বলল—'তাতে কি প্রমাণ হয় আমি মামাকে খুন করেছি?'

'সনৎবাবু, আপনি মেদিনীর মোহে পড়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়েছিলেন, মেঘরাজকে খুন করে মেদিনীর ওপর একাধিপত্য স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। আপনার বোধহয় প্ল্যান ছিল খুনের মামলা মিটে গেলে মেদিনীকে নিয়ে অন্য কোথাও বাসা বাঁধবেন।'

'আমি খুন করিনি।'

'আপনার দেহে খুনীর রক্ত আছে, আপনার বাবা আপনার মাকে খুন করে ফাঁসি গিয়েছিলেন।'

'আমি খুন করিনি। খুন করেছে—ওই মেদিনী।'

মেদিনী ধড়মড়িয়ে হাঁটুর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—'নেহি-নেহি-নেহি—।'

ব্যোমকেশ বলল—'ঠিক কথা। মেদিনী নিজের হাতে খুন করেনি। খুন করেছেন আপনি।'

'প্রমাণ আছে?'

'ছোট্ট একটা প্রমাণ আছে। খুন করার পর আপনি বর্ষাতিটাকে খুব ভাল করেই ধুয়েছিলেন, কিন্তু পকেটের মধ্যে কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়ে গিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, রক্তটা বেণীমাধববাবুর ব্লাড-গ্রুপের রক্ত।'

মেদিনী বলে উঠল—'হাঁ-হাঁ, সনৎবাবু খুন করেছে, আমি কিছু জানি না, আমি বেকসুর।'

হঠাৎ সনৎ বুনো মোষের মতো ঘাড় নিচু করে চাপা গর্জন করতে-করতে মেদিনীর দিকে অগ্রসর হল। কিন্তু দুজন সাব-ইন্সপেক্টর ইতিমধ্যে সনতের দু-পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা সনতকে ধরে ফেললেন। রাখালবাবু তার হাতে হাতকড়া পরালেন। সনতের ক্ষিপ্র উন্মত্ততা হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দুই প্রহরীর মাঝখানে সে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মেদিনী আবার বলে উঠল—'আমি কিছু জানি না, আমি বেকসুর।'

ব্যোমকেশ মাথা নেড়ে বলল—'না মেদিনী, তুমি বেকসুর নও। বেণীমাধববাবুর ক্ষুর চুরি করে তুমিই সনৎবাবুকে দিয়েছিলে। তারপর সে যখন গভীর রাত্রে ফিরে এসে সদর দোরে টোকা দিয়েছিল তখন তুমি দোর খুলে তাকে ভিতরে এনেছিলে; সে কাজ সেরে চলে যাবার পর তুমি দোর বন্ধ করে দিয়েছিলে। তোমরা দুজন সমান অপরাধী।'

মেদিনী আবার মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে। আসামী দুজনকে চালান করে দিয়ে রাখালবাবু বাড়ির ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়েছেন। বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যা। রাখালবাবু সনতের ঘরে গিয়ে তার আলমারি খুলে অ্যালবামের সারি থেকে একটি-একটি অ্যালবাম খুলে পাতা উল্টে দেখছিলেন। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে-টানতে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

রাখালবাবু অবশেষে একটি অ্যালবাম হাতে নিয়ে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন, নিবিষ্ট মনে অ্যালবামের ছবিগুলি দেখতে লাগলেন। প্রতি পৃষ্ঠায় একটি শিথিলবসনা তরুণীর ছবি। শিকারী যেমন বাঘ শিকার করে তার চামড়া দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে, সনৎ যেন প্রকারান্তরে তাই করেছে।

অ্যালবাম শেষ করে রাখালবাবু একটি নিশ্বাস ফেললেন, সিগারেট ধরিয়ে বললেন—'সনৎ গাঙ্গুলির রক্তে হয়তো পাগলামির বীজ আছে, কিন্তু সে যে একটি রসিক চূড়ামণি তাতে সন্দেহ নেই।'

ব্যোমকেশ কাছে এসে অ্যালবামের পাতা উল্টে দেখল, তারপর বলল—'শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য বলেছেন, নারী নরকের দ্বার। সনৎ নরকের অনেকগুলো দ্বার খুলেছিল, তাই শেষপর্যন্ত তার নরক-প্রবেশ অনিবার্য হয়ে পড়ল।'

'কিন্তু সনৎ মেদিনীর মতো মেয়ের জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাজ করল ভাবতে আশ্চর্য লাগে।'

'রাখাল, মেদিনীর মতো মেয়েকে তুচ্ছজ্ঞান কোরো না। যুগে-যুগে এই জাতের মেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছে—কখনও ধনীর ঘরে, কখনও দরিদ্রের ঘরে—পুরুষের সর্বনাশ করার জন্যে। দ্রৌপদী এই জাতের মহিলা ছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মূলে আছেন দ্রৌপদী। ইলিয়ডের হেলেনও তাই। এ-যুগেও এই জাতের মেয়ের অভাব নেই। ওরা সকলেই যে চরিত্রহীনা তা নয়, কিন্তু ওদের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা পুরুষকে—বিশেষত সনৎ-এর মতো দুশ্চরিত্র পুরুষকে—খেপিয়ে দিতে পারে, কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ত করে তুলতে পারে। জ্যেষ্ঠ আলেকজান্ডার দুমা একটা বড় দামি কথা বলেছিলেন —cherchez la femme ঃ যেখানে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে সেখানে মেয়েমানুষ খুঁজবে, মূলে মেয়েমানুষ আছে।'

'তা বটে।' রাখালবাবু উঠলেন—'দেখা যাচ্ছে বেণীমাধবের মেয়ে এবং পুত্রবধূ তাঁকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করেনি, বৃদ্ধের জীর্ণ পাকযন্ত্রই দায়ী। চলুন, এবার যাওয়া যাক। সন্ধে হয়ে গেছে, এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্যে প্রাণ কাঁদছে।'

'চলো আমার বাড়িতে, তরিবৎ করে চা খাওয়া যাবে।'

'উত্তম প্রস্তাব।'

ঘরের বাইরে এসে রাখালবাবু দোরে তালা লাগালেন, তারপর সদর দরজার দিকে যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন ঝিল্লী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, তার পিছনে প্রকাণ্ড ট্রে-র ওপর চায়ের সরঞ্জাম এবং কচুরি-নিমকির প্লেট নিয়ে দাসী আসছে। ব্যোমকেশ বলল—'রাখাল, তোমার প্রাণের কান্না ভগবান শুনতে পেয়েছেন। চলো, ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসা যাক।'

রাখালবাবু সাবধানী লোক, বললেন—'দাঁড়ান, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।'

ঝিল্লী তাদের কাছে এসে সলজ্জ স্বরে বল্লল—'মা আপনাদের জন্যে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

'দেখলে তো?' সকলে ড্রয়িংরুমে গেল। ঝি টেবিলের ওপর ট্রে রেখে চলে গেল; ঝিল্লীও তার অনুগমন করছিল, ব্যোমকেশ বলল—'ঝিল্লী, আমরা বড় ক্লান্ত; তুমি আমাদের চা ঢেলে দাও, আমরা বসে-বসে খাই।'

ঝিল্লী ফিরে এসে টি-পট থেকে তাদের চা ঢেলে দিল, জলখাবারের প্লেট তাদের সামনে রাখল। ব্যোমকেশ অর্ধমুদিত চোখে কচুরি চিবোতে-চিবোতে দেখল, ঝিল্লী গুটি-গুটি দোরের দিকে যাচ্ছে।

'ঝিল্লী, শোনো, চলে যেয়ো না। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ঝিল্লী থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর আস্তে-আস্তে ফিরে এসে ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়াল। ব্যোমকেশ সংকেতভরা চোখে রাখালবাবুর পানে তাকাল; রাখালবাবু অলসভাবে চায়ের পেয়ালা শেষ করে একটি গানের কলি গুঞ্জন করতে-করতে ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

ঝিল্লী ব্যোমকেশের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। তার যে বুক ঢিবঢিব করছে তা তার মুখ দেখে বোঝা যায় না। ব্যোমকেশ খাটো গলায় একটু হাসল, বলল—'সম্পর্কে নিখিল তোমার মামা হয় বটে, কিন্তু অনেক দূরের সম্পর্ক। আইনত বিয়ে আটকায় না।'

ঘরের ছায়া-ছায়া অন্ধকারে দেখা গেল না—ঝিল্লীর মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। তারপর তার ক্ষীণস্বর শোনা গেল—'কী করে জানলেন?'

ব্যোমকেশ বলল—'বোকা মেয়ে! সবগুলো চিঠিতেই তোমার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

—আচ্ছা, তুমি এখন কোণের চেয়ারে গিয়ে বোসো। আরও কথা আছে।'

ঝিল্লী নেংটি ইঁদুরের মতো ঘরের অন্ধকার কোণে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘরে যেন ব্যোমকেশ ছাড়া আর কেউ নেই।

বাইরে দু-জোড়া জুতোর শব্দ শোনা গেল। রাখালবাবু নিখিলকে নিয়ে ফিরে এলেন।

'রাখাল, আলোটা জ্বেলে দাও।'

দোরের পাশে স্যুইচ। রাখালবাবু স্যুইচ টিপলেন, কয়েকটা উজ্জ্বল বাল্‌ব জ্বলে উঠল। নিখিল কোনওদিকে না তাকিয়ে ব্যোমকেশের পাশে গিয়ে বসল, অনুরাগপূর্ণ চোখে তার পানে চেয়ে বলল —'ব্যোমকেশদা, আপনি ভেলকি জানেন। সনৎদা আমার মাসতুতো ভাই, তাকে সারাজীবন দেখছি, কিন্তু সে যে এমন মানুষ তা ভাবতেও পারিনি।'

ব্যোমকেশ বলল—'নিখিল, মুখ দেখে যদি মানুষের মনের কথা জানা যেত, তা হলে আইন, আদালত, পুলিশ, সত্যান্বেষী কিছুই দরকার হত না; তুমিও মুখ দেখেই বুঝতে পারতে কোন মেয়েটি তোমাকে বেনামী চিঠি লেখে।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' নিখিল ব্যোমকেশের আর একটু কাছে ঘেঁষে বসল, ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস করে বলল—'আপনি কিছু বুঝতে পেরেছেন নাকি?'

ব্যোমকেশ হাসল—'আগে তুমি বলো দেখি, মেয়েটির সন্ধান যদি পাওয়া যায় তুমি কী করবে?'

নিখিলের চোখ উদ্দীপনায় জ্বলজ্বল করে উঠল—'কী করব? বিয়ে করব। কানা হোক, খোঁড়া হোক, কাফ্রি হোক, হাবসি হোক, তাকে বিয়ে করব।'

ব্যোমকেশ বলল—'তাহলে সন্ধান পাওয়া গেছে। ঝিল্লী, এদিকে এসো।'

নিখিল চকিত হয়ে দোরের দিকে চাইল। ওদিকে ঘরের কোণে ঝিল্লীর সাড়াশব্দ নেই, সে চেয়ারের পিছনে লুকিয়েছে। নিখিল ব্যোমকেশের দিকে ফিরে উত্তেজিতস্বরে বলল—'কাকে ডাকলেন?'

'এই যে দেখাচ্ছি—' ব্যোমকেশ উঠে গিয়ে ঝিল্লীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করাল, তাকে হাত ধরে নিখিলের কাছে এনে বলল—'এই নাও তোমার ঝিঁঝিঁপোকা! ঝিঁঝিঁপোকাকে চোখে দেখা যায় না, কেবল ঝংকার শোনা যায়। আমরা কিন্তু ধরেছি।'

নিখিলের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম করল। সে দু-হাত তুলে চিৎকার করল—'অ্যাঁ! ঝিল্লী—ঝিল্লী আমাকে চিঠি লেখে! ঝিল্লী আমাকে ভালোবাসে! কিন্তু—কিন্তু ও যে আমার ভাগনী!'

ব্যোমকেশ হেসে বলল—'ভয় নেই, ভয় নেই। ঝিল্লী ভারি সেয়ানা মেয়ে, অপাত্রে হৃদয় সমর্পণ করেনি। তোমাদের যা সম্পর্ক তাতে বিয়ে আটকায় না।'

ঝিল্লীর মুখ অবনত, ঠোঁটের কোণে ভীরু হাসির যাতায়াত। নিখিলের মুখে ক্রমে-ক্রমে একটি প্রকাণ্ড হাসি ফুটে উঠল, সে বলল—'উঃ! কী সাংঘাতিক আজকালকার মেয়ে দেখেছেন ব্যোমকেশদা, আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিল! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। বিয়েটা হয়ে যাক—।'

এইসময় দোরের সামনে গঙ্গাধরকে দেখা গেল। লাঠি হাতে সে বোধহয় সায়াহ্নিক নিত্যকর্ম করতে বেরুচ্ছিল। ঘরের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে ঘরে ঢুকেছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যেই তার মেজাজ আবার সপ্তমে চড়ে গিয়েছে, সে রাখালবাবুকে লক্ষ্য করে কড়া সুরে বলল—'এখানে আপনার কাজ শেষ হয়েছে, এখনও এখানে রয়েছেন কেন?' রাখালবাবু উত্তর দেবার আগেই তার চোখ পড়ল ঝিল্লীর ওপর, অমনি ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বলল—'ঝিল্লী! তুই এখানে পুরুষদের মধ্যে কী করছিস?'

বাপকে দেখে ঝিল্লী একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, এখন চমকে উঠে ব্যোমকেশের পিছনে লুকোবার চেষ্টা করল। গঙ্গাধর বলল—'ধিঙ্গি মেয়ে! পুরুষ-ঘেঁষা স্বভাব হয়েছে। চাবকে লাল করে দেব।'

নিখিল হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল, একলাফে গঙ্গাধরের সামনে গিয়ে বলল—'মুখ সামলে কথা বলুন। ঝিল্লীকে আমি বিয়ে করব।'

গঙ্গাধর প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল, তারপর তারস্বরে চিৎকার ছাড়ল—'কী, আমার মেয়েকে বিয়ে করবি তুই, হতভাগা ছাপাখানার ভূত! ঠেঙিয়ে তোর হাড় ভেঙে দেব না!' সে লাঠি আস্ফালন করতে লাগল।

এইবার গায়ত্রী ঘরে ঢুকল, উগ্র দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল—'কী হয়েছে, এত চেঁচামেচি কিসের?'

গঙ্গাধর কর্ণপাত করল না, চেঁচিয়ে বলল—'বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে। ছোট মুখে বড় কথা। আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি!'

ঝিল্লী ছুটে গিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল—'মা, তুমি যদি অমত করো আমি বিষ খেয়ে মরব।' চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ঝিল্লীর মুখে কথা ফুটেছে।

গায়ত্রী একবার নিখিলকে ভালো করে দেখল, যেন আগে কখনও দেখেনি। নিখিল গিয়ে তার পায়ের ধুলো নিল। বলল—'দিদি, ঝিল্লীকে আমি—মানে আমাকে ঝিল্লী বিয়ে করতে চায়। ব্যোমকেশদা বলেছেন, সম্পর্কে বাধে না।'

গায়ত্রী ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করল—'সত্যি সম্পর্কে বাধে না?'

ব্যোমকেশ বলল—'না, ওরা first cousin নয়, সম্পর্কে বাধে না।'

গঙ্গাধর আরও গলা চড়িয়ে চিৎকার করল—'শুনতে চাই না, কোনও কথা শুনতে চাই না। বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ি থেকে, এইদণ্ডে বেরিয়ে যাও—।'

গায়ত্রী ধমক দিয়ে উঠল—'থামো তুমি। বাড়ি তোমার নয়, বাড়ি আমার। আমি সুধাংশুবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি; বাবা উইল করার আগেই মারা গেছেন, আইনত তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অর্ধেক আমার, এ-বাড়িরও অর্ধেক আমার। তুমি বাইরে যেখানে যাচ্ছিলে যাও না। যা করার আমি করব।'

গঙ্গাধর পিন ফোটানো খেলনার বেলুনের মতো চুপসে গেল, তারপর ঘাড় হেঁট করে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

গায়ত্রী ঝিল্লীর বাহুবন্ধন থেকে গলা ছাড়িয়ে তার হাত ধরে সোফায় বসল, নিখিলের দিকে চেয়ে হাকিমের মতো হুকুম করল—'কী কাণ্ড তোমরা বাধিয়েছ এবার বলো শুনি।'

নিখিল বলল—'আমি কিছু জানি না দিদি, ওই ওকে জিগ্যেস করো। ব্যোমকেশদা, চিঠিগুলো কোথায়?'

ব্যোমকেশ পকেট থেকে চিঠি বের করে দিয়ে বলল—'রাখাল, চলো, এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। গায়ত্রী দেবী, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিখিল, তুমি যে-বউ পেলে অনেক ভাগ্যে এমন বউ পাওয়া যায়। ঝিল্লী, তুমিও কম সৌভাগ্যবতী নও। জীবনে যে-জিনিস সবচেয়ে দুর্লভ, সেই দুর্লভ হাসি তুমি পেলে। তোমাদের জীবনে হাসির ঢেউ খেলতে থাকুক। এসো রাখাল।'

শাহী শিরোপা

প্রমথনাথ বিশী

এক

পঞ্চানন হঠাৎ এমন চিঠি লিখতে গেল কেন, তা-ও আবার পুলিশ হাজত থেকে, কিছুই বুঝতে পারছি না। পুলিশে কেন তাকে ধরবে! চুরি-ডাকাতি তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে ধনী; সরকার-বিরোধিতাও অসম্ভব, সে ভালোমানুষ। তবে আর কী হতে পারে?

অনেকক্ষণ চিন্তার পরেও যখন হদিশ পেলাম না, ভাবলাম অনির্বাণের কাছে যাওয়া যাক। পঞ্চানন আমাদের দুজনেরই বন্ধু, স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত একসঙ্গে আমরা পড়েছি।

উঠব-উঠব ভাবছি, এমনসময় হঠাৎ দরজা খুলে গেল আর প্রবেশ করল অনির্বাণ রায় স্বয়ং।

এসো, এসো, তোমার কথাই ভাবছিলাম; এসেছ ভালোই হয়েছে, নতুবা আমাকেই যেতে হত।

তবেই দ্যাখো, প্রবাদগুলো একেবারে মিথ্যে নয়। ইংরেজিতে বলে, শয়তানের কথা ভাবলেই এসে উপস্থিত হয় সে।

শয়তান না হোক অন্তর্যামী দেবতাকে এখন বিশেষ প্রয়োজন।

আরে শয়তানই কি কিছু কম অন্তর্যামী? কী হয়েছে বলো।

পঞ্চানন পুলিশ হাজত থেকে চিঠি লিখে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছে, তোমাকেও স্মরণ করেছে। দ্যাখো।

তারচেয়ে তুমি পড়ো, আমি শুনি। পাঠকের চেয়ে শ্রোতা হিসাবে আমি বেশি নির্ভরযোগ্য।

এই বলে সে গরম চাদরখানা টেনে নিয়ে বেশ জমিয়ে বসল, এমনসময়ে গুপী দু'পেয়ালা গরম চা নিয়ে ঢুকল। গুপী অনেকদিন আছে আমার কাছে, কখন চা জোগাতে হবে জানে।

নাও পড়ো।

ভাই জগবন্ধু, পুলিশ-হাজত থেকে আমার এ-চিঠি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে যাবে। কাল যখন আমাকে গ্রেপ্তার করল, আমিও কম অবাক হইনি। রাজার উত্তরাধিকারী হয়ে আজ আমি চুরির অপবাদগ্রস্ত। সবকথা লিখবার সময় নেই। এর মধ্যে কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে বলে আশঙ্কা। তুমি উকিল, সহজেই জামিন হতে পারবে, অন্য পরামর্শেরও দরকার। যদি হাতের কাছে পাও অনির্বাণকে এনো, পরের দায় বহন করাই তার পেশা, এ-ক্ষেত্রে দায়টা গুরুভার। ইতি—

পঞ্চানন রায়

চা শেষ হয়ে গিয়েছে, চুরুট ধরিয়েছে অনির্বাণ, জ্বলন্ত চুরুট প্রায় তার নিত্যলক্ষণ, বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, সার্থকনামা।

কী বুঝলে?

বুঝবার মতো কিছুই তো নেই চিঠিতে, তবে এ-কথা নিশ্চয়, পঞ্চাননের পক্ষে চুরি-ডাকাতি করা আর দিনেরবেলায় অমাবস্যার চাঁদ দেখা সমান সম্ভব। খুব সম্ভব ওর কথাই ঠিক, কোথাও একটা মস্ত ভ্রান্তি বা রহস্য আছে নিশ্চয়।

এখন কী করবে?

যাব,—এই বলে সে উঠে দাঁড়াল। গুপীকে ট্যাক্সি ডাকতে বলে দুজনে নিচে এসে দাঁড়ালাম।

অল্প আয়াসেই পঞ্চাননের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

আমি উকিল, পুলিশে-উকিলে একটা অলিখিত সন্ধি আছে। অনির্বাণকে নিয়ে হাজতে ঢুকে দেখলাম যে, একখানা বেঞ্চির একান্তে পঞ্চানন উপবিষ্ট, চোখমুখ ম্লান, গায়ের কাপড় একরাত্রি হাজতবাসেই মলিন।

বেশ বুঝতে পারা গেল সারারাত ওইভাবে বসে কাটিয়েছে।

আমাদের দেখে তার মুখে-চোখে ভরসার ভাব ফুটে উঠল। বলল, আমি জানতাম নিশ্চয় তোমরা আসবে।

আমি বললাম, আসব না এমন সম্ভাবনাও কি ছিল?

তিনজনেই গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালাম, কারণ লকআপে আরও দু-তিনজন লোক ছিল, একটু নির্জনতা আবশ্যক।

চুপ করে থাকলেই অস্বস্তির ভাব প্রবল হয়ে উঠবে, তাই ভূমিকা না করে একেবারেই ঘটনা বিবরণের মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

কী ব্যাপার বলো তো!

লকআপে ধূমপানের নিয়ম না থাকায় অনির্বাণ এখন নিতান্ত নির্বাণ নীরব শ্রোতামাত্র।

পঞ্চানন আরম্ভ করল, ব্যাপার কিছুই জানিনে, হঠাৎ পরশুদিন বাসায় পুলিশ গিয়ে উপস্থিত, বলে, রংপুর থেকে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা এসেছে।

আমি শুধোলাম, কী চার্জ?

দারোগা বলল, জানি না।

আমি জামিনে খালাস চাইলাম, দারোগা বলল, নন বেলেবেল ওয়ারেন্ট, জামিন চলবে না। তখন একটুখানি সময় চেয়ে নিয়ে তোমাকে চিঠি লিখে ডাকে দিলাম। তারপর এখন যেমন দেখছ সেইভাবে বসে আছি।

অনির্বাণ বলল, তুমি থাকো তো রংপুরে।

রংপুর জেলায় তাহেরগঞ্জে, সংশোধন করে দিল পঞ্চানন।

কলকাতায় ক'দিন এসেছ?

পাঁচ-ছ'দিন। বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে, ওয়ারেন্ট আমার পিছু-পিছু রওনা হয়েছে।

ওখানে থাকতে কিছু বুঝতে পারোনি?

কিছুমাত্র না।

পঞ্চানন ও অনির্বাণের মধ্যে সংবাদ চলছিল, আমি শুনছিলাম।

কিছুমাত্র নয়?

এবারে তাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখা গেল, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দ্যাখো, সত্যি কথা বলতে কি, কিছুকাল থেকে একটা কেমন যেন রহস্যের মতো অনুভব করছিলাম।

কীরকম খুলে বলো।

খুলেই যদি বলতে পারব তবে আর রহস্য বলতে যাব কেন?

তবু—।

তবে আমার পারিবারিক বিবরণের একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক।

এবারে আমি বললাম, আমি মোটামুটি জানি, অনির্বাণ অল্পই জানে, তাকে বলো : আমার অজানা কিছু থাকলে ওর কাছে শুনে নেব।

কিন্তু তুমি চললে কোথায়?

তোমার জন্যে কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি, কাল থেকে খাওয়া হয়নি বুঝতে পারছি।

সেইসঙ্গে গোটা দুই ডাব এনো, একটা এখন খাব, একটা থাকবে। এখানকার জল অপেয়।

পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক যে, এ-ঘটনা সন্দেশ নিয়ন্ত্রণের অনেক আগের, ইংরেজ আমলের।

পঞ্চাননকে খাইয়ে জামিনের দরখাস্ত করতে গিয়ে শুনলাম যে, এখানে জামিন পাওয়া যাবে না। রংপুরের পুলিশের পরওয়ানাবলে গ্রেপ্তার হয়েছে আসামী, কলকাতার পুলিশ তাকে পাঠিয়ে দেবে রংপুরে—সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ইচ্ছা করলে জামিন দিতে পারেন।

আরও জানতে পেলাম যে, পঞ্চাননের বিরুদ্ধে চার্জ গুরুতর। চুরির চার্জ। তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'হয়ারলুম' মোতির হার চুরির অভিযোগ।

পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করতে যখন পরওয়ানা নিয়ে গিয়েছিল তখনই তার এ-খবর জানবার কথা। হয় জেনেছিল কিন্তু লজ্জায় আমাদের বলতে পারেনি, নয় গ্রেপ্তারি পরওয়ানা দেখে এমনই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, চার্জ জিজ্ঞাসা করবার কথা মনে ছিল না, কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, অকস্মাৎ অবস্থা-বিভ্রাটের মধ্যে পড়ে সব ভুলে গিয়েছে। যাই হোক, এখানে আর করণীয় কিছু ছিল না।

পঞ্চাননকে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে, এখানে জামিন পাওয়া যাবে না, তাকে রংপুর যেতে হবে। আমরাও রংপুর যাব বলে রওনা হলাম, হয়তো এক গাড়িতেই যাব। আরও জানালাম যে, আমরা গিয়ে একেবারে তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে উঠব, যা করবার সেখান থেকেই করতে হবে। তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে আমরা একেবারে অপরিচিত নই, আগে বার দুই পঞ্চাননের সঙ্গেই গিয়েছি।

বাসায় ফিরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। অনির্বাণকে বললাম, এখন বাসায় যেয়ো না, এখানেই খেয়ে নাও, আজ রাতেই নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে রওনা হতে হবে। গাড়িতে নিরিবিলি বসে শুনব, পঞ্চাননের সঙ্গে কী কথা হয়েছিল তোমার।

যথাসময়ে শিয়ালদা স্টেশনে এসে সেকেন্ড ক্লাস কামরায় দুজনে উঠলাম।

ভাগ্যক্রমে গাড়িখানা ফাঁকা ছিল। পঞ্চাননকে পুলিশ নিয়ে এল কি না বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি ছেড়ে দিলে অনির্বাণকে বললাম, এবারে বলো কী কথা হল তোমার সঙ্গে।

অনির্বাণ বলল, তুমি বোধহয় লক্ষ করেছ যে, আমি এতক্ষণ বেশি কথা বলিনি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেন? তুমি অবশ্য কম কথার মানুষ, কিন্তু এত বেশি নীরবতা তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়।

নিতান্ত মিথ্যে বলোনি, জগবন্ধু। পঞ্চানন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে মন্তব্য করেছিল যে, মস্ত একটা রহস্যের জালে সে ধরা পড়েছে, এ-গ্রেপ্তারি পরওয়ানা তারই একটা মোটা সুতো।

আমি বললাম, রহস্য। কথাটা আমি থাকতেই একবার বলেছিল, তোমার কাছে বিস্তারিত আর কী বলল?

অনির্বাণ গুছিয়ে বসে নিয়ে বলল, তবে শোনো। তুমি তো জানো যে, পঞ্চানন রাজাবাহাদুরের উত্তরাধিকারী দত্তকপুত্র।

ভাই অনির্বাণ, আমি এ-সমস্তই জানি, নূতন কিছু থাকে তো বলো।

নেহাত মন্দ বলোনি। যাই হোক, যদি জানো তবু আর-একবার শুনতে বাধা নেই, বারবার শুনতে-শুনতে রহস্য কিছু ফিকে হয়ে আসতে পারে।

বরঞ্চ আমিই বলি। ওর পারিবারিক অবস্থা তোমার চেয়ে আমি ভালো জানি, তুমি দেখো পঞ্চানন যা বলেছে তার সঙ্গে কোথাও গরমিল হয় কি না।

বেশ, তাই হোক, তুমি বলো আমি চেক করি।

আমি আরম্ভ করলাম।

তাহেরগঞ্জের রাজাবাহাদুর কৃষ্ণবিলাস অপুত্রক, মৃতদার ও বৃদ্ধ। বৃহৎ ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী না থাকায় দরিদ্র এক বাল্যবন্ধুর পুত্র পঞ্চাননকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। আইনত সে-ই উত্তরাধিকারী বটে। আর কেবল আইনত উত্তরাধিকারী বলে নয়, রাজাবাহাদুরের সমস্ত পুত্রস্নেহেরও সে অধিকারী। রাজবাড়িতে তার সুখ ও সম্মানের অন্ত নেই। সুখ রাজাবাহাদুরের কাছে, সম্মান আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীদের কাছে। সবাই জানে, পঞ্চানন হচ্ছে ভাবী মালিক ও রাজাবাহাদুর। ওই পদবীটা ওদের উত্তরাধিকারী সূত্রে চলে। কেমন, ঠিক হচ্ছে কি না?

চুরুটের আগুনে দীপ্ত মুখমণ্ডল অনির্বাণ উত্তর করল, বলে যাও।

সবাই প্রসন্ন মনে পঞ্চাননকে গ্রহণ করেছে। কেন না করবে? চেহারায় ও স্বভাবে সে রাজসম্মানের যোগ্য। এদিকে রাজাবাহাদুরও ক্রমে-ক্রমে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাকে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। পুরুষানুক্রমে ওঁদের সঞ্চিত সোনা-রুপোর অলঙ্কার ও তৈজস, হীরে-জহরত প্রচুর। আকবরি মোহর থেকে কুইন ভিক্টোরিয়ার মোহর, তার সংখ্যাও বড় কম নয়। রাজাবাহাদুরের ব্যাঙ্কের উপরে আদৌ বিশ্বাস নেই, সমস্তই থাকে রাজবাড়িতে চোরা-কুঠুরিতে। কেমন, অবিকল হচ্ছে তো?

হচ্ছে, তবে এখনও আসল দুটি প্রসঙ্গই বাকি।

দুটি কোথায়, একটি। জাহাঙ্গীরের দত্ত সেই মোতির মালা। সেটাও দেখেছে পঞ্চানন। সেটা দেখিয়ে রাজাবাহাদুর বললেন, বাবা পঞ্চানন, এই শিরোপা-ই তাহেরগঞ্জের রাজপরিবারের বনিয়াদ। কতদিন আমি স্বপ্ন দেখেছি, মহাপুরুষ বলছেন, যতদিন এটা পুরুষানুক্রমে চলবে, হস্তান্তর না হবে ততদিন এই পরিবারের মান-সম্মান, ঐশ্বর্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, অন্য কারও হাতে গেলেই ধ্বংস শুরু হবে তাহেরগঞ্জ রাজপরিবারের। অনির্বাণ, এসব কথা তুমিও শুনেছ, আমিও শুনেছি পঞ্চাননের মুখে, তোমার চেয়ে আমাকেই বেশিবার শুনতে হয়েছে, আমার পাশেই তার তক্তপোশ ছিল।

পরপর চুরুটে অনেকগুলি টান দিয়ে সে বলল, আর-একটি প্রসঙ্গ যে বাদ দিলে—দেওয়ানজির কথা!

ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। বুড়ো দেওয়ানজি। হ্যাঁ, সেই বুড়ো দেওয়ানজি পঞ্চাননের উপর আদৌ সন্তুষ্ট নন। পঞ্চানন বলে, গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন, এখন রীতিমত প্রতিকূল হয়ে উঠেছেন।

কেন কিছু অনুমান করতে পারো কি?

পঞ্চানন কিছু অনুমান করতে পারেনি?

দ্যাখো, পঞ্চানন খুব সরল মানুষ, ওর মনে কিছুই আসেনি। তবে ওর দিকেও তো দু-চারজন আছে, তারা ওকে দেওয়ানজির অসন্তোষের কারণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছে। দেওয়ানজি হচ্ছেন, রাজাবাহাদুরের পিসতুতো ভাই, নিকট সম্বন্ধ, বয়সে কিছু বড়। রাজাবাহাদুর অপুত্রক, গত হলে তাঁরই সম্পত্তি পাওয়ার কথা। হঠাৎ দত্তকপুত্ররূপে পঞ্চানন এসে পড়ায় সেই আশায় ছাই পড়েছে। তিনি নাকি দত্তক গ্রহণের বিরুদ্ধে অনেকদিন বুঝিয়েছেন রাজাবাহাদুরকে। ওদিকে আবার জ্ঞাতিদের মধ্যে যাদের আক্রোশ দেওয়ানজির উপরে তারা রাজাবাহাদুরকে দত্তক নিতে উৎসাহ দিয়েছে। অনেককাল কী করি কী করি চিন্তা করতে-করতে অবশেষে দত্তক গ্রহণ করলেন তিনি।

তাই বলো, এত কথা জানতাম না। এমন ক্ষেত্রে রাগ হতেই তো পারে দেওয়ানজির। তা হলে এই হল গিয়ে রহস্য।

অনির্বাণ একটি নূতন চুরুট ধরাতে-ধরাতে বলল, যাই হোক, এর মধ্যে আর রহস্য কী আছে? এ তো মানব স্বভাবের নিত্যধর্ম। মুখের গ্রাস ছুটে গেলে কার না রাগ হয়!

কিছুক্ষণ কোনও কথা না বলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল অনির্বাণ।

বাইরে অন্ধকারে রেলপথের দু'ধারে অস্পষ্ট জঙ্গলের মধ্যে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ জোনাকি জ্বলছে আর নিবছে, রীতিমতো অগ্নিস্ফুলিঙ্গের হরির-লুঠ আর সেইসঙ্গে ভেসে আসছে পাট-পচানো স্নিগ্ধ গন্ধ।

দুজনেই নীরবে বসে আছি।

হঠাৎ অনির্বাণ বলে উঠল, কী ভাবছ বলব?

বলো দেখি।

সেবার পঞ্চাননের সঙ্গে এই রাতের গাড়িতেই তাহেরগঞ্জে গিয়েছিলাম সেই কথা।

ঠিক ধরেছ, বুঝলে কী করে?

অতি সহজ। Association of Ideas! সে-রাতেও এমনই জোনাকির চমক ও পাট-পচা গন্ধ ছিল। আজকের অভিজ্ঞতায় সেদিনের স্মৃতি মনে পড়ে গিয়েছে।

বোধহয় তাই। কিন্তু এখন মনস্তত্ত্ব থাক, পঞ্চাননের রহস্যের কথা বলো।

আরে সেটাও যে একটা মনস্তত্ত্বের ব্যাপার।

কীরকম?

পঞ্চাননের ধারণা হয়েছে, কিছুদিন থেকে—তা বছরখানেক হবে, ও যেন একটা রহস্যের মধ্যে বাস করছে। রাজবাড়িতে অসংখ্য ঘর, অধিকাংশই খালি পড়ে থাকে।

রাজবাড়ি আমার দেখা আছে, বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

আছে, নতুবা বাজে কথা বলতাম না। ও যে-মহলে শোয় সেখানে ওর পুরাতন খানসামা হারান ছাড়া আর কেউ থাকে না।

সে-ঘরটা আমার বেশ মনে আছে, সেবারে পাশের ঘরে আমাদের শুতে দিয়েছিল।

সে-ঘরটা যখন মনে আছে তখন নিশ্চয় মনে আছে যে, তার তিনদিকে টানা বারান্দা।

ও বর্ণনাটাও বাদ দাও। সেখানে চেয়ার পেতে তিনজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম, তুমি চুরুট টানতে আর রাজবাড়ির পরিত্যক্ত জীর্ণ মহলগুলোর দিকে তাকিয়ে উদ্ভট কল্পনার জাল বুনতে।

আশঙ্কা হচ্ছে পঞ্চাননের বিবরণটাও তোমার কাছে উদ্ভট মনে হবে।

উদ্ভট হলে অবশ্যই সে রকম মনে হবে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কী আগে শুনি।

পঞ্চানন বলে, মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে অনেকদিন দেখেছে, একটা ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে ওই বারান্দায়।

এবারে ভুতুড়ে গল্প আরম্ভ করলে।

ভুলে যাচ্ছ কেন, এ আমার বানানো নয়, ওর কথিত বিবরণ।

পঞ্চাননের কি ধারণা ছায়াটা ভৌতিক?

ভৌতিক কি আধিভৌতিক কিছুই জানি না, যা দেখেছে তাই বলেছে।

কী দেখেছে শুনি?

একটা ছায়ামূর্তি প্রায় নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেই বারান্দায় ঘুরে বেড়ায়। দু-তিন পাক দিয়ে চলে যায়।

এমন হতে পারে যে রাজবাড়ির রাত-পাহারা।

আমারও সে-সন্দেহ হয়েছিল। পঞ্চানন বলল, রাত-পাহারা আছে বটে, তবে তাদের এ-মহলে আসবার হুকুম নেই।

ভূত যদি না হয়, মানুষ। ক'টাই বা মানুষ রাজবাড়িতে? চিনতে পেরেছে কি না জিজ্ঞাসা করেছিলে?

করেছিলাম। সে বলে, জ্যোৎস্নারাতে দেখিনি, দেখেছি অন্ধকার রাতে, তখন চিনতে পারিনি।

তবু তো একটা আন্দাজ করতে পারে? লম্বা কীরকম?

সে বলে, দেওয়ানজির মতো লম্বা।

রাজাবাহাদুরের মতোই বা নয় কেন? দুজনেই তো মাথায় সমান-সমান।

পাগল হলে জগবন্ধু, রাজাবাহাদুর আসতে যাবেন কেন?

তবে দেওয়ানজিই বা আসতে যাবেন কেন?

সে তো দেওয়ানজি বলেনি, বলেছে তাঁর মতো লম্বা।

আর কী বলেছে শুনি।

একদিন সেই মূর্তি তার ঘরে ঢুকেছিল।

দরজা খোলা ছিল?

সামনের দিকের দরজাটা বন্ধ করবার ভার হারানের উপর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে হারান পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় আর-একটা ঘরে, যেখানে হারান শোয়।

হারানকে ডাকলে শুনতে পায়?

শুনতে পায়, দরকার হলে কখনও-কখনও ডাকে। তবে ছায়ামূর্তির প্রবেশে সে এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, হারানকে ডাকবার কথা মনে হয়নি। তা ছাড়া মূর্তি প্রবেশ করেই বেরিয়ে যায়।

তুমি বলতে চাও যে, ঘরে একটা লোক ঢুকল আর চিনতে পারল না!

যদি অচেনা লোক হয়?

রাজবাড়িতে গভীর রাতে অচেনা লোক আসবে কোথা থেকে?

আর চেনা লোককেই কি সবসময়ে অন্ধকারে চিনতে পারা যায়? জগবন্ধু, তুমি বাবলা গাছ ও আম গাছ দুই-ই চেনো। বলো দেখি বাইরে ওগুলো কী গাছ?

এই কি তা হলে রহস্য?

প্রায়।

তার মানে আরও আছে।

আছে, তবে এখন আর নয়। ঘুমের ঝোঁকে বলতে গেলে সব গুলিয়ে যাবে। অনেক রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ো।

আমারও ঘুম পাচ্ছিল, শোওয়ার উদ্যোগ করছি এমনসময়ে ঝমঝম করে ঝঙ্কার তুলে গাড়ি পদ্মার পুলের উপরে উঠল।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি গাড়ি পার্বতীপুর স্টেশনে থেমেছে।

গাড়ি বদলে ব্রাঞ্চ লাইনের গাড়িতে উঠতে হবে। তাড়াতাড়ি দুজনে নেমে পড়লাম।

নামতেই দেখি পাশের এক ইন্টারক্লাস থেকে পঞ্চানন নামছে, সঙ্গে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আর দুজন কনস্টেবল। তারাও গাড়ি বদলাবে—রংপুরের লাইনে।

শেয়ালদায় পঞ্চাননকে চোখে পড়েনি। পঞ্চাননের কাছে গেলাম। ব্রাঞ্চ লাইনে গাড়ি ছাড়তে দেরি আছে। চা খেয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইন্সপেক্টর পঞ্চাননের মর্যাদা জানে। কাজেই যখন বললাম, ইন্সপেক্টর, পঞ্চানন আর আমরা চা খাই, কী বলো, আপত্তি আছে? সে বলল, বেশ তো, খান না। আমরাও এই অবসরে চা খেয়ে নিই।

তারা তিনজনে চায়ের দোকানে গেল। আমরা তিনজনের চা আনিয়ে নিয়ে নিরিবিলি একখানা বেঞ্চির উপরে বসলাম।

আমি বললাম, কেমন, রাতে ঘুম হয়েছিল?

পঞ্চানন বললে, বর্তমান অবস্থায় যতটা সম্ভব তার বেশি নয়।

তারপরে একটু থেমে বলল, তোমরা যে সঙ্গে আসছ এ-একটা মস্ত ভরসা।

জ্বলন্ত চুরুট মুখ থেকে নামিয়ে অনির্বাণ বলল, কালকেই তো কথা হয়েছিল, আমরা আসব আর তাহেরগঞ্জ যাব। দেখা যাক, রাজাবাহাদুরের মন নরম হয় কি না।

পঞ্চানন বলল, রাজাবাহাদুর সহজেই রাজি হবেন, ভয় দেওয়ানজিকে।

তুমি কি মনে করো তোমার গ্রেপ্তারের পিছনে দেওয়ানজির হাত আছে?

ষোলো আনা।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের অমতে নিশ্চয় হয়নি।

তিনি এখন দেওয়ানজির হাতের পুতুল।

এমনকী ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও?

ভাবী উত্তরাধিকারী সম্বন্ধেও।

তাঁর কী স্বার্থ?

তিনিই জানেন। তোমরা যদি আশা করে থাকো তাঁর মন গলাতে পারবে তবে ভুল ভাঙতে দেরি হবে না।

অনির্বাণ বলল, আগে যাই তো, তারপরে দেখা যাবে।

এই বলে চুরুটে আচ্ছা করে গোটা দুই টান দিল।

আমি শুধোলাম, আচ্ছা, ওখানে কারও কাছে সাহায্য পেতে পারি?

দ্যাখো, একসময়ে অনেকেই আমার পক্ষে ছিল, এখন বোধকরি কেউ নেই। তবে গুপীবাবুকে বিশ্বাস করতে পারো, তিনি আমাকে কখনও ত্যাগ করবেন না।

গুপীবাবুটি কে?

গুপীবাবু আমার গাঁয়ের লোক, আমার সঙ্গেই রাজবাড়িতে এসে কাজ নিয়েছেন, আমাকে বাল্যকাল থেকে জানেন।

তাঁর পুরো নামটা কী?

পুরো নাম বললে কেউ চিনবে না, গুপীবাবু বলেই সকলে জানে। কিন্তু তোমরা কী করবে ভাবছ?

প্রথমে গিয়ে জামিনের চেষ্টা করব।

জামিন কে হবে?

ধরো রাজাবাহাদুর।

তিনিই যদি হবেন তবে গ্রেপ্তার হলাম কেন?

ধরো গুপীবাবু।

তাঁর এমন কিছু মর্যাদা নেই যে, জামিন হতে পারেন, তা ছাড়া তিনি রাজসরকারের কর্মচারী —রাজার বিরুদ্ধে যাবেন কেন?

আচ্ছা, আমরা দুজনে যদি জামিন দাঁড়াই?

তোমাদের সেখানে চেনে কে?

তবে?

তবে আর কি—হাজতবাস।

তারপরে বলল, ওসব চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমরা প্রথমে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে চার্জটা

কী জানতে চেষ্টা করবে। তার পরে কাজটা যে আমার পক্ষে অসম্ভব রাজাবাহাদুরকে সেটা বোঝাতে চেষ্টা করো। তবে দেওয়ানজির সম্মুখে হলে পেরে উঠবে না।

রাজাবাহাদুরকে একলা পাব তো?

খুব আশা নেই, দেওয়ানজি বা তাঁর লোক সর্বদা ঘিরে থাকবে রাজাবাহাদুরকে। —তার পরে থেমে বলল, যাচ্ছ তো, কীরকম অভ্যর্থনা পাবে জানি না।

সেবার তো ভালোই পেয়েছিলাম।

সেবারে যে উত্তরাধিকারীর বন্ধু, এবারে বন্ধু আসামীর, অনেক প্রভেদ।

ইন্সপেক্টর কাছে এসে দাঁড়াল, এবারে গাড়ি ছাড়বে।

পঞ্চানন ও আমরা দুই আলাদা গাড়িতে চাপলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল।

কিছুক্ষণ পরে তারা রংপুর স্টেশনে নেমে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে আমরাও স্টেশনে নামলাম। এখান থেকে তাহেরগঞ্জ যেতে হয়, পাকা সড়ক আছে, ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়।

দুই

তাহেরগঞ্জের রাজবাড়ি একটা মস্ত ব্যাপার।

বাড়ি ঘিরে গড়খাই। গড়খাই বরাবর ঘুরে এলে মাইল দেড়েক হবে। গড়খাইয়ের পরে প্রাচীরের ঘের, প্রাচীর অনেক জায়গায় ভগ্ন।

চারদিকে চারটে দেউড়ি ছিল, এখন কেবল পুব দিকের দেউড়িটাই ব্যবহার হয়, বাকিগুলো ইঁট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেউড়ির সামনে গড়খাইয়ের উপরে ইঁটের পুল—গাড়ি-পালকি যেতে বাধা নেই।

রাজবাড়ির চারদিকে খোলা মাঠ, উত্তর দিকে কিছু দূরে একটা গ্রাম, এই গ্রামটাই তাহেরগঞ্জ। রাজবাড়ির তিনতলার ছাদে উঠে তাকালে উত্তর দিকে অনেকটা দূরে রেললাইনের খানিকটা অংশ দেখা যায়। আমরাও দেখেছি। ওইটুকু চোখে না পড়লে রাজবাড়িকে বিংশ শতকের না ভেবে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতকের বলে মনে করতে কোনও বাধা নেই।

বর্তমান কালকে ডান হাত দিয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় ঠেকিয়ে রেখেছে রাজবাড়িটা, যদিচ বাম হাতের অভ্যর্থনার চিহ্নও অপরিস্ফুট নয়।

বাড়িটা যেমন বিপুল তেমনই নানা যুগের চিহ্নবাহী। ইতিহাসের পরিভাষায় প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সাক্ষী। প্রাচীনতম অংশ এখন অব্যবহার্য, মধ্যযুগীয় অংশ প্রায় তথৈবচ, তবে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক অংশটাতেই সকলে বাস করে। বাকি দুটো অংশ তাহেরগঞ্জ রাজবাড়ির প্রাচীন ঐতিহ্য ঘোষণার নকিব।

এসব আমাদের কাছে নতুন নয়, পঞ্চাননের কাছে আগে যখন এসেছি দেখে নিয়েছি; দেখার সঙ্গে শোনাও যুক্ত হয়েছে, কেন না, সেই ঘোর বর্ষাকালে সাহস করে প্রাচীনতম অংশে ঢুকতে পারিনি।

আমাদের গাড়ি রাজবাড়িতে এসে পৌঁছতেই দুজন কর্মচারী এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে বৈঠকখানায় বসাল, চাকরেরা মালপত্তর নামাল, মালপত্তর সামান্যই ছিল।

রাজবাড়িতে অতিথি কেন এসেছে জিজ্ঞাসা বেদস্তুর, এসেছে এই যথেষ্ট। কার কাছে এসেছে, কেন এসেছে, অতিথি নিজে থেকে না বললে জিজ্ঞাসা করবার নিয়ম নেই।

আগের বারে নবাবী কায়দার বিড়ম্বনা পোয়াতে হয়নি, পঞ্চাননের সঙ্গে এসেছিলাম।

একজন কর্মচারী বিনীতভাবে নিবেদন করল, আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, জলযোগ প্রস্তুত।

আমরা তদুত্তরে জানালাম, আমরা পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, কলকাতা থেকে আসছি, রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করব।

আমাদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য অবগত হয়ে অধিকতর বিনীতভাবে বলল, আজ্ঞে, আগে জলযোগ...।

কাজেই জলযোগের জন্য উঠতে হল। বুঝলাম, আগে জলযোগ পরে রাজদর্শন, দস্তুর ভেঙে কোনও কাজ এখানে চলবে না।

কে একজন লেখক নাকি বলেছেন যে, মানুষ বুড়ো হলে সুন্দর হয়। সেইসঙ্গে তিনি বলতে পারতেন যে, সে-সৌন্দর্য মানুষের মনে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায়।

রাজাবাহাদুরের সঙ্গে যখন আলাপ হচ্ছিল তখন এমন বিপুল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা অনুভব করছিলাম যে, ভালো করে কথা বলতে পারছিলাম না। আমি বেশি কথা বলতে পারিনি, নিতান্তই অভিভূতভাবে বসেছিলাম, কথাবার্তা চালাচ্ছিল অনির্বাণ।

রাজাবাহাদুর বলেছিলেন, বাবা, এ কেমন করে হল জানি না। আমি মনে-মনে নিশ্চয় জানি, এ-কাজ কখনও পঞ্চাননের দ্বারা সম্ভব নয়।

অনির্বাণ বলেছিল, তবে আপনি থাকতে, অর্থাৎ আপনার এ-বিশ্বাস থাকতে, পুলিশ কী করে তাকে গ্রেপ্তার করে চালান দিল?

এখানে থাকলে কখনও সম্ভব হত না। কলকাতায় গেলে তাকে গ্রেপ্তার করল। রামসদয় (দেওয়ানজি) একদিন এসে জানাল যে, পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছে।

আপনাকে কিছু না বলেই?

বাবা, আগের সেদিন তো আর নেই, যখন আমার জমিদারিতে আমিই জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।

কিন্তু সম্ভব-অসম্ভব তো দেখতে হবে।

সেসবের বিচার পুলিশ আর রামসদয়ের মধ্যে হয়েছে।

আর আপনি কিছুই জানতেন না?

আমি শুধু জানতাম যে, জাহাঙ্গীরদত্ত মোতির মালা চুরি হয়েছে। আমি সে-কথা রামসদয়কে জানিয়েছিলাম।

সে-মালার কথা কে জানত?

সবাই জানত। এ-রাজ্যের সবাই জানে যে, তাহেরগঞ্জের রাজবাড়িতে জাহাঙ্গীরদত্ত মোতির মালা আছে, যার দাম আজকের বাজারে কয়েক লক্ষ টাকা।

অনির্বাণ বলে, রাজাবাহাদুর, সে তো জনশ্রুতি। কলকাতায় বসে আমরাও জানতাম।

জানবে বইকী বাবা, শুনেছি ছাপা-বইয়ে আছে।

তাই তো বলছি জনশ্রুতি। কিন্তু এ-মালা আপনার বাড়িতে যে আছে সবাই জানলেও দেখেছে কয়জন?

দেখবে আর কে? আমার স্ত্রী দেখেছেন, তিনি আজ কয়েক বছর গত হয়েছেন। আর দেখেছে রামসদয়, আমিও অবশ্য দেখেছি।

পঞ্চানন?

হ্যাঁ, সে-ও দেখেছে। দত্তক হয়ে এ-বাড়িতে আসবার পরে ক্রমে-ক্রমে তাকে আমি সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলাম। পঞ্চানন খুব বুদ্ধিমান বাবা, অল্পদিনেই জমিদারির কোথায় কী আছে সমস্ত বুঝে

নিল। তারপরে তিনশো বছরের সঞ্চিত হীরে-জহরত-মণিমুক্তো, সেইসঙ্গে সেই মোতির মালা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ওসব বাড়িতে রাখতেন কেন? ব্যাঙ্কে জমা দিলেই তো সব চুকে যেত।

ব্যাঙ্কের উপরে আমার বিশ্বাস নেই। আমার জিনিস যদি আমি সামলাতে না পারি তবে ব্যাঙ্ক সামলাবে! ওসব হালফ্যাশানের মধ্যে আমি নেই। যাক্‌গে সে-কথা। অন্যান্য সমস্ত জিনিস দেখানো হয়ে গেলে সবশেষে দেখালাম জাহাঙ্গীরের নিজে হাতে দেওয়া সেই মোতির মালা।

এখানে আমি এক চরম নির্বুদ্ধিতার কাজ করে ফেললাম, শুধোলাম, কেন বাদশা এই মালা দিয়েছিলেন খুলে বলবেন, অবশ্য যদি আপনার কষ্ট না হয়।

কষ্ট! বিলক্ষণ। ও-গল্প হাজারবার বলেছি, আরও হাজারবার বলতে পারি, আদৌ কষ্ট হয় না। আনন্দ, আনন্দ, বাবা আনন্দ। কিন্তু সে-এক দীর্ঘ ইতিহাস, শেষ করতে কিছু সময় লাগবে। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আজ আর নয়। আগামীকাল হবে। তোমরা বিশ্রাম করো। —বলে তিনি উঠে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, পঞ্চানন থাকলে কোনও কথা ছিল না, তোমাদের দেখাশোনার ভার সে-ই গ্রহণ করত। আপাতত গুপী সে-কাজ করবে। লোকটি বড় ভালো, পঞ্চাননদের গাঁয়ের লোক। গুপী—।

আজ্ঞে, বলে গুপীবাবু সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

এঁদের ভার তোমার উপরে রইল, কোনও ত্রুটি না হয় দেখো, এঁরা পঞ্চাননের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রাজাবাহাদুর ধীরে-ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন।

আমরাও গুপীবাবুর অনুসরণ করে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চললাম।

সন্ধ্যার পরে গুপীবাবু এসে আমাদের কাছে বসলেন।

আমাদের বসবার ও শোওয়ার জন্যে দুখানি ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল দোতলার উপরে। আরও নাকি কয়খানি ঘর ছিল, সব খালি, বেবাক দোতলাটাই খালি। আমাদের ঘরের সম্মুখে টানা বারান্দা, সেখানে বসলে সামনে অনেকগুলো আঙিনা দেখা যায়। চকমিলানো অট্টালিকায় চলেছে আঙিনার পরে আঙিনা। সবগুলোই অন্ধকার—তাই জনশূন্য মনে হচ্ছে।

এসব রাজবাড়ির মধ্যযুগের অন্তর্গত, বোধকরি তার পিছনে প্রাচীন যুগের ভাঙা অট্টালিকার উপরে অশ্বত্থ গাছের ডগাগুলো এই আলো-আঁধারের মধ্যেও চোখে পড়ে।

বেশ বুঝতে পারা যায় এসব একসময়—রাজবংশের গৌরবের সময়ে—নর-নারী, দাস-দাসীতে পূর্ণ থাকত। আজ গৌরবে ভাঁটা পড়েছে, জনসমাগমেও। ফাঁকা মাঠ বা ঘন অরণ্য অনেকসময়ে মনে ভয় জাগায়, কিন্তু এই জনশূন্য ভগ্ন বাড়ির তুলনায় কিছুই নয়।

মৃতদেহ ও পরিত্যক্ত সৌধ ভীতিকর, ওর আশেপাশে অতীতের প্রেত ঘুরে বেড়ায়।

গুপীবাবু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখছেন?

এসব আনুষ্ঠানিক প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিলেও চলে, কিন্তু হঠাৎ ঠোঁটের উপরে উত্তর এসে পড়ল, বললাম, ভাবছি ওই ভাঙা বাড়িগুলোর মধ্যে ভূত আছে কি না।

তিনি চমকে ওঠে শুধোলেন, হঠাৎ ভূতের কথা মনে পড়ল কেন?

তাঁর চমকটা আমার চোখ এড়িয়ে গেলেও অনির্বাণের চোখ এড়ায়নি। একমনে বসে চুরুট টানলেও তার চোখ-কান প্রভৃতি সজাগ থাকে। তার যে চোখ এড়ায়নি তা পরে জানতে পেরেছি।

বললাম, এই রকম সব ভাঙা বাড়ি ভূতের স্বাস্থ্যনিবাস বলে শুনতে পাই কিনা।

না, কই ভূত-টুত আছে বলে তো শুনিনি।....আচ্ছা, আজ রাত হয়েছে, আপনারা বিশ্রাম করুন।

গুপীবাবু চলে গেলে অনির্বাণ মন্তব্য করেছিল, ভূতের কথাটা যেন চাপা দিয়ে গেলেন।

তুমি কি ভূতে বিশ্বাস করো নাকি?

মানুষে যখন বিশ্বাস করি ভূতেও বিশ্বাস করতে হয় বইকী।

কেন, মানুষ মরলে ভূত হয় বলে?

না, মানুষে ভূতের কল্পনা করেছে বলে, ওর মধ্যেও মানুষের প্রক্ষেপ আছে।

কিন্তু এখানে তার কী সম্বন্ধ?

কে বলতে পারে! পঞ্চাননের কথাটা ভুলো না, একটা রহস্য আছে বলেছিল।

তুমি কি বলতে চাও মোতির মালা ভূতে চুরি করেছে?

মানুষে না করলে অবশ্যই ভূতে চুরি করছে!

অর্থাৎ চুরির ব্যাপারটা রহস্যময়।

সে কোনও উত্তর না দিয়ে চুরুট টানতে লাগল।

গুপীবাবুকে বলেছিলাম, পঞ্চাননের সঙ্গে শেষ দেখা, পার্বতীপুর স্টেশনে, অবশ্য তার আগে কলকাতায় দেখা হয়েছিল।

আমার কথা কিছু বলেছিলেন কি?

বিশেষ করে বলেছিল। বলেছিল যে, আপনি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছিল।

সে-যোগযোগ যে আপনাদের অনুরোধে না হয়ে রাজাবাহাদুরের আদেশে হয়েছে সে ভালোই।

কেন বলুন তো।

এ-বাড়িতে সবাই আমার উপরে খুশি নয়।

সবাইয়ের মধ্যে তো দেখলাম রাজাবাহাদুর আর দেওয়ানজি।

ওঁরাই সব। অবশ্য অন্যলোকের অভাব নেই, তবে তারা সবের মধ্যে নয়।

রাজাবাহাদুর তো আপনার উপর খুশি মনে হল।

রাজার চেয়ে মন্ত্রীর প্রতাপ বেশি।

বোধকরি এতটা বলে ফেলা উচিত হয়নি মনে করে গুপীবাবু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন, রাজাবাহাদুর আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন। তাঁরই আদেশে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে এখানে এসেছি।

ওদের গাঁয়েই তো আপনার বাড়ি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, একেবারে পাশের বাড়ি বললেই চলে। ছেলেবেলা থেকে ওঁকে জানি, কোলেপিঠেও করেছি, তখন ডাকতাম পঞ্চা বলে।

অনির্বাণ কৌতুকের সুরে বলল, এখন?

পঞ্চাননবাবু। তবে অন্যদের দেখাদেখি যুবরাজবাহাদুর বললে বড় রাগ করেন।

শুধোলাম, আমরা তো শুনেছিলাম রাজাবাহাদুর পোষ্যপুত্র গ্রহণ করবেন না। জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকেই কাউকে উত্তরাধিকারী করবেন।

আমারও শোনা কথা, যেমন শুনেছি বলতে পারি। মুশকিল হল, কাকে নেবেন! এক জ্ঞাতিপুত্রের কথা ভাবলে আর-একজন আপত্তি করে, আর-একজনের কথা ভাবলে অন্যপক্ষ থেকে আপত্তি ওঠে। ওদিকে দেওয়ানজি একজন দাবিদার হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি রাজাবাহাদুরের আপন পিসতুতো ভাই। রাজাবাহাদুর অপুত্রক-গত হলে তিনিই নিকটতম উত্তরাধিকারী। তিনি বোঝাতে লাগলেন, জ্ঞাতিদের মধ্যে থেকে দত্তক নিলে অন্য সকলে জোট পাকিয়ে রাজবংশের ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে। আর অনাত্মীয় কারও পুত্রকে নিলে সেই মোতির মালা তাহেরগঞ্জ রাজবংশের বাইরের রক্তে চলে যাবে—তাতে বংশ ও সম্পত্তিনাশ।

সে আবার কীরকম, গুপীবাবু? শুধোলাম আমি।

কেন, এ-প্রবাদটার কথা পঞ্চানন কখনও কিছু বলেননি আপনাদের?

কই, মনে তো পড়ে না। আপনি বলুন না কেন?

দরকার হবে না, রাজাবাহাদুর নিজেই বলবেন মোতিমালার ইতিহাসের সঙ্গে।

আচ্ছা, তাঁর কাছেই না হয় শুনব। এখন যা বলছিলেন বলুন।

আমাদের গাঁয়ের নাম তালপুকুর। পঞ্চাননের পিতা কাশীনাথবাবু গাঁয়ের মধ্যে সম্পন্ন লোক। রাজাবাহাদুর আর কাশীনাথবাবু বাল্যবন্ধু। কাশীনাথবাবু ধার্মিক ও সুশীল, তাই রাজাবাহাদুর তাঁকে বড় ভালোবাসতেন। কাশীনাথবাবুর দ্বিতীয় পুত্র পঞ্চাননকে দেখে রাজাবাহাদুর স্থির করে ফেললেন, এই ধার্মিক বাল্যবন্ধুর পুত্রকেই দত্তক নেবেন।

অনির্বাণ বলল, কিন্তু সম্পত্তি যে অন্য বংশের রক্তে চলে যাবে।

সে-কথা অনেকেই বোঝাল। কাশীনাথবাবুও বোঝালেন। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল না। ওদিকে জ্ঞাতিরা দেওয়ানজির পথ বন্ধ করবার আশায় পণ্ডিতদের দিয়ে বোঝাল যে, শাস্ত্রমতে দত্তক গ্রহণ করলেই দুই রক্ত এক হয়ে যায়। অতএব দোষ নেই। যাই হোক, রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে দত্তক নিয়ে ফেললেন, বোধকরি জ্ঞাতিদের ও দেওয়ানজির ঝামেলা থেকে বাঁচবার আশাতেই। পঞ্চাননের সঙ্গে রাজাবাহাদুর নিয়ে এলেন আমাকে আর হারানকে।

হারান কে?

পঞ্চাননদের প্রজা ছিল। এখন রাজবাড়িতে পঞ্চাননের খাস খানসামা। দুজনেই আমরা দেওয়ানজির বিষ নজরে।

কেন?

কেন আর কী। আমরা যে পঞ্চাননের পক্ষের লোক!

তারপরে?

এমনসময় দেউড়িতে দশটার ঘড়ি বাজল। গুপীবাবু বললেন, এবারে আপনাদের কষ্ট করে উঠতে হবে—আহারের সময় এসেছে।

রাজার ঘরে মানুষ ঘড়ির ক্রীতদাস।

আহারান্তে দুজনে বারান্দায় বসে আছি, অনির্বাণের মুখে অনির্বাণ চুরুট, আমি চির-নির্বাপিত।

সম্মুখে রাজবাড়ির পরিত্যক্ত প্রাচীন অট্টালিকাগুলো আলো-আঁধারিতে ষড়যন্ত্রণায় নিযুক্ত, অশ্বত্থ গাছের পাতায় বাতাস লেগে কানাকানি করছে, চাঁদ যতই দিগন্তের দিকে হেলে পড়ছে অন্ধকার ততই এগোচ্ছে পায়ে-পায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত অধিকার করে নেবে।

কাছেই কোথাও পাখির বাসার ধড়ফড় করে আওয়াজ হল। একটা বাদুড়জাতীয় নৈশপাখি সম্মুখ দিয়ে হুস করে উড়ে গেল, দূরে কুকুরের ডাক উঠল।

এমনই সমস্ত অসংলগ্ন এলোমেলো ঘটনাস্রোত আমার ইন্দ্রিয়গুলোর উপর দিয়ে আলগোছে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে; দু-একবার প্রশ্ন করে উত্তর না পেয়ে অনির্বাণের সঙ্গে কথা বলবার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ও কী ভাবছে জানি না—রহস্যের খেই খুঁজছে না আর কিছু। ও যখন নীরবতা অবলম্বন করে, পাথরের মূর্তি হার মানে। অবশেষে আর বসে থাকতে না পেরে, 'ঘুমোতে যাচ্ছি' বলে ঘরের মধ্যে চলে এলাম। সে শুধু বলল, আচ্ছা।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ ঠেলা খেয়ে জেগে উঠলাম, শুনছ?

করুণ বুকভাঙা আর্তনাদ—যেন কার সুচির-সঞ্চিত আশাভাণ্ড মাটিতে পড়ে খানখান হয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসলাম, কী ব্যাপার?

অনির্বাণ বলল, তা জানি না।

কোথা থেকে আসছে?

রাজবাড়ির ভাঙা অংশের দিক থেকে—বুঝতে পারছ না?

তা-ই হবে।

কান্না বলে মনে হয়।

অসম্ভব নয়।

কে কাঁদে এত রাত্রে ওখানে?

কেমন করে জানব?

ভূত নাকি?

ভূত না হোক, ভৌতিক।

এই কি পঞ্চাননের রহস্য!

তা জানি না। আচ্ছা, লক্ষ করেছিলে রহস্যের কথা উঠতেই গুপীবাবু চমকে উঠেছিলেন? —শুধোল অনির্বাণ।

কথাটা চাপা দিয়ে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে।

তবে এই সেই রহস্য!

অসম্ভব নয়। তবে এ-একপ্রকার নিশ্চিত যে, এ-বাড়ির অনেকেই ব্যাপারটা অবগত আছে।

ব্যাপার বলতে কী বোঝায়? ওই শব্দ?

আপাতত তাই বটে!

কান্না অনেকক্ষণ থেমে গিয়েছে, তারপরে চলছিল আমাদের সংলাপ। কথা বলতে-বলতে দুজনে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

গায়ে ঠেলা দিয়ে অনির্বাণ ফিসফিস করে বললে, কিছু দেখলে?

কই না!

না দেখেছ ভালোই। জগবন্ধু, সংসারে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে হয়।

যেটুকু স্বভাবতই খোলা তারচেয়ে বেশি রাখবার প্রয়োজন মনে করিনে।

প্রয়োজনমতো খোলাতে কাজ চলে, তার অতিরিক্ত না হলে রহস্যোদ্ধার চলে না, মনে রেখো।

অত ভণিতায় কাজ কী, কী দেখলে বলেই ফ্যালো না।

অনির্বাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল এমনসময় হারান এসে দেখা দিল, কাল রাতেও সে এসেছিল, রাতের বেলায় আমাদের পাশের ঘরে ঘুমোবার হুকুম, তবে রাত বেশি হওয়ায় আর আলাপ করতে পারিনি তার সঙ্গে। অথচ পঞ্চানন পরামর্শ দিয়েছিল তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে।

বাবু, এখনও আপনারা ঘুমোতে যাননি! রাত যে অনেক হল!

অনির্বাণ বলল, হারান, তোমার জন্যেই জেগে আছি। কালকে তো কথাবার্তা হতে পারেনি।

হারানের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটল, বলল, বাবু, আমি কি আপনাদের আলাপের যুগ্যি লোক?

কিন্তু পঞ্চানন যে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

খোকাবাবু আমাকে খুব ভালোবাসে।

তুমিও তো তাকে খুব ভালোবাসো।

তা আর বাসব না, বাবু, সে যে মায়ের কোল থেকে আমার কোলে এসেছিল।

ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে অনির্বাণ শুধোলো, হারান, একটা কান্নার শব্দ শুনলুম। বোধহয় আশেপাশে কোনও মেয়েছেলে কাঁদছে।

হারানও ভূমিকা অংশ বাদ দিয়ে বলল, মেয়েছেলের গলা নয়, বাবু, বুড়োমানুষের গলা।

তবে তুমি শুনেছ?

না শুনে উপায় কী? রাজবাড়ির সবাই শুনেছে।

কে কাঁদে বলতে পারো?

কেমন করে বলব, বাবু, সংসারে বুড়োমানুষ তো দু-চারজন নয়।

কেন কাঁদে বলতে পারো?

তাই বা কেমন করে বলব, সংসারে দুঃখ তো অল্প নয়।

তোমরা কখনও খোঁজ করোনি!

কী দরকার, বাবু।

মনে হল, হারান কিছু চাপা দিতে চায়। কাজেই অনির্বাণ বলল, তা বটে। তারপরে সে বলল, তোমাদের দেওয়ানজিকে তো এ পর্যন্ত দেখলাম না, ব্যাপার কী!

দেওয়ানজি ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে গিয়েছেন।

কেন, এখানকার নদীতে কি জল নেই?

বড়লোকের বেশি জল দরকার হয়, এখানকার নদী হাঁটুজল।

ব্রহ্মপুত্র তো কাছে নয়। প্রত্যহ যাতায়াত করলে ওতেই তো দিন কেটে যাবে।

প্রত্যহ যাবেন কেন, যোগপ্রযোগে যান, কালকে ভোরেই আসবেন।

এলে দেখা হবে নিশ্চয়?

হবে না আবার! আপনারা যুবরাজবাহাদুরের বন্ধু, ভালোকরেই দেখা হবে।

তার কথায় না হোক কথার সুরে মনে হল যে, দেওয়ানজি আমাদের দেখে খুব খুশি হবেন না। —শুধোলাম, কেন হারান? দেওয়ানজি যুবরাজবাহাদুরের উপর খুশি নয়?

খুশি হলে আর সম্পত্তির মালিককে জেলে দেয়?

জেল তো এখনও হয়নি।

হবে, দেখে নেবেন।

রাজাবাহাদুরের মত না থাকলে দেওয়ানজির সাধ্য কী?

দেওয়ানজির অসাধ্য কিছু নেই, বাবু।

তোমার উপরে কেমন ভাব?

রাঁধুনির যেমন লকড়ির উপরে ভাব সেইরকম। উনুনের মধ্যে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গান্তর করে অনির্বাণ শুধোলো, হারান, মোতির মালা কে চুরি করল? পঞ্চানন নিশ্চয় করেনি। তোমার কী মনে হয়?

দারোগা-পুলিশে মীমাংসা করতে পারল না, আমি কী করে জানব, বাবু!

তা বটে, তবে তুমি বাড়িতে আছ কিনা—তাই শুধোলাম।

না, বাবু, কিছু জানিনে।

এতক্ষণ সে বেশ কথা বলছিল, এবারে মুখ বন্ধ করল।

আমি তো উকিল, তবু আমার সমস্ত সতর্ক জেরা ব্যর্থ হল, হারান কিছু বলতে রাজি নয়। কাজেই বললাম, হারান, রাত হল, এবারে আমরা শুতে যাই।

ঘরে এসে অনির্বাণ বলল, জগবন্ধু, তোমার আইনের ডিপ্লোমা ফেরত দাওগে।

কেন?

কেন কী! কিছু বার করতে পারলে?

কিছু জানলে তো বার করব?

ও অনেকখানি জানে, অন্তত কিছু একটা সন্দেহ আর অনুমান করেছে নিশ্চয়।

সে মীমাংসা না-হয় কালকে কোরো, এখন ঘুমোনো যাক।

অনেক রাতে জল তৃষ্ণা পাওয়ায় ঘুম ভেঙে গেল।

টর্চের আলোয় দেখলাম দুটো বাজে। টেবিলে জলের গেলাস থাকবার কথা, নেই।

ভাবলাম হারানের ঘরে দেখা যাক। পাশাপাশি তিনটে ঘর, দুটোয় আমরা দুজন, তৃতীয়টায় হারান, তিনটেরই দরজা খোলা থাকে। অনির্বাণের ঘরে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু হারানের ঘরে গিয়ে দেখি তার বিছানা খালি। তাই তো, এত রাতে গেল কোথায়! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, হারান ফিরল না।

তখন সন্দেহ হল, কাছাকাছি নিশ্চয় কোথাও হারানের অনুগৃহীতা কেউ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় হারানই তার অনুগৃহীত, সেখানেই তবে গিয়েছে। অগত্যা তৃষ্ণা নিবারণের আশা পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরছি, সহজ স্বাভাবিক স্বরে অনির্বাণ বলে উঠল, কী জগবন্ধু, না পেলে জল, না পেলে হারানকে।

জেগে আছ নাকি?

আমার নামই তো অনির্বাণ, আমার চুরুট ও চক্ষুর কোনওটাই কখনও নির্বাপিত হয় না।

কিন্তু জল ও হারানকে না-পাওয়া—জানলে কী করে?

নিতান্তই মামুলি, জগবন্ধু, নিতান্তই মামুলি।

কেমন!

ঘণ্টাখানেক আগে জেগে আমি জলের সন্ধান করেছিলাম, তখনই দেখেছিলাম হারানের বিছানা খালি, গত রাত্রেও তার বিছানা খালি দেখেছি।

সন্দেহ হচ্ছে ও কোনও মেয়ের অনুগৃহীত।

অনুগৃহীত কি নিগৃহীত সে-মীমাংসা না হয় পরে কোরো, এখন রাত দুটো।

তিন

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ দেওয়ানজির কামরায় আমাদের ডাক পড়ল।

অনির্বাণ বলল, চলো, দেওয়ান-ই-খাসে যাওয়া যাক।

দেওয়ান-ই-খাসে গিয়ে দেখি দেওয়ানজি ফরাসের উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছেন।

প্রথমেই চোখে পড়বার মতো রাজাবাহাদুর ও তাঁর চেহারায় মিল। দুজনেই সমান লম্বা, দুজনেরই রং ও বয়স সমান, মামাতো-পিসতুতো ভাইয়ে এমন বিরল নয়। দুজনেরই দীর্ঘ দেহ-যষ্টি বয়সের ভারে ঈষৎ নমিত। প্রভেদ কেবল চোখে। রাজাবাহাদুরের চোখ সুপ্তমীন সরোবর, শান্ত গভীর, দেওয়ানজির পুরু ভুরুতলে চোখ দুটো একজোড়া শ্বাপদের মতো শিকারের উপরে পড়বার জন্য উদ্যত।

দীর্ঘকাল দেওয়ানি উপলক্ষে মনুষ্য শিকার করতে-করতে চোখের দৃষ্টি শ্বাপদের গুণ পেয়েছে।

আসুন, আসুন, আপনারা দু'দিন এসেছেন অথচ অভ্যর্থনা করতে পারিনি, ব্রহ্মপুত্রে স্নানে গিয়েছিলাম, প্রত্যেক অমাবস্যা-পূর্ণিমায় স্নানে যাওয়া অনেককালের অভ্যাস কিনা।

আমি বললাম, তাতে ক্ষতি হয়নি, গুপীবাবু আর হারান আমাদের দেখাশোনা করছে।

এসেই ওই দুজনের হাতে পড়েছেন, ওরা দুজনেই অপদার্থ।

না, না, ওরা বেশ তদ্বির করছে।

তা হবে, আপনারা যে পঞ্চাননবাবুর বন্ধু, আর কাউকে বড় গ্রাহ্য করে না ওরা।

এবারে অনির্বাণ আরম্ভ করল, আচ্ছা, পঞ্চানন যে চুরি করেছে এ কি নিশ্চয়?

বিচার শেষ না হলে কেমন করে বোঝা যাবে। তবে সন্দেহের উপরে নির্ভর করে ধরতে হয়।

সন্দেহের কী কারণ থাকতে পারে জানি না। দু'দিন বাদে সমস্তই যার হবে সে কেন চুরি করতে যাবে? তা ছাড়া রাজবাড়ির অন্য ধনরত্নের সঙ্গে মোতির মালাটা থাকত তোষাখানায়, যার দুটো চাবি—একটা আপনার কাছে, আর-একটা রাজাবাহাদুরের কাছে। পঞ্চানন চাবি পাবে কেমন করে?

একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেললেন, একে-একে উত্তর দিচ্ছি। চুরি সন্দেহ করবার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ, আমাকে অপ্রস্তুত করা। ভাবটা এই যে, দেওয়ান বুড়ো হয়েছে, তেমন আর চৌকশ নেই, এখন ওকে বিদায় দিলেই ভালো। দ্বিতীয় কারণ, বয়স হয়েছে, টাকাপয়সার দরকার, বুঝতেই পারছেন। আরও কারণ চাই নাকি?

অনির্বাণ বলল, কিছু মনে করবেন না, দেওয়ানজি, আপনি বয়োবৃদ্ধ নমস্য ব্যক্তি। কিন্তু আমি তো দেখছি কোনও কারণটাই টেকসই নয়। চাবি থাকল আপনার কাছে। সে-চাবি নিশ্চয় সে পায়নি। তবে সিন্দুক খুলল কী করে? আপনি বলবেন, রাজাবাহাদুরের চাবি দিয়ে। সে-চাবিই বা পাবে কী করে? আর যদিই বা পায় অপ্রস্তুত হবেন তো রাজাবাহাদুর। আর দেখুন দ্বিতীয় কারণটা, আরও কমজোরি। বিক্রির জন্যেই যদি নেবে তবে অনায়াসে সোনা বা মোহর নিতে পারত, যা বাজারে নিয়ে গেলে ধরা পড়বার আশঙ্কা নেই। আরও দেখুন, ওই মোতির মালার সঙ্গে যে-কিংবদন্তী জড়িত তা নিশ্চয় সে জানে। ওই মালা বিক্রয় উপলক্ষে হস্তান্তর হয়ে গেলে রাজবংশের অবনতি হবে এ-কথা জেনেও কেন সে হস্তান্তর করতে যাবে বাস্তব মালাটাকে?

দাঁড়ান, এ-কথাটার উত্তর দিয়ে নিই। মোতির মালা তো হস্তান্তর হয়েই গিয়েছে।

কেমন?

দত্তক নিলেই কি রক্তের ঐক্য হয়!

ধরুন, আপনার কথাই যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়, তবু স্বীকার করতে হবে যে, এখনও রাজাবাহাদুর জীবিত, কাজেই মোতির মালা ভিন্ন রক্তে যায়নি।

ও একরকম যাওয়াই। তাই দেখুন না কেন এই বংশনাশকর অনাচার ভিন্ন রক্তের সন্তানের দ্বারাই হল।

দেওয়ানজি, ভুলে যাচ্ছেন যে, এখনও সেটা প্রমাণ হয়নি, অনুমান আর সন্দেহের ক্ষেত্রে আছে।

আমার কাছে অনুমান ও সন্দেহের অতীত।

বিচারক তো আপনি নন। এখনও মামলা বিচারাধীন।

তবে প্রশ্ন, মোতির মালা গেল কোথায়?

আমারও তো সেই প্রশ্ন—মোতির মালা গেল কোথায়?

আপনি যখন এতই জানেন আপনিই বলুন।

আমি জানলে অবশ্যই বলতাম, তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, মোতির মালা হয় রাজবাড়ির মধ্যেই আছে, নয় এমন লোকে নিয়েছে যে পঞ্চাননকে চরম অপদস্থ করতে চায়।

তবে কি আপনি—।

কথা শেষ হতে পারল না, খাস খানসামা এসে বলল, দারোগাসাহেব এসেছেন।

আচ্ছা, নিয়ে এসো।

দারোগা এসে মস্ত সেলাম করে দাঁড়াল।

কী তমিজ মিঞা, খবর কী?

তমিজ মিঞা একগাল হেসে বলল, হুজুর, সুখবর।

পেলে নাকি?

একরকম।

এই বলে সে থলি থেকে কাগজে মোড়া একটা বস্তু বার করল। তারপর সন্তর্পণে কাগজ খুলতেই বের হয়ে পড়ল মখমলের একটা বাক্স। সেটা দেওয়ানজির সম্মুখে ফরাসের উপর রাখল।

এই তো সেই শাহী শিরোপার বাক্স। বাদশাহী মোহরের ছাপ রয়েছে। তা হলে সত্যিই পেয়েছ—ব্যগ্রহস্তে খুলে ফেললেন বাক্সর ডালা। ভিতরটা বেবাক শূন্য।

এ কীরকম হল, তমিজ খাঁ?

হুজুর, খোলস যখন পাওয়া গিয়েছে, শাঁসও অবশ্য পাওয়া যাবে।

খোলসে আমার দরকার নেই, শাঁস কোথায় তাই বলো।

তা কী করে জানব, হুজুর?

ওদের মধ্যে যখন কথা চলছে আমরা বাক্সটা টেনে নিয়ে দেখতে শুরু করলাম। হ্যাঁ, বাদশাহী ব্যাপার বটে। ভিতরে বাইরে দামি মখমলে মোড়া, চারদিক ঘিরে সোনা দিয়ে মিনে করা, বাইরে মস্ত সোনালী বাদশাহী মোহরের ছাপ। ভিতরে যেখানে মোতির মালাটা থাকবার কথা, সেখানে প্রত্যেকটি মোতির জন্য একটি খাদ, এমন অনেকগুলো। পরে শুনলাম একশো আটটা মোতি এই মালায়।

কোথায় পেলে খুলে বলো।

হুজুর, রাজবাড়ির উত্তরে যে-গড়খাই আছে তার কাছে পড়ে ছিল।

কে নিল, কেমন করে গেল কিছু অনুমান করতে পারো?

বহুৎ খুব, হুজুর।

কেমন?

কাছেই একদল বেদে আস্তানা গেড়েছে, তারাই নেবে, আর কে নিতে আসবে, হুজুর।

খানাতল্লাশ করেছিলে?

তখনই।

পেলে?

আজ্ঞে না, ওরা বলে ও-বাক্সর খবর তারা জানে না। কেমন করে ওখানে এল জানে না। তখন তাদের মালমাত্তা তছনছ করে ফেললাম। নাঃ, কোথাও কিচ্ছু নেই।

তবে?

ওরা আসল শয়তান।

তারপর কী করলে?

আগে শুনুন হুজুর, শয়তানকে শায়েস্তা করবার মন্তর আমি জানি। আমি তমিজ মিঞা, আমার বাবা মস্ত গুণী ছিলেন কিনা।

তোমার বাবার খবরে আমার দরকার নেই।

সে কী হুজুর, আগে বাপ তারপরে তো ছেলে।

কী মুশকিলে পড়া গেল!

আপনি আর কী মুশকিলে পড়েছেন, হুজুর। মুশকিল তো ওদের। সবগুলোকে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান করে দিয়েছি।

কিন্তু মালাটা ওরা কী করল, খেয়ে ফেলল নাকি?

খেয়ে ফেলবার মতোই জিনিস যে।

তুমি দেখেছ নাকি?

বাক্সর মধ্যে খাদগুলো দেখেই বুঝতে পারছি, এক-একটা মোতি যেন পায়রার ডিম।

দেওয়ানজি মনে-মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, শুধালেন, তমিজ মিঞা, তোমার মতো অফিসার আর কয়জন আছে সরকারের?

আমার মতো? একজনও নয়, তমিজ মিঞা দুটি হবে না।

তবু রক্ষা। আচ্ছা, এখন তুমি এসো।

তবে ওই বাক্সটা এখন আপনার কাছেই থাক, মামলা উঠলে এগজিবিটের জন্যে নিয়ে যাব।

এই বলে আর-এক প্রস্থ সেলাম ও হাসি ছড়িয়ে তমিজ মিঞা বিদায় নিল।

এবারে অনির্বাণ শুরু করল, দেওয়ানজি, এ তো সেই মোতির মালার বাক্স।

তাতে আর সন্দেহ নাই।

এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এ-কাজ পঞ্চাননের নয়।

কেন?

সে যদি নিত তবে বাক্সটা সুদ্ধুই নিত, ওটা ফেলে দিতে যাবে কেন?

প্রমাণ লোপ করবার উদ্দেশ্যে।

দেওয়ানজি, কোন প্রমাণটা বড়, মোতির মালা না বাক্স?

বাক্সটা, ওর উপরে যে বাদশাহী ছাপ আছে!

কিন্তু এমন দুর্লভ মোতির মালা বাজারে পড়লে যে জানাজানি হয়ে যাবে।

যাবেই তো। কলকাতা, বোম্বাই, আর-আর সব বড় শহরের জহরতের বাজারে জানিয়ে দিয়েছি। পুলিশেও জানিয়েছে, বাজারে পড়লেই, যে নিয়ে যাবে তাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিছু খবর পেয়েছেন?

কিচ্ছু না।

তার মানে যে-ই নিক সে এখনও বাজারে দেয়নি।

বাজারে দেবার উদ্দেশ্যেই পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছিল।

তার' মালপত্তর তো পুলিশে নিশ্চয় তল্লাশ করেছে।

করেছে, কিন্তু পায়নি।

না নিলে পাবে কী করে!

ওইখানেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার তফাত। আপনারা ধরে নিচ্ছেন নেয়নি, আমরা ধরে নিচ্ছি সে ছাড়া আর কেউ নেয়নি।

আচ্ছা, ওটা যে খোয়া গেছে জানলেন কী করে? থাকে তো তোষাখানায় সিন্দুকের মধ্যে।

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে দেওয়ানজি বলে উঠলেন, ভালো জেরায় পড়লাম সকালবেলাতেই।

তবে না-হয় থাক।

থাকবে কেন? শুনে নিন। ওই শাহী শিরোপা বছরে একদিন বের করে রাজবংশের ইষ্টদেবতা রাধাগোবিন্দজিউর চরণে রাখা হয়। সেদিন সকালে সিন্দুক খুলে দেখা গেল শাহী শিরোপা উধাও। তার ঠিক দু'দিন আগে পঞ্চানন কলকাতায় গিয়েছে। এখন দুই আর দুইয়ে যোগ করে নিন, দেখুন চার হয় কি না।

কিছু মনে করবেন না, দেওয়ানজি, কিন্তু দুই আর দুই পাচ্ছি কোথায়? আমি তো দেখছি দুটো শূন্য। মোতির মালা থাকল সিন্দুকের মধ্যে। চাবি থাকল আপনার কাছে আর রাজাবাহাদুরের কাছে, সে-চাবি কখনও বেপাত্তা হয়নি। পঞ্চানন নেবে কী করে?

তবে কি বলতে চান আমি নিয়েছি?

আরে ছিঃ-ছিঃ, এ কী বলছেন!

এমনসময় রাজাবাহাদুরের খানসামা এসে তলব করায় বেঁচে গেলাম। রাজাবাহাদুর আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

দুজনে নিরিবিলি হওয়ামাত্র বললাম, কিছু বুঝলে?

বুঝেছি বইকী।

তার মানে সিদ্ধান্ত করেছ।

নিশ্চয়।

আগ্রহের সঙ্গে বললাম, কী?

সিদ্ধান্ত এই যে, পঞ্চানন নেয়নি।

তবে নিল কে? দেওয়ানজিই হাত-সাফাই করলেন না কি?

অসম্ভব নয়, তবে এখনও সব সূত্রগুলো আমার হাতে আসেনি।

তাঁর স্বার্থ কী?

কী যে বলো! রাজাবাহাদুর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, তিনি মারা গেলেই পঞ্চানন হাঁকিয়ে দেবে দেওয়ানজিকে, কাজেই সময় থাকতে যা হাতিয়ে নেওয়া যায়।

এ অসম্ভব। কতকালের পুরনো কর্মচারী, আবার আত্মীয়ও বটে।

তবে তোমার কথা অনুসারে স্বীকার করতে হয় যে, স্বয়ং রাজাবাহাদুরই নিয়েছেন।

হোঃ-হোঃ করে হেসে উঠলাম।

যত খুশি হাসো, তবে প্রমাণের যে-অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ-মালা রাজবাড়ির বাইরে যায়নি।

কিন্তু বাক্সটা!

সে তো খোলস, শাঁসটা ভিতরেই আছে।

ভাই অনির্বাণ, এ যে রহস্যের ভিতরে রহস্য।

মিথ্যা নয়, জল অনেক।

রাজাবাহাদুরের খাস-কামরায় পৌঁছে অভিবাদন করে দুজনে আসন গ্রহণ করলাম।

রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে যখন ছুটি পেলাম তখন আমাদের গজভুক্তকপিত্থবৎ অবস্থা, ভিতরে আর সার পদার্থ বলে কিছু নেই। একটানা চারঘণ্টা বক্তৃতা, মাঝে-মাঝে দু-একটা প্রশ্ন করেছি বটে আমি, ওই ভরসায় যে, বক্তৃতা থামতে পারে। অনির্বাণ কোন ভরসায় সে-ই জানে।

আমাদের পিছু-পিছু চলেছেন গুপীবাবু, তাঁর উপরেই আমাদের তদারকির ভার।

মানুষটি অত্যন্ত শিষ্ট, রাজবাড়ির কায়দাকানুনে অভ্যস্ত, জিজ্ঞাসা না করলে কথা বলেন না। কথা বললেও যথাসম্ভব সংক্ষেপে। তাঁর একটি মুদ্রাদোষ এই যে, হাত দুখানা বুকের কাছে তুলে জোড় করে থাকেন, আর দুই হাতের আঙুল মোচড়াতে থাকেন, যেন অনুপস্থিত কোনও মনিবের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

গুপীবাবু, রাজাবাহাদুরের কি এইভাবে একটানা কথা বলে যাওয়া অভ্যাস?

আপনারা তো তবু অল্পে ছাড়া পেয়েছেন।

তা বটে, খাওয়ার সময় হয়েছে বলে বোধকরি দয়া করে ছেড়ে দিলেন।

কতকটা তাই বটে।

সন্ধ্যাবেলা ধরলে বোধকরি সারারাত চালাতেন।

আজ্ঞে না, তখন অল্পেই ছাড়া পেতেন।

এমন সদয় কেন?

রাতের প্রথম প্রহরেই তিনি আসনে বসেন কিনা।

আসন আবার কিসের?

যোগসাধনা করেন কিনা।

সারারাত চলে?

সারারাত, তখন তাঁর মহলে কারও যাওয়ার হুকুম নেই।

এমন কতদিন চলছে? —এবারে প্রশ্নকর্তা অনির্বাণ।

আজ্ঞে রানিমা গত হওয়ার পর থেকেই।

কিংবা পঞ্চাননকে দত্তক নেওয়ার পর থেকে। ভালো করে ভেবে দেখুন।

ভাববার আর কী আছে? রানিমা গত হওয়ার মাসখানেক আগে দত্তক হয়ে পঞ্চাননবাবু এলেন, সঙ্গে আমরাও এলাম।

'আমরা' কে-কে?

আমি আর হারান। তখন থেকেই দেখছি আসনে বসেন, তার আগের কথা জানিনে।

আচ্ছা, গুপীবাবু, দেওয়ানজি যোগ-টোগ করেন কি?

শুনেছি হুজুর তিনিও আসনে বসেন।

শুনেছেন, দেখেননি?

কেমন করে দেখব, তাঁর মহলেও কারও যাওয়ার হুকুম নেই রাতের বেলায়।

আমি হেসে উঠে বললাম, এ-রাজ্যের উন্নতি না হয়ে যায় না, রাজা ও মন্ত্রী দুজনেই যখন যোগী।

আচ্ছা, গুপীবাবু, এ-যোগসাধনার তাৎপর্য কি অনুমান করতে পারেন?

এর মধ্যে আর তাৎপর্য কী আছে? বয়স হলেই ধর্মকর্মে মন যায়, দুজনেরই তো বয়স হয়েছে।

কে বড়?

রাজাবাহাদুর বছর দুয়েকের ছোট। একসঙ্গে এই বাড়িতেই দুজনে মানুষ হয়েছেন, দুজনে বড় সম্প্রীতি।

শুনেছি পঞ্চাননকে দত্তক না নিলে তিনি মালিক হতেন।

সেইরকমই তো শুনেছি।

পঞ্চানন দত্তক হয়ে আসায় দেওয়ানজি নিশ্চয় খুশি হননি।

গুপীবাবু নিরুত্তর। তাকিয়ে দেখি যে, তাঁর করতল মোচড়ানো বৃদ্ধি পেয়েছে, মুখের ভাবটা 'মুই অতি দীনহীন তোমার প্রেমের কী বা জানি'।

আমরা বুঝলাম যে, গুপীবাবু এবারে মুখ বন্ধ করেছেন, আর কোনও কথা বের করবার আশা নেই। রাজবাড়িতে মুখের যথাযথ ব্যবহার না জানলে টেঁকা ভার, এ-সত্য দেখতে পেলাম গুপীবাবুর আচরণে।

প্রসঙ্গান্তর করবার আশায় গুপীবাবু বললেন, হুজুর, পঞ্চাননবাবু আর কতকাল হাজতবাস করবেন?

যতকাল না মামলা ফয়সালা হয়—বলল অনির্বাণ।

কতদিনে ফয়সালা হবে মনে হচ্ছে?

কেমন করে বলব।

লোকে তো বলছে, আপনারা তদন্তের ভার নিয়ে এসেছেন।

অনির্বাণ হেসে উঠল, দুর্লভ তার হাসি—আমরা কি পুলিশ না গোয়েন্দা!

অপ্রস্তুত হয়েছে এমন ভাব দেখিয়ে ঘন-ঘন হাত কচলাতে লাগলেন গুপীবাবু।

চার

রাত্রে আহারান্তে শয্যাগ্রহণ করে রাজাবাহাদুর কথিত বিবরণের রোমন্থন করতে শুরু করলাম। অনির্বাণ এখনও ঘুমোয়নি, চুরুটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে বলে, সে কখনও ঘুমোয় না, তবে মাঝে-মাঝে চুরুটের গন্ধ পাওয়া যায় না কেন?

হারান এখনও শুতে আসেনি, এলে একবার ঘরে টহল দিয়ে যায়।

রাজাবাহাদুর বলেছেন, তাহেরগঞ্জ রাজবংশের আদি পুরুষ হরিনারায়ণ রায় অল্পবয়সেই আগ্রায় গিয়ে বাদশাহী ফৌজে ভরতি হন, তখন সিংহাসনে বাদশা আকবর। মানসিংহের ফৌজের সঙ্গে তিনি এলেন বাংলাদেশে। আপনি ভাবছেন, মানসিংহ কেন তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

আমি অবশ্য কিছুই ভাবিনে, অথবা ভাবছিলাম যে, যত শীঘ্র এ-কাহিনী শেষ হয় ততই সুবিধা।

—আরে হরিনারায়ণ রায় যে বাংলাদেশের লোক, এদেশের পথঘাট তাঁর সুবিদিত।

বুঝলাম, অনির্বাণ বিশেষ অস্বস্তি অনুভব করছে, রাজাবাহাদুরের সামনে চুরুট টানা চলবে না।

এ-বিষয়ে তাকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে বলেছিল, যতটা অসুবিধা হওয়ার কথা ততটা হয় না।

কেন?

রাজাবাহাদুরের অম্বুরি তামাকের গন্ধে অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়। তবে চুরুটের কাছে কেউ নয়।

অনেক চেষ্টায় মানসিংহ উড়িষ্যা জয় করলেন, হরিনারায়ণ রায় খুব বীরত্ব দেখালেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উল্লেখ করেননি।

বঙ্কিমের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বললাম, বোধহয় তাড়াতাড়িতে ভুলে গিয়েছিলেন।

আরে না, না। বাঙালি বাঙালির ভালো দেখতে পারে না, তার চোখ টাটায়। এদেশের পাখি অবধি 'চোখ গেল, চোখ গেল' রব করে, পরের ভালো দেখতে পারিনে, চোখ গেল। না, না, বঙ্কিম ওটা ইচ্ছা করেই বাদ দিয়ে গিয়েছেন। রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সহ্য করতে পারে না বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের গৌরব।

বুঝলাম যে, চোরাবালুর উপর দিয়ে চলেছি, খুব সন্তর্পণে পা ফেলতে হবে।

তা না পারুক আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। বাংলার বন্দোবস্ত করে যখন মানসিংহ ফিরবার মুখে, তখন খবর এল উত্তরবাংলায় ডাকাতরা রাজা-মহারাজা উপাধি নিয়ে লোকের উপরে অত্যাচার করছে। না তারা মানে গৌড়ের পাঠান নবাবকে, না মানে হিন্দু জমিদারদের। মানসিংহ স্থির করলেন, আগ্রায় ফিরবার আগে ও-দিকটা শাসন করে যেতে হবে। এ-কথা শুনে হরিনারায়ণ রায় সেলাম করে বললেন, মহারাজ, বান্দা থাকতে আপনি কেন যাবেন কতকগুলো ডাকাতকে শাসন করতে, রাজা বা নবাব হলেও হত।

মানসিংহ হেসে শুধোলেন, পারবে তুমি?

হরিনারায়ণ রায় বললেন, শির জামিন।

মানসিংহ বললেন, হ্যাঁ, তুমি পারবে।

তখন পাঁচশো শাহী ফৌজ নিয়ে হরিনারায়ণ রায় উত্তরবঙ্গে রওনা হয়ে গেলেন, বলে গেলেন, মহারাজ, আপনি গঙ্গাস্নান করে বিশ্রাম করুন, আমি লড়াই ফতে করে ফিরে আসছি।

যে কথা সেই কাজ। তিনমাস অন্তে সেই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' রাজা-মহারাজাদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে এলেন হরিনারায়ণ রায়। তারা বাদশাহের জন্য কেউ এনেছে ভুটানী ঘোড়া, কেউ এনেছে গোয়ালপাড়ার হাতি, কেউ এনেছে চন্দন কাঠ, কেউ দামি পাথর। মানসিংহ খুশি হয়ে বাদশাহের নামে তাদের খেলাৎ দিলেন। যার-যার জমিদারিতে বহাল রেখে বাদশাহী খাজনা নির্দিষ্ট করে দিলেন।

আর হরিনারায়ণ রায়কে কী দিলেন?

বংশগৌরবে জ্বলজ্বল করে ওঠে রাজাবাহাদুরের চোখ দুটো, আহা, সেই কথাতেই আসছি। হরিনারায়ণকে বললেন, তোমাকে বাদশা স্বহস্তে খেলাৎ দেবেন। হরিনারায়ণ ফিরে চললেন শাহী ফৌজের সঙ্গে আগ্রায়। ইতিমধ্যে আকবর বাদশার এন্তেকাল হওয়ায় সিংহাসনে জাহাঙ্গীর বাদশা। মানসিংহের মুখে বিবরণ শুনে হরিনারায়ণ রায়কে পদবী দিলেন সিংহ। হরিনারায়ণ রায় হলেন হরিনারায়ণ সিংহ রায়। সেই থেকে আমরা সবাই সিংহ রায়। আর যেখানে ডাকাত দলের সঙ্গে লড়াই হয়েছিল তার ফতেহাবাদ পরগনা নামকরণ করে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে ইজারা দিয়ে রাজাবাহাদুর উপাধি দিলেন। পত্তন হল তাহেরগঞ্জ রাজবংশের।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বোধকরি ক্ষণেকের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এমনসময়ে তীব্র কণ্ঠের কান্নার শব্দে হকচকিয়ে জেগে উঠলাম।

সেই পরিচিত ক্রন্দন।

বেশ বুঝলাম, এ-নারীকণ্ঠের রোদন নয়, নারীর কান্না ব্যক্তিগত। এ যেন সমস্ত প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকাগুলোর বহুকালের চাপা দুঃখ কোন অতীতের গহ্বর থেকে কোন অজ্ঞাত রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসছে। ভাঙা অট্টালিকার বুকভাঙা দুঃখের বিলাপ।

সমস্ত গা শিউরে ওঠে।

শুনছ অনির্বাণ!

না শুনে উপায় কী!

কে কাঁদছে?

তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।

এমন কতদিন চলছে?

শুনেছ যে অনেকদিন।

কতকাল আর এমন চলবে?

যে কাঁদছে বলতে পারে।

কে কাঁদছে?

মনে করো না কেন, ওই রাজপুরীর ওই প্রাচীন মহলগুলো।

কান্নার আওয়াজ মিলিয়ে গেল, এখন আর কিছুক্ষণ ঘুম হবে না। ভাবলাম, রাজাবাহাদুর-কথিত গল্পের খেই আবার অনুধাবন করা যাক।

কিন্তু তখনই, সেই মুহূর্তে আর-একটা বিকট আর্তনাদ উঠল, মনে হল, কোনও ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠ যেন ফুকরে উঠল, কর্তা...।

ব্যস, আর কোনও শব্দ নেই, যদি আর কিছু ওই অদৃশ্য কণ্ঠের থেকে থাকে তবে কণ্ঠনালীতেই চাপা পড়ে গিয়েছে।

ও আবার কী অনির্বাণ?

যা শুনলে।

শুনলাম, কে যেন আর্তনাদে বলে উঠল—কর্তা।

তবে তাই।

কে বলল, কাকে বলল, কেন বলল?

আমি তোমার পাশের ঘরে শুয়ে আছি, কেমন করে জানব!

হারানকে জিজ্ঞাসা করো না কেন, ঘুমোচ্ছে নাকি?

সে বিছানায় নেই।

কোথায় গেল?

আগের দু'রাত্রি যেখানে গিয়েছিল।

এত রাতে ও রোজ যায় কোথায়?

সে-কথা ও-ই বলতে পারে।

না, ভাই, প্রেতের পুরীতে আর নয়, কালকেই ফিরে চলো।

আর দু'দিন থাকো।

ওই কান্না আর সহ্য হয় না। একটা ছিল এখন আবার দুটো হল।

দ্যাখো না, হয়তো একটাও থাকবে না।

তুমি কী ভাবছ তুমিই জানো।

হয়তো ক্রমে তুমিও জানতে পাবে।

বলোই না।

অনির্বাণ নিরুত্তর—অযথা বাক্যব্যয় সে করে না।

ওই দুই বিকট আওয়াজের অবসানে রাজপুরী এখন দ্বিগুণ নীরব।

বুঝলেন, ওই পরগনা জায়গীর দিয়েই বাদশা ক্ষান্ত হলেন না। একদিন দেওয়ান-ই-আমে ভরা দরবারে হরিনারায়ণ সিংহ রায়কে আড়াই হাজারি মনসবদার পদবী দিয়ে স্বহস্তে গলায় পরিয়ে দিলেন শাহী শিরোপা এক মোতির মালা। দরবারীগণ কেয়াবাৎ-কেয়াবাৎ রব করে উঠল। এতদিন তারা শুনেছে মছলিখোর বাঙালি কাপুরুষ আর লড়াইয়ে নারাজ। এখন আর সে-কথা বলবার উপায় রইল না।

এতবড় বীরপুরুষের সমর্থনে কিছু বলা উচিত মনে করে বলে উঠলাম, বাঃ-বাঃ, চমৎকার! বাদশার যোগ্য বটে!

আর হরিনারায়ণ সিংহ রায়ের যোগ্য নয়!

অবশ্যই, অবশ্যই।

তবেই দেখুন, বাদশা কি যাকে-তাকে খেলাৎ আর শিরোপা দেন?

তারপর কী হল বলুন।

তার আগে কী হল শুনুন। বাদশা তাঁকে একশো আটটা আরবি ঘোড়া আর পাঁচটা হাতি বকশিস করলেন, বললেন, যাও তুমি, বাদশার নামে পরগনা শাসন করো গিয়ে। ওখানে যতটা তুমি জয় করতে পারবে—তোমার রাজ্য।

একটু থেমে আবার আরম্ভ করলেন, হরিনারায়ণ সিংহ রায় ফিরে এসে ধীরে-ধীরে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর রাজত্বের সীমা দাঁড়াল উত্তরে ভুটান, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র, পশ্চিমে বিহার আর দক্ষিণে মাত্রাই নদী।

বুঝলাম যে, ইতিহাস আর ভূগোল সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের কল্পনা নিরঙ্কুশ, তবে আপত্তি করা উচিত হবে না, তাতে কাহিনীর দৈন্য বাড়বার আশঙ্কা।

অনেকক্ষণ বলে ক্ষান্ত হয়ে পড়েছেন, আপনি বিশ্রাম করুন, পরে আবার শুনব।

আরে না, না, পূর্বপুরুষের বীরত্ব-কথায় কি ক্লান্তি আসে!

হায়, হরিনারায়ণ সিংহ রায় তো আমাদের পূর্বপুরুষ নন, আমাদের ক্লান্তি আসতে বাধা কী?

আসল কথাটাই তো এখনও বলা হয়নি। একশো আটটি মোতি সেই মালায়, আপনারা যাকে বলেন মুক্তো, সাহেবরা বলে পার্ল। সবগুলো সমান আকারের, একটিও ছোট বড় নয়। প্রত্যেকটির আকার পায়রার ডিমের মতো। আর রঙ!

বললাম, দুধের মতো।

দুধেও একটু হলদে আভা থাকে, এতে তাও নেই। শাদা পাথরের থালায় কুয়োর জল থাকলে যেমন রঙ হয় তেমনি। নদীর জল রাখলে চলবে না, নদীর জলে ধুলো-বালু থাকে। প্রত্যেকটিতে মুখ দেখে নিতে পারেন। শাহী মোহরের ছাপ দেওয়া ইস্পাহানী কারিগরের সোনায় মিনা করা মখমলের খাপের মধ্যে সেই মালাটি দেখে লোভে মানুষের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠত। আকবর বাদশাকে এই মালা ভেট পাঠিয়েছিল পারস্যের বাদশা। সেই মালা অবশেষে এল, যেখানে আসা উচিত ছিল সেখানে, তাহেরগঞ্জ রাজবংশের আদি পুরুষ রাজাবাহাদুর হরিনারায়ণ সিংহ রায় বাহাদুরের হাতে।

বেরিয়ে এসে অনির্বাণকে বলেছিলাম যে, রাজাবাহাদুর গল্প বলতে জানেন বটে।

সে বলেছিল, কেবল থামতে জানেন না।

ক্রমে তাহেরগঞ্জে রাজবাড়ি তৈরি হল, মহলের মতন। একটা মহল পুরনো হয়, নূতন ফ্যাশানে আর-মহল গড়ে ওঠে। বাদশাহী আমল, নবাবী আমল, কোম্পানির আমল, মহারাণির আমল, নূতন আমলে নূতন মহল। পুরনো হলে ভাঙবার দস্তুর নেই, বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া কিনা। নূতন গড়ে নিতে হবে, পুরনো কালের নিয়মে ধীরে-ধীরে যখন ভেঙে পড়ে পড়বে।

এবারে তা হলে উঠি।

বিলক্ষণ। হরিনারায়ণ সিংহ রায় বছরে একটা শুভদিন দেখে ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে যেতেন। এখনও সে-রেওয়াজ আমাদের পরিবারে আছে। প্রবীণ হয়ে পড়ায় আমি আর এখন যেতে পারি না, আমার হয়ে দেওয়ানজি যায়, তার শরীরেও রাজবংশের রক্ত আছে কিনা। এইরকম এক যোগে হরিনারায়ণ সিংহ রায় তো গিয়েছেন ব্রহ্মপুত্রে তীর্থস্নানে। স্নান সেরে উঠেছেন, এমনসময় দেখতে পেলেন কাঠের কী একটা বস্তু ভেসে আসছে। কৌতূহলী হয়ে সাঁতরে গিয়ে তুলে দেখলেন রাধাগোবিন্দজিউর দিব্যমূর্তি। আহা, কী গড়ন। দেখলেই ভক্তি করতে ইচ্ছা করে। সেই মূর্তি মাথায় বহন করে তিনি তো উঠলেন তীরে। এমনসময় সম্মুখে এক সন্ন্যাসী, চারদিকে লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া, তার মধ্যে কোথা থেকে সন্ন্যাসী এলেন কেউ বলতে পারে না।

রাজাবাহাদুর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করে বললেন, বৎস, তুমি মহা ভাগ্যবান, আজ স্বয়ং ইষ্টদেবতা ভেসে এসে তোমার কাছে ধরা দিয়েছেন। এঁরাই তোমার কুলদেবতা। যাও, মন্দির তৈরি করে এঁর প্রতিষ্ঠা করো গিয়ে।

রাজাবাহাদুর করজোড়ে বললেন, প্রভু, আপনার পায়ের ধুলো কি পড়বে না আমার কুটিরে? সে-কথার উত্তর না দিয়ে তিনি বললেন, শোনো, শাহী শিরোপা বলে যে-মোতির মালা পেয়েছ

তা সযত্নে রক্ষা করবে। রাসপূর্ণিমার রাতে একবার রাধাগোবিন্দজিউর চরণে স্পর্শ করাতে ভুলো না।

আমরা দুজন মন্ত্রমুগ্ধের মতো এই প্রাচীন দিনের কাহিনী শুনছি। মনে হচ্ছে, আমরা যেন বিংশ শতাব্দী থেকে চলে গিয়েছি তিনশো বছর আগে, যখন সম্ভব-অসম্ভব, বাস্তব-দৈবের সীমানা এমন অটল ছিল না। অনির্বাণও নীরব, তবে সে কী ভাবছে দেবতাদেরও দুর্বোধ্য।

প্রভু, মাপ করবেন, আপনি কী করে জানলেন যে, শাহী শিরোপা আমি পেয়েছি!

সন্ন্যাসী কোনও উত্তর না দিয়ে হেসে বললেন, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। এই মোতির মালা তোমার সৌভাগ্যের চিহ্ন। যতদিন এ-মালা তোমার বংশে থাকবে, রক্তের সূত্রে পুরুষ পরম্পরায় চলে আসবে, ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের গৌরব অক্ষুন্ন থাকবে। যদি কোনওদিন এ-মালা তোমাদের হস্তচ্যুত হয় কিংবা ভিন্ন রক্তে চলে যায় তবে জানবে তোমাদের গৌরব-সূর্য অস্তমিত হতে চলেছে। মনে রেখো। এখন যাও, রাধাগোবিন্দজিউর প্রতিষ্ঠা করো গে, মোতির মালা রক্ষা করো গে।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজিউর জয়প্রণিপাত করলেন। কিন্তু মাথা তুলেই দেখলেন যে, সন্ন্যাসী অন্তর্ধান করেছেন। চারদিকে লোক-লশকর, হাতি-ঘোড়া, তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে কেমন করে বা এলেন আর কেমন করেই বা গেলেন!

কাছেই রাজপুরোহিত দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি মনে করিয়ে দিলেন, মহারাজ, সমস্তই দেবতার লীলা, এ নিয়ে চিন্তা করা অনুচিত। ওঁরা কামচর। যখন খুশি, যেখানে খুশি যাতায়াত করেন। আপনার মহাসৌভাগ্য একদিনে কুলদেবতা ও মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলেন।

তখন সকলে রাধাগোবিন্দজিউর জয়ধ্বনি করে রাজবাড়িতে ফিরে এলেন।

কিন্তু মন্তব্য করে বাধা দিলে গল্পের দুর্নিবার স্রোত থামতে পারে আশায় বললাম, এ সত্যই এক উপন্যাস।

উপন্যাস তো যে-কেউ লিখতে পারে, বঙ্কিম লিখেছে, দামোদর মুখজ্জে লিখেছে, সে আর এমন কঠিন কী? এ সত্য। রাধাগোবিন্দজিউ এখনও মন্দিরে বিরাজ করছেন, আর...।

এই পর্যন্ত বলে অনেকক্ষণ অধোবদনে থেকে বললেন, শিরোপাও এতকাল ছিল।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, কোথায় গেল, কেমন করে গেল, কে নিল বলতে পারেন? প্রত্যেক দিন রাধগোবিন্দজিউর চরণে মাথাকুটে মরি, প্রভু, বলে দাও, বলে দাও, মালা ফিরে না পেলে যে রাজবংশ লোপ পায়!

তাঁর ক্ষণিক নীরবতার সুযোগে বললাম, আর যে-ই নিক পঞ্চানন নেয়নি।

নিশ্চয় নেয়নি। সমস্তই তো তার হবে, তবে কেন সে নিতে যাবে!

তবে তাকে গ্রেপ্তার করালেন কেন?

সেসব কথা রামসদয় জানে, দেওয়ানের উপরে কথা বলা কি মনিবের উচিত?

তবে কি মনিবের উপরে দেওয়ান!

আরে দেওয়ান তো নামে, তার মতো প্রভুভক্ত, রাজবংশের হিতৈষী আর কে আছে?

তা হলে তাহেরগঞ্জের যুবরাজ জেলে যাবে?

এরূপ কঠোর প্রশ্নে হতচকিত হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না তিনি। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে শুধোলেন, আচ্ছা, দত্তকপুত্র কি দত্তকগ্রহীতার সমরক্ত?

গোত্রান্তর হলেই সমরক্ত হয়, রক্ত অনুসারেই গোত্র।

নানা মুনির নানা মত, কার কথা বিশ্বাস করি বলুন।

তিনি যখন শাস্ত্র তুললেন অগত্যা আমাকেও শাস্ত্রনিক্ষেপ করতে হল, বললাম,

ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।

আমার মনের কথা বলেছেন—বলে বৃদ্ধ আমাকে আলিঙ্গন করলেন। আচ্ছা, এখানে 'মহাজন' শব্দটা কী অর্থে নেব?

এসব বিষয় কি আপনাকে বোঝাবার যোগ্যতা আমার আছে! তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এই বুঝি, শাস্ত্রকার বলছেন—মতামত বিচারে যেয়ো না, থই পাবে না। দশজনে যা করছে করো।

দশজনে যা মানে, আমার জ্ঞাতিরা সবাই বুঝিয়েছিল যে, দত্তক নাও, দত্তক পুত্র পিতার সমরক্ত, কাজেই তাহেরগঞ্জের রাজবংশ ভ্রষ্টরক্ত হবে না।

আমি সমস্ত জানা সত্ত্বেও ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করলাম যে, দত্তক গ্রহণ না করলে উত্তরাধিকারী কে হত?

রামসদয়, ও আমার পিসতুতো ভাই, কাজেই রক্তের যোগ আছে।

তবে বোধকরি দত্তক নেওয়াতে তিনি খুশি হননি।

না, না, ও খুব স্নেহ করে পঞ্চাননকে। তবে ওর ছেলেরা নিশ্চয় ওর কানভারি করেছে।

পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করাবার মূলে কি বাপের না হোক, ছেলেদের মন্ত্রণা নেই?

এ-প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ক'দিন হল?

বুঝতে পারলাম না কীসের হিসাব।

তখন তিনি নিজেই হিসাব করতে লাগলেন, আপনারা এসেছেন আজ তিনরাত, পথেও গিয়েছে একরাত, তারও আগে আর-তিনরাত, কাজেই সপ্তাহ হতে চলল, আরও কতদিন হবে কে জানে?

এতক্ষণ পরে অনির্বাণ প্রথম মুখ খুলল, বলল, জেল হলে অনেক রাত, অনেক দিন, অনেক বছর হবে।

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, জেল হতেই পারে না। তাহেরগঞ্জের যুবরাজের জেল হতেই পারে না, আমার পঞ্চাননের—।

আর বলতে পারলেন না, আর বলতে গেলে চোখের জল বাধা মানবে না। প্রাচীন অভিজাত পুরুষের পক্ষে অপরের সম্মুখে অশ্রুপাত জীবনপাতের মতো মর্মান্তিক। তবে ওই অর্ধোক্ত বাক্যে বুঝতে বাকি রইল না যে, পঞ্চানন তাঁর কত আদরের পাত্র। কেবল যুবরাজ বলেই নয়, পঞ্চানন বলেই। ভাবলাম, বৃদ্ধ কী কঠোর পরীক্ষাতেই না পড়েছেন! একদিকে রাজবংশের মঙ্গল ও স্থায়িত্ব, অন্যদিকে পঞ্চাননের প্রতি গভীর আর্কষণ। পঞ্চাননকে ভালো না বেসে কেউ পারে না, তার দুই সাক্ষী আমরা। ভালোবাসা আকর্ষণ করবার সহজাত সৌভাগ্য নিয়ে কোনও-কোনও লোক জন্মগ্রহণ করে।

পাঁচ

নাক ডাকে কার?

হঠাৎ নাক-ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। কার নাক ডাকে? অনির্বাণ কখন ঘুমোয়, কখন জাগে স্থির নেই, তবে তার নাক ডাকে না জানি। আর হারান তো রাতে শয্যাতেই থাকে না। তবে কার?

তখন মনে পড়ল ঘুমের পাতলা চাদরটার তলে আমারই যেন নাক ডাকছিল, তার শব্দে পাতলা চাদরটা সরে গিয়ে জেগে উঠছি।

নিজের নাক-ডাকা শুনতে পাওয়া যায় না এ-সর্বৈব সত্য নয়।

রাজাবাহাদুরের কাহিনী চিন্তা করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুমে-জাগরণে-স্বপ্নে মিলে এক দুঃস্বপ্নকর আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম।

সেই বুকফাটা কান্নার শব্দ, তার উপরে সেই আর্তনাদ মনে পড়ল। ভাবলাম, এ কোন ভূতুড়ে পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম!

স্থির করলাম, কালকেই ফিরব এবং ভোরবেলাতেই আমার সঙ্কল্প জানিয়ে দেব অনির্বাণকে।

কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম দেখি যে, অনির্বাণ ঠেলছে।

এত ভোরে?

ভোর কোথায়, বেশ বেলা হয়েছে, ওঠো, দেওয়ানজি তলব করে পাঠিয়েছেন।

দেওয়ানজির কামরায় গিয়ে দেখি তিনি সেই সকালেই স্নান-আহ্নিক সেরে তিলক-ফোঁটা কেটে বসে আছেন, তাঁর সম্মুখে সেই মোতির মালার মখমলের বাক্সটা।

এটা এল কোথা থেকে?—শুধোল অনির্বাণ।

খুব ভোরবেলাতেই তমিজ মিঞা এসে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

কেন?

সে বলল, বেদের দলের কাছে ভালো করে তল্লাশ করেছে। কিছু পাওয়া যায়নি। তাই তাদের ছেড়ে দিয়েছে, আর ফেরত দিয়ে গিয়েছে এটা।

আমি বললাম, রহস্য যে ঘনীভূত হয়ে উঠল।

জগবন্ধুবাবু, এর মধ্যে রহস্য তো কিছু নেই। যে নিয়েছে সে-ই গড়খাইয়ের ধারে বাক্সটা ফেলে দিয়ে গিয়েছে।

কেন?

কেন আর কী? এর উপরে যে শাহী মোহরের ছাপ, লুকানো চলবে না, তাই ফেলে রেখে গিয়েছে।

আপনার কী মনে হয়—।

মনে হওয়ার তো কিছু নেই। সমস্ত ঘটনা পঞ্চাননের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করছে।

এমনসময়ে একজন চাকর ছুটে এসে বলল, হুজুর, পুরনো বাড়িতে বিষ্ণুমণ্ডপের গলির মধ্যে হারান মরে পড়ে রয়েছে।

হারান মরে পড়ে রয়েছে—কী বলিস?

হ্যাঁ, হুজুর, দেখে এলাম, পুজোর ফুল তুলতে গিয়েছিলাম।

অনির্বাণ ছাড়া আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম। অনির্বাণ যদি বা বিস্মিত হয়ে থাকে মুখের ভাবে তা প্রকাশ পেল না। ওর ভাবগতিক সমস্তই অন্তঃসলিল।

চলুন, দেখে আসা যাক।

চাকরটির পিছু-পিছু আমরা তিনজন চললাম। পুরনো মহলের মধ্যে গিয়ে দেখলাম ঘাসের উপরে হারানের মৃতদেহ শায়িত, চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে।

কোনও একটা উৎকট আতঙ্কে তার মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ এমন বিকৃত হয়ে গিয়েছে যে, চিনবার উপায় নেই, গায়ের কাপড় দেখেই হারান বলে বুঝলাম।

কিছুক্ষণ তিনজন নিস্তব্ধ!

দেওয়ানজি বললেন, কী করে হল?

অনির্বাণ বলল, রাতে যেন একটা আর্তনাদ শুনেছিলাম।

কিছু বুঝেছিলেন?

আমি কথা বলতে উদ্যত হওয়া মাত্র অনির্বাণ বলে উঠল, দেওয়ানজি, পুলিশে খবর পাঠিয়ে দিন, ডাক্তার ডেকে লাভ নেই, অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।

মনে হল, অনির্বাণ চায় না কী শুনেছিলাম প্রকাশ করি।

চলুন, ফিরে গিয়ে পুলিশেই খবর পাঠাই।

ঘরে ফিরে এসে বললাম, অনির্বাণ, আমি সঙ্কল্প করেছি আজই কলকাতা রওনা হব, এ-ভূতুড়ে পরিস্থিতির মধ্যে আর-একদিনও থাকতে রাজি নই!

অবশ্যই যেতে হবে।

অবশ্যই নয়, আজই।

আর-একটা দিন থাকো, কালকে নিশ্চয় রওনা হব।

বেশ, আর-একটা দিন থাকতে রাজি আছি, তুমি না যাও, আমি একাই যাব।

আরে না, না, দুজনে একসঙ্গে যাব।

তুমি এখানে এসে কেমন যেন চুপ মেরে গিয়েছ। একে তো মোতির মালার রহস্য, তার উপর আবার তুমি রহস্যময়, দুটো রহস্যের ভার অসহ্য।

জগবন্ধু, আমি চোখ-নাক-কান সমস্তই খুলে আছি, কালকে হয়তো মুখটাও খুলব।

তার মানে কিছু হদিস পেয়েছ?

অনির্বাণ উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল।

আরে আমাকে বলতে ক্ষতি কী? আমি তো তোমারই ওয়াটসন।

তবে ওয়াটসনের মতো ধৈর্যধারণ করে অপেক্ষা করে থাকো।

রাতের বেলায় শুয়ে হারানের মৃত্যুর ঘটনা ভাবছিলাম। হঠাৎ অত রাতে ওখানে গেল কেন? এমন কী দেখল যে, আঁতকে উঠে মারা গেল? তবে কি সত্য-সত্যই ভূত আছে বাড়িটাতে? আর কিসে এমন ভয় পাওয়া যায় যে, একটা আস্ত জোয়ান লোক আঁতকে উঠে পড়ে মরে?

গা ছমছম করতে লাগল।

ভাবলাম, হারানের বিছানাটা গুটিয়ে দিয়ে আসি। শুতে আসবার সময় দেখেছিলাম যে, বিছানা পাতাই রয়েছে, তোলবার কথা কারও মনে পড়েনি।

হারানের ঘরে যেতে গিয়ে দেখি যে, অনির্বাণের শয্যা খালি। ও আবার কোথায় গেল? ওর আবার কিছু বিপদ না ঘটে। এ কোন অজগর পুরীতে এসে কী সঙ্কটেই না পড়লাম! ভাবলাম, হোক একবার ওর শিক্ষা। হারানের বিছানা পা দিয়ে গুটিয়ে দিয়ে ফিরে এসে অনেকখানি জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভাবলাম, অনির্বাণ না-ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি কালো মখমলের মতো অন্ধকার, আকাশময় তারার ফুলঝুরি। এই ঘনান্ধকারে কোথায় গেল অনির্বাণ! কোথায় গেল?

হঠাৎ অনুভব করলাম কে যেন ঠেলা দিচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ভোরের আলো আর অনির্বাণ।

ওঠো, ওঠো, আজ কলকাতা রওনা হতে হবে।

সত্যিই তো, বলে উল্লাসে লাফিয়ে শয্যাত্যাগ করলাম।

ঠিক যাবে তো?

নিশ্চয়।

গাড়ি তো সেই রাতের বেলায়।

তবে তখনই।

তবে চলো, গোছগাছ করে ফেলা যাক।

গোছগাছ পরে হবে, এখন মুখ-হাত ধুয়ে নাও, রাজাবাহাদুরের কাছে বিদায় নিয়ে আসি।

পঞ্চানন তা হলে হাজতেই পচবে?

অদৃষ্টলিপি কে খণ্ডাতে পারে বলো!

কিছুই করতে পারলে না?

তাই তো দেখছি।

তখন দুঃখিত মনে রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

ও কী, গায়ে আবার শাল চাপালে কেন?

বলো কী, রাজদরবারে যাচ্ছি, যোগ্য পোশাক পরতে হবে না!

এর আগে কি রাজদরবারে যাওনি?

আজ যে আনুষ্ঠানিক বিদায় গ্রহণ।

তবে আমিও আনুষ্ঠানিকভাবে পোশাক পরে নিই।

এই বলে একখানা শাল গায়ে দিয়ে বললাম, তা হলে পঞ্চানন হাজতেই থাকল?

কী আর করা যায়।

আমার মনে ভরসা ছিল, তুমি একটা বিহিত করতে পারবে।

আমি কি জাদু জানি নাকি?

অন্তত অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে ধারণা ছিল।

তবে সে-ধারণা বর্জন করো আর তোমার নোটবুকে বড়-বড় অক্ষরে লিখে রাখো, অনির্বাণ রায় অসাধারণ নির্বোধ।

হঠাৎ বিনয় কেন? ও-গুণটি তোমার ছিল না তো।

ঘটনার মুখোমুখি পড়ে হয়েছে। নাও, চলো এখন।

দুজনে যখন রাজাবাহাদুরের খাস-কামরায় এসে উপস্থিত হলাম দেখলাম রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি দুজনেই উপস্থিত। তাঁরা আগেই জানতেন যে, আজ সকালে বিদায় নিতে আসব।

নমস্কার করে অনির্বাণ বলল, রাজাবাহাদুর, আমরা বিদায় নিতে এসেছি।

আর দু-দিন থাকলে হত না? এ-দিকে অনেক কিছু দেখবার আছে। বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য, দেবীগড়, ব্রহ্মপুত্র নদী। কিছুই দেখলেন না।

এর পরে একবার এসে দেখে যাব। পঞ্চানন না থাকলে বেড়িয়ে আনন্দ নেই।

পঞ্চাননের প্রসঙ্গে রাজাবাহাদুরের চোখ ছলছল করে এল। বুঝলাম, আভিজাত্যের কঠোর আত্মসংযমের সঙ্গে চোখের জলের লড়াই চলছে। কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বিচারে কী হবে জানি না—আপাতত হাজতেই থাকল।

অনির্বাণ বলল, হাজতে থাকবে কেন? ছাড়িয়ে নিয়ে আসুন।

পুলিশে ছাড়বে কেন?

ছাড়বে এইজন্যে যে, আদৌ চুরি হয়নি।

এবারে প্রথম দেওয়ানজি কথা বললেন, ও-কথা তো অনেকবার বলেছেন। শুধু অনুমান বা স্নেহের দাবি তো পুলিশে মানবে না।

তবে শাহী শিরোপাটা দেখিয়ে দেবেন।

শাহী শিরোপাটাই যদি থাকবে তবে এত জল ঘোলা হল কেন?

কারও-কারও অভ্যাস জল ঘোলা না করে খায় না।

দেওয়ানজি বললেন, মিছা কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। যদি যাত্রা করাই স্থির করে থাকেন তবে স্নানাহার সেরে নিতে হয়।

মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তৃণখণ্ড অবলম্বন করে সেইভাবে রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, আপনি কি সত্যিই মনে করেন শাহী শিরোপা চুরি হয়নি?

ধীরভাবে অনির্বাণ বলল, আমি সত্যিই মনে করি।

কোথায় আছে? —দাবি করলেন দেওয়ানজি।

আরও ধীরভাবে অনির্বাণ বলল, যেখানে ছিল।

ছিল তো মখমলের বাক্সটায়।

তবে সেখানেই আছে।

সেটা তো কালকে দেখেছেন।

আবার দেখতে ক্ষতি কী?

দেওয়ানজি বললেন, মিছে সময় নষ্ট করছেন।

তদুত্তরে অনির্বাণ শুধোল, কোথায় আছে সেই বাক্সটা?

তোষাখানার সিন্দুকের উপরে।

উপরে কেন? ভিতরে নয় কেন? সাবধানে রাখা উচিত ছিল।

আমি তো তার ধীরতা দেখে ও কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলাম। অনির্বাণ করছে কী?

সিন্দুকে খালি বাক্স রাখা নিরর্থক।

খালি কি ভরা একবার দেখুন না।

অনেকবার দেখেছি।

আমার অনুরোধে আর-একবার দেখুন।

চলোই না, রামসদয়, দেখাই যাক না।

চলুন, যাচ্ছি। সকালবেলাতেই সময় নষ্ট—বলে নিতান্ত অপ্রসন্ন মনে তোষাখানার চাবি আনতে চললেন।

রাজাবাহাদুর সিন্দুকের চাবি আনলেন, দেওয়ানজিও।

আগেই বলেছি, সিন্দুকের দুটো চাবি দুজনের কাছে থাকত।

তারপর তাঁদের অনুসরণ করে আমরা চললাম তোষাখানার দিকে।

পুরনো মহলের দিকে তোষাখানা, একতলার পাকা ইমারত। একজন দারোয়ান তোষাখানার প্রকাণ্ড তালাটা খুলে ফেলল। অমনি পাওয়া গেল ভ্যাপসা গন্ধ। উপরের গোটা দুই কুলুঙ্গি দিয়ে বেশ আলো এসে পড়েছিল, অন্য জানলার বালাই নেই।

ভিতরে ঢুকতেই মনে হল দু-তিনশো বছর আগেকার যুগে পদার্পণ করলাম। পল্বলে যেমন জল আটকে থাকে তেমনই অষ্টাদশ শতক এখানে স্থির হয়ে আছে। পায়ের শব্দে গোটাকয়েক চামচিকে বিরক্ত হয়ে ফরফর করে ঘুরে-ঘুরে উড়তে লাগল।

ঘরটার উত্তর দিকে দেওয়ালে গাঁথা মানুষ-সমান এক প্রকাণ্ড সিন্দুক। সিন্দুকের উপরেই চোখে পড়ল সেই শাহী শিরোপার মখমলের বাক্সটা। শূন্য বাক্স, ভিতরে রাখবার উদ্যম হয়নি।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ানজি বললেন, ওই দেখুন বাক্স, বিশ্বাস না হয় খুলে দেখতে পারেন।

অনির্বাণ বলল, সে না-হয় দেখলেই হবে। কিন্তু দেওয়ানজি, ছাদের এ কী অবস্থা, যে-কোনও দিন ধসে পড়তে পারে।

আমি ছাদের দিকে তাকালাম, সত্যি, অবস্থা ভালো নয়। ছোট-ছোট টালির মতো ইঁটের সীমানাগুলো ফাঁক হয়ে গিয়েছে। কয়েকটা জায়গায় চিড় খেয়েছেও বটে।

দেওয়ানজি ও রাজাবাহাদুর ছাদের দিকে নজর করতে লাগলেন।

রাজবাহাদুর বললেন, রামসদয়, এবার বর্ষার আগেই যা হয় করো, এখনই লোক লাগিয়ে দাও।

হ্যাঁ, আর দেরি করা উচিত নয়, আর পূর্ব দিকের দেওয়ালে গোটা দুই পিলার গাঁথতে হবে, ওদিকে দেওয়ালটা কিছু জখম হয়েছে মনে হচ্ছে।

যা হয় তাড়াতাড়ি করো।

সকলেই বাড়িটার অবস্থা দেখে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, আমি তাঁদের উদ্বেগ লক্ষ করছি।

কিছুক্ষণ করে দেওয়ানজি বললেন, আচ্ছা, এবারে বাক্সটা খুলে দেখুন, অনির্বাণবাবু।

কষ্ট করে আপনিই খুলুন না।

সকালবেলাতেই এক বৃথা ঝামেলা জুটল বলে পণ্ডশ্রম করছেন মনে করে দেওয়ানজি অবজ্ঞাভরে মখমলের বাক্সটা খুলে দেখলেন।

খুলে দেখতেই ভিতরে কী একটা বস্তু জ্বলজ্বল করে উঠল। সেই মোতির মালা। একশো আটটা মোতি আলো-আঁধারি ঘরের সবটুকু আলো কুড়িয়ে নিয়ে স্থির দীপ্তিতে জ্বলতে লাগল।

আর যে-বিস্ময় অবিশ্বাসের অধিক, যে-আনন্দ আনন্দের অধিক, সেই বিশ্বাসে, আনন্দে জ্বলতে লাগল আমাদের তিনজনের চোখ।

কারও মুখে কথা জোগাল না, সকলেই চিত্রার্পিতবৎ বিস্ফারিত-নেত্র।

অনেকক্ষণ পরে প্রথমে চটকা ভাঙল রাজাবাহাদুরের।

আভিজাত্যের অভ্যস্ত সংযম ভুলে গিয়ে তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, রামসময়, এ-যে অসম্ভব সম্ভব হল!

রামসদয়ের অবিশ্বাসটাই সবচেয়ে বেশি ছিল। তা ছাড়া তাঁরই পরামর্শে পঞ্চানন গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাঁর অপ্রস্তুতের ঘোর তখনও পুরো কাটেনি, একবার স্পর্শ করে বুঝলেন, না, সত্যি মালাটা যথাস্থানে আছে।

মৃদু স্বরে বললেন, তাই তো, কেমন করে কী হল!

আমিও কম বিস্মিত হইনি, তবে বুঝলাম, মালা হারানোর রহস্যের চেয়ে মালা আবিষ্কারের রহস্য কম গভীর নয়।

ভাবলাম, এখন থাক, পরে অনির্বাণের কাছ থেকে শুনে নেব। এখন আসল কথা সে বলবে না।

দেওয়ানজি বললেন, অনির্বাণবাবু, আপনি কি জাদু জানেন নাকি?

আজ্ঞে না, জাদুবিদ্যা জানা নেই, তবে জানা আছে যুক্তিশাস্ত্রের একটা অব্যর্থ নিয়ম।

কী সেটা?

কোনও একটা বস্তুবিশেষের পক্ষে একইসঙ্গে একাধিক স্থানে থাকা সম্ভব নয়। মোতির মালাটা যখন পঞ্চানন নেয়নি, আর অন্য প্রকারেও রাজবাড়ির বাইরে যায়নি, তখন নিশ্চয় রাজবাড়ির মধ্যেই আছে। আর রাজবাড়িতেই যখন আছে, তখন যথাস্থানেই থাকবে।

দেওয়ানজি বললেন, যথাস্থানে বলতে তো ওই বাক্সটা, সেটা তো শূন্য ছিল আপনি নিজেও দেখেছেন।

তবে সেই দেখাটাই ভুল ছিল, আজকের দেখা তো ভুল হতে পারে না।

রামসদয়, তর্ক রাখো। মোতির মালা ফিরে পেয়েছ এই কি যথেষ্ট নয়!

এই বলে সেই অভিজাত সংযমী বৃদ্ধ মালাটি বের করে নিয়ে একবার মাথায় রাখেন, একবার

কপালে ঠেকান, একবার গলায় পরেন। নানাভাবে স্পর্শ ও ব্যবহার করে বস্তুটা যে মায়া নয়, যথার্থই পাওয়া গিয়েছে তাই যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেন।

রামসদয়, সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে আছে তো! এ-মালা হারালে তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেত। সে-ভয় আর নেই, সে-ভয় আর নেই। জয় রাধাগোবিন্দজিউ। রামসদয়, ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করো, আর তাঁদের চরণে এটা স্পর্শ করিয়ে ভালো করে সিন্দুকে তুলে রাখো। আর হ্যাঁ, পঞ্চাননকে হাজত থেকে আনিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করো। আজই, এখনই, আর দেরি নয়। বুঝতে পারছ, কত বড় ভুল, কত বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

রাজাবাহাদুর, যা কিছু হয়েছে সমস্তই তো রাজবংশের কল্যাণ কামনায় হয়েছে।

না, না, আমি কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি? তা নয়। কিন্তু এখন প্রমাণ হল যে, সে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাকে আনিয়ে নেওয়ার আয়োজন করো।

রামসদয় বললেন, আমি নিজেই যাচ্ছি।

আমাকেও যেতে হবে, বললেন রাজাবাহাদুর।

আমাদেরও—বলল অনির্বাণ।

আপনারা কোথায় যাবেন?

কলকাতায়। অমনই যাওয়ার পথে রংপুরে গিয়ে পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করে যাব।

আরে না, না, এমন আনন্দের দিনে আপনাদের ছাড়ছে কে? আপনারা এসে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিলেন বলেই তো মালাটা পাওয়া গেল। এতদিন তো অন্ধকারে হাতড়ে মরছিলাম অথচ যেখানকার জিনিস সেখানেই ছিল।

কণ্ঠস্বরে দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন করে অনির্বাণ বলল, মাপ করবেন, রাজাবাহাদুর। আমাদের যেতেই হবে। আরও এক কথা, পঞ্চাননকেও আমাদের সঙ্গে ছেড়ে দিন।

সে কি একটা কথা হল?

হল বইকী! যুবরাজের নামে এতবড় একটা অপবাদ, অবশ্য অপবাদ মিথ্যা, তবু তো অপবাদ, যতই চেপে রাখুন কিছু জানাজানি নিশ্চয় হয়েছে। অন্তত রাজবাড়ির লোকে নিশ্চয় জেনেছে। এ হেন সময়ে এখানে এসে সে খুব অস্বস্তি বোধ করবে! এখন কিছুদিন দূরে থাকাই ভালো, দু'দিনে সবাই ভুলে যাবে, তখন যুবরাজ সগৌরবে প্রত্যাবর্তন করবেন রাজবাড়িতে।

কী বলো, রামসদয়, অনির্বাণবাবুর কথা তো মিথ্যা নয়।

আপনি যদি ভালো মনে করেন, তবে তাই হোক। সবাই মিলে রংপুরে গিয়ে তাঁকে খালাস করে নিয়ে ওঁদের সঙ্গে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই।

অনির্বাণবাবু, কী দিয়ে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব ভেবে পাচ্ছি না।

আশীর্বাদ দিয়ে, রাজাবাহাদুর, আশীর্বাদ দিয়ে।

আশীর্বাদ যে করে, না চাইতেই সে করে।

যদি সত্যি খুশি হয়ে থাকেন, তবে একটি প্রার্থনা আছে।

আপনাকে অদেয় আমার কী থাকতে পারে?

আপনার কাছে সিন্দুকের যে-চাবিটি আছে, সেটি দেওয়ানজিকে দিন। এখন থেকে দুটি চাবিই তাঁর কাছে থাকবে। হাজার হোক, আপনি প্রবীণ হয়ে পড়েছেন তো। ভুল-ভ্রান্তি—।

তার বাক্য শেষ হতে পারল না, রাজাবাহাদুর বলে উঠলেন, ভুল-ভ্রান্তি বলে ভুল-ভ্রান্তি, মালা যথাস্থানে আছে অথচ চারদিকে খুঁজে মরছি। এর কি ক্ষমা আছে? এই নাও, রামসদয়, এখন থেকে এ-চাবিটা তুমিই রাখো।

অনির্বাণের প্রস্তাবে বিস্মিত হয়ে গেলাম।

এতদিন তার কথা শুনে মনে হয়েছিল দেওয়ানজিকেই সে চোর ঠাউরেছে—এখন আবার তাঁর হাতেই চাবি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব! অনির্বাণ ক্রমেই অধিকতর রহস্যময় হয়ে উঠছে।

ছয়

সকালের দিকেই আহারান্তে সকলে রংপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

রংপুর মাইল পনেরো।

রাজবাড়ির দুটি হাতি সজ্জিত হল, একটিতে রাজাবাহাদুর ও দেওয়ানজি। অপরটিতে অনির্বাণ ও আমি।

হাতিতে উঠবার সময়ে দেওয়ানজি বললেন, আপনাদের মাহুতকে কিছু বলবার দরকার হলে গায়ে ঠেলা দিয়ে ইশারায় বুঝিয়ে দেবেন। ও কানে একেবারে শুনতে পায় না, তবে ইশারায় সব বোঝে।

আগে রাজহস্তী, পিছনে আমাদেরটা, আগে-পিছে দশ-বারোজন ঘোড়সোয়ার। আমরা রংপুরে চলেছি। দেওয়ানজি আশ্বাস দিয়েছেন, ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যেই পৌঁছে যাব।

শীতের পূর্বাহ্ণ, রোদটি মধুর, দৃশ্যটি মনোরম।

বিশ্বপট যেন চিত্রকরের মমতা ও মাধুরী মিশিয়ে অঙ্কিত। রাজহস্তীটা এগিয়ে চলেছে, আমাদের হাতিটা অপেক্ষাকৃত মন্থর। হাওদার গদিতে হেলান নিয়ে দুজনে চুপ করে আছি। গত কয়েকদিন উদ্বেগের পর ভারি আরাম বোধ করছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি বললাম, অনির্বাণ, এবারে বুঝিয়ে বলো তো কী করে কী হল? আমার কাছে যুক্তিশাস্ত্রের তর্ক তুলে আসল কথা চেপে গিয়ে লাভ নেই।

বেশ, তবে যুক্তিশাস্ত্র থেকেই শুরু করা যাক। এটা তো স্বীকার করো যে, কোনও একটা বস্তুর পক্ষে একসঙ্গে একাধিক জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

বললাম, এ-কথাটার উপরে এত জোর দেওয়ার দরকার? এ তো অত্যন্ত মামুলি সত্য।

বেশ, তবে এই মামুলি সত্য থেকেই শুরু করা যাক, বুঝতে গোল হবে না। জগবন্ধু, বেশ মন দিয়ে শুনে যেয়ো। কোথাও ঘটনার শৃঙ্খলে গিঁট আলগা থাকলে চেপে ধরতে ভুলো না। ওই মোতির মালা কে নিল? অর্থাৎ, কার-কার পক্ষে নেওয়া সম্ভব? রাজাবাহাদুর, দেওয়ানজি ও পঞ্চানন ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়। পঞ্চানন অবশ্যই নেয়নি।

কী করে বুঝলে?

পঞ্চাননকে জানি বলেই বুঝলাম। তা হলে বাকি থাকল রাজাবাহাদুর আর দেওয়ানজি। রাজাবাহাদুর কেন নিতে যাবেন? অতএব শেষ পর্যন্ত একজনমাত্র বাকি থাকলেন, দেওয়ানজি। কী, ঠিক হচ্ছে তো?

যুক্তিতে চমৎকার শৃঙ্খলা।

তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। এখনই দেখতে পাবে আমার মতো নির্বোধ ভূভারতে দ্বিতীয়টি নেই।

কেন?

যথাসময়ে টের পাবে। সমস্ত ঘটনার অঙ্গুলি দেওয়ানজির দিকে।

অথচ তাঁরই জিম্মায় দিলে রাজাবাহাদুরের চাবিটা।

ধীরে, সজনী ধীরে। ধৈর্য ধারণ করে শ্রবণ করো। দেওয়ানজি যে নিয়েছেন, তার পক্ষে প্রমাণ সুপ্রচুর। তিনিই উদ্যোগী হয়ে পঞ্চাননকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন নিজের দোষ ঢাকবার আশায়। পঞ্চাননের কাছে শুনেছিলাম যে, তিনি পঞ্চাননের উপরে খুশি নন। পঞ্চানন দত্তক হয়ে না এলে তিনি বা তাঁর পুত্রগণ তাহেরগঞ্জ রাজ্যের মালিক হতেন, আর মোতির মালাটাও শেষ পর্যন্ত সমরক্তের বাইরে যেত না। গুপীবাবু আর হারানের কথাতেও এর সমর্থন পেয়েছ। তবে তিনি যে মালাটা নিয়েছিলেন ঠিক লোভের তাড়নায় নয়। মালাটা তাঁর হাতে থাকলে সমরক্তে থাকত, তাহেরগঞ্জের রাজবংশ লোপ পেত না—অনেক পরিমাণে এই উদ্দেশ্য ছিল।

অর্থাৎ, তুমি বলতে চাও এ-চুরিটা পরহিতায়।

সবটা নয়, অনেকটা।

বেশ, তারপরে।

এখানে আসবার আগেই একরকম স্থির করেছিলাম যে, একমাত্র দেওয়ানজির পক্ষেই এ-মালা নেওয়া সম্ভব। তারপর গুপীবাবু ও হারানের কথায় তা দৃঢ়তর হল। এবারে মনে করে দ্যাখো, রাতের অন্ধকারে আবছায়া মূর্তির পুরনো মহলে ঘোরাফেরা। রাজবাড়ির অনেকেই দেখেছে, তুমিও দেখেছ। তারা মনে করত কোনও অশরীরী সত্তা। হারান বলেছিল, এই অশরীরী মাথায় দেওয়ানজির মতো উঁচু। মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, বলে যাও।

তখন আমার পূর্ব ধারণা প্রত্যয়ে পরিণত হল যে, মালাটি দেওয়ানজি সরিয়েছেন, চুরি শব্দটা ব্যবহার না-ই করলাম। তাঁর রাতের অন্ধকারে পুরনো মহলের দিকে যাতায়াত দেখে বুঝলাম, মালাটা ওখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন, রাতের বেলায় দেখে আসেন খোয়া গেল কি না। হচ্ছে?

এ-পর্যন্ত ঠিক হচ্ছে, কিন্তু ওই গভীর রাতে বুক ফেটে কান্না?

প্রথমে মনে হয়েছিল রাজবাড়ির অধিবাসীদের ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানজির ওটা অভিনয়।

ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য?

যাতে ও-মহলটায় কেউ না যায়।

কিন্তু এমন বুকফাটা করুণ ক্রন্দন কি অভিনয় হতে পারে?

কেন হতে পারবে না? থিয়েটারে কি সীতা, শৈব্যা এদের কান্না শোনোনি?

পরে এ-থিওরি পরিত্যাগ করেছিলে?

হ্যাঁ!

আর হারানের মৃত্যু এবং অস্পষ্ট চিৎকার?

তার চিৎকার গোড়াতে অস্পষ্ট লেগেছিল বটে, তবে পরে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

খুলে বলো।

দ্যাখো, ওই রাজবাড়ির সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে একমাত্র ওই হারান আঁচে-আন্দাজে খানিকটা বুঝেছিল।

তাই বুঝি সে রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে ওই মহলটায় যেত?

তাই তার মৃত্যু।

হত্যা?

মৃত্যু। এইসব ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ইঙ্গিতের রাই কুড়িয়ে তেল তৈরি হয়ে উঠল। আর আমার সন্দেহমাত্র রইল না যে, মালাটি দেওয়ানজি নিয়েছেন আর রাজবাড়ির মধ্যেই কোথাও আছে। এইজন্যেই বারে-বারে মনে করিয়ে দিয়েছি যে, কোনও বস্তুর পক্ষে একই সময়ে দুই জায়গায় থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু তিনি যদি মালাটা নিলেনই তবে বাজারে দিলেন না কেন?

সর্বনাশ। ও-মালার পরিচয় দেশের সমস্ত জহুরি জানে। যে নিয়ে যাবে সে তক্ষুনি গ্রেপ্তার হবে।

তবে নেওয়ার উদ্দেশ্য কী?

আগেই বলেছি, মালাটা সমরক্তে রাখা। সেই সন্ন্যাসীর উক্তিকে এরা সবাই বেদবাক্য মনে করত। আর-একটা উদ্দেশ্য পঞ্চাননকে জব্দ করা।

আচ্ছা, তারপরে বলো।

আমরা তো তিনদিন মাত্র হারানকে দেখেছি, চতুর্থ দিনে অর্থাৎ, চতুর্থ দিনের রাতের বেলায় তার মৃত্যু হল। হারান রাতে উঠে বের হয়ে যেত। তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে অভিসারে যায়। আমি লক্ষ করেছিলাম ছায়ামূর্তিকে অনুসরণ করে যায় পুরনো মহলের দিকে। তখন ভেবেছিলাম যে, পরদিন রাতে আমি তাকে অনুসরণ করব। কিন্তু সে-সুযোগ আর পেলাম না, তার হঠাৎ মৃত্যু হল, অর্ধোক্তি চিৎকারে সে কী বলতে চেয়েছিল বুঝতে পারলে সুবিধা হত—

কিন্তু তুমি যে এইমাত্র বললে যে, সে চিৎকার স্পষ্ট হয়েছে তোমার মনে।

তখনও হয়নি, পরে হয়েছে। পরের কথা পরে।

আচ্ছা তা হলে আগের কথা বলো।

পরের দিন রাতে নিয়মিত সময়ে সেই ছায়ামূর্তি ধীরে-ধীরে পুরনো মহলের দিকে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

আমি অলক্ষ্যে সেইদিকে চললাম। রাতটা ছিল অন্ধকার, কাজেই ছায়ামূর্তির আমাকে দেখবার উপায় ছিল না। আর চাঁদের আলো থাকলেও আমাকে দেখতে পেত না। কারণ, কী করে সে ভাববে যে, কেউ তাকে অনুসরণ করছে, রাজবাড়ির সবাই তাকে অশরীরী মনে করে ভয়ে সরে থাকত।

অনির্বাণ তন্ময়ভাবে বলে চলেছে।

দিনেরবেলায় তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, আমি একবার ওদিকে গিয়ে গলি-ঘুঁজিগুলো দেখে এসেছিলাম। তাই পথ চলতে অসুবিধে হয়নি। কিছুদূর যেতেই দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে, আগে-পিছে ডাইনে-বামে কোনওদিকে নজর নেই। কেনই বা থাকবে? পথঘাট যার নখদর্পণে, লক্ষ্য যায় সুবিদিত, আর অনুসরণের ভয় যার মনে নেই, সে কেন এদিকে-ওদিকে তাকাবে!

আমিও অন্য কোনওদিকে লক্ষ করছি না, সেই ছায়া-শরীরীর দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে যে দেওয়ানজি, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র রইল না। অবশ্য আগেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম, সেই শীর্ণ দীর্ঘ দেহ, মাথার সেই খাড়াই। এখন আমার একমাত্র লক্ষের বিষয় হল, কোথায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং কী করে। সেই মালাটা যথাস্থানে লুক্কায়িত আছে কি না দেখতেই সে নিত্য রাত্রে ছায়া-শরীরীর অভিনয় করে থাকে বুঝলাম। আমিও পিছে-পিছে আর-একটি ছায়া-শরীরীর মতো তাকে অনুসরণ করতে থাকলাম।

ইতিমধ্যে আকাশে কোথাও টুকরো চাঁদ উঠেছে, তারই আলো সেই ভাঙা বাড়ির ছাদ-প্রাচীর-থামের মধ্যে দিয়ে বেঁকেচুরে এসে পড়েছে, আমার নজর চলবার কিছু সুবিধা হল বটে। তবে যাতে নজরে না পড়ি সেইজন্য ছায়া ঘেঁষে থাম ও প্রাচীরের আড়াল রক্ষা করে চলছিলাম। আমি অতিথি হয়ে তাঁকে অনুসরণ করছি এ অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই।

এমনসময় দেখলাম ছায়ামূর্তি একটা ভাঙা দেয়ালের কাছে গিয়ে থামল। অনেকক্ষণ নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর দেয়ালের একটা কুলুঙ্গি থেকে একখানা ইঁট সরিয়ে কিছু বের করল। কী দেখবার উপায় ছিল না, আমি পিছন দিকে আছি কিনা। তবে শেষপর্যন্ত হতাশ হতে হল না। সেই বস্তুটা হাতে নিয়ে উঁচুতে তুলে ধরল, অমনই তার উপরে পড়ল চাঁদের আলো। সেই মোতির মালা, পূর্ণিমার চাঁদ থেকে কুঁদে তৈরি প্রত্যেকটি দানা, এমনই শুভ্র এমনই স্বচ্ছ এমনই উজ্জ্বল। একবার সেটা নিয়ে গলায় পরল, একবার মাথায় রাখল, মনে হল একবার বুকে চেপে ধরল, এমন

চলল কিছুক্ষণ। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও দেহ দিয়ে সেটা যেন অনুভব করতে চায়, তার সত্যতা যেন পরীক্ষা করতে চায়। তারপরে, বেশ কিছুক্ষণ পরে, আবার সেটা কুলুঙ্গির মধ্যে সযত্নে রেখে কুলুঙ্গির মুখে ইঁট চাপা দিল।

এতক্ষণ সে অনড় ছিল, এবারে নড়ে উঠল। বুঝলাম, ফিরবে। পাছে মুখোমুখি হয়ে আমাকে চোখে পড়ে যায় আমি একটা থামের আড়ালে লুকোলাম, ভাবলাম, সবই তো দেখলাম, এখন আমাকে না দেখে ফেলে। স্থির করলাম, দেওয়ানজি খানিকটা এগিয়ে গেলেই মালাটা বের করে নিয়ে, চোরের উপরে বাটপাড়ি সমাধা করে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ব।

মূর্তিকে এখন আর দেখতে পাচ্ছি না, তবে পায়ের সন্তর্পিত চলার শব্দ শুনে বুঝতে পারছি এ যেন স্বপ্নগ্রস্তের পদধ্বনি, জাগ্রতের নয়।

এবারে মূর্তিটা আমার কাছে এসে পড়েছে। আমি নিশ্বাস রোধ করে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমনসময়ে চাঁদের বাঁকা আলো তার মুখের উপরে এসে পড়ল।

এইবার অনির্বাণ থামল। আমি এতক্ষণ রুদ্ধনিশ্বাসে শুনছিলাম, বললাম, থামলে কেন?

সে বলে উঠল, জগবন্ধু, জগবন্ধু, আমি নির্বোধ, আমি নিরেট আকাট ভরাট নির্বোধ, সুয়েজ খালের পূর্ব দিকের জগতে এতবড় নির্বোধ আর নেই।

হঠাৎ কী হল? কী দেখলে?

কী দেখলাম বলো তো।—কিছুক্ষণ থেমে বলল, তুমি বলবে কী করে?

আহা, কী দেখলে বলোই না।

সে-মূর্তি দেওয়ানজির নয়।

সাগ্রহে বলে উঠলাম, তবে কে?

রাজাবাহাদুর।

রাজাবাহাদুর!

কী, বিশ্বাস হচ্ছে না! তোমাকে দোষ দিই না, চোখে দেখেও আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

আলো-আঁধারিতে নিশ্চয় ভুল দেখেছ।

নিশ্চয় ভুল দেখিনি, হাত দুই দূর থেকে দেখেছি... কিন্তু সে কী মুখ!

কেন?

সে-মুখে যেন নিদারুণ প্রতিহিংসার মুখোশ পরানো।

একটু থামল, তারপরে বলে উঠল, সেই মুহূর্তে বুঝলাম, হারানের মৃত্যুর রহস্য।

মূর্তি কি তাকে খুন করেছে?

খুন করবার প্রয়োজন হয়নি। মুখের উৎকট বীভৎসতায়, অপ্রত্যাশিত সত্য উদ্‌ঘাটনে আঁতকে উঠে সে মারা গিয়েছে। মরবার আগে অজান্তে তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, কর্তা—বাকিটুকু আর শেষ করতে পারেনি।

আমি বললাম, এখন মনে হচ্ছে কর্তা বলেই সে আর্তনাদ করে উঠেছিল।

হারানের মরা মুখটা মনে পড়ছে? তাতে ছিল নিদারুণ আতঙ্কের ছাপ।

ছিল বটে। যাক, কী দেখলে ভাই তুমি?

কী দেখলাম! দেখলাম পিশাচের মুখ।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মুখ তো প্রশান্ত, প্রসন্ন—দেবতুল্য মুখ।

দেবতা ও পিশাচ অবস্থাবিশেষে বড় কাছাকাছি।

এ যে মোতির মালা চুরির চেয়েও ঘনতর রহস্য।

নিতান্ত মিথ্যে বলোনি।

তারপরে?

ওই শোনো, এই অঘ্রান মাসেও কোকিল ডাকছে। বাংলাদেশের কোকিল পঞ্জিকা মেনে চলে না।

ওসব কবি-কল্পনা এখন থাক।

থাকবে কেন? এখনই তো কবি-কল্পনার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। যে-কল্পনা কবিতা লেখায়, সেই কল্পনাই স্টিম এঞ্জিন উদ্ভাবন করে। যে-কল্পনা জীবন-রহস্য উদ্ধার করে, সেই কল্পনাই উদ্ধার করে মোতির মালা। দীপ জ্বালাতেও আগুন, আবার ঘর জ্বালাতেও আগুন।

বিরক্ত হয়ে বলে উঠলাম, আবার অসহিষ্ণু শ্রোতাকে জ্বালাতেও আগুন। এখন দয়া করে রহস্যটাকে পরিষ্কার করো, হঠাৎ রাজাবাহাদুরের দেবমুখে পিশাচের মুখোশ কেন?

বলছি শোনো। জানো তো যে, মানুষের মনের দুটো অংশ—একটা জাগ্রত চৈতন্য, আর একটা মগ্ন চৈতন্য। একটাকে বলতে পারি চৈতন্যের উপর তলা, আর একটা নিচের তলা।

এসব দর্শনে পড়েছি।

তুমি দর্শনে পড়েছ আমি স্বচক্ষে দর্শন করলাম। এই দুইতলায় সবসময় বনিবনাও হয় না। মানুষ যখন রোগে, শোকে বা নিদ্রায় দুর্বল হয়ে পড়ে তখন নিচের তলার চৈতন্য প্রবল হয়ে ওঠে, প্রবল হয়ে উঠে বের হয়ে আসে, আর জাগ্রত চৈতন্যকে অভিভূত করে ফেলে নিজের অধিকার কায়েম করে। তখন মানুষ এমন সমস্ত কথা বলে বা কাণ্ড করে বসে তাকে পাগলামি বলে মনে হয় কিংবা তার স্বভাবের ব্যভিচার বলে মনে হয়। তখন মানুষ যেন আর-একটা ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যায়। সেই রাধামাধবপুরের জোতদারের ঘটনার কথা স্মরণ করে দ্যাখো। মনে আছে তো?

এতক্ষণ ছিল না, এবারে মনে পড়ছে।

সে-লোকটা রাতেরবেলায় নিজের গোলা থেকে ধান চুরি করত, আর দিনেরবেলায় হা হুতাশ করে মরত, কে ধান চুরি করল ভেবে।

এখানে তার অনুরূপ কোথায় দেখলে?

রাজাবাহাদুরের মুখের প্রতিহিংসার মুখোশে। এ-দুই মানুষ এক নয়, আবার ভিন্নও নয়। সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করো। যতদিন এই মোতির মালা তাহেরগঞ্জের রাজবংশের সমরক্তে থাকবে ততদিন তাহেরগঞ্জের রাজবংশের ধারা থাকবে অক্ষুণ্ণ। কয়েক পুরুষের বিশ্বাসের ফলে এই ধারণা রাজবংশের রক্তধারায় গেঁথে গিয়েছে, ইচ্ছা করলেও তাকে বর্জন করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এই রাজবংশের লোকে, বর্তমানে রাজাবাহাদুর।

তাই যদি হয়, তবে পঞ্চাননকে দত্তক না নিলেই পারতেন।

ওইখানে জাগ্রত চৈতন্যের কারসাজি। কথাটা সে বিশ্বাস করে না। লোকে রাজাবাহাদুরকে মনে করিয়ে দিয়েছে দত্তক গ্রহণ না করতে, তা হলে মোতির মালা চলে যাবে রক্তান্তরে। জাগ্রত চৈতন্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। তারপরেই আরম্ভ হয়েছে মগ্ন চৈতন্যের লীলা।

কিন্তু পঞ্চাননকে দত্তক তো নিয়েছেন অনেককাল। এতদিন পরে কেন?

সেটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘকাল দুই চৈতন্যে লড়াই চলেছে রাজাবাহাদুরের মনের মধ্যে। বিশেষ তখনও রাজাবাহাদুরের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শীঘ্র মারা যাবেন এমন আশঙ্কা ছিল না, কাজেই মগ্ন চৈতন্য তার দাবি সম্পূর্ণ কায়েম করতে পারেনি। তারপরে, ইদানীং যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল, আর বেশিদিন জীবিত থাকবেন এমন আশা রইল না, সুযোগ পেল মগ্ন চৈতন্য। সে বাধ্য করল, রাজাবাহাদুরকে মোতির মালাটা চুরি করে লুকিয়ে রাখতে। সে বোঝাল, তা হলে মালাটা পঞ্চাননের হাতে পড়বে না।

কিন্তু রাজাবাহাদুরের মৃত্যু হলেই যে রাজবংশ লোপ পাবে, তখন অন্য বংশের লোকের হাতে মালাটা পড়া-না-পড়া সমান হয়ে যাবে না কি।

এত কথা বোঝে কে? মগ্ন চৈতন্যের যুক্তিশাস্ত্র আর জাগ্রত চৈতন্যের যুক্তিধারা এক নয়। দ্যাখো, জগবন্ধু, আমরা যে-লজিক পড়ি তা জাগ্রত চৈতন্যকে নিয়ে। কোনওদিন যদি মগ্ন চৈতন্যের লজিক লিখিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তোমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। জাগ্রত চৈতন্যে রাজাবাহাদুর পঞ্চাননকে সত্যই ভালোবাসেন আর মগ্ন চৈতন্যে তাকে পরম শত্রু বলে মনে করেন। রাতেরবেলায় সে-ই তাঁকে শত্রুতাসাধন করিয়েছে পঞ্চাননের বিরুদ্ধে।

অনির্বাণ, তোমার এই যুক্তিধারা সবাই মানবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু যে সেই বিভীষণ মুখ একবার দেখেছে বিশ্বাস না করে তার উপায় কী?

কীরকম দেখলে আর একটু বিস্তারিত করে বলো।

দেখলাম তো এক মুহূর্তের জন্যে, তারপরে তিনি স্বপ্নচালিতের মতো অন্দরমহলের দিকে চলে গেলেন।

তবু—।

দেখে মনে হল, তাহেরগঞ্জের রাজবংশের বিগত দশ-বারো পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বংশরক্ষার উগ্র সঙ্কল্প ঘনীভূত হয়ে শাণিত ছুরি হাতে দেখা দিয়েছে রাজাবাহাদুরের মুখের প্রত্যেকটি মাংসপেশিতে। ও আর রক্তমাংসে গড়া নয়, ও যেন কঠিন ইস্পাতে নির্মিত। মানুষের মুখ যে এমন ধাতবগুণসম্পন্ন হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। অথচ এই মানুষটিই দিনেরবেলায় পঞ্চাননের হাজতবাস স্মরণ করতে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হয়েছেন।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, সুযোগ পেলে মগ্ন চৈতন্যের প্রেরণায় রাজাবাহাদুর খুন করে ফেলতে পারেন পঞ্চাননকে।

পারেনই তো। সেইজন্যেই প্রস্তাব করেছি পঞ্চাননকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার, অবশ্য তার অন্য কারণ দর্শিয়েছি।

আমি আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপরে?

আট-দশ মিনিট লাগল অসম্ভবকে পরিপাক করতে। অপ্রত্যাশিতের চমক কাটলে একছুটে গিয়ে সেই কুলুঙ্গি থেকে মোতির মালাটা বের করে পকেটস্থ করলাম, তারপরে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম তুমি অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছ। আশা করি, এবারে ঘটনাশৃঙ্খল বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

কেবল একটা বিষয় ছাড়া—।

কী, বলো?

মালার সেই বাক্সটা গড়খাইয়ের ধারে পাওয়া গেল কী করে?

ওটা অপরিষ্কার থেকেই যাবে, কেননা, হারানের মৃত্যুর সঙ্গে ব্যাপারটা জড়িত। আমার মনে হয়, ওই কুলুঙ্গিতে বাক্সসুদ্ধ মালাটি ধরেনি, তাই রাজাবাহাদুর মালাটি কুলুঙ্গিতে রেখে বাক্সটা বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন। হারান সেটা কুড়িয়ে পায়, তবে সেটা নিজের কাছে রাখা নিরাপদ মনে করেনি, তার কাছে পাওয়া গেলে পঞ্চানন যে মালা নিয়েছে এ-ধারণা নিশ্চিত বলে প্রমাণিত হবে, তাই সে লুকিয়ে গিয়ে গড়খাই-এর কাছে ফেলে দিয়েছিল। হারান অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী। এমন ভৃত্য অনেক ভাগ্যে মেলে। আর কিছু জানতে চাও?

আপাতত আর কিছু নয়। ভাই অনির্বাণ, তুমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে এটাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করো। শখের কবিতার চেয়ে শখের গোয়েন্দাগিরি অনেক লাভজনক। কবিতা লিখে কার কী লাভ হয়?

সেটাও যে গোয়েন্দাগিরির অংশ। কবিতা লেখায় বুদ্ধিতে শান পড়ে, তারপরে সেটা খাটাই গোয়েন্দাগিরিতে। আরে ওই শোনো, কোকিলটা এখনও ডেকেই চলেছে।

ওটা অন্য কোকিল, ইতিমধ্যে রাজহস্তী অনেক পথ অতিক্রম করেছে।
পৃথিবীর সব কোকিলই এক। কীটসের নাইটিংগেল কবিতাটি মনে করে দ্যাখো।

পরিশিষ্ট

পঞ্চাননকে নিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এসেছি।

সে এখন আমার বাড়িতেই আছে।

বলা বাহুল্য, মোতির মালা চুরির রহস্য তাকে বলিনি। বলেছি যে, মালাটা যথাস্থানেই ছিল, বাকি সমস্তই দৃষ্টি-বিভ্রমজনিত। জানি না, ও বিশ্বাস করেছে কি না।

দিন পনেরো পরে পঞ্চাননের নামে টেলিগ্রাম এল, রাজাবাহাদুর হঠাৎ মারা গিয়েছেন। শীঘ্র এসো।

তিনজনেই রওনা হলাম, পঞ্চানন আমাদের ছাড়ল না।

তাহেরগঞ্জে গিয়ে শুনলাম যে, রাতেরবেলায় হঠাৎ তেতলার ছাদ থেকে পড়ে রাজাবাহাদুর মারা গিয়েছেন। অনির্বাণ আমাকে আড়ালে বলল, এরকম কিছু হবে বলেই আশঙ্কা করেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছে।

তাহেরগঞ্জ রাজ্যের আর সে-জৌলুস নেই, বড়-বড় অনেক পরগনা হস্তান্তরিত হয়ে গিয়েছে, আজ রাজবাড়িটা আর সামান্য কিছু সম্পত্তি আছে যাতে কোনওরকমে দিনাতিপাত করা সম্ভব।

কালাশৌচ-অন্তে পঞ্চানন বিবাহ করল। এখন সে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে একজন অফিসার। কলকাতাতেই থাকে, কালেভদ্রে যায় তাহেরগঞ্জে।

ইতিমধ্যে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে, অপরিবর্তিত কেবল অনির্বাণের চুরুট, যা সর্বদা অনির্বাণ ও সমান দীপ্তিমান।

বর্মার মামা

শিবরাম চক্রবর্তী

এক ঃ রহস্যময় অট্টালিকা

প্রথম দর্শনেই বাড়িটাকে ভালো লাগেনি শিশিরের, কীরকম একটা খটকা লেগেছিল। ওর মন বলেছে, উঁহু, এর লক্ষণ তো ভালো না! এখন এর আগাপাস্তলা লক্ষ করে—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতটা সুচারুরূপে দেখা সম্ভব—দেখে-শুনে ওর সেই সংশয় আরও দৃঢ়ই হল।

লিলিকে পাশে ডেকে স্পষ্টই ও জানিয়ে দিয়েছে ঃ 'বাড়িটার হাবভাব ভালো নয়।'

দাদার কথায় লিলিরও মনে খটকা লেগেছে, বাড়িটার সম্বন্ধে তত নয়, কথাটার সম্বন্ধেই। দাদার কথাটা কেমন যেন হল না? বাড়ির আবার হাবভাব কী? নির্জীব প্রাণীর কখনও হাবভাব হয় নাকি? হতে পারে কখনও? কথাটার কোথায় যেন ব্যাকরণে বেধে গেছে।

লিলিও তার সংশয়টা ব্যক্ত করেছে।

'ঠিকই বলেছি।' শিশির আরও সুদৃঢ় ঃ 'বাড়িটার গতিবিধি সুবিধের নয়।'

'গতিবিধি? তুমি কী বলচ দাদা? বারবার কী বলচ? ভারি বাড়াবাড়ি করচ তুমি।' লিলি ফের আপত্তি জানায় ঃ 'বরং বলতে পারো যে গতিক-সতিক।'

'ও একই কথা!' শিশির বলে ঃ 'দেখচিস না, কীরকম জরাজীর্ণ এই বাড়িটা! আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে হাজার বছর আগেকার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে। কত মণিমাণিক্য, হীরে-জহরত কোনও এক অন্ধকার কোণে চামচিকেদের সঙ্গে ঠাসাই হয়ে নির্বিবাদে বসবাস করছে। তা না হলে বাড়ির হালচাল এমন হয়?'

লিলি চোখ বড়-বড় করে চেয়ে থাকে, কিছু বলে না। বলতে পারে না। হাঁ করে থাকে।

'আমি তাই বলি! কেন যে মামা অমন সাধের দেশ-ঘর ছেড়ে, এত দূরে, এই বিদেশে বর্মা মুলুকে এসে এতদিন ধরে এই বাড়ি কামড়ে পড়ে আছেন, এতক্ষণে বুঝলুম—!'

শিশির আরও কিছুক্ষণ হয়তো গবেষণা চালাত, আরও খানিক, তার সদ্যপ্রসূত আবিষ্কার, লিলির হাঁ-র ভেতর দিয়ে চালান দিত, কিন্তু এর মাঝখানে মামার হাঁকডাক এসে বাধা দেয়।

নেপথ্য থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে ঃ 'এই বেলা! বেলা! বেলা না লিলি—শিশির, চা খাবি আয়! এই বেলা, আয়!'

চায়ের নাম শুনলে শিশির আর দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। চিরকালই তার এই অক্ষমতা। চা-র গন্ধ পেলে তো আর কথাই নেই—মাছের চার পাওয়ার মতন—আপনা থেকেই সে ধরা দেবে। এমনকী, লিলিও, এখনও পর্যন্ত যে দাদার বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেও আর নিজেকে স্থগিত রাখতে পারে না। একমুহূর্ত দেরি না করে দাদার পিছনে-পিছনে দৌড় মারে!

দুমদাম করে তারা ছুটে চলে। টপাটপ সিঁড়ি টপকে হুড়মুড় করে উঠতে থাকে। কাঠের সিঁড়ি, পুরনো সাবেক কালের, তাদের পদভারে মচমচ করতে শুরু করে।

সেই মচমচানি ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার কানে গিয়ে পৌঁছায়। তিনি খচখচ করতে থাকেন ঃ 'ঘর-দোর সব ভাঙল দেখচি! সারল দেখচি সব!'

চায়ের পাত্র হাতে আপনমনেই তিনি ঝঙ্কার দেন।

ছুটতে-ছুটতে উঠতে-উঠতে, সিঁড়ির মোড় ঘুরবার মুখে, রেলিংয়ের বাঁকের কাছে শিশির ধাক্কা খায়, হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় শিশির। এবং সঙ্গে-সঙ্গে তার ধারণা হয়, ধরণী যেন দ্বিধা হয়ে, তার একখানা পা—যে পা-টা অগ্রণী হয়ে গেছল, সেই পাখানাকেই হঠাৎ গ্রাস করে ফেলে।

শিশিরের মনে হল, পড়ে যেতেই, তার অধঃপতনের ভারে সিঁড়ির সেই জায়গাটা যেন ফাঁক হয়ে গেল, আর তার গর্তের মধ্যে তার একখানা পা হঠাৎ সেঁধিয়ে গেল—বেমালুম শূন্যের ভেতর দিয়ে গলে গেলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি আর কী!

বিস্মিত শিশির দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। উঠে আরও বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে যায়। কোথায় গর্ত, কোথায় কী! তেমনি জমাট সিঁড়ি, কাঠমিলানো নিটোল দেহ নিয়ে তেমনি জমজমাট! পা ঠুকলে তেমনি খটখট করছে!

'অ্যাঁ? এ কী হল? এ আবার কী হল?' অস্ফুট কণ্ঠে বলল শিশির।

'কী হল দাদা?' লিলি পিছন থেকে জিগ্যেস করে : 'খুব লাগল নাকি?'

'ও বাবা! এ-বাড়ির আরও গুণ আছে দেখচি।' শিশির জবাব দেয় : 'ভুতুড়ে বাড়িও বলা যায়!'

'ভুতুড়ে—!' ভূতের নামে লিলি ডরিয়ে ওঠে।

'পদচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম আর কী! পাখানা গিলে বসেছিল আমার। বলব কী, এই সিঁড়িখানাই—বুঝলি লিলি! ভারি আশ্চয্যি!' শিশির বলে, তখনও তার কণ্ঠ বিস্ময়াবিষ্ট : 'বাব্বাঃ, পাখানা হাতিয়ে নিয়েছিল আমার আরেকটু হলে!'

'ভূতে? ভূতে না কি?' লিলির নিজের পা কাঁপতে থাকে।

'বলব তোকে একসময়ে। আগে চ, চা জুড়িয়ে গেল।'

ব্রজেশ্বরবাবুর সঙ্গে এই বাড়ির মিলন আজকের নয়। বছর দশেক আগেকার কথা। এই রাজযোটকের গোড়ায় একটুখানি ইতিহাস আছে—এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলও খানিকটা জড়ানো।

বছর দশেক আগে, ব্রজেশ্বরবাবুর হঠাৎ খেয়াল হল, তিনি পদব্রজে ভূ-পর্যটন করবেন। যেমনি খেয়াল হওয়া, অমনি ঘরবাড়ি—সাধের ইস্কুলমাস্টারি—সব ফেলে, সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে ব্রজেশ্বর পদব্রজেশ্বর হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আসামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, গিরিবর্ত্ম ভেদ করে ব্রহ্মপুত্র সাঁতরে, সীমান্ত প্রদেশ পার হয়ে প্রায় প্রাণান্ত অবস্থায় তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে কত অ্যাডভেঞ্চার যে অবলীলায় অতিক্রম করে গেলেন, সে কহতব্যই নয়। বেশ মজাসেই করে গেলেন।

সব ভূ-পর্যটকেরই যা হয়ে থাকে। চলতি বরাতে যা না ঘটলেই নয়—যেসব দুর্ঘটনার বাঁধাধরা দস্তুর। ভূ-পর্যটনের ফাঁকে ব্রজেশ্বর বাঘের হাতে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর আকার-ইঙ্গিতে বাঘ তাঁকে ভূ-পর্যটক বলে টের পেয়েই খাওয়ার লালসা পরিত্যাগ করে লজ্জিত হয়ে চলে গেছে। সিংহরা তো ফিরেই তাকায়নি, হায়নারাও হায়-হায় করে ফিরে গেছে। ইয়া-ইয়া ভাল্লুক তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—কীরকম এক সঙ্কোচে; তাঁর একটা কথাও খসাতে হয়নি। এমনকী, বড়-বড় সব অজগর, যাদের ল্যাজের মোচড়ে লম্বাচওড়া শালগাছরাও দেশালাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়—অনিবার্যরূপেই হয়ে যায়—ব্রজেশ্বরকে দেখে, দেখবামাত্রই, ব্রীড়াবনত হয়ে মাথা নিচু করে চলে গেছে।

পাহাড়প্রমাণ হাতির পাল তাঁকে তাড়া করে এসেছিল। কিন্তু যেমন এসেছিল তেমনি তারা চলে গেল—বিনা বাক্যব্যয়ে। পরে দেখা গেল, তাড়া করে নয়, তাড়া খেয়ে, নিজেরাই তাড়িত হয়ে তারা ছুটছিল। একঝাঁক বোলতা, কী কারণে তাদের ঝোঁক হল বলা যায় না, হাতিদের পিছু নিয়েছিল—হাতাহাতি করবার মতলবেই হয়তো, কিন্তু কাপুরুষ হাতিরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বেশ হাঁকডাক ছেড়ে, লেজ তুলে, বীরদর্পেই তারা পালিয়েছে—এমনকী ব্রজেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই। এবং বোলতারাও ওঁর প্রতি কোনও বোলচাল ঝাড়েনি, বলাই বাহুল্য। হস্তীযূথের পাশে নেহাত তাঁকে দেখা যায়নি বলেই কি না কে জানে!

এমনকী, নরখাদকরাও ওঁকে মার্জনা করেছিল! যে-দিবসে তিনি তাদের পাড়ায় গিয়ে পড়লেন, সেদিন যার ঝলসানোর পালা, সে নিজেই ব্রজেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছিল, বলেছিল, তার নিজের তুলনায় ব্রজেশ্বরের মাংস আরও বঢ়িয়া হবে, অতএব 'অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' হিসেবে ওকেই আজ টেস্ট করাটা মন্দ কী! এই বলে সুড়ুৎ করে জিভের ঝোল টেনে নিয়ে অভ্যাগতের দিকে

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু করলে কী হবে, ব্রজেশ্বরের স্বাদ না পেয়েই, একজন আসামজাত বাঙালির আস্বাদ কেমন না জেনেই, সেই উচ্চাভিলাষ এ-জন্মের মতো মুলতুবি রেখে সে, বেচারীকে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই আর সকলের উদরস্থ হতে হয়েছে। এমনকী, ব্রজেশ্বরেরও।

প্রস্তাবটায় পালের গোদার তরফ থেকেই বাধা পড়েছিল। তিনি বললেন, 'উঁহু, ও-কাজটিও নয়। ইনি একজন ভূ-পর্যটক। এখন যদি ওঁকে গিলে ফেলি, তা হলে পরে যখন উনি নিজের সভ্য জগতে ফিরে যাবেন, আমাদের সভ্যতার অনেক নিন্দাবাদ রটাবেন—অনেক গালমন্দ দেবেন নিঃসন্দেহে। অতএব ওঁকে হজম করা সমীচীন হবে না।'

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে, সেই প্রতিবাদকারীকেই ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে), পরিতুষ্ট করে ওঁকে ছেড়ে দিয়েছে।

এবং ব্রজেশ্বরও নিমকহারাম নন। তিনিও সভ্য জগতে ফিরে এসে, এ-সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেননি। নিন্দাবাদ দূরে থাক—কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন, তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন মুখে?

তবে মাঝে-মাঝে তাঁর মনে হয়েছে, এই যে, দাঙ্গা-ফ্যাসাদে, যুদ্ধবিগ্রহে এত-এত লোকক্ষয় হয়, নাহক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি, মানে, হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে গেলে, রেঁধে-বেড়ে সাবড়ে দেওয়ার কোনও উপায় থাকত তা হলে হয়তো নেহাত মন্দ হত না। সমস্ত ব্যাপারটার তা হলে একটা অর্থ হত, সদর্থই হত, একেবারে নিরর্থক হত না, এতখানি রক্তপাত নিতান্তই ব্যর্থ হত না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এখন এ যা হচ্ছে এ যে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোনও মানে হয়? অনর্থক বৃথা অপচয় বই তো না? ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশি উপাদেয়, ঢের সুস্বাদু,—এই কথাই ওঁর মনে হয়েচে। মনে হয়েচে আর উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন আর নিজের জিভ চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে- মাঝেই—এই যা! সেই নরখাদকের তার তিনি ভুলতে পারেন নি! তার কথা চিরদিনের জন্য তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এইসব উপদ্রব-উৎপাত অনায়াসেই তিনি এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে। কেটেকুটে না গেলেই হল। এবং ঠিক যেমন-যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণত সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখা যায়, তার কিছুতেই—কোনওখানেই তাঁর ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেয়েছিলেন এবং পেরিয়েছিলেন—অবলীলাক্রমেই। কেবল এক ডাকাতরাই তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, 'বাপু, তুমি একটি ভূ-পর্যটক। বলতে হবে না, দেখেই টের পেয়েছি। তা বাপু, তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়বে, অটোগ্রাফ ছাড়বে আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মারতে চাইনে, কেননা তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু—হিতৈষী উপকারক—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে-বেছে এই সব বিপজ্জনক পথে ভূ-পর্যটন করবে কারা? তোমাদের খতম করলে আমাদেরই ক্ষতি। তোমাদেরও দফারফা আর সেইসঙ্গে আমদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেলব—এ যদি ভেবে থাকো তা হলে ভুল করেছ। যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েছ তেমনি প্রাণ হাতে করে ফিরে যাও। কেবল সম্মিলিত এক যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগের লাভ, সেইটা আগে ফ্যালো দিকি! তারজন্যেই তো এত কষ্ট করে, ঘাঁটি গেড়ে, মশার কামড় খেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওত পেতে বসে থাকা—কবে কালেভদ্রে তোমাদের এক-আধজন ছিটকে-ছিটকে এই পথে ভুলে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতোই এসে যাবে। তা নইলে আর কোন শিকারের আশায় এতখানি ত্যাগস্বীকার? বলো, তুমিই বলো!'

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বলবেন! মুখটি বুজে ওঁর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিলেন সবই সেই বনদস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছেন।

এত ফাঁড়া কাটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে, পথচারী পদব্রজেশ্বরকে, সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসতে হয়েচে।

লিলি হাঁ করে মামার ভোজন-বিলাসিতা দেখছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোস্ট গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয় এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি স্টেশন থেকে ওদের আনতে গেছলেন, সেই সময়ে রেলোয়ে কেবিনে একসঙ্গে জড়ো হয়ে আর্লি টি-র মারফতে ইতিমধ্যেই ওঁর আর একপ্রস্থ হয়ে গেছল—তারপরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নিজের বাড়িতে বসে বিশেষ তোড়জোড়ের সঙ্গে তাঁর এই দু-নম্বর ব্রেকফাস্ট!

লিলি হাঁ করে মামার খাওয়ার বাহাদুরি দেখছিল আর মাঝে-মাঝে একফাঁকে নিজের হাঁ-এর মধ্যে বিস্কুটের টুকরো ভেঙে-ভেঙে রপ্তানি করছিল, এমনসময়ে শিশির একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উঠল।

শিশির এতক্ষণ নিজের মনে কী যেন ভাঁজছিল, কোনওদিকে তাকায়নি, একটিও কথা বলেনি। যত রাজ্যের ভাবনা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম-গরম চাখছিল যেন। হঠাৎ যেন চা চলকে, চায়ের পাত্রে তুফান তুলে, একটা প্রশ্নের ঢেউ মাঝখান থেকে তার মর্মস্থল ভেদ করে উঠল।

'আচ্ছা মামা, তুমি কোনও নকশা পাওনি?' জিগ্যেস করল শিশির।

'নকশা? কীসের নকশা?'

'এই বাড়ির কোনও চোরকুঠরির? যেখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকোনো রয়েছে?'

'এ-বাড়িতে চোরকুঠরি আছে কে বললে তোকে? তুই কী করে জানলি যে, এখানে ধনভাণ্ডার লুকোনো আছে?' ব্রজেশ্বর সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান।

'এই আন্দাজ করছি। এরকম থাকে কিনা।' শিশির কৈফিয়ত দেয় ঃ 'অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।'

'উঁহু, বইয়ে পড়ার কথা নয়।' মামা খুঁতখুঁত করেন তবু ঃ 'খুব খারাপ কথা। ভারি ভীষণ কথা এসব।'

'তুমি তা হলে কোনও নকশা পাওনি? তাই বলো।'

'কেন, তুই পেয়েছিস নাকি?' ব্রজেশ্বর শাণিত চোখে শিশিরকে বিদ্ধ করতে থাকেন।

'এখনও পাইনি, তবে পাব-পাব মনে হচ্ছে।' শিশিরের হাসি রহস্যময়।

দুই ঃ ব্রজেশ্বরবাবুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

'ওঃ, এখন পাসনি! পাব-পাব মনে হচ্ছে! তবু ভালো! তবু রক্ষে!' ব্রজেশ্বর এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ঃ 'আরে, আমি তো বারো বচ্ছর ধরেই পাব-পাব মনে করছি! মনে করায় আর পাওয়ায় ঢের দূর—ঢের ফারাক! হুঁঃ!'

শিশির কোনও জবাব দেয় না, আপনমনে কী যেন ভাবে আর প্যাঁচ কষে।

লিলি বলে ঃ 'মামা, ও কথা থাক! আসামের জঙ্গলে তারপর কী হল বলো। স্টেশন থেকে আসতে-আসতে যতখানি বলেছ তারপর থেকে শুরু করো—।'

'কদ্দুর বলেছি? পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম। সেই পর্যন্ত—না? আচ্ছা, তারপর থেকে বলি, শোন।'

ব্রজেশ্বর পুনরায় নিজের পর্যটন-কাহিনী শুরু করেন, নিজের মনে আর নিজের ভ্রমণে মশগুল হয়ে যান ঃ

'সেই ডাকাতরা তো? বেজ়ায় বজ্জাত। ভারি ফিচেল—আর ভয়ানক নাছোড়বান্দা। আমি যতই বোঝাই, যতই আপত্তি করি কিছুতেই কান দ্যায় না। যতই বলি যে, বনের পশুরাও ভূ-পর্যটক বলে খাতির করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, নরখাদকরাও আমার কেশস্পর্শ করেনি, আর ডাকাত হয়ে, ভালোমানুষ হয়ে, তোমাদের এ কী কাণ্ড? এ কীরকম অভদ্র ব্যাভার? ততই ওরা বলে, আমরা তো আর চারপেয়ে জন্তু নই যে, পেয়ে তোমাকে অমনি ছেড়ে দেব। ওসব কথায় আমরা কর্ণপাত করিনে। আর নরখাদকদের কথা তুলছ যে, তোমাকে হজম করে—সাবড়ে দিয়ে আমাদের কী লাভ? খেতে আর এমন কী তুমি খাসা হবে? তোমাকে খেয়ে-দেয়ে ছেড়ে দেব—এই যদি তুমি ভেবে থাকো—হুঁঃ! আমরা অতো বোকা নই। আর—তুমি তো একটা অখাদ্য!

'আমি একটা অখাদ্য? শুনে আমার এমন দুঃখ হল! তুমি একটা আসামের ডাকাত—ডাকাতির আসামী—অধম পাপী তুমি কী বুঝবে? তোমাদের এলাকায় একলা পেয়ে, অসহায় পেয়ে, অখাদ্য বলে আমাকে খুব কষে অপমান করে নিচ্ছ। নাও, নাও, নিয়ে নাও, কী আর করছি! কিন্তু সে—সেই সামান্য নরখাদক—সেও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, বহুগুণে উত্তম, আমি মুক্তকণ্ঠে বলব—আমি নিজেই ভালো করে চেখে দেখেছি। আমি কতখানি সুখাদ্য—কতটা সুস্বাদু, সে কিন্তু আমাকে না চেখেই বুঝেছিল—দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দর্শনেই, প্রলুব্ধ হয়ে সে আমাকে তার হৃদয়ে—হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গা তার উদরে আমাকে স্থান দিতে চেয়েছিল—তার অন্তরঙ্গ করতে চেয়েছিল আমায়!

'তার কথা ভেবে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। জিভ দিয়ে একটু জলও যে না পড়ে তা নয়। প্রথমে তার ওপরে আমার রাগ হলেও, সত্যি প্রথমে তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—অতটা সমঝদার বলে ভাবতে পারিনি। একটু ভুলই বুঝেছিলাম তাকে। আমাকে উদরস্থ করার তার উৎসাহটা আমি খুব ভালো মনে নিতে পারিনি গোড়ায়—কিন্তু বেশিক্ষণ সে-রাগ আমার ছিল না। তাকে মুখস্থ করার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার রাগ পড়ে গেছল—তাকে আত্মসাৎ করবার পরে আমার যা কিছু রাগ, জিভের জলের সঙ্গে এক হয়ে, একাকার হয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অন্তর্গত করবার পর থেকে, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ এখন তার উপর গিয়ে চড়াও হয়ে পড়েছে। সে আর আমি এখন অভিন্নাত্মা, এ-কথা বললেও অত্যুক্তি হয় না!

'কিন্তু একজন সামান্য ডাকাত, যার কেবলমাত্র পরধনে লোভ—পরস্মৈপদী সম্পত্তির লালসা—মানুষের মূল্য—যথার্থ মূল্য সে কী বুঝবে? তার সাধ্য কী? একটা খুনে হলেও বরং বুঝতে পারত। চোর-ডাকাতের কর্ম না! হ্যাঁ, ডাকাতের আবার খাদ্যাখাদ্য-বোধ!

'যাকগে, যেতে দাও, পৃথিবীতে সবাই কিছু সব জিনিসের সমঝদার হয় না। "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ" বলেই দিয়েছে। সবার রুচি কিছু সমান নয়! অধম কি আর উত্তম হবে? ধমাধম উত্তম-মধ্যম দিলেও না! আর কথা বেশি না বাড়িয়ে, আমার যথাসর্বস্ব যা ছিল সব সেই ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে কেবলমাত্র কালাজ্বর সম্বল করে, কাঁপতে-কাঁপতে, অবশেষে বর্মায় এসে পৌঁছলাম।

'জ্বর গায়ে জর্জর অবস্থায় একজন ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়ি অতিথি হলাম। লোকটি ভারি ভালো। না, না, সেরকম ভালো নয়—সেই নরখাদকের মতো ভালো সে-কথা বলছি না। সেরকম ভালো কি না জানব কী করে? সবাই কি আর গায়ে পড়ে নিজেদের চাখতে দিচ্ছে? আর চাখতে দিলেও, সে-লোকটি যেরকম বুড়ো আর জরাজীর্ণ—তাতে সেই নরখাদকের মতো ভালো হওয়ার তার সম্ভাবনা কম ছিল। সেরকম কচি নরখাদ্য খুব ক্বচিৎ মেলে!

'তবু লোকটি ভালো। কেননা, আমি-লোকটা ভালো কি না, তার বাড়িতে পেয়েও—হাতে-নাতে পেয়েও—জানবার চেষ্টামাত্রও সে করেনি। করলে, সেই কাহিল অবস্থায়, আমি তাকে আটকাতে পারতাম কি না সন্দেহ! বিনা বাক্যব্যয়ে অক্লেশে তার উদরসাৎ হয়ে যেতাম।

'যাহোক, দিন কয়েক জ্বর-জড়িত থেকে কোনও গতিকে সেরে-সুরে তো উঠলাম—আর সেই লোকটি—সেই বুড়ো গৃহস্বামীটি—'

ব্রজেশ্বরবাবু বলতে-বলতে থেমে গেলেন।

লিলি বলে উঠল ঃ 'কী হল তার? কী হল মামা?'

'কী আবার হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা!'

'কবিতা! সে আবার কী?' শিশির জিগ্যেস করে।

'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাকে ধরল। সেই লোকটা নিজেই শেষে রবীন্দ্রনাথের একখানা কবিতা হয়ে বসল।'

'রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল সেই লোকটা? অ্যাঁ?' শিশির-লিলি ভয়ানক ধাঁধায় পড়ে যায় ঃ 'সে আবার কী?'

'আমি সেরে উঠতে না-উঠতেই, বুঝলি কিনা—' ব্রজেশ্বরবাবু এবার সঠিক ব্যাখ্যা করে সমস্তটা জলবত্তরল করে দেন ঃ 'নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ'পরে।'

'ওঃ, তাই বলো! তাকেও কালাজ্বরে ধরল!' শিশির হাঁফ ছাড়ে। লিলিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

'আর তুমি—তুমি বুঝি তাকে—' লিলি সভয়ে দু-চোখ বড়-বড় করে তাকায়, ওর বেশি ও এগুতে পারে না।

'দূর-দূর। আমি কি আর তাই করি? লোকটার প্রতি তো আমার একটুও ভালোবাসা হয়নি যে—তবে—তবে কেন?' ব্রজেশ্বরবাবু জবাবদিহি দেন ঃ 'লোকটার ওপর আমার কেমন একটা বৈরাগ্য ধরেছিল।'

'তাই বোধহয় ও বেঁচে গেল?' শিশির বলে। 'টিকে গেল এ-যাত্রা?'

'উহুঁ, বাঁচল না। মারাই পড়ল শেষটায়। মরবার সময় বলে গেল, মৌলমীনে তার একটা বাড়ি আছে, আর সেই বাড়ির মধ্যে একটা চোরকুঠরি রয়েছে. আর সেই চোরকুঠরির মধ্যে—'

'অগাধ ধনরত্ন!' শিশির নিশ্বাস ছাড়ে।

'তুই কী করে জানলি?' ব্রজেশ্বরবাবু রুখে ওঠেন ঃ 'কে বললে তোকে?'

'বলতে হয় না। এমনিতেই জানা যায়। অনেক অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে পড়া গেছে। এরকম ঢের পড়েচি আমি।'

'কই সে-বই? সে-সব বই কই দেখি?'

'সঙ্গে আনিনি তো।' শিশির জবাব দেয়।

'মাথা কিনেচ আমার!' মামা আরও ক্ষেপে যান ঃ 'একটা যদি উপকার হয় কারুর দ্বারা, কথায় বলে, যম জামাই ভাগনে, তিন না হয় আপনে! এই তিনমূর্তি কক্ষনও আপনার হয় না। কথাটা দেখচি ঠিক।

'বাঃ আমি কী করে জানব যে সে-বই তোমার কাজে লাগবে?' শিশিরও একটু খাপ্পা হয় ঃ 'তুমি কি আনতে বলেছিলে?'

'না বললে কি আনতে নেই? ভাগনে তবে আর বলেচে কেন?'

লিলি মাঝখানে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয় ঃ 'আচ্ছা, আমি মাকে লিখে দেব'খন! মা ভি-পি করে পাঠিয়ে দেবে।'

মামা এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হন ঃ 'হ্যাঁ, লিখে দিস। যেন ফেরৎ ডাকেই পাঠায়। ভি-পি করে নয়, রেজেস্টারি করে পাঠায় যেন। এমন জরুরি দরকার যে কী বলব! যদি সেই সব বইয়ের ভেতরে কোনওরকম ফন্দিফিকির বাতলানো থাকে, হদিশ-টদিশ থেকে যায় কোনও। হ্যাঁ, তারপর, কী বলছিলাম! সেই বর্মী বুড়োটা! মরবার সময় মৌলমীনের সেই বাড়িটা আমাকে দিয়ে গেল। আর বলে গেল, "দিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি কখনও সে-বাড়িতে থেকো না।"

আমি জিগ্যেস করলুম ঃ "কেন, সে-বাড়িতে কী হয়েছে?"

সে বললে ঃ "কেন, বুঝতে পারছ না? কোথায় আমি এই উত্তর ব্রহ্মে, আর কোথায় সেই সুদূর দক্ষিণে, সমুদ্রের ধারে মৌলমীন! মৌলমীন শহর ছেড়ে, সেই রাজার অট্টালিকা পরিত্যাগ করে কেন এখানে এসে, এই হিমালয়ের পাদদেশে, এমন কষ্টেসৃষ্টে বসবাস করছি! তাই থেকেই কি বুঝতে পারছ না?"

আমি বললুম ঃ "উঁহু! কিসসু না!"

বুড়ো বললে ঃ "সে-বাড়ি! সে-বাড়ি—ভারি ভয়ানক।" আর তারপরেই সে খাবি খেতে শুরু করল।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিগ্যেস করলুম ঃ তা তোমার সেই চোরকুঠরির সন্ধান পাব কী করে? তার কি কোনও নকশা-টকশা নেই? আছে? কোথায় সেই নকশা? বলো, বলো, বলে যাও। অমন করে খাবি খেয়ো না। ওইভাবে চলে যেয়ো না; ছলনা করে চলে যেয়ো না। আমি বারম্বার আবেদন করি, নিবেদন করি—সকাতর প্রার্থনা করি—তার অন্তিম দরবারে আমার ব্যাকুল আর্জি জানাই, আর সে ঘাড় নাড়ে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। কিন্তু তার বেশি আর কিছুই তার সেই হাঁ-করা মুখ দিয়ে বার হয় না—হাঁ-ও না, হুঁ-ও না।'

শিশির বলল ঃ 'এমনিই হয়! ঠিক এইরকমটাই হয়ে থাকে—কী বলিস লিলি? ঠিক এই ধরনটাই হয় কি না?'

'হ্যাঁ, দাদা!' লিলি তার ছোট ঘাড়খানা নেড়ে সায় দেয়। 'সব বইয়েই ঠিক এইরকম।'

'তবে আমি জানি, আমি জানি বটে, কোথায় তোমার সেই নকশাটা আছে।' শিশির ব্রজেশ্বরবাবুর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে ঃ 'বুড়ো না বললেও, আমি তোমায় বলে দিতে পারি। বলে দেওয়া কেন, আমি বার করেই দিচ্ছি না হয়! এসো আমার সঙ্গে। এখনই বার করে দিচ্ছি।'

তিন ঃ কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

শিশির যায় আগে-আগে, সাথে-সাথে লিলি। পিছুনে-পিছনে ব্রজেশ্বর।

ব্রজেশ্বরের মুখে অবিশ্বাসের হাসি!

আশ্চর্য নয়! দীর্ঘ বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে বড়-বড় বিশ্বাসই টলে যায়। বারো বছর ধরে চেষ্টা-চরিত্র করে, বাড়াবাড়ি করেও, এমনকী, ভগবানের যদি দেখা না মেলে—তাঁর টিকিরও সন্ধান না পাওয়া যায় তা হলে বড়-বড়, বিরাট-বিরাট, ভক্তও নাস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। অগাধ ধনরত্ন তো তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর তো কোন ছার!

শিশির জিগ্যেস করে ঃ 'নকশাটা কোথায় রয়েছে, টের পেয়েছিস লিলি?'

'না তো!' লিলি ঘাড় নাড়ে।

'এত বই-পড়া সব তোর ব্যর্থ হয়েছে দেখছি! বাজেই অ্যাদ্দিন অ্যাডভেঞ্চারের বই তোকে পড়ালুম। কিচ্ছু লেখাপড়া হয়নি তোর। এখনও মানুষ হতে পারিসনি।' শিশির মুখখানা মুরুব্বির মতো বানায় ঃ 'মেয়েই রয়ে গেছিস। আস্ত একটা মেয়ে!'

কথাগুলো ঠিক মোরব্বার মতো নয়, লিলি মুখ কাঁচুমাচু করে থাকে। প্রতিবাদের একটা চেষ্টা করে ঃ 'বারে, আমি কী করে জানব! আমি কি হাত গুনতে জানি?'

'আমার যদি একটা "টাইগার" থাকত, সেও যে বলে দিতে পারত রে!' শিশিরের অসন্তোষ সীমান্ত ছাড়িয়ে যায়।

'আমার থাকলে সেও বলতে পারত।' লিলিরও এবার একটু ধোঁয়া বেরোয় ঃ 'টাইগাররাই তো পারে। ওদেরই তো এই কাজ! ওরাই পারবে তো। ও তো মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু—

কিন্তু—' তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না ভেবে লিলি একটু ইতস্তত করে ঃ 'কিন্তু টাইগার আর আমি পাচ্ছি কোথায়? তুমি তো আর টাইগার হতে পারবে না। অন্তত এ-জন্মে তো আর পারছ না!'

'এ-জন্মেই পারব। পারব না, কে বলেছে—কে?' শিশির গরম হয়ে ওঠে।

'অনেকেই বলে! তা বলে আর পারতে হয় না?' লিলিও টগবগ করতে থাকে ঃ 'ঘেউ ঘেউ করা সহজ, টাইগার হওয়া অত সহজ না!'

'এক্ষুনি পারব! চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিচ্ছি।' শিশির সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে ঃ 'দেখতে না-দেখতেই দেখতে পাবি।'

এই বলে, শিশির, সিঁড়ির সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেইখানে, যেখানে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল একটু আগেই।

শিশির জায়গাটার আগাপাস্তলা পা চালিয়ে, টিপে-টিপে দেখে। কিছু না! তারপর, সহসা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, একজন উঁচুদরের নাচিয়ের মতো দাপাদাপি লাগিয়ে দেয়! দেখতে না-দেখতেই আবার ধরণী দ্বিধান্বিত হয়েছে এবং সেই দ্বিধার অবকাশে, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে, শিশিরের একখানা শ্রীচরণ গলে চলে গেছে।

'এই যে! এই যে পেয়েছি! পেয়ে গেছি! কেল্লা মেরে দিয়েছি।' শিশির চিৎকার করে ওঠে।

ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসে আর সন্দেহে, বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে এতক্ষণ ওতপ্রোত হচ্ছিলেন, এবার তিনিও আর্তনাদ করে উঠলেন ঃ 'ভাঙলি! ভাঙলি তো সিঁড়িটা! আমি তখনি জানি! এই তোমার নকশা বার করা?'

কিন্তু বলতে না-বলতে, শিশির, পায়ের সঙ্গে একখানা হাতও গলিয়ে দিয়েছে এবং হাতড়ে-মাতড়ে, তার অন্তঃস্তল থেকে, রুলের মতো করে পাকানো কাগজের কী একটা গুলতানি টেনেও বার করেছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলতেই—বেরিয়ে পড়ল পুরনো এক পার্চমেন্ট আর তার পিঠে কী সব মক্স করা।

'এই তো সেই নকশা!' শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ঃ 'সেই নকশাই তো!'

শিশিরের মামা সিঁড়ির মাথায় বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কী যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, এইবার তিনি একলাফে, একটি মাত্র উল্লম্ফনে সব ক'টা সিঁড়ি এক নিমেষে টপকে এসে শিশিরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

'দে—দে! আমার নকশা দে!' বলতে না-বলতে পার্চমেন্টটা তিনি শিশিরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

'বাঃ, আমি আবিষ্কার করলাম, আর তোমার নকশা কীরকম?' শিশির ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলতে গেছে।

'তোর নকশা! ভারি ইয়ার হয়েছেন!' এই বলে ব্রজেশ্বরবাবু ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন শিশিরের গালে ঃ 'বারো বছর ধরে আমি-ব্যাটা হাতড়ে মরছি, আর ওঁর কিনা নকশা হল! আবদার আর কী!'

এই বলে তিনি আর অযথা বাক্যব্যয় না করে অতিরিক্ত চড়-চাপড়ের প্রলোভন পর্যন্ত সম্বরণ করে দৌড়তে-দৌড়তে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিয়ে নকশার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

'খুব লেগেছে নাকি দাদা?' লিলির আবার শিশিরের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।

শিশির কিছু না বলে আহত গালে হাত বুলোয়।

'এ কীরকম মামা আমাদের?' লিলি অবাক হয়। 'বাবাঃ, কী বদরাগী!'

'মামারা এই রকমই।' শিশিরের আপনমনে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস।

'আচ্ছা, মামা হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন দাদা?'

লিলি দাদার গালে হাত বুলোতে পারে না, ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না, একটু আগেই ওদের মধ্যে যে-বাকযুদ্ধ হয়ে গেছে সেই কথা মনে করেই ওর হাত ওঠে না। ভয় করে, তা হলে হয়তো শিশিরের হাত উঠে আসবে। নিজের গাল থেকে লিলির গালেই এসে পড়তে পারে চাই কি!

'অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্!' শিশির উদাসীনের মতো জবাব দ্যায়। তার মুখপত্রে দার্শনিকতার বিজ্ঞাপন।

'এরকম হবে আমি ভাবতেও পারিনি।' লিলির কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

'আমি ভাবতে পেরেছিলাম।' শিশিরের গলায় নির্লিপ্ততার স্বর : 'এই রকমটাই হয়। এই রকমই হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই আমি এ-সব ভেবে দেখেছি।' শিশিরের ললাটে ভূয়োদর্শনের প্রচ্ছদপট!

'থাক গে। যেতে দে। মামা তো খিল এঁটেছে। চোরকুঠরির হদিস না নিয়ে আর নড়ছেন না। চল, এই ফাঁকে আমরা বেরিয়ে পড়ি, মৌলমীন শহরটা বেড়িয়ে-চেড়িয়ে দেখে নিই ততক্ষণ!'

বেড়াতে-বেড়াতে দুজনে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। শিশির ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে : 'মামা কীরকম চালাক দেখলি? দেখলি তো লিলি?'

মামার মূঢ়তা দেখেছে, রূঢ়তাও দেখা গেছে, মামা যে 'লাকি' সে-বিষয়েও ভুল নেই, অযাচিত—অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়ির নষ্ট-কোষ্ঠী পুনরুদ্ধারেই সেটা প্রত্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু মামার চালাকি যে কোনখানে লিলি সেটা সহজে বুঝে উঠতে পারে না।

'আমাদের শিলং থেকে, অত লং ডিস্ট্যান্স থেকে ধরে-বেঁধে-ডেকে আনানোর কী মানে, বুঝতে পারলি নে?'

'না তো!'

'এইজন্যেই! চালাকি করে নকশাটা উদ্ধার করে নেওয়ার জন্যেই। আমাকে ছাড়া আর কারু দ্বারা হত না কিনা!' শিশির দুঃখের সহিত এবং একটু গর্বের সঙ্গেই বিবৃতি দেয়।

এ ছাড়া তাদের আনানোর আর কী কারণ থাকতে পারে, শিশির ধারণা করতে পারে না। কোথায় শিলং আর কোথায় মৌলমীন—কতখানি ফারাক! এবং যে-মামা বারো বছর আগে তাদের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছেন, সে-সময়ে তারা দু-তিনবছরের, সেই সময়েই যা কোলেপিঠে করে মানুষ করে—বা মানুষ করবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে (দুশ্চেষ্টায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই কি না কে জানে) তাদের পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন, এমনও হতে পারে যে তারাই মামার বৈরাগ্যের কারণ; মামার আকস্মিক বানপ্রস্থের, পরদেশ-আসক্তির, দেশান্তর-বিলাসিতার মূলে খুব সম্ভব তারাই; মামা হয়তো ভেবেছিলেন, এই শিশুদের, যারা কখন নায়েগ্রা আর কখন গন্ধমাদন তার কিছুই স্থিরতা নেই—কখন প্রপাত আর কখন বা উৎপাত বলা কঠিন, কখন যে খাদ্য (কেবল চুমুর দিক দিয়ে) আর কখন অখাদ্য কে বলবে, তখন যাবতীয় লাভক্ষতি খতিয়ে, তিনি ভেবে দেখলেন, এদের কোলেপিঠে করার চেয়ে সমস্ত ভূভার ধারণ করাও সহজ, (এবং ঢের বেশি নিরাপদ) এর চেয়ে, এই পরস্মৈপদী নন্দন-কানন বহনের চেয়ে, কস্তুরী মৃগসম নিজের গন্ধে উন্মাদ হয়ে, বনে-বনে, অরণ্যে-অরণ্যে, সারা ধরিত্রীময় ছুটোছুটি করে বেড়ানোও ঢের ভালো—ঢের-ঢের সুখের! সেই বিরাগী মামার হঠাৎ যে আবার এত অনুরাগ উথলে উঠবে, এমন মন-কেমন করতে লাগবে যে, তাদের দেখবার লালসায়, মার কাছে তার করে সামারভ্যাকেশনেই আমদানি করার জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়বেন, এরকম সম্ভাবনার ভাবনাই করা যায় না। শিশির, ব্রজেশ্বরবাবুর মতলবটা, মনোগত অভিপ্রায়টা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চুল চিরে লিলির কাছে পরিষ্কার করে দেয়। সমুদয় রহস্য সূর্যোদয়ে কুয়াসার মতো বেবাক ফাঁক হয়ে যায়।

'তাই তো! তাই তো বটে!' লিলিও আর ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না।

'আমি অবশ্যি প্রথমে অন্য কথা ভেবেছিলাম—' বলতে-বলতে চেপে যায় শিশির।

'কী? কী কথা?'

'না, বলব না। বললে তুই ভয় খাবি।' শিশির বলে।

'না, বলো না? ভয় কিসের?' লিলি রীতিমতো নির্ভীক।

'আমি ভেবেছিলাম—মামার গল্প শুনতে-শুনতেই মনে হয়েছিল আমার। মামা সেই যখন বলল না যে, সেই নরখাদকটার তার এখনও তার মুখে লেগে রয়েছে—বলল না?'

'বলল তো! তার কী?'

'সেই ভুক্তভোগী নরখাদকটা মামার পেটে গিয়ে যে এখন বসবাস করছে!'

'করছেই তো! কী হয়েছে তার?'

'সে আর এখনও আছে কি? কবে হজম হয়ে গেছে! তাই মামা হয়তো তার শূন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে, তার অভাব-মোচনের অভিলাষেই, হয়তো—হয়তো—'

'হয়তো আমাদের—? অ্যাঁ?' লিলির দু-চোখ ভয়ে যেন ভুরুর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়।

'হ্যাঁ, তাই! মামা বলল কিনা যে, লোকটার তার এখনও তার মুখে লেগে রয়েছে। বলেই সুড়ুৎ করে মুখের ঝোল টেনে নিল আর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল—দেখলি না?'

'আর কেমন একটা অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকাল!' লিলি কম্পিতকণ্ঠে বলে: 'দেখেছি বইকী!'

'তবু তো সে-লোকটা খাসীই ছিল! ধেড়ে একটা খাসী ছাড়া আর কী? আমাদের মতো কচি পাঁঠা পেলে—?'

বাকিটা, বাকি অনির্বচনীয়ত্ব, শিশির অব্যক্তই রেখে দেয়।

'তা হলে চলো পালাই এখান থেকে। পরের ট্রেনেই পালিয়ে যাই। সোজা একেবারে রেঙ্গুনে—সেখান থেকে ফিরতি জাহাজে লম্বা এক পাড়ি!' লিলি লীলায়িত হয়।

'উঁহু, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্যন্ত না দেখেই যাব? গুপ্তধনের কিনারা না করেই? পাগল? তা ছাড়া, খেলেই অমনি হল কিনা! খাওয়া পথেই পড়ে আছে আর কী? হুঁ! আমরা হুঁশিয়ার থাকব না? তা ছাড়া, আরেকটা কথা—'

'কী? কী কথা?' আরও কী আশ্চর্য কথা শিশিরের আশ্চর্যতর মাথা থেকে বেরিয়ে আসে, লিলি সেজন্য উৎকর্ণ হয়।

'মামা বলল না, বলল না যে, ভয়ানক ভালোবাসা না হলে চাখবার কথা মনেই জাগে না। যেমন সেই বর্মীটার ওপর মামার তেমন ভালোবাসা হয়নি বলে—কেমন যেন একটু বৈরাগ্য হয়েছিল বলে—তাকে মুখে তোলবার কথা মামার মনেই হয়নি।'

'তুমি বলছ যে, মামা আমাদের তত ভালোবাসে না? অন্তত তত ভয়ানকভাবে নয়? তাই তেমন ভয় নেই বলছ?'

'ভালো যা বাসে তা তো এক চড়েই বুঝেছি!' এই বলে শিশির আবার নিজের গালে আরেকবার হাত বুলিয়ে নেয়। 'উঃ, যা জ্বলছিল!'

এতক্ষণে লিলি তবু কিছু ভরসা পায়। অমন কঠোর-হৃদয় মামার ভালোবাসার পাত্র হওয়া সহজ নয়, সে-কথা সত্যি। এবং ভালোই যদি না বাসেন, তা হলে, কেন আর মামা, অত কষ্ট করে তাঁর হৃদয়ের চেয়েও চওড়া জায়গায়, তাঁর উদার উদরের পরিধির মধ্যে অন্যান্য খাদ্যাখাদ্যদের হটিয়ে, উপাদেয় চর্ব্য-চোষ্যদের বাদ দিয়ে তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে উদ্ব্যস্ত হবেন?

'তাই ভালো। যদি কেবল চড়ের ওপর দিয়েই যায়, সেও মঙ্গল!' লিলি বলে: 'চর্চড়ি না হতে হলেই হল!'

চার ঃ প্যারাশুট-বাহিনী!

'দ্যাখ, দ্যাখ! চেয়ে দ্যাখ! নৈর্ঋৎ কোণ থেকে কী একখানা আসছে তাকিয়ে দ্যাখ।' আকাশের দিকে লিলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশির।

'একখানা এরোপ্লেন।' লিলির বুঝতে দেরি হয় না। 'সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে।'

'এরোপ্লেন তো বটেই, কিন্তু নৈর্ঋৎ কোণ থেকে উঁকি মারছে কিনা, দেখছিস নে? সেইটাই ভাবনার কথা।'

'ওটা নৈর্ঋৎ কোণ না কি? নৈর্ঋৎ কোণ, কোন কোণ, দাদা?'

'কে জানে! তবে খারাপ যা-কিছু সব ওই কোণ দিয়েই আসে। ঝড়-ঝাপটা-সাইক্লোন—সব! এরোপ্লেনও কি কম মারাত্মক আজকাল? সাইক্লোনের চেয়ে কিছু কম কি? আমাদের ওপরে বোমাই ফেলবে কি না কে বলতে পারে?'

'কিন্তু ওটাই যে নৈর্ঋৎ কোণ তা তো আর তুমি ঠিক জানো না।'

'জানি না মানে? হতে বাধ্য। মারাত্মক যা-কিছু, মন্দ যা-কিছু আর কোনদিক দিয়ে আসবে শুনি? তারা কেবল ওই এক কোণঠাসা হয়ে রয়েচে। নৈঋৎ কোণ।'

'ওটা যে বদ মতলবে আসচে কী করে তুমি বুঝলে?'

'ওর চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। ওর চালচলন দেখেই। ওর হাবভাবেই ধরা পড়চে। সমস্ত এই দূর থেকে দেখেই টের পেয়েছি। আমার দূর-দর্শন আছে এটা তো তুই মানিস? নইলে সেই নকশাটা বার করলুম কী করে?'

এ-কথার পর আর কোনও কথা চলে না। লিলি চুপ করে যায়। ভূয়োদর্শী লোকেরাই দূরদর্শী হয়ে থাকে, কে না জানে? যারা দূরের জিনিস দেখতে পায়, তারা ভূয়োও অনেক কিছু যে দ্যাখে, এ-কথাই বা কে অস্বীকার করবে? মনে-মনে এই সব খুঁটিয়ে-খতিয়ে, লিলি বেশি আর উচ্চবাচ্য করে না। এরোপ্লেনের রীতি এবং কোণের নৈর্ঋতি, যখন তার দাদার কাছে প্রাঞ্জল, জলের মতোই প্রাঞ্জল, তখন, একবাক্যে তার নিজের কাছেও পরিষ্কার—খুব ধবধবে পরিষ্কার না হলেও—মেনে নেওয়ার মতো মানানসই হতে বাধা কি?

'দ্যাখ-দ্যাখ, এরোপ্লেনটা কীরকম ডিগবাজি খাচ্ছে—দ্যাখ লিলি!'

'ঘুড়ির মতন অমন লাট খাচ্ছে কেন দাদা?' লিলিও জিগ্যেস করে।

'মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো! লাট খেতে-খেতে বেটপকা সমুদ্রে না পড়ে যায়। তা হলেই—তা হলেই—' অবরুদ্ধ নিশ্বাসে শিশিরের কণ্ঠরোধ হয়।

'তা হলে কী হবে?'

'কী আবার হবে! সলিল-সমাধি! যা হয়ে থাকে।'

শিশির মহাপুরুষ না হলেও, বয়ঃক্রমের অবিচারে এখনও না হতে পারলেও, মহাবালক তাকে বলতেই হয়। কেন না, সে কেবল দূরদর্শীই নয়, বেশ একটু বাকসিদ্ধও বইকী! বলতে না-বলতে, এরোপ্লেনটা ওল্টাতে-পাল্টাতে, একেবারে সমুদ্রের বুকের ওপর এসে খাবি খায়। কিন্তু তার আগেই—।

তার আগেই তার চালক, একমাত্র আরোহীই খুব সম্ভব, এরোপ্লেন গলে প্যারাসুট বগলে, ফাঁকা হাওয়ায় পদার্পণ করেচে। সুবিস্তৃত ছত্রাকার বস্তুটি অবলম্বনে শূন্যমার্গে ঝুলে পড়েচে।

আকাশ বিদীর্ণ করে আস্তে-আস্তে নামতে থাকে সে।

শিশির সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

'প্যারাশুট-বাহিনী!' তার মুখ থেকে খালি বেরোয়।

'প্যারাশুট-বাহিনী বলচ কি দাদা?' ভাষার এবম্বিধ লাঞ্ছনায় লিলি মৃদু আপত্তি না জানিয়ে পারে না ঃ 'শুধু একজন তো লোক! প্যারাশুটবাহী বলতে পারো বরং।'

'লোকটা মেয়ে কি পুরুষ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি নাকি?' দূরদর্শী হয়েও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতে শিশিরের লজ্জা হয় না ঃ 'আর মেয়ে হলে বাহিনীই তো হবে, ব্যাকরণেই বলে দিয়েচে। যেমন সিংহবাহিনী? সিংহবাহিনী বলতে কী বোঝায়? একগাদা সিংহ কি? মোটেই না। সিংহবাহিনী মানে মা দুর্গা! তার মানে—' উদাহরণ দিয়ে বিশদ করে ব্যাখ্যা দ্বারা সে বিস্তৃত করে ঃ 'তার মানে মেয়েরা একাই একশো কিনা! একাই একটা বাহিনী!'

'তোমার মাথা!' লিলি, নিজে মেয়ে হলেও, এতখানি নির্জলা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

'এই যা, লোকটাও যে জলে পড়ল দেখছি। ভেবেছিলাম, উড়তে-উড়তে ডাঙায় এসে পৌঁছবে।'

'ডুবে গেল যে লোকটা!' লিলির অস্ফুট আর্তনাদ।

'এখানে তো আর কেউ নেই! কী মুশকিল দ্যাখো তো!' শিশির ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে ঃ 'আমাকেই গিয়ে বাঁচাতে হবে দেখছি।'

'তুমি? না, না—তুমি না!' লিলির স্বরে আবেগ। 'না দাদা!' সকাতর আবেদন!

'কেন, আমি কি সাঁতার জানিনে? ডুবন্ত লোককে বাঁচাতে পারিনে না কি আমি?'

'সমুদ্রে কখনও সাঁতার কাটোনি তো!'

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' লিলির জবাবে এই কথাটা বলতে গিয়ে শিশির থেমে যায়। উপমাটা ঠিক তার উপযুক্ত নয়—বীরত্বব্যঞ্জকও না—যথোচিত নয় তার পক্ষে। একটু ভেবে নিয়ে সে বলে ঃ 'কেন, যে খাতায় অঙ্ক কষে, সে কি ব্ল্যাকবোর্ডে কষতে পারে না?'

এই বলে শিশির মালকোঁচা মেরে তৈরি হয়ে নেয় ঃ 'লোকটাকে কেমন করে অবলীলাক্রমে উদ্ধার করে নিয়ে আসি তুই চেয়ে চেয়ে দ্যাখ।'

শিশির সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিলি চিৎকার করে বাধা দিতে যায়, কিন্তু তার আওয়াজ বেরোয় না। সমুদ্রের বুকে শিশির-সম্পাত—কাঠের পুতুলের মতো সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। তার দু-চোখের উপকূল আরেক নোনাজলে ছাপিয়ে উঠে।

শিশির সাঁতরে কোনওরকমে মজ্জমানের কাছাকাছি যেতেই, তাকে হস্তগত করবার আগেই, লোকটিই শিশিরকে পাকড়ে ফ্যালে।

'এ কী! তুমি আবার কে হে? তুমি এখানে কেন?' পরিষ্কার বাংলাতেই প্রশ্ন করে সে। এবং দেখা যায় প্যারাশুট-বাহিনী নয়, লোকটা প্যারাশুট-বাহন।

'তোমাকে বাঁচাতে এলাম।' শিশির বলে, 'তুমি ডুবে যাচ্ছ।'

'আমাকে! আমাকে বাঁচাতে!' লোকটি না হেসে পারে না। 'কী সর্বনাশ! এক কাজ করো। আমার কাঁধ আঁকড়ে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে থাকো।' এই বলে সেই লোক, ডুবন্তরা যেমন করে খড়কুটো পাকড়ায়, ঠিক তেমনি করে শিশিরকে ধরে নিজের পিঠে জড়িয়ে নেয়—যেমন করে স্নানযাত্রীরা গামছা কাঁধে ফেলে আর কি।

উদ্ধার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শিশির নিজেই উদ্ধৃত হয়ে পড়ে।

শিশিরকে পৃষ্ঠসাৎ করে লোকটা যদৃচ্ছ সাঁতার কেটে তটভূমির দিকে এগোতে থাকে।

'ঢেউয়ের কীরকম জোর দেখচ! আর কী ভীষণ আন্ডারকারেন্ট! আমি না থাকলে এতক্ষণ তলিয়ে কোথায় ভেসে যেতে!' লোকটি, শিশিরের বোঝা ঘাড়ে ফেলেই শিশিরকে বোঝাতে চায়।

শিশির কিন্তু ধন্যবাদ-জ্ঞাপনের কোনও কারণ খুঁজে পায় না। কৃতজ্ঞতার কোনও বিজ্ঞাপন দেয় না।

'ডাঙায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে, ওই মেয়েটি কে?'

'আমার বোন।' শিশিরের কাটা জবাব।

'ও আবার তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবে না তো? কিংবা আমাকেই হয়তো? তা হলেই তো আমি গেছি! আমার তো একটিমাত্র পিঠ!' লোকটি বলে।

'একমাত্র পিঠ তো কী হয়েছে?'

শিশির উসকে ওঠে, তার একটু উষ্মাই হয়। লোকটা নিজের পীঠস্থানের মাহাত্ম্য নিয়ে যে- রকম বাড়াবাড়ি লাগিয়েচে, তাতে ওর পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে সলিল-সমাধিও শ্রেয়—ঢের শ্রেয় বলে শিশিরের ধারণা হতে থাকে। পৃষ্ঠে ধারণ করে লোকটা যেন ওর মাথা কিনতে চায়। কে ওকে অমন করে পিঠে ধরতে বলেছিল?

'একটি তো পিঠ, তাই নিয়ে আমি ক'জনের দ্বারা উদ্ধার হব? তাও আবার তুমিই এখন গ্রাস করেচ! পরহস্তগত পিঠ নিয়ে ক'জনের দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায়? তুমিই বলো?'

'কে আবার তোমাকে উদ্ধার করতে আসচে?' শিশির জানতে চায়।

'বলা যায় না তো, ওই মেয়েটাও আসে যদি? তোমার যখন বোন, পরের জন্য—পরের প্রাণদানের জন্য নিজের প্রাণ দেবার বাতিক ওরও থাকতে পারে, বিচিত্র কী? তা হলে বাপু, আমি পারব না, পেরে উঠব না। তোমার নিজের পিঠেই ওকে স্থান দিতে হবে তা হলে। আগে থেকেই আমি বলে রাখচি কিন্তু।'

শিশির কিছু বলে না, চটেমটে চুপ করে থাকে। উপকার করতে এসে উপকৃত হলে, বড়-বড় বীররাই বিরক্ত হয়ে যায়—শিশিরেরও বিরক্তি ধরবে সে আর বেশি কী?

আস্তে-আস্তে ওরা উপকূলে পৌঁছায়—ডাঙায় এসে পরস্পরকে নামায়।

'উঃ!' লোকটা কপালের ঘর্মাক্ত জল মুছে ফ্যালে : 'এই তোড় ভেঙে আর ঢেউ ঠেলে একটা লোককে টেনে নিয়ে আসা কি সোজা? প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়! বাপ!' লোকটি হাঁফ ছাড়ে : 'মানে, তোমার দাদার কথাই বলচি! আমাকে উদ্ধার করতে বেচারি হিমশিম খেয়ে গেছে।'

'আমার দাদা ওইরকম!' দাদার গর্বে ও গৌরবে লিলি টইটম্বুর : 'পরের প্রাণদান করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে ফেলে। কতবার!'

'তাই তো দেখচি। এরকম দাদা নিয়ে ঘোরাফেরা নিরাপদ নয়।'

'নয়ই তো! আরেকটু হলে আমি নিজেই তো জলে পড়েছিলাম! যদিও সাঁতার জানিনে তবু দাদার প্রাণ বাঁচাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হত!'

'উঃ, বড্ড বেঁচে গেছি দেখছি!' লোকটা অনেকখানি নিশ্বাস ফেলে দেয় : 'মানে তুমিই! বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছ আজ।'

কথা কইতে-কইতে তিনজনে শহরের মধ্যে এগোতে থাকে। শিশির খুব কমই কথা বলে। কী করে এরোপ্লেনের কল বেগড়াল, কজাগুলোকে কিছুতেই আর কায়দায় আনা গেল না, সবসমেত সমুদ্রগর্ভে তলাবার আগে কোন সতর্ক মুহূর্তে, মাথা এবং প্যারাশুট খেলিয়ে অধোগামী এরোপ্লেনের কবল থেকে, নবতো নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, শূন্যমার্গে, নিরুদ্দেশেই, নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছেন —এইসব কথা। কোথা থেকে আসছেন, কোনখানেই বা গন্তব্য, এবং কেনই বা নৈর্ঋৎ কোণকে এভাবে অগ্রাহ্য করে তাঁর এইসব অভ্রভেদী পঞ্জিকা-বিরুদ্ধ যাতায়াত—তার কোনও কথাই কিন্তু ভদ্রলোক পাড়তে দিচ্ছিলেন না।

লিলি উচ্চবাচ্য করে, শিশিরও উসখুস করতে থাকে—কিন্তু যেভাবেই শুরু হোক না কেন, প্রশ্নপত্র চেপে যাবার ভদ্রলোকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

অবশেষে তারা বেড়াতে-বেড়াতে শহরের বড় একটা বাড়ির পাশে এসে পড়ল। বাড়িটার গায়ে, সচিত্র এক বিজ্ঞাপনে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার একটা ঘোষণা জ্বলজ্বল করছিল।

শিশির না দেখেই বলল ঃ 'ক্রসওয়ার্ড পাজল! বুঝেচি!'

লিলি এগিয়ে যায় ঃ 'কই দেখি!'

'ও দেখে কী হবে? কেউ সলভ করতে পারে না। পারতে গেলে, সহজ কথার জায়গায় শক্ত কথা, শক্ত কথার জায়গায় সহজ কথা হয়ে যায়—যা করবি ঠিক তার উল্টোটা হবে। তার মানে, উল্টোটাই হচ্ছে ঠিক। বুদ্ধি খাটিয়ে ফের যদি তার উল্টো করতে যাস, দেখবি, আবার তার উল্টো হয়ে গেছে। এন্ট্রি-ফি-ই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার।' শিশিরের কাছে স্পষ্ট কথা—শিশির ওসব দিকে ভুলেও আর ভ্রূক্ষেপও করবে না। অভিজ্ঞতাবান উদাসীন শিশির।

ভদ্রলোক কিন্তু একবার চোখ বুলিয়েই বিজ্ঞাপনটা আড়াল করে দাঁড়ান ঃ 'হ্যাঁঃ! এসব পুরস্কার কেবল ঘোষণা করাই সার! কে-ই বা পাচ্ছে, আর কে-ই বা নিতে যাচ্ছে! কাউকে পেতে দিলে তো!'

এই বলে ওদের সাথে হনহন করে আরেকটু এগিয়ে, চৌমাথায় পৌঁছেই, চলতি একখানা ট্যাক্সি থামিয়ে তিনি চট করে উঠে পড়েন—এবং ওদের আর-একটি কথাও না বলে তীরবেগে তিরোহিত হয়ে যান। লোকটার আকস্মিক অন্তর্ধানে শিশির একটু বিস্মিতই হয়।

'চলো না দাদা, দেখে আসি পাজলটা। পারা যায় কি না দেখা যাক। বর্মার ক্রসওয়ার্ড হয়তো অতো শক্ত হবে না।'

'তোর ভারি টাকার লোভ! পারবিনে, তবুও। বলছিনে, আমার অনেক টাকা ওরা মেরে দিয়েছে। ওই ক্রসওয়ার্ডরা।'

শিশির আর লিলি আবার সেই বাড়িটার পাশে ফিরে আসে। আরে, এ-বাড়িটা তো শহরের একটা থানা বলে বোধ হচ্ছে? হ্যাঁ, থানাই তো! ইতস্তত লালপাগড়ি দেখা যায় যে! কিন্তু, এ আবার কীরকম ক্রসওয়ার্ড?

বিজ্ঞাপনের গায়ে ইংরেজি ভাষায় লেখা ঃ "নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার। হংকং-এর জেল হইতে কিছুদিন পূর্বে পলাতক দুর্ধর্ষ বাঙালি দস্যু—বক্কেশ্বর আইচ—যে-কেহ ইহাকে ধরাইয়া দিলে বা সঠিক সন্ধান দিতে পারিলে, উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।"

তবে, ক্রসওয়ার্ড না হলেও পাজল যে, সে-বিষয়ে ভুল কি?

সেই বিজ্ঞাপনের অঙ্গে যে-ফোটো লাগানো, সেই ফোটোর সঙ্গে—সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত ওই ভদ্রলোকের ভয়ঙ্কর মিল! বেধড়ক মিল, যাকে বলে!

পাঁচ ঃ অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক

বাড়ি ফেরার পথে শিশির চুইংগাম কেনে। গোটাকতক নিজের এবং লিলির মুখে অর্পণ করে বাকিগুলো রেখে দেয়।

'মামার পায়ে লাগানো যাবে এগুলো।' শিশির বলে।

মুখের বদলে পায়ে কেন, লিলি ভেবে পায় না। 'কেন, পায়ে কেন? মুখ থাকতে—পায়ে?' সে জিগ্যেস করে।

'আন্দাজ কর দেখি! বুঝব তোর বুদ্ধি!' শিশিরের রহস্যময় চাহনি।

লিলি আন্দাজ করে ঃ 'মামা বুঝি ফের আবার ভূ-পর্যটনে বার হবে মনে করছ? তাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?'

চুইংগাম যেমন চর্বণের—চর্বিত চর্বণের অন্তরায়, তেমনি নিশ্চয় ভূ-পর্যটনকারীর পদে-পদে বাধার সঞ্চার করবে, তার নিজের রোমন্থনের মুশকিল দেখে এই পর্যন্ত লিলি অনুমান করতে পারে।

'তোর মাথা! তোর কিচ্ছু মাথা নেই! তুই একটা গাধা!' শিশির সাদা বাংলায় বলে দেয়।

'মুখে লাগালেও মানে বুঝতুম! পাছে মামা প্ল্যানের খবর আর কারও কাছে ফাঁস করে দেন সেই কারণে মামার মুখ বন্ধ করার মতলবে—।'

'মোটেই না, মোটেই—না!' শিশির বাধা দিয়ে বলে ঃ 'কেন চুইংগাম কিনলাম বলি। মামা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথা খাটিয়ে প্ল্যানটার রহস্যভেদ করেচে। করেনি কি?'

'নিশ্চয়!' মামার কার্যকারিতায় লিলির অগাধ বিশ্বাস।

'আর আমি মামার পা খাটিয়ে তার সমস্ত জেনে নেব।' শিশির জানায়।

'পা খাটিয়ে? মামার পা?' লিলি আবার গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে, কিচ্ছু বুঝতে পারে না।

'এই চুইংগাম এখনই গিয়ে মামার যাবতীয় জুতো আর স্লিপারের তলায় ভালো করে এঁটে দেব। তাদেরই একজোড়াকে পায়ে দিয়ে তো মামা সেই গুপ্ত কক্ষের সন্ধানে বেরুবে। আর যে-যে ঘরের ভেতর দিয়ে যেখান দিয়েই যাক না—মামার প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে চুইংগামের চিহ্ন থেকে যাবে। চুইংগামরা তো সহজ পাত্র নয়!'

লিলি অবাক হয়ে দাদার বুদ্ধির বহর দেখে, তার মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বাড়ি ফিরে লিলি আর শিশির জুতোদের খোঁজখবর নিতে যাবে, এমনসময়ে মামার রুদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর সোরগোল শুনতে পায়।

'তুমি তা হলে এই বাড়ি আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি নও?' অপরিচিত কণ্ঠের বাজখাঁই আওয়াজ।

'নাঃ, কিছুতেই না।' মামার গলা।

'ভেবে দেখো, আমি কদ্দুর থেকে এসেছি? কীরকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে, প্রাণ তুচ্ছ করে—।'

'আমার বয়েই গেল!'

এ বাড়ি হাতে রেখে তুমি কী করবে? পুরনো পচা বাড়ি—এর ভাড়াটেও পাবে না কোনওদিন। এর ইঁট-কাঠ-কড়ি-বরগারই বা কত দাম হবে! যদি চাও উচিত মূল্যের বেশি দিয়েও আমি এটা কিনে নিতে পারি!'

'হ্যাঁ, এই বাড়ি আমি বেচতে গেছি কিনা!' মামার জবাব শোনা যায় ঃ 'এ-বাড়ির দাম আমার জানা আছে। তোমাকে আর বেশি করে আমায় জানাতে হবে না।'

'হুম।' অপরিচিত গলার সুর এবার বদলায় ঃ 'হুম বুঝেচি। এই বাড়ির কোনওখানে গুপ্তধন লুকোনো আছে, তুমি ভেবেচ বোধহয়? যদি লুকোনোও থাকে, কোনওদিন তুমি তার সন্ধান পাবে না। তার প্ল্যানই খুঁজে পাবে না কোনওদিন। সারাজন্ম খুঁজলেও তোমার ও-হাঁদাবুদ্ধির কর্ম নয়!'

'পাব কি পাব না, পেয়েচি কি পাইনি—সে আমি বুঝব! মামা জানায় ঃ 'তোমাকে বলতে গেছি আর কি! কী আমার গুরুঠাকুর এলেন!'

'বটে? এই কথা? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যদি না দেখে নিই, তা হলে আমার নাম—আমার নাম—।'

বলতে-বলতে ঝাঁঝালো গলায় ভদ্রলোক দরজা খুলে তীরবেগে বেরিয়ে যান।

শিশির ও লিলি সিঁড়ির আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দ্যাখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে দ্যাখে—তর্জন-গর্জনকারী নবাগতটি আর কেউ নন, তাদের সদ্যপরিচিত শ্রীমান বক্কেশ্বর আইচ।

সারাদিন শিশির আর লিলি ওত পেতে থাকে, মামার সবকটা জুতোর পরিচর্যা সেরে, মামাসুলভ গতিবিধির মাঝখানে, এখানে-সেখানে, মামার যাত্রাপথের সর্বত্র, প্রলোভনজনক করে ছড়িয়ে রেখে দেয়। যেদিকেই মামা পা বাড়াবেন, একজোড়া পাবেন—তাঁর পায়ে পড়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছে। জুতোর জন্যে মামাকে ইতস্তত করতে হবে না—পায়ের গোড়ায়—গোড়ালির

আগায়—পায়চারির নাগালেই ওরা পড়ে রয়েচে।

কিন্তু সমস্ত বজ্র আঁটুনিরই ফসকা গেরো আছে—সারাক্ষণ মামার জুতোদের (এবং মামাও বাদ নয়) নজরে-নজরে রেখে, বিকেলের দিকে, বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে পাঁপরভাজাওয়ালা ফিরি করে যাচ্ছে দেখে কেনার লোভ দমন করতে না পেরে শিশির আর লিলি যেই না দৌড়ে গেছে আর পাঁপর মুখে দৌড়ে এসেছে—আর এর মধ্যেই ফিরে দেখে—মামা নেই! মামার দরজা ফাঁক! মামার ঘর খালি! কোথায় গেল মামা? জানাশোনা সমস্ত ঘর আঁতিপাঁতি করে খোঁজা হল—কোনও ঘরেই মামা নেই!

নিশ্চয় তবে—তা হলে—সেই রত্নসঙ্কুল গুপ্তকক্ষেই মামা বিরাজ করছেন এতক্ষণ?

তক্ষুনি মামার বত্রিশ জোড়া জুতোর হিসেব নেওয়া হল—গোনাগুনতি করে মিলিয়ে দেখা গেল, হ্যাঁ, ঠিক! একজোড়া কমই বটে। মামার পায়ে-পায়ে—মামার সাথে-সাথেই উধাও হয়েছে সেই মানিকজোড়!

এইবার চুইংগামের চাকচিক্য লক্ষ্য করে অন্বেষণের পালা! শিশির বিচক্ষণ গোয়েন্দার মতো খুঁটিয়ে দেখে আর খানিক এগোয়—লিলি যায় তার পিছনে-পিছনে। দাদা যা করতে বলে তাই করে। লিলির চোখ বড়-বড়, নিশ্বাস রুদ্ধ, আর বুকের মধ্যে টিপটিপুনি!

এ-ঘর ও-ঘর পেরিয়ে—লম্বা ঘর, চওড়া ঘর, গোল ঘর অতিক্রম করে—একফালি ঘর, তিনকোণা ঘর, তেরছা ঘর পার হয়ে—দু-বার উপরে উঠে, তিনবার নিচে নেমে—অবশেষে সোঁদা-গন্ধ-ওলা, গুদামঘরের মতো, পোড়ো-ঝোড়ো চামচিকে-ওড়া একটা ঘরের নেপথ্যে চুইংগাম লাঞ্ছিত পদচিহ্নদের অনুসরণে ওরা গিয়ে উত্তীর্ণ হল।

নেপথ্য থেকেই জরাজীর্ণ জানলার আনাচ থেকে উঁকি মেরে দেখল, এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে সেই প্ল্যানখানা নিয়ে, সেই গুদামঘরের দেওয়ালে কী যেন খোঁজাখুঁজি করছেন মামা!

কী খুঁজচেন, বুঝতে দেরি হয় না শিশিরদের। ওরই মধ্যে কোনওখানে অর্থপূর্ণ দেরাজ—দেয়ালের অন্তর্গত হয়ে, দেওয়ালের সঙ্গে একাকার হয়ে ছলনা করছে তাকে আবিষ্কার করারই মামার অধ্যবসায়।

শিশির আর লিলি পা টিপে-টিপে গুদামঘরের মধ্যে সেঁধোয়—।

খুট করে আওয়াজ হয় একটু। অমনি তীব্র টর্চের আলো এসে ওদের মুখের উপর আছাড় খায়। 'কে? কে ওখানে?' মামার খনখনে গলার ভেতর থেকে ধারালো প্রশ্ন আসে—মামার পকেট থেকে ঝকঝকে পিস্তল বার হয়—একবারে যুগপৎ।

'আমি! আমরা। আমরা মামা।' শিশিরের কম্পিতকণ্ঠ।

'কে? কে তোমরা?' মামা চিনতে পারেন না—পিস্তল লক্ষ করেন।

'আমরা তোমার ভাগনে।' শিশির লিলিকে আড়াল করে দাঁড়ায়—গোলাগুলির যা কিছু ঝড়-ঝাপটা আসুক, ও নিজেই বুক পেতে নেবে। লিলি দাদাকে আঁকড়ে ধরে পিছন থেকে।

'ভাগনে?... ভাগনে!' মামার বিকট অট্টহাসি শোনা যায় ঃ 'ভাগ নেবার ভাগনে আমার!'

তারপর হাসি থামিয়ে, টর্চের আলোয়, উন্মুক্ত পিস্তলে, মামা এগিয়ে আসতে থাকেন—তাঁর দু-চোখে পৈশাচিক উল্লাস!

'সোজা হয়ে দাঁড়া! ঠিকঠাক হয়ে থাক। আমি একটার পর একটাকে সাবাড় করব। পিস্তলটা আজই কিনেছি! কোনও কাজের কি না এটা, তাও তো পরীক্ষা করা দরকার। আরেকটা কই, আরেকজন গেল কোথায়? দুটোকেই একসঙ্গে খতম করব—কোনও ওজর-আপত্তি শুনছিনে! কিচ্ছু না!'

এমনসময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। অভাবিত এবং অভাবনীয় কাণ্ডটা যে ঠিক এই রকম সময়েই ঘটবে তার আর আশ্চর্য কী? ওইসব কাণ্ডরা তো প্রায় ওত পেতে—এই ধরনেরই

যুৎ খোঁজে।

গুদামঘরের পশ্চাৎ দিক থেকে আরেকটা প্রবলতর টর্চের আলো মামার পিঠের ওপর এসে পড়ে—মামার পশ্চাতে এসে সহসা যেন এক ধাক্কা লাগায়।

'অ্যাঁ? এধার থেকে আবার কে?' মামার অগ্র-পশ্চাৎবোধ লোপ পায়—মামা কোনদিকে ফিরে কোনটা সামলাবেন স্থির করতে পারেন না।

'যেমন আছ তেমনি থাকো। নোড়চোড় না! একটু এদিক-ওদিক হয়েছ কি মাথার খুলি উড়ে গেছে।' পেছনের টর্চার— (কিংবা টর্চারার) বাজখাঁই গলায় হুকুম লাগান।

মামা সেই অবস্থাতেই তথৈবচ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকটি আলোক হস্তে এগিয়ে এসে, মামার হাত থেকে প্ল্যান এবং পিস্তলটি কেড়ে নেয়।

'একি ? মামা—তুমি? তুমিই মামা হয়ে ভাগনের সর্বনাশ করতে এসেচ? ফের এসেচ আবার?' ব্রজেশ্বরবাবুর কাতরকণ্ঠ থেকে বার হয়।

'সকালে যখন বললুম তখন হল না? এখন তো হল, কেমন?' বক্কেশ্বর আইচ হো-হো করে হাসেন—প্যাঁজ—পয়জার দুই-ই হল তো? এবার লক্ষ্মীছেলের মতো নিজের বিছানায় ফিরে যাও গে!'

'মামার হাতে ভাগনের মরণ—চিরদিনই জানি!' ব্রজেশ্বর বিদীর্ণকণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

শিশির পশ্চাৎবর্তিনীর কানে-কানে ফিসফিস করে : 'মামার ওপরেও মামা আছে! দেখছিস তো লিলি?'

বক্কেশ্বর টর্চটাও কেড়ে নেন ব্রজেশ্বরের হাত থেকে।

ছয় : মামার ওপরেও মামা আছে!

'মামার ওপরেও মামা আছে দেখছিস তো লিলি!' লিলির কানে-কানে শিশির বলে : 'মামার মামারা আরও কত ভয়ানক, ভেবে দেখ!'

'ভগবানও আছেন দাদা!' লিলি ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ, ভগবানকে আর থাকতে হত না, আর-একটু হলেই গুলির চোটে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে হত। মামা যেমন করে রিভলভার তুলেছিল! ভাগ্যিস—এই অন্য মামাটা—মামার স্কোয়াররুটটা এসে পড়ল তাই রক্ষে!'

'লোকটা একটা জলজ্যান্ত বিভীষিকা! তাই না—দাদা?'

'বিভীষিকা? বিভীষিকা কেন? একটুও বিভীষিকা না! অন্তত আমার কাছে তো নয়! তবে হ্যাঁ, জলজ্যান্ত বটে! আমিই তো আজ সকালে ওকে জল থেকে জ্যান্ত করেছি!'

'তোমার একটুও ভয় করেনি?'

'একটুও না।'

'তবে কাঁপছিলে কেন অমন করে?' লিলি জানতে চায়।

'আমি কাঁপছিলুম? আমি? আমি না তুই?' শিশিরের উল্টো চাপ।

'আমার তো হাত-পা কাঁপছিল!' লিলি সমস্ত দোষ অসহায় হাত-পা-র ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। 'পা-হাত কেবল।'

'তা হলেই হল! আর তুমি যদি আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে অমন করে কাঁপতে থাকো—তুমিই হও আর তোমার হাত-পা-ই হোক—তখন না কেঁপে আমি করি কী?' শিশির নিজের অনুকম্পার কারণ দেখায় : 'ভাগ্যিস তুমি কাঁপতে-কাঁপতে পড়ে যাওনি—তা হলেই হয়েছিল আর

কী! আমাকেও চিংপাত হতে হত সেইসঙ্গে!'

লিলির আনুকূল্যে শিশিরের যে অনিবার্য অধোগতি ঘটতে পারত, অথচ ঘটেনি—তার জন্যে লিলিকে দায়ী করায়, লিলির রাগ হয়ে যায়। যা ঘটেনি তার সে কী কৈফিয়ত দেবে? সে চুপ করে থাকে।

'কিন্তু যাই বল, গুলিটুলির চলাচলের সময়ে অত কাছাকাছি থাকা ভালো নয়। এমন করে আমার পিঠ লেপটে এক হয়ে থাকা তোর ঠিক হয়নি।' শিশির ভালো করে সমঝে দেয় ঃ 'আমার আড়ালে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হত।'

লিলি কিছু বলে না। তার অভিমান হয়ে যায়। তার কী দোষ? সে কি গায়ে পড়ে দাদার পৃষ্ঠপোষকতা করতে গেছল? দাদাই তো তাকে আড়াল করে নিজের পৃষ্ঠরক্ষা করেছিলেন! সে-কথা এখন ওঁর মনে পড়ছে না! বা রে!

'যেমন পিঠ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলি, গুলি ছুঁড়লে মজাটা টের পেতিস! গুলিটা আমাকে ভেদ করে তোর ভেতরে গিয়ে সেঁধুতো! গুলিদের কি ভেদাভেদ-জ্ঞান আছে? মেয়েছেলে বলে একটুও খাতির করত না! সোজা ফুঁড়ে এস্পার-ওস্পার হয়ে বেরিয়ে যেত!'

যেত—যেত—লিলির যেত—দাদার কী? উনি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির যাতায়াতে কতটা বাধাসৃষ্টি করেছেন, শুনি? নেহাত সেই জলজ্যান্ত বিভীষিকাটা ঠিক সময়ে এসে পড়ল বলেই না? তাই বলেই না ফাঁড়াটা অত সহজে কেটে গেল—ভুল পথ দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল ফাঁড়াটা?

লিলি গুম হয়ে থাকে। কোনও জবাব দেয় না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের নিরন্ধ্রতা খানখান করে খনখনে আওয়াজ ফেটে পড়তে থাকে—।

তাদের মামার আর্তনাদ!

বক্কেশ্বর আইচ ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার হাত থেকে পিস্তল, প্ল্যান, পরিশেষে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে পলায়ন করার পর, এতক্ষণ পরে, তাঁর সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হায়-হায় করে ওঠেন!

'যাক্, মামার কিছু হয়নি, বাঁচা গেল!' শিশির বলে ঃ 'এতক্ষণ ধরে মামার কোনও সাড়া না পেয়ে ভাবছিলুম মামাকে বুঝি সাবাড় করে গেছে! কিন্তু এতক্ষণে—প্রত্যক্ষ না দেখা গেলেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মামাকে।'

'হুম—একেবারে না মেরে ফেলতে পারলেও, মামাকে নিয়েও তো পিট্টান দিতে পারত লোকটা।'

'হ্যাঁ, মামা যা বহুমূল্য একটি রত্ন! কিন্তু লোকটার নিজের পিঠের ওপর টান আছে বলেই মামাকে নিয়ে পিট্টান দেয়নি! একটা মামার বোঝা তো বড় কম নয়!' শিশির হাসে। 'একবার পিঠে করে দেখ না!'

'তার কাছে তো ভাগনের বোঝা!' লিলি বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ 'মামা সেই লোকটার ভাগনেই তো!'

মামার কাতরোক্তি ক্রমশ বেড়েই চলে। অন্ধকারের কোনখানে দাঁড়িয়ে যে তিনি অনুশোচনা করচেন ঠিক ঠাওর হয় না, তবু ওরই মধ্যে হাতড়ে-হাতড়ে, শব্দের ধার আর ক্রন্দনের ধারা অনুসরণ করে যার-পর-নাই বিলাপকারীর কাছাকাছি গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

'মামা! মামা!' ডাক ছাড়ে শিশির।

'আর মামা!' ব্রজেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন ঃ 'তোদের জন্যেই আমার এই সর্বনাশ আজ!

'আমাদের জন্যে? আমাদের জন্যে কেন?' শিশির একটু বিস্মিতই।

'একদিকে তোরা—ভাগ নেওয়ার ভাগনেরা। আরেক দিকে মামা—সাক্ষাৎ মামা! সর্বস্ব নেবার মামা! দু-দিকেই ভারি পাল্লা—কোনদিক আমি সামলাই?' বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ ব্রজেশ্বরের।

'তা—আমরা—আমরা কী করলাম?' শিশিরের বিমূঢ় প্রশ্ন।

'তোরা আর কী করবি? কিছুই করতে পারলিনে। মামাই সর্বস্বান্ত করে চলে গেল!' ব্রজেশ্বরের আফসোস বাগ মানে না ঃ 'বাঘ এসে পড়লে বেড়ালরা কি কিছু করতে পারে? বেড়ালদের সুবিধা করতে দেবে—বাঘরা সে-পাত্রই নয়! তারা নিজেরাই সব সাবড়ে দিয়ে যায়, বেড়ালদের জন্যে ছিটেফোঁটাও রাখে না!'

'তা হলে আর আমাদের কী দোষ?'

'তোদের আর দোষ কী? টর্চ-ফর্চ কিছু আছে সঙ্গে?'

'কিচ্ছু না!'

'তবেই হয়েছে! তবে এই অন্ধকারের গর্ভ থেকে কী করে আমরা বেরুব?' মামার সকাতর কণ্ঠ। 'পিস্তল-টিস্তল আছে? তাও নেই? পিস্তল নেই, টর্চ নেই—বাছারা এসেচেন গুপ্তধনের সন্ধানে।' মামার হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে যায় ঃ 'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার। গুপ্তধন নেবেন? আবদার দ্যাখো না!'

সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই, কাকে বলা যায় না, আস্পর্ধার সেই জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দুটিকে অঙ্গুলি-নির্দেশে তিনি দেখাতে চান।

দেখাতে চান বটে, কিন্তু নিজে তিনি দেখতে পান না। নিদর্শন দুটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শন পেলে এইদণ্ডেই এইসা এক চড় কষিয়ে মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কার্পণ্য হত না।

সাত ঃ অন্ধকারের বিভীষিকা!

'কেন, পিস্তল না থাকলে কী হয়?' লিলি জানতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে ঃ 'পিস্তল থাকলে কী হত মামা?'

'চামচিকেরা এই অন্ধকারের মধ্যে কীরকম ফরফর করছে দেখচিসনে? না দেখলেও, শুনতে পাচ্ছিস তো? গায়ে-মুখে এসে ঝাপটা লাগালেই হল! পিস্তল থাকলে এক্ষুনি ওদের ফরফরানি বন্ধ করে দেওয়া যেত। একটি আওয়াজ করলেই—ব্যস! গুড়ুম শুনলেই, দুদ্দাড় করে পালিয়ে যেত সব। দিগ্বিদিকে উধাও হয়ে যেত। গুড়ুমকে ভয় করে সবাই। ওর নাম আক্কেল-গুড়ুম!'

'জানিস তো লিলি, ওরা ভারি চুল ছেঁটে নেয়, ওই চামচিকেরা! মাথায় এসে ঝাপটালেই বুঝবি খানিকটা চুল খুবলে নিয়ে গেছে—!' শিশিরও উড্ডীয়মান ওই দুরন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারে না—'নির্ঘাত নিয়েছে।'

লিলি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মাথায় হাত-চাপা দিয়ে নিজের কেশদাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। খুবলে নিলেই হল আর কী? চুলের দাম নেই? আঙুল-ঢাকা দিয়ে চুল বাঁচিয়ে লিলি মামার বিশাল বগলের তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চায়—এই অন্ধকারে ওই চক্রাকারে উড়ন্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ ছাড়া আর কী উপায়?

'এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা যাক, এসো মামা।' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু দরজাটা কোন দিকে, তোমার মনে আছে?'

'আরে তাই যদি মনে থাকবে তা হলে তো কোনকালে বেরিয়ে পড়তুম! তোদের জন্য অপেক্ষা করতুম নাকি? একমিনিটের জন্যেও দাঁড়াতুম না তা হলে!' মামা বলেন ঃ 'এই বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে কি একমিনিটও দাঁড়ানো যায়? কোনও ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে?'

একটু থেমে মামা আবার বলেন ঃ 'কেন, তোদের মনে নেই? তোরা তো এইমাত্র এলি? পথে দেখে আসিসনি? এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস? এই মেমারি নিয়ে কী করে যে তোরা পরীক্ষা পাশ করবি তাই আমি ভাবি!'

'আমরা কি আর পথ দেখে এসেছি? আমি তো চুইংগামের চিহ্ন দেখতে-দেখতে এলাম।' শিশির জানায়।

'আর আমি তো দাদাকে দেখতে-দেখতে এসেচি।' বিনা জিজ্ঞাসাতেই লিলি নিজের জবাব দিয়ে দেয়—আগে থেকেই!

'মাথা কিনে নিয়েচ! এইজন্যেই না বলে যে যম জামাই ভাগনা তিন না হয় আপনা—মিথ্যে কথা বলে কি? ভেবে দেখলে, তিনটেই অপদার্থ!'

'বারে! তোমার নিজের বাড়ি! এর ঘর-দোর-রাস্তা সবই তোমার মুখস্থ—আর তাই যখন তোমার নিজেরই মনে নেই তখন আমরা তো আজকের ছেলে! আজকেই তো এই বাড়িতে পা দিলুম! আমাদের মনে থাকবে?'

'আমার কী করে থাকে, শুনি?' মামার ঝাঁঝালো জবাব ঃ 'এই ঘোরালো ঘরটা যে এই বাড়ির ভেতরেই ছিল তাই আমি জানতাম না। প্ল্যান দেখে-দেখে তো এলাম। তারপর যখন একমনে গুপ্তস্থানটা খুঁজে বার করছি তখন তোরা এসে গোলমাল বাধালি—তখনও হয়তো বার-পথের একটা আন্দাজ ছিল, তারপর সেই হতভাগা মামাটা এসে সব গুলিয়ে দিল। ক'বার এগুলাম, ক'বার পেছুলাম—কতবার ঘুরপাক খেয়েছি—কিছু কি ছাই মনে আছে? তারপর এখন তো ঘুটঘুট্টি আঁধার! মামাটা আবার এমন বেয়াক্কেলে যে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে।' ক্ষণেক থেমে আবার তাঁর আক্ষেপোক্তি হয় ঃ 'প্ল্যানটাও ছাড়েনি।'

'প্ল্যান নিলি-নিলি, বেশ করলি! টর্চটা আবার নিতে গেলি কেন?' লিলিও অনুযোগ করে ঃ 'আমরা অন্ধকারে বেরুব কী করে সে-হুঁশ নেই?'

'মামারা এমনিই বটে!' মামা তাঁর নিজের মামার নজির এনে নিজেদের জের টানেন।

'সেজন্য তুমি আপশোস কোরো না মামা! ওর খপ্পর থেকে তোমার প্ল্যান আমি উদ্ধার করে আনব! তোমায় এনে দেব, তুমি দেখে নিয়ো—দুঃখ কোরো না তুমি! কেবল একবার ওর দেখা পেলেই হয়।' শিশির ভরসা দ্যায় ঃ 'কিন্তু যাই বলো মামা, তোমার মামাটি গ্র্যান্ড।'

'গ্র্যান্ড? কেন, গ্র্যান্ড কেন? কিসের জন্যে গ্র্যান্ড—শুনি?' মামা ভারি খাপ্পা হয়ে যান।

'মামার মামা তো এমনিতেই গ্র্যান্ড মামা, তাই নয় কি? আপনা থেকেই তো গ্র্যান্ড?' শিশির শুধরে নিতে চায় ঃ 'বাবার বাবারা যেমন গ্র্যান্ডফাদার!'

'হুঃ! মামারা কক্ষনও গ্র্যান্ড হয় না! মামার মামা হলেও না। ভারি বদ হচ্ছে এই মামারা, আমি বলে দিতে পারি।' মামা তৎক্ষণাৎ বলে দেন ঃ 'ভাগনেদের চেয়ে কোনও অংশে কিছু কম খারাপ নয়।' বলে দিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কুণ্ঠা হয় না।

মামার এই ব্যাখ্যানও বরং সহ্য হয়, কিন্তু চামচিকেদের ঝড়-ঝাপটা কতক্ষণ সওয়া যায়? শিশির অস্থির হয়ে উঠল—যে করেই হোক, এই অন্ধকারের চক্রব্যূহ থেকে বার হতেই হবে।

এই মুক্তির অভিযানে সে নেতৃত্বপদ নেয়, লিলি তার অনুগামিনী হয়—এবং মামাও শোক সম্বরণ করে তাদের পিছু নিতে দ্বিধাবোধ করেন না।

কিন্তু দরজা যে কোন ধারটায় তার হদিশ পাওয়া দায়! এ-কোণে ধাক্কা খেয়ে ও-কোণে ঢুঁ মেরে ইঁদুরদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দেওয়ালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, অবশেষে, একধারে উঁচু শান-বাঁধানো একটু জায়গা পেয়ে হতাশায় ক্লান্ত হয়ে ওরা বসে পড়ে। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'না, এই গোলকধাঁধা থেকে আজকে আর বার হওয়া যাবে না। রাত্রের মতো এখানেই থাকতে হবে দেখছি।

'তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন যে এ-দশা হবে, আগে থেকেই আমি জানি!' মামা গজগজ করেন।

'এই জায়গাটা একটু উঁচু রয়েছে! শান-বাঁধানো আবার! ইঁদুররা এতদূর উঠতে পারবে না আমার ধারণা। আয় লিলি, শুয়ে পড়া যাক। গা গড়িয়ে জিরিয়ে নেওয়া যাক একটু।'

'আমার চোখ জড়িয়ে আসচে দাদা!' বসতে না-বসতে তার ঘুম পায়—শুতে পেলেই সে বাঁচে।

'ঘুমোতে পারিস। আমি পাহারায় জেগে থাকলাম। মামা, তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো। কোনও ভয় নেই।'

'হ্যাঁ, ভয়ে তো আমি কাঠ হয়ে রয়েছি, তা আর বলতে!' বলতে-বলতে মামা লম্বা হয়ে পড়েন। একটু পরেই তাঁর নাক ডাকতে থাকে। লিলিরও নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে।

শিশিরের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে-শুয়ে জেগে-জেগে আজকের সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সে ভাবে। প্ল্যান উদ্ধার থেকে প্ল্যান হারানো পর্যন্ত...! আর সেই জলজ্যান্ত লোকটার অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা...! থানার গায়ে লটকানো সেই পুরস্কার-ঘোষণার নোটিশ...! একটার পর একটা সমস্ত তার মানসপটে উদিত হতে থাকে।

পকেট থেকে বার করে মাঝে-মাঝে চুইংগাম মুখস্থ করে আর কী করে দুর্ধর্ষ বক্কেশ্বর আইচের কাছ থেকে প্ল্যানটার পুনরুদ্ধার করবে, এই নিয়ে সে মাথা ঘামায়।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে—হঠাৎ একটু খুট! ইঁদুররাই হয়তো! শিশির আমল দেয় না। কিন্তু একটু পরেই আবার খট—খটাখট!

শিশিরকে উঠে বসতে হয়। ইঁদুরদের খটখটি তো এত জোর হবার কথা নয়! অন্য কারও নটখটি হবে। ভূত—ভূতরাই নাকি তবে?

শিশির সভয়ে অন্ধকারের চারিধারে ধারালো দৃষ্টি চালাতে থাকে। এধার-ওধার থেকে, অন্ধকার ফুঁড়ে, কালো-কালো ছায়ামূর্তিরা উঁকিঝুঁকি মারবে, হয়তো বা কঙ্কালদেহীরা দেহি-দেহি রবে এগিয়ে আসবে—পুনঃ-পুনঃ তাদের হি-হি হাসি শুনতে পাবে হয়তো, এইরকমটা প্রতি মুহূর্তেই সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু না, সে রকম কিছু দেখা যায় না।

অবশ্যি, একটু আগে সে, তন্দ্রার ঘোরে, তিনটি নরকঙ্কালকে করমর্দনের অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল—কিন্তু চটকাটা ভেঙে যেতেই চোখ মেলে দ্যাখে, সব ফাঁকা! ফাঁকি সব! কোথাও কিছু নেই!

এবারও দেখল, কোথাও কিছু নেই!

কিন্তু তথাপি সেই খুট—খাট—খুট! খুটখুটুনি বেড়েই চলে ক্রমশ—।

খুট—খাট—খটাৎ! কার এইসব খুঁটিনাটি?

এবার যেন দূরে—অতি দূরে—অন্ধকার বিদীর্ণ করে একফালি আলোর মতো কী যেন ঘোরাফেরা করছে বলে বোধ হয়!

আলেয়া নয় তো?

ভূতেরা—খুব সম্ভব মেয়ে-ভূতেরাই—অনেকসময়ে আলেয়ার ছদ্মবেশে আসে বলে শিশিরের শোনা আছে। সে নড়েচড়ে বসে। তার বুক দুরদুর করে! লিলির পায়ে পা ঠেকিয়ে ছুঁয়ে থাকে।

লিলির ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না, ভয় পেয়ে যাবে ছোট বোন—আর—আর মামার ঘুম ভাঙাতেও তার সাহসে কুলোয় না।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে ভূতের কার্যকলাপ লক্ষ করে।

সেই ভৌতিক আলোটা এবার এগিয়ে আসে। এসে এক জায়গায় থামে। চারধারে কী যেন খুঁজে ফেরে। এগোয়, একটু এগোয়, আবার থামে। অবশেষে একটা দেওয়ালের গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

দেওয়ালে-ধাক্কা-খাওয়া আলোর প্রতিচ্ছায়ার চারধারের আশপাশ ঈষৎ যেন আভাময় হয়ে ওঠে। তার আবছায়ায়, আলোর আড়ালের ছায়ামূর্তিটিকে এবার দেখা যায়। ছায়ামূর্তি হাত-পা নাড়ছে, বেশ স্পষ্ট করেই শিশিরের চোখে পড়ে এবার।

শিশিরের কৌতূহল এবার তার ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে। আলো হাতে, এ আবার কীরকম ভূত রে বাবা? ভূত, কিংবা ভূতের ছদ্মবেশে অন্য কোনও গুপ্ত-রত্ন-সন্ধানী? খোদার ওপর খোদকারি-

করা গুপ্তধনের অভিলাষী দুঃসাহসিক আর কেউ?

জানবার অভিপ্রায়ে (এবং বাধাদানের মতলবেও), শিশির মুখের চুইংগামটা বার করে সেই ছায়ামূর্তিটিকে ছুড়ে মারে।

গায়ে লাগতেই ছায়ামূর্তিটি চেঁচিয়ে ওঠে : 'ইস! এ আবার কী রে বাবা? কোত্থেকে এল? অ্যাঁ? কোনও ভুতুড়ে কাণ্ড না কি?'

ছায়ামূর্তিটি বিচলিত হয়। শিশির আরেকটা চুইংগামকে রসায়িত করে কশে লাগায়!

'ইস! কী এগুলো! ভারি ল্যাটপ্যাট করছে! টেনে ছাড়ানো যায় না—কী রে বাবা! চটচটে দেখছি আবার!'

ছায়ামূর্তিটি আপনমনেই মন্তব্য করে।

শিশির ক্ষান্ত হয় না, একটার পর একটা, অশ্রান্তভাবে লাগাতে থাকে!

ছায়ামূর্তিটি ভারি বিব্রত হয়ে পড়ে। এগুলে গায়ে লাগে, পেছুলে পায়ে লাগে, কী করবে ভেবে পায় না। তার ওপরে যা চটচটে! চটাটটি করেও ছাড়ানো যায় না। ভারি মুশকিলে পড়ে যায় বেচারী! অথচ, কোত্থেকে যে ওইসব চট্টোপাধ্যায়রা আসছে, চটপট এসে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

যেখানেই পা ফ্যালে, চুইংগামে আটকায়—পা তোলা এবং তুলে পুনরায় ফেলা দুরূহ হয়ে পড়ে—যেদিকেই এগোয়, পা আটকাতে-আটকাতে চলে। অগত্যা এক পা তুলে ছায়ামূর্তিটি খানিকক্ষণ ভাবে (এক পা-ই তুলে রাখে, যতটুকু বাঁচোয়া! দু-পা তো একসঙ্গে তোলা যায় না!)— তারপর সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে : "বুঝেছি! এ হচ্ছে যখের ধন! যক্ষেরা সব আগলাচ্ছে একে। রাত্তিরবেলা ওদের চোখের সামনে থেকে এ-চীজ বাগানো যাবে না। ইস! এবার একটা আমার নাকের ওপর এসে লেগেছে! যখন নাকে লেগেছে তখন আর না। নাক নিয়ে পালানো যাক!"

এই বলে আরও আক্রমণের অপেক্ষা না রেখে দুপদাপ করে অন্ধকারের মধ্যেই সে চোঁ চাঁ দৌড় মারে।

আট : ছাগলের রাজপথ পেরিয়ে

যে-রকমটা ভাবা গেছল, শিশির যেটি আশা করেছিল, তাই ঘটে রয়েছে দেখা গেল। রাতারাতি একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এরকম দৈব সহায় না থাকলে বড়-বড় ডিটেকটিভকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এই জাতীয় আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে বলেই শার্লক হোমস, রবার্ট ব্লেক, শিশির প্রভৃতি গোয়েন্দারা সুবিধা করে নেয়, পদে-পদে বিপদ হানা দিয়েও কিছু করতে পারে না—যৎপরোনাস্তি বাধা পেয়েও শেষমেশ তারা কর্যোদ্ধার করে বসে।

স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের—ওই বদমাশদের বিরুদ্ধে। ওদের নিজেদের প্রকৃতি নয়—বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির কথাই বলা হচ্ছে।

তাই, ইতিমধ্যে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এবং শিশির অন্ধকার ব্যূহ থেকে বার হবামাত্রই দেখল, হ্যাঁ, যেমনটি তার প্রত্যাশা ছিল তাই বটে! বৃষ্টিও হয়েছে এবং তার ফলে ভেজা মাটির ওপরে বেশ গভীর হয়ে কার যেন পায়ের দাগ চেপে বসেছে।

পৃথিবীর ছোট-বড়-মেজ-সেজ সব ডিটেকটিভ যে-সুবিধা পেয়েছে, বরাবর পেয়ে আসছে, শিশিরও যদি তার ওপরে নির্ভরতা পোষণ করে থাকে, বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। এবং প্রকৃতিও

যদি তার উপযুক্ত কাজ করে থাকে, কিছু অন্যায় হয় না। এ-স্থলে প্রকৃতি শিশিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি—প্রকৃতি-বিরুদ্ধ আচরণ করেননি কিছু।

এবং সেই পায়ের দাগ, মোটা-মোটা পায়ের গোদা-গোদা ছাপ চলে গেছে—তাদের বাড়ির আনাচ পেরিয়ে, পাশের বাগানের কানাচ ঘেঁষে—সেই দাগরাজি, পথের সেই দাগী পৃষ্ঠাটি বরাবর চলে গেছে—।

কোথায় গেছে, সেইটাই তো শিশিরের এখন আবিষ্কার্য—তা ছাড়া আর কী?

শিশির মাথা নেড়ে, মুখ নেড়ে তার মামাকে জানিয়ে দিয়েছে ঃ 'কাল রাত্রে যে এসেছিল সে তোমার মামাই বটে। তোমার মামা ছাড়া আর কেউ নয়, মামা।'

'বাঃ, মামাই তো! মামা ছাড়া আবার কে হতে যাবে?' ব্রজেশ্বর বিকৃতমুখে জবাব দিয়েছেন ঃ 'মামাই তো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে প্ল্যানটা! নইলে আর কোনও মিঞার সাধ্য ছিল না!'

'উঁহু, তারপরেও ফের আবার এসেছিল যে!'

'ফের এসেছিল? তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি না কি?'

ব্রজেশ্বর এবার একটু বিস্মিতই হন ঃ 'ফের আবার কে আসবে? ফের কেন আসতে যাবে শুনি? প্ল্যান তো সে আগেই নিয়েছে—নিয়ে গেছে—এই হাত থেকেই হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছে! তবে?'

শিশির সে-কথার জবাব দেয় না, শুধু বলে ঃ 'এবার তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো মামা! আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার প্ল্যান যদি না আমি উদ্ধার করে আনি তো কী বলেছি। সন্ধের মধ্যেই এনে দিচ্ছি তোমায়।'

'হ্যাঁ, সে-প্ল্যান আর উদ্ধার করতে হয় না।' ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসের হাসি হাসেন ঃ 'আমার মামাকে তুই তো চিনিস না! চিনি আমি! মামাদের খপ্পর থেকে জিনিস বাগানো সহজ নয়।'

'আমার তো আর মামা না! আমি পারব।' শিশিরের সুদৃঢ় আস্থা।

'মামার মামা—সে আরও বড় কঠিন ঠাঁই রে! বলে আমি যাই সেয়ানা তাই পেরে উঠলুম না, পেয়েও হারালুম—আর তুই তো কালকের ছেলে, সামান্য ভাগনে—ভাগনের ভাগনে মাত্র, তুই পারবি! হ্যাঁ, থাকত যদি আমার মামার মামা—পারত সে! কিন্তু—কিন্তু সে—সে কোথায়?'

আকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে ব্রজেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জন দেন।

'পারি কি না-পারি দেখে নিয়ো। লিলিকে সাথে নিয়ে এই আমি পা বাড়াচ্ছি।' উদাহরণ-স্বরূপ, তক্ষুনি-তক্ষুনি শিশির পাড়ি দেয়, মামার বাড়ির প্রাতরাশের জন্যেও প্রতীক্ষা করে না।

মাতুলালয়ের পাশ ধরে, বাগানের ধার ঘেঁষে, ভিজে মাটির পিঠে তাজা পায়ের দাগ লক্ষ করে শিশিররা এগিয়ে চলে। আরও সব কত বাড়ির গা ঘেঁষে, অনেকখানি পথ বেয়ে, আরেকটা বাগানের ভেতর দিয়ে অনেকদূর ওরা চলে যায়। যেতে-যেতে শহরের সীমান্তে গিয়ে ওরা পৌঁছয়।

এবং তখনও—তখনও ওদের চোখে পড়ে—সেই পায়ের দাগ! সেই শ্রীপাদপদ্ম-রেখা আরও—আরও দূরে চলে গেছে।

যাক, তাতে ওদের দুঃখ নেই। কেবল চিহ্ন রেখে গেলেই হল! পথে একটা রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু ওরা খেয়ে নিয়েছে—এখন পদচিহ্নের পথ ধরে—ওই পদাঙ্ক অনুসরণ করে—যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই। আর এই পায়াভারি ভদ্রলোক—পায়ের দাগের দাগী আসামী যেখানেই যান না কেন, যতদূরেই যান না, তাঁরও আর নিস্তার নেই ওদের হাতে—শেষ অবধি যদি তিনি পা বজায় রেখে গিয়ে থাকেন—পা তাঁর ক্ষয়ে গিয়ে কিংবা খোয়া গিয়ে না থাকে তা হলে তাঁকে ওরা পাকড়াও করবেই। নিশ্চয়ই।

'এ-ধারটায় ভারি ছাগলের আমদানি দেখা যাচ্ছে!' শিশির অদূরবর্তী অবশ্যম্ভাবী একপাল ছাগলের দিকে লিলির দৃষ্টি টানে।

'আমরা শহরের বাইরে এসে পড়েছি দাদা!' আসন্ন ছাগপালের দিকে তাকিয়ে লিলি বলে ঃ 'কীরকম মেঠো-মেঠো এ-ধারটা, দেখচ না!'

'হ্যাঁ, মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে ছাগলদের। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ, আমরা পেরুবার আগে ওরা যদি এসে পড়ে তাহলেই পায়ের দাগের দফা রফা! —সব ওরা নিজের পায়ের ক্ষুরে কামিয়ে দিয়ে যাবে।'

'ও বাবা! কত ছাগল! একশো—দুশো—তিনশো—না তারও বেশি?' ছাগ-সম্প্রদায়ের সেন্সাস নেওয়ার লিলির আগ্রহ দেখা যায়।

'একহাজারের কম না! চ, চ—চ বলছি—' কিন্তু বলতে-বলতে ছাগলের পাল এসে পড়ল। বাঁ-ধারের মাঠ থেকে, রাস্তা ডিঙিয়ে, ডানদিকের মাঠে গিয়ে পড়তে লাগল তারা—এই পারাপারের মুখে বিস্তর ছাগল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, মাঠে না নেমে, রাস্তার দু-দিকে রওনা দিতে চেষ্টা করল। তাদের এই উন্মার্গযাত্রায় নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা ছিলই—পালের সাথে-সাথে লাঠি হাতে কতকগুলি রাখালও রয়েছে দেখা গেল—তাদের দ্বারা পুনঃ-পুনঃ বাধা পেয়ে ব্যাহত হয়ে অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে।

রাখালদের যেমন হইহল্লা, ছাগলদেরও তেমনি চ্যাঁ ভ্যাঁ—সমস্ত মিলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে এমন এক বিপর্যয় বেধে রইল আর চারধার দিয়ে সেই উন্মত্ত ছাগস্রোত যেভাবে অট্টরোল করে ছুটে চলল, তাতে পাছে সেই ক্ষুরধার জনতার পায়ের তলায় পড়ে তারা নিজেরাই না শেষটায় চিহ্নমাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায় সেই ভয়ে শিশির আর লিলি একটা উঁচু পাথরের ঢিবির ওপর গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। এবং যতক্ষণ না শেষ ছাগলটি ত্রিসীমানা থেকে নির্বিঘ্নে অন্তর্হিত হয়েছে—ততক্ষণ তারা সেই ঢিবির ওপর থেকে নামল না।

'দেখলি তো! সব পশু! কোথায় আর পায়ের দাগ? বেবাক চারধারে ক্ষুর বোলানো!' শিশির আফসোস করে।

'চলো, একটু এগিয়ে দেখা যাক।' লিলি আশার বাণী শোনায় ঃ 'ঘুরে-ফিরে দেখাই যাক না!'

'পায়ের দাগ যখন নেই তখন আর নাহক ঘুরে লাভ? কোনও সত্যিকার ডিটেকটিভ এমন বাজে কাজ করে না। চ ফেরা যাক—কিন্তু মামাকে মুখ দেখাব কী করে তাই আমি ভাবছি।'

'আমার ভারি জলতেষ্টা পেয়েচে দাদা!' লিলি বলে। আশার বাণীর পরেই তার মুখে তৃষ্ণার বারতা।

'সামনের ওই ছোট্ট বাড়িটাতে গিয়ে জল চাওয়া যাক!' শিশির লিলিকে নিয়ে এগোয়—'খুব দূরে নয় বোধহয়।'

খুব দূর বোধ না হলেও, ছোট্ট বাড়িটা বেশ একটু দূরেই। ওধারটা পাহাড়ের ঢালুর থেকে আস্তে-আস্তে উঠে গেছে, সেইজন্যে আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনোরম আর সন্নিকট বলে মনে হয়, আসলে বাড়িটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উতরে, চড়াই বেয়ে ওরা বাড়ির নিকটে গিয়ে পৌঁছয়, সটান ভেতরে গিয়ে চড়াও হয়। কিন্তু বাড়ির কোথাও এতটুকু টুঁ শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পা টিপে-টিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়ে-ভয়েই এগোয়!

সামনের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলার ফিসফাস ওদের কানে আসে ঃ 'পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে নিয়েছ তো?'

পিস্তলের কথা কানে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিটকে এসে ওদের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। অ্যাঁ? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?

একটা আধবোজা জানলার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে দেখে, চৌকোনো একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের ওপর ছড়ানো কী একটা কাগজের ওপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সেই পঞ্চপাণ্ডবের একজনকে দর্শনমাত্রই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না, তাদের সেই গ্র্যান্ড মামা!

নয় ঃ বেড়ালের ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ

টেবিলের ওপর শায়িত সেই কাগজখানাও আর কিছু না, দূর থেকে কটাক্ষ করেই তারা বুঝতে পারে, সেই মোক্ষম প্ল্যান। মামার ওপর টেক্কা মেরে, কেড়ে-নিয়ে-আসা গুপ্তধন আবিষ্কারের নির্ঘাত সেই নকশা!

শিশির লোলুপ নেত্রে প্ল্যানটার দিকে তাকায় আর লিলির কানে-কানে জানায় ঃ 'লোকগুলো কোনও কারণে একবার এ-ঘর থেকে সরলে হয়! আমি টেবিলের ওপর ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে আসি।'

'আমি ভাবছি ওদের কেউ যদি আবার এই বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—!' লিলি তার ভয়াবহ আশঙ্কাটা ব্যক্ত করে ঃ 'বেরুবার চেষ্টা পায় যদি—?'

'তা হলে ভাবনার কথা বটে!' ঘাড় নাড়ে শিশির। 'একটু ভাবনার কথাই বইকী!'

বাস্তবিক, এদিকটা ওর চোখে পড়েনি, পালাবার পথ পরিষ্কার রেখে তবে এগুবার দিকে ঝোঁক দিতে হয়—তা নইলে দুঃসাহসিকদের জীবনে আর দ্বিতীয়বার জয়যাত্রার অভিযানে বেরুবার সুযোগ আসে না—সেই প্রথম মহাযাত্রাতেই তাঁরা তলিয়ে যান!

'কোথ্ দিয়ে পালাব আমরা?' লিলির মুখে সেই জিজ্ঞাসা—মহা-মহা বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনের যা প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

'পালাব কেন? প্ল্যান না নিয়েই পালাব?' শিশিরের মৃদু আপত্তি ঃ 'প্রাণ দিয়ে যেতে হয় তাতেও রাজি, কিন্তু প্ল্যান না নিয়ে এক পাও নড়ছি নে!'

তাদের জানলাটার পরবর্তী জানলায় ঠেসানো একগাদা খালি প্যাকিং বাক্স খাড়া করা ছিল— সেই কাঠের বাক্সগুলোর চূড়ায় বসে একটা বেড়াল ঝিমুচ্ছিল বলেই মনে হয়।

'আমরা ছদ্মবেশে এলেই পারতাম!' বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে লিলি জবাব দেয় ঃ 'ভালো হত তা হলে!'

'তুই কি বলতে চাস আরেক জন কেউ ছদ্মবেশে এখানে এসেছে?' শিশিরের অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠ ঃ 'ওই বেড়ালের ছদ্মবেশে ও কি অপর কোনও ডিটেকটিভ?'

শিশির লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্দিগ্ধ নেত্রে বেড়ালটার দিকে তাকায়।

শিশিরের প্রশ্নে লিলি ভালো করে লক্ষ করে এবার।

'বেড়ালটার হাবভাব কেমন যেন! ঘুমোনোটা যে ওর ফাঁকি তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝিমুনোর ফাঁকে-ফাঁকে দেখচ না, ও মাঝে-মাঝে চারধারে বেশ চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর চেয়ে দ্যাখো দাদা, ওরও নজর ওই ঘরটার ভেতরে।'

'দেখেছি।' শিশির গম্ভীর গলায় বলে। অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি।'

'কিন্তু তা হলেও ওকে বেড়াল ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হয় না!' লিলি তার তদন্ত-কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

'আমারও তাই মনে হয়। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তা ছাড়া একটা ব্যাপারে দুটো গোয়েন্দা লাগা ঠিক হবে কি? আর তা লাগেও না কখনও।'

'কিন্তু আমরা ওই বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? ওখান থেকে ঘরটার ভেতরেও নজর রাখা যায় আর বেশ লুকিয়েও থাকা যায়।'

এ-প্রস্তাব সমীচীন বলে মনে হয় শিশিরের। তারা দুজনে সেই প্যাকিং বাক্সগুলোর আবডালে গিয়ে খাড়া হয়।

বেশিক্ষণ ওদের দণ্ডায়মান থাকতে হয় না। তপস্যা বড়ই কি আর ছোটই কি, বরলাভ তাতে অব্যর্থ। অচিরেই তাদের অভীষ্টসিদ্ধি হয়। নিজেদের রিভলবার বার করে, খুব সম্ভব ভরাট করবার মতলবেই ওরা পাশের ঘরে যায়। সেই পার্চমেন্ট কাগজের প্ল্যানটিকে টেবিলের ওপরে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই চলে যায় ওরা।

'লিলি, এই আমাদের সুবর্ণ-সুযোগ! দাঁড়া তুই!'

শিশির সেই জনবিরল ঘরে একক এগিয়ে আগে টেবিলটা হস্তগত করে—তারপরে প্ল্যানটাও ঠিক বাগিয়ে নিয়েছে—এমনসময়ে, অঘটন আর বলে কাকে?

শিশিরের আকস্মিক গৃহপ্রবেশে বেড়ালটা ততটা বিচলিত হয়নি, একটা চোখ খোলা এবং আরেকটা বোজা রেখেই, নিরুদ্বেগে ওর কার্যকলাপ লক্ষ করছিল, কিন্তু টেবিলের ওপরে শিশিরের হস্তক্ষেপ দেখবামাত্রই তার ভাবান্তর ঘটল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ভারি বিপর্যয় ঘটে গেল। প্যাকিং বাক্সের মাথা থেকে সে এক লাফ মারল—ঠিক লিলির মাথায় নয়—লিলির মাথা বাঁচিয়ে জানলার গোড়াতেই লাফটা দিল, কিন্তু তার এই কক্ষ-পরিবর্তনের তৎপরতায়—ধূমকেতুরা যেমন সুযোগ পেলেই সমাদরে পৃথিবীর ওপরে ল্যাজ বুলিয়ে দিয়ে যায়, সেও তেমনি লিলির মুখের ওপর নিজেরটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

লিলি হাঁউমাঁউ করে উঠল। এবং তার কেবল ওই চিৎকার ছাড়াই নয়, সেইসঙ্গে চতুর্দিকে এমন হাত-পা ছুঁড়ল যে, তার প্রতিক্রিয়ায় উঁচু করে খাড়া করা সমস্ত প্যাকিং বাক্স, যেন অকস্মাৎ ভূমিকম্পে, ভয়ানক শব্দে একটার-পর-একটা—এবং সবগুলো পিঠোপিঠি ধুপধাপ করে পড়তে শুরু করল।

কেবল হাঁউমাঁউই মানুষের গন্ধ পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তার ওপরে মানুষের শব্দ কানে যেতেই অন্য ঘরে রাক্ষসদের টনক নড়ল।

শিশির অবশ্যি ততক্ষণে খসড়াটা হাতিয়ে বেগে বেরিয়ে আসতে পেরেচে। বার হয়েই, লিলিকে সেই পতিত এবং পতনোন্মুখ প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে এক হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে তিন লাফে পগারপারের দিকেই ছিল, কিন্তু এদিকেও তখন গ্র্যান্ড মামার দল, প্যাকিং বাক্সদের আর্তনাদ শুনে পিস্তলদের ভর্তি করে মার-মার শব্দে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে পড়েচেন।

'ওই—ওই পালাল! প্ল্যান নিয়ে পালাচ্ছে ওই!—' গ্র্যান্ড মামা নিজেই এবার আর্তনাদ করে ওঠেন।

অমনি সবার পিস্তল থেকে তাদের উদ্দেশে ঝমাঝম গুলিবৃষ্টি হতে শুরু হয়। কিন্তু হলে কী হবে, ততক্ষণে তারা রিভলভারের রেঞ্জের বাইরে।

'দেখচ কী! বন্দুক নিয়ে এসো! পালাল যে—পিস্তল হাতে ভ্যাবাগঙ্গারামের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখচ কী সব?' বক্কেশ্বর আইচ চিৎকার করে ওঠেন।

দেখতে-দেখতে বন্দুক এসে পড়ে।

'দুড়ুম—দুড়ুম—দুম!' বন্দুকেরা গর্জন করে ওঠে। একাদিক্রমে এবং একসঙ্গে দুমদাম লাগায়।

'লিলি, ঘাবড়াস নে। বন্দুকে আমাদের ভয় নেই।' দৌড়তে-দৌড়তে ছোটবোনকে আশ্বাস দেয় শিশির। 'ও-সব গুলি আমাদের কানের আশপাশ দিয়ে চলে যাবে। ছোঁবেও না আমাদের, তুই দেখে নিস! কেন, অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে তুই পড়িসনি?'

'হুম।' লিলি শুধু বলে। লম্বা-লম্বা পা ফেলতে হলে লম্বা-লম্বা কথা বলা যায় না।

শিশিরের কথা মিথ্যে নয়—বন্দুকদের ওই দুড়ুম-দুড়ুম আওয়াজই সার!... ওদের আগাপাস্তলার কোথাও লাগা দূরে থাক—এক নম্বরের স্ফূর্তিবাজের মতো—গুলিগুলো ওদের আশপাশ ঘেঁষে শিস দিতে-দিতে চলে যায়। শিশিরের সীমান্ত কি লিলির সীমন্ত—কোথাও ছোঁয় না। ওদের এরূপ ব্যবহারে শিশির বিস্মিত হয় না একটুও।

গুলির উপদ্রব শেষ হলে, দুজনে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁফ ছাড়ে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার পর লিলি বলে ঃ 'বুঝেচ দাদা, সেই বেড়ালটাই নষ্টের গোড়া! সেই তো আমাদের ধরিয়ে দিল! প্যাকিং বাক্সগুলোও ফেললে ওই তো।'

'হুঁ, এখন আমার বোধ হচ্ছে বেড়ালটা খুব সুবিধের ছিল না!' শিশির মাথা নাড়ে ঃ 'আসলে বেড়ালই ছিল কি না কে জানে!'

'তোমার কি ধারণা তা হলে কোনও ডিটেকটিভ?' পুনরায় ওদের পুরনো সন্দেহোদ্রেক ঃ 'ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোনও?'

'আমার তাই বিশ্বাস। আমি প্ল্যানটায় হাত দেবার সাথে-সাথে ও লাফ মেরেছিল। এখন আমার বেশ মনে পড়ছে।'

'আমাকে এমন একটা ল্যাজের ঝাপটা লাগাল যে—!' লিলি নিজের নাকে হাত বুলায় ঃ 'যদিও ওটা ওর সত্যিকার ল্যাজ নয় নিশ্চয়। অনেকটা পরচুলার মতো পরল্যাজার ব্যাপার যদিও, কিন্তু তবু ভাবতেই এখনও আমার গা শিরশির করচে!'

'ও-লোকটা একটা পাকা ডিটেকটিভ। উঃ, কীরকম নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে! আর কী তীব্র লক্ষ্য! আমার কার্যকলাপের ওপর কীরকম আশ্চর্য নজর রেখেছিল। দেখেছিলি? এরকম প্রায় দেখা যায় না। ভাবতেও পারা যায় না।' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু ডিটেকটিভ হলেও ওদের দিকের ডিটেকটিভ —ডিটেকটিভের ওপরে ডিটেকটিভ।'

এমনসময়ে দূরে ঃ 'ভৌ—ভৌ—ভৌ—ঔ-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ—!' একাধিক কুকুরের সমবেত ঐকতান একসাথে শোনা গেল।

শিশির ব্যস্ত হয়ে ওঠে ঃ 'দৌড়ো, দৌড়ো! ডালকুত্তাদের ছেড়ে দিয়েছে, দেখছিস কী! গন্ধ শুঁকে-শুঁকে আমাদের পিছু-পিছু ওরা ছুটে আসবে। হাতে পাওয়া মাত্রই ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলবে আমাদের। —ভারি ভয়ানক এইসব ডালকুত্তারা!'

এবং বলতে না বলতে—

দশ ঃ শিশিরের লম্ফঝম্ফ

এবং বলতে না বলতে—

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—ভো-ও-ও-ও-ও-ঔ।

সেই ডালকুত্তার দল ভয়ানক হইচই করে এগিয়ে আসতে লাগল।

এবং সঙ্গে-সঙ্গে শিশির আর লিলির আবার ভোঁ-দৌড়!

'জানিস লিলি, যে-কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে সে কুকুর নাকি কামড়ায় না।' দৌড়তে-দৌড়তেই শিশির জানায়।

লিলি এ-সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।

'এসব ডালকুত্তারা কামড়াবে কি না কে জানে!' শিশির বলে।

দৌড়তে-দৌড়তেই সন্দেহটা ব্যক্ত করে, দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখার তার সাহস হয় না। কুকুরদের মধ্যে যারা বাক্পটু, বিবৃতি দিতে বিশারদ কামড়াবার তাদের উৎসাহ কম, এ-

কথা অনেকদিনকার জানা কথা। কিন্তু সে-কথা কাজের কথা কি না, রচনার খাতায় ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগানো যায় কি না, এক সঙ্কটাপন্ন সুযোগে পরীক্ষা করে দেখতে তাদের ভরসা হয় না।

এরাও, এই সব কুকুররাও বক্তৃতা ছড়াতে-ছড়াতে ইস্তাহার বিলি করতে-করতেই আসছে বটে কিন্তু এদের মুখের কথায় কি আস্থা স্থাপন করা যায়? এরা যদি ততটা ভদ্রলোক না হয়?

'তুই কী বলিস লিলি? এই সব কুকুরদের—?'

এদের অভিভাষণে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না, এই কথাটাই শিশির জানতে চায়।

লিলি কিছুই বলে না, বলবার তার শক্তিই নেই কিংবা এ-বিষয়ে বলা বাহুল্যমাত্র, এই হয়তো তার বক্তব্য। সে আরও জোরে জোরে পা চালাবার চেষ্টা করে, যা বলবার, মুখে না বলে পায়ের সম্মুখেই ব্যক্ত করতে চায় বোধহয়।

'উঁহু, যেরকমধারা চেঁচাচ্ছে, এরা যেন কামড়ে দেবে বলে মনে হয়। এসব ডালকুত্তাদের কাছে ডাল গলানো যাবে না।' লিলির মতের অপেক্ষা না রেখেই শিশির নিজের অনাস্থা জ্ঞাপন করে।

'আর কামড়াতে আরম্ভ করলে—শুরু করলে একবার—বাব্বাঃ—!'

সেই ভয়াবহতা শিশির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তার মানসনেত্রের সামনে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়, তার প্রতি পদক্ষেপে, দ্রুতগতির সঙ্গে তাল রেখে, সেই একান্ত আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিলমের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে প্রকট হতে থাকে।...

এক ডজন বুভুক্ষু ডালকুত্তা খাইখাই করতে-করতে তাদের দুজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে — ছজন করে পার হেড—ভালো করে—খতিয়ে হিসেব করলে তিনজন করে পার লেগ—কেননা হাতের নাগালে পাওয়া মাত্রই ওরা পায়েই এসে কামড় বসাবে, পলায়নের যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করবে সব আগে—পা থেকেই উদরস্থ করতে শুরু করবে। তারপর পা থেকে হাতে—হাত থেকে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ! নাক-কান, চোখ-মুখও তারা বাদ দেবে না, অবহেলা করবে না নিশ্চয়, তাদেরকেও ছিঁড়েখুঁড়ে খুবলে-খাবলে পেটের মধ্যে পাচার করে দেবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওগুলো তারা খুব সম্ভব, শেষের দিকে, চাটনি কিংবা সন্দেশের মতো আস্তে-আস্তে তারিয়ে-তারিয়েই খাবে—ভোজনের প্রোগ্রামটা খাদ্যপরম্পরা এইভাবে অগ্রসর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছানো উচিত। তবে আহার্যবস্তুর অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে ডালকুত্তাদের কতটা বাছবিচার, খাদ্যদ্রব্যের চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় বিভেদে কার প্রতি কীরূপ ব্যবহার করা বিধেয়—এই বিষয়ে কতখানি ওদের কর্তব্যজ্ঞান ও বোধশক্তি, ওদের সুরুচি বা শৌখিনতারই বা কদ্দুর দৌড় তার কোনওই ধারণা শিশিরের নেই। হয়তো ওরা প্রথমেই এসে, উঁচু দেখে, শিশিরের নাসিকাতেই ঘেউ করে এক কামড় দেবে, প্রথম দর্শনেই সাবড়ে দেবে এক কামড়ে—ঠিক আচারের মতো তার প্রতি আচরণ করবে কি না কে জানে!

কিন্তু কতক্ষণেরই বা ভাবনা? ওদের দুজনকে পিকনিক করে ফেলতে বারোজনার পক্ষে আর কতক্ষণ?

তারপর আহার সমাধা করে বিজয়গর্বে ওরা ফিরে যাবে—প্রত্যেকে এক-একখানা হাড় মুখে করে—ওদের দুই ভাই-বোনের ভগ্নাবশেষ! ওদের চোখে দীপ্ত চাহনি এবং হয়তো বা মুখের কোণে একটু মুচকি হাসি!

তখন নিঃশব্দে ওরা ফিরে চলেছে—যদিচ তখনও ওদের মুখে বিবৃতি—সেই হাড়!

সিনেমার একেবারে সীমানায় এসে, The End কল্পনা করতেই শিশিরের রোমাঞ্চ হয়।

ডালকুত্তারা তখন খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—তাদের হাঁকডাক প্রায় ওদের কান ধরে টান লাগাচ্ছে বলতে গেলে!

ভৌ—ভৌ—ভৌ!

সংস্কৃত ভাষায় ওর মানে দাঁড়ায় ঃ 'ভো-ভো! ওহে—তোমরা! অত দৌড়চ্চ কেন? আরে শোনো, শোনো! একটু দাঁড়িয়ে যেতে কী হয়?'

শিশিরের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে তড়াক করে এক লাফ মারে—নিজে লাফিয়ে উঠে, তারপরে লিলিকে টেনে তুলে নেয়।

এগারো ঃ কুকুর আর মুকুর

উঁচু রোয়াকওয়ালা ছোট্ট একখানি ঘর। তাদের জন্যেই পথের ধারে অপেক্ষা করছিল যেন। একখানিই মাত্র ঘর, গৃহস্বামী কেউ নেই, হয়তো কোনও কাজেই কোথাও বেরিয়ে থাকবেন—তা যেখানে খুশি তিনি যান তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার শিশিরদের কোনও অত্যাবশ্যকতা ছিল না। অন্তত তদ্দণ্ডেই ছিল না।

উঁচু রোয়াকটা দেখবামাত্রেই শিশির লাফিয়ে উঠেচে। একলাফে আগে নিজে উঠে, তার পর লিলিকেও সে টেনে তুলে নিয়েছে।

'উঃ! বাঁচা গেল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেওয়া যাক এবার।' দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করতে-করতে সে বলে।

লিলি শুধু বলে ঃ 'উঃ!' সে দম ছাড়ছে তখন।

'অবশ্যি, বাঁচা যেতই! মারা যেতুম না অবশ্যি।' হাঁফ ছেড়ে শিশির জানায় ঃ 'আমরা যে মারা যাওয়ার নই তা আমি জানতুম। কেবল কী করে যে বাঁচব এইটেই আমার জানা ছিল না।'

'তুমি বলো কী দাদা?' লিলি বিস্মিত না হয়ে পারে না। 'তুমি জানতে?'

'বাঃ! আমরা কখনও মরতে পারি? এত সহজে মারা যাব, বলিস কী? কেন, বন্দুকের ব্যবহারে তুই কী বুঝলি—কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে সব চলে গেল না? কুকুরের পেটের ভেতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ, এ কখনও ভাবতে পারা যায়?' শিশিরের ততোধিক বিস্ময় হয় ঃ 'কোনও অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে এরকম পড়েছিস না কি? বইয়ের বীরবররা কখনও মারা পড়ে?'

'ওঃ, তাই বলো!' এতক্ষণে লিলির কাছে বক্তব্যটা বিশদ হয় ঃ 'কিন্তু এখন আমাদের বেঁচে উঠতে দেরি আছে দাদা! ডালকুত্তারা এসে পড়ল বলে! তুমি ভাবচ দরজায় খিল এঁটে বাঁচবে? যদি খিল ভেঙে ঢুকে পড়ে? ওরা অতগুলো আর আমরা দুজন! ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে কি আমরা পারব?'

'এই যে!' হঠাৎ শিশির চেঁচিয়ে ওঠে ঃ 'ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আয়না রয়েছে দেখচি যে!' চেঁচানোর সঙ্গে-সঙ্গে এবার সে লাফাতে শুরু করে দেয় ঃ 'আর আমাদের পায় কে?'

'আয় দুজনে মিলে এটাকে ধরাধরি করে দোরের বাইরে রেখে দিয়ে তারপর ভেতর থেকে খিল এঁটে দিই!' শিশির বাতলায় ঃ 'তারপর মজা দেখিস। কী মজা!'

দুজনে মিলে সেই লম্বা চওড়া আয়নাটাকে পাঁজাকোলা করে বাইরে এনে ওরা স্থাপিত করে—লম্বা আয়নাটাকে চওড়া করে দেওয়াল ঠেস দিয়ে রাখে দরজার ঠিক সুমুখটাতেই। তারপর ভেতরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে নিঃশব্দে ডালকুত্তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা এসে পড়ে! হুইহুই করে সব এসে যায়।

ভৌ—ভৌ—ভো ভো ভৌ—। (সাদা বাংলায় ওর মানে, সব ভোঁ-ভাঁ দেখছি যে! এর মধ্যেই ওরা সটকাল কোথায়?)

প্রশ্নপত্র মুখে করেই, ওরা রোয়াকের ওপর টকাটক লাফিয়ে উঠল এবং ওঠবামাত্রই ওদের

চক্ষুস্থির! ওদের প্রশ্নের যে এতবড় প্রত্যুত্তর ওখানেই অপেক্ষা করে রয়েছে তা ওরা ভাবতেই পারেনি। অ্যাঁ, এ কীরে বাবা, ওদেরই সগোত্র আর একপাল ডালকুত্তা মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়!

ওদের পিলে চমকে গেল, জয়ধ্বনি সেইসঙ্গে থমকে গেল।

কেবল ওই পালের মধ্যে যে-মোড়ল গোছের, তার গলা দিয়ে বেসুরো এক আওয়াজ গলে এল : 'ও-ও-ও-অ্যা-অ্যা-অ্যা—?'

অর্থাৎ কিনা, 'এ আবার কী হ্যা? এরা কারা হ্যা?'

দু ভাই-বোনে খড়খড়ির ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব—শিশির লিলির কানের গোড়ায় ফিসফিস করে : 'দেখলি তো! দেখছিস তো! আর সে ঝাঁউঝাঁউ নেই! একেবারে মিউ-মিউ! মিউ-মিউ না হলেও ভ্যা-ভ্যা ডাক বেরিয়ে গেছে!'

'হুঁ-উ-উ!' লিলি এক সুরে সায় দেয়।

'ওদের মধ্যে দার্শনিক কেউ থাকলে এইসময় এদের আসল-নকল সমঝে দিয়ে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারত!'

'ঠিক পথ তো আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়া?'

'তা সে যাই হোক! দার্শনিকের কাজ হচ্ছে নিজের চোখ চালানো, পরের ঘাড় বাঁচানো তো নয়।' শিশির জবাব দেয়।

কুকুরদের ঘাবড়ে যাবার কথাই বইকী! নিজের আশেপাশে ওরা প্রত্যেকে মাত্র দুজনকে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু সামনে একেবারে অগণন—সে যে কতগুলো ওদের লাঙুলের ডগায় গোনা যায় না! অঙ্কের ভয়ে বা অন্য কোনও আতঙ্কে ওদের লেজ আপনা থেকেই নেমে এল।

এবং কী আশ্চর্য, প্রতিপক্ষবা দলে-বলে ভারি হয়েও, নিজেদের পতাকা নামিয়ে ফেলল। ওরাও তা হলে ভয় পেয়েছে—ও-ধারের ওরাও! এতক্ষণে এদের প্রাণে আবার সাহস ফিরল, আবার এ-ধারের জয়পতাকা খাড়া হতে লাগল একে-একে।

অন্যপক্ষের পুনরায় লাঙুল উঁচানো দেখে এবার এরা চটে গেল। অ্যাঁ, একি রসিকতা না কি! নতুন সাহসে, নবোদ্যমে, এরা ওদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল এবার। এবং সেকী ঘোরতর লড়াই! আঁচড়াআঁচড়ি—চেঁচামেচি—কামড়াকামড়ি—আয়নার ওপর সেকী ভয়ঙ্কর বায়না! এবং বলা বাহুল্য, আয়নার পক্ষও যুদ্ধ করতে কিছুমাত্র কসুর করল না!

খানিকক্ষণ সংগ্রামের পর ডালকুত্তারা কাতর হয়ে জিভ বার করে ফেলল। অপর পক্ষেরও সেই দুর্দশা দেখা গেল। পরস্পরের একই হাল দেখে এবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগল ওদের। সাময়িক সন্ধি-ঘোষণা করে, উভয় পক্ষের সামরিক ক্ষতির খতিয়ান নেওয়া শুরু হল তখন। দু-দলের মধ্যে মোটামুটি আলাপ আরম্ভ হল। আয়নারূপ দোভাষীর মধ্যবর্তিতায় সেটাকে প্রথম শান্তি বৈঠক বলা চলে।

'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!' লিলি এতক্ষণে কথা বলে। একটি প্রবচন দান করে এতক্ষণে।

'মুগুর? মুগুর কিরে, মুকুর বল! যেমন কুকুর তেমনি মুকুর। মুকুর মানে আয়না জানিস না?'

'কথাটা মুকুর নাকি? আমি জানতাম মুগুর!' লিলি নিজের এতদিনের অজ্ঞতায় একটু অবাক হয়।

'আরে মুগুরই তো! মুগুর আর মুকুর তো এক! আয়নায় নিজেকে দেখতে মিষ্টি লাগে না? গুড়ের মতো—ঠিক মুগুরের মতো মিষ্টি লাগে না কি? গুড় আর মুগুর কি আলাদা?' শিশির ব্যাখ্যা করে দেয়।

এই বিপদের মাঝখানেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলে : 'ঠিক দাদা!' এবং

সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দিয়ে ভাবে, হায়, সামনে একটা আয়না নেই যে একফাঁকে নিজেকে একটু দেখে নেয় এখন।

'কিন্তু ভারি দুর্লক্ষণ! দেখেছিস! মুখ শোঁকাশুঁকি করে ওরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে! কনফারেন্স বসে গেছে দেখছিস না? এ-ধারের জানলা টপকে এইবেলা এখান থেকে পালাই চ।' শিশির বলে—ওর মুখে কোনও হাসি নেই।

বারো : গন্ধ থেকে গন্ধমাদন

পিছনের জানলাটা আবার বহুদিনের অব্যবহারে এমন জং, ধরা যে-সহজে খুলতে চায় না! ছিটকিনিটাকে হটাতেই শিশির কাবু হয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে ধরে সাধাসাধি করলে অটলকেও টলতে হয়, সামান্য ছিটকিনি আর কতক্ষণ? খানিক পরে সেটা খটাৎ করে সরে গেল হঠাৎ।

শিশির টপকাল আগে। তারপর লিলির পালা। লিলি যদি বা কোনওরকমে জানলার ওপরে নিজেকে খাড়া করতে পারল, নামতে আর পারে না।

'আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়!' শিশির আবাহন জানায়, 'পড় না!'

লিলি খুব ভরসা পায় না। তার পতনবেগে, বীরোচিত তার ছোট্ট দাদাটি দাঁড়াতে পারবে কি না তার সন্দেহ হয়।

'ভয় কী? আমি তোকে ধরব।' শিশিরের নিরুদ্বেগে আহ্বান।

লিলি একটা পা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু আরেকটা পা-কে কিছুতেই আর নামাতে পারে না। মূল্যবান মুহূর্ত সব অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, লিলির পায়ের পাশ দিয়ে কালস্রোত কলকল বেগে বয়ে যাচ্ছে, শিশিরের আর তর সয় না, পা ধরে হ্যাঁচকা টান লাগায়।

লিলি নেমে আসে, টানের সেই বিপাকে নির্বিঘ্নে পদচ্যুত হয়ে নিরাপদেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার ফ্রকের খানিকটা ছিন্ন হয়ে পশ্চাদবর্তী ছিটকিনিতে আটকে থেকে যায়।

'থাক গে!' শিশির ফ্রকের উপসংহারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে বলে : 'আমাদের জয়পতাকার মতো উড়তে থাক।'

'পরাজয়ের নিশান বলো বরং।' লিলি বলতে চায়। কেবল অসত্য বলেই জয়-ঘোষণায় তার দ্বিধা নয়, ফ্রকের অসভ্যতায় সে বেশ চটে গেছে।

'পরাজয় কীসের? কেন, আমরা কি অ্যাকর্ডিং টু দি প্ল্যান পালাচ্ছি নে? ঠিক যেমন করে পালানো উচিত, পালাতে পারছি নে কী?' শিশির গর্বিত না হয়ে পারে না।

'তা পালাচ্ছি বটে! কুকুরের সামনে শেয়ালের মতো পালাচ্ছি বটে।' লিলি বলে।

'উঁহু। মোটেই তা নয়। পালানোটা সিংহের মতো কাজ। পলায়নের শেষের দিকেই লায়ন। লায়নে আর পলায়নে একবারে জড়াজড়ি।'

এই বলে, উদাহরণ স্বরূপই যেন সে আবার দৌড়তে শুরু করে দেয়। লিলি আর প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে দাদার পিছু নিতে হয়।

'বন্দুকগুলো তবু মানুষের মতো ছিল! এই ডালকুত্তারা মোটেই তা নয়!' দৌড়তে-দৌড়তে শিশির বলে।

লিলি শুধু বলে—'উঃ!' এতদ্বারা আপত্তি বা সম্মতি কী জানায় বলা কঠিন।

'গুলিগুলিও ভদ্রলোক! ওদের কর্তব্য ওরা করেছে। ওদের আর কাজ কী? কানের আশ-পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বেরিয়ে যাওয়া। তা ওরা চোঁ-চোঁ বেরিয়ে গেছে, স্পর্শও করেনি আমাদের।'

লিলি কোনও সাড়া দেয় না।

'আমরাও আমাদের কর্তব্য করেছি। ওরাও যেমন আমাদের গায়ে হাত দেয়নি, আমরাও তেমনি বন্দুকের সামনে অম্লানবদনে বুক পেতে দিয়েছি। বুক অথবা পিঠ। আমরা তার কি কোনও অন্যথা করেছি?'

লিলি জবাব দিতে পারে না, শিশির যেমন পা আর মুখ, একসাথে, খরতর বেগে চালাতে পারে ওর পক্ষে তা অসাধ্য। পায়ের সঙ্গে-সঙ্গে শুধু ওর কান চলে। পা আর কান, পাল্লা দিয়ে, একসঙ্গে চালানো যায়।

'গুলির সামনে বুক পাততে আর কী? কী আর এমন? কান পাতলেই হয়। সোঁ-সোঁ করে চলে যাবে তাই কেবল শোনো। ভয়ের কিছু নেই।' শিশির নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞপ্তি দেয় ঃ 'কিন্তু এই ডালকুত্তারা! বাব্বা! একবার এরা হাতে পেলে আর রক্ষে আছে? সঙ্গে-সঙ্গে দাঁত বসাবে। আর সঙ্গে-সঙ্গে নির্ঘাত—!'

নির্ঘাত সাবাড়, বক্তব্যের এই কথাটা, সংবাদের শোচনীয় অংশটুকু বোনের মুখ চেয়ে শিশির উহ্য রাখতে চায়। লিলি এবার ঘাড় নেড়ে—যে- ঘাড়টা দৌড়নোর তালে-তালে আপনা থেকেই নড়ছিল তার সাহায্যে—দাদার কথায় সায় দেওয়ার চেষ্টা করে। হতাহতের তালিকায় তার স্থান যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে এ-কথা তার অজানা নয়, ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়।

ডালকুত্তারা এ-ধারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মুখেই একটা ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্মুখ-আলাপে অগ্রসর হতে দ্বিধা করেনি, অম্লানবদনেই মুখ বাড়িয়েছিল, ওদের সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে কি! কিন্তু তথাপি সে-আলাপের কেবল মৌখিকতাই সার! এতখানি সম্মুখীনতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কী যেন কোমলতা নেই, কেমন যেন জিনিসটা মিষ্ট নয়। ভাবের মধ্যে কীসের যেন অভাব!

আয়নায় মুখ শোঁকাশুঁকি করতে গিয়ে মুখ ঠোকাঠুকি করে, পুনঃ-পুনঃ ধাক্কা খেয়ে, হতাশ হয়ে পুনরায় যখন নিজেদের পরামর্শ বৈঠকে ফিরে এসেছে, তখন ওদের মধ্যে একজনের, অপেক্ষাকৃত ভূয়োদর্শী জনেকের মনে সন্দেহ জেগে উঠল—সমস্ত জিনিসটাই ভুয়ো নয় তো? স্রেফ আরেকখানা ভুয়ো-দর্শন নয় তো?

ঘাড় বেঁকিয়ে তথাকথিত শত্রুদের দিকে সে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছে। তারপর মাথা নেড়ে আপনমনেই বলেছে, 'হুঁ! সব মায়া। সমস্তই অসার! সবই ভগবানের লীলা! কিসুই কিসসু নয়! তা হলে—তা হলে আর বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?'

ভাবতে-ভাবতে তার মনে হল, ওধারে খট করে একটু আগে একটা আওয়াজ হয়েছিল না? তার মনে খটকা লাগল কেমন!

এটাকে যেমন চোখের ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে সেও কি তেমনি কানের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়?

যদি তা-ই হয়, তা হলেও সেই ভ্রমকে অনুসরণ করে—ঈষৎ লম্বা করে—পায়ের দিকে বাড়িয়ে একটু ভ্রমণ করে দেখতে ক্ষতি কী? কিঞ্চিৎ ঘুরফির করে দেখাই যাক না!

সেই ভূয়োদর্শীই সবার আগে একলা আবিষ্কার-যাত্রী হয়ে বেরিয়ে, খোলা জানলার পাশে পতপত রবে উড্ডীয়মান সেই জয়পতাকা দেখতে পেল!

এবং সেই জয়পতাকার সঙ্গে জড়ানো পলাতকদের সৌরভ!

আবিষ্কারের মতন একখানা আবিষ্কার! অমনি সে বাঙ্ময় হয়ে উঠে প্রত্যাদেশের মতো একটা আদেশ ছেড়েচে। হইচই করে, হাঁকডাক ছেড়ে সবাইকে একজোট করে ফ্যালে। ডালকুত্তাদের এমনি, একেবার একটু গন্ধ পেলেই হল! পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অমনি সেই গন্ধকে তাড়া করে তারা দৌড় লাগাবে।

এক্ষেত্রেও শিশির-লিলির পশ্চাদ্ধাবনে তাদের বিলম্ব হয় না!

শিশিররা লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছল, কুকুরে আর মুকুরে জড়াজড়ি

করে একত্র হয়ে বেশ জব্দ হয়ে রয়েছে ভেবে খানিকটা নির্ভাবনাও যে না হয়েছিল তা নয়, এমন সময়ে আবার সেই চতুষ্পদী পয়ারে 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ' না শুনে, পেছনে না তাকিয়েই কারা পিছু নিয়েছে অনুমান করতে তাদের দেরি হয় না।

কিন্তু এবার? এবার কী? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, খোলা বাড়ি দূরে থাক, একটা খোলার বাড়িও চোখে পড়ে না। চারধারেই ধু-ধু মাঠ! কদ্দুর দৌড়িয়ে কোথায় গিয়ে তারা রক্ষা পাবে?

আর কি তা হলে পরিত্রাণ নেই? এইখানেই শেষ? 'দি এন্ড?' কোনও অ্যাডভেঞ্চারের গল্পেই যা ঘটে না, কদাচ ঘটেনি, অন্তত তাদের পড়াশোনার মধ্যে মনে পড়ে না, মৌলমীনের এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে সেই অঘটন—সেই অঘটনীয় দুর্ঘটনা—সেই মৌলিক এবং অত্যন্ত মীন ব্যাপার—একান্তই ঘটে যাবে?

বন্দুকের হাতে বেঁচে—গুলিদের থেকে পদে-পদে খুলি বাঁচিয়ে—ডালকুত্তাদের হাতেই ঘাল হতে হবে শেষটায়?

শিশির আর লিলি প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। ডালকুত্তারাও ছেড়ে কথা বলে না—তারাও দৌড়ায়। অচিরেই তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

প্রায় তিনশো গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপরে লম্বা-লম্বা লম্ফক্ষেপে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসতে থাকে।... আড়াইশো গজ... দুশো তেতাল্লিশ... একশো বিরাশি... একশো চৌত্রিশ... অন্তরায় কমে-কমে অবশেষে একশো এগারোয় এসে দাঁড়ায়। এবং সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে না, আসতে-আসতে (আস্তে আস্তে নয়!) একেবারেই নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় এসে পৌঁছয়।

নিরানব্বই থেকে অষ্টআশি, ডালকুত্তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়। অষ্টআশি থেকে সাতাত্তর... সাতাত্তর থেকে সাঁইত্রিশ! সাঁই-সাঁই ব্যাপার! ভৌ-ভৌ ক্রমশই আরও ভয়াল হয়ে এগিয়ে আসে, কানের তালিতে এসে তালা লাগিয়ে দেয়।

এমনসময়ে—।

এমনসময়ে সেই ছাগলের পাল—।

অনেকক্ষণ আগে যারা ও-ধারে গেছল, তারা ও-ধারের চর্বণ সেরে, এ-ধারে বিচরণ করতে ফিরছে—ও-ধারের ভোজনপর্ব নিকেশ করে এ-ধারের চর্ব্য-চোষ্যে চড়াও হওয়ার মতলবেই তারা আসছিল।

'লিলি! লিলি! চটপট! ওই ছাগলদের আসবার আগেই! খুব ছোট! যেমন করে হোক ছাগলদের ও-ধারে গিয়ে পড়তে হবে।' রুদ্ধনিশ্বাসে শিশির চিৎকার ছাড়ে।

লিলি পারে না, তবু সে শেষবার মরিয়া হবার চেষ্টা করে। এমনিতেই সে দাদার থেকে তেরো হাত পিছিয়ে পড়েছিল, কুকুরদের সাড়ে ছ'গজ কাছিয়ে গেছল—কিন্তু তার পা আর উঠতে চায় না। শিশির নিজের গতি মন্দ করে লিলিকে আগিয়ে নিয়ে আসে, তারপরে তার হাত ধরে টান মেরে একসাথে দৌড় লাগায়।

একটু আগে যে-পাথরখানার উপরে তটস্থ হয়ে তারা ছাগস্রোত নিবারণ করেছিল, একটু পরে সেই পাথরখানার ওপরেই তারা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে।

আর তার পরমুহূর্তেই সেই ছাগলের পাল উল্কাবেগে ব্যা ব্যা করতে-করতে এসে পড়ে। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অফুরন্ত উৎসাহে রাস্তা পারাপার করতে থাকে।

ডালকুত্তারা সেই ছাগলাদ্য সমারোহের সামনে এসে হকচকিয়ে থেমে যায়। কী করবে ভেবে পায় না, ওদের ভেদ করে এগোবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

শিশির-লিলি সেই পাথরের ওপরে দণ্ডায়মান হয়ে দ্যাখে—ছাগলদের—ছাগলদের পরপারে কুকুরদের—।

কুকুররাও যে তাদের দেখতে পায় না তা নয়।

লিলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'কতক্ষণ আর! ছাগলরাও চলে যাবে, ওরাও এসে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

'হ্যাঁ, খেলেই হল!' শিশির বলে, তার নির্ভীকতা ফিরে এসেছে আবার! 'খেলেই হল আর কী!'

'কেন, খাবে না কেন? আমি আর দৌড়তে পারব না দাদা! তা বলে দিচ্ছি। পা তুলতেই পারচি নে!'

'দরকার নেই আর পা তোলার। ঠায় দাঁড়িয়ে দ্যাখ। কুকুররা আমাদের টের পেলে তো!'

'কেন, টের পাবে না কেন? জলজ্যান্ত ওইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে!' দাদার কথায় লিলি অবাক হয়ে যায়।

'দেখলেই বা! দেখে ওরা কিচ্ছু বুঝতে পারে না, গন্ধ থেকেই টের পায়। আমাদের গন্ধ আর পেলে তো? এই বোকাপাঁঠারা যা গন্ধ ছড়িয়ে গেল!' শিশির নাক সিঁটকোয়। 'রামোঃ! এ-গন্ধ এখন এক শতাব্দী থাকবে! শিলঙে ফিরেও এর সৌরভ পাব!'

যমালয়ের দরজার প্রায় সামনে এসে প্রাণান্তকর প্রান্ত পর্যন্ত তারা এগিয়ে পড়েছে, এতক্ষণ লিলির এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দাদার কথায় গন্ধর্বলোক ঘুরে, সে আবার নতুন করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। দারুণ দুর্গন্ধ নাক ভরে পান করে সে পুনঃ-পুনঃ আরামের নিশ্বাস ছাড়ে—আঃ! বাস্তবিক, এমন মিষ্টি গন্ধ, এহেন সৌরভ, কোনও মূল্যবান এসেন্সের মধ্যেও সে এতদিন পায়নি।

শিশিরের আন্দাজই ঠিক! পাঁঠারা চলে যাওয়ার পর ডালকুত্তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল! কোন দিকে যে যাবে, কার গন্ধের ছুতো ধরবে—সে-এক ভারি সমস্যায় পড়ে গেল তারা। শিশিরদের কাছেও এল না যে তা নয়—সন্দিগ্ধভাবে দেখল খানিক, শুঁকেও দেখল কয়েকবার, কিন্তু নাসিকার সাহায্য নিয়েও, পাঁঠাদের সগোত্র ছাড়া আর কিছুতেই তাদের ভাবতে পারা গেল না।

'উঁহু, যা ভাবছ তা নয়! আমরা তারা নই, সেই পলাতকরা আমরা নই।' লিলি বলে, নিজের মনে-মনেই বলে—উচ্চারণ করে বলার তার সাহস হয় না!

'হে পাঁঠারা! তোমরাই ধন্য! নিজের মহিমায় আমাদের মহিমান্বিত করে—নিজেদের সৌরভে আমাদের সুরভিত করেই কেবল তোমরা যাওনি, আমাদের সাথে-সাথে এই দুর্দান্ত ডালকুত্তাদেরও পাঁঠা বানিয়ে গেছ!' শিশিরের সারা মন পাঁঠাদের লীলার মহিমা গানে মুখর হয়ে ওঠে।

'ভৌ-ভৌ? এরা কারা? এই দুটো উদ্‌বেড়াল যারা দাঁড়িয়ে আছে—এরা কি তারা? তাদের মতোই বটে কিন্তু তারা তো নয়! এরা কারা তবে? ভৌ—ঔ—ও-ও-ঔ?'

ডালকুত্তারা নিজেদের মধ্যে মুখ শোঁকাশুঁকি করে।

'এই! এই! পাঁঠার ডাক ছাড়!' শিশির বলে ওঠে ঃ 'শিগগির! দেখছিস কী?'

'ব্যা—ব্যা—ব্যা—!' লিলি ডাকাডাকি লাগায়।

শিশির বলে ঃ 'অররররররর...।'

গন্ধে মেলা সত্ত্বেও শিশিরদের আকারে-প্রকারে যাও বা ওদের সন্দেহোদ্রেক হয়েছিল, ছাগল বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হচ্ছিল, এখন লিলির ব্যা-করণে আর শিশিরের সংস্কৃত ভাষায়, ভাষার সাথে ব্যাকরণের নিখুঁত মিলন দেখে তা তীরবেগে তিরোহিত হয়ে গেল। মানুষের হাবভাবে ওরা যে পাঁঠাদের পাঠান্তর ছাড়া কিছু নয়, এ-বিষয়ে একমত হতে ওদের আর বাধা রইল না!

এবং তারপরেই নিজেদের ভোট শিশিরদের বিপক্ষে দিয়ে একে-একে তারা লাঙুল প্রদর্শন করতে লাগল। কুরুক্ষেত্র থেকে, কিছু না করেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে ফিরে চলল।

এখন আর ওদের সে-লম্ফঝম্ফ নেই! সে-উৎসাহ যেন কোথায় উপে গেছে! টুঁ শব্দটি নেই কারও! ধীর পদক্ষেপে নীরবে অধোবদনে ওরা ফিরে চলেছে!

'সবাই মুখটি বুজে চুপটি করে চলেছে! দেখেছ দাদা, ডালকুত্তাদের কারও মুখে কোনও রা

নেই!' লিলি বলে।

'কর্তার কাছে কী কৈফিয়ত—কী জবাবদিহি দেবে—সেই কথাই ওরা ভাবছে—মনে-মনে তারই প্ল্যান ভাঁজছে এখন। কে জানে আজ হয়তো ব্যাটাদের ডালরুটি বন্ধ।'

এবার শিশির হাসে। এতক্ষণে ওর হাসি পায়।

তেরো : হাতের স্বর্গ না বিসর্গ?

'এই নাও।' শিশির গিয়ে তার মামার হাতে প্ল্যানটা ছাড়ল।

মামা বিস্মিত হয়ে উঠলেন, আর পরমুহূর্তেই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর মনোভাবের আভাস ভাষায় প্রকাশ করার জন্যে একমুহূর্তও না নষ্ট করে, একটুও না দাঁড়িয়ে, প্ল্যানটি পাওয়ামাত্রই বিদ্যুৎ-গতিতে তিনি অন্তর্হিত হলেন।

যেমন তড়িৎ-বেগে তিনি গেলেন, খানিক পরে, তারচেয়েও, এমনকী, ততোধিক ত্বরিত বেগে ফিরে এলেন তিনি।

'কিছু নেই, কিছু নেই!' তাঁর মেঘলা মুখমণ্ডল থেকে যেন দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল!

'কিছু নেই, সে কি মামা?' লিলিরও খুব তাক লাগে।

'নাঃ, সব সেই হতভাগা মামাটা নিয়ে সটকেছে। এর আগেই সটকান দিয়েছে। সেই কালনিমে অপয়াটা।'

'তা কী করে হবে?' শিশির বিশ্বাস করতে পারে না : 'এর মধ্যেই নিয়ে পালাবে কেমন করে? আমি তো গ্র্যান্ড মামাকে কাল রাত্রে কিছু নিতে দিইনি! চুইংগাম চালিয়েই তো তাকে ভাগালুম!'

বাস্তবিক, কী করে তা সম্ভব হতে পারে? কালকের রাত্রে, ইতো নষ্ট স্তত ভ্রষ্ট—সেইসব নিক্ষিপ্তদের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে—চুইংগামদের চাটুকারিতায় চটে গিয়ে, চটচটে হয়ে সেই যে তিনি তীরবেগে প্রস্থান করেচেন তারপরে ফের কখন এলেন আবার? তারপরে সেই-তো—এই শিশিরই তো—কত না বীরত্ব দেখিয়ে উক্ত প্ল্যান উদ্ধার করে এইমাত্র ফিরল!

'দাও তো দেখি প্ল্যানটা আমায়!' শিশির বললে : 'দেখি আমি চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে দেখা যাক একবার।'

ব্রজেশ্বর বড়ুয়া অম্লানবদনে—কিংবা অতিশয় ম্লান বদনেই, প্ল্যানটি শিশিরের হাতে পরিত্যাগ করেন। যে-প্ল্যানের পিছনে কোনও গুপ্তধনের কিনারা নেই তা রেখে লাভ? যার সমস্তটাই ফাঁকা—বেবাক ফাঁক—তা আর রাখা কেন?

নকশাটার সর্বস্বত্ব লাভ করে উল্লসিত হয়ে শিশির সেই গুপ্তকক্ষে গিয়ে হাজির হয়। পার্চমেন্টের ছকটাকে অনুসরণ করে, এগিয়ে-পেছিয়ে, ডান ধারে বাঁ-ধারে এঁকে-বেঁকে, দুবার লেফট আর চারবার রাইট টার্ন করে—রাইট কিংবা রংটার্ন তা কেবল সেই ছক্কেশ্বরই জানেন—অবশেষে নকশার উপদেশ মতো, তিনপাক ঘুরে চিহ্নিত একস্থানে গিয়ে সে উপস্থিত হয় এবং উপস্থিত হয়েই সে লাফাতে আরম্ভ করে (যদিও লাফাবার কোনও নির্দেশ সেই নকশার মধ্যে ছিল না)! কিন্তু না লাফিয়ে সে করে কী, একেবারে হুবহু সেই চিহ্নই যে! নকশার নিশানার সঙ্গে অবিকল একেবারে! একটা শক্ত আঁক এমনভাবে মিলে গেলে না লাফিয়ে কি থাকা যায়?

দুয়ে-দুয়ে যেমন চার হয়, (দুধও হয় নাকি, অনেকে বলে থাকেন) তেমনি অবলীলাক্রমে কতবড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল!

তারপর নকশার আদেশমতো তিনটি টোকা—চারটি নয়, দুটিও না—গুনে-গুনে তিনটি টোকা—সেই চিহ্নটির পৃষ্ঠদেশে। আর তিনবার টোকবার পরেই—।

ঠিক যেমনটি শিশিরের আশঙ্কা ছিল—।

চকিতের মধ্যে, কোত্থেকে কী সরে গিয়ে উন্মুক্ত আধারে, চকচকে কত কী সব বেরিয়ে পড়ল!

হাঁসের ডিমের মতো—কিন্তু আকারে হয়তো বৃহত্তম—তেমনি সাদা আর তেমনি সুচারু—থরে-বিথরে সাজানো কতকগুলি—।

কী ওগুলি? হীরে না জহরত? মণি না মাণিক্য? মুক্তা না গজমোতি? চুনী, পান্না, প্রবাল, মরকত—কী ওরা? রত্নতত্ত্বে শিশির খুব ওয়াকিবহাল ছিল না—ও-বিষয়ে ওকে প্রায় বিশেষজ্ঞই বলা চলে—তবু, বিশেষ অজ্ঞতা থাকলেও, যাই হোক, ওগুলো যে খুব দামি চীজ সে-সম্বন্ধে তার তিলমাত্র সন্দেহ রইল না।

একেকটি করে গুনে-গুনে দেখল শিশির—তেরোটি।

সাত রাজার ধন এক মাণিক—একমাত্র মাণিকে সাত-সাতটা রাজ্য কেনা যায়। কিন্তু এর একটায়—এহেন এক রাম-মাণিক্য দিয়ে ক'টা সম্রাটের ক'খানা সাম্রাজ্য কেনা যায় কে জানে!

বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে এইসব কথা শিশির ভাবছে—এমনসময়ে পেছন থেকে হেঁড়ে এক আওয়াজ এল ঃ 'হাত তোলো!'

'অ্যাঁ?' চমকে গিয়ে শিশির পিছন ফিরল। পিস্তল হাতে তার গ্র্যান্ড মামা।

'তুলে ফ্যালো! দেখছ কী আর?' বক্কেশ্বর আইচ বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেন।

'কেন, হাত তুলব কেন? কী হয়েছে?' শিশির বলে।

'হাত তুলবে কেন, বলছ বেশ।' বক্কেশ্বর কাষ্ঠহাসি হাসেন ঃ 'আমার হাতে এটা কী, দেখচ না?'

'দেখেচি। পিস্তল।' তাচ্ছিল্যভরে শিশির জানায়।

'হ্যাঁ, গুলিভরা ছ-নলা—দেখেচ তো?' গ্র্যান্ড মামা আরও বিশদ করে দেন ঃ 'এরকম একখানা দেখলেই লক্ষ্মীছেলের মতো হাত তুলতে হয়। গুলি করে দেব তা না হলে, তা বলে রাখচি। হাত না তুললেই গুলি করার নিয়ম।'

অগত্যা, শিশিরকে অনিচ্ছাসত্ত্বেই নিয়মরক্ষা করতে হয়।

'হুঁ, যে-বিয়েতে যে-মন্ত্র! যে-কাজের যা-দস্তুর!' ঊর্ধ্ববাহু দেখে প্রসন্ন হয়ে বক্কেশ্বর বিবৃতি দেন ঃ 'তুমিও যদি এমনি একখানা রিভলভার নিয়ে পেছন থেকে আসতে আর আমি তোমার অবস্থায় পড়তুম—আমিও হাত তুলে ফেলতুম। বলতে না বলতেই—হুঁ!'

'আমার রিভলভার কই?' শিশির ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলে।

'সেই তো—নেই তো! সেইজন্যেই তো আমি সুবিধে করে নিচ্ছি। এসব কাজে এগুতে হলে রিভলভার নিয়ে এগুতে হয়। তাও জানো না?'

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ রিভলভার হাতে রত্নসম্ভারের দিকে গুটিগুটি অগ্রসর হন। ধীরে-ধীরে এগুতে থাকেন। এগুতে-এগুতে শিশিরের নাকে আর পিস্তলে ঠোকাঠুকি লাগে।

'একি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিছনে হটছ না কেন? পিছিয়ে যাও। পিছনে হটে পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসো। যাতে দরকার হলে তোমাকে আমি গুলি করতে পারি। নাকের ওপরে নল রেখে গুলি করা যায় না—তাতে পিস্তলের অপমান হয়।'

শিশির তথাপি নড়ে না। পিস্তলের নলে আর তার গালে মোলাকাত হতে থাকে।

'ছি ছি! ছবির মতো অমন দাঁড়িয়ে থেকো না, দোহাই তোমার! আমার কাজের বাধা হচ্ছে। অমন করলে, গুলি না দেগে এর ডাঁট দিয়েই এক ঘা সাঁটিয়ে দেব। নাক ফেটে রক্ত পড়লে আমার দোষ নেই তখন।' বক্কেশ্বর আইচের সতর্কবাণী শোনা যায়। 'পিছিয়ে যাও, ভালো কথাই বলছি!' তিনি পুনঃ-পুনঃ সাবধান করেন।

গুলিকে শিশির গ্রাহ্য করে না, কিন্তু নলাঘাতে তার ভয় আছে। অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়েই, কয়েক পা তাকে পিছুতে হয়।

বক্কেশ্বর রত্ন-ডিম্বগুলি নিরীক্ষণ করেন, সকৌতূহলে পর্যবেক্ষণ করেন সব। তারপরে, রুমালে

বেঁধে ওগুলোকে করায়ত্ত করার তাঁর চেষ্টা হয়। কিন্তু একহাতে তাদের পাকড়ানো যায় না কিছুতেই।

'ইস! ভারি মুশকিল হল দেখচি! এই পিস্তলটাকে নিয়েই মুশকিল হল! কোথায় যে রাখি!'

'আমি ধরব?' শিশির প্রস্তাব করে—বেশ একটু সাগ্রহেই। 'পিস্তলটা আমি ধরব ততক্ষণ?'

'তুমি! তুমি ধরবে! তুমি ধরবে পিস্তল?' বক্কেশ্বরের দু-চোখ বিস্ময়ে কপালে গিয়ে ওঠে ঃ 'তুমি যদি পিস্তল ধরো তা হলে এই ডিমগুলো কি আর আমি ধারণ করতে পারব? পিস্তল যার, এগুলোও তার। বুঝেছ?'

আর অধিক বাক্যব্যয় না করে তিনি ডিম্বগুলিকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হন।

'হাত তুলে থাকতে পারছি না! ব্যথা করছে!' শিশির দুঃখের সঙ্গে জানায়।

'তা হলে এক কাজ করো। এগুলো আমার রুমালে বেঁধেছেঁদে আমার পকেটে ভরে দাও।'

গ্র্যান্ড মামার অনুজ্ঞায়, আর রিভলভারের অনুনয়ে, সেই গ্র্যান্ড রত্নগুলি শিশির রুমালের অন্তর্গত করে তাঁর পকেটস্থ করে দেয়।

'নাও, এইবার এই প্ল্যানটা নিতে পারো। নিয়ে যাও, খেলা করো গে। আমার আর এতে প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে তোমার মামাকেও এটা দিতে পারো—আমার সেই হতভাগা ভাগ্নেটাকে। তবু এখানা দেখলে খানিকটা শোক সামলাতে পারবে। অনেকে যেমন প্রিয়জন খোয়া গেলে তার ফোটো দেখে সুখী হয়।'

এই বলে গ্র্যান্ড মামা শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর আইচ, মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে মৃদুমন্থর গতি মিলিয়ে, একেবারে গদ্য কবিতার মতো মিলিয়ে দিয়ে, গদগদভাবে হেলতে দুলতে চলে যান।

চোদ্দো ঃ বিসর্গ থেকে অনুস্বর!

শিশির একছুটে সেই গুপ্তকক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে। মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পেছন থেকে ডাক ছাড়েন, 'কিরে পেলি কিছু?' কিন্তু শিশির আর ক্ষণমাত্র দাঁড়ায় না।

কাছেই একটা সাইকেলের দোকান সে দেখেছিল, সেখানে গিয়ে, পয়সা ফেলে, সাইকেল ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ ছুট লাগায়। তার অযথা কালক্ষেপ করার সময় নেই।

বক্কেশ্বর আইচের সেই আড্ডাখানার উদ্দেশে সে উধাও হয়। যেমন করেই হোক, গ্র্যান্ড মামার আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে নষ্টরত্নদের—না করে তার উদ্ধার নেই। বড় বড় মহাত্মারা যেমন পাপীতাপীদের সমুদ্ধার করে, সমুচিতভাবে উদ্ধৃত করে পরিশেষে নিজেরা ঊর্ধ্বলোকে যান, তেমনি ছোটখাটো একটা অবতার-স্বরূপ নিজেকে গণ্য করে শিশির। এবং এই নতুন অবতারণায় সে যখন সাইকেলে আর তার গ্র্যান্ড মামা পদব্রজে, তখন উদ্ধারের পথে পরিষ্কাররূপে সে যে অনেকখানি এগিয়েই রয়েছে, তার আর ভুল নেই।

মামার আড্ডাখানায় পৌঁছে, সাইকেলটাকে এককোণে লুক্কায়িত রেখে সে সেই উঁচু-করা বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গ্র্যান্ড মামাও সেখানে এসে হাজির! বক্কেশ্বরের সাড়া পেতেই তাঁর দলবলেরা হইহই করে এ-ঘর ও-ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। 'কী হল কর্তা? কদ্দুর এগুলো? উদ্ধার হল কাজ?' এই ধরনের প্রশ্নপত্র মুখে করে ঘেরাও হয়ে সবাই এগিয়ে আসে।

'এই রে! ব্যাটারা সব বখরা নিতে আসছে! কম্মের ঢেঁকি, কেবল বখরা নেবার ওস্তাদ! বিনে পয়সায় বাগিয়ে নেবার ফিকিরে আছেন! দাঁড়া, দিচ্ছি বখরা। ভালো করেই দিচ্ছি।'

এই বলে—নিজের কানে-কানে এই কথা না বলে—বক্কেশ্বর আইচ ঝটিতি তাঁর পকেট থেকে রত্নগর্ভ রুমালটা বের করে খাড়া-করা বাক্সগুলোর আড়ালে ফেলে দেন!

মেঘ না চাইতেই জল। শিশির ওরই নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, ওত পেতেই ছিল বটে সে,

কিন্তু এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না! গাছে না উঠতেই এককাঁদি, এইভাবে আপনা থেকেই, আকাশ ফুঁড়ে তার হাতে এসে পড়বে—কে ভাবতে পেরেছিল? যেমনি না রুমালের ঝুপ করে পড়া আর অমনি ওর নিঃশব্দে টুপ করে লুফে নেওয়া! ব্র্যাডম্যান বল হাঁকড়ালে কার্তিক বোস যেমন ক্যাচ ধরে থাকে ঠিক তেমনি!

দলবলরা এসে পড়তেই বক্কেশ্বর আইচ মুখ কাঁচুমাচু করে জানিয়ে দেন ঃ 'নাঃ, হল না, কিছুই হল না। ভাগনের খপ্পরে গিয়ে যখন পড়েছে তখন আর রক্ষে আছে—ভাগনেরা কি কম বিচ্ছু? এ তো আবার ভাগনের ভাগনে, একেবারে জলবিছুটি!'

'কী! প্ল্যানটা উদ্ধার করতে পারা গেল না?' দলবলরা বক্কেশ্বরের চেয়েও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে।

'আর প্ল্যান!—' বক্কেশ্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন ঃ 'প্ল্যানও উদ্ধার করেছিলাম, গুপ্তধনের কিনারা করতেও বাকি ছিল না, কিন্তু হলে কী হবে? ভাগনের ভাগনে যেখানে পিছু নিয়েছে—পিছনে লেগেছে যে-ক্ষেত্রে—সেখানে উদ্ধার করলেই বা কি! আবার তার হাতে চলে গেছে সেসব।'

'অ্যাঁ? উদ্ধার করার পর—আবার চলে গেল?' সকলে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে।

'গেলই তো! মিথ্যে বলছি না, আমার যথাসর্বস্ব সমস্তই আবার সেই মহাভাগনের হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কবলেই সব এখন।'

মিথ্যে বলতে গিয়ে কতবড় একটা মহাসত্য, নিজের অজ্ঞাতসারেই, গ্র্যান্ড মামা উচ্চারণ করেছেন, ভেবে শিশিরের হাসি পায়। রুমাল আর রুমালের ভেতরের মাল সে মুঠোর মধ্যে চাপে —আদর করে নিজের গালে বুলোয়—আর অতিবড় মিথ্যাবাদীরাও কেমন করে সময়ে-সময়ে সত্য কথার ফাঁপরে পড়ে যায় ভেবে মনে-মনে বিস্মিত হতে থাকে।

দলবলরা সমবেত হয়ে হায়-হায় করে। হা-হুতাশ শেষ করে অতঃপর কিংকর্তব্য জানবার লালসা জানায়।

'কী আর করা? এবার চাটিবাটি গুটোতে হবে এখান থেকে। থানায় আমার ফোটো লটকানো আছে সেই বদ ছেলেটা তা জানে। এবার আলবত সে গিয়ে বলে দেবে। পুলিশে খবর পাবার আগেই এখান থেকে সরে পড়া, এই এখন আমাদের কাজ।'

'গুপ্তরত্ন উদ্ধার না করেই সরে পড়ব?' ওদের ভেতরে একজন বলে ওঠে।

'আমরাই বা এক্কেকটা কী এমন কম রত্ন? আগে নিজেদের তো গুপ্ত রাখি। নিজেরা উদ্ধার পেলে, প্রাণে বাঁচলে, অনেক গুপ্তরত্ন উদ্ধারের সুযোগ জীবনে আসবে।'

এ-কথার পরে আর কথা নেই—সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। ঠিক হয়, বক্কেশ্বর আইচ সিঙ্গাপুরের দিকে পাড়ি দেবেন, আর দলবল সব রেঙ্গুন হয়ে অ্যাকীয়াবের দিকে রওনা হবে। পুলিশের সন্দেহ এড়ানোর জন্যই এই—কর্তা একদিকে কর্মরা অন্যমুখো উধাও হবার ব্যবস্থা, আপাতত কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে অচিরে, পরে আবার মান্দালয়ে গিয়ে নতুন ক্রিয়ায় সম্মিলিত হলেই হবে। মৌলমীনের বন্দর থেকে পরশুদিন দু-ধারের জাহাজই ছাড়ছে—তাতেই টিকিট কাটবার জন্য দলবলকে তিনি তক্ষুনি বেরিয়ে পড়বার হুকুম দিলেন।

দলবলরা কেটে পড়তেই, বক্কেশ্বর আইচ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগ্রেট ধরালেন ঃ 'উঃ, এতক্ষণে একটু দম দিতে পারা গেল! বাপ!'

শিশির যে-মুহূর্তে, প্যাকিং বাক্সের আবডালে আনন্দে বে-দম, প্রায় তার কানের গোড়াতেই যেন তখন আওয়াজটা এসে লাগে—কে যেন ছুঁড়ে দেয় পিছন থেকে—।

'কই হে! দাও তো দেখি এবার!'

কে বলছে? কী বলছে? কাকে বলছে? শিশিরের চমক লাগে। এ তো তার গ্র্যান্ড মামার পেটেন্ট গলা—কিন্তু তার কানের গোড়ায় কেন?

'কী! "ফল ধরো রে লক্ষ্মণ" করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? হাতের সুখ তো যথেষ্ট

হল, এখন দাও ওগুলো।'

আঁ্যা! তাকেই ডেকে বলা হচ্ছে যেন না? শিশিরের কেমন একটু সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যে ওখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে এ.তো গ্র্যান্ড মামার জানার কথা নয়! কানের ভ্রম না কি তা হলে?

সন্দেহ দূর হতে দেরি হয় না। ঠক করে পিস্তলের বাঁটটা তার মাথায় এসে ঠোক্কর লাগায়!

'ইস! তুমি তো বড় বেকুব দেখছি হে! ভারি বোকা তো!' কাষ্ঠ-ঘোমটা ফাঁক করে গ্র্যান্ড মামা ওর মুখদর্শন করেন।

শিশির শুধু বলে ঃ 'ইস!'

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাল মায় রুমাল সমেত গ্র্যান্ড মামার হাতে তুলে দেয়—নিজের অস্থাবর যা-কিছু অপরের হস্তান্তর করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে সম্পত্তিহারা শিশির, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচে।

পনেরো ঃ গ্র্যান্ড মামার গ্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি

'তোমার আগমন বার্তা কী করে টের পেলুম ভেবে তোমার তাক লাগছে। তাই না? ঠিক নিউটনের নিয়মে—মাধ্যাকর্ষণের জোরেই জানতে পারলুম। রুমালটা বাক্সগুলোর ওধারে চালান করার সময়েই সব জানতে পারলুম। মালগুলোর নিঃশব্দ চালচলনেই সমস্ত পরিষ্কার হয়েছে। ওদের নিঃশব্দে গিয়ে পড়বার কথা তো নয়। মাধ্যাকর্ষণের জোরে মাটিতে গিয়ে পড়বে আর সশব্দে গিয়ে পড়বে। তাল পড়ে টিপ করে জানো তো? টিপ করে তাল পড়ে তাও বলা যায়। কিন্তু পড়ে আর আওয়াজ ছাড়ে নিউটনের নিয়মেই। কিন্তু আমার তাল টিপ না করতেই, কে যে ওখানে কোন তালে রয়েছে, বুঝতে আমার দেরি হয়নি। জিনিসটা যেন আশ্চর্যভাবে আলগোছে থেকে গেল ত্রিশঙ্কুর মতো ত্রিশূন্যে—ভারি জিনিসের এরকম ভুতুড়ে ব্যাভার ভালো নয় তো! তারপর এ-ধারে ও-ধারে তাকাতেই গাছের আড়ালে সাইকেলটা নজরে পড়ল! ব্যস—তোমার কায়দা-কানুন জানতে আর বাকি রইল না! কেমন, এখন তো বুঝতে পারছ?'

বুঝতে শিশির অনেকক্ষণই পেরেছে, অনেক আগেই—মাথায় পিস্তলের ঠোক্কর খাবার সাথে-সাথেই তার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছল—তবে যেটুকু বুঝতে তবুও ওর বাকি ছিল এতক্ষণে বিশদ হল। মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে হাঁ করে ও বক্কেশ্বরের বকুনি হজম করে।

'এখন তুমি বন্দি আমার। বুঝেচ তো! সুড়সুড় করে লক্ষ্মীছেলের মতো আসবে—না, না? নইলে—নইলে দেখচ তো! পিস্তলের এই বাঁট দেখেচ? তোমার মাথায় এটা ভাঙতে হলে বিস্তর ক্ষতি হবে আমার। ও-পিস্তল তো আর এখানে সারানো যাবে না।'

ক্ষতির কথা আর বেশি করে খতিয়ে দেখাতে হয় না। বলতে না-বলতেই শিশির বক্কেশ্বরের পিছনে-পিছনে যায়। ছায়ার মতো অনুসরণ করে দোতলায় গিয়ে ওঠে।

'এই ঘরে তুমি বন্দি, বুঝেছ ভায়া?' বক্কেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন ঃ 'বন্দীশালার পক্ষে ঘরখানি তেমন খারাপ নয়। দেখে-শুনে কীরকম বুঝছ?'

শিশির ঘুরে-ফিরে ঘরখানাকে লক্ষ করে।

'তাকিয়ে দেখচ কী? তেমন অসুবিধাজনক ঘর নয়। পালাবার পক্ষে প্রশস্তই। চম্পট দেবার সুবিধা করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

গ্র্যান্ড মামা ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেচেন। তাঁর কথার ধাঁচে সেই কথার আঁচ পেয়ে শিশির লজ্জিত হয়ে পড়ে।

'পালানো আর এমন কঠিন কী? এই জানলায় শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধবে—বেঁধে লটকে পড়বে, ব্যস! তা বলে ভুল করে নিজের গলায় যেন বেঁধে বসো না—তাই বেঁধে লট্‌কো না যেন, সেটা কিন্তু ভারি খারাপ হবে আগেই বলে রাখচি।'

'সেই খারাপ একদিন তোমার বরাতে আছে।' শিশির রাগ করে বলে—মনে-মনেই বলে দেয় ঃ 'নির্ঘাত ফাঁসি রয়েছে তোমার অদৃষ্টে।'

'ওঃ, তাই তো! দড়ি কই? দড়ি তো নেই এ-ঘরে। দড়ি একটা চাই যে!'

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ তাকে দাঁড় করিয়ে দড়ির খোঁজে অন্য ঘরে যান। খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসতে একটু তাঁর দেরিই হয়।

'এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করোনি যে তাই ভালো! খোলা দরজা দিয়ে সোজা পিট্‌টান দেওয়া একদম বন্দিদশার দস্তুর নয়। যা দস্তুর—যেভাবে পালানো নিয়ম—যাদৃশ পলায়ন বন্দিদের পক্ষে গৌরবজনক তার পরাকাষ্ঠা হচ্চে এই।' এই বলে সপাং করে দড়াগাছটা শিশিরের ওপরে উনি ফেলে দেন।

'কী করে আমি পালাব সে তোমায় বলতে হবে না।' এতক্ষণে শিশির একটা জবাব দেয়। 'আর কষ্ট করে বলে দিতে হবে না তোমায়।'

'না, না, আমি কেন বলব! আমি বলবার কে? এসব তো পুঁথিপত্রে বিস্তারিত করে সব বলাই আছে। নেই বলা?'

'আছে কি না-আছে আমি বুঝব।'

'দড়িটা শক্ত করে জানলার গোড়ায় বেঁধে দিয়ে যাই। কী জানি বাঁধনের দোষে, যদি দড়ি সমেত ঝুলতে গিয়ে খুলে পড়ে হাত-পা ভেঙে ফেল! হাত-পা ভাঙলেই তো হয়েছে! একটা পিস্তল সারানোই আমার পক্ষে কঠিন, তার ওপর তোমাকে সারাতে হলেই গেছি!'

জানলার পাল্লায় তিনি দড়িটা মজবুত করে বেঁধে দেন।

'এইবার সবকাজই সহজ হয়ে রইল। এগিয়ে রইল অনেক। এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, আমি চলে গেলে—আমার সামনে সটকানো ঠিক উচিত হবে না—সুরুচিসঙ্গত হবে না—ঠিক আমার তিরোধানের পরে, ধীরেসুস্থে, ওই জানলা ধরে দড়ি বেয়ে সুড়ুৎ করে নিচে নেমে যাওয়া। আর নিচে পৌঁছতে পারলেই তো ফতে! পৌঁছলে কি পালালে! কিন্তু সাবধান, আগাগোড়া আমার নজর বাঁচিয়ে—এই চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না—তক্ষুনি গুলি ছুঁড়ব। নিয়ম তো সব মানতে হবে। মেনে চলতে হবে আইন-কানুন। যে-বিয়ের যে-মন্ত্র—শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে।'

'কী করে পালাতে হয় আমি জানি।' এককথায় শিশির জানিয়ে দেয়।

'জানবে বইকী! কার ভাগনের ভাগনে, সেটা তো বুঝতে হবে। সত্যিই যদি বেমালুম পালাতে পারো তা হলে সেটা খুব সুখের কথাই! তা হলে তেমন বাহাদুর ছেলেকে এক-আধটা দামি রত্ন উপঢৌকন দিতে আমার দ্বিধা নেই। এই দ্যাখো, এই দুটো রত্ন-ডিম্ব এখানে রইল, সযত্নে রেখে দিয়ে গেলুম। একটা তোমার, আর-একটা তোমার বোনের—পালিয়ে যাওয়ার সময় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।'

'আমার মামার জন্যেও একটা দাও।' শিশির আবেদন করে।

'সেই আদেখলা ভাগনেটার জন্যে? অপদার্থটাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে না। তবে তুমি বলছ, তার জন্যেও একটা থাকল। তিন-তিনটে গেল, যাক, দশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

'একেশ্বর হয়েই আমরা খুশি।' শিশির হাসিমুখে জানায়।

'বেশ, ভালো কথাই। এইবার আমি বাইরে থেকে দরজায় তালাচাবি মেরে চলে যাই—আহারাদি করি গে। বাজারে গিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে—অনেক কাজ—পরশুই এখান থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করচি তো! হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি বলতে—' যেতে-যেতে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন

ফিরে তিনি বলে যান ঃ 'আসল কথাই বলতে ভুলেছি।'

'কিচ্ছু বলার দরকার নেই। সব আমি জানি।' শিশির নিজের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গ্র্যান্ড মামার অধিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না।

'সেই ডালকুত্তাগুলোর কথা মনে আছে কি? তোমাদের যারা কালকে তাড়া করে গেছল? বেচারাদের বেজায় শাস্তি হয়েচে। তাড়া করবার জন্য নয়। তাড়া করে তোমাদের ধরে আনতে পারেনি সেই কারণেই কাল থেকে ওদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে আছে।'

'উচিত শাস্তি দিয়েছেন।' শিশির অতিশয় উল্লসিত হয়।

'হ্যাঁ, আর তারা রয়েচে এই জানলার নিচেটাতেই—ঠিক যেখানে এই দড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে। কাল থেকে কিচ্ছুটি খায়নি বেচারীরা। যদিও নিতান্ত অনাহারী কাজ, তবু তোমাকে যদি ব্রেকফাস্ট করতে পায়—যদি তুমি করতে দাও—না কি, তোমার তাতে খুব আপত্তি আছে? তোমার টেস্ট তেমন সুবিধের হবে না তুমি বলতে চাচ্ছ?'

ষোলো ঃ শিশির সাহায্যে শিশিরের উদ্ধার

শিশির রুদ্ধঘরে খানিকক্ষণ ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে। ক্ষোভ হওয়ারই কথা। নষ্টরত্ন স্বহস্তে লাভ করে, অভাবিত পুনরুদ্ধারের পর, আবার যদি তা সেই হাত থেকেই লোপ পায়—হাতে-হাতেই লোপাট হয় তা হলে কার না ক্ষোভ হবে? এবং কেবল খোয়া যাওয়াই নয়, তারপরে এই সব খোয়ার! শিশির অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে জানলার বাইরে গিয়ে মুখ বাড়ায়। এদিকে-ওদিকে উঁকিঝুঁকি মারে, কই একজন কুকুরেরও তো লেজ দেখা যাচ্ছে না! গ্র্যান্ড মামার স্রেফ ধাপ্পা নয় তো? হ্যাঁ, খেতে না পেলে ওরা বসে থাকবার পাত্র নাকি! খাবারের সন্ধানে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে গেছে।

এহেন সুবর্ণ-সুযোগ—পরিত্রাণের এই অর্ধোদয়যোগ উপেক্ষা করবার নয়! শিশির সেই ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলন-যাত্রা করে বেরিয়ে পড়তে চায়। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না। গ্র্যান্ড মামার দেওয়া দুর্লভ ডিম তিনটে, শার্টের তিন পকেটে না পুরে, দড়ি বেয়ে ধীরে-ধীরে নামতে থাকে।

প্রায় ধরাতলে গিয়ে পৌঁছয় আর কী, অবতীর্ণ হয়-হয়, এমনসময়ে কোত্থেকে গন্ধ পেয়ে ডালকুত্তার দল হইহই করে ছুটে আসে।

'ওই রে! ওই-ওই!' তাদের ঘেউ-ঘেউ-এর মধ্যে ওই একটি কথাই শোনা যায়। একবাক্যে ওরা অভ্যর্থনা করে।

শিশির আর মাটিতে পা দেয় না, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যমার্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে, তরতর করে দড়ি ধরে আবার সে রুদ্ধঘরে এসে ওঠে। বাব্বা, কক্ষ্যচ্যুত হওয়া কি সোজা? কেন যে চন্দ্র-সূর্যরা কক্ষভ্রষ্ট হতে চায় না এক্ষণে বোঝা গেল! আর একটু হলেই হয়েছিল আর কী।

শিশির ভাবল, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিলির উদ্দেশে একখানা চিঠি লেখে। লিলি সেই চিঠি পেয়ে, পত্রপাঠ, যে করেই হোক, তাকে এসে উদ্ধার করবে।

পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার করে চিঠি লিখতে বসল শিশির। একটুও না ভাবতেই, সাঙ্কেতিক একটা ভাষাও আবিষ্কার করা তার পক্ষে কঠিন হল না—।

AE CTT AE TKNR MAK DB—

পত্রবাহক, সে যে-মিঞাই হোক, তার নির্দেশের জন্যে এইটুকু মাত্র লিখে—লিলিকে সে লিখল ঃ

AKNA SA J KEY BPD—HAVE READ—AME KEY
R BALL BOW—COST-A TK AC—AKN SO—SA—

দরজার ও-ধারে কী যেন খুট করল। শিশির কান খাড়া করল—সে নিজে উৎকর্ণ হল বটে কিন্তু তার লেখনী থামল না—।

OK—KLO—OKLO—ODK—?

এতখানি লিখে শিশির পড়বার চেষ্টা করে। এ কীরকম সাঙ্কেতিক ভাষা—এ যে একেবারে জলের মতো গড়গড় করে পড়া যাচ্ছে; বুঝতেও একটু দেরি লাগে না। কিন্তু—কিন্তু লিলি বুঝতে পারলে হয়! তাকে আবার বোঝাবার জন্যে শিশিরকে গিয়ে না পড়ে দিতে হয়।

শিশির আদ্যোপান্ত পড়ল ঃ

এই চিঠিটি এই ঠিকানার মেয়েকে দিবি—

এখানে এসে যে কী বিপদে—পড়েছি—আমি কী আর বলব—কষ্টে টিকে আছি—এখানে এস—এসে—ও কে? কে এল?—ও কে এল ওদিকে?

এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে ঃ এরপরে, তার মনে তখন থেকে যেসব ভাবের উদয় হচ্ছে, সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্যে তার আবেগ প্রকাশ করতে হলে রীতিমতো বেগ পেতে হয়। পেনসিল থামিয়ে গালে হাত দিয়ে মাথা ঘামাচ্চে শিশির।

মাথা ঘামাতে-ঘামাতে তার মনে হল—ঘর্মবিন্দুর মতোই ভাবনাটা ফুটে উঠল—ভাষায় এলেই বা কী? না-হয় ভাষায় কুলিয়েই ওঠা গেল, কিন্তু সেই চিঠি—তার সেই সঙ্কেতধ্বনি—লিলির উপকূলে পৌঁছে দিচ্চে কে? আশেপাশে বাধিত করা তেমন বাধ্য গোছের লোক কই? থাকবার মধ্যে তো কতিপয় কুকুর—কুকুরের লেজে বেঁধে খবর পাঠানো চলে, এই ধরনের একটা কাহিনী পূর্বে তার কানে গেলেও এসব কুকুরের সম্বন্ধে সে-কথা ভাবতেই পারা যায় না। না, লেজ এদের থাকলেও, এরা সে-কুকুর নয়!

অগত্যা, চিঠি-লেখা ফেলে, পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে, অন্য পথে মুক্তির উপায় সে খুঁজতে লাগল!

আঁতিপাঁতি করে চারিধারে তাকিয়ে, ঘরের এককোণে, ছোট্ট এক কুলুঙ্গিতে হিমানীর শিশির মতো কী একটা তার চোখে পড়ল। হাতিয়ে নিয়ে দেখে—হিমানীর শিশিই বটে, কিন্তু হিমানী নেই—থাকলেও এ-সময়ে নিজের মুখে চুনকাম করার তার উৎসাহ হত কি না সন্দেহ। বরং তার গর্ভে যে-বস্তুটি দেখা গেল তার বর্ণ-পরিচয়ে যে-কথা বলে তস্য গন্ধ-বিবরণীতেও ঠিক সেই কথাটিরই—হ্যাঁ—হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—সাক্ষ্য দেয়। তার নাক আর শিশির মুখে এক বিজ্ঞাপন—নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়!

গ্র্যান্ড মামার সবই গ্র্যান্ড! যেমন পেল্লায় শরীর—তেমনি পেরকাণ্ড নাক—আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেমনি একখানা নস্যির ডিবে। তিনজনাই যার-পর-নাই—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো—নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে হাত-পা নেড়ে মাথা ঝেড়ে—হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁচচো!

হাঁচতে-হাঁচতে, মাথা পরিষ্কার হয়ে, তার বুদ্ধি খুলে যায়! এই তো! স্বহস্তেই তো! নিজের সমুদ্ধারের যৎপরোনাস্তি সরল পথ। এই হিমানী মার্কা বৃহৎ ডিবিয়ার ভেতরেই তো সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে তার মুক্তির উপায়! এতক্ষণ কি সে-কথা তার নাকের মধ্যে সেঁধোয়নি...?

পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার করে মুখ মুছে তাতে বেশ ভালো করে এ-পিঠে ও-পিঠে নস্যি মাখিয়ে জানলা গলিয়ে ডালকুত্তাদের সম্মুখে ফেলে দিল শিশির। একে এই ডালকুত্তারা গন্ধর্বশ্রেণীর, তার ওপরে গতকাল থেকে বুভুক্ষু—রুমাল-পতনের সাথে-সাথেই ওদের একজন এসে শুঁকে দেখেছে। আর—আর যেই না শোঁকা—অমনি—অমনি না—যা-একখানা জিনিস হল তাকে অকথ্য না বলে উপায় নেই। কুকুরের হাঁচি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার বর্ণনার ভাষা নেই!

দেখতে না-দেখতে প্রত্যেকেই সেই রুমালটা এসে শুঁকেচে—।

আর তার ফলে যে অনির্বচনীয় দৃশ্য—অশ্রুতপূর্ব কোরাস—পরমাশ্চর্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তা আর কহতব্য নয়।

নস্যি-বোঝাই সেই রামডিবে পকেটফাই করে শিশির তরতর বেগে দড়ি বেয়ে নেমে যায় এবার!

সেই অধঃপতিত রুমালটি হস্তগত করে—বিদায়চ্ছলে সেই ডালকুত্তাদের মুখের ওপর সেটি নাড়তে-নাড়তে—যদি বা তাদের কেউ ওইরকম ব্যতিব্যস্ত অবস্থাতেই মরিয়া হয়ে তাড়া করে আসে তা হলে তক্ষুনি তার মুখের ওপর সঙ্গে-সঙ্গে নেড়ে দেবে তার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুত হয়েই—সেই সমবেত ঐকতান ভেদ করে শিশির সীমান্তপ্রদেশ পার হয়।

কিন্তু না, কুকুররা তাড়া করে না, নিজেদের অন্তর্গত তাড়নাতেই তারা অস্থির হয়ে আছে—ভেতরের আবেগে এত কাবু যে তাদের বুলি পর্যন্ত বেরোয় না।

তাদের হাঁচাহাঁচি-নাচানাচির ভেতর দিয়ে সহাস্যবদনে শিশির বেরিয়ে যায়।

সতেরো : 'একজনকে রোস্ট করব একজনকে টোস্ট করব'

সেখান থেকে শিশির একছুটে একেবারে মাতুল সমীপে।

'এই নাও মামা, তোমার হারানো ধন! গ্র্যান্ড মামার কবল থেকে আমি উদ্ধার করে এনেছি—সাত রাজার ঐশ্বর্য এক মাণিক!'

এই বলে একটা ডিম্বাকৃতি রত্ন মামার কোলের ওপরে ফেলে দেয়।

মামা বিস্ময়বিহ্বল হয়ে রত্নটিকে—দুটি রত্নকেই একদৃষ্টে দেখেন! শিশির আর শিশিরের ডিম।

'অ্যাঁ, আনলি? আনতে পারলি তুই!' তাঁর বাক্‌স্ফূর্তি হলে বেরোয় : 'ধন্যি ছেলে তুই, সত্যি!'

'এখন নগদ কিছু টাকা দাও তো আমায়! সাইকেলওলাকে মিটিয়ে দিয়ে আসি। তার ভাড়া করা সাইকেলটা গ্র্যান্ড মামার আস্তানায় খুইয়ে এসেছি।'

মামা সে-কথায় কান দেন না—তাঁর কানেই যায় না সে-কথা। তিনি সেই অপূর্ব ঐশ্বর্যটিকে, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে, লক্ষ করেন—আর তাঁর পর্যবেক্ষণের ফাঁকে-ফাঁকে শিশিরকে চকিতের জন্যে নিরীক্ষণ করে নেন।

'সাইকেলওলাটাকে ঠিকানা দিয়ে দাও না! সে-ই লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে আনবে।' লিলি পরামর্শ দেয়। 'তোমার নিজের যেতে চক্ষুলজ্জা হয় আমিই না-হয় একটা পোস্টকার্ড লিখে ফেলে দিচ্ছি। গ্র্যান্ড মামার বাড়ির ছক কেটে পথ বাতলে দিলেই হবে।'

'তাই দে তো ভাই!' শিশিরের ঘাড় থেকে যেন সাইকেলের পাহাড় নেমে যায়। সে আরামের নিশ্বাস ছাড়ে : 'তোর বুদ্ধি খুব! সত্যি লিলি!'

দাদার কাছে, বিশেষত বিশল্যকরণী উদ্ধার-করে-আনা এরকম বীরোচিত দাদার কাছ থেকে এহেন সার্টিফিকেট লাভ করে একগাল হেসে লিলি তক্ষুনি-তক্ষুনি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ছেড়ে দিয়ে আসতে যায়।

মামা স্থাবর রত্নটিকে ট্যাঁকস্থ করে হনহন করে দরদালানে পায়চারি করতে থাকেন—আর এককোণে দাঁড় করানো শিশিরের দিকে—তাঁর অস্থাবর রত্নটির দিকে মাঝে-মাঝে ফিরে তাকান। যে রকম লোলুপ নেত্রে দৃকপাত করেন তাতে মনে হয়, সম্ভব হলে সমাদরের আতিশয্যে তাকেও ট্যাঁকস্থ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অতবড় ধাড়ি ছেলেকে ট্যাঁকে আনা দূরে থাক—কায়দা করে কোলে করাই কঠিন!

তিনি হনহন করে ঘুরপাক খান—আর ঝনঝন করে নতুন টাকার মতো কথার টুকরো তাঁর মুখ থেকে খসে পড়ে ঃ 'উঃ! এই মাণিকটা! কত দাম এর কে জানে! হয়তো বারো লাখ — কিংবা সাত লাখ সাতাত্তর হাজারই হবে হয়তো। এক ক্রোড় হলেই বা কে কী বলছে! এই দিয়ে বোধহয় একটা জমিদারি কেনা যায়। কিন্তু—কিন্তু—যদি এর দাম দশ-বিশ ক্রোড় হয়ে পড়ে—তা হলে—?'

এই সদ্যোজাত সমস্যা নিয়ে শিশিরের মুখোমুখি এসে তিনি দাঁড়ান ঃ 'তা হলে? তা হলে কী?'

প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত হয়ে শিশির উত্তর দেবার চেষ্টা করে ঃ 'তা হলে? তা হলে গোটা আসামটাকেই আমরা কিনে নেব। মায় ধুবড়ি—গোয়ালপাড়া—গৌহাটি—শিলং—শিলেট—শিলচর—লামডিং—নওগাঁ—শিলঘাট—জোড়হাট—শিবসাগর—তেজপুর—তিনসুকিয়া—ডিগবয়—সব সমেত।'

'সারা আসামটাকেই এই ট্যাঁকে?' প্রস্তাবটা যেন ব্রজেশ্বরকে ধাক্কা মারে—এতদূর—এতখানি তিনি ভেবে দেখেননি। কিন্তু ভেবে দেখে—আসামের মানচিত্র ভেবে-ভেবে আর দেখে-দেখে—প্রস্তাবটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরের কথাটা তাঁর মনঃপূত হয়—তিনি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ঃ 'গোটা আসামটাই এই ট্যাঁকের আসামী? তা—তা মন্দ কী?'

'মন্দ কী?' শিশিরেরও কথাটা খুব মন্দ লাগে না।

পুলকের আধিক্যে ব্রজেশ্বর শিশিরকে দু-হাতে উঁচু করে তুলে ধরেন ঃ 'ভ্যালা মোর ভাগনে!' তুলে ধরে গদগদ দৃষ্টিতে তাকান ঃ 'এমন চমৎকার ভাগনে প্রায় দেখা যায় না!'

বাহুগ্রস্ত শিশির লজ্জায় আর আনন্দে বিগলিত হয়ে ছটফট করে—মামার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাটিতে পা দিতে পারলেই বাঁচে।

মামা কিন্তু সহজে ছাড়েন না—ভাগনে আর ভাগনের প্রতি স্নেহ—দুই-ই তখন তাঁর মাথায় উঠেছে। শিশিরের এহেন মাতুল-ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রতিদান দেওয়ার তাঁর বাসনা হয়।

'নাঃ, সামান্য মৌখিক আদরে এই উপকারের ঋণ শোধ হবার নয়। এর সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে। ভাগনেরা যে মামাকে ভালোবাসতে পারে—এতদূর ভালোবাসতে পারে আমি তা জানতুম না!' ব্রজেশ্বরের চোখের কোণে শিশিরবিন্দুরা দেখা দেয়।

শিশিরের জামার হাতায় চোখ মুছে তিনি বলেন ঃ 'আয়! আমার সঙ্গে আয়। লিলি? লিলিটা গেল কোথায়? সেও আসুক।'

লিলি ততক্ষণে তার বক্তব্য ডাকবাক্সে পরিত্যাগ করে ফিরেছে, মামার হাঁকে তক্ষুনি এসে হাজির হয়।

'লিলিও আমার খুব চমৎকার মেয়ে!' মামার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বেয়ে স্নেহের ঝরনা নেমে আসে। দুজনকে সমাদর করে নিজের ঘরে তিনি নিয়ে যান।

'বোস, এই খাটের ওপরে বোস তোরা। ততক্ষণ বোস।'

তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে যান—তারপরে কী মনে করে ফের ফিরে এসে—ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে দ্যান।

'বেশি দেরি হবে না, আমি এই এলুম বলে।' এই বলে বোধহয় সান্ত্বনা-দানের ছলেই বাহির থেকে পুনরায় বলেন ঃ 'ভয় খাস নে! ভয়ের কী আছে? তোদের একজনকে রোস্ট করব—আরেকজনকে—।'

আরেকজনকে কী করা যায়, কীভাবে আপ্যায়িত করা যায়—কোন সুখাদ্যে পরিণত করতে পারলে বেশি সুস্বাদু হয়—একটু ভেবে ঠোঁট চেটে নিয়ে তিনি জানান ঃ 'আরেকজনকে টোস্ট করা যাক? কেমন, টোস্টই তো ভালো—তাই না?'

আঠারো ঃ 'মামা, তোমার মনে এই ছিল?'

মামার বাণী শুনে শিশিরের সারা গা শিরশির করে ওঠে।

'আমাদের জন্যে রোস্ট আর টোস্ট আনতে গেল মামা, তাই না?' জিগ্যেস করে লিলি—'আমার ভাগে যদি টোস্ট পড়ে দাদা, তা হলে কিন্তু ভাল হবে না। রোস্ট আর টোস্ট আমরা দুজনে ভাগাভাগি করে খাব, কেমন?'

লিলির নিমন্ত্রণে শিশিরের উৎসাহ দেখা যায় না—সে শুধু বলে ঃ 'আমাদের আর খেতে হবে না। মামাই সারবে।'

'মামা একাই সমস্তটা খাবে? সবখানি রোস্ট আর—?'

পুনশ্চ যোগ করে সংক্ষেপেই শিশির জানায় ঃ 'উঁহু; মামাই খাবে আমাদের।'

'আমাদের খাবে—আমাদের? অ্যাঁ?' বিষয়টা ভালো করে বোধগম্য হওয়ার সাথেই লিলি ককিয়ে ওঠে।

'তা হলে শুনলি কী তবে? তারই বন্দোবস্ত করতে গেল, বলে গেল কী? দরজায় শেকল এঁটে গেছে দেখছিস নে?'

তাই তো—তাই-ই তো! মামার বিবৃতির সঙ্গে কার্যকলাপ জড়িয়ে দেখলে তাই মনে হয়! আর সেইসঙ্গে মামার প্রাচীন ইতিহাস—মামার পূর্ব-জীবনের ভ্রমণবৃত্তান্ত—সেই অখাদ্য নরখাদককে খাদ্য করার লালায়িত কাহিনী স্মরণ করে মিলিয়ে নিলে এ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

গ্র্যান্ড মামাকে পারা গেছল—মামার মামাকে হয়তো পারা যায়—সে তো আর সাক্ষাৎ মামা নয়—কিন্তু এই নিজের মামার স্নেহের ক্ষুধা থেকে নিজেদের বাঁচানো কী করে সম্ভব শিশির ভাববার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে! লিলি তো খাটে লম্বা হয়ে পড়েছে। ভয়ে হাতে-পায়ে খিল লেগে গেছে তার—মুখে কথা নেই।

'ভয় কী, আমি ঠিক উদ্ধার করব।' মনে-মনে দমে গেলেও লিলিকে সে দম দেয়—তার প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করে ঃ 'আমার একার হলে কথা ছিল না! আমি না-হয় মামার পেটে চলে যেতে পারতুম—হাসতে- হাসতেই চলে যেতুম! লোকে পরের জন্যে প্রাণ দেয়—মামা তো আর কিছু পর নয়। বৃষকেতু কার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল? নিজের অস্থি-মজ্জা-মাংস দিয়ে অতিথিসৎকার করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি—দাতাকর্ণের গল্প পড়েছিস তো? বৃষকেতু কি আস্ত একটা বৃষ ছিল—গোরু ছিল একটা? আদৌ না। ঠিক কাজই করেছিল সে।'

'দাতাকর্ণ পড়েছি।' লিলি ঘাড় নেড়ে জানায়।

'হ্যাঁ কর্ণের মতো দাতা নেই। আগে পরের কথায় কান দিলেই, তারপরে আর না-দিয়ে পার নেই! শেষে নির্ঘাত প্রাণ দিতে হয়। এইজন্যেই পরের কথায় কর্ণদান করা নিষেধ। মামার কথা শুনে এ-ঘরে না এলে তো আমাদের এই ফাঁদে পড়তে হত না! কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—সে-কথা যাক। আমি তো একা নই—একা হলে মরতে আমার বাধা ছিল না, তুই আছিস যে! যে করেই হোক, ছোট বোনকে আমার বাঁচাতে হবে।'

দাদার আশ্বাসে, ভয়ানক ভরসা পেয়ে, লিলি এতক্ষণে উঠে বসে। ওই ছোট্ট দাদাটির ওপর তার অগাধ আস্থা। 'কী করবে ভেবেচ?' সাগ্রহে সে জানতে চায়।

'দেখি কী করা যায়। মামাকে বলে-কয়ে দেখি—তোকে ছেড়ে দেয় যদি। আমারই আধখানা রোস্ট আর আধখানা টোস্ট করে—আমার ওপর দিয়ে চুকে যায় যদি!'

'না—না—না!' লিলি বলে ওঠে ঃ 'তা হয় না।'

'কেন হয় না, শুনি? একটা মামা, একলা মামা—কত খাবে?'

'উঁহু, তা হলে আমি বাদ যেতে রাজি নই।' লিলি ঘোরতর আপত্তি জানায়—শিশির যদি

না বাঁচে তা হলে সেও সহমরণে যাবে। মামার উদর-পথে সেও তবে দাদার সহযাত্রী।

'আমি তোকে এই দুটো দিয়ে দেব।' শিশির লিলিকে ডিম দুটো দেখায়—'এর একটা তোর, একটা আমার—গ্র্যান্ড মামা দিয়েছে। আমারটাও তোকে দিয়ে দেব। তুই দেশে গিয়ে এই বেচে খুব বড়লোক হতে পারবি, কত যে চকোলেট কিনতে পারবি তার ইয়ত্তা নেই। আর ঘরভর্তি চীনেবাদাম!'' শিশির লিলিকে লোভ দেখায়।

'না না—সে হয় না।' লিলি তথাপি ঘাড় নাড়ে।

'তা হলে তো ভারি মুশকিল হল! দুজনকেই দেখচি উদ্ধার করতে হবে আমায়। ভারি শক্ত কিন্তু।'

শক্ত তো বটেই—শিশির ঘাড় হেঁট করে ভাবে। একজনকে বাদ দেয়ানো যেত—কিন্তু দুজনকে বরবাদ করতে মামাকে রাজি করানো যাবে কি না সন্দেহ।

লিলির সহসা কৌতূহল হয় ঃ 'মামা হঠাৎ আমাদের খেতে চাইছে কেন? আমরা কী করেছি?'

'বাঃ, মামার ধনরত্ন উদ্ধার করে এনে দিলুম যে!'

'সে তো ভালোই করলুম মামার।'

'ভালোই তো! মামাও তো সেটা ভালোভাবেই নিয়েছে। আর তাতেই আমাদের হল কাল! মামা আমাকে ভালোবেসে ফেলল যে! আমার খাতিরে তোকেও আবার ভালোবাসল কিনা!'

লিলি শিউরে ওঠে—স্টেশন থেকে তাদের নিয়ে আসার সময়ে মামার গল্প তার মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের অভিধানে—সেই নরখাদক গলাধঃকরণের পর—সেই বনভোজনের পর থেকে—ভালোবাসার একটি মাত্র অর্থ! যাকে ভালোবাস তাকে ভালো জায়গায় বাসা দাও! আর হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে উদরের মতো এত উপাদেয় স্থল আর কোথায়?

ঘি গলবার কলকলধ্বনি ওদের কানে আসে। খড়খড়ি ফাঁক করে সন্তর্পণে ওরা দেখে, এরমধ্যেই মামা ইটের পাঁজা সাজিয়ে, দরজার অদূরেই প্রকাণ্ড একটা উনুন খাড়া করেছে। আর সেই উনুনের মাথায় পেল্লায় এক কড়াই—! এইমাত্র তলাকার শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হল—এ-ধারেও দাউদাউ করে উঠেছে আর ও-ধারেও কড়াইয়ের ওপরে ঘি কলকল করতে লেগে গেছে।

উনুনের একপাশে স্তূপীকৃত কাঠ—আর তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা ফাঁক! এরমধ্যেই মামা ইটে আর কাঠে, আর ঘৃতাহুতিতে তাঁর দক্ষযজ্ঞ অনেকখানি এগিয়ে এনেচেন!

ঘিয়ের কলকলধ্বনি শুনে আর জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে শিশিরদের চোখ তো ছানাবড়া!

'হায় মামা, তোমার মনে শেষে এই ছিল,' দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে-সাথে লিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে ঃ 'তুমি যে আমাদের হাড়-মাস ভাজা-ভাজা করবে, তা ভাবতেও পারিনি!'

উনিশ ঃ প্রাণ নিয়ে টানাটানি লেন

ঘি যতই কলকল করে, লিলির চোখ ততই ছলছল করে। শিশির বলে ঃ 'ঘিটা ভালো নয়—শ্রীঘৃত নয়—বিশ্রী ঘি!'

লিলি কোনও জবাব দেয় না।

'চর্বির ভেজাল আছে, গন্ধে টের পাচ্ছিস নে?' শিশির পুনরপি বলে।

জ্বাল দেওয়ার সাথে-সাথেই জালিয়াতি জানা গেছল—দুর্গন্ধে মাত করে দিয়েছিল চারধার। কিন্তু চর্বির ভেজাল থাকলেই বা কী, খাঁটি ঘিয়ের তুলনায় তার ভাজবার ক্ষমতা কি কিছু কম? হাড়-মাস ভাজা-ভাজায় সেই বা কম যায় কীসে? আর চর্বির ভর্জিত হলেই বা মামার চর্বিতচর্বণের পক্ষে সুবিধা কোথায়? বড় জোর ব্রজেশ্বরের অম্বল হতে পারে—গলা জ্বালা, পেটের অসুখ অবধিও

গড়াতে পারে হয়তো—কিন্তু তাতে আর গরহজম-হওয়াদের কী সান্ত্বনা?

লিলি চুপটি করে থাকে। ঘিয়ের বিষয়ে কেন যে অত খুঁতখুতে হতে হবে সে ভেবে পায় না।

'মামা তো কই এখনও কাটছে না আমাদের?' শিশিরকে একটু যেন ব্যস্তই দেখা যায় ঃ 'আস্তই চাপিয়ে দেবে নাকি?'

'আস্তে-আস্তেই টের পাব।' লিলি বলে। দাদার এত ব্যগ্রতা তার ভালো লাগে না।

'কাটুক কি কুটুককি আগুনেই চাপাক, দরজাটা একবার খুললে হয়।' শিশির বলে ঃ 'একটা মতলব এঁটে রেখেছি।'

'কী মতলব!' লিলির এবার আগ্রহ দেখা দেয়।

'আমার কাছে সেই প্ল্যানখানা রয়েছে কিনা! মামাকে একটু ধাপ্পা মারতে হবে। মামাকে বলতে হবে যে, এই রত্নটি তো কেবল নমুনামাত্র! এরকম আরও বিস্তর সেই গুপ্তকক্ষে লুকোনো রয়েছে। এই প্ল্যান ধরে খুঁজে-পেতে বার করতে হবে। এই না শুনলে মামা নিশ্চয়ই লোভে পড়ে তক্ষুনি সেই ঘরে খুঁজতে যাবে—আমাদের রান্নাবান্না আপাতত স্থগিত রেখেই চলে যাবে। আর আমরা সেই ফাঁকে—।'

'বুঝেছি।' বাধা দিয়ে লিলি বলে ওঠে ঃ 'কিন্তু মামা ভারি হুঁশিয়ার, এমন তৈরি রোস্ট ফেলে রেখে—বেগুনি-ফুলুরির ফলার ফেলে—।'

'আরে, ভোজনের আগে দক্ষিণা পেলে কে না খুশি হয়? মামা তো মামা! দেখিস না কেন, কেমন দৌড় মারে—দেখিস তখন!'

মামার আগমনের প্রত্যাশায়—দ্বারোদঘাটনের অপেক্ষায়—গ্র্যান্ড মামার ফেরত দেওয়া প্ল্যানখানা পকেট থেকে বার করে শিশির। প্ল্যানটার পিছনে—অপর দিকে—এ আবার কীসের খসড়া? আরেকখানা নকশার মতো দেখা যাচ্ছে যে! এ আবার আরেক কোন গুপ্তকক্ষের হদিস?

শিশির বিস্মিত হয়ে নতুন নকশাটার ওপরে চোখ বুলোয়। যে-ঘরে তারা বন্দি রয়েছে, অনেকটা সেই ঘরের ছক মতন যেন। ছকের নির্দেশ মতো অনুধাবন করে—ঘরের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে একটা কোণে গিয়ে তারা হাজির হয়।

সেখানে কোণঠাসা হয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিশির ঘা লাগায়।

অবাক কাণ্ড! ঘা মারতেই জায়গাটা যেন নড়তে থাকে—তারপর আস্তে-আস্তে সরতে-সরতে অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়, সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক বেরিয়ে পড়ে। সুঁড়িপথ দেখা যায়।

'টেবিলের ওপর থেকে মামার টর্চটা নিয়ে আয় তো লিলি।'

গুহার মধ্যে আলো ফেলতেই যত দূর স্পষ্ট হয় তাতে সুড়ঙ্গ বলেই সন্দেহ হয় বটে! কিন্তু সুড়ঙ্গরূপী এই সন্দেহকে অনুসরণ করে এগুনো যায় কি না—এ-পথ গেছে কোনখানে? ইহাই প্রশ্ন।

সুড়ঙ্গটা যেমন নোংরা তেমনি আবার সন্দেহবাদী—কিন্তু যতই বিশ্রী হোক বিশ্রী ঘিয়ের পথ পরিত্যাগ করতে হলে এ ছাড়া সম্প্রতি অন্য পথ আর নেই, এই ভেবে টর্চ হাতে, ওরা সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়ায়।

সুড়ঙ্গটা সিঁড়ির মতো ধাপে-ধাপে নেমে গেছে। কোনওরকমে মাথা হেঁট করে অধোবদনে নামা চলে। শিশির যায় আগে-আগে—লিলির হাত ধরে। যতই এগোয়, বিচ্ছিরি সোঁদা-সোঁদা গন্ধ ওদের নাকে এসে কামড় লাগায়।

খানিক দূরে এগুতেই সিঁড়ি কাঁপতে থাকে—ইটের গাঁথনি হলেও, কেন বলা যায় না, তাদের পায়ের ভারেই যেন টাল খায়। সামনে-পিছনে—এ-ধার ও-ধার থেকে এক-আধখানা ইট খসে পড়ে।

'এই! পা টিপে-টিপে হাঁটছিস কী? তাড়াতাড়ি আয়। চারধার কাঁপছে, দেখছিস না?' শিশির তাড়া লাগায় লিলিকে।

'ভূমিকম্প না কি দাদা?' লিলি ভয় খেয়ে যায়! সুড়ঙ্গটা ওদের পিছু-পিছু পড়তে-পড়তে—

ধরাশায়ী হতে-হতে আসছে বলে মনে হয়।

'তা হলেই তো হয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যেই ইঁদুর-মরা হতে হবে।

সুড়ঙ্গের পিছনের পথ অবরুদ্ধ —তাদের অনুসরণ করে বুজে এসেছে—ক্রমশই বুজে আসচে। টর্চ ফেলেই দেখতে পায় ওরা। লিলিকে সাপটে নিয়ে শিশির তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সুড়ঙ্গপথের গোটাকয়েক বাঁক ঘুরে, নিচের তলে নেমে, নালার মতন একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে আসে। বাইরের আলোতে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ে!

এ কী! সত্যিই তো! প্রকাণ্ড অত বড় বাড়িটা অমন করে কাঁপছে কেন? পায়ের মাটি স্থির অথচ—ভূমিকম্প তো নয়! কম্পান্বিত বাড়ির কাছ থেকে সভয়ে ওরা সরে এসে দূরে এসে দাঁড়ায়।

দেখতে-না-দেখতে সমস্ত বাড়িটা হুড়মুড় করে—হইচই করে ভেঙে পড়ে—ইটে-কাঠে-কড়ি-বরগায় পুঞ্জীভূত হয়ে প্রত্যক্ষ বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

কুড়ি ঃ বিনা টিকিটের যাত্রী

'বাড়িটা ভারি ভয়াবহ, কেন যে সেই বর্মিজটা মামাকে এ-কথা বলেছিল বোঝা যাচ্ছে এখন।' শিশির বলে।

'তুমিও তো বলেছিলে বাড়িটার চালচলন ভালো নয়'—লিলি মনে করিয়ে দেয়।

'বলেছিলাম কি না? প্রথম দর্শনেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। 'শিশির নিজের কথার প্রমাণ লাভ করে পুলকিত হয় ঃ 'দেখলি তো চালচলনটা? আরেকটু হলে আমাদের ঘাড়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কী। নিজের চোখেই তো দেখলি!'

'হুঁ। এরকম গায়ে-পড়া বাড়ি ভালো না।' লিলি মুখ ব্যাঁকায়।

'কিন্তু মামা? মামা যে ঘিয়ের কড়াই নিয়ে ওর মধ্যেই থেকে গেল রে!' শিশির লাফিয়ে ওঠে ঃ 'চাপা পড়ে রইল যে! মামাকে তো উদ্ধার করতে হয়।'

'কিন্তু মামা যদি আবার খেতে চায়?' লিলির ভীতি প্রকাশ পায়।

'সে তখন দেখা যাবে। আগে তো মামাকে বাঁচাই।'

শিশির এক-একখানা করে ইট সরাতে আরম্ভ করে। পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় নব্বই-আশিখানা ইট সরিয়ে ফেলে—লিলিও তার সহযোগিতায় এগোয়—কিন্তু দুজনে মিলে উঠে পড়ে লাগলেও সে আর ক'খানা ইট! পর্বতপ্রমাণ ইটের পাঁজা তখনও তাদের সামনে স্তূপাকার। ধরাশায়ী অট্টালিকার নিঃশব্দ অট্টহাসির আকর্ণ-বিস্তারের সামনে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরও খান দশেক ইট হটিয়ে শিশির হাঁফ ছাড়ে ঃ 'এক শতাব্দীতে কি পেরে উঠব? এইসব ইট ঠাঁইনাড়া করতেই কলিযুগের বাকি ক'টা দিন কেটে যাবে।'

'মাগো! কম কি ইট!' লিলিও যোগ দেয় ঃ 'এই ক'খানা নাড়তে আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল!' লিলি নিজের ফোসকানো হাতে ফুঁ দিতে-দিতে বলে। খান ত্রিশেক সে নড়িয়েছিল—কিন্তু তাই নড়াতেই তার নড়াতে ব্যথা হয়ে গেছে।

'তা হলে—তা হলে আর কী হবে!' শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে ঃ 'এক-একখানা করে ইট সরিয়ে মামার কাছ অবধি গিয়ে পৌঁছতেই আমাদের চুল-দাড়ি সব পেকে যাবে। আমরা বুড়ো হয়ে যাব।'

দাড়ি-পাকার কথায় লিলির আপত্তি করার ছিল, শিশিরের দাড়িই হয়নি—এবং লিলির—লিলির কোনওদিনই হবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে যাওয়ার কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—ওটা পাকা কথা। তবু বয়স বাড়ার কথাটা মেয়েদের কাছে পছন্দসই কথা নয়, লিলিকে কাজেই চেপে

যেতে হয়।

'আর ততদিনে কি ওই ইষ্টক-সমাধির মধ্যে মামা বেঁচে থাকবে?' শিশির নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে : 'আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

'এতক্ষণই বেঁচে আছে কি না কে জানে।' লিলি সদুত্তর দেয় : 'মামা পিষ্টক হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়! ছাত-চাপা পড়লে ছাতু না-হয়ে যায় না।'

'তাহলে তো হয়েই গেছে! তবে তো বৃথা চেষ্টা! তা হলে আর এ-কাজে হস্তক্ষেপ করা কেন?' শিশির ইটের পিঠ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

'মামার কোনও দোষ ছিল না। সেই বুনো জংলিটাই অনর্থক মামার পেটে গিয়ে মামার স্বভাব বিগড়ে দিয়েছিল। সে-ই যত নষ্টের গোড়া।'

এতক্ষণে লিলির মুখে তবু একটু মামার গুণকীর্তন শোনা গেল। পরলোকগত মাতুলের জন্যে শোকপ্রকাশের সুযোগ এল তার।

'হুঁ! মামা-লোকটা ভালোই ছিল রে। দোষে-গুণে মানুষ।' শিশিরও মামার জন্য আফসোস করে : 'মামা হলে কী হবে, ভালোবাসতে জানত!'

'ভয়ানক।' বলতে না-বলতে লিলির চোখ-মুখ কাঁদো-কাঁদো হয়ে আসে : 'এখানে আর দাঁড়িয়ো না দাদা! আমার ভারি কান্না পাচ্ছে।'

'চল, আমরা এখান থেকে যাই। এই মৌলমীন থেকেই চলে যাব। এখানে আর কী জন্যে? আজই যে-জাহাজ ছাড়বে তাইতে চেপে বাড়ির দিকে পাড়ি দিই চ।'

জাহাজঘাটার দিকে ওরা পা চালায়। লোকের মুখে-মুখে পথের বার্তা নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলে।

'বাঘকে কেন যে মামা বলে এতদিনে জানলাম।' যেতে-যেতে জানায় শিশির : 'আমাদের মামাকে দেখেই জানা গেল। কিন্তু যাই বল লিলি, মামার মতোই মামা ছিল আমাদের। অমন বাঘা মামা প্রায় হয় না।'

মামার গৌরবে শিশির গর্ববোধ করে।

'তা ঠিক।' লিলিও গর্বিত হয় : 'কিন্তু আবার চাঁদকেও তো মামা বলে থাকে।'

'সে তোদের বেলা। যে-মামা আমাদের ভাগনেদের বেলা বাঘা-মামা, কেবল আমাদের তাড়া করে ফেরে, সেই মামাই আবার তোদের ভাগনীদের বেলায় চাঁদা-মামা—কথায়-কথায় কেবল চাঁদা দেয়।'

লিলি সলজ্জ হয়ে চুপ করে থাকে। ভাগনী-সুলভ অভিজ্ঞতায় এ-কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

'কিন্তু আমাদের এই মামার বেলা সে-কথা বলা চলে না।' শিশির বুক ঠুকে মামার সমর্থন করে : 'আমাদের মামাকে অমন পক্ষপাতী বলতে পারবে না কেউ। একদম একচোখোপনা ছিল না—দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই না রে লিলি?'

এ-কথাও অস্বীকার করা কঠিন। মামার সমদৃষ্টির কথা মনে পড়তেই লিলি শিউরে ওঠে।

জাহাজঘাটায় গিয়ে জানা যায়, রেঙ্গুনের জাহাজ ঠিক তক্ষুনি ছাড়বে। টেনাসেরিম থেকে আসা জাহাজ, সেখান থেকে ছেড়ে, রেঙ্গুন, একীয়াব, চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে।

টিকিট করার সময় ছিল না—জাহাজের পাটাতন ওঠাচ্ছিল—ছুটোছুটি করে গিয়ে ওরা উঠে পড়ে। ওরাও ওঠে, পাটাতনও ওঠানো হয়। জাহাজও সঙ্গে-সঙ্গে ভোঁ দিয়ে সরতে থাকে।

জাহাজের টিকিট-চেকার যাত্রীদের টিকিটের খোঁজ নিয়ে ফিরছিলেন! ঘুরতে-ঘুরতে শিশিরদেরও কাছে আসেন—তাড়াতাড়িতে টিকিট করা হয়নি—জানাতে বাধ্য হয় শিশির। তা ছাড়া—টিকিট কেনার টাকাও তো তাদের কাছে ছিল না।

'অ্যাঁ? একি তোমরা সরকারি রেলগাড়ি পেয়েছ নাকি, যে বিনা টিকিটে লম্বা দেবে?' ব্যাপার দেখে জাহাজের কর্মচারীটির আক্কেলগুড়ুম হয়ে যায়।

শিশির হাতের আংটি খুলে দেয় ঃ 'এতে আমাদের টিকিট হয় না? কলকাতা পর্যন্ত টিকিট?'

'এতেও যদি না হয়, আমার সোনার দুল আছে!' লিলি কানের দুল নেড়ে বলে। বলতে গিয়ে দুলের দোলনা লেগে ওর সোনালী মুখ লাল হয়ে ওঠে।

একুশ ঃ রেঙ্গুনী জাহাজের দরদস্তুর

জাহাজের কর্মচারী আংটিটা অঙ্গুলিগত করে বললেন, 'তোমাদের কিন্তু তলাকার ডেকে থাকতে হবে। তোমাদের টিকিট নেই কিনা!'

'খুব রাজি।' ঘাড় নেড়ে জানাল শিশির।

জাহাজের ওপরের ডেকে যত ডেক-প্যাসেঞ্জার—সাধারণ যাত্রী যত। তার থেকে একটা থাক আলাদা-করা—বেশি-ভাড়ার যাত্রীদের জন্যে—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের সারি। আর নিচের ডেকটায় যত মালপত্র বোঝাই।

সেই মালঞ্চের অন্তরালে—মালের সামিল হয়ে এককোণে শিশির ও লিলির জায়গা করে দেওয়া হল।

'এইখানে তোমরা লুকিয়ে থাকবে, বুঝলে? সাবধান, ওপরের ডেকে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরো না যেন।' কর্মচারীটি বিশেষ করে ওদের বলে দিলেন। গতিবিধির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে যদি ইতরবিশেষ ঘটে, যদি ওরা ধরা পড়ে ফের, তখন আর উনি ঝুঁকি নিতে পারবেন না, সে-কথাও বাতলে দিতে কসুর করলেন না।

'না না। উঁকিঝুঁকি মারব কেন?' বলল লিলি ঃ 'ওসব খারাপ কাজে আমরা নেই।'

অলঙ্কৃত আঙুলটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কর্মচারী বললেন ঃ 'এ তো গেল তোমাদের রেঙ্গুন পর্যন্ত যাবার ভাড়া। তারপর রেঙ্গুন থেকে একীয়াব—আচ্ছা, সে তখন রেঙ্গুনে গিয়ে দিলেই হবে।'

এই বলে লোকটি লিলির কানের দিকে প্রলুব্ধ চোখে তাকান।

'আমার দুল তো আছেই। তাই দেব।' পরবর্তী ভাড়ার ভার লিলি নিজের স্বকর্ণে অর্পণ করে।

'হ্যাঁ, তোমার দুল তো রয়েছেই! আমি সেই কথাই বলছিলাম।' কর্মচারীটির খুশি-খুশি মুখ হাসি-হাসি হয়ে ওঠে ঃ 'তোমাদের মতো ভালো ছেলেমেয়েদের কাছে আবার ভাড়ার জন্য ভাবনা!'

'কেন, দুল কেন? আমার ফাউন্টেনপেন নেই?' শিশির নিজের ফাউন্টেনপেন দেখায়।

ফাউন্টেনপেনটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে লোকটি বলে ঃ 'উঁহু, এই কলমে রেঙ্গুন থেকে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পোষাবে না। এ কী কলম? এ তো পার্কার নয়। শেফারও নয় তো! এ তো দেখছি আড়াই টাকা দামের জাপানি পাইলটপেন। পার্কার ডু ফোল্ড হলেও না-হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।'

'আমার হাতঘড়ির বদলে হয় না?' শিশির নিকেলের রিস্টওয়াচটা স্বহস্তে তুলে ধরে। হাত ঘুরিয়ে উঁচু করে ঘড়িটা দেখায়।

'হ্যাঁ, ওটা পেলে হয়তো তোমাদের একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তা হলে তোমাদের আরও নিচে যেতে হবে। এর তলায় ইঞ্জিন-ঘরের পাশে কয়লার ভাঁড়ারে থাকতে হবে তা হলে। তোমাদের তাতে একটু কষ্ট হতে পারে হয়তো। অবশ্যি এখান থেকে না, রেঙ্গুন থেকেই বলছি।

'বারে। তা কেন, আমার দুল আছে তো!' লিলি আবার দুলে ওঠে।

'থাকলই বা! দুল নিয়ে অত টানাটানি কীসের?' শিশির লিলির দাতাকর্ণতায় বাধা দেয় ঃ 'আচ্ছা, যদি আমার ঝরনাকলম আর হাতঘড়ি দুটোই দিই—আর—আর যদি—। না, তা হয় না।'

'হ্যাঁ, তা হলে হয়।' কর্মচারীটি জানায়।

'তাই বলছিলাম, লিলি ওপরে এই ডেকে থাক আর আমি যদি নিচে কয়লার ঘরে যাই—?'

'না না না!' লিলি চিৎকার করে ওঠে।

'তাই তো বলছিলাম, তা হয় না। লিলি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আমি পারি, হ্যাঁ, আমি খুব পারি। কিন্তু আমি একলা থাকতে পারলেও ওর মন কেমন করবে কিনা! ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আর আমিও চাই না যে, ও আমাকে ছাড়া কখনও থাকে। তা হলে?'

'তা হলে তোমরা দুজনেই একসাথে থাকো। তাতে আমার আপত্তি নেই। রিস্টওয়াচ আর ফাউন্টেনপেন দুটো পেলে আমি তোমাদের দুজনকেই একসঙ্গে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তারপরে?'

'তারপরে? তারপরে তো আর কিছু নেই।' শিশির বিষণ্ণ গলায় বলে।

'কিন্তু তারপরেও, একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম রয়েছে।'

'আর আমার দুলজোড়া রয়েছে কী জন্যে?' লিলি গরম হয়ে ওঠে। 'শুনি একবার?'

'লিলি? ওগুলো মার দেওয়া—তোমার জন্মদিনের উপহার। মনে আছে?'

'মার কাছ থেকে কি আর আমি পাব না?' আমার সব জন্মদিন কি ফুরিয়ে গেছে? আমার আরও কত জন্মদিন আসবে।'

'ছিঃ, লিলি! অমন কথা মুখেও আনিসনে।'

'মানে? আমার জন্মদিন আসবে না, তুমি বলতে চাও?'

'না না, ওই দুল দেওয়ার কথা। আর যেন ও-কথা না শুনি।'

'তা হলে—একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তার কী হবে?' লোকটা মনে করিয়ে দেয়। (মেমরি তার ভারি ভালো)

'দেখুন, আমার জুতো! খুব দামি জুতো। বাবার কিনে দেওয়া। আর আমার শার্টটাও কেমন চমৎকার দেখুন! খুব দামি সিল্ক। এগুলো দিলে হয় না?'

'ওগুলো?' লোকটা ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে তাকায় ঃ 'তা হলেও হতে পারে। খুব কষ্টসৃষ্টেই হবে। আমার সেজ ছেলেটা মাথায় অনেকটা তোমার সমান। সে পরতে পারবে। হাফপ্যান্টটাও দেবে তো? ওটা তোমার তত মন্দ না।'

'নাঃ, হাফপ্যান্ট দেওয়া যায় না।' শিশির সলজ্জ দৃঢ়তার সহিত বলে।

'আমি তোমাকে একটা গামছা দেব না হয়।'

'তা হলে হয়তো হতে পারে।' শিশির প্রস্তাবটা পুনর্বিবেচনা করে দেখে ঃ 'বেশ পরিষ্কার গামছা?'

'পরিষ্কার বইকী!' লোকটা প্রলোভনের সামগ্রীটির চতুর্দিক উন্মুক্ত করে ঃ 'একটু আধময়লা এই যা! সারেংদের গা-মোছা কিনা! তা বলে কয়লাঝাড়া ঝাড়ন নয় কিন্তু।'

ততটা নিন্দনীয় নয় জেনেও শিশির চুপ করে থাকে—গামছার বাঞ্ছনীয়তাটাই চিন্তা করে বোধহয়।

লিলি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে না ঃ 'দাদার প্যান্টের বদলে আমার জুতো দিলে হয় না? ওই পচা প্যান্টের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশি! আপনার ছোট মেয়ে পরতে পারবে।'

লোকটি লিলির শৌখিন জুতোর দিকে কটাক্ষ করে। পাছে লোকটা 'না' বলে বসে কিংবা দাদার দিক থেকে বাধা এসে পড়ে লিলি তাই তক্ষুনি-তক্ষুনি জুতো খুলে ফেলে—সেই দণ্ডেই ওদের

পদচ্যুত করে দেয়।

জুতোজোড়া হস্তগত করে লোকটা ভ্রূক্ষেপ করে : 'বাঃ, বেশ বাহারি জুতো তো! মেয়ে কেন—আমার বউই পায় দেবে'খন! আমার বর্মী বউ—তার খুদে-খুদে পা!'

'তা হলে আর তাকে পায় কে!' লিলি হেসে ফেলে। 'এই জুতো-পায় দেখবেন কেমন খুর-খুর করে চলচে।'

'হ্যাঁ, তা হলে তুমিও রিস্টওয়াচ ফাউন্টেনপেন—জুতো-জামা সব দিয়ে দাও। নিয়ে রাখি এখুনি।'

'এখুনি? এখুনি কেন? এখন তো আমরা রেঙ্গুনেই পৌঁছয়নি। রেঙ্গুন থেকে একীয়াব। একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তখন তো! তখনই দেব।' শিশির বলে।

'তা কি হয়? টিকিট লোকে গোড়াতেই কাটে। তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষরা ভারি ছটফটে। তোমরা ঠিক ওপর-নিচ করবে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এ-ধারে ও-ধারে উঁকি ঝুঁকিও মারবে, আমি জানি। আর ধরাও পড়ে যাবে সেটাও ঠিক।'

'বাঃ, তা কেন করব? ধরা পড়তে যাব কেন? তাতে তো আমাদেরই সর্বনাশ।'

'আর আমারই বা কী পৌষ মাসটা শুনি? তোমরা ধরা পড়ো তাতে ক্ষতি নেই—তোমরা গোল্লায় যাও না! কিন্তু ওই জিনিসগুলো সেইসঙ্গে ধরা পড়লে সমস্তই তো গেল! তাতে আমার লাভ? আর কি তখন ওগুলো আমার হাতে আসবে? কার হাতে যাবে কে জানে! তখন আমায় ক্ষতিপূরণ কে দেবে, শুনি?'

অগত্যা শিশিরকে তখনই জামা-জুতো, হাতঘড়ি আর ঝরনাকলম হাতছাড়া করতে হয়। শিশিরের থাকে কেবল সেই হাফপ্যান্ট আর একটা সামারকুল। জালি-দেওয়া গেঞ্জিটার ওপরেও তার নজর পড়েছিল, কিন্তু একটু পরীক্ষা করেই সে ওটাকে বরখাস্ত করে দিল—'নাঃ, অনেক কালের গেঞ্জি! তা নইলে এত ফুটো-ফুটো কেন? গেঞ্জিটার আগাপাস্তলা ছেঁদা হয়ে গেছে—হাঁড়-পাঁজরায় ঝাঁঝরা—'

অপদার্থটিকে বাদ দিয়ে বাকি পদার্থগুলিকে কুক্ষিগত করে লোকটি সহাস্য হয়ে উঠল—'বেশ-বেশ! তোমরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছলে আমাদের জাহাজ কিন্তু কলকাতায় যাবে। তোমরাও তো কলকাতাতেই নামবে। তাই না? তা হলে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার ভাড়া?'

সর্বস্বান্ত শিশিরের ওপর দ্রুত বিচরণ করে লোকটার লোলুপ চাহনি লিলির কানের গোড়ায় গিয়ে আটকে যায়। লিলির দুলের সঙ্গে দোল খেতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আরও দূর—তার মনে আরও দুরাশা।

'আমার দুল?' লিলিও দোদুল্যমান!

'তুই থাম। তোকে কর্তাত্বি করতে হবে না। তা হলে মশাই, চট্টগ্রামেই আমাদের নামিয়ে দেবেন।'

'চট্টগ্রামেই নেমে যাবে?' লোকটা অবাক হয়।

হ্যাঁ, সেখানেই নামিয়ে দেবেন দয়া করে। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে আমরা বাড়ি যাব।'

'পায় হেঁটে? চাটগাঁ থেকে আসাম?' লিলি আকাশ থেকে পড়ে—পড়বার সাথে-সাথেই তার পা ব্যথা করতে থাকে। বর্মার এত দৌড়ঝাঁপের পর আবার আরেক দফা হাঁটাহাঁটি—চট্টগ্রাম থেকে তাদের অট্টালিকা কদ্দুর কে জানে! ব্যাপারটা তার একেবারেই ভালো লাগে না।

'পারবি না? এমন কী দূর?' শিশির ওকে উৎসাহ দেয় : 'আমাদের মামা যদি আসাম থেকে পদব্রজে বর্মা আসতে পারে তা হলে আমরা কি চট্টগ্রাম থেকে হাঁটন দিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব না? খুব পারব। একহাঁটায় মেরে দেব—দেখে নিস।'

'হাঁটতে হবে না!' লিলি বলে : 'সেখান থেকে রেলগাড়ি করেই আমরা বাড়ি ফিরতে পারব! চাটগাঁয় আমার এক পেনফ্রেন্ড আছে। সে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে!'

'চাটগাঁয় বন্ধু আবার তুই কোত্থেকে পেলি?' শিশিরের তাজ্জব লাগে।

'চিঠিপত্রের ভেতর দিয়ে।... পেনফ্রেন্ড বলছিনে?' লিলি বলে।

'পেনফ্রেন্ডরা কিছু না! বলে প্লেজার-ফ্রেন্ডরাই কোনও কাজে লাগে না তো পেনফ্রেন্ড! "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায়-হায় কেহ কারও নয়।" তোর অভাবের সময়ে কোনও বন্ধুই নেই—বইয়ে পড়িসনি?'

'আমার বন্ধু সেরকম নয়।' লিলি নিজের বন্ধুর গুমোরে গুমরে ওঠে।

'বই ধার চাইলেই বন্ধুত্ব চলে যায়! বই ধার দিলেও যায়—কিন্তু সেইসঙ্গে বইও যায়। আমারও পেনফ্রেন্ড ছিল রে! আমিও তাকে দু-একটা ভাবের কথা লিখেছিলাম, তাইতেই সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে! অভাবের কথা কিছু লিখিনি, তবু সে কী ভাবলে কে জানে—হয়তো ভাবলে ভাব জমিয়ে বই-টই কিছু ধার নেবার মতলবে আছি।'

'ছেলেরা আবার বন্ধুত্ব করতে জানে? দূর দূর!' লিলি এক ফুৎকারে যাবতীয় বালকসুলভ বন্ধুত্ব উড়িয়ে দেয়।

'তোর মেয়েবন্ধু না বেঁকে দাঁড়ায় শেষটায়! পেনফ্রেন্ড শেষে পেনফুল ফ্রেন্ড না হয়ে ওঠে।'

'হয় তো বয়েই গেল। আমার কানে কি কিছু নেই? চাটগাঁতেই এটা আমি বেচে দেব তা হলে। আর কারু কথা তখন শুনব না। পা আমার মাথায় থাক! হাঁটাহাঁটি আমার পোষায় না বাপু।'

বাইশ ঃ ছাগলের ভাসমান রাজ্য

দুরাশাপরবশ ব্যক্তিটি হতাশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামের উপকূলে (ভবিষ্যৎ বাচ্যে), পরিত্যাগ করে যাওয়ার পর শিশির-লিলি তাদের এলাকার এধারে-ওধারে ঘুরে-ফিরে দেখতে বেরুল।

শিশির লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওপরে না গেলেই হল। উন্নতির মূল ওই যে সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে ওতে পদার্পণের লোভ সম্বরণ করলেই যথেষ্ট, তা হলেই নিশ্চিন্তি। ওপর থেকে কেউ আর এখানে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাদের দর্শন দিতে আসছে না নিশ্চয়।

হাঁটাহাঁটি লিলির ততটা না পোষালেও এক জায়গায় পা জড়িয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? তা ছাড়া, লম্বা-লম্বা পা ফেলে ছোটখাটো হণ্টন লিলির ভালোই লাগে।

একধারে প্যাক-করা একগাদা পার্শেলের বাক্স—আরেক-ধারে যত রাজ্যের ফলের ঝুড়ির ডালা উন্মুক্ত, উন্মুখ হয়ে কত রকমের ফল ওদের অভ্যর্থনা করছিল। তাদের দু-একজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে—এবং তাদের বাঁচিয়ে ডিঙি মেরে-মেরে ওদের চলতে হচ্ছিল। শিশির লিলিকে বলল, 'বুঝেছিস তো! এরাই আমাদের এই ক'দিনের ফলার। এই সিঙ্গাপুরের কলারা! চট্টগ্রাম অবধি অভিযানের রসদ।'

লিলি বলল ঃ 'যাওয়ার ভাবনাতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। খাওয়ার কথা মনেই পড়েনি।'

'কর্ম করলেই তার ফল আছে, বাবা বলেন না? তেমনি ফল থাকলে তার কর্মও থাকবে। তবে মুশকিল এই—এত ফল, আর চারটি মাত্তর হাত! বেশি কর্ম করে উঠতে পারব না। এই দুঃখ!'

এক জায়গায় আবার বস্তার পাহাড়! বস্তাবন্দি হয়ে সারি-সারি কী বস্তুরা দাঁড়িয়ে আছে—শিশিররা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। যাই থাক, বস্তা ফাঁক করে দেখার তাদের সাহস হয় না। তাদের নিজেদের যে-অবস্থা, তা হলে হয়তো সেই পাপে নিচের কয়লার ঘরেই নির্বাসিত হতে হবে। এবং সেখানে খুব যে সুবিধে হবে না, তা বলাই বাহুল্য! কয়লারা কেবল যে দৃষ্টিকটু তা-ই নয়—তার ওপরে—যার-পর-নাই অখাদ্য! এমন ফলতা ছেড়ে কয়লাঘাটায় কে যায়?

মোটা-মোটা কাছির দড়া তালগোল-পাকানো—এখানে-ওখানে-সেখানে কুণ্ডুলী করে রাখা। লাফ মেরে-মেরে ওরা চলছিল। ডেকের ধারটায় পৌঁছতেই দু-একটা চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে এল।

'অর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌...' চেঁচিয়ে উঠল কে যেন।

'পাঁঠা নাকি?' বলল লিলি।

'পাঁঠা তো নিশ্চয়!' শিশির বলে ঃ 'কিন্তু দুপেয়ে না চারপেয়ে?'

কৌতূহলী হয়ে কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে আর একটু এগুতেই—ব্যা—ব্যা—ব্যা! পরিষ্কার ভাষায় ছাগলাদ্য ব্যাকরণ ওদের কানে এল—এবং তারপরেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হতে সংশয়ের তিলমাত্র অবকাশ রইল না।

ছাগলের পাল তাদের চোখের সামনে।

'ওমা! এত ছাগল কেন এখানে?' লিলি গালে হাত দ্যায়।

'জাহাজে করে রপ্তানি হচ্ছে বোধহয়।' শিশির বলে।

ডেকের সে-ধারটা বেড়ার মতো করে ঘেরাও করা—তার ভেতরে অগুনতি ছাগল। ওই অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাসাঠাসি বন্দিদশায় বেচারীরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। লম্ফঝম্ফ দূরে থাব, স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচির পর্যন্ত কারও উৎসাহ ছিল না। কেবল ওদের মধ্যে দু-একজন—নেতৃস্থানীয়ই বোধহয়—বিশুদ্ধ ব্যাকরণে মাঝে-মাঝে অসন্তোষ প্রচার করছিল। মুখপত্র কিংবা মুখপাত্র হিসাবে প্রেরণাদানের কর্তব্যপালনমাত্র।

'কোথায় এদের ধরে-বেঁধে চালান দিচ্ছে দাদা?'

'আমিও তো তাই ভাবছি। কোথায় আবার ছাগল নেই? কোন মুলুকে ছাগলাভাব? সব দেশেই তো দেদার পাঁঠা—খেয়ে ফুরোনো যায় না?'

'মাগো? কী বিচ্ছিরি গন্ধ!' লিলি নাকে রুমাল দেয়।

'ছিঃ! পাঁঠা বলে ওদের অবজ্ঞা করিসনে। পাঁঠা বলে কি মানুষ নয়? একবার ওরাই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পাঁঠারা অতি নমস্য ব্যক্তি।' শিশির নমস্কারের দ্বারা নিজের কথায় সায় দেয়।

'দক্ষযজ্ঞের গল্প শুনিসনি বাবার কাছে? দক্ষ তার যোগ্যতার কী পুরস্কার পেয়েছিল শিবের হাতে? পাঁঠার মাথা। তার মানে কী? পাঁঠার মতো দক্ষ লোক দুনিয়ায় আর নেই। প্রত্যেক যোগ্য লোককে ভালো করে যাচিয়ে দেখ—দেখবি আসলে একটা পাঁঠা। বাবা-ই এ-কথা বলে—এবং আমি বাবার সঙ্গে এ-বিষয়ে একমত। আমি তো পাঁঠার মাংস পেলে আর কিছু পেতে চাইনে, অমন নিঃস্বার্থপর পরোপকারী জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা ওদের বলিদান করি—তার বদলে ওরা আমাদের বলদান করে।'

'পাঁঠা নয় তো বলদ!' লিলি এককথায় বলে দেয়।

'বলতে পারিস, গোরুরা যদি আপত্তি না করে। বাবা বলেন, পাঁঠারা সামান্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ডকারখানা কারা চালায়—যুদ্ধ-বিগ্রহ যত কারা বাধিয়ে রাখে? পৃথিবীর বড়-বড় কাজ কারা করে? পাঁঠারা। ছোটখাট কর্তৃত্বের চূড়া থেকে বড়-বড় শাসনচক্রের চূড়ান্তে কারা বসে আছে? হয় একটি—নয় একদল—সেই পাঁঠা। পাঁঠাদের লীলা বোঝা ভার। এক মুখে ওদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা যায় না।' শিশিরের গম্ভীর মুখে প্রবীণের বুলি।'

'মানুষের তা হলে মানুষ হওয়ার এখনও ঢের দেরি আছে, কী বলো দাদা? এখন ওদের পাঠ্যাবস্থা চলচে তা হলে?' লিলিও বাবার মুখ থেকে শোনা শক্ত একটা কথা উচ্চারণ করে দেয়।

'ফলের ঝুড়ির ওখান থেকে কটমট করে আমাদের দিকে চাইছে ও-লোকটা কে রে?' শিশির চকিত হয়ে ওঠে।

'এইমাত্র ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল না?'

'হুঁ। "দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে!" শিশির রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দিয়ে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করে।

'গ্র্যান্ড মামার আড্ডায়।' লিলির মনে হয়।

'ঠিক ধরেছিস। গ্র্যান্ড মামাদের দলের কোনও লোক। তা না হয়ে যায় না। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে মনে হচ্ছে।'

'তা হলে—তা হলে কী হবে?' লিলি শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

'নিশ্চয় ও একা নেই এখানে। গ্র্যান্ড মামার দলবল সবাই এই জাহাজেই যাচ্ছে তা হলে। ওদের তো পরশুদিন পাড়ি দেবার কথা শুনেছিলাম—তা হলে আজকেই—এই জাহজেই—চলল কেন? অ্যাঁ?'

'আমাদের ধরবার জন্যে নাকি?'

'নিজেরা ধরা পড়বার ভয়ে। পুলিশের তাড়ায় বোধহয়। গ্র্যান্ড মামাও নিশ্চয়ই এই জাহাজে চলেছে!'

'কিন্তু লোকটা অমন রেগেমেগে তাকাচ্ছে কেন দাদা?'

শিশিরকে এর উত্তর দিতে হয় না—লোকটা নিজেই, প্রকাণ্ড একটা ছোরা হাতে, বোধহয় সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশ্যেই ওদের দিকে এগুতে থাকে।

তেইশ ঃ পাঁঠায়-পাঁঠায় হল ধূল পরিমাণ!

লোকটা ছুরিকা হস্তে, রজনীর মতো, ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে। শিশির আর লিলি চারিধার অন্ধকার দেখে—সেই আঁধারের মধ্যে কেবল সেই ছুরিখানার চাকচিক্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

'কই? কই সেই গুপ্তধন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বের কর!'

লোকটার প্রথম কথাই কাজের কথা। বাজে কথার লোক সে নয়, বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় তার বিরল—ছুরির ইঙ্গিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ সে দেয়।

'এই তো।' হাফপ্যান্টের দুই পকেট থেকে রত্নডিম্ব দুটিকে উদ্ধৃত করে তুলে ধরে শিশির।

'এই দুটো? দুটো কেবল? আর সব কই?'

'আর! আর তো সব গ্র্যান্ড মামার কাছে।'

'গ্র্যান্ড মামা? সে আবার কোন ছুঁচো?'

'ছুঁচো কি না জানিনে—তার নাম বক্কেশ্বর আইচ।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? তিনি তো আমাদের দলের সর্দার! তাঁর সঙ্গে কী সম্পর্ক তোদের?' খেঁকিয়ে ওঠে লোকটা।

'মামাতুতো সম্পর্ক। তিনি আমাদের মামার মামা। তিনিই তো এই দুটো আমাদের প্রেজেন্ট দিয়েচেন।"

'প্রেজেন্ট দিয়েছেন !' হাতের ছুরিখানা আমূল নিজের বুকে বিদ্ধ হলেও লোকটা বোধকরি এতখানি আহত হত না। 'তিনি প্রেজেন্ট দিয়েছেন তোমাদের!' বিমূঢ় কণ্ঠে সে বলে। তার হাতের ছুরিখানা—না, হাত থেকে নয়—হাত সমেত খসে পড়ে। হাত-লাগাও হয়ে হাঁটুর কাছে ঝুলতে থাকে।

'তিনি ছাড়া আবার কে দেবে! কার দেওয়ার ক্ষমতা?' বলে শিশির।

সে-কথাও তো মিছে নয়! তাদের কর্তা ছাড়া এই ব্যাপারে ক্ষমতাবান আর কারও কথা সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে—স্বহস্তে—এই লোভনীয় মণিরত্ন, নিজের কাছে না রেখে, নিজের অনুচরদের না দিয়ে—কোথাকার কোন ভগনের ভাগীদারদের ডেকে বিলিয়ে

দেবেন এমন পরমাশ্চর্য কথাও তো ধারণা করা কঠিন। কিছুটা বিশ্বাস—কিছুটা অবিশ্বাস—আর সমস্তটাই বিস্ময় ওতপ্রোত হয়ে সে বলে ঃ 'তবে যে তিনি বললেন তোমরা বাগিয়ে নিয়ে পালিয়েছ!'

'তা কী করে হয়?' লিলি বলে ওঠে এখন ঃ 'আমাদের গ্র্যান্ড মামা কত বড় আর কী জোয়ান—আর আমার দাদা কত ছোট্ট—কতটুকু! সে কি কখনও তাঁর হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে?'

সেও তো একটা কথা। লোকটার মুখ দেখে মনে হয়, সে যেন আরও বেশি মর্মাহত হয়েচে। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ আসে না।

শিশিরের মুখ থেকে আসে ঃ 'তুই যে কী বলিস লিলি! আমি বুঝি বড় হইনি? আমি বুঝি জোয়ান নই? কী যে বলিস তুই!'

'তা হলেও, আমার দাদা ছোট জোয়ান তো!' লিলি দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে—দাদার অভিমান এবং দাদা—দুই কূল বাঁচিয়ে রাখতে চায় ঃ 'সেটা তো তুমি মানবে। একটা ছোট জোয়ান—তা সে যত বড়ই জোয়ান হোক—আসল একটা বড় জোয়ানকে কি গায়ের জোরে হারিয়ে দেবে?'

'দেবেই তো! দিয়েছেই তো!' শিশির বক্ষের বিস্তৃতির ওপরে বাহুর স্ফীতি আমদানি করে আনে, হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বলে ঃ 'তা না হলে এগুলো এই শ্রীহস্তে এল কী করে—শুনি?'

এই অযাচিত বীরত্ব লিলির ভালো লাগে না—ঝুলন্ত ছুরিখানা থেকে তখনও আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অকালযৌবনের ফলে, অকালবার্ধক্যের আগেই দাদার অকালমৃত্যু না ঘটে যায় এই ভয়ে সে সিঁটিয়ে ওঠে ঃ 'আহা, তুমি গ্র্যান্ড মামাকেই গিয়ে জিগ্যেস করো না বাপু—তিনিই এগুলো দাদাকে প্রেজেন্ট দিয়েছেন কি না! তা হলেই তো ফুরিয়ে যায়। তিনিও এই জাহাজেই প্রেজেন্ট আছেন তো!'

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে লোকটার মনে গুমরে-গুমরে উঠছিল—এই সবচেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা—আলপিনের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—ছুরির চেয়েও মর্মভেদী—এই উপলব্ধি! সর্দার হয়ে নিজের দলবলের সঙ্গে তিনি ছলনা করবেন—তাদের ন্যায়সঙ্গত ভাগ, ন্যায্য ভাগ্য থেকে বেদখল করে এভাবে বরখাস্ত করবেন; এই আইডিয়া বরদাস্ত করতেই তার প্রাণে ব্যথা লাগছিল। অন্তরঙ্গদের সাথে এই ধরনের রঙ্গ, নেতৃস্থানীয় তাঁর কাছ থেকে অন্তত আশা করা যায় না। এই কি তাঁর নেতৃসুলভতা?

লাঞ্ছিত কুকুর যেমন করে লেজ গুটিয়ে নেয়, সেইভাবে ছুরিখানাকে নিজের অন্তর্গত করে লুকিয়ে নিয়ে ম্লানমুখে লোকটা উন্নতির পরাকাষ্ঠা সেই সিঁড়িটা ধরে ওপরের ডেকে রওনা হয়।

একটু পরেই গ্র্যান্ড মামা—অধোগতির উপায়—সেই সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

'তোমরা করেছ কী!' হাঁফাতে-হাঁফাতে তিনি বলেন ঃ 'কী সর্বনাশ করেছ বলো দেখি?'

'সর্বনাশ! কেন, কী হয়েছে?' ওদের চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে ঃ 'আপনাকেও ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে নাকি?'

'আমাকে! আমাকে আর তাড়া করতে হয় না। তারা দল বেঁধে তোড়জোড় করে তোমাদের তাড়া করতেই আসছে, তবে তোমাদের কাছে হতাশ হলে—হয়তো আমাকেও তাড়া করতে পারে বলা যায় না।'

'তা হলে তো মুশকিল!' ওদের কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি।

'মুশকিল বইকী! তোমাদের কাছে মোটে দুটি রত্ন—আর আমার রত্ন অনেকগুলি! দুটি নিয়ে কি তারা তুষ্ট হবে? তখন চটেমটে কী করে বসে বলা যায় না, তোমরা এক কাজ করো, ও-ধার দিয়ে—ও-ধারেও একটা সিঁড়ি আছে—তাই ধরে গা-ঢাকা দিয়ে আমার কেবিনে চলে এসো। দশ

নম্বর কেবিন—ওপরে বাঁ-ধারে। সেখানে এই ক'দিন তোমাদের লুকিয়ে রাখব। হাজার হোক, তোমরা আমার ভাগনের ভাগনে। যতই বজ্জাত হও, বংশলোপ হতে দিতে পারিনে তো।'

'আমি পালালুম। তারা এসে পড়ল বলে। তোমরা ও-ধার দিয়ে চলে এসো চটপট।' এই বলে গ্র্যান্ড মামা সিঁড়ি দিয়ে সরসর করে উঠে গেলেন।

'যাই বল, গ্র্যান্ড মামা লোকটা যতই দুষ্টু হোক, আসলে কিন্তু খুব ভালো।' শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানায়।

ও-ধারের উক্ত উন্নতির সোপান ঘেঁষতে গিয়েই দেখা যায়, সেই পথেই গ্র্যান্ড মামার রত্নগুলি দুদ্দাড় করে নেমে আসছে। লিলিরা আর কোথায় পালাবে—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর ওপরে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর যা-একমাত্র উপায়।

'নেপোলিয়ন কর্সিকা থেকে লম্বা এক সাঁতারে ফ্রান্সে গিয়েছিলেন—না রে?' জিগ্যেস করে শিশির।

লিলি চুপ করে থাকে—শিশির যে নেপোলিয়ন নয়, সে-কথা জানানোর তার সাহস হয় না। তাহলে চাই কি, সেই দণ্ডেই হয়তো শিশির, অন্তত জলযুদ্ধে, নিজেকে নেপোলিয়ন প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত হবে।

'মৌলমীন থেকে আমরা কতটা এসেছি? ক'মাইল বল তো? এখান থেকে রেঙ্গুন সাঁতরে যাওয়া যায় না কি?'

লিলি একেবারে নিরিবিলি।

'গেলে তোকে অবশ্যি পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব, তুই ভাবিসনে। তোকে ফেলে যাব না নিশ্চয়।' শিশির ওর ভাবনার কারণ দূর করে : 'আমি কি ভালো সাঁতার জানিনে না কি? বলি, গ্র্যান্ড মামাকে সলিল-সমাধি থেকে উদ্ধার করেছিল কে? কে শুনি?'

লিলি ভরসান্বিত হয় কি না বলা যায় না, কিন্তু মতামত প্রকাশের আগেই ডাকাতরা ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

'দেখো, তোমরা যদি আর এক পা এগিয়েছ, আমি তা হলে এক্ষুনি—আমার হাতে এ দুটো কী, দেখছ তো? এক্ষুনি এগুলি ছুঁড়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব।' শিশি বেঁকে দাঁড়ায়।

'সাত রাজার ধন এক মাণিক!' সবিস্ময়ে সমস্বরে ওরা বলে উঠে।

'এক নয়, দুই মাণিক!' শুধরে দেয় শিশির। মাণিকজোড় বলতে পারো বরং।'

'জলে ফেলে দেবে?' ওরা চমকে যায়—যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না—তবু ওরা থমকে দাঁড়ায়। আর এক পা এগোয় না।

'একেবারে জলাঞ্জলি দেব।' শিশিরের কণ্ঠে কুণ্ঠার লেশ নেই।

'তা হলে? তা হলে তোমাদের ধরতে না পারলে আমরা ওগুলো পাব কী করে? হাতাব কী করে শুনি?... এ-কীরকম কথা?'

'তার আমি কী জানি!' শিশির যেন তাদের নাগালের বাইরে এক সামুদ্রিক চড়ায় গিয়ে চড়াও হয়েছে—এমনি তার চড়া গলা।

'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?' ওদের মধ্যে মোটাসোটা মতো একজন এক উপায় বাতলায় : 'তার চাইতে তুমি মাণিক দুটো আমার হাতে দাও—আমি না-হয় তোমাদের দুজনকে তুলে জলে ফেলে দিচ্ছি। তা হলে হয় না? জলে ফেলা নিয়ে তো কথা?'

'ইয়ার্কি পেয়েছ?' ধমকে দেয় শিশির।

'তা হলে কি অনন্তকাল ধরে আমরা এইরকম স্থির হয়ে এইরূপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকব?' একটু আগে যে ছুরি বাগিয়ে আগিয়ে এসেছিল তারই ক্ষুব্ধকণ্ঠ থেকে এই প্রশ্ন বেরোয়।

'বেশিক্ষণ নয়, এই যতক্ষণ পুলিশ অথবা রেঙ্গুন এই দুটোর একটা না এসে পড়ছে ততক্ষণ

একটু কষ্ট করে দাঁড়াতে হবে বইকী!' শিশির বলে। 'কিন্তু কতক্ষণ আর?'

'পুলিশ!' নামোচ্চারণেই ওদের মধ্যে শিহরন খেলে যায়—দেহে-মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

'অথবা রেঙ্গুন।' শিশির ওদের আশ্বস্ত করতে চায় : 'রেঙ্গুনও আসতে পারে। যদিও কোনটা আগে আসবে বলা কঠিন।'

চব্বিশ : বৃহৎ ছাগলাদ্য যুদ্ধ

কিন্তু ততক্ষণই বা কী করে ওই সব বদ্‌খৎ মুখ নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সহ্য করা যায়? আর অতক্ষণ ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকাও তো চাট্টিখানি নয়! ঘুম পেলে?

'দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তোমরা চি-বুড়ি খেলা জানো?' সে জিগ্যেস করে।

ঘাড় নাড়ে তারা! বুড়ি জিনিসটা তাদের জানা বটে—মেয়েরা বুড়ো হলে যা হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু তা তো খেলাধূলার বাইরে।

'উঁহু, সে বুড়ি নয়। ভেবে দ্যাখো, আমার হাতে এই দুটি মাত্র মাণিক—আর তোমরা এতগুলি সৎপাত্র। কাকে রেখে কাকে দেওয়া যায়? তারচেয়ে এক কাজ করা যাক—খেলাটা তোমাদের আমি সমঝিয়ে দিচ্ছি। এই লিলি হল গিয়ে বুড়ি—ওই সিঁড়িটার কাছে গিয়ে দাঁড়াক। আর তোমরা ওই ধার থেকে—যে-ধারটায় ছাগলরা আটকানো আছে—ওখান থেকে এক-একবারে একজন করে চি-দিয়ে আমাকে ছুঁতে আসবে। আমি পালিয়ে-পালিয়ে যাব—যে একদমের মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারবে এই মাণিক দুটো তার হবে। আর দম ফুরিয়ে গেলে আমি যদি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারি তা হলে সে মরা। তার খেলা ফুরিয়ে গেল, সে আর মাণিক পাবে না। কেবল আমি ছোঁওয়ার মুখে যদি সে ছুটে গিয়ে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবেই তার বাঁচোয়া। পালিয়ে নিজের কোঠায় পৌঁছে গেলেও অবশ্যি বেঁচে গেল! তখন সে আবার চি দিতে পাবে। চান্স পাবে আবার। কেমন এতে তোমরা রাজি আছ?'

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে দৌড়াদৌড়ি ভালো—ঢের বেশি মজার, এককথায় তারা রাজি হয়ে গেল। আর তা ছাড়া, এভাবে মাণিকটা হাতে এলে অপর কারও সাথে ভাগবখরা করতে হবে না—ঢের ফ্যাসাদ বেঁচে যাবে—সেও এক মস্ত সুবিধা।

চি-বুড়ি খেলা শুরু হতে দেরি হয় না।

প্রথম একজন চি দিয়ে তার গণ্ডি থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—কিন্তু শিশির খুব হুঁশিয়ার! দৌড়ে ধরা তাকে সহজ নয়। ফলের ঝুড়ি—পার্শেলের বাক্স সে লাফিয়ে-লাফিয়ে পার হয়—বস্তাদের ওপর দিয়ে টপাটপ চলে যায়—আর চি-ওয়ালা তীক্ষ্ণ সুরে শুরু করে বটে কিন্তু শেষটায় চিঁচিঁ করতে থাকে—ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে তার স্বর বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন আবার শিশিরের উল্টে তাড়ার পালা আসে। শিশিরের তাড়নায় তার তখন পালানোর পথ নেই। কেউ বা ফলের খোসায় পিছলে পড়ে, কারও বা পার্শেলের বাক্সে ধাক্কা লাগে, কেউ বা ঝুড়ির টক্করে জখম হয়ে বস্তার পাহাড়ে গিয়ে আটকে যায়। আর ধরা পড়লেই মরা!

একে-একে ওদের সাতজন এইভাবে শিশিরের হাতে মারা পড়ল। ম্লানমুখে পাঁঠাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের কাছে গিয়ে বসে রইল তারা—পাঁঠশালার বেড়া ঠেসান দিয়ে। নিজেদের বাদবাকিদের মৃত্যু-কামনা ছাড়া আর কোনও কামনা তাদের মনে নেই।

বাকি সাতাশ জনেরও সেই দশা হল। পূর্বগামীদের আন্তরিক প্রার্থনাতেই কি না বলা যায় না।

আর-একজন কেবল তখনও বেঁচে—পেল্লায় রকমের নাদুসনুদুস একজন। বেচারা দু-একবার এর মধ্যে চি দিয়ে এসেছিল—কিন্তু ওর চি বেশি দূর এগোয়নি। ও নিজে তারচেয়ে আরও কম এগিয়েছে।

সেই হৃষ্টপুষ্ট লোকটি বলে ঃ 'আমি অত দৌড়তে পারব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া আমার পোষাবে না বাপু! আমি বাঁশ দিয়ে ছোঁব। এই লম্বা বাঁশটা দিয়ে।'

এই বলে শিশির তার প্রস্তাবে রাজি কি না জানবার আগেই, শত্রু-মিত্র কারও প্রতিবাদের অপেক্ষা না করে ছাগলদের বেড়ায় বিলম্বিত একখানা বাঁশ সে খুলে নিল। তারপরে সেই বাঁশখানা স্বহস্তে ধরে—শিশিরের দিকে বাড়িয়ে—চি-দানের উপক্রম করল সে। কিন্তু উপক্রমের সূত্রপাতেই হুলুস্থুল!

'এই লিলি, দেখছিস কী! সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়—চটপট। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছে দেখছিস নে?' শিশিরের চিৎকার শোনা যায়।

মুক্তি পেতেই, ছাগলের পালের উৎসাহ দেখে কে! ডেকের ওপর দিয়ে ছাগলের তরঙ্গ যেন ছুটে আসতে লাগল। আর গোড়ার ধাক্কাতেই বেড়ায় ঠেসান দেওয়া বীরেরা ভেসে গেলেন প্রথমে। লিলি ও-ধারের সিঁড়ির ওপরে উঠে দাঁড়িয়েচে—শিশির এ-ধারের।

ছাগলের খরস্রোত চারধার প্লাবিত করে চলল। ফলের ঝুড়ি তছনছ করে—প্যাকিং বাক্সদের ভেঙেচুরে—বস্তাদের দুরবস্থায় ফেলে—দিগ্বিদিক ভাসিয়ে দিয়ে চলল। আর গ্র্যান্ড মামার দলবল—মায় সেই বংশধারী স্থূলকায় পর্যন্ত—সেই স্রোতের মুখে বেকায়দায় পড়ে ভাসতে-ভাসতে চলল। ঢেউয়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতোই।

তাদের কেউ-কেউ যে সেই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু তোড়ের মুখে পারবে কেন? দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই গুঁতো মেরে ফের তাদের শুইয়ে দিয়েছে। কাত হয়ে, চিত হয়ে, উপুড় হয়ে—ওল্টাতে-পাল্টাতে—নানারকমে তারা ভেসে চলেচে। বাঁশ-হাতে সেই মোটা লোকটিও ভাসতে দ্বিধা করছে না। তীরবেগে ভেসে যেতে-যেতে-যেতে অবশেষে—তারা—একেবারে জাহাজের রেলিং-এর কিনারায়—।

'সর্বনাশ হল!' চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

'এই যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে?' শিশির উচ্ছ্বাসে আনন্দমঠ হয়ে ওঠে ঃ 'হরে মুরারে—হরে মুরারে!'

বঙ্কিম কটাক্ষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে-দেখতে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' তার মনে পড়ে।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' লিলিও আওয়াজ ছাড়ে—সেও কিছু কম যাওয়ার মেয়ে নয়।

রেলিংয়ের কিনারায় এসে সে-এক দারুণ সংঘর্ষ—ও-ধারে সমুদ্রের দুর্দান্ত কল্লোল—এ-ধারে ছাগলদের উত্তাল তরঙ্গ—মাঝখানে ছত্রভঙ্গ গ্র্যান্ড মামার দলবল! ছাগলাদ্য ঢেউয়ের ধাক্কায় রেলিংয়ের ওপরে গিয়ে বারংবার তারা আছড়ে-আছড়ে পড়ছে—।

দেখতে-দেখতে রেলিংয়ের খানিকটা মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। এবং তারপরে আর দেখতে হল না। পঁয়ত্রিশটি বীরের একজনেরও আর টিকি দেখা গেল না। সবাই হুড়মুড় করে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে পড়ল! পিছনে-পিছনে পাঁঠারাও প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে লাগল। একটাও পিছু ফিরে তাকাল না। রক্ষা পেল না কেউ। এমনকী, সেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ লোকটি পর্যন্ত সবংশে লোপ পেয়ে গেল।

সোনার হরিন

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

এক ঃ দুখানা চিঠি

কলিকাতার কিছু দূরে গঙ্গার উপর একখানি গণ্ডগ্রাম, নাম শ্রীপুর। গ্রামখানাকে কেন্দ্র করিয়া রেলওয়ে কোম্পানি নানাদিকে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া দিয়াছে, স্টিমার কোম্পানিও অনেক পয়সা খরচ করিয়া সেখানে একটা পোক্ত রকমের আড্ডা গাড়িয়াছে। এত আড়ম্বরের কারণ বড়দরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা বলিয়া শ্রীপুরের বেশ খ্যাতি আছে।

অনেক ধনী ব্যবসায়ীর বাস এই শ্রীপুর গ্রামে। এই ধনীদের মধ্যেই আবার 'ধনকুবের' বলিয়া যিনি পরিচিত, তাঁর নাম দ্বারকানাথ বসু। শ্রীপুরের প্রকাণ্ড চিনির কলের তিনিই মালিক, তা ছাড়া বাংলা দেশের বহু জায়গায় কারবারে তাঁর অজস্র টাকা খাটিতেছে। দ্বারকানাথের ধনদৌলত ও-অঞ্চলে প্রবাদ-বাক্যের মতো।

গঙ্গার উপর অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া নানারকম ফল-ফুলের বাগান, পুকুর, আর তারই মাঝখানে দ্বারকানাথের বিরাট অট্টালিকা। এই অট্টালিকারই নদীর দিককার বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুইয়া প্রৌঢ় দ্বারকানাথ শূন্য মনে জেলেদের মাছধরা দেখিতেছিলেন। প্রথম জীবনে বড় বেশি পরিশ্রম করার ফলে এরই মধ্যে তাঁর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, নিত্য নূতন অসুখ দেখা দিতেছে। ডাক্তারদের তাই নির্দেশ, তিনি যতদূর সম্ভব মানসিক পরিশ্রম, লেখাপড়া প্রভৃতি কমাইয়া গঙ্গার মুক্ত বাতাস সেবন করিবেন।

এই বয়সেও দ্বারকানাথের গায়ের রং চাঁপাফুলের মতো উজ্জ্বল; কপালটা এতখানি চওড়া যে, সচরাচর সে রকম চোখে পড়ে না; মুখে কিন্তু তাঁর কোমলতার আভাস বড় বেশি নাই, বরং একটা কঠোর—পরুষ ভাব। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়া দুই চোখের রুক্ষ দৃষ্টি যেন মানুষের অন্তর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দেয়।

যে-বারান্দাটির উপর ইজিচেয়ারে দেহভার এলাইয়া দিয়া দ্বারকানাথ গঙ্গার শীতল বাতাস উপভোগ করিতেছিলেন তারই অপরদিকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক যুবক আসিয়া দাঁড়াইল। তার উপর নজর পড়িতেই দ্বারকানাথ বলিলেন, 'ওহে সলিল, অহিভূষণের খবর জানো?'

অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন, কিন্তু যুবকটি কেন যেন সামান্য একটু চমকাইয়া উঠিল; কোনওমতে আমতা-আমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ্ঞে—আজ্ঞে, কী বলছেন?'

'কাল অহিভূষণ বাড়ি ফেরবার সময় তাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম, আজ সকাল করে বেলা আটটার ট্রেনেই সে যেন অবশ্য এসে পৌঁছায়, অনেকগুলো জরুরি কাজকর্ম পড়ে আছে। সে এসে পৌঁছেছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। এ-গাড়িতে না এলে দশটার আগে আসবার তো আর উপায় নেই।'

সামান্য একটু চাঞ্চল্য যুবকের যাহা দেখা দিয়াছিল, তাহা কাটিয়া গেল; কণ্ঠস্বরে খুব খানিকটা ঔৎসুক্য মাখাইয়া সে বলিল, 'আজ্ঞে তা তো জানি না। তার আপিস-ঘরে গিয়ে দেখে আসব?'

'দরকার নেই; সন্তোষকে জানতে পাঠিয়েছি—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। বোধহয় আসেনি, এলে নিশ্চয়ই খবর পেতাম।'

এখানে সামান্য একটু টীকার প্রয়োজন। ইদানিং দ্বারকানাথের শরীর ক্রমশই খারাপ হইয়া পড়ায় কাজকর্মের সাহায্যের জন্য মাস তিনেক হইল তিনি একজন সেক্রেটারি রাখিয়াছেন, তারই নাম অহিভূষণ। লোকটি যেমন পরিশ্রমী, তেমনি বিনয়ী ও বিশ্বাসী। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সে দ্বারকানাথের প্রধান সহায়, ধরিতে গেলে একরকম ডান হাতের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। তার বাড়ি কলিকাতায়, সেখান হইতেই রোজ আসা-যাওয়া করে।

সলিল চলিয়া গেল এবং তার একটুকাল পরেই সন্তোষ ফিরিয়া আসিল, বেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন মুখেই। দ্বারকানাথকে উদ্দেশ করিয়া সে কহিল, 'অহিভূষণবাবুকে তাঁর আপিস-ঘরে বা বাড়ির

অন্য কোথাও দেখতে পেলাম না; তবে তিনি যে এসেছেন তাতে সন্দেহ নেই, কেননা রোজই বাড়ি যাওয়ার সময় সমস্ত খাতা-পত্তর তিনি তাঁর টেবিলের টানার ভেতর তালাবন্ধ করে রেখে যান, কাজে এসে সেগুলোকে ফের বার করেন। তাঁর আপিস-ঘরে ঢুকে দেখি টেবিলের ওপর অনেকগুলি খাতা খোলা অবস্থায় পড়ে—যেন কাজ শুরু করেই কোথাও উঠে গেছেন।' তারপর গলার স্বর খাটো করিয়া বলিল, 'ওঁর ঘর ঝাঁট দিয়ে কালীচরণ জঞ্জালগুলো বাইরে বারান্দার একপাশে জড় করে রেখেছিল, পরে বাইরে ফেলে দেবে বলে। হঠাৎ সেই আবর্জনাস্তূপের ভেতর একখানা মুখ-খোলা খাম দেখতে পেয়ে কাজের ভেবে সেটা তুলে নিয়েছিলাম। খাম খুলে দেখি ভেতরে এক অদ্ভুত চিঠি। তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে আপনার কাছে সেখানা নিয়ে এসেছি।'

দ্বারকানাথ সন্তোষের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া বলিলেন, 'কই, দেখি কী চিঠি?' তারপর চশমার খুব সম্মুখে আনিয়া মনে-মনে সেখানা পড়িতে লাগিলেন। তিনি ছিলেন এতক্ষণ শুইয়া, চিঠি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দারুণ উত্তেজনার ঝোঁকে ইজিচেয়ারের উপর মাটামভাবে সোজা হইয়া বসিলেন। অহিভূষণকে উদ্দেশ করিয়া কোনও অজানা লোক পত্রখানা লিখিয়াছে, ভাষাটা এই রকম—

'অহিভূষণ,

এই তোমাকে শেষ সুযোগ দিতেছি। আজ দিনের মধ্যে যদি আমাদের আদেশ পালন না করো তবে, চোখ ভরিয়া পৃথিবীর আলো দেখিয়া নাও, সে-আলোর সঙ্গে আজই তোমার শেষ সাক্ষাৎ। ন্যায়-অন্যায়ের বক্তৃতা অনেকদিন ধরিয়া শুনিয়াছি, কিন্তু আর না। তোমার কর্তব্য স্থির করার আজই শেষ দিন। ইতি—

পুনশ্চ—আমাদের চিঠিপত্র পুলিশ কি দ্বারকাবাবুর নিকট প্রকাশ না করিয়া তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। আমাদের সতর্ক চক্ষু সর্বদাই তোমার উপর খরদৃষ্টি রাখিতেছে। রহস্য ব্যক্ত হইলে তোমার অদৃষ্টে কী আছে তা তুমি ভালো করিয়াই জানো, তাই অপ্রয়োজনীয় মনে করিয়া তার আর উল্লেখ করিলাম না।'

চিঠিতে ঠিক আগের দিনকার তারিখ।

দ্বারকানাথকে ঝড়-ঝাপটা জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে, কোনও ব্যাপারেই হঠাৎ তিনি বড় একটা আকুল হইয়া পড়েন না। কিন্তু চিঠিখানার ভাষায় এমনি একটি রহস্যময় আতঙ্ক লুকানো আছে যে-সেখানা পড়ার পর যে-কোনও লোকের পক্ষেই বোধকরি ঠিক থাকা শুধু কঠিন নয়, সুকঠিন। দ্বারকানাথ যেন অকূল সমুদ্রের মধ্যে পড়িলেন, অজানা আশঙ্কায় তাঁর বুক দুরুদুরু করিতে লাগিল।

সন্তোষকে নানাভাবে জেরা করা হইল; সে দ্বারকানাথের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তাঁরই চিনির কলে কাজ করে এবং ছেলেবেলা হইতে তাঁরই কাছে এ-বাড়িতে মানুষ। বিশেষ কোনও খবরই দিতে পারিল না, অহিভূষণের কাছে ইদানিং বাহিরের কোনও লোক আনাগোনা করিতেছে কি না সে-খবরও সে রাখে না দেখা গেল। তবে আজ সকালে অহিভূষণ যে আসিয়াছিল, সে-সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বেলা বাড়িয়া ক্রমে দুপুর হইল, তখনও অহিভূষণের খোঁজ নাই। দ্বারকানাথ এইবার দস্তুরমতো ভয় পাইয়া গেলেন—ভীষণ একটা কিছু ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই, নতুবা এ-বাড়িতে ঢুকিয়াও অহিভূষণ ইচ্ছা করিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতেছে না, এ অসম্ভব।

অধীর দ্বারকানাথ কী করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন এমনসময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল, 'কলকাত্তাসে অবিনাশবাবু আয়েঁ হেঁ।'

অবিনাশবাবু দ্বারকানাথের অ্যাটর্নি, সকলরকম বিষয়কর্মে তিনিই তাঁকে পরামর্শ দেন। হঠাৎ

কোনও খবর না দিয়া এই অসময়ে শ্রীপুরে আসিয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন খুবই, কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে একটু যেন স্বস্তির ভাবও অনুভব করিলেন, যাক, পরামর্শের জন্য একজন বন্ধু তো পাওয়া গেল! চাকরকে হুকুম দিলেন, 'যাও, হিঁয়া পর লে আও।'

দ্বারকানাথের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই কথা কহিলেন অবিনাশবাবু, বলিলেন, 'আপনার চিঠি পেয়ে সেই সঙ্গে-সঙ্গেই অহিভূষণবাবুর কাছ থেকে রসিদ রেখে আপনার সোনার হরিণ তাঁর হাতে সঁপে দিয়েছি দ্বারিকবাবু।' তারপর গলার স্বর একটু নিচু করিয়া বলিলেন, 'জানি অহিভূষণবাবু আপনার পরম বিশ্বাসী। তবু হাজার হোক, অত টাকা দামের জিনিসটা তো, দেওয়ার পরই মনটা খচখচ করতে লাগল। শেষে আর থাকতে না পেরে সটান আপনার কাছেই চলে এলাম—পেয়েছেন তো আপনার জিনিস ঠিকমতো? ও কী, আপনি অমন বিহ্বলের মতো তাকাচ্ছেন কেন?'

দারুণ বিস্ময়ে দ্বারকানাথ স্তম্ভিত, অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তিনি বিহ্বলের মতো বলিয়া উঠিলেন, 'আমার চিঠি? অহিভূষণকে সোনার হরিণ দিতে লিখেছি? আপনি এ কী বলছেন অবিনাশবাবু, আপনার কথা তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

ততোধিক বিস্মিত হইলেন অবিনাশবাবু, বলিলেন, 'সে কী?' তারপর পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া কহিলেন, 'এ-চিঠি কি আপনার নয়? কিন্তু নাম-সই তো স্পষ্ট আপনার!'

স্বপ্নাবিষ্টের মতো দ্বারকানাথ চিঠিখানা বারতিনেক পড়িয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন, আমি তো এ-চিঠির বিষয় বিন্দুবিসর্গও জানি না, অবিনাশবাবু! হয় আমি ঘুমের ঘোরে চিঠিতে সই দিয়েছি, আর নয় তো এ-সই জাল। কিন্তু... কিন্তু জাল সই বলে তো মনে হচ্ছে না, এ-সই যেন আমারই। এ কী রহস্য অবিনাশবাবু?'

দুই হতবুদ্ধি প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিরিবিলিতে বসিয়া যখন এই ধরনের আলাপে ব্যস্ত তখন তাঁদেরই পিছনে আর-একটি লোক দুই কান খাড়া করিয়া এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিয়া দুজনার কথাবার্তা শুনিতেছিল। তার দুই চোখে বাজপাখির মতো দৃষ্টি, কিন্তু মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার। সে আমাদের পূর্বপরিচিত—সলিল।

দুই ঃ বিশেষজ্ঞ-যুগল

তিনদিন পরের ঘটনা, ঘটনাস্থল কলিকাতার বালীগঞ্জ অঞ্চল। ছোট্ট অথচ আধুনিক রুচিসম্পন্ন একখানি বাড়ির বৈঠকখানায় দুইটি যুবক বসিয়া গল্প করিতেছিল—একজন বাড়ির মালিক, অপরটি তারই এক আগন্তুক বন্ধু। বাড়ির মালিকের নাম দুর্গাপ্রসন্ন; বিলাত হইতে সে হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ (handwriting expert) হইয়া দেশে ফিরিয়াছে এবং সরকারি অফিসে মোটা মাহিনার চাকরি করিতেছে। আর তার বন্ধুটি? দুশো কুড়ি গজ, চারশো চল্লিশ গজ, আটশো আশি গজ, এক মাইল প্রভৃতি হরেকরকমের দৌড়ের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশে, একবার নয়, একাদিক্রমে অনেকবার, সে প্রথম হইয়াছে। হাই জাম্প, লং জাম্পে এখনও তার 'রেকর্ড' এদেশে কেহ ভাঙিতে পারিয়াছে কি না জানি না। তার সাঁতারের কৌশল দেখিয়া এক সাহেব বলিয়াছিল—লোকটা 'ম্যান-ফিশ'; এতবড় চৌকস খেলোয়াড় নাকি এদেশে কমই জন্মিয়াছে। নাম রণজিৎ।

দুই কাপ চা নিঃশেষ করিবার পর দুর্গাপ্রসন্ন সশব্দে গা মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কী এক প্রয়োজনে নাকি তাকে বাড়ির বাহির হইতে হইবে। চেয়ারের উপর একখানি পা তুলিয়া দিয়া জুতার ফিতা আঁটিতে-আঁটিতে সে কহিল, 'বাই-দি-বাই, রণজিৎ, সেদিন বলছিলে তোমার গুরুদেব নাকি আক্ষেপ করছেন যে, তেমন জটিল রহস্য আর তাঁর কাছে আসে না। কলকাতার খানিকটা দূরে কিন্তু বেশ একটু রহস্য চাক বাঁধতে শুরু করেছে, এরই মধ্যে একটু-একটু গন্ধ আমার নাকে এসে পৌঁছেছে।'

রণজিতের 'গুরুদেব' বলিয়া দুর্গাপ্রসন্ন যে-ভদ্রলোকটির ইঙ্গিত করিল তিনি আর কেহই নন—সুপ্রসিদ্ধ জাপানি ডিটেকটিভ হুকা-কাশি। রণজিৎ যে হুকা-কাশির বিশেষ গুণগ্রাহী ভক্ত সে-কথা দুর্গাপ্রসন্ন জানিত, তাই রণজিতের সম্মুখে তাঁর উল্লেখ করিতে হইলেই ঠাট্টার ছলে বলিত 'তোমার গুরুদেব'।

রণজিৎ বলিল, 'হ্যাঁ, মিস্টার হুকা-কাশি সে-কথা বলছিলেন বটে। ঘোষ-চৌধুরীর ঘড়ির কিনারা করবার পর থেকে তাঁর কাছে যেসব "কেস" আসছে, সেগুলো নাকি একেবারেই ছেলেখেলার ব্যাপার। দু-একদিন মাথা ঘামালেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। দস্তুরমতো ঘোরালো কোনও ব্যাপার না পেলে ওঁর মগজের যে আসল খোরাক জোটে না, সে-কথা ভাই আমিও বুঝি। হ্যাঁ, কলকাতার কাছে কোথায় কী ঘটেছে বলছিলে?'

জুতার ফিতা-আঁটা হইয়া গিয়াছিল, দুর্গাপ্রসন্ন কাপড়ের খুঁট দিয়া চেয়ারটা একটু ঝাড়িয়া নিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, 'শ্রীপুর বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ, ঠিক গঙ্গার ওপরেই তো? একবার এক বিয়ের নেমন্তন্নে গিয়েছিলাম; মস্তবড় একটা চিনির কল আছে, না?'

'অনেক খবরই রাখো দেখছি। সেই চিনির কলের মালিকের কথাই বলব। ভদ্রলোকের নাম দ্বারিক বোস—অতিশয় ঘুঘু লোক, ছেলেবেলা থেকেই ওঁদের চিনি কিনা! বিস্তর পয়সা, আর পয়সা বাড়াবার ফিকির-ফন্দিও নানারকমের জানা আছে। দিনকতক আগে কোত্থেকে কে এসে চুপিচুপি ওঁকে জানিয়ে গেছল সুন্দরবন-অঞ্চলে ছোটখাটো একটা জমিদারি মাটির দরে বিক্রি হচ্ছে; আসল দর তার পাঁচ লাখের কম নয়, তবে কমিশন বাবদ লোকটাকে কিছু দিলে এক লাখেই দ্বারিক বোসকে সে তা পাইয়ে দিতে পারে। বুঝতেই পারছ, কীরকম মোটা রকমের দাঁও। দ্বারিকবাবু হেন ব্যক্তি কথাটাকে পাঁচকান হতে দিতে পারেন না, দু'দিনের মধ্যেই সম্পত্তি কেনবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললেন। এখন কথা হচ্ছে, হাজার বড়লোক হোক, ব্যবসাদার তো বটে, পাঁচ জায়গায় টাকা লাগানো রয়েছে, অত অল্পসময়ের মধ্যে লাখ টাকা একত্রে জোগাড় করা একটু কষ্টকর বইকী! ঠিক করলেন, আপাতত কোনও ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নিয়ে উপস্থিত কাজ চালিয়ে নেবেন। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার নিতে গেলে কিছু সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া দরকার; জমিদারি অথবা বাড়ি বন্ধক দিতে গেলে হাঙ্গামা অনেক, আর তা ছাড়া ব্যাপারটা যে জানাজানি হয়ে পড়বে না, তা-ই-বা কে বলবে? অনেক ভেবে দ্বারিকবাবু তাঁর তোষাখানা থেকে এমন একখানা জিনিস বার করলেন যা প্রায় লাখ দুই টাকার মাল। আমরা তখন খুব ছোট—প্রায় বছর পনেরো আগেকার ঘটনা—দেনার দায়ে ইক্‌লিস্‌পুরের রাজার অনেক ধনরত্ন নিলামে চড়েছিল। দ্বারিক বোস সেই নিলামে স্বয়ং উপস্থিত থেকে নিজে পছন্দ করে একটা সোনার হরিণ কিনে এনেছিলেন। শুনেছি সেটা নিরেট সোনার, শিং দুটি স্ফটিকের, আর গায়ের ছিট-ছিটগুলোর জায়গায় এক-একখানি চোখ-ঝলসানো-হীরা বসানো। দ্বারিকবাবু তাঁর অ্যাটর্নি অবিনাশ দত্তের মারফত সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা আনালেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই লাখ টাকার জোগাড় দ্বারিকবাবু করে ফেললেন। অবিনাশবাবুর ওপর ভার পড়ল ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে সোনার হরিণটি খালাস করে আনবার। টাকা জমা দিয়ে অবিনাশবাবু হরিণ ছাড়িয়ে এনেছেন, দু-একদিনের মধ্যেই দ্বারিকবাবুর কাছে সেটা পৌঁছে দেবেন, ইতিমধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেছে। দ্বারিক বোসের প্রাইভেট সেক্রেটারি অহিভূষণ তাঁর নামের একখানা চিঠি দেখিয়ে অবিনাশবাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণটি হাত করে উধাও হয়ে গেছে।'

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওঃ, এই তোমার রহস্য? তা, এ-রহস্য ভেদ করবার জন্য আর হুকা-কাশির কাছে ছুটবার দরকার নেই, আমিই হদিস বাতলে দিচ্ছি। সেই জোচ্চোরটার

ফটো থাকে তো একখানা ফটো, আর তা না হলে চেহারার খুঁটিনাটি বিবরণ খবরের কাগজে ছাপিয়ে সেইসঙ্গে একটা মোটা পুরস্কার ঘোষণা করে দাও, এদিকে পুলিশেও খবর দেওয়া থাক—দু-দিন বাদে দেখবে হিড়হিড় করে তাকে টেনে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। লুকিয়ে মানুষ ক'দিন থাকতে পারে হে?'

'তিষ্ঠ বৎস, তিষ্ঠ, ব্যাপার অত সহজ নয়। প্রথমত, তুমি যাকে জোচ্চোর ঠাউরে বসে আছ সে স্বেচ্ছায় এ-কাজ করেনি, করেছে নিতান্ত প্রাণের দায়ে। কী কারণে জানি না, একদল ষড়যন্ত্রকারীর কাছে লোকটা ঠেকে পড়েছিল—একেবারে তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে। তারাও সুবিধে পেয়ে যন্ত্রের মতো ওকে চালিয়েছে। এ-কাজটি হাসিল করবার জন্যে তারা অনবরত ওর ওপর চাপ দিচ্ছিল, অনেক দিন ও যুঝেছে; তারপর বোধকরি ভাবলে, রাম মারলেও মারবে, রাবণ মারলেও মারবে, যেটা অপেক্ষাকৃত সহজ পথ সেটাই বরং বেছে নেওয়া যাক! ...কিন্তু এর চাইতেও বড় রহস্য হচ্ছে চিঠিখানা। দ্বারিকবাবু বারবার বলছেন, ও-চিঠির সই কক্ষনও তাঁর নিজের হাতের নয়। সইটা জাল কি না পরীক্ষা করবার জন্য চিঠিখানা আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে, সই আদপেই জাল নয়, স্পষ্ট দ্বারিকবাবুর নিজের হাতের লেখা। জালিয়াত আস্তে-আস্তে ধরে-ধরে মানুষের হাতের লেখার অবিকল নকল করতে পারে বটে, তার ওপর কালির দাগ বুলিয়ে সাধারণ লোকের চোখে ধুলোও দিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। আস্তে-আস্তে ধরে-ধরে যে-দাগ টানা হয় তার রেখা হয় ক্ষীণ, জায়গায়-জায়গায় তা আবার কেঁপেও যায়। কালির দাগ বুলোলে সাদা চোখে সেসব ধরা পড়ে না সত্যি, কিন্তু তেমন পাওয়ারফুল মাইক্রসকোপের নিচে ফেললেই সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যায়, ক্ষীণ রেখা, কাঁপুনির আভাস সমস্তই সুস্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া "আলট্রা-ভায়োলেট রে"ও এসব ব্যাপারে নানারকম সাহায্য করে। আমি আলট্রা-ভায়োলেট রে ফেলেও পরীক্ষা করেছি, এ-একটানা সই—চেষ্টা-চরিত্র করে আঁকা নয়। লেখার ধাঁচও অবিকল দ্বারিক বোসেরই মতো।'

'তবে তোমার দ্বারিক বোসকেই ভালো করে ভেবে দেখতে বলো গে—ফাইল ঘাঁটতে-ঘাঁটতে মনের ভুলে বুড়ো কখন কী করে বসেছে!'

'তাও বলেছিলাম হে বন্ধু—বলেছিলাম, "আপনার দৃষ্টিশক্তি কম, তাতে চোখে ছানি পড়ে এসেছে, বোধকরি চিঠিখানা ভালো করে পড়তে পারেননি—উপুর-উপুর দেখেই সই করে দিয়েছেন।" শুনে বুড়ো ক্ষেপেই অস্থির, বলে, "হ্যাঁ, বুড়ো হলে তোমাদের ওই দশাই হবে তা জানি, তবে আমরা আলাদা কাঠামোয় তৈরি, আমাদের এরকম ভুল হয় না যে চিঠি না পড়েই সই করে দেব। তোমাদের মতো হলে আর করে খেতাম না।" লোকটা বৃথাই এতকাল চিনির কারবার করলে হে, কারবার করা উচিত ছিল কুইনিনের; কথার চিনির আভাসমাত্র নেই। উঠি এইবার, পরীক্ষার ফলটা একবার জানিয়ে আসি গে।'

পরদিন সকালবেলা রণজিৎ বাড়ির বৈঠকখানায় ইজিচেয়ারে বসিয়া একখানা ইংরেজি উপন্যাস পড়িতেছিল। ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া খুব একপশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, শরীরে কেমন একটা জড়তা আসিয়াছিল, তার উপর বইখানায় মনও বসিয়াছিল খুব, রণজিৎ তাই স্থির করিল এ-বেলা আর বাড়ির বাহির হইবে না। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন, অল্প একটু পরেই প্রকাণ্ড একখানা মোটরগাড়িতে দুর্গাপ্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত, তার সঙ্গে একটি রুগ্নকায় ভদ্রলোক। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই পরিচয়াদির পালা শেষ হইয়া গেল; সঙ্গের ভদ্রলোকটি দ্বারকানাথ, হুকা-কাশির সাক্ষাৎপ্রার্থী—রণজিৎকে সঙ্গে করিয়া তাঁর নিকট যাইবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে আসিয়া হুকা-কাশির বাড়ির ফটকের ভিতর ঢুকিলেন। বাড়ির বেহারা রণজিৎকে ভালোমতোই চিনিত,

স্মিতমুখে অভিবাদন করিয়া সে সকলকে বাহিরের ঘরে আনিয়া বসাইল, তারপর সবিনয়ে জানাইল, কর্তা স্নানের ঘরে আছেন, সেখান হইতেই বেশ পরিবর্তন করিয়া খবরের কাগজ পড়ার উদ্দেশ্যে এই ঘরেই ঢুকিবেন, কাজেই খবর দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

সকলে অল্প একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভিতরদিককার দরজায় খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং ঠিক পরের মুহূর্তে হুকা-কাশি ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চকিত দৃষ্টিতে সকলের দিকে একবার তিনি চাহিলেন, তারপর রণজিতের দিকে ফিরিয়া একটু সৌজন্যপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'রণজিৎবাবু যে, কতক্ষণ?' চেয়ারে বসিতে-বসিতে ঘাড় বাঁকাইয়া ফটকের সম্মুখটা একটু দেখিয়া নিয়াই আবার বলিলেন, 'যাক, গাড়ি বিদেয় করে দিয়েছেন, ওঠবার জন্যে তা হলে এখুনি তাড়াহুড়ো করছেন না নিশ্চয়ই!'

দ্বারকানাথ বিস্মিত হইলেন; তাঁর গাড়িখানার প্রচুর দাম, চলিবার সময়ে একেবারেই আওয়াজ হয় না বলিয়া মনে-মনে তাঁর গর্বও আছে যথেষ্ট। হুকা-কাশি ছিলেন এতক্ষণ বাড়ির ভিতর স্নানের ঘরে, কেউ তাঁকে তাঁদের আসিবার খবর দেয় নাই, অথচ গাড়ির শব্দ তাঁর কানে গিয়া পৌঁছিল কী ভাবে? লোকটার শ্রবণ-শক্তি কি তবে অসাধারণ নাকি? মনের ঔৎসুক্য মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া তিনি বাহির করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, 'আপনি বাড়ির ভেতর থেকেও আমাদের গাড়ির আওয়াজ কী করে শুনতে পেলেন তাই ভেবে অবাক হচ্ছি!'

'গাড়ির আওয়াজ? কই, তা তো আমি পাইনি!'

'তবে? আমাদেরকে বাড়িতে ঢুকতেও তো আপনি দেখেননি! কী করে আঁচলেন আমরা হেঁটে আসিনি, গাড়িতে এসেছি?'

হুকা-কাশি অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন, 'একটু আগে আপনাকেও তো আমি দেখিনি! তা সত্ত্বেও কী করে এখন বলছি যে, খানিকটা আগে আপনি হ্যাট-কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন?'

দ্বারকানাথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। বাস্তবিকই, রণজিতের বাড়ি রওনা হইবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে স্যুট পরিয়া নানা জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে-খবর এ-লোকটি পাইল কোথায়? জ্যোতিষ জানা আছে না কি?

দ্বারকানাথের মনের ভাব হুকা-কাশি বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, 'আশ্চর্য হওয়ার খুব বেশি কিছু কিন্তু নেই এর ভেতর। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখুন তো একবার! আমাদের এদিকে পিচের রাস্তা হয়নি, খোয়ার রাস্তা, বৃষ্টি হবার ফলে সেখানে কীরকম কাদা হয়েছে দেখছেন তো! এবার আপনাদের জুতোগুলোর দিকে তাকান দেখি—তকতকে ঝকঝকে, কাদার বাষ্পও ওতে লেগে নেই। যে-মেঝের ওপর দিয়ে আপনারা হেঁটে এসেছেন, সেইটেও পরীক্ষা করুন, কাদার সামান্য ছোপও চোখে পড়ছে কি? আপনারা ও-রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে এসব ব্যাপার কি কখনও সম্ভব হত? বুঝলাম, নিশ্চয়ই আপনারা গাড়িতে এসেছেন। কোনও গাড়িই ফটকের আশপাশে দেখতে পাচ্ছি না, কাজেই আপাতত সেটা নিশ্চয়ই বিদেয় করে দেওয়া হয়েছে।'

রণজিৎ ছাড়া আর সকলেই হুকা-কাশির পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিল। দ্বারকানাথ বলিলেন, 'কিন্তু এখানে আসবার আগেই স্যুট বদলে ধুতি পরে এসেছি সে-খবর কী করে জানলেন? গায়ে তো আর স্যুটের দাগ লেগে নেই?'

হুকা-কাশি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তাও আছে। আপনার চুল অনেক দিন ছাঁটা হয়নি, বেশ বড় হয়ে পড়েছে; তার ওপর টুপিটা একটু আঁট হয়েছিল, ফলে চুলের ওপর একটু গোল দাগ এখনও নজরে পড়ছে। কপালও একটু লালচে হয়ে আছে। বেশি আগে টুপি খোলেননি, তা হলে এগুলো মিলিয়ে যেত নিশ্চয়ই। আপনি বাঙালি, কাজেই ধুতির ওপর যে টুপি পরেননি, স্যুট পরেছিলেন এ-কথা আঁচা আর শক্ত কী?'

দ্বারকানাথ এবং দুর্গাপ্রসন্ন ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

তিন ঃ খগেনের সন্দেহ

বেলেঘাটার খাল হইতে অল্প কিছু দূরে গলির মধ্যে একখানা বাড়িতে কয়েকটি লোক রবিবারের আনন্দময় সকাল যাপন করিতেছিল। লোকগুলি সংখ্যায় যে খুব বেশি তা নয়, বোধকরি জনা পাঁচ-ছয় হইবে, আর সকলেই যে সমবয়সী তাও বলা চলে না, যুবকের ভাগই বেশি তবে প্রৌঢ়-বয়সীও দু-একজন আছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী ছেলে কয়টি ঘরের এককোণে সতরঞ্চি পাতিয়া ভাগাভাগি করিয়া একখানা ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিল, আর অপর কোণে দুই জন বয়স্ক ব্যক্তি খাটোগলায় একটা গোপন পরামর্শে নিমগ্ন ছিল। তাদের আলোচনাটা চলিতেছিল এই ধরনের; একজন অপরকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিল, 'সবই তো ভালোয়-ভালোয় কাটিয়ে ওঠা গেল, খগেনবাবু কত রকমের বাধা-বিপত্তি ভেবে মাথা গরম করছিলেন, কোনওটাই আমাদের আটকে রাখতে পারেনি। অহিভূষণ চৌধুরীকেও ওরা খুঁজে বার করেছে, আর সোনার হরিণও উদ্ধার করেছে—হাঃ-হাঃ-হাঃ। যার জন্য এত কাণ্ড সেই আসল ব্যাপারটায় এবার হাত দেওয়া যাক—সে-কাজটাও তো বড় সহজ নয়।'

'খগেনবাবু' বলিয়া যে-লোকটিকে সম্বোধন করা হইল, ভাবে বোধ হইল সে-ই এ-দলের প্রধান সহায়, সম্বল এবং পরামর্শদাতা। লোকটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি কিন্তু স্বাস্থ্য এখনও অটুট। চোখ দুইটি দেখিলে মনে হয় ধূর্ততায় সে ধুরন্ধর। সঙ্গীর কথার জবাবে সে কহিল, 'আপাতত ও-সমস্ত মতলব শিকেয় তুলে রাখুন, অশনিবাবু, বছর তিন-চারের মধ্যে ও-ব্যাপারে হাত দেওয়া অসম্ভব।'

'তি-ন চা-র ব-ছ-র।' অশনিকান্তের চক্ষু কপালে উঠিল, 'কিন্তু খগেনবাবু—'

খগেন অশনিকান্তের উৎকণ্ঠা আমলেই আনিল না, অন্য এক চিন্তা তখন তার মাথায় ঘুরিতেছে। একটু কাল নীরব থাকিয়া সে কহিল, 'শ্রীপুরের একটি লোকের কথা ভেবে-ভেবে আমার পেটের ভাত চাল হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ভেতরকার রহস্যের বিন্দু-বিসর্গও যদি কেউ টের পেয়ে থাকে তবে সে-ই তা পেয়েছে।'

'সে কী কথা! কে সে লোকটা?'

খগেন তার সন্দেহ-পাত্রের নাম করিল।

ঠিক এমনই সময় ঘরের ওদিককার কোণটাতে একটা কলধ্বনি উঠিল, খবরের কাগজের একখানা পৃষ্ঠা সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া এ উহার আগে পড়িতে চাহিতেছে। ব্যাপারটা লক্ষ করিয়া খগেন এবং অশনিকান্ত উভয়েই উদ্‌গ্রীবভাবে সেদিকে আগাইয়া গেল। তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একজন যুবক বলিয়া উঠিল, 'অহিভূষণ চৌধুরীর সন্ধানের জন্য খবরের কাগজে নোটিস ছাপানো হয়েছে, দেখেছেন? দু-একটাকা নয়, একেবারে টাকার আগুন! তিন-তিন হাজার টাকা পুরস্কার!'

কোনওপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া খগেন কাগজখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল, দেখিল, বিজ্ঞাপনে অহিভূষণের চেহারার একটা বিশদ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—'বয়স পঁয়ত্রিশ, গায়ের রং শ্যামবর্ণ, ডানদিকের গালে একটা আঁচিল, মাথার ঘন কৃষ্ণ চুল ব্যাকব্রাশ করিয়া পেছনের দিকে ফেরানো, একটা চোখ কিছু ট্যারা, সেটিকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে বেশিরভাগ সময়েই চশমা ব্যবহার করে... ইত্যাদি। যে কেহ সন্ধান দিতে পারিলে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে।'

বিজ্ঞাপনটি পড়িবার সময়ে খগেনের মুখে এতটুকু আতঙ্কের বা অস্বস্তিরও ছায়াপাত হয় নাই, কিন্তু সর্বশেষে নাম-স্বাক্ষরটি পড়িয়া সে বার কয়েক দাড়ি চুলকাইল, কহিল, 'এ কী, এ দেখি রণজিতের নাম! তাই তো, তার নামে এ বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে কেন? নাঃ, একটু ভাবালে দেখছি।'

অশনিকান্ত বলিল, 'রণজিৎ বলতে কার কথা বলছেন বুঝছি না, সেই খেলোয়াড়ের? তা

হয়ই বা যদি সে, তাকে ভয় করবার কী আছে? সে অহিভূষণ চৌধুরীর খবর জানতে পারবে এ-ধারণা আপনার কী থেকে হল?'

'রণজিৎ ছেড়ে রণজিতের ঠাকুরদাদারও ক্ষমতা নেই যে, এ-ব্যাপারে দন্তস্ফুট করে; সেজন্য আমি ভাবি না, আমি দেখছি রণজিতের আড়ালে আর একটি ছবি—সে বড় ভয়ঙ্কর চীজ।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ হুকা-কাশি।'

কথাটা উচ্চারণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গেই অশনিকান্তের হাতে একটা আচমকা হেঁচকা টান মারিয়া খগেন জানালার ধার হইতে সরিয়া আসিল, তারপর কম্পিত হস্তে আঙুল দিয়া গলির ওধারে অল্প দূরের একটা দৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করিল। এক যুবক অপর একটি লোকের সঙ্গে মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া কী কথা কহিতেছে আর মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। অশনিকান্ত একবার মাত্র সেদিকে তাকাইয়াই যুবকটিকে চিনিয়া ফেলিল; ইহার কথাই খগেন একটু আগে উল্লেখ করিয়াছিল। সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ তখন তারও মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল।

চোখের ইশারায় সকলকে জানালা হইতে সরাইয়া আনিয়া খগেন স্তব্ধভাবে ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। খবরের কাগজখানা তখনও তার হাতেই রহিয়াছে। সেখানার প্রতি অতর্কিতে আর একবার তাকাইতেই কিন্তু তার মুখ হইতে অন্ধকার কালো মেঘখানি ধীরে-ধীরে মুছিয়া গেল, আর তার জায়গায় দেখা দিল প্রসন্ন ভাব। মদু হাসিয়া সে কহিল, 'আমাদের সন্দেহ একেবারেই অমূলক অশনিবাবু, এখন না দেখে যদি আর আধঘণ্টা আগে ওকে দেখতাম তা হলে ভাবনার অন্ত থাকত না। বুঝতে পারছেন কেন এ-কথা বলছি?'

অশনিকান্ত ভ্রূ কুঁচকাইয়া কী কারণ তাহাই ভাবিতে লাগিল, তারপর হঠাৎ কোনও কথা মানুষের মনে আসিলে সে যেমনভাবে শব্দ করিয়া ওঠে ঠিক তেমনি ভাবেই বলিয়া উঠিল, 'হোঃ হোঃ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন, এখন আর ভাবনার কোনও কারণ নেই। বাস্তবিক, বিপদের গন্ধ পেলে মাথাটা কেমন চন্ করে ওঠে আর সোজা জিনিসগুলোও সব গুলিয়ে যায়।'

খগেন আবার বলিল, 'কলকাতার যে-কোনও রাস্তায় যে-কোনও লোকের যখন-তখন প্রয়োজন থাকতে পারে; কাজেই যাকে এ-অঞ্চলে দেখবার মোটেই আশা করি না তাকে যদি কোনওরকমে দেখতেও বা পাই তা হলেও ভয়ে শিউরে ওঠবার কোনও কারণ নেই।' কথা কয়টা উচ্চারণ করিয়া জানালার অন্তরাল হইতে উঁকি মারিয়া সে দেখিতে লাগিল—যুবকটি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া আছে, না চলিয়া গেছে। দেখা গেল, চলিয়া সে যায় নাই, তখনও সেই অপরিচিত লোকটির সহিত বাক্যালাপেই মগ্ন।

'দেখুন অশনিবাবু', খগেন পুনরায় কথা আরম্ভ করিল, 'সাবধানের বিনাশ নাই। আপনি ওকে চিনলেও ও আপনাকে চেনে না নিশ্চয়ই। আমি বলি, আপনি এই মুহূর্তেই পিছু-পিছু ওকে অনুসরণ করুন। ও কোথায় যায়, কী করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে ফিরবেন।'

বেলা আড়াইটা বাজিয়া গেল, অশনিকান্ত তখনও গোয়েন্দাগিরি করিয়া ফেরে নাই। হয়তো শ্রীপুর পর্যন্ত পাড়ি দিতে হইয়াছে মনে করিয়া খগেনও বড় বেশি চিন্তিত হয় নাই, কিন্তু তিনটা যখন বাজিবার উপক্রম হইল তখন বাস্তবিকই চিন্তার কিছু কারণ ঘটিল বইকী! উদ্বিগ্নভাবে বেশিক্ষণ কিন্তু কাটাইবার দরকার হইল না, বারকতক ঘর-বার করিবার পরই দেখা গেল অশনিকান্ত এমুখো হইতেছে। আজ বেচারার শাস্তি বড় কম হয় নাই, খাওয়া নাই, নাওয়া নাই, সকাল হইতে শুরু করিয়া এই দুরন্ত রৌদ্র মাথায় এতটা বেলা পর্যন্ত ঘুরিতে হইয়াছে। বয়সেও সে তো আর নবীন যুবা পুরুষটি নয়!

অশনিকান্ত সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেই খগেন সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, 'কী দেখে এলেন অশনিবাবু? সব মঙ্গল তো—আমার ধারণা অভ্রান্ত তো?'

'হ্যাঁ, মানে এদিক থেকে ভয় পাবার কোনও কারণ দেখলাম না। যেতে হয়েছিল কিন্তু একেবারে শ্রীপুর পর্যন্ত তেড়ে। শ্রীপুর পৌঁছে ও যখন সোজা গিয়ে চিনির কারখানায় ঢুকল তখনই বুঝলাম ব্যাপার বেশি গুরুতর নয়। বেলেঘাটায় এসে আমাদের আঁচতে পেরে থাকলে ও কি একবার দ্বারিকবাবুর সঙ্গে দেখা না করেই কারখানায় ঢুকত? আমার তো একবারও মনে হয় না। ভালো কথা, সেই বিজ্ঞাপন দেনেওয়ালা খেলোয়াড়টিকে যে শ্রীপুরে দেখে এলাম। সঙ্গে আর-এক ভদ্দরলোক, কে তা চিনি না, দ্বারিকবাবুর চাকর কালীচরণটাকে কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

'কালীচরণকে জিজ্ঞাসাবাদ? আপনি ঠিক চিনেছেন কালীচরণ? মানে আর কেউ নয়?' আর্তের মতো খগেন প্রশ্ন করিয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তে সে তখন হুকা-কাশির প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইতেছে —বুক তার ঢিবঢিব করিতেছে।

চার : চাদর-তত্ত্ব

অহিভূষণের অন্তর্ধানের পর হইতেই শ্রীপুর সুগার-মিলে কাজকর্মে যে বেশ একটু ঢিল পড়িয়াছে কারখানার বেয়ারা-আরদালি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কর্মচারীই তা কিছু-না-কিছু টের পাইতেছিল। প্রতিদিন যে পরিমাণ চিনি কল হইতে বাহির হইবার কথা, এ-ক'দিনে বোধকরি তার অর্ধেকটাও হইয়াছে কি না সন্দেহ। চিনি সরবরাহের জন্য নানা জায়গার পাইকারদের কাছ হইতে অর্ডারের পর অর্ডার আসিতেছে, সময়মতো মাল না পাওয়ায় তারা তাগিদের উপর তাগিদ দিতেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও সুবন্দোবস্তেরই লক্ষণ নাই। অহিভূষণের কাজকর্ম ছিল ঘড়ির কাঁটার মতো সুনির্দিষ্ট; ঠিক সাড়ে দশটার সময় সে আসিয়া দ্বারকানাথের বাড়িতে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরটিতে উপস্থিত হইত। জরুরি চিঠিপত্র-পাঠ এবং সেগুলির কী জবাব দেওয়া হইবে তার খসড়া তৈরি করাই ছিল এ-সময়কার প্রধান কাজ। দ্বারকানাথের কড়া হুকুম জারি করা ছিল, এ-সময় কেহ গিয়া আধমিনিটের জন্যও তার সময় নষ্ট করিতে পারিবে না। বেলা বারোটা বাজিবার সঙ্গে-সঙ্গে কাগজপত্র গুছাইয়া অহিভূষণ কারখানায় চলিয়া আসিত। ঠিক তার দেড় ঘণ্টা পরে দ্বারিকবাবর বাড়ি হইতে তার জন্য কারখানাতেই খাবার যাইত। সুদক্ষ সেনাপতি যেমন সামনে একখানা নকশা রাখিয়া বিশাল যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করেন, অহিভূষণও তেমনি অফিস-ঘরের টেবিলের উপরেই নিজের প্রয়োজনীয় একটা খসড়া রাখিয়া কেবলমাত্র কাগজ, পেন্সিল আর স্লিপের সাহায্যেই এতবড় কারবারটা চালাইয়া দিত। অনাবশ্যক হুঙ্কার, অনাবশ্যক ছুটাছুটি করিতে কেহ তাকে কখনও দেখে নাই, বেশি কথার লোকও সে ছিল না, অথচ যন্ত্রের মতো নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেকটি কাজ বিনা বাধায় উঠিয়া যাইত।

অহিভূষণের অভাবে দ্বারকানাথকে আপাতত চিনির কল চালাইবার ভার দিতে হইয়াছে তাঁর ছোটভাই সলিলের উপর। কিন্তু সলিল যে এ-কাজের পক্ষে কতটা অনুপযুক্ত এ-ক'দিনের মধ্যেই সকলে তা টের পাইয়াছে—বিশেষ করিয়া সন্তোষ। থাকিয়া-থাকিয়া মাঝে-মাঝে কোথায় যে সে গা-ঢাকা দিয়া বসে, সন্তোষ ভাবিয়া কূলকিনারা পায় না। সোনার হরিণটি খোয়া যাওয়ার পর হইতে সলিলের যে বেশ একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে আর কারও নজরে না আসিলেও সন্তোষের সতর্ক চক্ষুতে তা এড়ায় নাই। অন্তত বিশবার তার মনে হইয়াছে ব্যাপারটা দ্বারকানাথের গোচর করে, কিন্তু প্রতিবারই শেষ মুহূর্তে দ্বিধা আসিয়া পড়িয়াছে এই ভাবিয়া—পাছে তিনি মনে করিয়া বসেন যে-সলিলের প্রতি সে ঈর্ষাভাবাপন্ন। বাস্তবিকই তো সলিল ছাড়া আপনার জন বলিতে এ-জগতে আজ আর তাঁর আছে কে? একটি ভাগিনেয় ছিল—পরম আদরের ভাগিনেয়—দ্বারকানাথের স্বর্গতা ভগিনীর একমাত্র পুত্র। একদিন সামান্য কারণে ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ তাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়াছেন। সলিলের বড় তাঁর আর-একটি ভাই ছিল, সেও আজ আট-দশ বছরের উপর সুদূর আমেরিকায়

পড়িয়া আছে। ছেলেবেলা হইতেই সে-বেচারার একটু যাত্রা-থিয়েটারের দিকে ঝোঁক ছিল, বড় হইয়া সে একদিন কলিকাতায় কোনও এক পেশাদারি থিয়েটারের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল, ব্যস, সেই হইতে দ্বারকানাথের বাড়ির দরজা তারও নিকট বন্ধ, এবং বোধকরি চিরকালের জন্যই বন্ধ। এহেন সর্বনেশে বুড়াকে ঘাঁটানো আর খোঁচাইয়া ঘা তৈরি করা তো একই কথা। সন্তোষ দেখিতে গোবেচারা, মনে হয় বুঝি সাত চড়ের পরেও সে কথা কহিতে পারিবে না, কিন্তু আসলে সে বোঝে অনেক—অনেকখানি।

কয়েকজন বিশিষ্ট পাইকারের সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার উদ্দেশ্যে আজ সকালের দিকে সন্তোষকে একবার কলিকাতা পাঠানো হইয়াছিল; সে আলোচনার ফলাফল সলিলকে জানানো দরকার, কেননা ব্যাপারটা একটু প্রয়োজনীয়। কারখানায় ঢুকিয়া কিন্তু সে শুনিতে পাইল সলিল সেখানে নাই; বেলা অনেকটা গড়াইয়াছে, আহারাদির সময় হইয়াছে, বোধহয় সেই কারণেই সলিল অনুপস্থিত, এইরূপ মনে করিয়া সন্তোষও বাড়ির পথেই হাঁটা দিল। সে যখন বাড়ির ফটকের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন তার নজরে পড়িল, দুটি ভদ্রলোক গেট পার হইয়া ভিতরে ঢুকিতেছেন। সন্তোষ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল; শুধু দুপুর বলিয়া নয়, আজকাল কোনও সময়েই দ্বারকানাথ বড় একটা বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না। তার উপর দূর হইতে যতটা মনে হয় লোক দুইটি তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। এরূপ অসময়ে এই অপরিচিত ব্যক্তিদ্বয়ের আকস্মিক আগমনের কী হেতু হইতে পারে?

সাধারণত যতটা জোরে সে বরাবর পথ চলিতে অভ্যস্ত তার চাইতে অনেক বেশি জোরে—একরকম ছুটিতে-ছুটিতেই—অগ্রসর হইয়া সন্তোষ লক্ষ করিল, সম্মুখে বিরাট চত্বরটি পার হইয়া আগন্তুকদ্বয় ধীরে-ধীরে বাড়ির বারান্দায় উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন। একটু পরেই ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁদের সম্মুখীন হইল, প্রশ্ন করিল, 'কাকে চান আপনারা?' আগন্তুকদের মধ্যে একজন বয়সে যুবক, অপরটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। যুবকটিকেই উদ্দেশ করিয়া সন্তোষ প্রশ্ন করিয়াছিল।

'দ্বারিকবাবুর বাড়ি এইটে তো?'

'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?'

যুবকটি এ-প্রশ্নের সহসা কোনও জবাব দিল না, আড়চোখে তার সঙ্গীর মুখের পানে একবার তাকাইল মাত্র। এ-ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিতে তার সঙ্গী কোনওরকম ভুল করিলেন না, কথাবার্তা চালাইবার ভার নিজের উপর লইয়া বলিলেন, 'দ্বারিকবাবু আমাদের প্রত্যাশা করছেন, তাঁকে এই খবরটুকু দিলেই চলবে।'

সন্তোষ একটু সন্দিগ্ধ ভাবে ধীরে-ধীরে উপরে উঠিয়া গেল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই মহা-ব্যস্তভাবে একসঙ্গে তিন-চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে-লাফাইতে নামিয়া আসিল। তার হাতে একটা চাবি, তারই সাহায্যে পাশের একটা কামরা খুলিয়া দিতে-দিতে সে সসম্ভ্রমে বলিল, 'কর্তা এলেন বলে, আপনারা এই ঘরে ততক্ষণ বসুন এসে।'

তার কথা শেষ হইতে না-হইতেই সিঁড়িতে শব্দ শোনা গেল, অসুস্থ দ্বারকানাথ লাঠি ভর দিয়া নামিতেছেন। প্রত্যেকটি সিঁড়ি লাঠি ভর দিয়া বেশ করিয়া অনুভব করিতে-করিতে তিনি নামিতেছিলেন, অভ্যাগতদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'সাড়ে এগারোটার গাড়িতেও যখন এলেন না, তখন মনে করেছিলাম আজ বুঝি তবে আর আপনারা এলেনই না মিস্টার হুকা-কাশি।'

'আজ্ঞে ট্রেনটা মিস করার দরুণ স্টিমারে আসতে হল কিনা, তাই পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেছে...। আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর চোখে দেখতে অসুবিধে হয়, কষ্ট করে নিচে নামবার কী দরকার ছিল? আমরাই তো ওপরে উঠে আপনার কাছে যেতে পারতাম।'

যে-ঘরটা সন্তোষ খুলিয়া দিয়াছিল কথা বলিতে-বলিতে সকলে সেই ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। দ্বারকানাথ বলিলেন, 'এ-রুমটা অন্যান্য রুমের চাইতে একটু অন্ধকার হলেও, এমন নিরিবিলি জায়গা এ-বাড়িতে নেই বললেই চলে। দরজার পাশেই কামিনী ফুলের ঝাড় আর হাসনুহানার বেড়াটা পড়েছে

কিনা, তাই আলো একটু কম আসে; কিন্তু নির্জন বলে আমার সেক্রেটারি অহিভূষণের ভারি পছন্দসই ছিল এ-রুমটা। তার সমস্ত কাজকর্ম সে এখানে বসে করত...আঃ, বেজায় ধুলো জমেছে তো দেখছি, ক'দিন ধরে এ-ঘরটায় আর ঝাঁড়-পাঁড়ও পড়েনি বুঝি? এ-ঘর পরিষ্কারের ভার কার ওপর হে সন্তোষ, ভজুয়ার?'

'আজ্ঞে না, কালীচরণের।'

'ডাক তো সে-হতভাগাটাকে, কুঁড়ের বেহদ্দ কোথাকার!'

কাজের গাফিলতির জন্য স্বয়ং কর্তা তলব করিয়াছেন খবর পাইয়া কালীচরণ বেচারার মুখের চেহারাটা বড়ই বিশ্রী হইয়া গেল; বৈশাখ মাসের কমলালেবুর মতো শুকনো মুখে সে আসিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। দ্বারকানাথ রাগতভাবে কী বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁকে ইশারায় নিরস্ত করিয়া প্রথমেই কথা পাড়িলেন হুকা-কাশি। ভয়ে মৃতপ্রায় সেই বেচারার মুখের উপর দুই চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় রেখেছো সে-চাদরটা?'

'আজ্ঞে? আজ্ঞে চাদর...।'

'হ্যাঁ—গো, সেদিনকার সেই চাদরটার কথা জিজ্ঞাসা করছি। কোথায় সেটা?'

'আজ্ঞে, আছে তো আমার ঘরেই।'

'তোমার ঘরে, বটে? নিয়ে এসো তো।'

যদি বলা যায় এই ব্যাপারে দ্বারকানাথ এবং সন্তোষ বিশেষ আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল, তবে খুবই কম বলা হইল। বাস্তবিক যে-ব্যাপার ঘটিয়া গেল তা তাঁরা কানে শুনিয়া এবং চোখে দেখিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যে-ব্যক্তি এ-বাড়িতে জীবনে আজই প্রথম পদার্পণ করিল, একটু আগে পর্যন্ত কালীচরণকে চর্মচক্ষে দেখা দূরে থাক, নাম পর্যন্ত শোনে নাই, তার সঙ্গে কালীচরণের এহেন কথাবার্তা শুনিলে বাস্তবিকই লোকে যে শুনিতে ভুল করিয়াছে মনে করিবে তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিল না কেবল রণজিৎ। এ-কথার অর্থ এ নয় যে, সে-ও ব্যাপারটার বিন্দুবিসর্গ কিছু বুঝিতে পারিয়াছে। তবে অনেক দিন ধরিয়া হুকা-কাশির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা, এ-অদ্ভুত লোকটিকে যাদুকরের মতো অভাবনীয় অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইতে এত বেশিবার সে দেখিয়াছে যে, এখন আর এঁর কোনও কথায় বা কোনও কাজেই সে বিস্ময় প্রকাশ করে না। আপাতদৃষ্টিতে যতই হেঁয়ালিজনক মনে হউক না কেন, হুকা-কাশির প্রত্যেকটি কাজেরই যে একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, এতদিনের অভিজ্ঞতায় রণজিৎ তা মর্মে-মর্মে বুঝিতে পারিয়াছে।

দ্বারকানাথের অট্টালিকা হইতে খানিকটা দূরে চাকরদের থাকিবার সারিবদ্ধ ঘর—যেমন সাধারণত সাহেব-সুবাদের বাড়িতে হইয়া থাকে। বাড়ির অনেকখানি কমপাউন্ড পার হইয়া তবে এ-ঘরগুলিতে পৌঁছিতে হয়। সকলে দেখিতে পাইল, কালীচরণ মাঠ পার হইয়া তার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে আগাইতেছে। হুকা-কাশি হঠাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া সোজা মাঠের দিকে চলিয়া গেলেন। দেখা গেল, কালীচরণকে মাঝপথে থামাইয়া তিনি কী সব জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছেন। সন্তোষ গলা বাড়াইয়া ব্যাপার লক্ষ করিতেছিল হঠাৎ বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিতে পাইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সলিল একদৃষ্টে হুকা-কাশির পানে তাকাইয়া আছে—তার সমস্ত শরীর একটা দেয়ালের আড়ালে লুক্কায়িত।

পাঁচ ঃ কাশী বনাম কলিকাতা

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে বড় রাস্তা ধরিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের দিকে আগাইতে বাঁ-হাতে একখানি পানের দোকান পড়ে; বিদেশি যাত্রী, বিশেষত বাঙালি বাবুদের ভিড় সেখানে লাগিয়াই আছে। পানের জন্য যতটা না হউক, বিখ্যাত জর্দা এবং সুর্তির জন্য এ-দোকানখানি কাশীধামে বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন।

দোকানের মালিক ধনপৎ কাজেরিয়া একটা ফিনফিনে কাপড়ের টুপি মাথায়, গোঁফে তা দিতে-দিতে সম্মুখের জনসমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সারাদিন বসিয়া থাকে, বোধকরি 'ভারিগোছে'র খরিদ্দার কে হইতে পারে মনে-মনে তারই গবেষণা করে। গত কুড়ি বছর ধরিয়া কাশীবাসী সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক ধনপৎকে ঠিক এই একইভাবে দেখিয়া আসিতেছে।

তিনটি বাঙালি ছোকরা আসিয়া দোকানখানির সামনে দাঁড়াইল। একটু মনোযোগের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা শুনিলে এটা বুঝিতে কারওই কষ্ট হইত না যে, কাশীতে তারা এই সবে প্রথম আসিয়াছে। কোন-কোন জায়গা দেখা হইল, কোন-কোন স্থান দেখিতে এখনও বাকি, আজ বিকালের প্রোগ্রাম কী করা হইবে—আলাপটা চলিতেছিল সেই সব সম্পর্কেই। একজন তাদের মধ্যে ধনপতের সামনে আসিয়া কহিল, 'দেখি হে পয়সা তিনেকের পান—বেশ ভা—লো করে মশলা-টশলা দিয়ে আমাদের সামনে সেজে দাও দেখি!'

ধনপৎ পান বিক্রি করে একখানা টুলের উপর বসিয়া; তার সামনে হালফ্যাশান-দুরস্ত দোকানের মতো একটি কাউন্টার রহিয়াছে; ফলে রাস্তা হইতে নজরে আসে কেবল তার ভুঁড়িটুকু পর্যন্ত—শরীরের আর সমস্ত অংশই কাউন্টারের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া যায়। আগন্তুক ছেলে তিনটির বোধহয় লক্ষ্যে আসিল না যে ধনপৎ কাজেরিয়া দুই হাতে পানের মশলা নাড়াচাড়া করিতে-করিতে ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে বোতামের মতো ছোট অথচ উঁচু কী একটা জিনিস বার তিনেক টিপিয়া ছাড়িয়া দিল। তারপরেই পান সাজিতে সে হঠাৎ অতিরিক্ত রকম ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে আরও-একজন নূতন খরিদ্দার আসিয়া জুটিয়াছে; এ-ব্যক্তিটিও বাঙালি, তবে বয়স্ক এবং বহুদিন কাশীবাসের ফলে বেশভূষায় একটু হিন্দুস্থানী ভাব লক্ষ করিবার বিষয়। সে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, 'মিঠ্‌ঠা-খোসবী সূর্তি হ্যায় শেঠজি?'

'কত লিবে?'

'পা'ভর।'

চোখের তারা দুইটি উপরে তুলিয়া ধনপৎ মনে-মনে একটু ধ্যান করিল, তারপর কহিল, 'বোলনে নেই শকতা! দেখনে হোগা হ্যায় কি নেহি।' যে-ছেলেটি পান চাহিয়াছিল তার দিকে তাকাইয়া কহিল, 'মেহেরবানি করকে একমিনিট মাফ কীজিয়ে বাবুসাব।'

দোকানঘরটিকে আড়াআড়িভাবে ভাগ করিয়া মধ্যখানে একখানি কাঠের পার্টিশন, তার অপর দিকে ধনপতের জর্দা-সূর্তির ভাণ্ডার। ভাণ্ডারের অভ্যন্তরে ধনপৎ অদৃশ্য হইয়া গেল এবং একটু পরেই তার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, 'অন্দরমে আ কর সূর্তিকা ওজন দেখ লিজিয়ে।'

আহ্বান শুনিয়া নবাগত খরিদ্দারও ধনপতের অনুসরণ করিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে দুই জন একত্র হইতেই খরিদ্দার ফিস-ফিস করিয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কী সর্দার, কলিং বেল টিপে ডেকে পাঠালে যে! অশনিবাবুর চিঠি...।'

সর্দারের ললাটে তখন চিন্তার চিহ্নস্বরূপ তিনটি রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে কহিল, 'কলকাত্তার কথা পরে হোবে রামদয়াল—রাৎরে; আগে হাঁথের চিড়িয়াটা পাকড়া। টঙ্গা কোথা? ফুকন সিং কী করিয়ে এল?'

'ফুকন সিং তো তোমার হুকুমমতো ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারিটাকে নিয়ে সারনাথ দেখাতে গেছে, এখনও ফেরেনি তো! অবশ্য ফেরবার সময়ও হয়নি।'

'আচ্ছা, এক্কা ঠিক আছে? শিউরতনকে বোলায় দিতে পারবি।'

'তা বরং সম্ভব।'

'বহুৎ আচ্ছা। হামার দুকানে যে তিনঠো বংগালি বাবু পান কি-নার লেইগে দোঁড়িয়ে আছে তুই ভালু করে ওদের চিনহিয়ে রাখ। বেলা পাঞ্চটার সময় ওরা রামকিষেণ মিশন থেকে আনওয়ারসিটি

দেখতে নাগোয়া যাবে। পাঞ্চটার সময় শিউরতন ওহি জায়গায় হাজির থাকবে, ওদের সওয়ারী করে লেবে। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আনওয়ারসিটি দেখলাবে, ঘোঁড়াকে দানাপানি খিলাবে, সাড়ে আটটার আগে আনওয়ারসিটির ফটকসে বাহার হোবে না। নওটার কুছ আগে তুই পাঁচ-সাতটা আদমি লিয়ে রাস্তার মধ্যি লুকিয়ে থাকবি, এক্কা হাজির হলেই ছোরা দেখলায়ে ওদের সব চীজ কেড়ে লিবি। পিঢ়হানে সোনার বোতাম আছে, হাথে দামি ঘড়ি আছে, আংটি ভি আছে। কারে বান্ধা চশমাগুলো বিলকুল রোলগোল—তবু ছিনিয়ে লিবি, আঁখুসে কুছু দেখতে পাবে না। হোটেলে উঠেছে, রূপেয়া উপেয়া লোট-উট সমুচয় পাকিটে-পাকিটেই ঘুরবে।'

শিষ্যকে যথোচিত উপদেশ দিবার পর ধনপৎ ঠোঙায় মোড়া খানিকটা ভাঙ তার হাতে তুলিয়া দিল, কয়েকটা টাকাও দিল—উদ্দেশ্য বাহিরের লোকে বুঝিবে রামদয়াল ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকান হইতে মিঠ্‌ঠা-খোসবী সূর্তি কিনিয়া বাহির হইতেছে। টাকাটা রামদয়াল দোকান হইতে বাহির হইবার সময় মূল্যস্বরূপ ধনপতের হাতেই ফিরাইয়া দিয়া যাইবে। কাশীতে এই ধরনের খরিদ্দার ধনপতের আরও অনেক আছে।

রাত্রি এগারোটার সময় দোকানের দরজা বন্ধ করিয়া ধনপৎ যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল সেটাকে তার বাড়ি বলিলে যথার্থ বর্ণনা দেওয়া হইবে না, বলা উচিত আস্তানা।

কাশীর গলির তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরা গবেষণা করিবেন, তবে এ-কথা নিশ্চিত যে, এ-আস্তানাটি যে-অঞ্চলে, সেখানকার গলির উপমা পৃথিবীতে নাই। একটা গোলক-ধাঁধা বলিলেই হয়, এরোপ্লেন হইতে ফটো তুলিয়া মাসিকের ধাঁধা বিভাগে ছাপাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। যারা কাশীতে আজন্ম কাটাইয়াছে তাদেরও কয়েকজনকে এখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিলে সারাদিনেও পথ খুঁজিয়া পাইবে কি না, ঘোরতর সন্দেহের বিষয়।

আস্তানাটি একটা বহু পুরাতন বাড়িতে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যখন কাশীনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেইসময় তাঁরই কোনও প্রজা এটি তৈরি করিয়া থাকিবে। প্রকাণ্ড ঘরের মেঝেয় সমস্তটা জায়গা জুড়িয়া ফরাস পাতা, তারই উপর দশ-বারোজন লোক—কেউ চিৎপাত হইয়া পড়িয়া আছে, কেউ বা ঘুমাইতেছে, বাকি কয়জন হামানদিস্তার মতো বিরাট পাত্রে একমনে সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে। দরজা ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, ধনপৎ বারকয়েক করাঘাত করিল। এ করাঘাতের একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে যাহাতে ভিতরের লোকে বুঝিতে পারে যে-আগন্তুক তাদেরই গোষ্ঠীর কেউ, দরজা নির্ভাবনায় খোলা যাইতে পারে।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া ধনপৎ ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিল; ফরাসের একধারে অনেকগুলি টাকা ও নোট স্তূপাকারে পড়িয়া আছে, তারই পাশে একটু দূরে কতকগুলি সোনা ও রূপার অলঙ্কার। এগুলি আজ সারাদিনের লুণ্ঠিত 'লভ্য'। ধনপৎ মনে-মনে খুশি হইয়া একজন সাগরেদকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রামদয়াল কোথা রে?'

যাকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্নটি করা হইয়াছিল, সে রামদয়ালেরই কনিষ্ঠ কৃষ্ণদয়াল, উত্তর করিল, 'দাদা তো ফেরেনি এখনও সর্দারজি!'

'আভিতক ফিরল না? নওটার সময় নাগোয়ামে লুঠ সারার কথা, সাড়ে গ্যারা হয়ে গেল যে!' ধনপৎ বিস্মিত, একটু বুঝি চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিল, 'শিউরতন? উঁ কোথায়?'

'সে তো ফেরেনি!'

ঠিক এইসময় দরজায় আবার করাঘাত পড়িল, পরিচিত, কিন্তু একটু যেন দুর্বল করাঘাত। ধনপৎ নিজেই দরজা খুলিয়া দিতে উঠিয়া গেল কিন্তু পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে এবং আতঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল—রামদয়াল টলিতে-টলিতে কোনওমতে ঘরে ঢুকিতেছে, তার পরনের জামা-কাপড়গুলি কে যেন কাদা-গোলা জলে ছোপাইয়া দিয়াছে, ঠোঁটের কোণে এবং চিবুকে রক্তের দাগ, আর কপালটি ফুলিয়া হইয়াছে ঠিক যেন একটা দু'পয়সা দামের মার্বেল। তার পিছনে শিউরতনের অবস্থাও খুব সুবিধাজনক নয়, সেও খোঁড়াইতেছে।

ধনপৎ প্রথমে মনে করিল, রামদয়াল বোধহয় টাকা হাতে পাইয়া একটু অতিরিক্ত রকম নেশা করিয়াছে, তারই ফলে ড্রেনে গড়াইয়া পড়িয়া তার এ-অবস্থা। কিন্তু ভালো করিয়া লক্ষ করিতেই বুঝিল তার সে-অনুমান ঠিক নয়—রামদয়ালের কথায় জড়তা বা চলনে মত্ততা নাই, আছে কেবল প্রচুর অবসাদ। ঘরে ঢুকিয়াই সে মেঝের এককোণে বসিয়া পড়িল, কহিল, 'ডাকাত, সর্দার, স্রেফ ডাকাত—একেবারে শয়তানের চেলা! আমাদের সব ক'জনাকেই মেরে পাট-পাট করে দিয়েছে!''

'ওই তিনঠো বংগালি ছোকরা কাশীর গুণ্ডাদের ঠুকে লাট-পাট করিয়ে দিল!'

'শুধু তিনজন হলে তো ভাবনাই ছিল না, সর্দার, দলের ভেতর ছিল আরও জনা পঞ্চাশেক। একেবারে বাছা-বাছা জোয়ান, অসুরের মতো কব্জির জোর। ব্যাপারটা কীরকম ঘটল বলি শোনো। ঝোপের আড়ালে আমরা ওত পেতে বসে আছি, ঠিক ন'টার সময় শিউরতন এক্কায় করে ওদের এনে হাজির করল। আমি লাফিয়ে গিয়ে ঘোড়ার রাশ চেপে ধরলাম, গিরিধারী ছোরা বার করে এগিয়ে যেতেই ওরা চিৎকার করে উঠল। তারপরেই ঘটল একেবারে অবাক কাণ্ড! প্রথমে শুনলাম ঝড়ের মতো একটা হু-হু শব্দ, তারপরেই চেয়ে দেখি প্রায় পঞ্চাশ জন বাঙালি ছোকরা সাইকেল হাতে আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের হাতে আর কিছু নেই, শুধু এক-একটা করে সাইকেলের পাম্প। বিষ্টির ফোঁটার মতো সেই পাম্পের বাড়ি অনবরত আমাদের মুখে, কপালে, ঘাড়ে পড়তে লাগল—উঃ, ব্যাটাদের কব্জি নিশ্চয়ই ইস্পাতের তৈরি—গিরিধারীর হাতে এক মোচড় দিয়ে কীভাবে ছোরাটা ছিনিয়ে নিলে! দ্যাখো সর্দার, কী অবস্থা করেছে!' বলিয়া রামদয়াল ললাটের স্ফীতি, ওষ্ঠ, চিবুক প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

'আমরা বুঝলাম,' রামদয়াল আবার কহিতে লাগিল, 'এখানে বাধা দেওয়ার মানে নির্ঘাত মারা পড়া, তাই যে যেদিকে পারি ছিটকে পড়লাম। ''ডাকু''গুলো তবু কি রেহাই দেয়? পেছন-পেছন তেড়ে এল। জঙ্গলে ঢাকা একটা খানা দেখতে পেয়ে তারই ভেতর তখন নিজেকে টান-টান শুইয়ে দিলাম। সেই নোংরা গন্ধ-ধরা পাঁকের ভেতর একঘণ্টা নরকবাস করে যখন দেখলাম গণ্ডগোল থেমে গেছে তখনই কেবল বাড়িমুখো রওনা হতে পেরেছি। তবু সোজা পথে আসতে ভরসা পাইনি, কী জানি, ব্যাটারা যদি থানা-পুলিশ কাণ্ড করে থাকে! অন্ধকার গলিঘুঁজি ঘুরে-ঘুরে তবে এসেছি।'

শিউনন্দন কহিল, 'ম্যায়নে তো হল্লা দেখ কর, গাছ পর চঢ় গয়া, উংরানেকো বখৎ গির গয়া!'

ধনপৎ শিউনন্দনের ক্রন্দন কানে তুলিল না, রামদয়ালকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'রাত নওটার সময় নাগোয়ার পথে পচাশঠো সাইকেল! এ তো তাজ্জব কথা আছে রে রামদয়াল!'

রামদয়াল সংশোধন করিয়া কহিল, 'তাজ্জব নয় সর্দারজি, ভয়ের কথা। ঘোড়ার রাশ ধরবার সময় সওয়ারীদের আলাপ আমার কানে এসেছে—ওদের মুখে অশনিবাবুর নাম শুনেছি।... তোমার দোকানে পান কেনবার সময় যত ন্যাকা ওদের ঠাওরেছিলে আসলে তত ন্যাকা ওরা নয়। সোনার হরিণ নিয়ে তলে-তলে মস্ত একটা ব্যাপার চলছে।'

'তবে তো আমাকে, তোকে, সব চিনহিয়ে রেখেছে!'

'খুব সম্ভব। আমাদের বোধহয় এখন পিছিয়ে পড়াই ভালো।'

ধনপৎ ললাট কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু চিন্তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না—সোনার হরিণের জ্যোতির্ময় রূপ স্মরণ করিয়া লোভীর দুই চোখ জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল, কহিল, 'চিনহিয়েছে তো চিনহুক, হামিও চালবাজি কুছু কম জানি না। হামার নাম ধনপৎ কাজেরিয়া—দেখি কাশীবালা গুণ্ডাই বড় না কলকাত্তাবালাই বড়!'

ছয় : মেধাবী ছাত্র

প্রথম যেদিন হুকা-কাশি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া দ্বারকানাথের বাড়ি যান, সেদিন অত্যধিক বেলা হইয়া পড়ায় তাঁর যত কিছু জ্ঞাতব্য ছিল সমস্তই জানা সম্ভব হয় নাই। দিনকয়েক পরে খবর পাঠাইয়া আবার তাই একদিন তিনি শ্রীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্তোষের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিন ধরিয়া কারখানার অফিসঘরগুলি পরিষ্কার করা হইতেছিল। এতবড় একটা কারবার যে চালাইতেছিল সেই অহিভূষণ চৌধুরী সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্তর্হিত হইয়া পড়ায় কিছুই তার নিকট হইতে বুঝিয়া লওয়া যায় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কোথায় কীভাবে আছে ঠিক-ঠিকানা নাই, কর্মচারীদের প্রতি তাই আদেশ দেওয়া ছিল যেন কুটাটি পর্যন্ত কেহ নষ্ট না করে। প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় নানা সামগ্রী এ-ক'দিন ধরিয়া ম্যানেজারের টেবিলের উপর জমা হইতেছে; সলিল এবং সন্তোষ পরীক্ষা করিয়া যেগুলি আবশ্যক বোধ করিবে, তুলিয়া রাখিবে, বাকিগুলি আবর্জনার স্তূপে বিসর্জন দেওয়া হইবে।

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিতে সর্বপ্রথমেই টেবিলের উপরকার এই অভিনব 'মিউজিয়াম'টি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; নানারকম জিনিস পাশাপাশি সাজানো রহিয়াছে, একটির সহিত অপরটির কোনওই কারণগত সম্পর্ক নাই। হুকা-কাশি সেগুলির দিকে একবার শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাইয়া হঠাৎ তার মধ্য হইতে, বোধকরি কৌতূহলবশতই, একটা জিনিস হাতে তুলিয়া লইলেন—একখানা সবুজ রঙের বাঁধানো মোটা একসারসাইজ বুক, তার চারিদিকের অনেকটা অংশ আগুনের আঁচে পুড়িয়া গেছে। খাতাখানি হাতে লইয়া একমনে পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে সলিলকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, 'আপনাদের কারখানায় কি পাঠশালা বসে না কি সলিলবাবু?'

'আজ্ঞে?'

'জিজ্ঞাসা করছি, ছোটছেলের লেখা ইংরেজি ফার্স্টবুকের কপি চিনির কারখানায় এল কোত্থেকে? মজুরদের জন্যে কি এখানে নাইট স্কুলের বন্দোবস্ত আছে না কি?'

'না তো!' পরম বিস্ময়ে সলিল এবং সন্তোষ একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িল, দেখিল হুকা-কাশি ঠাট্টার ছলে কিছুই অতিরঞ্জিত করিয়া বলেন নাই, বাস্তবিকই খাতাখানি একটি অল্পবয়সী ছাত্রেরই বটে, বিশেষ যত্নের সহিত ধরিয়া-ধরিয়া গোটা-গোটা অক্ষরে প্রথম পৃষ্ঠাতেই সে 'গরুর গল্প' লিখিয়াছে। দুইজনেই যথার্থ বিস্ময়ের সহিত পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল, কিন্তু হুকা-কাশির সেদিকে কোনও লক্ষ্যই দেখা গেল না, অখণ্ড মনোযোগ সহকারে একটি-একটি করিয়া খাতাখানার সবগুলি পৃষ্ঠা তিনি উল্টাইয়া অবশেষে কহিলেন, 'অদ্ভুত মেধাবী এ-ছাত্রটি; এরকমটি আর কোথাও দেখিনি। এ-খাতাখানার সন্ধান কোথায় মিলল একটু খোঁজ নিয়ে জানাতে পারেন কি?'

সন্তোষ উঠিয়া গিয়া অনুসন্ধান লইয়া আসিল। মাঝে-মাঝে কাজকর্মের অত্যধিক চাপ পড়িলে কারখানা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা রাখা হয়, চা এবং জলখাবার তৈরির উদ্দেশ্যে তাই একটা স্বতন্ত্র ঘর আছে। তারই উনুনের মধ্যে খাতাখানির সন্ধান নাকি মিলিয়াছে। চিনির কারখানায় ছোটছেলের লিখিবার খাতার আবির্ভাব যেমন আশ্চর্যজনক, উনুনের মধ্যে তাহার আবিষ্কার-কাহিনী ততোধিক অভাবনীয়। এ-বিস্ময়কর রহস্যের কোনওই কূলকিনারা করিতে না পারিয়া সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল হুকা-কাশি ধ্যানস্থের মতো অর্ধনিমীলিত-নেত্রে দু-তিনটিপ নস্য লইলেন।

'আপনাদের আপিসের কাজে মাস-মাস মনিহারী জিনিস—স্টেশনারি—যেসব কেনা হয় তার একটা হিসাব নিশ্চয়ই আছে?' হুকা-কাশি হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্নটি সকলের কানেই নিতান্ত অবান্তর বলিয়া বোধ হইল; সোনার হরিণের পুনরুদ্ধারে অফিসের স্টেশনারির—দোয়াত-কলম-কালি-পেন্সিলের—হিসাব যে কী প্রয়োজনে আসিতে পারে তার অণুমাত্রও কারও বোধগম্য হইল না। হুকা-কাশি ব্যতীত অপর কেহ এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সন্তোষ

নিশ্চয়ই অপাঙ্গে তার হাতঘড়িটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিত—দেখিত কতখানি সময় বৃথা নষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ-লোকটির নাকি সবই অদ্ভুত, কোন তুচ্ছ প্রশ্ন ভবিষ্যতের কোন দুরূহ সমস্যার যে সমাধান করিবে তা নাকি কেহই বুঝিতে পারে না। সে কেবল একবার সলিলের দিকে তাকাইল, অর্থাৎ ইঙ্গিতে তাকে ড্রয়ারের ভিতর হইতে হিসাবের খাতাখানি বাহির করিয়া দিতে অনুরোধ করিল।

হিসাবে খাতা আসিলে হুকা-কাশি কিছুক্ষণ বেশ করিয়া সেখানা পরীক্ষা করিলেন, তারপর খোলা পাতার এক জায়গায় ডান হাতের তর্জনী আঙুলটি রাখিয়া সলিলকে জিজ্ঞাসা করিলে, 'এই ফিতেটা বড্ডই ঘন-ঘন এসেছে, না?'

সলিল প্রথমটা এ-প্রশ্নের হেতু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিন্তু ক্রমেই যেন তার মুখে ভাবান্তর ঘটিতে শুরু করিল—একটু পূর্বের নির্লিপ্ত ভাব কোথায় উবিয়া গেল। এতক্ষণ সে ছিল হুকা-কাশির পাশে দাঁড়াইয়া, এইবার ধীরে-ধীরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। তার ভ্রূ পুনরায় কুঞ্চিত হইয়াছে—আষাঢ়ের কালো মেঘ আবার মুখে নামিয়া আসিতেছে। হুকা-কাশি খাতা-পরীক্ষার ছলে আড়চোখে একবার তার আপাদমস্তক দেখিয়া লইলেন, সন্তোষ গম্ভীরভাবে জানালার ধারে উঠিয়া গিয়া গলা পরিষ্কার করিতে হঠাৎ যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

যেদিন প্রাতঃকালে উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটে, সেদিনকারই সন্ধ্যার পরের কথা বলিতেছি।

খগেন্দ্রনাথের বেলেঘাটার বাসাবাড়িতে রাত পৌনে আটটার সময় সকলে আহারে বসিয়াছে। 'চিত্রা'য় একখানা নূতন ছবি আসিয়াছে, বায়োস্কোপ-রস-রসিকদের সেখানে বেজায় ভিড়। অশনিকান্তের এ-বিষয়ে বড়ই উৎসাহ, সে পূর্বাহ্ণেই গিয়া কয়েকখানা টিকেট কিনিয়া আনিয়াছে। কেবলমাত্র গুর্খা দরোয়ানটার পাহারায় বাড়ি ফেলিয়া রাখিয়া সকলের একসঙ্গে বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়, তাই খগেন্দ্রনাথ নিজেই প্রস্তাব করিয়াছে এ-যাত্রা সে বাড়িতেই রহিয়া যাইবে, ছবিখানা যদি বাস্তবিকই সকলের চোখে ভালো লাগে তবে কাল সে একা গিয়া দেখিয়া আসিবে। ঠাকুরকে বলা হইয়াছে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়া গেলে খগেনের শোয়ার ঘরে তার জন্য ভাত ঢাকা দিয়া সে যেন বাড়ি চলিয়া যায়।

একটু পরে সাজসজ্জা করিয়া সকলেই বাড়ির বাহির হইয়া গেল। এই অবসরে নিরিবিলিতে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলার উদ্দেশ্যে খগেন কাগজ-কলম লইয়া বসিল, কিন্তু অনেক কাটাছাঁটার পরেও চিঠিখানার ভাব ও ভাষা কোনওটাই যখন তার মনঃপূত হইল না, তখন বিরক্ত চিত্তে লেখার সরঞ্জাম তুলিয়া রাখিয়া সে আহারে বসিল। আজ সারাদিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, বাতাসের লেশমাত্র নাই। খাওয়া-দাওয়ার পর খগেন্দ্রনাথ বসিবার ইজিচেয়ারটাকে বারান্দার কাছে ঠিক জানালার সম্মুখে টানিয়া আনিল, খোলা জায়গায় চিৎ হইয়া যদি কিছু আরাম পাওয়া যায় সেই ভরসায়। ইজিচেয়ারের পাশে টিপয়ের উপর রহিল গুলিভরা একটা পিস্তল। আজকাল সন্ধ্যার পর একমুহূর্তের জন্যও খগেন এ-অস্ত্রটিকে কাছছাড়া করে না।

সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের পর এতক্ষণে ঝিরঝির করিয়া একটু বাতাসের আভাস দেখা দিয়াছে, ইজিচেয়ারের উপর দেহভার এলাইয়া দিতে খগেন যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস লইয়া বাঁচিল। ঘুমের উপর যাদের এতটুকু আধিপত্য নাই খগেন সে-শ্রেণীর লোক না, ইচ্ছা করিলে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়া দেওয়া তার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু গ্রীষ্মের রাত্রিতে কলিকাতার দক্ষিণের বাতাসে কী যে সম্মোহনী শক্তি আছে জানি না, ধীরে-ধীরে খগেনের দুই চোখ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ঠিক কতক্ষণ এভাবে কাটিয়াছে সে-সম্বন্ধে খগেনের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না, হঠাৎ খট্‌ করিয়া একটা শব্দ হওয়ায় সে সচকিত হইয়া উঠিল। তার মনে হইল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। ইজিচেয়ারে শুইবার আগে ইলেকট্রিক আলোর প্রখর রশ্মিতে সমস্ত ঘরখানা ঝলমল করিতেছিল, সে আলো এত মৃদু এবং ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে যে ঘরের সম্পূর্ণ অংশও আর চোখে পড়ে না। পরমুহূর্তেই

আলোর রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু সমস্ত ঘরখানা জুড়িয়া নয়, কেবল একটা কোণ হইতে মনে হইল যেন অসংখ্য নক্ষত্রের তীব্র দ্যুতি তীরের ফলার মতো তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। বিস্মিত খগেন চোখ রগড়াইয়া ভালো করিয়া আর-একবার তাকাইতেই আতঙ্কে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল—কালো দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার একটা লোক তারই দেওয়াল-আলমারির সামনে দাঁড়াইয়া—তার হাতে দ্বারকানাথের সোনার হরিণ আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে।

স্বপ্নাবিষ্টের মতো খগেন্দ্রনাথ পাশের টিপয়টির উদ্দেশে হাত বাড়াইল, কিন্তু ইতিপূর্বেই সেটি স্থানভ্রষ্ট হইয়া গেছে। সে ধড়মড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল কিন্তু ইস্পাতের মতো কঠিন একখানা হাত পিছন হইতে এমনই জোরে তার কণ্ঠটি চাপিয়া ধরিল যে, সে না পারিল নড়িতে, না বাহির হইল তার মুখ দিয়া এতটুকু স্বর। সেই মুহূর্তে সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে দেখিল, যমদূতের মতো চারিটা লোক চারিখানি খোলা ভোজালি তার গায়ে ঠেকাইয়া নির্বাকভাবে দাঁড়াইয়া আছে। যে-লোকটা পিছন হইতে খগেনের গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল সে তার দূরবর্তী সঙ্গীটিকে লক্ষ করিয়া বলিল, 'মাল পাওয়া গেছে তো? তবে এবার এটাকে গলা টিপে এখানেই সাবড়ে দিই, কী বল?' ভোজালিধারীদের মধ্যে একজনের বোধকরি কথাটা তেমন মনঃপূত হইল না, সে কহিল, 'হাত নষ্ট করতে যাবে কেন দাদা? ভোজালি রয়েছে কীসের জন্যে?'

খগেনের মনে হইল গলার চাপুনি একটু যেন কমিয়াছে, সে অতিকষ্টে বলিল, 'তোমরা তবে হুকা-কাশির লোক? আমার বিশ্বাস ছিল তার কাজকর্মের ধারা অন্যরকমের। সবাই দেখছি তবে এক!'

'হুঁকা? হুঁকা আমরা কেউ টানি না, আমাদের কাশিও হয় না। তবে তুমি যদি ফের মুখ খোলো তবে তোমাকে যে ফাঁসি দেব তাতে ভুল নেই। আরেঃ, নিচে টর্চ হাতে ঘুরছে ও কে রে?' লোকটার শেষ কথাগুলি ভয়ে যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল।

একজন তাড়াতাড়ি বারান্দার দিকে দেখিয়া আসিতে গেল, কিন্তু কিছুই তার নয়নগোচর হইল না; কহিল, 'তোমার বাপু একটু স্বপ্ন দেখার স্বভাব আছে! কই, কোথায় পেলে তুমি টর্চ-হাতে মানুষ? দরোয়ানটার কি আর ওঠবার অবস্থা রেখেছি?'

'না-না, দরোয়ান নয়, অন্য লোক, আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি। তোরা যা, শিগগির নিচে গিয়ে কী ব্যাপার দেখে আয়। আমি এদিক সামলাচ্ছি।'

সাত ঃ অদৃশ্য শত্রু

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে কাশীতে ধনপৎ কাজেরিয়ার নিকট রেজিস্টার্ড খামে মোড়া একখানি চিঠি আসিল। চিঠিখানা হিন্দিতে লেখা, বানান আর ব্যাকরণের ভুলগুলি শুদ্ধ করিয়া বাংলায় তরজমা করিলে সেখানা এইরূপ দাঁড়ায় ঃ

'সর্দারজি,

তোমার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালা হয়েছে আর তার ফলে যে উদ্দেশ্যে আমাদের কলকাতা আসা সে-কাজটিও সম্পন্ন হয়েছে। তবে "সু" সম্পন্ন হয়েছে কি না তা এখনও ঠিকমতো বুঝতে পারছি না। সমস্ত ব্যাপারটাতেই কেমন যেন একটা অজানা রহস্যের ছায়া দেখছি। এই নির্জন জায়গায় বসে তোমার কাছে চিঠি লিখতেও মাঝে-মাঝে গা'টা যেন ছমছম করে উঠছে, মনে হচ্ছে অলক্ষে আমার পেছন থেকে উঁকি মেরে একজোড়া চোখ বুঝি গোপন তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত।

আমরা এখানে রওনা হয়ে আসবার আগে তুমি বুক ঠুকে বলেছিলে, "দেখি,

কাশীবালা গুণ্ডাই বড়, না কলকাত্তাবালাই বড়!" কথাটায় তখন আমাদের অনেকখানি আত্মবিশ্বাস জেগে উঠেছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নেমে এখন যেন বুঝতে পারছি কী ভয়াবহ জীব এরা। এদের কাজের ধারা প্রত্যক্ষ করলে মনে হয় সেই ছেলেবেলার গল্পে শোনা একদল "জিন" বুঝি এদের হুকুম তামিল করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছে—তারা যেন সর্বজ্ঞ, আমাদের সমস্ত মতলবই টের পায়; যে-কোনও জায়গায় হাওয়া ফুঁড়ে ইচ্ছামতো তারা বার হতে পারে, আবার যখন-তখন হাওয়াতেই মিলিয়ে যেতে পারে। কাশীতে নাগোয়ার পথে ঝড়ের মতো হঠাৎ উড়ে এসে পঞ্চাশ জন শয়তানের চেলা যখন আমাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, তখন আশ্চর্য আমরা যতই হই না কেন, তারা যে আমাদেরই মতো রক্তমাংসের জীব অন্তত সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু অশনিবাবুদের বাড়ি থেকে সোনার হরিণ লুটে আনবার পর আমাদের চোখের সামনে এমন সব ধাঁধার সৃষ্টি হচ্ছে যে, তারা বাস্তবিকই মানুষ না অন্য কোনও অশরীরী জীব তা নিয়ে আমাদের মধ্যে নিয়তই আলোচনা চলছে। আমার এ-চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লেই বুঝতে পারবে কেন আমি এ-কথা বলছি।

'অশনিবাবুদের বাড়ির প্রায় সবাই রাত্তিরের শো'তে বায়োস্কোপ দেখতে যাবে খবর পেয়ে সেদিনই তোমার উপদেশ মতো আমরা আমাদের বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললাম। গুর্খা দরোয়ানটার পেটে ওষুধ পড়তে সে এমনই অকাতরে ঘুমোতে শুরু করে দিল যে, বিহার বা কোয়েটার মতো বড়রকমের একটা ভূমিকম্প না হলে সে যে তার চারপায়া ছেড়ে উঠবে না তা স্পষ্ট বোঝা গেল। টুক করে তার কোমর থেকে কুকরিটি তুলে নিয়ে কেষ্ট খাটিয়ার সঙ্গেই তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চাদর চাপা দিয়ে রাখল—যেন নিমতলায় বয়ে নিয়ে যেতেই যা বাকি। কিন্তু সর্দারটি ওদের যে বিশেষ ঝানু তা স্বীকার করতেই হবে। আলমারির গায়ে ছেনির ঠকাঠক শুরু হতেই তার তন্দ্রা ছুটে গেল, ধড়মড়িয়ে ইজিচেয়ারের ওপর উঠে বসতে যাচ্ছিল, পেছন থেকে আমি তার গলা টিপে ধরলাম, আর সামনে থেকে কেষ্ট আর ফুকন সিং ভোজালি উঁচিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে রাখল। মনে-মনে একটু খুশি হলাম এই ভেবে যে, অতি সহজেই সব গোল চুকে গেল, মারামারি, রক্তপাতের দরকার হল না। হঠাৎ কিন্তু একতলার দিকে নজর পড়তেই আমার চক্ষুস্থির! ছিপছিপে, ছায়ার মতো কালো একটা মূর্তি মাঝে-মাঝে টর্চ ফেলে আনাচে-কানাচে উঁকি মেরে কী দেখছে। নাগোয়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করে আমার সারা দেহ কেঁপে উঠল; বিদেশে ঝড়ের-মতো-আসা সে-দলটা সেবার অন্তত আমাদের প্রাণটা রেহাই দিয়েছিল, আজ নিজের দেশে মুঠোর মধ্যে পেয়ে সবাইকে টুকরো-টুকরো করে রেখে গেলেই বা প্রতিরোধ করবার কে আছে? সে-স্থানটা আবার এমনি যে, সন্ধ্যার পর বাড়ির মধ্যে ছোটখাটো একটা কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে গেলেও প্রতিবেশীরা যে তার কোনও সাড়াশব্দ পাবে সে-আশা নাই। কী করে এরা আমাদের সমস্ত মতলব আগে থেকে টের পেয়ে ঠিক সময়মতো এসে উপস্থিত হয় তা এক ভগবানই জানেন। তাড়াতাড়ি, কেষ্টকে পাঠিয়ে দিলাম ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য; আর নিজে খগেনের পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে, পাশে বাক্স-প্যাঁটরা রাখবার ছোট্ট একটা যে গুদাম ছিল, তারই মধ্যে ওকে পুরে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলাম। ততক্ষণে কেষ্ট ফিরে এসেছে, বললে সে আর ফুকন সিং সমস্ত বাড়ির আশপাশটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, কোথাও কোনও টর্চওয়ালা শত্রুর সন্ধান মেলেনি। আমাদের এদিককার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল; আর অপেক্ষা করবার কোনও দরকার ছিল না, সবাই তাড়াহুড়ো করে নেমে এসে

মোটরে চেপে বসলাম। আসবার সময় মোটরটা চালিয়ে এনেছিল ফুকন সিং; তাকে বলে দিলাম, ধারে কাছে শত্রু থাক বা না থাক, যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বড়বাজারের "বাসায়" গিয়ে পৌঁছুতে হবে। ওপরের বন্ধ গুদাম থেকে খগেন তখনও চিৎকার করে মরছিল; তার গলার ক্ষীণ, অস্পষ্ট আওয়াজ মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছিলাম।

'সে-রাত্রে সবাই যে বেশ উদ্বিগ্ন মনেই বাসায় ফিরে এলাম তা বোধকরি না বললেও বুঝতে পারছ। পরদিন সারাক্ষণ শঙ্কিত মনেই কাটালাম; দিনেরবেলাটা ভালোয়-ভালোয়ই কাটল বটে, কিন্তু রাত্রে যে ব্যাপার ঘটল তা একাধারে বীভৎস, রহস্যময়, অচিন্তনীয়! রাত তখন বোধকরি একটা হবে; সমস্ত কলকাতা শহর ঘুমন্ত দৈত্যের মতো নিঃসাড়ে পড়ে আছে, শুধু আমরা কয়টি প্রাণী তেতলার একটা কুঠুরীতে মোমবাতি জ্বেলে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত। ঘরের দরজা বন্ধ, শুধু বারান্দার দিকে বাতাস চলাচলের জন্য লোহার শিক দেওয়া একটা জানালা খোলা রয়েছে। পরদিনই আমাদের কাশী রওনা হয়ে পড়া উচিত, না কি কলকাতায় আরও কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই কর্তব্য, কাশী যেতে হলে ঠিক সোজা রেলের পথে না গিয়ে কোন পথে গেলে ভালো হয়—এইসব নানা বিষয়ে আস্তে-আস্তে আলোচনা হচ্ছে এমনসময় কেষ্ট হঠাৎ 'বাবাগো!' বলে আমার হাত চেপে ধরল। চমকে তাড়াতাড়ি মুখ তুলে চাইতেই জানালার ওধারে যা দেখলাম তা ভাবতে এখনও আমার গা শিরশির করে, শরীরের প্রত্যেকটি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। যে-প্রাণীটি আমাদেরই মাত্র কয়েক হাত দূরে শিকের পেছনে দাঁড়িয়ে, কী বলে তার বর্ণনা দেব? শ্মশানের চুল্লী থেকে আধপোড়া অবস্থায় সে যেন উঠে এসেছে। নাকটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে—চিহ্নমাত্র নাই—আছে কেবল তারই জায়গায় প্রকাণ্ড একটা গর্ত। শুধু নাক নয়, ওপরের চোয়ালেরও অনেকখানি পোড়া; তার ফলে মাড়িসুদ্ধ দাঁতগুলো বার হয়ে পড়েছে—উঁচু-নিচু জঘন্য একসারি দাঁত। চোখের জায়গায় দুটো গভীর খোঁড়ল দেখা গেল বটে, কিন্তু তার ভেতর বাস্তবিকই কোনও তারা আছে কি না নজরে এল না। ঘোড়ার মতো লম্বাটে মুখের গাল দুটো তোবড়ানো, হাড় বেরিয়ে আসছে, আর সমস্ত মুখখানা আগুনে পুড়ে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

'পলকের জন্য আমাদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল, এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমরা যে, তার শরীর বলে কোনও বস্তু আছে কি না লক্ষ করিনি। সকলে ভয়ে পেছিয়ে এসেছিল, কেবল আমি একটু সামনে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি জীবটার পেট ফুঁড়ে কেমন একটা অদ্ভুত আলোর রেখা ফুটে বার হয়ে এল—উগ্র—অতি উগ্র সে আলো, সাধারণ মানুষের চোখে সহ্য হয় না। তাড়াতাড়ি সকলেই একসঙ্গে চোখ বুজে ফেললাম, আর তার পরক্ষণেই শুনতে পেলাম হা-হা করে বিকট একটা অট্টহাসি। চোখ খুলে দেখি, সেই মূর্তিমান বিভীষিকা জানালা ছেড়ে থপথপ করতে-করতে বারান্দার পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। কী যে আমাদের কর্তব্য কিছুই ঠাহর করতে না পেরে আমরা ক'টি প্রাণী শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। জানি, তুমি আমাদের ভীরু অপবাদ দেবে, কিন্তু তবুও স্বীকার না করে উপায় নাই যে, দরজা খুলতে আমাদের ভরসা হল না, কেননা, বারান্দার পশ্চিম দিক দিয়ে কারোরই কোনওদিকে বার হবার জো নাই; ওটা নির্ঘাত ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

'আট-দশ মিনিট কেটে গেল; বাইরে কোনও সাড়াশব্দ নাই দেখে আমাদের সাহসও যেন একটু-একটু করে ফিরে এল। হাজার হোক, দলে তো আমরা একেবারে

পাতলা নই! নিঃশব্দে দরজা খুলে, ডান হাতের সবল মুষ্টিতে ছোরা ধরে একসঙ্গে সবাই বেরিয়ে এলাম। বারান্দা ধরে পশ্চিমের দিকে কয়েক পা এগুতেই তো আমাদের চক্ষুস্থির! কোথায় অন্তর্হিত হল সে-মূর্তিটা? বারান্দার দক্ষিণে যে-ঘরটা সেটা বার থেকে তালা বন্ধ, ভিতরে পিঁপড়া পর্যন্ত ঢুকতে পারে না; পূর্ব দিক আমরা আগলে বসে আছি; উত্তর আর পশ্চিম দিকে ঘোরানো রেলিং থেকে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে রেখেছে। রেলিং-এর নিচেই দেওয়াল একতলা অবধি নেমে গেছে—মসৃণ দেওয়াল—তার গায়ে কোনও অবলম্বন নেই। তেতলা থেকে লাফ দিয়ে কেউ নিচে পড়লে যতই ওস্তাদ হোক না কেন সে, মৃত্যু অনিবার্য। আর তা ছাড়া সেক্ষেত্রে শব্দও তো একটা হত; কারও কানে এতটুকু শব্দও তো আসেনি!

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে-ভেবে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। তোমার পত্রোত্তরের আশায় উম্মুখ হয়ে বসে রইলাম।

ইতি—রামদয়াল'

আট ঃ ফটো রহস্য

চিনির কারখানায় সেদিন যে আধ-পোড়া, বাঁধানো মোটা খাতাখানার সন্ধান মিলিয়াছিল তারই সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি প্রসন্নমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন। তাঁর হাতে একটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস—অতবড় শক্তিশালী লেন্স সচরাচর চোখে পড়ে না। তারই সাহায্যে মাঝে-মাঝে কতকগুলি কাগজপত্র তিনি দেখিতেছিলেন, এবং ভাবে মনে হয় দেখিয়া খুশিই হইতেছিলেন। টেবিলের উপর ঠিকানা লেখা, টিকেট-আঁটা একখানা খাম ডাকে যাইবার অপেক্ষায় পড়িয়া আছে, শিরোনামায় দেখা যাইতেছে দুর্গাপ্রসন্নের নাম।

অমৃত আসিয়া সকালবেলার ডাক টেবিলের উপর রাখিয়া গেল; হুকা-কাশি তখন খাতাপত্র পাশে সরাইয়া সেগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেন। দুখানা চিঠি পড়ার পর তৃতীয়খানায় আসিতেই তাঁর মুখে কি না জানি না—কেননা সে-মুখে জোয়ার-ভাঁটার খেলা বিশেষ দেখা যায় না—মনে রীতিমতো ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি দস্তুরমতো চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। থাকিয়া-থাকিয়া সন্দেহের কালো ছায়া তাঁর চোখের সম্মুখে উঁকি মারিতে লাগিল, অন্যমনস্কভাবে হাতের লেন্সখানা দোলাইতে দোলাইতে তিনি নিজের মনে কী যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ ধড়মড়াইয়া চেয়ারের উপর একেবারে সোজা হইয়া তিনি বসিলেন। এইমাত্র ডাকে যে-চিঠিখানা আসিয়াছে মুখ-খোলা অবস্থায় তার খামখানা তখনও টেবিলের উপর পড়িয়া ছিল, সেটি তিনি হাতে তুলিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সংশয়ের যে-পর্দাটা এতক্ষণ চোখের সামনে ঝুলিতেছিল হঠাৎ সেটি অনেকখানি স্বচ্ছ হইয়া আসিল, মনে-মনে একটু হাসিয়া তিনি ভিতর হইতে দরজার খিলটি আঁটিয়া দিলেন।

যে-ঘরটিতে বসিয়া হুকা-কাশি এতক্ষণ কাজকর্ম করিতেছিলেন, তারই সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত আর-একটা যে ছোট্ট কুঠুরী ছিল, সাধারণের চোখে ধরা পড়িবার তার কোনওই উপায় ছিল না। বড়ঘরের দরজায় খিল আঁটিয়া তিনি এইবার সেই ছোট্ট কুঠুরীটুকুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তারপর খানিকক্ষণ ধরিয়া তাঁর আর কোনওই সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ পরে আবার তিনি বাহির হইলেন, রুদ্ধদ্বার খুলিয়া দিয়া দেওয়ালের উপরকার একটা ইলেকট্রিকের বোতাম টিপিয়া ধরিলেন, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চাকরদের ঘরের কলিংবেল বাজিয়া উঠিল। মুহূর্ত পরে ভৃত্য আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতেই হুকা-কাশি বলিলেন, 'আমার স্নানের জল

ঠিক করো, একঘণ্টার মধ্যেই আমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে যেতে চাই। এর ভেতর যদি কেউ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো তাঁকে বলে দেবে, সন্ধ্যার আগে আমার বাড়ি ফেরবার সম্ভাবনা নেই, ইচ্ছা করলে তিনি নাম-ঠিকানা রেখে যেতে পারেন, বুঝলে?'

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, হুকা-কাশি ইঙ্গিতে তাকে থামিতে বলিলেন, তারপর একটু ভাবিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া একখণ্ড কাগজের উপর পেন্সিলে খসখস করিয়া কয়েকটা কথা লিখিয়া ফেলিলেন। তারপর কাগজখানা খামে মুড়িয়া চাকরের হাতে দিয়া কহিলেন, 'অমৃতকে বলবে বারোটার ভেতর রণজিৎবাবুকে যেন এটা দিয়ে আসে।'

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় শ্রীপুর স্টেশনে একখানা ডাউন স্টিমার আসিয়া থামিল; বহু লোকজন এবং মালপত্র নামিয়া পড়িল আর সেইসঙ্গে নামিলেন হুকা-কাশি। আজ ছুটির দিন নয়, অফিস-আদালত, কলকারখানা সমস্তই খোলা, কাজেই এই ভরদুপুরে দ্বারকানাথের বাড়ি গেলে হয়তো সেই অসুস্থ ভদ্রলোকটি ছাড়া আর কারওই সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না, মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া হুকা-কাশি সোজা চিনির কলের দিকেই রওনা হইলেন। কারখানার দরোয়ানটা হুকা-কাশিকে ইতিপূর্বে আরও দু-একবার দেখিয়াছে, এবং এ-ভদ্রলোকটি কে সে সম্বন্ধে তার খুব সুস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও ইনি যে একজন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি তা জানিতে তার বাকি ছিল না। সে সামনে আসিয়া প্রকাণ্ড একটা সেলাম জানাইয়া কহিল, 'আইয়ে হুজাউর, ছোটবাবু ঔর সন্তোষবাবু অফিস-কামরামে হই; খবর ভেজেঙ্গে?'

হুকা-কাশির নির্দেশ অনুযায়ী খবর 'ভেজা' হইল, এবং অল্পসময়ের মধ্যেই সন্তোষ ও সলিল আসিয়া পরম আপ্যায়নের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করিল। নিয়মিত শিষ্টাচারের পালা সাঙ্গ হইলে প্রথমেই আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করিল সন্তোষ, কহিল, 'এখানে আসবার আগে কর্তার সঙ্গে দেখা হয়েছে না কি? আজ সকালেই আপনার কথা উনি জিজ্ঞাসা করছিলেন।'

'কী বলছিলেন?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'না তেমন কিছু নয়—এই অহিভূষণবাবুর খোঁজখবর কিছু পাওয়া গেল কি না, সোনার-হরিণের কিনারা কতটা কী হল, এই সব।'

কথা বলিতে-বলিতে সকলে ততক্ষণে অফিস-কক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। হুকা-কাশি চেয়ারে বসিয়া নতমুখে নিজের দুই চোখের উপর বারকতক হাত বুলাইলেন, তারপর মনস্থির করিয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, 'দেখুন সন্তোষবাবু, কর্তাকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা অহিভূষণবাবুকে এ-জীবনে আর দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা আপনাদের খুবই কম।'

'অ্যাঁ! বলেন কী, গুণ্ডারা তাঁকে মেরে ফেলেছে?' আতঙ্কে সন্তোষ একেবারে শিহরিয়া উঠিল। সলিলের মুখ দিয়া কোনও শব্দই বাহির হইল না, সে কেবল ফ্যালফ্যাল করিয়া একদৃষ্টে হুকা-কাশির মুখের পানে চাহিয়া রহিল—বিশ্বাস-অবিশ্বাসে জড়িত সে-এক অদ্ভুত দৃষ্টি।

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, 'অবশ্য জোর করে কিছুই বলা যায় না, তবে চোদ্দআনা সম্ভাবনাই হচ্ছে তাঁকে আর ফিরে না পাওয়ার এবং সেজন্যেই আপনারা প্রস্তুত থাকবেন। তবে আমার অনুরোধ, এ-খবরটা দ্বারিকবাবুকে এখন দেবেন না, তাঁর শরীর অসুস্থ, হয়তো মনে হঠাৎ একটা আঘাত পেয়ে বসতে পারেন।'

সন্তোষ মলিন মুখে নতশিরে চেয়ারের উপর ঠায় বসিয়া রহিল, কিন্তু সলিল ক্রমাগত উসখুস করিতে লাগিল, মুখে তখন তার একটা অসহ্য অস্বস্তির ভাব। অহিভূষণ চৌধুরী লোভে পড়িয়া নিজেই দ্বারকানাথের সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছে, না অপর কেউ বাগে পাইয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী যন্ত্রের মতো তাকে চালাইয়াছে—সে-সমস্ত খবর এখনও গভীর রহস্যে আবৃত; কিন্তু দোষ যদি তার থাকিয়াও থাকে তবুও যে-লোকটা এতদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া চিনির কারখানাটি দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল, তার মৃত্যুতে শ্রীপুরে বোধকরি কেহই খুশি হইতে পারিত না।

হুকা-কাশি আড়চোখে দুজনারই মুখের ভাব লক্ষ করিলেন, তারপর কহিলেন, 'যাক, ওর জন্যে মন খারাপ করে কী আর করবেন, হবার যা তা তো হয়েইছে। যে-জন্যে আজ আমার শ্রীপুরে আসা তা এখনও বলা হয়নি। সেদিন এখানে বসে একটা হিসাবের খাতা আমি দেখতে চেয়েছিলাম, মনে আছে? আর-একবার সে খাতাটার দরকার পড়েছে—দু-একদিনের জন্যে সেটা আমায় একবার দিতে পারবেন?'

সন্তোষ বলিল, 'একদিন কেন, যত দিন খুশি তত দিনই রাখতে পারেন। পরশু থেকে আমাদের নতুন খাতা খোলা হয়েছে, ও-পুরানো খাতার দরকার আর রোজ-রোজ পড়বে না।'

'তা হলে তো ভালোই হল', বলিয়া একটিপ নস্যি নেওয়ার উদ্দেশ্যে হুকা-কাশি জামার পকেটে হাত দিলেন। হাত দিয়াই কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে তিনি চমকাইয়া উঠিলেন—বিশেষ ব্যস্তভাবে জামায় যে-কয়টা পকেট ছিল পরপর সবগুলি হাতড়াইতে লাগিলেন। দেখিতে-দেখিতে মুখ তাঁর বিবর্ণ, পাণ্ডুর হইয়া গেল।

সন্তোষ এবং সলিলের বিস্ময়ের যেন আর অবধি রহিল না। হুকা-কাশি চেয়ার ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে কী যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে শুরু করিয়াছেন দেখিয়া সন্তোষ জিজ্ঞাসা করিল, 'অমন ব্যস্ত ভাবে কী খুঁজছেন মিস্টার হুকা-কাশি, কোনও কিছু হারিয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ; অথচ কী করে হারাল তা আমার বুদ্ধির অগম্য।'

'কী সে জিনিসটা?'

'ছোট একখানা ফটো।'

'আপনি ঠিক জানেন, আপনার পকেটেই সেটা ছিল?'

'সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই, সন্তোষবাবু! আপনাদের কারখানায় ঢোকবার মুখেই আমি একটিপ নস্যি নিই—নস্যির কৌটো বার করবার সময়ও স্পষ্ট টের পেয়েছি ওটা আমার পকেটেই রয়েছে। অথচ এইটুকু পথ আসবার ভেতর কী করে সেটা উড়ে গেল ভেবে পাচ্ছি না! কারখানার চারধারটা সবাইকে একবারটি খুঁজে দেখতে বলুন না, যদি পকেট থেকে ফটোটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকে—আমি নিজেও সঙ্গে যাচ্ছি। অবশ্য দামের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে-জিনিসটা কিছুই নয়, কিন্তু তবুও ওটা হারিয়ে গেলে আমার কী যে ক্ষতি তা বুঝিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই। কোয়ার্টার সাইজের ফটো, পেছনের রবার স্ট্যাম্পে ছাপ মারা আছে—K.P.C।'

তৎক্ষণাৎ কারখানায় যতগুলি লোকের সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইল, সবাইকে সঙ্গে লইয়া সন্তোষ এবং সলিল ফটকের সম্মুখ হইতে শুরু করিয়া গোটা কম্পাউন্ডটা খুঁজিতে আরম্ভ করিল; হুকা-কাশিও সমস্তটাক্ষণ সেই সঙ্গে-সঙ্গেই রহিলেন, উদ্বেগের আজ আর তাঁর সীমা নাই। কিন্তু কোনও ফলই দর্শিল না, পুরা দেড়টি ঘণ্টা ধরিয়া সমস্তটা মাঠ চষাই কেবল সার হইল। হুকা-কাশি বড়ই মুষড়াইয়া পড়িলেন। অথচ সন্ধ্যার পর কলিকাতায় বহু কাজ পড়িয়া, শীঘ্রই ফেরা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর নাই। সলিলকে উদ্দেশ করিয়া তাই তিনি বলিলেন, 'এঁরা বরং আর একটু খুঁজে দেখুন—ভরসা খুবই কম, তবু যদি সন্ধান মিলে যায়! আপনি আমায় সঙ্গে করে একবারটি দ্বারিকবাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই। ফিরতি স্টিমারের সময় হয়ে এল।'

আন্দাজ প্রায় সাতটা সাড়ে-সাতটার সময় হুকা-কাশি কলিকাতার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। অমৃতকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনও খবর আছে?'

'এজ্ঞে আধঘণ্টাটাক আগে শিরীষপুর না কোত্থেকে যেন ফোনে একবার ডেকেছিল।'

'শিরীষপুর! ও বুঝেছি শ্রীপুর! ফোন করেছিল? কী বললে?' পরম আগ্রহের সঙ্গে হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন।

'এজ্ঞে আমায় কিছু বলেননি, কেবল শুধোলেন, "বাবু ফিরেছেন?" আমি বললুম, "তেনার ফিরতে দেরি হবেন, নাগাদ আটটা সাড়ে-আটটায় ফের ডেকে দেখবেন"।'

'বেশ করেছ'—বলিয়া হুকা-কাশি বাড়ির ভিতর ঢুকিলেন। আজ সারাদিনে ক্লান্তি নিতান্ত কম হয় নাই, জামা-কাপড় ছাড়িয়া একটু বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ইজিচেয়ারের উপর দেহটা তিনি এলাইয়া দিলেন বটে কিন্তু মন তাঁর সম্পূর্ণভাবেই পড়িয়া রহিল টেলিফোনটার দিকে। একটু পরেই ফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, হুকা-কাশি তাড়াতাড়ি রিসিভারটা কানে তুলিয়া বলিলেন, 'হ্যালো! কে, সলিল বাবু? ব্যাপার কী? আমি চলে আসবার পর ফটোটা খুঁজে পেয়েছেন? বাঁচালেন, একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচালেন। কোথায় পেলেন? ফটকের বাইরে সন্ধ্যামালতীর ঝাড়টার ভেতরে? দেখুন দেখি, কী আশ্চর্য, কতবার আমরা গেটটার আশ-পাশ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি! হ্যাঁ, পাঠিয়ে দেবেন কালই; একজন বিশ্বাসী লোকের হাতে পাঠাবেন কিন্তু। আপনি নিজেই দিয়ে যাবেন? তা হলে তো আর কথাই নেই! আচ্ছা নমস্কার।'

রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়াই হুকা-কাশি উচ্চকণ্ঠে হাঁকিলেন, 'অমৃত! অমৃত!'

অমৃত সাড়া দিয়া নিকটে আসিতেই তিনি কহিলেন, 'রণজিৎবাবুর কাছে গেছলে?' স্বরে ব্যস্ততা আছে বটে কিন্তু চিন্তার লেশমাত্র নাই, আছে কেবল প্রচুর উৎসাহ।

'এজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি কাল সক্কালেই আসবেন বলে দিয়েছেন।'

'ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করো, রুটি হতে আর কত দেরি।'

নয় ঃ ভগ্ননীড়

পরদিনকার ঘটনা। বেলা সাড়ে-ন'টা বাজিয়া গেছে, নক্ষত্রবেগে একখানা ট্যাক্সি আসিয়া জগন্নাথ ঘাটের সম্মুখে খশ্-শ্-শ্ শব্দে একেবারে নিশ্চল হইয়া থামিয়া পড়িল। গাড়িখানা আসিতেছিল এমনই দুরন্ত বেগে এবং ড্রাইভার ব্রেক চাপিয়া ধরিয়াছিল এমনই অতর্কিতে যে, ভিতরে যে একটি মাত্র আরোহী ছিল কোনওগতিকে ড্রাইভারের ঘাড়ের উপর হুড়মুড় খাইয়া পড়িতে-পড়িতে অতিকষ্টে আপনাকে সে সামলাইয়া লইল। কিন্তু সেদিকে তখন তার দৃকপাতও নাই, সমস্ত শরীরে তার কী এক অপূর্ব উন্মাদনা, চোখে শিকারী শ্যেনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রয়োজন পড়িলে এবং সম্ভব হইলে সে যেন ডানা মেলিয়া আরও দুর্বার বেগে শূন্যের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেও প্রস্তুত। আরোহীটি আমাদের রণজিৎ।

গাড়িখানা যেখানে আসিয়া হঠাৎ নিশ্চল হইয়া গেল ঠিক তারই সম্মুখে ছিল আর-একখানা ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া। ছয়জন লোক—তারা সকলেই রণজিতের অপরিচিত—তখন সবেমাত্র সেই ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কুলির মাথায় লটবহর চাপাইয়া, টিকেট-ঘরের দিকে রওনা হইতেছে। এ-ক'বছর ধরিয়া হুকা-কাশির শাগরেদি করার ফলেই কি না জানি না, রণজিতের চোখ আজকাল অসম্ভবরকম খুলিয়া গিয়াছে। সামনের ও লোক কয়টি যে ছদ্মবেশের আড়ালে নিজেদের ভোল সম্পূর্ণরূপেই বদলাইয়া ফেলার চেষ্টা পাইয়াছে এ-তথ্যটুকু বোধকরি উপস্থিত আর সকলের কাছেই লুকানো ছিল, ছিল না কেবল রণজিতের অভ্যস্ত চোখের কাছে। তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিয়া সে ওই সন্দেহভাজন লোক কয়টিকে অনুসরণ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু এক বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল ঠিক তার সম্মুখেই। স্টিমার-স্টেশনের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া তখন মেরামতের কাজ চলিতেছিল; যাত্রীদের টিকেট-ঘরের দিকে আগাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল অল্প পরিসর একটা সাময়িক ফটকের ভিতর দিয়া। অল্প জায়গায় বেশি লোক জড় হইলে যে-বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয় সেইটুকুর সুযোগ নিয়া এক পকেটমারের বাছা যাত্রীদের পকেটের অনাবশ্যক ভার লাঘবের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু পারে নাই, এক অতি চতুর লোক হাতিয়ার সমেত তার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়াছে। তারপর সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। দেখিতে-দেখিতে জায়গাটা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল, আর

শ্রাবণের ধারার মতো অনবরত চড়-চাপড় বর্ষিতে শুরু হইল পকেটমার-নন্দনের মাথার উপর, পিঠের উপর। রাস্তা দিয়া অনেক পথচারী লোক নিজের-নিজের কাজে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল তাদের জ্ঞানপিপাসা অসম্ভবরকম বাড়িয়া গিয়াছে, আসল ব্যাপারটির সম্বন্ধে অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য তারাও একসঙ্গে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভিড় জমাইয়াছে। রণজিৎ অস্থির হইয়া উঠিল, এসব ব্যাপারে তার এখন আদৌ উৎসাহ নাই—সে চায় কোনওরকমে ভিড় কাটাইয়া লোক কয়টির পিছন লইতে। কিন্তু সামনের ব্যূহ ভেদ করা তখন স্বয়ং নেপোলিয়ানেরও অসাধ্য, সে তো কোন ছার! তার বুক ঢিবঢিব করিতে লাগিল, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া সে শুরু করিল কেবল ঘামিতে।

রণজিতের মনের বর্তমান অবস্থা পাঠক-পাঠিকারা হয়তো সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিবেন না, যদি না গোড়ার দিকের কয়েকটা ঘটনা এই সময়ে তাঁদের বলিয়া দিই। শ্রীপুর রওনা হইয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে হুকা-কাশি অমৃতের মারফত রণজিৎকে যে-একটা জরুরি খবর পাঠাইয়া ছিলেন, পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই তা মনে আছে; তারপর শ্রীপুর হইতে ফিরিয়াই বেহারাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যথাসময়ে রণজিৎকে তার চিঠি দেওয়া হইয়াছিল কি না। জবাবে অমৃত যা বলিয়াছিল তার মর্মার্থ এই যে, আজ সকালেই রণজিৎ তাঁর সহিত দেখা করিতে আসিবে। রণজিৎ তার কথামতো বাস্তবিকই ভোরবেলায় হুকা-কাশির বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল; হুকা-কাশি তাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া কহিলেন, 'সূরযমল নগরচাঁদের লেন কোথায় আপনি জানেন রণজিৎবাবু?'

'না তো!'

'আমারও ঠিক জানা নেই, তবে নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে। বোধহয় মুক্তারামবাবু স্ট্রিট, বারাণসী ঘোষের স্ট্রিট—ওই সব অঞ্চলেরই কাছাকাছি। ডিরেক্টরিটা দেখলেই জানতে পারব। আমাদের দরকার—নম্বরের বাড়িটা।'

'কেন? সোনার হরিণ কি সেখানে নাকি?' রণজিৎ সোৎকণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল।

'কতকটা সেইরকমের আঁচ পাচ্ছি বটে, তবে খাঁটি জবাব নির্ভর করছে একটা ভৌতিক-কাণ্ডের সত্যাসত্যের ওপর। যতক্ষণ সেটি না সঠিক জানতে পারছি, ততক্ষণ হ্যাঁ-না কিছুই জোর গলায় বলা চলে না রণজিৎবাবু! ও-ব্যাপারটার মীমাংসা করাই হচ্ছে এখন আমার প্রথম কর্তব্য, আর তারই জন্যে দিন কয়েক এখন আমায় খুবই ব্যস্ত থাকতে হবে। অথচ যে-আভাসটুকু পাওয়া গেছে তার সুযোগ না নেওয়াও মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কথাগুলো বড়ই হেঁয়ালির মতো মনে হচ্ছে, না? কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যখন একে-একে খুলে বলব তখন দেখবেন, হেঁয়ালির নামগন্ধও এতে নেই—জলের মতো সমস্ত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, অবশ্যি ও-বাড়িটার ত্রিসীমানায়ও আমি জীবনে কখনও ঘেঁষিনি, তবু যত দূর মনে হয় ছ'জনের বেশি লোক বোধকরি ওখানে নেই। সেই লোক ছ'টির গতিবিধির ওপর একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। এটুকুর জন্য আপনার ওপর আমি নির্ভর করতে পারব কি রণজিৎবাবু? একটা কথা কিন্তু গোড়াতেই স্পষ্ট করে বলে রাখা দরকার—কাজটা বড়ই বিপজ্জনক। ওদের নজর পূর্ণভাবে এড়িয়ে প্রতিটি পদে আপনাকে চলতে হবে, যাতে করে সন্দেহের বাষ্পটুকুও আপনার ওপর পড়তে না পারে। বাস্তবিকই সন্দেহ ওদের জেগে উঠলে কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা মারাত্মক রকমের ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে। ও-খুনেগুলো কিছুতেই পিছপা নয়—মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই ওদের বরাবরকার অভ্যাস, দরকার পড়লেই নির্বিচারে আপনার বুকে ওরা ছুরি বসিয়ে দেবে, হাত তাতে এতটুকুও কাঁপবে না ওদের। এ সত্যি-সত্যিই আগুন নিয়ে খেলা, মনে যথার্থ ভরসা না পেলে আমি কিছুতেই এ-ব্যাপারে নামবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে পারি না।'

রণজিৎ একটু মৃদু হাসিল, কহিল, 'বিপদের নাম শুনে আপনি আমায় আঁৎকে উঠতে কি কখনও দেখেছেন না কি মিস্টার হুকা-কাশি? পদ্মরাগ-উদ্ধারের সময় সেই মোটর-রেসের কথা আপনার মনে পড়ে? খুব বেশি ভীরুতার পরিচয় কি তখন পেয়েছিলেন?'

হুকা-কাশি লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি জিভ কাটিয়া বলিলেন, 'না-না-না, সেভাবে তো কথাটা আমি বলিনি রণজিৎবাবু, কেন আমায় মিছে লজ্জা দিচ্ছেন? এই বেপরোয়া দস্যুগুলোর সঙ্গে লাগতে হলে খুব সাবধানী হয়ে চলতে হয়, এই কথাটা বলাই আমার সত্যিকারের উদ্দেশ্য ছিল, নইলে সাহসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়ে চলতে পারে এমন লোক তো আজ পর্যন্ত এতটা বয়সেও কই আমার চোখে পড়ল না!... যাক, এদিককার ভার তবে আপনার ওপর দিয়ে কতকটা নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমার সঙ্গে আসুন, একটা জরুরি জিনিস আপনাকে দেখাবার আছে।' বলিয়া হুকা-কাশি রণজিতের হাত ধরিয়া আমাদের পূর্বপরিচিত সেই গুপ্ত কুঠুরীটুকুর মধ্যে ঢুকিলেন। তারপর বাহির করিলেন কল্যাকার সেই ফটোটি।

মিনিট পাঁচেক পরে দুজনাই হাসি-হাসি মুখে বাহির হইয়া আসিলেন, রণজিৎকেই যেন একটু বেশিমাত্রায় উৎফুল্ল দেখা গেল; ডিরেকটরি হইতে সুরযমল নগরচাঁদ লেনটি কোথায় জানিয়া লইয়া সেই মুহূর্তেই সে বিদায় লইল। ওই লেনের উদ্দেশে এখনই তাকে রওনা হইতে হইবে।

গলিটি কোন অঞ্চলে ডিরেকটরি হইতে সে-বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মিয়াছিল, অল্পক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই সেটির সন্ধান মিলিল। তারপর, এক-এক করিয়া নম্বর গুনিতে-গুনিতে নির্দিষ্ট বাড়িখানার সম্মুখে আসিয়াই কিন্তু সে শুধু স্তব্ধ নয়, হতভম্ব, বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। যে-দৃশ্য দেখিতে পাইল সেইজন্য একেবারেই সে প্রস্তুত ছিল না, তা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত। দুয়ারে একখানা সিডান বডির ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া, তার ছাদের উপর স্ট্র্যাপে বাঁধা বিছানা ও গুটিকয়েক সুটকেস—এককথায়, বিদেশ-যাত্রার যাবতীয় সরঞ্জাম। ইতিপূর্বেই তিনজন আরোহী গাড়ির মধ্যে বসিয়া ছিল, রণজিতের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আরও তিনজন আসিয়া জুটিল, এবং পরক্ষণেই সকলকে কুক্ষিগত করিয়া সেই বিশাল যন্ত্রদানবটা রাস্তাঘাট কাঁপাইয়া সগর্জনে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল। রণজিৎ কেবল ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিল—তারই চোখের সম্মুখ দিয়া পাখি নীড় ভাঙিয়া পালাইতেছে।

একবার ভাবিল, 'চোর-চোর' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সে চিৎকার করিয়া ওঠে, কিন্তু পরক্ষণেই হুকা-কাশির কথা মনে পড়িয়া গেল; তিনি কহিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া হ্যাঁ-না বলার সময় এখনও আসে নাই। অযথা চিৎকার দিয়া শেষে কি নিজেই সে বিপদে পড়িবে? আর তা ছাড়া আরও একটা বিষয় ভাবিবার আছে—ক্ষুরধারবুদ্ধি হুকা-কাশি জাল ছড়াইয়া এখন সযত্নে সেটিকে নিজের দিকে গুটাইতেছেন; এমনসময় আনাড়ির মতো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিলে হয়তো সে জাল ফাঁসিয়া যাইবে, গভীর জলের মাছগুলি আবার গভীর জলেই আশ্রয় লইবে, লোকচক্ষুর সম্মুখে তাদের বাহির করিবার আর কোনও উপায়ই অবশিষ্ট থাকিবে না।

মানুষের সৌভাগ্য বলিয়া যে-একটা কথা আছে আকছার হয়তো সেটির সহিত পরিচয় ঘটে না, তবে একেবারেই যে ঘটে না এমন কথা বলিলেও ভুল হইবে, কেননা তা হইলে ও-শব্দটার সৃষ্টি হইবে কেন? ও-বস্তুটির কল্পনাও যখন আমরা করিতে পারিতেছি না এমনই অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে হয়তো তাহার সাক্ষাৎ মিলিয়া গেল! রণজিতের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল ঠিক এইরকমেরই একটা শুভমুহূর্ত—সে দেখিতে পাইল খালি গাড়ি লইয়া এক শিখ ড্রাইভার তার পাশ কাটাইয়া ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছে। পলকের মধ্যে রণজিৎ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল—ও-লোক কয়টি কোথায় গা-ঢাকা দিবার মতলব করিতেছে সে তা বাহির করিবেই, তাতে যত বড়ই না কেন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়।

ট্যাক্সিখানা থামাইয়া চালককে সে কহিল, 'ওই যে সিডান গাড়িটা মোড়ে বেঁকছে দেখছ, ওখানা যেখানে থামবে, আমাকেও সেখানে নামিয়ে দিতে হবে; যদি পারো, ভাড়া তো মিলবেই উপরন্তু একটা মোটারকমের বকশিসও দেব। কী বলো, পারবে?'

'উঠিয়ে তো বাবুসাব!' বলিয়া শিখ ড্রাইভার বিদ্যুৎ-গতিতে ট্যাক্সি ছুটাইয়া দিল।

দশ : হান্টার-পর্ব

অল্প একটু পরেই বীটের কনস্টেবল আসিল, পকেটমার প্রভুকে গ্রেপ্তার করিয়া থানার দিকে চলিল; 'তামাশা' শেষ হইয়া গেছে; অধিকাংশ লোকই তাই যেমন হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়াছিল, তেমনি আবার নিমেষে হাওয়াতেই মিলাইয়া গেল। বাকি রহিল কেবল কয়েকজন অপূর্ব অধ্যবসায়ী, তারা থানা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া নিঃশেষে সমস্তখানি জ্ঞান আহরণ করিবে, তবে নিরস্ত হইবে।

সম্মুখের রাস্তা ফাঁকা হইয়া যাওয়ায় এতক্ষণে রণজিৎ আবার অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল। তাড়াতাড়ি খানিকটা পথ আগাইয়া গিয়া সে দেখে তার সন্দেহের পাত্র সেই লোক কয়টি টিকেট-ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত মনে টিকেট কিনিতেছে। আগে হইতেই সে ঠিক করিয়াছিল যতটা সম্ভব ইহাদের সহিত ব্যবধান রাখিয়া চলিবে, কিছুতেই নিজের উপর সন্দেহের দৃষ্টি পড়িতে দিবে না। বাছিয়া-বাছিয়া সে তাই এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে অনায়াসেই সে ইহাদের কার্যকলাপ দেখিতে পারে অথচ তার সম্বন্ধে কাহারও অহেতুক কৌতূহল না জন্মে।

যে-লোকটা অপর সকলের মুখপাত্র হইয়া টিকেট কিনিতেছিল সে টাকার জন্য জামার পকেটে হাত দিল—রণজিৎ সযত্নে লক্ষ করিল সে কত টাকা বাহির করিতেছে। ছয়খানি টিকেট সে খরিদ করিল, রঙ দেখিয়া রণজিৎ বুঝিতে পারিল কোন শ্রেণীর টিকেট সেগুলি। এ-লাইনে মাঝে-মাঝে যাতায়াত সে করিয়াছে, কোন শ্রেণীতে কী হারে ভাড়া দিতে হয় তা সে জানে। মনে-মনে হিসাব করিয়া সে ঠাহর করিল, টিকেট ক'খানা হুগলি অথবা তারই আশপাশের কোনও স্টেশনের হইবে। স্টিমার ছাড়িবারও বড় বেশি দেরি নাই, এবার তাকেও টিকেট কাটিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। কিন্তু উহাদের সহিত একই স্টেশনে একই জায়গায় নামাটা কি যুক্তিযুক্ত হইবে? বোধহয় না। এ-লোক কয়টির মন যেন স্বভাবতই কিছু সন্দিগ্ধ; ওরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখিলে তার উপর সন্দেহের রেখাপাত না হওয়া অসম্ভব। তার চেয়ে ট্রেনে কয়েকটা স্টেশন পার হইয়া মাঝামাঝি কোনও জায়গায়—যেমন উত্তরপাড়ায়—স্টিমার ধরিলেই বোধহয় ভালো হয়। উহারা এখনও তাহাকে লক্ষ করে নাই বেশ বোঝা যাইতেছে।

মনে-মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রণজিৎ হাওড়া স্টেশনের দিকে ফিরিতেছিল, হঠাৎ মাঝ-পথে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সাশ্চর্যে সে দেখিল, সন্দেহভাজন লোক কয়টার গতিবিধি সে একাই কেবল লক্ষ করিতেছে না, আরও কে একজন পরম ঔৎসুক্যের সহিত ওই দিকেই তাকাইয়া আছে। ঔৎসুক্য তার প্রবল, সন্দেহ নাই, কিন্তু তার চেয়েও প্রবল বোধহয় তার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখিবার প্রচেষ্টা। একটি মুহূর্তের তরেও সে সুস্থির নাই, অনবরত আশেপাশে সশঙ্ক দৃষ্টি হানিতেছে; সর্বদাই ভয়, পাছে কেউ তাকে দেখিয়া ফেলে। লোকটি আধাবয়সী, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে চেহারাটা কিন্তু গোলগাল হইয়া উঠিয়াছে, রণজিতের ক্রমাগতই মনে হইতে লাগিল ইতিপূর্বে আরও কোথায় সে তাহাকে দেখিয়াছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না।

সামনা দিয়া এক ভদ্রলোক একখানা ই.আই.আর-এর টাইম-টেবল দেখিতে-দেখিতে যাইতেছিলেন, রণজিৎ সহসা তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, 'ওটা কি ই. আই. আর.-এর টাইম-টেবল না কি মশাই? উতোরপাড়ার গাড়ি ক'টায় ছাড়বে যদি একবার দয়া করে দেখে বলতেন!'

প্রৌঢ়বয়সী যে-লোকটা আড়ালে দাঁড়াইয়া টিকেট-ঘরের পানে তাকাইয়া ছিল এতক্ষণ সে রণজিৎকে লক্ষ করে নাই—এইবার গলার স্বরে আকৃষ্ট হইয়া এদিকে তাকাইল। সঙ্গে-সঙ্গেই সাপের গায়ে পা দিলে লোকে যেভাবে শিহরিয়া উঠে ঠিক সেইভাবে চমকাইয়া সে কয়েক

পা পিছাইয়া গেল। ব্যাপারটা রণজিতের নজরে আসে নাই, নইলে এ-দৃশ্য দেখিবার পর সে আর টাইম-টেবলের পাতা উল্টাইত কিনা সন্দেহ। রণজিতের প্রতি দু-চোখের নজর আবদ্ধ রাখিয়া সে একটু-একটু করিয়া পা টিপিতে-টিপিতে শেষটায় একেবারেই সরিয়া পড়িল। টাইম-টেবলের পৃষ্ঠা হইতে রণজিৎ যখন চোখ উঠাইয়াছে ততক্ষণে সে আর তল্লাটের ধারে-পাশেও নাই।

অল্প একটু বাদেই পরপর দুইবার বাঁশি বাজাইয়া স্টিমারখানা দুলিয়া উঠিল—ছাড়িবার সময় হইয়াছে। রণজিৎ আড়াল হইতে দেখিতে পাইল, লোক ছয়টি দোতলার ডেকের উপর দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যেই কীসব আলোচনা করিতেছে।

স্টিমার ছাড়িবার পর হাওড়া স্টেশনে রওনা হওয়ার উদ্দেশে সে সবেমাত্র জেটি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় উঠিয়াছে এমনসময় দেখা গেল সেই রাস্তারই উপর মাত্র দু-তিনশো গজ দূরে এক তুমুল হই-হই কাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ঢুকিবার মুখে যে-ভিড় জমিয়াছিল এখনকার ভিড়ের তুলনায় সে কিছুই নয়। রণজিতের মন বিরক্তিতে ভরিয়া গেল—সৃষ্টিছাড়া শহর এই কলিকাতা, লোকগুলির খাইয়া-দাইয়া বোধহয় আর কাজ নাই, চব্বিশ ঘণ্টা হুজুগেই মাতিয়া আছে।

একটু আগাইতেই সে শুনিতে পাইল ভিড়ের মধ্যে কে একজন বলিতেছে, 'বাহাদুর ছেলে কিন্তু বাবা বলতেই হবে! কলকাতার রাস্তা, হরদম লোকজন, গাড়িঘোড়ায় ভর্তি তারই মধ্যে দিব্যিসে হান্টার চালিয়ে গেল—সাঁক, সাঁক, সাঁক! কেউ ধরবার ফুরসুত পেলে না, অ্যাঁ? ঝড়াকসে মোটর হাঁকিয়ে গেল!'

অপর একজন বলিল, 'বেঁচে আছে তো লোকটা? কিছুই বিচিত্র নয় মশাই—চোখে, মুখে, কপালে যেভাবে হান্টারের বাড়িগুলো মেরেছে!'

ভিড়ের সম্মুখ হইতে আর-একজন পিছন ফিরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'আরে সুবোধ, ইদিকে আয় একবারটি! ইনি আমাদের অশনিবাবু, অশনি মিত্তির!'

অশনি মিত্তির? রণজিৎ সচকিত হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, বটেই তো তাই! একটু আগে সে তো অশনিকান্তকেই টিকেট-ঘরের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছে—চিনি-চিনি করিয়াও সে তখন তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কলিকাতায় রণজিৎ যেমন অনেক লোকের কাছে পরিচিত, অশনিকান্ত ঠিক অতটা না হইলেও অনেকটা সেই রকমই বটে। দু-হাতে ভিড় ঠেলিয়া রণজিৎ সামনের দিকে আগাইতে লাগিল; কাছে গিয়া দেখে বাস্তবিকই অশনিকান্ত অসহায় অবস্থায় নালার উপর লুটাইতেছে, হান্টারের লম্বা-লম্বা লাল দাগগুলি তার মুখখানাকে অস্বাভাবিক রকমের বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে। রণজিতের মনে হইল, সে যেন এক রহস্যের সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছে; কী জন্যই বা অশনিকান্ত স্টিমার-স্টেশনে অমনভাবে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আর কে-ই বা দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় তার উপর এই অকথ্য অত্যাচার করিয়া পালাইল, তার বিন্দুবিসর্গও সে আঁচিতে পারিল না।

কিন্তু ভগবান সেদিন আরও অনেকখানি বিস্ময় তার জন্য জমা রাখিয়াছিলেন। ট্রেনের সময় বহিয়া যাইতেছে দেখিয়া রণজিৎ বেশিক্ষণ অশনিকান্তের কাছে ব্যয় করিতে পারিল না, চটপট তাকে হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিতে হইল। যথাসময়ে উত্তরপাড়াতেও সে আসিয়া পৌঁছিল এবং প্রায় যথাসময়েই স্টিমারখানাও ঘাটে আসিয়া দর্শন দিল। কোনওরকম বাহ্য আড়ম্বর না দেখাইয়া নিতান্ত নিরীহ গোবেচারি যাত্রীর মতো ধীরে-ধীরে সে স্টিমারে উঠিল বটে, কিন্তু কোথায় সে-লোকগুলি? তন্নতন্ন করিয়া সারা স্টিমার খোঁজা সত্ত্বেও ছ'জন তো দূরের কথা, একজনেরও কোনও চিহ্ন মিলিল না। অথচ এ-কথা ধ্রুব সত্য যে একটিবারের তরেও তাদের কেউ রণজিৎকে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং তাকে এড়াইবার জন্যই যে আগের কোনও স্টেশনে তারা নামিয়া গিয়াছে এ-কথা রণজিৎ কীভাবে বিশ্বাস করিবে? তবে কি কোনও অদৃশ্য শক্তি যাদুমন্ত্রে তাহাদের উড়াইয়া লইল? কে এই রহস্যের সমাধান করিয়া দিবে?

এগারো : ব্যান্ডেলী কাণ্ড

গঙ্গার বিশুদ্ধ 'বায়ু-ভক্ষণ' ছাড়া স্টিমারে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়ার কোনওই যে সার্থকতা ছিল না রণজিৎ তাহা বুঝিল। লোক কয়টা তার চোখে ধূলা দিয়া একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে, পিছনে এমন একটু সূত্রও রাখিয়া যায় নাই যেটুকু অবলম্বন করিয়া আবার সে তাদের অনুসরণ করিতে পারে। এক্ষেত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া তার আর কী উপায় থাকিতে পারে? কিন্তু দিনটা ছিল রবিবার; রণজিৎ খবর লইয়া জানিল, শ্রীরামপুরের আগে আর কোনও স্টেশনেই সেদিন স্টিমার ভিড়িবে না। সেখানে পৌঁছিতেই বেলা বারোটা বাজিয়া যাইবে; আজকালকার মতো তখন বাসের এত ছড়াছড়ি হয় নাই, ওসব অঞ্চল হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতে হইলে নির্ভর করিতে হইত সাধারণত ট্রেনেরই উপরে। রবিবারদিন শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতা পৌঁছিবার লোকাল ট্রেনের সংখ্যা বড়ই কম, সকালের দিকে খুব ঘন-ঘন কয়েকটা ট্রেন আছে বটে, কিন্তু পৌনে বারোটার সময় যে-গাড়িখানা ছাড়িয়া যায় সেখানা না ধরিতে পারিলে অপেক্ষা করিতে হয় বিকাল সেই সাড়ে চারিটা পর্যন্ত। পৌনে বারোটার ট্রেন ধরা তার পক্ষে অসম্ভব; কাজেই শ্রীরামপুরে নামিলে সন্ধ্যার আগে বাড়ি গিয়া পৌঁছিবার ভরসা তো নাই-ই, উপরন্তু সারাদিন হয় অনাহারে, আর নয়তো দোকানের কদর্য খাবার খাইয়াই কাটাইতে হইবে। আর তা ছাড়া স্টেশনে চার-পাঁচঘণ্টা ঠায় বসিয়া থাকিবার ধৈর্যও তার নাই। এদিকে হুগলি পর্যন্ত টিকেট তার করা আছে; হুগলিঘাট হইতে মাত্র মাইল কয়েক দূরেই তার মামাবাড়ি। সেখানে ভরদুপুরে গিয়া উপস্থিত হইলে চর্ব্য-চোষ্য না জুটিলেও সুব্যবস্থা যে একটা হইবেই সেটা ঠিক, যত্ন-আত্তি হইবে সেটা আরও ঠিক। তার মামাবাড়ির গ্রাম হইতে অল্প কিছু দূর গেলেই প্রকাণ্ড স্টেশন ব্যান্ডেল জংশন—কলিকাতা ফিরিবার ট্রেন সেখানে প্রচুরই মিলিবে।

রণজিৎ অতর্কিতে মামাবাড়ি গিয়া উপস্থিত হইবার ফলে নাতিকে দেখিয়া তার বুড়া দাদামশায় দাড়িতে কয়বার হাত বুলাইলেন বা গড়গড়ায় কয়টা সুখ-টান দিলেন, দিদিমার কয় পাটি ফোকলা দাঁত বাহির হইয়া পড়িল, পুকুরের কতগুলি মাছ বন্ধুহীন হইল, সে-সমস্ত খবর অত্যন্ত রসালো হইলেও আমাদের গল্পের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, কাজেই সে-ইতিহাস উহ্য রাখিয়া তার ব্যান্ডেল পৌঁছিবার পর হইতেই আমরা আবার আমাদের গল্প বলা শুরু করিব।

বিরাট স্টেশন ব্যান্ডেল জংশন—অনবরত ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে; ভিন্ন-ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে নানা জায়গার গাড়ি দাঁড়াইয়া। যাত্রীদের বসিবার জন্য রেল কোম্পানি খানিকটা অন্তর-অন্তর বেঞ্চি পাতিয়া দিয়াছে, তারই একটার উপর রণজিৎ বসিয়া। কলিকাতার ডাউন গাড়ি আসিবার তখনও কিছু দেরি আছে, বসিয়া-বসিয়া সে কেবল আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গুরু-কাশের সহিত তার দেখা হইবে, সে যে বুদ্ধির দাবাখেলায় প্রথম চাল দিতে-না-দিতেই বিপক্ষ-দল বাজিমাত করিয়া দিয়াছে সে-কথা ধরা পড়িয়া যাইবে। মুখে তিনি কোনও কথাই বলিবেন না বটে, কিন্তু তাঁর দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়া হয়তো একটা অবজ্ঞার চাপা হাসি খেলিয়া যাইবে; সে-হাসি যেন তাকে বলিতে থাকিবে—বুঝিয়াছি তোমার কেরামতি, একশো-গজী ফুটবল মাঠটুকুর মধ্যেই তোমার যত লম্ফ-ঝম্ফ, তার বাহিরে গেলেই তুমিও যা, পাঁচবছরের শিশুটিও তাই। —এ চিন্তা অসহ্য—অথচ...।

হঠাৎ সজোরে রাশ টানিয়া ধরিলে ঘোড়া যেমন চলিতে-চলিতে আচমকা থামিয়া যায়, রণজিতের চিন্তাস্রোতও তেমনি মুহূর্তে বাধা পাইয়া থামিয়া গেল। ওই যে একটু দূরে একটা কুটিল চেহারার লোক কলের কাছে দাঁড়াইয়া কুঁজায় জল ভর্তি করিতেছে, ও কে? ও-মূর্তি তো রণজিতের অপরিচিত নয়, তার সমস্ত চিন্তার মধ্যে থাকিয়া-থাকিয়া এই ধরনের এক ব্যক্তিই যে ক্রমাগত

উঁকি মারিতেছে। না-না, জগন্নাথ ঘাটে ঠিক এ-মূর্তির দেখা সে পায় নাই; শুধু জগন্নাথ ঘাট বলিয়া নয়, আজ পর্যন্ত চর্মচক্ষে এ-মূর্তি কোথাও সে দেখে নাই, অথচ তার বুকের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো এ-চেহারা যে ছেঁকা দিতেছে সে-কথাও সত্য।

জামার উপর দিয়াই তাড়াতাড়ি সে ডানদিকের পকেটটা একবার অনুভব করিয়া লইল, তারপরেই উঠিয়া গিয়া প্লাটফর্মের এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল যেখান হইতে ও-লোকটা তার কার্যকলাপ কিছুই দেখিতে না পারে অথচ তার নিজের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ থাকে। হাওড়া স্টেশনে ইতিপূর্বেই সে একখানা টাইম-টেবল সংগ্রহ করিয়াছিল, চট করিয়া তার যে পাতাখানা হাতে আসিল তাহাই সে খুলিয়া ফেলিয়া আড়চোখে চারিদিকটা একবার দেখিয়া লইল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ডান পকেটে হাত দিয়া কী একটা কাগজ সেই খোলা পাতার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া এমনইভাবে টাইম-টেবলখানা চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল, যেন সে ট্রেনেরই সময় দেখিতেছে, সে-কাগজখানা নয়।

রণজিৎ দেখিতেছিল একখানি ফটো—আজ সকালে হুকা-কাশির বাড়ি হইতে 'অ্যাডভেঞ্চারে' বাহির হইবার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁর গুপ্ত কুঠুরীটুকুর মধ্যে রণজিৎকে ডাকিয়া লইয়া এই ফটোখানা দিয়াছিলেন। মুখে বলিয়া দিয়াছিলেন, এই ফটোতে তোলা চেহারার বাস্তব মূর্তি তার চোখে পড়িতেও পারে, নাও পারে; কিন্তু পড়িলে তাকে বিশেষ সাবধানের সঙ্গে চলিতে হইবে; হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় কোনও কাজ যেন সে না করিয়া বসে, কেননা তাহা হইলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। আর-একটা কথা, ফটোখানা যে তার সঙ্গে রহিয়াছে ঘুণাক্ষরেও সে কথা যেন বাহিরে কারও কাছে প্রকাশ না পায়। সেই অবধি ফটোখানা তার চিন্তার সমস্ত ফাঁক জুড়িয়া রহিয়াছে। হুকা-কাশি কী করিয়া যে এ-ছবিখানা করায়ত্ত করিলেন রণজিৎ তা বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই, কেননা এই অদ্ভুত শক্তিশালী জাপানি ডিটেকটিভটির প্রত্যেকটি কাজ এমনই জটিল, এমনই হেঁয়ালিতে ভরা যে-ইতিপূর্বে অনেকবার সে তার মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া কেবল ভোঁতা-মুখে ফিরিয়াই আসিয়াছে। সে শুধু এইটুকু বুঝিল যে, জলের কুঁজা হাতে এই লোকটার নাড়ি-নক্ষত্র তাকে জানিতেই হইবে এবং সেজন্য যদি পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত তাকে ছুটিতে হয় তাতেও সে প্রস্তুত।

লোকটার কুঁজায় জল ভরা হইয়া গিয়াছিল, লম্বা-লম্বা পা ফেলিয়া সে নিজের গাড়িতে ফিরিয়া আসিল। এ-অবস্থায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিতে হইলে ঠিক যতটা তফাতে থাকা দরকার ঠিক ততটা দূর হইতেই রণজিৎ লক্ষ করিল সে একখানা থার্ডক্লাস কামরায় উঠিতেছে। সে-কামরাটা একেবারে নির্জন ছিল না বটে—কোনও থার্ডক্লাস গাড়িই একেবারে নির্জন থাকে না—কিন্তু অন্যান্য যাত্রীদের প্রতি নজর করিলে এটা বুঝিতে কারওই কষ্ট হইবার কথা নয় যে-তাদের সহিত ওই ক্রূর চেহারার লোকটার কোনওই সম্বন্ধ নাই, সে সম্পূর্ণ একা। দেখিয়া রণজিৎ অনেকটা আশ্বস্ত হইল; অবশ্য হুকা-কাশির সতর্কতা সে অক্ষরে-অক্ষরে মানিয়া চলিবে, কিন্তু দৈবের ব্যাপার কিছু বলা যায় না, শক্তির একটা পরীক্ষা যদি নিতান্তই ঘটিয়া যায়, তবে একটিমাত্র আক্রমণকারীকে সে অনায়াসেই মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারিবে। নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস তার আছে। থার্ডক্লাস কামরাটির গায়েই একখানা ইন্টারক্লাসের গাড়ি—মধ্যে মাত্র একখানা পাতলা কাঠের ব্যবধান। রণজিৎ নিকটে গিয়া সানন্দে আরও লক্ষ করিল, সেই দেওয়ালটির গায়ে তারের জাল দেওয়া জানালার মতো ছোট্ট একটু ফাঁকও রহিয়াছে—অর্থাৎ এক গাড়ি হইতে অপর গাড়ির ভিতর নজর রাখা চলে। 'সৎকার্যে সুযোগের অভাব কখনওই হয় না'—এই মহা-বাক্যটি স্মরণ করিয়া একখানা ইন্টারক্লাসের টিকেট কিনিবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বুকিং-অফিসের দিকে আগাইয়া গেল।

বারো : ছায়া পূর্বগামিনী

টিকেট কিনিয়া ইন্টারক্লাস গাড়িতে ঢুকিতেই রণজিৎ দেখিল কামরাটি খুব ছোট, মাত্র তিনখানি বেঞ্চি রহিয়াছে। তার একটা বেঞ্চিতে বছর কুড়ি-বাইশের এক সুবেশ যুবক জানালায় ঠেসান দিয়া অর্ধশয়ানভাবে একখানা ছ'পেনি দামের ইংরেজি নভেল পড়িতেছিল। গাড়ি তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। রণজিৎকে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা সে পাশে সরাইয়া রাখিল, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বারবার রণজিতের আপাদমস্তক দেখিতে শুরু করিল। ট্রেনে একজন নূতন যাত্রীর আবির্ভাব হইলে সকলেই একবার তার দিকে তাকাইয়া দেখে বটে, কিন্তু সে-ধরনের অনাসক্ত দৃষ্টি এ নয়, ভিতরে আরও যেন কোনও অর্থ আছে বলিয়া রণজিতের মনে হইতে লাগিল। যুবকটি হুঁশিয়ার, তার সঙ্গোপন চাহনি যে রণজিৎ বিশ্লেষণের চোখে দেখিতেছে সে তা বুঝিতে পারিয়া বইখানা আবার চোখের সামনে খুলিয়া ধরিল। কিন্তু দৃষ্টি তার বই-এর অক্ষরের দিকে ছিল না; বইখানা ছিল আবরণ মাত্র, তার আড়াল হইতে সে শুধু দেখিতেছিল রণজিৎকেই।

একটু পরে একটা হাই তুলিয়া সে বই বন্ধ করিল, তারপর নাক ঝাড়িবার উপলক্ষ করিয়া অন্যদিকের জানালার দিকে আগাইয়া গেল। রণজিৎ লক্ষ করিল, যাইবার সময় দুই গাড়ির মধ্যকার জালের জানালাটার ভিতর দিয়া সে একবার উঁকি মারিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া নিজের বেঞ্চিতে বসিবার পর সে-ই প্রথম গাড়ির নীরবতা ভঙ্গ করিল, কহিল, 'চাকরটাকে তুলে দিয়েছি পাশের থার্ডক্লাস কামরাটাতে; ভেতরের এই জানালাটুকু থাকায় ভারি সুবিধে হয়েছে, মাঝে-মাঝে প্রায়ই উঠে গিয়ে তত্ত্বতালাশ করতে পারছি। একেবারে দেশ থেকে সদ্য আমদানি কিনা, বেজায় নার্ভাস।'

রণজিৎ কোনও জবাব দিল না, একটা অজানা আশঙ্কায় তার বুক দুরুদুরু করিতেছিল। মনে-মনে বলিল, 'চাকরকে দেখতে গেলে, না কি নিজের সঙ্গী ঠিক আছে কি না খোঁজ নিয়ে এলে, তা তো ঠিক বুঝছি না বাপধন! তোমার হাবভাব যেন একটু কেমন-কেমন ঠেকছে!'

যুবক ছ'পেনি দামের যে পাতলা ইংরেজি নভেলখানা পড়িতেছিল জানালা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেখানা সে বেঞ্চির উপরই ফেলিয়া রাখিয়াছিল; হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া বইখানার মলাট উলটাইয়া দিল আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চকিতে রণজিৎ দেখিতে পাইল দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় বইয়ের মালিকের নাম লেখা আছে 'সলিল বোস, শ্রীপুর।' সাধারণ ক্ষেত্রে এ-ব্যাপারে বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না, কেননা আমি যে-লোককে চিনি এ-পৃথিবীতেও তার যে আর দ্বিতীয় কোনও পরিচিত বন্ধু থাকিবে না তার কী হেতু আছে? কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দুনিয়ার প্রত্যেক জিনিসেরই অর্থ ভিন্নরকম হইয়া দাঁড়ায়। রণজিৎ যে 'দাগী' লোকটির সন্ধানে ফিরিতেছে, ঠিক পাশের কামরাটিতেই সে বসিয়া; এ-গাড়িতে ওঠা অবধি যুবক তার দিকে একটু ঘন-ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছে, একবার উঠিয়া গিয়া জানালার পথে সে ও-কামরায় উঁকি পর্যন্ত মারিয়া আসিয়াছে; এ-অবস্থায় সমস্ত ব্যাপারটা তার চোখে খুব সাধারণ বলিয়া মনে না-হওয়ারই তো কথা। কিন্তু অন্যদিকেও ভাবিবার বিষয় আছে। সোনার হরিণের মালিক স্বয়ং দ্বারকানাথের ছোট ভাই সলিলের একখানি বই এ-যুবকের হাতে। যে-ফটোখানার উপর নির্ভর করিয়া একটা অনির্দিষ্ট, অজ্ঞাত স্রোতের মুখে আজ সে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত, হুকা-কাশির মুখে শুনিয়াছে কাল-নাকি সেখানা শ্রীপুরের কারখানায় হারাইয়া গিয়াছিল, সলিলই সেটি উদ্ধার করিয়া আজ প্রাতে তাঁকে দিয়া গিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, ছবিখানা সলিলের কাছে অপরিচিত নয়। এমনও তো হইতে পারে যে, ফটোটি ফেরত দিবার পরই ওই দাগী লোকটা তার নিজের মতো সলিলেরও চোখে পড়িয়া গিয়াছে—সলিল নিজে অপারগ হওয়ায় তার কোনও সাহসী অন্তরঙ্গ বন্ধুকে লোকটার পিছনে লাগাইয়া দিয়াছে। অ্যাডভেঞ্চারের প্রকৃত নেশা যার আছে তার পক্ষে এ-লোভ সংবরণ করা একটু কষ্টকর বইকী! বাস্তবিকই এমন একটা কাণ্ড যদি ঘটিয়াই থাকে

তবে এ-যুবক তার শত্রু না হইয়া বন্ধুই হইয়া দাঁড়াইবে, কেননা দুজনার উদ্দেশ্যই যে এক। এখন প্রকৃত ব্যাপারটা কী, কী করিয়া জানা যায়?

হঠাৎ রণজিতের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলিয়া গেল; বইখানা বেঞ্চির উপর পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেখানাকে হাতে তুলিয়া লইয়া সে কহিল, 'রেলে সময় কাটাবার জন্য খোরাকটি সংগ্রহ করেছেন ভালোই।' কথা বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে মলাটের পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া ফেলিল; তারপর সবে যেন এইমাত্রই লেখাটা দেখিতেছে এমনই ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, 'শ্রীপুর? শ্রীপুর জায়গাটা কোথায় বলুন তো?'

ফ্যালফ্যাল করিয়া বড়-বড় চোখে যুবক মুহূর্তকাল রণজিতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'আপনি জানেন না তা?'

ঠিক এই ধরনের জবাবের জন্য রণজিৎ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, একটু থতমত খাইয়া সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, একটা শ্রীপুর জানি বটে! আচ্ছা, এ-সলিল বোসটি কে?'

মনে হইল, একটা যেন চাপা হাসির রেখা যুবকের ঠোঁটের পাশ দিয়া ক্ষণিক বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল, চোখ দুটিকে একটু মিটি-মিটি করিয়া সে কহিল, 'সে-খবরও তো আপনার অজানা নয়, রণজিৎবাবু!'

রণজিৎ বুঝিল ইহাকে আর ছলনা করা বৃথা, তার সমস্ত নাড়ি-নক্ষত্র ইহার নখদর্পণে, নামটি পর্যন্ত অজ্ঞাত নয়। বলিল, 'দ্বারিকবাবুর ভাই সলিলবাবু আর ইনি একই লোক কি না সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপনিও তো দেখছি আমার মতো সব খবরই রাখেন! দ্বারিকবাবু কেউ হন না কি আপনার?

বোধহয় রণজিৎ টের পাইল না, তার এই প্রশ্নে যুবকের মুখ পলকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু মাত্র পলকের জন্যই; মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, 'না, তাঁর সঙ্গে আমার কোনওই সম্বন্ধ নাই।'

'তবে সলিলবাবু বুঝি আপনার বন্ধু?'

এ-প্রসঙ্গটাই যুবকের অত্যন্ত রকমের অস্বস্তিকর, কোনওরকমে চাপা পড়িলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। দায়সারা গোছের সে একটা জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তা যা-ই বলুন!' তারপরেই বিষয়টা এড়াইবার জন্য সে পাড়িয়া বসিল একেবারে অন্য কথা। কহিল, 'বড়কর্তার শরীরের যে রকম গতিক দেখছি, এ-অবস্থায় চিনির কল চালিয়ে নেওয়াই তো একটা সমস্যা। সলিলবাবুর সে ক্ষমতা নেই, ব্যবসাবুদ্ধির ওঁর একেবারেই অভাব। সে ছিল মেজকর্তার।'

'দ্বারিকবাবুর মেজভাইয়ের কথা বলছেন বুঝি? সেই যিনি আমেরিকায় না কোথায় থাকেন?'

'হ্যাঁ, আট-দশবছর সেখানেই আছেন বটে। তবে তাঁকে দেশে ফিরতে লেখা হয়েছে; বোধহয় অল্প কিছুদিনের মধ্যে এসে পড়বেন। ভালো কথা, আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট কে হল আজকের খবরে কাগজে সে-খবর বার হয়েছে কি? আজকের কাগজ দেখবার সময় পাইনি।' কৌশলে দ্বারিকবাবুর পারিবারিক সম্পর্ক হইতে যুবক আলাপের ধারাটাকে একেবারে সাধারণ আলোচনায় আনিয়া ফেলিল।

এইভাবে এককথা, দু-কথা হইতে-হইতে হু-হু করিয়া সময় কাটিয়া চলিল, ক্রমে সন্ধ্যা এবং পরে রাত্রিও আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এ-সমস্তের মধ্যেও রণজিৎ তার আসল কাজে অবহেলা করে নাই, প্রত্যেক স্টেশনে গাড়ি থামিলেই সে কৌশলে লক্ষ করিয়াছে তার 'মার্কামারা' লোকটি সটকাইয়া পড়িতেছে কি না।

কিন্তু আজ সারাদিনে অবসাদ এবং উত্তেজনা গিয়াছে প্রচুর, শত চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ যেন তার মাঝে-মাঝে ভারি হইয়া বুজিয়া আসিতে চাহিতেছিল। হঠাৎ চোখ দুইটি কখন যে একেবারে বুজিয়া গেল সে তা টেরই পায় নাই। রাত্রি আন্দাজ দেড়টার সময় সে ধড়মড়িয়া জাগিয়া উঠিল, সমস্ত গাড়িখানা তখন নিঝুম অন্ধকার। বিদ্যুৎ-গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সে ইলেকট্রিক স্যুইচটা টিপিয়া

ধরিল; দেখিল, সামনের বেঞ্চির উপর যুবকের একটি শতরঞ্চি আর বালিশ পড়িয়া আছে, কিন্তু তার নিজের কোনওই চিহ্ন নাই। উন্মাদের মতো রণজিৎ তাড়াতাড়ি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়াই একেবারে গাড়ির মেঝের উপরই বসিয়া পড়িল—ফটোখানি তার পকেট হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া লইতে রণজিতের কিছু সময় লাগিল; এ-অবস্থায় সাধারণ লোক যে-কাজটিকে প্রথমেই অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করে, অভিভূত সে তা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। সহযাত্রী সুদর্শন যুবকটিই যে-ফটোখানা সরাইয়াছে এ-ধারণা মনে তার এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পাশের কামরার সেই দুশমন চেহারার লোকটা গাড়িতেই আছে কি না সেটা লক্ষ করার প্রয়োজনও সে এতক্ষণ বোধ করে নাই। কিন্তু সে-অনুসন্ধান লওয়া যে প্রয়োজন এইবার তার মনে হইল—তাড়াতাড়ি দেওয়ালের জানালাটিতে চোখ রাখিয়া দেখে, যুবকটির মতো সে-ও নিরুদ্দেশ হইয়া গেছে। দুইজনে যে একযোগে কাজ সারিয়াছে সে-বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে একবার ভাবিল, শিকল টানিয়া গাড়িখানাকে দাঁড় করায়, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল তাতে লাভ হইবে না কিছুই, উপরন্তু খানিকটা ক্ষতিরই সম্ভাবনা; কেননা ব্যাপারটি তা হইলে চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে; কিন্তু রাষ্ট্র হইতে দেওয়া হুকা-কাশির বোধহয় মনঃপূত হইবে না। বাহিরে তখন নিশাদেবীর পূর্ণ রাজত্ব চলিতেছে, গাঢ় অন্ধকার হানা পাতিয়া বসিয়া আছে। সূর্য উঠিবার পূর্বে কিছুই আর করার নাই, তাই রণজিৎ ভোরের প্রতীক্ষায় বেঞ্চির উপর ঠেসান দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

অন্ধকারের ঘোর ক্রমেই কাটিয়া আসিল এবং কিছুক্ষণ পরেই আবিরের রঙে দিগ্বিদিক রাঙাইয়া ভোরের আলো রণজিতের মুখে-চোখে স্নেহ-স্পর্শ বুলাইয়া দিল। তার মনে হইল, দূর হইতে বহু লোকের একটা ব্যস্ততাপূর্ণ কোলাহল যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। মুখ বাড়াইয়া সে দেখে ট্রেনখানা একটা বিরাট স্টেশনের আঙিনায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে। স্টেশনটা কী হইতে পারে ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই প্ল্যাটফর্মের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড লেখাগুলি জানাইয়া দিল যে, গাড়ি মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চিন্তাকুল মুখে ট্রেন হইতে নামিয়া রণজিৎ ধীরে-ধীরে রিফ্রেশমেন্ট রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, উদ্দেশ্য এককাপ চা খাইয়া মস্তিষ্কটাকে একটু সবল এবং সজীব করিয়া তুলিবে। কয়েক পা আগাইয়াই কিন্তু হঠাৎ সে এমনই ভাবে থামিয়া পড়িল যে, মনে হইল, কেহ যেন তাকে স্ক্রু দিয়া মাটির সঙ্গে আঁটিয়া দিল। সে নির্নিমেষে সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল, নিজের চক্ষুকেও সে যেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। এও কি সম্ভব? রণজিৎ এ-গাড়িতে রহিয়াছে প্রত্যক্ষ জানিয়াও কোন ভরসায় প্রকাশ্য দিবালোকে এ-লোকটি প্ল্যাটফর্মের উপর আসিয়া দাঁড়াইল! মাথায় বিশাল পাগড়ি, মোটা একখানি উড়ুনি চিবুক ঢাকিয়া গলার চারিপাশে কয়েকটা পাক খাইয়াছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রণজিতের বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, যে-লোকটার অনুসরণে কলিকাতা হইতে প্রায় পাঁচশো মাইল সে ছুটিয়া আসিয়াছে, ব্যান্ডেল জংশনে যে-ব্যক্তি জলের কুঁজা ভর্তি করিয়াছিল, এ সে-ই। রিফ্রেশমেন্ট রুমটি ছিল অতি নিকটেই, চট করিয়া সরিয়া আসিয়া রণজিৎ তাহারই একখানা কপাটের আড়ালে দাঁড়াইল।

লোকটা একজন হিন্দুস্থানীর সঙ্গে অপরে-না-শুনিতে-পায় এমনই খাটো গলায় কথা কহিতেছিল। হিন্দুস্থানীটির চোখে-মুখে একটু অস্বস্তির ভাব; সে কহিল, 'তুই একলা আইসে পড়লি, রামদোয়াল, আর সকুলে কুথা গেল?'

'সব ঠিক আছে সর্দারজি, দু-চারদিনের ভেতরে সকলেই আলাদা-আলাদা রাস্তায় এসে তোমার আড্ডায় জমা হবে; একসঙ্গে আসবার কি জো আছে—পেছনে ফেউ লেগেছিল যে!'

রুদ্ধকণ্ঠে 'সর্দারজি' কহিল, 'তারপর?'

রামদয়াল চোখ দুটিকে একটু মিটিমিটি করিয়া অর্থপূর্ণ এক হাসি হাসিল; রতনে রতন চেনে,

সর্দার সে-হাসির অর্থ বুঝিয়া মনে-মনে নিশ্চিন্ত হইল, বলিল, 'তুই খুব হুঁশিয়ার আদমি আছিস রামদোয়াল।' তারপর বারকতক এদিক-ওদিক তাকাইয়া আরও নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করিল, 'সোনেবালা হরিণ? সেটা কুথা রাইখেছিস?'

'ঘাবড়িও না সর্দার, সব ঠিক আছে; এতদিন শুধু নামেই ছিলে 'ধনপৎ' এবার কাজেও হবে ধনপৎ। কিন্তু আর নয়, এবার একটু আড়ালে যাও; আমরা সব স্বনামধন্য পুরুষ কি না, এখানে একসঙ্গে দুজনাকে গুলতানি পাকাতে দেখলে পুলিশের দৃষ্টি পড়বার ভয় আছে। আর-একটা কথা —এ-গাড়িখানায় কাশী ফিরো না; পরের কোনও একটা ট্রেন ধরবে, আর বেনারস ক্যান্টনমেন্টে না নেমে রাজা-ঘাটেই নেমে পড়বে।'

প্ল্যাটফর্মের অপর পারে আর-একখানা ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল, মুটের মাথায় মালপত্র চাপাইয়া রামদয়াল গজেন্দ্রগমনে তাহাতেই গিয়া চাপিয়া বসিল। ধনপতের সহিত এতক্ষণ দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া তাহার কী কথা হইয়াছে রণজিৎ অবশ্য তাহা শুনিতে পায় নাই, কিন্তু লোকটির গতিবিধির উপর নজর রাখিয়াছে সে বরাবর। এইবার তাকে গাড়ি বদল করিতে দেখিয়া সে খোঁজ লইয়া জানিল ওটি বেনারস লাইনের ট্রেন। তাহাকেও এই ট্রেনেরই যাত্রী হইতে হইবে; তবে ট্রেনটি ছাড়িবার তখনও বেশ কিছু দেরি আছে, ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সারিয়া লওয়া চলে। রিফ্রেশমেন্ট রুমের ভিতরে ঢুকিয়া সে তখন একবাটি চা, কিছু কেক ও ডিমের ফরমাস করিল।

রণজিতের কাশী-যাত্রা দেখিয়া আমরা একবার হুকা-কাশির খবর লইয়া আসি।

তেরো : চিঠির অংশ

হুকা-কাশি সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িখানার উপর রণজিৎকে কেবল দৃষ্টি রাখিতেই বলিয়াছিলেন; ও-বাড়ির লোক কয়টি যে সেদিনই বাসা ভাঙিয়া পালাইবে এবং তাদের অনুসরণে রণজিৎ যে কাশী পর্যন্ত ছুটিয়া আসিবে, তা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। সেইদিন সন্ধ্যা পর্যন্তও যখন রণজিৎ ফিরিয়া আসিল না, অথবা তাঁকে কোনও সংবাদ পাঠাইল না তখন তিনি বাস্তবিকই একটু ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। দেখিতে-দেখিতে পরের দিনটাও কাটিয়া গেল, তথাপি রণজিতের কোনও সংবাদ নাই। হুকা-কাশি এবার রীতিমতো উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। পরদিন প্রত্যুষেই তিনি বেহারা অমৃতকে রণজিতের বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন; ঘণ্টাখানেক বাদেই সে ফিরিয়া আসিল—বাড়ির কেহই রণজিতের খবর বলিতে পারে না—দু-দিন আগে সকালে সে চা খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল, তারপর হইতেই সে নিরুদ্দেশ। বিষম উৎকণ্ঠার সহিত হুকা-কাশি সময় কাটাইতে লাগিলেন, ডাক আসিবার সময় হইতেই প্রতিবার সোৎসুকভাবে খোঁজ লইতে লাগিলেন, রণজিৎ কোনও খবর পাঠাইয়াছে কি না, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁকে নিরাশ হইতে হইল।

তিনি প্রায় হাল ছাড়িয়া দিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমনসময় অমৃত আসিয়া বলিল, 'এক ল্যাংড়া বাবু এয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে; তেনার হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল রয়েছেন।'

কে এই 'বাণ্ডিলবাহী' ল্যাংড়া বাবু, দেখিবার জন্য হুকা-কাশি বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, সোফার উপর একটি যুবক বসিয়া, চেহারায় সলিলের সঙ্গে অনেকটা মিল, তবে বয়সে কিছু ছোট। 'আপনি কি দ্বারিকবাবুর কোনও আত্মীয়?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'না, দ্বারিকবাবুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।' যুবকের গলার স্বর গম্ভীর।

'ওঃ, আমার তবে ভুল হয়েছে; সলিলবাবুর সঙ্গে আপনার চেহারার একটু মিল আছে, তাই ও-কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

একটু ইতস্তত করিয়া যুবক বলিল, 'মিল থেকে থাকলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই; তিনি আমার মামা হন।'

'কীরকম? সলিলবাবু আপনার মামা, অথচ দ্বারিকবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক নেই বলছেন যে!'

'দেখুন, এ-প্রশ্ন আপনি ছাড়া আপনার পরিচিত আরও একজন ভদ্রলোক আমাকে করেছিলেন, কিন্তু আমি তখন জবাব না দিয়ে কথাটা এড়িয়ে গিয়েছিলাম; দ্বারিকবাবুর সঙ্গেও আমার ওই একই সম্পর্ক ছিল; কিন্তু তিনি বিনা দোষে আমাকে তাঁর বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন, এ-জীবনে আমার মুখ দেখবেন না বলেছেন। আমিও তাই তাঁর আত্মীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি—কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলি, আমার দুই মামা।'

হুকা-কাশির এ-পুরনো ইতিহাস জানা ছিল, মনে-মনে হাসিয়া ভাবিলেন, অভিমানী বালক! মুখে বলিলেন, 'দ্বারিকবাবু আপনার ওপর রূঢ় হয়েছিলেন, সন্দেহ নেই, কিন্তু এখন বোধহয় সে অভিমান আপনার ভোলাই ভালো। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে এবং অসুখে ভুগে-ভুগে তাঁর স্বভাব অনেকখানি মোলায়েম হয়ে এসেছে। আপনার মেজমামাকে তো আমেরিকা থেকে ফিরে আসতে দ্বারিকবাবুই লিখে পাঠিয়েছেন।'

'অভিমান উচিত কি অনুচিত সে হল তর্কের কথা,... কিন্তু সে-কথা থাক। যে-জন্য আপনার কাছে আসা তা-ই বলি; দেখুন তো এ-ফটোখানা কি আপনি চেনেন?'

হুকা-কাশি দেখিলেন রণজিৎ 'অভিযানে' বাহির হইবার পূর্বে তার হাতে তিনি যে-ফটোখানা গুঁজিয়া দিয়াছিলেন এ সেই ফটো! ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'এ কী, এ-জিনিস আপনি পেলেন কোথা?'

'ট্রেনে; সবকথা বলছি শুনুন। একটা ফুটবল ম্যাচে দেওঘর যাচ্ছিলাম, সঙ্গে ছিল ছোটমামাদের বাড়ির এক চাকর; তাকে মাঝপথে গিরিধির গাড়িতে তুলে দিতে হবে। হাওড়ায় গাড়িতে উঠে বেজায় ভিড় পেয়েছিলাম, শ্রীরামপুর আসতেই কিন্তু অনেকটা হাল্কা হয়ে এল; তারপর চুঁচড়োয় যখন পৌঁছেছি তখন গাড়িতে প্যাসেঞ্জার শুধু আমি একা। চাকরটাকে পাশের থার্ডক্লাস কামরায় তুলে দিয়েছিলাম —একেবারে অজ-পাড়াগেঁয়ে, বাড়ি ছেড়ে কোনওদিন কোথাও বেরোয়নি—দু-গাড়ির মাঝখানে একটা জানালা ছিল, তারই সামনে দাঁড়িয়ে ওকে মাঝে-মাঝে দেখছিলাম। ও ঝিমোচ্ছিল—অনেকেরই প্রায় সেই অবস্থা—শুধু একটা লোক চাদরে মুখ ঢেকে ঠায় বসেছিল, আর যতবার আমি জানালার গায়ে চোখ লাগাচ্ছি ততবারই মিটমিট করে আমার পানে চেয়ে দেখছিল। একটু বাদেই ব্যান্ডেল এসে পড়ল, দেখি লোকটা জলের কুঁজো হাতে নামছে—আমার দিকে পেছন ফিরে।

'গাড়ি প্রায় ছাড়ে-ছাড়ে এমনসময় কোত্থেকে রণজিৎবাবু এসে আমার কামরায় উঠে পড়লেন। ময়দানে অনেকবার 'ইন্টারন্যাশানালে' নামতে দেখেছি, ওঁকে চিনি ভালোমতোই। ক্রমে ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু হল—দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা, তারপর রাত্তির ঘোর হয়ে এলো। রণজিৎবাবু শুয়ে পড়লেন, আমিও আলো নিভিয়ে একটু গড়াগড়ির চেষ্টা দেখলাম। কিন্তু আমার বার্থটাতে ছিল অসম্ভবরকম ছারপোকার উপদ্রব, তাই খানিকটা বাদে উঠে রণজিৎবাবুর বেঞ্চি ডিঙিয়ে ও-পাশের আর-একটা বেঞ্চিতে গিয়ে গা ঢেলে দিলাম।

'অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছি, তন্দ্রার ঘোরে চোখ বুঁজে আসছে, এমনসময় টের পেলাম সেই চলতি গাড়ির মধ্যে কে একজন আমাদের কামরায় ঢুকেছে। গোড়াতে আমি যে-বেঞ্চিটাতে শুয়েছিলাম লোকটা প্রথমত সেইদিকেই এগোচ্ছে দেখতে পেলাম। তারপর হঠাৎ ঘুরে রণজিৎবাবুর দিকে পিছিয়ে এসে তাঁর জামার ওপর আস্তে-আস্তে হাত রেখে কী যেন সে দেখতে লাগল। ঠিক তার পরের মুহূর্তেই দেখি কিনা পকেটমারের মতন নিপুণ হাতে কী একটা জিনিস ওঁর জামার ভেতর থেকে ও টেনে বার করছে। ভাবে-ভঙ্গিতেই লোকটার স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলাম, ও-জিনিসটা যে রণজিৎবাবুর মানিব্যাগ সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই রইল না। আর দেরি করা উচিত হবে না মনে করে আমি এবার উঠে দাঁড়ালাম। লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল, পা টিপে-টিপে এগিয়ে এসে হেঁচকা টানে ওর হাত থেকে রণজিৎবাবুর জিনিস কেড়ে নিলাম; তারপরেই ধরলাম

প্রাণপণে ওকে জাপটে। বেশ বুঝলাম, লোকটা দারুণ চমকে গেছে। কিন্তু সে শুধু এক নিমেষের জন্য। পরমুহূর্তেই বেড়াল যেমন নেংটি ইঁদুরকে অক্লেশে গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়, ঠিক তেমনিভাবেই আমাকেও ঝেড়ে ফেলে, লোহার সাঁড়াশির মতো পাঁচটা আঙুল দিয়ে সবলে আমার টুঁটি চেপে ধরল। গলা দিয়ে রা বার করব কী, মনে হল সমস্ত শরীর আমার অবশ হয়ে আসছে। অন্ধকারের ভেতর বাঘের চোখের মতো ওর চোখ দুটো তখন ধক-ধক জ্বলছে। বাঁ-হাতে একটা টর্চ জ্বেলে একবার আমার মুখের দিকে তাকালো; আমার চোখ ধেঁধে গেল, তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেললাম। তারপরেই লোকটা খোলা দরজার সামনে আমায় ঠেলে এনে এক ধাক্কায় চলতি ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দিল।

'ছিটকে গিয়ে তারের বেড়ার ওপর পড়লাম, এইটুকু শুধু মনে আছে, তারপর পাঁচ-সাত মিনিট যে কী করে কেটে গেল সে-সম্বন্ধে কোনও ধারণাই নেই। ঘোরের ভাবটা একটু কমে এলে আশ্চর্য হলাম এই দেখে যে, এখনও বেঁচে আছি। পৃথিবীতে রোজই কত আশ্চর্য ঘটনা ঘটছে লোকের মুখে শুনতে পাই, খবরের কাগজেও হামেশা পড়ি, কিন্তু নিজের জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করা এই আমার প্রথম। চলতি ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে এত সামান্য চোটও মানুষে পায়! শরীরের অনেকখানি ভার তারের ওপর পড়াতে গা-টা কিছু জখম হয়েছে বটে, কিন্তু সামনেই একটা কাদার ডোবা থাকাতে গুরুতর কিছু হয়নি। অবশ্য পায়ের জখমও কম নয়—দাঁড়াতে গিয়ে পা চেপে একদম বসে পড়তে হল। সারারাত রেললাইনের পাশে পড়ে কাতরাতে লাগলাম; সকালে রেল কোম্পানির এক সাহেব ট্রলি চেপে যাচ্ছিল, আমায় দেখতে পেয়ে তুলে নিলে; সবকথা শুনে বললে, "তোমার এখন ফার্স্ট এড দেওয়া হচ্ছে সব চাইতে দরকার। তারপর রেলওয়ে এ-ব্যাপারে তদন্ত করবে। কাছেই মধুপুর স্টেশন, চলো, আপাতত সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মধুপুরের হাসপাতালে দেড়দিন থেকে ছাড়া পেয়েছি। যে-জিনিসটাকে গোড়ায় অন্ধকারে রণজিৎবাবুর মনিব্যাগ বলে মনে করেছিলাম, সেটা কিন্তু মানিব্যাগ নয়—এই ফটোখানা। চোর ব্যাটারও বোধহয় আমার মতোই ভুল হয়েছিল। হাওড়ায় নেমে বাড়ি ফিরছিলাম, হঠাৎ মনে হল রণজিৎবাবুর ঠিকানা যখন জানি না তখন তাঁর ফটো আপনার কাছেই পৌঁছে দিয়ে যাই—তিনি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু তা শ্রীপুরে ছোটমামার কাছেই শুনেছি। আচ্ছা, নমস্কার। আমি এখন চলি, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আপনাদের পাড়াতেই অমলেন্দুবাবুর বাড়ি আপাতত আমি উঠছি। না, না, সাহায্যের দরকার নেই, লাঠি ভর দিয়ে নিজের গাড়িতে উঠতে পারব।'

যুবক চলিয়া গেলে হুকা-কাশি সোফার উপর বসিয়া-বসিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপারটি ভাবিতে লাগিলেন। কী সাংঘাতিক এই দস্যুদল! রণজিৎ সামান্য একটু অসতর্ক হইয়া পড়িলে কি আর রক্ষা আছে? ভাবনার স্রোতে আরও কতদূর ভাসিয়া চলিতেন জানি না, কিন্তু চিন্তায় বাধা পড়িল, বেহারা আসিয়া তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিল। ঠিকানার উপর নজর পড়িতেই রণজিতের হস্তাক্ষর তিনি চিনিতে পারিলেন; তাড়াতাড়ি খামখানি খুলিয়া ফেলিলেন।

সুদীর্ঘ পত্র। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যান্ডেলের ঘটনা, মধ্যরাত্রে ফটোচুরির ইতিহাস, মোগলসরাইয়ের অভিজ্ঞতা—সমস্তই ধারাবাহিকভাবে বিশদ করিয়া লেখা হইয়াছে। জগন্নাথ ঘাটে অশনিকান্তের আবির্ভাব ও তাঁর লাঞ্ছনা, ব্যান্ডেল ছাড়াইবার পর অপরিচিত যুবকের সহিত পরিচয় প্রভৃতিও বাদ পড়ে নাই—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেসবেরও বর্ণনা রহিয়াছে। আমাদের পাঠক-পাঠিকার নিকট এসব তথ্য অজ্ঞাত নয়, কাজেই রণজিতের চিঠি হইতে এই অনাবশ্যক অংশটুকু বাদ দিয়া মোগলসরাই পৌঁছিবার পর কী-কী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে কেবলমাত্র সেইটুকুই উদ্ধৃত করিব।

'...রিফ্রেশমেন্ট রুম থেকে বার হয়ে কাশীর গাড়িতে গিয়ে চড়লাম। একটা লোক চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে ওদিকের জানালায় ঝুঁকে পড়ে কী দেখছিল. আমি ঢোকার প্রায় দু-তিনমিনিট বাদে এদিকে ফিরে চাইলে। চমকে উঠে পরের মুহূর্তেই

আশ্চর্য হয়ে গেলাম—ইনিই আমার জাগরণের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন, অর্থাৎ ব্যান্ডেল প্ল্যাটফর্মের জলার্থী সেই ব্যক্তিটি। ও এ-কামরায় উঠেছে জানলে আমি অবশ্যই এটাতে উঠতাম না, কিন্তু তখন আর গাড়ি বদলির সময় নেই, গার্ডসাহেব সিটি বাজিয়েছে, গাড়ি মোশান দিয়েছে।

'আমার মনে-মনে একটা বদ্ধ ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, মাঝরাত্রে সে-যুবকটি যখন ফটোখানা সরিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায় তখন সেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে এ-লোকটাও লিপ্ত ছিল নিশ্চয়ই। আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে একটু ছিপছিপে গড়নের বোধ হলেও একটু নজর করে দেখলেই বোঝা যায় কী অসম্ভব শক্তিশালী সে। লোহার মতো পেটা শরীর, হাতের কব্জি দুটো অসম্ভবরকম চওড়া আর আঙুলগুলো বেরিয়ে আসছে যেন পাঁচটা ইস্পাতের সাঁড়াশি। সে-গাড়ির আরোহী ছিলাম মাত্র আমরাই দুজন, কাজেই বুঝলাম এ-নির্জনতার সুযোগ নিতে ও নিশ্চয়ই কসুর করবে না। যে-কোনও মুহূর্তেই হয়তো আক্রমণ করে বসতে পারে, এ-আশঙ্কায় আমিও প্রতি-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম। কিন্তু একটু বাদেই লোকটার রকম-সকম দেখে আমাকে রীতিমত হতভম্ব হয়ে যেতে হল। সত্যি কথা বলতে কী, আমার সমস্ত চিন্তাশক্তিই যেন তালগোল পাকিয়ে গেল, কল্পনায় সমস্ত ব্যাপারটার যে-ছবি আমি এঁকে নিয়েছিলাম বাস্তবের সঙ্গে তার আর যেন এতটুকু মিল রইল না। লোকটা শান্ত মনে আমারই সামনে বসে, আমার ওপর তার যে সন্দেহের বাষ্পটুকুও রয়েছে তার বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া গেল না। আমার উপস্থিতিতে তার ভ্রূক্ষেপও নেই, প্রসন্নচিত্তে নিজের মনেই গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। মনের সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে যে-কোনও লোকের পক্ষেই ওভাবে গান গাওয়া এক অসম্ভব ব্যাপার।

'বেনারস ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে গাড়ি এসে থামবার পরও লোকটার কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। আমি গাড়িতেই থেকে গেলাম, না কি নামলাম সেদিকে লক্ষ পর্যন্ত না করে সে সোজা ফটক পার হয়ে এক্কাওয়ালাদের এলাকায় এসে হাজির হল, আর তার মিনিট কয়েক পরেই একখানা এক্কা ভাড়া করে বেরিয়ে গেল। যত শিগগির সম্ভব আমিও একখানা টঙ্গা নিয়ে তার পিছন-পিছন রওনা হলাম, কিন্তু খানিকটা পথ এগোবার পরই সামনের গাড়িখানা মোড় ফিরে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল, হাজার অনুসন্ধানেও তার আর কোনও কিন্নারা করা গেল না।

'গোধূলিয়া থেকে খানিক দূরে আমার আলাপী এক ভদ্রলোক কিছুদিন হল একটা হোটেল খুলেছেন; ইতিপুর্বে বার দুই তাঁর অতিথি হয়েছিলাম, মালপত্র নিয়ে তাঁরই ওখানে গিয়ে হাজির হলাম। এ দু-দিনে শরীরের ওপর দিয়ে একটা যেন ছোটখাটো ঝড় বয়ে গিয়েছিল। ম্যানেজার তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে নিয়ে পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা দিয়ে উঠতে উপদেশ দিলেন। তারপরেও ক্লান্তি যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে সন্ধ্যার পর একখানা নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার বুকের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে বেড়ালে নিশ্চয়ই তা একেবারে উবে যাবে। দশাশ্বমেধ ঘাটে ভাড়াটে নৌকোর অভাব কোনওকালেই হয় না, আর দরেও অন্যান্য ঘাটের চাইতে সেখানেই কিছু সুবিধা।

'সন্ধ্যার পর হাঁটতে-হাঁটতে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হতেই সাড়া পেয়ে মাঝির দল পঙ্গপালের মতো এসে আমায় ছেঁকে ধরল—যেন আমি ওদের একটা বহু-আকাঙ্ক্ষিত পণ্যের সামগ্রী। ওদের ব্যগ্রতা দেখে মনে হল, অন্যান্য ব্যবসার গতি যে-দিকেই হোক না কেন, মাঝির ব্যবসায়ে সম্প্রতি বড়ই মন্দা পড়েছে; প্রতিযোগিতার পাকে পড়ে দর হু-হু করে নেমে চলল। তারই মধ্যে একজন মাঝি

বড়ই সু-ব্যবসায়ী, নিরর্থক কথা কাটাকাটিতে সময়ক্ষেপ না করে সে একরকম বগলদাবা করেই আমায় তার নৌকোর দিকে নিয়ে এল। আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, "আরে বাপু রোসো, কী ভাড়া চাও সেইটেই তো এখনও খোলসা হল না।" সে পরম ঔদাস্যের সঙ্গে জবাব দিলে, "উসসে ক্যা জরুরৎ হই বাবুজি, চড়িয়ে তো আপ নাও পর, পিছে যো আপ কি মর্জি দীজিয়ে, ম্যায় খুশিসে লে লেঙ্গে।"

'গলুইয়ের উপর ভর দিয়ে নৌকোয় উঠে পড়লাম; তারপর সামনের দিকে আরও একটু এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ পাথরের মতো ভারি কী একটা জিনিসে হোঁচট খেয়েই দড়াম করে এক আছাড়! লোকটার অবিমৃষ্যকারিতায় মর্মান্তিক চটে গিয়ে ধমকে সাধ্যমতো হিন্দিতে বলে উঠলাম, "কোথাকার উজবুক হাঁদা রে তুই, সওয়ারী তুলতে এমনি মত্ত যে নৌকোর মালপত্তরগুলোও সামলে রাখতে পারিসনি? জলে যদি পড়ে যেতাম!"

'লোকটা মহা অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি হিন্দিতে কতকগুলি কথা উচ্চারণ করে গেল, আমি শুধু তার ভেতর "কসুর" কথাটা বুঝতে পারলাম। তারপর নিজের মনেই কী সব বিড়বিড় করতে- করতে পাটাতনের তক্তা তুলে জিনিসটাকে ঠেলে ভেতরে ফেলে দিয়ে আবার পাটাতন বন্ধ করে দিলে।'

'বাতাসের দিকে উল্টোমুখ করে ধীরে-ধীরে আমাদের নৌকো এগিয়ে চলতে লাগল। জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেছে, গঙ্গার প্রশস্ত বুকে রূপালী ঢেউগুলি লুকোচুরি খেলছে, আর অসংখ্য আলোর মালা গলায় পরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি কাশী জলের ভেতর নিজেরই যেন ছবি দেখছে। সত্যিই পৃথিবীর আর সমস্ত জিনিসই আমি তখন ভুলে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ এমনই তন্ময়ভাবে কেটে গেল জানি না, হঠাৎ দেখি, অসি ঘাট ছাড়িয়ে প্রায় মাইলটাক পথ চলে এসেছি। এইবার ফেরা দরকার মনে করে মাঝিকে নৌকোর মুখ ঘোরাতে হুকুম দিলাম; সে ছপাৎ করে দাঁড় তুলে নিলে, তারপরেই পাটাতনের তক্তাগুলো সরাতে আরম্ভ করল। মুহূর্ত পরে দেখি, দশাশ্বমেধ ঘাটে যে ভারি জিনিসটাতে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়েছিলাম সেইটে পাটাতনের ভেতর থেকে ওপরে চলে এসেছে। রূপালী জ্যোৎস্নায় নৌকোর চারধার প্রায় দিনের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, তারই সাহায্যে লক্ষ করলাম ওটা একটা ভারি পাথর। সেটাকে ফুটো করে কে দিব্যি একটি দড়ি গলিয়ে রেখেছে—মালা গাঁথবার সময় ঠিক যেমন পুঁতির ভেতর দিয়ে সুতো পরানো হয়। নৌকো চালাবার ব্যাপারে এ-জিনিসটার কী প্রয়োজন হতে পারে সেইটে আমি ভাবতে যাচ্ছি, এমনসময় আমার মাঝি বিকট কণ্ঠে একটা অট্টহাসি হেসে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, "এ-মালাগাছটা গলায় একবার পরে নাও তো রণজিৎবাবু!"

'একমুহূর্তে আমার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, একান্ত অজ্ঞাতসারে সেই ডাকাত দলেরই ফাঁদে পা দিয়েছি; নইলে আমার পরিচয় এরা পেলে কোথায়? নির্জন স্থানে ভুলিয়ে এনে গলায় পাথর বেঁধে এখন এরা আমায় নদীতে ডুবিয়ে মারতে চায়। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ভগবানকে একবার ধন্যবাদ না দিয়েও থাকতে পারলাম না—ভাগ্যিস এ-কাজের ভারটা ওরা মাত্র একজন লোকের ওপর দিয়েছে! হয়তো যত সহজ ওরা ভেবেছে, আসল ব্যাপারটা তত সহজে সমাধা হবে না। মাথা তুলে আড়চোখে আর-একবার লোকটার দিকে চাইতেই দেখতে পেলাম হাতখানেক লম্বা একখানা ভোজালি তার হাতে চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে। সেখানা একটু দুলিয়ে নিয়ে সে ব্যঙ্গচ্ছলে বললে, "ব্যান্ডেল থেকে কাশী পর্যন্ত ছুটে এয়োছ, একবার গঙ্গাদর্শনটা হবে না? সেও কি হয়?"

'আত্মরক্ষার সব চাইতে বড় উপায় যে আক্রমণ তা আমার জানা ছিল; নিমেষমাত্র চিন্তার সময় না দিয়েই আমি ছোরাসুদ্ধ ওর ডানহাতের কব্জিটা সবলে চেপে ধরলাম আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে দেহের সমস্ত ওজন এমনভাবে ওর বাঁ-হাতের ওপর চেপে দিলাম যে-কোনওমতে সে সেখানা মুক্ত করতে না পারে। তারপর কব্জিতে মোচড় দিতেই ওর হাত শিথিল হয়ে এল; মুখ দিয়ে যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা শব্দ করে ছোরাখানা ও জলে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল আমার চোখের আধ আঙুল ওপরে, ঠিক ভুরুর মধ্যে, একটা গোখরো সাপে যেন ছোবল মেরেছে। চমকে মাথাটা একটু সরিয়ে নিতেই ছপছপ করে কপালের ওপর আরও দুটো ছোবল। চোখ তুলে সামনের দিকে চাইতে যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত হিম হয়ে এল—আমার সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে পাঁচ-সাতজন লোক বিপুলবেগে আর-এক নৌকো চালিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আর ছোট-ছোট ছেলেরা গুলতি ছুঁড়ে যেভাবে পাখি শিকার করে, ঠিক তেমনিভাবে ওদেরই একজন আমার চোখ দুটি লক্ষ করে ক্রমাগত গুলতি ছুঁড়ছে। অব্যর্থ তার সন্ধান, চোখ দুটিকে না গেলে সে বোধকরি নিরস্ত হবে না।

'দেখতে-দেখতে দ্বিতীয় নৌকোখানা একেবারে কাছে এসে পড়ল, ভেতরে আরোহীদের স্পষ্ট কথাবার্তা শুনতে পেলাম। এতগুলো লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হওয়া আর গোঁয়ারের মতো কামানের সামনে বুক পেতে দাঁড়ানো একই কথা। "সুইমিং চ্যাম্পিয়ান" রণজিতের কাছে এ-ক্ষেত্রে যেটি আপনি প্রত্যাশা করতেন, তাই আমার কর্তব্য বলে ঠিক করে ফেললাম।

'গঙ্গা তখন খরতোয়া। চারপাশে জন-মনুষ্যের সাড়া-শব্দ নেই, আততায়ীর নৌকো দৈত্যের মতো হাত বাড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে এগিয়ে আসছে। মাতৃনাম স্মরণ করে ঝপ্ করে জাহ্নবীর বুকে লাফিয়ে পড়লাম—একেবারে দশ-বারোহাত জলের নিচে। কাশীর গঙ্গা উত্তর-বাহিনী তা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে; প্রবল টান হু-হু করে আমায় দশাশ্বমেধের দিকে নিয়ে চলল, আর তার সঙ্গে যোগ হল হাতের নৈপুণ্য। মাঝে-মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্য মাথা তুলতে হচ্ছিল, সেই অবসরে দেখছিলাম ওরা তখনও হাল ছাড়েনি, তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত নদী চষে বেড়াচ্ছে। কিন্তু জলের ভেতর কুমিরের সাক্ষাৎ পাওয়া যদি অসাধ্য ব্যাপার হয়, তবে রণজিৎ রায়ের সন্ধানও তার চাইতে বিশেষ কিছু সুসাধ্য মনে করবার কারণ নেই...।'

হুকা-কাশি চিঠি পড়া শেষ করিয়া ধীরে-ধীরে সেটি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, তারপর মনে-মনে কী একটু চিন্তা করিয়া আস্তে টেলিফোনের হাতলটি তুলিয়া লইলেন; সলিলের সঙ্গে তিনি একটু বাক্যালাপ করিতে চান।

'হ্যালো, শ্রীপুরের চিনির কারখানা এটা? সলিলবাবু আছেন?' হুকা-কাশি জিজ্ঞাসা করিলেন।

ওধার হইতে উত্তর আসিল—হুকা-কাশির মনে হইল স্বরটা যারই হোক, একটু উদ্বেগাকুল—'না, আপনি কোথা থেকে কথা কইছেন?'

'ডাফ স্ট্রিট থেকে।'

'তিনি তো... খানিক আগে... আপনার দরকারটা কী বলুন তো? ব্যবসা সম্বন্ধে?'

'ওঃ, তিনি নেই তা হলে! আচ্ছা, ফিরলে বলবেন ডাফ স্ট্রিট থেকে ফোনে ডেকেছিল, তা হলেই হবে।' বলিয়া আর কোনও জবাবের অপেক্ষা না রাখিয়াই হুকা-কাশি টেলিফোনের হাতল নামাইয়া রাখিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে অমৃত আসিয়া ঘরে ঢুকিল, কহিল, 'এজ্ঞে শিরিষপুর থেকে সন্তোষবাবু এয়েচেন, তেনার সঙ্গে আর-এক বাবু রয়েচেন। ওনাদের চেহারাটা কেমন বেজার-বেজার আর কাহিল-কাহিল ঠেকচেন। বললেন, আপনার সঙ্গে নাকি ভয়ঙ্কর দরকার।'

আচ্ছা বাইরের ঘর খুলে তাঁদের বসতে দাও গে, আমি এক্ষুনি আসছি।'

চৌদ্দ ঃ মেজাজী পার্শী

বাহিরের ঘরে আসিয়া হুকা-কাশি দেখিলেন, সন্তোষ এবং অপর একটি অপরিচিত ভদ্রলোক সোফার উপর বসিয়া আছেন; উভয়েরই মুখের ভাব উদ্বেগপূর্ণ। তাঁকে ঢুকিতে দেখিয়া দুজনেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সন্তোষ পরিচয় করাইয়া দিল, 'ইনি আমাদের কর্তার মেজভাই। আমেরিকা থেকে আজই দেশে এসে পৌঁছেছেন...।'

সে আরও কী বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হুকা-কাশির সৌজন্যের বন্যায় তা ভাসিয়া গেল; তিনি আন্তরিকতার সহিত নবাগতের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করিতে-করিতে বলিলেন, 'লেট মি ওয়েলকাম ইউ ইন ইওর ওন মাদার কানট্রি, মিস্টার বাসু। একযুগ পরে নিজের দেশে ফেরায় যে কী আনন্দ তা আমি কিছু-কিছু জানি—আমার নিজের জীবনেও ও-জিনিসটা দু-একবার ঘটেছে কিনা!' বিলাত অথবা আমেরিকায় গিয়া এখনও অনেক বাঙালি যে 'রায়'কে 'রয়', 'দাস'কে 'ডস' এবং বসুকে 'বাসু' নামে চালান হুকা-কাশি তা জানিতেন এবং নবাগত ভদ্রলোকটিও যে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম নন ইতিপূর্বেই তিনি তা জানিতে পারিয়াছিলেন।

মিস্টার বাসু বলিলেন, 'বাস্তবিক, দেশের মাটিতে পা দিতেই আনন্দ যা হয়েছিল তা অপরিসীমই বটে, কিন্তু ভগবান অবিমিশ্র আনন্দ বোধহয় কারও কপালেই লেখেন না। বাড়ি এসেই দেখলাম, রোগে আর চিন্তায় বড়দার শরীর অর্ধেক হয়ে গেছে; তারওপর আজ আবার আমার ছোটভাই সলিলকে পুলিশ এসে থানায় নিয়ে গেল। বড়দা তাই তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।'

হুকা-কাশি একটু যেন চমকাইয়া উঠিলেন, সন্তোষকে লক্ষ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'থানায় নিয়ে গেছে? কিন্তু কেন?'

সন্তোষ চুপ করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল, বারকয়েক ইতস্তত করিল, তারপর বলিল, 'আপনি কি বাস্তবিকই বুঝতে পারছেন না মিস্টার হুকা-কাশি? সোনার হরিণ চুরি যাওয়ার কথা যে চাপা নেই তা আপনি নিশ্চয়ই জানেন। সমস্ত দেশময় তা ছড়িয়ে পড়েছে—নানা জায়গায় পুলিশের কর্তাদের কানে তা তোলা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমার মুখ দিয়ে কোনও রা বার হয়নি, হয়তো এখনও বার হওয়া শোভন হচ্ছে কি না জানি না, কিন্তু তবুও কর্তব্যের খাতিরে আজ আর এ-কথা না জানিয়ে থাকতে পারছি না যে, এই চুরির পর থেকেই সলিল যেন—যেন—কেমন একটু আলাদা মানুষ হয়ে গেছে; তার ধরন-ধারণ যেন—এ—ইয়ে—কেমন একটু অস্বাভাবিক মতো হয়ে পড়েছে। এ-ক্ষেত্রে পুলিশ যদি...।'

সন্তোষ কথাটা শেষ করিল না বটে, কিন্তু তার ইঙ্গিত অতি সুস্পষ্ট। এই চুরির ব্যাপারে সলিল যে নিতান্ত সাধুপুরুষটি নয় ইহাই যেন সে ভাবে-ভঙ্গিতে বুঝাইতে চায়। হুকা-কাশি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে এ-ছেলেটির পা হইতে মাথা পর্যন্ত বারবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে কোনও কথা বলিলেন না। কিন্তু ধৈর্য হারাইলেন মিস্টার বাসু। সোনার হরিণের সমস্ত কথাই তিনি শুনিয়াছেন, সলিল—তাঁরই নিজের ছোটভাই, নির্মল, নিষ্কলুষ সলিল—তার বিরুদ্ধে এ কী জঘন্য অভিযোগ! রাগে তাঁর চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল, সন্তোষের দিকে ফিরিয়া কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, 'একমাত্র তোমার অনুমান ছাড়া সলিলের বিরুদ্ধে কী প্রমাণ তুমি পেয়েছ সন্তোষ, যাতে করে এতবড় একটা

দুর্নামের বোঝা তার ওপর চাপাতে সাহস করছ? সলিলকে আমরা চিনি, তোমার চেয়ে ঢের বেশি চিনি; আর চিনি বলেই জোর করে বলতে পারি—তার মতো সৎ ছেলে লাখে একজনও মেলে না। তুমি অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, নিশ্চয়ই তার প্রতি হিংসায় জ্বলে-পুড়ে মরছ, কাজেই তার ঘাড়ে এতবড় একটা বদনামের বোঝা চাপাতে উঠে পড়ে লেগেছ। কিন্তু দাঁড়াও, আমিও সহজে তোমায় রেহাই দিচ্ছি না; আজই বড়দাকে গিয়ে জানাব, দুধ-কলা দিয়ে কী কালসাপ তিনি ঘরের ভেতর পুষছেন!' উত্তেজনায় তিনি হাঁফাইতে লাগিলেন, আর তাঁর চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল ঠিক যেন দুই খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা।

সন্তোষ বেচারা একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিল। আজ এ-বাড়িতে ঢুকিবার অব্যবহিতকাল পূর্বেও সে একটি বারের তরেও ভাবিতে পারে নাই যে, যে-কথাটা এতদিন ধরিয়া তার মনের আনাচে-কানাচে অনবরত উঁকি মারিতেছিল আজ এমনই ভাবে বাহিরে তা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হুকা-কাশি ওভাবে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া না বসিলে কথাটা যে প্রকাশও পাইত না, তাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু নিজের মনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে এমন লোক পৃথিবীতে কয়জনই বা মেলে? ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া সন্তোষের যেন অনুশোচনার আর অবধি রহিল না, অপরাধীর মতো মাথা নিচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

হুকা-কাশি এতক্ষণ ভালো-মন্দ কোনও কথাই বলেন নাই, এইবার সন্তোষের দিকে তাকাইয়া ধীরে-ধীরে কহিলেন, 'থানায় নিয়ে গেছে বলছেন, কোন থানায়?'

সন্তোষ ম্লানমুখে বলিল, 'তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। কারখানা থেকে একজন বেয়ারা ছুটে এসে খবর দিয়ে গেল—"ছোটবাবুকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।" খবর শুনে তাড়াতাড়ি কারখানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম, একজন অফিসার আর একজন জমাদার এসেছিল। জমাদার বেঙ্গল পুলিশেরই বটে, কিন্তু অফিসারটি রেলওয়ে পুলিশের। সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীপুর থানায় চলে গেলাম, গিয়ে দেখি দারোগাবাবু নেই, মফস্বলে কোনও এক তদন্তে বেরিয়েছেন; আর যারা রয়েছে তারা কোনও খবরই দিতে পারলে না। ব্যাপারটা যেন কেমন-কেমন ঠেকল, বাড়ি ফিরে কর্তাকে সবকথা বলতেই তিনি ব্যস্ত হয়ে আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

সন্তোষের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই হুকা-কাশির মুখে কৌতুকের হাসি ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'আর এর ভেতর "কেমন-কেমন" কিছু নেই, সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনারা নিরর্থক চিন্তিত হচ্ছেন মিস্টার বাসু, সলিলবাবুকে পুলিশে মোটেই গ্রেপ্তার করেনি। রেলওয়ে পুলিশের অফিসার এসেছিল ওঁর কাছে এক তদন্তে, আর তারই ফলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উনি বেরিয়ে পড়েছেন অন্য এক ব্যাপারের তদন্তে। যাওয়ার সময় ওঁর মন এমনই ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল যে, কারখানায় বা বাড়িতে যে কিছু বলে যাওয়া দরকার তা পর্যন্ত খেয়ালে আসেনি। হঠাৎ অভাবনীয় একটা কিছু ঘটেছে জানতে পারলে এরকম ভুল মানুষের প্রায়ই হয়ে থাকে। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, আপনারা বাড়ি গিয়ে দেখবেন সলিলবাবু ফিরে এসেছেন।'

হুকা-কাশির কথা শেষ হইবার পূর্বেই বাহিরে পায়ের শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তপরেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল সলিল! মিস্টার বাসু এবং সন্তোষ সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন।

হুকা-কাশি মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কী, ভাগ্নের খবর কিছু মিলল?'

এবার বিস্ময় প্রকাশের পালা সলিলের। কহিল, 'না, তার সন্ধান পেলাম না; কিন্তু আপনি সে-কথা জানলেন কোত্থেকে মিস্টার হুকা-কাশি?'

এই বিশেষ 'আবিষ্কার'টায় তাঁর নিজের যে কিছুই কৃতিত্ব নাই, একটু আগে 'ভাগিনেয়' স্বয়ং আসিয়াই যে তাঁর কাছে সমস্ত ঘটনা বলিয়া গিয়াছিল, হুকা-কাশি সে-কথা ভাঙা আবশ্যক বোধ করিলেন না, বরং একটু ঘোরালোভাবে কহিলেন, 'আমাদের যে অনেক কিছু জানতে হয় সলিলবাবু—অনেক কিছু!' এই শেষের কথাটা বলিবার সময় মনে হইল তাঁর চোখে যেন একটু

রহস্যময় হাসি খেলিয়াই আবার মিলাইয়া গেল। এটুকু সলিলের দৃষ্টি এড়াইল না, মনে-মনে সে বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল যেন।

সন্তোষ এবং মিস্টার বাসুও কম আশ্চর্য হন নাই; মিস্টার বাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিন্তু সলিলকে বাস্তবিকই পুলিশে গ্রেপ্তার করেনি, ঘরে বসে এ-কথা আপনি কী করে জানলেন?'

'এটা জানতে বাইরে বেরুবার মতো জটিলতা কোথাও তো কিছু ছিল না!... আপনার ভাগ্নের একটা রেলওয়ে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। অ্যাকসিডেন্ট বললে ঠিক বলা হল না, চলন্ত গাড়ি থেকে এক গুণ্ডা তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল।'

মিস্টার বাসু এবং সন্তোষ যুগপৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন—'উঃ! বলেন কী?'

'হ্যাঁ, সত্যি কথা; কিন্তু আপনারা বিচলিত হবেন না, খুব অল্পের ওপর দিয়েই গেছে, আপনার ভাগ্নে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ই-আই-আরের একজন সাহেব কর্মচারী লাইনের পাশে ও-অবস্থায় ওঁকে পড়ে থাকতে দেখে নিজের ট্রলিতে উঠিয়ে মধুপুরের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এটা "অ্যাটেম্পটেড্ মার্ডার" কেস, কাজেই রেলওয়ে পুলিশ এ-সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত করবে—এ-কথা তিনিই আপনার ভাগ্নেকে বলে দিয়েছিলেন। আপনার ভাগ্নে শ্রীপুর থেকে রওনা হয়েছিলেন, কাজেই শ্রীপুরের ঠিকানা যখন পুলিশ চাইল, তখন তিনি C/o. সলিল বোস-ই বললেন, C/o. দ্বারিক বোস বললেন না নিশ্চয়ই, কেননা, আপনারা পারিবারিক সব ঘটনাই জানেন—দ্বারিকবাবুর সম্পর্ক তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন।' হুকা-কাশি মৃদু হাসিলেন।

'যখন শুনলাম,' হুকা-কাশি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'যে এঁর কাছে রেলওয়ে পুলিশের অফিসার এসেছিল, তখনই আমার মনে সন্দেহ হল। তারপর যখন আপনারা আরও বললেন যে, শ্রীপুরের থানায়ও আপনারা খবর নিয়ে এসেছেন—সলিলবাবু কোথায় সে-সম্বন্ধে থানার লোক কিছুই জানে না, তখন স্পষ্ট বোঝা গেল ওঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি নিশ্চয়ই, কেননা শ্রীপুরের সব চাইতে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনও ছেলে গ্রেপ্তার হবে, অথচ থানার লোকজন তার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারবে না, এটা খুবই অস্বাভাবিক। অথচ এদিকে আমার জানা আছে যে, যে-অফিসারটি সলিলবাবুর কাছে এসেছিলেন তিনি রেলওয়ে পুলিশের—মানে, রেলওয়ের এলাকার মধ্যে পুলিশ-গ্রহণযোগ্য কোনও কিছু ঘটলে তখনই তাঁদের কাজকর্ম শুরু হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সাহেবের কথা মনে পড়ে গেল—"এরপর রেলওয়ে পুলিশ এ-ব্যাপারে বিশেষ তদন্ত করবে।" মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না যে, আপনাদের ভাগ্নের "অ্যাকসিডেন্ট" অথবা "অ্যাটেম্পটেড্ মার্ডার" যাই বলুন—সে-সম্বন্ধেই রেলওয়ে পুলিশ তদন্তে এসেছিল সলিলবাবুর কাছে। ভাগ্নে সম্বন্ধে এমন একটা ভয়ঙ্কর খবর পেলে সবারই পিলে চমকে ওঠে, কাজেই সলিলবাবু যখন অফিসারের কাছে শুনতে পেলেন যে, ওঁর ভাগ্নে খুব সম্ভবত কলকাতাতেই ফিরে এসেছেন, তখন সেই অবস্থায় 'একবস্ত্রে' ওঁর সঙ্গেই কলকাতা রওনা হয়ে এলেন। মনের ওরকম অবস্থায় বাড়িতে একটা খবর পাঠানো যে দরকার তাও ওঁর খেয়ালে আসেনি। কেমন সলিলবাবু, বিশ্লেষণটা ঠিকমতো হয়েছে তো?'

'অবিকল! কোথাও এতটুকু ভুল হয়নি।' তার কণ্ঠস্বরে বিস্ময় বিজড়িত।

মিস্টার বাসুর সম্ভ্রমও অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি কহিলেন, 'আমি এসে পৌঁছবার পর বড়দার মুখে আপনার শক্তির কথা অনেক কিছুই শুনতে পেয়েছি। রাজা শশাঙ্কশেখরের পদ্মরাগ মণি কেমন সুকৌশলে আপনি উদ্ধার করে দিয়েছিলেন, নলকোপার ভূপেশ ঘোষচৌধুরীর ঘড়ির রহস্য কেমন নিখুঁতভাবে ভেদ করে দিয়েছিলেন—সবই তিনি আমায় বলেছেন। আপনার কাজের ধারা কীরকম তা আগেই শুনেছিলাম, এখনও কিছু-কিছু প্রত্যক্ষ করলাম—লাঠির সাহায্য নেই, মাংসপেশীর অনাবশ্যক চালনা নেই, কথায়-কথায় পিস্তল ছোঁড়া আর রক্তারক্তি কাণ্ড নেই—শুধু যুক্তিতর্কের সাহায্য আর মস্তিষ্কের ব্যবহার। বাস্তবিক এ একটা শিক্ষার, একটা অনুপ্রেরণার বিষয়। আমি জোর করে বলতে পারি, আমেরিকা হলে সেখানকার উৎসাহী যুবকদের ভেতর আপনার জীবনচরিতকার হওয়ার জন্য দস্তুরমতো রেষারেষি পড়ে যেত। প্রত্যেকটি অ্যাডভেঞ্চারে আপনার

নিত্যকার সঙ্গী হয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ঘটনা পর-পর তারা লিখে রাখত, তারপর অ্যাডভেঞ্চার শেষ হয়ে গেলে বই-এর আকারে তা প্রকাশ করে সমস্ত জগতের সঙ্গে আপনার প্রতিভার পরিচয় করিয়ে দিয়ে তবে তারা ক্ষান্ত হত! অবশ্য এই বয়সে আর সম্ভব নয়, নইলে আমার নিজেরই যেন উৎসাহ হচ্ছে!'

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, 'বেশ তো, নেমেই পড়ুন না তা হলে! বয়স আর আপনার এমন কী-ই বা হয়েছে? আমার চাইতেও কি বড় হবেন?'

'অনেকদিন বাদে দেশে ফিরেছি, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে বাস করতে ইচ্ছে করে বইকী! কিন্তু তা হোক, বড়দার সোনার হরিণের কিনারা করতে একটুও যদি আপনার কাজে লাগতে পারি তবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যটা না-হয় না-ই দেখলাম! আমি রাজি।'

হুকা-কাশি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'কিন্তু গোড়াতে একটা কথা পরিষ্কার করে আপনাকে বলা দরকার বোধ করছি; আমাদের বোঝাপড়া চলবে কিন্তু অতি দুর্দান্ত বেপরোয়া এক দস্যুদলের সঙ্গে। এ-দলটা কতখানি পুরু তা এখনও আমি ভালো করে ঠাহর করে উঠতে পারিনি, কাজেই আমার নিজেরও একটু দলবৃদ্ধি করে নেওয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে যোগদানে বিপদের সম্ভাবনাটা যে কতখানি তা প্রথমেই বলে রাখা ভালো; মানুষের প্রাণকে কিন্তু এরা প্রাণ বলেই গ্রাহ্য করে না—পিঁপড়ের মতো মানুষকেও টিপে মারতে এরা সর্বদাই অভ্যস্ত। ছোরা চালাতে এবং পিস্তল ছুঁড়তে এদের কিন্তু একেবারেই বাধে না।'

হুকা-কাশির এ-কথায় সলিলের মুখ প্রায় পাংশু হইয়া উঠিল, কিন্তু মিস্টার বাসু তা লক্ষও করিলেন না। হাসিয়া কহিলেন, 'সে-ভয় আমায় কী দেখাচ্ছেন, মিস্টার হুকা-কাশি? পাঁচ বচ্ছর আমি আমেরিকার শিকাগো শহরে কাটিয়ে এসেছি; শিকাগোর গুণ্ডাদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের দস্যুরই কি তুলনা চলে? এখানকার দস্যুদের তো ছ্যাঁচড়া বললেই হয়, বুদ্ধির কোনও বালাই-ই নেই। সেখানে তারা চলে পদে-পদে বিজ্ঞানের সাহায্যে। বেপরোয়া দস্যু যদি বিজ্ঞানের বলে বলী হয়, তবে সমাজের যে তারা কী ভীষণ অভিশাপস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা প্রত্যক্ষ করেছি শিকাগোতে—কিলিঞ্জার প্রভৃতির লীলাভূমি শিকাগো শহরে।'

হুকা-কাশি প্রসন্ন হইলেন। বলিলেন, 'বেশ, তা-ই তবে কথা রইল, সময় হলেই আপনাকে খবর দেব।'

দরকার মিটিয়া গিয়াছিল, সকলে এইবার উঠিবার উপক্রম করিল; সলিল একটু কাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে প্রশ্ন করিল, 'আমার সঙ্গে আপনার কি কোনও দরকার আছে, মিস্টার হুকা-কাশি?'

'সে-কথা আপনি জানলেন কী করে? শ্রীপুর হয়ে তবে আসছেন নাকি?'

'না, বড্ড বেশি দেরি হয়ে গেছে দেখে একটু আগে কারখানায় ফোন করেছিলাম যে, আমার ফিরতে রাত হতে পারে—কেউ যেন ভাবনা না করে। তারা সব ঘটনা খুলে বললে, তারপর জানালে যে মেজদারা রওনা হয়ে আসবার কিছু পরে আপনি ফোনে আমায় ডেকেছিলেন।'

'তারা ঠিক খবরই দিয়েছে। কাল বেলা ঠিক দুটোর সময় আমার এখানে আসবার একটু সুবিধা হবে কি আপনার?'

সলিল সন্দিগ্ধভাবে খানিকক্ষণ হুকা-কাশির মুখের দিকে তাকাইল, তারপর আস্তে-আস্তে বলিল, 'বেশ আসব।'

পরদিন বেলা দুইটা বাজিতে-না-বাজিতেই সলিল হুকা-কাশির বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল, কেননা সে জানিত, পূর্ব হইতে কারও সঙ্গে দেখা করিবার কোনও সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় তা তিনি পালন করেন। কিন্তু আজ বাড়ির ফটকে ঢুকিতেই বেহারা তাকে

সেলাম জানাইয়া কহিল, বাবু তাঁর কোনও জরুরি কাজে বাহির হইয়া গিয়াছেন—সলিল আসিলে বৈঠকখানা ঘরে তাকে বসাইবার জন্য তার উপর নির্দেশ রাখিয়া। বেহারা অমৃতের পিছন-পিছন সে আসিয়া ড্রইং রুমে প্রবেশ করিল। ঘরে ঢুকিয়াই সে কিন্তু বিশেষ একটু আশ্চর্যান্বিত হইল এই দেখিয়া যে, সে ছাড়া আরও এক ভদ্রলোকের সহিত ইতিপূর্বেই হুকা-কাশি এনগেজমেন্ট করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই লোকটিও তাঁরই অপেক্ষায় বসিয়া-বসিয়া এইবারে রীতিমতো উসখুস করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। লোকটি একজন আধা-বয়সী পার্শী, দেখিলে মনে হয় বেশ সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যবসাদার। সলিল ঘরে ঢুকিতেই সেই পার্শী ব্যবসাদারটি আড়চোখে একবার তার মুখের পানে তাকাইল, কিন্তু কোনও কথা কহিল না।

দেখিতে-দেখিতে আরও প্রায় পনেরো মিনিট সময় কাটিয়া গেল, পার্শী ব্যবসাদারটির মুখে বিরক্তির চিহ্ন এইবার যেন সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল, বাহিরেও সেই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে সে হাঁকিল, 'বেয়ারা, এ বেয়ারা, ইধার আও। সাহেব কা ঘুমনেমে আউর কেৎনা দের হোগা? পঁচিশ মিনিট তো কব্‌হি বিত গিয়া, আউর কেৎনা ঠারেঙ্গে?'

লোকটার কণ্ঠস্বরে কানে যেন পীড়া দেয়, মনে হয়, কেহ যেন সজোরে একটা ভাঙা কাঁসর বাজাইতেছে। তার এই মধুর আহ্বান শুনিয়া অমৃত আগাইয়া আসিল, কুণ্ঠিতভাবে দুই হাত কচলাইতে-কচলাইতে জানাইল, আজিকার এ-ব্যাপার বাস্তবিকই বিস্ময়কর, কেননা তার মনিবকে বহুদিন যাবৎ সে জানে, কথায় এবং কাজে মিল রাখিতে এরূপ লোক বাস্তবিকই দেখা যায় না। কেন যে তিনি কথা দিয়া আজ তা রাখিতে পারিতেছেন না, তা তার কল্পনারও বাহিরে।

নীরবে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল; পার্শী সাহেব বোধকরি একবার ইতস্তত করিল, তার পরেই সলিলকে লক্ষ করিয়া ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'মাপ করবেন, আপনার নামই কি সলিলবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' বিস্মিত সলিল জিজ্ঞাসুভাবে তার মুখের পানে তাকাইল।

'ওঃ, আমাকে আর আপনাকেই তবে সঙ্গে নিয়ে মিস্টার হুকা-কাশি ডায়মন্ড করপোরেশনে যাবেন, কথা ছিল।'

'কোথায় যাবেন?' অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সলিল প্রশ্ন করিল।

'ডায়মন্ড করপোরেশনে। কেন, ও-জায়গাটার নাম এর আগে আপনি আর শোনেননি না কি?'

'এই আপনার কাছেই প্রথম শুনছি।'

'বাঃ মিস্টার হুকা-কাশি যে বললেন, সেখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার বিশেষ জানাশোনা আছে! মিস্টার এ—এ—কী তো যেন নামটা?'

'কী করে বলি বলুন, জায়গাটার নামই জানি না শুনছেন, তা ম্যানেজারের নাম জানব কী করে?'

'ওঃ, কেন তবে অমন কথা হুকা-কাশি বললেন তিনিই জানেন। কিন্তু কী আনপাংচুয়াল লোক বলুন দেখি! পৌনে দুটোর এনগেজমেন্ট করে... বেয়ারা! বেয়ারা! এ বেয়ারা!!'

নাঃ, লোকটা জ্বালাইল দেখিতেছি, গলার আওয়াজে মাথার পোকা বাহির হইয়া আসিতে চায়! সলিল অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিল। তার এ-বিরক্তির ভাবটুকু কিন্তু পার্শী সওদাগরের নজর এড়াইল না, সলিলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, 'সত্যিই আমার গলার আওয়াজটা ভারী কনকনে, কিন্তু আপনি কি সত্যিই বলতে চান, সলিলবাবু, যে এইরকম গলার আওয়াজ বাস্তবিকই আর কখনও আপনি শোনেননি!' তার চোখের কোণে একটু ধূর্ত চাহনি আর ঠোঁটের পাশ দিয়া একটু বাঁকা হাসি যেন খেলিয়া গেল।

একমুহূর্ত সলিল যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ঠিক তার পরক্ষণেই কী ভাবিয়া একেবারে সচকিত হইয়া উঠিল—আতঙ্কের একটা ছাপ তখন তার মুখে স্পষ্ট ছাপা হইয়া গেছে।

পনেরো ঃ সলিল-চরিত

সন্ধ্যার কিছু আগে বাড়ি ফিরিয়া সলিল দেখিতে পাইল মিস্টার বাসু খুব ব্যস্তভাবে নিজের সুটকেসে কাপড়-জামা, আয়না, চিরুনি, সাবান প্রভৃতি গুছাইতে লাগিয়া গিয়াছেন—যেন এখনই কোথায় বাহির হইয়া পড়িবেন, মরিবারও ফুরসুত নাই। সলিল ঘরে ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে সলিল এসেছিস? ভালোই হল, আমি মনে করছিলাম হয়তো যাওয়ার আগে তোর সঙ্গে আর দেখাই হবে না। একটু আগে মিস্টার হুকা-কাশি ফোন করেছিলেন, ঠিক ন'টার সময়ে হাওড়ার সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাল্পিতল্পা নিয়ে আমায় হাজির থাকতে; আজকে রাত্রেই নাকি আমাদের বেনারস বেরিয়ে পড়া দরকার। দুপুরবেলা তোর সঙ্গে যে-এনগেজমেন্ট করেছিলেন তা রাখতে না পারায় মাফ চেয়েছেন। তাঁর বিশেষ দোষ নেই এতে, কেননা ওঁদের কাজের ধরনটাই এই রকম কিনা! যে-কাজে হাত দিয়েছেন দৈবাৎ হয়তো তার একটা সূত্র মিলে গেল; তখন আর সমস্ত কাজকর্ম পণ্ড করে তক্ষুনি সেই সরু সুতোটুকু ধরে-ধরে এগোনো ছাড়া তাঁর উপায় থাকে না। এইরকমই একটা সূত্র মিলে যাওয়ায়—ওকী, তুই অমন করছিস কেন?'

বাস্তবিক সলিলের চোখ-মুখের অবস্থা যেন আর স্বাভাবিক ছিল না। পার্শী সওদাগরের কথায় ইতিমধ্যেই তার বুকের ভেতর তুফান উঠিয়াছিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়াই যখন শুনিল মিস্টার বাসু হুকা-কাশির সহিত একযোগে সোনার হরিণ উদ্ধার করিতে কাশী রওনা হইয়া যাইতেছেন তখন সাহসী বলিয়া সচরাচর পরিচিত সলিলও যেন একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল।

মিস্টার বাসু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'তোর কি কোনও অসুখ করেছে সলিল?'

'না।' তারপর একটু থামিয়া, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'তুমি এ-ব্যাপারের মধ্যে যেয়ো না মেজদা! এ দস্তুরমতো আগুন নিয়ে খেলা। পদে-পদে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।'

মিস্টার বাসু হাসিলেন, 'না রে, না, তুই নিশ্চিত থাক। এ ছ্যাঁচড়া গুণ্ডাদের সাধ্য কি আমার কোনওরকম ক্ষতি করে? শিকাগো-ফেরতা আমি সেটা ভুলে যাচ্ছিস? আর তা ছাড়া ভেবে দেখ, আমরা সব জলজ্যান্ত উপস্থিত থাকতে শুধু ধাপ্পাবাজির জোরে কেউ দাদার এত সাধের জিনিসটা বেমালুম হজম করে ফেলবে, একি সহ্য করা সম্ভব! অহিভূষণ চৌধুরী বাস্তবিকই নিজে থেকে দাদার সঙ্গে প্রতারণা করেছে, না কি তার পেছনে দাঁড়িয়ে অন্য কোনও মাথাওয়ালা লোক কলের পুতুলের মতো তাকে চালিয়েছে, সে-সমস্ত খুঁটিনাটি একটি-একটি করে বার করে তবে আমি ছাড়ব। জানিস তো আমার গোঁ!'

সলিলের মুখে একঝলক রক্ত হঠাৎ আসিয়াই আবার যেন মিলাইয়া গেল। মিস্টার বাসু তার এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর স্পষ্ট লক্ষ করিলেন, গুণ্ডার কবলে পড়িবার তাঁর সম্ভাবনা আছে এবং সেইজন্য ভাইয়ের একটা স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি শুধু তা-ই? তা হইলে বিশেষ করিয়া তাঁর শেষ কথাগুলি শুনিবার পরই সলিলের মুখে অমন অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব ফুটিয়া উঠার মানে কী? যেমন করিয়াই হোক অহিভূষণ চৌধুরীর রহস্য তিনি ভেদ করিবেন—এ-কথা বলায় অমন ধারা আঁতকাইয়া ওঠার কী আছে? ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তিনি বারকয়েক সলিলের পা হইতে মাথা পর্যন্ত দেখিয়া লইলেন, তারপর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকাইলেন। সলিল কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু হঠাৎ থামিয়া গেল, কেননা ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলেন স্বয়ং দ্বারকানাথ।

'ডক্টর মৈত্র কাল বেলা তিনটের সময় আসবেন বলেছেন, না?' মিস্টার বাসুর দিকে তাকাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মিস্টার বাসু সুটকেসে আবার হাত দিয়াছিলেন, জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সেইরকমই কথা আছে বটে, তবে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপারেশনটা বন্ধ রাখতে হবে—সন্তোষকে সব বুঝিয়ে বলে রেখেছি।'

'বুঝিয়ে বলে রেখেছিস? তার মানে তুই কোথাও বাইরে বেরেচ্ছিস নাকি?'

'হ্যাঁ, একবার কাশী যেতে হবে।'

'কাশী যেতে হবে কেন?'

অসুখে মানুষের মনের তেজ অনেকখানি নিভাইয়া আনে; তাঁর এই অসম্ভব রকমের তেজী দাদাটি যে বহুদিন রোগে-ভুগিয়া ভুগিয়া বর্তমানে খানিকটা 'ভেতো' স্বভাব পাইতে বসিয়াছেন, দেশের মাটিতে পা দিয়াই বোধকরি মিস্টার বাসু তাহা বুঝিয়াছিলেন। পাছে গুণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযানের কথা শুনিয়া তিনিও ভড়কাইয়া যান এই ভয়ে তাড়াতাড়ি তিনি কহিলেন, 'হুকা-কাশি সঙ্গে নিতে চাইছেন, আমি গেলে তাঁর নাকি কিছু উপকার হবে। ডক্টর মৈত্র বলেছেন, অপারেশনের খুব বেশি তাড়াতাড়ি নেই, কাজেই আমি ফিরে এলেও তা হতে পারবে। যাতে খুব বেশিদিন বাইরে থাকতে না হয় তারই চেষ্টা করা যাবে'খন।' শেষের কথাটুকু অবশ্য তিনি যোগ করিলেন দ্বারকানাথকে প্রবোধ দিবার জন্য।

হাওড়া স্টেশনে আসিয়া মিস্টার বাসু যখন পৌঁছিলেন ট্রেন ছাড়িবার তখন মাত্র মিনিট পনেরো দেরি আছে। ভিতরে ঢুকিয়াই তাড়াতাড়ি তিনি এধার হইতে ওধার পর্যন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা একবার ঘুরিয়া লইলেন, তারপর প্রত্যেকটি কামরার কাছে আসিয়া উঁকি মারিয়া-মারিয়া দেখিতে লাগিলেন—নাঃ, মিস্টার হুকা-কাশি এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে 'বার্থ' যথারীতি রিজার্ভড হইয়াছে বটে।

যে-গাড়িখানায় 'বার্থ রিজার্ভ' হইয়াছিল তারই সামান্য একটু দূরে প্ল্যাটফর্মে আঁটা রেল-ওয়ের একটা বেঞ্চি দেখিতে পাইয়া মিস্টার বাসু সেইখানে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চিটা যে একেবারে খালি ছিল তা নয়, অপর প্রান্তে আর-একটি লোক বসিয়া ছিল; পরনে তার খাকি রঙের শর্টস এবং শার্ট, পায়ে স-পট্টি বুট, হাতে সুপুষ্ট লাঠি। সবচেয়ে প্রধান লক্ষ করিবার বিষয় এই যে, সে তার মাথার ফেল্ট হ্যাটটা সামনের দিকে প্রায় ভ্রূর কাছাকাছি পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মিস্টার বাসু জানিতেন, এভাবে টুপি পরে সাধারণত কেবল তারাই, যারা কোনও কারণে নিজেদের পরিচয় গোপন রাখিতে চায়। স্বভাবতই তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন; অস্বস্তির ভাব তাঁর ক্রমে বাড়িয়া গেল যখন তিনি স্পষ্ট টের পাইলেন যে, লোকটা টুপির আড়াল হইতে তাঁর পানে ঘন-ঘন চোরা কটাক্ষ হানিতেছে।

এদিকে গাড়ি ছাড়িবার সময়ও কাছাইয়া আসিল—ঢং-ঢং করিয়া পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়িয়া গেল—অথচ হুকা-কাশির তখন পর্যন্ত দেখা নাই। মিস্টার বাসু এইবার দস্তুরমতো চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কী যে তাঁর কর্তব্য কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। হঠাৎ দেখেন শার্ট-পরা সেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তারপর মিস্টার বাসুর একেবারে কাছে আসিয়া খাটোগলায় তাড়াতাড়ি সে বলিল, 'কোনও জবাব না দিয়ে সটান গাড়িতে উঠে পড়ুন গে'। গাড়ি মোশান দিলে তবে আমি চাপব। অন্যান্য কথা পরে হবে—আমি হুকা-কাশি।'

গাড়ি ছাড়িয়া দিলে পর মিস্টার বাসু বলিলেন, 'কৌতূহলে মারা যাচ্ছি মিস্টার হুকা-কাশি, আমায় শিগগির খুলে বলুন হঠাৎ আপনার এরকম ভোল বদলাবার মানে কী? আমি তো দূরের কথা, আপনার মা জীবিত থাকলে তিনি পর্যন্ত এ-বেশে আপনাকে চিনতে পারতেন কি না বিশেষ সন্দেহ।'

দুইজন সাহেব ছাড়া গাড়িতে আর কেউ ছিল না, হুকা-কাশি তাই অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলেন, 'অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে এছাড়া আর কী উপায় আছে বলুন! যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি কৌশলের জালে ফেলে তাকে কাবু করে আনা সম্ভব, কিন্তু যে-শত্রু কেবল ইন্দ্রজিতের মতো মেঘের আড়াল থেকেই বাণ ছোঁড়ে তাকে বাগে আনতে হলে নিজেকেও মেঘের আড়ালে নিয়ে যাওয়া দরকার নয় কী?... আজকে সারাদিনে আমার ওপর ক'বার আক্রমণ হয়েছে

জানেন? দু-দুবার।'

মিস্টার বাসু সবিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, 'সে কী কথা!'

'হ্যাঁ। আক্রমণের উদ্দেশ্য অবশ্যি প্রাণে মারা নয়, যাতে আমি মাসখানেকের ভেতর কিছুতেই কলকাতা শহর ছেড়ে যেতে না পারি তারই ব্যবস্থা করা। তাদের চোখে খুব জোর ধুলোটা দেওয়া গেল, কী বলেন?'

'তা বটে, কিন্তু আপনার ওপর ওরা যদি খুব কড়া নজর রেখে থাকে তবে তো কালকেই টের পাবে যে-পাখি শিকলি কেটে উড়ে গেছে!'

'না, তা পাবে না।'

'পাবে না?'

'না। আমার বাড়ির সামনে উপস্থিত হলে তারা দেখতে পাবে অমৃত ওষুধের শিশি, তুলো-ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘন-ঘন ঘর-বার করছে, ডাক্তারের পোশাকে একজন দিনে দুবার করে আসছেন—মোটর থেকে নামবার এবং মোটরে ওঠবার সময় তাঁর স্টেথসকোপ আর ব্যাগটা যাতে কারও নজরই না এড়ায় সেরকম উপদেশও দেওয়া হয়েছে। সকালে-বিকেলে উদ্বিগ্ন মুখে দু-চারজন বন্ধুবান্ধবও খবরাখবর নিতে আসবে; এককথায়, পাড়াময় রটে যাবে, কাল রাত্তিরে হুকা-কাশির একটা সাংঘাতিক মোটর অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে, বেশ কিছুদিনের জন্য তিনি এখন শয্যাশায়ী। অমৃত খুব হুঁশিয়ার আছে, সব ঠিকমতো ম্যানেজ করে নেবে।' বলিয়া হুকা-কাশি চোখ টিপিয়া একটু হাসিলেন।

মিস্টার বাসুও হাসিলেন। কহিলেন, 'রহস্য তবে খুবই ঘোরালো হয়ে উঠেছে বলুন!'

'দারুণ। কিন্তু আর কথা নয়, এবার শুয়ে পড়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন। কালকে কত ঝড়-ঝাপটা সইতে হবে, ঘুমোবার সময়ই আদপে পাবেন কি না, কে জানে? কাজেই আজকে যেটা সহজলভ্য সেটাকে মাটি করবার কোনও মানে হয় না; শুয়ে পড়ুন।'

পরদিন বেনারস ক্যান্টনমেন্টে তাঁরা পৌঁছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, সেদিন স্টেশনে একখানিও ট্যাক্সি ছিল না, অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া শেষে তাঁরা একটি টঙ্গা লইলেন। আপাতত ভেলুপুরার 'সুমিত্র নিকেতনে' তাঁরা উঠিবেন, কাজেই ভেলুপুরা যাইবার জন্যই টঙ্গাওয়ালাকে আদেশ দেওয়া হইল। গাড়ি মাত্র বিশ-পঁচিশ গজ গিয়াছে এমন সময় হাত তুলিয়া একটা লোক গাড়োয়ানকে থামিবার ইঙ্গিত করিল। গাড়োয়ান থামিলে তার সহিত লোকটার গুটিকয়েক কথা হইল; তারপরেই হুকা-কাশি দেখেন, টঙ্গার সামনে চালকের পাশে যে খালি আসনটুকু আছে লোকটা সেইখানে উঠিবার উপক্রম করিতেছে। হুকা-কাশি টঙ্গাওয়ালাকে ধমকাইয়া উঠিলেন, গোটা গাড়ি তাঁরা ভাড়া লইয়াছেন, কেন সে 'জিয়াদা সোয়ারী' লইতেছে।

জবাবে সে হিন্দিতে কহিল, 'হুজুর, এ-লোকটা শিবালা যাবে, শেয়ারে গেলে ভাড়া অনেক কম পড়বে তাই উঠতে চায়; আর আমিও গরীব লোক, দুটো পয়সা যদি বেশি পাই... আপনাদের তো ''তকলিফ'' কিছু নেই!'

'তকলিফ-টকলিফ বুঝি না বাপু, শিগগির নামিয়ে দাও, ওসব চলবে না।'

খানিকক্ষণ বাদে ভেলুপুরা রোডে গাড়ি মোড় ফিরিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই হঠাৎ যেন বিদ্যুতের খোঁচা খাইয়া হুকা-কাশি সজাগ হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, বিস্ময়ের যেন তাঁর আর অবধি রহিল না। শিবালা যাইবে বলিয়া যে-লোকটা একটু আগেই টঙ্গায় উঠিতে চাহিয়াছিল, শিবালায় সে মোটেই যায় নাই, ভেলুপুরাতেই একটা গলির মোড়ে চোখ-কান সজাগ করিয়া ঠিক যেন ওত পাতিয়া আছে; তার পাশেই একটা বাইসিকেল। হুকা-কাশির সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই নিমেষের মধ্যে কোথায় যে সে মিলাইয়া গেল তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না।

ব্যাপারটা মিস্টার বাসুও লক্ষ করিয়াছিলেন, হুকা-কাশির গায়ে একটু মৃদু ঠেলা দিয়া তিনি

বলিলেন, 'একটা জিনিস দেখতে পেলেন কি?'

হুকা-কাশি চিন্তামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুখে শুধু বলিলেন, 'হুঁ।' হাজারো রকমের চিন্তা তখন তাঁর মনের কোণে উঁকি দিতেছিল। তাঁর সমস্ত চাতুরি, সমস্ত কৌশলই কি তবে ব্যর্থ হইয়া গেল? তা যদি হয়, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে লোকগুলি সর্বজ্ঞ, নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ।

'সুমিত্র নিকেতন' একটা বাঙালি-পরিচালিত বোর্ডিং-হাউস; সেখানে পৌঁছিয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুজনে স্নানাহার সারিয়া লইলেন, তার পরেই হুকা-কাশি বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। মিস্টার বাসু প্রশ্ন করিলেন, 'এখন কোথায় যেতে হবে?'

'পাঁড়ের হাউলি।'

'কেন, সেখানে কী?'

'একটু বাদেই বুঝতে পারবেন।'

পাঁড়ের হাউলি অঞ্চলে পৌঁছিয়া নির্দিষ্ট-নম্বরের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হুকা-কাশি ঘন-ঘন কড়া নাড়িতে লাগিলেন। উপর হইতে প্রশ্ন আসিল, 'কে?'

'একবার নিচে আসবেন?'

'কাকে চাই আপনার, বলুন না!'

'রণজিৎবাবু বাড়ি আছেন?'

মনে হইল একসঙ্গে তিন-চারিটা সিঁড়ি লাফাইতে-লাফাইতে কে যেন নিচে নামিয়া আসিতেছে। একটু পরেই কুড়ি-বাইশ বছরের এক ছোকরা দরজা খুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোত্থেকে আসছেন আপনারা?' ঠিক সেই সময়ে এক বৃদ্ধা মহিলা গঙ্গাস্নান সারিয়া এই বাড়িরই দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হুকা-কাশি বলিলেন, 'রণজিৎবাবুকে ডেকে দিন, তিনি সমস্তই বুঝবেন।'

ছেলেটি সন্দিগ্ধভাবে একবার তাঁর মুখের পানে তাকাইয়া শেষে কহিল, 'আপনি কি কোনও খবরই তবে জানেন না?... কাল বিকেল থেকে তাঁর কোনওই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকী তিনি বেঁচে আছেন কি না—।'

ছেলেটির কথা শেষ হইতে পারিল না, উপস্থিত বৃদ্ধাটি একেবারে মড়াকান্না তুলিয়া দিলেন, 'ওরে রণজিৎরে, তুই কোথা গেলি রে! দিদিকে আমি কী বলব রে! কাল তুই কচুরি খেতে চাইলি, ঘরে ময়দা ছিল না রে! ওরে আমি হতভাগী কেন দোকানে ময়দা আনতে পাঠালুম না রে...!'

হুকা-কাশি রুমাল দিয়া ঘন-ঘন কপাল মুছিতে লাগিলেন, মিস্টার বাসু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন।

ষোলো : বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল

রণজিতের চিঠি পাইয়া পরদিনই হুকা-কাশি জবাব দিয়াছিলেন টেলিগ্রামে; তিনি ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলেন যে গোধূলিয়ার হোটেল তার পক্ষে আর আদৌ নিরাপদ হইবে না, পাঁড়ের হাউলিতে তার মাসিমার যে-বাড়ি আছে, পত্রপাঠমাত্র সেখানে চলিয়া যাইতে সে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে। যত শীঘ্র সম্ভব—দু-এক দিনের মধ্যেই—তিনি স্বয়ং কাশী রওনা হইয়া আসিতেছেন; তিনি আসিয়া না পৌঁছানো পর্যন্ত সোনার হরিণের ব্যাপারে সে যেন আর এতটুকুও অগ্রসর না হয়। রণজিৎ স্থান-পরিবর্তন করিয়া কোথায় যাইতেছে সে-কথা সে যে বাহিরে প্রকাশ করিবে না হুকা-কাশি তা জানিতেন। এইজন্যই 'সুমিত্র-নিকেতনে' উঠিবার পরই সর্বপ্রথম হুকা-কাশি পাঁড়ের হাউলিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু কী অদ্ভুত ক্ষমতা এই দস্যুদলের! সকালে টেলিগ্রাম করিয়া রাত্রির গাড়িতেই তিনি রওনা হইয়া

আসিয়াছেন, অথচ এই অতি অল্প সময়টুকুর মধ্যে তারা যে শুধু রণজিতের নূতন ঠিকানাই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে তা-ই নয়, কৌশলে তাকে নিজেদের খপ্পরে আনিয়া পর্যন্ত ফেলিয়াছে। রণজিৎ এখনও প্রাণে বাঁচিয়া আছে কি না একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। কোনও অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া পড়া হুকা-কাশির একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ, কিন্তু তবুও এই শেষের কথাটুকু ভাবিতে গিয়া তাঁর অন্তরটা যে একবারও কাঁপিয়া উঠিল না, এ-কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। মাথা নিচু করিয়া নির্বাকভাবে তিনি মাটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অবশ্য বেনারস পর্যন্ত দস্যুদলের পিছু ধাওয়া করিয়া আসিতে রণজিৎকে একবারও তিনি বলেন নাই, সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িখানার উপর একটু নজর রাখিতে বলিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তবুও বাস্তবিকই যদি এমন একটা শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াই থাকে তবে নিজে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব এড়াইবেন কীভাবে?

'আপনি সুমিত্র-নিকেতনে ফিরে যান মিস্টার বাসু; আমার মানসিক অবস্থা বোধহয় কতকটা বুঝতে পারছেন, ফিরতে আমার কিছু দেরি হবে। তবে একটা কথা, আমি বোর্ডিং-এ ফিরে না আসা পর্যন্ত ঘর থেকে কোথাও বার হবেন না যেন! আর যাবেন খুব সাবধানে লোকালয়ের ভেতর দিয়ে।' মিস্টার বাসুকে উদ্দেশ করিয়া হুকা-কাশি কহিলেন।

মিস্টার বাসু বিদায় লইলে হুকা-কাশি ধরিলেন সোজা গোধূলিয়ার রাস্তা। প্রসিদ্ধ মোড়টার কাছে আসিয়া সামান্য একটু জিজ্ঞাসাবাদের পরেই রণজিৎ বর্ণিত সেই হোটেলটির সন্ধান মিলিয়া গেল। হুকা-কাশি অফিসে ঢুকিলেন।

হোটেলের ম্যানেজার তখন টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া পরম আনন্দে একবাটি চায়ের রসাস্বাদন করিতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া এবং পোশাকপত্রে তাঁকে একটু সম্ভ্রান্তশ্রেণীরই ভদ্রলোক মনে করিয়া তাড়াতাড়ি পদযুগল নামাইয়া লইলেন; তারপর সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী চাই আপনার, বলুন!'

হুকা-কাশি ইহারই মধ্যে অপাঙ্গে সমস্ত ঘরটা দেখিয়া লইয়াছিলেন, ধারে-পাশে কোনও লোক আছে কি না সেদিকেও লক্ষ রাখিয়াছিলেন। কহিলেন, 'আমি রণজিৎবাবুর খোঁজে এসেছি।'

'তিনি তো এখানে নেই! উঠেছিলেন বটে আমাদেরই হোটেলে, কিন্তু কাল বেলা এগারোটার সময় সমস্ত পাওনা-পত্তর চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন। কোথায় গেছেন তা কিছু বলে যাননি।'

'কিন্তু কাল তারপর থেকে তাঁর আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না, সে-কথা জানেন কি?'

'সে কী কথা মশাই! জোয়ান-মরদ ব্যাটাছেলে কাশীর রাস্তা থেকে উবে গেল?' ম্যানেজারের চক্ষু গোলাকৃতি হইয়া উঠিল।

'দেখুন, আপনি রণজিৎবাবুর খুব হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তা আমি জানি; তাই গুটিকয়েক প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আশাকরি তা'তে আপনি মনে কিছু করবেন না, অথবা বিরক্ত হবেন না!'

'না না, তা কেন? আপনি স্বচ্ছন্দে যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

'রণজিৎবাবু যেদিন প্রথম কাশী এসে পৌঁছান, আমি খবর পেয়েছি সেদিনই তিনি সন্ধ্যার সময় নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কখন তিনি ফিরে এলেন এবং কী অবস্থাতেই বা ফিরে এলেন?'

'তা ফিরতে রাত হয়েছিল বেশ! যখন ফিরে এলেন, কাপড়-চোপড়, গা-মাথা—সমস্ত শরীরই দেখলাম তাঁর ভিজে। জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিলেন, গলুইয়ের কাছে বসে হাত ধুচ্ছিলেন, হঠাৎ নৌকো দুলে ওঠায় তাল সামলাতে না পেরে জলের ভেতর পড়ে গেছলেন।'

'আচ্ছা, আর-একটা কথা। সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কে?'

'সেটা বলেছিলাম আমিই; উনি যখন হোটেলে এসে পৌঁছুলেন, গা-হাত-পা তখন যেন ওঁর

এলিয়ে পড়ছে। রাত্তিরে বোধহয় ট্রেনে অসম্ভব ভিড় হয়েছিল, ঘুমোনো তো দূরের কথা বসবারও জায়গা বোধহয় পাননি। তাই আমি বললাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন, সন্ধ্যার সময় বরং দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় একটু বেড়িয়ে আসবেন।'

'হুঁঃ। তারপর তিনি খেয়ে-দেয়ে শুতে যাবার পর বাইরের এই অফিসঘরে আর-একজন অতিথির আবির্ভাব হল এবং কোনওরকমে সে এই খবরটি সংগ্রহ করলে যে, সন্ধ্যার সময় নৌকো ভাড়ার উদ্দেশ্যে রণজিৎবাবু দশাশ্বমেধ ঘাটে উপস্থিত হবেন! কেমন, ঠিক বলিনি?'

'আপনি দেখছি সব ঘটনাই তবে জানেন! বাস্তবিকই তা-ই। আমায় একবার জানতে হবে, কাশীর গাড়িগুলোতে সেদিন এমন কী কাণ্ড ঘটেছিল যাতে সব ক'টি যাত্রীই অমন হেদিয়ে পড়ল। রাত জেগে যাওয়া-আসা আমরাও তো হরদম করছি, কিন্তু কই, এমনধারা তো হয় না! রণজিৎবাবু তো তবু পদে ছিলেন, এ-নতুন লোকটির মুখের দিকে যেন আর চাওয়াই যায় না! তাকেও ওই একই পরামর্শ দিলাম—আপাতত খেয়ে-দেয়ে ঘুম। তারপর সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে খানিকটা বেড়ানো। কথাটাতে জোর দেওয়ার জন্য আরও জানিয়ে দিলাম যে, খানিক আগে কলকাতা থেকে আমার এক পরিচিত বন্ধু এসেছেন, সন্ধ্যার সময় তিনিও ওই উদ্দেশ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটে যাবেন। ইচ্ছে হলে তাঁর সঙ্গে একত্রও যেতে পারেন।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আপনার হোটেলে ভর্তি হল না, আপনার রেট বড় বেশি—এই ছুতো ধরে চলে গেল; নয় কী?'

'সে-খবরও আপনার কানে উঠেছে? কিন্তু রেট আমার সত্যিই বেশি নয়। দু-বেলা চা-জলখাবার আছে, রাত্রে লুচি দিচ্ছি; তা ছাড়া যে-মাগ্যির বাজার—চাকর-বাকরের মাইনে আছে, বাড়ি ভাড়া...।'

হুকা-কাশি ম্যানেজারের ক্রন্দনে একেবারেই কান দিলেন না, নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, 'লোকটির চেহারা বেশ সুন্দর, যাকে বলে সুপুরুষ, কেমন?'

'তা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে।'

'মাথার চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া?'

'সবই যখন জানেন তখন অনর্থক কেন আর প্রশ্ন করছেন?'

হুকা-কাশি এ-কথা বলিলেন না যে, এতক্ষণ যে-কথাগুলি তিনি বলিয়া গেলেন তার কিছুই প্রায় তাঁর জানা ছিল না, সমস্তই একটির পর একটি ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তিতর্কের সাহায্যে বাহির করিতে হইয়াছে। এহেন সরল প্রকৃতির ভালোমানুষের কাছে সবকথা খুলিয়া বলিতে নাই; সোনার হরিণ উদ্ধারের মতো জটিল ব্যাপারে তা হইলে নানাপ্রকারের বাধা জন্মিতে পারে। তাই আগের কথাটারই জের টানিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'গায়ের রংটা ফুটফুটে ফর্সা, নয় কি?'

'হুঁ।'

'নাকের ডগাটি টিকলো, আর ডান ভ্রূর ওপরে মস্ত একটা তিলের মতন কী রয়েছে; লক্ষ করেছেন তা?'

'যতদূর মনে পড়ে আছে বলেই তো আমার ধারণা। তবে জীবনে একবারটি কয়েক মিনিটের জন্য দেখা বই তো নয়, ভুল হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।'

'হ্যাঁ, সে তো বটেই, সে তো বটেই, তাকে আর দেখবেন কোত্থেকে! সে তো আর কাশীর লোক নয়। আচ্ছা, তাহলে উঠি আজ, খানিকটা বিরক্ত করে গেলাম, মনে কিছু করবেন না। দরকার পড়লে হয়তো আবারও আসতে হতে পারে।' বলিয়া হুকা-কাশি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক পা আগাইয়া হঠাৎ কী মনে করিয়া আবার তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, ম্যানেজারকে প্রশ্ন করিলেন, 'এখানে বায়স্কোপ মোট ক'টা আছে বলতে পারেন? সামনেই তো দেখছি একটা। নতুন একখানা বই আজ থেকে দেখানো হবে—বাজনা বাজিয়ে তাই শহরময় জানিয়ে দিচ্ছে—আপনার এখানে আসবার সময় পথে দেখে এলাম।'

'কী জানি মশাই, বায়োস্কোপ-মায়োস্কোপের ধার ধারিনে। যে-মাগ্যির বাজার, ছাপোষা লোক আমরা, কোনওমতে খেয়েপরে দিন কাটাতে পারলেই বেঁচে যাই, তা আবার বায়োস্কোপ।'

মুখে কোনওরূপ ভাবপ্রকাশ না করিলেও মনে-মনে এ-জবাবে হুকা-কাশি খুশিই হইলেন। ছোট্ট একটু নমস্কার করিয়া তিনি ম্যানেজারের নিকট হইতে বিদায় লইলেন, তারপর সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন একটা বাড়ির ফটকের সম্মুখে। ফটকটি সেই সিনেমা-হলের; যেটির কথা একটু আগেই ম্যানেজারকে তিনি বলিতেছিলেন। তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র রণজিৎ আজ দু-দিন ধরিয়া নিরুদ্দেশ, বাঁচিয়া আছে কি না তা পর্যন্ত জানা নাই, অথচ হুকা-কাশি করিতেছেন সিনেমায় ঢুকিবার উপক্রম! পাঠক-পাঠিকারা বিস্মিত হইতেছেন বিশেষ সন্দেহ নাই। হুকা-কাশির চরিত্র বাস্তবিকই বড় দুর্জ্ঞেয়—সংস্কৃত ভাষায় বলিতে গেলে 'দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?'

ফটক পার হইয়া কয়েক পা যাইতেই কিন্তু তিনি একেবারে থমকিয়া দাঁড়াইলেন—এতটা তিনি আশা করেন নাই, সত্যই করেন নাই। যে-কদাকার গুণ্ডা প্রকৃতির লোকটাকে ফটোতে দেখিতে পাইয়া রণজিৎ এতখানি কাণ্ড বাধাইয়া তুলিয়াছে, সিনেমা-চত্বরের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই লোকটাই অপর একজনের সহিত নিভৃত আলাপ করিতেছে। আর এই দ্বিতীয় লোকটিও হুকা-কাশির একেবারে অপরিচিত নয়, পূর্বে ইহাকেও তিনি দেখিয়াছেন। দুজনে কথাবার্তায় এমনই নিমগ্ন যে-কোনও কিছুরই হুঁশ নাই।

অপরে আমাকে দেখিতে পাইবে না, অথচ আমি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তার সমস্ত কথাবার্তাই শুনিয়া লইব এভাবে দাঁড়াইতে পারা যে একটা উঁচুদরের 'আর্ট', তা অস্বীকার করি না; কিন্তু হুকা-কাশিও তো 'আর্টিস্ট' বড় কম নন! কাজেই তিনি শুনিতে পাইলেন দুজনার কথাবার্তা হইতেছে এই ধরনের—দ্বিতীয় লোকটা বলিল, 'কাল স্টেশনে গাড়ি থেকে ওকে নামতে দেখে আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হয়ে গেছি। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত ও যে কাশী এসে পৌঁছোতে পারবে এ আমি ভাবতেও পারিনি।'

'আরে আনে দেও! ও যদি হয় বুনো ওল তবে আমরাও বাঘা তেঁতুল, সেটি ভুলো না।'

'আচ্ছা রামদয়াল, সঙ্গের ওই অন্য লোকটা কে? ওকে তো কখনও দেখিনি আর! ওটা এসে আবার কে জুটল? চেহারাটাও ভালো করে চিনে রাখা হয়নি। হুকা-কাশির...।'

'আরে হতে দাও যে খুশি সে। কল পেতে এসেছি; যেই হোন কলে ধরা পড়বেনই।'

'যাক, সকালেই তা হলে তুমি আসছ?'

'উঁহু, সকালে হয়ে উঠবে না। এক পুরানো যাত্রী এসেছে, তাকে একবার বাবার মন্দিরটা দেখাতে হবে।'

নিভৃত আলাপে মন্দা পড়িয়াছে লক্ষ করিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না, গুটিগুটি ফটক পার হইয়া প্রথমে রাস্তায় এবং পরে একেবারে ভেলুপুরার হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখেন মিস্টার বাসু একমনে চিঠি লিখিতেছেন।

'কোথায় চিঠি লিখছেন, বাড়িতে?' হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

'হ্যাঁ,' বলিয়া মিস্টার বাসু চিঠিখানি হুকা-কাশির হাতে বাড়াইয়া দিলেন।

হুকা-কাশি চিঠিখানার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়াই সেখানি কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মুখে বলিলেন, 'খুব সাবধানী তো দেখছি আপনি, পোস্টকার্ডে চিঠি লিখছেন! ফিরে লিখুন খামে, আর বাড়ির লোকদের জানিয়ে দিন, দু-দিন অন্তর আপনার কুশল-সমাচার তাঁরা পাবেন, কিন্তু আপনাকে যেন কেউ চিঠি না লেখেন। এখানকার ঠিকানা তাঁদের দিয়ে কাজ নেই। আমার সঙ্গে আবার আপনি কে এসে জুটলেন, এই তথ্যটি বার করবার জন্য শত্রুপক্ষে রীতিমত আলোড়ন পড়ে গেছে সে-খবর রাখেন? তারা নাকি কী কল পেতেছে!'

সতেরো ঃ মানুষ-কল না জাঁতি-কল?

হুকা-কাশির কথামতো মিস্টার বাসু আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিলেন; তারপর সেখানা খামে ভরিতে-ভরিতে বলিলেন, 'চিঠি পোস্ট বোধহয় আমাদের নিজের হাতেই করা উচিত হবে! কী বলেন?'

'নিশ্চয়, সে-বিষয়ে কি আর মতদ্বৈধ আছে? কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই; একটু কষ্ট করে দরজাটা একবারটি ঠেলে দেবেন কি?'

মিস্টার বাসু পা বাড়াইয়া দরজার পাল্লাটা জোরে ঠেলিয়া দিলেন, খট করিয়া কপাট বন্ধ হইয়া গেল। এ-হোটেলের সমস্ত দরজাই প্রায় সাহেববাড়ির অনুকরণে তৈরি; একখানা করিয়া প্রকাণ্ড পাল্লা—মোটরগাড়ির দরজার মতো জোরে ঠেলিয়া দিলেই সেখানা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়। আবার হাতল ঘুরাইয়া খুলিতে হয়। ল্যাচ কী-র বন্দোবস্ত আছে—ভিতর বাহির দু-দিক হইতেই চাবি ঘুরাইয়া কপাট বন্ধ করা চলে।

ঘরের চারিদিক বেশ নিরাপদ হইয়াছে দেখিয়া এইবার হুকা-কাশি তাঁর সুটকেশ খুলিয়া চৌকামতো একখানা কার্ডবোর্ড বাহির করিলেন, তারপর সেখানা মিস্টার বাসুর হাতে দিয়া কহিলেন, 'বেশ করে এটা একবার দেখুন দেখি!'

মিস্টার বাসু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া নানানভাবে সেটিকে দেখিয়া নিয়া কহিলেন, 'আপাতদৃষ্টিতে এটা তো দেখছি একখানা ফটো! অদৃশ্য আর কিছু লুকোনো আছে নাকি এতে? সামনে একটা বড় লোককে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তার আশপাশে বড়-বড় মুখ-বাঁধা বস্তার মতো ওগুলো কী?'

'ওগুলো লক্ষ করবার কোনও দরকার নেই আপনার, যেটা দেখতে পাচ্ছেন বলে বলছেন, সেইটের দিকেই আরও ভালো করে নজর দিন, কেননা...।'

হুকা-কাশির সবগুলি কথা মিস্টার বাসুর কানে বোধহয় ঢুকিল না—দেখিতে-দেখিতে তাঁর চোখের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'মিস্টার হুকা-কাশি, এ-লোকটি যে আমার একেবারে অচেনা, তা তো নয়, একে তো আমি দেখেছি—আজই—এই বেনারস শহরেই।'

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, 'তাতে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই মিস্টার বাসু। যে সব মহাবীরের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ-ঘোষণা করেছি ইনি তাঁদেরই একজন। ওদের পরিচয় পেতে আমাদের যেমন আগ্রহ, আমাদের খবরাখবর পেতেও ওদের যে তার চাইতে কিছুমাত্র কম আগ্রহ নেই, তা তো এরই মধ্যে টের পেয়েছেন! তা, কোথায় দর্শন মিলল এ-পুণ্যাত্মাটির?'

'এই বাড়িরই সামনেকার রাস্তায়। রণজিৎবাবুর দুঃসংবাদ পাওয়ার পর আপনি তো আমার হোটেলে ফেরবার ব্যবস্থা করে বেরিয়ে পড়লেন! আমি ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিছানায় পড়ে রইলাম, কিন্তু মনে অশান্তি, বিছানা ভালো লাগল না; পায়চারি করবার উদ্দেশ্যে বারান্দায় উঠে গেলাম। খানিক বাদেই দেখি, এই মহাপ্রভু হোটেলের আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছেন। ভেতরে ঢোকবার ইচ্ছা পুরোমাত্রায়, অথচ ভরসা পেয়ে উঠছেন না। আঃ, তখনই গিয়ে যদি ধরতাম ব্যাটার টুঁটি চেপে! কী ভুলই না হয়ে গেছে!'

'দোহাই মিস্টার বাসু, ও-কাজটি কখনও করবেন না, কক্ষনও নয়! রণজিৎবাবুর বেঁচে থাকবার আশা যদি বা কিছু থেকে থাকে এরপর তা হলে আর তাঁকে কোনওরকমেই ফিরে পাব না। আর তা ছাড়া আপনার দাদার সোনার হরিণ উদ্ধারের আশাও একেবারেই জলাঞ্জলি দিতে হবে। সেটাকে হজম করতে যদি এরা নাও পারে, গঙ্গার জলে যে ফেলে দেবে সে-কথা নিশ্চিত জানবেন। আদালতে গ্রাহ্য হতে পারে এমন কী প্রমাণ আছে আপনার এদের বিরুদ্ধে বলুন দেখি!'

মিস্টার বাসু কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ চোখ টিপিয়া তাঁকে থামিতে বলিয়াই হুকা-কাশি উচ্চস্বরে হাঁকিলেন, 'কে?'

হুকা-কাশি এতক্ষণ কথা বলিয়া যাইতেছিলেন বটে, কিন্তু চোখ দুইটি তাঁর সারাক্ষণই পড়িয়া

ছিল দরজার গায়ে চাবি গলাইবার ছোট্ট ফোকরটির উপর। সেই ফাঁক দিয়া এতক্ষণ বাহিরের আলো দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ সে-আলো ঘুচিয়া গেল, পরিবর্তে দেখা দিল অন্ধকার। স্পষ্টই বোঝা গেল, বাহিরের কোনও লোক রন্ধ্রপথে ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা পাইতেছে। অবশ্য, ইচ্ছা করিলে সে-পথে চাবি লাগাইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখার একমাত্র পথটুকু আগে হইতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই হুকা-কাশি এ-চাতুরীটুকু খেলিয়াছিলেন। বাস্তবিকই রন্ধ্রপথে কোনও লোক উঁকি দিতে আসে কি না সেইটিই পরীক্ষা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

মুহূর্ত মধ্যে অন্ধকার চলিয়া গেল, দেখা দিল আবার আলোর রেখা। দু-তিনমিনিট কাল চারিদিক নিস্তব্ধ, তারপরেই দরজায় ধীরে-ধীরে কয়েকটি ঘা পড়িল। হুকা-কাশি উঠিয়া গিয়া আস্তে-আস্তে দরজাটা খুলিয়া দিয়াই একেবারে অবাক হইয়া গেলেন—হোটেলের যে-চাকরটার উপর তাঁদের খবরদারি করার ভার পড়িয়াছিল, ঘরে সে-ই ঢুকিতেছে—তার হাতে একটা জাঁতি-কল। মিস্টার বাসু কিছুই টের পাইলেন না, কিন্তু হুকা-কাশির অভ্যস্ত চক্ষু আরও লক্ষ করিল, কোনও একটা অপকর্ম করিতে আসিয়া হঠাৎ ধরা পড়িয়া গেলে লোকের মুখে যে একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটিয়া ওঠে, চাকরটার মুখে তার স্পষ্ট আভাসই রহিয়াছে।

হুকা-কাশি বাহিরে কিন্তু কোনওই বিরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন না বরং সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন—অবশ্য হিন্দিতে—'কী চাই হে? জাঁতিকলে কী হবে?'

চাকর হিন্দুস্থানী ভাষায় উত্তর দিল, 'হুজুর, এ-ঘরটায় বড় ইঁদুরের উৎপাত, তাই এ-কলটা পেতে রাখতে এসেছি; নইলে আপনাদের জিনিসপত্র সব কেটেকুটে একাক্কার করে দেবে।'

'ও, ম্যানেজারবাবু বুঝি তাই কল পেতে রাখতে বলে দিয়েছেন?'

'আজ্ঞে না, তিনি নতুন করে কিছুই বলেননি। এ-ঘরে যখনই কোনও যাত্রী আসে তখনই আমরা ইঁদুর-মারা কল পেতে রেখে যাই। বরাবরই এরকম ধারা চলে আসছে।'

'আচ্ছা, পেতে রাখো, কল কোথায় পাতবে।'

চাকর কল পাতিয়া, দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। হুকা-কাশি একটু হাসিয়া মিস্টার বাসুকে বলিলেন, 'কেমন, একটু আগেই বলছিলাম না যে আমার সঙ্গে আপনি কে এলেন সে-খবর বার করবার জন্য ওরা কী একটা কল পাতবার কথা বলাবলি করছিল! দেখলেন তো সে কলের নমুনা?'

'কী, এ জাঁতি-কলটির কথা বলছেন? এরই সাহায্যে আমার নাম-ধাম, গোত্র-বৃত্তান্ত সব জেনে ফেলবে? বেজায় সায়েন্টিফিক শত্রু বলুন!' মিস্টার বাসু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'রসুন, জাঁতি-কল কি মানুষ-কল, আসল কল কোনটা তা জানতে এখনও বাকি আছে। উঠে পড়ি, চায়ের অপেক্ষায় বসে থাকলে আর চলবে না, এক্ষুনি একবার বেরিয়ে পড়তে হবে। বাস্তবিক, রণজিৎবাবুর একটা খোঁজ না মেলা পর্যন্ত কোনও কাজেই যেন আর মন বসতে চাইছে না!'

আঠারো ঃ পুনশ্চ

হোটেলে ফিরিয়া আসিতে হুকা-কাশির বেশ কিছু রাত হইল; শরীর এবং মন কোনওটার অবস্থাই তখন তাঁর বিশেষ সুবিধার নয়। রণজিতের সন্ধানে বাহির হইয়া এক নূতন সন্দেহের আভাস তিনি পাইয়া আসিয়াছেন, সেইকথাই নানানভাবে তাঁর মনের মধ্যে তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছে। তা ছাড়া দেহে শ্রান্তিরও সীমা নাই। রাত্রে যৎসামান্য কিছু খাইয়াই তিনি শুইয়া পড়িলেন, ঘুম ভাঙিল পরদিন বেলা আটটায়। মুখ হাত ধুইয়া এককাপ চা খাওয়ার পরও শরীর বেশ সুস্থ হইল না, ইজিচেয়ারের উপর চুপচাপ তিনি পড়িয়া রহিলেন।

দুপুরে আঁচাইয়া উঠিয়া একটা চুরুট ধরাইতে-ধরাইতে বাসু বলিলেন, 'আপনার হল কী মিস্টার হুকা-কাশি, সেই সকাল থেকে পড়ে-পড়ে খালি ঝিমুচ্ছেন; নাইলেন না, ভাতও খেলেন না, ব্যাপার কী? জ্বর-টর হয়নি তো?'

হুকা-কাশি ঘরের কোণ হইতে জাঁতি-কলটি আনিয়া নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া সেটি দেখিতেছিলেন। জবাব দিলেন, 'না, বিকেলবেলার দিকেই সুস্থ হয়ে উঠব আশাকরি। কলটায় কোনও জাদুমন্ত্র পড়া আছে নাকি ভাবছি।'

মিস্টার বাসু চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে-ছাড়িতে 'দেখি' বলিয়া জাঁতি-কলটা নিজের হাতে তুলিয়া লইলেন। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই এক বিষম বিপত্তি ঘটিয়া গেল; কলের মধ্যে যেখানে খাবার রাখিয়া ইঁদুরকে প্রলুব্ধ করা হয়, আলগোছে সেখানে যেই তিনি একটুখানি আঙুল ঠেকাইয়াছেন, অমনি দু-ধার হইতে জাঁতি-কলের দুইটি ধার আসিয়া তাঁর হাতখানা অসম্ভব জোরে চাপিয়া ধরিল।

'উঃ হুঃ হুঃ' বলিয়া মিস্টার বাসু যন্ত্রণায় চিৎকার করিয়া উঠিলেন; দরদর করিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। হুকা-কাশি লাফাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জাঁতি-কলের দুই ধার দু-হাতে ফাঁক করিয়া ধরিলেন, মিস্টার বাসু হাত উঠাইয়া আনিলেন।

পকেট হইতে পরিষ্কার রুমাল বাহির করিয়া বাসুর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধিতে-বাঁধিতে হুকা-কাশি বলিলেন, 'কী ভীষণ অবস্থাতে কলটা রয়েছে দেখেছেন, হাত ছোঁয়াতে-না-ছোঁয়াতে একেবারে রক্তারক্তি ব্যাপার! রাত্রে বেশ যন্ত্রণা হবে। তা ছাড়া হোটেলের কল, কত ইঁদুর মারা পড়েছে কে জানে? তাদের রক্তও সব সময়ে ঠিকমতো ধোয়া হয়েছে কি না তাই বা কে বলবে? এ-অবস্থায় কোনও ডিসপেন্সারিতেই একবার যাওয়া উচিত মনে করছি; চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।'

ডিসপেন্সারি হইতে ফিরিবার সময় সারাটি পথই হুকা-কাশিকে বিশেষ চিন্তামগ্ন বলিয়া মনে হইল। বেলা একেবারে পড়িয়া আসিতেছিল, হোটেলে ফিরিয়াই তিনি বলিলেন, 'সন্তোষবাবুকে একখানা চিঠি লিখে দেব মনে করছি সলিলবাবুর সম্বন্ধে।'

'কেন, সলিলের কী হয়েছে? তার সম্বন্ধে সন্তোষের কাছে চিঠি কেন?' মিস্টার বাসু সাশ্চার্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

'আমার কেমন মনে হচ্ছে—হয়তো সলিলবাবু হঠাৎ একদিন সশরীরেই এখানে এসে উপস্থিত হয়ে পড়বেন। তাই সন্তোষকে লিখে দেওয়া—পাঁচ-সাতদিন আমাদের কোনও খবরাখবর না পেলেও ওখানে কেউ যেন ব্যস্ত না হয়ে ওঠেন। বেশ, আমি না লিখলাম, আপনার জবানীতেই চিঠি লিখে দেওয়া যাক, অর্থাৎ আমি লিখে দিই, আপনি সই করে দেবেন'খন।'

শেষের এই প্রস্তাবটি কিন্তু মোটেই কার্যকারী হইল না, কেননা মিস্টার বাসু বাঁ-হাতে নাম লিখিতে গিয়া এমনই চমৎকার লিখিলেন যে হুকা-কাশি হাসিয়া চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলিতে-ফেলিতে কহিলেন, 'ও-চিঠি না পাঠানোই ভালো; বাড়িতে সবাই ভাববে আপনার হাতখানা এরা বারুদ দিয়েই উড়িয়ে দিয়েছে। তার চাইতে আমিই লিখি।'

হুকা-কাশি আবার নূতন করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠির শেষে কেবলমাত্র সন্তোষেরই উদ্দেশে একটা নিতান্ত গোপনীয় 'পুনশ্চ' রহিল। এই 'পুনশ্চ'টুকু এতই গোপনীয় যে, মিস্টার বাসুর কাছেও সেটুকু প্রকাশ করা তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না। চিঠিখানা খামে মুড়িয়া কহিলেন, 'আমি যাই, এখানা নিজে হাতে ডাকঘরে ফেলে দিয়ে আসি গে। আপনি ইচ্ছে করলে একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারেন, কিন্তু সর্বদা মূল কথাটি মনে রাখবেন—গলিঘুঁজি এড়িয়ে সর্বদা বড়রাস্তায় চলতে হবে, এটি ভুলবেন না। ছ্যাঁচড়া গুণ্ডা বলে এদের তাচ্ছিল্য করবেন না একেবারেই। মাথাওয়ালা লোক যে এদের চালাচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহই নেই। আর বাইরে না বেরিয়ে যদি পারেন সে তো ভালোই; ম্যানেজারবাবু সময় কাটাবার জন্য কতগুলো বই পাঠিয়ে দিয়েছেন, ওই শেলফের ওপর সেগুলো আমি তুলে রেখেছি—ইচ্ছে করলে ওগুলো ওল্টাতে পারেন। কিন্তু—' হুকা-কাশি গলার স্বর খাটো করিয়া আনিলেন, 'জাঁতি-কলবাহী চাকর নাথনি সম্বন্ধে খুব হুঁশিয়ার।'

হুকা-কাশি ফিরিলেন খুবই তাড়াতাড়ি। ঘরের কবাট বন্ধ ছিল। নাথনি-প্রভুর আবির্ভাব হয় নাই তো! চাবি গলাইবার ফোকরে তিনি চোখ লাগাইলেন—তা নয়, মিস্টার বাসু একাই ঘরে রহিয়াছেন। একটা আরামের নিশ্বাস ছাড়িয়া তিনি দরজায় ঘা দিলেন, মুখে বলিলেন, 'দোর খুলুন মিস্টার বাসু, আমি হুকা-কাশি। খুব জরুরি একটা খবর আছে।'

ঘরে ঢুকিয়াই হুকা-কাশি অতিমাত্রায় ব্যস্ততার সহিত বাসুকে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে এক্ষুনি একবার বার হতে পারবেন মিস্টার বাসু, এই মুহূর্তেই, কাপড়-জামা যেমন পরা আছে সেই অবস্থাতেই?'

'নিশ্চয়ই, কেন পারব না?'

'তবে চলে আসুন'—বলিয়া বাসুর হাত ধরিয়া তিনি একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তারপর তাঁর কানের কাছে মুখ আনিয়া খুব আস্তে-আস্তে বলিলেন, 'দুজনার একসঙ্গে বার হওয়া চলবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে ডানদিকে যে তৃতীয় ল্যাম্পপোস্টটা পড়বে তারই তলায় আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করুন গে; মিনিট পাঁচেকের ভেতরই কোনও ছুতোয় আমি বেরিয়ে আসছি।'

মিস্টার বাসু সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন; হুকা-কাশি দরজা বন্ধ করিয়া মিনিট দুই কাল চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর নিচে নামিয়া এমন একটা ভাব দেখাইলেন যাতে হোটেলের সকলে মনে করিতে পারে, বুঝি তিনি বাড়ির বাহির হইয়া গেছেন। আসলে কিন্তু তখনই তিনি বাড়ির বাহির না হইয়া সিঁড়ির পিছনে জুতাজোড়া খুলিয়া রাখিয়া খালি পায়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া আসিলেন।

কিন্তু উপরে আসিয়া কী দেখিলেন? দেখিলেন, তাঁদের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা, ভিতরে পুরামাত্রায় অন্ধকার, তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া চাকর নাথনি বইয়ের শেলফের ওপর ঘন-ঘন টর্চের আলো ফেলিতেছে। হুকা-কাশি মনে-মনে হাসিলেন, নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, 'বাছা, কোন বইয়ের সন্ধানে তুমি এসেছ তা আমার অজানা নেই—উঁহু, উঁহু, ওটা নয়, ওই লালটা; হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে এবার।'

নাথনিও লাল বইয়ে হাত দিল, সঙ্গে-সঙ্গে হুকা-কাশিও তার ঘাড়ে হাত রাখিলেন। হঠাৎ ভূতের স্পর্শ পাইলে লোকে যেমন চমকাইয়া ওঠে ঠিক সেইভাবেই একটা অস্ফুট চিৎকার করিয়া নাথনি ধপাস করিয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল।

বড়ই জটিলতার সৃষ্টি হইল দেখিতেছি!

উনিশ ঃ ঘোড়া-চরিত্র

সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু হুকা-কাশি একেবারে চাপিয়া গেলেন, ঘুণাক্ষরেও দ্বিতীয় কোনও প্রাণীকে কিছু জানিতে দিলেন না, মিস্টার বাসুকেও না। দুপুরবেলা বাসুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেনারসী কাপড়চোপড় কিছু আছে আপনার সুটকেসে?'

'তার মানে?' বাসু সাশ্চর্যে প্রশ্ন করিলেন।

'মানে বিশেষ কিছু শক্ত নয়। বিলাত-ফেরতই হোন আর যা-ই হোন, আপনি হিন্দু তো বটেন? কাশীতে এসে কোনও হিন্দু বিশ্বনাথ দর্শন না করে যে ফিরে যেতে পারে এ আমি বিশ্বাসই করি না। তা দেবদর্শনের উপযুক্ত কাপড় তো চাই!'

'ওঃ, সেই কথা? ভণিতা শুনে মনে হচ্ছিল কতই না জানি গূঢ় রহস্য রয়েছে বেনারসী কাপড়ের ভেতর। যেরকম তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বার নোটিস দিলেন তাতে আর পারলাম কই

দেবদর্শনের জন্য প্রস্তুত হয়ে বার হতে? একজোড়া পুরনো তসর হয়তো থাকতে পারে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে।'

'দিন তো তা হলে সেটা একবারটি বার করে, একটু ঘুরে আসি।'

মিস্টার বাসুর দেওয়া তসরের জোড় পরিয়া হুকা-কাশি একটা বিশেষ দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমশাই ভেতরে আছেন কি? রামদয়াল ঠাকুর মশায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

রামদয়াল যে সে-সময়ে দোকানে অনুপস্থিত থাকিবে হুকা-কাশি তা ভালো করিয়াই জানিতেন; ছোটভাই কৃষ্ণদয়াল উপস্থিত ছিল, চোখ দুইটি একটু কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল, 'বাবুর কোত্থেকে আসা হচ্ছে?'

'আসছি তো মশাই বাংলাদেশ থেকেই; আমার খুড়োমশাই ওনার নাম বলে দিয়েছিলেন, কিন্তু খুঁজে কি আর নিতে পারি? সেই কাল সক্কাল থেকে...।'

ঠিক সেই সময়ে হঠাৎ ক্রিং-ক্রিং করিয়া কলিংবেলের মতো কী একটা বাজিয়া উঠিল, অমনি কৃষ্ণদয়াল তাড়াতাড়ি হুকা-কাশির বক্তৃতা-স্রোতে বাধা দিয়া বলিল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি এলাম বলে।' অল্প দূরে আর একটি দোকান, হুকা-কাশি দেখিলেন 'কেষ্ট' সেই দোকানে ঢুকিতেছে।

কালবিলম্ব না করিয়া হুকা-কাশি দোকানটার সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন, অবশ্য দাঁড়াইলেন এমন একটা জায়গা বাছিয়া যাতে হঠাৎ তাঁর উপর কারও নজর না পড়িতে পারে—অন্তত পড়িলেও দোকানের উপর তাঁর যে কোনওরকম লক্ষ আছে এ-সন্দেহ ভুলিয়াও কারও মনে না জাগে। কতকগুলি জিনিস একই সঙ্গে তাঁর নজরে আসিল—দোকানটা পান, জর্দা এবং সুর্তির; কৃষ্ণদয়াল ঘণ্টার সঙ্কেত পাইয়া হঠাৎ খরিদ্দার সাজিয়া সুর্তি চাহিতেছে; দোকানের সামনে আরও দুইটি শৌখিন বাঙালি যুবক দাঁড়াইয়া; তাদের পরস্পরের আলাপ হইতে আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু বুঝা যাইতেছে যে, আজ বেলা সাড়ে পাঁচটায় তারা কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গা হইতে অপর এক জায়গায় যাইবে। হুকা-কাশি আরও লক্ষ করিলেন সুর্তি দিবার অছিলায় দোকানী কৃষ্ণদয়ালকে ভিতরে ডাকিয়া নিল।

একটু বাদেই দোকানদারের সহিত কৃষ্ণদয়ালকে আবার বাহিরে আসিতে দেখিয়া হুকা-কাশি আর সেখানে অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না, আবার দোকানটিতেই ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে বসিয়া-বসিয়াই তিনি লক্ষ করিলেন কৃষ্ণদয়াল সুর্তির দোকান হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া সোজা গোধূলিয়ার বিখ্যাত গাড়ির আড্ডাটায় ঢুকিয়া পড়িল, তারপর এক টঙ্গাওয়ালাকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া কী সব কথা বলিতে লাগিল। মাঝে-মাঝে সেই শৌখিন যুবক দুইটির পানে অঙ্গুলি-সঙ্কেতও চলিতেছিল। সমস্ত খণ্ড-খণ্ড ঘটনাগুলি একত্র করিয়া হুকা-কাশি ব্যাপারটার আসল অর্থ মুহূর্তেকের মধ্যেই বাহির করিয়া ফেলিলেন। সে-অর্থটা যে কী সে-সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদের পূর্বেরই অভিজ্ঞতা আছে, কাজেই এ-বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণদয়াল দোকানে ফিরিয়া আসিলে হুকা-কাশির সঙ্গে অল্প কিছুকাল ধরিয়া তার কথাবার্তা হইল—কখন আসিলে রামদয়ালের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে প্রধানত সেই আলোচনা। তারপরেই দোকানের প্রকাণ্ড তালাটায় চাবি লাগাইতে-লাগাইতে কৃষ্ণ জানাইল, আজ তাকে একটু সকাল-সকালই দোকান বন্ধ করিয়া বাহির হইতে হইবে, কেননা এক যজমানের কাছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

লোকটা সম্পূর্ণরূপে চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত হুকা-কাশি সে জায়গাটিতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন গোধূলিয়ার দিকে, গাড়ির আড্ডার উদ্দেশে। এরই মধ্যে মনে-মনে তিনি সঙ্কল্প ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—আজ এক ঢিলে দুই পাখি মারিবেন।... দেখা যাক, কী ধরনের ঢিল সেটা!

কৃষ্ণদয়ালের সহিত টঙ্গাওয়ালা যখন আলাপে ব্যস্ত ছিল তখন হুকা-কাশি ভালো করিয়াই

গাড়িখানা নিশানা করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাই সেটি খুঁজিয়া বাহির করিতে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। লোকটার কাছে গিয়া পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে তিনি কহিলেন, 'বাঃ তোমার ঘোড়াটা তো চমৎকার দেখছি হে!... আমায় একটু হাওয়া খাইয়ে আনতে পারবে? আমি কিন্তু ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া দেব—রাত আটটা পর্যন্ত চুক্তি। দেখ!'

'না হুজুর, আটটা পর্যন্ত আমি ভাড়া খাটতে পারব না, পাঁচটার পরেই জোয়াল খুলে দিতে হবে, নইলে ঘোড়ার বড্ড "তকলিফ" হবে; আজ সারাটা দিনই দৌড়ের ওপর আছে কিনা!'

আশপাশ হইতে অন্তত দশজন টাঙ্গাওয়ালা হুকা-কাশিকে ছাঁকিয়া ধরিল—'আসুন হুজুর, আমার গাড়িতে, আটটা কেন, চান তো রাত দশটা পর্যন্ত আপনাকে হাওয়া খাইয়ে আনব। চলে আসুন!'

হুকা-কাশি কিন্তু বারবারই ঘোড়াটার উপর এমনই সলোভ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন যে, উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল ওই ঘোড়াটাই বাবুর বিশেষ পছন্দ হইয়াছে, সহজে ওটিকে বেহাত হইতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা নয়। মুখের কথাতেও সেই আভাসই তিনি দিলেন, কহিলেন, 'আচ্ছা বাপু, পাঁচটা-পাঁচটাই সই, তারপর না-হয় অন্য আর-একটা গাড়ি ধরা যাবে। খা—সা ঘোড়াটি তোমার বাপু, যাই বলো! এটা আবার কী, পা-দানের কাছে একটা পচা দড়ি ফেলে রেখেছ কী জন্য?' গাড়িতে উঠিতে-উঠিতে হুকা-কাশি প্রশ্ন করিলেন।

এ-কথায় গাড়োয়ান কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, ঘোড়ার মতো দড়িটাকেও প্রশংসা করিলে বোধকরি সে খুশি হইত; একটু অনুযোগ-মাখা স্বরে বলিল, 'হাঁ বাবুজি, পচা দড়ি? পাঁচজন জোয়ান মরদ একে ছিঁড়তে পারবে? আমার এ-ঘোড়াটাকে এই দিয়ে আমি বেঁধে রাখি, আর আপনি বলছেন পচা দড়ি!'

'আচ্ছা-আচ্ছা বাবা, ঘাট মানলাম, খুব শক্ত দড়িই বটে। গোড়ায় একবার চকের দিকে নিয়ে চলো তো, একটু কেনাকাটি করবার আছে।'

চকে পৌঁছিয়া হুকা-কাশি একখানা মোটা চাদর কিনিলেন—কেন তিনিই জানেন—ধূসর রংয়ের চাদর, নিতান্ত খেলো কম দামি জিনিস। তারপর টঙ্গাওয়ালাকে হুকুম করিলেন, 'শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে নিয়ে চলো তো বাবা, যেখানে লোকজনের আনাগোনা হই-চই একেবারে নেই; উঃ, হট্টগোলে সকাল থেকে মাথাটা একেবারে ধরে আছে।'

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা শহরের বাহিরে সম্পূর্ণ নির্জন একটা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়োয়ানের মেরজাইয়ের পকেটে একটা বড় ঘড়ি ছিল, হুকা-কাশির অলক্ষ্যে সেটি দেখিবার জন্য সবে একবারটি সে ঘাড় হেঁট করিয়াছে, অমনি তার মনে হইল কোথা হইতে একটা অদৃশ্য লোহার নিগড় আসিয়া হঠাৎ যেন সজোরে তার গলার উপর চাপিয়া বসিল, শ্বাস বন্ধ করিয়া আনিল। হুকা-কাশি জাপানি ঢিল ছুড়িয়াছেন, যুযুৎসুর প্যাঁচ কষিয়াছেন।

মুহূর্তের মধ্যে ভিতরের ব্যবধানটুকু ডিঙাইয়া হুকা-কাশি পিছন হইতে একেবারে সামনের আসনে চলিয়া আসিলেন, ক্ষিপ্রহস্তে গাড়োয়ানের কোমর হইতে লুকানো ছোরাখানা গাড়ির পা-দানের উপর ফেলিয়া দিতে-দিতে বলিলেন, 'গলার প্যাঁচ আরও শক্ত হয়ে এঁটে বসে এটা যদি না চাও, তবে এক্ষুনি আমার সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়ো।' গাড়োয়ান সভয়ে দেখিল তাঁর হাতে সেই দড়িটি—অল্প কিছুক্ষণ আগেই যার দৃঢ়তা সম্বন্ধে সে খুব উঁচু মত জাহির করিতেছিল। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া—সে ক্ষমতাও তার ছিল না—হুকা-কাশির হুকুমমতো তাঁর সঙ্গে সে মাটিতে নামিয়া আসিল।

রাস্তার পাশে একটা তালগাছ ইতিপূর্বে হুকা-কাশি লক্ষ করিয়াছিলেন। দাঁতের সাহায্যে দড়িটি চাপিয়া ধরিয়া লোকটাকে সেই গাছের কাছে তিনি টানিয়া আনিলেন; তারপর দু-দিক হইতে তার দুইটি হাত গাছের পিছনে আনিয়া দড়ির সাহায্যে বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিলেন, 'সম্পূর্ণ বিদেশি পেয়ে

ছোঁড়া দুটোর সর্বস্ব লুঠে নেওয়ার মতলব ফেঁদেছিলে বাবা, এখন সে-পাপের খানিকক্ষণ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করো। সরকারি রাস্তা যখন রয়েছে তখন লোকও কিছু-না-কিছু এ-পথে আনাগোনা করবেই। সময় হলে তখন ছাড়া পাবে।'

বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বলিয়া বাংলায় একটা কথা আছে; ঘোঘ জানোয়ারটা বাস্তবিক যে কী তা আমার জানা নাই তবে খুব সম্ভবত বাঘের চাইতে সে বেশি সেয়ানা। যদি আমার এ-অনুমান সত্য হয় তবে হুকা-কাশির এখানে একটু ভুল হইল, কেননা ধনপৎ কাজেরিয়ার দোকানের সম্মুখে খরিদ্দারবেশী যুবক দুইটিকে যখন নিতান্ত 'নিরামিষ' জীব বলিয়া তিনি ঠাওরাইয়াছিলেন তখন তাদের প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবিকই তিনি বুঝিতে পারেন নাই; তলে-তলে তারা যে কী গভীর চক্রান্ত পাকাইয়া কাজে নামিয়াছে, বাঘের ঘরে কৌশলের ফাঁদ পাতিয়াছে, তখন পর্যন্ত তা তিনি টের পান নাই। কাজেই ভাবিলেন, নির্দিষ্ট সময়ে টঙ্গাওয়ালা যখন তাদের তুলিয়া নিতে পারিল না, তখন 'বেচারারা' বোধহয় এ-যাত্রা পার পাইয়া গেল।

এইবারে হুকা-কাশি তাঁর দ্বিতীয় চাল চালিলেন, কাশীর চকে কেনা চাদরটিতে সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া কেবলমাত্র মুখটুকু বাহিরে রাখিয়া টঙ্গার পিছনকার আসনটিতে লাগাম হাতে বসিলেন—ঠিক যেমন টঙ্গার গাড়োয়ানেরা সোয়ারী না থাকিলে রাস্তার উপর দিয়া হামেশা গাড়ি হাঁকাইয়া আনাগোনা করে। শুধু মানুষের চরিত্রে নয় 'ঘোড়া-চরিত্রে'ও হুকা-কাশির বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল; তিনি জানিতেন লাগামে ঢিল দিয়া গাড়ির ঘোড়াকে যদি তার ইচ্ছামতো চলিতে দেওয়া যায় তবে সে-ঘোড়া আস্তাবলেই ফিরিয়া আসে—এ-নিয়মের প্রায়ই বড় একটা নড়চড় হয় না। আস্তাবলের সন্ধান মিলিলে গাড়োয়ানের আস্তানারও সন্ধান পাইতে বেশি বেগ পাওয়ার কথা নয়! রামদয়াল যে গভীর জলের মাছ সে-খবর তিনি ভালো করিয়াই জানিতেন এবং ধনপতের হাবভাবে সে-ও যে বড় অগভীর জলে বিচরণ করে তা তো মনে হয় না। তাদের খেলাইয়া ডাঙায় তোলার চাইতে মোটাবুদ্ধি একটা টঙ্গাওয়ালাকে খেলাইয়া তোলা অনেক—অনেক সোজা। রণজিৎ-উদ্ধারের হয়তো একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার হইতে পারে।

হুকা-কাশির হিসাবে কিছুমাত্র গোল হয় নাই, ঘণ্টাখানেক বাদে ঘোর সন্ধ্যাবেলায় বাস্তবিকই ঘোড়া আস্তাবলে আসিয়া উপস্থিত হইল। হুকা-কাশি চকিতদৃষ্টি হানিয়া অমনি চারিদিক একবার দেখিয়া লইলেন—নাঃ, ধারে-পাশে এমন কেহই নাই যার নিকট কোনও জবাবদিহি দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। কেবল পাশের একটা মেটে ঘরের দাওয়া হইতে একটি ছোট ছেলে 'বাপ্পুজী আ গিয়া' বলিয়া তাঁর দিকে ছুটিয়া আসিল। হুকা-কাশি মনে-মনে প্রসন্ন হাসি হাসিলেন—যাক, কষ্ট করিয়া গাড়োয়ানের বাসস্থান আর খুঁজিতে হইবে না, সেটিরও সন্ধান মিলিয়া গেল। আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গলিপথে তিনি গা ঢাকা দিলেন। পৃথিবীর সর্বাঙ্গে রাত্রি তখন গাঢ় যবনিকা টানিয়া দিয়াছে।

আধঘণ্টাটাক এ-গলি সে-গলি দিয়া চলিতে-চলিতে হঠাৎ হুকা-কাশি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—দপ-দপ করিয়া পেছনে যেন অনেকগুলি লোকের একত্র পায়ের শব্দ শোনা যাইতেছে। মুহূর্ত পরেই চার-পাঁচজন লোক বিদ্যুৎগতিতে তাঁর পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া গেল। আচমকা অন্ধকারে তিনি ঠাহর করিতে পারিলেন না যে, তাদেরই মধ্যে একজন কৃষ্ণদয়াল। কয়েক মিনিট পরে আবার ঠিক সেইরকমেরই শব্দ—পায়ের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে এবার গলার আওয়াজও রহিয়াছে। পুনরায় পিছনপানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই তিনি দেখিলেন, আর-একদল লোক ঠিক পূর্বের দলের মতোই তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে; সংখ্যায় তারা ঢের বেশি। এবার আর তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম হইল না, এ-দলের একজনকে তিনি যথার্থই চিনিলেন। ব্যাপার কী? এ এখানে কেন?

হুকা-কাশি ঠিক করিলেন একটু আগাইয়া ব্যাপারটা কী দেখিবেন, কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন; একটি প্রকাণ্ড খাঁটি বেনারসী ষণ্ড পাশের গলি হইতে বাহির হইয়া এমনিভাবে সমস্ত রাস্তাখানি জুড়িয়া দাঁড়াইল যে, পাশ দিয়া একটা মাছিও যদি গলিতে পারিত তো তাকেও বাহাদুর বলিতাম।

ষাঁড়টির আবার বারাণসীসুলভ নিরামিষত্বেরও নিতান্ত অভাব; হুকা-কাশি পাশ কাটাইবার সামান্য একটু চেষ্টা করিতেই এমনি ভয়াবহভাবে তিনি তাঁর নধর শিং দুইটি দুলাইয়া উঠিলেন যে, চাণক্য ঋষির কী একটা বচন তাঁর স্মরণে আসিয়া গেল—আর অগ্রসর হওয়া তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। শুধু এইটুকু তিনি বুঝিলেন যে, পিছনের দল সামনের দলটিকে তাড়া করিয়া যাইতেছে।

কিন্তু হুকা-কাশি আগাইতে না পারিলেও পাঠক-পাঠিকার আগাইতে কোনও বাধা নাই; লেখক সঙ্গে থাকিলে তাঁরা না যাইতে পারেন এহেন স্থান পৃথিবীতে আছে নাকি? আগাইতে আপত্তি না থাকিলে তাঁরা দেখিতে পাইতেন, তাড়া খাইয়া সামনের দল হঠাৎ একটা বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িল। একটু ইতস্তত করিয়া পিছনের দলও ভিতরে ঢুকিল। তারপরেই একেবারে অবাক কাণ্ড—ভেল্কি বলিলেই চলে! যে-দরজা দিয়া সকলে ভিতরে ঢুকিয়াছিল সেটি ভিন্ন গোটা ঘরটিতে দ্বিতীয় জানালা বা দরজা নাই, অথচ দেখা গেল, সামনের দলের সবগুলি লোক বায়োস্কোপের 'ইনভিজিবল ম্যানের' মতোই চকিতে বোধকরি শূন্যেই মিলাইয়া গেছে। কেবল এক অপরিচিত বুড়ো ঘরে বসিয়া খকখক করিয়া অনবরত কাশিতেছে।

কুড়ি ঃ সুমিত্র-নিকেতনে অমিত্র

রাত্রে হোটেলে ফিরিয়াই হুকা-কাশি বাসুকে একান্তে ডাকিয়া আনিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার কাছে স্যুট আছে মিস্টার বাসু?'

'ব্যাপার কী বলুন তো, ও-বেলা চাইছেন তসরের জোড়, এ-বেলা চাইছেন স্যুট, কাপড়ের ব্যবসায়ে নামবার মতলব করলেন নাকি?'

'না-না, ঠাট্টা নয়, সত্যি-সত্যিই আছে না কি জিজ্ঞাসা করছি।... অবশ্য আপনাকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্য আমার একেবারেই নেই, কিন্তু তবুও আসল ঘটনা সম্পূর্ণ গোপন করাও বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সত্যি বলতে কি, ব্যাপার বাস্তবিকই বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনার পরিচয় যে আর একটুও চাপা নেই তার স্পষ্ট প্রমাণ আজ পাওয়া গেছে।'

বাসু বাহিরে কোনওরূপ ভাবান্তর দেখাইলেন না বটে, কিন্তু ভিতরটা তাঁর যেন কুঁকড়াইয়া এতটুকু হইয়া গেল। আল-কেপুন ও ডিলিঞ্জারের লীলাভূমি শিকাগো শহরে এতকাল যিনি কাটাইয়া আসিয়াছেন, নেটিভ গুণ্ডার উল্লেখে তাঁর তরফ হইতে কিছুমাত্র ভয়ের ভাব দেখানোও যে অশোভন তা জানি, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে রণজিতের অবস্থার কথাও ভুলিতে পারি কই?

হুকা-কাশি আবার বলিলেন, 'আমার নিজের জন্য ততটা ভাবি না, আর তা ছাড়া আত্মবিশ্বাসও যে একেবারে নেই তাও নয়; কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আমার একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। ধরতে গেলে এ-কাজে আপনাকে নামতে উৎসাহ দিয়েছি আমিই; কাজেই আপনাকে নিরাপদ না করে আমি কোনওমতেই সুস্থির হতে পারছি না। এক রণজিৎবাবুর কথা ভেবেই আমার...।'

তাঁর কথা শেষ হইতে পারিল না, বাসু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমাকে কি আপনি এমনই অপদার্থ পেলেন মিস্টার হুকা-কাশি, যে, আপনাকে এই বিপদের ভেতর একা ফেলে দিয়ে আমি সরে পড়ব? সে-শিক্ষা তো ছেলেবেলা থেকে কখনও পাইনি!'

হুকা-কাশি মৃদু হাসিলেন, কহিলেন, 'সরে পড়তে তো আপনাকে বলিনি, শুধু বলেছি আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করে তুলব। সেইজন্যেই স্যুটের খোঁজ করছিলাম; আমার কাছে সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই রয়েছে, মিনিট দশেকের মধ্যেই আপনাকে একটি খাঁটি ট্যাস-ফিরিঙ্গি বানিয়ে ছাড়ছি! তারপর আজ রাত্রেই আপনি এই হোটেল ছেড়ে—আমার সঙ্গ ত্যাগ করে—বেনারসের ডাকবাংলোতে গিয়ে উঠবেন। বিপদের গন্ধ পাওয়ামাত্রই আমি সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে এসেছি। এরপর কখন কী

করতে হবে সে-হদিস ডাকবাংলোতে বসেই আপনি পাবেন—পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত আমিই করব। আপনি শুধু কাঁটায়-কাঁটায় সেগুলো করে যাবেন, তা হলেই আমার কাজ বারোআনা পরিমাণ এগিয়ে যাবে। আচ্ছা... আমি তবে এবার দরজা আটকে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসি।'

হুকা-কাশির কণ্ঠস্বর শান্ত, অথচ দৃঢ়; বাসু বুঝিলেন প্রতিবাদ করিয়া কোনওই ফল হইবে না।

মিনিট পনেরো পরে একটি নিখুঁত চিনাবাজারি ফিরিঙ্গি সকলের অলক্ষ্যে হোটেলের ফটক পার হইয়া একখানা ট্যাক্সিতে গিয়া চাপিয়া বসিল। আরও মিনিট পনেরো পরে হুকা-কাশি টেবিলের সামনে গিয়া বসিলেন, চিঠি লেখার আবশ্যকীয় সামগ্রীগুলি লইয়া পর-পর দুখানা চিঠি লেখা হইল, তার মধ্যে 'বিশেষ গোপনীয়' মার্কা পড়িল যেখানার উপর, সেখানি যাইবে সন্তোষের কাছে—শ্রীপুরে।

চিঠি লেখা শেষ হইলে হুকা-কাশি ঘড়ি খুলিলেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর নয়, আহারাদি চুকাইয়া রাত্রির মতো এইবার বিশ্রামের আয়োজন করা দরকার। একটা হাই তুলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

তারপর তিন-চারঘণ্টা পরের কথা, দুপুর রাত; বহু পূর্বেই প্রকাণ্ড বাড়িটা নীরব, নিঝুম হইয়া গেছে, যে যার ঘরে অঘোরে ঘুমাইতেছে। হুকা-কাশির পাশের ঘরটা লোকাভাবে প্রায় দুই মাস যাবৎ খালি পড়িয়া ছিল, হঠাৎ সেই ঘর এবং হুকা-কাশির ঘরের ভিতরকার দরজায় ধীরে—অতি ধীরে খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল এবং তার পরমুহূর্তেই ছায়ার মতো একটা মূর্তি আস্তে-আস্তে পা ফেলিয়া ও-ঘর হইতে এ-ঘরের দিকে আসিতে লাগিল। দুপুররাত্রে তো কথাই নাই, দিনেরবেলায়ও বোধহয় সে-মূর্তি দেখিয়া যে কোনও লোক শিহরিয়া উঠিবে—পা হইতে মাথা অবধি একটা ভাপসা কালোর আভাসই মাত্র পাওয়া যাইতেছে। চলনে তার অতি সামান্যমাত্রও শব্দ নাই।

পাশাপাশি দুখানি খাট, একখানা হুকা-কাশির, অপরটা বাসুর। বাসু যে হোটেল ছাড়িয়া চলিয়া গেছেন, এক ম্যানেজার ছাড়া আর কাহাকেও এ-পর্যন্ত সে-খবর জানানো হয় নাই, কাজেই চাকর তাঁর খাটেও মশারি ফেলিয়া দিয়া গেছে। আস্তে-আস্তে পা ফেলিতে-ফেলিতে মূর্তিটা প্রথমে বাসুর খাটের দিকে আগাইতে লাগিল। খাটে পৌঁছিয়া একবার সে নিজেকে একটু প্রস্তুত করিয়া নিল, তার পরেই সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া ভিতরে হাত দিল। পরক্ষণেই বুঝিল সেখানে কেউ নাই, বিছানা শূন্য। বাসুর খাট ছাড়িয়া সে তখন চলিল হুকা-কাশির বিছানার দিকে। মশারি তুলিয়া এখানেও অল্প একটু হাতড়াইবার পরই সে দস্তুরমতো চমকিয়া উঠিল—এ-বিছানাটাও যে ওখানার মতোই শূন্য। হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হইতেই সে যেন বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল—একটা অস্ফুট আওয়াজ করিয়া উঠিল কি না আজ এতদিন পরে ঠিক স্মরণ হইতেছে না; তবে এটা সত্য যে, উন্মত্তের মতো দরজা খুলিয়া সে রাস্তার দিকের বারান্দার পানে ছুটিয়া গেল এবং পরের মুহূর্তেই একেবারে মরি-বাঁচি-জ্ঞানশূন্য হইয়া দোতালার বারান্দা হইতে সোজা কঠিন রাস্তার উপর লাফ মারিয়া পড়িল। অথচ কেন যে সে এতটা ভয় পাইল সে-ই জানে, তাকে ধরিবার অথবা তাড়া দিবার জনপ্রাণীও তখন জাগিয়া ছিল না। কেবল দূরে একজন পাহারাওয়ালা চেঁচাইতেছিল, 'জুড়িদার, জুড়িদার হো!'

পরদিন বেলা ন'টার সময় ডাকবাংলোতে বসিয়া মিস্টার বাসু একখানি লেফাফায় মোড়া চিঠি পাইলেন; সাইকেলে চড়িয়া একজন অচেনা লোক চিঠিখানা দিয়া গিয়াছে। বাসু ক্ষিপ্রহস্তে খাম খুলিয়া পড়িলেন—

'কাল রাত্রেই আপনাকে ডাকবাংলোয় স্থানান্তরিত করাটা যে কত বড় সুবিবেচনার কাজ হয়েছিল আজ ভোর হতে না-হতেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে। আপনি শুনে হয়তো অবাক হয়ে যাবেন, দুপুররাত্রে আমাদের শোবার ঘরে

কাল বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয় লোকের শুভাগমন হয়েছিল। উদ্দেশ্যটা অনুমান করা বোধহয় খুব বেশি শক্ত নয়, কেননা ও-সময়টাকে বন্ধুত্ব পাতাবার ঠিক উপযোগী সময় বলে কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

'শুধু একটা বিপদের আভাস মাত্র পেয়েছি—এইটুকুই কাল আপনাকে জানিয়েছিলাম, এর বেশি আর কিছু বলা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। হ্যাঁ, সত্যিই স্বীকার করছি, আমার মনে ভয় ছিল, সবগুলি কথা খুলে বললে হয়তো আপনার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে। কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই, কাল এই কাশীরই রাস্তায় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে যাকে দেখবার পর হতেই অজ্ঞাতবাসে যাওয়ার যুক্তিটা বারবার মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল। অন্তত "সুমিত্র-নিকেতনে" আর একদিনও নয়। একরকম জোর করেই আপনাকে ডাকবাংলোয় পাঠলাম। দুখানা চিঠি লেখবার ছিল, শেষ করে নিচে ম্যানেজারের ঘরে নেমে এলাম, তাকে বুঝিয়ে বলতে যে, অন্তত আজকের রাতটার মতো তার নিজের ঘরেই আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, কেননা রাত্রিবাসের পক্ষে আমার ঘর আর-একমুহূর্তও নিরাপদ নয়। লোকটা একেবারে হাউহাউ করে উঠল—এই বুঝি চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ লোক জড়ো করে! অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করা গেল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে এসে প্রথমেই টয়লেট পাউডারের কৌটোটা খুলে মুঠো-মুঠো পাউডার ঘরের সমস্ত মেঝেটাতে ছড়িয়ে দিলাম। হোটেলের সবাই রাত্রির মতো যে যার ঘরে কখন শুতে চলে যায় মোটামুটি তার একটা ধারণা ছিল; সেটুকু সময় ঘুমের ভান করে ওপরের নির্দিষ্ট ঘরটাতেই কাটিয়ে, তারপর নিঃশব্দে দোরে চাবি এঁটে চুপিচুপি চলে এলাম ম্যানেজারের রুমে। যার যে-প্রশংসাটুকু প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত করব না, ভদ্রলোক বাস্তবিকই দরজা ভেজিয়ে রেখে আমার জন্য ঘরের ভিতর অপেক্ষা করছিলেন।

'তারপর সকালবেলা নিজের ঘরে ফিরে আসতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। বারান্দার দিকের দরজাটি একেবারে খোলা, যেটি যাওয়ার আগে আমি ভালো করেই বন্ধ আছে দেখে গেছি। কার শ্রীকরস্পর্শে এটি সম্ভব হয়েছে জানতে বাকি রইল না; দুটো মশারিরই এক-একটা ধার ওপরপানে তোলা দেখে সে-ধারণার অনুকূলে দ্বিতীয় যুক্তিও মিলে গেল।

'মেঝের দিকে চেয়ে দেখি পাউডারগুলো আমার একেবারেই বিফলে যায়নি, সমস্ত ঘরময়ই কার যেন গোদা-গোদা পায়ের দাগ সযত্নে বুকের ওপরে তারা ধরে রেখে দিয়েছে। অতিশয় ঝানু যে সে-"নিশাচর"টি তাও বোঝা গেল, যখন একটিমাত্র রেখার সন্ধানও সে-পায়ের দাগের ভেতর দেখতে পেলাম না। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন বোধহয়—হয় রবারের জুতো পরে, আর নয় তো রবারের পট্টি পায়ে জড়িয়ে সে কাজে নেমেছিল, যাতে পায়ের দাগ কোনওমতেই কেউ আঁচতে না পারে—কোনওরকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যেই যেতে না হয়।

'কীরকম শক্ত লোকের পাল্লায় আমরা পড়েছি তা-ই জানাবার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এই ক'ছত্র লেখা। আপনাকে সাবধান করে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, ভয় দেখানো নয়। "সুমিত্র নিকেতন" ছেড়ে অন্য একটা আস্তানার সন্ধানে আজই আমায় বার হতে হবে। আস্তানার ব্যবস্থা হলেই আপনাকে সংবাদ দেব।'

হুকা-কাশি

একুশ ঃ পার্শী সাহেবের অর্ডার

তিন-চারিদিন পরের কথা, সন্ধ্যার পর কাশীর একটা উচ্চশ্রেণীর 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক' হোটেলের সম্মুখে হুকা-কাশিকে দেখা গেল। সদর দরজার সামনে এক নেপালী দরওয়ান বসিয়াছিল। হুকা-কাশি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পার্শী সাব কৌন কামরামে রহতা?'

'জি তেরা লম্বারমে, দোতল্লা'পর।'

'আউর কলকাত্তাবালা বংগালি—' হঠাৎ কী ভাবিয়া হুকা-কাশি থামিয়া গেলেন, প্রশ্ন পালটাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সিঁড়ি কিধার, বাতলাও।'

প্রায় আধঘণ্টারও বেশি সময় উপরে কাটাইয়া হুকা-কাশি আবার যখন নিচে নামিয়া আসিলেন তখন পৃথিবীর বুকে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। রাস্তায় নামিয়াই তিনি একখানা ট্যাক্সি ধরিলেন, চালককে হুকুম দিলেন, 'ডাকবাংলো।'

মিস্টার বাসু ইজিচেয়ারের উপর দেহ এলাইয়া দিয়া একখানা ইংরেজি বই পড়িতেছিলেন, হুকা-কাশিকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই স-কলরবে অভ্যর্থনা করিয়া উঠিলেন; একটু অনুযোগের সুরে বলিলেন, 'বেশ যা হোক, একখানা স্লিপ পাঠিয়ে দিয়েই তিন-চারদিন একেবারে ডুব! আমি বেঁচে রইলাম, না কি গুণ্ডার হাতেই নিপাত গেলাম সে-খবরটুকু পর্যন্ত নিলেন না!' হুকা-কাশির চিঠিখানা পাওয়ার পর নেটিভ গুণ্ডাদের প্রতি বোধহয় 'শ্রদ্ধা'টা তাঁর কিঞ্চিৎ বাড়িয়াছে, কেননা ফিরিঙ্গি-বেশ ত্যাগ তো তিনি করেনই নাই, বরং সেটিকে আরও একটু বাড়াইয়া তোলারই চেষ্টা করিয়াছেন।

হুকা-কাশি একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'বাড়ি বদল, তার ওপর শত্রুপক্ষের চোখ এড়িয়ে অজ্ঞাতবাস—দুটোতেই এমন ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল যে, নিজে এসে বাস্তবিকই দেখা করতে পারিনি, কিন্তু তাই বলে আপনার সংবাদ নিইনি এ-কথা বললে কিন্তু সত্যিই আমার ওপর অবিচার করা হবে। লোকের মুখে অন্তত রোজ একবারও খবর নিয়েছি, বাস্তবিকই আপনি সুস্থ মনে, বহাল তবিয়তে রয়েছেন কি না।'

'নতুন আস্তানা গাড়লেন কোথায়?'

হুকা-কাশি এদিক-ওদিক তাকাইয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আস্তে। একেবারে বাঙালি-টোলার ভেতরে—দেবন্যাথপুরা। ব্যাটারা যত হুঁশিয়ারই হোক না কেন, এবার আর সহজে আঁচতে হচ্ছে না। কিন্তু আর-এক মুশকিল বাধিয়েছে এক ব্যাটা পার্শী ব্যবসাদার—ব্যাটার বায়নার যেন আর অন্তই নেই। অথচ আমল না দিয়েও পারি না, লোকটাকে হাতে রাখা দরকার। এইমাত্র তার সঙ্গে কথা কয়ে আপনার এখানে আসছি। আমায় বলে কিনা, 'আপনি জাপানি, সস্তায় কী করে কিস্তি মারতে হয় আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে—আমায় বিদেশ থেকে অল্প কিছু—লাখ দু'তিন টাকার—কলকব্জা আনিয়ে দিতে হবে।' যত বলছি জাপানি মাত্রেই ব্যবসাদার নয়, ব্যবসার কোনও ধারই আমি ধারি না, তবু কে কার কথা শোনে! শেষটায় তাই আপনার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য চলে এলাম। আপনি তো প্রায় দশ-বারো বছর আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, জানাশোনা এমন কোনও লোক আছে যার ওপর এ-ভারটা দিয়ে দেওয়া যায়? অবশ্য ন্যায্য কমিশন সে পাবে। তবে খুব বিশ্বাসী লোক হওয়া দরকার, একরকমের জিনিস তো নয়, শেষে মাথায় বাড়ি না দিয়ে দেয়! আছে এমনধারা লোক? শুধু একটা পরিচয়-পত্র দিয়ে দেওয়া, তারপর ওরা দুজনে যা হয় বোঝাপড়া করুক গে। বেশি ঝুঁকি আমরা নিতে যাচ্ছি না, যেটুকু না করলে নয় সেইটুকু—আসল কথা, লোকটাকে হাতে রাখা উদ্দেশ্য।'

মিস্টার বাসু একটু চিন্তা করিয়া শেষে তাঁরই জানাশোনা এক আমেরিকান সাহেবের নামে একটা পরিচয়-পত্র লিখিয়া দিলেন। সে-লোকটা না কি নানা বিষয়ে দালালি করে।

চিঠি লিখিয়া মিস্টার বাসু বলিলেন, 'সেদিন সেই যে ফটো দেখাচ্ছিলেন না, তার সঙ্গে কাল বিকেলে একেবারে মুখোমুখি দেখা।'

হুকা-কাশি উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বলেন কী? আপনাকে চিনতে পেরেছিল?'
'উঁহু, কিন্তু সে শুধু আপনারই এই ফিরিঙ্গি পোশাকের দৌলতে!'
'আচ্ছা, তবে আরও একটু খবর দিয়ে রাখি; মনে রাখবেন সে-লোকটার নাম রামদয়াল।'

বাইশ ঃ কল্পনারও অতীত

হুকা-কাশির চোখে ধূলা দিয়া তাঁরই গতিবিধির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারে এমন লোক আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আমার অজ্ঞাত এহেন কোনও ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইবে, দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্থানে আজ ক'দিন ধরিয়াই তিনি হামেশা আসা-যাওয়া করিতেছেন, অবশ্য নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া। স্থান দুইটির মধ্যে একটি একখানি পানের দোকান, গঙ্গার প্রায় উপরেই; পান ছাড়া বিড়ি-সিগারেট প্রভৃতিও অল্পস্বল্প সেখানে পাওয়া যায়, তবে দোকানের আয়তন তেমন বড় নয়। দ্বিতীয় স্থানটি একখানা মেটে বাড়ি, বাহির হইতে নিতান্তই দরিদ্রের সম্পত্তি বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে উঁকি মারিবার সুযোগ পাইলে মালিক যে খুবই হীন অবস্থার লোক তা মনে হয় না।

রাত প্রায় এগারোটা বাজিয়া গেছে, তখনও হুকা-কাশি পানের দোকানেরই সন্নিকটে দাঁড়াইয়া। একজন বলিষ্ঠ চেহারার হিন্দুস্থানী দোকানের সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল; হুকা-কাশি দেখিলেন, যে-লোকটা এতক্ষণ পান বেচিতেছিল, সে দোকান ছাড়িয়া নিচে নামিয়া আসিল, আর তার পরিত্যক্ত 'গদি' দখল করিয়া বসিল নবাগত হিন্দুস্থানীটি। ভিতরে ছোট্ট একখানি চারপায়া পাতা আছে, আরও খানিকটা রাত হইলে দোকান বন্ধ করিয়া সে শুইয়া পড়িবে।

পরদিন এবং তারও পরদিন হুকা-কাশিকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত দেখা গেল, বাসুর সঙ্গে পর্যন্ত একবার দেখা করিবার ফুরসুত পাইয়া উঠিলেন না—নানা জায়গায় নানা কাজে অনবরত ছুটাছুটি করিয়া তাঁর সময় কাটিয়াছে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে যখন তিনি ফিরিলেন তখন ক্লান্তি এবং অবসাদ হয়তো তাঁর প্রচুরই হইয়াছিল কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে প্রসন্নতারও অভাব ছিল না।

ঘরে ঢুকিয়াই পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন; পড়া শেষ হইলে কুচিকুচি করিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তারপর সেই ছেঁড়া কাগজের প্রত্যেকটি টুকরা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া জ্বলন্ত উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। তাঁর নিজের মুখের একটি মাংসপেশীতেও কোনও পরিবর্তন লক্ষ করা গেল না কিন্তু পাঠক-পাঠিকাদের যদি সেরূপ কিছু হইয়া থাকে তবে তাঁদের সে-কৌতূহল মিটাইবার জন্য চিঠিখানার ভাষা শুনাইয়া দিতেছি—

নীলকুঠি, আসানসরাই

'প্রিয় বন্ধু,

বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে রত্নটির দাম যাচাই করিয়েছি—তাঁরা যে-দাম বলছেন তাতে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এদিকে নতুন এক বিপদ—আভাস যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হয়, ব্যাপারটা খুব বেশি চাপা নেই, কোনও-কোনও জায়গায় বেশ কিছু জানাজানি হয়ে পড়েছে—বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই কি না তা অবশ্য জানি না। এ-ক্ষেত্রে আসানসরাই-এর মতো ছোট্ট অরক্ষিত গ্রামে ওটি আমার কাছে রাখতে আদৌ ভরসা পাচ্ছি না, তবে পরশুর আগে ওটিকে স্থানান্তরিত করাও আমার পক্ষে কোনওমতেই সম্ভব হবে না। এ দু-দিন আমার লোহার সিন্দুকের ওপর আস্থা স্থাপন ছাড়া আর গত্যন্তর কী? যদি সময় করতে পারো, একবার আসবে। ইতি—'

নিচের স্বাক্ষরটি বুঝিবার উপায় নাই, এমনই জড়ানো।

এগারোটা বাজিতে তখন মিনিট পনেরো বাকি—দিন নয়, রাত্রি—হুকা-কাশির নূতন বাড়ির সম্মুখে যে-যুবকটি আসিয়া দাঁড়াইল সে বিলক্ষণ বলশালী। দিন কয়েক পূর্বে কাশীর এক 'অ্যারিস্টোক্র্যাটিক' হোটেলের ফটকে দরওয়ানের নিকট হুকা-কাশিকে জনৈক 'বংগালি বাবুর' অনুসন্ধান লইতে দেখা গিয়াছিল, এ-সেই 'বংগালিবাবু'; নাম তারকেশ্বর।

ঠকঠক করিয়া দরজায় কয়েকটি মৃদু করাঘাত পড়িতেই হুকা-কাশি স্বয়ং নামিয়া আসিলেন, দুয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন, 'ভেতরে চলে এসো।' তারপরেই আবার তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন; সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে-উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সবসুদ্ধ ক'জন বেরুল গুনেছিলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তেইশ জন।'

'বাঃ, চমৎকার! সন্তোষবাবুকে চিঠি লিখেছিলাম, আমার বেহারা অমৃতকে সঙ্গে করে কাল তিনি এসে পৌঁছেছেন, ওপরেই আছেন। আর তোমরাও দলে আছ তিনজন। প্রায় ডবল হল। কিন্তু তোমার বন্ধু দুজনা কোথায়?'

'মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে; ও-বেলাই আমি তাদের এ-বাড়ি চিনিয়ে রেখেছি।'

'সাড়ে বারোটা আন্দাজ বন্ধ হয়ে যাবে—তার খানিক আগেই ওখানে আমাদের গিয়ে পৌঁছানো দরকার।... এই যে আলাপ করিয়ে দিই—ইনিই সন্তোষবাবু, আর এ হচ্ছে আমাদের তারকেশ্বর রায়, যার কথা আজ সকালেই আপনাকে বলছিলাম।'

দেখিতে-দেখিতে আরও আধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল, তারকেশ্বরের বন্ধুদ্বয় ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিয়াছে। হুকা-কাশি পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, 'চলুন, আমাদের যাত্রার সময় হয়েছে; সন্তোষবাবু, আপনি কিছুমাত্র নার্ভাস হবেন না; শিগগিরই হয়তো এমন সব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবেন, যা আপনার কল্পনারও অতীত। কিন্তু ভগবানে নির্ভর রাখুন, সৎকার্যে তিনি যে সর্বদাই আমাদের সহায় এই বড় কথাটা ভুলবেন না।'

তখন সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ছয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর পুরুষ কাশীর এক নির্জন, সঙ্কীর্ণ গলির বুকে নামিয়া পড়িল। আমার এ-গল্পের পাঠক-পাঠিকা তাঁদের অনুসরণ করিলে দেখিতে পাইতেন—যেখানে সকলে আসিয়া থামিলেন তার কয়েক হাত দূরে তাঁদেরই পরিচিত সেই পানের দোকান, যার আনাচে-কানাচে এ-কয়দিন হুকা-কাশিকে অবিরত ঘুরিতে দেখা গিয়াছে।

সকলেই থামিয়াছে, কেবল হুকা-কাশি আগাইয়া গিয়া দোকানীর নিকট একপয়সার মিঠা খিলি চাহিলেন। তারপর পান সাজিবার উদ্দেশ্যে লোকটা উবু হওয়ামাত্র ব্যাঘ্রবিক্রমে তিনি তার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কণ্ঠের উপর চাপিয়া বসিল লোহার নিগড়ের চেয়েও কঠিন একখানি বাহু। ততক্ষণে হুকা-কাশির আর সঙ্গীরাও আসিয়া পড়িয়াছে। তারকেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে ঝাঁপ ফেলিয়া ভিতর হইতে দোকানের দরজা আঁটিয়া দিল; একসঙ্গে পাঁচটি টর্চ জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই আলোয় অমৃত দড়ির সাহায্যে লোকটার হাত-পা এমনই শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল যে, বেচারার আর এতটুকু নড়িবার ক্ষমতা রহিল না। মুখ-চোখও বাদ গেল না, শক্ত কাপড়ে আচ্ছাদিত হইল।

'এবার মাদুরটা উঠিয়ে ফেল, ম্যানহোলের মুখ সরাতে হবে।' হুকা-কাশি বলিলেন।

ঘরের মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো ছিল, সেটি সরাইতেই ম্যানহোল সকলের নজরে আসিল। হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর ধরাধরি করিয়া ঢাকনিটা তুলিয়া ফেলিলেন; দেখা গেল ঢাকনির নিচে মোটা লাঠির মতো একটি লোহার ডান্ডা লাগানো রহিয়াছে—সমস্ত জিনিসটা দেখিতে ঠিক একটি খোলা বার্মিজ ছাতার মতো। হুকা-কাশি তারকেশ্বরের দিকে চাহিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিলেন, বলিলেন, 'ডান্ডার মানে বুঝতে পেরেছ বোধকরি! চলো, ভেতরে ঢোকা যাক।'

ম্যানহোলের মুখে টর্চের আলো পড়িতেই সকলে—অবশ্য হুকা-কাশি এবং তারকেশ্বর বাদে—বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেল; ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি একটা বিশেষ দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই বিস্ময়

হুকা-কাশির সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়াইল না, সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, 'যা ভাবছেন তাই, সুড়ঙ্গই বটে এটা। এরই ভেতর আমাদের ঢুকতে হবে এবং সেইজন্যেই এতগুলো টর্চের ব্যবস্থা। চলুন, নেমে পড়া যাক।' রজ্জুবদ্ধ দোকানীকে দেখাইয়া বলিলেন, 'এ-চাঁদটিকেও এখানে ফেলে যাওয়া নিরাপদ নয়, সঙ্গে করে নিচে নেওয়াই শ্রেয়।'

অতি ধীরে-ধীরে, সতর্কভাবে সিঁড়ি বাহিয়া সকলে নামিতে লাগিলেন। অল্প খানিকটা আসিয়া সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, তারপর আরম্ভ হইয়াছে সরু গলি; আরও খানিকটা আগাইতেই দেখা গেল সে গলি শেষ হইয়াছে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া।

ঘরের দরজা ভেতর হইতে ভেজানো ছিল, ধাক্কা মারিতেই কোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই দুয়ার খুলিয়া গেল এবং সেইসঙ্গেই দেখা গেল ভিতরে কে একজন লোক মেঝের উপর গড়াগড়ি যাইতেছে। নিশ্চয়ই সে এতক্ষণ ভিতর হইতে দরজার গায়ে ঠেসান দিয়া ঝিমাইতেছিল, তাই ধাক্কার বেগ সামলাইতে পারে নাই, হুড়মুড় খাইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে টর্চ-হাতে হঠাৎ এতগুলি লোকের আবির্ভাব বাস্তবিক এমনই বিস্ময়জনক যে, লোকটা সহসা নিজের চক্ষুকেও বিশ্বাস করিতে পারিল না, মনে করিল, বোধহয় সে জাগিয়া-জাগিয়াই স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু ডাকু বড় ঝানু চীজ, যে কোনও অবস্থার জন্যই সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে; মুহূর্তের মধ্যে বিপরীত দিকের দেয়ালের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একটা সূক্ষ্ম বোতামের মতো কী সে টিপিয়া ধরিল, আর সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল এতক্ষণ নিরেট দেওয়াল বলিয়া যেটিকে তারা মনে করিয়া আসিতেছিল তারই মধ্যে পরিষ্কার একটি কাঠের দরজা খুলিয়া গেছে। কিন্তু রঙ ফলাইবার কী আশ্চর্য বাহাদুরি! কার সাধ্য দেয়ালের গায়ে দরজার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারে! হুকা-কাশি তারকেশ্বরের পানে তাকাইয়া আবার একটু হাসিলেন, ঠিক প্রথমবারের মতোই অর্থপূর্ণ হাসি—কিন্তু ততক্ষণে তারকেশ্বর 'ডাকুর-পো'কে মারাত্মকভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। হুকা-কাশি বলিলেন, 'তুমি এই দরজা আগলেই থাকো, কেউ যেন না ঢোকে।' তারপর অমৃতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'তুমি যে দাঁড়িয়ে রইলে অমৃত!'

প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে ভৃত্যের বিলম্ব হইল না; অল্প একটু পরেই উপরে দোকানীর যে-দশা হইয়াছিল, ঠিক সেই দশাই হইল এ-লোকটিরও—অর্থাৎ 'নাগ-পাশে' আবদ্ধ।

'কোণের ওই পেট-মোটা সিন্দুকটার চেহারা বড়ই সন্দেহজনকে মনে হচ্ছে। অক্সি-এসিটিলিনের সরঞ্জামটা এগিয়ে দিন তো সন্তোষবাবু!' হুকা-কাশি কহিলেন।

এ-সামগ্রীটির সহিত যাঁরা পরিচিত নন তাঁদের হয়তো একটু বুঝাইয়া বলা দরকার কী এ-জিনিসটা। কলিকাতায় ট্রামরাস্তা মেরামত করিতে বসিয়া মিস্ত্রিরা অতি উজ্জ্বল আলোর মতো একটা জিনিস ব্যবহার করে তা অনেকেই হয়তো লক্ষ করিয়াছেন। উহাই অক্সি-এসিটিলিন গ্যাস। লোহা যত শক্তই হোক না কেন, ইহার সংস্পর্শে আসিলে তরল হইয়া যায়।

সন্তোষ সরঞ্জামটা হুকা-কাশির কাছে আনিয়া দিল, তিনি আগাইয়া সিন্দুকের কাছে গিয়া বসিলেন। সকলে শব্দ শুনিল—হিসস, হিসস, ব্যস, সিন্দুকের তালা ক্রমশ গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মুহূর্তে পরেই হুকা-কাশির বুকের মধ্য দিয়া ঠিক যেন একটা বিদ্যুতের প্রবাহ খেলিয়া গেল—তাঁর সাধনার ধন, এতদিনের পরিশ্রমের মূল শ্রীপুরের সোনার হরিণ ভিতর হইতে আলোক বিচ্ছুরণ করিতেছে। অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সবে তিনি সেটি বাহিরে আনিবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর সব কয়টি সঙ্গী সমস্বরে এক বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল—নিদারুণ ভয়ব্যঞ্জক এক ধ্বনি! চমকিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে সেই অতি-বড় সাহসী পুরুষটিরও বুকের রক্ত হিম হইয়া আসিল—তাঁর নিকট হইতে মাত্র কয়েক আঙুল দূরে প্রায় তার গা ঘেঁষিয়াই দাঁড়াইয়া আছে বীভৎস হিংস্র চেহারার একটা ভালুক পিছনের দুটি পায়ে ভর রাখিয়া। আগুনের গোলার মতো তার দুই ক্রুদ্ধ চোখে সে কী ক্রূর দৃষ্টি, যেন এখনই নখে ছিঁড়িয়া সে তাঁকে কুটিকুটি করিয়া ফেলিতে চায়!

আত্মরক্ষার জন্য হুকা-কাশি সঙ্গে অস্ত্র আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন তার ব্যবহার একেবারেই অসম্ভব। দু-একটা গুলিতে এ-লোমশ জীবের হয়তো কিছুই হইবে না, বরং যন্ত্রণার প্রতিশোধ লইতে সে মরিয়া হইয়া উঠিবে। আক্রান্ত না হইলে কিছুতেই তিনি আক্রমণ করিবেন না, মনে-মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তিনি তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁর সঙ্গীরা দেখিতে পাইল, তিনি ধীরে-ধীরে ভালুকের গায়ে নিজের হাতখানি রাখিতেছেন। নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল—ভদ্রলোকের কি বন্য জন্তু সম্মোহনের বিদ্যাও জানা আছে নাকি!

হঠাৎ একটা অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি করিয়া হুকা-কাশি দুই হাতে ভালুকটাকে জাপটাইয়া ধরিলেন, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, 'অমৃত, শিগগির দড়ি দিয়ে পা দুটো এর বেঁধে ফেলো। আহা, কেন ভয় পাচ্ছ? আক্রমণের শক্তি এর নেই। দেখছ কী?'

এ-আদেশ অমান্য করা অমৃতের পক্ষে অসম্ভব, যন্ত্রচালিতের মতো দড়ি-হাতে ভালুকের দিকে সে কয়েক পা অগ্রসর হইল। কিন্তু মনের উপর তো আর মানুষের জোর নাই, পা হইতে মাথা অবধি সমস্ত শরীর তার কাঁপিতে লাগিল—ঠিক ঝড়ের মুখে কলার পাতার মতো। বেচারার এই সকরুণ ভাব হুকা-কাশির দৃষ্টি এড়াইল না, অভয় দিয়া তিনি আবার কহিলেন, 'অত কেঁপো না অমৃত; বারবার বলছি ভয়ের কিছুই নেই এখানে; এমন জ্বলজ্বলে দুটো চোখ থাকতেও এ কিছুই চোখে দেখতে পায় না—কানে শুনতে পায় না, হাত নাড়বারও শক্তি নেই। যা কিছু আছে ওই পা দুটোই, কিন্তু ভালুকের জোর এ-পায়ে আসবে কোত্থেকে? এ তো ভালুক নয়!'

'ভালুক নয়?' সন্তোষ এবং তারকেশ্বর একসঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিল।

'না; ইনি আমাদের রণজিৎবাবু।'

হঠাৎ মাথার উপরকার ছাতটা ধসিয়া পড়িলেও বোধহয় কেউ অধিকতর বিস্মিত হইত না। বিমূঢ়ের মতো সকলে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। হুকা-কাশি বলিলেন, 'মানুষ যে কীরকম কল্পনাতীত নিষ্ঠুর হতে পারে একটু পরেই তা জানতে পারবেন। কিন্তু তার আগে এই সাক্ষাৎ নরক থেকে বার হওয়া দরকার। আমাদের দুটো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে—রণজিৎবাবু এবং সোনার হরিণ দুয়েরই উদ্ধার। সন্তোষবাবু, এই আপনাদের সোনার হরিণ!'

হুকা-কাশি রত্নটি বাহির করিতেই সকলের চোখ একসঙ্গে ঝলসিয়া উঠিল—যেন একটা প্রদীপ্ত সূর্য লক্ষধারায় কিরণের ছুরি হানিতেছে! স্থান, কাল সমস্তই ভুলিয়া নির্নিমেষে সকলে সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। ইহার জন্য লোকে পাগল হইয়া উঠিবে, তাতে আর কথা কী!

কিন্তু হুকা-কাশি সকলের চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন, কহিলেন, 'ওহে তারকেশ্বর, অবাক হওয়ার সময় এখন নয়, সে-সময় ঢের পাওয়া যাবে; এখন চাই সক্রিয় হওয়া। যে-পথে যেভাবে সকলে ঢুকেছি অবিকল সেইভাবে বেরুব, শুধু রণজিৎবাবু আমার কাঁধে থাকবেন এই যা তফাত। আমাদের উপস্থিতি কিছুই ইনি টের পাচ্ছেন না—কাঁধে তুলে চলতে শুরু করলে স্বভাবতই একটু চঞ্চল হওয়ার সম্ভাবনা; কাজেই পা দুটো বেঁধে নেওয়া হল। অমৃত, ওই তাকের ওপর ওটা কী, বিছানার চাদর বুঝি! দাও তো, ওঁকে একদম ঢেকে ফেলা যাক!'

যে দুটি 'মহাত্মা'কে দড়ির সাহায্যে বন্দী করা হইয়াছিল তারা যাতে এখন অন্তত চার-পাঁচ ঘণ্টা বেশ 'ঠাণ্ডা' থাকে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা করিয়া সকলে সুড়ঙ্গ-পথে ফিরিবার উপক্রম করিলেন। উপরে উঠিয়া ম্যানহোলটি পরিপাটিরূপে বন্ধ করা হইল, তারপর সকলে মিলিয়া বাহির হইতে দোকানের দরজাটা এমনিভাবে ভেজাইয়া দিলেন যাতে হঠাৎ কাহারও মনে কোনওরকম সন্দেহই জাগিতে না পারে। দোকান হইতে কয়েক পা আগাইলেই গঙ্গা; একখানা বড় পানসি নৌকো সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, সকলে গিয়া তাতে চড়িয়া বসিলেন, হুকা-কাশি তৎক্ষণাৎ মাঝি-মাল্লাদের নৌকো ছাড়িতে আদেশ দিয়া 'ভালুকের' মাথার পিছন দিকে বড়-বড় লোমগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে

লাগিলেন; হাতে ঠেকিল গুটিকয়েক লোহার বল্টু। ক্ষিপ্রহস্তে সেগুলি খুলিয়া ফেলিতেই কঠিন ইস্পাতের-উপর-রোঁয়া-বসানো, চোখ-মুখ-কান-ঢাকা মুখোসটাও খুলিয়া আসিল, দেখা দিল রণজিতের নিজস্ব মূর্তি—উঃ, সে-চেহারা দেখিলে বোধকরি অতিবড় পাষাণেরও হৃদয় গলিয়া যায়।

ফ্যালফ্যাল করিয়া রণজিৎ চারিদিকে তাকাইতে লাগিল—সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তারপর হুকা-কাশির সহিত চোখাচোখি হইতেই সে কেমন এক অস্ফুট ধ্বনি করিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে-সঙ্গেই হুকা-কাশি দুই হাতে তার মাথাটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইলেন। সেও নিতান্ত নির্ভরশীল ছোট ভাইটির মতোই হুকা-কাশির বুকের উপর মাথা লুটাইয়া দিল। অপার্থিব দৃশ্য!

রণজিৎ ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সন্তোষ হুকা-কাশিকে প্রশ্ন করিল, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'

'সূর্য ওঠা অবধি নৌকোয় করে যতটা পারি এগিয়ে যাব; তারপর ভোর হলে পরে সব চাইতে কাছাকাছি স্টেশনে কলকাতার গাড়ি ধরতে হবে। আসানসরাই থেকে রামদয়ালদের শেষ রাত্তিরেই ফেরার কথা; তারা এসে শূন্য ডেরা দেখবার আগেই কাশী ছেড়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে চাই।'

'কিন্তু মেজকর্তা যে কাশীতেই পড়ে রইলেন!'

'কে? মিস্টার বাসু? তিনি খুব নিরাপদেই আছেন, কোনও অনিষ্টেরই সম্ভাবনা নেই।'

'আর অহিভূষণ চৌধুরী? তার কোনও কিনারা করতে পারলেন কি?'

'হুঁ, তাও করেছি।'

'বটে নাকি? প্রাণে বেঁচে আছেন তিনি? কেন তিনি সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছলেন?'

'সরিয়ে নিয়েছিলেন নিতান্ত জঘন্য চরিত্রের লোক বলে; হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন বইকী—তবে অহিভূষণ চৌধুরী নামে নয়, ও-নামের আর দরকার নেই, ভিন্ন নামে।'

'সে আবার কী? কী নামে?'

'যেটা তাঁর আসল নাম সেই নামে, অর্থাৎ মিস্টার বাসু নামে—মিস্টার খগেন্দ্রনাথ বাসু, দ্বারিকবাবুর মেজভাই।'

'অ্যাঁ, অ্যাঁ, অ্যাঁ? দূর, তাও কী হয়, কী বলছেন আপনি?'

'আমি ঠিকই বলছি; মিস্টার বাসু আর অহিভূষণ চৌধুরী একই ব্যক্তি।'

তেইশ ঃ হীরার টুকরো

কিছুক্ষণ সন্তোষ সম্পূর্ণই স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু কথাটাকে কোনওক্রমেই সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। কহিল, 'তা কী করে হবে মিস্টার হুকা-কাশি? সোনার হরিণের অন্তর্ধান, অহিভূষণ চৌধুরীর ব্যাপার—সে তো কতদিনের কথা! তখন মেজকর্তা এ-দেশে কোথা, তিনি তো আমেরিকায়! এই তো সেদিন সবে এলেন!'

'মিস্টার বাসু আমেরিকা থেকে ক'দিন ফিরেছেন বলে আপনার ধারণা?'

'আপনি কাশী রওনা হয়ে পড়বার মাত্র দু-দিন কি তিনদিন আগে। আমরাই তো হাওড়া-স্টেশনে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিলুম।'

'হ্যাঁ, লোক-দেখানো দেশে-ফেরার তারিখ ওইটাই বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসেছেন উনি তার ঢের—ঢের আগে'—হুকা-কাশি বলিলেন।

'কিন্তু তাই বা বলি কী করে? অহিভূষণবাবু যখন কর্তার প্রাইভেট সেক্রেটারিভাবে কাজ করছেন তখনও যে আমরা আমেরিকা থেকে মেজকর্তার চিঠি পেয়েছি; একেবারে খোদ তাঁর নিজের

হাতে লেখা চিঠি, টিকেটের উপর পরিষ্কার আমেরিকার ডাকঘরের ছাপ মারা। চান তো সে-চিঠি এখনও আপনাকে দেখাতে পারি।'

হুকা-কাশি জবাবে শুধু একটু হাসিলেন; তারপর পকেট হইতে একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া বলিলেন, 'এই তারটা একবার পড়ুন তো!'

বিস্মিত সন্তোষ টেলিগ্রামখানা চোখের সম্মুখে আনিয়া ধরিল; তাতে যা লেখা আছে তার অনুবাদ—

'খামে মোড়া তোমার প্রত্যেকটি চিঠিই পেয়েছি এবং নির্দিষ্ট দিনে সেগুলো পোস্টও করা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমার কোনও ভুল হয়েছে এমন ধারণা তোমার কী জন্য হল বুঝলাম না। যা হোক, আমার কোনও ভুল হয়নি।

—মর্নিংটন।'

টেলিগ্রাম পড়া শেষ হইলে সন্তোষ কহিল, 'আপনি বোধহয় বলতে চান মেজকর্তা আমেরিকা ছেড়ে আসবার আগে মর্নিংটন নামে ওঁর আলাপী এক মার্কিন সাহেবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে এসেছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, এখান থেকে উনি আমাদের নামে চিঠি লিখে খামসুদ্ধ সেই চিঠি সাহেবের কাছে পাঠাবেন, আর সাহেবও ঠিক-ঠিক তারিখ মিলিয়ে সেগুলো আমেরিকার কোনও ডাকঘরে ছেড়ে দেবে। সে-চিঠি পড়ে আমরা স্বভাবতই মনে করব যে-মেজকর্তা আমেরিকাতেই রয়েছেন—তিনি যে দেশে ফিরে এখানেই বাস করছেন এ-সন্দেহ কারও মনে ভ্রমেও জাগবে না—এই তো?'

'সমস্ত ব্যাপারটা আপনি জলের মতো বুঝে ফেলেছেন, সন্তোষবাবু! আপনার বোঝবার শক্তির আমি বাস্তবিকই তারিফ করছি।'

'কিন্তু এ-লোকটার খবর সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে?'

'কার? মিস্টার বাসুর প্রাণের বন্ধু মর্নিংটন সাহেবের? বঁড়শিতে টাকা বিঁধে জলে ফেলতে হয়েছিল; টাকার লোভে মিস্টার বাসু অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে টপ করে তাই গিলে ফেলেছেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে বঁড়শিতেও গেছেন আটকে। আসলে কথা কী জানেন, কোনও জটিল অপরাধের অপরাধীকে খুঁজে বার করতে হলে ঠিক অঙ্ক-কষার মতো ধাপে-ধাপে এগোতে হয়। যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঠিক বৈজ্ঞানিকের মতো অগ্রসর হতে পারলে শেষপর্যন্ত ফল আপনার মিলবেই। এইভাবে এগোবার ফলে আমি দেখতে পেলাম—কী করে পেলাম তা পরে জানবেন যে, যে-অপরাধীর সন্ধানে আমরা ফিরছি সে আর আমাদের মিস্টার বাসু-মশাই অভিন্ন ব্যক্তি। আমার এ-সিদ্ধান্তে যদি কোনওরকম ভুল না থেকে থাকে তবে ওই সময়টাতে মিস্টার বাসুর পক্ষে আমেরিকায় বাস এবং আমেরিকায় বসে চিঠি লেখা একেবারেই অসম্ভব। অথচ চিঠি যে সত্যিই আপনারা পেয়েছেন তাও জানি। কাজেই এ-রহস্যের একমাত্র সমাধান হতে পারে এই যে, আমেরিকায় ওঁর বিশেষ অন্তরঙ্গ, বিশ্বাসী কোনও লোক আছে যার মারফত নিয়মিত ও-চিঠিগুলো আপনাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও উপায় থাকা সম্ভব কি? আচ্ছা দেখা যাক, বাস্তবিকই সে রকম বিশ্বস্ত কোনও বন্ধু আছে কি না!

'বঁড়শিতে টাকা গেঁথে জলে ফেলে দেওয়া গেল—অর্থাৎ মিস্টার বাসুকে বললাম, আমার পরিচিত একজন ধনী পার্শী সওদাগর আমেরিকার বাজারে আপাতত লাখ তিনেক টাকার যন্ত্রপাতি কিনতে চান; কিন্তু এত দূর দেশ থেকে বেছে নিজে যাচাই করে মাল কিনতে গেলে তাতে পদে-পদে লোকসানের সম্ভাবনা। তিনি তো বহুদিন আমেরিকায় কাটিয়ে এসেছেন, তাঁর জানার ভেতরে পাকা অথচ বিশ্বস্ত এমন কোনও লোক আছে কি, যে এই ব্যাপারে পার্শী সাহেবের সাহায্যে আসতে

পারে? অবশ্য এর জন্য বাজার-চলিত ন্যায্য দালালি কমিশন যা, তা তিনি অবশ্যই দেবেন।

'তিন লাখ টাকার ওপর কমিশন একেবারে হেলাফেলার বস্তু নয়, তার ওপর ভবিষ্যতে আরও অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মিস্টার বাসুর চরিত্র আমি জানি, মোটা টাকার ওপর বখরা বসাবার এতবড় সুযোগ ছাড়বার পাত্র তিনি মোটেই নন। অর্থাৎ টোপ তিনি গিলবেনই। আর এও সত্যি যে, যাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারেন দালাল হিসেবে তার নাম কিছুতেই তিনি করবেন না, কেননা এসব যে মবলগ টাকাকড়ির ব্যাপার—দালাল যদি শেষে কমিশনের বখরা দিতে অস্বীকার করে বসে! কাজেই এরকম ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ সম্ভাবনাই হচ্ছে এই যে, নিতান্ত গোপনীয় চিঠি পাওয়ার মতো কাজ যে-অন্তরঙ্গ বন্ধুর ওপর পড়েছে, দালালের নাম করতে গিয়েও তার নামই মিস্টার বাসুর মুখ দিয়ে বার হয়ে আসবে—আমেরিকায় সে-ই তাঁর সব চাইতে বিশ্বাসের পাত্র কিনা!

'মিস্টার বাসু উল্লেখ করলেন মর্নিংটন নামে এক মার্কিন সাহেবের নাম, আর তার নামে একটা পরিচয়-পত্রও লিখে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পেয়ে গেলাম সে-সাহেবের ঠিকানা। ব্যস, বাড়ি এসেই সাহেবের কাছে এক টেলিগ্রাম—অবশ্য বাসুর জবানিতে অর্থাৎ যাতে করে সে মনে করে মিস্টার বাসুই টেলিগ্রামখানা পাঠিয়েছেন। টেলিগ্রামে লেখা হল যে, যেসব চিঠি তাকে পাঠানো হয়েছে তার সবগুলোই শ্রীপুর ফিরে এসেছে কি না অবিলম্বেই "তার" করে সে যেন জানায়। এর জবাবে সে যদি ফিরে টেলিগ্রাম করত—তোমার টেলিগ্রামের অর্থ কিছুই বুঝলাম না, তা হলে আমাকেও বুঝতে হত হিসাবে কোনও গোল হয়েছে—আমার অনুমান ভুল। কিন্তু সে-ধরনের টেলিগ্রাম সে মোটেই করেনি, বরং উল্টে কী করেছে তা তো আপনি এক্ষুনি দেখলেন। আমার সিদ্ধান্ত যে একেবারেই নির্ভুল তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল।'

সন্তোষ এতক্ষণ হাঁ করিয়া হুকা-কাশির কথাগুলি শুনিতেছিল, তিনি থামিতেই কপালের উপর আসিয়া-পড়া চুলগুলিকে পিছন দিকে সরাইয়া দিতে-দিতে সে কহিল; 'আচ্ছা, সলিল সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? আমার কিন্তু মনে বরাবরই কেমন একটা সন্দেহ জেগে আসছে যে, ভেতরকার রহস্য সে সব জানে।'

'আপনার সন্দেহ নির্ভুল; বাস্তবিকই আসল রহস্য সলিলবাবুর অজানা নেই।'

'অথচ সমস্ত জেনে-শুনেও কর্তার কাছে কোনও কথা ঘুণাক্ষরেও সে প্রকাশ করেনি! একেবারে হীরের টুকরো ভাই বলুন!'

'এবারও আপনার মুখ দিয়ে সত্যিকথাটাই বেরিয়ে পড়েছে সন্তোষবাবু,' হুকা-কাশি কহিলেন, 'বাস্তবিকই ভাই হিসাবে সলিলবাবুর তুলনা পাওয়া শক্ত। কিন্তু আপনার ও-ইঙ্গিতটা সত্যি নয়। বিদ্রূপভরে নয়, সত্যি-সত্যিই আমি বলছি, সলিলের মতো স্নেহময় ভাই একান্তই দুর্লভ। সোনার হরিণ উদ্ধার করতে সে আপনার অথবা রণজিৎবাবুর চাইতে কিছুমাত্র কম চেষ্টা করেনি; এমনকী প্রকারান্তরে তার সাহায্য না পেলে এত সহজে সোনার হরিণ আমি ফিরে পেতাম কি না, তাও জানি না। অথচ আত্মপ্রচারের লোভ একবারও তার মনে উঁকি মারেনি। দ্বারিকবাবুর ছেলেপিলে নেই, মিস্টার বাসু যে-অপরাধ করেছেন তাতে তাঁর সিকি পয়সাও পাওয়া উচিত নয় এবং দ্বারিকবাবুর কানে সবকথা পৌঁছুলে তা যে তিনি পাবেনও না, এ-কথাও নিশ্চিত। অথচ, পাছে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে, পাছে মিস্টার বাসুকে অর্থাভাবে পথে বসতে হয় এই ভয়ে স্নেহময় সলিল—নিঃস্বার্থপর সলিল—নিজের পাখা দিয়েই যেন আগাগোড়া তাঁকে ঢেকে রেখেছে। সে যে প্রকৃত রহস্য জানে, মিস্টার বাসুকে পর্যন্ত তা টের পেতে দেয়নি। ব্যাপারটা বাস্তবিক কী ঘটেছিল আগে সংক্ষেপে তা-ই বলে নিই, আমি কী করে ধীরে-ধীরে সমস্ত টের পেয়েছি—সেটা বরং পরে বলা যাবে।

'ভাইদের ভেতর দ্বারিকবাবুরা বর্তমানে তিনজন বেঁচে আছেন—তিনি স্বয়ং, খগেন্দ্র অর্থাৎ

আমাদের মিস্টার বাসু আর সলিলেন্দ্র। আরও কয়েকটি ভাই ছিল, তবে তারা অল্পবয়সেই মারা গেছে। বোধহয় ঠিক এই কারণেই ছেলেবেলায় খগেনবাবুর রীতিমতো শাসন হয়নি; লেখাপড়ায় তাঁর আদৌ মন বসল না, বছরের পর বছর কেবল ফেলই হতে লাগলেন। তারপর কষ্টেসৃষ্টে কোনওরকমে ফার্স্টক্লাশ পর্যন্ত উঠেই মা সরস্বতীর কাছে তিনি বিদায় নিলেন; পাড়ায়-পাড়ায় থিয়েটার আর যাত্রার আসরে ক্রমাগত তাঁকে রাজা-উজিরের পার্টে নামতে দেখা গেল। দ্বারিকবাবু অতিশয় কড়া মেজাজের লোক, এসব তাঁর বরদাস্তের বাইরে। তবুও যা হোক, মা-বাপ-হারা ছোটভাইয়ের খেয়াল কিছুদিন তিনি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু খগেনবাবু যেদিন কলকাতায় গিয়ে এক পেশাদারি থিয়েটারে নাম লিখিয়ে এলেন সেদিন তাঁর সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল—বাড়ি থেকে দিলেন তাঁকে দূর করে।

'বেপরোয়া খগেন্দ্র সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় আমেরিকা চলে গেলেন—মনে-মনে এই ধারণা নিয়ে যে, তাঁর অভিনয়-কলার একমাত্র সমঝদার হচ্ছে আমেরিকা; বায়স্কোপের অভিনেতা-হিসাবে হলিউডে ঢুকে তিনি জগৎজোড়া নাম কিনবেন। এদেশ থেকে রওনা হওয়ার আগে এই কথাই তিনি বলে গিয়েছিলেন এবং আরও জানিয়ে গিয়েছিলেন যে কোটিপতি না হয়ে এদেশমুখো আর হচ্ছেন না।

'কিন্তু ক্রোড়পতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা যত সহজ, সে-স্বপ্নকে কাজে পরিণত করা যে ঠিক ততটা সহজ নয়, কিছুদিন আমেরিকায় বাস করবার পরই বাসু তা বুঝতে পারলেন। তাই বছর দশেক পরে ফের তাঁকে শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশেই ফিরে আসতে হল—দেশের ওপর মমতায় বুকটা তাঁর টনটন করে উঠছিল বলে নয়, বুকের নিচেই যে স্থূলতর জিনিসটি রয়েছে সেটা খাদ্যাভাবে সর্বদাই চনচন করছিল বলে।

'বাংলাদেশে তখন সিনেমা-শিল্পের যুগ চলেছে, লাভজনক নতুন একটা ব্যবসার সন্ধান এখানে বহু লোক পেয়ে গেছে। যে-ব্যক্তি হলিউডে জীবনের আট-দশটি বছর কাটিয়ে সিনেমা-বিশারদ হয়ে এসেছে তার পক্ষে এটা বাস্তবিকই এক অপ্রত্যাশিত রকমের শুভ সময়। দেশে ফিরেই দেখতে-দেখতে প্রসিদ্ধ অভিনেতা এবং সিনেমা-ডিরেক্টর অশনিকান্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল—অশনিকান্ত তখন দু-চারজন উৎসাহী যুবক জুটিয়ে 'ডায়মন্ড করপোরেশন' নামে ছোট্ট একটি ফিল্মের কারবার গড়ে তোলায় মন দিয়েছেন। সকলের সমবেত পরামর্শে ঠিক হল, বেশ কিছু টাকার জোগাড় করে ব্যবসাটাকে জাঁকিয়ে তুলতে হবে। একটা কথা বলতে ভুল হয়েছে—মিস্টার বাসু তাঁর এদেশে ফেরার কথা আত্মীয়স্বজন কারও কাছেই প্রকাশ করেননি, কেননা প্রকাশ করবার মুখ তখন তাঁর ছিল না।

'ঠিক এই সময়ে দ্বারিকবাবুর অসুখ, বিশেষ করে চোখের অসুখ খুব বেড়ে ওঠায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বার হল—তাঁর একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি চাই। মিস্টার বাসু হঠাৎ যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। বড়দার অগাধ সম্পত্তি রয়েছে কেন, যদি না তা থেকে কিছু লুটে নিয়ে সিনেমা-ব্যবসায়ে তিনি ঢালতে পারেন! একটা কল্পিত নাম নিয়ে নিজেই তিনি এই প্রাইভেট সেক্রেটারির পদের জন্য প্রার্থী হবেন; তারপর একবার ঢুকতে পারলে সুযোগের অভাব হবে না—দাদার তফিল থেকে মোটা রকমের কিছু সরাবার সুযোগের কথা বলছি। লন চ্যানির লীলাভূমি হলিউডে বৃথাই তিনি ছদ্মবেশ ধারণের আর্ট এতদিন ধরে শিখে এসেছেন যদি না সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর আত্মীয়েরা তাঁকে দেখেনি, তাঁর চেহারার পরিবর্তন সম্বন্ধে কোনও খবরই রাখে না, তাদের সাধ্য কী তারা তাঁর ছদ্মবেশের আবরণ ভেদ করতে পারে! দেখতে-দেখতে টাকের ওপর ব্যাক-ব্রাশ করা চুল দেখা দিল, চোখে চশমা উঠল, মুখে নানারকমের অদল-বদল ঘটল—ব্যস, অহিভূষণ চৌধুরী নামে সম্পূর্ণ একটি নতুন লোকের ভূমিকায় মিস্টার বাসু দ্বারিকবাবুর দরজায় এসে চাকরির উমেদার হলেন।

'দ্বারিকবাবুর রুচি, পৃথিবীর নানান বিষয়ে তাঁর নানারকমের মত—প্রভৃতি খুঁটিনাটি কোনও খবরই মিস্টার বাসুর অজানা ছিল না; তার ফলে অল্পক্ষণের আলাপেই দ্বারিকবাবুর মনে হল, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হওয়ার সব চাইতে উপযুক্ত লোক ইনিই। অহিভূষণ-বেশী মিস্টার বাসু কাজে বহাল হয়ে গেলেন। তারপর দ্বারিকবাবুর চোখের ব্যামো যতই বাড়তে লাগল, মিস্টার বাসুরও কারবারের ওপর আধিপত্য ততই বেড়ে চলল। এককথায়, দ্বারিকবাবুর তিনি ডান হাত হয়ে দাঁড়ালেন, এবং সে-কথাও কারওরই জানতে বাকি রইল না।

'এইবারে মিস্টার বাসু মন দিলেন নিজের কার্যোদ্ধারে এবং শিগগিরই চমৎকার একটি সুযোগ জুটে গেল। দ্বারিকবাবু খুব তাড়াতাড়ি একটা জমিদারি কিনে ফেলবার মতলবে ছিলেন, তাই হঠাৎ একসঙ্গে অনেক টাকার দরকার হয়ে পড়ল। ব্যবসায়ীদের টাকা সবসময়ে হাতে থাকে না, ব্যবসায়ে খাটে। তাই আপাতত তিনি তাঁর সোনার হরিণ ব্যাঙ্কে বন্ধক রেখে টাকা ধার করলেন; তারপর টাকা-শোধের বন্দোবস্ত করে নিজের অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুকে উপদেশ দিলেন ব্যাঙ্ক থেকে সোনার হরিণটি খালাস করে আনতে। অবিনাশবাবু ব্যাঙ্ক থেকে রত্নটি ছাড়িয়ে এনেছেন—তখনও দ্বারিকবাবুর হাতে তা ফিরিয়ে দেননি, ঠিক এই সময়টুকুর মধ্যেই মিস্টার বাসু চরম ধূর্তের মতো একটি চাল চেলেই বাজিমাত করে দিলেন। টাইপ-রাইটারের সাহায্যে একখানা কাগজে তিনি দ্বারিকবাবুর জবানিতে একখানা চিঠি লিখলেন; তার মর্ম—"আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি অহিভূষণ চৌধুরীকে আপনি অবশ্যই চেনেন—তার হাতে সোনার হরিণটি ফেরত পাঠালে সুখী হব।" তারপর চওড়ায় ঠিক সমান-সমান, অথচ লম্বায় খানিকটা খাটো আর-একখানা কাগজে ব্যবসা-সংক্রান্ত একখানা চিঠি লিখলেন—সবটা কাগজ জুড়ে। এইবার একটা ফ্ল্যাট-ফাইলের ওপর প্রথম কাগজখানা রেখে, খালি চোখে নজরে আসে না, এমনি একরকম হাল্কা আঠার সাহায্যে দ্বিতীয় কাগজের নিচের প্রান্তটুকু প্রথম কাগজের গায়ে এঁটে দিলেন। প্রথম কাগজখানা লম্বায় বড় থাকায় তার খানিকটা অংশ নিচের দিকে বেরিয়ে রইল। দ্বারিকবাবু চোখে খুবই কম দেখেন, তাতে আবার সময়টা রাত্রি, কাজেই জোড়ার দাগটাতে খুব যত্নের সঙ্গে খড়ি বা সাদা কোনও রাসায়নিক পদার্থ ঘষে দিলে কিছুই তাঁর নজরে আসা সম্ভব নয়—অর্থাৎ একটা কাগজের ওপর আর একটা কাগজ যে চাপানো হয়েছে তা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারবেন না—মনে ভাববেন একটাই বুঝি কাগজ। ফ্ল্যাট-ফাইলের ওপর কাগজ ধরে রাখতে অনেক সমল ফাইলের দুধারে স্ট্র্যাপও দেওয়া হয়, মিস্টার বাসু একটা স্ট্র্যাপকে সরিয়ে জোড়ার দাগের ওপর নিয়েও থাকতে পারেন—তবে দ্বারিকবাবুর মতো ক্ষীণদৃষ্টি লোকের কাছে তার কোনও দরকার ছিল না।

'দ্বারিকবাবু নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রথম চিঠির বেরিয়ে-আসা অংশের ওপর সই করে দিলেন—অর্থাৎ তাঁর সই পড়ল মিস্টার বাসুর লেখা প্রথম চিঠিখানায়—দ্বিতীয়খানায় নয়। ব্যস, সেই চিঠি অবিনাশবাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ নিয়ে অহিভূষণরূপী মিস্টার বাসু ভেগে পড়লেন। তারপর থেকেই অহিভূষণ চৌধুরী পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল আর তার জায়গায় দেখা দিল খগেন্দ্রনাথ বাসু, যার সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীর চেহারার আর এতটুকুও মিল নেই। খুঁজে মরো এবার অহিভূষণ চৌধুরীকে! কিন্তু যাবার আগে মিস্টার বাসু আরও একটা চাল চেলে গেলেন। পাছে দ্বারিকবাবু বাঘা ডিটেকটিভ লাগিয়ে অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্ধান-রহস্যটার কিনারা করতেই বেশিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, সেই ভয়ে তাঁদের মনে একটা ভুল ধারণা জন্মে দেবার জন্য—তাঁদের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়ে মারবার উদ্দেশ্যে—এমনি একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, যাতে সকলের মনে হয়, তিনি কতকগুলো ভীষণপ্রকৃতি লোকের হাতের মুঠোর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন—তারাই তাঁকে যন্ত্রের মতো চালিয়েছে। এই ধরনের একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারলে স্বভাবতই দ্বারিকবাবুদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে পড়বে সেই মিথ্যে দলটারই সন্ধান করা; মরুক তারা মরীচিকার পেছনে ঘুরে!

কী করে ঘরের জঞ্জালস্তূপের ভেতর তাঁর কাছে লেখা "ডাকাত-দলের" চিঠি আবিষ্কারের বন্দোবস্ত হল, কী করে তিনি ঘরের ভেতর কাজ করতে-করতে হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে গেলেন বলে ধারণা জন্মাল—একে-একে সবকথাই বলব।'

চব্বিশ ঃ এক গ্রামের লোক

পরদিন ভোরবেলায় সকলে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নৌকোর ভিতর হুকা-কাশি তাঁর গল্প শেষ করেন নাই; ইচ্ছা করিয়াই যেন অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াছিলেন। ট্রেনে ওঠার পরও সেখানে এমনই অসম্ভব ভিড় দেখা গেল যে, সকলে জটলা পাকাইয়া এক জায়গায় বসিবে এমন সম্ভাবনাই রহিল না। হাওড়ার স্টেশনে আসিয়া গাড়ি থামিতেই সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া সলিল। পরে জানা গেল, হুকা-কাশিই টেলিগ্রাম করিয়া তাহাকে আনাইয়াছেন।

গাড়ি হইতে জিনিসপত্র নামাইতে-নামাইতে হুকা-কাশি বলিলেন, 'এখন আর কোনও কথা নয়, সটান বাড়ি গিয়ে সকলেরই বিশ্রাম। কথাবার্তা যা বলবার সে ফের কাল সকালে হবে। শরীরের ওপর দিয়ে ঝড়টা তো আর মন্দ যায়নি! অমৃত, তুমি এগিয়ে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি দ্যাখো তো! রণজিৎবাবু আর সলিলবাবু, আপনারা কিন্তু আমারই সঙ্গে যাবেন।'

পরদিন সকালেই সন্তোষ আসিয়া হুকা-কাশির বৈঠকখানায় উপস্থিত হইল; দেখা গেল, তারকেশ্বরের কৌতূহলও বড় কম নয়, সে সন্তোষেরও আগে আসিয়া আসর জমাইয়া বসিয়াছে। আর সলিল এবং রণজিৎ তো কাল হইতে হুকা-কাশিরই বাড়িতে অতিথি। উপস্থিত সকলের জন্যই চা এবং জলখাবার তৈরির হুকুম দিয়া হুকা-কাশি আবার তাঁর গল্প বলিতে বসিলেন ঃ

'সোনার হরিণ করায়ত্ত করে মিস্টার বাসু আবার তাঁর স্বাভাবিক বেশে নিজের "বন্ধুদলে" ভিড়ে পড়লেন অর্থাৎ অশনিকান্তদের দলে। ডায়মন্ড করপোরেশনটিকে জাঁকিয়ে তুলে একটা বড় রকমের ফিল্ম-কোম্পানি এবার গড়ে তুলতে হবে, আদত যে-জিনিসটির দরকার সেই টাকার সমস্যাই যখন চুকে গেছে। কিন্তু কখন কীভাবে টাকাটা খরচ করা হবে সেইসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে হয়তো তাঁর সঙ্গে অশনিকান্তের মতের অমিল হয়ে থাকবে, অথবা হয়তো অশনিকান্ত ব্যবসা-ট্যবসা ছেড়েছুড়ে একটা মোটা রকমের নগদ টাকা ট্যাঁকস্থ করবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকবে—ঠিক কী কারণে এখনও বলতে পারছি না, অশনিকান্ত কিন্তু মনে-মনে আগেকার সমস্ত মতলবই পাল্টে ফেললে। রামদয়াল নামে তাদের গাঁয়ের একজন লোক বহুদিন ধরে কাশীবাসী হয়ে, প্রকাশ্যে বাবার মন্দিরের পাণ্ডা, অথচ আসলে কাশীধামের গুণ্ডাগিরি করে দিন গুজরান করছিল। এসব তথ্য অশনিকান্তের অজানা ছিল না। এবার সে তারই শরণ নিলে। রামদয়ালের কাছে চিঠি গেল—"তুমি ধারণায়ও আনতে পারো না এমনি দামি একখানা রত্ন আমার শুধু খোঁজে নয়, একেবারে হাতের মুঠোর ভেতর রয়েছে। আমায় যদি ন্যায্য বখরা দিতে রাজি থাকো, পত্রপাঠমাত্র তৈরি হয়ে কলকাতায় চলে এসো।" দলবলসুদ্ধ রামদয়াল চলে এল কলকাতায়; দেনা-পাওনার কথা পাকাপাকি হয়ে যেতেই একদিন রাত্তিরবেলায় অশনিকান্ত কোনও ফিকিরে তাদের বেলেঘাটা বাসা-বাড়ির অধিকাংশ লোককেই বাইরে নিয়ে গেল, যাতে করে রামদয়াল নির্বিবাদে সোনার হরিণটি লুটে আনতে পারে।

'রামদয়াল সোনার হরিণ লুটে আনল বটে, কিন্তু কাজটা সে যে একদম নির্বিবাদেই সারতে পারলে এ-কথা বলা চলে না; তার কাণ্ডকারখানা একজনের চোখে পড়ে গেল—আমাদের সলিলবাবুর।

'অহিভূষণ চৌধুরী সরে পড়বার দিন কয়েক আগে থেকেই কয়েকটা ব্যাপারে সলিলবাবুর

মনে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে—বোধহয় দ্বারিকবাবুর এই নতুন সেক্রেটারি এবং তাঁর মেজভাই একই ব্যক্তি—দ্বারিকবাবুর ভয়ে নিজের আসল পরিচয় দিতে তাঁর সাহসে কুলোচ্ছে না, এইভাবেই নিজের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশা করছেন। ভগবান "দিন" দিলে —দ্বারিকবাবুকে নিজের কাজে খুশি করতে পারলে—তখন ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে আপনা থেকেই পরিচয় দেবেন। কিন্তু দু-দিন বাদেই যখন সোনার হরিণ উধাও হয়ে গেল এবং প্রকাশ পেল যে, সেই সঙ্গে-সঙ্গে অহিভূষণ চৌধুরীও নিখোঁজ হয়ে পড়েছে তখন আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ওঁর কাছে কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে এল। জঘন্য একটা মতলব নিয়ে ইচ্ছে করেই যে ছদ্মবেশে মিস্টার বাসু এ-বাড়িতে ঢুকেছিলেন সে-সম্বন্ধে ওঁর আর কোনও সন্দেহই রইল না। সেই সঙ্গে-সঙ্গে সলিলবাবু নিজের কর্তব্যও ঠিক করে ফেললেন—বড়দার এত সাধের ধন সোনার হরিণ, যে করেই হোক, উদ্ধারের ব্যবস্থা উনি করবেনই। কিন্তু সেই সঙ্গে-সঙ্গে মেজদাকেও বাঁচাতে হবে; দুনিয়ার কাছে শেষপর্যন্ত তিনি যে একটা ইতরশ্রেণীর বাটপাড় বলে প্রমাণিত হবেন, তা-ই বা উনি সহ্য করেন কোন প্রাণে? ওঁর কথাবার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও এমন কোনও ইঙ্গিত প্রকাশ পেলে চলবে না যাতে করে কারুর মনে একবারও সন্দেহ জাগতে পারে যে, মিস্টার বাসুই অহিভূষণ চৌধুরী।

'বেলেঘাটার দিকে কোনও বাড়িতে মিস্টার বাসুর দল আড্ডা গেড়েছে, এইরকম সন্দেহ করবার একটা কারণ ঘটায় শহরের ওই অঞ্চলটাতে সলিলবাবুকে দিনকতক খুব ঘন-ঘন ঘোরাফেরা করতে হল। শেষে একদিন সন্ধ্যার পর বাড়িটাও উনি এঁচে ফেললেন; কারও সাড়া-শব্দ নেই বাড়িতে, চারিদিক অন্ধকার, শুধু ওপরের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। হাতে টর্চ ছিল, সদর দরজায় উঁকি মারতেই তো ওঁর চক্ষুস্থির! সামনের ঘরটাতেই একটা চারপেয়ের ওপর চাদর-চাপা-দেওয়া এক নেপালী দরওয়ান চোখ বুজে পড়ে আছে, তার সারা শরীর খাটিয়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। গুরুতর রকমের একটা কিছু ঘটেছে আন্দাজ করে চট করে ওপরে উঠে যাওয়াটা উনি ভালো মনে করলেন না, নিচে থেকেই টর্চের আলোতে আর কিছু আঁচা সম্ভব কি না দেখতে লাগলেন। হঠাৎ ওপরের কথাবার্তা কানে এসে যেতেই প্রকৃত ব্যাপারটা সলিলবাবু বুঝে ফেললেন—চোরের ওপর বাটপাড়ির বন্দোবস্ত হচ্ছে—সোনার হরিণের হাতবদলি হচ্ছে। একদৌড়ে অমনি উনি বাইরে চলে এলেন, যদি কোথাও কোনও সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু ও-পাড়াটা যে একেবারেই নিরিবিলি! প্রায় পরের মুহূর্তেই গুটিকতক লোক ওই বাড়িটা থেকেই বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তার ধারে একটা মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, সবাই তাতে চেপে বসল। একজনের হাতে, সলিলবাবু দেখতে পেলেন, একটা বড় পুলিন্দা। বাড়ির ভেতর থেকে মিস্টার বাসুর গলার আওয়াজ তখনও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—যাক, প্রাণে মারেনি তা হলে। সেখানে দাঁড়িয়েই সেই মুহূর্তে সলিলবাবু ওঁর যথাকর্তব্য ঠিক করে ফেললেন; অন্য কিছু করবার আগে সর্বপ্রথম কর্তব্য ওই "ডাকাতে গাড়ি"টা কোথায় যায়—সেইটে জেনে নেওয়া। কাজটা ওঁর পক্ষে শক্ত বলে মনে হল না এইজন্য যে, মিস্টার বাসুদের ভাড়াটে বাড়িটার অল্প কিছু দূরে, একটা গাছের আড়ালে অন্ধকারে ওঁর টু-সিটার গাড়িখানা অপেক্ষা করছিল। "ডাকাতে গাড়ি"টা রওনা হয়ে পড়বার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই সলিলবাবুর টু-সিটারও পিছু-পিছু ছুটল। রাস্তায় চিৎকার করে অততায়ীদের গাড়িখানা থামাবার চেষ্টা উনি একবারও করেননি, কেননা গাড়িখানা বাস্তবিকই থামাতে পারলে সোনার হরিণ উদ্ধার হতো বটে, কিন্তু মিস্টার বাসুকে বাঁচানো আর সম্ভব হতো না। আর তা ছাড়া যে-গাড়ি রাতের বেলায় অত জোরে ছুটে চলেছে তাকে আদৌ থামানো সম্ভব হতো কি না কে জানে!

'অনেকটা পথ চলে আসার পর সলিলবাবু দেখলেন সুরযমল নগরচাঁদ লেনের একটা বাড়ির সামনে এসে "ডাকাতে গাড়ি"খানা থেমে গেছে। উনি বেশ করে লক্ষ করলেন, ও-গাড়ির আরোহীরা সবাই একে-একে নেমে পড়ল, শুধু একজন বাদে; সে-লোকটিকে নিয়ে গাড়ি ফের কোথায় রওনা হয়ে পড়ল; বোধহয় সোনার হরিণটাকে আরও নিরাপদ জায়গায় রেখে আসতে। রাস্তা নির্জন

হয়ে পড়তেই উনি তখন টু-সিটার থেকে নেমে এলেন; দেখলেন, ওপরের একটা ঘরে হঠাৎ ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোতে স্পষ্ট টের পাওয়া গেল যে, ওই ঘরটাই ডাকাত-দলের সাময়িক আড্ডা।

'এইবার সলিলবাবু বাস্তবিকই পড়ে গেলেন দারুণ দ্বিধায়। সোনার হরিণ ফিরে পেতে হলে আমায় এই ডাকাত-দলের সন্ধান দেওয়া নিতান্তই দরকার, অথচ নিজে উনি এ-বিষয়ে কোনওই উচ্চবাচ্য করতে পারেন না, কেননা তা হলে এমন সব জবাবদিহির ভেতর পড়ে যাবেন যাতে মিস্টার বাসুর রহস্য আর কোনওরকমেই চেপে রাখা সম্ভব হবে না। ঠিক সেই কারণেই পুলিশে খবর দেওয়াও অসম্ভব। আপনারা হয়তো বলবেন, কেন, আমার নামে একটা বেনামী চিঠি লিখে সেই চিঠিতে এ-বাড়ির নম্বরটা দিয়ে দিলেই তো হতো। হয়তো হতো, কিন্তু সলিলবাবু মনে-মনে বিবেচনা করলেন, সে-চিঠি পেয়ে আমি এদিকে আসবার আগেই হয়তো ব্যাটারা তল্পিতল্পা গুটিয়ে আর-কোথাও চম্পট দেবে। তাই শেষপর্যন্ত উনি ঠিক করলেন—এমন একটা সূত্র আমার হাতে গুঁজে দেবেন, যাতে করে ডাকাতগুলো ভেগে পড়লেও ফের তাদের টেনে বার করতে আমায় বেগ পেতে না হয়। ওঁর ছোট ক্যামেরাটা নিয়ে বাড়িটার আশপাশে পরদিন সমস্তক্ষণ উনি ঘুরে বেড়াবেন, যখনই ডাকাত-দলের কেউ কোনও দরকারে একবার বাড়ির বার হবে, অমনি লোকটার সম্পূর্ণ অজানতে তার চেহারা ক্যামেরায় তুলে ফেলবেন। মতলবটা মন্দ নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনওই কাজে এল না; ও-ব্যাটারা আসল ঘুঘু, লোকের চোখে ধুলো দেওয়াই হল ওদের ব্যবসা। সামান্য কারণে রাস্তায় বেরোবার দরকার হলেও চেহারা এমনি বদলে আসে যে, আসল চেহারা—যা আগের দিনে উনি দেখেছিলেন—তার সঙ্গে নকলের আর এতটুকু মিল থাকে না। আসল চেহারা যেটা, তার ফটো নেওয়ার সুযোগ আর মেলেই না। সলিলবাবু বুঝলেন, ফটো নিতে হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে ওঁকে এগুতে হবে—সে-পথ বড়ই মারাত্মক, বড়ই বিপজ্জনক, সে-পথে যেতে হলে মনে চাই দুরন্ত সাহস। ওঁকে তারিফ না করে পারছি না, কেননা এ-কাজটা উনি সমাধা করলেন বাস্তবিকই নিখুঁতভাবে।

'শ্মশানের চুল্লি থেকে আধ-পোড়া অবস্থায় উঠে এলে মানুষের মুখের চেহারা যেমন ধারা হয়, ঠিক সেই রকমের একটা মুখোস আর তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আরও দু-একটা সরঞ্জাম সেদিন বিকেলবেলাতেই সমস্ত টেরিটিবাজার আর মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ঘুরে-ঘুরে সলিলবাবু সংগ্রহ করে ফেলেন। আর সংগ্রহ করলেন একটা দড়ির মই। তার মাথার দিকে দুটো লোহার ডান্ডা এমনি গোলভাবে বাঁকানো রয়েছে যে, তাগ করে ছুঁড়ে ফেলতে পারলে কাঠের রেলিংয়ের ওপর সে-দুটো চমৎকার আটকে যায়; তখন খুব ভারি মানুষও যদি মই বেয়ে ওপরপানে উঠতে থাকে তা হলে হড়কে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। সমস্ত সাজ-সরঞ্জামে তৈরি হয়ে গভীর রাতে সলিলবাবু সুরযমল নগরচাঁদ লেনে এসে হাজির হলেন—কোমরে আঁটা ক্যামেরা, হাতে অসম্ভব পাওয়ারফুল টর্চ, যার আলোতে স্বাভাবিক মানুষের চোখ ধেঁধে যায়। ডাকাত-দলের খোদ আস্তানায় ঢুকে একেবারে খোলা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উনি তাদের স্বাভাবিক চেহারা ক্যামেরায় বন্দি করে নেবেন; তা ছাড়া আর কী উপায় আছে? যে-জায়গাটিতে আসা দরকার, দড়ির মইয়ের সাহায্যে ঠিক সেই জায়গায় এসে উনি উপস্থিত হলেন।

'মনস্তত্ত্বের ওপর সলিলবাবুর যে দস্তুরমতো অধিকার আছে এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। অত রাত্রে ডাকাত-দল যদি ঘুমিয়ে থেকে থাকে তবে ওঁর কাজটা অনেকখানিই সোজা হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু অতটা সৌভাগ্য বাস্তবিকই উনি প্রত্যাশা করেননি। কেউ-না-কেউ তাদের মধ্যে সতর্ক হয়ে জেগে থাকবে, এইটে ধরে নিয়েই উনি কাজে নেমেছিলেন, আর সেইজন্যেই নিজের তরফ থেকে ওঁর এতখানি সতর্কতা। মোটামুটি ওঁর কাজের প্রোগ্রামটা হল এইরকম—ভূতুড়ে মুখোস এঁটে, বীভৎস চেহারা নিয়ে জানালার পাশে এসে উনি দাঁড়াবেন; ভেতরে যারা জেগে আছে তারা আচমকা ও-মূর্তি দেখে ভয়ে শিউরে উঠবে; ঠিক সেই মুহূর্তে উনি একহাতে টিপে ধরবেন টর্চের

বোতাম, অন্য হাতে ক্যামেরার কল... ব্যস, ফটো উঠে যাবে। আপনারা হয়তো প্রশ্ন তুলবেন, ভূতের অস্তিত্বে সকলেই তো আর বিশ্বাস করে না—এমনও তো কেউ ওদের দলে থাকতে পারত যে মোটেই ভূত মানে না! সলিলবাবুর আবির্ভাবে ভয় না খেয়ে, পাল্টে সে যদি ওঁকেই আক্রমণ করে বসত? কিন্তু আগেই বলেছি, মনস্তত্ত্বে সলিলবাবুর সত্যিই দখল আছে। বাস্তবিকই যারা ভূত মানে না তারাও দুপুররাত্রে ও-রকমের মূর্তি দেখতে পেলে সাময়িকভাবে কিছু বিচলিত হয়ে পড়ে—অন্তত তক্ষুনি সিংহবিক্রমে তার উপর ঝাঁপিয়ে যে পড়ে না সেটা সত্যি। আসল বস্তুটা কী সেটা জানবার জন্যে তাদের ঔৎসুক্য হওয়া সম্ভব বটে, তবে তারা এগোয় আস্তে-আস্তে, চারদিককার আটঘাট বেঁধে, নিজেদের বাঁচিয়ে, তারপর। যেটুকু সময় তাতে যাওয়ার কথা, দড়ির মই বেয়ে নিচে নেমে সটকে পড়ার পক্ষে তা যে যথেষ্ট, সলিলবাবুর সে-কথা জানা ছিল। আর বাস্তবিক ঘটলও সত্যিই তা-ই।

'এইবারে সলিলবাবু ফটোখানা বেনামীতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন; একটা লোক বোধকরি জানলার কাছে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল, ফটোতে তার চেহারাটাই খুব স্পষ্ট উঠেছে, বাকি কয়েকজনের একটু ঝাপসা-ঝাপসা—তারা পেছনে রয়েছে। সেইসঙ্গে টাইপ-রাইটারে লেখা একটা চিঠিও ছিল—মিস্টার বাসুকে বাঁচিয়ে এই নতুন দস্যুদলের বিষয় যেটুকু খবর নির্ভয়ে দেওয়া চলত সেটুকু খবর ওই চিঠিতেই দেওয়া ছিল। ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না, আমাকে সত্যিই সাহায্য করবার জন্য এ-ব্যবস্থা করা হয়েছে, না কি উল্টে সম্পূর্ণ বিপথে চালাবার মতলবে। যাই হোক, সুরযমল নগরচাঁদ লেনের বাড়িটার ওপর একটু নজর রাখা দরকার মনে করলাম। সে-ভারটা আপাতত দেওয়া গেল রণজিৎবাবুর ওপরে। উনি সে-ঠিকানাটার কাছাকাছি যেতেই দেখতে পেলেন, ওরা কলকাতা ছেড়ে ভেগে পড়বার মতলব করছে—অবশ্যি ছদ্মবেশে। সঙ্গে-সঙ্গে উনিও ট্যাক্সি নিয়ে তাদের পিছু ধাওয়া করলেন। ওরা গিয়ে উঠল জগন্নাথ ঘাটে; সোজা রেলের পথে না পালিয়ে খানিকটা পথ স্টিমারে এগিয়ে পরে রেল ধরবে—এই মতলব।

পঁচিশ ঃ বিশ্লেষণ

'জগন্নাথ ঘাটে ঢুকে রণজিৎবাবু আড়ালে দাঁড়িয়ে লোকগুলোর টিকেট কেনা দেখতে লাগলেন; বুঝলেন, অন্তত হুগলি পর্যন্ত এই স্টিমারে এগোনোই ওদের মতলব। আরও বুঝলেন, ওদের সন্দেহ এড়াতে হলে জগন্নাথ ঘাটেই স্টিমারে ওঠাটা ওঁর উচিত হবে না, উচিত হবে হাওড়া থেকে ট্রেনে উত্তরপাড়া পর্যন্ত এগিয়ে, সেখানে এই স্টিমার ধরা। ই.আই.আর-এর টাইম-টেবল হাতে একজন ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে উনি জিজ্ঞাসা করে নিলেন উত্তরপাড়ার গাড়ি ক'টায়। প্রকাশ্যে ওই ধরনের প্রশ্নটা করাই হল ওঁর প্রথম ভুল, কেননা ওঁর অজান্তে ওটা গিয়ে এমন একজন লোকের কানে পৌঁছাল, যে নাকি শেষপর্যন্ত ওঁর সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার মূল হয়ে দাঁড়াল। অশনিকান্তের কথা বলছি।

'সলা-পরামর্শ আগে থেকেই সব ঠিক ছিল, অশনিকান্ত এসেছিল তাই বন্ধুদের নিজে উপস্থিত থেকে স্টিমারে তুলে দিতে—তারা কলকাতা ছেড়ে গেছে, নিজে চোখে এটা দেখে তবে সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়বে। হঠাৎ রণজিৎবাবুকে ওখানে দেখে আর তাঁর প্রশ্ন শুনে ওঁর আসল উদ্দেশ্য অশনিকান্তের চোখে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল—হাজার হোক, চালাক লোক তো! চুপিসাড়ে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে সে উপদেশ দিয়ে এল—তারা যেন পরের স্টেশনেই নেমে পড়ে, পিছনে ফেউ লেগেছে। তারপর স্টিমার বাঁশি বাজাতেই হাল্কা মনে সে বাইরে বেরিয়ে আসছিল, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তার পাপের প্রথম দফা প্রায়শ্চিত্ত জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সামনেই অপেক্ষা

করছে।

'আপনাদের বোধহয় আগেই এ-কথা বলেছি যে, অশনিকান্ত ছাড়া মিস্টার বাসুর অন্তরঙ্গদের ভেতর আরও জনা দু-তিন অল্পবয়সী ছোকরা ছিল, আর তারাও সকলেই ডায়মন্ড কর্পোরেশনের চাঁই মেম্বার। সোনার হরিণ লুঠ হয়ে যাবার পর আগাগোড়া তারা অশনিকান্তের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখল—নিশ্চয়ই এর ভেতরে তার কোনও ছলাকলা রয়েছে! সে-ই তো একটা ছুতো করে সবাইকে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে লুঠের পথ সহজ করে দিয়েছে! অশনিকান্তের পরের ব্যবহারও নিশ্চয়ই তাদের চোখে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। একে গরম রক্ত, তার ওপর আশাভঙ্গ, প্রতিশোধ নেবার সুযোগে রইল তারা। কী উদ্দেশ্যে তা অবশ্য আঁচতে পারেনি, তবে জগন্নাথ ঘাটে অশনিকান্ত যে সেদিন সকালবেলায় গেছে, সেটা তারা বার করে ফেললে। ব্যস, তারপর অশনিকান্তও ফটক থেকে বার হয়েছে, তারাও হান্টার দিয়ে তাকে চাবকে লাল করে দিল।

'এদিকে রণজিৎবাবু তো উত্তরপাড়ার ঘাট থেকে স্টিমারে উঠেই একদম বেকুব—বাবাজিদের চিহ্নমাত্র নেই। পরের সব ঘটনা খুঁটিয়ে বলবার দরকার নেই, আপনাদের বোঝবার পক্ষে শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে উনি যখন কলকাতায় ফিরে আসবার উদ্যোগ করছিলেন হঠাৎ তখন প্ল্যাটফর্মের ওপরেই অপ্রত্যাশিতভাবে রামদয়ালের দেখা পেয়ে গেলেন। ইনিই যে সেই স্টিমার থেকে অদৃশ্য-হওয়া বাবাজিটি তা অবশ্য রণজিৎবাবু বুঝতে পারেননি, কেননা স্টিমারে ওঠার সময় ছিল তার ছদ্মবেশ, আর এখন ফুটে উঠেছে একেবারে আদি অকৃত্রিম চেহারা! ট্রেনের ভেতরেই এ-রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু তবুও যে রণজিৎবাবু প্রতারিত হলেন না, সেই গাড়িতেই তাকে অনুসরণ করলেন, তার কারণ হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফখানা। সলিলবাবুর তোলা মূল ফটোটা ওঁর হাতে দিইনি, সেটা আমার কাছে এখনও রয়েছে; পেছনের লোকগুলোর চেহারা তাতে খুব ঝাপসা রকমের উঠেছিল, তা থেকে জীবন্ত মানুষের সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না। স্পষ্ট উঠেছিল শুধু রামদয়ালেরই চেহারাটা, তাই আমি আমার নিজস্ব ডার্করুমে বসে রামদয়ালের চেহারাটাই এনলার্জ করে নিয়েছিলাম, অন্য চেহারাগুলো একদম উড়িয়ে দিয়ে। রণজিৎবাবুকে সুরযমল নগরচাঁদ লেনে পাঠাবার সময় এই দ্বিতীয় ফটোখানা তাঁর হাতে গুঁজে দিয়েছিলাম, বলেছিলাম ফটোর লোকটার উপর একটু বেশিরকম নজর রাখতে। তাই ব্যান্ডলে এসে প্রথম সেই মূর্তির দর্শন পেয়েই উনি অতটা সচকিত হয়ে উঠেছিলেন।

'গাড়িতে কী-কী ঘটনা ঘটেছিল এবং শেষপর্যন্ত কাশী এসে গুণ্ডার দল নানান রকমে রণজিৎবাবুকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে শেষটায় কীভাবে একদিন বাগে পেয়ে বন্দি করে ফেলল সে-সবের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে কথা বাড়াতে চাইনে, তবে এটুকু জানবেন যে, ট্রেনের ভেতর কিন্তু ওঁর ওপর রামদয়ালের কোনও সন্দেহ হয়নি, হয়েছিল ওঁরই কামরার আর-একজন যাত্রীর ওপর; তিনি সলিলবাবুদেরই ভাগনে। দুপুররাত্রে গাড়িতে ঢুকে রামদয়াল তাকেই চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দেয়, অথচ রণজিৎবাবুকে ঘুমন্ত পেয়েও ওঁর কোনও অনিষ্ট করেনি!'

সকলে অভিভূত হইয়া হুকা-কাশির এই চমকপ্রদ বর্ণনাগুলি গোগ্রাসে গিলিতেছিল, হঠাৎ সন্তোষ কথার মধ্যেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, 'মাফ করবেন, মিস্টার হুকা-কাশি, একটা প্রশ্ন না করে থাকতে পারছি না। এ-সমস্ত জটিল তথ্যগুলি কি আপনি শুধু বিশ্লেষণ করেই বার করে ফেলেছেন? এ যে জ্যোতিষীদেরও ক্ষমতার বাইরে!'

হুকা-কাশি হাসিলেন, কহিলেন, 'আগেই তো আপনাকে বলেছি, এ ঠিক অঙ্ক কষার মতো; নির্ভুলভাবে ধাপে-ধাপে অঙ্ক করে যেতে পারলে শেষপর্যন্ত ফল আপনার মিলবেই। রহস্যের সাড়ে পনেরো আনা সন্ধান সেইভাবেই আমি পেয়েছি, খুঁটিনাটি সামান্য যেটুকু জানবার ছিল কাল রাত্রে সলিলবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সম্পূর্ণ গল্পটি তৈরি হয়ে গেছে। শুধু এইজন্যেই নৌকোর ভেতর আমি আমার বক্তব্য শেষ করিনি, সলিলবাবুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কীভাবে একটু-একটু করে

ধীরে-ধীরে গোটা রহস্যটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল তা জানতে আপনাদের যদি কৌতূহল হয়ে থাকে তবে তা মেটাতে এখন আর কোনও বাধা নেই। শুনুন—

'প্রথমে খবর পেলাম, দ্বারিকবাবুর সই-করা একখানা চিঠি দেখিয়ে অহিভূষণ চৌধুরী অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর কাছ থেকে সোনার হরিণ সরিয়ে নিয়ে গেছে—অথচ দ্বারিকবাবু দৃঢ়স্বরে বলছেন তিনি কখনওই ও-চিঠিতে সই দেননি। হস্তাক্ষর-বিশেষজ্ঞ দুর্গাপ্রসন্নবাবু কিন্তু আবার তেমনি দৃঢ়স্বরেই বলছেন যে, ও-সই জাল নয়, নির্ঘাত দ্বারিকবাবুরই হাতের অক্ষর। তবে এ-ব্যাপারের মানে কী? এ-কথা আমায় আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দ্বারিকবাবু সম্প্রতি চোখের অসুখে বড়ই ভুগছেন, দৃষ্টিশক্তি বেজায় কমে এসেছে। তবে কি তাঁর ক্ষীণদৃষ্টির সুযোগ নিয়েই অহিভূষণ চৌধুরী কোনও চাতুরী খেলল না কি? আপনারাই বলুন, ঠিক এই ধরনেরই একটা সন্দেহ সকলের মনে আসা উচিত ছিল কি না, আশ্চর্যের বিষয় কারও মনেই তা আসেনি। টাইপ-করা চিঠিখানা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের নিচে ফেলতেই দেখলাম, যা ভাবা গেছে অবিকল তা-ই। বিশেষজ্ঞরা নিজেদের বিষয়টা বেশ ভালো বোঝেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে একটু বিশেষ অজ্ঞই থেকে যান। দুর্গাপ্রসন্নবাবু যদি সইটা নিয়েই উঠে পড়ে না লেগে সই-এর ওপরেও একটু দৃষ্টি দিতেন তবে তাঁর ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস নিশ্চয়ই তাঁকে দেখিয়ে দিত যে, সেখানে পাশাপাশি সমস্ত কাগজটা ব্যেপে বেশ একটা অস্পষ্ট দাগের ছাপ রয়ে গেছে। খালি চোখে কিছুই নজরে আসে না সত্যি, কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ইরেজার দিয়ে কী একটা জিনিস আগাগোড়া ঘষে তুলবার চেষ্টা হয়েছে। চিঠির রহস্য তখন ভেদ হয়ে গেল—অহিভূষণ চৌধুরী নিশ্চয়ই কাগজে চিঠিখানা টাইপ করে, লম্বায় ছোট অথচ চওড়ায় ঠিক ওই মাপেরই আর একখানা কাগজ হাল্কা আঠায় তার ওপর জুড়ে দিয়েছিল—প্রথম চিঠির নিচের অংশ বাইরে রেখে। দ্বিতীয় চিঠিখানায় লেখা হয়েছিল ব্যবসা-সংক্রান্ত অন্যান্য সব কথা—দ্বারিকবাবু সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিচে সই করেছেন, আর সে-সই পড়েছে গিয়ে প্রথম চিঠির ওপর। তাই দেখিয়ে অহিভূষণ সোনার হরিণ আদায় করে নিয়েছে। এ ছাড়া আর কী অর্থ হতে পারে ও-দাগটার আমায় আপনারা বুঝিয়ে দিন।

'তারপর অহিভূষণ চৌধুরীর অন্তর্ধানের কথা। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে অনেকেরই ধারণা, ঘরে বসে কাজ করতে-করতে সে হঠাৎ কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেননা তার টেবিলের খোলা খাতা, কাগজ-পত্র, লাল-নীল পেন্সিল সমস্তই পড়ে রয়েছিল। কলকাতা ফেরবার সময় ওগুলো রোজই সে ড্রয়ারে বন্ধ করে যেত। সেদিন দিনের শেষে সে বাড়ি ফিরে যাবার পর কই ওগুলো তো কেউ টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেনি! তবে পরদিন সে কাজে বাস্তবিক না এসে থাকলে ড্রয়ার থেকে ওগুলো কে বার করলে? তার ড্রয়ারের চাবি তো আর অপর কারও কাছেই থাকে না! কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, পরের দিন সে আদপেই দ্বারিকবাবুর বাড়ি আসেনি, শুধু তার অন্তর্ধান সম্বন্ধে লোকের মনে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যে ধারণা জন্মিয়ে তাদের ভুল পথে চালানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক অহিভূষণ সেদিন সকালে এসেছিল, কি আসেনি, তা কিন্তু অতি সহজেই পরখ করা চলতে পারে। আসলে না-এসেও লোকের চোখে ধুলো দিতে হলে তার পক্ষে সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিল একটি; আগের দিনে বাড়ি ফেরবার সময় জরুরি খাতা-পত্তরগুলি খোলা-অবস্থায় টেবিলের ওপর রেখে, টেবিলটাকে একটা গাঢ় রঙের চাদরে ঢেকে রেখে যাওয়া! তার ঘরখানি এমন জায়গায় যে-দুপুরের খটখটে রোদেও সেখানে যেন একটু অন্ধকার-অন্ধকার ভাব লেগেই আছে, বেলার শেষে তো কথাই নেই। এ-অবস্থায় বেলা পড়ে এলে ঘোর রঙের একখানা চাদরে যদি টেবিলের ওপরকার খোলা খাতা-পত্তরগুলো ঢেকে রেখে যাওয়া যায়, তবে কারওরই নজর সেদিকে পড়বার কথা নয়। যে-চাকরটা সে-ঘর পরিষ্কার করে, যাবার সময় তাকে বলে গেলেই হল যে, সকালবেলা এসেই চারদখানা সে যেন সরিয়ে নিয়ে যায়। অবশ্য এ ছাড়া আরও একটা পন্থা যে ছিল না, তা নয়। চাকরটাকে কিছু বখশিশ করলে তারই হাতে ড্রয়ারের চাবিটা সে রেখে যেতে পারত, বন্দোবস্তটা

হতো এই যে, সকালবেলা এসে ড্রয়ার খুলে খাতা-পত্তরগুলো সে-ই টেবিলে ওপর খুলে রেখে দেবে। কিন্তু শেষের চাইতে আগের মতলবটাই যে বেশি সোজা তা বোধহয় আপনারা স্বীকার করবেন। চাকরটার হাতে "পান খেতে" আনা-চারি পয়সা দিয়ে আমি যদি বলি, "ওরে, কাল আমার আসতে একটু দেরি হতে পারে, আর সবাই কিছু টের পাবার আগে তুই টেবিলের ওপরকার এই চাদরটা সরিয়ে নিয়ে যাস তো!" তা হলে তার মনে গুরুতর রকমের কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়— বড়জোর ভাববে, কর্তা কড়া লোক, বাবু দেরি করে এসেছেন শুনলে হয়তো রাগ করবেন, তাই তাকে ও-কাজ করতে বলা হচ্ছে, যাতে সবাই বুঝতে পারে তিনি সময়মতো এসেই কাজে বসেছিলেন, হঠাৎ কোথায় উঠে গেছেন। কিন্তু তার হাতে জরুরি দলিল-পত্রের চাবি দিয়ে গেলে স্বভাবতই মনে তার বিশ্রী রকমের সন্দেহ এসে যাবে, হয়তো ভবিষ্যতে বিপদে পড়বার ভয়ে চাবি নিতেই সে রাজি হবে না, উল্টে পাঁচজনের কাছে তার সন্দেহের কথা প্রকাশ করে দেবে। আর তা ছাড়া কর্তার গোপনীয় কাগজপত্র যে-ড্রয়ারে রয়েছে তার তালায় সে চাবি লাগাতেই বা যাবে কোন ভরসায়, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলে যে একদম শ্রীঘর-বাস। অহিভূষণ চৌধুরী তখন তার হয়ে সাক্ষী দিতে আসবে নাকি? রামচন্দ্রঃ!

'এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে ঠিক করলাম, আমার এ-অনুমান ঠিক কি না গোড়াতেই সেটা পরখ করে দেখতে হবে: অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে অন্ধকারের ভেতর অনেকটাই আলোর রেখা যে ফুটে উঠবে তা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। অনুমান মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হলে, অবশ্য অন্য পথে এগোনো দরকার হয়ে পড়বে।

'যে-ঘরটায় বসে কাজ করতে-করতে অহিভূষণ চৌধুরী নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে বলে প্রকাশ, আমরা তখন সেই ঘরটাতেই দাঁড়িয়ে—আমি, রণজিৎবাবু, দ্বারিকবাবু আর আপনি সন্তোষবাবু, মনে পড়ে? হঠাৎ দ্বারিকবাবু এমন একটা প্রশ্ন করে বসলেন যাতে আমার কাজ অর্ধেক এগিয়ে গেল। ক'দিন ধরে ঘরটায় ঝাট পড়েনি, মেঝেতে তাই বেজায় ধুলো জমে রয়েছিল, তিনি রাগত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ-ঘর পরিষ্কারের জিম্মা কার ওপর?" জবাব পেলেন—চাকর কালীচরণের ওপর। ক্রুদ্ধস্বরে তিনি বলে উঠলেন, "ডাক সে-হতভাগাকে আমার আছে।"

'দূর থেকে কালীচরণকে আসতে দেখেই আমি মনে-মনে আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম— লোকটাকে ভাববার জন্য একটুও সময় দেওয়া হবে না; কাছে আসতেই এমনি দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করে বসব যাতে সে মনে-মনে বুঝতে পারে আমি সবকথা আগাগোড়া জানি, আমার কাছে কোনও জিনিস চেপে রেখে ফল হবে না। সে ঘরে ঢুকতেই তীব্রভাবে তার মুখের পানে তাকিয়েই একেবারে সোজা প্রশ্ন করে বসলাম, "কোথায় রেখেছ সে-চাদরটা?" কালীচরণ থতমত খেয়ে গেল, কিছুই অস্বীকার করতে সাহস পেলে না, বললে, "আছে, আমারই ঘরে।" যাক, আমার অনুমান তা হলে মিথ্যে হয়নি, অঙ্ক শুদ্ধ হয়েছে, ফল মিলে গেছে; তাকে বললাম, "যাও সেটা নিয়ে এসো গে।" আসলে কিন্তু চাদরটার চেহারা দেখবার জন্যই যে আমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠেছিল, তা নয়; অন্য মতলব ছিল। তাকে সকলের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে আরও গুটিকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার ছিল। চাদর আনবার জন্য যেই সে বাইরে এসেছে অমনি আমিও তার পিছু-পিছু এসে প্রশ্ন করলাম, "সেদিন অহিভূষণবাবু তাঁর টেবিলের নিচে কতকগুলি ছেঁড়া কাগজ দেখিয়ে বলেছিলেন, এগুলো খবরদার ফেলে দিয়ো না, এই ঘরের দরজায় জমা করে রেখো, কেমন ঠিক নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ বাবুমশাই।"

"আর সেই ছেঁড়া কাগজের জঞ্জালের ভেতর একটা মুখ-খোলা আস্ত খামও ছিল, কেমন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাও ছিল, মনে পড়ছে।"

'ব্যস, আরও খানিকটা আলোর সন্ধান পাওয়া গেল, অহিভূষণের চরিত্র সম্পূর্ণ বোঝা গেল। কেউ তাকে শাসিয়ে কোনও চিঠিই লেখেনি, সে নিজেই দ্বারিকবাবুর মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে, সোনার

হরিণ গাপ করেছে; তারপর যাতে কাল্পনিক একটা দলের ওপর সকলের সন্দেহ পড়ে সেই মতলবে ওই ভয়-দেখানো চিঠিখানা লিখে সেটাকে এমন জায়গায় রাখবার বন্দোবস্ত করে গেছে যাতে তার খোঁজ করতে গেলেই চিঠিখানা নজরে আসে। নতুবা শুনেছেন কখনও যে, ও রকম চিঠি মানুষ অত তাচ্ছিল্য করে ফেলে দেয়? ঘরের দোরে পাওয়া গেছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে ওটা ইচ্ছাকৃত।

ছাব্বিশ ঃ টাইপ-রাইটার যন্ত্র

'শ্রীপুরে অহিভূষণ চৌধুরীর কর্মস্থল ছিল দুটি, প্রথম—দ্বারিকবাবুর সেই বিশেষ ঘরখানা, দ্বিতীয়—চিনির কারখানা। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে যা কিছু দেখবার সমস্তই দেখা হয়ে গেছল, কাজেই দিন দুই পরে রণজিৎবাবুকে সঙ্গে করে একদিন চিনির কারখানায় এসে উপস্থিত হওয়া গেল।

'আপনাদের বোধকরি মনে আছে, সে-সময়টাতে কারখানার সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে যেখানে যা কিছু খুঁটিনাটি জিনিসপত্তর পাওয়া যায় সবই এনে অফিসের টেবিলটার ওপর জমা করা হচ্ছিল। হঠাৎ সেই 'মিউজিয়ামের' স্তূপে একটা আশ্চর্য বস্তু লক্ষ করলাম—সবুজ রঙের বাঁধানো একটা একসারসাইজ বুক, কিন্তু অর্ধেকটা তার আগুনে পুড়ে গেছে। খুলে দেখি, ফার্স্টবুক-পড়া এক কচিছেলের হাতের লেখার খাতা ওখানা, শুনলাম পাওয়া গেছে অহিভূষণ চৌধুরীরই বসবার ঘরের কাছে একটা উনোনের ভেতর। ভালো করে খানিকক্ষণ লেখাগুলোর ওপর তাকিয়ে থাকতেই চোখ আমার খুলে গেল। এ তো ছোটছেলের লেখা নয়, দস্তুরমতো ইংরেজি-জানা কোনও বয়স্ক লোকের হাতের অক্ষর! ছোটছেলেরা যখন প্রথম লিখতে শেখে তখন তাদের হাতের অক্ষর থাকে গোটা গোটা, লেখার প্যাঁচ আয়ত্ত করা তখন তাদের একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ-লেখা কাঁচা হাতের হলেও মাঝে-মাঝে অভিজ্ঞ লোকের লেখার মতো প্যাঁচ রয়েছে এতে। ছোটহাতের "d" গুলোর সামনের দিকটা কোথাও লেজের মতো নিচের দিকে নেমে আসেনি, বরাবর টিকির মতো মাথার দিকে উঠে গেছে। ছেলেরা ওভাবে "ডি" লেখে না! কথার মাঝখানকার "e" গুলো দেখলাম অনেক জায়গাতেই বড় হাতের—ও-অভ্যাসও বয়স্কদের মধ্যেই দেখা যায়, ছেলেদের ভেতর কক্ষনও না! বড়দের মধ্যে অনেকে ক্যাপিটাল "M" প্রায় লেখেই না, ফুলস্টপের পরেও ছোট হাতের "m" লেখাই তাদের অভ্যাস। এ-লেখাতেও তাই রয়েছে—ফুলস্টপের পর সব অক্ষরই ক্যাপিটাল, কিন্তু "m" গুলো আগাগোড়া ছোট হাতের। কচিছেলেরা অতশত জানে কি? আরও একটা বিশেষ লক্ষ করবার জিনিস এই যে, প্রথম পৃষ্ঠার লেখায় আর শেষ পৃষ্ঠার লেখায় একেবারে আকাশ-পাতাল তফাত; খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা দস্তুরমতো পেকে এসেছে। ছেলেদের লেখা পাকতে ঢের বেশি দেরি হয়; ওটা কতকটা নির্ভর করে ইংরাজি-জ্ঞানের ওপর কি না!

'ব্যাপারটা তখন অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে এল—একজন বয়স্ক লোক চুপিচুপি কারখানায় বসে বাঁ-হাতে লেখা অভ্যাস করছিল; তারপর লেখা অনেকটা রপ্ত হয়ে এসেছে দেখে খাতাখানা নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত উনোনে সেটা ফেলে দেয়। কিন্তু কে এ-লোকটি? অহিভূষণ চৌধুরী নয় তো? গোটা কারখানার ভেতর শুধু তারই একখানা একলার নিজস্ব বসবার ঘর আছে, কাজেই কারখানার ভেতর বসে গোপনে কোনও কাজ করবার সুযোগ তারই সবচাইতে বেশি। আর তা ছাড়া অন্য সবাই শ্রীপুরেরই লোক, গোপনে লেখা পাকাতে হলে তাদের নিজেদের বাড়ি আছে, সকাল-সন্ধ্যা আছে—সেসবের সুযোগ না নিয়ে কারখানায় তারা মরতে আসবে কী জন্য? কেবল 'অহিভূষণ'ই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, কলকাতায় ফেরে রাত দশটা সাড়ে দশটায়, আবার সকাল হতে-না-হতেই বেরিয়ে পড়ে। কলকাতার মেসের বাসায় তার অবসর কোথা?

'অহিভূষণ বেশিদিন হল দ্বারিকবাবুর কাজে ঢোকেনি; যদি হাতের লেখার মন্ত্র বাস্তবিক সে-ই করে থাকে, তবে খুব সম্ভব তার মতলব ছিল এখানকার লেখাপড়ার সমস্ত কাজ সে বাঁ হাতেই চালাবে। তাই যদি হয় তবে যতদিন না লেখা বেশ রপ্ত হয়ে এসেছে, ততদিন সে নিশ্চয়ই টাইপ-রাইটারের সাহায্যেই কাজকর্ম চালিয়ে এসেছে—আজকাল এ-অভ্যাস অনেকের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আশ্চর্য হবার কিছুই নাই এতে। তা হলে টাইপ-রাইটারের ফিতে অবশ্যই তাকে একটু বেশি-বেশি পাল্টাতে হয়েছে, কেননা অফিসের কাজকর্ম তো বড় কম নয়! সত্যিই তাই কি না সেটা ঠিক সোজা আপনাদের জিজ্ঞাসা না করে মনিহারী জিনিসের হিসাবটা একবার দেখতে চাইলাম। যা ভাবা তা-ই, টাইপ-রাইট্যারের ফিতে সত্যিই খুব ঘন-ঘন এসেছে দেখা গেল। অঙ্ক আবার শুদ্ধ হয়েছে।

'এবার মনে প্রশ্ন জাগল—হঠাৎ অহিভূষণের বাঁ-হাতে লেখার বাতিক মাথায় ঢুকল কেন? ডান হাতে লেখায় ক্ষতি ছিল কি? ডান হাতে লিখলে পরিচিত লোকে চিনে ফেলবে, এই ভয়েই তো লোকে বাঁ-হাতে লেখে জানি! তবে কি অহিভূষণের ডান হাতের লেখা আপনাদের সকলেরই পরিচিত? অহিভূষণ চৌধুরী কি তবে দ্বারিকবাবুরই পূর্ব-পরিচিত কোনও লোক—নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে নতুন সেক্রেটারি সেজে বসেছে? হু-হু করে নতুন ধরনের এক চিন্তা মাথায় এসে ঢুকল। দ্বারিকবাবুর বাড়িতে অহিভূষণের ঘরখানার কথা মনে পড়ে গেল; অন্ধকার ঘর, তার ওপর লোকজনের যাতায়াত সেদিকে নেই বললেই চলে। হ্যাঁ, ছদ্মবেশধারীর পক্ষে এই ধরনের ঘরই যে খুব প্রিয় হবে তাতে আর কথা কী! শুনেছি, লোকজনের সঙ্গ সে আদৌ পছন্দ করত না; কি দ্বারিকবাবুর বাড়িতে, কি কারখানায়, নিজের ঘরটিতে নিরিবিলি আপনার মনে কাজ করে চলে যেত। চেনা লোকের ভেতর যে আসল পরিচয় গোপন রাখতে চায় তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এটা বরং এর উল্টো হলেই আশ্চর্য হবার কথা ছিল। ট্যারা চোখের ছুতো নিয়ে আসল দৃষ্টি লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাও লোকের মনে ওই একই সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। একটা-একটা করে সমস্ত লক্ষণই হুবহু মিলে গেল; মনে মনে স্থির বুঝলাম, "অহিভূষণ চৌধুরী" বলে কোনও লোকই কোনও জন্মে ছিল না, ওটা শুধু একটা বানানো ছদ্মনাম। দ্বারিকবাবুর এবং আপনাদেরই চেনা কোনও লোক ওঁর মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার কুমতলবে ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে, সেক্রেটারি হয়ে আপনাদের পরিবারের ঢুকেছিল, কাজ হাসিল করে এখন সটকে পড়েছে। নকল চেহারা ছেড়ে দিয়ে এখন সে ধরেছে তার আসল মূর্তি—মর সবাই এখন সেই মিথ্যে লোকের, আর তার চাইতেও মিথ্যে "চক্রান্তকারী"-দের পেছনে ঘুরে!

'কে এই পরিচিত লোকটি? বড়ই জটিল, দুরূহ প্রশ্ন—কোনওমতে কোনওদিকে ধরা-ছোঁয়া দেবার এতটুকু ফাঁক সে রেখে যায়নি।

'দিন দুই পরের ঘটনা। "অহিভূষণ" যে বাজে চিঠিখানা অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুকে দেখিয়ে সোনার হরিণ ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সেইটে দুর্গাপ্রসন্নবাবুকে ফেরত পাঠাব; কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় অমৃত এসে লেফাফায় মোড়া একখানা ডাকের চিঠি দিয়ে গেল। খাম খুলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম—অদ্ভুত একটা বেনামী চিঠি! তাতে লেখা আছে—

"সোনার হরিণ যারা সরিয়ে নিয়েছিল তাদের কাছে ও-বস্তুটি আর নেই। একদল গুণ্ডা গায়ের জোরে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। গভীর রাত্রে ভূতুড়ে মুখোশ পরে কোনও লোক তাদের—নং সুরযমল নগরচাঁদ লেনের আস্তানায় হাজির হয়ে ফ্ল্যাশ লাইটে সেই দস্যুদের একখানা ফটো তুলে এনেছিল; সেটা সে এইসঙ্গে আপনার কাছে পাঠাল—এই ভরসায় যে, হয়তো আপনার দিক থেকে সোনার হরিণ উদ্ধারের কিছু সাহায্য তাতে হতে পারে। ইতি..."

'সে ফটোখানাও চিঠির সঙ্গেই এসেছিল। চিঠিটা যে শুধু বেনামী তা-ই নয়, লেখকের হাতের অক্ষর পর্যন্ত তাতে দেওয়া নেই, আগাগোড়া ইংরেজি টাইপ-রাইটারে লেখা। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলাম; হঠাৎ মনে হল, ধীরে-ধীরে চোখের সামনে একটা কালো পর্দা যেন সরে যাচ্ছে, পরিষ্কার আলোর রেখা ফুটে বার হচ্ছে। এ-কথা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কোনও টাইপ-রাইটার যন্ত্র পুরোনো হলে তার সবগুলো হরফ আর কিছু একই রকমের থাকে না। কোনও কোনও অক্ষরের ওপর বেশি চাপ পড়ায় সেগুলোর একটা ধার হয় একটু বেশি ক্ষয়ে আসে, নয়তো বা ভেঙে যায়; কাজেই সেই-সেই অক্ষরের ছাপ কাগজের ওপর ওঠে আর-আর অক্ষরের চাইতে একটু বেশি অস্পষ্ট ভাবে। এইরকম একটা পুরোনো যন্ত্রের সাহায্যে প্রায় একই সময় যতগুলি চিঠি লেখা হবে তার সবগুলোতেই "দাগী" অক্ষরগুলোর ছাপ একই রকম ভাবে উঠবে—এতটুকু ইতর-বিশেষ হবে না। একটু আগেই আমি দেখছিলাম অ্যাটর্নি অবিনাশবাবুর কাছে পেশ করা "অহিভূষণের" চিঠিখানা, আর তার অব্যবহিত পরেই এল এই নতুন চিঠি। অবাক হয়ে দেখলাম, আগের চিঠিখানার যে-যে অক্ষরে ঠিক যে-যে রকম খুঁৎ, শেষেরখানায়ও সেই-সেই অক্ষরে অবিকল সেই রকমেরই খুঁত—বিন্দুমাত্র তফাত নেই! মুহূর্তের মধ্যে বুঝে নিলাম, বেনামী চিঠির লেখক শ্রীপুরের চিনির কলেরই কোনও লোক, কেননা অফিসেরই টাইপ-রাইটার যন্ত্রে প্রথম চিঠিখানা লেখা হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে—দ্বিতীয়খানাও লেখা হয়েছে। কে এই বেনামী চিঠির লেখক সেইটে প্রথম খুঁজে বার করতে হবে—নিশ্চয় সে আসল ব্যাপারের কিছুটা রহস্য জানে!'

কথা কয়টি বলিতে-বলিতে হুকা-কাশি সলিলের দিকে তাকাইয়া একবার একটু মৃদু হাসিলেন, তারপর আবার বলিতে শুরু করিলেন, 'সেদিনই রওনা হয়ে পড়া গেল শ্রীপুরে, সোজা চিনির কারখানায়।...সেখানে বসে আপনাদের সঙ্গে কথা কইছি, হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে এমনি একটা ভাব প্রকাশ করলাম যেন আমার জরুরি একটা কিছু হারিয়ে গেছে। কী হারিয়েছে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেই জবাব দিলাম, "একটা ফটো, কিন্তু বড়ই দরকারী সেটা।" আসলে কিন্তু ফটোখানা মোটেই হারায়নি; দিব্যি বহাল তবিয়তে আমারই ডেস্কের ভেতর বিরাজ করছিল। আমার এ-লুকোচুরির মধ্যে একটা বড় রকমের উদ্দেশ্য ছিল; আমি জানতাম, যে-লোক ফটো পাঠিয়েছে, সে কারখানাতেই আছে। ফটো হারিয়েছে শুনে সে মোটেই খুশি হবে না, কেননা তার আন্তরিক ইচ্ছা ওটার ওপর নির্ভর করেই আমি সোনার হরিণের খোঁজে নেমে পড়ি। ফটো যখন সে তুলেছে তখন সে-ফটোর নেগেটিভ প্লেটখানাও অবশ্যই তার কাছে আছে। যখন সে দেখবে হারানো ফটো কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সেই প্লেট থেকে আর-একখানা ফটো তুলে সে-ই আবার আমার কাছে পাঠাবে, মুখে বলবে হারানো ছবিই খুঁজে পাওয়া গেছে। সঙ্গে-সঙ্গে আমিও টের পেয়ে যাব ফটোর মালিক কে, কে আমার বেনামী চিঠির লেখক!

'যে রকম ভেবেছিলাম, অবিকল তাই ঘটল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও যখন ফটো-উদ্ধার হল না, তখন আমি কলকাতায় রওনা হয়ে এলাম। আসবার সময়ে বলে এলাম, যদি কেউ ওখানা খুঁজে পায়, আমায় যেন পাঠিয়ে দেয়, কেননা ওটা আমার বড়ই দরকারী। বাড়ি ফিরতেই সলিলবাবুর টেলিফোন—জানালেন, ফটো উনি খুঁজে পেয়েছেন। আমি জানলাম সলিলবাবু আমার বেনামী চিঠির লেখক, রহস্যের খানিকটা সন্ধান তিনি রাখেন।'

সলিল লজ্জায় রাঙা হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'অতি কঠিন লোক আপনি।' হুকা-কাশি বলিলেন, 'হ্যাঁ; কিন্তু আপনার ওপর গোড়া থেকেই আমার একটু নজর ছিল, সলিলবাবু! কালীচরণকে যখন গোপনে প্রশ্ন করি তখন আপনাকে বড়ই উদ্বিগ্ন দেখেছিলাম, আবার যখন টাইপ-রাইটারের ফিতে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি তখনও আপনি অকারণেই ঘেমে উঠেছিলেন। এখন সে-সন্দেহটা বেশ দৃঢ় হল। হয় আপনি তথাকথিত অহিভূষণ চৌধুরীর সঙ্গে সাঁটে আছেন, আমাকে একটা বাজে চাল দিয়ে বিপথে চালাবার চেষ্টা পাচ্ছেন, আর নয়তো আপনি অহিভূষণের আসল পরিচয় জানেন, কিন্তু

তাকে ধরিয়ে দিতে চান না; শুধু সোনার হরিণটাই দ্বারিকবাবুকে ফিরিয়ে দিতে চান। নইলে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে দেখা না করে অমন উড়ো চিঠি দেওয়ার মানে কী? এখন কথা হচ্ছে, কোন অনুমানটা ঠিক? প্রথমটা না দ্বিতীয়টা? দ্বিতীয় অনুমানই যে ঠিক তা বোঝা গেল যখন দু-দিন পরেই টের পেলাম ফটোর লোকগুলি বাস্তবিকই বেপরোয়া দস্যু, রণজিৎবাবু যে সোনার হরিণ উদ্ধারে নেমেছেন তা তারা জানে; এবং সেইজন্য তাঁকে হত্যা করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

'ব্যাপারটা বোঝা গেল এইভাবে :

'সলিলবাবুর উড়ো চিঠি পেয়ে একখানা এনলার্জড ফটো হাতে রণজিৎবাবুকে আমি সূরযমল নগরচাঁদ লেনে ওই লোকগুলোর ওপর একটু নজর রাখতে পাঠিয়েছিলাম। তারপর আর রণজিৎবাবুর কোনও খোঁজ নেই। বড়ই ভাবনা হল, কিন্তু ক'দিন বাদেই ওঁর একখানা চিঠি পেলাম, বেনারস থেকে উনি লিখছেন। সেই চিঠির মধ্যে দরকারী যেসব খবর ছিল সেগুলো হচ্ছে এই—সূরযমল নগরচাঁদ লেনে উপস্থিত হতেই উনি দেখলেন বাড়ি খালি করে সে-বাড়ির লোকগুলো গাঁটরি-বোঁচকা নিয়ে সটকে পড়ছে; তারা জগন্নাথ ঘাটে পৌঁছে স্টিমারে হুগলির টিকেট করলে; অশনিকান্ত খুব ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাদের রওনা হয়ে যাওয়া দেখছিল; হাওড়া থেকে উত্তরপাড়ায় গাড়ি ক'টায় ছাড়বে এই প্রশ্ন প্রকাশ্যে রণজিৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন এক টাইম-টেবলওলা ভদ্রলোকের কাছে—অবশ্য ডাকুগুলো তখন দৃষ্টি-সীমানার বাইরে ছিল। জগন্নাথ ঘাটের বাইরে এসে উনি দেখলেন অশনিকান্ত রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, দুজন যুবক নাকি ফটকের বাইরে তাকে হান্টার-পেটা করে পালিয়েছে; উত্তরপাড়ায় স্টিমারে উঠে রণজিৎবাবু হতবুদ্ধি হলেন এই দেখে যে সব ক'টা ডাকু ইতিমধ্যেই কোথায় উধাও হয়ে গেছে; যে-লোকটার ফটো ওঁর হাত গুঁজে দিয়েছিলাম তার দেখা পেলেন রণজিৎবাবু ব্যান্ডেলে; ট্রেনের ভেতর লোকটা রণজিৎবাবুকে আদৌ চিনতে পারেনি; মোগলসরাইতে মাত্র ওঁরা দুজনই গাড়ির একটা কামরা দখল করে বসেছিলেন, অথচ রণজিৎবাবুর চেয়ে ঢের বেশি পালোয়ান হওয়া সত্ত্বেও সে ওঁর কোনও অনিষ্টের চেষ্টা করেনি—অনিষ্ট করা দূরে থাক চিনতেই পারেনি; কাশীর স্টেশনেও সেই অবস্থা; রণজিৎবাবু ওখানে গিয়ে হোটেলে ওঠার পরই কিন্তু ওরা ওঁকে চিনে ফেলে, গঙ্গায় বেড়াবার সময় ফাঁদ পেতে ডুবিয়ে মারবার চেষ্টা করে।

'চিঠি পড়েই অঙ্ক কষতে শুরু করলাম। ডাকুর দল জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎবাবুকে চিনতে পারেনি, উনি যে ওদের পিছু নিয়েছেন সে-খবরও তাদের অজানা, তবে তারা হুগলি পর্যন্ত যাওয়া ঠিক করা সত্ত্বেও মাত্র দু-এক স্টেশন এগিয়েই নেমে পড়ল কী জন্য? নিশ্চয়ই তবে ওদের হিতাকাঙ্ক্ষী কোনও লোক জগন্নাথ ঘাটে রণজিৎবাবুকে দেখতে পেয়ে ওদের গিয়ে জানিয়ে এসেছিল—'সাবধান! পিছনে ফেউ লেগেছে।" এ ছাড়া এ-ব্যাপারের আর কী সমাধান হতে পারে বলুন দেখি। তারপর কাশী পর্যন্ত ওরা রণজিৎবাবুকে চিনলে না, অথচ কাশী যাওয়ার পরই ওদের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল এই-বা কী করে সম্ভব হতে পারে? নিশ্চয়ই ওদের সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" ব্যক্তিটি সেদিনই অন্য কোনও দ্রুতগামী গাড়িতে কাশীর দিকে রওনা হয়ে পড়েছিল, রণজিৎবাবুকে বেনারসে দেখেই ওঁর অনুসরণ করেছে। হ্যাঁ, একটা কথা আপনাদের এখানে বলা দরকার; আমি জানতে পেরেছিলাম যে, সলিলবাবুর ভাগ্নে সম্পূর্ণ দৈবাৎ রণজিৎবাবুর সঙ্গে একই ট্রেনে যাচ্ছিলেন, ফটোয়-ধরা-পড়া গুণ্ডাটা তাঁকেই তার অনুসরণকারী মনে করে গভীর রাত্রে চলন্ত গাড়ি থেকে তাঁকে ফেলে দেয়। কাজেই লোকটার বরাবরই ধারণা ছিল—ফেউ যদি পিছনে কেউ লেগেই থাকে তো সে তাকে ইতিমধ্যেই নিপাত করে ফেলেছে। হঠাৎ তার সে ধারণা ওল্টাল কেন? এ-প্রশ্নের শুধু একই জবাব সম্ভব; নিশ্চয়ই সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" লোকটি কাশী গিয়ে উঠেছে, তারপর রণজিৎবাবুর অজান্তে ওঁর হোটেলে গিয়ে কৌশলে এই খবরটি সংগ্রহ করেছে যে, উনি ও-দিন দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় বেড়াতে যাবেন। ব্যস, দলকে গিয়ে খবরটি দেওয়া, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমৎকার একটি ফাঁদের পত্তন।

'এই "হিতাকাঙ্ক্ষী" লোকটি যে অশনিকান্ত মিত্র ছাড়া আর কেউ নয় সেটা বার করে

ফেললাম এইভাবে; জগন্নাথ ঘাটে ওই ডাকুগুলোর স্টিমারে চড়া শুধু পথচারী লোকের দৃষ্টি দিয়ে নয়, নিতান্ত উদ্‌গ্রীব ভাবে যে কেবলমাত্র সে-ই লক্ষ করছিল, সেটা রণজিৎবাবুরও চোখ এড়ায়নি, চিঠিতে স্পষ্ট উনি তা লিখেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, অনবরত সে নিজেকে গোপন রাখবার চেষ্টা করছিল, আশপাশে বারবার সন্দিগ্ধভাবে চাইছিল—এ-কথাও রণজিৎবাবু জানাতে ভোলেননি। রণজিৎবাবুকে নিশ্চয়ই সে চেনে—অনেকবার ক্যালকাটা গ্রাউন্ডে খেলতে দেখেছে; উনি আমার "জুড়িদার" তাও অজানা নেই, কেননা আমার ধারণা—কালীচরণের সঙ্গে আমি যখন কথা কই তখন অশনিকান্তকেই যেন শ্রীপুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। রণজিৎবাবু যখন উত্তরপাড়া যাওয়ার গাড়ি সম্বন্ধে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন অশনিকান্ত তখন ঠায় দাঁড়িয়ে তা শুনেছে, কিন্তু ঠিক তার পরের মুহূর্তেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে! তারপর যখন শুনলাম জগন্নাথ ঘাটের ফটকের সুমুখেই সে অকারণে হান্টার-পেটা হয়েছে তখন সব মিলে দস্তুরমতো একটা সন্দেহের ভাব তার বিরুদ্ধে জেগে উঠল। ব্যাপারটার একটু খোঁজ নিতে হচ্ছে। অশনিকান্ত বিখ্যাত সিনেমা-অভিনেতা, তার ওপর খবরের কাগজে পড়েছি কিছুদিন ধরে "ডায়মন্ড কর্পোরেশন" নামে একটা ফিল্ম কোম্পানি গড়ে তুলতেও সে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজেই এহেন লোকের বাড়ির ঠিকানা জোগাড় করতে বেগ পেতে হল না। ঠিকানা খুঁজে সে-বাড়িটায় গিয়ে উঠতেই তার বড়ছেলে নেমে এল, জিজ্ঞাসা করলে "কী চাই?" জবাব দিলাম, "অশনিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

"তিনি তো নেই, ক'দিন হল কলকাতায় বাইরে গেছেন!"

"কবে গেলেন?"

'যে-তারিখটার কথা শুনলাম, মনে-মনে মিলিয়ে দেখি সেদিনই জগন্নাথ ঘাটের কাণ্ডগুলো ঘটেছে!

'এবারে ছেলেটা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

'কপাল ঠুকে বলে দিলাম, "ডায়মন্ড করপোরেশন থেকে।"

'কথা ক'টা শোনবামাত্র ছেলেটির মুখের ভাব কেমন যেন হয়ে গেল; তাতে ভয়, রাগ দুটোই ছিল। হঠাৎ কয়েক পা পেছিয়ে সে একেবারে দেওয়ালের কোণটিতে চলে গেল; সেখানে ছিল একগাছা লাঠি ঠেসান দেওয়া, চেয়ে দেখি শক্ত মুঠোয় সে সেটা চেপে ধরেছে। তাকে আর না ঘাঁটিয়ে মনে-মনে হেসে আমি চলে এলাম। দুটো সমস্যারই তখন মীমাংসা হয়ে গেছে—প্রথম, অশনিকান্ত বাস্তবিকই সেই "হিতাকাঙ্ক্ষী" বন্ধু, ঘটনার দিনই সে কাশী রওনা হয়ে গেছে; দ্বিতীয়, যে-যুবক দুটি সেদিন তাকে হান্টার-পেটা করেছিল তারা ডায়মন্ড করপোরেশনের লোক। নইলে ও-নাম শুনেই ছেলেটার অমন পরিবর্তন দেখা গেল কেন?

সাতাশ ঃ বাসু কাত!

'বাড়ি ফিরেই মনে-মনে আমি আমার থিয়োরি খাড়া করে ফেললাম। সলিলবাবু তাঁর উড়ো চিঠিতে লিখেছিলেন—"সোনার হরিণ যারা ছিনিয়ে নিয়েছিল," "যে ছিনিয়ে নিয়েছিল" নয়। "যারা" শব্দটা বহুবচন, তার মানে দ্বারিকবাবুর মাথায় হাত বুলিয়েছে অহিভূষণ চৌধুরী একা নয়, জনাকয়েক একসঙ্গে জোট বেঁধে। তার মাথায় আবার হাত বুলালো রামদয়াল কোম্পানি। এর পরেই দেখতে পাচ্ছি, খুব চুপিচুপি সন্ত্রস্তভাবে রামদয়ালকে কলকাতা ছেড়ে পালাতে সাহায্য করছে অশনিকান্ত, আর অশনিকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—ডায়মন্ড কর্পোরেশনের মেম্বাররা—প্রতিহিংসা নিচ্ছে ওরই ওপর। তারপর যখন মনে পড়ল, সুদূর শ্রীপুর গাঁয়ে দ্বারিকবাবুর বাড়িতে কালীচরণকে নিরিবিলি প্রশ্ন করবার সময় এই অশনিকান্তকেই আনাচে-কানাচে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখেছি, তখন সে-ব্যাপারটাকে আর

"দৈবের ঘটনা" বলে ঠেলে ফেলতে পারলাম না। মনে-মনে বদ্ধ ধারণা জন্মাল যে, সলিলবাবুর "যারা" কথার অর্থ ডায়মন্ড কর্পোরেশনের সভ্যেরা, আর সেই সভ্যদের মধ্যে একজনা আমাদের তথাকথিত "অহিভূষণ চৌধুরী" আর-একজনা অশনিকান্ত মিত্র। অহিভূষণ বাটপাড়ি করে সোনার হরিণ জোগাড় করেছে, খুব সম্ভব ডায়মন্ড কর্পোরেশনটাকেই জাঁকিয়ে তোলবার জন্য, আর অশনিকান্ত লোভে পড়ে গুণ্ডার দল ডেকে এনেছে, মোটা নগদ টাকা ট্যাঁকে গুঁজবার উদ্দেশ্যে। এই ডায়মন্ড কর্পোরেশনের কতখানি রহস্য সলিলবাবুর জানা আছে সেটা বার করবার জন্য ওঁকে আরও একটু নাড়াচাড়া দেবার দরকার বোধ করলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল, রহস্য জানা তো দূরের কথা, ও-নামে যে একটা কারবার আছে তাই উনি জানেন না। আপনার মনে পড়ে সলিলবাবু, একদিন এনগেজমেন্ট করে সে-এনগেজমেন্ট আমি আর রাখিনি। আপনারই পাশে বসে এক পার্শী ব্যবসাদার তিতিবিরক্ত কণ্ঠে বারবার জানাচ্ছিল যে, হুকা-কাশির কথায় আর কাজে যে এমন গরিমল তা তার জানা ছিল না! তারপর আপনার সঙ্গে সে আলাপ শুরু করে দিলে। সে-পার্শী ব্যবসাদারটি কিন্তু স্বয়ং আমি-ই। আমায় মাফ করবেন, নিতান্ত দায়ে পড়েই এ-ছলনাটুকু আমায় করতে হয়েছিল—আপনার দাদার কার্যোদ্ধারের জন্য।

'ঠিক এই ঘটনারই আগের দিনে মিস্টার বাসু আমেরিকা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছেন, জানলাম। আমি গুণ্ডাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বেনারস রওনা হচ্ছি শুনে তিনিও আমার সঙ্গ নিতে চাইলেন, আর আমিও খুশি হয়েই তাতে রাজি হয়ে পড়লাম। তখন ওঁর সত্যিকার মতলব কিছুই টের পাইনি, বরং দাদার ওপর টান দেখে মনে-মনে তাঁকে প্রশংসাই করেছি। এখন অবশ্যি বুঝতে পারছি আসল উদ্দেশ্য ওঁর কী ছিল! অশনিকান্তকে যে অবস্থার ফেরে বেনারসে আসতে হবে তা তাঁর চিন্তায় আসেনি, ভেবেছিলেন অমন দামি জিনিসটা অ-দানে অ-ব্রাহ্মণে যায় কেন, তার চাইতে সেটার উদ্ধার করে দ্বারিকবাবুর হাতে তুলে দিতে পারলে আখেরে হয়তো কাজ দেবে। তার চাইতেও ওঁর বড় উদ্দেশ্য হল এই যে, পদে-পদে আমার প্রত্যেকটি কাজের ওপর খরদৃষ্টি রাখবেন আর নিজের কুকীর্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখলেই আড়াল থেকে সব ভেস্তে দেবেন।

'দুজনা কাশী এসে পৌঁছালাম। আমি জানতাম রণজিৎবাবুর ওপর যখন অশনিকান্তের দৃষ্টি পড়েছে তখন আমার সম্বন্ধেও সে আর উদাসীন নেই; নিশ্চয়ই আমার ওপরও কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা হবে—যাতে কোনওক্রমেই না আমি কাশী এসে পৌঁছাতে পারি। চালাকির আশ্রয় তাই আমাকেও নিতে হয়েছিল, কিন্তু কাশীর মাটিতে পা দিয়েই বুঝলাম সে-সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেছে; অর্থাৎ আমার আসবার কথা অশনিকান্তের কাছে আর চাপা নেই। শুধু তা-ই নয়, "সুমিত্র নিকেতন" নামে ভেলপুরার যে-বোর্ডিং হাউসটায় আমরা আস্তানা গাড়ব বলে ঠিক করে এসেছিলাম সেটাও তারা এঁচে ফেলল। প্রথম চোটেই ধাক্কা খেয়ে মনটা একটু খিঁচড়ে গেছল অস্বীকার করব না, কিন্তু তারপরেই ফের যে-ধাক্কা খেলাম তার তুলনায় আগের ওটা কিছুই নয়—নগণ্য বললেই চলে। রণজিৎবাবু নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফিরে আসেননি, কোথায় রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। এ-ব্যাপারের মূলেও যে অশনিকান্তেরই হাত তা আন্দাজ করতে অবশ্য দেরি হল না; চলে এলাম গোধূলিয়ার মোড়ের সেই হোটেলটাতে যেখানে রণজিৎবাবু প্রথম এসে উঠেছিলেন। ম্যানেজারের সঙ্গে দু-চার কথা কইতেই দেখি কিনা কলকাতায় বসে-বসে সমস্ত ব্যাপারটা আমি যেমন-ধারা এঁচেছি ঠিক তেমনিটিই ঘটেছে। সত্যিই রণজিৎবাবু ওখানে গিয়ে ওঠবার পর অশনিকান্তও নাকি এসে জোটে, তারপর কথার ফেরে ভালোমানুষ ম্যানেজারটির কাছ থেকে এই খবরটুকু সংগ্রহ করে নিয়ে যায় যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলাই উনি, মানে রণজিৎবাবু, দশাশ্বমেধ ঘাটে নৌকো ভাড়া করে জল-বেড়াতে বেরোবেন। অশনিকান্তের চেহারার একটু বর্ণনা দিতেই ম্যানেজার বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকমই বটে সে-লোকটা দেখতে।'

'হোটেলে আসবার সময় রাস্তার একটা ব্যাপার লক্ষ করেছিলাম, যেটা আমার কাজে লাগল ভালো; খুব ধুম-ধাড়াক্কা করে, বাজনা বাজিয়ে, বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন বিলি হচ্ছিল—"মেঘপুষ্প" নামে বাংলা ছবিখানা সেদিনই নাকি প্রথম কাশীতে দেখানো হবে। কিছুদিন আগে কলকাতায় ও-ছবিখানা আমি দেখেছিলাম—কী একটা ভূমিকায় যেন অশনিকান্ত ওতে নেমেছে। আজ সে কাশীতে সশরীরে উপস্থিত। কাজেই নিতান্ত অসুবিধা না ঘটলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে আর-একবার নিজের অভিনয় দেখতে সে বায়োস্কোপে উপস্থিত হবেই। হোটেল থেকে বেরিয়ে আমিও তাই রওনা দিলাম সেদিক পানেই। আধুনিক ভাষায় আপনারা যাকে "প্রেক্ষাগৃহ" বলেন তার ভেতরে ঢোকবার আর প্রয়োজন হল না, দেখা গেল, বাইরে দাঁড়িয়েই শ্রীমান অপর এক বন্ধুর সঙ্গে দিব্যি গল্পে মেতে গেছেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, তার এই প্রাণের বন্ধুটি রামদয়াল, যার ফটো আমায় নিজে হাতে এনলার্জ করতে হয়েছিল। বন্ধুযুগলের আলাপং কিঞ্চিৎ কানে এল—আমার আর মিস্টার বাসুর মধ্যে একজনকে তো তারা চেনে এবং যে-কোনও মুহূর্তে কাশী এসে পড়তে পারে প্রত্যাশাও করছিল, কিন্তু অপরজনা কে তাই নিয়েই গবেষণা চলছিল। তাড়াতাড়িতে তার মুখটা ভালো করে চিনে রাখা যায়নি বলে ওদের মনে দুঃখ হয়েছে, দেখলাম। রামদয়ালের কথায় আরও টের পাওয়া গেল যে, কাশীতে সে যজমানি ব্যবসা করে অর্থাৎ সোজা কথায় প্রকাশ্যে সে কাশীর পাণ্ডা।

'নাথনি নামে সুমিত্র নিকেতনের একটা চাকর রামদয়ালদের টাকা খেয়ে আমাদের ওপর বেজায় গোয়েন্দাগিরি শুরু করে দিয়েছিল। ব্যাটার টিকির গোছা মোটা হলেও বুদ্ধিটা যে সরু তা বলতেই হবে; একটা-না-একটা জিনিস সর্বদাই ওর হাতে থাকত, যাতে ধরা পড়লেই সেটা দেখিয়ে অনায়াসে বলতে পারে যে, আমাদেরই কোনও কাজে এদিকপানে এসেছিল। প্রথম যেদিন ধরা পড়ে, সেদিন ওর হাতে দেখলাম একটা জাঁতি-কল—বললে, ইঁদুর মারবার জন্যে ওটা না কি আমাদের ঘরে পাততে হবে। ও কিন্তু সেদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, জাঁতি-কলটা শেষপর্যন্ত ওর কোনও কাজে আসবে না, আসবে আমারই কাজে, আর তাতে ইঁদুর ধরা পড়বে না, ধরা পড়বেন সশরীরে মিস্টার বাসু। ঘটনাটা এবারে খুলে বলি শুনুন—

'রণজিৎবাবুর খোঁজে সেদিন আমি একটু সকাল-সকালই বেরিয়ে পড়েছিলাম, চা খাওয়া অবধি অপেক্ষা করিনি। পথে সেটা সেরে নেবার উদ্দেশ্যে এক চায়ের দোকানে ঢুকেই কিন্তু আমি একদম থমকে গেলাম—আমার ঠিক সুমুখেই রামদয়াল আর অশনিকান্ত হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসে আছে। আমার দিকে তারা একবার ক্ষণিক দৃষ্টিতে চাইল বটে, কিন্তু আলাপ বন্ধ হল না, নাথনি যে সে-রাত্তিরেই ওদের সঙ্গে দেখা করবে সেই কথাই বলাবলি করতে-করতে চা খেয়ে চলল। বুঝলাম, আমায় ওরা চিনতে পারেনি। অবশ্য স্বাভাবিক চেহারায় কাশীধামে আমি নামিনি, কিন্তু তা হলেই বা কী, স্টেশনে নামামাত্রই তো ওরা আমায় এঁচে ফেলেছে, সেই চেহারাই এখন ওদের ভুলে যাওয়ার হেতু কী? তবে কি অশনিকান্ত স্টেশনে আমায় সেদিন মোটেই চিনতে পারেনি, চিনেছিল মিস্টার বাসুকে? তাঁকেই ওদের প্রধান শত্রু বলে ঠাউরে নিয়েছে—আমার দিকে ততটা লক্ষ না রেখে? বায়োস্কোপে সেদিন এরা দুজন যে "অপর লোকটি" কে তাই নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছিল, আর তার চেহারাটা ভালো করে চিনে রাখা হয়নি বলে আফসোস করছিল—আমিই কি সেই "অপর লোকটি", বাসু নয়? নিশ্চয়ই তাই, নতুবা এ-ব্যাপারের যে আর অন্য কোনও মানেই হয় না!

'কিন্তু মিস্টার বাসুকেই বা অশনিকান্ত কীভাবে চিনতে পারে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। অশনি মিত্তির বেনারস রওনা হয়ে আসার দু-তিনদিন পরে উনি প্রথম দেশে ফেরেন, পুরো দশ-দশটি বৎসর আমেরিকায় কাটিয়ে। অথচ সেদিন বায়োস্কোপে ওদের কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি, তিনি যে-কোনও মুহূর্তে কাশী এসে পৌঁছোবেন বলে ওদের আতঙ্ক হচ্ছিল এবং কড়া পাহারারও বন্দোবস্ত হয়েছিল সেইজন্যেই। উনি যে কাশী আসবেন সে কথা আমি, সলিলবাবু আর সন্তোষবাবু ছাড়া আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। এত লোককে বাদ দিয়ে যার ওপর সন্দেহ হওয়ার

কথা কেউ ভাবতে পারে না, তার ওপর সন্দেহই বা হল কেন, আর স্টেশনে নামবামাত্র অশনিকান্তই বা তাকে চিনে ফেলল কীভাবে? তবে কি—তবে কি মিস্টার বাসু সবাইকে যা বলছেন তা ঠিক নয়, অর্থাৎ তাঁর লোক-দেখানো আসার তারিখটা প্রকৃত আসার তারিখ নয়, ওর ঢের আগেই গোপনে তিনি দেশে ফিরেছিলেন এবং ফেরার পরই অশনিকান্তের সঙ্গে কোনও সূত্রে ওঁর আলাপ ঘটে গেছল? এ ছাড়া এ-ব্যাপারের আর কোনও অর্থ করাই যে শক্ত! কিন্তু কেন? মিস্টার বাসুর এ-লুকোচুরি খেলার কারণ কী? সোনার হরিণ অথবা "অহিভূষণ চৌধুরী"-র সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই তো?

'মনের ভেতর এই ধরনের বিশ্রী একটা চিন্তা পুষে সুমিত্র নিকেতনে ফিরে এলাম। ঠিক তারপরেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল; মিস্টার বাসু নাথনির রেখে-যাওয়া জাঁতি-কলটা নিয়ে আনমনে নাড়াচাড়া করছিলেন, হঠাৎ ওঁর ডান হাতের তিনটে আঙুল কলের মধ্যে আটকে গেল—একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড! ঠিক সেই মুহূর্তেই আমারও মাথায় চমৎকার একটা মতলব ঢুকল; "অহিভূষণ চৌধুরী" বাঁ-হাতে লিখে-লিখে বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছিল, মিস্টার বাসু বাঁ-হাতে লিখতে পোক্ত কি না একবার পরীক্ষা করতে ক্ষতি কী? মিস্টার বাসুরই জবানীতে সন্তোষবাবুর নামে এক চিঠি লিখে সই নেবার জন্যে ওঁর সামনে সেটা বাড়িয়ে দিলাম। যন্ত্রণায় ডান হাত উনি নাড়তে পারেন না, সই হলে বাঁ-হাতেই করতে হবে। কিন্তু শিকাগো-ফেরতা লোক, ধড়িবাজিতে ওঁর নাগাল পাওয়া শক্ত; ন্যাকামি করে এমনি একখানা সইয়ের নমুনা দেখালেন যে, বাঁ-হাতে লেখা কস্মিনকালেও যে ওঁর আসে, কারও মনেই সে-সন্দেহ না জাগতে পারে। কিন্তু অতি চালাকেরও যে মাঝে মাঝে "নাকে দড়ি" পড়ে সে-সম্বন্ধে আপনাদের দেশেই প্রবচন আছে, এ-ক্ষেত্রেও হল তা-ই। চিঠিখানা ডাকঘরে না ফেলে সামনেরই একটা লেটার বক্সে ফেলে খুবই তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি কপাট ভেতর থেকে বন্ধ; তখন চাবির ফোকরে চোখ লাগিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার রহস্য ষোলোআনাই ভেদ হয়ে গেল—যিনি বাঁ-হাতে লিখতে পারেন না বলে মাত্র মিনিট দশেক আগেই ন্যাকামির চূড়ান্ত করছিলেন এখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তিনিই দিব্যি তরতর করে বাঁ-হাতেই একখানা চিঠি লিখে যাচ্ছেন—নিবিষ্ট মনে। এতদিনের চেষ্টায় তা হলে অহিভূষণ চৌধুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল! আর সলিলবাবুও পাঁচজনের সন্দেহ-দৃষ্টি থেকে কাকে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে আসছেন তাও বোঝা গেল। মনে-মনে হেসে আমি দরজায় বার কয়েক ঘা দিলাম, তারপরেই আবার ফোকরে চোখ রেখে দেখতে লাগলাম কী-কী পরিবর্তন ঘটে ঘরের ভেতরটাতে। প্রথম পরিবর্তন দেখা গেল মিস্টার বাসুর মুখে, সাদা মুখ একেবারে কালো হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটল তাঁর ব্যবহারে, সেই মুহূর্তে লেখা বন্ধ করে শেলফের কাছে এগিয়ে একটা বইয়ের ভেতর তিনি চিঠিখানা রেখে দিলেন; তারপর মুখখানাকে যতদূর সম্ভব সহজ অবস্থায় এনে তাড়াতাড়ি দোর খুললেন। আমিও বুঝলাম, অবিলম্বে ও-চিঠিখানা আমার হস্তগত হওয়া চাই-ই, কেননা যে-ব্যক্তি সোনার হরিণ সরিয়েছে এখন আবার কার কাছে তার গোপনীয় চিঠি পাঠাবার দরকার পড়ল সেটা জানতে হবে বইকী! হঠাৎ যেন একটা বিশেষ জরুরি কাজ পড়ে গেছে এবং তারই জন্যে আমাদের দুজনারই তৎক্ষণাৎ বাইরে কোথাও বেরিয়ে যাওয়া দরকার—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে মিস্টার বাসুকে একেবারে রাস্তায় নিয়ে এলাম। তারপর "দাঁড়ান, ম্যানেজারের ঘর থেকে আসছি" বলে আবার ভেতরে ঢুকে এমনি একটা জায়গা বেছে নিয়ে একটুকাল দাঁড়ালাম যাতে আমার ওপর কারও নজরই না পড়তে পারে। যখন দেখলাম চারদিক একদম নিরিবিলি তখন আস্তে-আস্তে পা টিপে ওপরে আসতে আর কোনও বাধা রইল না। আমাদের রুমটার সামনে গিয়েই দেখি কিনা নাথনি শেলফের কাছে দাঁড়িয়ে সেই বইখানা খুঁজছে। আমায় দেখেই তো তার মূর্ছা হওয়ার গতিক, আমিও তাকে পালাবার সুযোগ দিয়ে, বই খুলে চট করে চিঠিখানা দেখে নিলাম। ছোট্ট স্লিপের কাগজে লেখা, আর সে-লেখাও সবে শুরু হয়েছিল, শেষ হয়নি। কাজেই খবর বিশেষ কিছু পাওয়া গেল

না। তবে ও-পক্ষের উদ্দেশেই যে চিঠি পাঠানো হচ্ছিল তাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না, নইলে নাথনি এটার উদ্ধারে আসবে কেন? চিঠি লিখবার সময় সে যে ঘরের ত্রিসীমানায়ও ছিল না তা তো নিজের চোখেই দেখেছি। সমস্ত মিলে এবার থিওরিটা দাঁড়াল এই—আমার অগোচরে ইতিমধ্যেই—খুব সম্ভব সেইদিনই—মিস্টার বাসুর সঙ্গে অশনিকান্তের দেখা হয়ে গেছে। অশনিকান্ত তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, সে চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে এ-কথা ঠিক, কিন্তু বাসু যদি তাকে ফাঁসাবার মতলব করে থাকেন তবে তিনি নিজেও বাদ পড়বেন না। অর্থাৎ, মরবার আগে বাসুকেও তিনি মেরে যাবেন, অহিভূষণ চৌধুরীর আসল রহস্য ফাঁক করে দেবেন। তখন দুজনের মধ্যে আপোসে রফা হয়ে গেল—ফিফটি-ফিফটি! ব্যস, বাসু ও-দলে চলে গেলেন, আমার সঙ্গে রইলেন শুধু পদে-পদে প্রত্যেকটি কাজ ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য। এরপরই নাথনিকে শিখিয়ে দেওয়া হল মিস্টার বাসুর প্রত্যেকটি হুকুম যথাযথভাবে তামিল করতে। আমি ম্যানেজারের ঘরের দিকে সরে যেতেই নাথনিকে ডেকে মিস্টার বাসু কী উপদেশ দিয়েছিলেন তা বোধকরি আর আপনাদের বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই!

'রহস্য তো ষোলোআনাই ভেদ হল, কিন্তু এখনও যে বড়-বড় দুটো কাজই বাকি—রণজিৎবাবুর উদ্ধার আর দ্বারিকবাবুর জিনিস তাঁর নিজের হাতে সঁপে দেওয়া। এবার দ্বিগুণ উৎসাহে নেমে পড়লাম ও-দুটো কাজে। জানা ছিল রামদয়াল কাশীর পাণ্ডা, কাজেই তার "অফিস" খুঁজে বার করতে গোল হল না; পরদিন সক্কালেই তসরের কাপড় পরে তীর্থযাত্রীর বেশে তার দোকানটিতে এসে হাজির হওয়া গেল। সে তখন দোকানে ছিল না, ছিল তার ছোট ভাই। দুজনে কথা কইছি, হঠাৎ দোকানের ভেতরেই কেমন একটা কলিংবেল যেন বেজে উঠল, আর সেও অমনি আমায় একটু অপেক্ষা করতে বলে শশব্যস্তে চলে গেল সামনেরই একটা পানের দোকানে। একটু বাদেই স্পষ্ট বুঝে নিলাম যে, এ-দোকান দুটো আর কিছুই নয়, ওদেরই শিকার ধরবার ফাঁদ। কাশীতে কারা নতুন আসছে দু-কথাতেই ওরা বুঝে নেয়, তারপর কৌশলে কখন তারা কোথায় বেড়াতে যাবে জেনে নিয়ে লুঠের ব্যবস্থা করা। এ-কাজের জন্য ওদের নিজস্ব টঙ্গা, গাড়োয়ান সবই ঠিক আছে। সম্প্রতি দুটি বাঙালি ছোকরা শিকার জুটেছে, তাদের "ব্যবস্থা" করবার জন্যই কলিংবেলটি বেজেছিল। সবকথা বিতং দিয়ে বলবার দরকার নেই, আপনাদের শুধু এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে যে ওদের গাড়োয়ানটাকে সেদিন আমি কৌশলে শহরের বাইরে এনে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম; ছোকরা দুটিও রক্ষা পেল, আর ফেরবার সময় ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দেওয়ায় সেও তার আস্তাবলে ফিরে এল, অর্থাৎ আস্তাবলটি আমায় চিনিয়ে দিলে। ঠিক সেই সময়েই ওই গাড়োয়ানের এক ছোট্ট ন্যাংটা ছেলে পাশেরই একটা মেটে ঘর থেকে দৌড়ে এসে বললে, "বাবা এসে গেছে।" ব্যস, গাড়োয়ানের বাড়িটারও একটা হদিস পাওয়া গেল। এ-গাড়োয়ানটা আর কিছু রামদয়ালদের মতো "উচ্চশ্রেণীর জীব" নয়, কাজেই ওর অল্পবুদ্ধির সুযোগ নিয়ে অনায়াসেই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোনো সম্ভব হবে মনে করে আমি খুব খুশিমনেই ফিরছিলাম, পথে একটা মজার ব্যাপার ঘটায় অতি অক্লেশেই রণজিৎবাবুর উদ্ধার সম্ভব হয়ে গেল, সোনার হরিণও হাতে ফিরে এল।

'ব্যাপারটা এই—অন্ধকারে গলিপথে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি একদল লোক সামনের ছোট্ট আর-একদল লোককে তেড়ে চলেছে, আর পেছনের দলে রয়েছে আমাদের এই তারকেশ্বর ভায়া—আমার বহুকালের চেনা বন্ধু। অবাক হয়ে গেলাম—তারকেশ্বর এখানে কেন? তারপরেই মনে পড়ল—ওঃ হোঃ, ও-ই তো "মেঘপুষ্প" ছবিখানার ডিরেক্টর, নিশ্চয়ই ফিলমের কাজে কাশী এসেছে। কিন্তু বায়োস্কোপের আর্ট ছেড়ে সত্যকারের বীরের পার্ট ও কেন নিলে সেটা জানবার ইচ্ছা থাকলেও তখন আর জানা গেল না, বাবা বিশ্বনাথের একটি সুপুষ্ট বাহনের কৃপায়।

'বাড়ি ফিরে এলাম; ঠিক জানতাম আজ যে-সব কাণ্ড করে এসেছি তারপর রামদয়াল, অশনিকান্ত এবং বাসুর দল আর সহজে আমায় নিষ্কৃতি দিচ্ছে না। বাসুর সঙ্গে এরপর থেকে একঘরে

রাত কাটানো আমার পক্ষে "সসর্পে চ গৃহে" বাসের-ই সামিল হবে, তাই সেইরাত্রেই ওঁকে ডাকবাংলোয় চালান করে, নিজেও গোপনে চলে এলাম ম্যানেজারের কামরায়। আপনারা শুনে হয়তো আশ্চর্য হবেন, সেইরাত্রেই আমার "লীলা-খেলা" ঘোচাবার বন্দোবস্ত হয়েছিল! কিন্তু যাক—সে অন্য কথা।'

'পরদিনই সিনেমা-হাউসে খবর নিয়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে তাঁর হোটেলে গিয়ে দেখা করা গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কাল সন্ধ্যার পর জনাকয়েক লোককে খুব জোরসে তাড়া করে যাচ্ছ দেখতে পেলাম। কেন হে?"

'তারকেশ্বর বললে, "ওঃ, দেখেছেন নাকি আপনি? একটা পুরানো অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল, তাই!"

'উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কী রকম? প্রতিশোধটা কীসের?"

"আরে মশাই, সে আজ কিছুদিন আগেকার ঘটনা, জীবনে সেই প্রথম কাশী এসেছি; একটা পানের দোকানের সামনে—আমি আর আমার দুই বন্ধু পান কিনতে-কিনতে আলাপ করছি—আজ অমুক-অমুক জায়গা দেখতে হবে—রামকৃষ্ণ মিশন, ইউনির্ভাসিটি ইত্যাদি। রামকৃষ্ণ মিশনের গেটে এক টঙ্গাওয়ালা পাকড়াও করল, আমাদের সোয়ারী করে সে সবকিছু দেখিয়ে দেবে। লোকটার হাবভাব কেমন সুবিধার ঠেকল না, তবু তিন-তিনজন জোয়ান মরদ, ভয় খাব কেন, ওরই গাড়ি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। ইউনির্ভাসিটি ঘুরে-ঘুরে দেখবার পর মনে হল গাড়োয়ানটা যেন ইচ্ছে করেই শুধু-শুধু দেরি করছে, অন্ধকার বেশ গাঢ় হয়ে না আসা পর্যন্ত ওর যেন বাড়িমুখো হবার মতলবই নেই।

"দিব্যি রাত হয়েছে; নির্জন রাস্তা দিয়ে আমরা টঙ্গা চড়ে বাড়ি ফিরে আসছি—আমি আর আমার সেই দুই বন্ধু। 'মেঘপুষ্প' ছবিখানা সম্বন্ধে আলোচনা করতে-করতে এগোচ্ছি, অশনিবাবুর অভিনয় কেমন সুন্দর হয়েছে সেই কথাই বলছি, হঠাৎ কে একজন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ার রাশ চেপে ধরল, আর সেই মুহূর্তেই চেয়ে দেখি অনেকগুলো লোক ছোরা হাতে আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। যে-লোকটা ঘোড়ার রাশ চেপে ধরেছিল, দেখা গেল সে আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা নয়—সকালে আমাদের পান কেনবার সময় হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে দোকানীর সঙ্গে ভেতরে একত্র কিছুটা সময় কাটিয়ে গেছল। আর আমাদের গাড়োয়ানটার ব্যবহারেও মনে হল, এই ঘটনাটির জন্য এতক্ষণ সে শুধু প্রস্তুত নয়, একেবারে যেন উদ্‌গ্রীবই হয়ে রয়েছিল। বুঝলাম, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রকাণ্ড চক্রান্তের ফল, আর সেই চক্রান্তের হেড-অফিস হচ্ছে গোধূলিয়ার ওই পানের দোকানটি। সাবাড় আমরা তক্ষুনি হয়ে যেতাম, কিন্তু রাখে হরি মারে কে? জানেন বোধহয় যে-বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটিতে বহু বাঙালি ছাত্র পড়ে—আর তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। হপ্তায় একদিন তারা বায়োস্কোপ দেখতে শহরে আসে, এক-একদলে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন ছেলে—সব বাইকে চড়ে। সেদিন ছিল এমনই একটা দিন, বায়োস্কোপ দেখে ওরা হোস্টেলে ফিরে আসছিল, পথে গুণ্ডার অত্যাচার দেখে একসঙ্গে সবাই নেমে পড়ল। তারপর মশাই, বাইক থেকে পাম্প খুলে নিয়ে ব্যাটাদের যা পিটুনি! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হাতুড়িপেটা শরীর, দু-মিনিটে বাছাধনদের সর্ষে ফুল দেখিয়ে তবে ছাড়লে!"

'ওঃ, এই অত্যাচারেরই প্রতিশোধ? তাই বুঝি কাল ওদের ফাঁদে ফেলবার মতলব আগে হতে সব আটঘাট বেঁধে দুটি শাগরেদকে পাঠিয়ে দিয়েছিলে পান কিনতে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'তারকেশ্বর হেসে জবাব দিল, "হ্যাঁ, কিন্তু ফল বড় বেশি পাওয়া গেল না। তাড়া খেয়ে ওরা একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু তারপরই যেন কোথায় হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাস্তার ধারে সদর দরজাটা ভিন্ন সে-ঘরে আর দ্বিতীয় জানলা-দরজা যে ছিল না তা আমরা বেশ করে লক্ষ করেছি।'

'হুঁ; আচ্ছা অশনি মিত্তির কাশী এসেছে জানি, সে কোথায় আছে বলতে পারো?'

'শুনেছি তার দেশের কে একজন এখানে নাকি পাণ্ডাগিরি করে, তারই বাড়িতে অতিথি আছে। তবে সেটা কোথায় তা বলতে পারি না, পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গে আমার তো আর কোনওদিন সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি!'

'বাড়ি ফিরে সমস্ত ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে বসলাম। রাস্তার দিককার সদর দরজাটা ছাড়া ঘরে আর কোনও দোর-জানলা নেই, তারকেশ্বর বলেছে। তা হলে লোকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল কোন পথে? হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি অবশ্যই। নিশ্চয়ই তা হলে ঘর থেকে গোপনে সরে পড়বার কোনও একটা গুপ্ত ব্যবস্থা আছেই। বাইরের কোনও লোকের তা ধরবার উপায় নেই, আর সে সঙ্কেত জানাও বাইরের কারও পক্ষে অসম্ভব। সমস্ত রহস্যটার শুধু এই একমাত্র সমাধানই হতে পারে। আর সবদিক ভেবে দেখতে গেলে এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা থাকার কথাও বটে! যে সাধু ব্যবসা এতদিন ধরে শহরের বুকে ওরা চালিয়ে আসছে তাতে, যে-কোনও মুহূর্তে পুলিশের লোকের পক্ষে বাড়ি ঘেরাও করা সম্ভব এটা কি আর ওরা ভেবে দেখেনি? সে-ক্ষেত্রে পলায়নের একটা ব্যবস্থাও কি আর করে রাখেনি? নিশ্চয়ই তা হলে অন্য কোনও গলির সঙ্গে এ-ঘরটার সংযোগ আছে; আমার উচিত হবে সেদিকেই নজর রাখা।

'গাড়োয়ানটার আস্তানার সন্ধান নিয়ে বাস্তবিকই কাজ আমি অনেকখানি এগিয়ে রেখেছিলাম। তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতেই টের পেলাম, রোজই সন্ধ্যার পর গঙ্গার ধারে একটা পানের দোকানে সে এসে উপস্থিত হয়, তারপর আর-একজনার কাছ থেকে দোকানের জিম্মা নিয়ে গদিয়ান হয়ে বসে। রাত বারোটা-একটার সময় আবার তাকে ছুটি দিয়ে দোকানে বসে এসে আর-একজন। অতরাত্রে ও-তল্লাটে একটি খদ্দেরকেও দোকানের দিকে ঘেঁষতে দেখিনি; দু-পয়সা দামের দোকান, চুরির ভাবনাও নেই, অথচ তা সত্ত্বেও কেউ-না-কেউ অষ্টপ্রহরই সেখানে পাহারা রয়েছে। মনে-মনে কেমন একটা খটকা লাগল—এটা কি ঘাঁটি আগলাবার বন্দোবস্ত অর্থাৎ প্রধান আড্ডা থেকে রাস্তায় বেরোবার এটাই কি গুপ্ত দরজা? দু-দিন বাদেই আমার সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেল; আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি দোকানটির দিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ দেখি ভেতরে দ্বিতীয় একটি লোকের আবির্ভাব হয়েছে। আমার সুমুখ দিয়ে সে ভেতরে ঢোকেনি, তবে এল কোত্থেকে? অনেকটা কাছে এগিয়ে দেখি, মেঝের উপর একটা মাদুর বিছানো, আর তার একপাশ দিয়ে ম্যান-হোলের ঢাকনির একটা অংশ উঁকি মারছে। সমস্ত রহস্য জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

'সেদিনই তারকেশ্বরের হোটেলে গিয়ে আমি আমার শেষ অস্ত্র প্রয়োগের ব্যবস্থা করলাম। একখানা চিঠি তৈরি করা হল—আসানসরাই এর "নীলকুঠি" থেকে কেউ যেন আমায় খবর দিচ্ছে যে, তার জিম্মায় যে বিশেষ দামি জহরতটা আছে সেটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার; কেননা যে কোনও মুহূর্তে সেটা লুঠ হয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা দাঁড়িয়েছে। আসলে কিন্তু এ-সমস্তই একেবারে ভুয়ো—আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একটা ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। ডাকে এ-চিঠিখানা যখন আমার নামে সুমিত্র নিকেতনের ঠিকানায় গিয়ে পৌঁছবে তখন নাথনি নিশ্চয়ই ওখানা করায়ত্ত করতে ভুলবে না; তাকে ওইরকমই শিখিয়ে দেওয়া আছে কিনা! আর চিঠি নাথনির হাতে পড়ার মানেই রামদয়ালদের হাতে পড়া; তারা আলগোছে ওখানা খুলে খবরটুকু জেনে নেবে, আমার হাতে চিঠি এসে পৌঁছবার অনেক আগেই। ওদের চরিত্র আমার খুব ভালোমতোই জানা আছে; এ-লোভ সম্বরণ অসম্ভব—চিঠি পড়বার পর যত শিগগির সম্ভব দলবল নিয়ে ওরা নির্ঘাৎ আসানসরাই রওনা হয়ে যাবে "নীলকুঠি" লুঠ করে জহরৎটি ট্যাঁকস্থ করবার সদভিপ্রায়ে। যে ক'টি লোককে আড্ডা পাহারার জন্য এখানে না রেখে গেলেই নয়, তারাই শুধু থেকে যাবে কাশীতে। সেই সুযোগে পেছন দিককার গুপ্ত পথে, অর্থাৎ পানের দোকান দিয়ে, ওদের আস্তানায় গিয়ে পৌঁছতে আমাদেরও আর

কোনও বেগ পেতে হবে না। বাস্তবিকই যে বেগ বেশি পেতে হয়নি তা আপনারা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করেছেন।'

হুকা-কাশি থামিলেন। তারকেশ্বর একটু চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, 'আপনি ওদের বলেন ধড়িবাজ, কিন্তু সত্যিকার ধড়িবাজিতে আপনি যে ওদের শ্রীগুরুদেব!'

হুকা-কাশি হাসিলেন, বলিলেন, 'শেষদিকটায় কিন্তু শ্রীগুরুদেবও প্রায় ফেল মেরেছিলেন আর কী! ভালুক দেখে বাস্তবিকই আমি ভড়কে গেছলাম, রণজিৎবাবু বলে গোড়াতে চিনতেই পারিনি; মানে, মানুষ যে মানুষকে অমন পিশাচের মতো যন্ত্রণা দিতে পারে তা ভাবতে পারিনি। মাত্র দু-হাত দূরে ও-মূর্তি দেখে সত্যিই স্বীকার করছি আমার বুকের ভেতরটা একদম বসে গিয়েছিল। শুনেছিলাম—অবশ্য কখনও পরীক্ষা করিনি যে, বুনো জানোয়ারের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাইতে পারলে ওরাও বেশ একটু ঘাবড়ে যায়। সে চেষ্টা করতে গিয়েই একেবারে অবাক হয়ে গেলাম —ভালুকের চোখ দুটোতে পলক বলে কোনও জিনিস নেই, তারা দুটো একেবারে স্থির, কোনওদিকেই তাদের গতি নেই—ঠিক যেন কাচের চোখ! আস্তে-আস্তে হাতদুটোর পানে তাকিয়ে দেখি, নিতান্ত অসাড়ের মতো সে দুটো ঝুলছে, এদিক-ওদিক কোনও দিকেই তিলমাত্র নড়ছে না। হাত দিতেই বোঝা গেল এও কৃত্রিম হাত! কেবল পা দুটো বাস্তবিকই ঠিক আছে। তৎক্ষণাৎ আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল—নকল ভালুকের কাঠামোর ভেতর একটি আস্ত মানুষকে পুরে রাখা হয়েছে। তার চোখ বন্ধ, কান বন্ধ, মুখ বন্ধ এবং যত দূর মনে হয়, হাত দুটোও দড়িতে বাঁধা। দিনের পর দিন এইভাবে চলেছে—ভাবুন দেখি, কী ভীষণ শাস্তি! বুঝলাম, এই আমাদের রণজিৎবাবু। শয়তানগুলোর মাথা আছে স্বীকার করতেই হবে, দরকারমাফিক ওঁকে আর কোথাও পাঠাতে হলে এই তো সেরা ব্যবস্থা—গোলমাল চেঁচামেচির এতটুকু আশঙ্কা নেই, বাইরের কারও মনে এতটুকু সন্দেহ ঘটবার হেতু নেই, কেননা ব্যবসার খাতিরে নাচ দেখিয়ে টাকা রোজগারের উদ্দেশ্যে ভালুক তো লোকে হরদমই পুষে থাকে, তাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নেওয়া হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে? কী পাষণ্ডের কবলেই না আপনি পড়েছিলেন রণজিৎবাবু!... ভালো কথা, সলিলবাবু, সন্তোষবাবু, আপনারা তো শ্রীপুরে ফিরে যাচ্ছেন, সোনার হরিণটা আপনাদের সঙ্গেই দিয়ে দিই না কেন?'

'না না না, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে; কর্তা আপনাকে দেখবার জন্য কাল থেকে আকুলি-বিকুলি কচ্ছেন।' সন্তোষ জবাব দিল।

'ওঃ, মিস্টার বাসুর কথা তাঁকে বলেছেন নাকি?'

'না, এখনও তা বলা হয়নি।'

হুকা-কাশি একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন, 'আর বলেই বা কী হবে, বাসুকে কি আর দেখতে পাবেন বলে আশা করেন? একে শিকাগো-ফেরত লোক, তাতে আবার নাকি হলিউডে থেকে পাকা ওস্তাদদের কাছে ছদ্মবেশ ধরার আর্ট শিখে এসেছে; শেষরাত্রে ওদের কাছে যেই সমস্ত ব্যাপার শুনতে পাবে অমনি হয়তো এক লোটা-কম্বল নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে কোথাও সরে পড়বে—তাকে চেনে কার সাধ্যি! তারপর হয়তো কিছুদিন বাদে আবার আমেরিকা—আবার ভাগ্যান্বেষণ!'

'আর বাদ বাকি গুণ্ডাগুলো? অশনিকান্ত?" সন্তোষ সোৎকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল।

'বেনারস-পুলিশের কাছে তো তার করে দিয়েছি, দেখা যাক কদ্দুর কী হয়।... কে ও, অমৃত নাকি? বাবুদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করছ তো! এঁরা কিন্তু এ-বেলা এখানেই খেয়ে যাবেন।'

গোয়েন্দা হলেন পরাশর বর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ সে র উ ৭৪

এক

পরাশরের একটি বিশিষ্ট নতুন কাহিনী প্রকাশ করে অনেকেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হব জানি, কিন্তু এই কাহিনীটিই যে আমার গভীর শিরঃপীড়ার কারণ তাও জানিয়ে রাখা দরকার। শিরঃপীড়া যে কেন তা যথাস্থানে প্রকাশ করব।

পরাশরের এই বিচিত্র কাহিনীটির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সংশ্রব শুধু এইটুকু যে, অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হাতে এসে পড়বার পর এটি পরিবেশনের ব্যাপারে আমিই প্রথম উৎসাহিত হয়েছি। নইলে এ-কাহিনীতে আমার যৎসামান্য ভূমিকাও যেমন নেই, এটির রচনাও তেমনি আমার নয়। এ-কাহিনী আমার হাতে এসে পড়ে একটু আচমকা ও অদ্ভুতভাবে।

পূজাসংখ্যা বার হওয়ার আগে সাধারণ কাগজের অফিসের কী হাল যে হয়, সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের নেই তাঁরা আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

হোমরা-চোমরা কাগজের অফিসের কথা জানি না। সেখানে হয়তো অমন পঞ্চাশ জোড়া হাত থাকে, ঝামেলা আর ঠেলা সামলাবার জন্যে। কিন্তু আমাদের মতো মাঝারিদেরই দিশাহারা অবস্থা। এক কূল সামলাতে আর-এক কূল ধসে ভেসে যায়। কিংবা বলা উচিত, একদিকের বোঝা হালকা করতে না-করতে আর-একদিকে কাজের বা কাগজের পাহাড় জমে যায়।

এই কাগজের পাহাড়ের মধ্যে যা সব থাকে, বেশিরভাগই তার আবর্জনা হলেও দু-একটা একেবারে ফেলনা নয়। অন্তত কৌতুকের খোরাক তার মধ্যে পাওয়া যায়।

যত হেলায়-ফেলায় হোক, নিজে একবার চোখ না বুলিয়ে তাই কোনও চিঠিপত্র বা ডাকে-পাঠানো লেখাই আমি ফেলতে দিই না। আমদানি-মার্কা বেশ ঢাউস তারের ট্রেটা চিঠিতে, কাগজে বোঝাই হয়ে উপচে পড়লেও আমার ফুরসত না হওয়া পর্যন্ত টেবিলের শোভাহরণ করেই বিরাজ করে।

পুজোর কাগজ বার করবার চাপটা সেদিন একটু হালকা হয়েছিল। সে-সংখ্যার কাগজে কী-কী যাবে মোটামুটি তার একটা ছক তখন করে ফেলেছি। কয়েকটা দামি লেখা হাতে পেয়ে কম্পোজ ধরানোও হয়ে গেছে।

একটু ফাঁক পেয়ে তাই জমানো চিঠি ও কাগজপত্রের স্তূপের যতটা পারি গতি করবার চেষ্টায় লেগেছিলাম।

কাগজের পাহাড়ের বেশিরভাগই খামের ভেতর পাঠানো কবিতা আর তা ছাপাবার জন্যে অনুরোধ।

দু-একটা মোটা প্যাকেট তার ভেতর যা মাঝে-মাঝে থাকে, তা অবশ্য উপন্যাস বা ভ্রমণকাহিনীর পাণ্ডুলিপি। সে-উপন্যাস আর ভ্রমণকাহিনীর বিষয়বস্তু কিন্তু বেশিরভাগ না পড়েই বলে দেওয়া যায়।

উপন্যাস হলেই তা হবে ঐতিহাসিক, আর ভ্রমণকাহিনী হলেই হিমালয়ের কেদারবদরী, পশুপতিনাথ যদি না হয়, তা হলে অন্তত ঋষিকেশ, লছমনঝোলা হবেই।

ইদানীং মানে খুব সম্প্রতি আর-এক জাতের লেখাও এক-আধটা মাঝে-সাঝে হানা দিচ্ছে। এসব লেখাও উপন্যাস, তবে দুঃসাহসিকভাবে অসাধারণ, অগ্রসর ও অনন্য।

এমন অসাধারণ ও অনন্য আমার যে ক'টি লেখা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, তাদের একটির সঙ্গে আর-একটির কোনও তফাতই নেই। সব লেখাই যেন হঠাৎ এক আশ্চর্য আবিষ্কারের গর্বে ডগমগ। মানুষের ভাষাতে যে খিস্তি-খেউড় আছে, এইটেই হল আশ্চর্য আবিষ্কার। যে-লেখাই পড়া যাক, দেখা যাবে, পাত্রপাত্রী যে যেখানে পারে মনের সুখে অশ্লীল গালমন্দ আর খিস্তি চালাচ্ছে।

আর সেইসঙ্গে গল্প যেমন জোরালো তেমনি আগুয়ান। পিছিয়ে-পড়া যুগের সেকেলে সব ল্যাট্রিন যেন নিজেদের কাঁচা দুর্বল কল্পনার লজ্জায় মানে-মানে চুনকাম হয়ে এই দুঃসাহসীদের পথ ছেড়ে দিয়েছে।

এবারের জমানো কাগজের গাদায় একটিমাত্রই ভারি রেজিস্ট্রি-করা প্যাকেট দেখতে পেয়েছিলাম। ঐতিহাসিক বা অনন্য কিছু হবে ভেবেই সাহস করে সেটি আগে খুলতে পারিনি। তার বদলে অন্য চিঠিপত্রগুলির ওপরই চোখ বোলাচ্ছিলাম প্রথমে।

সত্যিই প্রায় সবগুলিই কবিতা-সংক্রান্ত।

যেমন সব কবিতা, তেমনি তা ছাপাবার জন্যে অনুরোধের ভাষা।

কেউ লিখেছেন, বিনীতভাবে—'আমি জীবনে কখনও কবিতা লিখি নাই। কিন্তু সেদিন অফিস-টাইমে গুড়ের নাগরীর মতো ঠাসা অবস্থায় রড ধরিয়া বাদুড়-ঝোলা ঝুলিতে-ঝুলিতে অদূরবর্তিনী একটি মেয়েকে দেখিয়া হঠাৎ মনে যেন কবিতার বান ডাকিয়া গেল। অদূরবর্তিনীর মুখ দেখিতে পাই নাই। ভিড়ের ফাঁকে তাঁহার মাথার কবরীর একাংশমাত্র চোখে পড়িয়াছে। তিনিও আমায় দেখিতে পান নাই। দেখিবার উপায় ছিল না। তবু এই খণ্ডিত দেখার অসীম রহস্য আমার মনের মধ্যে কবিতার ছত্রগুলি যেন আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া তুলিল। অফিসে পৌঁছাইতে যথারীতি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। টেবিলে তখন রাজ্যের কাজ জমা হইয়া আছে। তবু প্রথমেই লেজারের বদলে একটি কাগজ টানিয়া লইয়া কবিতাটি লিখিয়া ফেলিলাম। কবিতাটির নাম দিয়াছি, "দেখার ভগ্নাংশ"। ছন্দ ও মিলের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো থাকিতে পারে, তবু এমন স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্রেরণার কবিতার মর্যাদা দিতে আপনারা কার্পণ্য করিবেন না, এ-বিশ্বাসে কবিতাটি আপনাদের পাঠাইতেছি। আশা করি, আপনাদের পূজাসংখ্যায় কবিতাটিকে মুদ্রিত দেখিতে পাইব।'

আমাদের কাগজের ঠিক পূজাসংখ্যা বলে কিছু নেই। সাধারণ সংখ্যাই কলেবরে একটু বাড়ে মাত্র। কিন্তু সেটুকু খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনমাত্র বোধ না করে কাগজ থাকলেই অতিকায় পূজাসংখ্যা থাকবে বলে ধরে নিয়ে কবিতাই বেশিরভাগ লেখক পাঠিয়েছেন।

বিনীত যেমন তেমনি উদ্ধত ভঙ্গিও আছে।

কোনও একজন লিখেছেন—'কবিতা একটা পাঠালাম। বুঝতে পারবেন না জানি। কিন্তু নিজের বোধশক্তির ওপর নির্ভর না করে কবিতাটি পূজাসংখ্যায় ছাপবেন। কবিতা না বুঝে ছাপবার জন্যে আপনার দ্বিধার কোনও কারণ নেই। যেসব কবির নামে আপনারা গদগদ তাদের কতটুকুই বোঝেন? আমি আপনাদের জপমালার সেইসব কবির চেয়ে অনেক বেশি উচ্চশ্রেণীর। তাঁরা ম্যালার্মে, বোদলেয়ার, আয়ান ভ্যালেরী কি ইয়েটস, এলিয়ট, পাউন্ড, স্পেন্ডার, ডাইলান টমাস ইত্যাদি যে ক'জন কবির কাছে দাসখত লিখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি কবির কবিতা আমি মক্স করেছি। সেইসব কবিতার অনুপান মিশেল করে আমি যা বানিয়ে তুলেছি তা অনবদ্য। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে প্রুফ পাঠাবেন।'

আর-একজনের আবার এই প্রুফ পাঠানোতেই আপত্তি।

তিনি লিখেছেন—'অনুগ্রহ করে প্রথম কম্পোজের পর যা দাঁড়ায় প্রুফ সংশোধন না করেই তা ছাপবেন। আমার বহু শ্রেষ্ঠ কবিতায় কম্পোজিটারগণের বিশেষ অবদান আছে।'

চিঠি ও কবিতাগুলো ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলব, না বন্ধুবরের জন্যে রেখে দেব ভাবতে-ভাবতে প্যাকেটটা একটু অবহেলাভরেই খুলেছিলাম, কিন্তু খোলবার পর একটু পড়ে সত্যিই অবাক এবং বেশ উদ্‌গ্রীব হতে হল।

প্যাকেটের ভেতর পরিচ্ছন্ন হাতে লেখা একটি বেশ মোটা পাণ্ডুলিপির তাড়া। তা কিন্তু হিমালয় ভ্রমণ বা ঐতিহাসিক উপন্যাস তো নয়ই, এমনকী দুঃসাহসী সাহিত্যে-যুগান্তর-আনা খেউড়-কীর্তনও নয়।

সম্পূণ অন্য এবং অপ্রত্যাশিত কিছু।

লেখাটা আরম্ভ হয়েছে চিঠি হিসেবে আর চিঠি আমাকে উদ্দেশ করেই লেখা। সম্পূর্ণ অপরিচিত একজন লিখছেন—

কৃত্তিবাসবাবু,

আপনি কাগজে পরাশর বর্মার কীর্তিকাহিনী প্রকাশ করেছেন দেখে আনন্দিত হয়েছি। আপনার প্রকাশিত কাহিনীগুলি পড়েই এ-লেখাটি পাঠাতে উৎসাহিত হলাম।

পরাশর বর্মার গোয়েন্দাগিরির অনেক বাহাদুরির কথাই আপনি লিখেছেন, কিন্তু কেন, কখন, কীভাবে পরাশর বর্মা প্রথম গোয়েন্দাগিরিতে আকৃষ্ট হল তা বোধহয় জানেন না। পরাশর বর্মার অনুরাগীদের জন্যে সে-আখ্যান প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে মনে করি।

দুই

এই পর্যন্ত পড়েই ব্যস্ত হয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটটা হাতড়াতে হল। রেজিস্টার্ড প্যাকেটের ছেঁড়া মোড়কটা হেলাভরে সেখানেই ফেলে দিয়েছিলাম।

মোড়কটা উদ্ধার করে তা থেকে জানলাম, কাছাকাছি কোথাও না, দক্ষিণের সুদূর জলারপেট বলে এক শহর থেকে লেখাটি পাঠানো হয়েছে। লেখকের নাম শ্রীজলধর রায়।

নামটা দেখে একটু অবাকই হলাম।

পরাশরের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয় এখন গভীর অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছে বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। কিন্তু তার মুখে এ-নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

পরাশর বর্মার প্রথম গোয়েন্দাগিরিতে আকৃষ্ট হবার বিবরণ যিনি দিতে যাচ্ছেন তাঁর সঙ্গে পরাশরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই ছিল বলে অনুমান করা স্বাভাবিক। কথায়-কথায় এ-নাম তাই পরাশরের মুখে এক-আধবারও না শোনায় একটু যেন খটকা লাগে!

পরাশর অবশ্য নিজের সম্বন্ধে একেবারে নীরব বললেই চলে। তার নিজের জীবনের কথা অনেক খুঁচিয়েও একটু-আধটুর বেশি বার করা যায় না। সেদিক দিয়ে দেখলে জলধর রায় বলে কারুর নাম তার মুখে কখনও না শোনা খুব একটা অদ্ভুত কিছু নয়।

যা দুর্বোধ লাগছে তার হদিশ হয়তো জলধর রায়ের বিবরণেই পাব আশা করে সাগ্রহে তা পড়তে শুরু করলাম।

খুব নিরাশ হতে হল না। জলধর রায় পরাশরের ছেলেবেলার কথা দিয়েই তাঁর কাহিনী শুরু করেছেন। লিখেছেন—

পরাশর বর্মা ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখায় উৎসাহী। কিন্তু গোয়েন্দাগিরির কোনও অভিলাষ তার ছিল না।

আপনি বোধহয় জানেন যে, পরাশর বর্মা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল। ইদানীং যা পূর্ব পাকিস্তান সেখানকার একটি কলেজে আমি তাঁর সহপাঠী ছিলাম। শুধু সহপাঠী নয়, বন্ধুও।

সে-বন্ধুত্ব আমাদের অটুট থাকবারই কথা। কিন্তু জীবিকার্জনের দায়ে বহুদিন আমাকে দেশছাড়া হয়ে থাকতে হওয়ার দরুন তার সঙ্গে যোগাযোগটা অনেককাল ধরে আর রক্ষা করতে পারিনি।

তা ছাড়া, যে-ঘটনার কথা বিবৃত করতে যাচ্ছি, তার সঙ্গে একটু অপ্রিয় স্মৃতি জড়িত আছে বলেও হয়তো পরাশর আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার বিশেষ চেষ্টা করেনি।

পরাশরের প্রথম গোয়েন্দাগিরির এ-বিবরণ পড়লে শুধু যে এই বিভাগে তার সুপ্ত প্রতিভার আদি স্ফুরণের কথাই জানতে পারবেন তা নয়, কেন যে সে আজ পর্যন্ত অকৃতদার তাও হয়তো স্পষ্ট হবে।

তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এস-সি পরীক্ষা দিয়েছি।

পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরি আছে, তাই ছুটির সুযোগে দুই বন্ধু ক'দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি বেড়িয়ে যেতে। আমি উঠেছি গ্রাম সম্পর্কে এক মামার মেসে অতিথি হয়ে, আর পরাশর উঠেছে শিয়ালদার কাছে একটা সস্তা হোটেলে।

প্রতিদিন সকালে হয় পরাশর আমার মেসে আসে, নয় আমি তার হোটেলের ঘরে গিয়ে হাজির হই। তারপর যেদিন যেমন খুশি চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, বোট্যানিক্স, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তো বটেই, স্টিমারে কি ট্রেনে চড়ে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, ডায়মন্ডহারবার, ব্যান্ডেল, তারকেশ্বরও ঘুরে আসি।

বিকেলবেলাটা বরাদ্দ থাকে সাধারণত থিয়েটার-বায়স্কোপের জন্যে। শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কোনও থিয়েটার বায়স্কোপের নতুন নাটক বা ছবিই বাদ দিই না।

সেরকম কিছু না থাকলে কার্জন পার্ক কি গড়ের মাঠে বসে গল্প করে আর পরাশরের কবিতা শুনে বেশ রাত পর্যন্ত কাটিয়ে যে যার আস্তানায় ফিরি। পরাশর তখন প্রতিদিন রাশি-রাশি কবিতা লিখছে।

কলকাতায় ছুটির মেয়াদ ও রসদ দুই-ই যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তখন একদিন সকালে তার পালা মাফিক পরাশর আমার মেসে না আসায় একটু চিন্তিত হলাম।

সারা সকাল অপেক্ষা করে একটু উদ্বিগ্ন হয়েই তার হোটেলে গেলাম খোঁজ করতে। না, যা ভয় করেছিলাম সেরকম কিছু নয়। অসুখ-বিসুখ তার করেনি। তবে সে হোটেলেই নেই। তার কামরার দরজার তালা বন্ধ। হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জানলাম, সকালবেলাতেই সে নাকি বেরিয়ে গেছে খাওয়া-দাওয়ার আগে, এখনও ফেরেনি।

সুস্থ থাকা সত্ত্বেও আমায় কিছু না জানিয়ে এরকম একা বেড়াতে যাওয়াতে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই নিজের মেসে ফিরলাম। গিয়ে দেখি, পরাশর সেখানেই আমার অপেক্ষায় বসে আছে। মেসের চাকরকে দু-কাপ চা আনতে পাঠিয়ে পরাশরকে হোটেল ছেড়ে সকালেই এমন উধাও হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাব, তার আগেই সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল—তোমার মাসি-পিসি কেউ আছেন?

প্রশ্নটা হঠাৎ অন্য যে-কেউ করলেই অদ্ভুত লাগত, কিন্তু পরাশর বর্মা এ-প্রশ্ন করলে বেশ একটু বিমূঢ় হতে হয় নিশ্চয়।

উত্তর না দিয়ে তাই সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকালাম।

পরাশরের কবিতা লেখাই বাতিক জানতাম। তার ওপর আবার কুলজি নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে নাকি আজকাল! তা কুলজি হলেও প্রথমে বাবা-পিতামহ ছেড়ে মাসি-পিসির খোঁজ কেন?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করলাম—হঠাৎ মাসি-পিসির খোঁজ কেন?

আহা, আগে বলোই না আছে কি না?

না, মাসি-পিসি কেউ নেই। —বাধ্য হয়ে জানাতেই হল—মা ছিলেন মাতামহের একমাত্র সন্তান, আর বাবার দিকে জ্যাঠা-খুড়ো থাকলেও পিসি কেউ নেই।

তা হলে তুমি বুঝবে না!—পরাশর যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

কী বুঝব না! —একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বললাম—মাসি-পিসি না থাকলে কবিতা বোঝা যায় না নাকি?

কবিতার কথা কোথা থেকে আসছে! পরাশর বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করলে—কবিতা

ছাড়া আমার আর কি কোনও ভাবনা নেই!

আছে নাকি? সেটা কি মাসি-পিসির ভাবনা? তাইতেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছলে?

আমার ব্যঙ্গটা গায়ে না মেখে পরাশর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে—হ্যাঁ, তাই বলতে পারো। মাসি নয়, পিসির। আমার একমাত্র পিসির। ছেলেবেলা থেকে একমাত্র যিনি আমার কবিতার সমঝদার আর আমার জীবনযাত্রার সমালোচক ও পথনির্দেশক, বাবা-মা বেঁচে থাকতেই যিনি আমার অভিভাবকত্ব নিয়েছিলেন আর বিধবা হয়ে বৃদ্ধা বয়সে কাশীবাস করেও যিনি প্রতি হপ্তায় নিয়মিত চিঠি লিখে আমার জীবন রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করে আসছেন।

পরাশর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বললাম—তা হলে তাঁর নিয়ন্ত্রণ তো তোমার গা-সওয়া। নতুন করে ভাবনার কী আছে তাতে?

আছে! সাংঘাতিকভাবে আছে—পরাশরের মুখটা করুণ হয়ে উঠল—তিনি এবার যা হুকুম পাঠিয়েছেন তাতে আমার স্বাধীন জীবনের দফারফা। ডানা দুটি কেটে এবার খাঁচার মধ্যে বন্দি হতে হবে।

পরাশরের কবিত্বের ভাষার মর্মার্থটা বুঝে একটু হেসে বললাম—হুকুমটা কীসের? বিয়ে করে সংসারী হওয়ার?

সরাসরিভাবে ঠিক তা নয়, পরাশর বিরস মুখে বললে—কিন্তু তার মধ্যে ওই বিপদটাই প্রচ্ছন্ন।

বুঝতে পারলাম না।

পরাশর আমার বোধশক্তির দুর্বলতা নিয়ে কটাক্ষ করবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তার বদলে সে সহজভাবেই বললে—না বোঝবারই কথা। তবে বোঝাবার জন্যে একটু ইতিকথা জানাতে হবে। আমার পিসিমার একটি মাত্র মেয়ে শর্মিলা। মেয়ে না হয়ে কিন্তু তার ছেলে হওয়াই উচিত ছিল।

কেন? —প্রসঙ্গটা হালকাসুরে রাখবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলাম—অলিম্পিক-এর ডিসকাস ছোড়ার চ্যাম্পিয়ান গোছের চেহারা না কি টামারা প্রেস-এর ভগিনী জাতীয়?

না। পরাশর ঠাট্টার সুরটাকে আমলই না দিয়ে বললে—চেহারার কথা বলছি না। চেহারায় তাকে বেশ সুন্দরীই বলা চলে। কমনীয়তারও অভাব নেই। শুধু চালচলনে মেয়েলিপনার ধার দিয়েও সে যায় না। যেমন স্বাধীন তার প্রকৃতি, তেমনি সে খেয়ালী। পিসিমা সেকেলে বুড়োমানুষ, কাশীবাস করেন ধর্মগত সংস্কারে। তবু অনেক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনায় আধুনিকতার দিকেই তাঁর পক্ষপাত দেখেছি। কিন্তু শর্মিলা সম্পূর্ণ আর-এক অর্থে আধুনিকা।

আধুনিকা আবার নানান অর্থে হয় নাকি? কৌতুকের সঙ্গে কৌতূহল মিশল আমার জিজ্ঞাসায়, —আধুনিকা মানে তো সেকেলে সবকিছু বাতিল-করা একেবার হালফ্যাশানের সাহসিকা।

শর্মিলা সে ধরনের আধুনিকা নয়—বোঝাবার চেষ্টা করলে পরাশর, তার পোশাকে-আশাকে কোনও উগ্র বিদ্রোহ নেই শুধু নয়, সে-বিষয়ে সে অত্যন্ত সংযত-সেকেলে। তার বিদ্রোহ মেয়েদের সাধারণ বাঁধাধরা জীবনধারার ছকের বিরুদ্ধে। পিসিমা তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শর্মিলা তখন সবে স্কুল থেকে বেরিয়েছে। সেসব কথা সে গ্রাহ্যই করেনি। নাম লিখিয়েছে এক রাজনৈতিক দলে। মাসকয়েক তাদের সভায় বক্তৃতা দিয়েছে, মিছিলে পাণ্ডা হয়েছে, তারপর বিরক্ত হয়েই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ভর্তি হয়েছে আর্ট কলেজে। সেখানে বছরখানেক মাত্র থেকেই আবার ছেড়ে দিয়ে, এখন 'খাদ্য বাড়াও' ব্রত নিয়ে অন্নপূর্ণা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে গেছে কোনও পাণ্ডববর্জিত ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে।

পরাশর একটু দম নেওয়ার জন্যে থামতেই বললাম—এ তো তোমার পিসতুতো বোনের চরিত্র বর্ণনা শুনলাম। তার মধ্যে তোমার বিপদটা কোথায়? আমাদের সমাজে কাজিন ম্যারেজের চল অন্তত নেই। সমস্যাটা আশাকরি তা নয়?

আরে না, না! পরাশর অধৈর্যের সঙ্গে বললে—শোনোই না সবটা। সমস্যাটা শর্মিলাকে নিয়ে নয়। বয়সে সে আমার দু-বছরের ছোট হলেও মুরুব্বিয়ানায় আমার ঠাকুমা। পিসিমার চেয়ে তাকে সমীহ করে চলতে হয়। সমস্যাটা তার শিষ্যা ও সহকারিণীকে বিনিকে নিয়ে।

বিনি আবার কে?—কথার মাঝখানে বাধা না দিয়ে পারলাম না।

ভালো নাম তার বিনতা, ডাক নাম হয়েছে বিনি। —পরাশর বললে, পিসিমার কাশীর এক তীর্থধর্মের সঙ্গিনী ও বান্ধবীর মেয়ে। পিসিমা শর্মিলার সম্বন্ধে আশা-ভরসা ছেড়েই দিয়েছেন। তাকে শাসন করে, হুকুম করে কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের যখনকার যা-গোঁ তা যে ছাড়ানো যাবে না তা তিনি ভালো করেই জানেন। শর্মিলা সম্বন্ধে ভয়-ভাবনাও তাঁর তেমন কিছু নেই। মেয়ে হয়ে সে অনেকদিকে পুরুষের ওপর টেক্কা দেয়, আর যে-কোনও অবস্থায় নিজেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা যে তার আছে তা তাঁর জানা। তাঁর যা কিছু ভাবনা বিনিকে নিয়ে। বিনি নেহাত সাধারণ, মিষ্টি, নিরীহ একটি মেয়ে। শর্মিলার সঙ্গেই একসঙ্গে পড়ত। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজেও ঢুকেছিল। কিন্তু পড়াশুনা তারও আর হয়নি। শর্মিলা রাজনৈতিক দল ছেড়ে আর্টকলেজে ঢোকবার আগে একবার কাশীতে যায় মার সঙ্গে দেখা করতে। বিনির শর্মিলার ওপর অন্ধ ভক্তি স্কুল থেকেই ছিল। এবার কিছুদিন সঙ্গ পেয়ে বিনি শর্মিলার একেবারে অনুগত শিষ্যা হয়ে ওঠে। শর্মিলার সঙ্গে সেও কলেজ ছেড়ে আর্ট কলেজে পড়তে এসেছিল। আবার আর্ট কলেজে ছেড়ে অন্নপূর্ণা আশ্রমেও গেছে তার সঙ্গে।

এ-অন্নপূর্ণা আশ্রমটি কোথায়? জিজ্ঞাসা করলাম।

নাম সত্যিই অন্নপূর্ণা আশ্রম নয়,—পরাশর একটু হাসল, আমি ঠাট্টা করে অন্নপূর্ণা আশ্রম বলি। আসল নামটা গালভারি—গ্রামলক্ষ্মী সমবায়। তাতে পোলট্রি, ডেয়ারি, তাঁত—সবকিছুরই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করা হয়েছে বলে শুনি। নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। জায়গাটা পাণ্ডববর্জিত বলা ঠিক নয়, ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, কিন্তু এখন ধ্বংসস্তূপের দেশ। কলকাতা থেকে প্রায় সওয়া একশো মাইল দূরে চিরতী বলে একটা গ্রাম। সেই গ্রামেরও বাইরে একটা ধ্বংসপুরী গোছের পোড়ো বাড়ি আর তার চারধারের লালমাটির ডাঙা নিয়ে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পত্তন করা হয়েছে।

বলো কী! —অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করতে হল—ওই দুটি মেয়ে ওই খাঁ-খাঁ তেপান্তরের মধ্যে পোড়ো একটা বড়িতে সঙ্গী-সহায় ছাড়া একলা থাকে! কত আর বয়স হবে দুজনের? বড় জোর কুড়ি-একুশ?

বয়সটা ঠিকই ধরেছ। পরাশর বললে, শর্মিলার একুশ আর বিনির কুড়িই হবে। তবে ঠিক সঙ্গী-সহায় ছাড়া নয়। চিরতী গ্রামের বাইরে ওই পোড়ো ভিটে আর তার আশপাশের জমিজমা ছিল পিসিমার এক নন্দাইয়ের। তাঁদের বংশ প্রায় লোপই পেয়েছে। সিংহরায় তাঁদের পদবি। এককালে ক্ষুদে রাজা হিসেবে ও-অঞ্চলে সিংহের মতোই তাঁদের প্রতাপ ছিল। কিন্তু ধীরে-ধীরে সে-প্রতাপ অস্তে গেছে। বংশধারাও এসেছে শুকিয়ে। পিসিমার নন্দাই আর তাঁর ছোটভাই ছিলেন সিংহরায়দের শেষ বংশধর। পিসিমার নন্দাই আর ননদ নিঃসন্তান অবস্থাতেই বিদেশে মারা গেছেন। তাঁর ছোটভাই বিক্রম সিংহরায়ও বিদেশে মানে বর্মায় কাজ করতেন। সেখান থেকে শেষ বয়সে বর্মার নতুন আইনে প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে দেশে ফিরে ওই পুরনো ভিটেতে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বিয়ে-থা-ই করেননি। শর্মিলা যখন আর্ট কলেজে পড়বার আগে কাশীতে ছিল কিছুদিনের জন্যে, বিক্রম রায় তখন একবার কাশী বেড়াতে গিয়ে পিসিমার সঙ্গে দেখা করেন। শর্মিলা তাঁর কাছেই তখন ওই জায়গার বিবরণ শোনে। মাথার মধ্যে কথাটা তার ছিল। ছবি আঁকা শিখতে-শিখতেই গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পরিকল্পনাটা তার মনের মধ্যে বোধহয় পাকিয়ে ওঠে ওই জায়গাটাকে কেন্দ্র করে। তারপর বিনিকে নিয়ে হঠাৎ একদিন সেখানে গিয়ে হাজির—মুরগি, হাঁস, গরু, ছাগল পুষে আর তার সঙ্গে তাঁত বসিয়ে গ্রামের

অর্থনীতির সংস্কার করবে বলে। একেবারে নিঃসঙ্গ-নিঃসহায় তাই ওরা নয়। বৃদ্ধ বিক্রম সিংহরায় নাম-কে-ওয়াস্তে হলেও পাহারাদার ও অভিভাবক হিসেবে আছেন।

পরাশর থামবার পর একটু কৌতুকের স্বরে বললাম—সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনিয়েও তোমার সংকটটা কী তা কিন্তু বোঝাতে পারলে না। তোমার পিসিমার হুকুমটা কী, যাতে তুমি এত বিচলিত? ওই চিরতীতে গিয়ে গরু-ছাগল-মুরগি আর তাঁতের খবরদারি করা?

না,—পরাশরের মুখে যেন আশঙ্কার ছায়া পড়ল—হুকুম ওখান থেকে বিনিকে উদ্ধার করে কাশীতে ফিরিয়ে দিয়ে আসা। নিজের মেয়ের ওপর তাঁর কোনও হাত নেই তিনি জানেন। তার জন্যে ভাবনাও ছেড়ে দিয়েছেন বলেন। কিন্তু তাঁর তীর্থের পাতানো দিদির মেয়ে বিনির শর্মিলার পাল্লায় পড়ে আখেরটা নষ্ট হচ্ছে এই ভাবনাতেই তাঁর শুয়ে-বসে শান্তি নেই। আমাকে তাই লিখেছেন, যেমন করে হোক, বিনিকে ওখান থেকে নিয়ে তাকে কাশীতে পৌঁছে দিতেই হবে। চিঠিটা লিখেছিলেন ঢাকার ঠিকানায়, সেখান থেকে কাল সকালে হোটেলে এসে পৌঁছেছে।

এতে এত বিচলিত হওয়ার কী আছে তা তো বুঝতে পারছি না! সত্যি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—মেয়েটিকে ওখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়া এমন কিছু শক্ত কাজ তো নয়!

শক্ত কাজ নয়! —পরাশর আমার ওপরই একটু যেন চটে উঠে বললে—প্রথমত, আমি গিয়ে আঙুল নেড়ে ডাকলেই বিনি চলে আসবে কেন আমার সঙ্গে? আর দ্বিতীয়ত, যদি বা কাশী ফিরে যেতে রাজি হয় তা হলে তাকে কাশীতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে আমি কি আর ফিরতে পারব?

কেন? না পারার কারণ?

কারণ এই যে,—পরাশর ঝাঁঝের সঙ্গে বললে—পিসিমা তা হলে আর আমায় স্বাধীনভাবে ফিরতে দেবেন না। এই বিনির সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা মনে-মনে অনেকদিন থেকেই তিনি ঠিক করে রেখে দিয়েছেন। এতদিন শুধু নাগালের মধ্যে পাননি।

তা স্বাধীনতা না-হয় বিসর্জনই দিলে! মুচকে হেসে বললাম—দিতে তো হবেই একদিন। বিনি মানে বিনতা দেবী দেখতে-শুনতে কেমন? হতকুচ্ছিত-টুচ্ছিত নয় নিশ্চয়!

হতকুচ্ছিত! পরাশরই জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ জানালে—অমন মেয়ে হাজারে একটা দেখা যায় না। যেমন চেহারায় তেমনি স্বভাবে। কিন্তু আমি যে স্বাধীনতা খোয়াতে কিছুতেই পারব না।

তবু তোমার মনে একটু দুর্বলতা যে আছে তা তো লুকোতে পারছ না! কৌতুকের সঙ্গেই বললাম—শুধু পিসিমার উদ্দেশ্য বুঝেই নয়, নিজের দুর্বলতার জন্যেই তুমি বিনির কাছে ঘেঁষতে চাও না। কেমন তাই না?

তা একেবারে মিথ্যে নয়! পরাশর স্বীকার করলে, মানুষের মনকে তো বিশ্বাস নেই। শক্ত রাশও হঠাৎ ছিঁড়ে যায়।

তা হলে এক কাজ করো না! —সুপরামর্শই দেওয়ার চেষ্টা করলাম—চিঠিটা তো ঢাকা থেকে রি-ডাইরেক্টেড হয়ে এ-হোটেলে এসেছে। যেন ডাকের গোলমালে চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছোয়নি এইভাবেই চেপে যাও না।

চেপে যাব! —পরাশর প্রায় স্তম্ভিত—পিসিমার চিঠি পেয়েও যেন পাইনি বলে বোঝাব তাঁকে!

পিসিমার প্রতি মনের মধ্যে গাঁথা ভয়-ভক্তিটা পরাশরের মনের মধ্যে কত গভীর তা তার মুখের ভাবেই বুঝলাম।

তাই এবার বললাম—তা হলে তো আর উপায় নেই? এক কাজ শুধু করতে পারি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো তোমার সঙ্গে আমিও যেতে পারি সেখানে, তোমার কী বলে ভ্যাকুয়ম ব্রেক হিসেবে। বলো, আপত্তি আছে?

আপত্তি! পরাশর যেন অকূলে কূল পেল—তুমি যদি যাও তো তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব।

পরাশরের উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বললাম—ঋণী-টিনি কিছুই তোমার থাকতে হবে না। অভিজ্ঞতার একটু মুখবদল করার সুযোগ পেয়ে আমি নিজের খুশিতেই যাচ্ছি।

সে-অভিজ্ঞতা যে কী তখন যদি জানতাম!

তিন

এই ব্যবস্থাই পাকা করে পরের দিন ভোর সাড়ে ছ'টায় হাওড়ায় গিয়ে ট্রেন ধরলাম।

ট্রেন নয়, যেন গরুর গাড়ি।

সকাল সাড়ে ছ'টায় ট্রেনে উঠেও টিকোতে-টিকোতে গন্তব্য স্টেশনে গিয়ে পৌঁছোলাম বেলা একটায়।

যেমন রেললাইন, স্টেশনেরও তেমনি ছিরি।

শুকনো বাঁকা লাল কাঁকরের দেশ। দুপুরের রোদে চারিদিক খাঁ-খাঁ করছে।

একটিমাত্র অত্যন্ত নিচু প্ল্যাটফর্ম। নেহাত পাথরের একটা সাইনবোর্ড না থাকলে স্টেশন বলে চেনাই যেত না।

ইটের গাঁথুনি আর করোগেটের টিনে-ছাওয়া একটা বড় গোছের ঘরেই স্টেশনের যাবতীয় কাজ হয়।

স্টেশনমাস্টার আর-একজন খালাসী ছাড়া স্টেশনে আর কেউ কাজ করে বলে মনে হল না।

আমাদের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটারই জাত-কুল কিছু নেই। কিন্তু সেও যেন এই অখদ্দে স্টেশনটাকে তাচ্ছিল্য করে একটু ঘৃণাভরে থেমে আমরা নামতে না-নামতেই ছেড়ে দিলে।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাই ফাঁকা।

আমরা দুজন ছাড়া আর কোনও যাত্রী নামেনি বা ওঠেনি।

নতুন অজানা জায়গায় খোঁজখবর কারুর কাছে না নিলে নয়। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নীল কোর্তাপরা রেলের খালাসীকে স্টেশনের ঘরের দিকে যেতে দেখে তাকেই ডাকলাম।

ও ভাই, শুনছ!

মানুষটি কালা বা অন্যমনস্ক যা-ই হোক, সে-ডাক অগ্রাহ্য করে স্টেশনের ভেতরেই চলে গেল।

অগত্যা তার পিছু-পিছু সেখানেই গিয়ে ঢুকতে হল।

খালাসীটিকে সেখানে দেখতে পেলাম না। আমরা পৌঁছোবার আগেই ওদিকের দরজা দিয়ে স্টেশনের পিছন দিকে সে বেরিয়ে গেছে বোধহয়।

ঘরটায় আর কেউ আছে বলেও মনে হল না প্রথমে। টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শুধু দূরের কোনও বার্তা নিয়ে একঘেয়েভাবে বেজে যাচ্ছে।

এদিক-ওদিক চেয়ে কী করব ভাবছি, এমনসময় ভারি গম্ভীর গলার আওয়াজ পেলাম পিছনেই।

কী চাই আপনাদের?

চমকে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাকই হলাম। অমন ভারি বাজখাঁই আওয়াজ যাঁর গলা থেকে বেরিয়েছে সে-মানুষটি নেহাত ছোটখাট্ট, বামন বললেই হয়।

এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয় বলে বিস্ময় প্রকাশ করবার মতোই চেহারা।

গায়ের কোটটা দেখেই বুঝলাম, তিনিই স্টেশনমাস্টার। পিছন দিকের দরজা দিয়ে সবে এসে ঢুকেছেন।

আমরা কিছু বলবার আগেই তিনি নিজে থেকে আবার বললেন—ট্রেন তো এইমাত্র ছেড়ে গেল। সন্ধে ছ'টা আটচল্লিশের আগে তো আর ট্রেন পাবেন না।

সবিনয়ে বলতে যাচ্ছিলাম—না, আমরা...।

তিনি তার আগেই বাধা দিয়ে বললেন—ও, আপনারা ডাউনে যেতে চান? তা সে-ট্রেনও বিকেল সাড়ে তিনটেয়।

স্টেশনমাস্টারের কর্তব্য শেষ করে তিনি কাঠের রেলিংয়ের কাটা দরজাটা খুলে তাঁর অফিসের টেবিলে গিয়ে বসলেন।

বিনীতভাবে এবার নিবেদন করলাম—আমরা আপ-ডাউন কোনওদিকেই যাব না। এইমাত্র এই স্টেশনেই আমরা গাড়ি থেকে নেমেছি। এখন...।

ও নেমেছেন!— আবার বাধা দিলেন স্টেশনমাস্টার মশাই—আপনাদের টিকিট?

টিকিট দুখানা হাতেই ছিল। সে দুটো তাঁকে দিলাম।

আমাদের বিনা টিকিটের যাত্রী বলে সন্দেহ করেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু টিকিট দুটো হাতে পেয়েই স্টেশনমাস্টারের মুখের চেহারা যেন বদলে গেল।

তাঁর ক্ষুদে চেহারার পক্ষে অফিসের টেবিলটা বেশ উঁচু। দুখানা ইট তলায় দিয়ে বসবার চেয়ারটাকে যথেষ্ট উঁচু করতে হয়েছে, তাও বেশ একটু যেন কসরত করেই তাতে উঠে বসে ভদ্রলোক এবার প্রসন্ন মুখে বললেন—ও, আপনারা বেড়াতে এসেছেন এখানে। বেশ! বেশ! বসুন, বসুন।

বসবার জায়গা একটা ভাঙাগোছের তেপায়া বেঞ্চি। সেটা একদিকে পায়ার বদলে ইট সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

নিজেদের গরজেই সেখানে বসে বলবার চেষ্টা করলাম—আমরা এখানে এই প্রথম...।

এবারও কথাটা শেষ করা গেল না।

স্টেশনমাস্টার মশাই তার মাঝখানেই বললেন—আহা, প্রথম বুঝতেই পারছি। প্রথম নয় তো বারবার কেউ কি আর এখানে সাহস করে আসে! তবে প্রথম একবার আসবার মতো জায়গা। য়ুয়ান চোয়াঙ-ও এসেছিলেন।

মাস্টারমশাইয়ের গলায় এবার উৎসাহের উচ্ছ্বাস। তবু য়ুয়ান চোয়াঙ শুনে আমরা বেশ একটু থ' হয়ে গেছি।

পরাশর নিজের দরকারটা ভুলে একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে—য়ুয়ান চোয়াঙ মানে সেই চীনা পর্যটক এখানে এসেছিলেন?

এসেছিলেন বইকী!— স্টেশনমাস্টার সোৎসাহে জানালেন—এখানেই তিনি লো-টো-বী-চী মানে রক্তভিত্তি নামে বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম দেখে তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণনা করে গেছেন। এ-জায়গাটা তো হল সেই আদিকালের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। শ'দুই বছর আগেও এখানকার নাম ছিল কানসোনা। সে-রাজধানীই ছিল চার মাইল লম্বা-চওড়া আর রাজ্য ছিল প্রায় তিনশো মাইল এদিকে-ওদিকে। এখানে হুয়েন সাং বা এখন আপনাদের পণ্ডিতেরা যাঁকে বলেন য়ুয়ান চোয়াঙ, তিনি সম্রাট অশোকের বসানো কয়েকটা চৈত্যও দেখেছেন। এখানে বৌদ্ধ সঙ্ঘারামই তো ছিল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা। বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্ত সম্প্রদায়েরও ছিল তিনটে সঙ্ঘারাম আর হিন্দু মন্দির অন্তত পঞ্চাশটা। সেসবের চিহ্নও আজকাল অবশ্য খুঁজে পাওয়া দায়।

স্টেশনমাস্টার সেই অতীতের দুঃখেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—এসে ভালোই

করেছেন। আপনাদের বয়স থেকেই তো এসব বিষয়ে আগ্রহ থাকা দরকার। তবে এসেছেন বড় অসময়ে। এই গরমের দিনে এ-অঞ্চল তো একেবারে আগুনের খোলা। দিনেরবেলা ঘুরে-ফিরে দেখতেই পারবেন না।

এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরের নগণ্য একটা স্টেশনে, মাথায় হাত-আড়াই মাত্র এমন একটি বালখিল্য প্রত্নতত্ত্ববিশারদ স্টেশনমাস্টারের দেখা পাব কল্পনা করতেও পারিনি।

আমাদের এ-স্টেশনে নামার উদ্দেশ্য তিনি যা বুঝেছেন তার প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে হল না এখন।

তা ছাড়া উদ্দেশ্যটা আগে যা ছিল সেটা একটু বিস্তৃত করে নিয়ে তার মধ্যে এসব পুরাকীর্তির সন্ধান নেওয়া ঢুকিয়ে দিলে ক্ষতি কী?

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের কথার যেন জের টেনেই পরাশর তাই বললে—এ-সময়ে এদিকে এসব দেখতে বড় কেউ তা হলে আসে না?

অন্য সময়েই বা বেশি আসে নাকি? স্টেশনমাস্টার মশাই তাঁর দুঃখটা প্রকাশ করলেন—আমরা দিল্লি-আগ্রা জয়পুর দেখতে যাই বুঝেছেন, বাংলাদেশে কী ছিল না-ছিল তার জন্যে ক'জন মাথা ঘামায়। আপনারা যে এসেছেন তাই যথেষ্ট। আপনাদের এ-বয়সে আর গরম-ঠাণ্ডা কি গ্রাহ্য করবার জিনিস নাকি। তবে এখানে থাকবার একটা ব্যবস্থা দরকার। তা...।

ওই পর্যন্ত বলেই মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের। উঁচু চেয়ার থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নিচে নেমে একটু উত্তেজিতভাবেই আবার বললেন—যাক, মেঘ না চাইতে জল পেয়ে গেছেন মশাই। আপনাদের এখানে থাকার সমস্যা মিটে গেছে। আসুন, আসুন, চৌধুরীমশাই।

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমরা আগেই বাইরের দরজায় নূতন আগন্তুককে দেখেছি।

স্টেশনমাস্টার মশাইয়ের গলায় যে-সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে তারই যোগ্য সম্ভ্রান্ত সম্পন্ন চেহারা চৌধুরীমশাইয়ের। স্টেশনমাস্টার যেমন একরত্তি মানুষ, চৌধুরীমশাই তেমনি দশাসই, বিরাট, বলিষ্ঠ সুপুরুষ। বয়সটা যৌবন-সীমান্ত ছুঁই-ছুঁই করছে বটে, কিন্তু শরীরের সামান্য মেদবৃদ্ধি আর জুলফির চুলের একটু পাক তাঁর আভিজাত্যকে যেন আরও স্পষ্ট করে তুলেছে।

মুখের হাসিটি তাঁর অমায়িক। স্টেশন-ঘরে ঢুকে আমাদের দিকে একবার বিস্মিত দৃষ্টি একটু বুলিয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আজ আপনার অভ্যর্থনাটা যেন একটু বেশি সাদর মনে হচ্ছে! ব্যাপার কী বক্সীবাবু?

আপনার অভ্যর্থনা সব জায়গাতে সবসময়েই সাদর। হেসে বললেন স্টেশনমাস্টার বক্সীবাবু—তবে আজ একেবারে প্রার্থনাপূরণের মতো যথাসময়ে আবির্ভাবটা আপনার হয়েছে বলে উচ্ছ্বাসটা একটু বেশি জানিয়ে ফেলেছি। এইমাত্র আপনার কথাই ভাবছি, আর আপনি সশরীরে এসে হাজির। এঁরা দুজন এখানকার সব পুরনো আমলের জিনিস দেখতে আজ দুপুরের ট্রেনে এখানে নেমেছেন। আপনার কাছেই আতিথ্য নিতে এঁদের পাঠাতে যাচ্ছিলাম। তা ওঁদের চিঠি দিয়ে পাঠাবার আর দরকার হল না।

চৌধুরীমশাই প্রসন্ন দৃষ্টিতে আবার আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন বক্সীবাবুকেই—আপনার আত্মীয় বুঝি?

আত্মীয়! বক্সীবাবু এবার অপ্রস্তুতভাবে বললেন—না আত্মীয়-টাত্মীয় নয়।

আমাদের নামধামটুকুও যে তাঁর জানা হয়নি সেটা এতক্ষণে খেয়াল করে বললেন—আমিও ওঁদের চিনি না। রাঙামাটির পুরাকীর্তি দেখতে এসেছেন বলেই ওঁদের থাকবার ব্যবস্থার কথা ভাবছিলাম। সত্যি, আপনাদের নামগুলোই তো এখনও জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

পরাশর ও আমি এবার আমাদের নাম-ধাম যথাসম্ভব সংক্ষেপে বললাম।

চৌধুরীমশাই নিজেই এবার উৎসাহভরে খুশি মুখে বললেন—সেই ঢাকা থেকে এতদূর এসেছেন রাঙামাটির সেকেলে কীর্তি দেখতে? এসেছেন কি ইতিহাস পড়ে, না কারুর কাছে শুনে?

এবার সত্য কথাটা জানাবার সুযোগ পাওয়া গেল।

পরাশর একটু ইতি গজ করে বললে—আমরা, সত্যি কথা বলতে গেলে, শুধু এইসব দেখতেই আসিনি। এখানে সিংহীর জাঙালবাড়ি কোথায় জানেন বোধহয়। সেইখানে আমাদের একটু কাজও আছে।

আপনারা জাঙালবাড়িতে যাবার জন্যে এসেছেন!

বক্সীবাবুর মুখে এবার স্পষ্ট একটু উদ্বিগ্ন বিস্ময়ের ছায়া দেখা গেল।

তিনি একটু চুপ করে থেকে একটু যেন ক্ষুণ্ণস্বরে আবার বললেন—কই আগে বলেননি তো!

না, মানে—বলবার ঠিক সুযোগ পাচ্ছিলাম না। লজ্জিতভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করলে পরাশর—সিংহীদের জাঙালবাড়িটায় যাবার রাস্তা জানতেই আপনার এখানে ঢুকেছিলাম।

জাঙালবাড়িই যে আমাদের গন্তব্য সে-কথাটা আগে না জানাবার ত্রুটিটা যে বক্সীবাবুর কাছে বড় নয়, তাঁর পরের কথাতেই তা বোঝা গেল। বিষণ্ণ সহানুভূতির স্বরে তিনি যা জিজ্ঞাসা করলেন তাতে আমরা কিন্তু বিমূঢ়।

বক্সীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—জাঙালবাড়ির দুঃসংবাদটা পেয়েই তা হলে আপনারা আসছেন?

দুঃসংবাদ! কী দুঃসংবাদ? —পরাশর অস্থির উদ্বেগের সঙ্গে বললে—সু বা কু কোনও খবরই তো আমরা জানি না! কী হয়েছে কি সেখানে?

আপনারা কিছু না জেনেই এসেছেন! —এবার চৌধুরীমশাই বিস্ময় প্রকাশ করলেন—আশ্চর্য তো!

পরাশর দুর্ভাবনায় উদ্বেগে একটু রূঢ়স্বরেই এবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু ব্যাপারটা কী একটু দয়া করে খুলে বলবেন আপনারা? কী হয়েছে জাঙালবাড়িতে? শর্মিলা আর বিনতা বলে যে দুটি মেয়ে ওখানে থাকে তাদের কার কী হয়েছে?

তাদের কারুর কিছু হয়নি। —শান্ত স্বরে চৌধুরীমশাই-ই এবার জানালেন—কিন্তু যাঁর ভরসায় ওঁরা এখানে আছেন, সেই ওঁদের পিসেমশাই বিক্রম সিংহরায় আজ তিনদিন হল নিরুদ্দেশ।

নিরুদ্দেশ! পরাশরের ব্যাপারটা বুঝতেই যেন দেরি লাগল।

অবিশ্বাসের সুরে সে বললে—কিন্তু তিনি তো প্রায় বৃদ্ধ লোক। নিজের শেষ বয়সের আশ্রয় ছেড়ে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবেন কেন? তাঁর বাড়িতে এমন সোনাদানা-হীরে-মানিকও ছিল না যার জন্যে কেউ তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। নাম সিংহীদের জাঙালবাড়ি, কিন্তু একটা মান্ধাতার আমলের পোড়োভিটে বলেই তো শুনেছি। শর্মিলা যার নাম সে আমার পিসতুতো বোন। তার বান্ধবী বিনতাকে নিয়ে কোনওরকমে পোড়োভিটের খানিকটা যৎসামান্য মেরামত করেই আছে বলে তো জানি। ওখান থেকে সিংহরায়ের মতো বৃদ্ধ লোকের লোপাট হবার কোনও কারণ তো নেই।

ঠিকই বলেছেন—সহানুভূতির স্বরে বললেন চৌধুরীমশাই—আমরা এখানকার সবাই তো এ-ব্যাপারে তাজ্জব বনে গিয়েছি। এটা অজ তেপান্তরী মফঃস্বল বটে কিন্তু এমন বিশ্রী কাণ্ড কখনও এখানে ঘটেনি। ভাবনা হয়েছে আমাদের ওই মেয়ে দুটির জন্যেই। বুড়োই হন, আর অথর্বই হন, মাথার ওপর অভিভাবক হিসেবে তো সিংহরায়মশাই ছিলেন। এখন মেয়ে দুটির এখানে থাকাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাহস অবশ্য ওদের যথেষ্ট! —বক্সীবাবু প্রশংসার সুরে বললেন—বিশেষ করে ওই শর্মিলা মেয়েটির। আমার কাছে ইদানীং রাঙামাটির পুরনো ইতিহাস শুনতে আর তেমন কিছু পুরনো জিনিস পেলে দেখাতে আসে মাঝে-মাঝে। আমিও ছুটিছাটা পেলে জাঙালবাড়ি যাই। মেয়েটির সঙ্গে কথা

বলে, তার সাহস আর মনের বল দেখে অবাক হয়েছি। দিনকাল অনেক বদলেছে, তবু দুটি ওই বয়সের যুবতী মেয়ের ওই গ্রামের বাইরে খাঁ-খাঁ করা পোড়োভিটেতে শুধু একজন বুড়োর ভরসায় থাকা তো চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু এখন সে-ভরসাও নেই। তাই আগে মনে-মনে যত বাহবাই দিয়ে থাকি এখন আর ওদের ওখানে থাকা কোনওমতেই উচিত নয় বুঝতে পারছি। যাক, খবর কিছু না জানলেও আপনারা যে ঠিক এই সময়েই এসেছেন এটাও ভাগ্য বলতে হবে। ভগবানই আপনাদের পাঠিয়েছেন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এখন ওদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

বক্সীবাবু একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে একটু হাঁফিয়ে মিনতিভরে আমাদের দিকে তাকালেন।

পরাশর তাঁকেই যেন আশ্বাস দিয়ে বললে—হ্যাঁ, তা ছাড়া আর উপায় কী!

একটু থেমে তারপর আবার বললে—এখন জাঙালবাড়ি যাওয়ার রাস্তাটা একটু যদি বুঝিয়ে দেন।

রাস্তা বোঝাতে হবে কেন! চৌধুরীমশাই উদারভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন—আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদের ওখানে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।

না, আপনাকে মিছিমিছি কেন কষ্ট দেব! —আমরা একটু প্রতিবাদ করতে গেলাম।

কিন্তু চৌধুরীমশাই সে-প্রতিবাদ হেসেই উড়িয়ে দিলেন—আরে কষ্ট কী মশাই। আমি তো আপনাদের অতিথি হিসেবেই পেতে চাইছিলাম। এখনও যদি ইচ্ছে করেন তো আমার ওখানেই উঠতে পারেন।

অনেক ধন্যবাদ! —আমরা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সবিনয়ে বললাম—কিন্তু এখন যা অবস্থা হয়েছে তাতে জাঙালবাড়ি ছেড়ে আপনার আতিথ্য নেওয়া উচিতও হবে না বোধহয়।

তা অবশ্য হবে না।— চৌধুরীমশাই স্বীকার করে একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন, আমি তো শর্মিলাদেবী আর বিনতাকেও এ-ব্যাপারের পরে আমার বাড়িতে এসে থাকবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলাম। আমার মেয়ে তো ওদেরই বয়সী, অসুবিধে কিছু ওদের হত না। কিন্তু বড় একগুঁয়ে মেয়ে ওই আপনাদের শর্মিলা। কিছুতেই রাজি হয়নি। কী আর করব, তাই আমারই দুজন পাইককে পাহারায় থাকতে হুকুম দিয়েছি দিনরাত।

একটু হেসে চৌধুরীমশাই আবার বললেন—তাও জানলে হয়তো মানে লাগবে বুঝে লুকিয়েই এ-ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আপনারা ফাঁস করে দেবেন না যেন।

না, তা করব না। পরাশর আশ্বাস দিয়ে তারপর জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, সিংহরায়মশাইয়ের এ নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে এখানকার থানা-পুলিশ কিছু করেনি?

বলছে তো যা করবার করেছে! —চৌধুরীমশাই বেশ একটু অপ্রসন্ন অনুযোগের সুরে বললেন—কিন্তু পুলিশ বিশেষ করে এইরকম অজ থানার পুলিশ কতখানি উৎসাহী আর কাজের হয় তা তো জানেন। এদিক-ওদিক একটু খোঁজখবর করে তারা বরং একটু উল্টোকথারই আভাস দিয়েছে।

উল্টোকথাটি কী? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছি আমরা।

বলছে, নিজেই হয়তো রাগারাগি করে কোথাও চলে গেছেন। মেয়ে দুটির সঙ্গে ওই গ্রামলক্ষ্মী সমবায় নিয়েই দু-দিন আগে তাঁর কী ঝগড়াঝাটির কথা নাকি পুলিশ ও-বাড়ির এক মুনিশের কাছ থেকে বার করেছে।

না। এ অসম্ভব! পরাশর তীব্র প্রতিবাদ জানালে।—বিক্রম সিংহরায় সে-ধরনের মানুষই নন বলে আমি জানি। শর্মিলাকে তিনি নিজে সাদরে এখানে ডেকে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করতে উৎসাহ, সাহায্য—সব দিয়েছেন।

তা কি আর আমরা জানি না? চৌধুরীমশাই পরাশরের কথায় সায় দিয়ে বললেন—এ শুধু

পুলিশের দায় এড়াবার একটা ফিকির। যাক, আপনারা তো এখন জাঙালবাড়িতেই যাচ্ছেন, ওদের মুখ থেকে আরও ভালো করে সব শুনতে পাবেন।

একটু থেমে কিছুটা যেন কুণ্ঠিতভাবে বক্সীবাবুর দিকে ফিরে চৌধুরীমশাই এবার পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—আপনাকে এটা দিতেই এসেছিলাম বক্সীবাবু। আমার তো দামি কিছু বলেই মনে হচ্ছে। তবে মুখ্খু আনাড়ি তো! শালুককে পদ্মফুল ভেবে না হাস্যাস্পদ হই। আপনার রায় পেলে সাহস করে কর্তাদের কাছে পাঠাতে পারব। একটু দেখে রাখবেন।

নিশ্চয় দেখব। বলে বক্সীবাবু সোৎসাহে কাগজের মোড়কটা নেওয়ার পর চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে তাঁর গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

চার

পুরনো হুডখোলা একটা মরিস গাড়ি। চৌধুরীমশাই নিজেই তা চালান।

পরাশর সামনে তাঁর পাশে বসেছে। আমি আমাদের সামান্য মালপত্র নিয়ে বসেছি পিছনের সিটে।

জায়গাটার নাম রাঙামাটি নাকি ছিল। তার বদলে পোড়ামাটি রাখলেই বুঝি ভালো হত। প্রথম গ্রীষ্মের রোদে চারিদিক যেন তেতে আগুরা হয়ে আছে মনে হয়েছে।

রুক্ষ রাঙা মাটি বলেই কাঁচা রাস্তাটা তেমন অবশ্য খারাপ নয়।

স্টেশন ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই দূরের গ্রামটা দেখা গেছে। তার মধ্যে কয়েকটা পাকা বাড়ি ও মন্দিরের চুড়ো খড়ো সব মাটির বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। একটি বাড়ি তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। দূর থেকেই প্রাধান্যটা বোঝা যায়। শুনলাম সেইটেই চৌধুরীমশাইয়ের পৈতৃক বাড়ি। আগেই অবশ্য সেইরকমই অনুমান করেছিলাম।

গাড়ি কিন্তু গ্রামের রাস্তায় গেল না। গ্রামকে একধারে ফেলে একটা ঢেউ খেলানো বাঁজা ডাঙার ওপর দিয়ে চলল।

আমাদের কৌতূহল অনেক। যেতে-যেতে চৌধুরীমশাইয়ের কাছে যতদূর সম্ভব মেটাবার চেষ্টা না করে পারিনি।

গাড়িতে ওঠবার খানিক বাদেই পরাশর জিজ্ঞাসা করেছিল—বক্সীবাবুকে কাগজের মোড়কে কী দিলেন? প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত কিছু?

হ্যাঁ। গাড়ি চালাতে-চালাতে চৌধুরীমশাই বলেছেন একটু যেন লজ্জিতভাবে হেসে—দুটো পুরনো মুদ্রা গোছের সেদিন এক জায়গায় খুঁড়তে-খুঁড়তে পেয়েছি। এখানে কণিষ্ক আর গুপ্ত যুগের কয়েকটা মুদ্রা আগে পাওয়া গেছে। নিজে দেখে তো ঠিক বুঝতে পারলাম না। তাই বক্সীবাবুকে দিয়ে এলাম পরীক্ষা করতে।

বক্সীবাবু এসব ব্যাপারের বিশেষজ্ঞ নাকি! —জিজ্ঞাসা করেছি আমি, করেন তো স্টেশনমাস্টারি!

স্টেশনমাস্টারি করেন তো শুধু পেট চালাতে। চৌধুরীমশাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন বক্সীবাবুর গুণকীর্তনে—নইলে এই প্রত্নতত্ত্বই ওঁর নেশা আর ধ্যানজ্ঞান। বিয়ে-থা করেননি, অন্য কোনও দায় নেই। শুধু এই এক নেশা নিয়েই মত্ত হয়ে আছেন। এ-স্টেশনে আছেন প্রায় বারো বছর। প্রোমোশন নেননি এখান থেকে বদলি হবার ভয়ে। সেরকম কোনও কথা উঠলে ওপরওয়ালাদের হাতে-পায়ে ধরে বদলি ঠেকিয়েছেন। এ-অখদ্দে স্টেশনে সাধ করে কেউ তো আর আসতে চায় না। তাই এ নিয়ে বিশেষ কিছু অসুবিধেও হয়নি।

কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে ওঁর এত উৎসাহ হল কোথা থেকে?— জিজ্ঞাসা করলে পরাশর— উনি কি আর্কিওলজির ছাত্র ছিলেন?

না, না, সেসব কিছু নয়। হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই—তখনকার দিনে ম্যাট্রিকটা কোনওরকমে পাশ করে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলেন। ঘষতে-ঘষতে কিছুদূর পর্যন্ত উঠে প্রথম ভার পেয়েছিলেন এই স্টেশনের। তখন এটা একটা ফ্ল্যাগ স্টেশন মাত্র। এখানে আসবার পর রাঙামাটির পুরনো সত্য-মিথ্যা গল্পগুজব সেকেলে লোকেদের মুখে কিছু-কিছু শুনে আর দু-একটা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে এ-বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। বইপত্র সাধ্যের অতিরিক্তও কিনে পড়াশুনা করতে শুরু করেন তখন থেকেই। পণ্ডিত বলে নাম কেনবার কোনও লোভ কিন্তু নেই। এই নিয়ে মেতে থেকে যখন যা-কিছুর সন্ধান পান তা প্রত্নদপ্তরেই পাঠিয়ে দেন বেশিরভাগ। শুধু সেসব জিনিস পরীক্ষা করে তার পাঠোদ্ধার বা যথার্থ মূল্য নির্ণয় যে তিনি করতে পেরেছেন চিঠিপত্রে তাদের কাছে এইটুকু তারিফ পেলেই উনি খুশি। আমি তো এখানেই জীবন কাটালাম। এই বয়সে আমাকেও এ-নেশা উনিই ধরিয়েছেন।

আপনারা তেমন দামি কিছু এখানে পেয়েছেন কি এ-পর্যন্ত?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, তেমন কিছু গর্ব করবার মতো এখনও পাইনি। —চৌধুরীমশাই একটু যেন ইতস্তত করে বলেছেন—মুশকিল হয়েছে কী জানেন, আমাদের মতো শখ করে প্রত্নতত্ত্ব যারা চর্চা করে তাদের তো আর সরকার বিভাগে হুকুমনামা নেই। এখানে-সেখানে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পাই তা-ই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

সামনে রাস্তার মধ্যে একপাল গরুর জন্যে চৌধুরীমশাইকে গাড়ি একটু সাবধানে ধীরে-ধীরে চালাতে হয়েছে। আর সেইখানেই, আমার জীবনের রঙ যে বদলে দেবে, আমার সেই স্বপ্নের মেয়েকে হঠাৎ সেই গরুর পালের ক্ষুরে-ক্ষুরে লাল ধুলো ওড়ানো রাস্তায় আমি দেখেছি।

মেয়েটি প্রায় ছুটেই আসছিল। আমাদের গাড়িটা দেখে সে থমকে থেমে দাঁড়িয়েছে।

চৌধুরীমশাইও তাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে গাড়িটা থামিয়েছেন।

মেয়েটি গাড়ির বাঁ-ধারেই একটু সরে দাঁড়িয়েছিল। স্থান-কাল ভুলে আমি তখন অভিভূতের মতো তার দিকে তাকিয়ে আছি।

সুন্দরী তাকে হয়তো বলা চলে। কিন্তু আলুথালু বেশে লাল ধুলো মাখা চুল ও মুখের উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় সে-সৌন্দর্য চাপাই পড়ে গেছে তখন। আমি তার ওপর থেকে যে চোখ ফেরাতে তখন পারিনি, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে বুঝি কবিত্ব করা ছাড়া উপায় নেই। মনের মধ্যে নিজের অজান্তে এঁকে রাখা একটা কল্পনার ছবিই যেন আমি হঠাৎ সামনে সশরীরে উপস্থিত থাকতে দেখে বিহ্বল হয়ে গেছি।

অতি দীর্ঘ মনে হলেও এ বিহ্বল আচ্ছন্নতা দু-এক সেকেন্ডের মাত্র।

পরাশরের কথায় আমার চমক ভেঙেছে।

একি বিনু! কোথায় যাচ্ছ তুমি? হয়েছে কী? উত্তেজিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

এই তাহলে বিনু মানে বিনতা? মনের ভেতর একটা অদ্ভুত বিদ্যুতের ঝিলিক যেন অনুভব করেছি। বিনতা পরাশরের মুখের দিকে কেমন হতভম্ব হয়ে চেয়ে থেকে প্রথমটা কোনও উত্তর দিতে পারেনি। পরাশরকে ওখানে দেখাটা যেন তার কাছে দৃষ্টিবিভ্রম বলে মনে হচ্ছে।

চৌধুরীমশাই ততক্ষণে গাড়ির মোটর বন্ধ করে ডানদিক দিয়ে নেমে পড়েছেন। মোটরের সামনে দিয়ে ঘুরে কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে তিনিও উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন—এ-সময়ে তুমি এমনভাবে ছুটে কোথায় যাচ্ছিলে বিনতা?

বিনতা এতক্ষণে যেন নিজেকে খানিকটা সামলাতে পেরেছে। একবার পরাশর আর-একবার চৌধুরীমশাইয়ের দিকে একটু থতমত খেয়ে বলেছে—স্টেশনেই যাচ্ছিলাম। বক্সীবাবুর কাছে।

স্টেশনে? বক্সীবাবুর কাছে? অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন চৌধুরীমশাই—তা এই রোদের মধ্যে অমন ছুটতে-ছুটতে কেন?

শর্মিলাকে পাওয়া যাচ্ছে না! বিনতা বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

পাওয়া যাচ্ছে না মানে? তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর—কখন থেকে?

সেই ভোরবেলা বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। যাওয়ার সময় আমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরবে বলে গিয়েছিল।

বিনতার উদ্‌ভ্রান্ত গলার স্বরটা যেন আমার বুকের ভেতর গিয়ে আঘাত করেছে। নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে না পেরে এবার গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে-আসতে জিজ্ঞাসা করেছি—তিনি মানে শর্মিলাদেবী ভোরবেলা কোথায় যাচ্ছেন তা কিছু বলে গেছেন?

বিনতা আমার দিকে চোখ ফিরিয়েছে নেহাত যান্ত্রিকভাবে। আমাকে আলাদাভাবে লক্ষ করবার মতো অবস্থা যে তার নয় তা বুঝেছি। যেন দৃষ্টিহীনের চাউনিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছে—স্পষ্ট করে কিছু বলে যায়নি। তবে পিসেমশাইয়ের কিছু একটা হদিশ পেয়ে তাঁরই সন্ধানে যে গেছে তা বুঝেছিলাম।

এখন তো তা হলে থানাতেই যাওয়া দরকার। বলেছি আমি।

কিন্তু পরাশর মাথা নেড়েছে। বলেছে—না, এখুনি থানায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই। আমার পিসতুতো বোনকে আমি চিনি। সাধারণ কোনও বিপদ হলে তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করবার ক্ষমতা সে রাখে। সে যদি এখনও না ফিরে থাকে তার একটা উপযুক্ত কারণ নিশ্চয় আছে। আর তার এখনও না ফেরার মধ্যে সাংঘাতিক কোনও শয়তানী কারণ যদি থাকে তাহলে এখুনি এখানকার থানায় গিয়ে তার প্রতিকার করা যাবে না। আগে জাঙালবাড়িতেই চলো। সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার।

সেই বয়সেই এত সহজে এই বিপদের মধ্যে পরাশর যে সমস্ত ব্যাপারটার কর্তৃত্ব নিয়েছে তাতে আমার অবাক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমার মনের তখন সে-অবস্থা নয়।

পরাশরের নির্দেশ মতোই আমরা আবার গাড়িতে উঠে বসেছি।

পরাশর আগের মতোই চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে সামনে বসেছে, বিনতা বসেছে পেছনে আমার পাশে।

কার পাশে কোথায় বসেছে, বিনতা তা তখন খেয়ালও করেনি নিশ্চয়।

কিন্তু আমি সেই শঙ্কিত উদ্বেগের মধ্যেই আমার পাশে তার উপস্থিতিটুকুতেই যেন ধন্য হয়ে গেছি।

পাঁচ

আর কিছুদূর যাওয়ার পরই একটা নিচু গোছের টিলা পার হতে জাঙালবাড়ির আয়তনটা দেখা গেছে।

দূর থেকে একটা ধ্বংসস্তূপ বলেই মনে হয়েছে আমার।

দু-ধারে নিচু পাথুরে দেওয়াল তোলা একটা পাথরে বাঁধানো লম্বা পোলের মতো রাস্তায় সেখানে যেতে-যেতে জাঙাল নামটার সার্থকতাও বুঝেছি।

বাঁধানো পোলের মতো রাস্তাটার নিচে নাবাল জমি। এককালে সেখানে ঝিল গোছের কিছু নিশ্চয় ছিল। এখন তা শুকিয়ে বুজে এসে প্রায় রাস্তার নাগালই ধরে ফেলেছে। কোনও বাঁধ-টাঁধের জন্যে নয়, জাঙালবাড়ি নামটা এই পাথুরে পোলটুকুর জন্যেই এককালে দেওয়া হয়েছিল মনে হয়েছে।

পাথুরে পোলটা পার হয়ে জাঙালবাড়ির এলাকার মধ্যে ঢোকবার পর দেখা গেছে যে, সবটাই তার ধ্বংসস্তূপ নয়। একদিকটা ধসে পড়া গড়ের মতো হলেও অন্যদিকটা মেরামত করে ব্যবহারযোগ্য করা হয়েছে।

কোথাও পুরনো দেওয়ালের অবশেষ আর কোথাও নতুন শালের খুঁটি বেড়া দেওয়া বাইরের জায়গাটুকুর মধ্যে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের কিছু চিহ্নও বর্তমান। একদিকে তারের জাল দেওয়া ও ভাগ ভাগ করা ক'টা মুরগির ঘর। আর-একদিকে টিনের শেড দেওয়া একটা গোয়াল। সেখানে গরু মাত্র দুটি হলেও তাদের ব্যবস্থায় আধুনিক গোপালন পদ্ধতির ছাপ আছে। বসতবাড়ির একধারে তাঁত-ঘরও একটি বর্তমান। সেখানে তাঁত একটি আছে বটে, তবে চালাবার লোক অভাবে সেটি অচল। বাড়ির অদূরে একটি বৃহৎ ইন্দারায় লাটা দিয়ে জল তোলবার ব্যবস্থা আছে। ইন্দারার চারিপাশে এই গ্রীষ্মের মধ্যেই কিছু তরিতরকারির চাষ চোখে পড়ে।

এতসব খুঁটিয়ে অবশ্য সেই প্রথম আসার সময় দেখিনি। জাঙালবাড়ির রহস্য আর আমার পাশে বিনতার উপস্থিতিই তখন সমস্ত মন আচ্ছন্ন করে আছে।

জাঙালবাড়িতে পৌঁছে অবশ্য একটা সমস্যার সমাধানের সঙ্গে আমাদের বিস্মিত হতে হল।

গাড়ি থামবার আগেই ইন্দারার ধারে লাটা দিয়ে যে জল তুলছিল সেই মুনিশটি ছুটে এল আমাদের কাছে।

তার উত্তেজিত সম্ভাষণ শুনে আমরা যেমন বিস্মিত হলাম তেমনি স্বস্তির নিশ্বাসও ছেড়ে বাঁচলাম।

পরাশরের অনুমানই ঠিক। মুনিশটির কথায় বোঝা গেল শর্মিলা খানিক আগেই ফিরে এসেছে।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াবার পর তার দর্শনও পাওয়া গেল।

মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি নিয়ে সে তখন বাড়ির ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেউ কিছু বলবার সুযোগ পাওয়ার আগেই বিনতা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

কোথায় ছিলি বল তো!

অভিযোগে গলাটা তীক্ষ্ণ কঠিন করবার চেষ্টার সঙ্গে বিনতার মুখের সে উচ্ছ্বসিত আনন্দ সত্যিই উপভোগ করবার মতো।

কিন্তু আমার মতো শুধু সেদিকে দৃষ্টি তখন আর কার আছে।

পরাশরের সঙ্গে চৌধুরীমশাইও ব্যস্ত হয়ে শর্মিলার কাছে এগিয়ে গেছেন।

সত্যি কোথায় গেছলি শর্মি?—একটু ভর্ৎসনার সুরে জিগেসা করেছে পরাশর।

এতদিন বাদে এখানে কি শাসন করতেই এলে নাকি পরাশরদা।—কৌতুকের ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করলেও শর্মিলা গলাটা যেন একটু ভারি হয়ে উঠেছে।

শাসন আপনাকে কারুর করা কিন্তু দরকার শর্মিলাদেবী। হালকা সুরে একটু হেসে বলেছেন চৌধুরীমশাই—এতক্ষণ এমন নিপাত্তা হয়ে থাকলে আপনার সখীটির অবস্থা কী হতে পারে তা কি বুঝতে পারেননি। বিনতা যে রকম উন্মাদিনী অবস্থায় মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটছিল আমি তো সত্যি আঁৎকে উঠেছিলাম।

বিনতাকে তুমি বলে সম্বোধন করলেও শর্মিলার বেলা চৌধুরীমশাই যে আপনি ব্যবহার করেন সেটা তখনই লক্ষ্য করেছিলাম।

সেটা শর্মিলার ব্যক্তিত্বের জন্যে কি না তখন অবশ্য বিচার করে দেখিনি।

চৌধুরীমশাইয়ের কথায় শর্মিলা একটু স্নেহভরেই হেসে বিনতার দিকে চেয়ে বলেছে—এত ভয় পাওয়ার কী হয়েছিল? আমিও কি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি ভেবেছিলি?

বিনতা কিছু বলেনি। তার বদলে পরাশর একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছে—এ সত্যি হাসি-তামাশার সময় নয় শর্মি। কিছুটা আমি চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে শুনেছি, বাকিটা তোমার

কাছে শুনতে চাই।

বেশ তো সবই শুনবে। —এবার গম্ভীর হয়ে বলেছে শর্মিলা—সারাদিন ট্রেনে হয়রান হয়ে তেতেপুড়ে এসেছ। এখন একটু বিশ্রাম করো, সবই তারপর বলব। শুনেই এখুনি ছুটে গিয়ে কিনারা করে ফেলবে এমন সমস্যা এটা বোধহয় নয়।

পরাশর না পাক আমরা এ-কথায় একটু লজ্জা পেয়েছি।

চৌধুরীমশাই একটু কুণ্ঠিতভাবে আমাদের সকলকে উদ্দেশ করে বলেছেন, আমি তা হলে এখন চলি।

একটু থেমে বিশেষভাবে শর্মিলার দিকেই চেয়ে আবার বলেছেন, যদি উচিত মনে করেন আপনার এতক্ষণের অন্তর্ধান রহস্যটা আমায় পরে জানাবেন। আর আগে যা বলেছি আবার সেই অনুরোধই করে যাচ্ছি। যদি কিছু দরকার হয় বলবেন, বিশ্বাস রাখবেন যে, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করতে সবসময়ে প্রস্তুত।

ধন্যবাদ! বলেছে শর্মিলা। কিন্তু চৌধুরীমশাইয়ের তা যেন কানে যায়নি।

কথাগুলো বলে তিনি আর সেখানে না দাঁড়িয়ে গাড়িতে উঠে সোজা জাঙালবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তাঁর গাড়িতে গিয়ে ওঠবার সময় বিনতার এই উদ্বেল উত্তেজনার মধ্যেই শর্মিলার দিকে চেয়ে ঈষৎ কৌতুকের হাসিটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি।

আর তাহলে এখানে কেন? ভেতরে এসো। —বলে ফিরে দাঁড়াতে গিয়ে শর্মিলা একটু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছে!

ও, পরিচয়টা এখনও দেওয়া হয়নি।— এবার সহজভাবে হেসে বলেছে পরাশর, তা পরিচয় দেওয়ার সময়ই পেলাম কোথায়!

পরিচয় সারা হওয়ার পর আমরা সবাই ভেতরে গিয়েছি। বাইরের বসবার ঘর হিসেবে সেটা বোধহয় কাছারিবাড়ি গোছের কিছু ছিল। দেওয়াল, ছাদের ফাটলগুলো এখন দাগরাজি করা। ঘরটি কিন্তু যেমন প্রশস্ত তেমনি আগের আমলের পুরু গাঁথুনির জন্যে চমৎকার ঠাণ্ডা।

ঘরে বিলাসের সাজসরঞ্জাম না থাকলেও সাদাসিধে দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে বেশ পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো।

স্নান খাওয়া-দাওয়া সারতে সেদিন বিকেল হয়ে গেছে।

তখনও পর্যন্ত জাঙালবাড়ির রহস্য সম্বন্ধে ইচ্ছেকরেই কেউ কোনও কথা তোলেনি।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করবার আগ্রহ কিন্তু দেখা যায়নি কারুরই। সেই বসবার ঘরটিতেই আমরা আবার সবাই সমবেত হয়েছি।

প্রথমে অবশ্য আসল প্রশ্নটাকে দূরে রেখে সাধারণ আলাপই একটু চালানো হয়েছে।

তারপর হঠাৎ কী মনে করে তোমার উদয় বলো তো পরাশরদা! শর্মিলা সহজ পরিহাসের সুরে বলেছে—এই অজ পাড়াগাঁয়ে শখ করে বেড়াতে এসেছ বলে তো মনে হচ্ছে না! এতটা ভগিনী-প্রীতি তোমার তো কখনও দেখিনি।

প্রীতিটা চোখে দেখবার বস্তু নয় বলেই জানি। পরাশরও হেসে পাল্টা জবাব দিয়েছে, তবে সত্যিই প্রীতির টানে আসিনি স্বীকার করছি। এসেছি পিসিমার হুকুমে।

হুকুমে এসেছ! শর্মিলা একটা ভুরু একটু তুলেছে, কী হুকুম আবার মার?

হুকুম হয়েছে বিনুকে এখান থেকে নিয়ে কাশী পৌঁছে দেওয়ার। পরাশর প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যেই বিনতা ও শর্মিলার দুজনের দিকেই চেয়েছে।

বিনতা কেমন একটু অসহায়ভাবে তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে। শর্মিলা কিন্তু হেসে বলেছে—তা নিয়ে যাও না। সত্যি এখন আর এরকম গোলমেলে জায়গায় ওর থাকা উচিত নয়।

আর তোমার থাকা উচিত। —প্রায় ধমকের স্বরে বলেছে পরাশর—তোমাদের কারুরই আর এখানে থাকা চলবে না। আমাদের সঙ্গে তোমাদের দুজনকেই কাল এখান থেকে যেতে হবে। গোছগাছ যা করবার করে নাও।

তা হয় না পরাশরদা।

শর্মিলার স্বরের দৃঢ়তায় পরাশর যেন চমকে গেছে। তবু কঠিন স্বরে বলেছে—কেন হয় না! সবকিছুর একটা সীমা থাকা উচিত শর্মি। এরকম একটা বিপদের জায়গায় জেদ করে তোমার থাকার কোনও মানে হয় না। এখানে এমন কিছু রাজত্ব তুমি পেতে বসোনি যা ছেড়ে গেলে তোমার সর্বনাশ হবে!

রাজত্ব হলেও তা ছেড়ে যেতে পারতাম হয়তো। শর্মিলার স্বর যেন বজ্রকঠিন, কিন্তু ভয় দেখিয়ে কেউ আমায় এ-জায়গা ছাড়াবে তা আমি সহ্য করতে পারব না।

ভয় দেখিয়ে জায়গা ছাড়াবে! পরাশর এবার বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, ভয় আবার তোমায় কে দেখাচ্ছে?

কে দেখাচ্ছে জানি না, কিন্তু গত দু-মাস ধরে এমন কিছু সব অদ্ভুত ব্যাপার এই জাঙালবাড়িতে ঘটছে যার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়ানো বলে আমি মনে করি। একজন প্রৌঢ় দুর্বল পুরুষ আর দুটি আমাদের মতো অল্পবয়সী মেয়ে যাতে আতঙ্কে দিশাহারা হয় এমন কোনও কৌশলই বাকি নেই। ভয়ে আমার মজুর-মুনিশ-চাকররা বেশিরভাগ কাজে আসা বন্ধ করেছে, তবু আমরা হার মানিনি বলে শেষ পর্যন্ত পিসেমশাইকে লোপাট করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তাতেই আমি সব ছেড়ে পালাব যদি কেউ ভেবে থাকে তার ভুল আমি ভাঙব। এ-রহস্যের একেবারে মূল না খুঁড়ে বার করে আমি যাব না। তা ছাড়া পিসেমশাইয়ের কী হয়েছে না জেনে শুধু নিজেকে নিরাপদ করতে তুমিই কি আমায় যেতে বলো!

শর্মিলা উত্তেজিতভাবে তার বক্তব্য শেষ করবার পর ঘরটা কয়েক মুহূর্ত একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। শর্মিলার উত্তেজনা তখন আমাদের ভেতরও সংক্রামিত।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে পরাশরই প্রথম শর্মিলাকে সমর্থন করে বলেছে, না, তা যেতে তোমায় বলি না। এ-রহস্যের মীমাংসা না করে আমিও এখান থেকে যাব না ঠিক করলাম। এখন তোমার মুখে গোড়া থেকে যা-যা হয়েছে তা শুনতে চাই।

শর্মিলার কাছে সেই বিবরণ এবার শোনা গেছে। সত্যিই বেশ জটিল, গোলমেলে, ভয়াবহ রহস্যে জড়ানো দীর্ঘ একটা ইতিহাস।

ছয়

শর্মিলারা জাঙালবাড়িতে এসে তাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করে প্রায় বছরখানেক আগে।

প্রথমেই অতবড় গালভরা নাম দিয়ে তাদের কাজ অবশ্য তারা শুরু করেনি। তখন সবে বর্ষা শেষ হয়ে শরতের শ্রী এই বন্ধ্যা পাথুরে মাটির দেশেও দেখা দিয়েছে। জায়গাটা তাদের এত ভালো লেগে গিয়েছিল যে, নানান অসুবিধা সেখানে থাকলেও তারা তা গ্রাহ্য করেনি। সেখানেই তাদের স্বপ্ন সফল করবে বলে সঙ্কল্প করেছে।

তারা মানে অবশ্য শর্মিলা একাই। হ্যাঁ করতেও সে, না করতেও। সে যা ঠিক করবে বিনতার সায় তাতে থাকবেই।

শুধু বিনতা নয়, প্রৌঢ় বিক্রম সিংহরায়ও শর্মিলার উৎসাহের ছোঁয়াচ লেগে এ-কাজে মেতে উঠেছেন।

জাঙালবাড়ি তখন প্রায় সমস্তটাই ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবি। তার সামান্য যে-অংশটুকু সারিয়ে বিক্রম সিংহরায় থাকতেন তারই লাগাও আরও বৃহৎ একটা অংশ শর্মিলার নির্দেশমতো তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে সংস্কার করিয়েছেন। হাঁস-মুরগি কিনে পোলট্রির পত্তন করা, টিনের চাল দিয়ে গরু রাখবার উন্নত ধরনের গোয়াল তৈরি করা, তাঁত-ঘর বসানো—সব কাজই ছোটখাটো বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে।

বাধা-বিপত্তি গোড়ার দিকে ছিল বেশিরভাগ একদিক দিয়ে। এ-অঞ্চলের লোকেদের কোনও কিছুতেই গা না-লাগাবার স্বভাবই যত গোল বাধিয়েছে। কুঁড়েমি এদের মজ্জাগত। কোনও কাজ সম্বন্ধে তাদের উৎসাহ তো নেই-ই, দায়িত্ববোধেরও অভাব। ঠিকমতো কেন, আগাম মাইনে-মজুরি নিয়েও যথাসময়ে তারা কাজে আসে না। মাঝে-মাঝে একেবারেই ডুব মারে।

খবর নিতে গিয়ে কিন্তু জানা যায় যে, টাকা ফাঁকি দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য মোটেই নয়। এক-আধদিন কাজ কামাই করাটা তারা দোষের বলেই মনে করে না। এ-ধরনের কথার খেলাপ তাদের কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। অজুহাতও তাদের একেবারে জিহ্বাগ্রে। নিজের জ্বরজারি ব্যায়রামের ছুতো তো আছেই, তার ওপর মরা বাপ কি মার নতুন করে গঙ্গাজলির বা না-জন্মানো ছেলের মুখেভাতের দোহাই দিতে তাদের বাধে না।

বিক্রম সিংহরায় জাঙালবাড়ির মালিক হলেও এ-অঞ্চলের খুব বেশিদিনের বাসিন্দা নন। ছেলেবেলা কিছুকাল তাঁর এখানে কেটেছিল মাত্র। তারপর জীবনের বেশিরভাগ তিনি বিদেশে, বিশেষ করে বর্মাতেই কাটিয়েছেন। বছরকয়েক আগে সেখান থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে এসে এই ভিটেতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেও এখানকার মানুষজনের সঙ্গে পরিচয় তাঁর অত্যন্ত অল্প। তাঁর একার তাতে বিশেষ কিছু আসে যায়নি। দু-একজন মুনিশ, পাহারাদার দিয়েই তাঁর চলে গেছে। শর্মিলাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের জন্যে লোকজন জোগাড় করে কাজে লাগাতে গিয়েই তিনি তাদের গুণপনা টের পেয়েছেন।

এইসব দায়িত্বহীন মানুষজনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে শর্মিলাদের সত্যিই এক-একসময়ে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। সেই অসুবিধার সূত্রেই তাদের চৌধুরীমশাই অর্থাৎ দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে প্রথম ভালো করে পরিচয়।

দেবপ্রতাপ চৌধুরী এ-তল্লাটের প্রধান গ্রাম দশানিপাড়ার সত্যিকার মাতব্বর ব্যক্তি। এ-অঞ্চলের বড় জমিদার হিসাবে পয়সা, প্রতিপত্তি তাঁর যথেষ্ট, তার ওপর প্রাচীন বনেদী বংশের আভিজাত্যের ছাপের দরুন নয়, তাঁর নিজের ব্যক্তিগত চরিত্র আর ক্ষমতার জন্যেও সবাই তাঁকে সমীহ করে।

সমীহটা প্রায় ভয়ের সামিল বলেই শর্মিলাদের ব্যাপারে মনে হয়েছিল। দেবপ্রতাপ চৌধুরী তাদের সে-সময়ে সাহায্য না করলে তাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের গোড়াপত্তনই বোধহয় হত না।

মজার কথা এই যে, চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগটা বেশ একটু রাগারাগির ভেতর দিয়েই শুরু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মহিন্দর নামে তাঁত-ঘরের নতুন কাজে-লাগা একটি লোককে নিয়েই ব্যাপারটার সূত্রপাত। লোকটা সত্যিই গুণী। এ-অঞ্চলে রেশমের তাঁত চালাবার মতো ওস্তাদ কারিগর তখন প্রায় দেখা যায় না বললেই হয়। বাংলায় রেশমের নতুন করে চাহিদা তখনও শুরু হয়নি। বেশিরভাগ কারিগর খেতে না পেয়ে অন্য পেশায় চলে গেছে। রেশমের তাঁত-শিল্পই তখন লোপ পাওয়ার অবস্থা। শর্মিলা মহিন্দরকে দিয়ে সেই রেশমের শিল্পই আবার জাগিয়ে তুলবে আশা করে তার ওপর সব ভার দিয়েছিল। সেইসঙ্গে একমাসের মজুরি আগাম।

কিন্তু মহিন্দর আগাম নেবার পরদিন থেকে সেই যে ডুব দিলে তার আর দেখা নেই। সমবায়ের অন্য লোকজন পাঠিয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে কিছুই সঠিক জানা গেল না। কখনও শোনা গেল তার অসুখ, কখনও বা শোনা গেল যে, সে গাঁ ছেড়েই চলে গেছে। এর মধ্যে বিক্রম সিংহরায়ের

পুরনো বিশ্বাসী পাহারাদার দশরথ একদিন নিজে খোঁজ নিয়ে এসে যা খবর দিলে তাতে অবাক শুধু নয়, মেজাজ গরম হওয়ারই কথা।

মহিন্দর দশরথের কাছে সাফ বলে দিয়েছে যে, জাঙালবাড়িতে কাজ করতে আসতে সে পারবে না। আগাম যা টাকা নিয়েছে তা সে ফেরত দিয়ে দেবে। তবে আপাতত টাকাটা তার খরচ হয়ে গেছে, তাই রাজাবাবুর সামনে সে টাকা ফেরত দেওয়ার কড়ার লিখে দিতে রাজি।

রাজাবাবুটা কে সে প্রশ্ন করবার আগে কেন মহিন্দর জাঙালবাড়িতে কাজ করতে নারাজ জানতে চেয়েছে শর্মিলা।

দশরথের মুখে মহিন্দরের অজুহাত যা শোনা গেছে তা অদ্ভুত।

জাঙালবাড়িতে নাকি অপদেবতা, যখ পাহারায় আছে। সবাই তাকে ওখানে কাজ নিতে মানা করেছিল। তবু গোড়ায় সে কারুর কথা শোনেনি। কিন্তু জাঙালবাড়িতে কাজ নেওয়ার প্রথম দিনই ফেরবার সময় সে নিজের চোখে যখকে পোড়ো গড়মহলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে।

তা যখ দেখে সে চুপ করে থেকেছে কেন?—দশরথই জিজ্ঞাসা করেছিল মহিন্দরকে—চেঁচামেচি হাঁকাহাঁকি করলেও তো জাঙালবাড়ি থেকে কেউ-না-কেউ যেতে পারত তার কাছে।

হ্যাঁ, চেঁচামেচি করলে কেউ তা শুনে আসত ওই ভরসন্ধের সময়ে জাঙালবাড়ির গড়মহলের দিকে! —মহিন্দর মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তার অবিশ্বাস জ্ঞাপন করেছিল আর সেইসঙ্গে জানিয়েছিল যে, চেঁচামেচি করবার মতো অবস্থাই তার ছিল না। কারণ, ওই বিদ্‌ঘুটে জায়গায় হঠাৎ যখকে বার হতে দেখেই সে না কি দাঁতকপাটি লেগে বেঁহুশ হয়ে যায়। নেহাত গুরুবল ছিল বলে শেষপর্যন্ত এক ভালোমানুষের পো-এর নজরে পড়ে সে-যাত্রা তার প্রাণ বেঁচেছে; নইলে বেঁহুশ অবস্থাতেই যখ তাকে কোন পাতালে পুঁতে ফেলত কে জানে।

দশরথের কাছে এ পর্যন্ত বিবরণ শুনে বিক্রম সিংহরায়ই অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন—এই ভালোমানুষের পো-টি কে?

মহিন্দর বলে চেনা-চেনা লাগলেও ঠিক ঠাহর করতে পারেনি।—জানিয়েছে দশরথ।

না চেনা, না অচেনা একজন মানুষ ওখানে হঠাৎ কেমন করে উদয় হয়ে মহিন্দরের প্রাণ বাঁচালেন দশরথ তা অবশ্য ব্যাখ্যা করতে পারেনি। কারণ, মহিন্দর যা তাকে বলেছে তার বেশি কিছু সে আর কোথা থেকে জানবে!

অজুহাত যা দিয়েছে তা যত অদ্ভুতই হোক, মহিন্দর যে জাঙালবাড়িতে কাজ করতে চায় না এই মোদ্দা কথাটা ভালো করেই বোঝা গেছে।

কিন্তু হঠাৎ তার এ-আপত্তির কারণ কী! শর্মিলা-বিনতা তো বটেই, বৃদ্ধ সিংহরায়মশাই নিজেই এ-আপত্তির কোনও কারণ খুঁজে পাননি।

লোকটা আগ্রহভরেই এ-কাজ নিতে এসেছিল। শর্মিলা আর সিংহরায়মশাইয়ের কাছে কাজ আর অগ্রিম মাইনে বুঝে নিয়ে চলে যাওয়ার সময়ে তার কথাবার্তায় কি চালচলনে মতলব যে তার এমন পাল্টে যেতে পারে, তার এতটুকু ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। জাঙালবাড়ির গড়মহল সম্বন্ধে এ-অঞ্চলে নানা ভুতুড়ে গল্প চলতি থাকা স্বাভাবিক। মহিন্দরের সেসব অজানা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া লোকটা সম্বন্ধে আর কিছু না জানা যাক, ঠগবাজ যে সে নয় এটুকু খোঁজখবর নিয়ে ভালোভাবেই জানা গেছে। মিথ্যে স্তোক দিয়ে ফাঁকি দিয়ে টাকা নেওয়ার ফিকির সে নিশ্চয়ই করেনি। তার এ-মতবদলের একটা সত্যিকার কারণ তা হলে আছে।

সে কারণ কি সত্যিই সে যা বলেছে তাই? ওইরকম আজগুবি ভুতুড়ে গোছের কিছু সে গড়মহলে সত্যিই দেখেছে!

শর্মিলা তো নয়ই সিংহরায়মশাইও তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

জাঙালবাড়ি থেকে নিজেদের গাঁয়ে যেতে মহিন্দরের তো গড়মহলের দিকে যাওয়ারই কথা নয় ওই ভরসন্ধেবেলা। গড়মহলের দিক দিয়ে গাঁয়ে যাওয়া যায় না এমন নয়, কিন্তু সে তো সত্যিকারের দুঃসাহসিক ব্যাপার। গড়মহল ছাড়ালেই মজা বাঁওড়ের বিরাট দিগন্ত-ছোঁওয়া জংলা জলা। যত না অপদেবতার, সাপখোপের ভয় সেখানে তারচেয়ে বেশি।

সেদিক দিয়ে সাহস করে যদি গিয়েই থাকে তা হলেও ভুতুড়ে মূর্তি দেখে বেঁহুশ হওয়ার পর চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে তার সাড় ফিরিয়েছে কে, মহিন্দর যাকে চিনি-চিনি করেও চিনতে পারেনি?

অসময়ে অমন বেপোট জায়গায় ঘোরাফেরাই বা সে লোকটি করছিল কেন?

না, ও ভুতুড়ে গল্পটল্প সব বানানো অজুহাত।—জোর দিয়ে বলেছেন সিংহরায়মশাই—এখানে কাজ করতে না আসার অন্য গুরুতর কারণ আছে। কেউ মহিন্দরকে মানা করেছে এ-কাজ নিতে, হয়তো ভয় দেখিয়েছে।

সেরকম লোক কে হতে পারে? বলে নিজের সংশয়টা প্রকাশ করেই শর্মিলা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে—আচ্ছা, ওই রাজাবাবুটি কে, টাকা ফেরৎ দেওয়ার কড়ার করতে মহিন্দর যাঁকে জামিন রাখবার ভরসা পায়।

রাজাবাবু মানে দেবপ্রতাপ চৌধুরী। আসলে রাজা-টাজা কিছু নয়, পয়সা, প্রতিপত্তি আছে বলে এখানকার লোকে, বিশেষ করে, গরীব-দুঃখীরা রাজাবাবু বলে। সিংহরায়মশাই একটু অপ্রসন্ন স্বরেই বলেছেন, তা বনেদী জমিদার বংশ বটে। এককালে ওই চৌধুরীদের সঙ্গে আমাদের সিংহরায়দের খুব রেষারেষি আকচা-আকচি ছিল বলে শুনেছি। বাঁওড় নিয়েই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে অনেক।

সিংহরায়মশাইয়ের কথায় তারপর জানা গেছে যে, তাঁর সঙ্গে রাজাবাবু অর্থাৎ দেবপ্রতাপ চৌধুরীর বিশেষ পরিচয় নেই। বর্মা থেকে এসে এখানে বাসা বাঁধবার পর সামান্য দু-চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল মাত্র। শর্মিলারা এখানে এসে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় নিয়ে কাজ শুরু করবার পর কাছের গ্রাম থেকে দরকারি জিনিসপত্র ও মানুষজন জোগাড় করার ব্যাপারে দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে আর একটু বেশি যোগাযোগ হয়েছে। চৌধুরী গাঁয়ের মাথা ও এ-অঞ্চলের মাতব্বর ব্যক্তি। তাঁর সাহায্য, পরামর্শ তাই মাঝে-মাঝে না নিয়ে পারা যায়নি।

দেবপ্রতাপ চৌধুরী কিন্তু গোড়া থেকেই মেয়েদের এই পুরুষালি প্রচেষ্টা একটু যেন বাঁকা চোখে দেখেছেন বলে সিংহরায়মশাইয়ের ধারণা। অন্তত তাঁর মুখে হাসি-ঠাট্টা একটু-আধটু যা শোনা গেছে তাতে এ-ব্যাপারে তাঁর সমর্থন নেই বলেই মনে হয়েছে।

প্রথমবার শর্মিলাদের ডেয়ারির জন্যে গাঁয়ে গরু কিনতে গিয়ে সিংহরায়মশাইকে দেবপ্রতাপ চৌধুরীরই শরণ নিতে হয়েছিল। গাঁয়ের বেচবার মতো ভালো গরু কারুর নেই। সবাই দেবপ্রতাপ চৌধুরীর কাছেই যেতে বলেছিল। চৌধুরীবাড়ির গোয়ালে নাকি একেবারে সেরা জাতের সব গরু আছে।

বিক্রম সিংহরায় তাই গেছলেন। সব শুনে চৌধুরীমশাই উদার হয়ে বলেছিলেন—তা নিয়ে যান না, যে ক'টা গরু দরকার। গোটা দশেক হলেই হবে তো?

না গোটা দশেক নয়, দুটো হলেই হবে—বলেছিলেন সিংহরায়।

মোটে দুটো!— দেবপ্রতাপের গলার স্বরে আর চোখে-মুখে পরিহাসের ভাবটা এবার লুকনো থাকেনি।

সেটা গ্রাহ্য না করেই সিংহরায়মশাই দামের কথা তুলেছিলেন।

দাম? দাম আবার কী দেবেন। স্পষ্টই হেসে উঠেছিলেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী—দাম আপনাদের দিতে হবে না।

তা কী করে হয়? বলতে গেছলেন সিংহরায়।

কিন্তু দেবপ্রতাপ তার আগেই ঠাট্টার সুরে বলেছিলেন—দু-দিন বাদেই তো গ্রাম-গ্রাম খেলার শখ আপনার ভাইঝিদের মিটে যাবে। তখন জলের দরে আমার কাছেই সব বেচতে আসতে হবে। অবলা বধ করে সেই লাভটা আর করতে চাই না। তারচেয়ে এমনি ক'দিন গরু দুটো ভাড়া নিয়ে যান। খেলাধুলো শেষ হলে চলে যাওয়ার সময় না-হয় ভাড়া হিসাবে কিছু ধরে দিয়ে যাবেন।

সিংহরায়মশাইয়ের কাছে এই পর্যন্ত শুনেই শর্মিলা আগুন হয়ে উঠেছে। মুখ-চোখ রাঙা করে বলেছে—আস্পর্ধা তো কম নয় আপনার এই চৌধুরীমশাইয়ের! এসব কথা আগে তো কিছু বলেননি পিসেমশাই!

পিসেমশাই স্বীকার করেছেন যে, তখনও হাসি-ঠাট্টাটা তেমন দোষের মনে করেননি। গাঁয়ে দেশের লোকের মন একটু গোঁড়া সেকেলে হয়েই থাকে। দুটি অল্পবয়সী কুমারী মেয়ের এরকম একটা কাজ নিজেরাই চালাবার চেষ্টায় তাদের একটু মজা পাওয়া তাই স্বাভাবিক।

চৌধুরীমশাইয়ের শেষ ঠাট্টাটাই অবশ্য একটু মাত্রাছাড়া মনে হয়েছিল পিসেমশাইয়ের।

তখন অন্য কথাবার্তা সব হয়ে গেছে। পিসেমশাইয়ের পীড়াপীড়িতে চৌধুরীমশাই গরু দুটির যৎসামান্য দাম নিতে রাজি হয়েছেন। একজন রাখাল দিয়ে গরু দুটি পৌঁছে দেওয়ারও ব্যবস্থা করে পিসেমশাইকে বিদায় দেবার সময় হঠাৎ হেসে উঠে চৌধুরীমশাই বলেছিলেন—ও-গরু দুটো তো আমার কাছেই আবার ফেরত আসবে জানি। আপনার ওই জাঙালবাড়িও শেষ পর্যন্ত গ্রামলক্ষ্মীর কৃপায় আমাকেই কিনতে হবে। বলেন তো এখন থেকেই বায়না দিয়ে রাখি। ও-পোড়োভিটের দাম আমার চেয়ে বেশি কেউ দেবে না।

মনে-মনে চটলেও সিংহরায়মশাই ঠিক উপযুক্ত জবাব খুঁজে পাননি। 'আচ্ছা বিক্রি যদি করি তখন দেখা যাবে' গোছের কী একটা বলে ভেতরে-ভেতরে গজরাতে-গজরাতে চলে এসেছিলেন।

সে-ঘটনা স্মরণ করে এতদিন বাদে পিসেমশাই একটু সন্দিগ্ধই হয়ে উঠেছেন বিশেষ শর্মিলার তাতে সমর্থন পেয়ে।

সব কথা শুনে শর্মিলার তখন বেশ দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, দেবপ্রতাপ চৌধুরী বা রাজাবাবু মানুষটি সুবিধের নয়। গ্রামলক্ষ্মী সমবায় বিফল হওয়ায় যেন তাঁর বেশ কিছু স্বার্থ আছে মনে হয়। কে জানে জাঙালবাড়িটা দাঁও মেরে সস্তায় কেনবার ফিকিরেই হয়তো শর্মিলাদের কাজে তিনি এই রকম লুকিয়ে বাগড়া দিচ্ছেন। তাঁত-ঘরের মহিন্দর তো বটেই, তাদের অন্য লোকজনও বেশিরভাগ রাজাবাবুরই তাঁবেদার। মহিন্দর তাঁর গোপন প্ররোচনাতেই হয়তো কাজ একবার নিয়েও তা ছেড়ে টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলতে সাহস করেছে।

হয়তো থেকে সন্দেহটা নিশ্চিত হয়ে উঠেছে ক্রমশ, আর রাগে, উত্তেজনায় শর্মিলা পিসেমশাইকে নিয়ে নিজেই রাজাবাবুর সঙ্গে পরের দিন বোঝাপড়া করতে যাবে বলে ঠিক করেছে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, ঠিক যেন অন্তর্যামীর মতো তাদের মনের কথা বুঝে দেবপ্রতাপ চৌধুরী তার পরদিন সকালেই তাঁর মোটরে জাঙালবাড়িতে এসে হাজির।

একা নয়, সঙ্গে আবার স্টেশনমাস্টার বক্সীবাবু। দেবপ্রতাপ চৌধুরী বা বক্সীবাবুর সঙ্গে শর্মিলা আর বিনতার কোনও পরিচয়ই ছিল না। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে যা ছিল তা-ও যৎসামান্য।

হঠাৎ দুজনের এভাবে দেখা করতে আসায় শর্মিলারা তাই বেশ একটু অবাক হয়েছে। দেবপ্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে বোঝাপড়াটা তাঁকে বাড়িতে পেয়েও প্রথমটা শুরু করতে পারেনি।

বাইরের দিক দিয়ে এ-অঞ্চলের রাজাবাবুর ব্যবহারে ধরবার মতো কোনও ত্রুটি নেই।

তিনি প্রথমেই বক্সীবাবুর পরিচয় দিয়ে হালকাসুরে হলেও একটু যেন কুণ্ঠিতভাবে পিসেমশাইয়ের বদলে শর্মিলাকেই উদ্দেশ করে বলেছেন—আপনারা আমাদের এ-অঞ্চলের অতিথি। আপনাদের সঙ্গে অনেক আগেই আলাপ করতে আসা উচিত ছিল। কিন্তু একা-একা আসতে ঠিক সাহস করছিলাম না।

শর্মিলা বড় মুখফোঁড় মেয়ে, তার ওপর মেজাজটা তার গরম হয়েই ছিল। নতুন আলাপ আর মানী লোক বলে সে রেয়াত করেনি। খোঁচা দেওয়ার সুযোগটা পেয়ে রাজাবাবুর চেহারাটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে বলেছে—হ্যাঁ, যেরকম বিপদের জায়গা, শুধু সঙ্গী নয়, তলোয়ার-বন্দুক নিয়েও আসা উচিত ছিল।

সকলে এ-কথায় হেসে উঠেছে। বিনতাই বুঝি সবচেয়ে বেশি। চৌধুরীমশাই কিন্তু অপ্রস্তুত হওয়ার বদলে যেন খুশিই হয়েছেন। শর্মিলার পাল্টা জবাবে হাসিমুখেই বলেছেন—তাতেও ভয় কাটত না। আসল কথা কী জানেন, আমরা বেশ একটু গাঁইয়া মানুষ তো। যতই বনগাঁয়ে শেয়ালরাজা হই, আপনাদের মতো শহুরে সভ্য একেলে মেয়েদের সামনে এলেই ভড়কে যাই।

এর পরই শর্মিলা হয়তো সত্যিই বলে ফেলত—তাই বুঝি দূরে আর পিছনে থেকে আমাদের কাজে বাদ সাধছেন।

কিন্তু সে-কথা বলবার সুযোগই হয়নি। দেবপ্রতাপ চৌধুরী সব অভিযোগের জবাব যেন আগে থাকতেই তৈরি করে নিয়ে এসেছেন।

জাঙালবাড়ির বড় উঠোনটা পেরিয়ে শর্মিলাদের বসবার ঘরের দিকে যেতে-যেতে কথা হচ্ছিল। তাঁর কথার উত্তরে অন্য কেউ কিছু বলার আগেই চৌধুরীমশাই চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলেছেন—আপনাদের কাজকর্ম তো সব বন্ধ দেখছি। আগাম টাকা নিয়ে লোকজন বেইমানি করছে শুনলাম। তাই শুনেই আরও আসতে হল।

তাই শুনেই এলেন! —সিংহরায়মশাই এরপর কড়া একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। চৌধুরীমশাই তাঁকে সে-সুযোগ তো দেনইনি, শর্মিলাদেরও হতভম্ব করে দিয়ে বলেছেন—হ্যাঁ, ব্যবস্থাও একেবারে না করে আসিনি। আমাদের গাঁয়ের মহিন্দরই বেয়াড়াপনা করছিল তো? আপনাদের আর ভাবনা নেই। মহিন্দর অন্তত আর গোলমাল কিছু করবে না। আজই সে কাজে আসছে।

পিসেমশাইয়ের জন্যে বরাদ্দ বাইরের ঘরে সবাই তখন গিয়ে বসেছে। পিসেমশাই বা শর্মিলা দুজনেরই মুখে বিরক্তি হঠাৎ বিস্ময় হয়ে ওঠায় প্রথমটা কোনও কথা বার হয়নি। বিনতাই সোজা সরল বলে সবার আগে সামলে উঠে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—মহিন্দর সত্যিই আসছে? ভূত দেখা-টেখা তাহলে সব তার বানানো ছুতো?

চৌধুরীমশাই আবার একবার সকলকে চমকে দিয়ে বলেছেন, না, বানানো ছুতো নয়।

তার মানে সত্যিই সে ভূত দেখেছে বলছেন! —শর্মিলার গলা সন্দেহের তীক্ষ্ণতায় ঝাঁঝালো হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই—তার ভূতের ভয় তা হলে কাটল কী করে? আপনিই কাটালেন নাকি!

হ্যাঁ, আমার ছাড়া আর কারুর কথা সে মানতে চায় না। —বেশ একটু যেন দুঃখের সঙ্গে জানিয়েছেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী।

কিন্তু আপনার কথাই মানল কী করে? —শর্মিলার জেরা থামেনি—আপনি বুঝি বললেন ভূত-টূত মিথ্যে আর অমনি মহিন্দর তা সোনামুখ করে মেনে নিলে!

শর্মিলার কথার খোঁচাটা অস্পষ্ট না হলেও রাজাবাবু তা গ্রাহ্যই করেননি। হেসে বলেছেন, —ভূত-টূত এমন জিনিস নয় যে, আমি বললেই মেনে নেবে। সে যা দেখেছে তা যে ভূত নয় প্রমাণ দিয়ে তাকে বুঝিয়েছি, তবে না মেনেছে আমার কথা।

প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে ভূত নয়! —শর্মিলা এবার বিমূঢ় হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে—কী প্রমাণ?

প্রমাণ এই যে আপনাদের সামনে!

বক্সীবাবুর দিকে আঙুল দেখিয়ে চৌধুরীমশাই এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠেছেন। সবাই তখন একবার বক্সীবাবু আর-একবার চৌধুরীমশাইয়ের দিকে বোকার মতো তাকাচ্ছে।

বক্সীবাবু রহস্যটার সরল ব্যাখ্যা এবার তাদের শুনিয়েছেন। তাঁর কথায় জানা গেছে যে,

মহিন্দর সত্যিই সেদিন গড়মহলের ভেতর থেকে ভরসন্ধ্যার আবছা আলোয় ভূতের মতো কাউকে বার হতে দেখেছিল। তবে ভূত নয়, বক্সীবাবুই তখন ওখান থেকে বার হয়েছিলেন। জাঙালবাড়ি আর গড়মহল সম্বন্ধে আতঙ্ক মেশানো কয়েকটা ধারণা এ-অঞ্চলের লোকের মজ্জাগত। মহিন্দর তাই অন্ধকারে বক্সীবাবুকে ওই ভুতুড়ে জায়গা থেকে বার হতে দেখেই চিৎকার করে উঠে ভয়ে ভির্মি গেছে। বক্সীবাবুকেই তখন গিয়ে তাকে নাড়াচাড়া দিয়ে চাঙ্গা করতে হয়েছে। মহিন্দরকে অবশ্য বক্সীবাবু চিনতেন না। পরিচয় নেওয়ার সুযোগও তাঁর হয়নি। কারণ চাঙ্গা হবার পরও মহিন্দরের অবস্থা আগেরই মতো। তখন অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। বক্সীবাবুর দিকে ভালো করে একবার তাকাতেও সাহস না করে সে পড়ি কি মরি করে ছুট দিয়েছে পুরনো পাথুরে পোলটার দিকে। কোনও লাভ নেই বলে বক্সীবাবু আর ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি করেননি।

তন্ময় হয়ে সবাই এ-বিবরণ এতক্ষণ শুনেছে। তারপর শর্মিলা সন্দিগ্ধভাবে প্রথম জিজ্ঞাসা করেছে—কিন্তু বক্সীবাবু ওই গড়মহলে ভরসন্ধের সময় কী করতে গেছলেন?

গেছলেন, যে জন্যে প্রায় উনি ওখানে যান। —হেসে বলেছেন রাজাবাবু—তবে তখন উনি যাচ্ছিলেন না, ফিরছিলেন।

ফিরছিলেন তো বুঝলাম, কিন্তু তার আগে গেছলেন কেন?—শর্মিলা আবার একটু রুক্ষস্বরে বলেছে—ওটা তো বেড়াবার জায়গা নয়।

আর কারুর না হোক বক্সীবাবুর বেড়াবার জায়গা!—আগের মতো হেসে বলেছেন দেবপ্রতাপ চৌধুরী—কখনও-কখনও আমারও বটে!

তার মানে?—পিসেমশাই, বিনতা, শর্মিলা সবাই অবাক হয়ে তাকিয়েছে রাজাবাবুর দিকে। তখনও জাঙালবাড়ি ও গড়মহলের পুরাতত্ত্বের কথা তারা কেউ জানে না।

বক্সীবাবুই এবার সকলকে আসল ব্যাপারটা খুলে বলেছেন। অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস শুনিয়ে কেন যে সময় সুযোগ পেলে তিনি এখানে পুরাকীর্তির নিদর্শন খুঁজতে আসেন, তা বুঝিয়েছেন এবং শেষকালে সিংহরায় আর জাঙালবাড়ির নতুন পরিচালিকাদের কাছে মাঝে-মাঝে ওই ধ্বংসস্তূপে এসে খোঁজাখুঁজি করার অনুমতি চেয়েছেন তাঁর ও চৌধুরীমশাইয়ের হয়ে।

সে-অনুমতি তাঁদের সানন্দেই দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে শর্মিলা ও বিনতা পুরাকীর্তির নিদর্শন খোঁজার ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে তার অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেছে।

বেশিরভাগ প্রশ্নের জবাব বক্সীবাবুই দিয়েছেন; কিন্তু সেইদিনই বিনতার চোখে পড়েছে যে, শর্মিলার প্রশ্নের বেলায় উত্তর দেওয়ার ব্যাকুলতা চৌধুরীমশাইয়ের একটু বেশি।

সেদিন যে-পরিচয় শুরু হয়েছিল ক্রমশ তা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বক্সীবাবু স্টেশন ফেলে সবসময়ে আসতে পারেন না, কিন্তু দেবপ্রতাপ চৌধুরীকে প্রায়ই তাঁর পুরনো হুডখোলা মরিস গাড়িটায় জাঙালবাড়িতে আসা-যাওয়া করতে তখন দেখা গেছে।

জাঙালবাড়ির গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের অনেক সমস্যার তিনি সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ পেয়ে শর্মিলারা অনেক হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেয়েছে।

শুধু প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের নেশাতেই চৌধুরীমশাই জাঙালবাড়িতে এত ঘন-ঘন যাতায়াত করেন, বা গড়মহলে খুশিমতো ঘোরাফেরার অধিকারের জন্যে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পরিচালিকাকে একটু বেশি তোয়াজ করবার চেষ্টা করেন বলে মনে হয় না। মনে হয়, একদিন গ্রামলক্ষ্মী সমবায় যাঁর কাছে হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার ছিল, তাঁর এ-পরিবর্তনের মূলে আরও কিছু আছে।

বিনতার অন্তত তখন থেকেই ধারণা, রাজাবাবু শর্মিলাকে প্রথম দেখার পরই কাবু হয়েছেন।

হপ্তায় অন্তত তিনদিন তখন বিকেলে প্রত্নতত্ত্ব-সন্ধানীদের মজলিশ বসে। বক্সীবাবু আসুন বা না আসুন, চৌধুরীমশাই প্রত্যেকটিতেই হাজির থাকেন। শর্মিলাও উপস্থিত থাকে, তবে শুধু প্রত্নতত্ত্বেরই

আকর্ষণে। উৎসাহ না থাকলেও বৃদ্ধ সিংহরায়মশাই এ-মজলিশে যোগ দেন।

তাঁর কাছে অবশ্য ক্রমশ প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহের এ-হুজুগ বেশ বিরক্তিকর হয়েই উঠছে মনে হয়। সে-বিরক্তি তিনি গোপনও করেন না।

শর্মিলাকেই একদিন তিনি বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের সবকথা সরল বিশ্বাসে মেনে নেওয়া সম্বন্ধে সাবধান করেন।

ঠাট্টার সুরেই বলেন—গ্রামলক্ষ্মী ছেড়ে তোমরা কি শেষপর্যন্ত বাস্তুলক্ষ্মীর যখের ধন খুঁড়ে বার করতেই মাতবে নাকি!

শর্মিলা তাঁকে পালটা ঠাট্টা করে বলেছে—তা মাতলে ক্ষতি কী?

একটু থেমে আবার বলেছে—দুটো ইট-পাথর নেড়ে আর একটু মাটি খুঁড়ে যদি হীরে-মোহর পাওয়া যায় তাহলে গ্রামলক্ষ্মীর পেছনে অত ছোটাছুটি হয়রানির দরকার কী! সেদিন যে-তাম্রশাসনের টুকরো পাওয়া গেছে তাতে কী ইশারা আছে জানেন? ওই গড়মহলের তলায় কুবেরের ভাণ্ডার লুকনো আছে। ঠিক হদিশটি শুধু পাওয়ার ওয়াস্তা।

সিংহরায়মশাই এবার সত্যি রেগে উঠেছেন, একটু বকুনির সুরে বলেছেন—মুখেই ঠাট্টা করছ কিন্তু ওই বাজে হুজুগের নেশা সত্যিই মনে তোমাদের লেগেছে বলে ভয় হচ্ছে। এ-নেশা যারা ধরিয়েছে সেই বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের ওপরই রাগ হচ্ছে আমার। তাঁদের এই বেয়াড়া খেয়াল নিয়ে বাড়াবাড়ি বন্ধ করাই উচিত মনে হচ্ছে।

আপনার কোনও ভয় নেই পিসেমশাই! —এবার হেসে শর্মিলা সিংহরায়মশাইকে আশ্বস্ত করেছে—পুরাতত্ত্ব নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে মজা পাই বলে তার জন্যে নিজেদের আসল কাজ ভুলব এমন আহাম্মক আমরা নই। এ আমাদের একরকম ছেলেখেলা মনে করুন না।

পিসেমশাই কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হননি। বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছেন—এই ছেলেখেলাই আমার ভালো লাগে না। কোথা থেকে কী হয়ে যায় কেউ বলতে পারে? সেকেলে কিছু যদি থাকেও এখানে তা নিয়ে খোঁচাখুঁচি করলে কোনও শাপমন্যি যে লাগবে না, তাই বা কে জানে!

শর্মিলারা এ নিয়ে আর তর্ক করেনি। দেশ-বিদেশ-ঘোরা মানুষ হলেও পিসেমশাইয়ের মনের কুসংস্কার দেখে নিজেদের মধ্যে একটু হাসাহাসি করেছে।

তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক মজলিশেও পিসেমশাইয়ের অনুপস্থিতিতে একদিন বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইকে শর্মিলা একটু সাবধান করে দিয়েছে।

বলেছে—পিসেমশাইয়ের সামনে গড়মহলের প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে বেশি উৎসাহ দেখাবেন না আপনারা।

কেন?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন বক্সীবাবু—ওঁর তো এ-ব্যাপারে বেশ আগ্রহই আছে মনে হয়। এই তো কিছুদিন আগে তাম্রশাসনের টুকরোটা পাওয়ার পর যখন সেটা নিয়ে আলোচনা করি তখন তো বিরক্তি-টিরক্তি কিছু দেখিনি।

তখন বিরক্তি ছিল না কিন্তু এখন হয়েছে। —বলে শর্মিলা পিসেমশাইয়ের এখনকার মনোভাবটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

চৌধুরীমশাই হাসতে-হাসতে জিজ্ঞাসা করেছেন—তার মানে জায়গাটায় কোনও যখ-টখ গোছের অপদেবতার রাজত্ব আছে বলে মনে করেন সিংহরায়মশাই? তার সম্পত্তি খোঁজাখুঁজি করলে ঘাড় মটকে দেবে বা অনিষ্ট করবে ওইরকম কিছু?

ধারণাটা প্রায় ওইরকম! —বলেছে শর্মিলা। সবাই হেসেও উঠেছে।

তা হলে কাজ কি অপদেবতাদের ঘাঁটিয়ে! —দেবপ্রতাপ চৌধুরীর গলার স্বরে কৌতুকের চেয়ে আন্তরিকতাই যেন ফুটে উঠেছে—আপনাদের গ্রামলক্ষ্মী সমবায় এই অভিশাপের জায়গা থেকে তুলে নিয়ে চলুন না অন্য কোথাও। এই খাঁ-খাঁ শূন্য ভূতুড়ে তেপান্তরের চেয়ে অনেক ভালো জায়গা

এখুনি আপনাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

বিনতার চোখে-মুখে কৌতুকের দুষ্টুমি আর চাপা থাকেনি। মুখে অবশ্য সরলতার ভান করে সে জিজ্ঞাসা করেছে—জায়গাটা কোথায়? আপনার বাড়ির কাছাকাছি না হলে কিন্তু চলবে না। আর দাম-টামও সস্তা হওয়া দরকার। এখানে আমাদের পয়সাই লাগে না জানেন তো!

পয়সা সেখানেই লাগবে নাকি!— চৌধুরীমশাই ব্যস্ত হয়ে জানিয়েছেন—সে জমি অমনি...।

শর্মিলা কিন্তু তাঁকে কথাটা শেষ করতে দেয়নি। গম্ভীর মুখে তাঁকে একটু দমিয়ে দিয়েই বলেছে—আচ্ছা, আপনার এ উদার প্রস্তাবের কথা পরে ভাবা যাবে। এখানকার অপদেবতা আগে তাঁর কোপ-টোপ দেখান, তারপর!

শর্মিলা ঠাট্টা করে যা বলেছিল তা অমন নিদারুণ সত্য হয়ে উঠবে সত্যিই কেউ ভাবতে পারেনি।

ব্যাপারটা শুরু হয় অদ্ভুতভাবে।

সাত

মাস দুই আগে প্রথম একদিন গভীর রাত্রে তারা কাতর আর্তনাদের মতো অমানুষিক এক চিৎকার শুনতে পায়।

শর্মিলা ও বিনতা ভেতরের একটি ঘরে শোয়, পিসেমশাই শুতেন এই বাইরের ঘরে।

সেদিন মাঝরাত্রে পিসেমশাই দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাদের জাগান।

বাইরের ঘরে একটি লণ্ঠন সারারাত পলতে নামিয়ে জ্বালানো থাকে। দরজা খোলবার পর তিনি সেইটি হাতে করে যেরকম কাঁপতে-কাঁপতে তাদের ঘরে ঢোকেন, তাতে তারা প্রথমটা একটু অবাকই হয়। অবাক হয় লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখের চেহারা দেখেও। বৃদ্ধ হলেও বিক্রম সিংহরায়কে সাহসী বলেই তারা জানে। কিন্তু সমস্ত মুখ তাঁর ভয়ে যেন সিঁটিয়ে উঠেছে তখন।

কী, হয়েছে কী পিসেমশাই! —ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে শর্মিলা।

পিসেমশাই প্রথমটা কিছু বলতে পারেন না। তারপর অস্পষ্ট জড়িত স্বরে বলেন, শুনতে পাচ্ছ?

শুনতে তারা তখন পেয়েছে। বাইরে ঠিক যেন তাদের ইন্দারার কাছ থেকে কেউ যেন কাউকে গলা টিপে হত্যা করছে এমনি একটা কাতর আর্তনাদ দু-বার রাত্রির অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে থেমে যায়।

প্রথম কিছুক্ষণ শর্মিলা ভয়ে কাঠ হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে সে বাইরের দরজা খুলে ছুটে বার হতে যায়।

বিক্রম সিংহরায় ও বিনতা দুজনেই তাকে ধরে কোনওরকমে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সকালের জন্যে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করে।

ভোর না হতেই শর্মিলা খোঁজ করতে বার হয় ব্যাপারটার। পিসেমশাই ও বিনতা যান তার সঙ্গে।

বাইরে ইন্দারার কাছে বা আর কোথাও গত রাত্রের ঘটনার কোনও চিহ্নই কিন্তু দেখা যায় না। শুধু বাইরের তাঁত-ঘরে রাত্রের পাহারাদার হিসাবে যে-দুটি লোক থাকে তাদের কারুরই পাত্তা নেই।

দিনেরবেলা তাদের বাড়িতে খোঁজ করতে পাঠিয়ে যে-খবর পাওয়া যায় তা অদ্ভুত। সে দুটি লোক আগের রাত্রেই নাকি তাদের ঘরে ফিরে এসেছিল। তারপর সকাল না হতেই তারা কোথায়

গেছে কেউ জানে না।

রাত্রের ঘটনার কথা কোথাও চাউর না করে শর্মিলা, বিনতা ও পিসেমশাই পরের রাত্রে বেশ একটু প্রস্তুত হয়েই থাকে। গ্রামের স্টেশনারি দোকান থেকে একটি জোরালো টর্চ তারা কিনে আনে পলাতক পাহারাদারের জায়গায় আরও দুটি লোককেও বহাল করে রাত্রে জাঙালবাড়িতে শোওয়ার জন্যে।

সেই অমানুষিক আর্তনাদ কিন্তু সেদিনও মাঝরাত্রে শোনা যায়। এবার ইন্দারার কাছ থেকে নয়, বাড়ির যে অংশটি ভগ্নস্তূপ, সেইদিক থেকেই যেন।

পাহারাদারদের সঙ্গে শর্মিলা, বিনতা ও পিসেমশাইকে নিয়ে টর্চের আলোয় যতখানি সম্ভব সেই পোড়োবাড়ির অংশটা পরীক্ষা করে দেখে সেই রাত্রেই। কিন্তু কোনও হদিশই পাওয়া যায় না এ-রহস্যের।

এরপর থেকে উপদ্রব আরও বাড়তে থাকে। এবার আর শুধু ভয় দেখানো অমানুষিক চিৎকার নয়। তার সঙ্গে আরও অদ্ভুত অবিশ্বাস্য নানা ঘটনা।

একদিন সকালবেলা উঠে ইন্দারার চারিধারের বাঁধানো চত্বরে রক্তমাখা পায়ের কয়েকটা ছাপ দেখা যায়।

যে দুজন পাহারাদার এতদিন পর্যন্ত কোনওরকমে টিঁকে ছিল তারা সেইদিন থেকেই হাওয়া। গোয়ালে, বাগানে ও তাঁত-ঘরে যারা কাজ করে তারাও এখন বিকেল হতে না-হতেই কাজ ছেড়ে পালাবার জন্যে ব্যস্ত।

জাঙালবাড়ির ওপর অপদেবতার কোপের কথা সারা গাঁয়েই তখন রটে গেছে। এরই মধ্যে একদিন রাত্রে পেছনের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে গভীর রাত্রে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখা যায়।

সকালবেলা খোঁজ করে দেখা যায়, সেখানে একরাশ খড় কোথা থেকে কে জড় করে আগুন দিয়েছিল। গাঁয়ের লোককে সে-কথা কিন্তু বিশ্বাস করানো যায় না। তারা রাত্রে গাঁ থেকে সেই অদ্ভুত আগুন আর ধোঁয়া দেখেছে। ব্যাপারটা যে ভৌতিক এ-বিষয়ে কারুর কোনও সন্দেহ আর নেই।

চৌধুরীমশাই এসব কথা শুনে অবশ্য নিজে থেকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসেন। তাঁর বন্দুক আছে। সেই বন্দুক নিয়ে রাত্রে জাঙালবাড়িতে পাহারায় থাকার প্রস্তাব তিনি করেন, কিন্তু শর্মিলাই তাতে আপত্তি জানায়।

কিছুদিনের মতো তাঁর বাড়িতে বিনতাকে নিয়ে থাকার অনুরোধও সে প্রত্যাখ্যান করে। এ-অনুরোধ করবার জন্যে শর্মিলাদের সমবয়সী দুজন ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়েই এসেছিলেন চৌধুরীমশাই। কিন্তু শর্মিলা তাদের শুধু ধন্যবাদ জানিয়েই ফিরিয়ে দিয়েছে।

এই পর্যন্ত বিবরণ শুনে পরাশর ও আমি দুজনেই সত্যি একটু অবাক হই।

পরাশর আমার প্রশ্নটাই তোলে—চৌধুরীমশাইকে পাহারা দিতে দিলে না কেন? তাঁর বাড়িতে গিয়ে ক'দিন থাকলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

শর্মিলা কোনও উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

বিনতার মুখে এ-কথায় একটু হাসির আভাস দেখে পরাশর একটু বিরক্তির সুরে তাকেই জিজ্ঞাসা করে—এতে হাসির কী আছে তা তো বুঝতে পারছি না।

বিনতা ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়েই এবার কথাটা বলে ফেলতে বাধ্য হয় বোধহয়।

সলজ্জ কৌতুকের সঙ্গে বলে—হাসছি মানে চৌধুরীমশাইয়ের অবস্থাটা ভেবে। ভদ্রলোক কত চেষ্টাই করেন আমাদের সাহায্যে করবার, কিন্তু শমি ওঁকে পাত্তাই দেয় না।

কেন? চৌধুরীমশাই কি লোক ভালো নন? —আমিই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করি।

আমার তো ভালো লোক বলেই মনে হয়। —বিনতা শর্মিলার দিকে কৌতুক-কটাক্ষ করে

বলে—শমির জন্যে উনি তো জান দিতে প্রস্তুত।

তুই থাম তো! —শর্মিলা ধমক দেয় বিনতাকে।

বিনতা থামলেও ব্যাপারটা অনুমান করে পরাশর এবার একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করে—শমির ওপর ওঁর দুর্বলতা আছে না কি? উনি তো বয়স্ক লোক। ওঁর মেয়েরাই তোমাদের বয়সী শুনলাম।

মেয়ে কোথা থেকে থাকবে! এবার হেসে ফেলে বিনতা—উনি বিয়েই করেননি। ওঁর বয়সও এমন কিছু হয়নি। বাপ-মা মরা ভাইঝিদের মানুষ করেছেন বলে তাদেরই মেয়ে বলেন।

আচ্ছা, খুব ওকালতি হয়েছে!—শর্মিলা এবার বিনতার পিঠে একটা চাপড় দিয়ে ঝঙ্কার দেয়—অত যদি পছন্দ তো নিজেই স্বয়ম্বরা হও না। এখন আসল কথা বলব, না এইসব বাজে হাসি মশকরা চলবে?

না, না আসল কথাই শুনি।—পরাশর শর্মিলাকে শান্ত করে।

আসল কথা তারপর আর বেশি কিছু নেই।— শর্মিলা বলে যায়—চৌধুরীমশাই তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে যেদিন ভাইঝিদের নিয়ে এসে অনুরোধ করে যান তার পরের দিনই বিকেলবেলা বক্সীবাবু আসেন স্টেশন থেকে আমাদের খোঁজ নিতে। আগেই শুনেছ তাঁর সঙ্গে এখানে আসবার কিছুদিন পর থেকেই আলাপ হয়েছে। প্রথমে তিনি চৌধুরীমশাইয়ের সঙ্গেই এসেছিলেন। তারপর অনেকবার নিজে থেকে এসে আলাপ করে এ-জায়গার প্রাচীন ইতিহাসের গল্প করে গিয়েছেন। আমরা সেকালের কোনও কিছু নিদর্শন যদি পাই তা তাঁকে দেখাতেও অনুরোধ করেছেন বারবার। নতুন করে সবজি বাগানের মাটিটা চষবার সময় পুরনো ভাঙা একটা তামার টুকরো পাওয়া যায়। তাতে কয়েকটা অক্ষর যেন খোদাই করা। সে টুকরোটা পেয়ে বক্সীবাবু দারুণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ওই খোদাই করা তামার টুকরো কোনও সেকালের মন্দিরের জন্যে জমির দানপত্রের তাম্রশাসনের অংশ বলে তাঁর বিশ্বাস। তিনি আমাদের এ-জায়গার ওপর ভালো করে নজর রাখতে বলেন। হয়তো অত্যন্ত দামি কিছু এখানেই আমরা পেতে পারি সে-আশ্বাসও দেন। তেমন কিছু অবশ্য পাইনি এ-পর্যন্ত। শুধু একদিন গোয়ালঘরটা বাড়াবার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে আমাদের মুনিশ গোটা দুই পুরনো মুদ্রা গোছের পায়। সেগুলো বক্সীবাবুকে দেখবার জন্যে দিয়ে এসেছিলাম তারপরই। কিছুদিন বাদে উনি অবশ্য জানান যে, সেগুলো সত্যিকার মুদ্রা নয়।

সেদিন আমাদের এখনকার বিপদের কথা চৌধুরীমশাইয়ের মুখে শুনেই তিনি খোঁজ নিতে এসেছিলেন। ব্যাপারটার মানে তিনিও কিছু বুঝতে পারেননি। সন্ধ্যা হতে পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এই বিষয়েই আলোচনা করতে-করতে তিনি পাথুরে পোলের রাস্তায় স্টেশনে ফিরে যান। পিসেমশাই তাঁকে পাথুরে পোলের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মনে আছে। পিসেমশাই কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকেই নিরুদ্দেশ।

সন্ধ্যে পার হয়ে রাত হতেই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। পিসেমশাই ভিতু আগে ছিলেন না। কিন্তু এইসব উপদ্রবের পর থেকে সন্ধের পর তিনি আর বাড়ির বাইরে পর্যন্ত বার হন না। তাঁর এত রাত পর্যন্ত না ফেরার কোনও কারণ না পেয়ে আমরা ক্রমশই অস্থির হয়ে উঠেছি।

সেদিন নতুন বহাল করা পাহারাদারটাও বাড়ি থেকে দুপুরে একবার ঘুরে আসবার নাম করে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি।

তা সত্ত্বেও রাত যখন দশটা তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি—বলেছে শর্মিলা—টর্চ নিয়ে আর বিনিকে সঙ্গে করে বাইরে খুঁজতে বেরিয়েছি। পাথুরে পোল পর্যন্ত তো দেখে এসেছি-ই, পেছন দিকের পোড়োগড়টারও এদিক-ওদিক খুঁজেছি। তারপর গিয়েছি পশ্চিম দিকে গঙ্গার চর পর্যন্ত প্রায়। বিনির অবস্থা তো বুঝতেই পারছ। আমারও সমস্ত শরীর যেন ভয়ে অবশ।

তবু মরিয়া হয়ে মনের জোরে কোনওমতে নিজেকে খাড়া রেখেছি। চিৎকার করে ডেকে আর এত ঘুরে-ঘুরেও পিসেমশাইয়ের কোনও খোঁজ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি আবার বাড়িতে। সেইখানেই বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে গেছে আতঙ্কে। যাওয়ার সময় দরজায় নিজে হাতে তালা দিয়ে গেছলাম। সে তালা খোলা। ঘরের মধ্যে ঢুকে টর্চের আলোয় সেই রক্তমাখা পায়ের দাগ দেখেই বিনি চিৎকার করে উঠেছে। আমারও তখন সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে টলে পড়বার অবস্থা।

পায়ের ছাপটা কী ধরনের? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর—বেশ বড় জোয়ান লোকের পায়ের ছাপ? ভেতরের দিকে যাওয়ার না বাইরে বেরুবার মুখে পড়েছে মনে হয়?

শর্মিলা এক-এক করে সব ক'টা প্রশ্নেরই জবাব দিয়ে জানিয়েছে—ছাপটা বড় জোয়ান পুরুষের নয়। ইঁদারার কাছে যেমন দেখা গেছল তেমনি যেন কোনও ছোট মেয়ের পায়ের। দুটি মাত্র ধ্যাবড়া অস্পষ্টগোছের ছাপ ঘর থেকে বার হয়ে যাওয়ার সময় যেন পড়েছে।

রক্তটা কীরকম লক্ষ্য করেছিলে? পরাশর আবার জিজ্ঞাসা করেছে—জমাট বাঁধা কি? রক্ত কিছুক্ষণ পড়ে থাকলে যেমন হয়?

হ্যাঁ, জমাট বাঁধা-ই! বলেছে শর্মিলা—কিন্তু রক্ত কি না তা আমারও সন্দেহ হয়েছে। আমার তো লালচে গাঢ় কোনও রঙ বলেই মনে হয়েছিল। তাইতেই মনে যেন একটু সাহস পেয়েছিলাম। কিন্তু সে-সাহসের আর দাম কী? রক্তের বদলে রঙ-ই যদি হয় তা হলেও কেউ এই জাঙালবাড়িতে লুকিয়ে থেকে এসব করছে এ-বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কে সে হতে পারে সেইটেই তো গভীর রহস্য।

আচ্ছা, পিসেমশাইকে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এসে দরজার তালাটা ভাঙা না খোলা দেখেছিলে?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

না, ভাঙা, নয়, খোলাই দেখেছিলাম। এবার বিনতাই বলেছে—তাই দেখে তো প্রথমে একটু আশা হয়েছিল যে, পিসেমশাই হয়তো ফিরে এসেছেন। তারপর ঘরে ঢুকতেই মেঝের ওপর ওই পায়ের দাগ দেখে আমারও প্রায় হার্টফেল-এর অবস্থা। শমিকে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে কয়েক সেকেন্ড বোধহয় বেহুঁশই হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন কিন্তু আপনাকে দেখে ততটা ভিতু মনে হচ্ছে না!—বিনতার সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ নিয়েছি আমি।

এখন যে আপনারা এসে গেছেন!—হেসে বুকটা আমার যেন অবশ করে দিয়ে বিনতা বলেছে—তাছাড়া মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার পর সবকিছুই বোধহয় খানিকটা সয়ে যায়। সে-রাত্রে বাইরের দরজাগুলোর শুধু খিল লাগাইনি তাতে চেয়ার-টেবিল লাগিয়ে, সহজে যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়, তার ব্যবস্থা করেছি। তারপর সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে নিয়ে জল দিয়ে ওই রক্ত না রঙ, যাই হোক ধুয়ে ফেলে যখন শুয়েছি তখন সে দিশেহারা আতঙ্কটা অনেকখানি যেন কেটে গেছল। আজ দুপুর পর্যন্ত শমি না ফেরায় অবশ্য আবার দিশেহারাই হয়ে গেছলাম।

আট

সে-রাত্রে বিছানায় শুয়েও ঘুমোতে কিন্তু পারিনি।—শর্মিলা আবার তার বিবরণ শুরু করেছে—বিনি একদিক দিয়ে আমার চেয়ে ভালো। ও ভয়ও যেমন বেশি পায় তেমনি ভুলে যেতেও ওর দেরি লাগে না। ও খানিকবাদে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমাকেই জেগে থাকতে হয়েছে সারারাত। সেই রাত্রে আরও সব বিশ্রী উপদ্রব হয়েছে। জানলাগুলো সব বন্ধ করে শুয়েছিলাম।

একবার এদিকে একবার নানা জানলায় কিসে যেন অনেকক্ষণ আঁচড়েছে। আমি তা অগ্রাহ্য করে শুয়ে থেকেছি। তারপর আবার সেই গলাটিপে-ধরা আর্তনাদ শোনা গেছে একেবারে যেন বাড়ির ঠিক বাইরে। সেইসঙ্গে শাবল বা ওইরকম কিছু নিয়ে দেওয়ালে ঘা মারবার শব্দ।

বিনিকে না জানিয়ে তখন আমি উঠে পড়ে একবার যেখানে শব্দ হচ্ছিল সেই দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। শব্দটা সেদিকে থেমে গিয়ে আর-একদিকে শুরু হয়েছে। এবার আমি তা গ্রাহ্য না করে মনটাকে শক্ত করে বিছানায় এসে রাতটা কাটিয়েছি। ভোর হতে না-হতেই দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েছি বিনিকে নিয়ে। দেখি, আমাদের দারোয়ান হিসেবে যাকে রেখেছিলাম সে লোকটা ফিরে এসেছে। বাড়িতে বাচ্চার অসুখের জন্যে রাত্রে আসতে পারেনি বলে সে কৈফিয়ত দিয়েছে। তাই মেনে নিয়ে তাকে ইচ্ছেকরেই কিছু জানাইনি। কিন্তু অবাক হয়েছি বেলা একটু বাড়তে না বাড়তেই চৌধুরীমশাই তাঁর গাড়িতে বক্সীবাবুকে নিয়ে এসে পড়ায়।

তাঁরা এসে ব্যস্ত হয়ে পিসেমশাইয়ের খোঁজ করেছেন। খবরটা এবার তাঁদের জানাতে হয়েছে। হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে পিসেমশাইয়ের খোঁজে আসার কারণটা জিজ্ঞাসা করেছি সেইসঙ্গে। তাতে তাঁরা যা বলেছেন তা শুনে একেবারে বিমূঢ় হয়েছি। পিসেমশাই নাকি আগের দিন সন্ধ্যার সময় বক্সীবাবুকে পোল পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার সময়ে তাঁকে বিশেষ করে পরের দিন সকালে চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে সকাল আটটার মধ্যে উপস্থিত থাকতে বলেছিলেন। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবুকে অত্যন্ত দরকারি কী একটা গোপনীয় কথা তাঁর নাকি না জানালে নয়। সেই কথাটা জানিয়ে তারপর পুলিশে যাওয়া উচিত কি না সে-বিষয়ে পরামর্শ করা না কি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন। পিসেমশাই তখনও গিয়ে না পৌঁছোনোতে একটু চিন্তিত হয়ে খোঁজ নিতে এসেছেন তারপর। কারণ, পিসেমশাই বক্সীবাবুকে যেরকম ব্যাকুলভাবে গোপন কথাটা জানাবার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর ওঁদের সঙ্গে সময়মতো গিয়ে দেখা না করাটা বেশ অস্বাভাবিক।

পিসেমশাইকে সেই সন্ধ্যার পর থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না শুনে, এ-কয়দিনের সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো উচিত বলে বক্সীবাবু ও চৌধুরীমশাই দুজনেই মত প্রকাশ করেছেন। চৌধুরীমশাইয়ের জেদে তাঁর গাড়িতেই থানায় গিয়েছি তারপর। দারোগাবাবু সব শুনে দুজন পুলিশ নিয়ে একবার সরেজমিনে তদন্ত করতেও এসেছেন। কিনারা কিছুই অবশ্য করতে পারেননি। আমাদের মতো দুজন অল্প বয়সের মেয়ের এরকম নির্জন বাড়িতে থাকা উচিত নয় বলে উপদেশ দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের ভীত মনের কল্পনা এইরকম একটা ইঙ্গিতই দিয়ে গেছেন।

পিসেমশাইয়ের অন্তর্ধান হওয়াটা তো আর কল্পনা নয়।—শর্মিলা একটু থামবার পর বলেছে পরাশর—সে-বিষয়ে দারোগাবাবুর ধারণা কী?

দারোগাবাবুর নাকি ধারণা পিসেমশাই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে রাগে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আমাদের কাছে যারা কাজ করে তাদের অনেকের কাছে এজাহার নিয়ে কার কাছে না কি তাই শুনেছেন।

ঝগড়া কি কিছু হয়েছিল কখনও?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ঝগড়া নয়, তবে একটু মতান্তর ইদানীং দু-একবার হয়েছে অবশ্য, স্বীকার করেছে শর্মিলা। —এইসব আজগুবি উপদ্রবে পিসেমশাই শেষদিকটায় বেশ একটু বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন সত্যি। তাঁর ভেতরকার কুসংস্কার একটু বোধহয় চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাঁর কেমন ধারণা হয়েছিল, এতকালের পুরনো পোড়োভিটেয় আবার চাষ-আবাদ আর খোঁড়াখুড়ি করে আমরা এখানকার কোনও বাস্তু দেবতার কোপে পড়েছি। আমাদের জন্যেই উনি ভয় পেয়েছেন। গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের মতো কাজ আমাদের বয়সী মেয়েদের দিয়ে এখানে হওয়ার নয় তাই আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন মাঝে-

মাঝে। তাতে দু-একসময়ে একটু হয়তো ধৈর্য হারিয়ে তাঁর অন্ধ কুসংস্কার নিয়ে কড়া কথা কিছু বলে ফেলেছি। কিন্তু সেসব কথা তিনি গায়েও মাখেননি।

আচ্ছা, যেদিন সন্ধ্যায় তিনি নিরুদ্দেশ হন—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে—সেদিনই বক্সীবাবুকে পাথুরে পোল পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার সময় পরের দিন চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে দেখা করতে অনুরোধ করা ছাড়া আর কিছু কি তিনি বলেছেন? বক্সীবাবুর কাছে সে-বিষয়ে কিছু শুনেছ?

হ্যাঁ, শুনেছি। বলেছে শর্মিলা—পিসেমশাই প্রথমে নাকি বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইকেই দোষ দিয়েছেন এই জায়গার প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে আমাদের ক্ষেপাবার জন্যে। গ্রামলক্ষ্মী নয়, আসলে এখানকার সেকালের কোনও দামি জিনিস খুঁড়ে পাওয়ার লোভেই আমরা এখানে জেদ করে আছি আর তাইতে কোনও অপদেবতার কোপে পড়েছি বলে তাঁর ধারণার কথা পিসেমশাই বক্সীবাবুকে জানিয়েছেন। আমাদের মিথ্যে আশাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সত্যি কথা বলে এ-অভিশাপের জায়গা ছাড়াবার চেষ্টা করতেই অনুরোধ করেছেন তাঁকে।

কী বলেছেন তাতে বক্সীবাবু?

তিনি আর কী বলবেন। পিসেমশাইয়ের অদ্ভুত ধারণার কথা তো তাঁর অজানা নয়। মনে-মনে তাই হেসেছেন। তবে অপদেবতার কোপ বা যাই হোক, এসব অদ্ভুত ব্যাপার যখন ঘটছে তখন আমাদের মতো মেয়েদের এখানে না থাকাই ভালো এই মতই প্রকাশ করেছেন।

সেকালের যখের ধন-টন পাবার লোভ সত্যি আপনাদের আছে নাকি?—এবার আমি জিজ্ঞাসা করেছি।

পেলে আপত্তি করব না, কিন্তু লোভ কিছু সত্যিই নেই।— হেসে বলেছে শর্মিলা।

এ-পর্যন্ত কিছু তেমন পেয়েছ কি? জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

ওই তো বললাম, একটা খোদাই করা তাম্রশাসনের টুকরো, আর ক'টা মুদ্রা গোছের। সেগুলো সেকালের সোনার দিনার কি রুপোর দ্রম্ম ভেবেছিলাম। কিন্তু বক্সীবাবু তো বলেছেন তা নয়। তবে এখানে কুষাণ আর গুপ্তযুগের মুদ্রা তো বটেই, এমনকী অঢেল সোনা-দানা পাওয়া আশ্চর্য নয়, বক্সীবাবুই একবার স্বীকার করেছেন। তাম্রশাসনের ভাঙা টুকরোতে তারই না কি ইঙ্গিত আছে।

শর্মিলার কথা শেষ হবার পর খানিকক্ষণ কেউ আর কিছু আমরা বলিনি।

পরাশর গম্ভীরভাবে কী যেন একটা ভাবতে-ভাবতে একবার প্রায় নিজের মনেই বলেছে —লোভ! লোভ! সমস্ত রহস্যের মূল হল লোভ!

তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছে—চৌধুরীমশাই তোমাদের তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করতে আসেন কবে?

সেইদিনই! —বলেছে শর্মিলা—থানা থেকে আমাদের প্রথম এখানে পৌঁছে দিয়ে চলে যান। বিকেলবেলাই আবার তাঁর দুই ভাইঝিকে সঙ্গে নিয়ে আসেন আমাদের তাঁর বাড়িতে গিয়ে থাকবার জন্যে বলতে।

তোমরা রাজি না হওয়াতে একটু দুঃখিত হয়েছেন, না?—পরাশর কেমন অদ্ভুতভাবেই যেন তাকিয়েছে শর্মিলার দিকে।

একটু নয়, খুব! —হেসে উত্তরটা বিনতাই দিয়েছে—আমি কাছে না থাকলে বোধহয় কেঁদে-ককিয়ে সাধাসাধি করতেন।

থামবি তুই! —শর্মিলা বিনতার পিঠে আবার একটা চাপড় দিয়েছে।

আমি থামলে সত্যি কথাটা তো আর মিথ্যে হবে না! —বলে বিনতা হাসতে-হাসতে শর্মিলার কাছ থেকে উঠে আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসেছে।

সত্যি, আপনাদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি। —শর্মিলাকে উদ্দেশ করেও বলেছি বিনতার দিকে চেয়ে।

আমার সাহস-টাহস নেই। —হেসে বলেছে বিনতা—আমি যা কিছু করেছি ওর ভরসায়। তবে সে-রাত্রে কিন্তু ভয়টয় পাওয়ার মতো কিছু বোধহয় হয়নি।

না,—শর্মিলা সায় দিয়েছে বিনতার কথায়—সে-রাত থেকে কেন জানি না সব উপদ্রব যেন থেমে গেছে।

তা হলে সেটা চৌধুরীমশাইয়ের জন্যে। —হেসে বলেছে পরাশর।

চৌধুরীমশাইয়ের জন্যে! —অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা,—তিনিই সব থামিয়েছেন না কি?

তিনি তো তাই বলেন। —পরাশর জানিয়েছে—তিনি নাকি তোমাদের একগুঁয়েমিতে নিরুপায় হয়ে দিনে-রাতে একজন করে পাহারাদারের ব্যবস্থা করেছেন।

মিথ্যে কথা!—শর্মিলা হঠাৎ তীব্র প্রতিবাদ করেছে—পাহারাদার নয়, বোধহয় চর লাগিয়ে রেখেছেন আমাদের ওপর নজর রাখবার আর নিজের কোনও মতলব হাসিলের জন্যে। আমি আজই তার প্রমাণ পেয়েছি।

কী প্রমাণ?—পরাশর জিজ্ঞাসা করেছে উত্তেজিতভাবে।

প্রমাণ প্রথমত, ওদিকের পোড়োমহলের এক জায়গায় লুকনো একটা টর্চ, একটা মাপবার হুইল ফিতে আর একটা ছোট গ্রামোফোনের চোঙার মতো জিনিস। পাহারা দিতে এসব জিনিসের নিশ্চয় দরকার হয় না! তা ছাড়া ওঁর পাহারাদার গ্রাম থেকে আসা-যাওয়া না করে ডিঙিতে গঙ্গা পার হয়ে যাতায়াত করে কেন? পাহারাদারের নামে ওঁর চর একজন নয়, অন্তত দু-তিনজন গত কয়েকরাত ধরে এখানে আসছে।

এসব তুই কী বলছিস!—ভয়ে, বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে বলেছে বিনতা।

যা দেখেছি তাই বলছি। উত্তেজিতভাবে বলেছে শর্মিলা—আজ ভোরবেলা উঠে, পিসেমশাইয়ের হঠাৎ নিরুদ্দেশ হওয়ার রহস্যের অন্য কোনও দিকের হদিশ পাওয়া যায় কি না দেখতে আমি পশ্চিমের গঙ্গার দিকটায় একলা গেছলাম। এখন গরমের দিনে এ-দিকটায় চড়া পড়ে গঙ্গা অনেক দূর সরে গেছে। সে-চড়ার মাটি কিছুদূর পর্যন্ত শক্ত, তারপর নরম কাদা। সেই নরম কাদার চরের কাছাকাছি গিয়ে তার ওপর কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। এদিকটার নদীর পাড় এমন নির্জন যে ভুলেও কেউ কখনও আসে না। এখানে এতগুলো পায়ের দাগ তাহলে কোথা থেকে পড়ল? পায়ের দাগগুলো যে সদ্য-সদ্য আগের রাত্রেই পড়েছে তার প্রমাণও পাই। শক্ত পাড়ে জুতো খুলে রেখে আমি সেই পায়ের দাগ ধরে একেবারে গঙ্গার জলের ধারা যেখানে বইছে সেখান পর্যন্ত চলে যাই তারপর। সেখানে নরম বেলেকাদায় একটা ডিঙি যে তুলে রেখে আবার ঠেলে জলে ভাসানো হয়েছে তার স্পষ্ট চিহ্ন পড়ে রয়েছে।

গঙ্গার ধার থেকে ফিরে এসে খুব ভালো করে লক্ষ্য করে বুঝতে পারি, পায়ের দাগ ক্রমশ শক্ত জমিতে অস্পষ্ট হয়ে এলেও ভাঙা গড়-বাড়িটার দিকেই গেছে। গড়-বাড়িটার ভেতর ঢোকবার পর পায়ের দাগ না পেলেও এখানে-সেখানে গঙ্গার কাদার ছিটে লেগে থাকতে দেখে কোনদিকে লোকগুলো গেছে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি।

সেই কাদার ছিটে ধরে এদিকে-ওদিকে একটু খোঁজ করতেই লুকনো ওই জিনিসগুলো একটা ভাঙা কুলুঙ্গির মধ্যে দেখতে পাই। চৌধুরীমশাইয়ের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করার মানে বুঝতে পারছ এবার?

কিন্তু এসব চৌধুরীমশাইয়েরই কাজ ভাবছ কেন? পরাশর একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করেছে।

ভাবছি তিনি পাহারার বড়াই হঠাৎ বোধহয় মুখ ফস্কে তোমার কাছে করে ফেলেছেন শুনে। শর্মিলা ঝাঁঝালো গলায় বলেছে—প্রথমে একটু অস্পষ্ট সন্দেহই আমার ছিল, কিন্তু ওঁর লোক পাহারায় আছে, শোনবার পর নিশ্চিত বুঝতে পারছি, এসবের পেছনে উনি আছেন।

জিনিসপত্রগুলো যেমন ছিল তেমনিই রেখে দিয়েছ না নাড়াচাড়া করেছ?—জিজ্ঞাসা করেছে পরাশর।

আমি কি অত আহাম্মক! শর্মিলা একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বলেছে—ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

তা হলে—পরাশর খুশি মুখে বলেছে, দু-চারদিনের মধ্যে এ-রহস্যের মীমাংসা হয়তো হতে পারে।

নয়

সে-রাত্রে পিসেমশাইয়ের ঘরেই আমার আর পরাশরের শোওয়ার ব্যবস্থা হল।

পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে পরাশরের সঙ্গে জাঙালবাড়ির রহস্যটাই ভালো করে আলোচনা করবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরাশরের তেমন কোনও উৎসাহই দেখলাম না। সে যেন ঘুমোতে পারলেই বাঁচে।

সারাদিন আমাদের অত্যন্ত ধকল গেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এইরকম একটা ভয়াবহ রোমাঞ্চকর ব্যাপার জানবার পর সেই জায়গাতেই রাত কাটাতে হলে ঘুম কি সহজে আসে!

তখন সমস্ত রহস্যটার অনেকরকম ব্যাখ্যাই আমার মাথায় আসছে, সেইসঙ্গে প্রশ্নও নানারকম।

পরাশরকে তাই আমি সহজে রেহাই দিলাম না।

যে-প্রশ্নটা সবচেয়ে আমায় খোঁচা দিচ্ছিল সেইটে পরাশরের মনেও উঠেছে কি না জানতে চাইলাম প্রথমে।

বললাম—বৃত্তান্ত যা শুনলাম, আর শর্মিলাদেবী যা বললেন তাতে ভয় দেখিয়ে কেউ ওঁদের এ-জায়গা ছাড়াতে চাইছে, এইরকমই যেন ধারণা হয়, কী বলো?

পরাশরের কাছ থেকে কোনও সাড়া পেলাম না।

দ্বিতীয়বার, আবার প্রশ্নটা তাকে শোনাতে হল তাই। তার উত্তরে সে ঘুমে জড়ানো গলায় শুধু বললে—হুঁ।

হুঁ কী!—বিরক্ত হয়ে উঠলাম পরাশরের ওপর—তোমার কী মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করছি। কেউ ওদের ভয় দেখিয়ে জাঙালবাড়ি থেকে তাড়াতে চাইছে, এই কি তোমার মত?

হুঁ।

এ হুঁ-টার তবু একটু অর্থ হয়।

তারপরের প্রশ্ন তাই তুললাম—কিন্তু শর্মিলাদেবীরা গ্রামলক্ষ্মী সমবায় শুরু করবার বেশ কিছুকাল আগে থাকতেই পিসেমশাই তো এখানে আছেন। তখন তাঁকে তাড়াবার কোনও উপদ্রব হয়েছিল কি না শর্মিলাদেবীর কথায় কিন্তু জানা গেল না।

পরাশর 'না' বললে, না, তার একটু নাসিকাধ্বনি হল ঠিক বোঝা গেল না।

গলা চড়িয়ে তাই বললাম—কী বলছি শুনতে পাচ্ছ পরাশর?

এবার চটপট জবাব এল—হ্যাঁ।

ধরো, আগে যদি কোনও উপদ্রব না হয়ে থাকে, তাহলে হঠাৎ কিছুদিন আগে তা শুরু হবার কারণ কী? পিসেমশাইয়ের চেয়ে শর্মিলাদেবীদের তাড়াবার গরজই কারুর বেশি, না, নতুন কিছু প্রচ্ছন্ন ঘটনা এর পেছনে আছে?

প্রশ্নটা বৃথাই করলাম। যাকে করলাম সে তখন ঘুমে অসাড়। না হলে অন্তত এরকম একটা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ উপেক্ষা করে নীরব থাকতে পারত না বলেই আমার ধারণা।

পরাশরের সঙ্গে রহস্যটা খুঁটিয়ে বিচার করতে পারলে ভালো হত। তা যখন হল না তখন

নিজেই সমাধানের সূত্রটা আমায় বার করতে হবে। তা যে পারব সে-বিষয়ে খুব বেশি সংশয় আমার তখন নেই। এ-রহস্যভেদ যত কঠিনই হোক, নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার জন্যেই তাতে আমায় সফল হতে হবেই। পরাশরের কাছে এ-বিষয়ে হার মানতে আমি পারব না। তার সঙ্গেই আমার রেষারেষি।

পরাশর আলোচনাটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ায় খুব দুঃখিত তাই আমি হইনি। পরাশর এরকম উদাসীন থাকলেই বরং আমার সুবিধে।

সুবিধেটা যে কী নিজের কাছে স্বীকার করতে তখন আর আমার দ্বিধা নেই। বিনতাকে অবাক ও মুগ্ধ করাই আমার আসল ও একমাত্র লক্ষ্য। পরাশরের সঙ্গেই বিনতার বিয়ে হওয়ার একটা কথা ছিল। পরাশর অবশ্য এ-বিয়েতে নিজেকে জড়াতে চায় না বলেছে, আমাকে সঙ্গেও এনেছে শুধু রক্ষক হিসেবে তাকে সামলাবার জন্যে।

তবু পরাশরের মুখের কথায় বিশ্বাস রাখতে আমি পারছি কই! বিনতার মতো মেয়েকে পাওয়ার আশা থাকলে কেউ যে প্রত্যাখ্যান করতে পারে এ আমার ধারণার বাইরে। তাও দূরে চোখের আড়ালে যখন ছিল তখন যা বলেছে—বলেছে বাহাদুরি দেখাতে। এখন চোখের সামনে বিনতাকে দেখে সে কথা ভুয়ো হয়ে যেতে বাধ্য।

না, পরাশর আলোচনাটা না শুনে ঘুমিয়ে যে পড়েছে, ভালোই হয়েছে তাতে।

ভেবে-চিন্তে রহস্যের যেসব খেই আমি বার করছি পরাশরকে তা জানাবার দরকার কী!

তার আগেই মীমাংসাটা, যেমন করে হোক আমায় একাই করে ফেলতে হবে।

জাঙালবাড়ির রহস্য আর সেইসঙ্গে বিনতার কথা ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

রাতের শেষ প্রহরে দূরে শেয়ালের ডাকেই বোধহয় ঘুম ভেঙে গেল।

একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পলতে নামিয়ে মিটমিটে করে ঘরের কোণে রাখা ছিল। তারই আলোয় পরাশরের বিছানার দিকে চেয়ে অবাক হলাম, সে বিছানায় নেই।

ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার দরজাটা ভেজানো দেখে বাইরেই সে গেছে বুঝলাম। কিন্তু এখনও রাতের অন্ধকার কাটেনি। এ-সময়ে বাইরে যাওয়ার আগে আমায় একটু জাগিয়ে যাওয়া তার কি উচিত ছিল না?

যা-সব ব্যাপার এখানে ঘটে গেছে তাতে রাতের অন্ধকারে একলা এভাবে বাইরে যাওয়া নির্বোধ গোঁয়ার্তুমি ছাড়া আর কিছু নয়।

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই তার ফেরার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু কোথায় পরাশর? ঘণ্টাখানেক কেটে গিয়ে বাইরের অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে তখন, তবু পরাশরের দেখা নেই।

এবার সত্যি একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। আরও উদ্বিগ্ন হলাম পরাশর বেশ তৈরি হয়েই বেরিয়েছে জেনে। যা পরে সে শুয়েছিল সে-জামাকাপড় ছেড়ে পরাশর বাইরের পোশাকেই বেরিয়েছে। যে-টর্চটা আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম ও রাত্রে যেটা আমার মাথার বালিশের কাছে ছিল, সেটাও সে নিয়ে গেছে।

টর্চটা নেওয়ার সময় আমার বিছানা তাকে হাতড়াতে হয়েছে, তবু আমায় সে ডাকা দরকার বোধ করেনি।

পরাশরের জন্যে ভাবনা যেমন হচ্ছিল তার ওপর রাগও তেমনি।

পরাশর যে রহস্যভেদের বাহাদুরির জন্যেই এমন আহাম্মকের মতো বেপরোয়া হয়েছে এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ তখন আমার নেই। আমার ওপর টেক্কা দেওয়ার জন্যেই রাত না পোহাতে তার একা বার হওয়ার এই দুঃসাহস।

যেন তাইতেই ভোর হতে না-হতে সে সবকিছু মীমাংসা করে আসবে।

রাগ যতই হোক এতক্ষণেও তাকে ফিরতে না দেখে নিশ্চিন্তে মনে আবার ঘুমনো তো আর যায় না। তার খোঁজখবর নিতে বাইরে একবার যেতেই হয়।

পোশাক বদলে সেইজন্যেই বার হতে গিয়ে শর্মিলাদের জানিয়ে যাওয়া উচিত কি না ভাবছি এমনসময়ে ও-পাশের করিডর থেকে শর্মিলারই গলা শুনতে পেলাম।

ঘুম ভেঙেছে পরাশরদা? দরজাটা একটু খুলবে!

দরজাটা খুললাম। আমাদের ঘরের ওদিকেই একটা লম্বা করিডর চলে গেছে শর্মিলাদের ঘর ছাড়িয়ে ওদিকে রান্না ও ভাঁড়ার পর্যন্ত। শর্মিলা ও বিনতা যেরকম সাজপোশাকে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হল তারা হঠাৎ ঘুম ভেঙে আসেনি, অনেক আগে উঠে সাজপোশাক প্রসাধন সব সেরেছে।

দরজা খুলতেই ভেতরে এসে শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—কই, পরাশরদা কোথায়?

পরাশরের অন্তর্ধান-বৃত্তান্ত এবার বললাম।

শুনে যতটা বিস্মিত বা বিচলিত হবে বলে অনুমান করেছিলাম তা কিন্তু শর্মিলা হল না। একটু ভুরু কুঁচকে বললে—রাতদুপুরে বেরুবার কী দরকার ছিল! চলুন দেখি।

শর্মিলার প্রায় নির্বিকার ভাব দেখে বুঝলাম মামাতো ভাইটির মাথা যে সম্পূর্ণ সুস্থ নয় তা তার অজানা নয়।

বিনতা কিন্তু উদ্বিগ্নভাবে যা বললে তা আমারই মনের কথার প্রতিধ্বনি হলেও বুকে একটু বাজল।

আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে শমি—বিনতা শর্মিলাকেই বললে বাড়ি থেকে বাইরে এসে—সেই রাত্তিরে বেরিয়ে এখনও পরাশরবাবু ফেরেননি। কোনও বিপদ হয়নি তো!

বিনতার এ-দুর্ভাবনাটুকু স্বাভাবিক কিন্তু তার মধ্যে আরও গভীর কোনও ব্যাকুলতা হয়তো আছে ভেবে মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল।

শর্মিলা কিন্তু তার ভ্রাতা সম্বন্ধে প্রায় নির্বিকার। সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্যভরে বললে—কচি খোকা তো নয়। নিজের মতলবে বেরিয়েছে। তাতে যদি বিপদ হয় তো কে কী করতে পারে! মাঝে থেকে আমাদের কাজটা মাটি!

শর্মিলা ও বিনতা যে এই ভোরেই কোথাও যাওয়ার জন্যে সেজেগুজে বেরিয়েছে সে-কথাটা এতক্ষণে খেয়াল হল।

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারা কোথাও যাবেন ঠিক করেছিলেন, না?

হ্যাঁ—বিনতাই জানালে—শমি কাল রাত্রেই ঠিক করেছিল আজ সকালে উঠেই স্টেশনে যাবে।

স্টেশনে!—একটু অবাক হয়ে জানতে চাইলাম—আজই এত সকালে স্টেশনে কেন? অন্য কোথাও যাওয়ার জন্যে নিশ্চয় নয়!

না, অন্য আবার কোথায় যাব!—শর্মিলাই জবাব দিলে ঈষৎ অধৈর্যের সঙ্গে—স্টেশনেই যাচ্ছিলাম বক্সীবাবুর কাছে কয়েকটা কথা আলোচনা করে জানবার জন্যে।

আমার বিমূঢ় ভাবটা লক্ষ্য করে শর্মিলা একটু থেমে আবার বললে—কী ভাবছেন বুঝতে পারছি। ভাবছেন, আজই এত সকালে বক্সীবাবুর সঙ্গে আলোচনা করবার এত তাড়া কেন। তাড়ার কারণ আছে। যা জানতে চাই আর দেরি হলে বক্সীবাবু তা ভুলে যেতে পারেন বলে সন্দেহ আছে আমার। এখনই হয়তো বেশি দেরি হয়ে গেছে।

শর্মিলা ব্যাপারটার সব রহস্য ভাঙতে চায় না মনে করে এ-বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করছিলাম, বিনতাই আমার হয়ে কৌতূহলটা প্রকাশ করে দিল।

অভিমানের সুরে বললে—কী এমন দরকারি কথা আজ না জিজ্ঞাসা করলেই বক্সীবাবু ভুলে

যাবেন আমি তো বুঝতে পারছি না। তাই যদি হয় তা হলে, বক্সীবাবুর সঙ্গে আগেও তো কতবার দেখা হয়েছে। তখন সে-কথা জিজ্ঞাসা করা যেত না!

না, যেত না।—শর্মিলা এবার একটু হেসে বললে—কারণ, জিজ্ঞাসা করবার কথাগুলো আগে মাথাতেই আসেনি। কালই রাত্রে ভাবতে-ভাবতে প্রশ্নগুলো হঠাৎ জরুরি মনে হল। আজ সকালে উঠেই বক্সীবাবুর কাছে তাই যাব ঠিক করেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, পরাশরদার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নেব, কিন্তু তিনি তো রাত থেকেই উধাও। এখন পরাশরদা না ফেরা পর্যন্ত যেতেও পারছি না। আর পরাশরদা ফিরতে-ফিরতে কত বেলা হবে কে জানে!

পরাশরের দেরি করে ফেরার সম্ভাবনায় একটু বিরক্ত হওয়া ছাড়া তার নিরাপদ থাকা সম্বন্ধে শর্মিলা যেরকম নিশ্চিন্ত মনে হল, আমি কিন্তু তখন আর তা থাকতে পারছি না।

ইতিমধ্যে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বাড়ির বাইরে এসে এদিক-ওদিক যেটুকু আমরা ঘুরেছি তার মধ্যে পরাশরের কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি।

শর্মিলাদের বেশিরভাগ লোকজন এইসব উপদ্রবের পর এধার আর মাড়ায় না। ইঁদারায় জল তোলা, বাসন-কোসন মাজা আর গরু-বাছুরের তদারকের জন্যে জন দুই মুনিশ শুধু সকালবেলা এসে বিকেল না হতে-হতেই চলে যায়।

সেই মুনিশদেরই একজনকে বাঁধানো জাঙাল দিয়ে আসতে দেখে, শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—পথে এদিক থেকে কাউকে যেতে দেখেছ গোবর্ধন, কোনও বাবুকে?

না, গোবর্ধন কোনও মানুষজন তো নয়ই, একটা শেয়াল কুকুরকেও এ-পথে যেতে আসতে দেখেনি জানা গেল।

সত্যি, তা হলে পরাশর কোথায় যেতে পারে!

গোবর্ধন নিজের কাজে চলে যাওয়ার পর চিন্তিত হয়েই শর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করলাম—এই জাঙালের পথে স্টেশন কি গাঁয়ে না গেলে আর কোন পথে কোথায় যাওয়া পরাশরের পক্ষে সম্ভব?

সম্ভব গড়মহলের গোলকধাঁধায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া।—পরাশরের আহাম্মকিতে অপ্রসন্ন হয়েই যেন বললে শর্মিলা—কিন্তু গড়মহলের ধ্বংসস্তূপ দেখবার জন্যে শেষরাতে একা যাওয়ার তো কোনও দরকার ছিল না। আজ দিনেরবেলায় আলোয়-আলোতেই অনায়াসে যেতে পারত। তা ছাড়া আপনারা আসার দরুন কি না বলা যায় না, কাল রাত্রে কোনও উপদ্রব হয়েছে বলে তো টের পাইনি। বাইরেও কোনও চিহ্ন-টিহ্ন দেখছি না। সুতরাং হঠাৎ শেষরাতে তার বার হয়ে যাওয়ার কোনও মানেই বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা, কাল যেখানে তুমি চরের ওপর নৌকোর দাগ দেখেছিলে পরাশরবাবু সেদিকে যেতে পারেন না?—বিনতা জিজ্ঞাসা করল।

সেদিকে!—শর্মিলা একটু কী যেন ভেবে নিয়ে বললে—বেশ, সেদিকটাই একবার দেখে আসি তা হলে।

জাঙালবাড়ির পেছনে পুবদিকে বেশ বিস্তৃত খানিকটা পাথুরে বাঁজা মাঠ, তারপরে প্রকাণ্ড পলিপড়া চর।

সেদিকে বেশিদূর কিন্তু যেতে হল না। হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার শুনে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চিৎকারটা কোনদিক থেকে ও কার যখন বুঝলাম তখন সত্যিই একেবারে হতভম্ব। উত্তর দিকে দূরের গড়মহলের পাহাড়ি গোছের সব ঢিবি ঘুরে পরাশর আমাদেরই ডাকতে-ডাকতে একরকম ছুটেই আসছে।

সে কাছে আসতে তাকে দেখে যত না অবাক হলাম তার হাতের বস্তুটিকে দেখে তারচেয়ে

কম হলাম না।

তার হাতে সুতো দিয়ে ঝোলানো দুটো বড়-বড় শোলমাছ!

বাহাদুরির সঙ্গেই কানকোর ভেতর দিয়ে সুতো গলিয়ে ঝোলানো মাছ দুটোকে আমাদের মুখের ওপর তুলে ধরে পরাশর বললে—কীরকম তাগড়া পুরুষ্টু শোল দেখছ! পাঁঠার মাংসকে হার মানায়। মেয়েদের গলগ্রহ না হয়ে, নিজেদের খাওয়ার সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে ফেলেছি।

এতক্ষণ সবাই আমরা হাঁ হয়ে ছিলাম। কারুর মুখ দিয়েই কোনও কথা বার হয়নি।

এবার আমিই প্রথম অনুযোগের সুরে রুক্ষভাবে বললাম—তুমি কি এই মাছ ধরতে শেষরাত্তিরে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলে কাউকে কিছু না জানিয়ে? এদিকে আমরা ভেবে সারা। মিছিমিছি তোমায় খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

ও, তোমরা আমাকেই খুঁজতে এদিকে যাচ্ছিলে নাকি?—পরাশর যেন আমাদের বোকামিতে ক্ষুণ্ণ—আমায় খোঁজবার কী দরকার ছিল?

সত্যিই দরকার কিছুই ছিল না।—ভাইয়ের কথার উপযুক্ত জবাব এবার ভগিনী শর্মিলাই দিলে—অজানা নতুন জায়গায় রাত চারটের সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে কেউ যদি ঘর ছেড়ে চুপিচুপি বেরিয়ে যায়, তাহলে ধরে নেওয়াই উচিত যে, তাগড়া আর পুরুষ্টু দুটো শোলমাছ ধরতেই গেছে! এখন শোলমাছ দুটো পেলে কোথায় শুনি।

যেখানে ইচ্ছে করলে রোজ পাওয়া যায়। —পরাশর এমনভাবে বললে যেন কাছেপিঠেই নিত্যকার বাজার থেকে মাছ দুটো সে কিনে এনেছে!

যেখানে রোজ পাওয়া যায়!—আমিই এবার অধৈর্যের সঙ্গে বললাম, এখানে কোথায় কী পাওয়া যায় তুমি জানলে কী করে, তুমি তো কাল দুপুরে আমারই সঙ্গে এসেছ?

হ্যাঁ, তা এসেছি বটে! পরাশর যেন বাধ্য হয়ে স্বীকার করল—তাই তো একটু বেশি হাঙ্গামা পোয়াতে হল। অথচ এ-মাছ না পেলে সমস্ত ধাঁধাটার মীমাংসায় একটা বড় ফাঁক থেকে যায়।

পরাশর বলে কী! শর্মিলা তার মামাতো ভাইকে ভালোমতোই চেনে। কিন্তু আমাদেরই মতো হতভম্ব হয়ে তার মুখ দিয়ে কোনও বিদ্রূপ কি বকুনি আর শোনা গেল না। পরাশরের এ-হেঁয়ালি শুধু ভুয়ো ধাপ্পা না তার সত্যিকার কোনও অর্থ আছে বুঝতে না পেরে শর্মিলা শুধু একটু সন্দিগ্ধ সুরে বললে—এখানকার সব রহস্যের জট ছাড়াতে ওই মাছ দুটোও খেই তুমি বলতে চাও?

নিশ্চয়।—পরাশর অবিচলভাবে জানালে—এই মাছ পেয়েই তো একটা মস্ত গোলমেলে ব্যাপারের মানে পেলাম।

কিন্তু মাছটা কোথায় পেলে তা তো বলছো না। বিনতার সামনে পরাশরের বাহাদুরিটা সহ্য না করতে পেরে রূঢ়ভাবেই আমি বললাম—খানিক আগে গোবর্ধন জাঙালের রাস্তায় এসেছে। সে তো তোমায় দেখেনি।

না, সে দেখবে কী করে।—পরাশর মাছ কোথা থেকে পেয়েছে সে-প্রশ্নটা যেন ইচ্ছে করে এড়াবার জন্যেই হঠাৎ চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটিয়ে বললে—তোমাদের লোকজন তো মাত্র এখন দুটি, ওই গোবর্ধন আর কী যেন নাম কাল শুনলাম, রঘু। এদেরও এবার রাখা কিন্তু মুশকিল হবে। আমার তো ভয় হচ্ছে ওরা আজ সকালেই না হাওয়া হয়।

কী বলছ তুমি! আজ সকালেই ওরা হাওয়া হবে! অমনি বললেই হল!

শর্মিলার ধমক-দেওয়া গলায় স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরাশরের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আমাদেরই মতো তার রীতিমতো সন্দেহ জেগেছে।

পরাশর এ-ধমকে একটু কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে বললে—সাধ করে কি কু গাইছি অমন। ওরা

না যদি যায় খুব ভালো, কিন্তু...

পরাশরকে কথাটা আর শেষ করতে হল না।

আলাপ করতে-করতে আমরা জাঙালবাড়ির পশ্চিমেই তখন পৌঁছে গেছি। আমাদের সামনে বড় ইঁদারা থেকে গোবর্ধন লাটা দেওয়া বালতিতে জল তোলবার আয়োজন করছে, তাও আমাদের চোখে পড়েছে।

পরাশরের কথা ওই পর্যন্ত পৌঁছোতেই গোবর্ধনের একটা অমানুষিক চিৎকারে আমাদের বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে গেল।

গোবর্ধন লাটায় বাঁধা দড়ি ধরে বালতিটা ইঁদারার পাড় পর্যন্ত তুলে ঢালতে গিয়েই ওই আতঙ্কের চিৎকার ছেড়েছে।

আমরা যতক্ষণে সাড় ফিরে পেলাম তার আগেই সুতোয় বাঁধা মাছু দুটো একধারে ফেলে পরাশর ইঁদারার কাছে ছুটে গেছে।

ভয়ে ফ্যাকাশে গোবর্ধন কাঁপতে-কাঁপতে তখনও বালতিটা ধরে আছে।

পরাশর তার হাত থেকে বালতিটা দড়িসুদ্ধ টেনে নিয়ে নিজে এবার তার ওপর ঝুঁকে পড়ল।

কয়েক সেকেন্ড নিস্পন্দ হয়ে থাকবার পর আমরাও ছুটে গিয়ে গোবর্ধন যা দেখে আর্তনাদ করে উঠেছে ও পরাশর একাগ্রভাবে যা দেখতে তন্ময়, সেই জলভরা বালতিটা দেখলাম।

জল নয়, তার সঙ্গে বালতিতে গাঢ় রক্ত কে যেন গুলে দিয়েছে।

কিন্তু এ-কি রক্ত না রং?

আমার মতো শর্মিলারও একই সন্দেহ হয়েছিল। পরাশরের হাত থেকে বালতিটা টেনে নিয়ে কাৎ করে একটুখানি জল সে গড়িয়ে দেখে বললে—রক্ত কোথায়! এ তো রং। গাঢ় লাল রং কে ইঁদারায় গুলে ফেলেছে।

না, শর্মি—পরাশর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লে—রং নয়, আজ ইঁদারায় যা ফেলা হয়েছে তা সত্যিই রক্ত। বালতির গাটা দ্যাখো, দ্যাখো কুয়ার কিনারাটা। কিছু রক্ত সেখানে জমাট বেঁধে লেগে আছে।

রক্ত! সত্যি রক্ত!

বিনতার শিউরে উঠে কাগজের মতো শাদা হয়ে যাওয়াটা চোখের ওপর দেখলাম। বুকের ভেতরটা তখন আকুল হয়ে উঠেছে, হাতটা বাড়িয়ে তার কম্পিত হাতটা ধরে একটু সাহস দেওয়ার। কিন্তু সাহস বা স্পর্ধা যাই বলি, তা আমার নেই।

বিনতা একটু টলে গিয়ে শর্মিলার হাতটাই জোর করে চেপে ধরল দেখলাম। পরাশর তার কাছেই দাঁড়িয়েছিল। এরকম দিশাহারা মুহূর্তেও পরাশরের দিকে সে যে ভুলেও হেলে পড়েনি এইটুকুই তখন আমার সান্ত্বনা।

সত্যিই প্রেমে পড়লে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়।

ইঁদারার মধ্যে সত্যিকার রক্ত ঢালা হয়েছে জানবার পর আমি শুধু বিনতার কথাই যে ভাবছি, কয়েক মুহূর্ত বাদেই সে-হুঁশ হলে বেশ একটু লজ্জিত হলাম।

সামনের ভয়ঙ্কর রহস্যটাতেই সমস্ত মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানকার লোকজন আজই হয়তো থাকবে না যখন বলেছিলে তখন কি এইরকম একটা কিছুর আভাস পেয়েছিলে তুমি!

আভাস?—পরাশরকে একটু অন্যমনস্ক মনে হল—না, আভাস কেন, প্রমাণটাই পেয়েছিলাম তখন।

প্রমাণটা কী জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পরাশর দিলে না। নিজেই আবার চিন্তিতভাবে বললে —এবারের শয়তানিটা বেশ সাংঘাতিক গোছের। খাবার জলের জন্যে তোমাদের এই ইঁদারাটি ছাড়া

আর তো কোনও ভরসা নেই। এ-ইঁদারার জল পরিষ্কার করা এখন দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ জলের সমস্যা না মেটাতে পারলে এখনকার পাট তোমাদের ওঠাতেই হবে।

না, কিছুতেই না।—উচ্ছ্বাসের সঙ্গে নয়, শান্ত দৃঢ়স্বরে বললে শর্মিলা—আগেই তো বলেছি ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবার আনন্দ কাউকে কিছুতেই দেব না। ইঁদারার জল নষ্ট হয়ে থাকে তো এখান থেকে একমাইল হেঁটে গিয়ে নদীতে স্নান করে আসব, সেখান থেকে জল বয়ে এনে ফুটিয়ে খাব, তবু হার মানব না। পুলিশকে আর-একবার এ-ব্যাপার জানিয়ে দেখব। তারা কিছু করে ভালো, না করে নিজেরাই যা করবার করব।

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে শর্মিলা আমাদের দিকে ফিরে পরাশরকেই উদ্দেশ করে বললে —এখন জানতে চাই তুমি এই বিপদের মধ্যে আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি আছ কি না। জলধর-বাবুকে অবশ্য আমাদের জন্যে এইসব বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে নিজেকে না জড়াতেই আমি অনুরোধ করব...।

শর্মিলাকে তার কথা শেষ না করতে দিয়ে পরাশর কিছু বলার আগেই উত্তেজিত গলায় আমি বললাম—আপনার সে-অনুরোধ আমি রাখতে পারব না শর্মিলাদেবী। পরাশর থাকতে রাজি হোক বা না হোক, এ-রহস্যের মীমাংসা আর শয়তানির শেষ না দেখা পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গেই আছি জানবেন।

কথাটা শর্মিলাকে বললেও দৃষ্টিটা যে আমার বিনতার ওপরই নিবদ্ধ বিনতার একটু লাল হয়ে মুখ নামানোতে তা বুঝলাম।

মনে হয়, আর কেউ তা লক্ষ্য করেনি, কারণ, পরমুহূর্তেই পরাশর এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে—এই তো পুরুষের মতো—বন্ধুর মতো কথা। তোমার কাছে আজ যে আমি কতখানি ঋণী হলাম জলধর, তা বলতে পারি না।

আমার সম্বন্ধে পরাশরের উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু হঠাৎ আমার কাছে তার ঋণী হওয়ার কথাটা কোথা থেকে আসে ঠিক অবশ্য বুঝতে পারলাম না।

তবে পরাশরের অনেককিছুরই যে মানে পাওয়া যায় না, তা আমার জানা।

পরাশর ও শর্মিলা তো বটেই· বিনতাও যেন আমার সঙ্কল্প জানবার পর বেশ একটু খুশি বলে মনে হওয়ায় আমি তখন উল্লাস-উৎসাহের সপ্তম স্বর্গে উঠে গেছি।

বাইরে তবু যথাসম্ভব নিজেকে সামলে গম্ভীর হয়ে বললাম—এসব উচ্ছ্বাসের কোনও দরকার নেই পরাশর। এখন বেশ ভেবে-চিন্তে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কী আমাদের এখন করা দরকার তাই ঠিক করে ফেলতে হবে এখুনি।

হ্যাঁ, প্রথম গোবর্ধনকে...এই পর্যন্ত বলেই পরাশর থেমে গিয়ে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাল।

সত্যি, কোথায় গোবর্ধন! আমরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে ব্যস্ত তখনই সে নিঃশব্দে এ-সাংঘাতিক জায়গা পরিত্যাগ করেছে। তার এভাবে পালানোটা অস্বাভাবিকও কিছু নয়। কুয়োর জলে টাটকা রক্তের মতো সর্বনাশা ব্যাপারের পর কোন ভরসায় আমাদের মতো ক'জন আহাম্মক বাইরের লোকের সঙ্গে সে থাকবে!

প্রথম গোবর্ধনকে কী জন্য খুঁজছিলে?—এই নতুন পরিস্থিতিতে একটু তিক্তভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করলে শর্মিলা।

খুঁজছিলাম ওদের রাজাবাবুকে একটু খবর দেওয়ার জন্যে।—বললে পরাশর।

সবার আগে তাঁকে খবর দেওয়ার কথা মনে হল কেন?—শর্মিলা বেশ একটু বিদ্রূপের স্বরে বললে মনে হল—তিনি এলেই সব সমস্যা মিটে যাবে?

না, তা নয়!—পরাশরের গলার সুরটা একটু কৌতুকের কি না বুঝতে পারলাম না—এমনিই তোমাদের হিতৈষী হিসেবে তিনি ব্যাপারটা এসে দেখে কী বলেন জানতে চাইছিলাম। তা তোমার

যখন আপত্তি তখন তাঁকে খবর দেওয়ার দরকার নেই। আর খবর দেওয়ার লোকই তো হাওয়া। আমি অবশ্য একবার দশানি গাঁয়েই যাচ্ছি।

তুমি গাঁয়ে যাচ্ছ কেন? আমি জিজ্ঞাস করলাম।

যাচ্ছি, ওখানকার মনোহারী দোকানে ক'টা জিনিসের খোঁজ করতে।

এখন তোমার মনোহারী জিনিস কেনার দরকার পড়ল? বিস্ময়ের সঙ্গে বিরক্তিটা না প্রকাশ করে পারলাম না,—তার আগে জলের সমস্যা মেটাবার কথাটা ভাবলে হত না! সত্যিই কি দু-বেলা একমাইল দূরের নদী থেকে জল বয়ে এনে দিনের পর দিন কাটানো সম্ভব?

না, তা কেন? জলের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।— পরাশর আমাকে সমর্থনই করে বললে, —কিন্তু গাঁয়ে একবার এখুনি না গেলে নয়।

বেশ তাই যাও।—বললে শর্মিলা, আমরাও যে জন্যে বেরুচ্ছিলাম বক্সীবাবুর কাছে, সে-কাজটা সেরে আসি। এখন না গেলে পরে যাওয়ার আর কোনও মানে থাকবে না।

কী এমন জরুরি কাজ বক্সীবাবুর কাছে যে এখুনি না সারলে নয়!—জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

জরুরি কাজ হল বক্সীবাবুর কাছে ক'টা কথা জানা!—শর্মিলা পরাশরের মতোই একটু যেন হেঁয়ালি করে বললে—কথাগুলো এখুনি না জানলে নয়।

হুঁ, এখন? কী কথা জানতে পারি?—পরাশর একটু কৌতুকের স্বরেই প্রশ্ন করল।

পারো। তবে দোহাই তোমার। কৌতূহলটা যদি আমার অন্যায় বা বাজে মনে হয় তাহলে সে-বিষয়ে আর আলোচনা করবার চেষ্টা কোরো না।—একটু থেমে আমাদের প্রতিক্রিয়ার জন্যে যেন তৈরি হয়ে নিয়ে শর্মিলা বললে—বক্সীবাবুর কাছে যা জানতে চাই তার প্রথমটা হল, গাঁয়ের চৌধুরীমশাই কবে থেকে এখানকার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে উৎসাহী হয়েছেন। আর দ্বিতীয়টা হল, নিখোঁজ হবার আগে বক্সীবাবু না চৌধুরীমশাই, কার কাছে পিসেমশাই গোপন জরুরি কিছু জানাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। ওঁরা দুজনে সেদিন চৌধুরীমশাইয়ের বাড়িতে পিসেমশাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করে তারপর তাঁর খোঁজে এখানে এসেছিলেন। পিসেমশাই বক্সীবাবুকেই কথাটা জানিয়ে চৌধুরীমশাইকে খবরটা দিতে বলেছিলেন, না চৌধুরীমশাইকে খবরটা দিয়েছিলেন বক্সীবাবুকে তাঁর বাড়িতে ডাকিয়ে এনে অপেক্ষা করার জন্য।

শর্মিলা জটিল মানসাঙ্কের মতো তার বক্তব্যটা শেষ করবার পর পরাশরের মুখে একটু ঠাট্টার হাসি হয়তো ফুটে উঠবে, অনুমান করেছিলাম। তা কিন্তু ফোটেনি। বরং অত্যন্ত গম্ভীরই সে হয়ে গেল। খানিক সেইভাবে চুপ করে থেকে কী যেন ভেবে নিয়ে বললে, বক্সীবাবু কী বলেন জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। তোমরা স্টেশন থেকে ফিরে এসো। তার আগেই জলধরের সঙ্গে গাঁ থেকে ফিরে আসতে পারব আশা করছি। হ্যাঁ, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে ভাবনা নেই। সে-ব্যবস্থা আমরাই করব। আমরা এগোচ্ছি। তোমরাও ঘর-দোরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ো।

পরাশর আমায় একরকম টেনে নিয়েই চলল এবার।

একে এই সাংঘাতিক রহস্য, তার ওপর পিসতুতো বোন আর মামাতো ভাই মিলে আমাকে যে হেঁয়ালিতে জড়িয়েছে তাতে আমার মাথাটা তখন রীতিমতো গুলোচ্ছে।

যেতে-যেতে বিনতার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে বুঝলাম, তার অবস্থাও তথৈবচ।

দশ

পরাশরের সঙ্গে চৌধুরীমশাইয়ের গ্রামে গেলাম।

গ্রামটা খুব খারাপ লাগল না। খুব ছোটখাটো নয়, প্রায় যাকে গণ্ডগ্রাম বলে তাই। গ্রামটা

প্রাচীনও বটে। কিন্তু প্রাচীন বলে নোংরা জরাজীর্ণ গোছের কিছু নয়।

রুক্ষ লালমাটির দেশ। এ-অঞ্চলে মাটির ঘর পাকা ইটের কোঠার মতো শক্ত মজবুত হয়, শুধু যদি মাটিতে জল না লাগে। পুরু মাটির দেওয়াল দেওয়া দোতলা মাঠকোঠাও দেখলাম অনেক। ওপরে ঘন করে খড়ের ছাউনি দেওয়া।

পাড়াগাঁর যা দস্তুর সেই ঘিঞ্জি বসতি এখানে নেই এমন নয়, সরু আঁকাবাঁকা গলি গোছের পথও আছে এখানে-সেখানে, কিন্তু সব জায়গাই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লাগল। পচা এঁদো পুকুর ডোবা তো একটাও দেখলাম না।

পরাশর যে মনোহারী দোকানে যাওয়ার জন্যে এসেছিল সেটি খুঁজে বার করতে চৌধুরী-কুঠির কাছ দিয়েই যেতে হল। চৌধুরীরা যে গাঁয়ের মাথা, তা সেই কুঠি দেখলেই বোঝা যায়। কুঠি না বলে ছোটখাটো প্রাসাদ বললেই হয়। চেহারাটা মোটের ওপর সেকেলে চকমেলানো বাড়ির ধরনের হলেও নতুন অদলবদলের চিহ্ন তার ওপর পড়েছে।

গ্রামের এইদিকটা অনেক বেশি ছিমছাম। এখানে অশথ, বট, শিরীষের ছায়াঢাকা বেশ চওড়া ও পরিচ্ছন্ন রাস্তা, চারদিকে বাঁধানো ঘাটের টলটলে জলের দীঘি, শান্ত পবিত্র ক'টি মন্দির মিলে এমন একটি মধুর শ্রী ও আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, বাইরে থেকে যা কল্পনাও করা যায়নি।

মনোহারী দোকানটাও যা অনুমান করেছিলাম তারচেয়ে অনেক বড় ও উঁচুদরের দেখলাম। মুদিখানা ও মনোহারী দোকান একসঙ্গে মেলানো। ভেতরে একবার চোখ বুলোতেই দোকানের সওদা যে খুব তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়, তা বোঝা গেল।

আমাদের নতুন মুখ দেখে দোকানি একটু বেশি উৎসাহের সঙ্গে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরই অনুরোধে দোকানের সামনে পাতা হেলান-দেওয়া বেঞ্চিটিতে বসলাম।

দোকানির বয়স তেমন বেশি নয়। জুলপির কাছে সামান্য একটু পাক ধরা ছাড়া মাথায় সব চুল কাঁচাই আছে। মুখেও ভাঁজ পড়েনি।

বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশি হবে না।

ভারিক্কি হাবভাবটা কিন্তু প্রায় ষাট-সত্তরের। ভারিক্কি মানে গোমড়া গোছের কিছু নয়, ভঙ্গিটি বেশ প্রসন্ন। কথা বলতে ভালোবাসেন। শুধু তাঁর যে একটা ওজন আছে কথাবার্তার ধরনে তা বুঝিয়ে দেন।

আমাদের বসতে বলে নিজে থেকেই তিনি বললেন—আপনারাই তো জাঙালবাড়িতে এসে উঠেছেন, না?

এ-কথায় অবাক খুব হলাম না। জাঙালবাড়ির গল্প যে পাশের গাঁ পর্যন্ত এসে পৌঁছোবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু কীভাবে কতটুকু পৌঁছেছে সেইটেই জানবার।

পরাশর মাথা নেড়ে দোকানি মশাইয়ের অনুমান সমর্থন করবার পর তিনি যা বললেন তাতে যা বুঝলাম, তা কিন্তু একটু অবাক করবারই মতো।

জাঙালবাড়ির রহস্যটার ভয়াবহ দিকটা এখানকার একেবারেই অগোচর। যেটুকু এখানে প্রচারিত, তা শুধু একটু নির্দোষ কৌতূহলের বেশি জাগাবার মতো নয়।

তা না হলে আমরা জাঙালবাড়িতে উঠেছি বলে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর দোকানি শুধু, 'সিংহরায়মশাই ফিরেছেন?' এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করে ক্ষান্ত হতেন না।

না, আজ সকালেও তো ফেরেননি।—বলে পরাশর যেভাবে একটু হাসল, তার সোজা অর্থ এই যে, ব্যাপারটা সামান্য একটু কৌতুক বোধ করবার মতো নিতান্ত তুচ্ছ।

গ্রামে সেইভাবেই যে ঘটনাকে বোঝা হয়েছে, একটিমাত্র যে খদ্দের দোকান থেকে একটা

বার সোপ কিনতে এসে দাম চুকিয়ে সওদা নিয়েও আমাদের দেখে একটু দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কথাতেও বোঝা গেল।

তিনি প্রথমটা আমাদের কৌতূহলভরে শুধু লক্ষ্য করছিলেন। পরাশরের কথায় সিংহরায়মশাই আজ সকালেও ফেরেননি জেনে নিজে থেকে একটু হেসে বলে গেলেন—কিছু ভাববেন না, শনি গেছে, রবি গেছে, আজ সোমবার। বুড়ো আজই বিকেলের মধ্যে যদি না ফেরে তো কাল সকালে ফিরবে নির্ঘাৎ। বুড়োর স্বভাব আমার ভালো করে জানা। ঝগড়ার ছুতো করে ও নিজের মতলবটি হাসিল করে আসছে। তবে মেয়ে দুটিকে এভাবে বিপদে ফেলে যাওয়া খুব অন্যায় হয়েছে, একশোবার বলব।

ভদ্রলোক আশ্বাস দিতে গিয়ে এতখানি হতভম্ব করে দেবেন ভাবতে পারিনি। পরাশরের অবস্থা আমারই মতো।

দ্বিধা-সংকোচ না করে সে কিন্তু খোলাখুলি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলে—ভদ্রলোক যে মাথাটা গুলিয়ে দিয়ে গেলেন মশাই। শনি, রবি সোম, ঝগড়ার ছুতোয় মতলব হাসিল, কীসব বললেন কিছুই তো বুঝতে পারলাম না। অথচ ওঁর কথায় মনে হল বোঝা আমাদের উচিত ছিল।

না, আপনারা নতুন লোক, আপনারা কেমন করে বুঝবেন! দোকানি আমাদের প্রতি সহানুভূতির হাসিই হাসলেন—সিংহরায়মশাইয়ের মজার রোগটুকুর কথা যারা জানে, তারা ছাড়া কেউ বুঝবে না। সে-রোগের খবর এ-গাঁয়েরই বা ক'জন জানে!

মজার রোগটা কী?—বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন না করে পারলাম না।

মজার রোগ হল ওঁর এই এত বয়সেও থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশা। জাঙালবাড়িতে ওঁর ভাইঝিরা আসবার আগে তো শনি-রবিবার সদরে গিয়ে কাটানো ওঁর বাঁধা ছিল।

বলেন কী!—পরাশরের কাছে ব্যাপারটা যে বেশ অবিশ্বাস্য তার গলার স্বরে লুকনো রইল না—কিন্তু থিয়েটার-বায়স্কোপ দেখতেই যে শনি, রবি সদরে কাটাতেন তা জানলেন কী করে?

জানলাম—দোকানি হেসে বললেন—হাতে-হাতে ধরে ফেলে। কাছারির কাজে মাঝে-মাঝে সদরে যেতে হয় তো! এইমাত্র যিনি গেলেন সেই পাঠকমশাইয়ের সঙ্গে সেবার ট্রেনে যেতে সিংহরায়ের সঙ্গে দেখা। তিনিও কাছারির কাজে যাচ্ছেন শুনলাম। কাছারির কাজ সেরে ফিরতি ট্রেন একসঙ্গেই ধরব জানি। কিন্তু সিংহরায়মশাইয়ের আর দেখা নেই।

কোথায় গেলেন বুঝতে না পেরে পাঠকমশাইকে নিয়ে আমি ওখানকার খাসবাজারে ক'টা সওদা করে স্টেশনের দিকে যাবে হঠাৎ দেখি বাজারের মাঝখানকার বড় সিনেমা হলটার সামনে দাঁড়িয়ে সিংহরায়মশাই বিড়ি টানতে-টানতে একটা দেওয়াল-ছবি তন্ময় হয়ে দেখছেন। কাছে গিয়ে ডাকতে চমকে উঠে প্রথমে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, তারপর একটু কাঁচুমাচু হয়ে স্বীকার করলেন যে, আসলে সিনেমার ছবি দেখতেই তাঁর সদরে আসা। শুধু সিনেমার ছবি নয়, থিয়েটারেরও শখ আছে। শনিবারের পর রবিবার একটা কলকাতার পার্টি কী থিয়েটার করতে আসছে, সেটাও দেখে তবে ফিরবেন। পরে জেনেছি ফি শনি-রবি তখন এই ছিল তাঁর রুটিন।

ফি শনি-রবিবারই যেতেন!—পরাশর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হত বুঝি?

না, আমার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হবে কেন?— দোকানি পরাশরের ভুল অনুমান শোধরালেন, আমার তো আর হপ্তায়-হপ্তায় সদরে যেতে হয় না। কিন্তু সিংহরায়মশাই যে যান, বেস্পতি কি শুক্রবারে ওঁর বাড়তি ক'বাণ্ডিল বিড়ি কেনা থেকেই বুঝতে বাকি থাকত না।

বিড়ি কেনা থেকে!—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—বিড়ি কেনা থেকে সদরে যাওয়া বুঝতেন!

হ্যাঁ, বলে হেসে দোকানি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন।

আমাদের দশানির এক স্পেশ্যাল বাঁধা বিড়ি, শুধু আমার দোকানেই থাকে। এখানে আসার পর সে বিড়ির স্বাদ পেয়ে সিংহরায়মশাইয়ের আর কোনও বিড়ি মুখে রোচে না। দু-দিন বাইরে গিয়ে থাকবার জন্যে তাই তিনি বেশি করে কয়েক বান্ডিল বিড়ি কিনে নিয়ে যেতেন। একদিন না দু-দিন সদরে থাকবেন তাও ওই বান্ডিল কমবেশি দেখে বুঝতে পারতাম।

এবারে বেশ ক'বান্ডিল নিয়ে গেছেন তা হলে?—পরাশর নিতান্ত সরলভাবে প্রশ্ন করলে।

দোকানি কিন্তু একটু চিন্তিতভাবেই মাথা নাড়লে—না, বিড়ি কিনতেই আসেননি। সেইটেই আশ্চর্য। সিংহরায়মশাইয়ের অন্তর্ধান হওয়ার খবর শুনে আমি আর পাঠকমশাই ধরে নিয়েছি যে, উনি নির্ঘাত সদরে সরে পড়েছেন। ভাইঝিরা আসবার পর অনেকদিন ও-পাট হয়নি বলে বোধহয় ছটফট করছিলেন ভেতরে-ভেতরে, ঝগড়ার ছুতো একটা পেয়েই পালিয়েছেন। কিন্তু ওই বিড়ি না কিনে খাওয়ার জন্যেই পাঠকের না হোক আমার একটু কেমন খটখা লাগে।

আপনার এ স্পেশ্যাল বিড়ি তাহলে খুব বিক্রি!—পরাশর হঠাৎ আসল প্রসঙ্গ থেকে কেন সরে গেল বুঝতে পারলাম না।

হ্যাঁ, তা খুবই ভালো বিক্রি বলতে হয়।—দোকানি গর্বভরেই জানালেন।

দুটি ফ্রক পরা ছোট মেয়ে দোকানে গুঁড়ো চায়ের প্যাকেট আর চিনি কিনতে এসেছিল। তাদের সওদা দিয়ে বিদায় করে দোকানি আবার বললেন—শুধু এ-অঞ্চলেই নয়, বাইরে থেকেও এখন এ-বিড়ির অর্ডার আসতে শুরু করেছে, বুঝেছেন। দেখবেন একটা পরীক্ষা করে, দোকানি দুটি বিড়ি আমাদের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

নেহাত ও-রসে বঞ্চিত!—পরাশর হাতজোড় করে প্রত্যাখ্যান করে বললে—না হলে আপনার স্পেশ্যাল বিড়ি নিশ্চয়ই একবার পরীক্ষা করে দেখতাম। আচ্ছা, আর আপনার সময় নষ্ট করব না, এবার আমাদের সওদাটা দিয়ে বিদেয় করুন।

না, না, সময় নষ্ট কী!—দোকানি আন্তরিক প্রতিবাদই জানালেন মনে হল—আপনাদের মতো লোক পেলে তবু তো দুটো কথা বলে বাঁচি। হ্যাঁ, বলুন কী চাই?

পরাশর যা চাইল তা শুনে সত্যিই প্রায় বেঞ্চি থেকে পড়ে যাবার অবস্থা। এরকম একটা অদ্ভুত আজগুবি ফরমাস আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

ভালো তরল আলতা ক'শিশি চাই।—বললে পরাশর।

তরল আলতা!

তাও এক নয়, ক'শিশি!! আমার চোখ তো তখন কপালে উঠেছেই দোকানিও বেশ একটু হতভম্ব মনে হল। তবু দোকান করতে হলে খদ্দেরদের অনেক খেয়ালই মুখবুজে সইতে হয় বোধহয়। দোকানি তাই দু-বার মাত্র ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলেন—ক'শিশি বলুন?

এই গোটাদশেক হলেই চলবে।—বলতে পরাশরের মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

না, অত তো হবে না!—দোকানি বিমূঢ় হলেও দুঃখের সঙ্গে জানালেন—নতুন চালান এখনও আসেনি। আগে যা এসেছিল ফুরিয়ে এসেছে। তবু দেখছি।

এবার দোকানদার দোকানের মনিহারি দিকটায় উঠে গিয়ে একটা তাকের পেছনে খানিক হাতড়ে একটিমাত্র শিশি বার করে এনে একটু যেন লজ্জিতভাবে বললেন—এই একটিই আছে।

মোটে একটি!

দোকানি যদি দুঃখিত লজ্জিত হয়ে থাকেন পরাশর একেবারে হতাশ। হতাশাটা বেশ জোর

করে যেন কাটিয়ে সে একটু ক্ষুণ্ণস্বরে আবার বললে—একদফা চালানে আলতা তা হলে আপনার খুব কমই আসে। অবশ্য পাড়াগাঁয়ের ছোট দোকান, দু-চারটের বেশি আনবেনই বা কোন ভরসায়।

দু-চারটে আনাই!—দোকানি যেন আঁতে ঘা খেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সামনের দিকে এসে ক্যাশবাক্সের পাশে রাখা একটা খেরো খাতা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন—এই দেখুন, ঠিক দু-মাস আগে এক দফায় তিন ডজন আলতা এসেছে।

দোকানি খেরো খাতাটা পরাশরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন।

সেটা নেওয়ার কোনওরকম উৎসাহ না দেখিয়ে পরাশর যেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে বললে—তিন ডজন আলতা! আর এই দু-মাসেই তা শেষ হয়ে একটিতে ঠেকেছে! আপনাদের গ্রাম তো প্রায় শহর-ই বলতে হয় মশাই।

না, অতটা নয়। এক-আধবার একটু বেশি বিক্রি হয়, যেমন এবারে!—দোকানি ন্যায্যের বেশি বাহাদুরি নিতে রাজি হলেন না।

কিন্তু এত আলতা কেনে কে মশাই? —পরাশর আবার সন্দিগ্ধ কৌতূহল দেখালে, এ সরেস আলতার তো দাম বেশ বেশি!

সরেস ছাড়া আমার দোকানে কিছু রাখি না।— দোকানি গম্ভীর হয়ে গর্বটুকু প্রকাশ করে খেরো খাতার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বললেন—কে কেনে জিগ্যেস করছেন? এই, এই দেখুন...।

একটা পাতা খুলে তার ওপর আঙুল দিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে দোকানি আবার বললেন—এই তো দক্ষিণ পাড়াতেই ক'ঘরে একটা-একটা করে গেছে দশটা। বাঁধখোলাতেও গেছে গোটা আষ্টেক আর চৌধুরীবাড়িতেই পাঁচটা। তা ছাড়া খুচরো নগদ বিক্রি আছে।

এবার দোকানির হাত থেকে খাতাটা নিতে পরাশরের আপত্তি দেখা গেল না। পাতাটার ওপর চোখ বুলিয়ে সে অবশ্য একটু কুণ্ঠিতভাবেই বললে—বাইরের মানুষ! এদিকের কিছু তো জানি না। এ গাঁয়ে পয়সাওয়ালা ভদ্রলোক তা হলে অনেক আছেন!

তা আছেন।—খেরো খাতাটা ফিরিয়ে নিয়ে পরাশরের কথায় ঈষৎ প্রতিবাদ জানালেন দোকানি—তবে শুধু ভদ্রলোকেরাই নয় মশাই, আজকাল চাষী-কলু-কামারদেরও তো পয়সা হয়েছে, সেইসঙ্গে শখও। তারাও গাদা-গাদা শৌখিন জিনিস কিনে নিয়ে যায়।

এ-প্রসঙ্গ আর যেন চালানো যায় না বলেই পরাশর এবার উঠে পড়ে বললে—তা হলে আর কী করা যাবে! একটামাত্রই যখন আছে তখন ওইটেই দিন, নিয়ে যাই।

দোকানি আলতার শিশিটা দিয়ে পরাশরের দেওয়া নোটটার ভাঙানি দেবার সময় পরাশর আবার হঠাৎ যেন ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বললে—আপনাদের গাঁ-দেশের দোকানের দস্তুর দেখলাম ভালো। খাতায় লেখা মানেই তো ধার, আর বেশিরভাগই তাই। এমনকী চৌধুরীবাড়িরও।

হ্যাঁ, এখানে ধারের কারবার তো করতেই হয়।—দোকানির মুখটা এবার খুব প্রসন্ন মনে হল না।

আদায় হয় তো সব? —পরাশরের একটু বেশি আসকারা নেওয়া প্রশ্ন।

দোকানি দোষ ধরে অসন্তুষ্ট হতে পারতেন, কিন্তু তাঁরও গোপন কিঞ্চিৎ ক্ষোভ মনের মধ্যে আছে মনে হল। একটু ক্ষুব্ধ গলাতেই বললেন—সব কি আর হয়? তবে আশা করে থাকা ছাড়া উপায় কী?

হঠাৎ এ প্রসঙ্গ একেবারে বদলে দিয়ে পরাশর বললে—আপনাদের গ্রামটি কিন্তু চমৎকার লাগল মশাই। এমন গ্রাম আজকাল চোখেই পড়ে না। দেখে মনে হল, আপনাদের রাজাবাবু মানে দেবপ্রতাপ চৌধুরীই সবকিছুর পেছনে আছেন।

হ্যাঁ, তা আছেন। তিনি ছাড়া থাকবেনই বা কে!—দোকানির গলায় উৎসাহ উচ্ছ্বাসের বদলে

কেমন একটু সমালোচনার সুরই যেন আছে সন্দেহ হল—এবার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান-টেয়ারম্যান হবেন বোধহয়, আর রায়সাহেব-টাহেব। কিন্তু গাঁয়ের পেছনে টাকা ঢালতে যদি চৌধুরীবাড়ি নিলেমে ওঠে সেটা কি লজ্জার কথা হবে না?

সেরকম কিছুর ভয় আছে না কি?—পরাশর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললে—দেখে তো মনে হয় না।

দেখে আর কী মনে হবে! ওপরের খোসা দেখে ভেতর ফোঁপরা কি বোঝা যায় সবসময়ে? আচ্ছা নমস্কার।

হঠাৎ যেন যতখানি উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি বলে ফেলেছেন হুঁশ হওয়ায় দোকানি একটু যেন অভদ্রভাবেই নমস্কার করে আলাপটায় ছেদ টানলেন।

এগারো

দোকান থেকে বেরিয়ে খানিক দূর নীরবেই পাশাপাশি হাঁটলাম। দোকানের রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে চৌধুরীবাড়ি ছাড়িয়ে জাঙালবাড়ির পথ ধরবার পর কৌতূহল আর বিরক্তি দুটোর কিছুই আর চাপতে পারলাম না।

প্রায় রুক্ষস্বরে বললাম—তুমি গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলা শুরু করেছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু তার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

কেন? কেন? পরাশর অবাক ও দুঃখিত হবার ভান করলেও কৌতুকের সুরটা তার ভেতর দিয়ে বেশ একটু ফুটে উঠল যেন।

তাইতে আরও জ্বলে উঠে বললাম—কেন তুমি জানো না! মনোহারী দোকানে গিয়ে ওই তরল আলতা কেনবার ভড়ং করে অতখানি সময় নষ্ট করবার কিছু দরকার ছিল?

বাঃ, একটা কিছু না কিনলে আলাপ জমানো যাবে কী করে!—পরাশর কৈফিয়ত দিলে।

তাইজন্যে তরল আলতা! আর একটা নয়, একেবারে এক ডজন! দোকানির কাছে আমাদের মাথাখারাপ প্রমাণ করার কিছু দরকার ছিল?

আরে তাই তো ছিল!—পরাশর আমাকে একেবারে থ' করে দিয়ে জবাব দিলে—মাথাখারাপ মনে করলে লোকে তবু বেশি সাবধান না হয়ে দু-চারটে গুহ্য কথা বলে ফেলে। আমাদের একটু ছিটেল না ভাবালে অত কথা ওর পেট থেকে বার করতে পারতাম?

নিজেদের পাগল-ছাগল সাজিয়েও কী এমন দামি কথা বার করতে পেরেছ শুনি!—ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম—যা জেনেছি তাতে আমাদের রহস্যের কোনদিকের কিনারা হবে? আমরা জেনেছি যে, পিসেমশাইয়ের বায়স্কোপ-থিয়েটারের নেশা আছে। সে-নেশার টানে তিনি আগে সদরে গিয়ে দু-একদিন কাটিয়ে আসতেন। আর জেনেছি, তিনি এখানকার এক স্পেশ্যাল বিড়ির দারুণ ভক্ত। বাইরে কোথাও গেলেও সে-বিড়ির বান্ডিল কিনে নিয়ে যান। এইসব জেনে পিসেমশাইয়ের নিখোঁজ হওয়াটার মানে বোঝা গেছে। তুমি কি মনে করো পিসেমশাই সদরে বায়স্কোপ-থিয়েটার দেখার লোভে পালিয়ে লুকিয়ে আছেন?

না, তা আর কী করে মনে করি?—পরাশর বাধ্য হয়ে স্বীকার করলে।

পিসেমশাইয়ের রহস্য তা হলে যেমন তেমনই রইল।—পরাশরের ওপর টেক্কা দিতে পেরে কতকটা বক্তৃতার সুরেই বললাম—আর যা জেনেছ, তার দামটা কী? জেনেছ, রাজাবাবু অর্থাৎ চৌধুরীমশাইয়ের ওপর দোকানি ভদ্রলোক হয় তেমন সন্তুষ্ট নন, নয় তাঁর অত্যন্ত হিতৈষী। এত

হিতৈষী যে গাঁয়ের ভালো করতে চৌধুরীমশাই নিজের ক্ষতি করেন, এ তিনি চান না। তাঁর কথা যদি বাড়ানো নাও হয় তবু তাতে চৌধুরীমশাইয়ের অবস্থা হয়তো যা মনে হয় তার চেয়ে খারাপ, এর বেশি আর কী জানা গেছে?

তখন না যাক, চৌধুরীমশাই সম্বন্ধে এখন আরও দামি কথা কিছু জানা যাবে মনে হচ্ছে।

আমার সব গুরুগম্ভীর বক্তব্য যেন তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিয়ে পরাশর সামনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে কী দেখালে!

দশানি গ্রাম ছাড়িয়ে তখন আমরা পাথুরে ডাঙার মেঠো রাস্তায় পড়েছি। কিছুদূর গিয়েই এ-রাস্তাটা স্টেশনের রাস্তার সঙ্গে মিলেছে।

পরাশরের নির্দেশ মতো সামনে দূরের দিকে যা দেখলাম, প্রথমটা তাতে কিছু বুঝতে পারলাম না।

স্টেশনের রাস্তার প্রায় কাছাকাছি জনচারেক ভারী কাঁধে ভারা নিয়ে আসছে। ভারায় বাঁধা বড় কেরাসিনের টিনগুলো যে খালি তা তাদের কাঁধে ভারা নেওয়া আর হাঁটার ধরনেই বোঝা যায়।

ভারী ক'জন আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছোবার আগেই অবশ্য ব্যাপারটা আমি আঁচ করে ফেলেছি। পরাশর তাদের যা জিজ্ঞাসা করলে তাতে আমার অনুমান সমর্থিত হল শুধু।

পরাশর এর মধ্যেই এখানকার কথার আঞ্চলিক টান একটু রপ্ত করে ফেলেছে। সেই টান দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—কী গো ভালোমানুষের পো-রা! জাঙালবাড়িতে জল দিয়ে ফিরছ, কেমন?

লোকগুলি একটু অবাক হলেও হেসে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু!

ওখানে দেখলে কাউকে?—জিজ্ঞাসা করলে পরাশর।

আজ্ঞে না বাবু! ভারীদের মধ্যে মুরুব্বি গোছের একজন বললে—দিদিমণিরা কেউ ছিলেন নাই। দরজায় তালা দেওয়া। খালি একজন মুনিশ ওই বাইরে ইঁদারা পাড়ে বসেছিল। বললে, ইঁদারার জলে ইঁদুর মরে পচে গেছে। তাই জল খারাপ।

ইঁদুর পচেছে বললে বুঝি?—পরাশর হেসে তারপর জিজ্ঞাসা করলে—তা জল ভালো করে রেখেছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ!—ভারীরা আশ্বস্ত করলে—ওই মুনিশই যেখানে রাখবার দেখিয়ে দিল।

বেশ, তা হলেই হল।—বলে পরাশর তাদের বিদায় দিলে।

ভারীরা চলে যাওয়ার পর আবার হাঁটতে-হাঁটতে এই জল পাঠানোর ব্যাপারে আশ্চর্য ও কৃতজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে জাঙালবাড়ির দুরবস্থার কথাও ভাবছিলাম। একজনও মুনিশ যে বাড়িতে উপস্থিত ছিল তাতেই আশ্চর্য হলাম অবশ্য। বুঝলাম, সে দামু ছাড়া আর কেউ নয়। এক-এক করে আর সকলের পরে পিসেমশাইয়ের একান্ত বিশ্বাসী দশরথও পাহারার কাজ ছেড়ে পালাবার পর পিসেমশাই কোথা থেকে এই দামুকে জোগাড় করে এনেছিলেন শুনেছি। দামুই একমাত্র এখনও টিকে আছে। অবশ্য রাত্রে সে জাঙালবাড়িতে থাকে না। বিকেলবেলাই ঘরে চলে যাওয়ার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এই দামুও আর ক'দিন থাকবে কে জানে! সে না থাকলে আজ এত কষ্টের পাঠানো জলও হয়তো বরবাদ হত ভেবে জাঙালবাড়ির রহস্যভেদ করতে ওখানে টিকে থাকতে পারা সম্বন্ধেই মনে-মনে একটু যে হতাশ বোধ করছিলাম সে-কথা লুকিয়ে লাভ নেই।

হঠাৎ পরাশর জিজ্ঞাসা করলে—কী বুঝলে এই জল পাঠানোর ব্যাপারে?

ভারীদের সঙ্গে কথাবার্তায় আর জাঙালবাড়ির দুর্দশার ভাবনায় পরাশরের কিছুক্ষণ আগের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। এখন একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললাম—এতে আর বোঝাবুঝির কী আছে?

কিছু নেই!—পরাশর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলে—কে জল পাঠিয়েছে তা নিশ্চয়ই বুঝেছ?

সেটা বোঝার জন্যে খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধির দরকার বটে!—এবার বিদ্রূপ না করে পারলাম না—দশানি থেকে ভারীরা জাঙালবাড়িতে জল বয়ে দিয়ে আসছে দেখলে হুকুমটা যে চৌধুরীমশাইয়ের সে-কথা ভাবা তো অসম্ভব!

এ-বিদ্রূপের খোঁচা যেন গ্রাহ্যই না করে পরাশর তেমনি গম্ভীর হয়ে বললে—কিন্তু এই জল পাঠানো মানে জাঙালবাড়িতে চৌধুরীমশাইয়ের চর থাকা, সেটা ভেবে দেখেছ?

চর থাকা!—সত্যিই বিমূঢ় হয়ে বললাম।

হ্যাঁ—পরাশর যেন অঙ্ক কষে বোঝালে—আমাদের ইঁদারার জলে রক্তের কথা আমরা গাঁয়ে এসে ঘুণাক্ষরে কাউকে জানাইনি। শর্মিরাও স্টেশনে গিয়ে তা বক্সীবাবুকে জানায়নি আশাকরি। আর জানালেও স্টেশন থেকে চৌধুরীবাড়িতে টেলিফোন যখন নেই তখন সে-খবর রানার ছুটিয়েও আধঘণ্টার আগে চৌধুরীমশাইয়ের কাছে পাঠানো সম্ভব নয়। চৌধুরীমশাই কিন্তু অনেক আগেই যে খবর পেয়েছেন, এখান থেকে ভারীদের জাঙালবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে জল দিয়ে এতখানি ফিরে আসা থেকেই তা বোঝা যায়। খবর তিনি একমাত্র গোবর্ধনের কাছেই পেতে পারেন। আর গাঁয়ে কোনও খবর যখন রটেনি, শুধু চৌধুরীমশাই একাই জেনেছেন, তখন গোবর্ধন চৌধুরীমশাইয়েরই চর।

মাথাটা সত্যিই গুলিয়ে গেছল। কতকটা নিজের মনেই বললাম, কিন্তু চর লাগাবার উদ্দেশ্যটা তাঁর কী?

পরাশরের উত্তরটা শোনবার আর সুযোগ হল না। পেছনে হর্নের আওয়াজে ফিরে তাকিয়ে দেখি চৌধুরীমশাই স্বয়ং তাঁর হুডখোলা মরিস গাড়িটা চালিয়ে আসছেন।

জাঙালবাড়ি পর্যন্ত আর হাঁটতে হল না। তাঁর গাড়িতেই গেলাম।

বারো

চৌধুরীমশাই আমাদের দেখেই গাড়ি থামিয়েছিলেন। সামনে তাঁর পাশে পরাশর বসল আর আমি পেছনের সিটে।

পেছনের সিটে একটু আড়ষ্ট হয়েই বসতে হল। কারণ শালপাতামোড়া দিয়ে বাঁধা একটা বড় ঝুড়ি সেখানে বেশিরভাগ জায়গা নিয়ে আছে।

এরকম সুযোগ পেয়ে পরাশর জল পাঠানোর কথাটা তুলতে দেরি করবে না ভেবেছিলাম, কিন্তু পরাশরের সেরকম কোনও লক্ষণই দেখলাম না।

সে যেন হঠাৎ এখানকার নিসর্গ দৃশ্যের প্রতি বেশিরকম আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত পরাশরের মুখ খোলার জন্যে অপেক্ষা করে নিজেই কথাটা তুলব বলে ঠিক করলাম। কিন্তু চৌধুরীমশাই লোকটি সত্যিই যেন মনের কথা টের পাওয়ার মতো তুকতাক কিছু জানেন।

আমি কিছু বলার আগেই নিজে থেকে বললেন—কী ভাগ্যি, সকালেই গোবর্ধনের সঙ্গে আমার এই রাস্তায় দেখা। নইলে ওঁদের আরও কতক্ষণ এ-দুঃখ সইতে হত কে জানে!

এবারও পরাশরই কিছু বলবে আশা করেছিলাম, কিন্তু সে যেন এ-জগতেই নেই। আমার তাই জিজ্ঞাসা করতে হল—গোবর্ধনের সঙ্গে আপনার আজ দেখা হয়েছে? এই রাস্তাতেই?

হ্যাঁ, চৌধুরীমশাই রাস্তার একটা খোদলকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাশ কাটিয়ে বললেন—আমরা

সকালে আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম যে, আপনাদের সুবিধে-অসুবিধে কী হল না-হল খোঁজখবর নিতে। সিংহরায়মশাই যখন নেই তখন এখানকার অতিথি হিসেবে আপনাদের একটু দেখাশোনা আমাদের কাউকেই করতে হয়।

সাতসকাল বেলায় আমাদের খোঁজখবর নিতে দশানি থেকে জাঙালবাড়ি যাওয়ার কাহিনীটা বেশ দুর্বলই মনে হল। সেইজন্যই বোধহয় ওই ভুয়ো কৈফিয়তটা দেবপ্রতাপ চৌধুরী অত বিস্তারিত-ভাবে দিয়ে তারপর আসল কথায় পৌঁছলেন।

তাঁর বিবরণ অনুসারে ব্যাপারটা হল এই যে, এই রাস্তাতেই মোটর নিয়ে যেতে-যেতে গোবর্ধনকে ভয়ে প্রায় দিশাহারা অবস্থায় ছুটে আসতে তিনি দেখেন। তাকে দাঁড় করিয়ে বেশ ধমক-টমক দিয়ে তারপর জাঙালবাড়ির ইঁদারায় রক্তের ব্যাপারটা তাঁকে জানতে হয়। সেটা জানবার পর জলই আমাদের আপাতত সবচেয়ে জীবন-মরণ সমস্যা বুঝে তিনি তৎক্ষণাৎ গোবর্ধনকে গাড়িতে তুলে নিজের বাড়িতে ফিরে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারী দিয়ে জল পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। আর গোবর্ধনকে শাসিয়ে বলে দেন, ঘুণাক্ষরে এসব কথা গাঁয়ের কাউকে কিছু না জানাতে।

বিবরণের শেষে চৌধুরীমশাই একটু আত্মপ্রসাদের সঙ্গে জানালেন, আমি আগে থাকতেই অবশ্য এদিক দিয়ে সাবধান হয়েছি। এখানকার দারোগাও আমার সঙ্গে একমত হয়ে আমায় সাহায্য করেছেন। সিংহরায়মশাই যেন ঝগড়াঝাটি করে বা অন্য কোনও তুচ্ছ কারণে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন, এর বেশি এখানকার কেউ কিছু জানে না। মহিন্দর তার ভয় পাওয়ার কথা গোড়ার দিকে একটু চাউর করেছিল, কিন্তু এখানকার লোকের কাছে সেটা কিছু নতুন নয়। জাঙালবাড়ি আর গড়মহল ভয়ের জায়গা এ তারা অনেককাল থেকে জানে। তা ছাড়া মহিন্দর নিজেই ক'মাস গাঁ ছাড়া। সুতরাং সেদিক দিয়ে আর কোনও ভাবনা নেই।

সত্য মিথ্যা যাই হোক, এ-বিবরণ শেষ করে চৌধুরীমশাই, যা ভয় করছিলাম, সেই প্রশ্নই তুলে বসলেন।

আচ্ছা, আপনারা তো গাঁয়ে আমার খোঁজেই এসেছিলেন নিশ্চয়। কিন্তু বাড়িতে দেখা না করে ফিরে যাচ্ছিলেন যে?—চৌধুরীমশাই একটু ভ্রূকুটিভরেই জিজ্ঞাসা করলেন।

জবাব দেওয়ার মতো কোনও মিথ্যে কৈফিয়তই চটপট বানাতে না পেরে তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত কাহিল।

পরাশরই এবার তার প্রকৃতি-ধ্যান থেকে হঠাৎ জেগে উঠে মুখরক্ষা করলে। বললে—পথে আপনার পাঠানো ভারীদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যে। এ-জল আপনি ছাড়া আর কেউ যে পাঠায়নি তা বুঝে আপনাকে আর বিরক্ত না করে গ্রামটাই একটু ঘুরে দেখে এলাম।

তা বেশ করেছেন! আর-একদিন কিন্তু আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেওয়া চাই।

চৌধুরীমশাই অতি সহজেই আমাদের কৈফিয়তটা মেনে নিয়ে ভদ্রতা করে যে নিমন্ত্রণ জানালেন পালটা সৌজন্য দেখিয়ে তা গ্রহণ করতে দেরি করলাম না। বললাম—নিশ্চয়ই! এখানে এলে আপনার বাড়ি না দেখে গেলে তো আমাদেরই লোকসান!

রাস্তায় এদিকের মার্কামারা শীর্ণ বালখিল্য গোছের একপাল গরুর ভেতর দিয়ে অনবরত হর্ন বাজিয়ে সন্তর্পণে মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে-যেতে চৌধুরীমশাই সৌজন্যের পাল্লা আর চালিয়ে যাবার সুযোগ পেলেন না বলে রক্ষে। নইলে আরও অনেকক্ষণ 'আপ উঠিয়ে'র পালা বোধহয় চলত।

সত্য কথাটাই ঈষৎ ঘুরিয়ে 'ইতিগজ' করে বলে দায়টা তখনকার মতো সামলাবার জন্যে আমি তখন পরাশরের কাছে কৃতজ্ঞ। চৌধুরীমশাই তাঁর ভারীদের জেরা করে কখন আমাদের সঙ্গে

দেখা হয়েছে আশাকরি জানতে চাইবেন না। তা করে সত্য কথাটা জানলে আমাদের সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন কে জানে!

জাঙালবাড়ি পৌঁছে দেখলাম শর্মিলা ও বিনতা আগেই ফিরে এসেছে। গাড়ির শব্দে তারা দুজনেই ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

যিনি এত কষ্ট করে তৃষ্ণার জল পাঠিয়ে নিজে আবার খোঁজ নিতে এসেছেন সেই হিতৈষী ভদ্রলোকের অভ্যর্থনাটা কিন্তু যথোচিত হল না।

আমার বসবার অসুবিধা করবার কারণ-স্বরূপ শালপাতা-ঢাকা ঝুড়িটার রহস্য এবার বোঝা গেল।

চৌধুরীমশাই গাড়ি থামিয়ে পেছনের দরজা খুলে নিজেই ঝুড়িটা বার করে শর্মিলার দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা তখন কৌতুক-মিশ্রিত কৌতূহলে ব্যাপারটা দেখছি।

চৌধুরীমশাই কাছে যেতে শর্মিলা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলে, এটা কী?

অত বড় জোয়ান বীরপুরুষের মতো চেহারার মানুষটা যেন চোরের মতো এতটুকু হয়ে গেল। অত্যন্ত অপরাধীর মতো চৌধুরীমশাই বললেন, এতে এই সামান্য কিছু খাবার-দাবার আছে।

শর্মিলার চোখের দৃষ্টি তাতেও নরম হতে না দেখে একটু থেমে কুণ্ঠিতভাবে কৈফিয়ত দিলেন আবার— ভোরবেলাই ইঁদারার ওই অবস্থা শুনে রান্নাবান্নার অসুবিধা হবে বুঝলাম কি না, তাই কিছু লুচি-তরকারি আর মিষ্টি এনেছি!

শর্মিলার মন কতক্ষণে গলত বলা যায় না, কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা না করে পরাশরই এবার বললে, তা বেশ করেছেন! খুব ভালো করেছেন। কাল রাত্তির থেকে এখনও পর্যন্ত পেটে কিছু না পড়ে খিদেয় নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়। যা উপকার করেছেন তাতে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার তাই ভাষা নেই।

শর্মিলা আর বিনতার দিকে ফিরে প্রায় হুকুমের স্বরেই পরাশর তারপর বললে—চলো, চলো, আর তর সইছে না। ভেতরে গিয়ে খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক আগে। আপনিও আসুন চৌধুরীমশাই!

আমি! না, না! —চৌধুরীমশাই সত্যিকার বিস্ময় ও আপত্তি জানালেন।

কিন্তু পরাশর শুনলে না।

বাঃ! আপনি না থাকলে হয়! —বলে একরকম জোর করেই চৌধুরীমশাইকে ধরে নিয়ে গেল।

চৌধুরীমশাই খাবার যা এনেছিলেন তা আমাদের তিনবেলা খেয়েও ফুরোবার নয়। বিপদের দিনে ভোজটা ভালোভাবেই হল। চৌধুরীমশাইকেই যেন মনে হল সবচেয়ে কৃতার্থ। সেটা শর্মিলার পাশে বসতে পাওয়ার জন্যে কি না বলা অবশ্য শক্ত।

কথায়-কথায় তাঁর সেই পুরনো আর্জিটাই তিনি আবার একবার জানালেন শর্মিলার কাছে —এত কষ্ট করার চেয়ে ইঁদারাটা পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অন্তত আমাদের ওখানে ক'দিন থাকবেন চলুন না।

আমাদের এ-বাড়ি ছাড়াবার এত যখন আগ্রহ—শর্মিলা কিন্তু কঠিন মুখেই জবাব দিলে, তখন অমন একটা ভুল করা আপনার উচিত হয়নি।

কী ভুল! চৌধুরীমশাই অবাক ও একটু সন্ত্রস্ত হয়ে শর্মিলার দিকে তাকালেন।

ভুল, ভারীদের দিয়ে অত কষ্ট করে এখানে জল পাঠানো।— শর্মিলা নীরস গলায় বললে— জল না পেলে আমরা নিজেরাই হয়তো ব্যস্ত হয়ে আপনার অনুগ্রহের জন্যে ছুটতাম।

সবার আগে জোর করে গলা ছেড়ে হেসে উঠে পরাশরই হাওয়াটা হালকা না করে দিলে কথাগুলো ঠাট্টা বলেই চালিয়ে দেওয়া একটু বোধহয় কঠিন হত।

চৌধুরীমশাই আমাদের সঙ্গে হেসেছেন শেষপর্যন্ত, কিন্তু তেমন প্রাণ খুলে বোধহয় নয়।

তেরো

চৌধুরীমশাই খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরেই বিদায় নিয়ে গেছেন। মনে যাই থাক, বাইরে বিশেষ কিছু ভাবান্তর তিনি বুঝতে দেননি। যাওয়ার আগে ইঁদারার জল তুলে পরিষ্কার করবার জন্যে পাম্পের ব্যবস্থা যে আগেই করে এসেছেন ও আগামীকাল থেকে সে-কাজ যে আরম্ভ হবে তাও জানিয়ে গেছেন।

চৌধুরীমশাই চলে যাওয়ার পর বিনতাকে এই প্রথম আর-এক মূর্তিতে দেখে আমি তো একেবারে অবাক। শর্মিলার ছায়া হিসেবেই যাকে ঘুরতে-ফিরতে দেখেছি তার চোখে সে কী তেজ আর মুখে সে কী বকুনির খইফোটা! বকুনি আবার অন্য কাউকে নয়, শর্মিলাকেই।

শর্মিলা অকারণে কেন চৌধুরীমশাইকে এত হেনস্থা শুধু নয়, অপমান পর্যন্ত করে এই নিয়েই বিনতার রাগ। ভদ্রলোক যদি তার দু-চক্ষের বিষ হন তা হলে মুখে অন্তত তাঁর সঙ্গে ভদ্রতা তো রাখা যায়। তাদের ইঁদারার জল নষ্ট হয়েছে জেনে ভদ্রলোক যেমন করে হোক জলের ব্যবস্থা করেছেন, আর তাদের খাওয়ার অসুবিধের কথা ভেবে নিজে সঙ্গে করে রাজভোগের যুগ্যি খাবার নিয়ে এসেছেন এই তো তাঁর অপরাধ! তার জন্যে তাঁকে অপমান করে আঁতে ঘা দিয়ে অমন কটু কথাগুলো না শোনালে হত না!

বিনতার বকুনি প্রথমটা শর্মিলা অন্যসময়ের মতো হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ঠাট্টা করে বলেছে, তুই একেবারে এত হাবুডুবু খাচ্ছিস তা কি জানি! তাহলে মুখে মধু মেখে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতাম।

কিন্তু বিনতার মেজাজ আজ অন্যরকম। এসব ঠাট্টায় তাকে থামানো যায়নি। শেষপর্যন্ত তার ভর্ৎসনার তোড় সহ্য করতে না পেরে শর্মিলাকেই পিটটান দিতে হয়েছে আমাদের কাছ থেকে।

শর্মিলা চলে যাওয়ার পরই কিন্তু বিনতার মুখের ভাব যেন ম্যাজিকে বদলে গিয়ে সেখানে হাসি ফুটে উঠেছে।

তার দিকে চেয়ে পরাশরও হেসে বলেছে—আমিও তাই ভেবেছিলাম। তবে খুব ভালো করেছ অমন করে কথাগুলো শুনিয়ে। শমির একটু নাড়া খাওয়া দরকার ছিল। তোমার কাছে খেয়েছে বলে একটু বেশি কাজ হবে।

ছাই হবে! —বিনতা হেসে বলেছে—আসলে ও নিজের মনটাকে চিনতে চাইছে না, তাই এত বেয়াড়া বদমেজাজ।

তার মানে আপনি কি বলতে চান—আমি বুঝে-সুঝে বোকা সেজে বিনতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগের জন্যে জিজ্ঞাসা করেছি—চৌধুরীমশাই সম্বন্ধে শর্মিলাদেবীর কিছু দুর্বলতা আছে ভেতরে-ভেতরে!

যা আছে তাকে 'কিছু দুর্বলতা' বলে না! —বিনতা হেসে ওঠবার উপক্রম করেছে।

কিন্তু—এবার আমার আগেই পরাশর তাকে থামিয়ে বলেছে—যেটা দুর্বলতা মনে করছ সেটা সন্দেহ আর তার জন্য বিরাগের প্রকাশও তো হতে পারে। শমি চৌধুরীমশাইকে সন্দেহ করে এটা তো ঠিক।

সে তো শখের সন্দেহ!—বিনতা হেসে বলেছে—কিংবা নিজের মনের আসল কথাটা চাপা দেওয়ার জন্যে মিথ্যে সন্দেহের ফিকির মাত্র। অবশ্য ওর মন নিজের অজান্তেই নিজেকে ঠকাচ্ছে।

হুঁ, মনস্তত্ত্বের এরকম জটিলতার দৃষ্টান্ত যথেষ্ট পাওয়া যায় বটে—পরাশর গম্ভীর হয়ে বলেছে—কিন্তু চৌধুরীমশাইকে সন্দেহ করার যথার্থ কারণ যে প্রচুর।

চৌধুরীমশাইকে সন্দেহের প্রচুর কারণ আছে!—বিনতার গলার স্বরেই বোঝা গেছে এ-কথাটা তার কাছে অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ, সত্যিই প্রচুর।—পরাশর যেন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছে।

কী সেগুলো, শুনি! —কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা।

বলছি, কিন্তু তার আগে তোমরা বক্সীবাবুর কাছে যে জন্যে গিয়েছিলে তার কী হল বলো। কী উত্তর পেলে তোমাদের প্রশ্নের? পরাশরের মুখে যেন একটু কৌতুকের আভাস দেখা গেছে।

কোনও উত্তরই পাইনি।—বলেছে এবার বিনতা।

তার মানে তিনি স্টেশনেই ছিলেন না—পরাশরের মুখের কৌতূহলটা আরও স্পষ্ট হয়েছে —তাঁর জায়গায় আর-একজনকে কাজ করতে দেখেছ! কেমন?

বিনতা মাথা নাড়তেই পরাশর ভারিক্কি চালে বলেছে—আমি তাই ভেবেছিলাম!

তাই ভেবেছিলে!—বিনতার কাছে পরাশরের এ-বাহাদুরিতে একটু ঘা না দিয়ে পারলাম না—কেন, কী করে ভেবেছিলে তোমায় আগে বলতে হবে। তোমার গোয়েন্দাগিরির ভড়ং একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ঠিক বলেছেন জলধরবাবু!—শর্মিলা কিছুক্ষণ আগেকার বকুনির জ্বালা ভুলে হাসিমুখে এসে বিনতার পাশেই বসেছে। খানিক আগে কখন সে বসবার ঘরে ফিরে এসেছে লক্ষ্য করিনি।

শর্মিলার সমর্থন পেয়ে এবার আরও জোর দিয়েই পরাশরকে আক্রমণ করেছি। বলেছি—সাহিত্যের নামকরা সব গোয়েন্দার মতো এই দু-দিনেই অনেকগুলি ধাঁধার প্যাঁচ তুমি ছেড়েছ। সব তোমার এখানে ব্যাখ্যা করতে হবে!

যেমন?—পরাশর তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।

কিন্তু তাতে না ভড়কে বলেছি—যেমন, আজ সকালবেলার ওই মাছ দুটো! সে দুটো কোথায় কেমন করে পেলে, আর সেই মাছই এখানকার রহস্যের একটা খেই বলে আমাদের ধোঁকা দিলে কেন জানতে চাই। তারপর...।

দাঁড়াও, দাঁড়াও! পরাশর মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বলেছে—একটা-একটা করে উত্তর শোনো। নইলে গুলিয়ে ফেলবে। প্রথম, মাছটা কোথায় পেয়েছি? পেয়েছি গড়মহলের উত্তর দিকের একটা ডোবাতে। নদীর বাঁওড় মজে গিয়ে ওখানে জলা-জংলা হয়েছে তোমরা জানো। সেই মজা জলা-জংলার মাঝে ছোটখাটো দু-একটা এমন ডোবা আছে। একটা আছে একেবারে গড়মহলের লাগাও। ভূতের ভয়ে গাঁয়ের লোক পারতপক্ষে এদিক মাড়ায় না। দু-একজন ভরসা করে দিনেরবেলা শাল-শোল ধরবার জন্যে ন্যাটা-খলসে বঁড়শিতে গেঁথে তার সুতো পাড়ের পোঁতা বাঁশটাশে বেঁধে দিয়ে যায়। এ-মাছ ধরবার জন্যে ছিপ ফেলে বসে থাকতে হয় না। মাছ গাঁথলে তার পরের দিন দিনের বেলায় কোনওসময়ে এসে নিয়ে গেলেই হল।

তোমার কাছে মৎস্যশিকার বিদ্যা শিখতে চাইনি—ব্যঙ্গ করে বলেছি—ওখানে এরকম মাছ পাওয়া যায় তুমি জানলে কী করে বলো?

জানলাম মহিন্দরের কীর্তি থেকে!—আমাদের হতভম্ব ভাবটা উপভোগ করে পরাশর তারপর বলেছে—মহিন্দর কোথায় ভির্মি গিয়েছে তা শুনেছ! কিন্তু মহিন্দর এত জায়গা থাকতে গড়মহলের ওই জায়গায় দাঁতকপাটি লাগতে গেল কেন সেটা কি ভেবে দেখেছ কেউ? ওখানে না গেলে তাকে তো আর গড়মহলের ভূত দেখতে হয় না। মহিন্দরের প্রত্নতত্ত্বে উৎসাহ নেই বক্সীবাবু কি

চৌধুরী-শাইয়ের মতো। সুতরাং তার মতো গাঁইয়া সাধারণ মানুষের ওদিকে যাওয়ার খুব সাধারণ একটা কারণ থাকা উচিত। সেই কারণটা কিছুটা অনুমান করে তা খুঁজতেই আজ ভোরে ওদিকে গিয়ে ওই ডোবা ও বঁড়শিতে গাঁথা শোল দুটোকে দেখতে পাই। মহিন্দর এদিকে ডোবাগুলোর কথা জানে। এখানে কাজ নিয়ে এসে সে রথদেখার সঙ্গে কলাবেচার মতো মাছ ধরাটাও উপরি লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সন্ধেবেলা এমনিতেই ভয়ে-ভয়ে ওদিকে যাওয়ার পর বক্সীবাবুকে গড়মহলের অন্ধকার থেকে বেরুতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। বক্সীবাবুর নাড়া খেয়ে হুঁশ হওয়ার পর আর তার সাহস হয়নি মাছ দুটো খুলে নিয়ে যেতে। এই মাছ দুটোয় সুতরাং মহিন্দরের ভির্মি যাওয়ার রহস্য যেমন বোঝা যাচ্ছে তেমনি বক্সীবাবু সেদিনের বিবরণ যা দিয়েছেন তাও সত্যি বলে জানা যাচ্ছে। সব রহস্যের একটা স্পষ্ট খেই ওখানে তাহলে পাচ্ছি।

তুমি পাচ্ছ, কিন্তু আমি তো সত্যি পাচ্ছি না। তবু সে-কথা এখন থাক।—বলে পরাশরকে আবার প্রশ্ন করেছি—সকালে ইঁদারার জলে রক্ত দেখে, এরকম একটা কিছু হয়ে লোকজন এখান থেকে পালাবে তার আভাস নয় একেবারে প্রমাণ আগেই পেয়েছ বলে বাহাদুরি করেছিলে কেন? কী প্রমাণ পেয়েছিলে?

প্রমাণ? পরাশর এবার হেসেছে—রক্ত থেকে যার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই পেয়েছিলাম অর্থাৎ প্রমাণ পেয়েছিলাম খুনের।

চোদ্দো

আমরা উত্তেজিতভাবে কিছু বলার আগেই পরাশর আবার বলেছে—খুন অবশ্য মানুষকে নয়, একটা হাঁসকে। কিন্তু শয়তানি মতলবে হত্যা করলে একটা হাঁস মারাও খুন। যে-ডোবায় মাছ দুটো পেয়েছিলাম তারই পাশে সব আগাছার জঙ্গলে পালকগুলো পড়েছিল। পালকগুলো দেখেই বুঝেছিলাম সেগুলো খুব বেশি আগে মারা হাঁসের নয়। তা ছাড়া ওই হাঁসের আর্তনাদেই রাত্রে আমি জেগে উঠে বাইরে বেরোই।

হাঁসের আর্তনাদ শুনে বেরোও? কখন?—শর্মিলা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করেছে।

তখন রাত প্রায় চারটে।—বলেছে পরাশর, ঘুম আমার অবশ্য আগেই ভেঙেছিল। আসলে প্রথম রাতটা আমি তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম শেষরাতটা জাগব বলেই। আমরা আসার দরুন একটা নতুন শয়তানি কিছু হবে আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। শেষরাতের দিকে তা হওয়া সম্ভব বলে সজাগও ছিলাম। হাঁসের আওয়াজটা শুনে প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারিনি। ডাকটা পাখির তা বুঝেছিলাম, কিন্তু এ-অঞ্চলের সব পাখি তো আমার জানা নেই। আমার অজানা কোনও পাখির ডাক হতে পারে ভেবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকেছিলাম। বার দুয়েকের পর আর সেরকম ডাক না শুনে অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় একটা থামের আড়ালে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলাম। সত্যি কথা স্বীকার করছি, ইঁদারার দিকটায় আমার নজর ছিল না। শয়তানি হিসেবে শর্মিলা ও বিনতাকে ভয় দেখাবার জন্যে তাদের ঘরের কাছেই কিছু হবে ভেবে নিয়ে সেইদিকেই আমি নজর রেখেছিলাম। সেইখানেই আমার ভুল হয়েছিল। আমি যতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেছি, তার মধ্যেই হয়তো ইঁদারায় রক্ত ঢালার কাজ সারা হয়ে গেছে। আকাশে একটু আলো ফুটতে দেখে আর পাহারার কোনও দরকার নেই বুঝে মহিন্দরের রহস্যটার সমাধান করতে আমি গড়মহলের উত্তরে গেছি। সেখান থেকে ফেরবার মুখেই তো তোমাদের সঙ্গে দেখা।

পরাশরের দীর্ঘ ব্যাখ্যাগুলোকে কিছুটা মানতে বাধ্য হলেও শেষ প্রশ্নটা একটু কড়া গলাতেই করেছি—শর্মিলা আর বিনতাদেবী স্টেশনে গিয়ে বক্সীবাবুকে পাবেন না—তার বদলে আর-একজনকে সেখানে কাজ করতে দেখবেন, এ নির্ভুল গণনা তুমি আগে থাকতে করলে কেমন করে? তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে বলে তো জানি না।

দিব্যদৃষ্টি নয়, শুধু একটু সজাগ কান—পরাশর আমাকে বেশ অপ্রস্তুত করে বলেছে—তা থাকলে, এ নির্ভুল গণনা তুমিও করতে পারতে।

তোমার সজাগ কানটা কখন কোথায় এই বেতার-সংবাদটা ধরল, একটু বলবে?—একটু নরম হয়েই বলেছি।

যখন ধরল তখন তুমিও পাশেই ছিলে—হেসে বলেছে পরাশর, মোটরে আমাদের তুলে এখানে আসবার সময় চৌধুরীমশাই কী বলেছিলেন একটু মনে করে দেখো, বলেছিলেন—আমরা সকালে জাঙালবাড়িই যাচ্ছিলাম। এ 'আমরা' বলতে কাদের বোঝাতে পারে? চৌধুরীমশাই ওই সাতসকালে তাঁর ভাইছিদের নিয়ে নিশ্চয় এখানে আসছিলেন না, অন্য যাকে-তাকে সঙ্গে নিয়েও জাঙালবাড়িতে আসবার লোক তিনি নন। সুতরাং 'আমরা' বলে উল্লেখ থেকে তাঁর সঙ্গে বক্সীবাবুই ছিলেন নিশ্চিত ধরা যেতে পারে। কিন্তু ডাউনের একটা প্যাসেঞ্জার ওই সকালেই আসে। সে-সময়ে স্টেশনমাস্টার হিসেবে বক্সীবাবু স্টেশনে থাকতে বাধ্য। তা না থাকলে তাঁর জায়গায় আর কেউ নিশ্চয় কাজ করছে বুঝতে হবে।

পরাশরের যুক্তিগুলো অস্বীকার করতে না পারলেও প্রশ্ন তুলেছি, কিন্তু বক্সীবাবু হঠাৎ কাজের সময় স্টেশন ছেড়ে যাবেন কেন? তাঁর জায়গায় কাজ করবার অন্য লোক তিনি পেলেনই বা কী করে?

পেলেন কাজ থেকে ছুটি নেবার দরুন কিংবা চাকরি যাওয়ার জন্যেও হতে পারে।—বলে পরাশর আমাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়েছে প্রতিক্রিয়াটা দেখবার জন্যেই বোধহয়।

কিন্তু চাকরি গেলে বক্সীবাবু করবেন কী!—শর্মিলা সহানুভূতির সঙ্গে বলেছে—এ-জায়গা ছাড়তে হলে উনি তো বাঁচবেন না!

স্টেশন ছাড়লেও এ-জায়গা থেকে যাওয়ার দরকার নাও হতে পারে। পরাশর আশ্বাস দিয়েছে—হয়তো চৌধুরীমশাইয়েরই অতিথি হয়ে থাকবেন।

কিন্তু আপনি যে-কালির ছোপে ওঁকে আঁকছিলেন তাতে চৌধুরীমশাইয়ের ওরকম উদার হওয়ার তো কথা নয়।—বলেছে বিনতা।

না, কালির ছোপে আঁকিনি—পরাশর প্রতিবাদ করেছে—আমি শুধু বলছিলাম যে, চৌধুরীমশাইকে এখানকার রহস্যের ব্যাপারে সন্দেহ করবার কারণ প্রচুর।

কী সেগুলো শুনি।—বিনতার আগে শর্মিলাই তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছে এবার।

সেগুলো শুনবে!—পরাশর একটু দ্বিধা করে বলেছে—তোমাকেই শোনাতে চাইছিলাম না। তবু যখন এসে পড়েছ শোনো। প্রথম, এই জাঙালবাড়ি আর গড়মহলের প্রতি চৌধুরীমশাইয়ের লোভের কথা অনেক আগেই জানা গেছে যখন পিসেমশাইয়ের কাছে ঠাট্টার ছলে এ-জায়গা তিনি কিনতে চান। এ-জায়গার প্রতি লোভ শুধু ওঁর নয়, চৌধুরীদেরই বংশগত। ওই মজা বাঁওড়ের দখল নিয়ে চৌধুরীর পূর্বপুরুষরাই সিংহরায়দের সঙ্গে লড়েছেন। দ্বিতীয়, এখানে যারা কাজ করতে এসেছে ও পরে বেয়াড়াপনা করেছে কি বাদ সেধেছে, তারা প্রায় সবাই চৌধুরীমশাইয়েরই প্রজা। তারা তাঁর চর হিসেবে এখানকার খবর তাঁকে দেয় এ-রকম সন্দেহ করবারও কারণ হয়েছে। তৃতীয়, এখানকার পাট তুলে দিয়ে যাতে তোমরা চলে যাও তারজন্যে তাঁর আগ্রহ তিনি স্পষ্টই জানিয়ে ফেলেছেন, এমনকী এখানকার চেয়ে ভালো জায়গা দেওয়ার

লোভও তোমাদের দেখিয়েছেন। চতুর্থ, গ্রামের প্রতি সত্যিকার টানে কিংবা নাম কেনবার জন্যে, যে কারণেই হোক, এখানকার উন্নতির জন্যে প্রচুর খরচ করে তিনি প্রায় দেউলে হতে বসেছেন এরকম ধারণাও অনেকের আছে।...

যা বলছ সেসবের সঙ্গে এখানকার রহস্যের সম্পর্ক কী?—শর্মিলা পরাশরকে বাধা দিয়ে থামিয়ে একটু উষ্ণস্বরেই জিজ্ঞাসা করেছে—উনিই মুখে সহানুভূতি দেখানো আর ওপরে-ওপরে সাহায্য করবার ভান করে তলে-তলে আমাদের তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাবার সব ষড়যন্ত্র করছেন বলতে চাও? উনি তা করতে যাবেন কেন?

উনিই করছেন, এমন কথা বলছি না।—পরাশর যেন সুর একটু নামাতে চেয়েছে—তবে করবার কারণ ওঁর আছে বইকী! বক্সীবাবুর কাছ থেকে প্রত্নতত্ত্বের নেশা ধরার সঙ্গে ওঁর মনে এখানকার গুপ্তধন উদ্ধারের লোভ হওয়া খুব আশ্চর্য কিছু নয়। সেরকম গুপ্তধন পেলে ওঁর সব আর্থিক সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু সে-গুপ্তধন পাওয়াও চাই গোপনে। আর কেউ তাতে দাবি-দাওয়া যাতে না করতে পারে। একা সিংহরায়মশাই থাকলে তেমন কোনও ভাবনা ছিল না কিন্তু তোমরা এখানে গ্রামলক্ষ্মী সমবায় ছড়িয়ে বসলে ওঁর দারুণ অসুবিধে। তাই তোমাদের তাড়াবার আগ্রহ ওঁর তো হতেই পারে।

শুধু ওঁরই হতে পারে!—শর্মিলার গলায় বেশ রাগের ঝঙ্কার শোনা গেছে—বক্সীবাবুর হতে পারে না কেন?

তাও পারে হয়তো।—পরাশর স্বীকার করেছে।

হয়তো নয়, খুব বেশিরকম হতে পারে। বোঝাতে ব্যস্ত হয়েছে শর্মিলা—প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সত্যিকার দারুণ আগ্রহ তাঁরই। তিনি এ-বিষয়ে পাগল বললেই হয়। ঘর-সংসার, চাকরির উন্নতি সবকিছু তিনি বিসর্জন দিয়েছেন এর জন্যে। তাঁর কিন্তু সব আশায় হয়তো ছাই পড়বার উপক্রম হয়েছে। তুমি যা বলছ তাতে হয় তিনি বদলি হয়েছেন বা তাঁর চাকরি গেছে মনে হচ্ছে। এ-খবর নিশ্চয়ই বেশ কিছুদিন আগে থাকতেই তিনি জেনেছেন। তাই যেমন করে হোক, এখানকার গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে তিনি পাগল হয়ে উঠেছেন। মহিন্দর তাঁকে দেখে যেদিন ভয় পায় সেদিন ওই সন্ধ্যার অন্ধকারেও গড়মহলে ঘোরাফেরা করতে তাঁর বাধেনি। হয়তো ইতিমধ্যে বেশ স্পষ্ট কোনও হদিশ তিনি পেয়ে গেছেন। তাই আমাদের, যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তাড়ানো তাঁর অত্যন্ত দরকার। তাই পিসেমশাইকে ভুলিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখে তিনি আমাদের ভয় দেখাবার ব্যবস্থা করছেন।

শর্মিলা থামবার পর খানিক চুপ করে থেকে যুক্তিগুলো যেন মনে-মনে বিচার করে নিয়ে পরাশর কেমন একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বলেছে—হ্যাঁ, তোমার যুক্তিগুলোও হেলাফেলা করবার নয়। তোমার কথা শুনতে-শুনতেই আরও কয়েকটা কথা আমার মাথায় এল। তাতেই মনে হচ্ছে যে, এ-রহস্যের মীমাংসার বোধহয় আর দেরি নেই।

আর দেরি নেই!—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে ঔৎসুক্যটুকুও লুকোতে পারিনি—তুমি তাই বলছ! কিন্তু কী থেকে?

কী থেকে?—পরাশর আবার একটু হেঁয়ালি করেছে। অনেক কিছু থেকে, যেমন ধরো দশানির স্পেশ্যাল বিড়ি থেকে।

সে আবার কী!—জিজ্ঞাসা করেছে শর্মিলা।—কী বলছো কী?

ঠিকই বলছি!—পরাশর গলার জোরেই প্রশ্নটা চাপা দিয়ে বলেছে—রহস্যের মীমাংসা হবেই, শুধু আমার একটা কথায় যদি তোমরা রাজি হও।

কী কথা?—জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা আর শর্মিলা।

আমাদের স্তম্ভিত করে পরাশর বলেছে—কালই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

কী!—তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে শর্মিলার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদের গলা।

আহা, চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা মানেই তো চলে যাওয়া নয়। পরাশর আশ্বস্ত করেছে শর্মিলাকে—আমার কথাটা একদিনের জন্যে রেখে দেখো না! রহস্যের মীমাংসা হয় কি না তা জানতে তো কাল বাদে পরশু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না।

পরশুর মধ্যেই রহস্যের মীমাংসা হয়ে যাবে বলছ?—শর্মিলা অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছে।

হ্যাঁ হবে, যদি আমার কথা রাখো।—দৃঢ় আশ্বাস দিয়েছে পরাশর।

বেশ তাই রাখব।—কথা দিয়ে শর্মিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—ও কী, যাচ্ছ কোথায়?

পরাশর তখন দরজার বাইরে। সেখান থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলেছে—বাঃ! আমার সব ব্যবস্থা করতে হবে না?

কী ব্যবস্থা করতে কে জানে, পরাশর সেই যে গেছে, রাত ন'টার আগে ফেরেনি। তার জন্যে বেশ একটু চিন্তিতই আমরা হয়ে উঠেছিলাম।

ইতিমধ্যে বিনতাকে একবার একলা পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বলবার এত কথা থাকতেও কী বলব ঠিক করে উঠতে পারিনি।

শুধু পরাশরকে নিয়ে একটু ঠাট্টার চেষ্টা করে বলেছি—পরাশর তো আর একদিনেই সব রহস্যের মীমাংসা করে ফেলছে। আপনি খুশি নিশ্চয়।

মীমাংসা করলে নিশ্চয় খুশি হব।—আমার দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে বিনতা—কেন, আপনি হবেন না?

এ-সুযোগটা নষ্ট হতে দিইনি। গম্ভীর মুখে বলেছি—না।

তারপর দীর্ঘনিশ্বাসটা চেপে বলেছি—মীমাংসা হলেই তো আমাদের এখানকার পালা শেষ।

আর কিছু বলবার সুযোগ পাইনি, বিনতা কথাটা কীভাবে নিলে তা জানবারও। শর্মিলার ডাকে বিনতাকে তখনই চলে যেতে হয়েছে।

পরের দিনটা সত্যিই কেটেছে যাওয়ার আয়োজন নিয়ে। সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ।

চৌধুরীমশাই এসে আমাদের যাওয়ার কথা জেনে গিয়েছেন। পরের দিনই ইঁদারা পাম্প করে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমরা চলে যাচ্ছি বলে দুঃখ করেছেন। খবর পেয়ে বক্সীবাবুও এসেছেন একবার। তাঁর মুখেই শোনা গেছে যে, তিনি এখন ছুটিতে আছেন। আছেন চৌধুরীবাড়িরই অতিথি হয়ে।

সন্ধের পর গাড়ি। চৌধুরীমশাই নিজে বিকেলে গাড়ি নিয়ে আসবেন কথা দিয়েছেন আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে। মালপত্র নিয়ে যাওয়ার লোকের ব্যবস্থাও তিনি করবেন আশ্বাস দিয়েছেন। বেশিরভাগ মাল যাবে লগেজে। আমাদের সঙ্গে যাবে সামান্যই। কী-কী যাবে পঞ্চাশবার তাই গোনা হয়েছে। লোকজন বলতে মাত্র দুজন। চৌধুরীমশাইয়ের কথায় ফিরে-আসা গোবর্ধন আর দামু। তাদের দিয়ে মালপত্র বাঁধা-খোলা কতবার হয়েছে তার ঠিক নেই। অবশ্য মোটা বকশিসও তাদের দেওয়া হয়েছে আগে থাকতে।

সেইসঙ্গে তাদের সঙ্গে পরাশরের অত বকবকানি আমার ভালো লাগেনি। বিশেষ করে পরাশর অসাবধান হয়ে একটু আহাম্মকি করে ফেলেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

আমরা চলে যাচ্ছি এই কথাটাই সকলকে জানাবার। তার জায়গায় একবার কানে গেছে মুনিশ দুজনের সঙ্গে বকবক করতে-করতে পরাশর বলছে—তোদের কোনও ভাবনা নেই রে! যাচ্ছি বটে ওদের সকলকে জোর করে তুলে নিয়ে। কিন্তু এ-জায়গার মায়া ছেড়ে ক'দিন থাকতে পারবে! দিদিমণিরা ক'দিন বাদে ঠিক ফিরে আসবে দেখিস।

কিছুক্ষণ বাদে পরাশরকে আলাদা ডেকে শর্মিলা আর বিনতার সামনেই অভিযোগ করেছি—ওদের ওসব কথা বলার তোমার কী দরকার ছিল? এমনই আহাম্মকি করে আজ রাত্রের মধ্যে তুমি রহস্যের মীমাংসা করবে!

শর্মিলাও আমায় সমর্থন করেছে।

পরাশর মুখে যেন দোষীর মতো বলেছে—তাই তো! ওদের বেফাঁস কথাগুলো বলা উচিত হয়নি, না?

সেইসঙ্গে তার চোখের হাসিহাসি ভাবটা কিন্তু ভালো লাগেনি।

পরাশর অবশ্য জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছে—যাক, কোনও ভাবনা নেই। ওরা তো বিকেল হলেই চলে যাবে। তারপর আমরা কী করছি না-করছি জানবে কোথা থেকে? আমি বলে দিচ্ছি এ রহস্য-নাটকের আজই শেষ রজনী। মীমাংসা যা হওয়ার আজ হবেই!

পনেরো

মীমাংসা হয়েছে সত্যিই। কিন্তু তার আগে সকলের ভোগান্তি যা হয়েছে তা বড় কম নয়।

সে-দুর্ভোগ শুধু আমার কাছেই সৌভাগ্যের চেয়েও বেশি কিছু হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্যভেদের যে-প্ল্যান হয়েছে তাতে ঠিক হয়েছে দুটি দলে ভাগ হয়ে সমস্ত রাত আমরা গোপনে দু-ধার থেকে গঙ্গার তীরের দিক ও পোড়ো গড়মহলের ওপর নজর রাখব। আমার সঙ্গে আছে বিনতা ও পরাশরের সঙ্গে শর্মিলা।

'আমাদের ওপর ভার পড়েছে নিঃশব্দে ওই পোড়োবাড়ির কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে থেকে পাহারা দেওয়া।

পরাশর আর শর্মিলা গিয়েছে গঙ্গার দিকে।

একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, চৌধুরীমশাই তাঁর কথামতো আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিতে আসেননি। এমনকী গাড়িটা পাঠিয়ে দিতেও ভুলে গেছেন। একটু অদ্ভুত লাগলেও এ-ভুলের গভীর তাৎপর্য তখনও বুঝতে পারিনি।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। একাদশী কি দ্বাদশী হবে, কারণ প্রায় সমস্ত রাতই অন্ধকার থাকবে, বলে দিয়েছে শর্মিলা পিসেমশাইয়ের পাঁজি দেখে।

রাত দশটা বাজবার পর নিঃশব্দে শুধু একটি করে টর্চ আর ছোট একটা করে লাঠি নিয়ে আমরা দু-দল জাঙালবাড়ি থেকে বেরিয়ে আলাদা-আলাদা পথ ধরেছি। বিনতার হাতে টর্চটা দিয়ে লাঠিটা অবশ্য রেখেছি নিজের কাছে।

বিনতা ও শর্মিলাকে সঙ্গে রাখবার ইচ্ছে অবশ্য পরাশরের প্রথমে ছিল না। ওরা দুজনে বাড়িতেই দরজা বন্ধ করে থাকবে, আর আমরা দুজনে দু-দিকে পাহারা দেব এই প্রস্তাবই সে করেছিল।

কিন্তু শর্মিলা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সে-ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়েছে।

বলেছে—এতদিন সব ধকল আমরাই সইলাম আর একরাত্রে পৌরুষ দেখিয়ে তোমরা আসল বাহাদুরিটুকু নেবে, সে হবে না। আমি অন্তত তোমাদের সঙ্গে থাকবই!

আর আমি একলা এই বাড়িতে থাকব নাকি!—বিনতা শঙ্কিত গলায় বলেছে—সে আমি পারব না।

দল ভাগাভাগি তারপর হয়ে গেছে। বিনতা যে আমার দলে পড়েছে তাও শর্মিলারই ব্যবস্থায়।

গঙ্গার দিকে পাহারায় থাকাটা শুধু বেশি জরুরি নয় বিপদের সম্ভাবনাও সেখানে থাকতে পারে।

পরাশর সেই ভারটা নিতে চাওয়ায় শর্মিলা আপত্তি করেনি। শুধু বলেছে, তাহলে তোমার সঙ্গেই আমায় থাকতে হবে।

কেন? আমায় ভরসা দিতে?—পরিহাস করেছে পরাশর।

তাই বা নয় কেন?—জবাব দিয়েছে শর্মিলা—তা ছাড়া তুমি যত বীরপুরুষই হও, এখানকার অন্ধিসন্ধি তো কিছু জানো না। কোথা দিয়ে ওরা আসে, কোনদিকে যায় আমি সঙ্গে না থাকলে বুঝবে কী করে? আমরা নদীর দিকে থাকব আর এরা পাথুরে পোলের কাছ থেকে গড়মহল আর পাথুরে পোল দু-দিকেই নজর রাখবে।

সেই ব্যবস্থা মতোই বিনতার সঙ্গে পাথুরে পোলের খানিক দূরে ক'টা খেজুরগাছের জটলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সত্যি গা-ছমছম করা রাত। চাঁদ না থাকলেও আকাশে তারার যেন ফুল ফুটেছে আর তার মৃদু আলোয় চোখ দুটো অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আবছাভাবে সবকিছু দেখাও যাচ্ছে।

সেই আবছাভাবটাই যেন আতঙ্ক-মাখানো রহস্যটা আরও গাঢ় করে তুলেছে।

গড়মহলের ধ্বংসস্তূপটা দিনেরবেলাতেই কেমন একটু ভুতুড়ে গোছের লেগেছিল। ঈষৎ তরল অন্ধকারে সেটা যেন একটা বিভীষিকার সঙ্কেত হয়ে উঠেছে।

পাশাপাশি চুপ করেই বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।

বহুদূরে গ্রামের কোনও একটা মন্দিরের কী পুজোর জানি না ঘণ্টা-কাঁসরের ধ্বনি মাঝখানের তেপান্তর পার হয়ে ক্ষীণভাবে কানে বাজছিল।

সেটা থেমে যেতে নিস্তব্ধতাটা যেন বিরাট ঢাকনার মতো আমাদের ওপর নেমে এল।

ও কী!—বলে হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে শিউরে উঠে বিনতা আমার কাছে ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

শিউরে আমিও উঠেছিলাম। তারপর অবশ্য লজ্জিত হয়ে হেসে ফেললাম।

আচমকা একটা হাওয়ার দমকে খেজুর গাছের পাতাগুলো দোলা খেয়ে মর্মরিত হয়ে উঠেছে।

নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ শব্দটায় কিন্তু গা শিরশির করে উঠেছিল।

নিজের ভয় পাওয়াটা গোপন করে বিনতাকে একটু কৌতুকের স্বরে বললাম—ওটা কিছু নয়। খেজুরের পাতাগুলো হাওয়ায় নড়ছে। কিন্তু এখন ঘরে খিল দিয়ে ঘুমোলেই ভালো হত মনে হচ্ছে নিশ্চয়!

মোটেই না!—দেখতে না পেলেও বিনতার ঠোঁট ওল্টানোটা যেন আমি অনুভব করলাম—ঘরে থাকলে ভয়েই আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম।

যাক! বাইরে অজ্ঞান হওয়ার তা হলে ভয় নেই!—হালকা আলাপটা চালিয়ে যেতে চাইলাম।

অজ্ঞান হলে তো আপনি আছেন!—বলে বিনতা একটু হাসল।

উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না।

চুপ!—বিনতা চাপা তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল—দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখতে আমিও পেয়েছি। পোড়ো গড়মহলের পেছন দিকে একনিমেষের জন্যে একটা আলোর চমক। কেউ টর্চটা টিপেই যেন নিভিয়ে দিয়েছে।

পরাশর আর শর্মিলাই টর্চটা জ্বেলেছে ভাবতে পারতাম। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। তারা স্পষ্ট করে বলে গেছে যে, গড়মহলের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে গঙ্গার চড়ার দিকেই তারা থাকবে। যদি কোনও কারণে এদিকে তারা আসতে বাধ্যও হয়ে থাকে তা হলেও টর্চ জ্বেলে সংকেত দেওয়ার ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে হয়নি। সেরকম কোনও গুরুতর কারণ উপস্থিত হলে আমরা সজোরে শিস দিয়ে পরস্পরকে ডাকব এই কথাই আছে।

হঠাৎ এ-টর্চ তা হলে কার হাতে জ্বলে উঠতে পারে?

চাপা উত্তেজিত গলায় বিনতাকে জিজ্ঞেস করলাম—এই পাথুরে পোল দিয়ে ছাড়া জাঙালবাড়িতে তো অন্য রাস্তাতেও আসা যায়!

আসা তো যে কোনও দিক দিয়ে যায়। তবে গাড়ির রাস্তা এই একটাই।—বললে বিনতা—পুবদিকে তো গঙ্গার চড়া আগেই দেখেছেন, উত্তর-দক্ষিণেও শুনেছেন যে, এককালে বাঁওড় ছিল, এখন আধশুকনো জলা হয়ে আছে। পারতপক্ষে সেদিক দিয়ে কেউ আসে না।

যার না এলে নয় তেমন কেউই এসেছে মনে হচ্ছে। আসুন, ব্যাপারটা দেখতে হবে।

সন্তর্পণে সামনে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার বললাম—সাবধানে আসবেন কিন্তু। অন্ধকারে ছাড়াছাড়ি না হয়ে যায়।

বাঁ-কাঁধের স্পর্শটুকুর রোমাঞ্চ বুঝিয়ে দিলে বিনতা আমার অত্যন্ত কাছে ঘেঁষে এসেছে।

কিছুদূর পর্যন্ত সমতল মাঠের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নেই যেতে পারলাম। গড়মহলের কাছাকাছি যেতেই অসুবিধে শুরু হল।

এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নিচু জমি। এখানে সেখানে পোড়ো বাড়ির নানা ভাঙা চাঙড়া পড়ে আছে। জংলা কাঁটাগাছের ঝোপও হয়েছে অনেক জায়গায়।

টর্চ জ্বালবার উপায় নেই। অতি সাবধানে এইসব বাধা এড়িয়ে যখন গড়মহলের উত্তর দিকটায় পৌঁছোলাম তখন এতখানি কষ্ট করা বৃথাই হয়েছে মনে হল।

দৈত্যাকার গড়মহলের ধ্বংসস্তূপের দরুনই জায়গাটায় তারার আলোর ক্ষীণ দ্যুতিও নেই। সব যেন জমাট অন্ধকার।

এখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া নেহাৎ দৈব সহায় না হলে অসম্ভব।

সেই দৈবের সাহায্যই পাব ভাবতে পারিনি।

এদিক-ওদিক একটু খুঁজে আবার পাথুরে পোলের দিকেই ফিরে যাব ভাবছি, এমন সময় বিনতা আমার হাতটা চেপে ধরল।

তারপর কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করে উত্তেজিতভাবে বললে—বাঁ-দিকটায় চেয়ে দেখুন।

দেখলাম এবং দেখে অবাক হলাম। গড়মহলের একটা ধসে পড়া ছাদের ধার দিয়ে তারাভরা আকাশ খানিকটা দেখা যাচ্ছে।

সেই তারাছিটোনো কালিবরণ আকাশের পশ্চাৎপটে একটি না দুটি যেন ছায়া দিয়ে গড়া মূর্তি দাঁড়িয়ে।

একজন বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান মনে হয় আকার দেখে। তার পাশে একটা ছোটছেলেই মনে হল।

মূর্তি দুটো কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ধ্বংসস্তূপের ভেতর দিকেই এগিয়ে গেল।

যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে তাদের অনুসরণ করলাম।

অনুসরণ করা অবশ্য অত্যন্ত কঠিন, বাইরের তারাভরা আকাশের ফালিটুকু পেছনে থাকায় তাদের সামান্য যেটুকু দেখা গিয়েছিল গড়মহলের ভেতর দিকে এগিয়ে যাওয়ার পর গাঢ় অন্ধকারে তাও আর পাওয়া গেল না।

কিছুটা আন্দাজে কিছুটা থেমে-থেমে পায়ের শব্দ ধরে খানিকদূর পর্যন্ত তবু কাছাকাছিই থাকতে পারলাম।

মূর্তি দুটো সম্বন্ধে অনেক ভাবনাই তখন মনের মধ্যে খেলে যাচ্ছে। ছোটছেলের মতো যাকে দেখেছি, ইঁদারার ধারে ও ঘরের মেঝেয় এরই কি পায়ের রক্তাক্ত ছাপ পড়েছিল?

অনুসরণের অসুবিধের দরুন এরা নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার আগে শিস দিয়ে পরাশর ও শর্মিলাকে ডাক দেব কি না যখন ভাবছি তখনই দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল।

একটা আলগা ইটের চাপড়ার ওপর পা দিয়ে ফেলে অস্ফুট চিৎকার করে কাৎ হয়ে পড়ে যাবার আগেই বিনতাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললাম বটে কিন্তু তখন সামনের অন্ধকারই যেন বজ্রস্বরে হাঁক দিয়ে উঠল।

কে ওখানে? খবরদার! নড়লেই গুলি করব!

সেইসঙ্গে টর্চের জোরালো আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল আর তৎক্ষণাৎ অস্ফুট বিস্ময়ধ্বনিও শুনলাম—এ কী! আপনারা!

টর্চ নিয়ে মূর্তি দুটি এগিয়ে আসবার পর তাদের দেখে আমরাও বিমূঢ়!

একজন চৌধুরীমশাই আর অন্যজন বক্সীবাবু!

দুজনেরই পরনে গাঢ় রঙের শার্ট-প্যান্ট। বক্সীবাবুর হাতে টর্চ আর চৌধুরীমশাইয়ের হাতে একটা পিস্তল। নেহাত বেঁটেখাটো বামন গোছের চেহারা বলেই বক্সীবাবুকে ছোটছেলে বলে ভুল হয়েছিল।

চৌধুরীমশাই কাছে এসে হেসে যা জিজ্ঞাসা করলেন, মনে-মনে আমি তাঁদের সম্বন্ধে তখন তারই জবাব খুঁজছি।

আপনারা এখানে কী করছেন?— হাসিমুখে হলেও একটু সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন চৌধুরীমশাই।

এই আপনাদের ওপর নজর রাখছিলাম! —মুখ দিয়ে কথাটা যেন ফসকে বেরিয়ে গেল।

বেশ! বেশ! —চৌধুরীমশাই কথাটাকে ঠাট্টা হিসেবে নেওয়ারই যেন ভান করে বললেন—পরস্পরের দিকে নজর রেখে আরও উপাদেয় কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় কি না দেখি আসুন।

নিরুপায় হয়ে তাঁর কথাই এবার মানতে হল।

আমি বিনতাকে নিয়ে তাঁদের পেছনে থাকবার চেষ্টা করলাম একবার। কিন্তু চৌধুরীমশাই একটু শক্ত গলাতেই বললেন—না, না, পেছনে নয়, আমাদের সামনে চলুন।

আদেশটার যেন কৈফিয়ত হিসেবেই বললেন সেইসঙ্গে—এখানে সামনে, পিছনে দু-দিকেই বিপদের সম্ভাবনা। তবু পিস্তলটা যখন আমার হাতে তখন আমি পেছনে থাকলেই আপনাদের অন্তত পাহারা হবে।

এই ব্যাখ্যাই মেনে নিয়ে বিনতাকে নিয়ে তাঁদের আগে—আগে যেতে হল।

আমাদের হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর টর্চ জ্বালা সম্বন্ধে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর সাবধানতাটা একটু শিথিল হয়েছে দেখলাম।

গড়মহলের ধ্বংসস্তূপে পথ বলে কিছু নেই। এখানে ধসা ছাদ, ওখানে হেলা দেওয়াল কি থামের আশপাশ দিয়ে বড়-বড় ইট-পাথরের ঢিবি ডিঙিয়ে কোনওরকমে কখনও মাথা নুইয়ে, কখনও কাৎ হয়ে যেতে হচ্ছে।

মনে-মনে চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর এ-রহস্যনাটকের ভূমিকা তখন আমি সঠিকভবেই বুঝে ফেলেছি।

পরাশর ঠিকই অনুমান করেছিল। ভুতুড়ে ব্যাপার এতদিন যা ঘটেছে লোভই সে-রহস্যের মূলে আছে। এই ধ্বংসপুরীতে অত্যন্ত মূল্যবান কিছু পাওয়ার আশাতেই দুজনে শর্মিলা ও বিনতাকে

এখান থেকে তাড়াবার ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়েছেন। বাধা হিসাবে পিসেমশাইকে সরাবার ব্যবস্থা হয়েছে আগেই। তাঁকে একেবারে শেষই করে দেওয়া হয়েছে হয়তো। তা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কোথাও অসহায়ভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে নিশ্চয়ই।

এঁদের সব শয়তানি আজ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার পর আমাদের সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা এঁরা করবেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। এই ধ্বংসপুরীর কোথাও আমাদের গুমখুন করে পুঁতে রাখলে যুগ-যুগান্তরেও তো কেউ তা জানতে পারবে না।

এখনি পেছন থেকে পিস্তল ধরে আমাদের সেইরকম কোনও গুপ্ত কুঠুরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না কে জানে।

অসম্ভব জেনেও এঁদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার শেষ চেষ্টা তাই করতেই হবে।

একটু সময় নেওয়া ও এঁদের বর্তমান মতলবটা বোঝবার চেষ্টায় যেতে-যেতে গলাটা সহজ রেখেই জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, আপনারা এলেন কোনদিক দিয়ে। পাথুরে পোল দিয়ে অন্তত আসেননি।

ও, সেইদিকেই আপনারা পাহারায় ছিলেন বুঝি! বক্সীবাবু কেমন বিশ্রীভাবে হাসলেন মনে হল, আপনাদের কথা ভাবিনি, তবে ওদিকে কারুর নজর থাকবে অনুমান করে মাঠ জলা ভেঙে আমাদের বেশ কষ্ট করেই আসতে হয়েছে।

কিন্তু এখন আমরা যাচ্ছি কোথায়? কী খুঁজছেন আপনারা? আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

সাপের গর্ত! বলে হাসতে গিয়ে হাসিটা যেন চৌধুরীমশাইয়ের গলায় আটকে গেল।

একটা ভাঙা দেওয়ালের হাঁ করা ফোকরের ভেতর দিয়ে পা বাড়িয়ে বক্সীবাবুর হাতের টর্চের আলোয় যা তখন দেখেছি তাতে আমরাও নিষ্পন্দ নির্বাক।

ঘরের রাবিশ ছড়ানো ভাঙা মেঝের ওপর একটি শীর্ণ গোছের মানুষ পড়ে আছে।

পিসেমশাই!—বলে বিনতার ব্যাকুল চিৎকারে তাঁর পরিচয় বুঝতে দেরি হয়নি।

সুযোগ বুঝে সেই মুহূর্তে আমি অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি। চৌধুরীমশাই ও বক্সীবাবু আমাদের পেছনে তখন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছেন।

আচমকা পেছনে ফিরে সজোরে ছোঁ মেরে চৌধুরীমশাইয়ের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে এক লাফে অন্যদিকে সরে যেতে-যেতে আমি মুখের ভেতর বাঁ-হাতের ক'টা আঙুল ঢুকিয়ে প্রাণপণে শিষ দিলাম।

তারপর চিৎকার করে বললাম—আমার দিকে সরে এসো বিনতা। টর্চটা ধরে থাকো ওঁদের ওপর।

উত্তেজনার মাথায় আপনি থেকে যে বিনতাকে তুমি করে ফেলেছি সে-খেয়াল তখন নেই।

ওঁদের দুজনকেও সঙ্গে-সঙ্গে সাবধান করে হুঙ্কার দিলাম—সাবধান! যেমন আছেন তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন, নড়বার চেষ্টা করলেই বিপদ জানবেন।

বিনতা তখন আমার নির্দেশ মতো আমার কাছে সরে এসে তাঁদের ওপর টর্চ জ্বেলে ধরেছে।

তার আলোয় চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর হতভম্ব হওয়ার ভানটা বেশ নিখুঁত মনে হল।

আমার দিকে যেন সবিস্ময়ে তাকিয়ে তিনি বললেন—আপনি করছেন কী মশাই! পাগল হয়ে গেছেন নাকি! পিস্তলটা নামান, আপনার হাত যা কাঁপছে তাতে হঠাৎ গুলি ছুটে যেতে পারে।

পারেই তো!—তীব্রস্বরে বললাম—আর সেই বুঝেই নড়বার চেষ্টা করবেন না। পরাশর আর শর্মিলাদেবী এখুনি আসছেন। তাঁরা এলেই আপনাদের যা ব্যবস্থা করবার করছি।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই পরাশর আর শর্মিলা সেই ফোকরের ভেতর দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল ব্যস্তভাবে।

কিন্তু ওদের সঙ্গে আর যারা ঢুকল তাদের দেখেই আমি অবাক।

পোশাক দেখেই বুঝলাম থানার দারোগাবাবু ও দুজন পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে আবার পিছমোড়া করে বাঁধা মুখে কালিঝুলি মাখা দুশমন গোছের একটা লোক।

বিনতা তাকে দেখে বলে উঠল—আরে! এ তো আমাদের সেই পুরনো পাহারাদার দশরথ! কাজ ছেড়ে যে পালিয়েছিল।

আমার কিন্তু তখন সেসব দিকে মন দেওয়ার সময় নেই।

উত্তেজিতভাবে বললাম—শোনো পরাশর, শুনুন দারোগাবাবু, সমস্ত চক্রান্তের মূল দুজন ওই সামনে দাঁড়িয়ে। চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবু! হাতেনাতে আজ ওঁদের ধরেছি!

পরাশর ও দারোগাবাবু দুজনেই এবার হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

তারপর দারোগাবাবু কেন বুঝলাম না হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন—তাই নাকি! কিন্তু আপনার হাতের পিস্তলটা এবার নামান। আমি যখন এসে পড়েছি তখন আর ভাবনা নেই!

বাধ্য হয়েই পিস্তলটা তখন নামাতে হল।

পরাশর তখন যা করছে তা দেখেই আমার প্রায় চক্ষুস্থির।

চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবুর কাছে গিয়ে তাঁদের ডান হাত দুটো ধরে নাড়া দিয়ে সে বলছে—সকলের তরফ থেকে আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনারা দারোগাবাবুকে নিয়ে এভাবে সাহায্য করতে না এলে এ-রহস্যের মীমাংসা আজও হত না।

শর্মিলার কাণ্ড দেখে আরও আমি হতভম্ব।

কোথায় সেই তেজ আর বেপরোয়া সাহসের কঠিন ভঙ্গি। সে যেন হঠাৎ সলজ্জ সঙ্কুচিত গ্রামের মেয়ে হয়ে গেছে।

চৌধুরীমশাইয়ের কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে লজ্জাজড়িত স্বরে তাকে বলতে শুনলাম—সম্পূর্ণ ভুল করে অন্যায়ভাবে আপনাকে সন্দেহ করেছিলাম। আমায় মাপ করবেন।

মাপ অত সহজে হয় না। খেসারৎ না পেলে মাপ নেই।

হঠাৎ শর্মিলার হাত দুটো ধরে ফেলে চৌধুরীমশাইয়ের ওই মোটা রসিকতা মার্কা জবাব আর তাইতেই শর্মিলার সলজ্জ খুশির হাসি দেখে মাথাটাই তখন আমার ঘুরতে শুরু করছে।

দারোগাবাবুই এসব নাটকে যবনিকা ফেলে বললেন—আচ্ছা, আপনারা তা হলে এগোন, আমি এই দশরথ বাহাদুরকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি।

আমাকেও কি থানায় নিয়ে যাবেন?

পিসেমশাই ইতিমধ্যে যে মেঝের ওপর উঠে বসেছেন তা কেউ বোধহয় লক্ষ করেনি। তাঁর কাতর আক্ষেপ শুনে সেদিকে দৃষ্টি গেল।

দারোগাবাবু হেসে বললেন—না, আপনাকে আর থানায় নেব না। বুড়োবয়সে লোভের যে শাস্তি আপনি পেয়েছেন তাই যথেষ্ট। আপনাকে স্ট্রেচারে করে বাড়িতে পাঠাবারই ব্যবস্থা করছি। এ-বয়সের ভাঙা পা আর বোধহয় জোড়া লাগবে না। শেষ ক'টা দিন তাই আপনার কাশীবাস করাই বোধহয় ভালো।

সমস্ত ব্যাপারটা তখনও আমার কাছে ধাঁধার মতো। বিমূঢ়ভাবেই বিনতাকে নিয়ে পরাশর ও শর্মিলার পিছু-পিছু ফোকর দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সমস্ত রহস্যটা তারপর পরাশরের কাছে শুনে বুঝেছি। পিসেমশাই সিংহরায়মশাই বুড়ো বয়সে গুপ্তধনের লোভে পড়েছিলেন বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের আলাপ শুনে। শর্মিলা আর বিনতাকে নিজেই ডেকে এনে জায়গা দিলেও তখন তিনি তাদের সরিয়ে দিয়ে গুপ্তধন একলা খোঁজবার জন্যে ব্যাকুল। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের রাজি না করাতে পেরে পুরনো পাহারাদার দশরথের সাহায্যে তিনি শর্মিলাদের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার ফন্দি আঁটেন। আগে দশরথ যেন কাজ ছেড়ে চলে যায়, তারপর তিনি হঠাৎ নিরুদ্দেশ হবার ভান করেন সেইজন্যেই। দশরথের

গাঁ গঙ্গার ওপারে। তারই ডিঙিতে তিনি প্রথম ওপারে তারই বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। তারপর রোজ রাত্রে তার ডিঙিতে আসতেন এপারে শর্মিলাদের ভয় দেখাতে। দশরথ যাওয়ার পর দামুকে তিনি কাজ দেন খুঁজে-পেতে। দামু দশরথেরই শাগরেদ এবং পিসেমশাইয়ের চর। শেষদিন ইচ্ছে করেই পরাশর তাকে আমাদের ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা শোনায় যাতে পিসেমশাই সেই রাত্রি থেকেই কাজ সারবার জন্যে ব্যস্ত হন। দশরথ অনেক টাকাকড়ির আশায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এ-পর্যন্ত তার কিছু না পেয়ে সে সিংহরায়মশাইয়ের ওপর খাপ্পা হয় ও ঝগড়ার মধ্যে তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ডিঙি করে ওপারে পালাবার চেষ্টা করে। দারোগাবাবু ও পরাশরের সতর্কতায় ধরা পড়ে সে সেইখানেই। পড়ে গিয়ে সিংহরায়মশাইয়ের তখন পা ভেঙে গেছে। আমরা সেই অবস্থাতেই তাঁকে দেখতে পাই।

পিসেমশাইয়ের ওপর সন্দেহটা পরাশরের মনে একটু-একটু করে বেড়ে উঠেছিল। শর্মিলাদের কাছে সমস্ত বিবরণ শুনে তাঁর কয়েকটা ব্যবহার বেশ দুর্বোধ লেগেছিল প্রথম থেকেই। যেমন, নিজে থেকে শর্মিলাদের ডেকে এনে জায়গা দিয়ে হঠাৎ অপদেবতার ভয়ে ভীত হয়ে উঠে সেই অজুহাতে তাদের এখান থেকে গ্রামলক্ষ্মী সমবায়ের পাট তোলাবার চেষ্টা। যেদিন নিরুদ্দেশ হন ঠিক তার আগের দিনই বক্সীবাবু ও চৌধুরীমশাইকে গোপন কিছু জানাবার কথা দিয়ে পরের দিন সকালে চৌধুরীবাড়িতে অপেক্ষা করতে বলাও পিসেমশাইয়ের ধরনধারণের সঙ্গে যেন খাপ খায় না। সুতরাং হয় চৌধুরীমশাই আর বক্সীবাবু দুজনেই একসঙ্গে মিথ্যে বলেছেন ধরতে হয়, নয় বুঝতে হয় যে, বক্সীবাবু আর চৌধুরীমশাইয়ের কথাটাই সত্যি আর পিসেমশাই কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কাজটা করেছেন।

পিসেমশাই মানুষটা কেমন সে-বিষয়েও নতুন কয়েকটা তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, তাঁর অদম্য থিয়েটার-বায়স্কোপের নেশার কথা। আর তাইতে পরাশরের মনে হয়েছে যে, বুড়ো হতে চললেও প্রাণে তাঁর শখ এখনও যথেষ্ট। এ-ধরনের লোকের টাকার প্রতি বেশিরকম লোভ থাকতেই পারে। তা ছাড়া বর্মা থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যিনি এসেছেন, গড়মহলে অবিশ্বাস্যরকম গুপ্তধন আছে বলে ইঙ্গিত পেয়ে আবার বড়লোক হওয়ার জন্যে লালায়িত হওয়া তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

তাঁর নিখোঁজ হওয়াটাও কেমন যেন বেশি সাজানো মনে হয়েছে। তাঁর ফন্দিটা বেশিরকম ফাঁস হয়ে গেছে অবশ্য দশানির স্পেশ্যাল বিড়ির দরুন। সেই বিড়ির টানই একদিক দিয়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছে। অন্য-অন্যবার ক'দিনের জন্যে বাইরে যেতে হলে বাড়তি বিড়ির বান্ডিল তিনি কিনে নিয়ে যান। এবার তা করেননি। কারণ, তাতে সন্দেহ জাগবার সম্ভাবনা। দশানির দোকানে খোঁজ করে জানা গেছে যে, পিসেমশাই নিরুদ্দেশ হবার আগে বাড়তি বিড়ির বান্ডিল কেনেননি, কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা খবরও জানা গেছে যা একটু আকস্মিক ও অস্বাভাবিক। দোকানি গর্ব করে বলেছেন যে, সম্প্রতি হঠাৎ বাইরে থেকেও বিড়ির অর্ডার আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ বাইরের এই চাহিদা থেকেই পরাশরের সন্দেহ হয়েছে যে, বাইরের এ-খদ্দের স্বয়ং পিসেমশাই ছাড়া আর কেউ নন। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই তাঁর স্বেচ্ছা-নির্বাসন। তা না হলে অর্থাৎ সত্যিই শয়তানি মতলবে কেউ তাঁকে গুম করে থাকলে তাঁর শখের বিড়ি তাঁকে খাওয়াতে এত ব্যস্ত হত না।

সমস্ত দিক দিয়ে বেশিরভাগ ঘটনা তার বিচারে যেন আঙুল তুলে পিসেমশাইকে নির্দেশ করেছে বলেই পরাশর অত জোর করে অবিলম্বে রহস্য-সমাধানের আশ্বাস দিতে পেরেছিল।

জাঙালবাড়ির রহস্যের মীমাংসা হয়ে গেছে। তারসঙ্গে আরও অনেক কিছু হয়েছে।

কার ভেতর যে কী থাকে, তা কে বলতে পারে? যা লোহার চেয়ে শক্ত মনে হয় তাও গলে যায় মোমের মতো। শর্মিলা অন্তত তাই গেল দেখলাম। সেই স্বাধীন, স্বাবলম্বী, জবরদস্ত, যুদ্ধং

দেহি গোছের ভঙ্গির আড়ালে অমন একটি লতানে কোমল মেয়ে লুকিয়েছিল কে জানত? যাঁর বিরুদ্ধে বাইরে অত বিরাগ আর সন্দেহ, নিজের অগোচরে মনে-মনে শর্মিলা তাঁরই প্রতি একান্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। চৌধুরীমশাই নিজেও অবশ্য তাই। তবে তাঁরটা প্রকাশ্যে। সারাজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে কাটাবার প্রতিজ্ঞা তাঁর শর্মিলাকে প্রথম দেখার পরই টলমল করেছে। তারপর কয়েকদিন শর্মিলার সঙ্গ পেয়েই তা চুরমার হতে দেরি হয়নি। শর্মিলা ওখানেই আছে স্বেচ্ছায়, সানন্দে, চৌধুরীমশাইয়ের ঘর আলো করে। বিনতাকে বিয়ে করে আমি বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে গেছি। মুখে কিছু না বলুক পরাশর মনে-মনে বোধহয় একটু আহত হয়েছে। বিনতার প্রতি দুর্বলতার কথা নিজেই সে একসময়ে আমার কাছে স্বীকার করেছিল।

বিবরণটা পড়ে ফেলে কাগজের এতদিনের নিয়মটা না ভেঙে পারলাম না। পুজোসংখ্যায় এ-ধরনের বড় লেখা দেওয়া আমার কাগজের দস্তুর নয়। এ-লেখাটা কিন্তু ছাড়তে না পেরে তখুনি পাঠিয়ে দিলাম কম্পোজ করতে।

কম্পোজ হওয়া মেক-আপ প্রুফটা নিজেই দিয়ে এলাম পরাশরকে দেখবার জন্যে।

পরের দিনই বাড়িতে এসে পরাশর আমাকে এই মারে তো সেই মারে।

কীসব আবোল-তাবোল ছেপেছ আমার নামে? —গনগনে গলায় সে জানতে চাইলে।

কেন তোমার প্রথম গোয়েন্দাগিরির গল্পই তো ছাপছি! —অবাক হয়ে বললাম।

আমার প্রথম গোয়েন্দাগিরি! —পরাশর বলে উঠল—সব মিথ্যে, বানানো গল্প। আমার জ্যাঠা, কাকা, পিসি, মাসি কেউ নেই। আমার বাবা ছিলেন বংশের একমাত্র সন্তান! আমিও তাঁর সবেধন নীলমণি ছেলে। আমার মা-ও ছিলেন বাপ-মার একমাত্র মেয়ে। তা ছাড়া ঢাকায় আমি কখনও পড়িনি, পড়েছি গৌহাটি আর লক্ষ্ণৌতে। রাঙামাটিতে কোনও জন্মে আমি কখনও যাইনি। খবর নিয়ে জানলাম, সে-জায়গার একটু-আধটু সঠিক খবরের সঙ্গে আগাগোড়া কল্পনার ভেজাল দিয়ে ওই জাঙালবাড়ির ব্যাপার সাজানো হয়েছে।

তা হলে এখন উপায়! —আমি একেবারে অকূল পাথারে পড়ে বললাম—তোমার সম্বন্ধে লেখা বেরুবে বলে আমি বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছি। তোমার সম্বন্ধে না হলে তোমার নামে একটা লেখা অন্তত চাই। তুমি তাহলে একটা কবিতাই দাও। ছেপে মুখরক্ষা করি।

বেছে নাও। —পরাশর টেবিলের ওপর মোটা বাঁধানো খাতাটা রাখলে।

একটু চমকে তার মুখের দিকে তাকালাম। আগে থেকেই সব আঁচ করে সে কি তৈরি হয়ে এসেছিল?

উদাসীবাবার আখড়া

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ক ব উ ৮২

এক

কলকাতা থেকে মাইলসাতেক দূরে, জায়গাটার নাম করতে আমি চাই না, বহুদিন থেকে একটা বিরাট জলা জায়গা পড়েছিল। কিন্তু, কলকাতার জমির দরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেই জলা মাঠের মধ্যে দেখতে-দেখতে এক-আধখানা বাড়ি গড়ে উঠতে লাগল। দেখতে-দেখতে বছর খানেকের মধ্যে সেখানে একটা সুন্দর 'কলোনি' গড়ে উঠল।

সেই কলোনির একধারে কখন যে নিঃশব্দে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর গড়ে উঠেছিল তা কারুরই নজরে পড়েনি। দেখতে-দেখতে ছিটেবেড়ার আড়ালে একটির জায়গায় আরও দুটি কুঁড়েঘর পাশাপাশি গড়ে উঠল। গাছের শুকনো ডাল আর পাতা দিয়ে বেড়াটা ঘেরা হল। ঘেরার ভেতরে অনেকখানি খালি জায়গা। সেই খালি জায়গাটার সামনে তিনটি সামান্য কুঁড়েঘর।

দেখতে-দেখতে সেই বেড়াকে জড়িয়ে নানারকমের ফুলন্ত বুনোলতা গজিয়ে উঠল। খালি উঠোনটার মাঝখানে একটা সুন্দর তুলসী-মঞ্চ তৈরি হল। সন্ধ্যা হলেই একদল একবস্ত্র সন্ন্যাসী সেইখানে একত্র বসে আপনার মনে নাম-গান করে। সেই নিস্তব্ধ পল্লী—সন্ধ্যার মুখে তাদের নাম-গানে মুখরিত হয়ে উঠত। এতদিন যাদের প্রতি কারুরই দৃষ্টি পড়েনি, ক্রমশ সেই নিয়মিত সান্ধ্যভজনার শব্দে সকলের দৃষ্টি তাদের ওপর গিয়ে পড়ল।

কেউ বললে, ভণ্ডের দল। কেউ বললে, বোষ্টমের আখড়া। কেউ-কেউ বললে, সাধু-বেশে চোরেদের আড্ডা। কেউ-কেউ বললে, হতেও-বা পারে, সাধু-সন্ন্যাসী!

কিন্তু সেই ছিটেবেড়ার আড়ালে, সেই তিনখানি কুঁড়েঘরে যারা থাকত, তাদের ব্যবহারে কলোনির লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে বলবার কোনও কিছুই পেল না। তারা তাদের সেই বেড়ার বাইরে বড় একটা কারুর সঙ্গেই মেলামেশা করত না। তবে প্রতি রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সেই খালি জায়গাটা ভিখিরিতে ভরে যেত, বাইরে থেকে দেখা যেত, মাটির বড়-বড় হাঁড়ি করে একবস্ত্র সেই সাধুর দল শালপাতায় খিচুড়ি পরিবেশন করছে। তৃপ্ত ভিখিরির দল খাওয়া সেরে, জয়—উদাসীবাবার জয়! বলে দলে-দলে বিদায় হত, আবার দলে-দলে আসত।

পাড়ার লোকেরা জানল, সেই আশ্রমের যিনি কর্তা, তাঁর নাম উদাসীবাবা, আর আশ্রমে যারা আছে তারা সব তাঁরই চেলা।

ক্রমশ-ক্রমশ রবিবার দিন কিংবা অন্য কোনও ছুটির দিনে শহর থেকে দু-একজন করে ভদ্রলোক সেই ছিটেবেড়া পেরিয়ে উঠোনে দেখা দিতে লাগলেন। সন্ধ্যার নাম-গানের আসর ক্রমশ বেশ জেঁকে উঠল এবং আরও কিছুদিন গেলে সেই সামান্য পর্ণকুটিরের দ্বারে দু-একখানা করে মোটরগাড়িও দাঁড়াতে আরম্ভ করল।

পাড়ার লোকেরা বুঝল, উদাসীবাবার ভক্তের সংখ্যা দিন-দিন বাড়ছে এবং কানাকানি থেকে এ-কথা ক্রমশ জানাজানি হয়ে গেল যে, উদাসীবাবার ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে কলকাতা শহরের কোনও-কোনও বড় অধ্যাপক, উকিল এবং ব্যারিস্টারও আছেন। সুতরাং উদাসীবাবা এবং তাঁর চেলাদের আর উপেক্ষা করা চলে না। ক্রমশ পাড়ার লোকেরাও একে-একে সেই ছিটেবেড়া-ঘেরা উঠোনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলেন। যাঁরা প্রবেশ করে প্রত্যক্ষভাবে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলেন তাঁরা ফিরে এসে উদাসীবাবার গুণগানই করলেন এবং তার ফলে সেই নবগঠিত কলোনির ঘরে-ঘরে ক্রমশ উদাসীবাবার নাম এবং সেইসঙ্গে কীর্তির কথা ছড়িয়ে পড়ল।

আমাদের বাঙালি জাতির স্বভাবই এইরকম যে, যাকে আমরা দেখতে পারি না, তাকে বিনা বিচারে চোর বলতেও আমরা কুণ্ঠিত হই না, আর যাকে আমাদের ভালো লেগে গেল, তাকে নিঃসঙ্কোচে দেবতা বলতেও আমাদের একমুহূর্ত দেরি লাগে না। দেখতে-দেখতে উদাসীবাবা পাড়ার লোকদের কাছে দেবতা হয়ে উঠলেন।

তবে এক্ষেত্রে পাড়ার লোকেরা যে উদাসীবাবাকে বিনা বিচারেই একেবারে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতে লাগল, ঠিক তা নয়। দিনের পর দিন তাঁর অসাধারণ শক্তির আভাস-ইঙ্গিত যা পাড়ার লোকের চোখে পড়তে লাগল, তাতে তাঁকে শ্রদ্ধা না করে বিমুখ থাকা যায় না।

ধর্ম-ব্যাপারে তাঁরা যে কোন সম্প্রদায়ের লোক, তা কেউ কিন্তু জানত না। কৌতূহলী হয়ে যারা উদাসীবাবাকে এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করত, তারাও কোনও স্পষ্ট জবাব পেত না। তিনি হেসে বলতেন, সকল পথের পথিক আমি, আমার কোনও আলাদা পথ নেই। সব পথই আমার পথ।

কী যে তাঁর ধর্মমত, তাও পাড়ার লোকেরা জানতে চেষ্টা করে জানতে পারেনি। তবে পাড়ার লোকেরা একটা বিষয় বুঝেছিল যে, তিনি সহজে, সাধারণ গুরুর মতন কাউকে দীক্ষা দিতেন না। তাঁর যে কয়েকজন ভক্ত তাঁর সঙ্গে সেই আশ্রমে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল, তারাই নাকি কিছুকাল পরে, অর্থাৎ তাদের শিক্ষানবিশীর কাল সম্পূর্ণ হলে, দীক্ষা পাবে। এখনও তারা দীক্ষা পায়নি অথবা দীক্ষা পেয়েছে তার খবর বাইরের কোনও লোক জানত না। বিশেষ করে, তাঁর চেলাদের কাছ থেকে কোনও কিছু জানবার উপায় কারুর ছিল না, কারণ উদাসীবাবার নির্দেশ অনুসারে তারা সকলেই মৌনী। অন্তত, বাইরের লোকজন যখন থাকত, তখন তাদের কাউকেই কথা বলতে কেউ দেখেনি। বিশেষ প্রয়োজন হলে তারা ইঙ্গিতেই কাজ সারত এবং বাইরের কোনও লোকজন এলে তারা মৌনভাবেই তাঁদের অভ্যর্থনা করত। একমাত্র নাম-গানের সময়, বাইরের লোকেরা তাদের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারত যে, আর যা-ই হোক তারা বোবা নয়!

ক্রমশ একজন-দুজন করে পাড়ার লোকেরাও উদাসীবাবার আখড়ায় যোগদান করতে লাগল। দেখতে-দেখতে শহরের প্রান্তদেশে সেই পরিত্যক্ত জলাভূমিতে সেই নবগঠিত কলোনির সঙ্গে-সঙ্গেই উদাসীবাবার আখড়াও বেশ জমজমাট হয়ে উঠল।

দুই

এইসময়ে বিশেষ একটি ব্যাপারে উদাসীবাবার নাম ও খ্যাতি সহসা বিশেষভাবে বেড়ে গেল।

কিছুদিন থেকে তাঁর আশ্রমে কলকাতা থেকে এক বিশেষ ধনী আসা-যাওয়া করছিলেন। লোকমুখে উদাসীবাবার গুণের কথা শুনে তিনি তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। কিন্তু উদাসীবাবা কিছুতেই তাঁর কাছে ধরা দিতে চান না। তাঁর যে কোনও অলৌকিক ক্ষমতা আছে তা তিনি স্বীকার করতে চান না। অথচ স্পষ্টত যে অস্বীকার করেন তাও নয়। বিশেষ পীড়াপীড়ি করে ধরলে তিনি শুধু হেসে বলতেন, দৈবী ক্ষমতা থাকা না-থাকা, সেসব তাঁরই দয়া! সকলেই কি তাঁর দয়া পেতে পারে?

বিশেষভাবে এই ব্যাপারে তাঁকে দুজন খুব ধরে বসল। একজন হলেন, কলকাতার সেই ধনী ভদ্রলোকটি, দ্বিতীয়জন হলেন, সেই কলোনির যিনি মাথা—কপিলেশ্বরবাবু। কপিলেশ্বরবাবু রেলের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে বড়বাবু ছিলেন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোটা টাকা নিয়ে তিনি এখন 'রিটায়ার্ড' হয়েছেন। তিনিই এই কলোনিতে প্রথম মাটি খুঁড়ে বাড়ি তোলেন, সেইজন্য পথ-প্রদর্শকের প্রাপ্য খাতির সকলেই তাঁকে দেয়। চাকরিতে থাকতে-থাকতেই তাঁর দুই ছেলে এবং জামাইকে অফিসে বসিয়ে দিতে পেরেছিলেন। তাই এখন পরম নিশ্চিন্ত মনে, তাঁর আজীবনের সাধ দুটি বিষয়ে ঘরে বসে পড়াশোনা করছিলেন। একটি হল—জ্যোতিষ, আর-একটি—প্রেততত্ত্ব।

এখানে কলকাতা থেকে আগত ধনী ব্যক্তিটির একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। তাঁর নাম হল—নিবারণচন্দ্র দালাল। পাটের কারবার করে একদা প্রভূত অর্থ তিনি করেছিলেন, কিন্তু ইদানীং কয়েক বৎসর হল, বাজার মন্দা যাওয়ার দরুন অর্থাগম তেমন সুবিধামতো আর হচ্ছিল না। লেখাপড়া বিশেষ কিছু তিনি জানেন না, কিন্তু সে-কথাটা তিনি প্রাণপণে গোপন রাখবারই চেষ্টা করেন। ইংরেজি

সইটা তিনি নকল করে-করে একরকম 'মুখস্থ' করে ফেলেছিলেন, তার বেশি ইংরেজি লেখা তাঁর হাত থেকে বড়-একটা কেউ দেখেনি। সম্প্রতি তিনি একটি পাহাড়ে জায়গা কিনেছেন, সেখানে 'মাইকা' থাকার সম্ভাবনা। তাঁর প্রায় সমস্ত টাকাই তাতে ফেলেছেন এবং একজন শিক্ষিত ব্যারিস্টার তাঁর পার্টনার হতে সম্মত হয়েছেন। এ-ব্যাপারটা তাঁর দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া আর কেউই জানে না এবং নতুন সঙ্গীর সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসায়ে হাত দিতে তাঁর মনে বড়ই শঙ্কা হচ্ছিল। বিশেষ করে, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেদের তিনি মনে-মনে বড়ই ভয় করতেন। এই সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎ ফলাফল জানবার জন্যই তিনি উদাসীবাবার শরণাপন্ন হয়েছেন। উদাসীবাবাকে তিনি কোনও কথাই প্রকাশ করে বলেননি, কারণ, তিনি একটু পরীক্ষা করে দেখতে চান, সত্য-সত্যই সাধুর দৈবশক্তি কতখানি।

কিন্তু উদাসীবাবা দিনের পর দিন তাঁকে শুধু এড়িয়ে চলেন। হাত-দেখা বা ভবিষ্যৎ-বিচারের কথা উঠলেই উদাসীবাবা একান্ত বিনয়ের সঙ্গে সে-প্রসঙ্গ বাদ দেন।

নিবারণবাবু প্রত্যেকদিন যাওয়ার সময়ে একটি করে গিনি প্রণামী দেন, কিন্তু উদাসীবাবা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করেন না। একান্ত আহত হয়ে তিনি বলেন, আমার কাছে যখন আসবেন, অনুগ্রহ করে শুধুহাতেই আসবেন। আমি ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করি না।

লজ্জিত হয়ে নিবারণবাবু গিনিটি তুলে নেন। কিন্তু সেইসঙ্গে উদাসীবাবার ধার্মিকতা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আরও বেড়ে ওঠে।

অবশেষে একদিন উদাসীবাবা ধরা দিলেন। ঘরে শুধু নিবারণবাবু আর কপিলেশ্বরবাবু ছিলেন। ভেতর থেকে তিনি ঘরের খিল বন্ধ করে দিলেন। বাবার দয়া হয়েছে মনে করে নিবারণবাবুর অন্তর আনন্দে দুলে উঠল। উদাসীবাবা নীরবে তাঁর আসনে বসে, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বালালেন। সেই প্রদীপের সামনে এক আসনে নিবারণবাবুকে বসতে দিলেন।

কপিলেশ্বরবাবু নিবারণবাবুর হাত ধরে বললেন, সত্যিই নিবারণবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক!

প্রসন্ন হাসি হেসে নিরারণবাবু উদাসীবাবার দিকে চেয়ে বললেন, বাবার দয়া কি আপনার ওপর নেই, তা আপনি বলতে পারেন?

কপিলেশ্বরবাবুর বুক থেকে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

নিবারণবাবুকে আসনে বসতে বলে, উদাসীবাবা আদেশ করলেন, আচ্ছা, আপনি কিছুক্ষণ চোখ বুঁজে বসে থাকুন আর ভাবতে চেষ্টা করুন, আপনার কপালের মাঝখানে আর-একটা চোখ আছে!

নিবারণবাবু চোখ বুজে বসলেন, কপিলেশ্বরবাবু নিশ্বাস আটকে ঘরের এককোণে চুপটি করে বসে দেখতে লাগলেন। উদাসীবাবা ধ্যানে বসলেন। তারপর ধ্যানস্থ-অবস্থায় নিবারণবাবুকে একবার স্পর্শ করলেন। সে-স্পর্শে নিবারণবাবুর চোখ খুলে গেল। তিনি আবার চোখ বুঁজে বসবেন কি না, এই ভাবছেন, এমন সময় উদাসীবাবা বললেন, আর প্রয়োজন নেই। এখন বলুন, আপনার কী জানবার দরকার!

নিবারণবাবু অনেক সাধু-সন্ন্যাসী জীবনে ঘেঁটেছেন, তাই তিনি একটু পরীক্ষা না করে, কোনও কথাই প্রকাশ করতে রাজি নন। তাই প্রশ্ন করতে গিয়ে একটু ইতস্তত করছিলেন।

উদাসীবাবা তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে নিজেই শুরু করলেন, আমাকে যাচাই করে নিতে চাস, না? তা ভালো। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, গুরুকেও বাজিয়ে নিবি! কাল সকালে যে কাণ্ডটা ঘটেছে, তার মীমাংসা হয়ে গিয়েছে?

নিবারণবাবু চমকে উঠে সোজা উদাসীবাবার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, তোর ভয় নেই, ছেলেটা মারা যাবে না। হাসপাতাল থেকে সেরে উঠে বাড়ি যাবে।

কপিলেশ্বর বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন, কী ব্যাপার নিবারণবাবু?

উদাসীবাবা অর্ধনিমীলিত চোখে বললেন, নিবারণের বদলে আমিই বলছি...কাল নিবারণ একটা কুলি-কামিনের ছেলেকে মোটর চাপা দিয়েছে।

নিবারণবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, আপনি. আপনি কী করে জানলেন? সত্যি কাল এ-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে...বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

—কিছু ভয় নেই...ছেলেটা সেরে উঠবে...তুমি ইত্যবসরে তার মাকে কিছু টাকা দিয়ে দাও...। তবে...দেখি হাতখানা?

এই বলে তিনি নিবারণবাবুর হাতটা একটু টেনে নিয়ে কী দেখলেন, তারপর ঘাড় তুলে বললেন, তুমি মনে-মনে যে বাসনা ঠিক করে রেখেছ...।

নিবারণবাবুর মুখ শুকিয়ে এল...কপিলেশ্বরবাবু আপনার অজ্ঞাতে কোণ থেকে এগিয়ে এলেন।

—সেটা আমার কথামতো বন্ধ দেওয়া উচিত।

—আপনি কোন বিষয়ে বলছেন?

—তোমার ব্যবসা-সংক্রান্ত বিষয় নয়। তা ছাড়া আর একটা বিশেষ গোপন জিনিস তোমার মনকে ইদানীং তোলপাড় করছে, না?

—গুরুদেব! বলে কাতরভাবে নিবারণবাবু উদাসীবাবার পা জড়িয়ে ধরলেন।

উদাসীবাবা শান্তকণ্ঠে বললেন, কপিলেশ্বরবাবু আমাদের আপনার লোক, তাঁর কাছে লজ্জা করে লাভ নেই...তুমি এই বয়সে বিয়ে করবার যে-সঙ্কল্প করেছ, সেটা পরিত্যাগ করো!

কপিলেশ্বরবাবু নিবারণবাবুর কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ ভায়া, সত্যি নাকি!

শুধু অস্ফুটস্বরে নিবারণবাবু বললেন, সত্যি!

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির জন্যে...।

নিবারণবাবু আর তাঁকে বলতে দিলেন না, দোহাই বাবা! আমি বুঝেছি, আর বলতে হবে না...আমার অপরাধ হয়েছিল, আপনার মতো দৈবজ্ঞ লোককে আমি মনে-মনে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম...আমার অপরাধ নেবেন না।

এই বলে নিবারণবাবু উদাসীবাবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লেন।

তিনি হাত ধরে তাঁকে তুলে বললেন, তার জন্যে তোমাকে কিছুই লজ্জিত হতে হবে না...আজকে আমাদের দেশে ধর্মের নামে যেরকম ভাবে ব্যবসা চলছে, তাতে পরীক্ষা না করে মানুষকে গ্রহণ করাই উচিত নয়। হ্যাঁ, এখন আসল কথা, তুমি যা জানতে চাও...আমিই বলি...কেমন?

নিবারণবাবুর সমস্ত দেহে তখন আনন্দের শিহরন বইছিল...যেন কলম্বাস নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেল...যেন খ্যাপা পাথর বাছতে-বাছতে পরশমণির সন্ধান পেল...।

—তুমি নতুন যে পাহাড়টা কিনেছ, তা নিয়ে তুমি মিঃ দত্তের সঙ্গে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে চলেছ...আমার কাছে জানতে চাও, তা তোমার পক্ষে ভালো হবে, না, মন্দ হবে, এই তো?

নিবারণবাবু যেন সহসা বোবা হয়ে গেলেন...এ-খবর...মিঃ দত্ত...পার্টনারশিপ...এই আশ্রমে বসে-বসে তিনি জানলেন কী করে? তিনি যে কোথায় থাকেন, তা পর্যন্ত কোনওদিন তিনি উদাসীবাবাকে বলেননি! ধন্য! ধন্য!

আনন্দে নিবারণবাবুর মুখ থেকে আর কথা বেরুচ্ছিল না। আনন্দ-গদগদকণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, বাবা, আমি জানতাম...আমি জানতাম...তাই আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেও আমি আপনাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম!

কপিলেশ্বরবাবুর মুখে কথা ছিল না। তাঁর শুধু দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

সহসা তাঁরা দুজনেই দেখলেন যে উদাসীবাবা আবার ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে তিনি বললেন, নিবারণ, এ-কাজে তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আমি দেখছি, বহু বিঘ্ন আছে। তোমাকে বিঘ্ননাশক কিছু ধারণ করতে হবে।

—বলুন, আপনি যা বলবেন, তা-ই করব...যত খরচ লাগে...।

উদাসীবাবা বাধা দিয়ে বললেন, খরচের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই...সে-জিনিস আমার কাছে নেই।

শেষের কথাগুলো শুনে নিবারণবাবু প্রায় কেঁদে ফেলবার মতো হলেন।

—তা আমি শুনছি না বাবা! যত টাকা লাগে, আপনাকে তা জোগাড় করে দিতে হবে!

—আমি বলি শোনো, এ কিন্তু খুব গুহ্য কথা। তোমরা দুজনেই শুধু জানবে। হিমালয় থেকে মৌনীবাবার প্রতিনিধি হয়ে দুজন সাধু এখন ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা এসেছেন অর্থ-সংগ্রহের জন্যে...মানস-সরোবরের ধারে এক বিরাট মন্দির হবে এবং সেখানে এই কলিকালে এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান হবে। এ-সম্বন্ধে আর বেশি কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। সেই সাধুর একজন এখন কাছাকাছিই আছেন, তাঁর কাছে একটি শিকড় আছে, তাঁকে সন্তুষ্ট করে যদি সেই শিকড়টি আনতে পারো...।

—কিন্তু কীভাবে তাঁর দর্শন পাব? আর তিনি আমার সঙ্গে কথাই-বা বলবেন কেন?

—তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি!

এই বলে তিনি উঠে একটা তামার আংটি নিয়ে এলেন। আংটির গায়ে বিচিত্র দাগ কাটা।

—এই আংটিটি তাঁকে দেখালেই তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলবেন, কিন্তু কোনও কথা তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, এ-প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হবে। তিনি কোনও টাকা চাইবেন না, তোমার যা দেবার তা একটা থলিতে করে তাঁর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে শুধু বলবে, প্রভু, বিঘ্নবিনাশী-শিকড়ের জন্যে আমি এসেছি।

—কিন্তু কী অর্থ তাঁকে দেব?

—আজ তোমার বাড়িতে নেমে প্রথম যে সংখ্যা তোমার চোখে পড়বে, সেই সংখ্যার টাকা তাঁকে দিতে হবে! যদি ১ দেখ, একটাকাই দেবে!

—বাবা, সত্যি আপনার দয়ার অন্ত নেই—আমি কী করে আপনার ঋণ শোধ করব? কিন্তু, কোথায় তাঁর দর্শন পাবো?

—তুমি দেবতা সাক্ষী করে এ-সমস্ত ব্যাপার গোপন রাখতে সম্মত আছ তো?

—আমি আপনার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি...।

—সামনেই অমাবস্যা। তুমি সন্ধ্যার পর হুগলির বাঁধাঘাট ধরে কিছুদূর এগুলেই দেখতে পাবে, এক বৃহৎ বটগাছের তলায় গঙ্গার ধারে তিনি বসে আছেন। তাঁর মাথায় অসংখ্য জটা, জটাগুলো ছড়িয়ে তাঁর কোলের ওপর পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে এই আংটি দেখালেই তিনি তোমাকে বসতে বলবেন।

আনন্দ-উদ্বেল হৃদয়ে নিবারণবাবু এবং কপিলেশ্বরবাবু সেদিন গভীর রাত্রিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশ্রম থেকে বাড়ি ফিরলেন। সেই দুটি লোক সেদিন এই মনে করে যে-যাঁর বাড়ি ফিরলেন যে, জগতে তাঁদের দুজনের মতো সৌভাগ্যশালী লোক আর নেই...নইলে এতবড় শক্তিমান সাধুর দর্শন...দর্শন শুধু নয়, তাঁর কৃপা কি সহজে মেলে?

তাঁরা চলে গেলে একজন শিষ্য সদরের দরজা ভেতর থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে এল।

উদাসীবাবা শিষ্যদের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন, ঘটি, সব ঠিক আছে তো?

ঘটি নামধারী ব্যক্তিটি উত্তর দিল, হ্যাঁ কত্তা।

উদাসীবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কত লিখে রেখে এসেছিস?

—আপনি যা বলে দিয়েছিলেন, একের পিঠে তিনটে শূন্য।

—তোর যেমন কাণ্ড, সেবার একটা বড় মক্কেল তোর বোকামিতে হাতছাড়া হয়ে গেল!

—সাদা গেটের গায়ে লাল খড়িতে বড় করে একহাজার লিখে রেখে এসেছি।

—বেশ। ঘণ্টা, তুমি অমাবস্যার দিন বেশ ভালো 'মেক্‌আপ' করে হুগলির ঘাটে গিয়ে বসবে...বাজে কোনও প্রশ্ন করলে, কোনও উত্তর দেবে না। চলে গেলে, ঘাটে নেমে সামনেই নৌকো থাকবে, সেই নৌকোতে চলে আসবে।

ঘণ্টেশ্বর ওরফে ঘটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

উদাসীবাবা আর-একজনকে ডেকে বললেন, পচা, কাল যে-লোকটা এসেছিল তার মোটর-নম্বর টুকে রেখেছিস তো?

—আজ্ঞে—হ্যাঁ।

—নম্বারের ইন্‌ডেক্‌স্‌ওয়ালা মোটর-গাইডটা থেকে তার নাম-ঠিকানা সমস্ত বার করেছ তো?

—ওই নম্বরের গাড়ির যে মালিক, তার নামের সঙ্গে ওর নাম তো মিলছে না! বোধহয় গাড়ি ওর নিজের নয়, চেয়ে নিয়ে চড়ে এসেছিল!

—তবে বাদ দাও। হ্যাঁ, ঘটি, তুমি কিন্তু নিবারণবাবুর পিছু ছেড়ো না! ওকে দিয়ে আমার অনেক কাজ হবে! তুমি যে এত শিগগির-শিগগির ওর সম্বন্ধে information জোগাড় করতে পারবে, তা আশা করিনি। ওর নামে একটা আলাদা ফাইল করেছ তো? সব detail লিখে-লিখে যাবে... memory-র ওপর কিছু ফেলে রাখবে না...আমার এতদিনের সাধনার ফলে আমি এই ব্যবসায়কে এক proper scientific basis-এ এনেছি...দেখবে, পাঁচবছরের মধ্যে আমরা প্রত্যেকেই লক্ষপতি হয়ে গিয়েছি...science আর psychology...ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে, টাকা মারে কে? কিন্তু আমি এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারিনি...সেই তিনটে খুনের ব্যাপারের জন্যে পুলিশ এখনও আমার সন্ধানে ঘুরছে...আমার plan-এর next step হচ্ছে, পুলিশের দু-একজন বড়-বড় কর্তাকে আমাদের আশ্রমে এনে ফেলা। যারা young officer তাদের পারবে না, যাদের একটু বয়স হয়েছে, পেছনের জীবনের জন্যে যাদের মনে একটু অনুতাপ হয়েছে এমন লোক বেছে-বেছে আনতে হবে। তারজন্যে তুমি এখন থেকে শুধু Informarion সংগ্রহ করতে থাকো। এখন তুমি বিশ্রাম করোগে...হ্যাঁ, নতুন যে-লোকটা এসেছে, তাকে একবার ডেকে দিয়ে যাও!

ঘটি আশ্রমের ভেতর থেকে অনুসন্ধান করে খবর দিল যে, শিবু নেই। উদাসীবাবার বিনা অনুমতিতে শিবু মাঝে-মাঝে রাত্রিতে অনুপস্থিত হত। উদাসীবাবার বিশেষ নিষেধ ছিল যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউই আশ্রমের বার হবে না—শিবুর এই অবাধ্যতায় তিনি মনে-মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু একবার তিনি এই আশ্রমের অন্তরঙ্গমহলে স্থান দিয়েছেন, এখন তাকে আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। নতুন লোকটির আসল কী নাম ছিল তা জানবার আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আখড়ায় তার নাম হয়েছিল—শিবু।

আজ প্রায় ছ-মাস হল সে এই দলে যোগদান করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত উদাসীবাবা তাকে আসল মন্ত্রে দীক্ষা দেননি। সেইজন্য তিনি ইদানীং লক্ষ করছিলেন যে, শিবু আর যেন ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। তাই তিনি স্থির করলেন, তাকে আর বসিয়ে না রেখে এবার কাজে দেবেন।

এমনসময় বাইরে অন্ধকারে খুট করে আওয়াজ হল।

উদাসীবাবা ডাকলেন, শিবু!

শিবু কাঁপতে-কাঁপতে উদাসীবাবার সামনে এসে দাঁড়াল। আজ ছ-মাস ধরে এই আখড়ায় থেকে সে বুঝেছিল, উদাসীবাবা ক্রুদ্ধ হলে আর রক্ষা নেই! সে নিজে চোখের সামনে দেখেছে, তারই মতন একজন অবাধ্য লোককে তিনি রাতারাতি নিজের হাতে কেটে ফেলে এই আখড়ার মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন। কিন্তু তার আজীবনের অভ্যেস চুরি করা, বসে থাকতে-থাকতে সে

যেন ক্ষেপে উঠত আর সেই সময় বেরিয়ে গিয়ে এই কলোনির গেরস্তবাড়ি থেকে যা পারত তাই সরাত।

উদাসীবাবার সামনে আসতে তিনি আপাদমস্তক একবার শিবুকে দেখে নিলেন। সে-দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে এল।

চাপা অথচ গম্ভীরকণ্ঠে উদাসীবাবা বললেন, বসো।

শিবু যন্ত্রচালিতের মতো বসল।

—তোমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম, তোমার মনে আছে?

—হ্যাঁ ঠাকুর!

—আমার অবাধ্য হলে তোমার কী পরিণাম হবে, জানো?

—জানি প্রভু!

—বারবার তোমাকে বলেছি, সামান্য একটি ঘটি, কি খানকতক থালা চুরি করবার জন্যে আমি এই বিরাট আয়োজন করিনি! তোমাদের বারবার বলেছি, তোমাদের প্রত্যেককে দিয়েই আমি বড়-বড় কাজ করিয়ে নেব...পুলিশের বাবার সাধ্য থাকবে না যে, তোমাদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায়! কিন্তু আমার কথা না শুনে যদি এখনও এমনি ছিঁচকে চুরি করবার প্রবৃত্তি তোমার থাকে, তবে সেদিন দীক্ষা নেবার সময় মাকালীর খাঁড়া ছুঁয়ে শপথ করেছিলে কেন?

শিবু কাঁপতে-কাঁপতে বললে, ঠাকুর, এবারের মতন আমাকে রক্ষে করুন! আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারছি না!

—আজ কার বাড়িতে হানা দিয়েছিলে?

—আজ্ঞে, কপিলেশ্বরবাবুর বাড়ি।

—কী এনেছ?

—প্রায় খান-তিরিশেক বাসন!

—হতভাগা ছিঁচকে চোর! বলেছি না, যেখানে থাকবে, সে-থানার এলাকার মধ্যে কারও বাড়িতে হানা দেবে না! আমার এই আখড়ার এইটেই হল প্রথম নিয়ম, তোমরা কেউই কখনও কোনও প্রলোভনে এই কলোনির কোনও বাড়ি থেকে একটি খড় পর্যন্ত সরাবে না। বুঝলে? সে-বাসনগুলো কোথায়?

—পাশের বাগানে পুঁতে রেখে এসেছি।

—হতভাগা কোথাকার! যাও, এক্ষুনি গিয়ে বাসনগুলো নিয়ে, সামনে যে ডোবাটা খোঁড়া হয়েছে, ওর পশ্চিম-পাড়ে গর্ত করে রেখে দিয়ে এসো। আর আমি ঘটিকে তোমার কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছি, তার কাছ থেকে শুনে নিয়ো, তোমাকে কী করতে হবে...তবে, এই শেষবার তোমাকে সাবধান করে দিলাম, যেন, কখনও নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করতে যেয়ো না। আমি যা বলে দেব, ঠিক সেইমতো কাজ করে যাবে...যাও এখন!

তিন

এধারে নিবারণবাবু বাড়ি ফেরবার পথে দু-চোখ বার করে খুঁজতে-খুঁজতে চলেছেন, কোথায় কোন সংখ্যা তাঁর চোখে পড়ে। আজ তাঁর মন এক অপূর্ব শক্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এতদিন পরে তিনি একজন সত্যিকারের দৈবশক্তিসম্পন্ন লোকের সন্ধান পেয়েছেন। এ-সৌভাগ্য কি সকলের ভাগ্যে ঘটে!

মোটর তাঁর বাড়ির দরজায় থামতেই তিনি গাড়ি থেকে নেমে ফটকে ঢুকতে দ্যাখেন, কী আশ্চর্য! দেওয়ালের গায়ে কী একটা সংখ্যা লেখা! তিনি কাছে গিয়ে ভালো করে দেখলেন, ১০০০।

সংখ্যাটা দেখে তাঁর মন হঠাৎ একটু মুষড়ে পড়ল...একেবারে একহাজার টাকা! কিন্তু তার পরক্ষণেই তাঁর মনে হল, কিন্তু এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! কোথা থেকে তাঁর বাড়ির দেওয়ালে এই সংখ্যা এল? আর এইরকম যে একটা সংখ্যার দেখা তিনি পাবেন, উদাসীবাবা তা জানলেনই-বা কী করে? এই অতি অল্প সময়ের মধ্যে আর কেই-বা তা জানবে? তিনি এসেছেন মোটরে...নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভগবানের কোনও শুভ ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। তিনি যতই ভাবতে লাগলেন, ততই তাঁর মন বিস্ময়ে ভরে যেতে লাগল এবং সেইসঙ্গে উদাসীবাবার অদ্ভুত দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ নিদর্শন পেয়ে তিনি মনে-মনে স্থির করলেন, জগতে আর যাই-ই হোক, তিনি উদাসীবাবাকে ছাড়ছেন না! হাজার টাকা তাঁর কাছে এমন আর কী? যদি সন্ন্যাসীদের কাজে তাঁর এই টাকাটা লাগে, সে তো তাঁর সৌভাগ্যের কথা! তিনি স্থির করলেন, কালই তিনি হুগলি যাত্রা করবেন।

পরের দিন সকালের খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি বাড়ি থেকে রওনা হবার জন্যে যেই বেরিয়েছেন, অমনি একদল কলেজের ছেলে তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল। তাদের দলপতিরূপে যে যুবকটি এগিয়ে নিবারণবাবুর সঙ্গে কথা বলতে এল, তাকে তোমরা বেশ ভালো করেই চেনো...'বিজয়-অভিযানে' রাঁচীর কাঁকর-ভরা পথে তাকে তোমরা দেখেছ—বিনয়...তাকে নিশ্চয়ই তোমরা ভোলোনি!

বিনয় নিবারণবাবুর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সম্পর্কে সে নিবারণবাবুর ভাইপো। নিবারণবাবুকে সে কাকা বলেই ডাকে। আজ পাঁচদিন ধরে ছেলের দল একটা ক্লাব তৈরি করবার চাঁদার জন্যে নিবারণবাবুর পিছু-পিছু ঘুরছে, কিন্তু কিছুতেই নিবারণবাবুকে তারা ঘায়েল করতে পারছিল না। তাই তারা আজ বিনয়কে সঙ্গে ধরে নিয়ে এসেছে। তারা নিবারণবাবুর সঙ্গে বিনয়ের আত্মীয়তার কথা জানত এবং তারচেয়ে বেশি জানত যে, বিনয়কে ফেরত দিতে পারে এমন লোক খুব কমই আছে।

নিবারণবাবুকে দেখেই বিনয় সেই পথের মাঝখানে তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্যে ঘাড় নিচু করল। সে বেশ ভালো রকমই জানত যে, কঠিন সংসারী লোকদের মন নরম করবার পক্ষে ভক্তির এই রসায়নের চেয়ে বড় জিনিস আর কিছু নেই।

নিবারণবাবু বিনয়কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং নিজে লেখাপড়া জানতেন না বলে, এই ভাইপোটির লেখাপড়ার খ্যাতি শুনে তিনি মনে-মনে একরকম তাকে শ্রদ্ধা করতেন।

বিনয়কে হাত ধরে তুলে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, আহা বিনয়, করো কী! তোমার কাণ্ডই আলাদা! দেখা হলেই কি পায়ের ধুলো নিতে হয়? তুমি দেখছি, আজকালকার ছেলেদের মুখ পোড়ালে!

বিনয় অট্টহাস্য করে উঠল—।

—কিন্তু কাকাবাবু, বুঝছেন তো, আমরা কেন এসেছি...আজ আর শুধুহাতে ফিরছি না।

—দেখ বাবা, সত্যি কথা বলতে কি, আজকালকার ছেলে-ছোকরারা কোথায় কী ক্লাব করবে, তাকে টাকা দিয়ে কি শেষকালে ফ্যাসাদে পড়ব?

—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কাকাবাবু, এর মধ্যে যে আমি আছি!

—কিন্তু বাবা, এখন আমার বড্ড তাড়াতাড়ি...আমাকে একবার বিশেষ দরকারে এক জায়গায় যেতে হবে।

বিনয় দেখল, এরকম করে ছেড়ে দিলে চলবে না। সে বলে বসল, বেশ তো, আপনার গাড়িতেই আমি যাচ্ছি...চলুন, আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।

পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখে নিবারণবাবু বললেন, তা এসো, এ-ট্রেনটা ছাড়বার আর বেশি সময় নেই!

সঙ্গীদের আশ্বাস দিয়ে বিনয় নিবারণবাবুর সঙ্গে মোটরে চড়ে বসল।

গাড়ি ছাড়তেই নিবারণবাবুর মাথায় হঠাৎ যেন একটা কী মতলব এল। তিনি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা বিনয়, তোমার কি খুব তাড়াতাড়ি আছে?

—কেন বলুন তো কাকাবাবু?

—আমি যেখানে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে যাবে?

সকাল থেকেই নিবারণবাবু ভাবছিলেন যে, একা না গিয়ে যদি কাউকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারতেন, তা হলে ভালো হত। একে তো সঙ্গে অতগুলো নগদ টাকা, তার ওপর রহস্যময় ব্যাপারে নিজেকে লিপ্ত করতে কেমন যেন তাঁর মনে একটা অজানা আশঙ্কাও জাগছিল। বিশেষ করে তিনি নিজে যে একজন খুব সাহসী লোক, তা মোটেই ছিলেন না। তাই হঠাৎ বিনয়ের দেখা পেয়ে তাঁর বড় ইচ্ছা হল যে, বিনয়কে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। কাল সন্ধ্যাবেলা থেকে সেই ঘটনাটা কাউকে বলতে না পেয়েও তাঁর মনের ভেতর কেমন যেন পাক খাচ্ছিল। তাই তিনি বিনয়কে বিশেষ অনুরোধ করে বললেন, চলো, একটু না-হয় বেড়িয়েই আসবে।

নিবারণবাবুর আগ্রহ দেখে বিনয় জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু, কোথায় যাচ্ছেন, তা তো এখনও পর্যন্ত জানতে পারলাম না—দিল্লি, না লাকনাউ, না সিমলা, কতদূর যেতে হবে আমাকে, সেটা না জেনে কী করে 'হ্যাঁ' বলি!

—না হে বাপু, দিল্লি-সিমলে নয়।

তখন তিনি বিনয়কে সবকথা খুলে বললেন।

—কিন্তু মাপ করবেন কাকাবাবু, আপনাকে আমি একজন বেশ পাকা হিসেবী লোক বলে জানতাম...আজ দেখছি আপনিও...।

—তুমি বুঝবে না হে! তোমার মতন বয়েসে আমিও এসব কিছু তোয়াক্কা করতাম না। কিন্তু আজ আর আমি অবিশ্বাস করতে পারি না!

—আমাকে একবার আপনার সেই সাধুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

—বেশ তো!

নতুন কিছু, মজার কিছু পেলেই বিনয়ের মন তাতে আপনা থেকেই সাড়া দিয়ে উঠত। তা ছাড়া টাকাটা তো তাকে আদায় করতে হবে! সে আর বিশেষ আপত্তি না করে নিবারণবাবুর সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেল।

হুগলির বাঁধাঘাটের কাছে এসে গাড়িটাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে গঙ্গার পাড় ধরে তাঁরা দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। তখন অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, পথে লোকজন কেউই নেই। মাঝে-মাঝে গঙ্গার বুক থেকে মাঝিদের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে।

নিবারণবাবু বিনয়কে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে বললেন, দেখো বাবা, তুমি যেন কোনও কথা বোলো না!

—আগে দেখুন, আপনার সেই সাধুর দেখা আপনি পান কি না?

কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁরা দেখলেন, সামনে গঙ্গার ধারে যেন ধুনির আলো জ্বলছে। আবেগে নিবারণবাবুর বুক দুলে উঠল। বিনয়কে ডেকে তিনি বলে উঠলেন, দেখছ, নিশ্চয়ই ওখানে তিনি আছেন। উদাসীবাবার কথা কখনও মিথ্যে হতে পারে না।

সরকারি পথ থেকে একটু সরে গঙ্গার পাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখেন যে, এক বটগাছের তলায় ধুনি জ্বেলে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন।

নিবারণবাবু বিনয়ের হাত ধরে সেই ধুনির সামনে মাটিতে গিয়ে নীরবে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইলেন।

সন্ন্যাসী চোখ মেলে চাইতেই নিবারণবাবু তাঁর হাত থেকে উদাসীবাবার দেওয়া সেই আংটিটি তাঁর পায়ের কাছে রেখে গদগদকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমি এসেছি।

সন্ন্যাসী নীরবে আংটিটি তুলে নিয়ে ধুনির আগুনের আলোয় বেশ করে দেখলেন, তারপর স্মিতমুখে নিবারণবাবুর দিকে চেয়ে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। নিবারণবাবু সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। বিনয় দেখল, এক্ষেত্রে নিস্পৃহ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ইচ্ছা না থাকলেও সে ঘাড় হেঁট করে শুধু নমস্কার করল।

উদাসীবাবার নির্দেশমতো নিবারণবাবু বললেন, বাবা, বিঘ্নবিনাশী শিকড়ের জন্যে আপনার কাছে এসেছি...যৎসামান্য প্রণামী এনেছি, যদি দয়া করে নেন—।

এই বলে কোটের ভেতরের পকেট থেকে গিনি-ভরা একটা থলে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রাখলেন। বিনয়ের একবার মনে হল, জোর করে সে-থলিটা যেন সেখান থেকে সে তুলে নেয়। অকারণে এতগুলো টাকা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় লোকটা এই অজানা লোকটার পায়ের তলায় ঢেলে দিল? কিন্তু নিবারণবাবুর কাছে সে কথা দিয়েছিল, কোনও কথাই সে বলবে না। তাই নীরবে সে সমস্ত ব্যাপারাটা শুধু দেখে যেতে লাগল।

সন্ন্যাসী কোনও কথা না বলে পায়ের কাছে থলিটা একবার দেখলেন। তারপর তেমনি নীরবে পাশ থেকে একটা বড় থলি তুলে নিয়ে, তার মুখটা খুলে নিবারণবাবুকে ইঙ্গিত করলেন যে, তাঁর থলিটা এই থলির ভেতরে ফেলে দিতে। নিবারণবাবু বুঝলেন, সন্ন্যাসী নিজের হাতে সেই টাকা স্পর্শ করতে চান না।

সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতমতো নিবারণবাবু তাঁর থলিটা সন্ন্যাসীর থলির ভেতর ফেলে দিলেন। গিনিগুলো ঠনঠন শব্দ করে উঠল। বিনয়ের বুকে কে যেন তখন হাতুড়ির ঘা মারছিল।

থলিটা তেমনি পাশে ফেলে রেখে সন্ন্যাসীঠাকুর ধুনির ছাই থেকে আঙুলে একটু ছাই তুলে নিবারণবাবুর কপালে ঘষে দিলেন। নিবারণবাবুর সর্ব-দেহে যেন রোমাঞ্চ জেগে উঠল। তিনি নিজে বিনয়ের ঘাড়টা ধরে সন্ন্যাসীর দিকে এগিয়ে দিলেন। বিনয়ের কপালেও সন্ন্যাসীঠাকুর ছাইয়ের টিপ পরিয়ে দিলেন—সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ।

তারপর মাথার জটা থেকে একটা ছোট্ট শেকড় বার করে নিবারণবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, ভালো দিন দেখে ডান হাতে পরে থাকবি বেটা...কেউ আর তোকে কিছু করতে পারবে না......যা বেটা, তোর বরাৎ খুব ভালো!

বিনয় কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় নিবারণবাবু তাকে বাধা দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন, বাবা, আপনাকে আর বিরক্ত করব না, এবার আমরা যাই!

—জয়স্তু! বলে সন্ন্যাসী তেমনি হাত তুলে আশীর্বাদ জানালেন।

পাছে বিনয় কোনও গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলে, নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। ঘাটে তখনও গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল। বিনয় সারাপথ গুম হয়ে বসে রইল। নিবারণবাবু আপনার মনে কত কথা বলে যেতে লাগলেন, তার একটারও উত্তর বিনয়ের কাছ থেকে এল না। শেষে নিবারণবাবু বললেন, বাবা বিনয়, তুমি ভাবছ, এইসব সন্ন্যাসীরা ধর্মের ভোল দেখিয়ে আমাদের ঠকিয়ে নিচ্ছে! কিন্তু তা ঠিক নয়। আমাদের মুনি-ঋষিরা মূর্খ ছিলেন না। একদিন তুমিও জানতে পারবে যে, মানুষের শক্তির বাইরে একটা দৈবশক্তি আছে, তার ক্রিয়া আমরা সাধারণ লোকে বুঝতে পারি না। পারেন সাধু-সন্ন্যাসীরা।

বিনয় 'হ্যাঁ', 'না',—কোনও কথাই বলল না।

বাড়িতে ফিরে এসে প্রাপ্য চাঁদা আদায় করে চলে যাওয়ার সময় বিনয় শুধু বললে, কিন্তু কাকাবাবু, আমাকে একদিন আপনার সেই উদাসীবাবার কাছে নিয়ে যেতে হবে।

নিবারণবাবু সম্মতি জান্যলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে বললেন, কিন্তু বাবা, সন্দিগ্ধ মন নিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর দর্শনে যেতে নেই।

নিবারণবাবুর মনের কথা বুঝতে পেরে বিনয় বললে, ভয় নেই কাকাবাবু, আমি সেখানে গিয়ে এমন কোনও কাজ করব না, বা কথা বলব না, যাতে আপনার মনে আঘাত লাগতে পারে।

চার

এধারে ভোর না হতেই কপিলেশ্বরবাবু হন্তদন্ত হয়ে উদাসীবাবার আশ্রমে এসে উপস্থিত।

অত সকালবেলায় সেইভাবে কপিলেশ্বরবাবুকে আসতে দেখে উদাসীবাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে, কপিলবাবু! এত সকালে আপনি? আপনার মুখ-চোখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, আপনার কী যেন হয়েছে!

কপিলেশ্বরবাবু রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত বাসন আমার চুরি গিয়েছে। কাল বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় এসেছিলেন, তাই ভালো-ভালো পুরোনো বাসনগুলোও বার করা হয়েছিল...সকালে দেখছি সব চুরি হয়ে গিয়েছে!

—এখন উপায়?

—আপনি তো সর্বজ্ঞ, প্রভু!

উদাসীবাবা হেসে উঠলেন। বললেন, বসুন! বসুন!

—বসব না। একবার থানায় তো খবরটা দিয়ে আসি! শুধু আমার বাড়ি নয়, আজ ক'দিন ধরেই এই কলোনির কারুর না কারুর বাড়ি থেকে চুরি যাচ্ছে...ব্যাপার মোটেই সুবিধের নয়।

—এসব হচ্ছে বাড়ির চাকর-বাকরদের কাজ। আজকাল খুব সাবধানে চাকর-বাকর রাখতে হয়।

—তা যা বলেছেন! কিন্তু আমার একেবারে কলাপাতার ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছে!

উদাসীবাবা হেসে বললেন, সেদিন আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক এসেছিলেন আমার কাছে, এই একই ব্যাপার। নাছোড়বান্দা—বলেন, চোর কোথায় বলে দিতে হবে। আমি যেন গোয়েন্দা...।

বলেই উদাসীবাবা অট্টহাস্য করে উঠলেন। কিন্তু তিনি যে-উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথাগুলি বললেন, কপিলেশ্বরবাবুর মনে গিয়ে তা অব্যর্থ লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, বাবা, আমাকেও উদ্ধার করতে হবে। অনেকগুলো বাসন। শুনেছি, আপনারা চেষ্টা করলে সব বলে দিতে পারেন!

—বসুন! বসুন! কপিলেশ্বরবাবু, অত ব্যস্ত হবেন না।

—আমি আপনার প্রতিবেশী। আপনি হলেন একরকম এ-পাড়ার মাথা। আপনি থাকতে যদি এসব অনাচার হয়, সে আপনারই অসম্মান!

উদাসীবাবা তেমনি স্মিতহাস্যে কপিলেশ্বরবাবুকে বললেন, বসুন! বসুন! দেখি আপনার হারানো জিনিসের উদ্ধারের কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না!

এই বলে তিনি আশ্রমের একজনকে ডেকে বললেন, নকড়ি, খড়িটা একবার নিয়ে আয় তো বাবা!

নকড়ি খড়ি নিয়ে এল, উদাসীবাবা একটা কুশাসন পেতে কপিলেশ্বরবাবুকে বললেন, আপনার বাড়ির দরজা কোনমুখো বলুন তো?

—আজ্ঞে, পূর্বদ্বারী।

—বেশ, তা হলে পূর্বদিকে মুখ করে এই আসনে বসুন।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন কপিলেশ্বরবাবু সেই আসনে পূর্বমুখী হয়ে বসলেন। উদাসীবাবাও তাঁর সামনে আর-এক আসনে বসলেন। খড়িটা নিয়ে মাটিতে তিনি একটা ছক কাটলেন।

—আপনার এখন বয়স হল কত?

—৫৭।

—ভালো! কোন বারে আপনার জন্ম?

—শনিবার।

উদাসীবাবা মনে-মনে কী হিসেব করে ছকের তিনটে ঘরে তিনটে সংখ্যা বসালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বলছেন কাল চুরি গিয়েছে—কাল গিয়েছে সোমবার।

তারপর আবার মনে-মনে কী হিসেব করে আরও দুটো সংখ্যা বসালেন।

—এইবার চোখ বুঁজে আপনি একটা ফুলের নাম মনে করুন। প্রথমেই যে ফুলটার চেহারা মনে পড়বে, সেইটে বলবেন—বলুন?

—পদ্ম।

—ভালো। এইবার আপনার কপালটা একটু তুলুন দেখি? হ্যাঁ...এক, দুই, তিন, চার...।

উদাসীবাবা কপাল দেখে কী গুনলেন, তিনিই জানেন। তারপর আবার মনে-মনে কী হিসেব করে নিয়ে ছকের দুটি খালি ঘরে সংখ্যা বসালেন। তারপর সংখ্যাগুলো মনে-মনে বোধ হল যেন যোগ করলেন। কপিলেশ্বরবাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু দেখছিলেন, বৈজ্ঞানিক যেরকম বিস্ময়ে নতুন কোনও গ্রহের আবির্ভাব আকাশের দিকে চেয়ে দেখেন। তারপর কিছুক্ষণ চোখ বুজে কী যেন জপ করলেন। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, ১,২,৩,৪। ৩ যখন বেরিয়েছে... তখন পশ্চিম...বাঁ-দিকের ঘরে আছে পাঁচ...পাঁচ হল...আচ্ছা কপিলেশ্বরবাবু, আপনার বাড়ির পশ্চিমদিকে কি কোনও পুকুর আছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে।

—বেশ। আমি লোক দিচ্ছি—এই শিবু, তুই কপিলেশ্বরবাবুর সঙ্গে যা দিকি! আপনি এখুনি সেই পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গিয়ে খোঁজ করুন—যে চুরি করেছে, সে সেইখানেই আপনার বাসনগুলো পুঁতে রেখে এসেছে...যান...বিলম্ব করবেন না।

কপিলেশ্বরবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়ালেন। শিবু তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

পুকুরের পশ্চিম পাড়ে আসতেই শিবু বলে উঠল, এই দেখুন কত্তা, পায়ের দাগ...এখানকার মাটিটা খোবলানো রয়েছে...নিশ্চয়ই এখানে আছে।

শিবু হাতে করে একটা লোহার শাবল নিয়ে এসেছিল। দু-এক কোপ বসাতেই পুকুরের পাড়ের নরম মাটি উঠে এল। এবং তার ভেতর ঠং করে আওয়াজ হল।

কপিলেশ্বরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, ওই...ওই...

শিবু হাত দিয়ে একে-একে সেই বাসনগুলোকে কাদার ভেতর থেকে বার করল। তখন যদি কেউ কপিলেশ্বরবাবুর মুখের চেহারা দেখত, তা হলে বুঝতে পারত, ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর ডিউক-অফ-ওয়েলিংটনের মুখের চেহারা কীরকম হয়েছিল...বুঝতে পারত, যেদিন আর্কিমিডিস প্রথম 'ইউরেকা' বলে উঠেছিলেন, সেদিন তাঁর মুখের চেহারা কীরকম ছিল!

কপিলেশ্বরবাবুর অন্তরাত্মা, দেহের সমস্ত লোমকূপ যেন বলছিল ইউরেকা, ইউরেকা, আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি!

এ শুধু হারানো বাসন ফিরে পাওয়ার আনন্দ নয়, এ-আনন্দের সঙ্গে জড়ানো রয়েছে, আর-এক বৃহত্তর আনন্দ, উদাসীবাবার মতো একজন মহাঋষির সন্ধান পাওয়ার আনন্দ! শুধু সন্ধান পাওয়া নয়, তার স্নেহ পাওয়ার সুদুর্লভ সৌভাগ্য! ধন্য আর্যঋষি! ধন্য তোমার মন্ত্রতন্ত্র! ধন্য উদাসীবাবা!

কপিলেশ্বরবাবু তাঁর বয়স ভুলে, ভাবে গদগদ অবস্থায় একরকম নাচতে-নাচতে সোজা উদাসীবাবার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়লেন।

দ্যাখেন, তাঁর আগে...ঠিক তাঁরই মতো অবস্থায় নিবারণবাবুও এসে তাঁর শ্রীচরণে পড়েছেন।

দুজনের মুখ থেকে শুধু অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে বেরুল, জয় গুরু! জয় গুরু!

সেই জোড়া-ভক্তের পেছনে দাঁড়িয়ে, দরজার গায়ে হেলান দিয়ে, একটি তরুণ যুবক নির্বাক-বিস্ময়ে সেই দৃশ্য দেখছিল—সে বিনয়।

পাঁচ

মিঃ গুপ্ত সামান্য সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে পুলিশ-বিভাগে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু নিজের 'মেরিট'-এ তিনি এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শহর থেকে চুরি, ডাকাতি এবং গুণ্ডামি যে তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় দূর হয়েছে, এ-কথা ভেবে তিনি নিজে যেমন গর্ব অনুভব করেন, শহরের গণ্যমান্য লোকেরাও তেমনি তাঁর প্রশংসাও করেন। তাঁর কাজের পুরস্কারস্বরূপ সরকার থেকে তিনি 'রায়সাহেব' খেতাব পেয়েছেন এবং এ-কথা প্রায় জানাজানি হয়ে গিয়েছে যে, সামনের রাজার জন্মতিথি উপলক্ষে উপাধি-বিতরণ উৎসবে 'রায়বাহাদুরের' তালিকায় তাঁর নাম আছে।

সম্প্রতি একটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিলেন। আজ প্রায় বছরখানেক হতে চলল, তিনি দুটো বড়-বড় খুনের কোনওই হদিস বার করতে পারছিলেন না। একটি দুর্ঘটনা ঘটে ট্রেনে...সেকেন্ড ক্লাস কামরায়। এক ধনী মাড়োয়ারি একাকী সেই কম্পার্টমেন্টে আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে দশহাজার টাকার কারেন্সী নোট ছিল। ট্রেন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে দেখা গেল যে, তাঁর মৃতদেহ গাড়িতে পড়ে আছে...কে বা কারা তাঁকে যেন গলা টিপে মেরে ফেলেছে। ট্রেনের গদির একধারে ধুলো জমেছিল, সেই ধুলোর ওপর শুধু একটা হাতের ছাপ মাইক্রস্কোপের সাহায্যে পাওয়া গিয়েছিল এবং সেই ছাপের X-Ray ফটো নেওয়া হয়। তাতে দেখা যায়, লোকটার হাতে পাঁচটা আঙুলের বদলে কড়ে আঙুলের পাশে আর-একটা ছোটো আঙুল আছে। যে-মাড়োয়ারিটি নিহত হয়েছিল, এ তার হাতের ছাপ নয়, কারণ তার কোনও হাতেই কোনও বাড়তি আঙুল ছিল না। নিশ্চয়ই এ আততায়ীদের মধ্যে কারুর হাতের ছাপ। দ্বিতীয় খুন, এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঘটে। তার কিছু বিবরণ জানতে পারা যায়। দুপুরবেলা, ফিরিওয়ালার সাজে একদল লোক বাড়ির ভেতর ঢুকে, দরজায় চাবি দিয়ে, মেয়েদের গা থেকে এবং সিন্দুক থেকে সমস্ত গয়না চুরি করে নিয়ে যায়। সেই বাড়িতে তখন একটি ছেলে রোগে শয্যাশায়ী ছিল। ডাকাতরা তার ঘরে এসেও উৎপাত করে এবং সে চেঁচাবার উপক্রম করলে, ক্লোরোফর্ম দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়। ছেলেটি সেই উৎপাতের ফলে মারা যায় এবং মৃত্যুকালে সে যে-জবানবন্দী দিয়ে যায়, তাতে সে বলে যে, যে-লোকটা তার মুখ চেপে ধরেছিল, তার হাতে যেন ছ'টা আঙুল ছিল। এই দুটি ঘটনার মধ্যে মাত্র ওইটুকু যোগসূত্র ছিল। কিন্তু মিঃ গুপ্ত এত চেষ্টা করেও আততায়ীদের কোনও সন্ধান বার করতে পারেননি। সন্দেহক্রমে কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণাভাবে পুলিশ তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কারুরই কোনও হাতে পাঁচটা ছাড়া ছ'টা আঙুলের কোনও চিহ্নই ছিল না। এই দুটি ঘটনার তদন্ত নিয়ে আজ একবছর ধরে মিঃ গুপ্ত কম পরিশ্রম করেননি, কিন্তু সে-অনুপাতে কোনও ফললাভই তিনি করতে পারেননি। এই পরাজয়ে ভেতরে-ভেতরে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ও দুঃখিত হয়েই ছিলেন, কারণ পুলিশ-কর্মচারী হিসেবে তাঁর গোপন গর্বে এই দুটি ঘটনা কুশাঙ্কুরের মতো বিঁধত।

তাঁর কর্মজীবনের পিছনে কিন্তু ছিল তাঁর সাংসারিক জীবনের নিদারুণ ব্যথা।

বাইরের দিক থেকে পদোন্নতি হলেও মিঃ গুপ্তের মনে কিন্তু একতিল শান্তি ছিল না। যেদিন তিনি প্রথম চাকরিতে 'লিফ্‌ট' পেলেন, সেদিন তাঁর স্ত্রী শয্যাশায়ী হন এবং বহুদিন রোগশয্যায় শক্তিহীনভাবে থেকে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তার পরের বছরেই তাঁর প্রথম কন্যা বিধবা হয়ে তাঁরই আশ্রয়ে চলে আসে। পুলিশের কাজের মধ্যে তিনি প্রথম জীবনে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দুই ছেলের লেখাপড়ার দিকে কোনও নজরই দিতে পারেননি। বড় ছেলেটি দুবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করে বাড়িতে বসেছিল। ছোট ছেলেটির ওপর তাঁর সব ভরসা গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দৈবের নির্মম আঘাতে সেই ছেলেটিই আজ দু-বছর হল টাইফয়েড রোগে মারা যায়। পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাস নেবেন ঠিক করেন এবং সেইখান থেকেই তিনি জীবনের শেষ আশ্রয়স্বরূপ ধর্মকাজে মন দেন। যেখানেই

যে সাধু-সজ্জনের সন্ধান পেতেন, আকুল অন্তরে সেখানে গিয়ে পড়তেন, যদি তাঁর কৃপায় অন্তরে কিছু শান্তি তিনি পান। একদিন নাস্তিক বলে নিজেকে জাহির করতে তিনি গর্ব অনুভব করতেন এবং আচার-অনুষ্ঠান দেখলেই নাক সেঁটকাতেন। কিন্তু আজ দৈবের উপর্যুপরি নিষ্ঠুর আঘাতে তিনি প্রাণপণে আবার সমস্ত অনুষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরেছেন, ডুবে-যাওয়া লোক যেমন স্রোতের মধ্যে যা পায় তা-ই আঁকড়ে ধরতে যায়।

এহেন মানসিক অবস্থায় তিনি দুটি 'কেস' নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। কিছুতেই সে দুটি খুনের কোনও হদিসই তিনি বার করতে পারছিলেন না, অথচ উপর থেকে এই নিয়ে রীতিমতো চাপ তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। তার ওপর কয়েকমাস ধরে শহরে এবং শহরের আশেপাশে এক নতুন ধরনের ডাকাতি শুরু হয়েছে, ডাকাতির বিবরণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, একদল লোক রীতিমতো দল বেঁধে এই কাজ করে চলেছে এবং সেই দলের মাথা হিসেবে একজন রীতিমতো মাথাওয়ালা লোক আছে।

এইসব ব্যাপার নিয়ে সেদিন তাঁর অফিস-ঘরে বসে তিনি ভাবছেন, এমনসময় তাঁর টেলিফোন বেজে উঠল—।

—হ্যাঁ, বলুন। ডাকাতি হয়েছে...? চাকরের ওপর সন্দেহ করছেন? আপনি এখুনি থানায় চলে আসুন!

কয়েকমিনিট পরে থানায় একটি মোটর এসে দাঁড়াল। মোটর থেকে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি থানার ভেতর ঢুকলেন। পুলিশের লোকেরা তাঁকে মিঃ গুপ্তের ঘরে নিয়ে গেল।

—বসুন! হ্যাঁ, বলুন দেখি, ব্যাপারটা কী?

—আজ মাস-তিনেক হল আমার বাড়ির সামনে একটা লোক শুয়েছিল। দু-দিন নাকি তার খাওয়া হয়নি। লোকটির কথাবার্তা শুনে আর তার হাবভাব দেখে, তার ওপর আমার দয়া হল। সে চাকরি চাইতে আমি তাকে বাড়িতে থাকতে দিলাম। সে শুধু ছেলেমেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেত, টিফিনের সময় তাদের খাবার নিয়ে যেত। কিন্তু অবসর সময়ে, দেখতাম, সে অন্য চাকরদেরও কাজ করে দিত। চাকরগুলোর মজা হল। তারা শক্ত কাজ পড়লেই লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিত। লোকটা বিনা আপত্তিতে হাসিমুখে তাদের সব কাজ করে দিত। দেখতে-দেখতে সে বাড়ির সকলের প্রিয় হয়ে উঠল। তার ব্যবহার দেখে, তার কাজকর্ম দেখে, আমারও মনে আনন্দ হল। সত্যি-সত্যি একটা ভালো চাকর পাওয়া গেল, টাকাপয়সার ব্যাপারেও লক্ষ করতাম, একটা আধলা সে এদিক-ওদিক করত না। মাইনের জন্যে কোনওদিন কিছু বলত না। এইভাবে লোকটা বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে দরকারি লোক হয়ে উঠল।

—তারপর, আসল কথাটা বলুন।

—কাল রাত্তিরে আমার বাড়িতে সব চুরি হয়ে গিয়েছে এবং এমন অদ্ভুত উপায়ে হয়েছে যে, জানতেও পারিনি। আমরা সকালে উঠে দেখি, যেসব দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকত, সেইসব দরজার সামনে খড়ি দিয়ে দাগ কাটা! এমনভাবে দাগ কাটা যে, সেই দাগ ধরে কাটলেই ভেতর থেকে তালাটা খুলে যাবে...এইরকম নানা সাঙ্কেতিক চিহ্ন সিন্দুকের গায়ে, দেরাজে সর্বত্র রয়েছে।

—ঠিক এইরকম আরও দুটো কেস এসেছে। এরা একজনকে প্রথমে চাকর সাজিয়ে বাড়িতে ঢোকায়। সে-লোকটা গৃহস্বামীর বিশ্বাস উৎপাদন করিয়ে বাড়ির গোপন কলকব্জা সব জেনে নেয়, কোন তালার কীরকম চাবি তার ছাঁচ পর্যন্ত তৈরি করে ফেলে, তারপর ডাকাতির দিন, সেইসব জায়গায় এমনভাবে সাঙ্কেতিক চিহ্ন এঁকে দিয়ে রাখে যে, বাইরে থেকে অন্য লোক এসে যন্ত্র দিয়ে একঘণ্টার কাজ পাঁচ মিনিটে হাসিল করে পালায়। আপনার বাড়িতে সেই দলের লোকেরাই কাল উৎপাত করেছে।

—তা না-হয় বুঝলাম, কিন্তু উপায় কী? আমার যে যথাসর্বস্ব কাল চুরি হয়ে গিয়েছে...আমার আজীবনের সঞ্চিত সব...।

—লোকটির নাম-ঠিকানা কিছু জানা আছে?

—নাম বলেছিল পাঁচু! ওই পর্যন্তই! বাড়ি বলেছিল বীরভূম জেলায় কোনও গ্রামে, সে আর কে খোঁজ করতে গিয়েছিল বলুন?

—এখানে তার জানাশোনা কেউ আছে, আপনার চাকরেরা জানে?

—সে বড় একটা কোথাও যেত না! মাঝে-মাঝে গঙ্গাস্নান করতে যেত...এই পর্যন্ত। তা ছাড়া তো কেউ কিছু জানে না।

—তার জামা-কাপড় কিছু পড়ে আছে?

—যে-বাক্সটায় চাকরদের ঘরে তার জিনিসপত্র থাকত, সে-বাক্সটা খালি!

—চলুন, একবার দেখে তো আসি!

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে উদাসীবাবার আখড়ায় উদাসীবাবার সমস্ত ভক্তরা এক জায়গায় হয়েছে। উদাসীবাবা তাদের সকলকে ডেকে বলছেন, কিন্তু এই সময়ই তোমাদের সবচেয়ে সাবধানে থাকতে হবে...দল ভেঙে বা দল ছেড়ে কেউ কিছু করতে যেয়ো না, তা হলেই মরবে...মনে রেখো, কলিকালে দলই হল শক্তি। আজ যে-জন্যে তোমাদের সকলকে একসঙ্গে ডেকেছি, বলছি শোনো।

শেষ কাজটা তোমরা যেভাবে হাসিল করেছ, তাতে সত্যি তোমাদের প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু এ-পথ আর নয়। বিশেষ করে ঘণ্টাকে আর আমি কিছুদিন বেরুতে দেব না...ঘণ্টা, তুমি সর্বদাই ওই দাড়ি-গোঁফ পরে থাকবে...আজ থেকে তোমার কাজ হবে আমার পাশে-পাশে থাকা...হ্যাঁ, এবার থেকে আমরা নতুন কায়দায় কাজ আরম্ভ করব। আমার এই 'স্কীম' সফল হলে, এখানকার ডেরা আমরা তুলে ফেলব...কিন্তু তার আগে আমি প্রথমে একটা কাজ করতে চাই। সেদিন যে-ছোকরাটা এসেছিল, তার সম্বন্ধে তুমি কী খবরাখবর এনেছ, গণেশ?

—ছেলেটির নাম বিনয়। আমাদের নিবারণবাবুর আত্মীয়। কলেজের পড়া তার শেষ হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু ছেলেটি কী করে?

—খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি তাতে ছেলেটিকে খুব সাংঘাতিক বলে মনে হয়। শুনলুম নাকি, সে একজন শখের গোয়েন্দা।

—তার শখ আমি দু-দিনে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। ভেবেছিলাম, আর মানুষের গায়ে হাত তুলব না, কিন্তু সেদিন ছোঁড়াটার ভঙ্গি দেখে আপাদমস্তক জ্বলে গেল! ওকে সরাতেই হবে...তারপর অন্য কাজ! আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে ওকে লোপাট করতে হবে...তুমি ওর পিছু ছাড়বে না...কোথায় যায়, কী করে, সব খবর নিয়ে কাল রাত্তিরে আমাকে দেওয়া চাই-ই, তারপর আমি দেখছি ওর শখের গোয়েন্দাগিরি!

এমনসময় বাইরে মোটরের শব্দ হতে, আখড়ার ভেতরে সকলেই সচকিত হয়ে উঠল।

ঘণ্টা ঘর থেকে বেরিয়ে খবর নিয়ে এল, নিবারণবাবু এসেছেন, সঙ্গে নতুন লোক আর সেই ছোঁড়াটা।

বলতে-বলতে নিবারণবাবু এগিয়ে এলেন। ঘরের বাইরে থেকে ভক্তি-গদগদকণ্ঠে ডাকলেন, বাবা!

—কে নিবারণ নাকি? এসো, এসো, বাবা!

নিবারণবাবু ঘরে ঢুকেই বাবাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।

—বাবা, আজ আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। মিঃ গুপ্ত—পুলিশের একজন বড় অফিসার...আর একে তো জানেনই...বিনয়! বসো, বিনয়, বসো।

মিঃ গুপ্তের নাম শুনে হঠাৎ উদাসীবাবার দেহের ভেতরে যেন একটা তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গেল, কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশই পেল না। আনন্দে বিহ্বল হয়ে তিনি শিষ্যদের ইঙ্গিত করতেই, তারা একটা আসন পেতে দিল। তারপর মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বললেন, বসুন, মিঃ গুপ্ত!

মিঃ গুপ্ত আসনে বসতে-বসতে একান্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, আমাকে আর আপনি 'মিঃ গুপ্ত' বলে ডাকবেন না...আমি এসেছি আপনার একটু করুণা পাবার জন্যে।

মৃদু হেসে উদাসীবাবা বললেন, করুণা একমাত্র তিনি করতে পারেন, সকল করুণার মহাপারাবার যিনি!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দুটি চোখ যেন আপনা থেকেই বুজে এল। পাশেই একখানা হাতপাখা পড়েছিল। নিবারণবাবু সেখানা তুলে নিয়ে উদাসীবাবাকে বাতাস করতে লাগলেন। বিনয় 'এক্স-রে'-দৃষ্টি দিয়ে ঘরের সমস্ত কিছু দেখছিল। কিন্তু সে লক্ষ করেনি যে, সেই ঘরের আশে-পাশে চারিদিক থেকে জোড়া-জোড়া চোখ তাকেও ঠিক সেইভাবে দেখছিল।

কিছুক্ষণ পরে উদাসীবাবা চোখ খুলেই সোজা মিঃ গুপ্তের দিকে চাইলেন। মিঃ গুপ্তের মনে হল, সে-দৃষ্টি যেন তাঁর অন্তস্তল পর্যন্ত গিয়ে বিঁধছে। সহসা উদাসীবাবা বলে উঠলেন, আপনার ছেলের জন্যে আপনার বড় ভাবনা হয়েছে ইদানীং, না?

হঠাৎ তাঁর অন্তরের নিভৃততম ব্যথার কথা এই অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে এইরকম ভাবে শুনে মিঃ গুপ্ত একেবারে উতলা হয়ে পড়লেন। একদিন যাঁকে দেখে শহরের গুণ্ডারা পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠত, সেই লোক সহসা শিশুর মতো হয়ে গেলেন।

মিঃ গুপ্ত আপনা-থেকেই তাঁর নিজের জীবনের কথা বলে যেতে লাগলেন। উদাসীবাবা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

মিঃ গুপ্ত কুণ্ঠিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি আপনার সন্তানতুল্য, আমাকে আপনি 'আপনি-আপনি' বলে কথা বলবেন না...আমার নাম হল হরিশ...আপনি আমাকে আমার নাম ধরে যদি ডাকেন, তা হলে খুশি হব।

এত শিগগির যে শিকার ধরা দেবে, তা উদাসীবাবা আশা করেননি। যেদিন থেকে তিনি শুনেছিলেন যে, মিঃ গুপ্তের হাতে পড়েছে তাঁর অতীত জীবনের কীর্তির সন্ধান, সেইদিন থেকে তিনি চেষ্টায় ছিলেন কী করে মিঃ গুপ্তকে তাঁর আখড়ায় বেঁধে ফেলা যায়, তা হলে পুলিশের সন্দেহের দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারেন। তাই তিনি মিঃ গুপ্তের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। আজ দৈবের কৃপায় সেই মিঃ গুপ্ত যে এমনভাবে নিজে এসে ধরা দেবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। আনন্দের হিল্লোলে তাঁর সর্ব দেহ-মন ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল! আর সেই লক্ষণ দেখে নিবারণবাবু সন্ন্যাসীর ভগবদ্‌ভাব স্ফুরণ মনে করে ভক্তিতে টলমল হয়ে উঠছিলেন।

উদাসীবাবা এতক্ষণ যেন ঘরে বিনয়কে দেখতেই পাননি, এমনিভাবে তিনি বিনয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, এই যে বাবা, তোমার নামটা ভুলে যাচ্ছি, কিছু মনে করো না বাবা, বুড়ো মানুষ...।

নিজের শুষ্ক ভঙ্গিকে ঠিক করে নিয়ে বিনয় স্নিগ্ধভাবে তাড়াতাড়ি নিজেই বলে উঠল, আজ্ঞে, এ-অধমের নাম—বিনয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ! বিনয়! বিনয়! বসো, বসো বাবা।

বিনয় একটি আসনে নীরবে উপবেশন করল। উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বললেন, আচ্ছা বাবা হরিশ, তোমার সেই দিনগুলো মনে করো দেখি, যখন তুমি ঈশ্বর মানতে না...।

মিঃ গুপ্ত যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। তারপর বলে উঠলেন, এ-কথা আপনাকে কে বললে?

—আমাকে আর কে বলবে বাবা! কার সঙ্গেই বা মিশি, যিনি খবর দেওয়ার, তিনি দয়া করে যেটুকু খবর দেন, সেইটুকুই জানতে পারি!

নিবারণবাবুর দুই চোখ দিয়ে তখন আনন্দের ধারা গড়িয়ে পড়ছিল। বিস্ময়ে তিনি তাঁর গুরুর দিকে চেয়ে আছেন!

বিনয় ঘরের কোণে একদিকে একটি আসনে নীরবে বসল। উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তকে লক্ষ করে বলতে লাগলেন, আমি জানি বাবা, তোমার মনের অশান্তির কথা আমি সব জানি।

যে-লোক বেদনায় ভেতরে-ভেতরে জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে থেকে যদি কেউ তার সেই বেদনার জায়গায় সকরুণ হাতের স্পর্শ দেয়, আপনা-থেকেই তা গলে যায়। মিঃ গুপ্ত—পুলিশের উচ্চ কর্মচারী মিঃ গুপ্ত, সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদাসীবাবার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, মৃত্যুতে যে-আসন শূন্য হয়, মানুষের সাধ্য নেই সে-স্থান পূরণ করে।

এই বলে উদাসীবাবা মিঃ গুপ্তের ডান হাতটি নিজের দিকে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ একমনে নিরীক্ষণ করলেন, তারপরে একে-একে মিঃ গুপ্তের জীবনের সবকথা বলে যেতে লাগলেন, যেসব কথা তাঁর চরেরা দিনের পর দিন সংগ্রহ করেছিল। মিঃ গুপ্ত উদাসীবাবার সেই অলৌকিক ক্ষমতা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল, এই লোকের কাছ থেকে তিনি তাঁর অন্তরের শান্তির খোরাক পাবেন, তাঁর ক্ষুধিত বঞ্চিত মন করুণার স্পর্শে অবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে।

সহসা উদাসীবাবা বলে উঠলেন, আমি জানি, সম্প্রতি তোমার কাজের ব্যাপারে তুমি বিশেষ উতলা আছ!

হঠাৎ এ-কথা ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে মিঃ গুপ্তের মনে একটা কথা জেগে উঠল, শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের অলৌকিক শক্তি থাকে এবং নিবারণবাবুর কাছে তিনি যেসব কথা শুনেছেন এবং আজ তিনি নিজে যা প্রত্যক্ষ করলেন, তাতে উদাসীবাবার যে সে-ক্ষমতা নেই, তা বলা চলে না। আজ দু-বছর ধরে তিনি যে-কেসের কোনও হদিস বার করতে পারছেন না, উদাসীবাবা কি সেই কথাই তুলছেন! আশ্চর্য!

তবুও তিনি বাইরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু যদি মনে না করেন, আপনি যদি আরও স্পষ্ট করে একটু বলেন...।

উদাসীবাবা হেসে বললেন, সেসব খুন-খারাবির কথা এত লোকের মাঝখানে আলাপ করা কি যুক্তিসঙ্গত হবে?

খুনের কথা শুনেই মিঃ গুপ্তের বুঝতে বাকি রইল না যে, তিনি যে-কেস নিয়ে পড়ে আছেন, উদাসীবাবা ঠিক তারই কথা বলছেন!

নির্বাক বিস্ময়ে মিঃ গুপ্ত উদাসীবাবার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে বললেন, বাবা, আজ থেকে আমাকেও আপনার চরণে স্থান দিতে হবে।

সেদিন তাঁরা চলে যাওয়ার পর উদাসীবাবা আনন্দে নৃত্য করে বলে উঠলেন, আর আমাকে পায় কে? পুলিশের কর্তাকে এখানে করেছি মোতায়েন—আর পুলিশের সাধ্য কী আমাকে সন্দেহ করে!...কেল্লা ফতে!

ছয়

পথে যেতে-যেতে মোটরে নিবারণবাবু বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কী হে, কেমন দেখলে?...কথা বলছ না যে? তোমার সন্দেহ বুঝি এখনও ভাঙল না?

নিবারণবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে, মিঃ গুপ্তকে ডেকে বিনয় বললে, মিঃ গুপ্ত, আপনি রাজি হয়েছেন, সেই দুটি খুনের কেসে আমার সাহায্য গ্রহণ করতে?

—নিশ্চয়ই।

—তা হলে জানবেন, আজ থেকে আমার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

—কী বলছ তুমি, বিনয়?

—আরও স্পষ্ট করে বলবার সময় হলে আরও স্পষ্ট করেই বলব!

—কিন্তু তার সঙ্গে উদাসীবাবার কী যোগ যে, হঠাৎ তুমি এখানে সেই কথা তুললে?

—আপনারা যখন গল্প করছিলেন, ধর্ম নিয়ে মত্ত ছিলেন, তখন আমি আমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে ঘরের অন্যসব লোকদের দেখছিলাম।

—কী দেখলে?

—ঘণ্টা বলে যে-লোকটি ছিল, তাকে লক্ষ করেছেন?

—কেন?

—তার ডান-হাতে ছ'টা আঙুল!

মিঃ গুপ্ত হেসে উঠলেন। বললেন, মাপ করো ভাই বিনয়! প্রথম-প্রথম যখন মানুষ গোয়েন্দাগিরি করে, তখন উৎসাহের আবেগে সব জিনিসেই সে clue দেখে।

—আজ্ঞে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের তাই তো রীতি!

—কিন্তু জগতে কত লোকের তো ছ'টা আঙুল থাকতে পারে!

—নিশ্চয়ই! সেজন্যে বলছিলাম, স্পষ্ট করে বলবার সময় আমার এখনও আসেনি।

—কিন্তু ওইটুকু অনুমানের ওপর নির্ভর করে, এতবড় একটা ধার্মিক লোকের আশ্রমের ওপর তুমি—।

—শুধু তাই নয়! এ-জায়গাটায় ধর্মের যে সঙ্কোচহীন আত্মভোলাভাব প্রকাশ থাকা উচিত, তার বদলে কীরকম একটা আড়ষ্ট মৌনতা আছে, সেইটেই আমাকে প্রথম দিন থেকে সতর্ক করে দিয়েছে। জানেন তো, এক-একটা প্রাণীর এক-একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, ইংরেজিতে যাকে instinct বলে, যার সাহায্যে সে বাতাসের গন্ধ পেয়েই বুঝতে পারে, কোনদিকে কী আছে। তেমনি আমার বিশ্বাস, আমার মনে সেই শক্তি আছে, যার সাহায্যে আমি বাতাসে গন্ধ পাই!

এতক্ষণ নিবারণবাবু চুপ করে বসেছিলেন। বিনয়ের কথা শুনে রাগে তাঁর সর্বশরীর ফুলে ফেঁপে উঠছিল! আর বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে না পেরে, গর্জন করে উঠলেন, বিনয়! দেখছি, আমারই ভুল হয়েছিল, তোমাকে এখানে আনা! কথায় বলে না, এঁটোপাতা কি স্বর্গে যায়? দু-পাতা ইংরেজি পড়ে, বাবুরা ভেবেছেন যে, দুনিয়া জয় করে ফেলেছেন! তুমি যা বুঝেছ তা তোমার নিজের থাক...আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি, আমার সামনে ওরকম যা-তা কথা তুমি আর বলবে না।

বিনয় কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার হঠাৎ মনে হল, নিবারণবাবুকে চটানো যুক্তি-সঙ্গত কাজ হবে না। নিবারণবাবু হচ্ছেন, উদাসীবাবার আশ্রমে যাওয়ার তার পাসপোর্ট! হয়তো তার অনুমান ভুল হতে পারে, কিন্তু ভুল হতে পারে বলে কোনও সম্ভাব্য প্রমাণকে উপেক্ষা করা বৈজ্ঞানিকতা নয়।

বিনয় নিবারণবাবুর দিকে চেয়ে দ্যাখে, নিবাণরবাবু রাগে কাঁপছেন! তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বিনয় বলে উঠল, আমি আমার একটা অনুমানের কথা বলছি। আমি বলছি না যে, আমি যা বলছি তা-ই অভ্রান্ত সত্য।

—তোমার মুখ থেকে এ-সম্পর্কে আমি কোনও কথা শুনতে চাই না...আর কোনওদিন তুমি আমাদের সঙ্গে ওখানে যেতে পারবে না।

এমনসময় গাড়ি মিঃ গুপ্তের থানার সামনে এসে দাঁড়াল। মিঃ গুপ্তের সঙ্গে বিনয়ও থানাতে নামল।

—কিছু মনে না করেন তো, সেই দুটো কেসের report-গুলো একটু দেখব এবং সেই হাতের printটা আর-একবার ভালো করে দেখতে চাই।

—ভালো কথা।...এসো ভেতরে!

নিবারণবাবু একবার বিনয়ের দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শফারকে গাড়ি চালাতে বললেন।

সেদিন থানা থেকে ফিরতে বিনয়ের অনেক রাত হয়ে গেল।

শীতের রাত্রি। পথ প্রায় নির্জন হয়ে এসেছে। তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছে যে, ওই উদাসীবাবার আখড়ার ভেতরে ধর্ম ছাড়া যেন আরও কিছু রহস্যজনক ব্যাপার লুকিয়ে আছে এবং বাবার ঝোলাতে শুধু যে ভক্তদের কৃপা বা ভক্তির দান পড়ে, তা নয়!...পথ চলতে-চলতে সে যতই নিজের মধ্যে তর্কবিতর্ক করে, ততই তার নিজের সন্দেহটা যেন বড় হয়ে ওঠে। সে নিজের মধ্যে একজনকে খাড়া করে তাকে নিবারণবাবু সাজিয়ে তার সঙ্গে মনে-মনে তর্ক জুড়ে দিলে—

নিবারণবাবু বলে—ছিঃ, ধর্ম নিয়ে যেসব নিরীহ লোক সংসার থেকে আলাদা হয়ে আছে, তাদের ওপর এরকম হীন সন্দেহ করে?

বিনয়ের আসল মন বলে, ধর্মকে আবরণ করে মানুষ যে যুগে-যুগে অন্যায় করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব নেই।

নিবারণবাবু বলে, কিন্তু ধর্মের আবরণে এইসব খুন-জখম!

বিনয়ের মন বলে, কেন, 'রাসপুটীন'-এর কথা কি ভুলে গিয়েছ?

নিবারণবাবু বলে, 'রাসপুটীন' ওদের দেশেই সম্ভব হয়।

বিনয়ের মন বলে, ভুল কথা! রাসপুটীন সব দেশেই জন্মায়। আর তা ছাড়া, ওদের দেশে কাল যা হয়ে যাচ্ছে, আমাদের দেশে আজ তা গজিয়ে উঠছে!

দেখতে-দেখতে পথে কখন ঝড় উঠেছিল বিনয়ের সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। শীতের দিনে এরকম ঝড় বড় একটা হয় না। একে তো সন্ধে থেকে এ-অঞ্চলে বেশি লোকজন চলা-ফেরা করত না। তার ওপর ঝড় ওঠাতে রাস্তা একেবারে খালি হয়ে গিয়েছিল। বিনয়ের অবশ্য সেদিকে কোনও লক্ষ ছিল না। কিন্তু উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখতে-দেখতে তীরের মতো বেগে বৃষ্টি নেমে এল। হঠাৎ সেই শীতের রাতে সেই বৃষ্টির ধারা গায়ে লাগাতে বিনয় সচকিত হয়ে উঠল। শীতের রাত্রিতে কে আর ভেজে! বিনয় রাস্তার থেকে উঠে ফুটপাথের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল—হয়তো সেই পথ দিয়ে কোনও গাড়ি, বা রিক্সা যেতে পারে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিনয় দু-তিনবার 'এই রিক্সাওয়ালা' বলে ডাকল। হঠাৎ মনে হল, যেন কিসের একটা আওয়াজ হল, গ্যাসের আলোয় গাছের ছায়াগুলো ঝড়ে দুলছিল! ফুটপাথের ভেতর দিকটা একেবারে অন্ধকার! ফুটপাথের সামনের রাস্তা—আলো-ছায়ায় ছক-কাটা! বিনয় একবার চারিদিক চেয়ে দেখল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দৃষ্টিগোচর হল না। উদ্‌গ্রীব হয়ে তখন সে রিক্সার আগমন-আশায় সেইদিকে চেয়েছিল, কিন্তু শব্দটা এগিয়ে আসতে-আসতে ক্রমশ যেন দূরে সরে গেল—হয়তো সামনে এগিয়ে না এসে কোনও গলির ভেতর ঢুকে গেল। এমনসময় বিনয় শুনল, সামনে ফুটপাথের ভেতর দিকে কে যেন নড়ে উঠল! সেইদিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর বিনয় দেখল, ফুটপাথের ভেতর দিক থেকে অন্ধকারে কে যেন আস্তে-আস্তে তার দিকে এগিয়ে আসছে। একটু ভালো করে দেখতে সে বুঝতে পারল যে, সামনে যে-লোকটা আসছে সে কোনও ভিখিরি হবে। গায়ে টুকরো-টুকরো সব ময়লাকাপড় জড়ানো। কোনও কথা না বলে লোকটা অর্থহীন হাসি হেসে উঠল।...পাগল! অস্ফুট ভাষায় সে হাত পাতল—কিছু ভিক্ষে চায়! বিনয় পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়সা খুঁজে তার হাতে দিল। লোকটা খিলখিল করে হেসে উঠল, তারপর যেমন অন্ধকার থেকে আস্তে-আস্তে উঠে এসেছিল, তেমনি আস্তে-আস্তে আবার অন্ধকারের মধ্যে

ঢুকে পড়ল। এমনি কত লোক আশ্রয়হীন হয়ে এই মহানগরীর পথে-পথে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে!... তাদের কথা স্মরণ করে বিনয়ের বুক থেকে আপনা-হতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল। এমনসময় গাছের ওপর থেকে ঠিক তার নাকের ডগা ছুঁয়ে কী-যেন পড়ল! বিনয় অজ্ঞাতে ঘাড় তুলে গাছের ওপরের দিকে চাইতে, তার মাথার ভেতর দিয়ে গায়ে কী-যেন একটা এসে পড়ল। গা-টা ঝাড়া দিতে কী-যেন একটা টান পড়ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিনয় বুঝল, তার গলায় ফাঁস পড়ে গিয়েছে! আত্মরক্ষার প্রথম চেষ্টায় নড়তেই ফাঁসটা কঠিনভাবে গলায় আটকে গেল, সেইসঙ্গে ঝুপ করে গাছ থেকে কে যেন লাফিয়ে পড়ল। পেছন থেকে আর-একজন এসে সজোরে বিনয়ের মুখ চেপে ধরল। ফাঁসের টানে বিনয়ের চৈতন্য লোপ পাবার মতন হল। সেই অবস্থায় সে যেন শুনল, একটা মোটর এসে দাঁড়াল। কারা তাকে ধরাধরি করে মোটরে তুলল। তারপর কিছু শোনবার বা বোঝবার মতো কোনও চেতনাই তার আর রইল না।

সাত

বাড়ি ফিরে গিয়ে নিবারণবাবু সেদিন ভালো করে ঘুমুতে পারলেন না। বিনয়ের ওপর রাগে তাঁর সর্বশরীর জ্বলছিল এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আজকালকার সব ছেলেদের ওপর তাঁর যে স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল, তা যেন শতগুণ বেড়ে গেল। বিনয়ের চিন্তা মন থেকে একটু সরে যেতে না-যেতে তাঁর মনে হল, হয়তো উদাসীবাবা সমস্ত জানতে পারবেন। যখন জানতে পারবেন, তিনি কী মনে করবেন! হয়তো মনে-মনে তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। তিনিই বিনয়কে সঙ্গে করে তাঁর আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলেন, হয়তো সেই অপরাধে তিনি আর তাঁকে কৃপা করবেন না!...এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর আর ভালো করে ঘুম হল না। বিশেষ করে তাঁর এই ভয় হতে লাগল যে, বিনয়ের কথায় মিঃ গুপ্ত যদি সত্যি-সত্যি আশ্রমের লোকদের ওপর সন্দেহ করে কিছু করে বসেন! হাজার হোক, পুলিশের লোক...কিছু বলা যায় না!

ভোর না হতেই নিবারণবাবু গাড়ি নিয়ে সোজা থানায় গিয়ে মিঃ গুপ্তের কাছে হাজির হলেন। মিঃ গুপ্ত তখন সবে ওপর থেকে নেমে তাঁর চেয়ারে এসে বসেছিলেন। এমনসময় নিবারণবাবু হন্তদন্ত হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, আরে ভাই, ওঠো একবার।

নিবারণবাবুর মুখের চেহারা দেখে মিঃ গুপ্ত মনে করলেন যে, নিবারণবাবু হয়তো কোনও বিপদে পড়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার নিবারণবাবু?

—একবার চলো ভাই, বাবার আশ্রমে...একবার বাবার শ্রীচরণ একটু দর্শন করে আসি... গাড়ি নিয়ে এসেছি, ওঠো!

নিবারণবাবুর আগ্রহ দেখে মিঃ গুপ্ত আর না বলতে পারলেন না। হাতের কাজ ফেলে রেখে তিনি উঠলেন। তীব্র বেগে মোটর কলকাতা ছাড়িয়ে উদাসীবাবার আখড়ার সামনে এসে দাঁড়াল। নিজেই মোটরের দরজা খুলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি নেমে পড়লেন। মিঃ গুপ্ত তাঁর পিছনে-পিছনে নামলেন। সারাপথ নিবারণবাবু মনে-মনে চিন্তা করছিলেন, বাবার কাছে কী করে ক্ষমা চাওয়া যায়, কী বলে এই অজানিত অপরাধের কথা উত্থাপন করা যায়...সবকথা কি খুলে বলবেন? না, এসব কথাই উত্থাপন করবেন না?

গাড়ি থেকে নেমে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই নিবারণবাবুর মন কেঁপে-কেঁপে উঠল। বাবার সামনে গিয়ে কিছু না বলেই তিনি তাঁর পা জড়িয়ে ধরবেন...তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠতে হঠাৎ যেন তাঁর মনে হল, আজ যেন কেমন লাগছে...বাবার শিষ্যরা কোথায়? সামনের ঘরে ঢুকে দেখেন কেউ নেই...ঘরটাও খালি...কী হল?

ফিরে তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে মিঃ গুপ্তের দিকে চাইলেন। দেখলেন, মিঃ গুপ্তের চোখেও সেই এক জিজ্ঞাসা...

ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের একটা ঘর ছিল...সে-ঘরও খালি...কেউ কোথাও নেই...একটা দড়িতে ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলছে...এধারে-ওধারে খালি শুকনো কলসী গড়াগড়ি দিচ্ছে...সমস্ত জায়গা পাতি-পাতি খুঁজেও কোথাও কোনও মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত দেখতে পেলেন না...পরিত্যক্ত শূন্য আশ্রম...।

নিবারণবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

—এ-কী, গুপ্তভায়া...এ-কী হল! বাবা আমাদের এমনি করে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন? ...হায়-হায়!

নিবারণবাবু আপনার মনে বলে যেতে লাগলেন, আমি জানতাম, আমি জানতাম......কাল আমার মন বলেছিল...অকারণে সাধু-পুরুষের নিন্দে! হায়! হায়! আর কি তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে?

মিঃ গুপ্ত এতক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে চারিদিক নিরীক্ষণ করছিলেন। নিবারণবাবুর প্রশ্নে তিনি যন্ত্রচালিতের মতো বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হয়তো তাঁর দর্শন আর পাওয়া যাবে না!

নিবারণবাবু বালকের মতো কেঁদে বলে উঠলেন, তবে উপায়, মিঃ গুপ্ত? যেমন করেই হোক, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে...

তেমন স্থিরকণ্ঠে মিঃ গুপ্ত বললেন, নিশ্চয়ই! তবে খুঁজে বার-করা খুব সহজ কাজ হবে না।

উত্তেজিতকণ্ঠে নিবারণবাবু বলে উঠলেন, যত টাকা লাগে মিঃ গুপ্ত, অমি খরচ করতে রাজি আছি...বাবাকে খুঁজে বার করতেই হবে...আপনি পুলিশের একজন বড় অফিসার...বহুলোক আপনার জানা, আপনি চেষ্টা করলেই হবে...

তেমনি স্থিরকণ্ঠে মিঃ গুপ্ত বললেন, আপনার টাকার চেয়ে যার টাকা ঢের-ঢের বেশি তার টাকা নিয়ে, আমার সমস্ত লোকজন নিয়ে এতদিন চেষ্টা করেও তিনি আমার চোখের সামনে ধুলো দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন...এ কি কম আপসোসের কথা নিবারণবাবু? ইস! তখন যদি বিনয়ের কথা শুনতাম!

মিঃ গুপ্তের কথা শুনে নিবারণবাবু দুই চোখ বিস্ফারিত করে বলে উঠলেন, এ আপনি কী বলছেন মিঃ গুপ্ত? ছি-ছি, এ কী বলছেন আপনি?

—ঠিকই বলছি নিবারণবাবু। নিজের জুতো খুলে নিজের পিঠে মারতে ইচ্ছা করছে। এখন চলুন তো একবার বিনয়ের কাছে!

বিনয়ের নাম শুনে নিবারণবাবু যেন ছিটকে পড়লেন।

—সেই হতভাগাটার জন্যেই তো...।

বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্ত বললেন, সেই হতভাগাটার কথা যদি শুনতেন, তা হলে আপনার হাজারটা টাকা জলে যেত না! এখন একবার চলুন তো বিনয়ের কাছে!

মুখ ভার করে নিবাণরবাবু গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। শুধু একবার বললেন, মিঃ গুপ্ত, আমি বলছি, আপনিও ভুল করছেন...সাধু-সন্ন্যাসী মানুষদের এমন করে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে নেই।

মিঃ গুপ্ত বললেন, সাধু-সন্ন্যাসী কি না তা জানি না, কিন্তু আপনার গুরুদেবটিকে আমি মোটেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখছি না নিবারণবাবু! তাঁর মতো ভয়ঙ্কর ক্রিমিন্যাল আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখিনি...একেবারে বিজ্ঞানশাস্ত্রমতে তিনি এই বিদ্যা শিখেছেন এবং তাঁর চেলাদের শিখিয়েছেন।

নিবারণবাবু রুদ্ধকণ্ঠে শুধু হুঙ্কার করে উঠলেন, মিঃ গুপ্ত!

ইত্যবসরে গাড়ি বিনয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিনয় বাস করত। তার সংসারের মধ্যে ছিল তার বৃদ্ধা পিসিমা আর এক চাকর।

নিবারণবাবুর গাড়ি বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই চাকর রামহরি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

গাড়ি থেকে নিবারণবাবু এবং মিঃ গুপ্ত দুজনেই নামলেন। রামহরি এগিয়ে গিয়ে দেখল, গাড়িতে শফার ছাড়া আর কেউ নেই।

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, দাদাবাবু? তিনি এলেন না?

—কেন? তোর দাদাবাবু কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি?

—না!

মিঃ গুপ্ত ও নিবারণবাবু দুজনে দুজনার মুখের দিকে চাইলেন। রামহরি বলতে লাগল, দিদিমা সারারাত জেগে আছেন...আমি সারা সকাল সব জায়গায় খুঁজে এসেছি...দাদাবাবু যেখানে-যেখানে যান...কোথাও কোনও খবর পেলাম না!

মিঃ গুপ্ত তাড়াতাড়ি নিবারণবাবুকে নিয়ে মোটরে উঠলেন, চলুন শিগগির থানায়!

থানায় এসে মিঃ গুপ্ত ফোনে থানায়-থানায়, হাসপাতালে খবর নিলেন, কোথাও কোনও খবর পাওয়া গেল না!

নিবারণবাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন, ওর ওইরকম স্বভাব...না বলে-কয়ে শুনেছি ও মাঝে-মাঝে উধাও হয়ে যায়!

মিঃ গুপ্তের মুখ অন্ধকারে ভরে এল। কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সেইদিনই কাগজে-কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন, বিনয়, তোমার জন্যে আমরা বিশেষ চিন্তিত হয়ে আছি। যেখানে থাকো, এই বিজ্ঞাপন দেখলে অবিলম্বে খবর দেবে!

তারপর একদিন, দু-দিন, তিনদিন করে সপ্তাহ চলে গেল, সপ্তাহ ক্রমশ মাসে গিয়ে পড়ল। বিনয়ের আর কোনও খবর পাওয়া গেল না। মিঃ গুপ্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন।

আট

বিনয়ের খবরের জন্যে আমাদের একটু পিছন দিকে আবার ফিরে যেতে হবে। বিনয়ের যখন জ্ঞান হল, তখন সে দ্যাখে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে সে শুয়ে আছে। পা নাড়তে চেষ্টা করল—পারল না। বুঝল, তার পা দড়ি দিয়ে একটা কিছুর সঙ্গে এমন করে বাঁধা যে, নড়বার আর উপায় নেই—হাতেরও সেই অবস্থা। সমস্ত মাথা এত ভারি যে, সেটা যে তার নিজের মাথা তা মনেই হচ্ছিল না। যতটুকু তার চেতনা হয়েছিল, তাই দিয়ে সে মনে করতে চেষ্টা করল, কোথায় কীভাবে কী ঘটেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ ভাববার পর সে দ্যাখে, তার সব ভাবনাগুলো যেন জলের দাগের মতো মিলিয়ে-মিলিয়ে যাচ্ছে! কিছু সে স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে না, কিছুই তার স্পষ্ট করে মনে পড়ছে না! অন্ধকারে চোখ চাইবার চেষ্টা করল, কিন্তু মনে হল, কীসের আঠায় যেন চোখ জুড়ে আছে, ভালো করে সে চাইতেও পারছে না।

এমনি অসহায় অর্ধচেতনভাবে কিছুক্ষণ থাকবার পর সে শুনতে পেল, কাছেই দুজন মানুষ যেন কথা বলছে। একজন বলছে,

—না, ওকে মেরে ফেলে কাজ নেই। আমি বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখেছি...যেসব লক্ষণ এতক্ষণ ধরে খুঁজে বেড়িয়েছি, ছেলেটার মধ্যে পুরোমাত্রায় সেসব লক্ষণ আছে।

—তা বেশ, আমার আপত্তি নেই...আমি জানি...আপনার হাতে যখন দিয়ে গেলাম তখন আমার আর কোনও ভয় নেই।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো...ও আর সভ্য মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে পারছে না...যেদিন ও আবার সভ্য মানুষের মধ্যে যাবে, সেদিন ও হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সহায়, আমাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র!

বিনয় সেই অর্ধচেতন অবস্থার মধ্যে চমকে উঠল...এ-কী! তারই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে? একটা কথা শুনে তার বড় ভালো লাগল, তাকে মেরে ফেলা হবে না...সে বেঁচে থাকবে...কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, তাকে নিয়ে ওরা কী করতে চায়! একজনের গলা খুব পরিচিত বলে মনে হতে লাগল...সেই গলার স্বর শুনতে-শুনতে বিনয়ের সব মনে পড়ে গেল...একে-একে সব ঘটনা পরের পর তার মনে পড়তে লাগল।

—আমার ওষুধের গুণে আজকে আর ওর জ্ঞান হবে না...তুমি জেনে রেখো, আজ থেকেই আমি কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি...আজ সন্ধেবেলায় তাকে আর-একটা ওষুধ খাওয়াব...সেই ওষুধের ফলে আস্তে-আস্তে তার ভাববার শক্তি একটু-একটু করে লোপ পাবে...ক্রমশ সে কলের মানুষ হয়ে যাবে...তখন তাকে যা করতে বলব তা-ই সে করে আসবে...আমি যাদের নিয়ে এ-পরীক্ষা করেছি...তাদের দেহের ও মনের কতকগুলো লক্ষণ না থাকার দরুণ আমার ওষুধ তারা বেশিদিন সহ্য করতে পারে না...গোড়ার দিকটা বেশ চলে...কিন্তু শেষের দিকটায় তারা পাগল হয়ে যায়!

সেই অন্ধকারের মধ্যে বিনয় ভয়ে চমকে উঠল—তাকে নিয়ে যে-পরীক্ষা হবে, তা শুনে সে শিউরে উঠল! এর চেয়ে মৃত্যু যে শতগুণে ভালো।

—বহু চেষ্টার ফলে আমি এই তন্ত্র উদ্ধার করেছি...এতে যেসব প্রক্রিয়ার কথা আছে তা যদি উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়...আমার বিশ্বাস, তাতে আমি এই নতুন ধরনের মানুষ তৈরি করতে পারব...এই নতুন মানুষের যেসব গুণ হবে, তন্ত্রে বলেছে—তার গায়ে দানবের জোর হবে, তার নিজের মন বলে কোনও জিনিস থাকবে না, পশুর মতন নিজের মনিব ছাড়া সে কাউকে জানবে না...কোনও বিষ বা অস্ত্রের আঘাত আর তার দেহে কাজ করবে না এবং তার নিশ্বাসে মানুষ অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

বিনয়ের মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে...কিন্তু না, এ তো স্বপ্ন নয়! নিজের সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্ভাবনার কথা শুনতে-শুনতে বিনয়ের সর্ব দেহ-মন আবার ঝিমিয়ে আসতে লাগল। সে কোথায়? কাদের হাতে এসে পড়েছে সে? কী করেই-বা সে উদ্ধার পাবে? সেই ভয়ঙ্কর মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু যে শতগুণে শ্রেয়!

—আমি একবার এখন এক নম্বর গুহায় যাচ্ছি...তুমি এখানে পাহারায় থাকো। ছেলেটার চেতনা ফিরে এলে আমাকে খবর দেবে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করে এখানে স্থান দিয়েছি...আশা করি, তুমি বা তোমার চেলারা আমার সমস্ত নিয়ম মেনে চলবে।

—সে-কথা আর ভুলব না...আপনারই সেবার জন্যে আজ এই দীর্ঘকাল ধরে এই বিপুল অর্থ অর্জন করে এনেছি—শুধু এই বিদ্যা আপনার কাছে শেখবার জন্যে!

—বেশ! তুমি আমার সব কাজে আমার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকবে...কাল পাগলগুলো বড় উৎপাত করেছে...আজ সেগুলোকে সাবাড় করে দিয়ে আসি। পাহাড়ে শকুনগুলো অনেকদিন মাংস খায়নি!

বিনয় নিজের কানকে যেন আর নিজে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—তোমার চেলারা থাকবে পাহাড়ের তলায়...তাদের কাজ হবে শুধু লক্ষ রাখা, পাহাড়ের সেইদিকে কোনও মানুষ আসছে কি না। তুমি একমাত্র সেই গুহায় প্রবেশ-অধিকারী...এই নাও...এই আংটি না নিয়ে আমি ছাড়া আর কেউ সেই গুহায় ঢুকতে বা বেরুতে পারবে না। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে যদি দ্যাখো, ছেলেটির জ্ঞান হয়েছে, তা হলে এই শেকড়টা তার নাকে একটু শুঁকিয়ো...সে আবার ঘুমিয়ে পড়বে...আমার ফিরতে দেরি হতে পারে—কারণ, একটা নয়, দুটো নয়, পঞ্চাশটা পাগলকে সাবাড় করে আসতে হবে!

তারপর অন্ধকারে নানারকমের বিচিত্র কী-যে সব শব্দ হল তারপর সব চুপচাপ হয়ে গেল। বিনয় সেই অন্ধকারের মধ্যে মড়ার মতন পড়ে রইল...যেটুকু নড়াচড়া করবার শক্তি তার এসেছিল, সেই ভয়ঙ্কর কথাবার্তা শুনে তাও বন্ধ হয়ে গেল। এইমাত্র যে-কথা সে শুনল, মনে-মনে সেইসব

কথার আড়ালে যেসব জিনিস ঘটে-ওঠার সম্ভাবনা, তা সে কল্পনা করতে লাগল। কী ভয়ঙ্কর কথা! এইমাত্র সে শুনল, পঞ্চাশটা লোককে অকারণে মেরে ফেলে শকুনিকে খাওয়ানো হবে! যদি তার ওপর পরীক্ষা সফল না হয়, তাহলে সে-ও একদিন এমনি পাগল হয়ে যাবে...এমনি একদিন তাকেও পাহাড়ের শকুনির পেটে যেতে হবে। সেই নিদারুণ ভবিতব্য—তার কথা স্মরণ করতে, বিনয় আপনা থেকে শিউরে-শিউরে উঠছিল...কিন্তু এই ভয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটা জিনিস বিনয় লক্ষ করল যে, তার মাথা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে...ভয়ের দরুণ ভেতরে-ভেতরে সে যতখানি সচকিত হয়ে উঠেছে, ততই—তাকে যে মাদক খাওয়ানো হয়েছিল, তার প্রভাব কমে-কমে এসেছে। ক্রমশ অন্ধকারে সে স্পষ্ট করে চোখ চাইতে পারল...মাথাটা একটু ঘুরিয়ে সে দেখল, তার পায়ের দিক থেকে সেই অন্ধকারে একটা তীরের ফলার মতো খানিকটা আলো বাইরে থেকে এসে পড়েছে। সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে, সেই নিদারুণ বিভীষিকার মধ্যে সেই আলোর ফালিটুকু যেন তার কাছে আজ নিখিলের জীবনের প্রতীক। জগতের সমস্ত আশা যেন সেইটুকু আলোর রূপ নিয়ে এসেছে!

বেশি নড়াচড়া করলে পাছে যে-লোক তাকে পাহারা দিচ্ছে তার দৃষ্টি আর্কষণ করে, তাই বিনয় মড়ার মতন পড়ে রইল...কিন্তু কতক্ষণই বা সেইভাবে থাকা যায়! এতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থার মধ্যে বিনয় তার মনের যে-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, ধীরে-ধীরে তার স্বাভাবিক সেই মনের শক্তি আবার ফিরে এল—এমনিভাবে শকুনির পেটে শেষকালে চলে যেতে হবে?

ভাবতে-ভাবতে বিনয় মরিয়া হয়ে উঠল...সেই আলোর টুকরোটুকুর দিকে চেয়ে-চেয়ে তার মনে আবার আশা জেগে উঠল...বহুবার বহুভাবে সে মৃত্যুকে দেখেছে...দেখেছে, মৃত্যু তার পাশ দিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে চলে গিয়েছে...কিন্তু এরকম ভয়ঙ্কর মৃত্যু-গুহায় তিল-তিল করে মানুষের জগৎ থেকে, মানুষের চেতনা থেকে সরে থাকার নিদারুণ অস্তিত্বের কথা সে কখনও কল্পনাও করেনি। যদি কোনওরকমে এই ভয়ঙ্কর জীবনের হাত থেকে মুক্তি পেতে হয়, তবে আজই তাকে তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে...বিলম্বে হয়তো লোকগুলো আবার ওষুধ খাইয়ে তাকে অচৈতন্য করে ফেলে রেখে দেবে...তারপর, তারাই জানে, কীভাবে ধীরে-ধীরে তাকে মানুষের রাজ্য থেকে সরিয়ে—যন্ত্রমানব করে তুলবে! কিন্তু কী উপায়? সে কোথায় আছে, মানুষের বাসস্থান থেকে কতদূরে...কাছে বা দূরে কোথাও কোনও সাহায্যের সম্ভাবনা আছে কি না, তাও সে কিছুই জানে না। কিন্তু সে যখন জানবার কোনও উপায়ই নেই, তখন সে-সম্বন্ধে ভেবে আর কী লাভ? তার মনে পড়ল, এইমাত্র যেসব কথা সে শুনেছে, জ্ঞান হলেই তাকে আর-একটা কী শেকড় শোঁকাবার ব্যবস্থা আছে—এক্ষেত্রে সে কী করবে? এমনসময় মনে হল, তার হাতের বাঁধন যেন একটু শিথিল মনে হচ্ছে...হাতটা একটু এ-পাশ ও-পাশ করতেই তার মনে হল, কাছেই যেন একটা পাথর রয়েছে...হাতের স্পর্শ দিয়ে সে স্পষ্ট অনুভব করল যে, পাথরের খনিকটা বেশ ধারালো। সেই অবস্থায় শুয়ে সে পাথরের ধারে হাতের দড়িটা ঘষতে লাগল। খানিকক্ষণ ঘষার পর হাতের দড়ি ছিঁড়ে গেল...হয়তো হাতের দড়িটা তত শক্তও ছিল না, কারণ, যারা তাকে অচৈতন্য করে সেখানে ফেলে রেখেছিল, তারা তার সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া একরকম অসম্ভব ব্যাপার মনে করেই হাতের দড়ি তত শক্ত করে বাঁধার প্রয়োজন মনে করেনি। বিনয় অসীম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করল। দেখতে-দেখতে তার হাতের দড়ি সে খুলে ফেলল। অতি সন্তর্পণে উঠে সে পায়ের দড়িও খুলে ফেলল। এমনসময় সে দেখল, অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেদিক দিয়ে আলোর ফালিটুকু আসছিল, সেদিকে কীসের যেন শব্দ হল, আলোর ফাঁকটা যেন একটু বেড়ে গেল। বিনয় তাড়াতাড়ি উঠে সেইদিকে একেবার আলোর মুখের নিচে গিয়ে দাঁড়াল...দেখল, একটা সিঁড়ি দিয়ে কে একজন নেমে এল। যে নেমে এল, সে পরম নিশ্চিন্তমনেই নামছিল। তার হাতে টর্চ ছিল। কিন্তু সে-টর্চও সে তখনও জ্বালেনি। হয়তো এই লোকটার ওপরই ভার আছে, তাকে শেকড় শুঁকিয়ে আবার

স্থান করে ফেলার। লোকটা, সিঁড়ি দিয়ে নেমে কয়েক ধাপ অন্ধকারের মধ্যে এগোতেই, বিনয় বেড়ালের মতো সন্তর্পণে তার পিছন দিক দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে পড়ল। বাইরের আলোতে সিঁড়িটুকু তখন স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল—বিদ্যুৎবেগে বিনয় সেই সিঁড়ির ওপর দিয়ে, সেই আলোর ফাঁকের ভেতর দিয়ে ওপরে গিয়ে উঠল...ওপরে উঠেই দ্যাখে, মস্তবড় একটা পাথরের চাঁই সেই ফাঁকের মুখে রয়েছে। কালবিলম্ব না করে সে সেটাকে ফাঁকের মুখে টেনে এনে ফেলে দিল...ভেতর থেকে কী-একটা তীব্র চিৎকার জেগে উঠল...সেদিকে লক্ষ না করে বিনয় এক-পা এক-পা করে সামনের দিকে এগুতে লাগল।

নয়

চারিদিকে নিথর মৌন পর্বতশিখর...কোনওরকম চিন্তা না করে সে নিচের দিকে নামতে লাগল। তবে সর্বদাই মনে হচ্ছিল, কে যেন তার পিছু-পিছু নামছে—পিছনে ফিরলেই হয়তো দেখতে পাবে, তাকে ধরবার জন্যে চারিদিক থেকে লোক ছুটছে। তাই সে আর পিছন দিকে একবারও চাইল না। কতক্ষণ সে এইভাবে ছুটতে-ছুটতে নেমে এসেছে তার কোনও ধারণা তার ছিল না। বহুক্ষণ নেমে আসবার পর সে খানিকটা সমতল জায়গা দেখতে পেল। সমস্ত শরীর তার তখন কাঁপছিল, অথচ একমুহূর্তের জন্য থামতেও তার মন চাইছিল না। কিন্তু শরীর তখন এতদূর অবসন্ন যে, বাধ্য হয়ে তাকে থামতে হল। এইবার সে একবার পিছন ফিরে চাইল...কোথাও কেউ নেই...কোনও শব্দ বা তার কোনও প্রতিধ্বনি পর্যন্ত নেই। কিন্তু সেই অবস্থার মধ্যে তার মনে হল, যেভাবে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সে ছুটে চলে এসেছে, তাতে কোন পথ দিয়ে কীভাবে সে এসেছে তা মনে করে রাখবার কোনও উপায়ই নেই। কিন্তু আত্মরক্ষা করাই তখন তার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল, তারই আবেগে সে অন্য সমস্ত চিন্তা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে তো অপেক্ষা করে থাকা যায় না? সেই জনমানবহীন অপরিচিত পার্বত্য-দেশের পথ-ঘাট তার কিছুই জানা নেই...সেই সমতল-ক্ষেত্রের দু-পাশ দিয়ে দুটো সরু রাস্তা নিচের দিকে নেমে গিয়েছে...কোন রাস্তা সে ধরবে? ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সে ডানদিকের রাস্তা ধরে আবার নামতে আরম্ভ করল, কিছুদূরে একটা জীর্ণ কুঁড়েঘর রয়েছে। অসীম অকূল সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে অসহায় নাবিক যেমন একটুকরো কাঠ পেলে আশায় উদ্বেল হয়ে তাকে আঁকড়ে ধরতে দু-বাহু বাড়ায়, তেমনি সেই কুঁড়েঘরখানি দেখে বিনয় পাগলের মতো সেইদিকে ছুটে চলল। ঘরের সামনে এসে দ্যাখে, একজন আধাবয়েসী লোক কাঠ জ্বালিয়ে রুটি তৈরি করছে। হঠাৎ বিনয়কে দেখে লোকটা যেন অবাক হয়ে গেল। বিনয় কীভাবে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে তা ভেবে না পেয়ে হঠাৎ বলে বসল, আমার বড় খিদে পেয়েছে, আমাকে কিছু খেতে দিতে পারো?

বিনয় অবশ্য হিন্দিতেই কথা বলেছিল এবং উত্তরও তার এল হিন্দিতে।

—নিশ্চয়ই, এ-আর এমন কী কথা? দেখছ তো রুটি তৈরি...এসো, ভেতরে এসো।

বিনয়ের মনে তখন হাজার রকমের কথা, হাজার রকম সমস্যা একসঙ্গে তোলপাড় করে উঠছিল। কিন্তু সে-সমস্ত তার চাপা পড়ে গেল...তবু তার সামনে সে যাকে দেখছে সে তো একজন মানুষ! তার চারদিকে তার চিরদিনের চেনা সেই অপরাহ্নের আলো, সেই পরিচিত মাটির পৃথিবী, এতদিন—কতদিন সে তা জানে না, সে যেন এক অসম্ভব ছায়ার রাজ্যে ছিল, জীবনহীন মৃত্যুর প্রেতপুরীর মধ্যে...তার মধ্যে সে যেন তার সত্তাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল...আজ একটা জ্যান্ত মানুষকে চোখের সামনে নড়তে-চড়তে কথা বলতে দেখে, বিনয়ের মধ্যে আবার তার নিজের সত্তা

জেগে উঠল। এক অজানা ভয়ে সে যেন পঙ্গু হয়েছিল, আবার তার বুকে ফিরে এল তার বহু সাধনার যৌবন-দুঃসাহসিকতা...।

বিনয় এগিয়ে গিয়ে ঘরের ভেতর যেতেই লোকটা একটা কাঠের চৌকী-মতন জিনিস এগিয়ে দিল। বিনয় তার ওপর বসল।

লোকটি বিনয়কে জিজ্ঞাসা করল, তোমার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বড় ক্লান্ত... ব্যাপার কী?

—আমি অনেকদূর থেকে আসছি, তাই বড় ক্লান্ত।

—কিন্তু এ-ধারে, এ-পথে তুমি গিয়েছিলে কোথায়?

বিনয় দেখল, লোকটাকে প্রশ্ন করতে দিলে, সে উত্তর দিতে পারবে না। একবার মনে হল, লোকটাকে সব কথা খুলে বলে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হলে তাকে যেসব কথা বলতে হয়, তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? তাই বিনয় কায়দা করে তার প্রশ্ন এড়িয়ে, নিজেই প্রশ্ন করতে লাগল ঃ

—আমি পথ হারিয়ে গিয়েছি...এ-জায়গাটার নাম কী বলতে পারো?

কিন্তু বিনয় যে-উদ্দেশ্য প্রশ্ন করেছিল, দেখল, লোকটা সে-ফাঁদে পড়ল না...সে উল্টে আবার প্রশ্ন করল, কেন তুমি কি এ-অঞ্চলে আসোনি কখনও?

—না।

—তুমি কোথায় রয়েছ তা জানো না?

—না!

—বা রে, তবে এখানে এলে কীকরে?

যে-কথা বিনয় এড়িয়ে চলতে চেয়েছিল, দেখল সেই কথার মধ্যে সে আবার পড়ে যাচ্ছে। তখন বেগতিক দেখে বিনয় বলল, সে অনেক কথা...তোমাকে পরে বলছি...তুমি এখন আমাকে কিছু খেতে দাও!

লোকটি আর কোনও প্রশ্ন না করে দুখানা রুটি আর খানিকটা ডাল বিনয়ের সামনে দিল। খিদেয় তখন বিনয়ের সর্ব-দেহ যেন চিৎকার করছিল—গোগ্রাসে সে খেতে আরম্ভ করল। একখানা রুটি শেষ করার পর বিনয়ের বড় তেষ্টা পেল।

—জল আছে?

লোকটি জল আনতে ঘরের বাইরে গেল। হঠাৎ সেইসময় বিনয় দেখল যে, তার সামনে একটা ছোট টিনের বাক্সের ওপর দুখানা চিঠি পড়ে রয়েছে। ডিটেকটিভের স্বাভাবিক প্রেরণায় বিনয় চিঠি দুটো নিয়ে জামার ভেতরের পকেটে রেখে দিল। নিশ্চয়ই চিঠি দুটো এই লোকটার ঠিকানায় এসেছে এবং সেই ঠিকানা থেকেই বোঝা যাবে, এ-জায়গাটা কোথায় এবং এই লোকটিরই-বা নাম কী! সে যে কোথায় আছে, নিঃসন্দেহভাবে সে-খবর এই চিঠির ঠিকানার মধ্যে পাবে এবং এই-থেকে পরে সে মৃত্যু-গুহারও হদিস বার করতে পারবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে লোকটি একটি ঘটিতে জল নিয়ে এল। ঘটিটি হাতে নিয়ে বিনয় আকণ্ঠ পান করল। লোকটি তার সামনে এসে চুপটি করে বসল। বিনয় দ্বিতীয় রুটিখানা সদ্ব্যবহার করবার জন্য সেখানা ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়ে দ্যাখে, তার জিভটা কেমন যেন আড়ষ্ট ঠেকছে! শুকনো রুটিতে তেষ্টা আরও বাড়ে মনে করে, ঘটির বাকি জলটুকুও সে নিঃশেষে খেয়ে ফেলল। কিন্তু জল খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে হল, তার মাথার মধ্যে কেমন যেন হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে গেল...চোখটা আপনা থেকে বুজে এল...ধীরে-ধীরে তার চোখের সামনে অপরাহ্নের সেই সুন্দর আলো—আবছা হয়ে এল...শুনল, লোকটা যেন অট্টহাস্য করে উঠল...তার কথার শেষ রেশটুকু তার কানে গেল...

—বাবু, ভেবেছিলে খুব পালালে...হাঃ! হাঃ! হাঃ!

দ্বিতীয় রুটিখানি আর শেষ করা হল না। বিনয়ের অচৈতন্য দেহ সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল।

দশ

বিনয়কে নিশ্চিতভাবে এই জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে—এই আশা নিয়ে উদাসীবাবা আবার তাঁর কর্মক্ষেত্রের দিকে ফিরলেন। অজ্ঞান অবস্থায় বিনয় যে-দুজন লোকের কথাবার্তা শুনেছিল, তার মধ্যে একজন ছিলেন উদাসীবাবা। যেদিন কলকাতার রাস্তায় বিনয় অজ্ঞাত শত্রুর হাতে ধরা পড়ে, সেদিন উদাসীবাবা তাঁর আসর ভেঙে নৌকাযোগে গঙ্গা ধরে উত্তর-মুখো হন। বিনয়ের পকেট থেকে বিনয়ের যে হাতের লেখা পাওয়া যায় তাই নকল করে উদাসীবাবা নিবারণবাবুকে একখানা চিঠি লেখেন। বিনয়ের নিরুদ্দেশের দশদিন পরে সেই চিঠি নিবারণবাবুর হাতে এসে পড়ে। আলমোড়া থেকে বিনয় লিখছে ঃ

কাকাবাবু,

আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আগে, আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনার গুরুদেবের কথা উল্লেখ করে আপনাকে মনোকষ্ট দিয়েছি। আমি যে কেন এইভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি তা কাউকে বলে যেতে পারলাম না। যদি পারেন, পিসিমাকে দেখবেন। ইতি—

উদাসীবাবা যদিও তাঁর নিজের কাজেই নিজের পরিচয় বেশ ভালোভাবেই দিয়েছেন, তবুও তাঁর আর একটু পূর্ব-পরিচয় দেওয়া দরকার। উদাসীবাবা নিজে একটা-কিছু করবার জন্যে তাঁর এই আখড়ার পত্তন করেছিলেন, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন এক অতি রহস্যময় গুপ্তদলের ভাড়াটে লোক! তাঁর কাজ ছিল, ছেলে সরবরাহ করা। এই সমস্ত ছেলে নিয়ে, কোনও সুদূর পার্বত্য-অঞ্চলের নির্জনতার মধ্যে এক অতি দুঃসাহসী তান্ত্রিক এক লুপ্ততন্ত্রের প্রক্রিয়া অনুসারে, চেষ্টায় ছিলেন, নর-রাক্ষস তৈরি করবার! এই সমস্ত রাক্ষসের চেহারা ঠিক মানুষের মতোই হবে, বাইরের দিক থেকে তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কিছু সন্দেহ করবার কোনও কারণ থাকবে না। কিন্তু আসলে তার মন, শক্তি এবং প্রকৃতি হবে সবই রাক্ষসের মতো। সেই বিলুপ্ত তন্ত্রের মতে, এইসব নর-রাক্ষস তাদের স্ব-স্ব প্রভু ছাড়া জগতে আর কারুর কোনও কথা শোনে না এবং জগতের কোনও বিষ বা আঘাত তাদের ওপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরা তখন অসাধ্য-সাধন করতে পারে। একদিন মানুষ যেমন দেবতা হবার জন্যে যোগ-যাগ, উপবাস ইত্যাদি বহুভাবে পালন করে এসেছে, এই বিলুপ্ত তন্ত্রের যিনি শাস্ত্রকার, তাঁর মতে, এইভাবে উল্টোদিকেও মানুষকে গড়ে তোলা যায়। মানব-সমাজ থেকে দূরে, মানুষকে নিয়ে এই ভয়াবহ পরীক্ষা সেদিন চলেছিল এবং বিনয়ের চরম দুর্ভাগ্য যে, সেই ভয়াবহ পরীক্ষার মধ্যে তার মতো ছেলে গিয়ে পড়ে।

উদাসীবাবা ফিরে এসে স্থির করলেন, যেখানে আখড়া ছিল সেইখানেই আবার ফিরবেন। তিনি তাঁর লোকদের পাঠিয়ে সমস্ত খবর নিলেন। নিবারণবাবুর কাছেও তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন...তাঁর অকস্মাৎ চলে যাওয়াতে নিবারণবাবু অত্যন্ত দুঃখিতই হয়েছেন এবং কৌশলে সে-লোকটি নিবারণবাবুর কাছ থেকে মিঃ গুপ্ত এবং বিনয় সম্বন্ধে সমস্ত খবর আদায় করে আনে। উদাসীবাবা সম্বন্ধে নিবারণবাবুর বিশ্বাস তেমনি আছে। মিঃ গুপ্ত প্রথম-প্রথম সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু এখন আর উদাসীবাবা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ সন্দেহ নেই। তিনি একরকম ধরেই নিয়েছেন যে, বিনয় আত্মহত্যা করেছে...মিঃ গুপ্তের পরামর্শ অনুসারে সে-কথা তিনি গোপনে রেখেছিলেন, এ-সংবাদ উদাসীবাবা সমস্তই সংগ্রহ করিতে পেরেছিলেন। যার ওপর সন্দেহের দরুন বিনয়ের দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়েছিল, সেই ঘন্টাকে তিনি ফেরবার পথে নির্জন পথ-হারা অরণ্যে একা ফেলে আসেন...বাঘ আর ভাল্লুকের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, মানুষের জগতে ফিরে আসবার তার আর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তাকে

তিনি অন্য উপায়ে আরও নিশ্চিতভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু কোথায় কেমনভাবে কখন পাথরের বুকে শীর্ণ জলের রেখা লুকিয়ে থাকে তা কেউ জানে না, সেইটুকু মায়ার দুর্বলতায় উদাসীবাবা ঘণ্টাকে আর নিজের হাতে প্রাণে মারলেন না। তবে তিনি জানতেন, যে-অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে এসেছেন, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার কোনও সম্ভাবনাই ঘণ্টার ছিল না।

এইভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে উদাসীবাবা সাহসে ভর করে আবার তাঁর সেই পুরনো আখড়াতেই ফিরলেন। তিনি জানতেন যে, সেইখানে ফিরে এলে লোকে আর তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

ফিরে এসে দ্যাখেন, পরিত্যক্ত কুঁড়েগুলি জীর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কলোনির লোকেরা একদিন সকালে বিস্মিত হয়ে দেখল যে, উদাসীবাবার আখড়ায় আবার মানুষের চলাফেরার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। দেখতে-দেখতে কথাটা উদাসীবাবার পূর্বতন ভক্তদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, বাবার আবির্ভাব হয়েছে!

দরজার গোড়াতেই ছিলেন, কপিলেশ্বরবাবু। প্রথমে এলেন তিনি, চরণে প্রণাম করে বললেন, আমরা তো ভেবেই সারা! ভাবলাম, আমাদের ভাগ্যে নেই!

উত্তরে—উদাসীবাবা দূরের দিকে চেয়ে, গলায় একটু শব্দ করে মৃদু হাসলেন মাত্র।

নিবারণবাবুর কাছে সংবাদ পৌঁছতেই তিনি সোজা মিঃ গুপ্তের থানায় গিয়ে উঠলেন। আনন্দে তাঁর বিপুল কলেবর কাঁপছিল। কোনওরকম ভূমিকা না করেই তিনি মিঃ গুপ্তকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠলেন, বলেছিলাম মিঃ গুপ্ত! দেখুন, আমার কথা সত্যি হল কি না! আরে বাবা, মানুষ চরিয়ে এতবড় হলাম, আর আমি কিনা মানুষ চিনি না!

মিঃ গুপ্তও শুনেছিলেন, যে উদাসীবাবা ফিরে এসেছেন এবং তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, লোকটা যদি কোনও অসৎ দলের নেতা হবে, তবে আপনা থেকে সে সেই জায়গায় ফিরে আসবে কেন?

নিবারণবাবু বলে উঠলেন, কি মিঃ গুপ্ত? বলি যে-লোকটা পালিয়ে যায়, সে আবার নিজে এসে ধরা দেয় নাকি? ছি-ছি, আপনারা কী সব তখন ভেবেছিলেন বলুন দেখি? এখন চলুন!

মিঃ গুপ্ত নিজের মনে সত্যি-সত্যি একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, আপনি যান নিবারণবাবু, আমি এখন আর যেতে পারছি না।

নিবারণবাবু নাছোড়বান্দা! আরে ভায়া, সাধু-স্থানে কি লজ্জা করতে আছে? আর, আমি তো আর উদাসীবাবাকে কোনও কথা বলছি না।

নিবারণবাবু মিঃ গুপ্তকে ছাড়লেন না। পথে যেতে-যেতে নিবারণবাবু মিঃ গুপ্তকে বললেন, দেখুন মিঃ গুপ্ত, বাবাকে বিনয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। সবাই তো নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে বলেই জানে, দেখা যাক, তিনি কী বলেন?

নিবারণবাবু ও তাঁর সঙ্গে মিঃ গুপ্তকে দেখে উদাসীবাবা বাইরে থেকে ঠিক তেমনিভাবে তাঁদের গ্রহণ করলেন, যেন কোথাও কিছু হয়নি!

নিবারণবাবুর একান্ত ঔৎসুক্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, এতদিন আপনি কোথায় অন্তর্ধান করেছিলেন?

উদাসীবাবা হেসে বললেন, কোথায় আর যাব বাবা, এইখানেই ছিলাম। দেখছিলাম, সাধু-সন্ন্যাসীদের ওপর তোমাদের কতখানি দরদ!

শেষের কথাগুলো নিবারণবাবুর বুকে গিয়ে যেন কাঁটার মতো বিঁধল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন।

উদাসীবাবা বলে যেতে লাগলেন, যে সব সাধককে সংসারের সীমানায় থেকে সাধনা করতে হয়, তাদের বড় বিপদ বাবা! পদে-পদে লোকে তাদের ভুল বোঝে, অতি সন্তর্পণে তাই মানুষের সমাজে তাদের বাস করতে হয়। ভেবেছিলাম, কাল পূর্ণ হয়েছে...তাই চলে গিয়েছিলাম...কিন্তু যাঁর কৃপায় আমার এ-জীবন...তিনি আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলেন...এখনও কাল পূর্ণ হয়নি।

শেষের কথাগুলো যে মিঃ গুপ্তকে লক্ষ করে ছোঁড়া হয়েছে, তা বুঝে মিঃ গুপ্ত বড়ই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। দোটানার মধ্যে পড়ে তাঁর মন তলিয়ে গেল।

ব্যাপারটা ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে উঠছে দেখে নিবারণবাবু অন্য কথা উত্থাপন করলেন...আপনি বিনয়ের কথা নিশ্চয়ই ভোলেননি?

—বিনয়! কে?

—আমার সঙ্গে যে-ছেলেটি আসত?

—ও হো-হো...হ্যাঁ-হ্যাঁ, ছেলেটির মুখে তখন বাপু কতকগুলি দুর্লক্ষণ দেখেছিলাম, তোমাদের বলব-বলব করে আর বলা হয়নি!

নিবারণবাবু ও মিঃ গুপ্ত দুইজনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। তাদের কোনও কথা বলার আগেই উদাসীবাবা নিজে জিজ্ঞাসা করলেন, বলি, ছেলেটি ভালো আছে তো?

নিবারণবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, সে তো আজ কয়েক মাস হল নিরুদ্দেশ! আপনি যেদিন চলে গেলেন, সেদিন থেকে তারও আর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না!

উদাসীবাবা হেসে বলে উঠলেন, তাই থেকে তোমরা ধরে নিলে যে, আমিই বুঝি ছেলেটিকে চেলা করলাম! তা বাবা, ভালো জিনিস দেখলে আমাদের একটু-আধটু লোভ যে হয় না, তা নয়। ভালো খাবার, ভালো পোশাক দেখলে যেমন তোমাদের মন আনচান করে, তেমনি আসল মানুষ বা, তার একটা টুকরো দেখলেই আমাদের মনটাও কেমন আনচান করে ওঠে!

মিঃ গুপ্ত এতক্ষণে তাঁর মন থেকে সমস্ত সন্দেহ আবার ঝেড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। তিনি এবার প্রশ্ন করলেন, আপনি যদি অনুগ্রহ করেন...বিনয় সম্বন্ধে কোনও খবর আপনি দেন...।

কথা শেষ করবার আগে উদাসীবাবার দিকে মিঃ গুপ্তের নজর পড়তেই তিনি দ্যাখেন যে, বাবা ধ্যানস্থ! নিবারণবাবু তখন ইশারায় জানালেন যে, ভয় নেই। বাবা ধ্যানে বসেছেন, সত্যি-মিথ্যে এখুনি বলে দেবেন।

মিঃ গুপ্ত বা নিবারণবাবু—এঁরা ইচ্ছে করেই বিনয়ের কাছ থেকে পাওয়া সেই চিঠিটার কোনও উল্লেখ করেননি। কিছুক্ষণ পর উদাসীবাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাইলেন।

নিবারণবাবু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, বাবা!

মিঃ গুপ্তের দিকে চেয়ে বাবা বললেন, সে তো আর জীবিত নেই, মিঃ গুপ্ত: তার আত্মা দেখছি, হিমালয়-অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে...বড় ব্যথিত...আত্মহত্যা করেছে কিনা!

মিঃ গুপ্ত এবং নিবারণবাবু দুজনেই আঁতকে উঠলেন! নিবারণবাবুর দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। বাবার অসাধারণ ক্ষমতার এরচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ নিদর্শন আর কী হতে পারে?

উদাসীবাবা বললেন, নিবারণ, তোর উচিত, তার প্রেতকৃত্যের একটা ব্যবস্থা করা।

নিবারণবাবু বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, বড় ভালো ছেলে ছিল সে!

—তুমি নিজে গয়ায় গিয়ে ব্যবস্থা করতে পারো কিংবা আমাকে যদি বলো, আমি লোক পাঠিয়ে তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—সেই ভালো বাবা, আমি টাকা দিচ্ছি, আপনি একটা লোক দিয়ে ব্যবস্থা করে দিন!

এগারো

এ-ধারে বিনয়ের যখন প্রেতকৃত্যের ব্যবস্থা হচ্ছিল, ও-ধারে বিনয় তখনও প্রেতলোকে গিয়ে পৌঁছয়নি, তবে প্রেতলোকের দরজায় দাঁড়িয়ে তার আত্মা কাঁপছিল!

বিনয়ের জ্ঞান হলে সে দেখল, তার সামনে এক দীর্ঘ জটাজুটধারী বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে! বৃদ্ধ বটে,

কিন্তু তাঁর দেহের কোথাও এতটুকু জায়গা যৌবনের সাবলীল ঋজুতাকে হারায়নি। দুটি চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে! দীর্ঘ-লম্বিত বাহু, সেই বাহুর শেষে আঙুলগুলিও বাহুর তুলনায় দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ। স্থিরদৃষ্টিতে তিনি বিনয়ের দিকে চেয়েছিলেন। একটু-একটু করে যখন বিনয়ের জ্ঞান ফিরে এল, বিস্ময়ে সে সেই অপরূপ ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর সেই অপরূপ বৃদ্ধটি বললেন, তুমি ভেবেছিলে, লোকটাকে পাথর চাপা দিয়ে খুব পালালে! দেখছ, পালাতে পারোনি?...যে একবার এখানে ঢোকে তার আর পালাবার কোনও উপায় নেই...সমস্ত পথঘাট বেঁধে আমি আমার এই সাধন-গুহা তৈরি করেছি...তুমি না দেখতে পাও, এর প্রত্যেকটি জায়গা, প্রত্যেকটি ছিদ্র আমি সতর্ক-প্রহরী দিয়ে ভরিয়ে রেখেছি। অতএব, ফিরে যাবার আশা মন থেকে ত্যাগ করে দাও।

বিনয় চুপটি করে সব শুনল। হ্যাঁ কিংবা না...ভালো কিংবা মন্দ—কিছুই বলবার বা ভাববার শক্তি যেন তার ছিল না।

সেই বৃদ্ধটি তেমনি নিস্পৃহকণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন, তবে, তোমার জীবনের কোনও ভয় নেই। তুমি যদি আমার পরামর্শ মতো ভালোছেলের মতো চলো, তাহলে দেখবে, আমি তোমাকে এক নতুন মানুষ করে গড়ে তুলব...আর যদি বেয়াড়াপনা করো, তাহলে তোমার আগে যাদের নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম তাদের যে-দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে...তোমার বিশ্বাসের জন্যে আমি তোমাকে সে-দৃশ্য দেখাতে চাই।

এই বলে তিনি তিনবার কী নাম ধরে ডাক ছাড়লেন...বিনয় দেখল, পাহাড়ের এক কোণ থেকে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে এল, লোকটি আরও কাছে এলে...লোকটিকে যেন এর আগে সে কোথায় দেখেছে...হ্যাঁ, মনে পড়েছে, উদাসীবাবার আখড়াতেই দেখেছে...এই সেই লোক, যার হাতে সে ছ'টা আঙুল দেখেছিল...উদাসীবাবার আখড়া থেকে এই অজানা পার্বত্য-অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট ষড়যন্ত্রের সমস্ত ব্যাপারটা সে যেন মনে-মনে গেঁথে ফেলল।

লোকটা কাছে আসতে দলপতি-বৃদ্ধ তার নাম ধরে ডেকে বললেন, ঘণ্টা, তোমার ওপর ভার দিলাম এই ছেলেটির...এটি তোমারই শিকার, সুতরাং তোমারই জিম্মায় একে রাখলাম! একে তুমি ৩নং গুহায় নিয়ে যাও...সেখানে একবার একে দেখিয়ে দাও—এর মতো যারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তাদের কী অবস্থা হয়েছে...তারপর রাত্তিরে ওকে ৫নং গুহায় রেখে দেবে...বুঝলে?

বিনয় দেখল, ঘণ্টা তার দিকে এগিয়ে এল...একবার মনে হল যে, শিকারী-কুকুরের মতো লাফিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, বাঁচবার যদি কোনও সম্ভবনা থাকে, তবে তাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলে কী লাভ?

বিনয়ের দু-পাশ থেকে দুজনে এসে পিছমোড়া করে তার দু-হাত বেঁধে ফেলল, তারপর একটা পুরু কালো ন্যাকড়া দিয়ে তার দু-চোখ ভালো করে বেঁধে দেওয়া হল। সেই অবস্থায় ঘণ্টা তাকে নিয়ে চলল।

কোথা দিয়ে, কীভাবে তাকে নিয়ে যাওয়া হল, সে তা কিছুই বুঝতে পারল না, শুধু বুঝতে পারল, তাকে বারকতক উঁচু আর নিচু ওঠা-নামা করতে হচ্ছে! পথে যেতে-যেতে বিনয়ও কোনও কথা বলে না, যে লোকটা তাকে নিয়ে চলেছিল, সে-ও কোনও কথা বলে না...।

তোমরা হয়তো ভাবছ, ঘণ্টা এখানে এল কী করে! তাকে তো উদাসীবাবা নিবিড় বনে বাঘ-ভাল্লুকের মুখে ফেলে রেখে এসেছিলেন! আজ বারো বছর ধরে এই লোকটা উদাসীবাবার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছে, তাঁর সমস্ত পাপ-কাজে সেই-ই ছিল তাঁর প্রধান সহায়। সে যখন দেখল, নির্জন অরণ্যে তাকে ফেলে রেখে তাঁরা চলে গিয়েছেন, তখন তার ক্রূর মনে সবচেয়ে বেশি রাগ জেগে

উঠল তাঁর প্রতি, যাকে সে কুকুরের মতো এতদিন ধরে অনুসরণ করে এসেছে। এতদিন তার মনে যে-অনুরাগ, যে-প্রভুভক্তি ছিল, আজ তা তেমনি তীব্র প্রতিহিংসায় পরিণত হল। সে মনে-মনে স্থির করল যে, কোনওরকমে যদি সে একবার এই বন থেকে বেরুতে পারে, সে জানে কী করে এই তাচ্ছিল্যের প্রতিশোধ নিতে হয়! প্রথম দিন সূর্যের আলো থাকতে-থাকতে সে নিজের মনে একদিক ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু যত হাঁটে, বন ততই যেন গভীর হয়ে ওঠে! ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। নিবিড় বনের মধ্যে সে-অন্ধকার যে কী ভয়ানক-মূর্তি হয়, তা যে ভুক্তভোগী সে-ই শুধু জানে।...তখন সে নিরুপায় হয়ে একটা গাছের ওপর চড়ে রাত কাটাবার মনস্থ করল, গাছের ওপর চড়ে সে যত শোনে বাঘের ডাক, ততই তার মনে পড়ে উদাসীবাবার চেহারা আর সেইসঙ্গে বন্য হিংস্র পশুর মতো সে ক্ষেপে ওঠে! উদাসীবাবাকে যদি পায় এইমুহূর্তে, সে যেন তাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফ্যালে! রাত প্রভাত হলে সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল! কিছু পথ হাঁটে আর গাছে চড়ে দেখে কোথাও খালি জায়গা কিছু দেখা যাচ্ছে কি না। হঠাৎ দুপুরের দিকে এক উঁচু গাছে চড়ে দেখতে পেল, সে যেদিক ধরে যাচ্ছিল, তার বাঁ-দিকে আকাশে অসংখ্য শকুনি উড়ছে... শকুনিগুলো পাক খেয়ে-খেয়ে একই জায়গায় ঘুরছে...মনে পড়ে গেল সেই ভয়াবহ বৃদ্ধের কথা...সে নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছে...কীভাবে বন্দি ছেলেদের অসাড় মৃতদেহ শকুনিদের খাওয়ানো হতো। গাছ থেকে নেমে সে সেইদিকে রওনা হল। সন্ধ্যার মুখে পাহাড়ের সেই চটিতে এসে সে উপস্থিত... পাহাড় থেকে যে দুটি পথ নেমে গিয়েছে, তার দুই মুখে এইরকম দুটি চটি ছিল এবং তাতে একজন করে সেই বৃদ্ধের লোক পাহারায় থাকত। কোনও বন্দি যদি পালাবার চেষ্টায় সফল হত, তাহলে তাকে সেই চটিতে আসতেই হত...সেখান থেকে আবার তাকে বন্দি করে ভেতরে চালান দেওয়া হত। ঘণ্টাকে ফিরে আসতে দেখে, চটিদার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হে, তুমি ফিরে এলে যে?

ঘণ্টা বললে, উদাসীবাবা একটা জিনিস ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তিনি পাঠিয়ে দিলেন।

এইভাবে ঘণ্টা তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য আবার সেই গুহার দেশে ফিরে এসেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল—কীভাবে, উদাসীবাবার ওপর সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারে!

বিনয়কে নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল—এই ছেলেটিকে দিয়ে তো তার কাজ হাসিল হতে পারে! কিন্তু বৃদ্ধ যদি জানতে পারে?...সে স্থির করল, প্রথমে সর্বভাবে সে বৃদ্ধের বিশ্বাস অর্জন করবে, তারপর...

তাই হঠাৎ সে বিনয়ের দিকে চেয়ে বললে, জানো, তুমি কোথায় এসেছ?

—না।

—জানো, এখানে এলে আর কেউ ফিরে যেতে পারে না?

—শুনেছি।

—তুমি ফিরে যেতে চাও?

সেই নিশ্চিত মৃত্যুর দেশে হঠাৎ সেই আশার প্রশ্ন শুনে বিনয় থমকে দাঁড়াল!

—আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

—সত্যি পারো?

—হ্যাঁ।

—আমি যা বলব, ঠিক সেইমতো কাজ করে যাবে...।

—কিন্তু, আমাকে মুক্তি দিয়ে তোমার লাভ?

—আছে! পরে বলব।

আশায়, আনন্দে বিনয়ের বুক উদ্বেল হয়ে উঠল।

বারো

পরের দিন বৃদ্ধ ঘণ্টাকে ডেকে বললেন, দ্যাখো, তোমার এখন যাওয়া হবে না...ওই ছেলেটির ভার তোমার ওপর দিলাম। ১নং গুহায় ওকে সাতদিন রেখে দেবে এবং প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় এই শেকড়-বাটা জল ওকে খেতে দেবে। আটদিনের দিন ও যখন অচৈতন্য হয়ে পড়বে, তখন আমাকে খবর দেবে। আর, এর মধ্যে যদি দ্যাখো যে, গোলমাল করছে, তা হলে এই জিনিসটা একবার নাকের কাছে শোঁকাবে...তখুনি ও অচৈতন্য হয়ে পড়বে।

এই বলে সেই শেকড়টি আর একটি বড়ির মতো নরম জিনিস তিনি তার হাতে দিলেন। দেওয়ার সময় বলে দিলেন, এই বড়িটি সম্বন্ধে তুমি নিজে খুব সাবধানে থাকবে, হাওয়ার সংস্পর্শে এলেই এর কাজ আরম্ভ হবে...সেইজন্যে একে সর্বদাই ভালো করে মুড়ে রাখবে।

তিনদিন ১নং গুহায় থাকার পর ঘণ্টা আর বিনয় গোপনে সেই পাহাড়ে-পথ দিয়ে বেরুল। সেই চটির কাছাকাছি এসে বিনয়কে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে ঘণ্টা চটিদারের সঙ্গে দেখা করতে চলল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে বলল, কাজ সাবাড়! চলে এসো।

ঘণ্টা আগে-আগে চলতে লাগল—বিনয় তার পিছনে-পিছনে চলল। আজ তার কাছে এই খুনে লোকটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়...কিন্তু তার কাছে রয়েছে সে-বড়ি! যতক্ষণ তার কাছে সেই বড়ি রয়েছে, বিনয়ের মনে সোয়াস্তি নেই!

তিনদিন হাঁটার পর, পাহাড়ে দেশ ছেড়ে তারা সমতল ক্ষেত্রে এসে পড়ল। পথে আসতে-আসতে বিনয় প্রত্যেক পথের মোড়ে একটা করে নিশানা রেখে দিয়ে আসছিল, প্রথমে ঘণ্টা তা লক্ষ করেনি। হঠাৎ তার নজরে পড়তে সে জিজ্ঞাসা করল, এটা কী হচ্ছে কত্তা?

—যদি কোনওদিন ফিরতে হয়...।

—তুমি কি মনে করো কত্তা, বুড়ো যখন জানতে পারবে আমরা পালিয়েছি...সে আর ওখানে থাকবে? সুতরাং বৃথা তুমি কষ্ট করছ... ও-বুড়োকে ধরার আশা তুমি ছেড়ে দাও...যদি তোমাদের শহরে পৌঁছতে পারি... তবে সেই পাজিটাকে শায়েস্তা করতে হবে...তবে, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ—।

—সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো, ঘণ্টা! জগতে তোমার কথা কেউ জানতে পারবে না...কিন্তু তোমার ওই মারাত্মক বড়ি তোমাকে ফেলে দিতে হবে।

—এতবড় একটা দামি অস্ত্র ফেলে দিতে হবে? তারচেয়ে আমি এ-জিনিস তোমাকেই দিয়ে দিলাম। আমরা মরণকে নিয়ে খেলা করি...প্রয়োজন হলে আমরা যে-বিশ্বাস মনে আনতে পারি...তা তোমরা পারো না।

এই বলে সেই বড়িটা সে বিনয়ের হাতে দিয়ে দিল—একটা কৌটোতে সেটা ভরা ছিল—বিনয় কৌটোটা পকেটে রেখে দিল।

শেষ

ও-ধারে আজ উদাসীবাবার আখড়ায় খুব শোরগোল। নিবারণবাবু গয়ায় না গিয়ে, বিনয়ের প্রেতকৃত্যের ব্যবস্থা সেইখানেই সারবার ব্যবস্থা করেছেন। সকাল থেকে তিনি নিজে সেখানে মোতায়েন আছেন।

কপিলেশ্বরবাবুও সেখানে আছেন। উদাসীবাবা নিজে পুরোহিতের কাজ করতে রাজি হয়েছেন।

মিঃ গুপ্ত কাজ সেরে সকাল-সকালই চলে আসবেন, কিন্তু ক্রমশ বেলা বাড়তে লাগল। নিবারণবাবু, মিঃ গুপ্তের আসতে দেরি দেখে একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছেন।

যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। নিবারণবাবু ঘড়ি ধরে আছেন। শুভকাজ সব লগ্ন-অনুযায়ী হওয়াই উচিত।

ঘড়িতে আর মিনিট দুয়েক বাকি আছে দেখে নিবারণবাবু উদাসীবাবাকে কাজ আরম্ভ করবার জন্যে আহ্বান করে আনতে ভেতরে ঢুকলেন।

ক্ষণকাল পরেই উদাসীবাবা দেখা দিলেন। দিব্য ক্ষৌমবসন-পরা উদাসীবাবা গম্ভীর পদক্ষেপে পুরোহিতের আসনের দিকে অগ্রসর হলেন...।

এমনসময় বাইরে মোটরের শব্দ হওয়াতে সকলেই সেদিকে ফিরে চাইল। মোটর থামতেই মিঃ গুপ্ত নামলেন এবং তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে আরও দুজন লোক নামল।

শেষের দুজনকে দেখে নিবারণবাবু এবং উদাসীবাবা দুজনে একসঙ্গে চমকে উঠলেন!

উদাসীবাবা আসনে বসতে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন...কী মনে করে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরের দিকে ঢুকলেন...।

নিবারণবাবু কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। বিনয়...তার প্রেতাকার্য করতে আজ যাঁরা সবাই এসেছেন...তাঁরা সবাই বিস্ময়ে দেখেন যে, সেই বিনয়! তার নিজের শ্রাদ্ধে সে নিজে এসে উপস্থিত!

বিস্মিত জনতাকে বিমূঢ় করে বিনয় পিস্তল হাতে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল...সঙ্গে মিঃ গুপ্ত।

কালবিলম্ব না করে বিনয় বাঘের মতো লাফিয়ে উদাসীবাবার ঘাড়ের ওপর পড়ে সোজা তার বুকে পিস্তল বসিয়ে হুকুম করল ঃ

—সোজা বেরিয়ে এসো!

বিমূঢ় জনতা দেখল...উদাসীবাবা দু-হাত তুলে পিছু হটতে-হটতে বেরিয়ে আসছেন।

নিবারণবাবু বিমূঢ় বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, বিনয়!

বিনয়, উদাসীবাবার বুকের দিকে তেমনি পিস্তল লক্ষ্য করে হেসে বলে উঠল, অপরাধ নেবেন না, কাকা! আবার ফিরে এলাম...এবং আপনারই চোখের সামনে আপনার ইষ্টদেবতার হাতে এবার হাতকড়ি দিতে হবে।

বলতে-বলতে দুজন পাহারাওয়ালা এসে উদাসীবাবার হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।

বিনয় নিবারণবাবুকে ডেকে বলল, অতি দুঃখের বিষয় কাকা, যে, আপনাকে এবার গুরু বদলাতে হবে এবং আপনার গুরু যে কী চিজ তা আপনার গুরুর একদা অনুচর—ঘণ্টার কাছেই সব শুনতে পাবেন।

উদাসীবাবা একবার অতি হিংস্রভাবে ঘণ্টার দিকে চাইলেন।

ঘণ্টা তেমনিভাবে সোজা তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিল, এমনি করেই একদিন পাপের শেষ হয়!

মিঃ গুপ্তের গাড়ি আসামীকে নিয়ে সবেগে থানার দিকে চলে গেল।

কারাগারে কৃষ্ণা

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এক

তাড়াতাড়ি কলেজে বেরোবার মুখে যে-পত্রখানা কৃষ্ণার হাতে এসে পড়ল, সেখানা তখন পড়বার সময় না পেয়ে সে তার ব্যাগের মধ্যে পুরে রাখলে।

ক্লাস আরম্ভ হবার দু-মিনিট আগে সে কলেজে পৌঁছল এবং তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে বসল। তারপর পত্রের কথা তার আর মনেই রইল না সারাদিন।

বৈকালে বাড়ি ফিরেও সে ভুলেছিল...মনে পড়ল রাত্রে খাওয়ার সময়।...'তাই তো, কী যে ভুল আমার, সারাদিনটা গেল—পত্রখানার কথা মনেও পড়ল না একবার!'

খাবার টেবিলে বসে মামা প্রণবেশ গম্ভীরমুখে বললেন, 'কার পত্র? কে লিখেছে কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা হাসিমুখে বললে, 'সেইকথাই তো বলছি, মামা। চিঠিখানা না খুললে কেমন করে বুঝব যে, পাঠিয়েছে কে আর কোথা থেকে আসছে! মোট কথা, মোটেই সময় পাইনি পড়বার। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া যাক, কী বলো?'

প্রণবেশেরও ইচ্ছা তা-ই। তাঁকেও আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে হবে; কারণ, আজই লাইব্রেরি থেকে তিনি একখানা ডিটেকটিভ উপন্যাস এনে একনিশ্বাসে দু-ঘণ্টায় খান-তিরিশ পাতা পড়ে ফেলেছেন এবং বাকিটুকু যে আজ রাত্রেই শেষ করে ফেলবেন সে-সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

পড়াটা তাঁর বরাবরই ধীর, এজন্য কৃষ্ণার অনুযোগের অন্ত নেই, কিন্তু মামা এককথায় সেরে দেন। তিনি নিজের সঙ্গে কচ্ছপের ও কৃষ্ণার সঙ্গে খরগোশের তুলনা দিয়ে গম্ভীরভাবেই বলেন, 'হলুমই-বা আমি কচ্ছপ, তবু যে-কোনও কাজে আমার নিষ্ঠা আর একাগ্রতা আছে এ-কথা তো মানবি, কৃষ্ণা! তোর সব কাজ তাড়াতাড়ি—পড়াও তাড়াতাড়ি—একবার চোখ বুলিয়ে যাস বই তো নয়। কিন্তু আমি? আমি যতটুকু পড়ি, চিবিয়ে-চিবিয়ে পড়ি, কুড়ি বছর পরেও সে-পড়ার কথা আমার মনে থাকে—জানিস?'

তারপর আরম্ভ করে দেন ছোটবেলায় শেখা একটি কবিতা—'ও কল মাই ব্রাদার ব্যাক টু মি।' ...আর কবিতার এই লাইনটি আবৃত্তি করেই সগর্বে বলেন, 'দেখলি তো, সেই কোন ছোটবেলাকার কবিতা, আজও কেমন জলের মতো মুখস্থ বলতে পারি—কোথায় কমা, কোথায় ফুলস্টপ, কোথায় সেমিকোলন—কোনও জায়গা আমার ভুল হয় না—তবুও তুই বলতে চাস...'

কৃষ্ণা হাসে। মামার বুদ্ধির প্রশংসা করে...স্মরণশক্তির প্রশংসা করে।

খাওয়া শেষ করে হাত-মুখ ধুয়ে প্রণবেশ নিজের ঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন, তারপর আরাম করে বিছানায় শুয়ে বইখানা খুললেন।

'মামা, জেগে আছ? ...মামা?'

বলতে-বলতে ভেজানো দরজা ঠেলে প্রবেশ করলে কৃষ্ণা, তার হাতে একখানা খোলা পত্র, মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন!

বইখানা পাশে রেখে দিয়ে প্রণবেশ আশ্চর্যভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে, কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা বললে, 'এই দেখো, কী অদ্ভুত একখানা চিঠি এসেছে! নাঃ, যত সব ভেজাল বাপু, একেবারে জ্বালিয়ে খেলে! এতটুকু সুখ-শান্তি যদি পাওয়া যায়!'

কথা না বলে প্রণবেশ তার হাত থেকে পত্রখানা নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন; কৃষ্ণা বলে চলল : 'পারব না ইচ্ছে করলেই হয় না, মামা, কোথা থেকে ফ্যাসাদ আসে দেখো। এই যে আমার পড়াশুনো—এসব এবার শিকেয় তুলতে হবে, নইলে দেখছি নিস্তার নেই। এখন ভাবছি,

কেনই-বা মরতে শখের গোয়েন্দাগিরি করতে গেলুম, হল বটে লোকের উপকার, কিন্তু এর ম্যাও সামলাতে আমার যে প্রাণ যায়!'

প্রণবেশ বিরক্তকণ্ঠে বললেন, 'চিঠিখানা আগে পড়তেই দাও বাপু, তারপরে যত পারো কথা বলো—'

প্রণবেশের পড়ায় যে কতটা সময়ক্ষেপ হয় তা অনুমান করে কৃষ্ণা চুপ করলে। সে তাকিয়ে রইল মামার মুখের দিকে।

পড়তে-পড়তে প্রণবেশের মুখখানা অন্ধকার হয়ে উঠল। প্রায় দশ মিনিট তিনি একাগ্রমনে পত্রখানা পড়লেন, তারপর আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন—'উঁহু, বড় জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে কৃষ্ণা, এর মধ্যে না যাওয়াই ভালো।'

প্রণবেশের সামনা-সামনি চেয়ারখানায় বসে কৃষ্ণা বললে, 'কিন্তু, আশ্চর্য দেখেছ মামা, তোমাদের সঙ্গে আবার এঁদের বিশেষ সম্পর্ক আছে, মায়ের সেই সম্পর্ক ধরে এই মেয়েটি আমার মাসি হয় বলতে পারো। কিন্তু কই মামা, কোনওদিনই তো তোমাদের মুখে এই বোনটির কথা শুনিনি বাপু!'

প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'আমিও এঁদের বিশেষ চিনিনে, কৃষ্ণা। তবে বাবার মুখে একবার শুনেছিলুম, তাঁর এক ভাই নাকি তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় চলে যান, তারপর অনেক সন্ধান করেও তাঁরা সেই ভাইয়ের কোনও খোঁজ পাননি। এখন এই চিঠিখানা দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি আগে মালয়ে, পরে আসামের ল্যাংটিংয়ে ছিলেন এবং সেখানেই বিবাহ করে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরই এই মেয়েটি বিপদে পড়ে তোমায় পত্রপাঠ যাওয়ার জন্যে লিখেছে, এই তো?'

কৃষ্ণা বললে, 'হ্যাঁ, পড়লে তো, এর ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ পিতাকে ওদের শত্রুরা বন্দি করে রেখেছে...পুলিশের সাহায্য নিয়েও তাঁকে উদ্ধার করতে পারা যায়নি, সেইজন্যে আমার সাহায্য চাচ্ছে। কিন্তু আমি ভাবছি, এ-মেয়ে আমাকে চিনলে কী করে! আমি যে মাঝে-মাঝে শখের গোয়েন্দাগিরি করি তাই-বা জানলে কীভাবে, অবাক হয়ে শুধু সেই কথাই ভাবছি।'

একটু হেসে প্রণবেশ বললেন, 'খবরের কাগজের মারফতে তুমি যে কতখানি বিখ্যাত হয়ে পড়েছ, তা তো জানো না, কৃষ্ণা! মাকড়সার মতো আপনার জালের মধ্যে জড়িয়ে থাকলেও, বাইরের জগৎ তোমাকে দেখতে পাচ্ছে। তারপর এই কিছুদিন আগে মিঃ সেনের মামলায় তোমার নামটা আরও অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। যাক, এখন কী করবে তাই বলো দেখি?'

বিকৃতমুখে কৃষ্ণা বললে, 'আমার চেয়ে সে-ভাবনা তোমারই করা উচিত মামা। তোমার কাকা...তাঁর মেয়ে...বিশাল সম্পত্তিও যে সঙ্গে নেই তাই-বা কে বলতে পারে? মেয়েটি, মানে, তোমার এই বোনটি যে খুব বিপদে পড়েই এ-চিঠি লিখেছে এটা তো বুঝছ!'

লজ্জিত প্রণবেশ ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ, বুঝেছেন তিনি।

কৃষ্ণা হাতের পত্রখানা নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে, 'যাক, ঘুরেই আসা যাক—কী বলো, মামা? বেশিদূর তো নয়; মানে, তোমার-আমার কাছে পথের দূরত্ব বেশি নয়। আর, আমার চেয়ে তোমারই আপনার লোক তো বটে!'

প্রণবেশ বাধা দিলেন, রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'ও-কথাটি বলো না, কৃষ্ণা। দেখছ তো এ-মেয়ে বাঙালি নয়, নাম রয়েছে রুমা। কোন জাত তাও জানিনে, তবু আমাকে তার নামগোত্র বলতে হবে এ হতেই পারে না। কোথাকার কে পথের মেয়ে, কোন একটা হারানো সম্পর্ক ধরে কিনা—।'

রাগে-রাগে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না।

তাঁর রাগ দেখে কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'যাকগে, ধরলুম তোমার কেউ নয়, শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি অসহায় মেয়ে; তার বৃদ্ধ পিতা শত্রুর হাতে বন্দি, কেবল এইজন্যেই আমি তার কাজ করতে

যাব। মেয়েদের বিপদে মেয়েরা না দেখলে কে দেখবে বলো? সেইজন্যেই আমার যাওয়া উচিত, তা ছাড়া যখন এসব ব্যাপারের কিছু-কিছু আমার জানা আছে।' একটু থেমে সে বললে, 'কাল সকালেই তুমি বরং দুখানা টিকিট করে নিয়ে এসো মামা, দেরি করো না। সামনে পুজোর ছুটি আসছে, একদিন বাদেই কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে, ছুটির অবকাশটা না-হয় ওধারটায় কাটিয়ে আসা যাবে—কী বলো?'

এ-প্রস্তাবে প্রণবেশ মোটেই খুশি হলেন না। পুজার আনন্দটা যে তিনি বাংলার বাইরে গিয়ে নষ্ট করতে চান না, সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যায়; বললেন, 'পুজোটা বরং কেটে যাক, তারপর একদিন রওনা হলেই হবে, না কি বলো, কৃষ্ণা?'

হাতের পত্রখানার উপর চোখ রেখে কৃষ্ণা বললে, 'দেরি করেই বা লাভ কী, এখন গেলে, এ-মাসের মধ্যেই আবার ওখানকার কাজ সেরে ফিরে আসতে পারব।'

একটু ইতস্তত করে প্রণবেশ বললেন, 'পুজোর সময়টা কলকাতার বাইরে যেন কেমন-কেমন লাগে!'

কৃষ্ণা বললে, 'কী যে বলো মামা! আচ্ছা, তোমার বয়েস কত হলো বলো তো? আজও কি ছেলেমানুষ আছ, যে, পুজোর সময় নতুন জামা-কাপড় পরে নেচে বেড়াবে? না, না, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না মামা, বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর হও, নইলে কেউ তোমায় মানবে না। যাক, কাল সকালেই একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো, আমরা পরশু রবিবারে এখান থেকে রওনা হয়ে যাব।'

সে উঠে দাঁড়াল।

মুখখানা কাঁচুমাচু করে প্রণবেশ বললেন, 'রবিবার না গিয়ে, সোমবার গেলেই তো হয়।'

কৃষ্ণা ফিরে দাঁড়িয়ে, বিস্মিতকণ্ঠে বললে, 'কেন, রবিবারে তোমার কোনও জরুরি কাজ—মানে, তোমাদের ব্যায়াম-সমিতির বার্ষিক অধিবেশন না কি?'

প্রণবেশ ব্যায়াম-সমিতির একজন সভ্য। গোপনে-গোপনে তিনি যে শক্তিচর্চা করেন, কৃষ্ণার পরিহাসের ভয়ে তিনি এ-কথা কৃষ্ণাকে জানাননি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণা সে-কথা জানতে পেরেছে।

লজ্জিত প্রণবেশ মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'না-না, তা ঠিক নয়, কথাটা হচ্ছে—রবিবার, নিষ্ফলা বার কিনা...।'

'নিষ্ফলা বার!'

কৃষ্ণা হেসে উঠল। ...'নাঃ, পাঁজিপুঁথিও দেখতে শিখেছ মামা, এবার হাঁচি-টিকটিকি, কাশি-হাসি-কান্না সবকিছুই মানবে, আর আমাকেও মানাবে দেখছি। ওসব আশ্চয্যি বিধান একালে চলবে না, মামা...নিষ্ফলা হলেও আমার অধ্যবসায়ে আমি ওই নিষ্ফলা বারটাকেই সফলা করে তুলব। তুমি বাপু আর ফ্যাকড়া তুলো না, এখন একটু স্বস্তিতে কাজ করতে দাও আমায়।' বলেই বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা ভেজিয়ে দিতে-দিতে আবার বললে, 'ও ডিটেকটিভ-উপন্যাসখানা আজ তুলে রেখে দাও মামা, এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমোও।'

তারপর আর তার সাড়া পাওয়া গেল না।

দুই

এত জায়গা থাকতে মায়ের কাকা যে আসামে গিয়ে পড়লেন কেন, আর সেখানেই-বা সংসার পেতে বসলেন কী জন্যে, কৃষ্ণা বুঝতে পারে না।

কিছুকাল আগে বিশেষ কাজের জন্যে তাকে একবার আসামে যেতে হয়েছিল। আসামের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত দু-দিনের জন্যে ভালো লাগলেও, সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করা যায় না বলেই তার বিশ্বাস।

ট্রেনে বসে সে আর-একবার পত্রখানা পড়ল।

পত্রখানা পোস্ট হয়েছে গৌহাটি থেকে। পত্রের ভিতরে এককোণে গ্রামের নাম দেওয়া আছে—'মিয়াং', তার নিচে তারিখ দেওয়া। তারিখ দেখে বোঝা যায়, এ-পত্র লেখা হয়েছে, আজ থেকে ঠিক উনিশ দিন আগে।

অপরিচিতা মেয়েটি লিখছে ঃ

প্রথমে এই পত্রখানা হাতে পড়লেই ভাববে, কে ইনি? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আমি অপরিচিতা নই! তোমার মা আমার দিদি ছিলেন, সে-হিসাবে আমি তোমার মাসিমা।

আমার বাবা ভবতোষ চৌধুরী, তোমার মায়ের নিজের কাকা। ভাগ্যদোষে তিনি আজ এখানে তাঁর শত্রুপক্ষের হাতে বন্দি হয়ে আছেন। তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে, এখানকার পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও সে-সন্ধান পায়নি। জানি না এ-পত্র তোমার কাছে পৌঁছবে কি না, কারণ, আরও যতবার এমনিভাবে পত্র দিয়েছি, কোনও পত্রই আমার বিশ্বাসী কেউ পোস্ট করেনি। আজ পাঁচটাকা পাওয়ার লোভে একটি গরীবের ছেলে এ-পত্র ডাকে দেবে বলেছে। যদি এ-পত্র পাও, একটুও দেরি না করে পত্রপাঠ চলে আসবে। গৌহাটিতে নেমে, ব্রহ্মপুত্রে নৌকায় আসতে হবে—ওখানে খোঁজ করলে এ-জায়গার সঠিক বিবরণ জানতে পারবে, আসা মুশকিল হবে না। ট্রেনের পথ নয়, মোটরে আসা চলে, কিন্তু মোটর নিতে গেলেই জানাজানি হয়ে যাবে, আমায় হয়তো এরা সরিয়ে ফেলবে এখান থেকে। তোমরা নৌকা-পথে এসো। কাছারী-ঘাট থেকে দক্ষিণে চার মাইলের বেশি হবে না। এলে সব বলব।

—হতভাগিনী রুমা।

প্রণবেশ জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিলেন...ট্রেন আমিন-গাঁওয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে...স্টিমারে ওপারে পাণ্ডুতে পৌঁছে আবার ট্রেনে গৌহাটি যেতে হবে।

পত্রখানা ভাঁজ করে রেখে কৃষ্ণা মুখ তুললে। সন্ধ্যা হতে এখনো দেরি আছে। ট্রেন যত এগিয়ে চলে, দূরের পাহাড়শ্রেণী ততই কাছে আসছে দেখা যায়।

এদিককার স্টেশনের ব্যবধান বড় বেশি। কৃষ্ণা যখন পত্র পড়ছিল, সেইসময় একটা ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতে, কত লোক নেমে গেছে, উঠেছেও কয়েকজন, কৃষ্ণার তখন সেদিকে খেয়াল ছিল না। এখন পত্রখানা রেখে দিয়ে মুখ তুলতেই সামনে সে যে-লোকটিকে দেখতে পেলে, তার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না...দীর্ঘ দেহ, গায়ের রং তামাটে, একটা চোখ নেই, চোখের সাদা অংশটা শুধু উঁচু হয়ে উঠেছে। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে আছে, পানের ছোপে সেগুলো লাল হয়ে গেছে, সমস্ত মুখে তার বসন্তের ছোট-ছোট চিহ্ন।

একটা চোখেই সে চেয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে, তার সে-দৃষ্টিতে বুকের ভিতরে রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায়, কৃষ্ণা অস্বস্তি বোধ করে।

লোকটার গায়ে বার্মিজদের মতো ঢিলে জামা, পরনে নীল-ডোরা লুঙ্গি, মাথায় খুব ঘন কোঁকড়া চুল...এক পলকের দৃষ্টিতেই কৃষ্ণা এগুলো দেখে নিলে।

তারপর প্রণবেশের দিকে সরে বসে আর-একবার তাকিয়ে দেখলে, লোকটা ততক্ষণে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে, বাইরের পানে তাকিয়ে আছে...জানলার দিকে খানিকটা সরেও গেছে।

এতক্ষণে ধ্যানমগ্ন প্রণবেশের বাহ্যিক-জ্ঞান ফিরে এল। তিনি কৃষ্ণার দিকে ফিরতেই কৃষ্ণা চাপা সুরে বললে, 'পথে-ঘাটে অতটা আত্মসমাহিত হওয়া উচিত নয় মামা, বাইরের সঙ্গে কিছুটা

সম্পর্ক রাখা দরকার।'

প্রণবেশ বলতে যাচ্ছিলেন, 'কিন্তু—।'

কৃষ্ণা বাধা দিলে, 'থাক কিন্তু, তারচেয়ে এসো খানিকটা গল্প করা যাক, টাইমটেবলটা দেখো তো—গৌহাটিতে আমরা পৌঁছব কখন?'

প্রণবেশ টাইমটেবলের পাতা উল্টে দেখে বললেন, 'সন্ধের পরে পৌঁছব। কিন্তু তোমার মুখখানা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ হয়েছে না কি?'

তারপর কতকটা স্বগতোক্তি করলেন, 'তা আর হবে না? ছুটি হতে না-হতে আজ চলো আসাম, কাল চলো সীমান্তপ্রদেশে, পরশু চলো বিহার, তার পরদিন বম্বে! একটু বিশ্রাম নেই। শরীর আর কত সইবে!'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'কিন্তু মহাজনের বাণীটা স্মরণ করো, মামা—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়"। সেই মহাজনের নীতি অনুসারে চলো—শরীর হবে লোহার বলের মতো, যেদিকে গড়িয়ে দেবে, সেইদিকে চলবে।'

'তা বলে'...প্রণবেশ মুখ তুলে তাকাতেই একচক্ষু সেই লোকটির উপর চোখ পড়ে, তিনি যা বলতে চাচ্ছিলেন তা আর বলা হল না। সে-লোকটিও তাঁর পানে চেয়েছিল; হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আবার বাইরের দিকে চাইলে।

'বার্মিজ কিংবা অসমীয়া।' প্রণবেশ অস্ফুট উক্তি করেন।

কৃষ্ণা বললে, 'যাই হোক, তাতে কিছু আসে-যায় না, মামা। আমাদের কাছে সবাই সমান। মোট কথা, বাংলার আমদানি নয়, আর মনে হয় যেন পরিচিত...ও-মুখখানা কিছুদিন আগের দেখা। ভোল ফেরালেও চোখকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।'

সে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে বর্মার স্মৃতি—মাতা-পিতার মৃত্যু-কাহিনী মনে পড়ে যায়। নির্দয় দস্যুদের হাতে একদিন তার পিতা-মাতা উভয়েই নিহত হয়েছিলেন; হত্যার প্রতিশোধ সে নিয়েছে, তবু বেদনা তার বুক হতে মেলায়নি। আসামের পার্বত্য অঞ্চল আজ তার মনে বর্মার স্মৃতি জাগিয়ে তুলছিল...স্বর্গগত পিতা-মাতার কথা বিশেষ করে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

প্রণবেশ স্নেহের ভাগিনেয়ীর অন্তরের ব্যথা বুঝলেন, তাই হাতখানা সস্নেহে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু মা, বাপ-মা কারও চিরকাল বেঁচে থাকে না এ-কথা তো জানো। আমিও কিছু ভুঁইফোড় ছিলুম না। আমি ছিলুম মায়ের কোলের ছেলে—মা তাই আমাকেই ভালোবাসতেন বেশি। সেই মা যখন মারা গেলেন, আমি বুঝতে পর্যন্ত পারলুম না, তাই মরা মাকেই বারবার ধাক্কা দিয়ে "মা! মা!" বলে ডাকতে লাগলুম—।'

তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে; বললে, 'মা যদি স্বাভাবিকভাবে মারা যেতেন, আমার দুঃখ থাকত না, মামা। কিন্তু মাকে যে হত্যা করা হয়েছে! বাবাকেও তা-ই। ডাকাতেরা সবাই প্রায় ধরা পড়েছে জানি, ওদেরই দলের সেই আ-চিন দস্যুটা এতদিন কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিল, আজ এই প্রথম ওকে দেখতে পেলুম। আ-চিনও যে আমায় প্রথমে চিনতে পারেনি, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে তা বুঝেছি—যখনই ও বুঝেছে যে, ওকে চিনতে পেরেছি, তখনই ও চোখ ফিরিয়ে সরে বসেছে। তা হলেও চোখটা কিন্তু ওর এইদিকেই আছে—দেখছ? ও ভাবছে, আমাদের কথার এতটুকু টুকরোও যদি ওর কানে যায়—'

প্রণবেশ সচকিত হয়ে ওঠেন, শশব্যস্তে বলেন, 'থাক-থাক, আর এসব কথাবার্তায় কাজ নেই বাপু, কে জানে, শুনতে পেয়ে আবার কী ফ্যাসাদ বাধাবে! ওইজন্যেই তো আমি—'

ভ্রূকুঞ্চিত করে কৃষ্ণা বললে, 'খেপেছ মামা, ট্রেনের যা শব্দ, এতে একহাত দূরের

কথাও শোনা যায় না। আর আমাদের এসব কথার একটা বর্ণও যদি ও শুনতে পেয়ে থাকে, তবুও—।'

পিছনের বেঞ্চে একটা লোক এসে বসায় কৃষ্ণা চুপ করলে, হাতের টাইমটেবলটার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বললে, 'যাক, আর দেরি নেই, বোধহয় এসে পড়েছে।'

আমিন-গাঁওয়ে ট্রেন থামতেই যাত্রীরা সব নেমে পড়ল।

সামনে ব্রহ্মপুত্র। স্টিমার দাঁড়িয়ে আছে। বেশিরভাগ যাত্রী ওপারে যাবে, খুব কম লোকই আমিন-গাঁওয়ে থেকে গেল।

স্টিমারে ওঠবার সময় পিছন ফিরে কৃষ্ণা দেখলে, সেই একচক্ষু দস্যু আ-চিনও আসছে, সেও সম্ভবত ওপারে যাবে।

প্রণবেশ কেবিনের মধ্যে কৃষ্ণাকে বসিয়ে, বাইরে ডেকে এসে দাঁড়ালেন—তারপর রেলিংয়ে ভর দিয়ে সবেমাত্র ব্রহ্মপুত্রের সৌন্দর্য দেখছেন, সহসা...।

'বাবু কোনখানে যাবে?'

চমকে উঠে প্রণবেশ চেয়ে দেখলেন, তাঁর পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে...পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে আরাকানের লোক মনে হলেও, কথা শুনলে তাকে চট্টগ্রামের লোক বলে ধরা যায়।

লোক ভুল করেছে হয়তো। প্রণবেশ একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার জলের দিকে চাইলেন। তুফান-তরঙ্গে চঞ্চল কালো জল। এপারে-ওপারে পাহাড়...দিগন্ত-বিস্তৃত কেবল পাহাড়ের শ্রেণী। সেইসব পাহাড়ের গায়ে পটে-আঁকা ছবির মতো পাহাড়িদের ঘরগুলি দেখা যাচ্ছে...চমৎকার দৃশ্য!

লোকটা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, এবারে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কলকাতা থেকে আসছ বাবু? গৌহাটি যাবে, না কামিখ্যে যাবে?'

প্রণবেশ জবাব দিলেন; রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'যেখানেই যাই না, তোমার সে-খবরে দরকার কী বাপু? তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে! আমার খবরে তোমার দরকারটা কী বলো দেখি?'

লোকটি নিতান্ত নিরীহভাবে হাত কচলায়, খানিকক্ষণ অ্যাঁ-উঁ করে মাথা চুলকোয়, তারপর বলে, 'না বাবু, আমার এমন কিছু দরকার নয়। কলকাতায় আমার ছেলে থাকে কিনা; বড়বাজারের বেহারিবাবু গৌহাটিতে আসবেন, তাঁকে গৌহাটিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে ছেলে আমায় চিঠি লিখেছে—আমি যেন আমিন-গাঁও থেকে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই। সেইজন্যেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম বাবু, আমার নিজের কোনও দরকার নেই।'

'ও।' প্রণবেশ আশ্বস্ত হন। করুণার দৃষ্টিতে লোকটির পানে তাকিয়ে বলেন, 'না বাপু, আমার নাম বেহারিবাবু নয়, দেখো গিয়ে আরও জনকয়েক বাঙালি এসেছেন, ওঁদের মধ্যে কেউ যদি বেহারিবাবু থাকেন।'

বাবুর মিষ্টিকথা শুনে লোকটি কৃতার্থ হয়ে অভিবাদন করে অন্যদিকে চলে গেল।

তিন

গৌহাটি পৌঁছেই পরিচিত লোক পাওয়া গেল। প্রণবেশের বন্ধু সুজন মিত্র এখানে পুলিশ-বিভাগে কাজ করেন, স্টেশনেই দুই বন্ধুর দেখা হয়ে গেল।

'আরে, প্রণব যে! হঠাৎ এখানে?'

প্রণবেশ থমকে দাঁড়ালেন।

সুজন মিত্র যে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন নওগাঁ থেকে, তা তিনি জানতেন না। নওগাঁ থেকে তিনি কতবার প্রণবেশকে পত্র দিয়েছেন—প্রণবেশ যদি ওখানে বেড়াতে আসেন, কিন্তু প্রণবেশ বড় একটা কোথাও যেতে চান না। পত্র দিয়ে-দিয়ে বিরক্ত হয়ে শেষে সুজন পত্র দেওয়া বন্ধ করেছিলেন, সেইজন্যেই প্রণবেশ জানতে পারেননি যে, সুজন এখানে কাজ করছেন।

প্রফুল্লমুখে তিনি সুজনের প্রসারিত হাতখানা চেপে ধরলেন—'আরে, তুমি এখানে! যাক, আর ভয় নেই কৃষ্ণা, সুজনের এখানেই ওঠা যাবে।'

'কৃষ্ণা!' বিস্মিত সুজন পিছনে তাকান—'তাই তো, কৃষ্ণাও এসেছে যে। তোমার বিরাট দেহের আড়ালে কৃষ্ণাকে দেখতে পাইনি। যাক, এখন কী মতলবে দুই মামা-ভাগনী হঠাৎ আসামে পদার্পণ করেছ বলো দেখি? বিনা উদ্দেশ্যে যে নয়, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে সহাস্যে নমস্কার করলে, বললে, 'উদ্দেশ্যটা পরেই শুনবেন, এখন থাকবার মতো একটু জায়গা পেলে নিশ্চিন্ত হতে পারি। অজানা দেশ, নির্ভর করবার মতো আশ্রয়ের অভাবে শেষে স্টেশনেই না রাত কাটাতে হয়!'

সুজন মিত্র শশব্যস্ত হয়ে ওঠেন, 'তাই কখনো হতে পারে, যখন আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে! যদিও আমি থানায় এখন একাই আছি, তবু সেখানেই তোমাদের জায়গা দিতে পারব, শুধু আজকের জন্যে নয়—যতদিন তোমরা এখানে থাকবে ততদিন স্বচ্ছন্দে আমার ওখানে থাকতে পারবে। তা ছাড়া যদি পুলিশের কোনও সাহায্য দরকার হয়, তাও পাবে।'

কৃষ্ণা বললে, 'ভগবান হয়তো সেইজন্যেই স্টেশনে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, থানাতেই চলুন, সেখানেই কথাবার্তা হবে।'

সামনেই ঠিকা-গাড়ির আড্ডা। একখানা ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করে প্রণবেশ ও কৃষ্ণা যখন উঠছিলেন, সেইসময় কৃষ্ণা দেখলে, ট্রেনের সেই সহযাত্রীটিও অদূরে একখানা গাড়ি ঠিক করছে।

থানায় পৌঁছে প্রণবেশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, স্নানাদি সেরে এসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, 'ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যেই করেন, বুঝেছ, কৃষ্ণা! এবারে অনেকটা নিশ্চিন্তভাবে থাকতে পারা যাবে।'

কৃষ্ণা শূন্য চায়ের কাপটা সামনের টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে, 'তিনি যে মঙ্গলময় সে-বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটানোর জন্যে যে আমরা এখানে আসিনি, সে-কথাটাও মনে কোরো মামা!'

এ-কথা শুনে প্রণবেশ যেন ভাবরাজ্য থেকে ধূলার ধরণীতে ফিরে এলেন; লজ্জিত-হাস্যে বললেন, 'সে-কথা আমার খুব মনে আছে কৃষ্ণা।'

কৃষ্ণা বললে, 'সত্যি, একটা অনিশ্চিতের পিছনে ধাওয়া করে এসে, ভগবানের কৃপায় সুজন-মামাকে যে পেয়ে গেছি, এ আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে। উনি পুলিশের লোক, নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন, সেদিক থেকে ওঁর কাছে আমরা অনেক সাহায্য পাব।'

বাইরে সুজন মিত্রের কথা শোনা যায়। তিনি কৃষ্ণা ও প্রণবেশকে থানায় নিজের কোয়ার্টারে পৌঁছে দিয়ে, তাদের ভার ভৃত্য শামুয়ার হাতে দিয়ে ডিউটিতে চলে গিয়েছিলেন, এইমাত্র ফিরলেন।

'ঘুমুলে নাকি প্রণবেশ!'

দরজার কাছে সুজন মিত্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। প্রণবেশ বললেন, 'এত সকাল-সকাল ঘুমের অভ্যেস নেই আমার, তুমি ভেতরে এসো, অনেক কথা আছে।'

ভিতরে আসতে-আসতে সুজন মিত্র বললেন, 'এই যে, শামুয়া উপযুক্ত অতিথি-সৎকার করেছে দেখছি। এইজন্যেই তো ওকে ছাড়তে চাইনে। শামুয়া?'

হাঁক পাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে পাশের দরজা দিয়ে অত্যন্ত বিনীতভাবে এসে দাঁড়াল শামুয়া।

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'রান্না হয়ে গেছে?'

শামুয়া উত্তর দিলে, 'জী।'

সুজন বললেন, 'ঘণ্টাখানেক পরে সবাইকে একসঙ্গে খেতে দেবে—যাও, এখন বিশ্রাম করো গে।'

হুকুম পেয়েই শামুয়া অদৃশ্য হল।

কৃষ্ণা সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'একে কোথায় পেলেন সুজন-মামা, এ তো এই দেশেরই লোক দেখছি।'

সুজন বললেন, 'সে বড় করুণ কাহিনী, মা! হ্যাঁ, এ-বেচারা এই আসাম অঞ্চলেরই লোক। আমি যখন বদরপুরে কাজ করি, সেইসময় একদিন একে এর শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাই। জঙ্গলের ধার দিয়ে আসছিলুম, আমার সঙ্গে ছিল দুজন কনস্টেবল; সেইসময় একটা চিৎকার শুনতে পেয়ে আমি কনস্টেবল দুজনকে নিয়ে গিয়ে দেখি, একে পাঁচ-সাতজন লোক চেপে ধরেছে, তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা দড়ির ফাঁস, সেই ফাঁসটা সে এর গলায় পরাবার চেষ্টা করছে, আর শামুয়া প্রাণপণে চিৎকার করছে। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। কারণ, এইরকম মৃত্যুর কেস দুটো আমি হাতে পেয়েছিলুম—সোজাকথায়, গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা যাকে বলা চলে।'

রুদ্ধশ্বাসে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর?'

সুজন বললেন, 'তারপর রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করতেই লোকগুলো শামুয়াকে ফেলে ছুটে পাহাড়ের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালাল...কাছে গিয়ে দেখলুম, বেচারা শামুয়া জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে। তখন কনস্টেবলদের সাহায্যে তাকে নিয়ে এলুম আমার বাংলোয়, সেই থেকে আজ এই একটা বছর শামুয়া আমার কাছেই আছে।'

কৃষ্ণা বললে, 'তাদের সম্বন্ধে শামুয়া কী বলল?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'শামুয়া যা বললে তা আমাদের কাছে আশ্চর্য ব্যাপার মনে হলেও, এদের ওসব নিত্যকার ব্যাপার। এদের তোমরা জানো না। এরা একদিক দিয়ে সরল হলেও, অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত বদরাগী। সোজাকথায় যাকে বলে—প্রতিহিংসাপরায়ণ। এদের মধ্যে দলাদলি খুব বেশি। এই দলগত ব্যাপারে এদের ক্ষতিও বড় কম হয় না। শামুয়া ছিল একটা দলের সর্দার। এই দলকে অন্য দল সহ্য করতে পারত না—দুই দলে প্রায়ই মারামারি বাধত। সেই বিপক্ষ দলই একদিন সুযোগ পেয়ে শামুয়াকে ধরে ফেলেছিল—আর এইভাবে তাকে হত্যা করবার জন্য টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'শামুয়ার আত্মীয়স্বজন আছে তো, তারা কোথায়?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'ছিল সবাই, কিন্তু এখন কেউ নেই। মাস-পাঁচেক আগে শামুয়া একদিন ওদের লুকিয়ে নিজের ঘর দেখতে গিয়েছিল, সেখানে দলের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জেনেছে, তার মা-বাপ-ভাই-বোন, সকলকে ওরা হত্যা করেছে, তার ঘরের চিহ্নমাত্র নেই।'

প্রণবেশ বিবর্ণমুখে বললেন, 'কী নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা! তবু তুমি তাদের সরল বলো, সুজন?'

সুজন হাসলেন; বললেন, 'সরল বইকী। আমাদের দেশের লোকের তুলনায় এরা অনেক সরল। এদের সঙ্গে ব্যবহার করলে জানতে পারবে, এরা যেমন প্রতিহিংসা নিতে জানে, তেমনি উপকারীর উপকারও কোনওদিন ভোলে না, প্রাণ দিয়েও এরা এদের উপকারীকে বাঁচায়।'

একটু থেমে তিনি বললেন, 'এদের আরও অনেক ব্যাপার আছে, সেসব কথা পরে শুনো, এখন তোমরা কীজন্যে হঠাৎ গৌহাটিতে এসেছ, ধীরে-সুস্থে এবার সেই কথাটা শোনা যাক।'

কৃষ্ণা বললে, 'বিশেষ কোনও কাজের জন্যেই যে এসেছি, তা তো বুঝতেই পারছেন। ক'দিন আগে হঠাৎ একখানা পত্র পেলুম—একটি মেয়ে, সম্পর্কে আমার মাসিমা হন—বড় বিপদে পড়েছেন

তিনি, যে-কোনও রকমে তাঁকে আর তাঁর বাবাকে উদ্ধার করতে হবে।'

সুজন হেসে ওঠেন—তাঁর হাসি আর থামে না।

প্রণবেশ হুঙ্কার ছাড়েন—'আঃ, থামো, থামো বলছি সুজন, তোমার হাসির শব্দে যে ঘরখানা ভেঙে পড়বে!'

খানিকটা দম নিয়ে একটা সশব্দ নিশ্বাসের সঙ্গে সুজন হাসি থামান, বলেন, 'এখান থেকে তিনি তোমায় খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যে...ডিটেকটিভের কাজে খুব নাম করে ফেলেছ দেখছি।'

কৃষ্ণার মুখখানি লাল হয়ে ওঠে, সে একবার প্রণবেশের দিকে তাকায়, তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বলে, 'ভুল করছেন। আমি ডিটেকটিভ নই—আত্মীয়তা হিসাবে তিনি আমায় পত্র দিয়েছেন আর আমিও মামাকে নিয়ে সেইজন্যেই এসেছি। আমার মনে হয়, পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশের পুলিশ এত কর্মতৎপর যে, এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কিছু কিনারা করতে পারেনি।'

ফিরিয়ে আঘাত পেয়ে সুজন মিত্রের মুখখানা এবার লাল হয়ে উঠল, তিনি বললেন, 'কেসটা শুনলে আমি বুঝতে পারব কীসের জন্যে তোমরা এসেছ। প্রণবেশকে বলছি, যদি সে—'

কৃষ্ণা বাধা দিলে—'না, মামার বলার চেয়ে, আমিই আপনাকে বলছি শুনুন।' বলে সে ব্যাগ খুলে নিজের ছোট ডায়েরিটা বার করে বললে, 'এই আসামে ল্যাংটিং স্টেশন থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে একটা ছোট গ্রামে একজন বাঙালি ভদ্রলোক বহুকাল থেকে বাস করছিলেন, এ-অঞ্চলে অনেকগুলো চা-বাগান তাঁর ছিল, তা ছাড়া কমলালেবুর ব্যবসায়ও ছিল তাঁর—'

'রোসো, রোসো!'

সুজন তাড়াতাড়ি উঠে একখানা মোটা খাতা বার করে আনলেন, তারপর টেবিলে খাতাখানা রেখে তিনি তার পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে এক জায়গায় থামলেন ঃ

'হ্যাঁ, এই তো লেখা আছে—ভবতোষ চৌধুরী, ইনি কয়েকটা চা-বাগানের মালিক ছিলেন, অনেকগুলি কমলালেবুর বাগানও তাঁর ছিল। হাতিখালিতে তিনি বাস করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যা ছিল তাঁর জীবনের অবলম্বন। মনে হয়, তোমার দাদু ইনিই, আর তাঁর মেয়েটি হচ্ছেন তোমার মাসিমা।'

তিনি কৃষ্ণার পানে তাকালেন।

কৃষ্ণা বললে, 'তাঁর চিঠি পড়ে তাই তো মনে হয়।'

সুজন নিস্তব্ধে কিছুক্ষণ ডায়েরির পাতা ওল্টাতে লাগলেন, তারপর বললেন, 'আচ্ছা, তোমরা এখন বিশ্রাম করো কৃষ্ণা, আজ তোমরা বড় ক্লান্ত। আমি কাল এ-সম্বন্ধে তোমাদের জানাব, আর তোমরা যদি সেখানে যেতে চাও তো তোমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' বলে তিনি ওঠবার উপক্রম করতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু একটা কথা বলে যান যে, আপনারা তা হলে এঁদের ব্যাপার কিছু-কিছু জানেন।'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'শুধু জানি নয়, আমরা সত্যিই হয়রান হয়ে গেছি! এ-কেস আমারই হাতে আছে, তাই বলছি, সুবিধা এতে আমাদের উভয়পক্ষেরই হল। যে-কোনওদিন তোমাদের ওখানে নিয়ে যাব, অবশ্য গৌহাটি থেকে অনেকটা দূরে যেতে হবে; লামডিং পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেন বদল করে আমাদের যেতে হবে—ল্যাংটিং। সেখানে পৌঁছে, ওখান থেকে দশ মাইল যেতে হবে। আমরা হাঁটতে পারলেও, তুমি সেই চড়াই-উতরাই ভাঙতে পারবে না কৃষ্ণা, তা আমি জানি। আবার একখানা ডুলির ব্যবস্থা করতে হবে কিনা—সেটা লামডিং-এ পৌঁছে একদিন থেকে করা যাবে।'

'চড়াই-উতরাই—প্রায় দশ মাইল!'

স্থূলদেহ প্রণবেশ একেবারে হাঁপিয়ে ওঠেন।

কৃষ্ণা তাঁর পানে তাকিয়ে হেসে ওঠে, তারপর সুজনের দিকে ফিরে বলে, 'কিন্তু সুজন-মামা, কেবল একখানা ডুলি করলেই কি চলবে? তা হলে মামাকে এখানে রেখে যেতে হয় যে! নইলে আমি খানিকটা হাঁটব...মামা খানিকটা হাঁটবেন...এমনি করে আমাদের দশ মাইল আর দশ মাইল এই কুড়ি মাইল পথ চলতে হবে।'

'আবার দশ মাইল!'

প্রণবেশ যেন আকাশ হতে পড়েন...'কী আবোল-তাবোল বকছিস কৃষ্ণা? এক দশ মাইলের ঠেলায় অন্ধকার, আবার দশ মাইল এতে তুই যোগ দিচ্ছিস কোথা থেকে! এ দশ মাইল তুই পেলি কোথায়?'

কৃষ্ণা আবার হাসে—'বেশ বলছ মামা। আসবার সময় আবার ওই দশ মাইল আসতে হবে না হেঁটে?'

প্রণবেশ করুণ চোখে সুজনের দিকে তাকান, কিন্তু সুজনের মুখেও হাসি দেখে, লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেন।

সুজন বললেন, 'আচ্ছা, সেসব কালকের কথা কাল হবে, আজ তোমরা বিশ্রাম করো। প্রণব আর আমি পাশের ঘরে থাকব কৃষ্ণা, তুমি এই ঘরে থাকো। কিছু ভয় নেই, থানা সুরক্ষিত, বেশ নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে পারবে।'

তিনি অগ্রসর হলেন, প্রণবেশও উঠলেন।

চার

সকালবেলা প্রোগ্রাম ঠিক করার সময় কৃষ্ণা অপরিচিতা মেয়ে রুমার পত্রখানা বার করে সুজনের সামনে ধরল।

'আসল এই পত্রখানার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম সুজনমামা। এই পত্রখানা পেয়েই আমি এসেছি। এতে যে-জায়গাটার কথা লেখা আছে, সেটা আপনার এরিয়ার মধ্যে পড়ে—এই দেখুন পত্রখানা, একে এই গৌহাটির কাছে কোথায় আটক করে রাখা হয়েছে, এখানে যাওয়ার পথের কথাও আছে দেখুন।'

সুজন ব্যগ্রভাবে পত্রখানা পড়তে লাগলেন। কৃষ্ণা দেখতে পেলে—পড়তে-পড়তে তাঁর মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠল।

পড়া শেষ করে কৃষ্ণার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি গম্ভীরভাবে কেবলমাত্র বললেন, 'হুঁ।'

কৃষ্ণা পত্রখানা নিয়ে ব্যাগে রাখতে-রাখতে বললে, 'আমার মনে হয়, একটু তাড়াতাড়ি এখানে খোঁজ নিতে যাওয়া উচিত! চিঠিখানার তারিখ দেখুন, আজ থেকে ঠিক তেইশ দিন আগে এই চিঠিখানা কলকাতায় পৌঁছেছে, তার দু-তিনদিন পরে আমার কলেজের ছুটি হয়েছে, তারপর আমরা রওনা হয়েছি—।'

এবারে সুজন বাধা দিলেন—'অর্থাৎ সোজা কথা এই বলো যে, এতদিন এই মেয়েটিকে দুর্বৃত্তেরা ওখানে রেখেছে কি না। হ্যাঁ, এ-কথা সম্ভব, এঁকে এর মধ্যে ওখান হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। যাক, এখন আমরা যা খবর পেয়েছি সেটা আগে শোনো। ভবতোষ চৌধুরী ও-অঞ্চলে বেশ নামকরা লোক। তিনি ল্যাংটিংয়ের ওদিকে কর্মক্ষেত্র স্থাপন করলেও, থাকতেন বেশিরভাগ ওইখানে, তাঁর মেয়ে রুমাদেবী ওইখানেই কলেজে পড়তেন।'

কৃষ্ণা অবাক বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তিনি কোথায় থাকতেন?'

সুজন বললেন, 'এখানে ভবতোষ চৌধুরী বাড়ি তৈরি করেছিলেন। আমি তোমাদের এখন

সেখানে নিয়ে যাব, বাড়িখানা তোমরা দেখতে পাবে। রুমাদেবী এখানে বি.এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন, তাঁর জন্যেই ভবতোষ চৌধুরীকে বেশিরভাগ এখানে থাকতে হত। ইদানীং একবছর তিনি ল্যাংটিং-এ যাননি, সর্বদা এখানেই থাকতেন। সব বিষয়েই তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী—খেলাধূলা, গান-বাজনা, থিয়েটার-বায়োস্কোপ, রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদি প্রত্যেকটি দিকেই তাঁর উৎসাহ দেখা যেত। অর্থ ছিল তাঁর প্রচুর, সবদিক দিয়ে তিনি দু-হাতে খরচ করতেন। তাঁর মতো লোককে সর্বদা এখানে পেয়ে—।'

প্রণবেশ মৃদু হেসে বললেন, 'এখানকার লোকেরা বেঁচে গিয়েছিল—কেমন?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'তা তুমি বলতে পারো। তাঁর পর্যাপ্ত দানই তাঁকে অনেক বড় করে তুলেছিল সাধারণের কাছে। তাঁর বাড়িতে সর্বদাই লোকজন আসত, কত দেশের গল্প-আলোচনা চলত। এরই মধ্যে কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন ভবতোষ চৌধুরী নিজেই থানায় এসে হাজির...আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, এখানে থাকা তাঁর আর পোষালো না—তিনি কাল কিংবা পরশু কলকাতায় চলে যাবেন। এই দু-একদিনের জন্যে তিনি আমার কাছে জনকয়েক সশস্ত্র পুলিশ চান।'

'সশস্ত্র পুলিশ!!'

কৃষ্ণার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে—'আপনি দিয়েছিলেন?'

বেদনার হাসি হেসে সুজন বললেন, 'ওপর থেকে অর্ডার না পেলে তো আমি দিতে পারি নে। এ-কথা তাঁকে বলায় তিনি খানিক চুপ করে বসে রইলেন। তাঁকে নীরব দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কেন তিনি সশস্ত্র পুলিশ চান? তার উত্তরে তিনি কেবলমাত্র বললেন, তিনি সর্বদাই জীবনের আশঙ্কা করছেন, কেবল তাঁর নিজেরই নয়—তাঁর মেয়ে রুমার পর্যন্ত।'

প্রণবেশ ফোঁস করে উঠলেন, 'বেচারা! কিন্তু তুমি এ-কথা শুনেও অর্ডারের অপেক্ষা করলে সুজন, জনকতক পুলিশ দিতে পারলে না?'

সুজন মুখ বিকৃত করলেন—'না। কারণ, একটা থানার ভার আমার ওপর, বেশি কনস্টেবল তখন আমার হাতে ছিল না, কাজেই সেটা সম্ভব হয়ে উঠল না। থানায় আমায় কিছু লোক রাখতেই হবে।'

কৃষ্ণা কী ভাবছিল, মুখ তুলে বললে, 'তারপর কী হল?'

সুজন বললেন, 'তারপর যা হল তা আর না বললেও চলে। রাতটা কেটে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে খবর পেলুম, গত রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। ডাকাতেরা শুধু জিনিসপত্রই নিয়ে যায়নি, সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে গেছে বাড়ির মালিক ভবতোষ চৌধুরীকেও।'

রুদ্ধশ্বাসে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'আর রুমাদেবী?'

সুজন বললেন, 'রুমাদেবী পুলিশে খবর দিলেন, জোর এনকোয়ারি চলল, কিন্তু ভবতোষ চৌধুরীকে আমরা আর পেলুম না। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রুমাদেবীও হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান করলেন, তাঁরও কোনও খোঁজখবর পেলুম না আমরা। রুমাদেবী অনেক কথাই বলেছিলেন, তাঁর কথা যে সত্য তা বিশ্বাস করাবার জন্যেই তিনি হাতিখালি থেকে কাগজপত্র আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে আর ফেরেননি তিনি। শেষটায় আমাকেও যেতে হয়েছিল সেখানে, কিন্তু ব্যর্থ হয়েই ফিরতে হয়েছে।'

শান্তকণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, 'আমার মনে হয়, এখানে কোনও বিপদাশঙ্কা করে হাতিখালি গিয়ে, তারপর তিনি সেখান থেকে সরে পড়েছেন। হয়তো এমন কোনও নিরাপদ জায়গাতে তিনি আছেন, যেখানে বিপদের—।'

সুজন বললেন, 'যেখানে বিপদের আশঙ্কা নেই সেখানে গেছেন বলছ তো? কিন্তু পুলিশের হাতে যখন তিনি এ-ভার দিয়েছেন, পুলিশই তাঁকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে, এ-অবস্থায় তিনি

পুলিশকে না জানিয়ে, একা চলে যেতে পারেন না—অন্তত পক্ষে আমার তাই বিশ্বাস। মনে হয়, তিনি নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছেন, তাঁর যেসব শত্রু অনিষ্ট করছে, তারাই তাঁকে কোনওরকমে সরিয়ে রেখেছে, যাতে পুলিশ তাঁর কাছ থেকে কোনও সন্ধান না পায়।'

কৃষ্ণা এ-কথার কোনও উত্তর দিল না।

প্রণবেশ একটা হাই তুললেন, দীর্ঘ একটা আড়মোড়া ছেড়ে বললেন, 'এরই নাম "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো"। কোথায় সেই কলকাতা—পুজোর আনন্দে সেখানকার ছোটবড় সবাই আজ পাগল, আর আমরা কিনা আসামের এই থানায় বসে ভাবছি যতসব অবান্তর কথা—যত সব...।'

কৃষ্ণা মুখ তুললে, কঠিন কণ্ঠে বললে, 'আবার সেই পুরনো কথা। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ফিরে যাও মামা, এত কষ্ট স্বীকার করে যে-জন্যে এসেছি তা আমি করবই। তোমার বোন বলে নয়; একটি মেয়ে বিপদে পড়েছে, তাকে আমায় উদ্ধার করতে হবে এই ইচ্ছা নিয়েই আমি এখানে এসেছি।'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'মাথা খারাপ করো না হে প্রণব, কৃষ্ণার কথা খুব সত্যি। এসে পড়েছ যখন, থেকে যাও।'

প্রণবেশ জানলার দিকে মুখ করে বসলেন। খুশি যে তিনি মোটেই হননি তা তাঁর গম্ভীর মুখ দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

সুজন বললেন, 'যাই হোক, কথা-কাটাকাটি এখন থাক, এখনকার যা কাজ তাই হোক। কৃষ্ণাকে নিয়ে আজ আমি একবার ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে যাব, সেখানে গেলেই কৃষ্ণা অনেক কিছু জানতে পারবে।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সে-বাড়িতে এখন কে আছে?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'ভবতোষবাবুর অনেককালের পুরনো চাকর রতন আছে। লোকটা বাঙালি, বয়স প্রায় ষাট বছর হবে। বহুকাল থেকেই সে ভবতোষবাবুর কাছে আছে, তোমার অনেক-কিছু জানবার কথা তার মুখে শুনতে পাবে। তুমি তৈরি থেকো কৃষ্ণা, আমি বেলা তিনটে-নাগাদ ফিরে তোমায় নিয়ে যাব।'

প্রণবেশ সবেগে ঘাড় দুলিয়ে বললেন, 'তার মানে? তুমি এখন কোথাও বেরোচ্ছ না কি?'

সুজন বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'বেরুতে হবে বইকি! জানোই তো, ডিউটি ইজ ডিউটি,—চাকরি বজায় রাখতে এখনই যেতে হচ্ছে, কারণ কানপুরে ভীষণ একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তার এনকোয়ারি করতে হবে।'

উৎকণ্ঠিতভাবে কৃষ্ণা বললে, 'খাওয়ার ব্যবস্থা কী হবে দুপুরে আপনার?'

সুজন বললেন, 'ফিরে এসে যা হয় হবে। তোমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ো, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না। আমি তিনটের মধ্যেই এসে পৌঁছব।'

তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচ

যে-সময়ে ফেরবার কথা, তার অনেক পরে ফিরলেন সুজন মিত্র। কানপুরেই স্নানাহার শেষ করে এসেছেন তিনি, এখানে আর কোনও ঝামেলা পোহাতে হল না।

কৃষ্ণা প্রস্তুত হয়ে ছিল, প্রণবেশ এর মধ্যে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন তাই মনটা তাঁর বেশ

ভালো আছে। পোশাক ছেড়ে, বসবার ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসতে-বসতে সুজন বললেন, 'পুলিশের কাজ সত্যিই বড় ঝকমারির কাজ, নিশ্চিন্ত হয়ে দু-দণ্ড বসবার যো-টি নেই। রাতদুপুরেও ঘুম ভেঙে উঠে বেরুতে হবে, "না" বলবার উপায় নেই।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ কী হল, সুজনমামা?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'সাংঘাতিক ডাকাতি যার নাম। কানপুরে কমলালেবুর বাগান আছে তো, সেখানকার ম্যানেজার জানকী রায়ের বাড়িতে এই সাংঘাতিক ডাকাতি হয়ে গেছে। একজন লোক ধরা পড়েছে, কিন্তু তাকে অনেক পীড়ন করেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।'

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, 'আমি প্রথমে যে সন্দেহ করেছিলুম, ওসব আ-চিনের কাণ্ড—এদের বর্ণনা শুনেও তাই মনে হয়।'

'আ-চিন!' কৃষ্ণা একেবারে বিবর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রণবেশ নিজের মাথায় হাত বুলোন, 'আ-চিন?'

সুজন মিত্র সবিস্ময়ে বললেন, 'আশ্চর্য তো! তোমরাও আ-চিনকে চেনো দেখছি।'

প্রণবেশ শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'বার্মিজ ডাকাত আ-চিনকে না চেনে এমন লোক বোধহয় দুনিয়ায় নেই! কৃষ্ণার মা—আমার দিদি আর জামাইবাবু যে বর্মায় নিহত হন তা জানো তো? ডাকাতরা সবাই ধরা পড়েছিল, পালিয়েছিল কেবল ওই আ-চিন। এখানে আসার সময় আমরা ট্রেনে আমাদের কামরায় তাকে দেখেছি, আমার মনে হয়, এখানে এসেই সে তার দলবল নিয়ে কানপুরে গিয়ে ডাকাতি করেছে।'

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি চিনলে কী করে আ-চিনকে? আগে কোনওদিন দেখেছিলে না কি?'

কৃষ্ণা বললে, 'না, মামা তাকে চেনেন না, আমি চিনি। বর্মায় থাকতে আমি তাকে দেখেছি, তার কুৎসিত চেহারা একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। এখানে আসবার সময় একটা ছোট স্টেশনে সে ট্রেনে উঠেছিল, আমিন-গাঁ পর্যন্ত তাকে দেখেছি, তারপর স্টিমারে উঠে আর দেখিনি। সে নিশ্চয়ই গৌহাটিতে এসেছে, এখান থেকে দল নিয়ে গিয়ে ডাকাতি করেছে। ওরকম শয়তান খুব কমই দেখতে পাওয়া যায় সুজনমামা, কোনও বিপদকেই সে গ্রাহ্য করে না। যাক, ডাকাতি করে সে এবার কী পেলে, জেনেছেন তো?'

একটু হেসে সুজন বললেন, 'তা নিয়েছে অনেক। গতকাল একটা চা-বাগান বিক্রির মোটা টাকা পেয়েছিলেন জানকীরাম। টাকাটা আজ ব্যাঙ্কে জমা করে দেবেন ভেবে, সমস্ত টাকাই একটা ড্রয়ারে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়েছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য সন্ধানী আ-চিন দস্যুর গুপ্তচরেরা তাদের সর্দারের কাছে জানকীরামের এই টাকা পাওয়া আর ড্রয়ারে রাখার সংবাদ যথাসময়েই পৌঁছে দিয়েছে।'

সুজন পকেট থেকে ডায়েরিখানা বার করতে যাচ্ছিলেন, কৃষ্ণা বাধা দিলে, বললে, 'ও-সম্বন্ধে সন্ধ্যার পর আলোচনা করা যাবে সুজনমামা, এখন ডায়েরি নিয়ে বসলে আমার কাজ হবে না। আমাকে আপনি আগে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে নিয়ে চলুন, তারপর আপনার বিশ্রাম।'

সুজন আবার হাসলেন, বললেন, 'বিশ্রাম কথাটা আর বোলো না কৃষ্ণা, বিশ্রাম আমার জীবনে মিলবে কি না জানি নে। রুমাদেবীর এই কেস নিয়েই গলদঘর্ম হয়ে উঠেছি, এর মধ্যে এসে জুটল আবার ডাকাতি কেস! উপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ত দিতে-দিতে প্রাণান্ত হচ্ছে! যাক সে-কথা, তোমাকে নিয়ে যাই চলো, দেখি যদি তুমি ঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারো!'

সুজনের সঙ্গে কৃষ্ণা এগিয়ে চলে, সঙ্গে-সঙ্গে প্রণবেশ যেতে-যেতে জিজ্ঞেস করেন, 'ওঁদের বাড়িটা এখান থেকে কতদূর!'

সুজন বললেন, 'যতদূরই হোক না, মোটরে যাবে-আসবে, বিশেষ কষ্ট হবে না।'

একখানা জিপে উঠলেন তিনজন।

ব্রহ্মপুত্রের কোল ঘেঁষে ওই সুন্দর বাংলোটি দূর থেকে দেখলে একখানি ছবি মনে হয়। বাংলোর তিনদিকে ফুলের বাগান, সামনে খেলার লন।

গেটের সামনে একজন কনেস্টবল পাহারা ছিল, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে সে গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল, সুজন জিপখানা ভিতরে নিয়ে গেলেন। লাল টালি-ছাওয়া বারান্দার নিচে গাড়ি দাঁড়াতেই সঙ্গে-সঙ্গে সেখানে এসে দাঁড়াল একটি বৃদ্ধ। সুজনের মুখে শোনা গেল, 'এরই নাম রতন, ভবতোষবাবুর অনেকদিনের পুরাতন ভৃত্য।'

কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে, জিজ্ঞাসুনেত্রে সে সুজনের দিকে চাইলে। সুজন পরিচয় দিলেন, 'এঁরই নাম কৃষ্ণাদেবী, যার কথা তোমায় বলেছিলুম। বাংলাদেশে এঁর প্রচুর নাম। বয়সে ছোট হলেও এই মেয়েটি ডিটেকটিভের কাজে এমন পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, যা নামজাদা গোয়েন্দারাও অনেকসময় পেরে ওঠেননি।'

কৃষ্ণা লজ্জিত হয়ে ওঠে, সুজনের কথার মাঝখানে বাধা দেয়, বলে, 'না না, তুমি সুজনমামার কথা শুনো না রতন, উনি অনেক বাড়িয়ে বলছেন।'

স্মিতমুখে বৃদ্ধ বলে, 'উনি না-হয় বাড়িয়ে বলতে পারেন, কিন্তু রুমা-মাও তো তোমার কথা বলছিলেন, মা! তোমার ঠিকানা অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। তারপর রুমা-মা যখন ল্যাংটিং গেলেন, সেইসময় হঠাৎ ঠিকানা পাওয়া গেল।'

সকলে ঘরে ঢুকলেন। উৎসাহিত হয়ে কৃষ্ণা একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে, 'আগে আমায় সব কথাগুলো বলো তো রতন, খাপছাড়াভাবে শোনার চেয়ে প্রথম থেকে শুনলে, পরে আমি অনেক কিছু জানতে বা করতে পারব যাতে আমার কাজের সুবিধা হবে।'

রতন খানিকটা চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'সে যে মস্তবড় গল্প হয়ে যাবে, মা!'

কৃষ্ণা বললে, 'তবু তার মধ্যে থেকেই আমার যা জানবার তা জেনে নিতে পারব।'

রতন বললে, 'সবই বলব, এখন আগে আপনারা চা খান, চা এনে দিই।'

বাধা দেওয়ার আগেই সে বেরিয়ে গেল।

সুজন ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে বললেন, 'রুমাদেবীর মুখে যতদূর শুনেছি, তাতে রতনকে বিশ্বাসী বলেই মনে হয়। তা ছাড়া বহুদিনের লোক, বয়সও অনেক। এ-বয়সে লোকে কোনও খারাপ কাজ করতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

প্রণবেশ সন্দেহজনক হাসি হাসলেন, বললেন, 'আমি যদি পুলিশের কাজ করতুম, আগে এই রতনকেই গ্রেপ্তার করতুম।'

কৃষ্ণা বললে, 'আর সঙ্গে-সঙ্গে ওকে হয় চিরকালের জন্যে জেলে পুরতে, নয়তো ফাঁসিতে লটকাতে—কী বলো মামা? এককথায় সব আপদের শান্তি হয়ে যেত, আমরাও বাঁচতাম, ওরাও বাঁচত।'

প্রণবেশ উত্তর দিলেন না। মুখখানা তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সুজন কী বলতে যাচ্ছিলেন, রতন এসে পড়ায় কিছু বলা হল না। একজন আসামী ভৃত্য এসে চা, বিস্কুট, কেক সামনে সাজিয়ে দিলে।

কৃষ্ণা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে, 'এসব কী রতন? এত আয়োজন কে তোমায় করতে বললে, শুনি?'

রতন বেদনার হাসি হেসে বললে, 'এ তো সামান্যই। বাবু কি রুমা-মা থাকলে যা করতেন তা যদি দেখতেন! আপনারা সঙ্কোচ করবেন না, আমি খুব অল্পই এনেছি।'

প্রণবেশই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন দেখা গেল। নিজের ডিশখানা টেনে নিয়ে বললেন, 'খাওয়ার নামে আবার চক্ষুলজ্জা! কৃষ্ণা যেন কী! বিকেল হয়ে গেছে, এ-সময় চা না খেলে কোনও কাজে নাকি মন বসে! তুমি বসো রতন, কথাগুলো বলো। আমরা ততক্ষণ খেতে আরম্ভ করি।'

রতন একখানা টুল টেনে নিয়ে বসল।

ছয়

রতন কাহিনী শুরু করল ঃ

বাংলাদেশের এক গ্রামের ছেলে ভবতোষ চৌধুরী।

ছোটবেলা থেকেই খুব ডানপিটে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি করতে ওস্তাদ। এইজন্যে বড় ভাই আশুতোষের সঙ্গে একবার খুব বিবাদ হয় এবং আশুতোষ তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে আদেশ করেন।

দারুণ অভিমানে ও রাগে ভবতোষ বাড়িছাড়া হয়ে গেলেন...তারপর নানা জায়গায় ঘুরতে-ঘুরতে দৈবাৎ রতনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল।

দুজনে মিলল ভালো। দরিদ্র রতনও ভাগ্যান্বেষণে বার হয়েছিল ঘর ছেড়ে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে ভবতোষ চললেন অজানা দেশের সন্ধানে।

ঘুরতে-ঘুরতে দুজনে গিয়ে পড়লেন সুদূর মালয়ে, সেখানেই তাঁদের অদৃষ্ট ফিরল।

মালয়ে এক রবারের কারখানায় ভবতোষ কাজ পেলেন। কারখানার মালিক বর্মার লোক, তিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না, তাই বিদেশীদের সঙ্গে কারবার করতে খুব অসুবিধা হয়। এখন ইংরেজি-জানা বাঙালি ভবতোষকে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠলেন এবং ভবতোষকে এই কাজের ভার দিলেন। ভবতোষ বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করে রবার বিক্রির ব্যবস্থা করতেন, তাই তাঁর বেতনও ছিল বেশি। রতন করত কুলিদের সর্দারি। মালয়ে প্রচুর রবার গাছ জন্মায় এবং সেই উৎপন্ন রবার বিভিন্ন দেশে চালান যায়।

মিঃ আউ-চি লিংয়ের অনেকগুলি বাগান ছিল; কারখানাও ছিল তাঁর অনেকগুলি। ভবতোষ সেখানে থাকতে হঠাৎ একদিন আউ-চি লিং ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরী হস্তগত করেন।

কীভাবে এই লক্ষ-লক্ষ টাকার বিপুল সম্পত্তি ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয় তা রতন জানে না। আউ-চি লিংয়ের একমাত্র পুত্র মাও-তুং তখন আমেরিকায় ছিল, শোনা গিয়েছিল যে, সে সেখানে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে এবং সেখানেই বিবাহ করে বসবাস করছে। আউ-চি লিং তাকে দেশে ফিরে বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার জন্যে অনেকবার লিখেছিলেন, কিন্তু আসা তো দূরের কথা, সে কোনও পত্রেরই উত্তর দেয়নি।

রতন শুনেছিল, পুত্রের উপর রাগ করেই আউ-চি লিং তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিশ্বস্ত কর্মচারী এই ভবতোষ চৌধুরীকে দিয়ে গেছেন উইল করে। রতন এতে খুব খুশি হয়েছিল।

কিছুদিন পরে ভবতোষের মুখে সে শুনতে পায়, তিনি এখানে আর থাকবেন না, এখানে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। নিত্য অসুখে ভোগার চেয়ে এখানকার বাগান-কারখানা সব বিক্রি করে দিয়ে ভারতে ফিরে তিনি ব্যবসা করবেন এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়।

এরপর সত্যি-সত্যিই একদিন তিনি সব বিক্রি করে দিয়ে আসামে চলে আসেন এবং লোকজনের ভিড় থেকে দূরে নির্জন স্থান ল্যাংটিংয়ের হাতিখালিতে স্থায়ীভাবে বাস করবার ব্যবস্থা

করেন। বলা বাহুল্য, রতনও তাঁর সঙ্গে এখানে আসে।

মালয়ে থাকার সময় ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার একটি মেয়েকে সেখানকার নিয়মানুসারে বিবাহ করেছিলেন এবং রুমাও সেখানে জন্মেছিল। যখন তাঁরা ল্যাংটিংয়ে আসেন তখন রুমার বয়স পাঁচ-ছ'বছরের বেশি নয়!

ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ে অনেকগুলো চা-বাগান কিনে নিয়েছিলেন। রতন রুমাকে দেখা-শুনা করত আর চা-বাগানগুলোর তদারক করত। রুমার মা ল্যাংটিংয়ে আসবার কিছুদিন পরে মারা যান, তারপর থেকে রুমার ভার সম্পূর্ণ ভাবে রতনের উপর পড়ে এবং সম্পূর্ণ বাঙালির মতোই সে মানুষ হতে থাকে।

বেশ স্বচ্ছন্দে দিন যায়, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন একখানা পত্র পেয়ে ভবতোষ বড় বেশিরকম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন।

চিরদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও কর্মচারী রতন—তাকে তিনি কোনও কথাই গোপন করেননি। রতন ভবতোষ চৌধুরীর কাছে জানতে পারে যে, দীর্ঘকাল পরে মাও-তুং ফিরে এসেছে আর দীর্ঘকাল ধরে ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান করে সে জানতে পেরেছে যে, ভবতোষ চৌধুরী ল্যাংটিংয়ে হাতিখালিতে বাস করছেন। সে জানিয়েছে, শীঘ্রই সে ল্যাংটিংয়ে আসছে, তার পিতার সম্পত্তি কীভাবে ভবতোষ চৌধুরীর হস্তগত হয়েছে সে সেই কথা জানতে চায়।

এরপর ভবতোষ চৌধুরী আর সাহস করে ল্যাংটিংয়ে থাকতে পারেননি, তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে তিনি চলে আসেন গৌহাটিতে।

তারপর একদিন এসেছিল মাও-তুং।

দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস করার পর দেশে ফিরেই সে শুনেছে, বাঙালি ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার যথাসর্বস্ব হস্তগত করে শেষে এক ইংরেজ কোম্পানির কাছে সব বিক্রি করে কোথায় চলে গেছেন।

খোঁজ করে সে প্রথমে আসে ল্যাংটিংয়ে, তারপর আসে গৌহাটিতে। এখানে প্রথমেই তার সঙ্গে দেখা হয় রতনের এবং সে ভবতোষ চৌধুরীকে খবর দেয়। বলা বাহুল্য, ভবতোষ চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করেননি এবং দারোয়ান দিয়ে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় মাও-তুং শাসিয়ে গেছে যে, সে প্রতিশোধ নেবে। তার পিতাকে হত্যা করে অসৎ উপায়ে ভবতোষ চৌধুরী তার পিতার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করেছেন, সে নাকি তার প্রমাণ পেয়েছে এবং অতি শীঘ্র সে ভবতোষ চৌধুরীকে জানিয়ে দেবে যে, বার্মিজরা সরল, উদার এবং বিশ্বাসপরায়ণ হলেও, প্রয়োজন হলে তারা কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে।

তারপর বছর-দুই মাও-তুংয়ের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

তারপর একদিন রাত্রে...।

ভবতোষ চৌধুরী সেদিন কন্যা রুমা এবং রতনকে বলেছিলেন, তিনি শীঘ্রই কলকাতায় যাবেন। কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর একখানা বাড়ি কেনা হয়ে গেছে! তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি আগেই বাড়ির কথা লিখেছিলেন এবং টাকাও পাঠিয়েছিলেন; বন্ধু বাড়ি কিনে তাঁকে খবর দিয়েছেন এবং সেই পত্রানুসারে তিনি আগামী সোমবার দিন কলকাতায় যাত্রা করবেন।

প্রস্তাবটা রুমার ভালো লাগলেও, রতনের কাছে মোটেই চিত্তাকর্ষক হয়নি। কতকাল আগে সে বাংলা ছেড়ে চলে এসেছে! আজ বাংলায় সে একেবারেই অপরিচিত। তার আত্মীয়স্বজন কেউ বর্তমান নেই, বাড়িঘরেরও অস্তিত্ব নেই। আজ দেশের কেউ তাকে চিনবে না। যেখানে সে আছে, এ-দেশের ওপর তার একটা মায়া জন্মে গেছে, তাই এখান থেকে সে আর কোথাও যাবে না।

মনিবকে সে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক নিন্দনীয় কথা শুনলেও সে কিছুই বিশ্বাস করে না। তার অমতে ভবতোষ চৌধুরী ভিন্ন-জাতের ভিন্ন-দেশের একটি মেয়েকে বিবাহ

করেছিলেন—মনে আঘাত পেলেও সে তাঁকে অপরাধী করতে পারেনি; রুমাকেও সে ঘৃণা করতে পারেনি, অপত্য-স্নেহে তাকে বাঙালির মতোই মানুষ করে তুলেছিল।

যে-সোমবার কলকাতায় যাওয়ার আয়োজন ঠিক হয়েছিল, তার আগের রবিবার রাত্রি থেকে ভবতোষ চৌধুরীকে আর পাওয়া যায়নি। রাত্রে কে বা কারা তাঁর ঘরের জানলা ভেঙে ঘরে ঢুকেছিল এবং খুব সম্ভব, অচৈতন্যাবস্থায় তাঁকে সরিয়ে ফেলেছে। বাড়িতে অত সতর্ক প্রহরী থাকা সত্ত্বেও বেমালুম গায়েব হয়ে গেছেন তিনি!

রুমা সকালেই পুলিশে খবর দেন এবং তদন্তে আসেন ইনি, এই সুজন মিত্র। এই তদন্তের জন্যেই সুজন মিত্রের সঙ্গে রুমা হাতিখালি গিয়েছিলেন, তারপর সেখান থেকে তিনি আর ফেরেননি। সেই থেকে রতন যক্ষের মতো এ-বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। যতদিন তাঁরা না আসবেন রতনের নিষ্কৃতি নেই।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রতন চোখ মোছে।

সাত

সুজনের কাছে শোনা যায়, পরদিনই রুমা দেবীকে নিয়ে তাঁর গৌহাটি ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বড়সাহেবের কাছ থেকে জরুরি 'তার' পেয়ে বাধ্য হয়ে তাঁকে সেই রাত্রেই ফিরতে হয়েছে। রুমাদেবীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি চারজন কনস্টেবলকে হাতিখালিতে রেখে আসেন। এখানে এসে আশ্চর্য হয়ে যান যে, সাহেব তাঁকে 'তার' করেননি।

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে মাথা দুলিয়ে বললে, 'সে আমি আগেই বুঝেছি সুজনমামা, এ শুধু শত্রুর একটা চাল। আপনি নিজে পুলিশের লোক, চিরকাল এরকম ঘটনা দেখে আসছেন, তবু ওদের ছলনায় ভুলে...আশ্চর্য!'

এ-কথায় সুজন যে একটু অসন্তুষ্ট হলেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল; তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, চিরকাল দেখে আসছি। কিন্তু তবু বাধ্য হয়ে চলে আসতে হল কৃষ্ণা, কারণ, সাহেব এখানে না থাকায় আমি তাঁকে জানিয়ে যেতে পারিনি। অথচ কতকগুলো জরুরি রেকর্ড আমার জিম্মায় ছিল। 'তার' পেয়ে আমি ভাবলাম, সাহেব ফিরেছেন আর সেই রেকর্ডগুলো তাঁর তখনই চাই। সেইজন্যেই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলাম।'

কৃষ্ণা বললে, 'তারপর আপনি কবে জানলেন যে, রুমাদেবীকে পাওয়া যাচ্ছে না?'

সুজন উত্তর দিলেন, 'তার পরদিন সকালের ট্রেনে আমি সেখানে গিয়ে কনস্টেবলদের মুখে শুনতে পেলাম, সন্ধ্যায় সময় রুমাদেবীর সঙ্গে কে একজন লোক দেখা করতে এসেছিল, সেই লোকটা চলে যাওয়ার পর রুমাদেবী নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাস-দাসী সকলকে হুকুম দেন যে, রাত্রে যেন কেউ তাঁকে বিরক্ত না করে। সকালবেলা দেখা গেল, তাঁর ঘরের দরজা খোলা...তিনি নেই!'

কৃষ্ণা খানিক নিস্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর উঠে বললে, 'আপনারা বসুন; আমি রতনের সঙ্গে একবার বাড়িটা ঘুরে দেখে আসি।'

প্রণবেশ একটু হেসে বললেন, 'বাড়িতে কী-ই-বা পাবে কৃষ্ণা! তারচেয়ে আমার মনে হয়, হাতিখালিতে গেলে বোধহয় কিছু সন্ধান পাওয়া যেত।'

সুজন বললেন, 'কৃষ্ণা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, পুলিশ তদন্ত করতে কিছু কম করেনি। এখনও আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি আর ফল যে হবেই এ-বিশ্বাসও রাখি, তবু—।'

কৃষ্ণা বাধা দেয়, হাসিমুখে বলে, 'তা আমি জানি সুজনমামা, রুমাদেবীর কেসটার কিনারা

করতে পারলে আপনার নাম হবে বড় কম নয়। আপনি যথেষ্ট করেছেন, আমিও আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে একবার দেখি না কেন, তাতে হয়তো আপনারও এতটুকু সাহায্য হবে।'

বলে হাসিমুখেই সে রতনের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সুন্দর সুসজ্জিত ঘরগুলি গৃহস্বামীর ঐশ্বর্যের পরিচায়ক। দেখে বোঝা যায়, ভবতোষ চৌধুরী মনের মতো করে বাড়িটিকে তৈরি করিয়েছেন আর পছন্দসই করে সাজিয়েছেন রুমাদেবী; সে-কথা রতনের মুখে শোনা গেল।

রতনের মুখে কৃষ্ণা আরও শুনলে, রুমাদেবী এখানে পড়তেন। এই ঘরে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। বড় শান্ত মেয়ে—এখানে তাঁকে কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে দেখা যায়নি, বন্ধু-বান্ধব তাঁর কেউ ছিল না।

এই কথাবার্তার মধ্যে বাগানের দিকে খোলা জানলা-পথে একটা মুখ কৃষ্ণার পানে বারেক তাকিয়েই সহসা সরে গেল। কৃষ্ণার কিন্তু চোখ এড়াল না। সে জিজ্ঞাসা করল—'জানলা দিয়ে উঁকি দিলে কে রতন! এখানে কোনও মেয়ে আছে কি?'

রতন উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, ওর নাম সুমিয়া—মালয়ের একটি মেয়ে, মাস তিন-চার হল এখানে এসেছে। রুমা-মায়ের দেশের লোক—ওঁর মায়ের বিশেষ পরিচিত। এখানে আসার পরে চৌধুরীমশাই ওকে রাখতে চাননি, কিন্তু বোবা-কালা মেয়েটা কোথায় যাবে, তাই রুমা-মা ওকে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'বোবা-কালা! বলো কী?' বিস্ময়ে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে।

রতন বললে, 'হ্যাঁ, কানেও শোনে না, কথাও বলতে পারে না। তবে ভাবে-ভঙ্গিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিতে পারে।'

কৃষ্ণা বললে, 'ওকে একবার ডাকতে পারো রতন? একবার ভালো করে দেখি...আলাপ-পরিচয় করি।'

'ডাকছি।'

রতন বাইরে চলে যায় এবং পরক্ষণেই একটি কালো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে; বলে, 'এই সুমিয়া। বয়স এর খুব বেশি নয়, আমাদের রুমা-মায়ের বয়েসী হবে। বেচারা—মানুষ হয়েও অমানুষ—বোবা, কালা, জগতের কিছুই জানল না।'

কৃষ্ণা সুমিয়ার পানে তাকিয়ে থাকে; তারপর জিজ্ঞাসা করে—'তুমি সুমিয়া, মালয়ের মেয়ে?'

সে নিঃশব্দে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে কেবল হাসে, সাদা-সাদা বড়-বড় দাঁতগুলো তার আমূল বেরিয়ে পড়ে। কৃষ্ণা যত কথা বলে যায়, সে শুধু অ্যাঁ-উঁ শব্দ করে আর হাসে...।

কৃষ্ণা হতাশ হয়ে পড়ে, তবু তার মনের সন্দেহ যায় না। এই মেয়েটির হঠাৎ এ-বাড়িতে আসাটাই যেন কেমন সন্দেহজনক মনে হয়। ভবতোষ চৌধুরী মালয় থেকে বহুকাল আগে চলে এসেছেন, সেখানকার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্কই নেই এখন। কোনকালে তিনি মালয়ে ছিলেন, সেই সম্পর্ক ধরে মালয়বাসিনী সুমিয়ার এখানে আসা সত্যিই সন্দেহের কারণ বলে মনে হয়।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা সুমিয়াকে বিদায় দিলে। সে যেমন এসেছিল, তেমনিভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণার গম্ভীর মুখখানার পানে তাকিয়ে রতন আর কথা বলবার সাহস পায় না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সুমিয়া কি কোনওদিন হাতিখালিতে গেছে, রতন?'

রতন মাথা নেড়ে বললে, 'না। ও আসার পর বাবু কি রুমা-মা, হাতিখালি যাননি। বাবু যাওয়ার পর রুমা-মা সুজনবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলেন, সুমিয়া তখন এখানেই ছিল।'

কৃষ্ণা বললে, 'সুমিয়া এখানে আসার পর কোনওদিন কোনও লোক ওর সঙ্গে দেখা করতে

এসেছিল কি?'

রতন চিন্তা করে, তারপর মাথা নাড়ে 'কই, না। কেউ তো কোনওদিন আসেনি।'

একটু থেমে সে কী মনে করে বললে, 'কিন্তু মনে হয়, মেয়েটা যেন লেখাপড়া জানে। ...তা হতেও পারে, বোবা-কালাদেরও তো ইস্কুল আছে, সেখানে হয়তো পড়েছে।'

'পড়তে পারে?' বলে কৃষ্ণা রতনের পানে তাকাল।

রতন বললে, 'বোধহয় পারে। ওকে মাঝে-মাঝে বাবুর ইংরেজি কাগজ যা আসত তা পড়তে দেখেছি। হতে পারে—মালয়ে ইংরিজি কথাটা খুব চলে তো, কেউ হয়তো ওকে শিখিয়েছিল। হলই-বা বোবা-কালা, তবু ওইটুকুই যে শিখতে পেরেছে, সে-ও তো সাহেবদেরই দৌলতে। যাই বলো মা, সাহেবরা আমাদের দেশে এসে যত যা-ই করুক, উপকারও বড় কম করেনি।

কৃষ্ণা শুধু হাসল, কোনও উত্তর দিলে না।

উৎসাহিত রতন আরও কথা বলতে চায়, কিন্তু কৃষ্ণার মুখে কোনও কথা না পেয়ে সে দমে যায়...সাহেব জাতের বিশেষ-বিশেষ গুণের কথা আর বলা হয় না।

আট

গৌহাটি পৌঁছে দু-দিন বিশ্রাম নেওয়ার পরে কৃষ্ণা প্রস্তাব করে 'ল্যাংটিং যাওয়া এখন স্থগিত থাক মামা, তার আগে আমাদের যেতে হবে, মিয়াংয়ে—যেখান থেকে রুমাদেবী পত্রখানা লিখেছেন। দেখেছেন তো, তিনি লিখেছেন, পত্রপাঠ যেন আমি ওখানে গিয়ে সন্ধান করি। দেরি করলে হয়তো আর তাঁকে এখানে পাওয়া যাবে না, অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে।'

চিন্তিত মুখে সুজন বললেন, 'কিন্তু, আমায় যে আজই আবার কানপুর যেতে হচ্ছে কৃষ্ণা, বড়সাহেব নিজে যাচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে আমায় যেতে হবে, বিশেষ এনকোয়ারিতে।'

কৃষ্ণা বললে, 'বেশ তো, আপনি কানপুর যাচ্ছেন যান, আমাকে একজন বিশ্বাসী লোক দিন, যে নিয়ে যেতে পারে। স্থান নির্দেশ করাই আছে, শুধু পথটা...।'

বলতে-বলতে সে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে রুমাদেবীর পত্রখানা বার করে বললে, 'এই দেখুন না. "কাছারীঘাট থেকে নৌকোয় উঠে, দক্ষিণ দিকে মাইল-চারেক গেলেই এ-জায়গাটা পাবে"। এমন লোক দিন, যে এসব পথ-ঘাট চেনে, জানে। রুমাদেবী ম্যাপ এঁকে দিয়েছেন, শুধু পথ দেখালেই চলবে।'

প্রণবেশ বললেন, 'তোমার শামুয়া এসব জায়গা বেশ চেনে হে! কৃষ্ণা তাকে বলেছিল...তুমি হুকুম করলেই সে যেতে পারে, বললে।'

সুজন বললেন, 'সে যেতে পারে জানি, চিনবেও সব, কিন্তু কথা হচ্ছে, কেবল তাকে নিয়ে সেই অজ্ঞাত স্থানে তোমাদের—বিশেষ করে কৃষ্ণার যাওয়া উচিত হবে না। আমি সঙ্গে থাকলে তবু চলত, কিন্তু ধরো যদি বিপদ ঘটে?'

কৃষ্ণা বাধা দেয়, 'কোনও ভয় নেই সুজনমামা, আমি শামুয়াকে নিয়েই যাব, মামাও সঙ্গে থাকবেন। আমরা বেড়াতে এসেছি মাত্র, কেউ কোনও সন্দেহ করবে না।'

সুজন বললেন, 'তবু যদি বলো, না হয় দুজন কনস্টেবল সঙ্গে যেতে পারে।'

প্রণবেশ খুশি মুখে বললেন, 'ঠিক বলেছ, দুজন কনস্টেবল বরং সঙ্গে চলুক। ওদের কাছে তো রিভলভার থাকবে, যদিই কোনও বিপদ আসে, ওরা লড়বে।

শক্ত মুখে কৃষ্ণা বললে, 'খেপেছ মামা, আমরা বেড়াতে যাচ্ছি, সঙ্গে পুলিশ থাকলে সবাই সন্দেহ করবে যে! কী দরকার ওসব করে? আমরা এমনি বেড়াতে যাব, বেড়িয়ে আবার চলে আসব,

এমন তো অনেকেই বেড়াতে যায় শুনেছি।'

সুজনকে অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হল।

শামুয়াকে ডেকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

শামুয়া নৌকো ঠিক করে আসে। তারপর আহারাদি শেষ করে কৃষ্ণা, শামুয়া ও প্রণবেশ কাছারী-ঘাটে এসে নৌকোয় উঠে বসেন।

ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে নৌকো ভেসে চলে সোজা দক্ষিণ দিকে।

শামুয়া এ-অঞ্চলের সব চেনে। চার-পাঁচ মাইলের দূরত্ব সে হেসে উড়িয়ে দেয়, বলে, 'ওসব মাইল-টাইল আমি চিনি নে বাবু, মিয়াংয়ের কাছাকাছি নেমে পড়ে খুঁজতে-খুঁজতে যাওয়া যাবে এখন।'

ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর শামুয়া থামবার আদেশ করে মাঝিকে—'এখানে নৌকো বাঁধো, এইখানেই নামব আমরা।'

দু-দিকে পাহাড়...মাঝখানে সরু পথ...গ্রামের লোক খুব সম্ভব এই পথে যাওয়া-আসা করে।

শামুয়া এগিয়ে চলে, পিছনে আসেন প্রণবেশ আর কৃষ্ণা।

দু-দিককার খাড়া পাহাড়শ্রেণীর পানে তাকিয়ে প্রণবেশের বুকের রক্ত জল হয়ে আসে। মনে-মনে তিনি কৃষ্ণাকে গালাগালি করেন, মুখে কিছু বলতে সাহস পান না।

কোথাও চড়াই, কোথাও উতরাই। পাহাড়ি পথে চলতে প্রণবেশ রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠেন।

তাঁর অবস্থা দেখে কৃষ্ণা মাঝে-মাঝে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, তারপর আবার এগিয়ে চলে।

প্রায় মাইল-তিনেক পথ চলবার পর শামুয়া বললে, 'এই জায়গার নাম মিয়াং, বাবু।'

অল্প দূরে একটি লোককে এদিকে আসতে দেখা যায়। কিন্তু এদের দেখে সে পাহাড়ের আড়ালে সরে যাওয়ার চেষ্টা করবার আগেই কৃষ্ণা তার সামনে গিয়ে পড়ে।

লোকটি অবাক হয়ে কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে—কৃষ্ণা তাকে প্রশ্ন করে, কোনও কথারই সে উত্তর দেয় না। প্রণবেশ বিরক্ত হয়ে উঠে বলেন, 'ছেড়ে দাও কৃষ্ণা, মনে হয় লোকটা বোবা-কালা, নইলে তোমার এত কথার একটা উত্তর ও দিত।'

কৃষ্ণা বলল, 'বোবাও নয়, কালাও নয় মামা, লোকটা জানে সব, অথচ কোনও উত্তর দিচ্ছে না, পাছে কোনও কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমি শামুয়াকে দিয়ে ওকে কথা বলাচ্ছি দেখো।'

শামুয়া আস্ফালন করে—'যা বলেছেন দিদিসাহেব, পাজির পা-ঝাড়া এই লোকটা। হতভাগ্যটাকে জব্দ করবার ভার আমায় দিন, আমরা যে পুলিশের লোক তা ও জানে না, তাই মুখ খুলছে না।'

এই কথা শুনে যে বীভৎস-দৃষ্টিতে লোকটা শামুয়ার মুখের দিকে চাইল, তাতে শামুয়া একেবারে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে কাঁপতে-কাঁপতে কৃষ্ণার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল।

সহসা বিকৃত হাসি হেসে উঠল লোকটা। তার সেই অট্টহাসিতে চমকে উঠে প্রণবেশ দুই পা পিছনে সরে গেলেন।

ততক্ষণে লোকটা পাহাড়ের ওধারে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

প্রণবেশ শুষ্ককণ্ঠে বললেন, 'থাকগে, আর দরকার নেই কৃষ্ণা, ফিরে যাওয়া যাক, কেমন?'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'তুমি শামুয়াকে নিয়ে নৌকোয় যাও মামা, আমি যা করতে এসেছি তা না করে এক পা-ও নড়ব না।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রণবেশকে তার সঙ্গে যেতে হয়। হাতের রিভলভারটা দেখিয়ে কৃষ্ণা বলে, 'ভয় নেই শামুয়া, যতক্ষণ হাতে রিভলভার থাকবে, কেউ তোমার এতটুকু অনিষ্ট করতে পারবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

সঙ্গে যাওয়া ছাড়া শামুয়ার আর উপায় ছিল না, তাই ছায়ার মতোই সে কৃষ্ণার পিছনে-পিছনে রইল।

জনমানবহীন পথ। মাঝে-মাঝে কেবল দু-একখানা ঘর দেখা যায়, শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। শামুয়ার কাছে শোনা গেল—এখানে কিছুদিন আগে কী এক জ্বর এসেছিল, অনেক লোক সেই জ্বরে ভুগে মারা যায়, বাকি যারা বেঁচেছিল তারা জ্বরের ভয়ে পালিয়ে গেছে ঘরের মায়া ত্যাগ করে।

বিফল হয়ে কৃষ্ণা ফিরল।

বেশ বোঝা গেল, রুমাদেবীকে যারা চুরি করে এনেছিল, তারা এখান থেকে সরে গেছে। কৃষ্ণার মনে হল, তারা একজায়গায় বেশিদিন থাকে না, পুলিশের ভয়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়।

নৌকোয় উঠে শামুয়া একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলল, এতক্ষণে তার মুখখানা প্রফুল্ল দেখা গেল। সে কিছু না বললেও কৃষ্ণা বুঝতে পারে যে, আজও শামুয়ার শত্রুরা প্রতিহিংসা ভোলেনি। যারা একদিন শামুয়াকে হত্যা করতে উদ্যোগী হয়েছিল, মিয়াংয়ের পথে-দেখা সেই লোকটি তাদেরই দলের একজন। অথচ শামুয়া সম্পূর্ণ নীরব হয়েই থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনও কথা বলে না।

নয়

মিয়াং থেকে ফেরবার কয়েকদিন পরের কথা। একদিন ল্যাংটিং স্টেশনে নেমে কৃষ্ণা বিস্মিতভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

ছোট্ট স্টেশন—চারিদিকে উঁচু-নিচু পাহাড়ের শ্রেণী...পাহাড়তলির পাশে এখানে-ওখানে চায়ের বাগান। এ-অঞ্চলটা চা-বাগানের জন্যে বিখ্যাত।

সঙ্গে এসেছেন সুজন।

বন্ধুর দুর্গম পথের কথা ভেবে প্রণবেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, কৃষ্ণা তাঁকে আশ্বস্ত করেছে—'থাক মামা, তোমায় আর যেতে হবে না। আমি আজ যাচ্ছি, কাল আবার ফিরে আসব, তোমায় নিয়ে গেলে কাল হয়তো ফেরা হবে না, দু-চারদিন আবার সেই হাতিখালিতে আমায় থেকে যেতে হবে।'

একদিক দিয়ে খুশি হলেও প্রণবেশ রাগ করে বললেন, 'তার মানে? আমি কি তোমার বোঝা হয়ে যাব, যে, আমার ভার বয়ে তোমায় দু-চারদিন ওখানে বিশ্রাম নিতে হবে?'

কৃষ্ণা সান্ত্বনার সুরে বললে, 'কথাটা বুঝতে পারছ না, মামা। হয়তো যাওয়ার সময় ডুলি পাব, ফেরবার সময় পাব না, মোটের ওপর হাঁটতে হবেই। পথের মাঝখানে গিয়ে তুমি হয়তো অচল হয়ে পড়বে, তখন উপায়? তারচেয়ে তুমি এখানেই থাকো—আরামে থাকতে পারবে, শামুয়া তোমায় হাতে-হাতে রাখবে, এতটুকু কষ্ট পেতে হবে না।'

বলা বাহুল্য, প্রণবেশ আসেননি, সুজনের সঙ্গেই কৃষ্ণা ল্যাংটিং রওনা হয়েছে।

সুজন আগে থেকে ডুলির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। উঁচুনিচু পার্বত্য পথে অন্য কোনও যান-বাহন চলতে পারে না; সুজনের জন্যেও একখানা ডুলি রয়েছে।

এখানকার ডুলি দেখে কৃষ্ণা হাসে।

সুজন বললেন, 'পাহাড়ি দেশের ডুলি এইরকমই হয়ে থাকে কৃষ্ণা, সভ্য জগতের বার্তা এরা পেলেও, সভ্য সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই। যাই হোক, উঠে পড়ো ডুলিতে, দেরি করবার দরকার নেই।'

দীর্ঘ দশ মাইল পথ।

বাহকেরা ডুলি নিয়ে কখনও চড়াই ভেঙে উঠছে, কখনও উতরাই পথে নামছে। পাহাড়ের উপর দূরে-দূরে মিকিরদের বস্তি দেখা যায়; মাঝে-মাঝে দু-একজন জংলি লোকের সঙ্গে দেখা হয়, বিস্মিতভাবে তারা ডুলির পানে তাকিয়ে থাকে।

পাহাড়ের পাশে-পাশে জঙ্গলে-ভরা গভীর খাদ...কৃষ্ণা ডুলির বাইরে মুখ বাড়িয়ে বাহকদের সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, বাহকেরা তার কথা বোঝে না।

পিছনে আসতে-আসতে সুজনের ডুলি মাঝে-মাঝে পাহাড়ের বাঁকে আড়াল পড়ে, আবার ঘুরে নিকটে আসে।

চলতে-চলতে সহসা বাহকেরা একসময় থেমে গেল।

সুজন বাহকদের কী জিজ্ঞাসা করেন এবং তার উত্তরে তারা যা বলে, কৃষ্ণা তা না বুঝলেও এটুকু বুঝতে পারে যে, কোনও বিপদের আশঙ্কায় তারা থেমে গেছে, আর এগুতে চাচ্ছে না।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে—'ব্যাপার কী, সুজনমামা, এরা হঠাৎ থেমে গেল যে?'

সুজন সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখালেন...দূরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সারি-সারি হাতি চলেছে; বললেন, 'ওদিকে আর এগিয়ে যাওয়া মানে, মরণকে ডেকে আনা। ওদের দৃষ্টি একবার এদিকে পড়লে আর নিস্তার নেই, এখনি দলে-দলে ছুটে আসবে...আমাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না।'

কৃষ্ণা অবাক-বিস্ময়ে সেইদিকে চেয়ে থাকে! বর্মা-অঞ্চলের মেয়ে...অনেক জীবজন্তু দেখেছে সে, কিন্তু আসামের জঙ্গল-ভরা পার্বত্য পথে আজ যেমন সমারোহে হাতির দল যেতে দেখল, এরকম সে আর কখনও দেখেনি!

দূর থেকে সেই হাতি আর তাদের বাচ্চাদের দেখে কৃষ্ণা চোখ ফেরাতে পারে না—অপূর্ব... অ-দৃষ্টপূর্ব...মনোরম!

সুজন বললেন—'এরা এইভাবে মাঝে-মাঝে এইরকম জঙ্গলে চলাফেরা করে। এ-সময়ে সামনে কোনও মানুষ বা জীবজন্তু পড়লে এরা পায়ে চেপে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলে!'

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাহকেরা আবার এগিয়ে চলল।

দীর্ঘ চড়াই-উতরাইয়ের পথ অতিক্রম করবার সময় পরিশ্রান্ত বাহকেরা পথের মাঝে দু-চারবার ডুলি নামিয়ে বিশ্রাম করে নিল। এমনি করে হাতিখালিতে যখন তারা পৌঁছল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

হাতিখালির চারিদিকে চায়ের বাগান, মাঝখানে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়ি। আসামের অধিকাংশ বাড়ি যেমন কাঠের তৈরি এ-বাড়িটিও তাই। চারিদিক-ঘেরা বিরাট উঁচু পাঁচিলের মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ি।

ডুলি থামতেই সুজন মিত্র নেমে পড়লেন, কৃষ্ণাও নামল।

চারিদিকে তাকিয়ে কৃষ্ণা বললে, 'ইস! কী সাংঘাতিক নির্জন জায়গা! এরকম জায়গাতেও মানুষ বাস করে? আশ্চর্য!'

সুজন বললেন, 'না, একেবারে নির্জন নয়। ওদিকে এইসব জংলিদের বস্তি আছে, এ-বাড়ির পেছনদিকে ভবতোষবাবু অনেক ঘর তৈরি করে তাঁর কর্মচারীদের রেখেছেন, আপদে-বিপদে তারাই এঁদের সহায়। ভেতরে চলো, দেখতে পাবে।'

মস্তবড় এই বাড়ির মধ্যে অসংখ্য ঘর। এখানে কেউ না থাকায় সব ঘরই চাবিবন্ধ ছিল। সুজনের কাছে চাবি ছিল, তিনি সামনের ঘরের তালা খুললেন।

তিনি এসেছেন খবর পেয়ে, ভবতোষ চৌধুরীর কর্মচারী ও দ্বারবান-ভৃত্যেরা উপস্থিত হল।

ম্যানেজার রামশরণ সিং—বিহারের অধিবাসী। শোনা গেল, ইনি ভবতোষ চৌধুরীর পরম বিশ্বাসী ও হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। ভবতোষ চৌধুরীর সমস্ত বৈষয়িক-ব্যাপারে ইনি জড়িত এবং তাঁর এইসব উন্নতির মূলে ছিল রামশরণ সিংয়ের ঐকান্তিক পরিশ্রম।

কৃষ্ণাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। সুজনকে লক্ষ করে বললেন, 'কাল আপনার তার পেয়ে জেনেছি, আপনি কৃষ্ণাদেবীকে নিয়ে আসছেন। ঘরের চাবি আমার কাছে ছিল না বলে কিছুই পরিষ্কার করে রাখতে পারিনি, তাই আমার ঘরেই ওঁর থাকার ব্যবস্থা করেছি, ইন্সপেক্টার সাহেব।'

সুজন হাসিমুখে বললেন, 'তা আমি জানি রামশরণবাবু; বিশেষ করে, আপনার ভরসাতেই ওকে এখানে আনবার সাহস করেছি। রুমাদেবীর এখান থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান করার ব্যাপারটা আমাদের বড় বেশিরকম বিস্মিত করেছে কিনা; তাই এখানে আর-কাউকে আনবার ভরসা করিনি।'

অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে রামশরণ সিং বললেন, 'কিন্তু ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি তো জানেন, ব্যাপারটা কীরকম ভাবে ঘটল! এত পুলিশ পাহারা, আমরা নিজেরা সর্বদা সজাগ, তার মধ্যে এরকম একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমরাও বড় কম লজ্জিত হইনি। বিশেষ, তিনি আমার মনিব এবং বন্ধুর কন্যা—এ বাড়িঘর সব তাঁরই। নিজের বাড়িতেও তিনি শান্তিতে থাকতে পারলেন না—সত্যিই দুঃখের কথা।'

সে-রাত্রে কৃষ্ণা কিছুই করতে পারল না। অজানা দেশ। নিকষ কালো অন্ধকার রাত। রামশরণ সিংয়ের মহলে একখানা ঘরে তার শয্যা রচিত হয়েছিল। এ-মহলে কৃষ্ণা কোনও স্ত্রীলোককে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাড়িতে কোনও মেয়েকে দেখতে পাচ্ছি না সিং-সাহেব, কিন্তু মামা বলেছিলেন, মেয়েছেলে আছে। একটু আগেও তো জানতে পারিনি যে, এখানে কেউ নেই—মামাকেও বলেননি তো?'

রামশরণ সিং বললেন, 'ইন্সপেক্টার সাহেব সেবারে এসে আমার স্ত্রীকে দেখেছিলেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়েছি চিকিৎসার জন্যে, কৃষ্ণাদেবী! আজ দিন তিন-চার হল তিনি গেছেন। এখনও পৌঁছনোর খবর পাইনি। দেখছেন তো, কীরকম জায়গায় আমরা বাস করছি; ব্যায়রাম হলে ডাক্তার নেই, কবিরাজ নেই, একফোঁটা ওষুধ পর্যন্ত আমরা পাই নে, তাই অসুখ-বিসুখ হলে এখানে আর থাকা চলে না।'

কৃষ্ণাকে ঘরের দরজা বন্ধ করতে উপদেশ দিয়ে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমোতে বলে রামশরণ সিং বেরিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণা দরজা বন্ধ করে খিল দিলে।

তারপর আলোটা খুব কম করে দিয়ে, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার খড়খড়ির পাখিগুলো খোলা থাকলেও, ছিটকিনি সে বন্ধ করে দিলে।

রামশরণ সিংকে সে সুজনের মতো এককথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। তার মনে হচ্ছে, এই লোকটি এইসব ষড়যন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত আছে। গৌহাটির বাড়ি থেকে ভবতোষ চৌধুরীর অন্তর্হিত হওয়া এবং রুমাদেবীর এখান থেকে অকস্মাৎ বিলীন হওয়ার মূলে রামশরণ সিংয়ের সাহায্য সম্পূর্ণভাবেই আছে।

পাশের ঘরে নাসিকা-গর্জন শুনতে পাওয়া যায়। এ-নাসিকা-গর্জন তার পরিচিত। গত রাত্রে গৌহাটিতে সে সুজনমামার নাসিকা-গর্জন শুনেছে—দারুণ অস্বস্তিতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত তার চোখে ঘুম আসেনি।

ওপাশে রামশরণ সিংয়ের ঘরের ঘড়িতে টং-টং করে বারোটা বেজে গেল। কৃষ্ণা আস্তে-আস্তে নিজের বিছানায় যাওয়ার উদ্যোগ করছিল, এমনসময় বাইরের দিকে দরজা খোলার শব্দ কানে আসায় সে আবার ফিরল।

রামশরণ সিং অত্যন্ত সন্তর্পণে দরজা খুলে দিচ্ছেন—নিশ্চয়ই বাইরের কোনও লোক এসেছে। নিশ্বাস বন্ধ করে কৃষ্ণা তাকিয়ে থাকে খড়খড়ির রন্ধ্র-পথে।

খোলা দরজা দিয়ে যে-লোকটি পা টিপে-টিপে ভিতরে ঢুকল, সে কৃষ্ণার অপরিচিত নয়। রামশরণ সিংয়ের হাতের টর্চের মৃদু আলোকে কৃষ্ণা তাকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে...।

কদম্বকেশরের মতো সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে তার...আ-চিন এসেছে।

দশ

রামশরণ সিংয়ের ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। ততক্ষণে কৃষ্ণা নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলে...সুজনকে জাগাতে হবে। যাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই আ-চিন এখানে স্বয়ং উপস্থিত। এখনকার প্রত্যেক মুহূর্তটি মূল্যবান...এইসময় যদি দস্যুটাকে গ্রেপ্তার করা যায়...।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই সে হতাশ হয়ে পড়ে। এখানে তাদের সাহায্য করবার লোক কই? রামশরণ সিংকে সুজন কোনওদিনই অবিশ্বাস করেননি। নানারকম কাজের জন্যে রামশরণ সিং প্রায়ই গৌহাটি গেছেন, সুজন মিত্রের সঙ্গে তাঁর আজকের পরিচয় নয়। সুজন স্বপ্নেও কোনওদিন ভাবতে পারেননি, যাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি তাঁর শত্রুপক্ষের লোক ছাড়া আর কিছু নন।

তাঁকে বিশ্বাস করে সুজন কৃষ্ণাকে শুধু এখানে নিয়ে এসেছেন নয়, রামশরণ সিংয়ের গৃহেই আশ্রয় নিয়েছেন।

আ-চিন এই মুহূর্তে এখানে এই বাড়িতে এসেছে সংবাদটা সুজনকে দেওয়ার জন্যে কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। কে জানে, বিলম্বে তারও কোনও বিপদ ঘটতে পারে কি না! আ-চিন তাকে চেনে, কৃষ্ণার পিতা-মাতার মতো কৃষ্ণাকেও সে আজ হত্যা করতে পারে। সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান...কোথায় কী আছে কৃষ্ণার অজ্ঞাত...কোন পথ দিয়ে কোন ঘরে পৌঁছে সুজনকে খবর দেবে সে? তা হলে?...

মনে পড়েছে। শোবার আগে কৃষ্ণাকে নিঃশঙ্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে, রামশরণ গেলেন বাঁদিকে আর ডানদিকে সুজনমামা। আলোটাকে বাড়াবার চেষ্টা না করে, বিছানার উপর বালিশের পাশে যে-রিভলভারটা রেখেছিল, সেটা হাতে নিয়ে সে নিঃশব্দে দরজা খুলে ফেলল। তারপর খুব সন্তর্পণে পা টিপে-টিপে...।

এই যাঃ! দরজা খোলবার সঙ্গে-সঙ্গে সহসা কে তাকে চেপে ধরে তার হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে হঠাৎ তার মুখের ভিতর তারই কাপড়ের আঁচল গুঁজে দিলে।

লৌহমানব না কি? তার শক্ত হাতের নিষ্পেষণ থেকে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করে কৃষ্ণা... চিৎকার করবার উপায় নেই...তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে সামনের লোকটিকে পদাঘাত করে, একবার... দুবার...তিনবার...

কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শক্তিশালী একজন পুরুষের সঙ্গে একটি তরুণী কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে?

চাপাকণ্ঠে কে আদেশ দেয়—'নিয়ে যাও...পেছনের দরজায় ডুলি আছে...যত শিগগির পারো... তার জন্যে সময় দিলুম দু-মিনিট...।'

পরিষ্কার আ-চিনের কণ্ঠস্বর।

নিস্তব্ধে মূর্ছিতার মতো পড়ে থাকে কৃষ্ণা, তা ছাড়া উপায় কী?

আ-চিন বললে, 'সবুর! সাবধানের মার নেই। মূর্ছার ভান করে থাকে তো, সরানোর আগে ওকে ক্লোরোফর্ম করে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ। মনে হয় ওর জ্ঞান আছে।'

রামশরণ সিং বললেন, 'না-না, আমার মনে হয়, সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওরকম করে গলা টিপে ধরলে কোনও মানুষের জ্ঞান থাকে না। আমার মতে অনর্থক ক্লোরোফর্ম করা হবে।'

'অনর্থক?' আ-চিন হাসে, বলে, 'একে তুমি চেনো না রামশরণ, এ একেবারে জাত-কেউটের বাচ্চা। একবার একটু ছোবল দেওয়ার সুযোগ পেলেই সঙ্গে-সঙ্গে জীবনান্ত! একে চিনতে আমার আর বাকি নেই। বাংলাদেশে এই বয়সে এই মেয়ে যা নাম করেছে, শুনলে তুমি আশ্চর্য হয়ে যাবে। ওই ইন্সপেক্টারটাকে আমি একদম গ্রাহ্য করি নে, ওদের দলকে আমি মশা-মাছির মতো মনে করি। কিন্তু এ-মেয়ে—এর তুমি জুড়ি পাবে না। মস্তবড় গোয়েন্দা এ-মেয়ে, একে চেনা সহজ নয়।'

'গোয়েন্দা!'

রামশরণ সিং আকাশ থেকে পড়েন—'এইটুকু মেয়ে, গোয়েন্দা?'

আ-চিন বলে, 'হ্যাঁ, মস্তবড় গোয়েন্দা। তোমার ওই ইন্সপেক্টার সাহেব এর কাছে কিছুই না। যা করছি শুধু দেখে যাও, যদি বাঁচতে চাও তো একটি কথা বোলো না—বুঝলে?'

উগ্র গন্ধটা নাকে আসতেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে। চোখ তার বাঁধা, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দেওয়া, চিৎকার করা চলে না, দু-একবার হাত-পা নাড়বার চেষ্টা করে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে।

কয়েকজন লোকের সাহায্যে আ-চিন পিছনের দরজা-পথে কৃষ্ণাকে একখানা ডুলিতে তুলে দিয়ে, রামশরণ সিংয়ের ঘরে ফিরে আসে।

'হো-হো-হো-হো-হো-হো!'

সচকিতভাবে রামশরণ বললেন, 'চুপ-চুপ...আস্তে। ইন্সপেক্টার শুনতে পাবে।'

একটা চোখ অর্ধমুদ্রিত করে আ-চিন বললে, 'তোমার ইন্সপেক্টার আজ সারারাতের মধ্যে আর জাগছে না বাপু; ওর খাবার জলে ঘুমের ওষুধ মেশানো হয়েছে, আজ সারারাত ও ওইভাবেই ঘুমোবে। তোমায় যাতে সন্দেহ করতে না পারে সে-উপায় আমি করে যাচ্ছি, চিন্তা নেই।'

প্রায় আধঘণ্টা পরে আ-চিন যখন সেই বাড়ি থেকে বেরুল তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে।

সারারাত্রি একভাবেই কেটে গেল।

সকালের দিকে সুজন মিত্রের যখন ঘুম ভাঙল, নিজেকে বড় দুর্বল মনে করলেন তিনি। সমস্ত গায়ে অসহ্য ব্যথা, হাত-পা নাড়তেও কষ্ট হয়। দশ মাইল পথ পার্বত্য পথে ডুলি করে আসা তাঁর কাছে আজ নতুন নয়, এই রামশরণ সিংয়ের নিমন্ত্রণেই তিনি আরও দু-চারবার হাতিখালিতে এসেছেন-গেছেন, কিন্তু কোনওবারই তাঁর এরকম হয়নি।

বহু কষ্টে তিনি বসলেন, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে খুলতে পারলেন না, টানাটানি করে বোঝা গেল, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

এক মুহূর্তে তাঁর সমস্ত জড়তা কেটে গেল, অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠলেন তিনি—'রামশরণবাবু! দেওদার! সাংলো!'

কোথায়-বা কে! অত হাঁকডাকেও কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বাংলোতে কেউ নেই না কি?

মনে পড়ে—পাশের ঘরে কৃষ্ণা আছে।

সুজন চিৎকার করে ডাকেন—'কৃষ্ণা!'

কিন্তু তারও সাড়া পাওয়া গেল না।

বিপদের আশঙ্কায় সুজন অভিভূত হয়ে পড়েন, কৃষ্ণার সাড়া না পেয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দরজায় সজোরে পদাঘাত করেন, দরজা ঝনঝন করে ওঠে, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণা? তবে কি...

আবার পদাঘাত—উপর্যুপরি পদাঘাতে দরজা কাঁপতে থাকে। হাঁপিয়ে যান সুজন...খানিকটা বিশ্রাম...একটু সামলে নিয়ে আবার পদাঘাত—মড়-মড়-মড়...।

ক্রমাগত ধাক্কার ফলে দরজার কিছু অংশ খসে যেতে, দেখা গেল, কৃষ্ণার ঘর শূন্য—

বিমূঢ়ের মতো সুজন দাঁড়িয়ে থাকেন, ভাবেন, গেল কোথায় কৃষ্ণা! তবে কি শত্রুর হাতে বন্দি হয়েছে সে? তাই বা কী করে হয়? কৃষ্ণার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল নিশ্চয়ই? তবে কি দরজা খুলে বাইরে এসেছিল সে আর সেই সুযোগেই শত্রুরা তাকে বন্দি করেছে! আমি উপস্থিত থাকতে কৃষ্ণা এইভাবে অপহৃতা হবে! এ যে ভয়ানক লজ্জার কথা!

বাড়িতে তো আরও লোক ছিল—রামশরণ সিং কোথায় গেলেন? তাঁর কী হল?

রামশরণ সিংয়ের দরজা বাইরে থেকে শিকল বন্ধ। দরজা খুলে সজন দেখতে পেলেন, মুখ-হাত-পা বাঁধা নিরুপায় রামশরণ চিং হয়ে পড়ে আছেন বিছানায়।

তাড়াতাড়ি সুজন তাঁর বাঁধন খুলে দিলেন।

রামশরণ বিছানায় উঠে বসলেন...অবসন্ন। তাঁর উপর দিয়েও যে ভীষণ উৎপীড়ন-নিপীড়ন চলেছে তা দেখেই বোঝা যায়।

সুজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপার কী, রামশরণবাবু? কৃষ্ণাকে দেখতে পাচ্ছি নে, আপনাকে এরকম অবস্থায় দেখছি, বাড়ির আর-সব লোকজন কোথায়?'

রামশরণ সিং ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'কিছুই জানি নে আমি। একবার যেন মনে হল, কে আমায় চেপে ধরেছে, তারপর সব অন্ধকার! ঘুমিয়ে পড়েছিলুম খুব। কেউ নেই? গেল কোথায় সব?'

সুজন স্তব্ধ হয়ে থাকেন—যে উত্তর দেবে, উল্টে সে-ই তাঁকে প্রশ্ন করছে? ব্যাপার মন্দ নয়! কিন্তু গৌহাটি ফিরে গিয়ে প্রণবেশকে কী বলবেন তিনি?

এগারো

ঘটনার অপরাংশে ওদিকে কৃষ্ণার জ্ঞান ফিরে আসে।

প্রথমটায় সে বুঝতে পারে না সে কোথায়! চোখ মেলে সে এদিক-ওদিক তাকায়, বিস্মিতভাবে উঠে বসে, সমস্ত কথা মনে করবার চেষ্টা করে।

আস্তে-আস্তে মনে পড়ে...কাল সে গৌহাটি থেকে ল্যাংটিং এসেছিল, সেখানে স্টেশনে নেমে, ডুলিতে চেপে দশ মাইল দূরে হাতিখালিতে গিয়েছিল, তারপর সেখানে রামশরণ সিংয়ের অভ্যর্থনা আদর-আপ্যায়ন...অবশেষে তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাবধানে থাকার উপদেশ...

সেই রামশরণ সিং আর তার চিরশত্রু দস্যু আ-চিন...

প্রথম থেকেই কৃষ্ণা রামশরণ সিংকে বিশ্বাস করতে পারেনি। লোকটার মুখ-চোখ দেখে মনে হয়েছিল, ধূর্তের শিরোমণি সে।

কিন্তু কোথায় এসেছে সে? হাতিখালি থেকে কতদূরে? অথবা হাতিখালিতে সেই বাড়িরই একটা ঘরে তাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে? কৃষ্ণা একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে।

এটা যেন ঠিক ঘর নয়; মনে হয়, পাহাড়ের একটা প্রায়ান্ধকার গুহা। কোনওদিকে জানলা নেই, উপরদিকে অনেক উঁচুতে খানিকটা জায়গা তারের জাল দেওয়া, সেখান থেকে যেটুকু আলো আসছে, তাতেই এর অন্ধকার খানিকটা পাতলা হয়ে গেছে।

কৃষ্ণা দেখল—ঘরের মেঝেয় কতকগুলো খড়ের গাদায় কম্বল পড়ে আছে একখানা, তার উপরেই সে শুয়েছিল।

চারদিককার দেয়াল শক্ত পাথর কেটে তৈরি। মেঝেটাও তাই। একদিকে একটি মাত্র ছোট্ট

দরজা, সে-দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ। ঘরের এককোণে একটি মাটির কলসী, তার মুখে একটা মাটির গ্লাস। কলসীর কাছে মাটিরই একটা পাত্রে কী যেন ঢাকা দেওয়া আছে।

তৃষ্ণায় বুক পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ! হয়তো ওই কলসীটাতে জল আছে। দস্যুদের বুদ্ধি আছে। রামশরণ সিং বা আ-চিন, যে-ই তাকে বন্দি করুক...এত যন্ত্রণা দেওয়ার পরে বন্দির যে পিপাসা লাগবে, এটা তাদের অজানা নেই...সাবাস! এত দুঃখেও কৃষ্ণার হাসি আসে।

কোনওরকমে এতক্ষণে সে উঠে বসল।

মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা...মনে হয়, দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবে। কোনওরকমে হামাটানার মতন করে সে ঘরের কোণে কলসীর কাছে পৌঁছল,...কম্পিত-হাতে কলসীর মুখের গ্লাস নিয়ে একনিশ্বাসে দু-গ্লাস জল পান করে, তারপর মাথায় মুখে জল দিলে। ভরসা করে সে বেশি জল নষ্ট করতে পারে না...আর যদি না পায়?

এতক্ষণে সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হল, পূর্বাপর ভাববার অবকাশ পেল।

মনে পড়ে অতীতের কথা...বন্দিনী সে আরও বহুবার হয়েছে, নিজের অধ্যবসায়ে প্রতিবারে মুক্তিও পেয়েছে, কিন্তু এবারে কোথায় তাকে আনা হয়েছে জানবার উপায় কী? উপায়...উপায়...চিন্তার শেষ নেই...।

মাটির থালার উপর ঢাকনাটার দিকে এবার তার চোখ পড়ে। ঢাকনাটা খুলে দ্যাখে—খান তিন-চার শক্ত মোটা রুটি...একপাশে খানিকটা গুড়...।

হাসি পায় কৃষ্ণার, রুটি-গুড়ের দিকে তাকিয়েই তার পেট ভরে গেছে মনে হয়—অখাদ্য! খাবার যেমন ঢাকা ছিল তেমনি ঢাকা দিয়ে রেখে সে নিজের তৃণশয্যায় ফিরে এসে ভাবতে বসে। যে জন্যে তার আসামে আসা, তার কিছুই হল না, লাভ থেকে সে নিজেই অপরিচিত লোকের হাতে বন্দিনী হল! শুধু রতনের মুখে যতটুকু জানতে পেরেছে...অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সেইটুকুই মাত্র সম্বল তার। হাতিখালির বাংলোয় হয়তো অনেক তথ্যই সংগ্রহ করতে পারত, কিন্তু সে-সুযোগ সে পেল না। মনে হয়, সুজন নিশ্চয় গৌহাটি ফিরে গিয়েছেন, তাঁর মুখে কৃষ্ণা-হরণের কথা শুনে বেচারা মামা...।

প্রণবেশের সেই অবস্থা কল্পনা করে কৃষ্ণা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

এখন চাই মুক্তি। কিন্তু মুক্তিলাভের পথ কই?

অনেক ওপরে ওই জাল-আঁটা ভেন্টিলেটার, কিন্তু অত উঁচুতে ওঠবার কোনও উপায়ই নেই!

তবু কৃষ্ণা সাড়া নিতে চায়...বন্ধ-দরজায় আঘাত করে... 'বাইরে কেউ আছ কি?' লোহার কপাট শুধু ঝনঝন করে ওঠে। কৃষ্ণা আবার সজোরে ধাক্কা দেয়...।

কে যেন কর্কশ কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'এই, চুপ করে থাক।'

তা হলে মানুষ আছে।

কৃষ্ণা নিজের মনেই খানিকটা হেসে নেয়...নিজের মনেই ধারণা করে...এতক্ষণ প্রণবেশ ও সুজন পুলিশ-প্রহরী নিয়ে হাতিখালিতে এসে পৌঁছেছেন...হাতিখালির বাংলো তাঁরা আতিপাতি করে খুঁজছেন...তাঁরা নিশ্চয়ই জেনেছেন, কৃষ্ণাকে আটক করে রাখা হয়েছে। ভৃত্যদের পাবেন, কিন্তু রামশরণ সিংকে তাঁরা পাবেন না। কৃষ্ণা বেশ বুঝেছে, ভবতোষ চৌধুরী ও রুমার ব্যাপারে প্রধান আসামী ওই রামশরণ। আ-চিনকে কৃষ্ণা সেখানে দেখলেও সে হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই রামশরণের দলের একজন। রামশরণ সিং সকল সন্দেহের অতীত হয়ে দূরে হাতিখালিতে বসে থাকে, তার প্রধান পার্শ্বচর আ-চিন সব কাজ চালায়—কানপুরে ডাকাতির মূলেও আছে ওই রামশরণ সিং! কৃষ্ণার মনে প্রথম থেকেই যা সন্দেহ জেগেছে তা মিথ্যা নয়।

ঘরের ভিতরটা অল্পে-অল্পে অন্ধকার হয়ে আসে। কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বাইরের জগতে সন্ধ্যা নেমেছে।

জ্ঞান ফেরবার পর থেকে জনপ্রাণীর মুখ দেখতে পায়নি সে। যারা তাকে বন্দি করেছে, তারাও নিশ্চিন্ত আছে যে, জল আর খাবার যখন দেওয়া আছে, তখন জ্ঞান ফিরলে কৃষ্ণা নিজেই খাবার নিয়ে খাবে।

দারুণ ক্রোধে কৃষ্ণা নিজের হাত কামড়ায়...।

সুচতুর রামশরণ সিং সুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে, তার সহৃদয়তায় সুজন মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু সে কেন মুগ্ধ হল—যখন তাকে দেখেই তার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল?

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায়!

এইরকম সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সেই মসি-মলিন অন্ধকার ঘরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন কৃষ্ণা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না!

বারো

অকস্মাৎ কৃষ্ণার ঘুম ভেঙে যায়।

অন্ধকার ঘরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, সেই আলোয় সে দেখতে পায় তার শয্যার পাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

'কে?'

শঙ্কিতভাবে কৃষ্ণা ধড়মড় করে উঠে বসে, দু-হাতে চোখ মুছে সে ভালো করে তাকায়—আ-চিনকে চিনতে তার দেরি হয় না।

'তোমায় আমি চিনি...তুমি আ-চিন।'

আ-চিনের একটা চোখ জ্বলজ্বল করে...শিকার আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে হিংস্র বাঘ যেমন তার ক্ষরিত রক্ত লেহন করবার জন্যে মুহুর্মুহু জিহ্বা সংকোচন-প্রসারণ করে, তেমনি নিজের সরস জিভটা বারবার অধরোষ্ঠে বুলোতে-বুলোতে আ-চিন বললে, 'হ্যাঁ, আমি আ-চিনই বটে। আজও দেখছি তুমি আমায় ভুলে যাওনি সুন্দরী! ঘটনাক্রমে কয়েকদিন আগে ট্রেনে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়েছিল! আমি তোমায় দেখা মাত্র চিনেছিলাম, দেখছি, তুমিও আমায় ভোলোনি—তাই না?'

ঘৃণায় কৃষ্ণার মুখখানা বিকৃত হয়ে ওঠে, বিকৃত কণ্ঠে বলে, 'হ্যাঁ, তোমায় আমি কোনওদিনই ভুলতে পারব না। যেখানে দেখব তোমায় চিনতে পারব। বহুকাল তোমায় দেখিনি, ভেবেছিলুম আমার জীবনে আর কোনওদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। হঠাৎ আবার যে তোমায় এই অবস্থায় দেখতে পাব তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!'

কোমল কণ্ঠে আ-চিন বললে, 'সেটা নেহাৎ ভগবানের দয়া, কৃষ্ণাদেবী! আমি এ-পর্যন্ত তোমার খোঁজে বহুৎ জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি—শুনেছিলাম তুমি কলকাতায় আছ, তাই কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছিলাম, সেখানে শুনলাম, তুমি আসাম রওনা হয়েছ। ভগবানের দয়ায় তুমি যে-ট্রেনে আসছিলে, আমিও ঠিক সেই ট্রেনেই...।'

'তোমার মুখে ভগবান! হ্যাঁ, ভগবানের দয়াই বটে।'

ঘৃণায় কৃষ্ণা আর কথা বলতে পারে না—তার মুখ দেখে আ-চিন বুঝতে পারে, বলে, 'আমি জানি তুমি আমায় ঘৃণা করো—কিন্তু ভগবানের দিব্য কৃষ্ণাদেবী, আমি ঘৃণার কাজ এমন কিছু করিনি, যাতে...।'

অকস্মাৎ কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—'থাক, থাক, আর ভগবানকে ডেকো না এর মধ্যে, ও-মুখে ও-কথা মানায় না। নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে যত কথাই তুমি বলো না কেন, তোমায় আমি চিনি। তুমি—তুমি আমার পিতা-মাতার হত্যাকারী, তুমি...।'

বলতে-বলতে অকস্মাৎ তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলে নেয় সে, তারপরে বলে, 'শুধু আমি নই, পুলিশও জানে তোমাকে, আজও তোমার নামে ওয়ারেন্ট ঝুলছে, আর তোমায় ধরে দেওয়া বা তোমার সন্ধান করে দেওয়ার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা আছে, সে-কথাও তুমি জানো। হত্যাকারী-দলের সকলেই প্রায় ধরা পড়েছে, একমাত্র তুমিই গা ঢাকা দিতে পেরেছ, পুলিশ তোমায় খুঁজে পায়নি। সেদিন তোমায় দেখেই আমি বুঝেছিলুম, তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে নেই, বাংলায় না হোক, বাংলার বাইরে তোমার কর্মক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেছে। তুমি যে রামশরণ সিংয়ের সহকারী রূপে...।'

'রামশরণ সিংয়ের সহকারী?'

আ-চিন অট্টহাসি হাসে...দরজা-জানলা-বিহীন কারাগারের বদ্ধ-ঘরটা তার হাসির দমকে যেন কাঁপে...।

কৃষ্ণা দু-হাত কানে চাপা দেয়, রুক্ষকণ্ঠে বলে, 'তোমায় মিনতি করছি আ-চিন, এখান থেকে তুমি বিদায় নাও—আমায় একটু নির্জনে থাকতে দাও।'

স্নিগ্ধকণ্ঠে আ-চিন বললে, 'আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসিনি কৃষ্ণাদেবী, তোমায় শুধু একবার দেখতে এসেছি। দেখছি, এখানে ওরা যে-খাবার দিয়ে গেছে তা তুমি খাওনি, তেমনি ঢাকা পড়ে আছে।'

বলেই এগিয়ে গিয়ে ঢাকা খুলে খাবার দেখে আপনমনে সে গর্জন করে—'এ কী! এ-খাবার কি কেউ খেতে পারে? এই মোটা-মোটা পোড়া শক্ত রুটি আর একটু গুড়!' তারপর হাঁক দেয়—'পারিসানা...লতিফ!'

'জী, হুজুর!'

সসম্ভ্রমে দ্বারের প্রহরী সামনে আসতেই আ-চিন আবার গর্জন করে, 'এ-খাবার এখানে কে দিয়েছে?'

পারিসানা সসম্ভ্রমে উত্তর দেয়, 'আউলেন দিয়ে গেছে হুজুর!'

আ-চিন আদেশ করে—'নিয়ে যাও। শিগগির চা আর টোস্ট নিয়ে এসো।'

কিছুক্ষণ পরে চা-টোস্ট এসে পড়ে।

আ-চিন বলে, 'খেয়ে নাও কৃষ্ণাদেবী, কাল থেকে কিছু খাওনি, দেরি কোরো না।

কৃষ্ণা বলে, 'ধন্যবাদ! দরকার নেই এসব, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলো।'

আ-চিন বললে, 'না খেয়ে কতদিন থাকবে? একদিন-দু-দিন নয়, দিনের পর দিন, হয়তো চিরদিনই তোমায় এখানে থাকতে হবে, না খেলে কি চলে, সুন্দরী!'

কৃষ্ণা মুখ তোলে, বলে, 'তাই নাকি? কিন্তু আমাকে কোথায় এনেছ আগে সেই কথাটা দয়া করে জানাও। আচ্ছা, আমাকে বন্দি করবার কী প্রয়োজন ছিল তোমার? তোমার স্বার্থে কোনও আঘাত দিয়েছি আমি?'

আ-চিন বীভৎস হাসি হাসে। বলে, 'আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যেই তো তোমায় এনেছি। মনে করো সেদিনের কথা, তখন তোমার বয়স চোদ্দো কি পনেরো। সেদিন তোমায় ভালোবাসা জানানোর অপরাধে তোমার বাবা পা থেকে জুতো খুলে আমায় মেরেছিলেন...আমায় চোর অপবাদ দিয়ে পুলিশে দিয়েছিলেন...তাঁর বন্ধু পুলিশ-অফিসার আমার একটি কথাও কানে নেয়নি...উঃ সে কী নির্যাতন সেদিন সইতে হয়েছিল, ভাবলে...যাক, আজ আমি তোমায় কী বলে সম্ভাষণ করব—প্রিয়তমে? না, ডার্লিং? তুমি কোনটা পছন্দ করো?'

আ-চিনের মুখ থেকে তার সরস জিভটা বেরিয়ে ঠোঁটের ওপর-নিচ ভেজাতে থাকে...।

'আ-চিন?'

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—'তুমি কি আমায় হাতের মধ্যে পেয়ে এমনি করে অপমান করতে চাও?'

আ-চিন মাথা নাড়ে—'না—না—না। ভুল কোরো না কৃষ্ণাদেবী, আমি আজও তোমায় ভালোবাসি, আর ভালোবাসার পাত্রীকে কেউ অপমান বা নির্যাতন করতে পারে না। আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেই আমি তোমায় স্বাধীনতা দেব, তোমায় রানি করে রাখব—মোট কথা, আমি তোমায় চাই। যাক, এখন খেয়ে নাও, আমার কথাগুলো আজ ভালো করে ভেবে দেখো...কাল, পরশু, যেদিন হোক আমি তোমার কাছ থেকে এর একটা উত্তর চাই।'

যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে সে আবার ফিরল—'হ্যাঁ, কোথায় তোমাকে আনা হয়েছে জানতে চাচ্ছিলে, না? এ-জায়গার নাম—'মায়'। পাহাড়ের মাঝখানে বলে এখানে জনমানবের যাতায়াত নেই—কেবল আমরাই আসি-যাই, থাকি। আচ্ছা, আজ বিদায়।'

আত্মপ্রসাদের বিজয়-হাসি হেসে সে বিদায় নিল।

তেরো

একদিন, দু-দিন, তিনদিন কেটে গেল, আ-চিনের দেখা নেই।

খাবার দিতে লোক আসে দুবার। বন্দিনী কৃষ্ণার বরাত ভালো—সকালে ভাত-তরকারি-মাছ...সন্ধ্যায় দিকে গরম-গরম খানকতক লুচি, তার সঙ্গে মাংস, দুধ, মিষ্টান্ন...।

মনে-মনে কৃষ্ণা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে...যে লোক খাবার দিতে আসে, তাকে জিজ্ঞাসা করে—'আ-চিন কোথায়?'

কিন্তু জবাব দেবে কে? লোকটা শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে কৃষ্ণার দিকে, তারপর কিছু বুঝেই বোধহয় ফিক করে হেসে, হাতের তর্জনী একবার মুখে আর একবার কানে ঠেকিয়ে ইশারায় জানায়—সে বোবা...সে কালা!

ক্ষীণ একটু হাসির রেখা কৃষ্ণার ব্যথা-ভরা মুখখানাকে মুহূর্তের জন্য সুন্দর করে তোলে, মনে-মনে সে স্বীকার করে—হ্যাঁ, আ-চিনের লোক-নির্বাচন শক্তি আছে। সঙ্গে-সঙ্গে গৌহাটির সুমিয়ার কথা মনে হয়, সেও যেমন বোবা-কালার ভান করেছিল, এও বোধহয় তা-ই।

উপায় নেই—কোনও উপায় নেই তার। দরজায় দুজন সশস্ত্র প্রহরী...লোকটা যখন খাবার দিতে আসে, সে-সময়েও পালাবার কোনও উপায় নেই।

কৃষ্ণা আবার নিজের হাত কামড়ায়—একা-একা বদ্ধ ঘরের মধ্যে চঞ্চলা সিংহীর মতো ঘুরে বেড়ায়, বুদ্ধিদেবীর আরাধনা করে—তুমি এসো মা, কণ্ঠে বাণী বাগ্‌বাদিনী! বাঙালী মেয়ের মৌন মুখে মুক্তির ভাষা দাও মা!

তিনদিন পরে—

দরজা খুলে প্রবেশ করে আ-চিন, বলে, 'খবর কী কৃষ্ণাদেবী! খাওয়া-দাওয়া...তোমার আদর-যত্নের নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি হয়নি?'

'আদর-যত্ন?'

এক মুহূর্ত থেমে সে উত্তর দেয়—'হ্যাঁ, বন্দিনীর পক্ষে যতটা আদর-যত্ন পাওয়া সম্ভব তা আমি পাচ্ছি, সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এসবের মানে কী? এই আদর-আপ্যায়ন...এই অস্বাস্থ্যকর ঘর...এখানে বন্দি করে রেখে, বন্দিনীর কাছে মিষ্ট-মধুর প্রেমালাপের প্রলাপ বকে যাওয়া...তুমি চাও কী? কী তোমার বাসনা? আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, দয়া করে আমায় বাইরে যাবার অনুমতি দাও যদি...।'

আ-চিন বললে, 'আমি তো বলেছি প্রিয়তমে, আমার কথা শুনলেই আমি তোমায় মুক্ত করে দেব। আমার পাশে-পাশে তোমার যে-কোনও জায়গায় যাওয়ার অধিকার থাকবে—তুমি শুধু আমায় কথা দাও, আমার স্ত্রী হয়ে থাকতে রাজি আছ—ব্যস। এই মুহূর্তে তোমায় মুক্ত করে দেব।'

'শয়তান!'

গর্জন করে উঠেই কৃষ্ণা ঝিমিয়ে পড়ে। আ-চিনের স্পর্ধা! কয়েক বৎসর পূর্বের কথা... আ-চিন বিদেশ থেকে যখন দেশে ফিরে আসে, তার পিতাই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আ-চিন সে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করেছিল, আশ্রয়দাতার কন্যা কৃষ্ণার হাত চেপে ধরে। সেদিন সহসা কৃষ্ণার হাত চেপে ধরার পর উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়ে পিতা আ-চিনকে পুলিশের হাতে দেওয়ার সময় সেই যে আ-চিন শাসিয়ে গেছল, তারপর থেকে...।

আত্মগোপন করে কৃষ্ণা। সে জানে—এখানে তার দম্ভের, তার অহঙ্কারের কোনও মূল্য নেই, বরং তার ফলে তাকে নির্যাতনই সইতে হবে। তা হলে? তা হলে? কৃষ্ণার মনে পড়ে যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলার কথা। হ্যাঁ, নিজে মুক্তিলাভ করতে এবং যার জন্যে সে এসেছে সেই রুমাদেবী ও ভবতোষ চৌধুরীকে মুক্ত করতে তাকে চাতুর্যের আশ্রয় নিতে হবে। তাকে 'বিমলা'র ভূমিকা অভিনয় করতে হবে।

এতক্ষণে নিজের কর্তব্য সে ঠিক করে নিয়েছে।

শান্তকণ্ঠে সে বললে, 'আচ্ছা আ-চিন, আমার কাছে তুমি চাও কী?'

আ-চিনের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, 'তুমি জানো আমি তোমার কাছে কী চাই। আমি চাই তোমায় সহধর্মিণী রূপে পেতে।' সহসা নারীকণ্ঠের উচ্চহাসি মিহিসুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে —'সহধর্মিণী? তোমার দস্যু-ধর্মের অনুসঙ্গিনী! এত দুঃখ দিয়েও তুমি যে আমায় হাসাতে পারলে এখন, এর জন্যে তোমার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় দস্যু।'

'দস্যু? কিন্তু বুদ্ধিমতী, ভেবে দেখো, তোমায় আমি কত ভালোবাসি! দস্যু হয়েছিলাম বলেই তুমি আজ জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছ...আমি যে আজ দস্যু, সে-ও তো তোমারই জন্যে!'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার জন্যে। আজ যদি দস্যু আ-চিন সাধু আ-চিন বলে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করত, তাহলে তোমার স্থান কোথায় হত, বিদুষী তরুণী? তোমায় চিনত কে? তোমায় যে পরদানশিন লজ্জাবতী সরলা অবলা বাঙালি মেয়ে হয়ে রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে হত, গোয়েন্দা-রানি!'

'বাঃ! সুন্দর! বাংলা-ভাষা তোমার বেশ আয়ত্তে এসেছে দেখছি। এত বাংলা তত্ত্বকথা তুমি শিখলে কোথায়?'

'কেন, তোমার পিতার আশ্রয়ে থেকে। একটা বিরাট দলের সর্দারি করতে হলে শুধু বহুরূপী হলে হয় না, বহুভাষা-ভাষীও হতে হয়। এর জন্যে—শুধু তোমায় পাওয়ার জন্যে দস্তুরমতো বঙ্গ বাণীর আরাধনা করতে হয়েছে আমায়।'

আ-চিনের মুখে এইসব কথা শুনে কৃষ্ণা হাসে...।

কৃষ্ণার মৃদু হাসিতে আ-চিনের নিরাশ মনে আশার সঞ্চার হয়, সে ঠোঁটে জিভ বুলোতে-বুলোতে বলে, 'তা ছাড়া, তখন আর আমি দস্যু আ-চিন থাকব না। কৃষ্ণাদেবীর স্বামিত্ব লাভ করে আমি দেবত্ব পেয়ে যাব।'

কৃষ্ণা বলে, 'ওসব সাময়িক উত্তেজনার কথা। ওই ধরনের কথা শুনে-শুনে কান আমার বধির হয়ে গেছে...ওসব কথা আর কানে আসে না...এলেও শুনতে ভালো লাগে না। ওইরকম কথা বলে-বলে, আর-একজন আমায় মজিয়ে গেছে— ইস! কী ভালোই যে তাকে বাসতুম আমি ...কী ভালোই যে সে বেসেছিল আমায়...।'

ভালোবাসা-বাসির কথা—কৃষ্ণার মুখে? আ-চিনের সরস জিভটা মুহুর্মুহু সঞ্চালিত হয়ে

ভিজিয়ে তোলে ওর শুকনো ঠোঁট দুটোকে...এতক্ষণে কৃষ্ণা লয়ে এসেছে...'কী-রকম, কী-রকম সে-ভালোবাসার ইতিহাস—বলতে বাধা আছে কী? অর্ধেক তো বলেই ফেলতে—বাকিটা কৃষ্ণাদেবী...শুনতে বেশ লাগে কিন্তু। নির্জন বন্দিশালা...দীর্ঘ অবসর...এখানে শুধু তুমি আর আমি আর অলক্ষ্যে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী...সে ভাগ্যবানটি কে, কৃষ্ণাদেবী?'

বা রে আ-চিন! তোমার দস্যু-হৃদয়ের অন্তস্তলেও অতনুর আনাগোনা আছে তা হলে!

কৃষ্ণা বললে, 'না, আর বলতে বাধা কী? তাছাড়া শুনে তোমার লাভও আছে যথেষ্ট। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যখন তোমার হাত থেকে আর নিস্তার নেই, তখন বলেই যাই, কিন্তু আমার কাহিনীও ফুরুবে আর আমার হাতের এই আংটি দেখেছ? রিয়েল ডায়মন্ড! খাঁটি হীরে! একবার জিভে ঠেকালেই ব্যস! তারপর মাথার ওপর ওই অনন্ত মুক্ত আকাশ...মহাশূন্য...বায়ুস্তরে মিশিয়ে যাবে কৃষ্ণার অন্তরাত্মা!' বলেই কৃষ্ণা ডানহাতের তর্জনী আকাশের দিকে দেখাবার ভঙ্গিতে উপরের ভেন্টিলেটারের দিকে তুলে ধরতেই, মোহমুগ্ধ আ-চিন যেমন সেইদিকে চোখ ফিরিয়েছে, সেই মুহূর্তে আ-চিনের আলগা-হাতে ধরা রিভলভারটা ফস করে কৃষ্ণা নিজের হাতে নিয়ে নিলে! আ-চিন স্তম্ভিত! সে কিছু বলবার আগেই সহাস্যে কৃষ্ণা বললে, 'হাত পাতো...লুফে নাও।'

কৃষ্ণার হাতের রিভলভার অল্প শূন্যে উঠেই আবার আ-চিনের হাতে ফিরে এল। আ-চিন বুঝলে, আর যাই হোক, কৃষ্ণার উদ্দেশ্য খারাপ নয়...পাখি পোষ মেনেছে!

কৃষ্ণা বলতে শুরু করলে ঃ

'আমি তখন কলেজে থার্ড-ইয়ারে। যুবতী মেয়েদের রূপ থাকলে যা হয়, অনেকেই ফাঁদ পাতলে...শেষে ধরা পড়লুম যার কাছে, সে হুবহু তোমার মতো দেখতে...একটি বার্মিজ ছেলে। তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে, তাই এখনও বেঁচে আছি...নইলে মৃত্যু আমার পায়ের ভৃত্য...এই আংটি দেখছ? আর বাঁচিয়ে রেখেছি তোমায়, নইলে ওই রিভলভার আর তোমার হাতে ফিরে যেত না। যাক, যে-কথা বলছিলুম, হ্যাঁ, তার প্রেমে পড়বার পর বুঝলুম সে একজন অ্যানার্কিস্ট। তারপর আর কী? দেশের জন্যেই হোক আর যে-জন্যেই হোক, রাজার বিরুদ্ধে গেলে চিরকাল যা হয়ে আসছে—বিচারে তার দণ্ড হল—আজ সে দ্বীপান্তরে। আজ যদি তোমার সঙ্গে প্রেম করি আ-চিন, যদি কোনওদিন সুদিন আসে, সে যদি ফিরে আসে—তখন? তখন কি সুন্দ-উপসুন্দের লড়াই বাধিয়ে দেব?'

সব কথা না বুঝলেও, আ-চিনের বুদ্ধিতে এটা এসে গেল যে, যদিও সে হতভাগাটা কোনওদিন ফিরে আসে—তখন কৃষ্ণাকে পাওয়ার সাধ আ-চিনের মিটে যাবে। সে শপথের প্রতিশ্রুতি দিলে; বললে, 'সে আর ফিরেছে, আর যদিই ফেরে, তখন...এই রিভলভারটা তোমায় দিয়ে দিলাম...আমার ভালোবাসার জামিন।' ...বলেই সে কৃষ্ণার একখানা হাত চেপে ধরে, আর-এক হাতে রিভলভারটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'এবার তুমি মুক্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার পাশে-পাশে থাকতে হবে। কেমন, রাজি?'

কৃষ্ণা উত্তর দিলে, 'রাজি, কিন্তু এক শর্তে। আজ থেকে তিন মাস দশ দিন পরে আমার পিতার কালাশৌচ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করবে না—আমার সংস্পর্শে আসবে না। এই শর্তে রাজি হলেই তোমার ভালোবাসার মূল্য বুঝতে আমার দেরি হবে না। যখন বাঁচতেই হবে, তখন এরকমভাবে বন্দিনী অবস্থায় চিরকাল কাটাবার চেয়ে আমি তোমার কাছে বাইরে থেকেই বাঁচতে চাই। তোমার ভগবানের দিব্য।'

আ-চিন হেসে ওঠে—'বেশ, তোমার শর্তেই রাজি আমি। মাত্র তিন-চারটে মাস তো? কী আর করা যাবে! কিন্তু আমার কোনও ভগবান নেই কৃষ্ণা—কাজেই তার নামে দিব্য করা একেবারে মিথ্যে বলেই মনে হয়।'

খুশি-মুখে কৃষ্ণা বলল, 'আমারও। কারণ, আমি জানি, সবার উপরে মানুষই সত্য। শুধু শপথটা দৃঢ় করবার জন্যেই আমি ভগবানের নাম করেছি, নইলে...।'

দরজার কাছ থেকে কার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—'এদিকে একবার দরকার আছে হুজুর!'

'এসো কৃষ্ণা, আমার সঙ্গে বাইরে এসো, আর একটা কথা মনে রেখো, এখানে যা-কিছু দেখবে, শুধু দেখেই যাবে, কোনও কথা বলতে পারবে না।'

আ-চিনের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষ্ণা বাইরে বেরিয়ে আসে।

অন্ধকার পার্বত্য-গুহা—এঁকে-বেঁকে ঘুরে গেছে। খানিকদূর গিয়ে তবে পাওয়া যায় মুক্ত দিনের আলো—'আ-আ-আঃ!'

বাইরের উন্মুক্ত আলোয় এসে কৃষ্ণা নূতন জীবন ফিরে পায়, প্রাণভরে সে নিশ্বাস গ্রহণ করে, তারপর তাকায় আশেপাশে—।

আ-চিনের দলভুক্ত কয়েকজন লোক যারা বাইরে অপেক্ষা করছিল, বিস্মিত চোখে তারা কৃষ্ণার পানে তাকিয়ে থাকে...।

দুর্বোধ্য ভাষায় আ-চিন তাদের কী বলে, হয়তো কৃষ্ণার সম্বন্ধেই কিছু জানায় তাদের—সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দে লোকগুলি কৃষ্ণাকে অভিবাদন করে, তারপর তারা অদৃশ্য হয়ে যায় পাহাড়ের বাঁকে। ওদের মধ্যে একটি লোককে দেখে কৃষ্ণা চিনতে পারে। এ সেই লোক—যাকে সে ক'দিন আগে মিয়াংয়ে দেখে প্রচুর বিস্মিত হয়ে নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছিল।

যেমন করেই হোক, কার্যোদ্ধার সে করবেই...এই আ-চিনকে হস্তগত করেই সবকিছু করবে। ভীষণ প্রকৃতির এই লোকটিকে সে দারুণ ঘৃণা করে, কিন্তু সে ঘৃণা যেন তার কোনও কাজে বা কথাবার্তায় না ফুটে ওঠে, সেদিকে কৃষ্ণা সতর্ক হয়।

চোদ্দো

অতি সতর্ক আ-চিন। কৃষ্ণা বেশ বুঝতে পারে, আ-চিন তাকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে না! মুক্ত আলোয় চলাফেরা করলেও কৃষ্ণা সম্পূর্ণভাবে তার নজরবন্দি হয়ে আছে।

মাঝে-মাঝে আ-চিন কোথায় যায়—সে-সময় কৃষ্ণার ভার থাকে আ-চিনের পরম বিশ্বাসী সতর্ক প্রহরিণী সুমিয়ার ওপর।

সুমিয়াকে কৃষ্ণা চিনেছে। গৌহাটিতে ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বোবা-কালার অভিনয়ে সুদক্ষ সুমিয়াকে সে দেখেছিল। গতকাল টিটাগড় যাওয়ার সময় আ-চিন যখন কৃষ্ণাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে সুমিয়াকে এনেছে, তখনই সে সুমিয়াকে চিনেছে।

আ-চিন সুমিয়াকে আদেশ দিলে, 'এই মেয়েটি তোমার জিম্মায় রইল সুমিয়া—কোনওরকমে যেন এর কষ্ট না হয়, দেখবে। আমি দিনকয়েক পরেই ফিরব—এই সময়টুকু খুব সতর্ক থাকবে, কোনওরকম গাফিলতি না হয়—বুঝলে?'

কুর্নিশের ভঙ্গিতে সুমিয়া সেলাম করে—সে বুঝেছে। সে বোবা নয়—কালাও নয়। অথচ রতনের কাছে তখন কৃষ্ণা শুনেছিল, তিন-চারমাস সে গৌহাটিতে তাদের বাড়ি থাকার সময় সম্পূর্ণ বোবা-কালার অভিনয় করে এসেছে।

রতন বলেছিল, মেয়েটি লেখাপড়া জানে। সেদিন সে বিস্মিত হয়েছিল, সেই মুহূর্তেই একে সন্দেহ করেছিল—নিশ্চয়ই এ গুপ্তচরের কাজ করতে এসেছে। তার ধারণা যে মিথ্যে নয়, তা আজ বুঝেছে।

তবু সে কতকটা খুশি হল। যাই হোক, সুমিয়া মেয়ে, যে কোনওরকমে তার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।

সে জিজ্ঞাসা করে—'তোমায় গৌহাটিতে দেখেছিলাম না সুমিয়া...! ভবতোষ চৌধুরীর বাড়িতে? আচ্ছা, সেখানে তুমি বোবা-কালা সেজেছিলে কেন?'

সুমিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে...উত্তর দেয় না।

কৃষ্ণার মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে; বলে, 'তোমায় তখনই সন্দেহ করেছিলুম সুমিয়া, আ-চিন যে তোমায় সেখানে তার গুপ্তচর হিসেবে রেখেছিল, বুঝেছিলুম আমি। ...নয় কি?'

সুমিয়া উত্তর দেয়, 'ঠিক আ-চিনই যে রেখেছিল তা নয়, বরং আমিই তার কাজ করতে স্বেচ্ছায় গিয়েছিলুম।'

কৃষ্ণা বললে, 'স্বেচ্ছায় হোক বা টাকা বেশি পাওয়ার জন্যেই হোক, তুমি গিয়েছিলে। শুনলুম, ভবতোষ চৌধুরী তোমায় জায়গা দিতে চাননি, কিন্তু রুমাদেবী তাঁর পিতার অমতে তোমায় স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তাঁর সেই বিশ্বাসের পরিবর্তে তুমি এতখানি কৃতঘ্ন হবে। আ-চিন তোমাদের, অর্থাৎ দলের লোকদের অনেক টাকাকড়ি দেয় জানি—।'

বাধা দিয়ে সুমিয়া বললে, 'টাকাকড়ির কোনও কথা এখানে ওঠে না কৃষ্ণাদেবী!'

কৃষ্ণা তার দৃপ্ত মুখখানার পানে তাকায়, বলে, 'তবে দলবদ্ধভাবে তোমরা এমনিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো বুঝি? দলের সব লোকই তো আ-চিনের জন্যে প্রাণ দিতে পারে শুনেছি।'

সুমিয়া আবার হাসে; বলে, 'সে-কথা বলতে পারেন। আমরা আ-চিনের নিমক খেয়েছি...নিমকহারামি আমাদের জাত কোনওদিন করেনি...করবেও না কোনওদিন। মহামান্য আ-চিনকে আপনি যতটা হেয়, ঘৃণ্য মনে করছেন, সত্যিই তিনি তা নন। কতখানি দুঃখ, কতখানি কষ্ট পেয়ে তিনি আজ ঘৃণ্য দস্যুসর্দারে পরিণত হয়েছেন তা যদি জানতেন, তা হলে তাঁর সম্বন্ধে একটি কথাও বলতে পারতেন না। তিনি যে কতখানি মহানুভব...কতখানি...।'

কথাটা সে শেষ করে না—তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়।

কৃষ্ণা তার মুখের দিকে তাকায়, সুমিয়ার চোখে স্পষ্ট জল দেখা যায়, তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরিয়ে চোখ মুছে ফ্যালে।

না, সুমিয়া মেয়েটি মন্দ নয়। দিনরাতই সে কৃষ্ণার পাশে-পাশে থাকে, কত গল্প করে দেশ-বিদেশের। তার তেইশ-চব্বিশ বছরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস...কত দেশ-বিদেশের কাহিনী...আ-চিনের সেই সময়কার উদারতার পরিচয়...।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল—'বাংলা দেশে কখনও গিয়েছিলে সুমিয়া?'

সুমিয়া উত্তর দিলে—'আমাদের সর্দারের সঙ্গে এই তো মাস-পাঁচেক আগে কলকাতায় গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশিদিন থাকা হয়নি কৃষ্ণাদেবী, দিন-সাতেক মাত্র ছিলুম। সর্দার আপনাদের বাড়ি দেখালেন...আপনি তখন পড়ে বাড়ি ফিরছিলেন।'

বিস্মিত হয়ে যায় কৃষ্ণা। আ-চিন সুমিয়াকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে...তাদের বাড়িখানাও দেখিয়েছে একে। হবে. সে হয়তো সে-সময় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিল, দূর থেকে আ-চিন তাকেও দেখিয়েছে—আশ্চর্য কথা বটে!

কৃষ্ণা বললে, 'হঠাৎ আমাদের বাড়ি আর আমাকে দেখানোর কারণ তো কিছু বুঝতে পারলুম না, সুমিয়া। যাক, সে নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তোমার কথাই আমি মেনে নিচ্ছি—আ-চিন মহৎ লোক, সবদিক দিয়ে সে শ্রেষ্ঠ, সে মহান। কিন্তু ভবতোষ চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে রুমাদেবীকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার কারণ তো বুঝতে পারলুম না!'

সুমিয়ার চোখ দুটি জ্বলে, সে বলে, 'বড় জ্বালায়, বড় দুঃখে সর্দার ওঁদের সরিয়েছেন, কৃষ্ণাদেবী। আপনি যদি সবকথা শোনেন, তাহলে চৌধুরীকে আন্তরিক ঘৃণাই করবেন। অবশ্য,

রুমাদেবীর অপরাধ নেই। তাঁকে সবকথা জানানো হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তিনি সর্দারকে পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আর সেইজন্যেই আজ তাঁকেও বন্দিনী হতে হয়েছে...অসম্ভব কষ্টে তাঁর দিন যাচ্ছে। তাঁর বাপের জন্যেই তিনি কষ্ট পাচ্ছেন, এ-কর্মফল তাঁর নিজের—আ-চিনের নয়।'

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সে-সবকথা কি আমি শুনতে পাই না সুমিয়া?'

সুমিয়া উত্তর দিলে, 'সর্দার বললেই জানাব কৃষ্ণাদেবী, তাঁর অনুমতি না পেলে আমি কিছু বলতে পারব না। তিনি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন, তাঁর মুখেই সবকথা শুনতে পাবেন।'

কৃষ্ণা এ-সম্বন্ধে আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করে না, সুমিয়াও এ-প্রসঙ্গে আর কথা বলে না।

দিনের পর দিন চলে যায়...।

কৃষ্ণা মনে-মনে অস্থির হয়ে ওঠে। কোথায় সে আছে, সত্যি এ-জায়গার নাম কী সে কিছুই জানে না—সুমিয়াকে জিজ্ঞাসা করলে সে একই উত্তর দেয়—'সর্দার এলে সবই জানতে পারবেন।'

কেবল সুমিয়াই নয়, আরও পাঁচ সাত জন লোক এখানে থাকে। কৃষ্ণা স্বচ্ছন্দভাবে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, পাশে-পাশে থাকে সুমিয়া।

সেদিন সুমিয়া আসতে পারেনি, সঙ্গে এসেছিল মিংলো—অল্পবয়সের একটি ছেলে, কৃষ্ণাকে সে বেশ একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখত; কৃষ্ণার কোনও কাজ করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত।

প্রায়ই সে কৃষ্ণার আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, কিন্তু সুমিয়ার সতর্কতার দরুন কোনওদিনই সে তার কাছে আসবার সুযোগ পায়নি। আজ কৃষ্ণার প্রহরীরূপে তার সাথী হওয়ার সুযোগ পেয়ে সে ধন্য হয়ে গেল।

কৃষ্ণা তার সঙ্গে গল্প জমায়...মিংলোর মুখ থেকে তার কাহিনী শোনে ঃ

মিংলোর দেশ—লখিমপুর থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে একটা গ্রামে। তার পিতা, মহামান্য আ-চিনের দলে আসবার সময় মাতৃহারা মিংলোকেও নিয়ে আসে, সেই থেকে আজ তিন বছর সে এখানেই আছে। পিতার কথা বলতে-বলতে তরুণ মিংলোর চোখে জল আসে। তার পিতা পাঁচ মাস আগে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, আজ আপনার বলতে জগতে মিংলোর আর কেউ নেই।

মিংলোকে সহসা সাথী পাওয়াটা, ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে হয়। চতুরা সুমিয়ার কাছ থেকে এতদিনের মধ্যে এদের কোনও কথাই কৃষ্ণা জানতে পারেনি; মিংলোর কাছ থেকে এখন তবু কিছু-কিছু জানা যাচ্ছে।

চলতে-চলতে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা মিংলো, গৌহাটি থেকে যে আর-একটি মেয়েকে মাস দুই-তিন আগে আ-চিন নিয়ে এসেছে, তাকেও এখানে রাখা হয়েছে তো? কই, তাকে তো একদিনও দেখিনি এখানে।'

কৃষ্ণার প্রশ্ন বেশ মিষ্টি লাগে মিংলোর...সে আরামের হাসি হাসে; বলে, 'তাকে দেখবে কী করে? সে তো এখানে ছিল না; তাকে যেখানে রেখেছিল সেখানে পুলিশ হানা দেবে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়ে এনেছে। এই তো সবে কাল রাত্রে এসেছে সে...তারজন্যেই তো সুমিয়া আজ তোমার সঙ্গে আসেনি।'

রুমাকে কাল রাত্রে এরা এনেছে এখানে...।

কৃষ্ণার মুখখানা দৃপ্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমি যে ঘরে ছিলুম, তাকে বোধহয় সেই ঘরেই রেখেছে, তাই সুমিয়া আজ আসতে পারেনি...তাকে পাহারা দিচ্ছে।'

মিংলো বললে, 'তা আমি বলতে পারিনে। ওইরকম কোনও জায়গায় হয়তো তাকে রেখেছে; সুমিয়া তা জানে, তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।'

তখনকার মতো কৃষ্ণা চুপ করে যায়।

পনেরো

গভীর রাত্রি। আস্তে-আস্তে কৃষ্ণা উঠল...।

ওদিকে গভীর ঘুমে ডুবে আছে সুমিয়া। নাক ডাকছে তার। ভয়াবহ নিঝুম অন্ধকার রাত। বন্দিশালার এই নিস্তব্ধ ভুতুড়ে আবহের মধ্যে জাগ্রত প্রাণী একা কৃষ্ণার গা ছমছম করে...হাজার হোক, মেয়ে তো? কিন্তু উপায় কী? মুক্তি যে তাকে পেতেই হবে...ছলে, বলে অথবা কৌশলে রুমাদেবীকে মুক্ত করতে হবে। যুক্তকরে মহাদেবী শক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা করে কৃষ্ণা পা টিপে-টিপে আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলে...।

এখন চাই সে-ঘরের চাবি। চাবি নিশ্চয় সুমিয়ার কাছেই আছে। অন্য কোথাও রাখবার মেয়ে নয় সে। শয্যার সুমিয়ার মাথার শিয়রে, সম্ভব একটা টুলের ওপর অন্ধকারের বন্ধু একটা অতি মৃদু আলো যেন এইমাত্র মরা কোনও নির্যাতিত বন্দির নিষ্প্রভ চোখের মতো সকরুণ দৃষ্টিতে নিদ্রিতা-প্রহরিণীকে পাহারা দিচ্ছে।

সেই ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোয় কৃষ্ণা দেখলে, ঘুমন্ত সুমিয়ার গায়ে-আঁটা নিমার পাশ থেকে ওর বুকের ওপর বেরিয়ে আছে একটা রঙিন রুমালের কিছু অংশ। পাশে পড়ে আছে একখানা বার্মিজ হাতপাখা। এক-হাতে সেই পাখা নিয়ে সুমিয়ার মুখের ওপর ভাসা-ভাসা বাতাসের দোল দিতে-দিতে, আর-এক সাবধানী হাত ধীরে—ধীরে—ধীরে—আ-আ-আঃ! এতক্ষণের বদ্ধ নিশ্বাসটা বেরিয়ে এসে যেন স্বস্তির বার্তা পৌঁছে দিয়ে গেল কৃষ্ণার কাছে।

রুমালের এককোণে পাক-দিয়ে বাঁধা বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা চাবি। এরই জন্যে এত!

চাবিটা হস্তগত করে আবার পা টিপে-টিপে বেরিয়েই সে দরজার শেকলটা তুলে দিলে। ক'দিন বাইরে বেড়িয়ে কৃষ্ণা জেনেছে, এ-গুহার দিকে কেউই থাকে না, যে ক'জন পুরুষ আছে এখানে, তারা বিপরীত দিকের একটা গুহায় থাকে। সুমিয়ার ঘুম ভাঙবার পর সে চিৎকার করলেও এই বদ্ধ-গুহার মধ্যে সে-স্বর তাদের কানে পৌঁছবে না।

আগামীকাল আ-চিন আসবে। মিংলোর মুখে শুনেছে কৃষ্ণা, আ-চিন এসেই তাদের এখান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবে। পুলিশ এ-জায়গার সন্ধান করছে, হয়তো যে-কোনও দিন সদলবলে এসে ঘিরে ফেলবে। আ-চিন এবার বর্মায় ফিরবে...তার অপহৃত সম্পত্তি উদ্ধার করে সে নিশ্চিন্ত হবে।

অপহৃত সম্পত্তি...বর্মা...।

কথাটা কৃষ্ণার মনে লাগে। রতনের কাহিনী মনে পড়ে—মালয়ের ব্যবসায়ী আওচি লিং, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুং। সুমিয়ার কথা-প্রসঙ্গে এঁদের সম্বন্ধে দু-একটা আভাসও যেন সে পেয়েছিল।

আজকের প্রহরী—মিংলো।

কৃষ্ণা জানে, দিনে একজন আর রাত্রে একজন প্রহরী এখানে পাহারা দেয়। মিংলোর কাছে সে জেনেছে, আজ রাত্রে সে পাহারায় থাকবে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। দেখে মনে হয়, পূর্ণিমার বেশি দেরি নেই, আজ হয়তো দ্বাদশী-ত্রয়োদশী হতে পারে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে কৃষ্ণা—মিংলো এই পথেই ঘুরবে।

'কে ? কে দাঁড়িয়ে?'

অকস্মাৎ চমকে উঠে কৃষ্ণা দেখল, পাশে দাঁড়িয়ে মিংলো...গুলিভরা বন্দুকটা সে উঁচু করে ধরেছে। একটা হাত তোলে কৃষ্ণা—'আমি। মিংলো, আমি কৃষ্ণা।'

'তুমি? তুমি একা এই রাত্রে ,এখানে!'

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায় মিংলো...আস্তে-আস্তে সে উদ্যত বন্দুক নামিয়ে নেয়।

কৃষ্ণা এগিয়ে এসে, মিংলোর কাঁধের ওপর একটা হাত রাখল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, আমি এসেছি মিংলো। নিশ্চয়ই তাতে তুমি অ-খুশি হওনি?'

'অ-খুশি!' অসভ্য মিংলোর চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুখখানা খুশির হাসিতে ভরে যায়। ...আ-আ! কী পেলব স্পর্শ!

'কিন্তু, তুমি একা এই কালো রাতে...তুমি কী সুন্দর! ...কী সুন্দর!!

তার হাতখানা নিজের কোমল দু-হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে কৃষ্ণা গদগদকণ্ঠে বলে :

'আমাকে পাহারা দিতে তোমার খুব ভালো লাগে—না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে যাতে চিরকাল একসঙ্গে থাকতে পাও, সেই চেষ্টা করো না; আমাকে মুক্ত করে বাইরে...দূরে...খুব দূরে তোমার দেশে নিয়ে চলো না! একটু আগে আমি কী করে এসেছি জানো? সুমিয়াকে ঘরে শেকল দিয়ে এসেছি তার ঘুমন্ত অবস্থায়। এখন জাগলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না সে। পালাতে যদি হয় তো এই ঠিক সময়। চলো যাই, তোমার দেশে...তোমার ঘরে...।'

'আমার দেশে...আমার ঘরে!!'

তার হাতের উপর মৃদু একটা চাপ দেয় কৃষ্ণা...।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, লক্ষ্মীছেলে, তোমার দেশে...তোমার ঘরে...আমরা দুটিতে...তুমি আর আমি...।'

কদম্বকেশরের মতো মিংলোর সর্বাঙ্গে কাঁটা জেগে ওঠে...আনন্দে মুখ দিয়ে তার আর কথা বেরোয় না।

কৃষ্ণা বললে, 'হ্যাঁ, আমি তোমার ঘরেই যাব মিংলো। কাল সকালে আ-চিন আসছে, সে এলেই তো আবার আরম্ভ হবে আমার নির্যাতন; সেইজন্যেই আমি এখন পালাতে চাচ্ছি। সেই কুৎসিত কদাকার লোকটার যত শক্তিই থাক, আমি কখনওই তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারব না, তাই তোমার সাহায্য চাচ্ছি। আমি জানি—যদি কেউ আমায় মুক্তি দিয়ে আশ্রয় দিতে পারে, সে একমাত্র তুমি—মিংলো।'

মিংলো আত্মহারা হয়ে পড়ে...চোখের খোলা-পাতা নেমে আসে...সঙ্গে-সঙ্গে বেহেস্তও নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে...ওর হাতের কাছে। নিঃশব্দে মিংলো কৃষ্ণার হাতের ওপর হাত বুলোয়—তারপর বলে, 'হ্যাঁ, তোমায় রক্ষা করব, তোমায় আমি নিয়ে যাব কৃষ্ণা। আ-চিনকে আমিও কোনওদিন ভালোবাসতে পারিনি; তার সর্বনাশ হোক এ-কামনা আমিও অনেকদিন থেকে করি। —চলো—আমরা দুজনে আজ এখনই চলে যাব, আ-চিন কাল ফিরে আসবার আগেই আমরা পালাব।'

সে জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলছিল।

কৃষ্ণা বুঝেছে, ওষুধ ধরেছে। এ-সময় মিংলোকে দিয়ে অনেক কাজ করানো যাবে...।

বন্দুকটা পিঠে বেঁধে নিয়ে মিংলো বললে, তা হলে এসো, আর দেরি কোরো না।'

দু-পা এগিয়ে গিয়েই কৃষ্ণা হঠাৎ থমকে থামে।

মিংলো বলে, 'কী হল, থামলে যে?'

কৃষ্ণা তার হাতখানা ধরে আর্দ্রকণ্ঠে বলল, 'আমার মাসিমাকে যে নিয়ে যেতে হবে মিংলো! ওঁর জন্যেই আ-চিন আমায় আটক করেছে...ওঁকে না নিয়ে যেতে পারলে তো আমি শান্তি পাব না! লক্ষ্মীটি মিংলো, ওঁকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে।'

মিংলো দাঁড়াল, চিন্তিত মুখে বলল, 'কিন্তু, চাবি তো আমার কাছে নেই...দরজায় যে তালা দেওয়া আছে।'

কৃষ্ণা হাতের চাবি তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'চাবি আমি এনেছি, নিয়ে চলো।'

অবাক বিস্ময়ে মিংলো চাবিটা দেখে নিল, তারপর বললে, 'তোমার যাওয়া চলবে না, সেখানে পাহারা আছে, তোমায় দেখলেই চিনবে—গোলমাল করবে। তুমি এখানে এই ঝোপের মধ্যে দাঁড়াও, এখানে বাঘ-ভালুক নেই, আ-চিনের দাপটে তারা পালিয়েছে, সেজন্যে তোমার কোনও ভয় নেই। আমি পাহারাওয়ালাকে কোনও একটা অছিলায় কোথাও পাঠিয়ে, তোমার মাসিমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছি।'

তার মধ্যে যে কোনও মন্দ মতলব নেই তা তার মুখ দেখেই কৃষ্ণা বুঝতে পারে, বলে, 'বেশ, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, যত শিগগির পারো, তুমি আমার মাসিমাকে নিয়ে এসো।'

একটা ঝোপের আড়ালে কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে রইল, চাবি হাতে নিয়ে, শিস দিতে-দিতে মনের আনন্দে মিংলো এগিয়ে চলল—কিছুক্ষণ পরে আর তাকে দেখা গেল না।

সন্দেহ হয়, মিংলো বিশ্বাস রাখবে তো? হয়তো চাবিটা হাতিয়ে নিয়ে সে এখানকার বর্তমান নেতা—আ-চিনের ডানহাত সাংগ্রোর হাতে দেবে...সবকথা তাকে হয়তো জানাবে...হয়তো...।

অনির্দিষ্ট কতদূরে কোথায় সমতল স্থান, কতদূর হেঁটে গেলে সেখানে পৌঁছনো যাবে তাই বা কে জানে! হয়তো এতক্ষণে সুমিয়ার ঘুম ভেঙে গেছে...ঘরের মধ্যে সে চিৎকার করছে! বাইরের লোক কোনওরকমে যদি জানতে পারে তাহলে তার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবতে কৃষ্ণা ঘেমে ওঠে।

মিনিটপাঁচেক এইরকম অস্বস্তিতে কাটবার পরে জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোতে দেখা যায় দূরে একজন লোককে, সে এইদিকেই আসছে...।

মিংলো কি?

কাছে না-আসা পর্যন্ত কৃষ্ণা নড়ে না, আড়ষ্টভাবে ঝোপের আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকটা ক্রমশ কাছে এল...ঝোপের পাশ দিয়ে আবার চলেও গেল!

সর্বনাশ! ও তো মিংলো নয়! তবে কি যে-প্রহরীকে কৌশলে সরিয়ে দেবার কথা বলে গেল মিংলো, সেই লোকটা? বরাতে কী আছে কে জানে!

এর পাঁচ-সাত মিনিট পরেই দেখা গেল, মিংলো আসছে আর তার পিছনে আসছে একটি মেয়ে। সে যেন আর হাঁটতে পারছে না। তবে দূর থেকে আন্দাজ করা যায়, মিংলো মাঝে-মাঝে মুখ ফিরিয়ে তাকে জোর করে তাড়াতাড়ি চলতে বলছে।

তারা স্পষ্ট হতেই ঝোপের আড়াল থেকে কৃষ্ণা বাইরে আসে—।

এই রুমাদেবী! শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ...কৃশাঙ্গী একটি মেয়ে, কৃষ্ণার বয়সী বা তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড়। কৃষ্ণাকে সামনে দেখে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে দু-হাত বাড়ায়...কৃষ্ণা সযত্নে তার হাত দুখানা চেপে ধরে, 'তুমি রুমামাসি...তুমি আমার...।'

মিংলো ভয়ার্তকণ্ঠে বলে, 'তাড়াতাড়ি চলো কৃষ্ণা, পারিসানা এখুনি ফিরবে, আমি তাকে খেতে পাঠিয়েছি, ফিরে সে যখন দেখবে, বন্দিনী নেই—তখন সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। তাড়াতাড়ি ছুটে চলো, একটুও দেরি নয়।'

আগে-আগে মিংলো—তার পেছনে চলে কৃষ্ণা ও রুমা। যতদূর সম্ভব দ্রুত চলতে আরম্ভ করে ওরা। বেচারা রুমা যতবার পার্বত্য পথে পা পিছলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়, ততবার কৃষ্ণা ওকে হাত ধরে তুলে খুব সাবধানে নিয়ে চলে।

ষোলো

দীর্ঘ পথ যেন আর ফুরোতে চায় না—শীর্ণ রুমা আর চলতে পারে না..। অবসন্নভাবে শুয়ে পড়ে...ওঠবারও ক্ষমতা থাকে না আর।

মিংলো ভয় পেয়ে বলল, 'পারিসানা যদি ফিরে এসে বন্দির ঘরের দরজা খোলে, তা হলেই সর্বনাশ! এতক্ষণ হয়তো চারিদিকে তাদের লোক ছুটেছে, বান্দরী-খালে আ-চিনের কাছেও খবর গেছে। বান্দরী-খাল এখান থেকে বেশি দূর নয়, আ-চিন সকালের মধ্যে এসে পৌঁছবে, যদি কোনওরকমে ধরা পড়ি তাহলে হয়তো তোমাদের কিছুই হবে না, কিন্তু আমায়—আমায় তারা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে মারবে...জীবন্ত আমার গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে...।'

বলতে-বলতে সে শিউরে ওঠে।

কৃষ্ণা সে-কথা বিশ্বাস করে। আ-চিন যে প্রকৃতির লোক, জীবন্ত মানুষের গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা এখন কোন দিকে চলেছি, মিংলো?'

মিংলো উত্তর দিলে, 'আমরা লামডিংয়ের দিকে যাচ্ছি। লামডিং পৌঁছতে পারলে তবু আশা আছে, ওখান থেকে ট্রেনে করে আমি লখিমপুরে যেতে পারি। কিন্তু লামডিং এখনও অনেক দূর, এখান থেকে তিন-চার ক্রোশ হবে! এতখানি পথ যাওয়া তোমার মাসিমার পক্ষে অসম্ভব।

ভোরের আর বিলম্ব ছিল না...পূর্ব-আকাশ আস্তে-আস্তে ফরসা হয়ে আসছে...।

এতক্ষণে রুমা চোখ মেললে।

কৃষ্ণা তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বলল, 'এখন হাঁটতে পারবে, রুমামাসি? আর বেশি দূর নেই, লামডিংয়ের কাছে এসেছি, সকাল হতে-হতেই ওখানে পৌঁছতে পারব বলছে মিংলো।'

রুমা ওঠবার চেষ্টা করে, কৃষ্ণা ওকে সাহায্য করে।

বেচারা রুমা। পা দুখানা ওর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। দু-তিন মাস বন্দিনী অবস্থায় আ-চিনের দলের লোকের সঙ্গে ওকে এখানে-ওখানে নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে।

তবু রুমা হাঁটে, অতি কষ্টে কৃষ্ণাকে অবলম্বন করে চলে।

মিংলোকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করবার ছিল, কিন্তু পরিশ্রান্ত কৃষ্ণার কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় না।

চলতে-চলতে হঠাৎ মিংলো থেমে গেল...ভয়ার্তকণ্ঠে বলল, 'লুকোও—লুকোও কৃষ্ণা, আ-চিনের গলার স্বর শুনতে পেয়েছি, নিশ্চয় এই পথেই ফিরছে তারা।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটা পাথরের আড়ালে সে কৃষ্ণা ও রুমাকে টেনে নিয়ে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে বসে পড়ে! সরু পার্বত্য পথে অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যায়, কথা বলতে-বলতে তারা এগিয়ে চলেছে...

ও তো আ-চিনেরই কণ্ঠস্বর...আ-চিন ধমক দিচ্ছে—'আঃ, কি আস্তে-আস্তে হাঁটছ তোমরা? পেছনে পুলিশ আসছে, খেয়াল নেই? এখুনি ধরা পড়তে হবে...তারপর শাস্তির কথাটা ভাবো...ছুটে এসো...এখুনি আড্ডা ভেঙে দিতে হবে...ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পুলিশ আসবে...কোনও ভুল নেই...।

খুব দ্রুত তারা ছুটে চলে।

ভগবান রক্ষা করেছেন, নইলে যদি ধীরভাবে যেত তারা—নিশ্চয়ই দেখতে পেত কৃষ্ণাদের। পুলিশ পিছনে আসছে...ধরা পড়বার সম্ভাবনায় আ-চিন ছুটে চলেছে...এদিক-ওদিক চাইবার অবকাশ নেই ওর...এও কি সম্ভব? কে বলে, ভগবান ঘুমিয়ে আছেন কলিকালে? এই তো সবে কলির সন্ধে... এরই মধ্যে? কৃষ্ণা শিক্ষিতা মেয়ে তাই রক্ষে, নইলে স্বৈরাচারী দস্যুর ত্রস্ত শঙ্কিত ভাব দেখে, প্রতিশোধ-নেওয়ার সাফল্যে 'হা-হা-হা-হা' অট্টহাস্য করে এইরকম সময়েই তো নির্যাতিত বন্দিরা আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে ওঠে!

পদশব্দ দ্রুত মিলিয়ে যায়...কথাবার্তাও তাদের শোনা যায় না আর...তবু পনেরো-কুড়ি মিনিট কৃষ্ণা, রুমা, মিংলো সেখানে অপেক্ষা করে...সরে যেতে সাহস করে না।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণা বললে, 'ওঠো, এবার এগিয়ে চলা যাক। পুলিশ আসছে, আমাদের আর কোনও ভয় নেই, মিংলো।'

আনন্দে কৃষ্ণার মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রুমাও অনেকখানি উৎসাহ পায়, শুধু বিমর্ষ হয়ে পড়ে মিংলো।

দুর্বল পায়ে চলতে-চলতে সে যা বলতে থাকে তার বাংলা করলে মানে এই হয় যে, 'রামে

মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে, আমার কাছে দু-ই সমান। আ-চিন জীবন্ত-অবস্থায় গায়ের ছাল ছাড়াবে...পুলিশ না হয় ফাঁসি দেবে... নয়তো দেবে দ্বীপ-চালান...তফাত শুধু এই।'

সে আর হাঁটতে পারে না।

কৃষ্ণা তাকে সান্ত্বনা দেয়—'না—না—না, ভুল করছ মিংলো, পুলিশ তোমায় রাজসাক্ষী করে নেবে, তোমায় কোনও শাস্তিই পেতে হবে না।'

মিংলো মনে-মনে হাসে, কৃষ্ণার সাহস দেওয়ার রকম দেখে। কিন্তু চোখ তার ক্রমেই ভিজে ওঠে...।

একটা বাঁক ঘুরতেই সশস্ত্র পুলিশ-দলের সামনে এসে পড়ে এরা তিনজন...।

তারা যুগপৎ বন্দুক উঁচু করে...সঙ্গে-সঙ্গে কার চিৎকার কানে আসে—'কে, কৃষ্ণা? আমাদের কৃষ্ণা?'

পরমুহূর্তে ছুটে আসেন সুজন মিত্র, তাঁর পিছনে প্রণবেশ।

'মামা!'

কৃষ্ণা ছুটে যায় প্রণবেশের কাছে, আত্মহারা প্রণবেশ তার মুখখানা দু-হাতে বুকের ওপর টেনে নিয়ে ক্ষুদ্র বালকের মতো উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে ওঠেন।

বেচারা প্রণবেশ। এ-ক'দিন যে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন তা তাঁর আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়। সত্যি, প্রণবেশ আর আগেকার সেই সৌম্যমূর্তি প্রণবেশ নেই, আধখানা হয়ে গেছেন যেন।

কৃষ্ণা তাঁর চোখ মুছিয়ে দিতে-দিতে বললে, 'চুপ করো মামা, যখন ফিরে এসেছি তখন আর কারও ক্ষমতা নেই যে, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবে।'

প্রণবেশ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু এ-ক'দিনে তোর কী চেহারা হয়েছে কৃষ্ণা...দেখে চেনা যায় না...কেন তুই এমন জায়গায় এলি?'

কৃষ্ণা হাসে, বলে, 'তোমার চেহারাটাই বুঝি আগের মতো আছে? রোগা আধখানা হয়ে গেছ যে একেবারে! হ্যাঁ, সুজনমামা, আগে আপনাকে একটা কথা জানাই—একটু আগে আ-চিন এই পথে গেছে। ঝোপের আড়ালে ওই মস্তবড় পাথরটার পেছনে আত্মগোপন করে থাকার সময় শুনেছি, আমাদের নিয়ে সে আজই বর্মায় চলে যাবে বলতে-বলতে যাচ্ছে। যাক, আর তাকে ভয় করবার কারণ নেই, যখন আপনারা এসে পৌঁছেছেন। ...এই দেখুন কাকে সঙ্গে করে এনেছি...ইনিই আমার রুমামাসি! বহু কষ্টে এঁকে উদ্ধার করে আনতে পেরেছি শুধু এই মিংলোর সাহায্যে!' বলে মিংলোকে কৃষ্ণা দেখিয়ে দিলে।

মিষ্টি হাসিতে মিংলোকে তুষ্ট করে, তারপর রুমাকে অভিবাদন জানিয়ে সুজন বললেন, 'দুজন কনস্টেবল সঙ্গে দিচ্ছি, কৃষ্ণা, এঁদের নিয়ে তুমি লামডিংয়ে ফিরে যাও। প্রণবেশ! আমি আ-চিনের ব্যবস্থা করে যত শিগগির পারি ফিরে আসছি।'

পুলিশ-দল নিয়ে সুজন মিত্র দ্রুত সামনের দিকে ছুটলেন।

সতেরো

লামডিং পৌঁছেই গৌহাটি ফেরবার ট্রেন পাওয়া গেল।

একখানা ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লেন প্রণবেশ, রুমা ও কৃষ্ণা...কনস্টেবল দুজনও উঠে বসল।

'মিংলো...মিংলো কোথায় গেল?'

কৃষ্ণা এদিক-ওদিক তাকায়...মিংলো কখন কোন ফাঁকে সরে পড়েছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। হতাশভাবে কৃষ্ণা বসে পড়ে, বলে—'বেচারার কপালে অনেক লাঞ্ছনা আছে দেখছি। রামের হাতে মরলে তবু স্বর্গ পেত...রাবণের হাতে মরে ওকে অনন্ত নরকেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।'

রাগ করে প্রণবেশ বললেন, 'যাক না নরকে! চিরকাল ডাকাতি করে এসেছে, জানে, পুলিশের হাতে পড়লে দুর্গতির একশেষ হবে...শাস্তি পেতে হবে। তার চেয়ে পালাল, বেঁচে গেল। যাক, রুমাকে পাওয়া গেছে এই আমাদের সৌভাগ্য। ভবতোষবাবুকেও পাওয়া গেছে, ল্যাংটিংয়ে ওঁদের সেই বাড়িতে।'

'বাবা...বাবাকে পাওয়া গেছে!'

রুমা আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—'কেমন আছেন তিনি ...খুব রোগা হয়ে গেছেন বোধহয় ভেবে-ভেবে...তা হোক, বেশ ভালো আছেন তো?'

বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রণবেশ বললেন, 'তাঁর অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। একে বৃদ্ধ—তার ওপর বহুদিন একটা ছোট অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে ছিলেন, এখন তিনি অত্যন্ত পীড়িত। তাঁকে গৌহাটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি তোমার পথপানে চেয়ে আছেন রুমা..।'

এ-কথা শুনে রুমা যেন পাথর হয়ে যায়, নিঃশব্দে তার চোখের কোণ দিয়ে কেবল জল ঝরে পড়ে...।

ট্রেন গৌহাটিতে পৌঁছল। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে তাতে রুমা ও কৃষ্ণাকে উঠিয়ে, প্রণবেশ নিজেও উঠলেন।

অত্যন্ত অসুস্থ ভবতোষ চৌধুরী—বাঁচবার আশা নেই, শহরের বড়-বড় ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়েছেন।

রুমা গিয়ে পিতার কাছে বসল, কৃষ্ণা খানিক সেখানে থেকে রতনের নির্দেশমতো পাশের ঘরে গেল বিশ্রাম করতে।

তারপর স্নানাদি সেরে চা পান করতে-করতে কৃষ্ণা বলল, 'অনেক কথাই শুনেছি মামা...ভবতোষ চৌধুরী লোকটি বড় সুবিধের নয়, অনেক কীর্তিই করেছেন তিনি।'

উৎসুক প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী-রকম?'

কৃষ্ণা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছে তা বলতে শুরু করে ঃ

'ভবতোষ চৌধুরী একদিন রতনকে সঙ্গী করে চলে যান মালয়ে—তারপর সেখানে তিনি আউচি লিং নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর কাছে চাকরি পেয়েছিলেন। আউচি লিং অত্যন্ত সহৃদয় লোক ছিলেন, ভবতোষ চৌধুরীকে তিনি খুব বিশ্বাসও করেছিলেন। আউচি লিং ছিলেন বিপত্নীক, তাঁর একমাত্র পুত্র মাও তুংকে তিনি আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন শিক্ষার জন্যে।

ভবতোষ চৌধুরীই আউচি লিংকে জানান যে, মাও তুং এক আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম নিয়েছে। এরপর আউচি লিং হঠাৎ একদিন মারা যান...মাও তুং তারপর ফিরে আসে...কিন্তু তার অনেক আগে ভবতোষ চৌধুরী সেখানকার রবার-বাগান, কারখানা সব বিক্রি করে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করে ল্যাংটিংয়ে চলে আসেন। মাও তুং কোনওরকমে জানতে পারে যে, তার পিতাকে ভবতোষ চৌধুরী হত্যা করেছেন এবং জাল উইলে প্রতিপন্ন করেছেন, এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক তিনিই। সেই দলিলের মধ্যে দেখা গেল যে, বিধর্মী পুত্রকে আউচি লিং এক পয়সাও দেননি। তাঁর প্রিয় বন্ধু ও বিশ্বস্ত কর্মচারী ভবতোষ চৌধুরীকেই তিনি স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেছেন।

কপর্দকহীন মাও তুং আত্ম-নাম ও পরিচয় গোপন করে 'আ-চিন' নাম নিয়ে কৃষ্ণাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। বর্মায় ফেরবার পর বসন্ত হওয়ায় তার বাঁচবার আশা ছিল না এবং তাতেই তার

একটা চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর মুখে অজস্র ক্ষত চিহ্ন হওয়ার ফলে মুখখানা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়।

সুমিয়ার পরিচয়ও কৃষ্ণা সংগ্রহ করেছে, মিংলোর কাছে...আ-চিনের উপযুক্ত সহধর্মিণী সুমিয়া। বসন্ত হয়ে যখন আ-চিন মরণাপন্ন, তখন এই মালয়ী মেয়েটি প্রাণপণ যত্নে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, যার ফলে আ-চিন জীবন ফিরে পেয়ে, কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে সুমিয়াকে বিবাহ করেছিল।

উপযুক্ত স্বামীর উপযুক্ত পত্নী সুমিয়া। স্বামীকে সে ভালোবাসত...নির্বিচারে তার ভালো-মন্দ সব কাজই প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পন্ন করত। আ-চিনের অবর্তমানে সে-ই তার সমস্ত কাজ চালিয়েছে...দল পরিচালনা করবার শক্তি তার যথেষ্ট ছিল।

এরপর মাও তুং, প্রবঞ্চক ভবতোষ চৌধুরীর অনুসন্ধান করতে থাকে। কপর্দকশূন্য মাও তুং অবশেষে দস্যুদল গঠন করে নিজে তাদের অধিনায়ক হয়। বর্মায় সে যে-দলে ছিল, সে-দল ধরা পড়ার পর ছদ্মবেশে সেই সময় ভারতের সমস্ত দেশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়িয়েছে ভবতোষ চৌধুরীকে। ল্যাংটিংয়ের হাতিখালিতে তার অবস্থানের খবর পেয়ে, দেখা করতে গিয়ে দেখা হয়নি...গৌহাটিতে গিয়ে অপমানিত মাও তুং ফিরে যায়।

প্রতিহিংসা সে নিয়েছে। ভবতোষ চৌধুরীর ম্যানেজার রামশরণ সিংকেই শুধু সে হস্তগত করেনি, তার দাসদাসী, কর্মচারীদের সকলকেই সে হাত করেছিল। রামশরণ সিং তার আদেশে সব-কিছু ঘৃণ্য কাজ করত এবং এদের সাহায্য নিয়েই একদিন রাত্রে ভবতোষ চৌধুরীকে অচৈতন্য অবস্থায় গৌহাটির বাড়ি থেকে হাতিখালির বাড়িতে এনে বাড়ির যে-ঘরটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকত, সেই ঘরে বন্দি করে রেখেছিল।'

প্রণবেশের কাছে শোনা গেল, কৃষ্ণা অন্তর্হিত হওয়ার পর সুজন ফিরে এসে, পুলিশ নিয়ে সেই বাড়ি অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন। কিন্তু রামশরণ সিংকে সেখানে পাওয়া যায়নি। দু-দিন আগে সে নাকি নিজের দেশে যাত্রা করেছে, সম্ভব এতদিনে গ্রেপ্তারও হয়েছে। বাড়ি সার্চ করবার সময় চাবি-বন্ধ কুঠুরিটার মধ্যে জীবন্মৃত অবস্থায় শুধু ভবতোষ চৌধুরীকে পাওয়া গেছে।

আ-চিন জাল দলিলপত্র সব নিয়ে গিয়ে রেঙ্গুন-কোর্টে দাখিল করেছে, শিগগিরই ভবতোষ চৌধুরীকে, মাও তুংয়ের সমস্ত সম্পত্তি ফেরত দিতে হবে।

দস্যু-দলপতি হিসেবে আ-চিন ওরফে মাও তুংকে পুলিশ এখন ধরবার চেষ্টায় ফিরছে। সম্পত্তি উদ্ধার করে ভোগ করার পরিবর্তে তাকে হয়তো এখন আজীবনকালের জন্যে জেলের দুর্ভোগই ভোগ করতে হবে।

রুমাকে মাও তুং তার পিতার কথা জানিয়েছিল। রুমা পুলিশে খবর দিয়ে মাও তুংকে ধরাবার ব্যবস্থা করবার জন্যেই বন্দিনী হয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছে। নইলে বেচারা রুমার ওপর মাও তুংয়ের কোনও রাগ ছিল না, রুমা নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছে। উত্তেজিত প্রণবেশ তারপর বললেন, 'যাক, সব কাজই তো মিটে গেল...এবার কলকাতায় চলো...এখানে আর একটা দিন নয়...আমার মোটে ভালো লাগছে না...এখন কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি...এতে তুমি অমত কোরো না কৃষ্ণা...সত্যি আমার অবস্থাটা একবার বোঝো।' ...একনিশ্বাসে এতগুলো কথা বলবার পর নিশ্বাস নিতে প্রণবেশ থামলেন, তারপর অধীর আগ্রহে কৃষ্ণার মতামত জানবার জন্যে তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলেন।

কৃষ্ণা মাথা কাত করে বললে, 'তুমি ব্যাকুল হয়ো না মামা, আর দু-দিন অপেক্ষা করো, ওঁর অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায় দেখি। যদি তেমন কিছু হয় রুমামাসিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে...ওঁকে তো আর এখানে একা ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না!'

প্রণবেশ মুখ ভারি করেন। রুমা মেয়েটির উপর তাঁর এতটুকু স্নেহ নেই, তাকে এড়াতে পারলে বাঁচেন তিনি।

আঠেরো

জনকয়েক লোককে বন্দি করে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন সুজন। মাও তুংকে ধরতে পারা যায়নি — সে কোন পথ দিয়ে সরে গেল, অশেষ নির্যাতন করেও দলের কোনও লোকের মুখ থেকে সে-সম্বন্ধে একটি কথাও বার করতে পারা যায়নি।

কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করে—'সুমিয়া কোথায় গেল, মাও তুংয়ের স্ত্রী?'

সুজন উত্তর দেন—'ও, সেই কালোমতো মেয়েটি তো? সে আত্মহত্যা করেছে।'

'আত্মহত্যা!...কেন?'

কৃষ্ণা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

সুজন বললেন, 'কারণ, সে মাও তুংয়ের সঙ্গে পালাতে পারেনি। সে-সময় খুবই অসুস্থ ছিল সে, নড়বার ক্ষমতা ছিল না তার। শুনলুম, অনেক মিনতি করে শেষে জোর করে সে মাও তুংকে সরিয়ে দিয়েছে। আমরা যখন পৌঁছলুম ঠিক সেই মুহূর্তে সে বিষপান করেছে। অনেক চেষ্টা করেছি...তাকে যদি বাঁচাতে পারি তবে মাও তুংকে কোনওদিন পাবার আশা থাকবে...কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে সে চলে গেছে।'

সুমিয়ার জন্যে কৃষ্ণা প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করে...দুঃখিত হয়। নিজে সে জীবন দিয়েছে...তার স্বামীকে সে বাঁচিয়েছে...উপযুক্ত স্ত্রীর কাজ করেছে সে। সে আর-যাই হোক, সত্যিকারের সহধর্মিণী বটে। তার আত্মার সদ্গতির জন্যে কৃষ্ণা মনে-মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে।

ভবতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কথা তাঁর বন্ধ হলেও ভেতরে জ্ঞান ছিল, হতজ্ঞান-প্রায় রুমাকে কৃষ্ণার হাতে তুলে দিয়ে, কপর্দকহীন ভবতোষ চৌধুরী সেদিন রাত্রে মহাপ্রস্থান করলেন।

বাধ্য হয়ে কৃষ্ণাকে আরও কয়েকটা দিন থাকতে হল।

গৌহাটিতে রুমা পিতার শেষকাজ সম্পন্ন করলে। বাড়িতে রতনকে পাহারায় রেখে একদিন রাত্রে চোখ মুছতে-মুছতে রুমা—কৃষ্ণা ও প্রণবেশের সঙ্গে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে বসল।

বাংলায় এই তার প্রথম যাত্রা।'

হয়তো চিরকালের মতোই গৌহাটি ত্যাগ করে যাওয়া...রুমা সজল চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকে...শান্তভাবে ধীরে-ধীরে মাথাটা নত করে আবাল্যের লীলাভূমি গৌহাটিকে একটা প্রণাম জানায়...।

ট্রেন তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

ভূতের মতো অদ্ভুত

বুদ্ধদেব বসু

এক
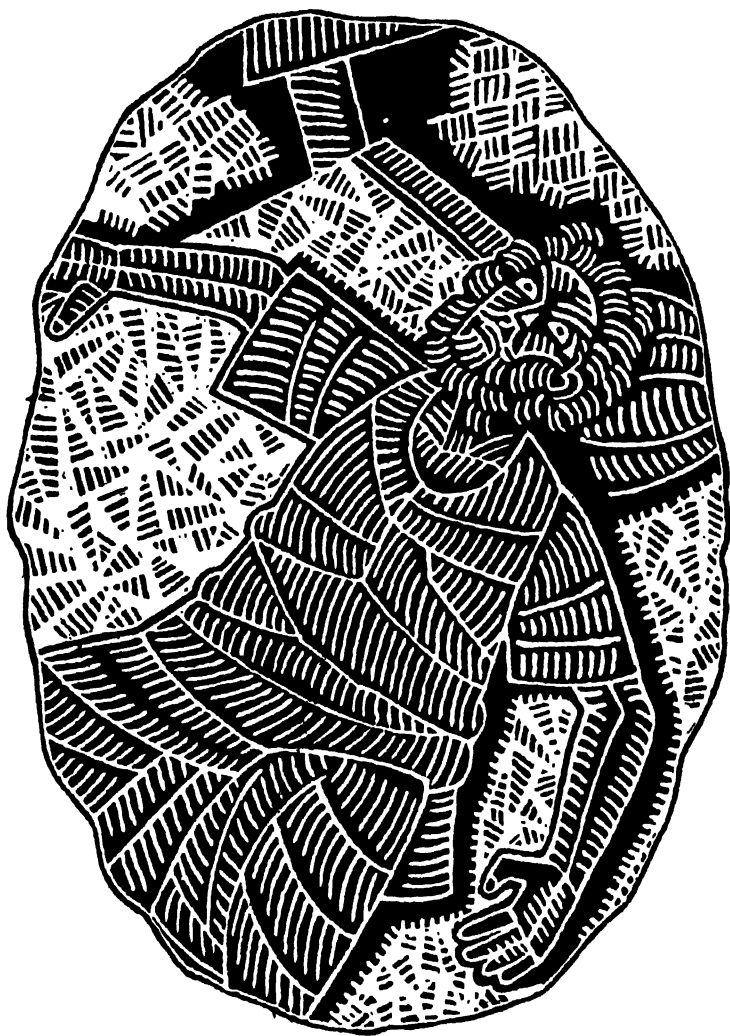
নাম ব্রডওয়ে হোটেল, কিন্তু আসলে বৌবাজারে কেরানি ও বেকারবাবুদের একটি মেস। এই মেসে শীতের রবিবারের এক সকালবেলায় এ-গল্পের যবনিকা তোলা গেল।

চাকুরেদের পক্ষে—বিশেষত কলকাতার কেরানিদের পক্ষে রবিবার দিনটি সত্যই স্বর্গীয়। এই তো নরহরিবাবু, যিনি অন্য সব দিন এই শীতেও ভোর না হতে ওঠেন, তারপর শ্যামবাজারে ছেলে-পড়ানো চুকিয়ে, কোনওরকমে নাওয়া-খাওয়া সেরে ন-টা না বাজতেই আপিসে ছোটেন, তিনি আজ বেলা আটটাতেও লেপের তলায় পাশ ফিরছেন। এইমাত্র তাঁর ঘুম ভাঙল। গোটা দুই হাই তুলে তিনি অস্ফুটস্বরে বললেন, 'দুর্গা, দুর্গা!' তারপর হাঁক দিলেন, 'দুর্গা!'

শেষের ডাকটি জগৎমাতাকে লক্ষ করে নয়। দুর্গা মেসের এক চাকর। একডাকে তার দেখা পাওয়া গেল না, তখন নরহরিবাবু গলা চড়িয়ে আবার ডাকলেন, 'দুর্গা—অ দুর্গা!'

গলার জোর আছে নরহরিবাবুর, কেরানি না হয়ে কলকাতার কলেজে প্রফেসর হলে তাঁকে মানাত। একতলার সিঁড়ির কাছে কলতলায় দুর্গা চায়ের পেয়ালা ধুচ্ছিল, তার কানে সে-ডাক পৌঁছল। সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে একটা চায়ের কেৎলি নিয়ে বেরিয়ে গেল, মিনিট পাঁচেক পরে কেৎলিতে চা, একটা প্লেটে দুখানা টোস্ট আর হাতে একটা চায়ের পেয়ালা ঝুলিয়ে উঠে এল তেতলায় নরহরিবাবুর ঘরে।

তাকে দেখেই নরহরিবাবু চটে উঠে বললেন, 'হতভাগা, তোকে এতক্ষণ ধরে ডাকছি, কোথায় থাকিস—।'

দুর্গা বললে, 'আপনার চা-টা একেবারে নিয়েই এলুম।'

নরহরিবাবু তক্ষুনি জল হয়ে গিয়ে বললেন, 'বাঃ, বেশ! তোর বেশ বুদ্ধি আছে, দুর্গা। জীবনে তোর উন্নতি হবে।'

দুর্গা বললে, 'আমি তো জানি আপনি রবিবারে সকালে উঠেই প্রথমে এক পেয়ালা চা খান, তাই আপনার ডাক শুনে উপরে না এসে একেবারে চা আনতেই চলে গেলুম।'

চা নরহরিবাবু রোজই সকালে খান, তবে অন্যান্য দিন এমন আরাম করে খাওয়া হয় না, টিউশনি করতে যাওয়ার পথে দোকানে ঢুকে তাড়াহুড়ো করে খেয়ে নেন। আজ আরাম করবার দিন, আজ সব ব্যবস্থাই অন্যরকম।

'বেশ, বেশ। চা-টা ঢেলে দাও তো বাবা। টোস্টও এনেছিস দেখছি। খুব ভালো। দুর্গা, তুই লেখাপড়া জানিস?'

তক্তপোশের পাশে টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালাটি রেখে দুর্গা বললে, 'অল্প-অল্প জানি।'

'পাশ-টাশ করলে তোর ভালো চাকরি হত, দুর্গা।'

'আজকালকার দিনে তা কি জোর করে বলা যায়?'

লেপের তলায় আধশোওয়া অবস্থায় চা খেতে-খেতে নরহরিবাবু বললেন, 'তা যা বলেছিস। কত বি.এ., এম.এ. ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবু তো গতর খাটাতে পারিস বলে খেতে পাচ্ছিস। বড্ড খাটুনি মেসে, না রে?'

'তা খাটতেই তো এসেছি।'

নরহরিবাবু হঠাৎ তাঁর বালিশের তলায় হাত দিয়ে একটি আনি বের করে দুর্গার হাতে দিয়ে বললেন, 'নে এটা। কিছু কিনে-টিনে খাস। এখানে আমাদেরই যা খাওয়ার ব্যবস্থা, তোরা যা খাস ভাবতেই ভয় করে।'

দুর্গা আনিটি তার জামার পকেটে রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নরহরিবাবু প্রায়ই তাকে এরকম দু-চার পয়সা দিয়ে থাকেন। মানুষটি তিনি একটু শৌখিন গোছের। বোধহয় তাঁর রোজগারও

ভালোই, তেতলায় আস্ত একটা ঘর নিয়ে থাকেন। তার উপর হৃদয়টাও তাঁর কোমল। মেসে যখনই যার দরকার, দু-চার টাকা ধার দিতে পরোয়া করেন না, সে-টাকা সবসময়ই যে ফেরত আসে তাও নয়। বেকার ছেলেদের চাকরির খোঁজখবর দেওয়া, তাদের অ্যাপ্লিকেশন নিজের আপিস থেকে টাইপ করিয়ে আনানো—এসব তিনি হামেশাই করে থাকেন। এসব কারণে মেসে সকলেই তাঁকে ভালোবাসে, ম্যানেজার থেকে শুরু করে সকলেরই তিনি হরি-দা।

নরহরিবাবু বললেন, 'একখানা খবরের কাগজও যে চাই দুর্গা। তা না হলে চা জমে না।'

'নিয়ে আসব?'

'এক্ষুনি আবার এতগুলো সিঁড়ি ভাঙবি?'

'দিনরাতই সিঁড়ি ভাঙছি বাবু, ওতে আমাদের কিছু হয় না।'

দুর্গাকে নরহরিবাবু যেন বিশেষ একটু স্নেহের চোখেই দেখেন। তার কারণও আছে। দুর্গা ভারি ছেলেমানুষ, আঠারো-উনিশ মতো বয়েস। দেখতেও সুন্দর, হাত-পা তকতকে পরিষ্কার, দেখে ভদ্রলোকের ছেলে মনে হয়। কথাবার্তাও মার্জিত। এই মেসে সে নতুন এসেছে, পুরো একমাসও হয়নি। মেসের চাকরদের গালিগালাজ এমনকী মারধোর প্রায়ই সহ্য করতে হয় আর খাটতে হয় ভূতের মতো। দুর্গাকে দেখে মনে হয়নি, সে কাজ চালাতে পারবে। ম্যানেজারবাবুও বোধহয় তার সুন্দর মুখ দেখেই দয়া করে তাকে বহাল করেছিলেন! বাবুদের ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে তাকে রাখা হয়েছে। মেসের সব বাবুরাই তাকে যেন একটু-আধটু দয়া করেন—মাঝে-মাঝে এক-আধটু বকুনি দিলেও এ-পর্যন্ত চড়-চাপড় তার পিঠে পড়েনি। তবে এ-ও বলতে হয় যে, কাজকর্ম দুর্গা চালাচ্ছে ভালোই—শুধু তার সুন্দর মুখ দেখে নয়, তার কাজেও সকলে তার উপর খুশি।

নরহরিবাবু বালিশের তলা থেকে আর-একটা আনি বের করে দিয়ে বললেন, 'তা হলে যা একখানা খবরের কাগজ নিয়ে আয়।'

'আনন্দবাজার?'

'না, না, বাংলা কাগজ আমি পড়িনে। জানিস, বিশ বছর আগে বি.এ. ফেল করেছিলুম, সুরেন বাঁড়ুয্যের বক্তৃতা এখনও আমার মগজে ঘুরছে। অমৃতবাজার আনবি। আর শোন, চারতলার বাবুকে একবার ডেকে দিবি—বলবি আমি তাঁকে তাস খেলতে ডেকেছি।'

প্রায় প্রতি রবিবারেই নরহরিবাবুর ঘরে তাসের আড্ডা বসে। দুর্গা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সরোজ ঘরে ঢুকে বললে, 'কী দাদা, আজ খেলা-টেলা হবে না?'

'হবে, হবে, বোসো। এই তো ঘুম থেকে উঠলুম। তুমি দেখছি এই সকালেই একেবারে ফিট-ফাট বাবু সেজেছ। বেরুচ্ছ নাকি কোথাও?'

'আর বলেন কেন—আজ আপিসের বড়োবাবুর মেয়ের বিয়ে। দশটা থেকেই হাজিরা দিতে হবে। ভাবছি তার আগে দু-পিঠ খেলে যাই।'

'বেশ, লোকজন ডেকে আনো। আমি ততক্ষণ হাত-মুখ ধুয়ে আসি,' বলে নরহরিবাবু লেপের তলা থেকে উঠে পড়লেন। বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'গোবিন্দবাবুকেও খবর পাঠিয়েছি।'

'ওই বুড়োটাকে আবার কেন, দাদা?'

'বুড়ো তো আমিও।'

'হ্যাঃ, রেখে দাও—তোমার পঁয়তাল্লিশ হলেই খুব বেশি। সত্যি হরি-দা, ওই একচোখো গোবিন্দটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারিনে। ও এলে আড্ডাই মাটি হয়।'

'তোরা সকলে মিলে তাঁকে বয়কট করেছিস বলেই আমি মাঝে-মাঝে ওঁকে ডেকে পাঠাই। তিনি যে কানা সে তো আর ওঁর দোষ নয়, আর উনি যে কিপটে তাও ওঁর স্বভাবেরই দোষ। তাস খেলতে তিনি ভালোবাসেন, খেলেনও ভালো—এ-অবস্থায় একই মেসে থেকে তাঁকে না ডাকলে কি ভালো দেখায়?'

সরোজ রাগে গজগজ করতে-করতে বললে, 'রেখে দাও তোমার ভালো দেখানো! লোকটাকে এই মেস থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

'কী অপরাধে? তিনি কুচ্ছিত আর কিপটে, তাই বলে কি মানুষ নন?'

'মানুষ? ওকে তুমি মানুষ বলো হরি-দা! টাকার কুমির—এদিকে আমাদেরই মতো একটা মেসে পড়ে আছে—হেঁটো ধুতি আর হাফ-শার্ট পরে, বিড়ি ফোঁকে, মান্ধাতার আমলের একটা তেল-চিটচিটে বালাপোশ জড়িয়ে শীত কাটায়। ওর গায়ে দুর্গন্ধ, ওর দাড়িতে উকুন, ওর কাপড় এত ময়লা যে ওর পাশে বসতে ঘেন্না করে। অন্যের জন্যে কিছু না-হয় না-ই করল, যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্যেও যে একটা পয়সা খরচ করে না, তুমিই বলো তাকে কি মানুষ বলে!'

নরহরিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'বড্ড চটে গেছ দেখছি। ওর কাছে কিছু ধার-টার চাইতে গিয়ে জব্দ হয়েছিলে বুঝি?'

সরোজ মুখ লাল করে বললে, 'খেপেছ তুমি! পাথর ভাঙলে রক্ত বেরোবে, কিন্তু গোবিন্দ চাটুয্যের আঙুল গলে একটি পয়সা পড়বে না তা তো জানো!'

'বড্ড ছেলেমানুষ আছ এখনও, সরোজ। সব মানুষ একরকম নয়, এ-কথা এখনও মেনে নিতে পারো না কেন? এই যে দুর্গা এসেছে অমৃতবাজার নিয়ে। তুমি বসে-বসে একটু কাগজটা পড়ো, আমি আসছি। দুর্গা, চারতলার বাবুকে বলেছিলি আসতে?'

'তাঁর এখনও ঘুম ভাঙেনি। দরজা বন্ধ।'

সরোজ বলে উঠল, 'বুড়ো খুব ঘুমুচ্ছে তো আজ! থাক হরি-দা, ওকে তা হলে আর ডেকে কাজ নেই।'

এ-কথার কোনও জবাব না দিয়ে নরহরিবাবু হাত-মুখ ধুতে চলে গেলেন।

দুই

মিনিট দশেকের মধ্যে আরও কয়েকটি ছোকরা সে-ঘরে এসে জড়ো হল। সকলেই তাসের গন্ধে এসেছে; চারজন খেলবে—বাকি ক'জন দেখবে ও উৎসাহ দেবে, আবার খানিক পরে তারা বসবে অন্যেরা দেখবে। এইরকমই হয় প্রায় রবিবারে।

দুর্গা নরহরিবাবুর বিছানা ঠিকঠাক করে সুজনি দিয়ে ঢেকে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল, তখন সেই বিছানার উপরেই গুলজার হয়ে বসল সবাই।

নরেশ আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরাম করে বসে বললে, 'আঃ!' ওই একটি কথাতেই যেন ছ-দিনের খাটুনির পরে পুরো একটি দিনের বিশ্রামের আনন্দ ফুটে উঠল।

মনোহর বললে, 'বেশ কনকনে শীতটি পড়েছে আজ। এমন দিনেই তো আড্ডা জমে। শুধু-শুধু তাস নয় ভাই, আজ হরি-দাকে বলে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক।'

—'আর সেইসঙ্গে গরম সিঙাড়া,' বললে সরোজ। 'জানো তোমরা, সে-ব্যবস্থাও করেছেন হরি-দা।'

ফর্সা বেঁটে মতো একটি ছেলে এককোণে বসে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, সে বলে উঠল, 'তা হরি-দা তো আড্ডা বসলেই চা খাওয়ান, আমাদেরই একদিন বিনিময়ে কিছু করা উচিত।'

'আরে শুধু কি চা—রীতিমতো ভোজ, ফিস্টি!'

নরেশ আর মনোহর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'হুরে! হুরে!

সরোজ বলতে লাগল, 'বিরাট ভোজ দিচ্ছেন শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়!'

ওই নামটা শোনামাত্র সকলে একসঙ্গে হেসে উঠল।

সরোজ বললে, 'হরি-দা আজ আবার ওই বুড়োটাকে ডেকেছেন। কী কাণ্ড দ্যাখো দেখি

তোমরা। তা আমিও মনে-মনে ভেবে রেখেছি আজ বুড়োর কাছে খাওয়া আদায় করব তবে ছাড়ব।'

ফর্সা ছেলেটি বলে উঠল, 'গোবিন্দ বুড়ো খাওয়াবে! তাহলেই হয়েছে!'

সঙ্গে-সঙ্গে আবার হাসির হররা।

হাসি থামলে পরে মনোহর বললে, 'ভালো করলে না, সরোজ, ওই সকালবেলা বিটকেল বুড়োটার নাম করে। কপালে কী আছে কে জানে।'

'আজ খাওয়া জোটে কি না দ্যাখো,' বললে নরেশ।

সরোজ বললে, 'না, না, আমি যা প্ল্যান করেছি করাই চাই। এমন চেপে ধরব বুড়োকে যে এ-আড্ডায় তাস খেলতে আর অন্তত আসবে না। তোমরা সব আছ তো আমার সঙ্গে?'

নরেশ বললে, 'হ্যাঁঃ, তুমি কি ভেবেছ ওর সঙ্গে আমরা পেরে উঠব? ওর কি একফোঁটা চক্ষুলজ্জা আছে!'

ফর্সা ছেলেটি বলে উঠল, 'তা ছাড়া একদিন জোর করে খাওয়া আদায় করে লাভই বা কী!'

সরোজ কৌতূহলী চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললে, 'তবে? তোমার মতটা কী শোনা যাক, আনন্দ।'

আনন্দ বয়েসে ওদের সবার ছোট, তাকে ছেলেমানুষ বলা যায়। বেকার অবস্থায় আছে এই মেসে, চাকরির চেষ্টা করছে। চাকরি হওয়ার কোনও আশাই দেখা যাচ্ছে না, মেসের দেনা দু-মাস বাকি। অবস্থা তার সত্যি খুব খারাপ, পরনে ময়লা কাপড়, শীতেও একটা র‍্যাপার গায়ে নেই, নিচে একটা শার্ট তার উপরে একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরেছে, সবসুদ্ধু এই দুটোই জামা তার। কোথা থেকে নানারকম বই জোগাড় করে এনে গোগ্রাসে পড়ে সে, আর সুযোগ পেলেই খুব চড়া ক্যানকেনে গলায় এমন সব বক্তৃতা করে যা শুনে মেসবাসীদের তাক লেগে যায়। কেউ তাকে বলে পাগল, কেউ বলে ইডিয়ট, কেউ বা এমনও সন্দেহ করে যে স্বদেশিওয়ালাদের সঙ্গে কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত—তাকে মেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক এমন প্রস্তাবও কেউ-কেউ এনেছে! কিন্তু মোটের উপর তার কথাবার্তা শুনতে সকলেরই বেশ মজা লাগে, অনেকে ইচ্ছে করেই তাকে বেশ খানিকটা আশকারা দেয়। আর সত্যি—বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে সে। তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে সকলেই, কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ব্রডওয়ে হোটেলে সে-ই সবচাইতে ভালো বক্তা আর পড়াশুনোও বোধহয় তারই সবচেয়ে বেশি।

আনন্দ হাতের তাস ফেলে দিয়ে বলতে লাগল, 'আমার মত! আমার যা মত তা আপনাদের সকলেরই মনের কথা। শুধু একজন গোবিন্দ চাটুয্যে তো নয়, এরকম দেশ ভরে জগৎ ভরে কত আছে। একজন বসে আছে রাশি-রাশি টাকা নিয়ে, সেসব টাকা হয় ব্যাঙ্কে পচছে, নয় নানা বদখেয়ালে উড়ছে। এদিকে হাজার-হাজার লোক খেতে না পেয়ে মরছে কিংবা ঠিক সেটুকু খেতে পাচ্ছে যাতে কোনওরকমে বেঁচে থাকা যায়। মেডিকেল কলেজের সামনে সেদিন দেখলুম একটা ভিখিরি মরে পড়ে আছে, কলকাতার রাস্তায় প্রায়ই দেখা যায় ডাস্টবিনের এঁটো নিয়ে ভিখিরি আর কুকুরে মারামারি চলেছে। আর আমি, আপনারা—আমরা সবাই—আমাদেরই বা কী অবস্থা! বুকে হাত দিয়ে বলুন, আপনাদের যা আয় তাতে কোনও ভদ্রলোকের চলতে পারে—না চলা উচিত! কলকাতার এই মেসের ফ্যান-মেশানো ডাল আর এক টুকরো করে পচা মাছ খেয়েই কত লোকের সারা জীবন কেটে যায়, তা তো জানেন! আর বেকার—তাই বা কত! কত ভালো ছেলে পড়াশুনো পর্যন্ত করতে পারে না, আর বড়লোকের পেটমোটা নাদুসনুদুস হোঁৎকা ছেলেগুলো ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই আমাকেই দেখুন—আমি জোর করেই বলতে পারি বিজ্ঞানে আমার মাথা খুব ভালো, সুযোগ পেলে হয়তো পৃথিবীতে একটা নাম রাখতে পারতুম। কিন্তু অভাবে আমার কিছুই হল না—একটা কুড়ি টাকার চাকরির জন্য পথে-পথে কুকুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার টাকা নেই—

আর টাকা আছে ওই কঞ্জুস গোবিন্দ চাটুয্যের, যার বেঁচে থাকারই কোনও মানে হয় না—' বলতে-বলতে আনন্দর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

'বাঃ, সাবাস ছেলে!' বলে উঠল নরেশ। 'আচ্ছা, বলো তো আনন্দ, এসব কথা কি তোমার মুখস্থ করা থাকে?'

'এসব আমার প্রাণের কথা,' গম্ভীরভাবে বললে আনন্দ।

ওই বেঁটে রোগা ছেলেটির মুখে এসব কথা শুনলে সত্যি হাসি পায়, কিন্তু আবার পায়ও না, কথাগুলো বোধহয় সত্য—এরকম একটা ধারণা কোথা থেকে এসে জুড়ে বসে।

মনোহর ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'তুমি তো দেখছি রীতিমতো একজন পাবলিক স্পিকার—তোমার বক্তৃতাগুলো পার্কে দাঁড়িয়ে দিলেই ভালো হয়, আমরা সামান্য কেরানি, অত বড়-বড় বিষয়ে চিন্তা করবার সময় আমাদের নেই।'

আনন্দ একটুও দমে না গিয়ে বললে, 'যদি আপনারা সবাই চিন্তা করতেন তা হলে তো হতই।'

সরোজ একটু সহানুভূতির স্বরে বললে, 'এ নিয়ে মন খারাপ করে কী আর করবে—এই তো নিয়ম।'

'এই নিয়ম! কক্‌খনও না। এভাবে পৃথিবী চলতে পারে না। সাম্য চাই—সাম্য।'

সরোজ বললে, 'চাইলেই তো হবে না, ওই গোবিন্দ চাটুয্যের দল চিরকালই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

'যারা পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে, পথ থেকে তাদের সরিয়ে দিতে হবে,' মৃদুস্বরে অথচ খুব জোর দিয়ে এই কথা ক'টি বলে আনন্দ আবার তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

মনোহর বললে, 'বাপরে, রক্ত একেবারে টগবগ করে ফুটছে যে। এসব ছাড়ো হে ছোকরা, শেষটায় একদিন বিপদে পড়বে—।'

নরেশ আলোয়ানটা কাঁধের উপর টেনে দিয়ে বললে, 'আর আমাদের সুদ্ধু জড়াবে।'

আনন্দ চোখ তুলে বললে, 'জানেন, ডস্টয়েভস্কির একটা বইয়ে আছে—।'

কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই ব্যস্তসমস্তভাবে নরহরিবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর চেহারা দেখে সবাই চমকে উঠল—এইমাত্র যেন তিনি ভূত দেখে এলেন।

সরোজ বললে, 'কী হয়েছে হরি-দা, আপনাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?'

'গোবিন্দবাবুকে কে যেন খুন করে গিয়েছে,' বলে নরহরিবাবু কাঁপতে-কাঁপতে বসে পড়লেন।

মনোহর আর নরেশ একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ!' আর সরোজের মুখ একদম কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। কিন্তু আনন্দর মুখের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না, সে মাথা নিচু করে তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

তিন

গোবিন্দ চাটুয্যে গেল দশ বছর ধরে এই মেসের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে মেসের দু'বার হাত বদল হল, একবার নাম বদল হল, কত লোক এল কত লোক গেল, কিন্তু গোবিন্দবাবু ঠিকই আছেন। তাঁর জীবনযাপনের প্রণালী সত্যি একটু রহস্যময়। চারতলার যে-ঘরটিতে তিনি থাকেন সেটি আসলে ঘর নয়, চিলেকোঠা, অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে ওই ছোট্ট ঘরে মস্ত ছাদের মধ্যে একদম একলা থাকতে সাধারণত কেউই রাজি হয় না—ও-জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে—কিন্তু গোবিন্দবাবু ওই চিলতেটুকুই ভাড়া নিলেন মাসিক আড়াই টাকায়। মেসের ম্যানেজার ভাবলে, ও-ঘর তো আর-কেউ ভাড়া নেবে

না, ভাড়াটে যে পাওয়া গেছে এই বেশি, সুতরাং আড়াই টাকাই বা মন্দ কী। গোবিন্দবাবুর খাওয়া খরচ মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, কারণ তিনি মেসে সকলের সঙ্গে খান না—সকালে একটু ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ আর সন্ধে হবার আগে খান দুই রুটি আর একটু ভাজা—এই তাঁর আহার। চাকর দু-বেলা তাঁর খাবারটা ঘরে দিয়ে আসে। এ ছাড়া আর কিছু তিনি খান এমন কখনও শোনা যায়নি।

এককথায় গোবিন্দবাবু একেবারে হাড়-কিপটে; লোকে বলে তাঁর মুখ দেখলে পাপ হয়, নাম নিলে হাঁড়ি ফাটে ইত্যাদি। মেসে কেউ তাঁর সঙ্গে মেশে না। অবশ্য সেজন্য তাঁর একটুও আপশোস নেই, কারণ তিনি নিজে ঘোরতর অমিশুক। চারতলা থেকে তিনি কদাচিৎ নামেন, প্রায় সবসময়ই দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বসে থাকেন, সন্ধেবেলা ছাদে যখন পায়চারি করেন হঠাৎ দেখলে তাঁকে ভূত বলে ভুল হয়। কারণ চেহারাও তাঁর অতিশয় কদাকার! একটা চোখ কানা, লম্বা লম্বা চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে, নোংরা দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা, কপালের উপর একটা মস্ত আঁচিল—ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁকে দেখলে হয়তো ভয়ে চেঁচিয়ে উঠবে। চেহারা দেখে তাঁর বয়েস আন্দাজ করা সম্ভব নয়—চল্লিশও হতে পারে, পঞ্চাশ হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সবাই বলে, গোবিন্দবাবু অনেক টাকার মালিক। সে যে কত টাকা, আর সে-টাকা তাঁর হাতে কেমন করে এল তা অবশ্য কেউ জানে না। তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন কি বন্ধুবান্ধব আছে বলে কখনও শোনা যায়নি, তাঁর কোনও চিঠি আসে না, কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে না। এদিকে তিনি তো কাজকর্ম কিছুই করেন না, চারতলার ওই চিলকোঠা ছেড়ে রাস্তায় নামতেও কেউ তাঁকে দেখেনি। লোকটি সত্যি রহস্যময়। অনেকে সন্দেহ করে যে, টাকাকড়ি তিনি ব্যাঙ্কে না রেখে নিজের ঘরেই রেখেছেন—আর জীবিত যখ হয়ে দিন-রাত সেই ঘর পাহারা দিচ্ছেন। এরকম সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এ-পর্যন্ত কাউকেই তিনি তাঁর ঘরের ভিতর ঢুকতে দেননি—চাকরদের পর্যন্ত না। তাঁর খাবার নিয়ে চাকররা এসে দরজায় ধাক্কা দেয়, তিনি বেরিয়ে এসে খাবারের থালা নিয়ে ভিতরে চলে যান, খাওয়া হলে নিজেই থালাটি বাইরে রেখে আবার দরজা বন্ধ করেন। এই নিয়মই বরাবর চলে এসেছে। এক মিনিটের জন্য ঘর থেকে বেরুলেও ঘরে তালা দিতে ভোলেন না; ম্যানেজারবাবু কি নরহরিবাবু—দুজন ছাড়া আর কেউই পারতপক্ষে তাঁর মুখদর্শন করতে রাজি নয়—তাঁর কাছে গেলে ভেজানো দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই আলাপ করেন, আর সে-আলাপও দু-চারটে কথাতেই শেষ হয়। তাঁকে দেখলে মেসের সকলেই খুব অস্বস্তি বোধ করত, লোকটা যেন একটা জ্যান্ত ভূত, এই পৃথিবীর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই যেন নেই।

গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে আর-একটা প্রবাদ মেসে প্রচলিত, তিনি নাকি কখনও স্নান করেন না। স্নানের ঘরে তিনি অবশ্য একবার যান, কিন্তু তিনি যে স্নান করেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। চুল তাঁর সব সময়েই রুক্ষ, এলোমেলো—বোধহয় চিরুনিও ব্যবহার করেন না—সমস্ত গা কেমন বিশ্রী নোংরা রকমের। লোকে বলে, গচ্ছিত অর্থ ফেলে বাথরুমে দশটা মিনিট কাটাতেও তাঁর প্রাণে সয় না, তাই তিনি স্নান করাই ছেড়েছেন। কেউ বা বলে, তা নয়, পাছে মনের ভুলে একদিন একখানা সাবানই মেখে ফেলেন সেই ভয়ে তিনি জলই ছোঁন না। ম্যানেজারবাবু না কি বলেন যে, তিনি গোবিন্দবাবুকে জিগ্যেস করে জেনেছেন যে ভদ্রলোকের কী একটা ব্যামো আছে যেজন্যে তাঁর স্নান করা বারণ। শুনে সবাই বলেছে—'হ্যাঁঃ, রেখে দিন ওসব কথা, ব্যামো না হাতি! এই গরম দেশেও যে স্নান করে না সে কি মানুষ! সে পিশাচ!'

সকলের ঘৃণিত এই লোকটার উপরে শুধু নরহরিবাবুই একটু সদয় ছিলেন। লোকটা যতই খারাপ হোক, লোকটা যে অসুখী তাতেও সন্দেহ নেই; নরহরিবাবুর কেমন দয়া হত। তিনি মাঝে-মাঝে চারতলায় গিয়ে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে যতটা সম্ভব আলাপ করে আসতেন। এমনকী কখনও-কখনও তাসখেলাতেও ডাকতেন তাঁকে। আশ্চর্যের বিষয় গোবিন্দবাবু তাসখেলার সে-নিমন্ত্রণ রক্ষাও করতেন। জীবনে যাঁর কোনও শখ, কোনও আনন্দ নেই, যাঁকে জীবিত না বলে মৃত বললেই যেন

ঠিক হয়, তাঁরও একটা শখ কোথায় যেন লুকিয়ে ছিল—সে হচ্ছে তাসখেলার শখ। তাসের নাম শুনলে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠতেন—এক-একদিন নিজের ঘর ছেড়ে এসে ঘণ্টাখানেক তাস খেলে যেতেন—সকলে অবাক হয়ে যেত। অবশ্য নির্দিষ্ট ওই একঘণ্টা হয়ে গেলেই তিনি আস্তে-আস্তে উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন। তিনি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সকলেরই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ত। তবে তাস তিনি খেলতেন ওস্তাদের মতোই—যারা তাঁকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না তারাও মনে-মনে তারিফ করত। মুখে তাঁর হুঁ-হাঁ ছাড়া কথা ছিল না—শুধু কোনওদিন কেউ যদি কোনও নাটক দেখে এসে থিয়েটার সম্বন্ধে কথা তুলত, তিনি মন দিয়ে সেসব কথা শুনতেন, এমনকী দু-একটা কথা বলতেন।

একদিন নরহরিবাবু না-বলে পারেননি, 'চাটুয্যেমশাই দেখছি থিয়েটারের খোঁজখবর একটু রাখেন।'

'হ্যাঁ, এককালে খুব নেশা ছিল।' গোবিন্দবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল খুব মোটা আর ভারি, অথচ খুব পরিষ্কার—শুনলে চমক লাগে।

এরপর নরহরিবাবু একটা অসম্ভব কথা বলেছিলেন, 'চলুন না, একদিন সবাই মিলে থিয়েটার দেখে আসি।'

কিন্তু গোবিন্দবাবু গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নেড়েছিলেন, কোনও কথা বলেননি।

যার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, লোকের কল্পনা তার সম্বন্ধেই উদ্দাম হয়ে ওঠে। গোবিন্দবাবুর সম্বন্ধে অনেকগুলি থিওরি মেসে প্রচলিত ছিল। কেউ বলত, লোকটা খুনি আসামি, ফেরার হয়ে আছে; কেউ বা বলত, তিনি নিশ্চয়ই সাধুপুরুষ, দরজা বন্ধ করে যোগ-টোগ করেন; কেউ বা বলত, এঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়ে সব একসঙ্গে জলে ডুবে মারা যায়, তারপর থেকেই ইনি পাগল মতো হয়ে গেছেন, আর জলে এমন ভয় হয়েছে যে স্নান পর্যন্ত করেন না। এমনি যার যা মনে হত তাই বলত! তবে মোটের উপর মানুষটা নিরীহ—কারু কোনও ক্ষতি করে না আর তার অস্তিত্বও সহজেই ভুলে থাকা যায়, সেইজন্য এ নিয়ে কারু কোনও দুশ্চিন্তাও ছিল না। এমন সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে পারে তা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি।

চার

মিনিটখানেক ঘরের সকলেই চুপ, তারপর নরেশ বললে, 'সত্যি?'

নরহরিবাবু ক্ষীণস্বরে বললেন, 'সত্যি নয় তো কী! আমি নিজের চোখে দেখে এলুম।'

'নিজের চোখে দেখে এলে!'

'হ্যাঁ। হাত-মুখ ধুয়ে ভাবলুম, যাই উপরে গোবিন্দবাবুকে ডেকেই আনি। দুর্গা যে বলে গেল বাবুর এখনও ঘুম ভাঙেনি—শুনে ভারি অবাক লেগেছিল, কারণ আমি জানি খুব ভোরেই গোবিন্দবাবুর ঘুম ভাঙে। মনে হল, হয়তো ছাদে-টাদে বেড়াচ্ছেন, দুর্গা দেখতে পায়নি। গেলুম উপরে ছাদে। কোথাও তিনি নেই, দরজা বন্ধ। ফিরে আসছিলুম—হঠাৎ কী মনে হল, ভাবলুম একটু ভালো করে দেখে যাই, কেমন একটু কৌতূহল হল। এতদিন আছি, কখনও তাঁর ঘরের ভিতরটা দেখিনি। ওঁর ঘরে ওই একটাই তো জানলা, তাও অনেকটা উঁচুতে। অনেক চেষ্টা করেও সে-জানলার কাছে মুখ নিতে পারলুম না। তখন আর কী করি, দরজাতেই আস্তে ধাক্কা দিলুম। অবাক হয়ে গেলুম যখন দেখলুম দরজাটা আস্তে খুলে গেল। তা হলে খোলাই ছিল দরজাটা! গোবিন্দ চাটুয্যে দরজায় খিল না এঁটে ঘুমুচ্ছেন এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যি—দরজা ফাঁক হয়ে আছে।

এই পর্যন্ত বলে নরহরিবাবু একটু থামলেন।

নরেশ রুদ্ধস্বরে বললে, 'তারপর?'

'কী-করি কী-করি ভেবে কয়েক সেকেন্ড কাটল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁর ঘরের ভিতরে একটু উঁকি দেবার কৌতূহল কিছুতেই সামলাতে পারলুম না। এই ঘর কতদিন ধরে একটা রহস্যপুরী হয়ে আছে, আজ হয়তো সে-রহস্যের কিছু সমাধান হবে, এই ভেবে ঘরের ভিতরে মুখ বাড়াতেই যে-দৃশ্য চোখে পড়ল—।'

বলে নরহরিবাবু দু-হাতে মুখ ঢাকলেন।

কয়েক সেকেন্ড ঘরের মধ্যে ভারি নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। তারপর নরহরিবাবু আবার বলতে লাগলেন, 'গোবিন্দবাবু মেঝের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, হাত দুটো দু-পাশে ছড়ানো, চোখ দুটো প্রায় বেরিয়ে আসছে আর মুখটা বীভৎস। উঃ!'

আনন্দ জিগ্যেস করলে, 'ঘরের ভিতর আর কী দেখলেন?'

'কী যেন, তা তো মনে পড়ছে না।'

'রক্ত?'

'কই, না।'

আনন্দ খুব সহজভাবে বললে, 'তা হলে গলা টিপে মেরেছে।'

মনোহর বাঁকা চোখে আনন্দর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি যেন খবরটা শুনে একটুও অবাক হলে না?'

আনন্দ বললে, 'তা এসব লোকের কপালে অপমৃত্যু লেখাই থাকে।'

খবরটা দেখতে-দেখতে সমস্ত মেসে—এমনকী সমস্ত পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, আর রবিবার সকালের আনন্দ মুছে গিয়ে মেসের আবহাওয়া অস্বাভাবিক থমথমে হয়ে উঠল। এতবড় একটা মেসে কারও গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না, কাজকর্ম সব বন্ধ।

ম্যানেজারবাবু নরহরিবাবুর ঘরে এসে বললেন, 'পুলিশে খবর দিয়েছি, ওরা এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছে। পুলিশ এসে তদন্ত করে যতক্ষণ চলে না যায় আপনারা কেউ মেস থেকে বেরোবেন না যেন। যে যেখানে আছেন বসে থাকুন। উপরের ঘরেও কেউ যাবেন না—বুঝলেন? ও-ঘরে যা যেমন আছে, পুলিশ না-আসা পর্যন্ত একচুল নড়চড় হতে পারবে না। চাকরদেরও সব বলে দিয়েছি—কারুর বেরুনো বারণ।'

হঠাৎ সরোজ বলে উঠল, 'কিন্তু আমাকে যে বেরোতেই হবে—আমাদের বড়বাবুর মেয়ের আজ বিয়ে—।'

'অসম্ভব।'

সরোজ আকুল হয়ে বলতে লাগল, 'ওখানে না-গেলে আমার চলবেই না—আমার চাকরি যাবে—না-খেয়ে মরব। আমায় ছেড়ে দিন, আমায় যেতে দিন—' বলতে-বলতে সরোজ দরজার কাছে ছুটে গেল, ম্যানেজারবাবু তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ, চুপ করে বসে থাকো।'

সরোজ কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'হরি-দা, তুমি একটু বলে দাও, আমাকে যেতেই হবে—আমার চাকরি থাকবে না—।'

নরহরিবাবু বললেন, 'অত ব্যাকুল হোয়ো না, সরোজ, চুপ করে বোসো। কিচ্ছু ভয় নেই।'

সরোজ হতাশভাবে বসে পড়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। তার ভাব দেখে মনে হয় তার যেন এক মস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

আধঘন্টার মধ্যেই নিচের ফুটপাথ লাল-পাগড়িতে ছেয়ে গেল; দুজন কনেস্টবল সঙ্গে নিয়ে মেসের ভিতরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত। সিঁড়ির ধারেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন ম্যানেজারবাবু।

ম্যানেজারবাবুর নাম পশুপতি ঘোষ। দেশ বরিশালে, মেজাজ বেশ কড়া। একটানা পাঁচ বছর তিনি ব্রডওয়ে হোটেলের পরিচালনা করছেন, তাঁর প্রতাপে ও প্রভাবে মেসের যথেষ্ট উন্নতি ও সুনাম হয়েছে—আর এর মধ্যে এ কী কাণ্ড! বিপদের মুখে ঘাবড়ে যাওয়ার লোক তিনি নন, মনে-মনে বরঞ্চ বেশ চটেই আছেন—কোন দুশমনের এত সাহস যে তাঁর মেসের মধ্যে একটা খুন করে গেল, তাঁর এত কষ্টে অর্জিত সুনামে কলঙ্কের কালি এঁকে!

'আসুন, ইন্সপেক্টরবাবু, আসুন। খুনি ব্যাটাকে কিন্তু ধরে দেওয়া চাই। ও ধরা না-পড়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই ছাড়ব না—হ্যাঁঃ, আমি বরিশালের লোক, সেটা জানেন তো!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'সেটা আপনার কথা শুনেই টের পেয়েছি। চলুন তো উপরে, দেখা যাক।'

গোবিন্দ চাটুয্যের পরিচয় দিতে-দিতে ম্যানেজারবাবু ইন্সপেক্টরের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। কেমন লোক ছিলেন গোবিন্দবাবু, অন্য সকলের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার কেমন ছিল। খানকয়েক ডিটেকটিভ নভেল পড়া ছিল ম্যানেজারবাবুর, তা থেকে তাঁর জানা ছিল যে, কোনও খুন হলে নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে খবর নেওয়াই সকলের আগে দরকার। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও তৎপরতার উপর তাঁর এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সাহায্য ছাড়া যে এ-রহস্যের কোনও কূল-কিনারা হতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারতেন না।

তেতলায় এসে রণজিৎবাবু বললেন, 'এরপর কোনদিকে?'

'গোবিন্দবাবুর ঘর চারতলায়।'

রণজিৎবাবু চারতলা সিঁড়ির দিকে মাত্র পা বাড়িয়েছেন, এমনসময় নরহরিবাবুর ঘর থেকে দুর্গা বেরিয়ে এল কয়েকটা চায়ের পেয়ালা হাতে করে। তাকে দেখেই রণজিৎবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

দুর্গা পেয়ালাগুলো নিয়ে বেগে নেমে যাচ্ছিল, রণজিৎবাবুর দিকে চোখ পড়তেই সে-ও যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পশুপতিবাবু এটা লক্ষ করে বললেন, 'কী হল? ওকে আপনি চেনেন নাকি?'

'হ্যাঁ, চিনি বইকী,' বলে রণজিৎবাবু হেসে এগিয়ে গেলেন দুর্গার দিকে। বললেন, 'কী খবর চঞ্চল, কেমন আছ?'

দুর্গা—মানে, চঞ্চল—কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনসময় পশুপতিবাবু দুজনের মাঝখানে এসে বললেন, 'আপনি ওকে বেশ ভালোই চেনেন, মনে হচ্ছে। দেখুন, ও যদি কোনও দাগি আসামি বা অন্য কিছু হয় তা হলে আমি কিন্তু দায়ী নই—ওকে আপনি যা খুশি তা-ই করতে পারেন। ও নতুন এসেছে ওর সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনে। বরং ওর হাবভাব দেখে আমার কেমন একটু সন্দেহই হয়।'

'ঠিক বলেছেন, সন্দেহ হওয়ারই কথা।'

'ওকে আপনি কী-একটা অন্য নামে যেন ডাকলেন না? ভাবছেন আমি শুনিনি? সব শুনেছি। এখন কথা হচ্ছে, যে-লোক ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে নাম ভাঁড়িয়ে মেসের চাকরের কাজ করতে আসে, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়? তার উপর এই তো একটা অঘটন ঘটল। দ্যাখো ছোকরা, তুমি যতই চালাক হও, আমার সঙ্গে চালাকিতে তুমি পারবে না, তা জেনো। তোমার মতলবখানা কী, খুলে বলো দেখি। আর এই যে গোবিন্দবাবু খুন হলেন, সে-বিষয়েই বা তুমি কতদূর কী জানো, শুনি? সব বলতে হবে, কিছু গোপন করা চলবে না। ভালোয়-ভালোয় বলবে তো ভালো, নয়তো কী করে পেট থেকে কথা আদায় করতে হয় তা আমার ভালোই জানা আছে। হুঁ-হুঁ, আমি যে-সে লোক নই, দেশ আমার বরিশালে। আর দেখছ তো পুলিশের ইন্সপেক্টর সামনেই রয়েছেন—প্যাঁচ কষতে গেলে আরও বিপদে পড়বে।'

'ইন্সপেক্টরবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন না আমার কথা,' বললে চঞ্চল।

রণজিৎবাবু বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না, ওর ভার আমিই নিচ্ছি। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, এর সঙ্গে আমি একটু কথা বলে নিই।'

পশুপতিবাবু গলা খাটো করে বললেন, 'ছোকরাকে অ্যারেস্ট করবেন তো? আমার মনে হচ্ছে ও তলে-তলে এর মধ্যে আছে। ওকে ছেড়ে রাখা কোনও কাজের কথা নয়।'

'না, না, ওকে ছাড়ব না। চোখে-চোখেই রাখব। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, একে জেরা করে দেখি—কিছু বেরোয় কি না।'

পশুপতিবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা-ই ভালো। কার পেটে কী আছে কে জানে! আজকালকার দিনে কাউকেই বিশ্বাস নেই, মশায়। এই তো সেদিন আমাদের দেশের বাড়িতে...।'

পাঁচ

কিন্তু রণজিৎ সামন্ত পশুপতিবাবুর কথা শেষ পর্যন্ত শোনবার জন্য অপেক্ষা করলেন না। দুর্গা—অথবা চঞ্চলকে—একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'চঞ্চল, এ তুমি করেছ কী?'

হাত থেকে পেয়ালাগুলো নামিয়ে চঞ্চল বললে, 'কেন, কী করেছি?'

'শেষটায় এই মেসে—চাকরের কাজ করছ!'

চঞ্চল মেঝের দিকে তাকিয়ে বললে, 'তা ছাড়া উপায় কী?'

'উপায় ছিল বইকি। তুমি যদি আমার কাছে আসতে—।'

'কী করে জানব আপনি আমাকে মনে রেখেছেন?'

'বাঃ, সেই 'কলকাতা হরকরা'র ব্যাপারে তুমি যেরকম সাহস আর বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলে—তোমাকে কি ভুলতে পারি! আমি বরং মনে-মনে ভেবেছি সে-ছোকরাটির হল কী? দেখা পেলে বেশ হত—কাজে লাগাতে পারতুম। তারপর—এ-ক'মাস তুমি কোথায় ছিলে, কী করলে সব বলো আমাকে।'

'বলবার বিশেষ কিছু নেই। 'কলকাতা হরকরা' উঠে যাওয়ার পর আমি একেবারে অকূলে ভাসলুম। তাই বলে খুব যে ঘাবড়ে গেলুম তা-ও নয়, এ তো আমার অভ্যেসের মধ্যেই—ছেলেবেলা থেকে এইরকমই তো চলছে। পকেটে একটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা ছিল; খুচরোটা নিজে রেখে একটাকার চিনে সিঁদুর, চুলের কাঁটা, বেলুন-বাঁশি—এসব কিনে ফেললুম রাধাবাজার থেকে। তারপর তাই নিয়ে বালিগঞ্জে ফেরি করতে বেরোলুম। রোদ্দুরে-বৃষ্টিতে বেশ কষ্ট হত, কিন্তু রোজগারও মন্দ হত না।'

'কত পেতে?'

প্রথমটায় দু-আনা দশ পয়সার বেশি হত না রোজ, কিন্তু তাই থেকে দু-চার পয়সা জমিয়ে জমিয়ে আমার পুঁজি যখন একটু বাড়ল, তখন জিনিসের স্টক ক্রমেই বাড়তে পারলুম—শেষের দিকটায় চার আনা ছ-আনা এমনকী আট আনা পর্যন্ত রোজগার হত।'

রণজিৎবাবু সবিস্ময়ে জিগ্যেস করলেন, 'তাতে তোমার চলত?'

'বলেন কী! চলবে না! রোজ চার আনা যে অনেক। পাইস হোটেলে দু-আনায় রীতিমতো ভোজ হয়ে যায় একবেলা। দু-পয়সায় এক পেয়ালা চা, আর ছ-পয়সা হাতে থাকে। চার আনা কি কম!'

রণজিৎবাবু হেসে উঠে বললেন, 'তুমি অবাক করলে, চঞ্চল, এত কষ্ট করতে সত্যি পারো তুমি?'

চঞ্চল বিনীতভাবে বললে, 'না, তা আর পারি কই! হাজার হোক, ভদ্রলোকের রক্ত তো

বইছে শরীরে। ভদ্রলোকের কাজ তো জোটেই না, এদিকে কুলির সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় পারি না—এই তো এখন আমাদের অবস্থা। জিনিস ফেরি করে একরকম চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুখ করেই আবার গোল বাধালে।'

'অসুখের আর দোষ কী! নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া কিছু-ই ঠিক নেই—রোদ-জল মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে—ওই তুমি যা বললে—এ কি আর ভদ্রলোকে সয়! আমি অবাক হচ্ছি এ-কথা ভেবে যে তুমি তক্ষুনি কোনও খবর-কাগজের আপিসে চেষ্টা করলে না কেন? ও-লাইনে তোমার তো অভিজ্ঞতা ছিল!'

'চেষ্টা করলেই যে হত তার তো মানে নেই। চাওয়া মাত্র কি আর কোনও চাকরি হয়! এদিকে আমার যে এখন-তখন অবস্থা—আজকে রোজগার না-করলে আজকেই উপোস। কাগজের আপিসে চেষ্টা করতে গেলে হাঁটাহাঁটিই হত সার। এদিকে আমার সেই একটাকা সাড়ে-সাত আনাও খামোখা খরচ হয়ে যেত। তা ছাড়া 'হরকরা' নিয়ে যেরকম এক কেলেঙ্কারি হল আমাকে হয়তো কেউ বিশ্বাস করত না, হয়তো সন্দেহ করত আমিও তলে-তলে ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলুম। তা ছাড়া আমি যে 'হরকরা'য় কাজ করেছি তারই বা বিশ্বাস কী! একটা সার্টিফিকেট নেই, কিচ্ছু নেই! আপনিই বলুন, তারচেয়ে এই কি ভালো করিনি! চাকরির চেষ্টার চাইতে হাঁটাহাটি খুব বেশি হল না, অথচ সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পয়সাও পকেটে এল—অবশ্যি আপনাদের অর্থে "দুটো পয়সা" হয় অভিধানের অর্থে।'

'তুমি তো দেখছি কথাবার্তাতেও বেশ তুখোড়, মিষ্টি করে জুতোও দিতে পারো,' মন্তব্য করলেন সামন্তমশাই।

'কিছু মনে করবেন না, সত্যি কথাটা মুখে এসে পড়ল—।'

'সে যাকগে—যখন অসুখ করল, কী করলে তুমি?'

'কী আর করব—সোজা হাসপাতাল। টাইফয়েড হয়েছিল—আট-দশ দিন না কি স্রেফ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম। অসুখের কথা ভালো করে আমার মনেও পড়ে না—কেমন একটা স্বপ্নের মতো মনে হয়। এটা কিন্তু মস্ত বাঁচোয়া—অতখানি কষ্ট সজ্ঞানে ভোগ করতে হলে আর উপায় ছিল না। দু-মাস পরে অত্যন্ত রোগা হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলুম। পকেটে একটি পয়সা নেই। যখন ফেরিওলা ছিলুম, চানাচুর চিবিয়ে ফুটপাতে ঘুমিয়ে দিব্যি দিনের পর দিন কেটে গেছে, কিন্তু এখন দুর্বল শরীরে মনে হল, একটা আশ্রয় পেলে ভালো হয়। সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল, চাকরের কাজ পেলে বেশ হয়, দু-বেলা খাওয়া জোটে, তা ছাড়া ঘুমোবার একটা নির্দিষ্ট জায়গাও পাওয়া যায়। বৌবাজার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা পানের দোকানে খবর পেলুম, ব্রডওয়ে হোটেলে একটা চাকরি খালি আছে। এক সেকেন্ডও দেরি না করে এই হোটেলে এসে হাজির হলুম। ম্যানেজারবাবু আমার সঙ্গে দুটো-চারটে কথা বলেই যেন খুশি হলেন—জানি না কী কারণে আমি তাঁকে খুশি করতে পেরেছিলুম। সেই থেকে আছি।'

'কত মাইনে পাও?'

'পাঁচ টাকা। তা ছাড়া বাবুরা মাঝে-মাঝে বখশিশ দেন। মোটের উপর কাজটা ভালোই।'

'হ্যাঁ, ভালোই,' বলে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন।

'ভালো বইকী, পঁচিশ টাকা মাইনের কেরানিগিরির চাইতে নিশ্চয়ই ভালো। কেরানিকে লোকে 'আপনি' বলে আর চাকরকে বলে 'তুমি'—এ ছাড়া এ দুই কাজে আর কোনও তফাৎ তো আমি দেখতে পাইনে।'

রণজিৎবাবু বললেন, 'ওটাই তো মস্ত তফাৎ। ...কিন্তু যাই হোক, এভাবে আর কতকাল কাটাবে তুমি?'

'যতদিন এর চেয়ে ভালো কিছু না জোটে।'

'জোটাবার চেষ্টা কিছু করছ কি?'

চঞ্চল চুপ করে রইল।

রণজিৎবাবু তার কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'সাবাস ছেলে তুমি, চঞ্চল, আমার যদি তোমার মতো একটা ছেলে থাকত, নিজেকে ধন্য মনে করতুম। এরকম আত্মনির্ভরশীল ছেলে বাংলাদেশে ক'টা আছে! এই তো চাই! তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনে আনন্দ যেমন হচ্ছে তেমনি মনটাও একটু খারাপ লাগছে এ-কথা ভেবে যে, এত দুঃখে পড়েও আমাকে তুমি একবার মনে করলে না! তোমার কি একবারও মনে হল না যে, আমি তোমার কোনও কাজে লাগতে পারি?'

চঞ্চল আমতা-আমতা করে বললে, 'মনে যে না হয়েছিল তা নয়, কিন্তু আপনার বাড়ির ঠিকানা...।'

সামন্তমশাই হেসে উঠে বললেন, 'সে তো টেলিফোনের বই খুললেই পেতে। যতই তুখোড় হও না, এখনও একেবারে ছেলেমানুষ আছ দেখছি।'

চঞ্চল কিছু বললে না।

'একটা কথা তোমাকে বলি, চঞ্চল। এখান থেকে এবার তুমি ছুটি নাও। আমার ওখানে চলো—ভুল বুঝো না, তোমাকে আমার উপর নির্ভর করতে বলছি না—যতদিন ভালো কোনও কাজ না জোটে আমার ওখানে থাকবে আর কি। আর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি জোটে সেজন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আশা করি, এতে তোমার আপত্তি হবে না। বলো?'

চঞ্চল নিচু গলায় বললে, 'বেশ তো, আপনি যেরকম বলছেন তা-ই হবে।'

'পশুপতিবাবু তোমাকে আর রাখবেনও না এ তুমি ঠিক জেনো। একবার যখন তোমাকে সন্দেহ করেছেন...যেরকম জবরদস্ত লোক দেখছি!'

শেষের কথাটা বলে রণজিৎবাবু একটু হাসলেন। —'চলো এবার, এই ব্যাপারটার কিছু হদিস করতে পারি কি না দেখি।'

'চলুন।'

রণজিৎবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'এবার চারতলায় যাওয়া যাক।'

পশুপতিবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওর পেটের কথা বের করতে পারলেন কিছু?'

'ওর জন্যে ভাববেন না, ওকে আমি ঠিক করে নেব। চলো হে চঞ্চল, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে চারতলায়।'

ছয়

এমনসময় চটি চটপট করতে-করতে নরহরিবাবু বেরিয়ে এলেন বাইরে। তাঁকে দেখেই পশুপতিবাবু বলে উঠলেন, 'আসুন মশাই, শুনে যান আপনার পেয়ারের চাকরের কাণ্ড। আমি বরাবরই বলেছি—।'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, হয়েছে কী?'

'আরে মশাই, ও আসলে চাকরই নয়। দেখছেন না, কেমন সুন্দর চেহারা, পরিষ্কার হাত-পা। উনি ভদ্দরলোকের ছেলে, নাম ভাঁড়িয়ে বাসন মাজতে এসেছেন। ইন্সপেক্টরবাবু তো ওকে দেখেই চিনে ফেলেছেন। দাগি আসামি কিনা।'

নরহরিবাবু মনে-মনে শিঁউরে উঠে বললেন, 'সে কী কথা!'

রণজিৎবাবু বললেন, 'দাগি আসামি তা তো আমি বলিনি।'

'আহা—আপনারা কি আর সবকথা খুলে বলবেন! যাই হোক, এর আসল নাম হচ্ছে—

কী যেন তোমার নামখানি বাপু?'

'চঞ্চল নাগ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চঞ্চল নাগ—খাসা! অতি-আধুনিক নাম। তা এই তো ব্যাপার—এদিকে দেখছেন তো অবস্থা। আপনাদের সবাইকে বলে রাখছি, সাবধানে থাকবেন—যা দিনকাল পড়েছে, কখন কী হয় কিছুই বলা যায় না।'

নরহরিবাবু বললেন, 'তা ভদ্রলোকের ছেলে বিপাকে পড়ে চাকরের কাজ করতে এসেছে, এ এমন একটা অন্যায় কী।'

'থাক, থাক, আপনার সঙ্গে ওসব কথা পরে হবে, এখন সময় নেই। ইন্সপেক্টরবাবু, ইনিই আমাদের নরহরি-দা, ইনিই সকালবেলা চারতলায় গিয়ে ভীষণ দৃশ্য দেখে আসেন।'

'ও, আপনিই প্রথমে দেখেন। তাহলে আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনার কথা শোনাও হবে।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'বেশিদূর নয়, এই চারতলায়। তুমিও এসো, চঞ্চল।'

চারজনে গেলেন চারতলায়।

চারতলার প্রায় সমস্তটাই ছাদ, শুধু এককোণে ছোট্ট একটি ঘর, আসলে সেটি চিলেকোঠা। কার্নিশে ঘেরা এই মস্ত ছাদ কেউ বিশেষ ব্যবহার করে না। প্রায় সকলেই চাকুরে, সকলেরই সময়াভাব, ছাদে এসে হাওয়া খাওয়ার মতো বাবুগিরি কারুরই পোষায় না। তা ছাড়া গোবিন্দবাবুর অখ্যাতি সমস্ত মেসে এতই রাষ্ট্র যে কদাচ কারও শখ হলেও ওই দাড়িওলা অলক্ষুনে মুখ মনে করলেই ছাদে যাওয়র ইচ্ছে উবে যায়। ছাদটি বলতে গেলে গোবিন্দবাবুর একলারই দখলে ছিল।

ঘরে ঢোকবার আগে রণজিৎবাবু ছাদটি বার দুই ঘুরে এলেন। আশ্চর্য—ছাদটি একেবারে তকতকে পরিষ্কার, একটা কাগজের টুকরোও কোথাও পড়ে নেই। কার্নিশে ভর দিয়ে নিচের দিকেও তাকিয়ে দেখলেন—জলের পাইপ বেয়ে উঠে আসা অবশ্য অসম্ভব নয়, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বা ক্ষতি কী?

তারপর গেলেন ঘরের ভিতরে। কনেস্টবল দুজন সিঁড়ির কাছে রইল।

চারজন মানুষে ঘরটা যেন একেবারে ভরে গেল। দড়িতে ঝোলানো সামান্য দু-একটা জামাকাপড়, টিনের একটা ভাঙা তোরঙ্গ—জিনিস বলতে এই। আর মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন গোবিন্দ চাটুয্যে—মুখটা ফুলে বীভৎস হয়েছে, জিভ এসেছে বেরিয়ে, ভালো চোখটা এমন বড় যেন দৈত্যের চোখ, আর কানা চোখটা যেন আরও বুঁজে চামড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে—গলায় চাক-চাক মাংস উঠেছে লাল হয়ে ফুলে।

রণজিৎবাবু একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নৃশংস বলতে হয় এই হত্যাকারীকে। বুকের উপর হাঁটু চেপে বসে গলা টিপে মেরেছে। দেখছেন গলায় লাল-লাল দাগ?' বলেই তিনি মৃতদেহের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জামার পকেটে হাত ঢোকালেন।

পকেট থেকে কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর খোলা হল তোরঙ্গ।

প্রথমে বেরুল গোটা কয়েক পুরনো, পাতা-ছেঁড়া নাটকের বই, তারপর এককৌটো দাঁতের মাজন, তারপর একজোড়া নোংরা চিটচিটে তাস, তারপর—ব্যস, আর কিছু না। টাকাকড়ি? একটা আধলাও না।

গোবিন্দ চাটুয্যের পার্থিব সম্পত্তি দেখে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

নরহরিবাবু বললেন, 'টাকার জন্যেই ভদ্রলোক প্রাণে মারা গেলেন। এই তোরঙ্গেই সব

টাকাকড়ি রাখতেন নিশ্চয়ই—যে খুন করেছে সে নিয়ে সটকেছে।'

'কিন্তু তোরঙ্গ তো ভাঙা নয়,' বললেন ম্যানেজারবাবু।

'ভাঙবার দরকার কী—ওতে তো আর তালা ছিল না। আর তোরঙ্গটা এতই পুরনো যে তালা দেওয়া সম্ভবও ছিল না বোধহয়।'

'তা হলে কি আপনি বলতে চান গোবিন্দবাবু তাঁর সব টাকাকড়ি একটা ভাঙা তোরঙ্গে ফেলে রাখতেন? তিনি কি এতই অসাবধান?'

'কত আর সাবধান হবেন! ঘর ছেড়েই তো বেরোতেন না।'

'হয়তো কোনও গুপ্ত জায়গায় লুকিয়ে রাখতেন? কী হয়তো তাঁর টাকাকড়ি কিছু ছিলই না, সবই আমাদের অনুমান?' পশুপতিবাবুর ডিটেকটিভ নভেল-পড়া মগজে নানারকম থিওরি পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। তিনি একটা লাঠি দিয়ে দেওয়াল ঠুকে-ঠুকে দেখলেন, কোথাও একটু ফাঁপা আওয়াজ হয় কি না। সমস্ত দেওয়াল হাৎড়ে হাৎড়ে দেখলেন কোনও লুকোনো বোতাম বা হাতল হাতে ঠেকে কি না। লাথি মেরে-মেরে মেঝের সিমেন্ট প্রায় তুলে ফেললেন। কিন্তু এত করেও কোনও ফল হল না।

রণজিৎবাবু বললেন, 'নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির সন্ধান পেতে আপনি বড়ই যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ম্যানেজারবাবু। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড যে করতে পারল, সে কি আর টাকাকড়ির লোভ সামলাতে পেরেছে!'

পশুপতি বললেন, 'না, না, তা নয়—এই দেখছিলুম আরকি। ভদ্রলোকের সবই রহস্যময় ছিল কিনা। আপনার কী মনে হচ্ছে? কোনও ক্লু-ট্লু পেলেন?'

'আপাতত একেবারেই অন্ধকার।'

হঠাৎ! চঞ্চল বলে উঠল, 'এ তো ভারি আশ্চর্য!'

ঘরের এককোণে গোবিন্দবাবুর বিছানাটা জড়ানো পুঁটলি হয়ে পড়ে ছিল, এতক্ষণ কেউ তা লক্ষ করেনি। চঞ্চল গিয়ে সেটা টেনে খুলে ফেলেছে। বিছানা বলতে অবশ্য শুধু একটা কম্বল আর একটা ওয়াড়-ছাড়া চিটচিটে বালিশ। কিন্তু সেই কম্বলের মধ্যে জড়ানো একখানা মস্ত বড় ঝকঝকে দামি আয়না।

এই আয়নাটাই আশ্চর্য।

সবাই ঝুঁকে পড়ে আয়নাটা দেখতে লাগল। সোনালি রঙের ফ্রেম, আঙুল রেখে দেখা গেল কাঁচটা অন্তত এক ইঞ্চি পুরু। একটা পয়সা খরচ করতে যার প্রাণ বেরিয়ে যেত, তার এই দামি আয়নার আজগুবি শখ কেন? আশ্চর্যই বটে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'বুড়োর প্রাণে তো রস ছিল খুব! নিজের ওই অলক্ষুনে মুখখানাই বোধহয় দেখত বসে-বসে।'

'কেন, অলক্ষুনে মুখ কেন?' জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'কেন অলক্ষুনে তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন। খুন হয়ে ইনি অবশ্য দেখতে ভয়াবহ হয়েছেন, কিন্তু বেঁচে থেকেও যে এর চেয়ে বেশি সুশ্রী ছিলেন তা তো নয়। আচ্ছা, ওই বালিশটার ভিতরে নোট-টোট কিছু নেই তো?'

বলে পশুপতি বালিশটা তুলে নিয়ে একটানে খোলটা ছিঁড়ে ফেললেন। সারা ঘরে তুলো ছড়িয়ে পড়ল, নোট একটিও বেরুল না।

চঞ্চল তখনও আয়নাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীব্র আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, ঘরের ইলেকট্রিক বালবটা তখনও জ্বলছে। দিনের আলোয় কেউ তা এতক্ষণ লক্ষ করেনি।

রণজিৎবাবুকে ডেকে সে বললে, 'দেখছেন—কে বা কারা হাতের কাজ শেষ করে আলোটা

নেবাতে ভুলে গিয়েছিল।'

- রণজিৎ বললেন, 'তা-ই তো দেখছি।'

চঞ্চল বললে, 'আচ্ছা, আলোটা খুব বেশি উজ্জ্বল নয় কি? এই দিনের আলোতেও কেমন চোখে লাগছে।'

'হ্যাঁ, খুবই উজ্জ্বল, অন্তত একশো পাওয়ার হবে।'

'এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো! ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ ছিল?'

'তা লোকের কত রকমই খেয়াল থাকে,' বলে রণজিৎবাবু শিস দিতে-দিতে উঠে দাঁড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলেন। ম্যানেজারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বালিশটা মিছিমিছি ছিঁড়লেন দেখছি। তা এখানে তো আর কিছু করবার নেই। চলুন, নিচে গিয়ে গল্প-টল্প করা যাক। —আহা, কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে লোকটাকে,' বলে তিনি মৃতদেহের কাছে গিয়ে মুখে-চুলে-দাড়িতে একটু হাত বুলোলেন।

পশুপতি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমাদের একটা কিন্তু ভুল হয়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হয়নি।'

রণজিৎ বললেন, 'ডাক্তারের দরকার হবে না। ইনি যে আত্মহত্যা করেননি সেটা নিঃসন্দেহ। এ ছাড়া আর যা জানবার তা ধরা পড়বে পোস্টমর্টেমে।'

'মৃতদেহ কি এখনই সরিয়ে নেবেন?'

'একটু পরেই। আপনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা আছে। চলুন নিচে।'

সাত

ম্যানেজারবাবু ইন্সপেক্টরকে নরহরি-দার ঘরে এনেই বসালেন। সেখানে মনোহর, সরোজ, নরেশ আর আনন্দ তখনও বসে আছে।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'এদের কি বাইরে যেতে বলব?'

'না, না, আমার কথা কিছু গোপনীয় নয়। দু-একটা খোঁজখবর নেব শুধু। আচ্ছা, কাল রাত্রে আপনারা গোবিন্দবাবুকে শেষ কখন দেখেছিলেন?'

সকলেই বললে যে, রাত্রে কেউ তাঁকে দেখেনি, এমনকী বিকেলের দিকেই দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। পশুপতি বুঝিয়ে বললেন যে, গোবিন্দবাবু মানুষটা মোটেও মিশুক ছিলেন না, নেহাৎ দরকার না-হলে উপর থেকে নামতেন না, খাওয়া-দাওয়াও নিজের ঘরেই করতেন। তাঁর সঙ্গে মেসের পাঁচজনের দেখাশোনা বলতে গেলে হতই না, শুধু নরহরি-দার ঘরেই এক-আধ সময় আসতেন।

'আপনার ঘরে আসতেন? কেন?'

'আসতেন তাস খেলতে।'

'তাস খেলতে ভালোবাসতেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, পৃথিবীতে ওই একটা জিনিসেই তাঁর একটু আসক্তি ছিল মনে হয়।'

'আর কিছু ভালোবাসতেন?'

'মনে তো হত না।'

'কথাবার্তা কীরকম বলতেন?'

'খুব কম।'

'কোনও বিশেষ বিষয়ে উৎসাহ ছিল?'

'কিছুমাত্র না।'

'একটু ভেবে দেখুন।'

'যদি খুব খুঁটিয়ে জিগ্যেস করেন তা হলে বলতে হয় এক থিয়েটারের কথা উঠলে ভদ্রলোকের একটু উৎসাহ দেখা যেত।'

'অথচ তিনি থিয়েটারে কখনও যেতেন না?'

'কখনওই না। বাড়ির বাইরেই যেতেন না কখনও।'

'আচ্ছা। এবার আপনি বলুন ম্যানেজারবাবু, গোবিন্দবাবুর বিষয়ে কী জানেন।'

পশুপতি তাঁর ম্যানেজারির প্রথম দিন থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুরু করলেন। গোবিন্দবাবু কী করতেন, কী খেতেন, চাকরদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন—কিছুই সে বর্ণনা থেকে বাদ গেল না। সব শুনে ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন ঃ

'তাঁর দেশ কোথায় ছিল?'

'তা তো জানিনে।'

'তাঁকে কখনও জিগ্যেস করেছেন?'

'অনেকবার করেছি, কোনও জবাব পাইনি। এটুকু মাত্র বলতে পারি যে, কথা শুনে চব্বিশ পরগনার লোকই মনে হত।'

'তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন...?'

'কারও কথা জানিনে।'

'কেউ দেখা করতে আসত তাঁর সঙ্গে?'

'কেউ না। আর এতদিনের মধ্যে তাঁর একটা চিঠি এসেছে বলেও জানা যায়নি।'

হঠাৎ আনন্দ বলে উঠল, 'কাল কিন্তু ওঁর নামে একটা চিঠি এসেছিল।'

'অ্যাঁ? চিঠি? ওঁর নামে!' পশুপতি রীতিমতো চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ওঁর নামে চিঠি।'

'তুমি জানলে কেমন করে?'

'কাল সকালে আমার কোনও চিঠি এসেছে কি না দেখবার জন্য আমি লেটারবক্স ঘাঁটছিলাম, নানা চিঠির মধ্যে গোবিন্দ চ্যাটার্জির নামে একটি পোস্টকার্ড চোখে পড়ল।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'ঠিক মনে আছে আপনার?'

'ঠিক মনে আছে। ওঁর নামে কখনও কোনও চিঠি আসে না, সেইজন্য ওটা লক্ষ করেছিলাম। কোনও জরুরি খবর এসেছে মনে করে আমি তখুনি সেটা চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিলাম চারতলায়।'

ম্যানেজারবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কী ছিল সে-চিঠিতে?'

'তা জানিনে। পরের চিঠি পড়বার অভ্যেস আমার নেই।'

মনোহর বললে, 'তুমি তো খুব পরোপকারী ছেলে, আনন্দ, তক্ষুনি চিঠিটা চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে।'

'তা দিয়েছিলুম, আপনাদের মতো টিপ্পনি কেটেই তো আমার দিন যায় না।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'থাক, থাক, তোমার আর ফাজলেমি করতে হবে না। কোন চাকর দিয়ে পাঠিয়েছিলে?'

'কেষ্টাকে দিয়ে।'

ডাকা হল কেষ্টকে। কেষ্ট বললে যে, হ্যাঁ, কাল সকালে একতলার বাবু তার হাতে একখানা পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন বটে চারতলার বাবুকে দিয়ে আসতে।

'তুই সেটা তখুনি দিয়ে এসেছিলি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চিঠি পেয়ে চারতলার বাবু কিছু বললেন?' জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

কেষ্ট মাথা নাড়ল।

'তাঁর মুখের চেহারা চিঠি পেয়ে কেমন হল?'

কিন্তু কেষ্ট আর-কিছুই বলতে পারলে না। চিঠি দিয়েই সে চলে এসেছিল।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'পোস্টকার্ডটা ঘরের মধ্যে পাওয়া গেলে একটু সুরাহা হত।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'সেইজন্যেই তো পাওয়া গেল না।'

'আপনি তা হলে মনে করেন পোস্টকার্ডটার সঙ্গে এই ঘটনার কোনও যোগাযোগ আছে?'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

মেসের আরও অনেককে জেরা করা হল, তা থেকে দুটো খুব বড়রকমের খবর বেরুল। দোতলার ললিতবাবু বললেন যে, কাল রাত প্রায় দুটোয় তিনি থিয়েটার দেখে ফিরেছিলেন। মেসের কাছে এসে তিনি দেখেছিলেন যে, সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শুধু চারতলার এককোণে আলো জ্বলছিল। তিনি মনে-মনে ভেবেছিলেন—বিটকেল বুড়ো এত রাতে আলো জ্বেলে কী করছে—সে-কথা তাঁর মনে আছে।

'আলোটা কি আপনার চোখে খুব বেশি উজ্জ্বল লেগেছিল?'

'তা তো বলতে পারব না। কার্নিশের ফুটো দিয়ে একটুখানি আলোই চোখে পড়েছিল।'

'তবে আলো দেখেছিলেন সেটা ঠিক মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আলো দেখেছিলুম ঠিকই।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনারা কেউ কি কখনও লক্ষ করেছেন যে গোবিন্দবাবুর ঘরের আলোটা খুব বেশি জোরালো?'

এ-কথার কোনও জবাব কেউ দিতে পারলে না, কারণ গোবিন্দবাবুর ঘরের অভ্যন্তর সকলেরই অজ্ঞাত।

আর-একটা খবর দিলে মেসের ঠাকুর। সে বললে যে, গোবিন্দবাবু তাকে বলেছিলেন যে, তাঁর ভাই কাল দেশ থেকে আসছে, তার খাওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়।

'কবে বলেছিলেন?'

'কাল।'

'কখন বলেছিলেন?'

'দুপুরে তাঁর খাবার নিয়ে যখন যাই, তখন।'

'কী বলেছিলেন তোমাকে ঠিক করে বলো তো?'

ঠাকুর একটু ভেবে বললে, 'বাবু বললেন, "ঠাকুর, কাল সকালে আমার ভাই আসছে দেশ থেকে। তার খাওয়ার ব্যবস্থা কোরো। সে আমার মতো পেট-রোগা লোক নয়, বেশ খেতে-টেতে পারে। ওর জন্যে আলাদা করে একটু মাছ-তরকারি রান্না কোরো—বেশ ভালো করে রেঁধো—তোমাকে বখশিশ দেব।"

এ-কথা শুনে সকলেই অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। প্রথম নম্বর তাজ্জব কথা এই যে, ভূতের মতো অদ্ভুত ওই মানুষটারও পৃথিবীতে একজন ভাই আছে—এবং তার চেয়েও যা আশ্চর্য—সেই ভাইয়ের জন্য হাড়-কঞ্জুস গোবিন্দ চাটুয্যে রীতিমতো ভোজের ফরমাস দিয়েছিলেন—এমনকী ঠাকুরকে বকশিশ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন!

পশুপতি বললেন, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ওই পোস্টকার্ডে ভাইয়ের আসবার খবরই ছিল।'

'সেইরকমই তো মনে হয়', বললেন ইন্সপেক্টর।

রণজিৎবাবু তাঁর কথা মেনে নেওয়ায় পশুপতি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠে বলতে লাগলেন—এটাও মনে হয় যে, এমন কেউ আছে ওই দু-ভাইয়ে দেখা হওয়ার সঙ্গে—অর্থাৎ না-হওয়ার সঙ্গে—যার গভীর স্বার্থ জড়িত। সে চায় না যে, গোবিন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের সাক্ষাৎ হোক। অতএব তারই এই কাজ। এখন এটুকু শুধু জানতে বাকি থাকে সেই লোকটি কে?'

'বাঃ, বেশ বলেছেন। সমস্যাটা আপনি অনেকটা সরল করে এনেছেন সে-কথা মানতেই হয়।'

ইন্সপেক্টর ঠাকুরকে আরও দু-একটা প্রশ্ন করলেন :

'গোবিন্দবাবু তোমাকে আর কিছু বলেননি—না?'

'না, হুজুর।'

'রাত্রে যখন তাঁর খাবার দিতে গেলে?'

'না। আর কোনও কথাই বলেননি। তখন আমি তাঁকে দেখিওনি, দরজার বাইরে খাবার রেখে চলে এসেছিলুম। তাঁর ঘরের মধ্যে যাওয়ার হুকুম তো আমাদের ছিল না।'

'খাবারটা তিনি খেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। কেষ্ট খানিক পরে গিয়ে থালাটা নিয়ে এসেছিল।'

'আচ্ছা, রাত্রে তোমরা কোথায় শোও?'

'একতলায়—রান্নাঘরের দিকে।'

'কাল রাত্রে কোনওরকম শব্দ-টব্দ কিছু শুনেছিলে?'

'আমাদের তো শুতে-শুতেই একটা হয়।'

'তারপর?'

'না, মনে তো পড়ে না।... হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে একবার যেন কলতলায় জলের শব্দ শুনেছিলুম।'

পশুপতিবাবু ঠাকুরকে এক ধমক দিয়ে বললেন, 'কলতলায় জলের শব্দের কথা কেউ শুনতে চায় না। কোনও চিৎকার-টিৎকার শুনেছিস?'

কিন্তু বেচারা ঠাকুর তো একতলায় কত দূরে শোয়—তার আর দোষ কী? সমস্ত মেসে একজনও এমন কথা বলতে পারলে না যে, গত রাত্রে সে এমন কোনও শব্দ শুনেছে যা কোনও বিপন্ন কি মরণোন্মুখ ব্যক্তির চিৎকার বলে ভুল করা যায়।

আট

পশুপতিবাবু ইন্সপেক্টরকে একটু আড়ালে ডেকে দিয়ে বললেন, 'ওই আনন্দ ছোকরাকে একটু লক্ষ করবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'ছোকরার মতিগতি ভালো নয়।'

'কীরকম শুনি?'

'বড্ড স্বদেশির দিকে ঝোঁক।'

'তাই নাকি?'

'বাসরে, কীসব গরম-গরম বক্তৃতা করে তা যদি শোনেন! বলে কিনা, একজনের বেশি টাকা থাকবে আর-একজনের কম থাকবে—এ না কি দারুণ অন্যায়! যাদের অনেক আছে তাদের টাকা কেড়ে নেওয়া উচিত, এই হল ওর মত। এসব কথা যারা বলে তারা গুণ্ডা ছাড়া আর কী, আপনিই বলুন। বড়লোক-গরিব নিয়েই তো সংসার।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'হুঁ।'

'আমার খুব সন্দেহ হয় যে, এর মধ্যে ওর কোনও হাত আছে। দেখছেন না—আর-সবাই ঘাবড়ে গেছে, অথচ ও দিব্যি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্রিমিনাল না হলে এত সাহস হয়!'

'ও তো বাচ্চা ছেলে, ওর পক্ষে কি...।'

'আপনি পুলিশের লোক হয়ে কী বলছেন, সামন্তমশাই! বাচ্চা ছেলেরাই তো যত অঘটন ঘটায়। ওর ঘরটা অন্তত একবার সার্চ করুন—দেখুন না, কী বেরোয়।'

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'বেশ, চলুন।'

পরমুহূর্তে এক কাণ্ড! সরোজ ছুটে এসে একেবারে ইন্সপেক্টরবাবুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললে, 'স্যার, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন স্যার—আজ বড়বাবুর মেয়ের বিয়ে—আমি ঠিক সময়ে হাজির না হলে ঠিক আমার চাকরি যাবে।'

ইন্সপেক্টরবাবু সরোজকে টেনে তুলে ধরে একটু কঠোরভাবেই বললেন, 'বিয়ে তো রাত্রে, এখন যাওয়ার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

'আজ্ঞে, আমি তো নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছি নে, যাচ্ছি খাটতে। আপিসের সব ক'টি কেরানিই তাই। আজকের দিনের যত কাজ সব আমাদেরই করতে হবে। সবাই যাবে—আর আমি যাব না, তাহলে কি আর বড়বাবু আমাকে আস্ত রাখবেন! কোনও ওজর-আপত্তি শুনবেন না তিনি। এ-বাজারে একবার চাকরি গেলে আর চাকরি হবে না, স্যার না খেয়ে মরব, উপোস করে মরব। আমি মিছে কথা বলছি না, স্যার, বড়বাবুর বাড়িতে টেলিফোন আছে, আপনি এক্ষুনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন। ফোন নম্বর হল...।'

কিন্তু সরোজের কথা শেষ হবার আগেই পশুপতিবাবু প্রচণ্ড গলায় ধমকে উঠলেন, 'চুপ করো, সরোজ। আর-একটি কথা বলবে তো তোমাকে একদম হাজতে পুরে রাখা হবে। ভালো চাও তো চুপ করে বসে থাকো—এখন কোথাও যাওয়া হবে না তোমার।' তাঁর কথার ভাবে মনে হল যেন তিনিই পুলিশের বড় কর্তা।

তবু সরোজ আর-একবার বললে, 'আমাকে যেতে দিন, আমাকে...' কথা সে শেষ করতে পারলে না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আপনি যখন এত করে বলছেন তখন আপনাকে যেতে দেব, কিন্তু তার আগে আপনার ঘরটি একবার সার্চ করব।'

'অ্যাঁ! আমার ঘর! আমার ঘরে কিছু নেই, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি আমার ঘরে কিছু নেই।'

'সে দেখা যাবে।'

এর পরে সরোজ আর-কিছু বললে না, বোধহয় কথা বলবার ক্ষমতাই তার চলে গিয়েছিল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে মেঝের উপরেই সে বসে রইল, থেকে-থেকে তার শরীর কেঁপে উঠতে লাগল, যেন দমকে-দমকে কান্না আসছে।

পশুপতিবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'আগে চলুন আনন্দর ঘরে।' তারপর চেঁচিয়ে আনন্দকে : 'ওহে আনন্দ, ইন্সপেক্টরবাবু তোমার ঘরটি একবার দেখতে চান।'

আনন্দ খুব সপ্রতিভভাবে বললে, 'বেশ তো, বেশ তো, আমার ঘরে আজ বড়লোকের পায়ের ধুলো পড়বে—কত ভাগ্য আমার! ওকে ঘর বললে অবশ্যি বেশি বলা হয়, কেননা সেখানে বাস করে ইঁদুর, আরশোলা আর আনন্দ।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি আনন্দ, একতলার একটা এঁদো অন্ধকার কুঠুরিতে ওর বাসা। জিনিসের মধ্যে ভাঙা একটা তক্তপোশ, কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল আর একটা রংচটা তালা-ছাড়া স্টিল-ট্রাঙ্ক। সার্চ করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। কয়েকখানা বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আর বাংলায় লেখা একখানা লেনিনের জীবন-চরিত—এ ছাড়া আর-কিছুই পাওয়া গেল না।

বাংলা বইটার মলাট লাল। সেটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখে পশুপতিবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'বইটা প্রোসক্রাইবড নয় তো?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'না। চলুন, এবার ওই কেরানিবাবুর ঘরটা দেখা যাক।'

উপরে এসে দেখা গেল সরোজ তখনও মেঝের উপর জবুথবু হয়ে বসে আছে। পশুপতিবাবু হাঁক দিলেন, 'ওহে ওঠো, একবারটি ঘরে যেতে হচ্ছে।'

কলের পুতুলের মতো সরোজ উঠে দাঁড়াল। তার মুখে একফোঁটা রক্ত নেই, ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

পশুপতি বললেন, 'আপনিও চলুন নরহরি-দা।'

নরহরি বললেন, 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, সরোজ? তোমার যে কিছু দোষ নেই তা তো সবাই জানি।'

সরোজ নরহরিবাবুর দিকে এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকাল যে বলবার নয়।

কিন্তু নরহরিবাবুও অবাক হয়ে গেলেন যখন সরোজের ট্রাঙ্কের তলা থেকে পাঁচশো টাকা বেরুল—কড়কড়ে পাঁচখানা একশো টাকার নোট।

'এর মানে?' বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন পশুপতি, 'তুমি মাইনে পাও পঁচিশ টাকা, চালচুলোর খবর নেই, এত টাকা তোমার হাতে কেমন করে এল?'

সরোজ চুপ।

পশুপতি বলতে লাগলেন, 'এর একটা জবাবদিহি তো দিতে হচ্ছে, ভায়া!'

সরোজ জিভ দিয়ে একবার ঠোঁট চেটে বললে, 'সত্যি কথাই বলব, যদিও জানি সে-কথা আপনারা কেউ বিশ্বাস করবেন না।'

'শুনি, শুনি, অবিশ্বাস্যটাই শুনি।'

'টাকাটা আমাকে গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন।'

'কী? কী বললে?'

'গোবিন্দবাবু দিয়েছিলেন। গোবিন্দ চাটুয্যে।'

'তার চেয়ে বললে না কেন আকাশের পরী ঘুমের মধ্যে তোমার বালিশের তলায় রেখে গেছে!'

'বানিয়ে বললে এমন কিছু বলতুম যা লোকে বিশ্বাস করবে। কিন্তু সত্যি বলছি বলেই অবিশ্বাস্য বলতে হচ্ছে।' সরোজ এতক্ষণ একেবারেই নেতিয়ে ছিল, কিন্তু সত্যিকার সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে তার বুদ্ধিসুদ্ধি যেন খুলে গেল।

নরহরিবাবু বললেন, 'আহা, ও যে মিথ্যে বলছে তা তো এখনও প্রমাণ হয়নি। হতেও তো পারে। পৃথিবীতে কত কী আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, আর এই কি হতে পারবে না!'

পশুপতি বললেন, 'আপনি থামুন নরহরি-দা, ক্রাইম হ্যান্ডল করা আপনার মতো ভালোমানুষের কর্ম নয়। কী ব্যাপার খুলে বলো, সরোজ—নয়তো কপালে দুর্ভোগ আছে।'

রণজিৎ সামন্ত এগিয়ে এসে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি ওঁকে জিগ্যেস করছি সবকথা। এ-টাকা আপনাকে গোবিন্দ চাটুয্যে দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধার?'

'না, আমার মতো গরিবকে ধার দেবে কে? আমাকে তিনি দান করেছিলেন।'

'তিনি তো ভীষণ কৃপণ ছিলেন—হঠাৎ এত দয়া কেন হল তাঁর?'

'কেন হল তা আমি কেমন করে বলব?'

'আপনি তাঁর কাছে চেয়েছিলেন?'

'চেয়েছিলুম। অনেকদিন ধরেই চাচ্ছিলুম।'

'কেন?'

'আমার বোনের বিয়ে দিতে হবে—সেইজন্যে।'

'তারপর কবে পেলেন টাকাটা?'

'কাল।'

'কাল কখন?'

'কাল সন্ধেবেলা—আপিস থেকে ফিরে।'

'কী বলে দিলেন তিনি?'

'ব্যাপারটা এইরকম। আমরা অত্যন্ত গরিব। মা বিধবা, এক বোন আছে, তার বিয়ে দেওয়া দরকার। টাকা ছাড়া বিয়ে হয় না। কোথায় পাই টাকা, সবসময় এই আমার ভাবনা। এই মেসে সকলেরই ধারণা যে, গোবিন্দবাবুর অনেক টাকা। সেই ধারণারই বশবর্তী হয়ে আমি অনেকদিন ধরেই গোবিন্দবাবুর কাছে কিছু সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করছিলুম। আজ যেমন আপনার পায়ে ধরেছি তেমনি তাঁরও পায়ে পড়েছি অনেকবার। অনেক কেঁদেকেটে তাঁর মনটা বোধহয় একটু ভিজিয়ে এনেছিলুম।'

পশুপতি এখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তা হলে তুমি তাঁর ঘরে প্রায়ই যেতে?'

'তাঁর ঘরে যেতুম বললে ভুল হয়, মাঝে-মাঝে ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি বটে।'

'কিন্তু এ-কথা তো আগে কখনও বলোনি!'

'কথাটা কি বলবার মতো? বোনের বিয়ের জন্য ভিক্ষের চেষ্টা করছি এ-কথা কি পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াবার মতো?'

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'গোবিন্দবাবুর মন তাহলে একটু ভিজেছিল?'

'আমার তো তা-ই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তিনি বিশ-পঁচিশ কি বড় জোর পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ভিখিরি-বিদেয় করবেন। এদিকে দেশ থেকে মা চিঠি লিখেছেন বোনের একটি ভালো সম্বন্ধ উপস্থিত, কম-সে-কম শ পাঁচেক টাকা হলে শুভকার্য এ-মাসেই হয়ে যেতে পারে। তাই মরিয়া হয়ে ধন্না দিচ্ছিলুম গোবিন্দবাবুর কাছে। কাল সন্ধেবেলা আপিস থেকে ফিরেই গেলুম তাঁর কাছে। ছাদে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখেই মুখ কটমট করে বললেন, "কী চাই?" আমি তাঁর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললুম, "বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এ-যাত্রা আমাকে উদ্ধার না করলে চলবে না।" তিনি প্রথমটায় কিছু বললেন না, তারপর হঠাৎ অদ্ভুত একটু হেসে বললেন, "কত চাই?" আমি ধাঁ করে বলে ফেললুম, "পাঁচশো।" "একটু দাঁড়াও", বলে তিনি ঘরের ভিতর ঢুকলেন, একটু পরেই বেরিয়ে এসে আমার হাতে কয়েকখানা নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "যাও, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকো না।" নিচে এসে আমি অবাক হয়ে দেখি যে, তিনি পাঁচশো টাকাই দিয়েছেন, সত্যি-সত্যি পাঁচশো!'

কথা শেষ করে সরোজ হাঁপাতে লাগল।

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'তখন তাঁর ঘরে কি আলো জ্বলছিল?'

'হ্যাঁ। জ্বলছিল!'

'আপনি ঘরের ভিতরটা দেখতে পেয়েছিলেন?'

'তাঁর দরজা তো সবসময় ভেজানো থাকত।'

'কিচ্ছু দেখেননি? মনে করবার চেষ্টা করুন।'

সরোজ একটু ভেবে বললে, 'তিনি যখন টাকা আনতে ভিতরে যান, তখন ঘরের ভিতরটা আমার একটুখানি চোখে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, ঘরে যেন আর-একজন মানুষ বসে আছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার চোখের ভুল।'

'আচ্ছা, আপনি যখন টাকা চাইলেন তখন তিনি অদ্ভুত একটু হাসলেন, না?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত সে-হাসি। অমন হাসি তাঁর মুখে আমি কখনও দেখিনি।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'মিছিমিছি ওকে জেরা করছেন, ইন্সপেক্টরবাবু, ওর সবকথাই বানানো। ও-টাকাটা গোবিন্দবাবুর সেটা অসম্ভব নয়, কিন্তু তিনি ওকে দান করেছেন এ একেবারেই অসম্ভব। থানায় নিয়ে চলুন, কিল-গুঁতো না খেলে সত্যি কথা বেরোবে না।'

নরহরিবাবু বললেন, 'কেন, ও যা বলছে তা হতেও পারে। আমারও মনে হয় যে, গোবিন্দবাবুর বাইরেটা যতই রুক্ষ হোক, ভিতরের মানুষটা ঠিক ওরকম ছিল না।'

পশুপতি বললেন, 'দেখুন নরহরি-দা, আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, কিন্তু যা বোঝেন না তা নিয়ে কথা বলবেন না দয়া করে। তাহলে ইন্সপেক্টরবাবু...'

কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হল না। ঝড়ের মতো একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বলতে লাগল, 'এ কি সত্যি? যা শুনছি এ কি সত্যি? ...গোবিন্দবাবু...গোবিন্দবাবুকে...কে না কি...খুন করে গেছে!'

শেষের কথাটা চিৎকার করে বলে লোকটি কাঁপতে-কাঁপতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তার চিৎকার এমন অমানুষিক যে, তা শুনে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

নয়

আগন্তুক অপরিচিত। দাড়ি-গোঁফ কামানো সুন্দর চেহারা, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি আর দামি শাল, বেশ একটু বাবুগোছেরই বেশবিন্যাস। দু-তিন মিনিট কেউ যেন ভেবে পেল না তাঁর সঙ্গে কে কথা বলবে, কী কথা বলবে। তারপর পশুপতি গেলেন এগিয়ে। জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কে?'

ভাঙা গলায় আগন্তুক জবাব দিলেন, 'আমি—আমি গোবিন্দবাবুর ভাই, আমার নাম ভুজঙ্গধর।'

'ও—আপনারই আজ আসবার কথা ছিল! আপনিই পোস্টকার্ড লিখেছিলেন!'

'সে-পোস্টকার্ড তিনি কি পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিলেন। তারপর...আজ সকালে উঠে তো আমরা দেখি এই কাণ্ড! কী আর করবেন, মশাই, সবই ভগবানের হাত।' পশুপতি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে থেকে আগন্তুক বলতে লাগলেন, 'দশ বছর দাদার সঙ্গে আমার দেখা হয় না, দশ বছর তিনি দেশছাড়া। আর আজ আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাও এলুম—' হাতের উল্টো দিক দিয়ে তিনি কপালে আঘাত করলেন, তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

ইন্সপেক্টরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এইমাত্র এসে পৌঁছলেন?'

'হ্যাঁ, এইমাত্র।'

'সঙ্গে কোনও জিনিস নেই?'

'আছে বইকী। একটা বিছানা আর স্যুটকেস। সেগুলো নিচেই ফেলে এসেছি। শেয়ালদায় নেমে একটা রিকশ নিয়ে এসেছি এখানে। কাছাকাছি এসেই দেখি চারিদিকে লাল পাগড়ি। দেখে তো আমার চক্ষুস্থির—বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। আমি মানুষটা একটু ভীতু গোছের, তা ছাড়া পাড়াগাঁয়ে থাকি—কোনওরকম হাঙ্গামাই ধাতে সয় না ...আমাকে একগ্লাস জল দিতে বলবেন?'

পশুপতি তৎক্ষণাৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'ওরে কেষ্ট, ওরে কে আছিস, একগ্লাস খাবার জল নিয়ে আয়।'

জল আনা হল। এক চুমুক জল খেয়ে নিয়ে আগন্তুক আবার বলতে লাগলেন, 'রিকশ এসে দরজায় দাঁড়াতেই শুনলুম আশেপাশের লোক কী যেন বলাবলি করছে, তার মধ্যে "খুন" কথাটা স্পষ্ট শুনতে পেলুম। আমি গলা বাড়িয়ে একজনকে জিগ্যেস করলুম, "কী হয়েছে, মশাই?" সে বললে, "গোবিন্দ চাটুয্যে খুন হয়েছে।" সঙ্গে-সঙ্গেই আমার চোখে দিনের আলো নিবে গেল, পায়ের তলা থেকে মাটি গেল সরে। কেমন করে রাস্তায় নেমে, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলুম তা আমি নিজেই জানিনে। দু-একটা লাল পাগড়ি বোধহয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তখন আমার কিছুই খেয়াল ছিল না। ওই দেখুন, রিকশভাড়াটা পর্যন্ত দিতে ভুলে গেছি। আর জিনিসগুলো

রিকশাতেই রয়েছে। দয়া করে ভাড়াটা পাঠিয়ে দেবেন,' বলে ভুজঙ্গবাবু পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগ বের করে একটা চকচকে সিকি টেবিলের উপর রাখলেন। সকলেই লক্ষ করলে যে, ব্যাগটা এতই ভর্তি যে, টাকার চাপে যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

পশুপতি বললে, 'আপনার জিনিসগুলোও উপরে আনতে বলি।'

'কোনও দরকার নেই। আমি পরের ট্রেনেই আবার ফিরে যাব। কলকাতায় যে-জন্য এসেছিলাম তা তো চুকেই গেল।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'একটু বসুন। একটু বিশ্রাম করুন। আপনাকে দিয়ে আমাদের একটু দরকার আছে।'

'আদেশ করুন।'

'আমি এই ব্যাপারটার তদন্তের ভার নিয়েছি। আপনার কাছে গোবিন্দবাবুর ইতিহাস শুনতে চাই, তাতে যদি আমাদের কোনও সাহায্য হয়। আপনি সেটুকু জানেন সেটুকুই বলবেন।'

'নিশ্চয়ই।' ভুজঙ্গধর আর-একঢোঁক জল খেয়ে নিলেন। সকলে চারিদিকে ঘন হয়ে দাঁড়াল। গোবিন্দ চাটুয্যের জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে—সকলেই শুনতে উৎসুক।

ভুজঙ্গধর বলতে লাগলেন, 'আমাদের দেশ জয়নগর লাইনে মোতিঝিল গ্রামে। আমরা দু-ভাই। দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। ছেলেবেলা থেকে দাদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন, আমিও দাদার খুব ভক্ত ছিলুম। বাবা যখন মারা গেলেন আমার বয়েস তখন পঁচিশ। কুসংসর্গে পড়ে, কুলোকের পরামর্শে সম্পত্তি নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধালুম। দাদা অনেক বোঝালেন, অনেক সইলেন, মা-ও প্রাণপণ চেষ্টা করলেন আমার মতি ফেরাতে। হায়, তখন যদি তাঁদের কথা শুনতুম!'

ভুজঙ্গবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করলেন। ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'তারপর?'

'এভাবে কিছুদিন কাটল। তারপর আমি এক ধূর্ত উকিলের সাহায্যে নানারকম আইনের প্যাঁচ কষতে লাগলুম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না—দাদাকে যখন-তখন যা-তা বলতুম, নানারকম অপমান করতুম। তারপর একদিন চরম হল। দাদাকে ঘাড় ধরে বাড়ির বের করে দিলুম। দাদা সেই যে বাড়ির বের হলেন আর ফিরলেন না। আমি একা বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলুম। দাদার শোকে মনমরা হয়ে মা-ও কিছুদিন পর মারা গেলেন। এদিকে আমারও মনে শান্তি ছিল না। যখনি মাথা ঠাণ্ডা হল, কুসংসর্গ ছাড়লুম, অনুশোচনায় হৃদয় জ্বলে যেতে লাগল—হায়, হায়, এ আমি কী করলুম! তারপর আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠল। মনে হল, এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত না-করলে আমি বাঁচব না। তাই আজ এসেছিলুম কলকাতায়—দাদাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বিষয়-সম্পত্তি থেকে এতদিনে যত টাকা তাঁর প্রাপ্য হয়েছে সব নিয়ে এসেছিলুম সঙ্গে—সে-টাকা তাঁকে দেব, তারপর তাঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা আমার কপালে নেই।'

ইন্সপেক্টর জিগ্যেস করলেন, 'বাড়ি ছেড়ে তিনি বেরিয়েছেন কতদিন?'

'তা বছর দশেক হবে।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'ঠিক দশ বছরই তিনি এই মেসে আছেন।'

ইন্সপেক্টর আবার জিগ্যেস করলেন, 'এর মধ্যে তিনি আপনাদের খোঁজখবর নেননি?'

'না। তিনি বোধহয় পণ করেছিলেন বাকি জীবন অজ্ঞাতবাসে কাটাবেন, আমার মুখ আর দেখবেন না—সেজন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না।'

'আপনিও কোনও খবর নেননি?'

'অনেকদিন নিইনি। তারপর মা যখন মারা গেলেন, কলকাতায় এসে খবর নিয়ে জানলুম, তিনি এই মেসে আছেন। কিন্তু দেখা করবার সাহস হল না—কিংবা ইচ্ছে হল না। একটা পোস্টকার্ড লিখে মা-র মৃত্যু সংবাদটা তাঁকে জানিয়ে দিলুম।'

'সে আজ কতদিনের কথা?'

ভুজঙ্গবাবু একটু ভেবে বললেন, 'তা সাত বছর হবে।'

'সে-চিঠির তিনি কোনও জবাব দিয়েছিলেন?'

'না।'

'আর কোনও চিঠি লিখেছিলেন এই দশ বছরে?'

'না।'

'আপনি বললেন যে, আপনার মা-র মৃত্যুর পর কলকাতায় এসে খোঁজ নিয়ে জানলেন· আপনার দাদা এই মেসে আছেন। কার কাছে খোঁজ নিলেন।'

'কেন, তাঁর বন্ধুদের কাছে।'

পশুপতি বলে উঠলেন, 'সে কী কথা! তাঁরও বন্ধুবান্ধব ছিল তা হলে!'

'বলেন কী! ছিল না! তিনি অত্যন্ত দিলদরিয়া মিশুক মানুষ ছিলেন যে!'

এ-কথা শুনে উপস্থিত সকলের মধ্যেই খুব একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। গোবিন্দ চাটুয্যে দিল-দরিয়া মিশুক মানুষ! এমন অসম্ভব কথা কেউ কি ভাবতে পারে!

পশুপতি বললেন, 'তাহলে শেষের দিকে তিনি একেবারে বদলে গিয়েছিলেন, বলতে হয়। আমরা তাঁকে দেখেছি—অত্যন্ত কৃপণ, অতি রুক্ষ মেজাজ, কারও সঙ্গে মেশেন না, কেমন একটা অদ্ভুত খাপছাড়া গোছের মানুষ। এই মেসে তিনি একটা প্রবচন দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।'

আগন্তুক বললেন, 'বুঝেছি। মনের কষ্টে তাঁর ওরকম হয়েছিল। আর সে-কষ্ট আমিই তাঁকে দিয়েছিলুম।'

'তাঁর বন্ধুবান্ধব দু-একজনের নাম করতে পারেন? জিগ্যেস করলেন ইন্সপেক্টর।

'পারব না কেন? অমর ঘোষ, বিপিন মুখার্জি—'

'কোন অমর ঘোষ? অ্যাক্টর?'

হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি।'

'তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধুতা হল কেমন করে?'

'বাঃ, তিনিও যে অ্যাক্টর ছিলেন।'

'অ্যাক্টর ছিলেন? থিয়েটারে অভিনয় করতেন!' পশুপতিবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

'পয়সা নিয়ে করতেন না, শখে করতেন। সেটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান শখ। তাঁর বন্ধুরা বলেন যে, স্টেজে টিঁকে থাকলে তিনি একজন উঁচুদরের অভিনেতা হতে পারতেন।'

'তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্টেজে ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেননি?'

'চেষ্টা কি আর কম করেছেন! কিন্তু আমার উপর রাগ করে সমস্ত জীবনের উপরেই তিনি অভিমান করেছিলেন। বন্ধুবান্ধব এলে শেষটায় আর দেখাও করতেন না। অগত্যা তাঁরা হাল ছেড়ে দিলেন, তাঁর কাছে কেউ আর আসতেন না, তিনি অবশ্য কোনওখানেই বেরোতেন না, ক্রমে লোকে তাঁর অস্তিত্বই ভুলে গেল।'

'তিনি বিয়ে করেছিলেন?'

'না। বিয়ে করলে কি আর নিজের উপর এত নিষ্ঠুর হতে পারতেন!'

হঠাৎ নরহরিবাবু বলে উঠলেন, 'তিনি অ্যাক্টর ছিলেন! তাই বলো! তাই থিয়েটারের কথা উঠলেই তাঁর যা একটু উৎসাহ দেখা যেত।'

'আর তাঁর ঘরেও কয়েকটা নাটকের বই পাওয়া গেছে তা তো জানেন।'

নরহরি বললেন, 'কিন্তু—আমি তো বলতে গেলে থিয়েটারের পোকা, গত বিশ বছর এই কলকাতা শহরের কোনও নাটকই প্রায় বাদ দিইনি। কিন্তু গোবিন্দ চাটুয্যে নামে কোনও অ্যাক্টর তো মনে পড়ে না।'

ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'স্টেজে যে তাঁর ছদ্মনাম ছিল। তাঁর মত ছিল যে, গোবিন্দ নামটা এত সেকেলে যেন স্টেজের মোটেও উপযোগী নয়। তাঁর স্টেজের নাম ছিল মণি দত্ত।'

নরহরি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মণি দত্ত! তাই বলুন। মণি দত্তের অভিনয় আমার মনে আছে বইকী। বছর পনেরো আগে সরস্বতী থিয়েটারে তাঁর কর্ণের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তারপর হঠাৎ মণি দত্তকে আর থিয়েটারে দেখা যায় না। আমি অনেক সময় ভেবেছি যে, লোকটার কী হল। অনেককে জিগ্যেসও করেছি—কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাইনি। কী আশ্চর্য, সেই মণি দত্তই এই গোবিন্দ চাটুয্যে! ...কিন্তু ...মণি দত্ত তো চমৎকার সুপুরুষ ছিলেন!'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চান আমার দাদা দেখতে খারাপ ছিলেন?'

'মুখ-ভরা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, একটা চোখ কানা, কপালে মস্ত আঁচিল—এ চেহারাকে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না।'

ভুজঙ্গধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী জানি পরে হয়তো তিনি ওইরকম দেখতে হয়েছিলেন। আমরা তো তাঁকে ওরকম দেখিনি। হয়তো চোখের কোনও অসুখ করেছিল। দাঁড়ি-গোঁফ ইচ্ছে করেই রেখেছিলেন—এ-মানুষ যে সেই মানুষ সে-কথা নিজেও যেন ভুলে থাকতে পারেন।'

'এই দশ বছরের মধ্যে আপনি কি তাঁকে একবারও দ্যাখেননি?'

'না।'

'তাঁর এখানকার খরচ কী করে চলত অনুমান করতে পারেন?'

'কী করে বলব! হয়তো নিজের কিছু টাকা ছিল, সেটা নিয়ে এসেছিলেন, তাই দিয়েই চালাতেন।'

'খরচও তো ছিল তাঁর মাসে পাঁচ টাকার বেশি না, 'বললেন পশুপতি।'

ভুজঙ্গ বললেন, 'হয়তো বাধ্য হয়েই ওরকম চালে চলতে হত।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'অথচ এখানে এই ভদ্রলোক বলছেন যে, কাল সন্ধেবেলা তিনি এঁকে পাঁচশো টাকা দান করেছিলেন—বোনের বিয়ে দেওয়ার জন্য।'

ভুজঙ্গধর আস্তে-আস্তে বললেন, 'অসম্ভব নয়। তাঁর হাতে টাকা থাকলে তিনি অমনি করেই বিলিয়ে দিতেন, ওইরকমই তাঁর স্বভাব ছিল। আপনারা তাঁকে যত কৃপণ বলেই জানুন, আসল মানুষটা ছিলেন একেবারে উল্টো।'

সরোজ বললে, 'আমি হলফ করে বলছি এ-টাকা আপনার দাদা আমাকে দান করেছিলেন। আপনি যদি ফেরৎ চান এক্ষুনি ফেরৎ দেব, কিন্তু আমি যা বলছি তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়।'

ভুজঙ্গ বললে, 'আমি তো আপনার কথা অবিশ্বাস করছি না। আর আপনার টাকা আমি কেন ফেরৎ নেব? দাদাকে অনেক ঠকিয়েছি, তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় কাউকে কিছু দিয়ে থাকেন সেটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

ইন্সপেক্টর বললেন, 'কিন্তু আপনি যা বলছেন সে-অনুসারে তো তাঁর হাতে পাঁচশো টাকা থাকবার কথা নয়। যিনি পয়সার অভাবে অত কষ্ট করে থাকতেন, তাঁর পক্ষে অত টাকা দান করা কি সম্ভব?'

'অসম্ভব কেমন করে বলব? তাঁর হাতে ঠিক কত টাকা ছিল তা তো আমি জানি না, হয়তো ছিল কিছু টাকা।'

নরহরিবাবু ভুজঙ্গধরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আপনাদের দু-ভাইয়ের চেহারায় একটু মিল নেই। শুধু কপালের কাছটায় একটু যেন মেলে।'

পশুপতি বললেন, 'কিন্তু গলার স্বর একেবারে একরকম, তাই নয়?'

ভুজঙ্গধর ক্লান্তভাবে বললেন, 'ভাইয়ে-ভাইয়ে ওরকম হয়।'

দশ

রণজিৎ সামন্ত বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ, ভুজঙ্গবাবু। আপনি যেরকম সরলভাবে সমস্ত ঘটনা বললেন তা আমার সত্যি খুব ভালো লাগল। এখন চলুন, আপনার দাদাকে একবার দেখে আসবেন।'

এ-কথা শুনেই ভুজঙ্গবাবুর মুখ যেন এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠল। অতি কষ্টে তিনি বললেন, 'আমার যাওয়া কি...একান্তই দরকার?'

'চলুন, একটু দেখবেন।'

'চলুন।' ভুজঙ্গবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে নরহরিবাবুর মনে হল যে, দুঃখময় হতাশার এমন মূর্তি তিনি কখনও দ্যাখেননি। ভুজঙ্গবাবুর চেহারা সত্যি ভালো; কিন্তু তাঁর নিখুঁত করে আঁচড়ানো চুল আর অমন পরিপাটি সাজসজ্জার ভিতর দিয়েও তাঁকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত, এমন দুঃখী দেখাচ্ছিল যে শুধু নরহরিবাবুর নয়, উপস্থিত অনেকেরই মৃত ব্যক্তির চাইতে এই অনুতপ্ত দোষী ভাইটির জন্য কষ্ট হচ্ছিল বেশি।

ইতিমধ্যে চাকর ভুজঙ্গবাবুর বিছানা আর স্যুটকেস ওই ঘরেই এনে রেখেছিল। সেদিকে হঠাৎ চোখ পড়ে ইন্সপেক্টরবাবু বলে উঠলেন, 'বাঃ! আপনার স্যুটকেশটা ভারি নতুন ধরনের তো!'

'হ্যাঁ, এটা নতুন কিনেছিলুম। আর এটাতে ভরে কী এনেছিলুম, জানেন? দাদার জন্যে কাপড়-চোপড়। এই দেখুন—' বলে ভুজঙ্গবাবু চাবি বের করে স্যুটকেস খুলে ফেললেন। ভিতরে দেখা গেল, পর-পর ভাঁজ করা অনেক কাপড়-জামা—দামি-দামি তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, গরম জামা—সবই আনকোরা নতুন। সেগুলোর উপর আস্তে একবার হাত বুলিয়ে ভুজঙ্গবাবু বললেন, 'এই ক'বছরে যত পুজোর কাপড়, ষষ্ঠির কাপড় দাদার পাওয়া উচিত ছিল, সব একসঙ্গে কিনে এনেছিলুম, তা ছাড়া জামাও অনেকগুলো। ভেবেছিলুম তিনি ক্ষমা করবেন, ফিরে আসবেন। কিন্তু..।' ভুজঙ্গবাবুর কথা শেষ হতে পারল না, তাঁর গলা আটকে এল, টপটপ করে কয়েক ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ল।

একটু চুপ করে থেকে রণজিৎবাবু বললেন, 'চলুন তা হলে একবার উপরে। আপনিও চলুন ম্যানেজারবাবু—আর নরহরিবাবু, আপনিও আসতে পারেন।'

উপরে যাবার সিঁড়ির কাছে হঠাৎ দেখা গেল চঞ্চলকে।

রণজিৎবাবু বললেন, 'চঞ্চল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'এখানেই তো ছিলুম।'

রণজিৎ চেঁচিয়ে বললেন, 'আপনারা এগোন, আমি আসছি।' তারপর চঞ্চলের সঙ্গে চুপিচুপি মিনিট দুয়েক কী কথা বললেন। তিনি যখন উপরে এলেন, চঞ্চলও এল তাঁর সঙ্গে।

ঘরে ঢুকে দাদার বীভৎস মৃতদেহ দেখে ভুজঙ্গবাবু একেবারে আকুল হয়ে পড়লেন। দু-হাতে মুখ ঢেকে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন তিনি, তাঁর অবস্থা দেখে নরহরিবাবুরও চোখে জল এল।

ইন্সপেক্টরবাবু বলতে লাগলেন, 'অত অধীর হবেন না, ভুজঙ্গবাবু, একটু ধৈর্য ধরুন, একটু শান্ত হবার চেষ্টা করুন।'

কিন্তু ভুজঙ্গবাবু আরও ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। খানিক পরে অনেক চেষ্টা করে বললেন, 'আমি এখন যাই। এ-দৃশ্য আমি আর সইতে পারিনে।'

'আর একটু অপেক্ষা করুন। অন্যরকম একটা দৃশ্য দেখে যান,' বলে ইন্সপেক্টর চঞ্চলকে কী ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চঞ্চল যে-কাণ্ড করল তাতে নরহরি আর পশুপতি দুজনেই হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ বাধা দেওয়ার আগেই চঞ্চল মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে মৃতদেহের গাল থেকে দাড়িগুলো পটপট করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল, তারপর ঘরের কোণ থেকে জলের বালতি, সাবান আর স্পঞ্জ নিয়ে এসে (এগুলি সে আগেই এনে রেখেছিল) মৃতদেহের

মুখের উপর খুব জোরে স্পঞ্জ ঘষতে লাগল। উড়ে গেল কপালের আঁচিল, কানা চোখ ভালো হয়ে গেল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে দাড়ি-গোঁফ-কামানো সুশ্রী একটি মুখ ফুটে উঠল, তাতে নিষ্ঠুর মৃত্যুর চিহ্ন তখনও স্পষ্ট, কিন্তু তাকে গোবিন্দ চাটুজ্যের মুখ বলে চেনবার কোনও উপায়ই আর নেই।

নরহরি আর পশুপতি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখলেন।

আর ভুজঙ্গ?

তাঁর মুখ ততক্ষণে মৃত ব্যক্তির মুখের চেয়েও বীভৎস হয়ে উঠেছে। বড়-বড় চোখ যেন সমস্ত কপাল থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। একবার তিনি দরজার দিকে তাকালেন—দরজা থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত আগাগোড়া লাল-পাগড়িতে ভরা। আর একবার তাকালেন অন্যদিকে। ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্তর কঠোর দৃষ্টি তাঁর মুখের পর পড়ল।

ইন্সপেক্টরবাবু খুব স্পষ্ট উচ্চস্বরে বললেন, 'দেখুন আপনারা, এই আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি আপনাদের চির পরিচিত গোবিন্দ চাটুয্যে; আর মেঝের উপর মরে পড়ে আছে তাঁর ভাই ভুজঙ্গধর। কাল রাত্রে গোবিন্দ চাটুয্যে তাঁর ভাইকে এই ঘরে গলা টিপে মেরে ফেলেন—গোবিন্দবাবুর সাধ্য থাকে তো এর প্রতিবাদ করুন।'

এই কথাগুলি শুনে নরহরি আর পশুপতির শরীর যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হল, আর ইন্সপেক্টরবাবু যাঁকে গোবিন্দবাবু বলে সম্বোধন করলেন তিনি কাঁপতে-কাঁপতে মেঝের উপর বসে পড়ে হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকলেন।

ইন্সপেক্টর রণজিৎ সামন্ত বলতে লাগলেন ঃ

'গোবিন্দবাবু, আপনার অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিল। মেসে হঠাৎ এসে যখন ঢুকলেন তখন থেকে এ-ঘরে এসে মৃতদেহ দেখে কেঁদে ওঠা পর্যন্ত সবই অতি নিখুঁত হয়েছে। আপনি যে অতি নিপুণ অভিনেতা তা আপনি বলে না দিলেও আমরা বুঝতে পারতুম। আর আপনি যে কায়দা করে আপনার ব্যাগের টাকা আর নতুন স্যুটকেসের নতুন জামাকাপড়গুলি আমাদের দেখিয়ে দিলেন তার জন্যেও আপনাকে বাহবা দিই। আপনি ভেবেছিলেন যে, ওরকম করেই সন্দেহের হাত এড়াতে পারবেন। হয়তো পারতেন, কিন্তু তার আগেই আমি একটা আবিষ্কার করে ফেলেছিলুম, যেটা আপনার পক্ষে মারাত্মক। প্রথম যখন আমরা এ-ঘরে আসি তখন আমি মৃতদেশের মুখে হাত দিতেই অল্প একটু রং আমার আঙুলে লেগে গিয়েছিল। আমি লক্ষই করিনি, এই চঞ্চলই সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আপনার মেক-আপ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়, কিন্তু একটা জায়গায় রংটা একটু কাঁচা ছিল। অবশ্য আঙুলে ওই একটু রঙের দাগ আমরা হয়তো গ্রাহ্য করতুম না, কিন্তু চঞ্চল কলতলায় গিয়ে দেখল, একটা ঘটির গায়েও একটু রং লেগে আছে। ঠাকুর বলেছিল, অনেক রাত্রে সে কলতলায় জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। আপনি তখন এই পৈশাচিক কর্ম সেরে হাত ধুচ্ছিলেন। তারপর আপনি ঘর ছেড়ে যাওয়ার সময় আলো নেবাতে ভুলে গিয়েছিলেন, দেখা গেল আলোটা অত্যন্ত বেশি উজ্জ্বল। এতটুকু ঘরে একশো পাওয়ারের আলো দিয়ে গোবিন্দ চাটুয্যের কী দরকার? আবার অত্যন্ত দামি একটি আয়নাই বা কেন? বাক্সে নাটকের বই, থিয়েটার সম্বন্ধে আলাপে উৎসাহ। এতে কী বোঝা গেল? এককালে হয়তো থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। হয়তো তিনি অভিনেতা ছিলেন। তা হলে মেক-আপের বিদ্যে নিশ্চয়ই তাঁর জানা আছে। যদিও আপনার রং-তুলি ইত্যাদি সরিয়েছিলেন, কিন্তু আয়নাটা ছিল, একশো পাওয়ারের আলো ছিল। গোবিন্দবাবুর চেহারাটা অতি বিকট, কিন্তু সেটা তাঁর সত্যি চেহারা তো? যেরকম রহস্যময় মানুষ, হয়তো কোনও কারণে অজ্ঞাতবাস করছেন, হয়তো ও-মুখ তাঁর মুখই নয়, মেক-আপ করা মুখোস। নকল দাড়ি পরে, নকল আঁচিল বসিয়ে, নকল কানা চোখ নিয়ে আছেন। সেইজন্য ঘরের মধ্যে কাউকে ঢুকতে

দেন না, ঠাকুর-চাকরকেও না। কখনও স্নান করেন না তাও একই কারণে। সবসময় মেক-আপ করে সেজে থাকা কষ্টকর, শুনতে অসম্ভব শোনায়, কিন্তু ওটাই তাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। কেমন, তা-ই নয়?'

গোবিন্দবাবু মুখ তুলে একবার তাকালেন, তারপর আবার চোখ নামালেন।

'তারপর এই খুনের ব্যাপার। আপনার ভাই আসবে এই খবর কাল পেয়েছিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়ার ব্যবস্থা রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে সে কাল বিকেলেই এসে পড়েছিল, মেসের কেউ তা লক্ষ করেনি। সরোজবাবু যখন সন্ধেবেলা আপনার কাছে টাকা চাইতে যান, তখন ঘরে আপনার ভাই বসে ছিল—কেমন, তা-ই নয়? সরোজবাবু তাঁকে দেখেছিলেন, কিন্তু আপনার ঘরে অন্য লোক থাকা এতই অসম্ভব যে, তিনি সেটা চোখের ভুল মনে করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সরোজবাবুকে পাঁচশো টাকা আপনি কেন দিয়েছিলেন আপনিই জানেন। আবার তারই কয়েক ঘণ্টা পরে আপনার মায়ের পেটের ভাইয়ের বুকের উপর চড়ে বসে গলা টিপে তাকে হত্যা করলেন কেন তাও আপনিই বলতে পারবেন। মৃতদেহের মুখ ঠিক নিজের মুখের মতো করে মেক-আপ করলেন, তাকে পরালেন নিজের জামা-কাপড়, তারপর কলতলায় হাত ধুয়ে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন। তারপর নতুন জামা-কাপড়-জুতো কিনলেন, চুল ছাঁটালেন, নতুন স্যুটকেসে নতুন কাপড় ভরে, নতুন হোল্ডলে নতুন বিছানা বেঁধে গোবিন্দবাবুর ভাই ভুজঙ্গধর সেজে এসে উঠলেন এই মেসে। ভাইয়ের আজ সকালেই আসবার কথা, সুতরাং কেউ কিছু সন্দেহ করত না। আর যারা আপনার মেক-আপ করা মূর্তি শুধু দেখেছে তাদের পক্ষে অবশ্য আপনাকে দেখে চেনা একেবারেই অসম্ভব। মৃতদেহের মেক-আপও পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ত না—দাড়িটা আসল না নকল তার বিচার করা পোস্টমর্টেমের উদ্দেশ্য নয়। আপনার সব চালই ঠিক হয়েছিল, তবু ধরা পড়ে গেলেন। নেহাৎই দৈবক্রমে, বলতে পারেন। আমার হাতে একটুখানি রং লেগে না গেলে এদিকে আমার কল্পনাই কখনও যেত না। আর, একবার যখন ওরকম একটা সন্দেহ হল তখন দেখলুম পর-পর সব মিলে যাচ্ছে—আয়না, জোরালো আলো, নাটকের বই, আপনার পরনে নতুন জামাকাপড়, আপনার অতি চমৎকার কথাবার্তা, নিখুঁত অঙ্গভঙ্গি—জানেন, আপনার কথা শুনতে-শুনতে আমার ঠিক মনে হচ্ছিল নাটক দেখছি। অনেকদিন স্টেজে নামেন না বটে, কিন্তু আপনার শক্তি লোপ পায়নি, আজ যা অভিনয় করলেন আমি তো তা ভুলতে পারব না। গোবিন্দবাবুর ভাই বলে যিনি পরিচয় দিচ্ছেন তাঁর যে কপালের কাছটায় গোবিন্দবাবুর সঙ্গে মিলবে আর গলার স্বর একেবারেই একরকম হবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, কিন্তু এও ভাবতে হল যে, গোবিন্দবাবুর মুখ তো কপাল বাদ দিয়ে দাড়ি-গোঁফেই ঢাকা, অন্য কোথাও মিললেই বা বোঝা যাবে কেমন করে?

আমার যা বলবার তা তো বললুম। এখন আপনি বলুন, গোবিন্দবাবু, কেন এই নৃশংস কাণ্ড করতে গেলেন।'

এগারো

গোবিন্দ চাটুয্যের জবানবন্দি ঃ

'হাতকড়া? না, দরকার নেই। আমি পালাব না। আমি ফাঁসি যাব। বাঁচবার চেষ্টা করেছিলুম। তা যখন ব্যর্থ হল তখন আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন মরলেই বাঁচি।

'ভুজঙ্গধর সেজে আপনাদের যা বলেছিলুম তার অনেক কথাই সত্যি। আমাদের গ্রামের নাম ঠিকই মোতিঝিল। সত্যিই আমরা দু-ভাই। ভুজঙ্গ ছোট। বাবা মারা গেলেন অনেক টাকা রেখে।

সে-টাকায় আমাদের দু-ভায়েরই সমান অংশ। কিন্তু আমার মাথায় দুর্বুদ্ধি চাপল, আমি ওকে ঠকিয়ে সব টাকা মেরে দিলুম। কেমন করে ঠকালুম সেসব না-ই বা শুনলেন।

'ভুজঙ্গ ছিল মিনিমুখো ভালোমানুষ। আমাকে কিছু বললে না, অভিমান করে চলে গেল আসামে চায়ের বাগানে চাকরি নিয়ে। মা-ও আমার উপর রাগ করে গেলেন ওর সঙ্গে। একা বাড়িতে বসে-বসে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, এ কী করলুম! সুখের সংসার ছারখার করে দিলুম!

'ভুজঙ্গকে চিঠি লিখলুম ফিরে আসতে। সে জবাব দিলে না। মাকে লিখলুম, তিনিও নীরব। তখন নিজের উপর ধিক্কার এল, তীব্র অনুশোচনায় হৃদয় জ্বলতে লাগল। কলকাতায় এসে কুসংসর্গে পড়ে অনেক টাকা ওড়ালুম। কিন্তু মন কিছুতেই শান্ত হয় না।

'হ্যাঁ—আমার থিয়েটারে শখ ছিল, এককালে ছিলুম নামজাদা অভিনেতা। তা ছাড়া মেক-আপে আমার হাত খুব ভালো ছিল। টিঁকে থাকলে লন চ্যানির জুড়ি হতে পারতুম। আর-একটা শখ আমার ছিল—তাসের ব্রিজখেলা। একবার সমস্ত কলকাতার চাম্পিয়ন হয়েছিলুম, আমার জুড়ি ছিল অ্যাক্টর অমর ঘোষ।

'সেসব দিন আমার কী সুখেই কেটেছে! কিন্তু ভাইকে ঘরছাড়া করবার পর থেকে আমার মনে আর সুখ ছিল না। কোনও ভালো কাজে মন দিতে পারিনে—নিতান্ত বাজে খেয়ালে পয়সা ওড়াই। এভাবে যখন প্রায় অর্ধেক টাকা উড়িয়ে দিয়েছি তখন মনে হলো আর না! আর যা আছে রেখে দেব ভুজঙ্গের জন্য; যদি কোনওদিন ও আমাকে ক্ষমা করে, যদি কোনওদিন ফিরে আসে তা হলে ওর হাতে তুলে দেব।

'পাপ করেছিলুম, এবার শুরু হল তার প্রায়শ্চিত্ত। উঃ, কী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন! মেক-আপ করে মুখটা যথাসম্ভব কুৎসিত করে উঠলুম এসে এই মেসের চারতলার চিলেকোঠায়, আমার সুন্দর মুখ আমাকে যেন সবসময় ব্যঙ্গ করত—যার অন্তর অত নোংরা, তার মুখ সুন্দর হওয়া কি উচিত? আমার বাইরের চেহারা আমার ভিতরের চেহারার মতোই ভয়াবহ হবে এই ছিল আমার পণ। আয়নায় নিজের বিকট মূর্তি দেখে খানিকটা যেমন ভালো লাগত। যতদিন প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ না হয়, এই আমার ছদ্মবেশ। এর জন্য কী কষ্টই না আমি করেছি! দশ বছরের মধ্যে একটা দিন ভালো করে নাইতে পারিনি। কারও সঙ্গে মিশতে পারিনি, কথা বলতে পারিনি, আমার অভিশপ্ত শুষ্ক জীবন নিয়ে একা পড়ে রয়েছি ওই চারতলায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল, জগতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকল। বেঁচে মরে থাকা কাকে বলে তা বেশ ভালো করেই বুঝলুম।

'আমি, গোবিন্দ চাটুয্যে, অ্যাক্টর মণি দত্ত, একদা যে দু-হাতে টাকা উড়িয়েছি, আমি অকস্মাৎ ঘোরতর কৃপণ হয়ে উঠলুম। মনে হত, একটা পয়সা বাঁচলে ভুজঙ্গের একটা পয়সা বাড়ল। গল্প নয়—সত্যি আমার মাসিক খরচ পাঁচটাকার বেশি ছিল না। টাকাগুলো সব নিজের কাছেই রাখতুম—ব্যাঙ্কে রাখতুম না, হঠাৎ মরে গেলে ভুজঙ্গ হয়তো সে টাকা আর খুঁজে পাবে না। তা ছাড়া কোনওদিন নিজে ওর হাতে সব টাকা তুলে দেব এও আমার একটা ইচ্ছে ছিল।

'একদিন ভুজঙ্গর একটা পোস্টকার্ড এল—মা মারা গেছেন। সুদ্ধু এই খবরটি—আর কিচ্ছু না। এই মেসের ঠিকানা আমিই অবশ্য ওকে জানিয়েছিলুম।

'বুঝলুম, মা আমাকে ক্ষমা না করেই চলে গেলেন। ভাইও পাষাণ। ক্রমে আমার অন্তর—মন সবই যেন বদলে যেতে লাগল। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে উঠলুম—হবই না বা কেন? এই পৃথিবীর আমি কে, এই জীবনের সঙ্গে কোনওখানে আমার একটা বন্ধন নেই। আত্মহত্যা করতে পারতুম—তা যে করিনি সুদ্ধ এই আশায় যে, হয়তো কোনওদিন আবার ভুজঙ্গর সঙ্গে দেখা হবে, হয়তো শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ক্ষমা করতে পারবে।

'কিছুদিন আগে অত্যন্ত অনুনয় করে তাকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম একবার আসতে। কাল

সকালে হঠাৎ পোস্টকার্ড পেলুম, সে সত্যি-সত্যি আসছে। মন আনন্দে নেচে উঠল। এতদিনের অভিমান তা হলে ভাঙল। কালকের দিনটা যে কী রকম একটা অধীর আগ্রহে কাটিয়েছি তা কাউকে বোঝাতে পারব না।

'আজ সকালে আসবার কথা, হঠাৎ কাল সন্ধ্যার একটু আগেই সে এসে হাজির। মুগ্ধ চোখে তার দিকে রইলুম চেয়ে। সে আমাকে দেখে বললে, "দাদা, তুমি ওরকম চেহারা করেছ কেন?" আমি বললুম, "তোর জন্যে।"

'একটু পরেই সরোজবাবু গেলেন আমার কাছে টাকা চাইতে। দিয়ে দিলুম তাঁকে পাঁচশো টাকা। মনে-মনে বললুম, "ওরে গোবিন্দ, আজ থেকেই তোর নবজীবন শুরু হোক। কাল থেকেই তো তুই মুক্ত। কাল থেকে তুই আবার মানুষ, আবার জীবন্ত। সমস্ত পাপের বোঝা এবার নামিয়ে দেব। ভুজঙ্গকে সব টাকা গছিয়ে দিয়ে আমি আমার পথ ধরব, যে পথ মুক্তির, যে পথ আনন্দের।"

'ভুজঙ্গ অনেক ভালো-ভালো খাবার নিয়ে এসেছিল। ও তা-ই খেল। আমি মেসের খাবারই খেলুম। অনেকদিন ভালো খেয়ে অভ্যেস নেই, হয়তো হঠাৎ সইবে না, এই মনে করে ভুজঙ্গের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও ও যা এনেছিল তার কিছুই খেলুম না, খাওয়ার পর আলো নিবিয়ে ওকে আমার প্রাণের সব কথা খুলে বললুম। ও বললে, "দাদা, কালই আমি চলে যাব, তুমিও যাবে তো আমার সঙ্গে?" আমি বললুম, "পাগল। আমি কাল, থেকে মুক্ত। আর আমি তোদের জড়াব না, তোরাও আমাকে আর জড়াসনে।" তবু সে বার-বার বলতে লাগল, "না, দাদা, তোমাকেও যেতে হবে। তুমি আমার কাছেই থাকবে এখন থেকে।" আমি হেসে বললুম—কতকাল পরে যে একটু হাসলুম,—"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে।"

'ওই ছোট্ট ঘরে মেঝেতে বিছানা পেতে দুজনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়লুম। ও বিছানা আনেনি, আমার বিছানা ওকে দিলুম, আমি পড়ে রইলুম মাদুরে। অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে শুনি ভুজঙ্গ অঘোর ঘুমে গভীর নিশ্বাস ফেলছে। মনে-মনে বলতে লাগলুম—কাল থেকে আমার নতুন জন্ম, কাল থেকে আমার নতুন জন্ম! আহা, যদি একেবারে নতুন হতে পারতুম, একেবারে নতুন হয়ে জন্মাতে পারতুম! এমন যদি হত যে গোবিন্দ চাটুয্যে বলে কেউ আর রইল না, অথচ আমি রইলুম, তা হলে কী চমৎকারই হত! ওই তো ভুজঙ্গ কেমন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আমি যদি ভুজঙ্গ হতে পারতুম—যে কখনও কোনও অন্যায় করেনি, যার মনে কোনও পাপ নেই! তা কি সম্ভব হয় না? কোনওরকমেই সম্ভব হয় না?

'কথাটা ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল, আমি মাদুরের উপর উঠে বসলুম। তারপর হঠাৎ আমার মাথায় এই বুদ্ধি এল। এর চেয়ে সহজ কিছুই নয়। মা মারা গেছেন, ভুজঙ্গ বিয়েও করেনি, আমাদের নিকট কোনও আত্মীয়ও আর নেই—কে জানবে যে, আমি ভুজঙ্গ নই! কে জানবে? কেউ না। এ আমার একরকম আত্মহত্যা—অদ্ভুত আত্মহত্যা বলতে পারেন। গোবিন্দ চাটুয্যেকে আমি হত্যা করব, তার নাম মুছে দেব জগৎ থেকে—কাল থেকে আমি, ভুজঙ্গধর চাটুয্যে, নির্মল নিষ্পাপ মুক্ত জীবনের অধিকারী হব। আনন্দে, উত্তেজনায়, নিষ্ঠুর সংকল্পে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল।

'তবু আমি অনেকক্ষণ ঘুমন্ত ভুজঙ্গের পাশে চুপ করে বসে রইলুম। হঠাৎ ঢং-ঢং করে কোথায় দুটো বাজল, সেই শব্দে চমকে উঠলুম। না—আর তো দেরি করা চলে না—রাত যে ফুরিয়ে এল। তখন আমি আস্তে-আস্তে উঠে ভুজঙ্গর বুকের উপর চেপে বসলুম। ঘুমের মধ্যে সে গোঁ-গোঁ করে উঠল। তারপর দু-হাতে তার গলা টিপে ধরলুম শক্ত করে। আমার গায়ে যত শক্তি আছে সব নেমে এসে ভর করল আমার দশটি আঙুলে। বড়-বড় বিকট চোখ মেলে সে তাকাল— সে কি ওই অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পেরেছিল? পেরেছিল নিশ্চয়ই। তখন তার মুখে যন্ত্রণায়, আতঙ্কে, ঘৃণায়, অভিযোগে মেশা যে ভীষণ ভাব ফুটে উঠেছিল তা আমি নরকে গিয়েও ভুলব না।

'অনেকক্ষণ সে গোঁ-গোঁ করল, ধস্তাধস্তি করার চেষ্টা করল, কিন্তু আমার দশটি আঙুলের একটিও মুহূর্তের জন্য শিথিল হল না। তারপর আস্তে-আস্তে তার ছটফটানি কমে এল—খানিক পরে হঠাৎ একটা গভীর ভীষণ দীর্ঘশ্বাস পড়ল—তারপর চুপ।

'তখন আমি উঠে আলো জ্বালালুম। এতদিন নিজের মুখ যা দিয়ে কুৎসিত করে রেখেছি, সেই সব দিয়ে সাজালুম ওর মুখ। সেই দাড়ি, সেই আঁচিল, সেই কানা চোখ, সেই লম্বা-লম্বা আলুথালু চুল। কাজটি শেষ করতে পুরো একটি ঘণ্টা লাগল। নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা হল ওর মুখ—গোবিন্দ চাটুয্যের মুখ—কোনওখানে খুঁত নেই। তারপর আমার এই হেঁটো ধুতি আর খাটো পাঞ্জাবি ওকে পরালুম—আমি পরলুম ওর জামাকাপড়।

'মৃত গোবিন্দ চাটুয্যে পড়ে রইল ঘরে, জীবন্ত ভুজঙ্গধর নিচে নেমে এসে কলতলায় হাত মুখ ধুল, তারপর রাস্তায়। ওকে রেখে এলুম মেঝেতে শুইয়ে যতদূর সম্ভব বীভৎস ভঙ্গিতে, বিছানাটা এক কোণে গুটিয়ে রাখলুম, তার মধ্যে রইল আমার এতদিনের অদ্ভুত প্রসাধনের সঙ্গী দামি আয়নাটি। মুখের ওপর ছবি আঁকার কাজ রাত্তিরেই করতে হত, তাই আলোটা ছিল খুব জোরালো—সেটা নেবাতে ভুলে গিয়েছিলুম, এখন মনে পড়ছে।

'আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ, আজ থেকে আমি ভুজঙ্গ। কী আরাম, কী শান্তি!

'আমার রং-তুলির পুঁটলিটা হাতে করে নিয়ে বেরিয়েছিলুম, খানিকটা এসে সেটা ফেলে দিলুম একটা ডাস্টবিনে। বলতে ভুলেছি—টাকা-পয়সা সব সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলুম। ও-টাকা তো ভুজঙ্গর, আমিই তো ভুজঙ্গ। রাস্তায় ঘোরাঘুরি করে রাত কাটিয়ে দিলুম। ভোর হল, লোকজনের চলাচল শুরু হল। কাছাকাছি একটা ভালো হোটেলে গিয়ে উঠলুম। ডিম-রুটি দিয়ে চা খেলুম ভদ্রলোকের মতো। কতদিন পরে মানুষের মতো খাওয়া জুটল। তারপর বেরিয়ে রাশিরাশি, জামা-কাপড়, গরম জামা, শাল, বিছানা, বালিশ, হোল্ডল, স্যুটকেস সব কিনলুম। আর তো আমি হাড়কিপটে গোবিন্দ চাটুয্যে নই—আমি ভুজঙ্গধর, আমি মানুষ, এখন থেকে মানুষের মতো বাঁচব। নাপিতের দোকানে গিয়ে চুল ছাঁটালুম, দাড়ি কামালুম। হোটেলে ফিরে এসে গরম জলে ভালো করে স্নান করলুম—দশ বছর পরে এই আমার প্রথম স্নান, জলের স্পর্শে সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। আহা—যে-কোনও অভাজন যেসব সুখ থেকে বঞ্চিত নয়, আমি তা থেকে বঞ্চিত ছিলুম কোন প্রাণে! কিন্তু আর না— আর না— গোবিন্দ চাটুয্যে মরে গেছে, আমি ভুজঙ্গধর, আজ থেকে আমার মানুষের মতো জীবন-যাপন, জিনিসপত্র নিয়ে একটা রিকশ করে গেলুম শেয়ালদা স্টেশনে, সেখান থেকে আর-একটা রিকশ নিয়ে এই মেসে।

'এখানে আবার না এলেই হত, স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়ি ধরে যে-কোনও জায়গায় চলে গেলেই হত। কিন্তু এলুম কেন জানেন? আমি যে গোবিন্দ চাটুয্যে নই, আমি যে ভুজঙ্গধর, সেটা নিজের কাছে এবং সকলের কাছে প্রমাণ করবার জন্যে। আজ সকালে এই মেসে ভুজঙ্গর আসবার কথা। সে এল। সুন্দর চেহারা তার, চমৎকার ভদ্রলোক সে, পরিপাটি ফিটফাট তার সাজসজ্জা। তারপর তো আপনারা জানেন।

'ইন্সপেক্টরবাবু, আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ, আপনারা আমাকে দয়া করে দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না। আর বিচারের ব্যাপারটা যথাসম্ভব সংক্ষেপে করবেন। যদি আজই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে পারতুম, তা হলে খুশি হতুম। বাঁচবার শেষ চেষ্টা করলুম, তা ব্যর্থ হল, এখন আর আমার বাঁচবার ইচ্ছে নেই। এখন আমি মরলেই বাঁচি।... আচ্ছা ইন্সপেক্টরবাবু, ফাঁসিতে খুব কি লাগে?'

হায়নার দাঁত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

এক

জীবনে ছোট-ছোট তুচ্ছ ঘটনা দিয়েই বৃহৎ নাটকের শুরু হয়। মনীষীরা বলেন, একটি সুতোকে কেন্দ্র করে যেমন মিছরির কুঁদো দানা বাঁধে, নাটকও তেমনি একটি প্রধান ভাবকেন্দ্রে লক্ষ্য স্থির রেখে অল্পে-অল্পে দানা বেঁধে উঠবে। সেই কেন্দ্রটি বা সুতোটি থাকে নাট্যকারের হাতে। জীবনেও তাই। তফাতের মধ্যে, এর সুতোটা ধরে থাকেন ভগবান বা অদৃষ্টদেবতা—যা-ই বলুন না কেন, বিরাট একটা শক্তি—তাই, সে-নাটক আরও জমাট হয়ে ওঠে।

এমনটা আর কার জীবনে কতটা হয় কে জানে, নলিনাক্ষর জীবনে অন্তত বারবারই ঘটছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা, সামান্য দু-একটা কথার টুকরো দিয়েই শুরু। কিন্তু তারপর? কী বিপজ্জনক নাটকই না অভিনীত হতে থাকে!

সেদিনের কথাটা আজও মনে আছে ওর।

দুপুরবেলা আপিস যাচ্ছিল। দুটোয় পৌঁছবার কথা, আড়াইটেয় পৌঁছলেও দোষ নেই। খবরের কাগজটা বড় ঠিকই, তবে তার বৃহত্তর কর্মকাণ্ডর সঙ্গে ওর কোনও যোগ নেই। অর্থাৎ খবর অনুবাদ করতে হয় না। এমনিতেই কাজ কম, পৃষ্ঠাসংখ্যা কমেছে অনেক, যা আছে তারও সবটাই মূল্যবান বিজ্ঞাপনে ভরে যায়; অসার সংবাদ দিয়ে ভরাতে হয় না। নলিনের কাজ কলম লেখা—এখন সম্প্রতি একটু প্রমোশন পেয়েছে। এক-আধদিন সম্পাদকীয় লেখারও ভার পড়ে। দমকা এক-আধটা ফিচার লেখার হুকুম হয়—'বাঁকুড়ার মাটির ঘোড়া' কিংবা 'মৃতপ্রায় কাঁসার বাসনশিল্প'—এই ধরনের। তেমন দরকার পড়লে, বড়জোর 'কভারেজ' যাকে বলে সে ভারও নিতে হয়। তবে সেরকম দরকার মোট আড়াই পৃষ্ঠায় আর কত বা কতবার পড়ছে! তাই বার্তা বা সম্পাদকীয় বিভাগে কোন কর্মচারী কখন যাচ্ছে না যাচ্ছে তা নিয়ে কর্তারা মাথা ঘামান না।

গ্রীষ্মের কামড় বেশ চেপে বসেছে কলকাতায়। বাতাসে আগুনের হলকা। রাস্তারও পিচে আর পাথরে খর রোদ পড়ে তার তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে চারদিকে, সে-তাপ এই বাস পর্যন্ত এসে আরোহীদের মুখ-চোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাস-এ বসে যেন আরও চিংড়িমাছ-ভাজা অবস্থা। এক-একবার নলিনাক্ষর মনে হচ্ছে, নেমে বাকি পথটুকু হেঁটেই যায়—কিন্তু পথচারীদের মুখ-চোখের অবস্থা ও ঘামে-ভেজা জামা দেখে সাহস হচ্ছে না।

রাস্তার দিকেই চেয়ে আছে, হঠাৎ চোখে পড়ল ছেলেটা। সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়, দু-দিকের ট্রাফিককেই এখানে অন্তত মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করতে হয়। গরমে এই দাঁড়িয়ে থাকাটাই অসহ্য, আরও যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু উপায়ই বা কী। অন্যমনস্ক হওয়ার জন্যেই বেশি করে পথের দিকে মন দিয়েছিল নলিনাক্ষ। তাইতেই চোখে পড়ল—একটা খোঁড়া ছেলে এই দাঁড়িয়ে থাকা বাস-ট্যাক্সি-লরির ফাঁকে-ফাঁকে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। বছর তেরো-চোদ্দো বয়েস হবে। নিতান্তই ছেলেমানুষ। এই বয়েসেই কিন্তু দুর্গতির শেষ নেই যেন। খোঁড়া বললেও ঠিক বলা হয় না। একটা পা গোড়া থেকেই কাটা। তার ওপর ক্রাচও জোটেনি বেচারার। একটা লাঠির মতো জিনিসের ওপর ভর দিয়েই কতকটা লাফিয়ে-লাফিয়ে চলছে। আর-একটু কাছে এলে দেখল, শুধু পা-ই নয়, ডান হাতের তিনটে আঙুলও কাটা। বাকি দুটো আঙুলে একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি আটকে ধরে ভিক্ষে করছে।

ভারি মায়া হল নলিনাক্ষর। কালো—মানে কুচকুচে সাঁওতালী রঙ নয়, শ্যামবর্ণ বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই। কিন্তু কালো রঙেও সুন্দর হতে বাধে না; আমাদের দেশের মহাকবিরা ও পুরাণকাররা তা জানতেন, তাই আমাদের দুই মহানায়ক—সৌন্দর্যের প্রতীক রাম ও কৃষ্ণ—দুজনেই কালো। এরও

মুখখানি ভারি সুন্দর, লাবণ্যে ভরা। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, বড় টানা-টানা দুটি চোখ, টিকলো নাক, সাজানো সাদা দাঁত (এই শ্রেণীর ভিখিরিদের এই বয়েসেই বিড়ি খেয়ে দাঁতে ছোপ ধরে, এর তা ধরেনি)—এমনকী দুটি ঠোঁটের গঠনও ভারি সুঠাম। ভদ্রঘরের ছেলে হলে বহু মেয়ের মনে আগুন জ্বালাত।

কে জানে কাদের ছেলে। কী করে এমন দুর্গতিই বা হল! এর কি আর কেউ নেই যে একে দেখে!

অবশ্য ওই মুখখানা ছাড়া আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। যেমন আর পাঁচটা হয়—মার্কামারা ভিখিরি। ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, একটা ছেঁড়া তালি-দেওয়া হাফ-প্যান্ট—ওর অনুপাতে অনেক বেঁটে ভাঙা লাঠি একটা। বস্তুত, লাঠিটা কোনও কাজেই আসছে না—ওই এক পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়েই চলছে। চারিদিকের দৈত্যাকার বাস-ট্রাম-গাড়ির ফাঁক দিয়ে এইভাবে চলা। কোনওদিন মরবে ছেলেটা! কষ্টই কি কম হচ্ছে, এই গরমে এইভাবে লাফিয়ে চলা—দরদর করে ঘামছে, মনে হচ্ছে কে বালতি করে জল ঢেলে দিয়েছে সর্বাঙ্গে—

কাছে আসতে হাতে যা উঠল দিয়ে দিল নলিনাক্ষ। বোধহয় সিকি-আধুলি কিছু ছিল। ছেলেটার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বাটি সুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকাল। তবে তার দাঁড়াবার সময় নেই তখন, এদিকে সবুজ বাতি জ্বলায় সব গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু করে দিয়েছে; তাদেরও, আর অপেক্ষা করা কিংবা ওইসব ভিখিরিরা ঠিকমতো রাস্তা পার হতে পারছে কি না সেদিকে নজর দেওয়া সম্ভব নয়। ভিখিরিও অসংখ্য, আর ওই চলন্ত গাড়ির মধ্যেই তাদের জীবিকা উপার্জন করতে হবে। ছেলেটাও ওই গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে, আশ্চর্য কৌশলে চাপা পড়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে ওইভাবেই লাফাতে-লাফাতে চলে গেল। নলিনাক্ষই বরং যেন নিশ্বাস রোধ করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল—ছেলেটা নিরাপদে পার হতে পারে কি না।

ভয়টা একেবারে অমূলকও নয়। ওদিকের একটা বাস থেকে কে একজন পাঁচ নয়া মতো—তিনও হতে পারে, এতদূর থেকে ঠিক দেখা সম্ভব নয়—ছুঁড়ল, বাটিতে না পড়ে সেটা পড়ল রাস্তায়। একটা ঠোঁটকাটা গন্নাখ্যাঁদা ভিখিরি তীরবেগে সেটা লক্ষ করে আসছে, ছেলেটাও পয়সা ছাড়তে রাজি নয়। সে তারমধ্যেই লাঠিটা ফেলে একরকম হামাগুড়ি দিয়েই গিয়ে বাঁ-হাতে পয়সাটা তুলে নিল। পিছন থেকে যে মিনিবাসটা আসছিল সে কোনওমতে বেঁকে গিয়ে ওকে বাঁচাল বটে কিন্তু লাঠিটা বোধহয় বাঁচল না। মড়মড় করে আওয়াজ হল—ভেঙেই গেল খুব সম্ভব।

সেই এক মুহূর্তের 'টেনশ্যন' যাকে বলে—তারই জের হিসেবে বহুক্ষণ পর্যন্ত বুক ঢিবঢিব করতে লাগল নলিনাক্ষর।

আপিসে এসেও ছেলেটার মুখ আর ওই কষ্টের, প্রাণসংশয়-করা উপার্জনের কথা ভুলতে পারল না নলিনাক্ষ। বরং নিজের নিরিবিলি ঠাণ্ডা ঘরে বসে—সারা তেতলাটাই ওদের 'বাতানুকূলিত', ঠাণ্ডা এবং আরামদায়ক—কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল ওর কথাটা মনে হয়ে।

কাজ কিছু ছিল না, মানে টেবিলে কোনও নির্দেশ ছিল না। কাজে মন দিলে এই অস্বস্তির ভাবটা কেটে যাবে ভেবে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ, সহযোগী সম্পাদক জয়ন্তবাবুই কাজ বিলি করেন, তাঁর সন্ধানে। তিনি হেসে সুসংবাদ দিলেন—'কাজ কিস্‌সু নেই, সময়টা কাটিয়ে চলে যান, আর কী! ছ'পাতার কাগজ, সাড়ে তিনপাতা বিজ্ঞাপন। থাকে আড়াইপাতা, অন্তত দুটো পাতা নিউজ না দিলে লোকে গাল দেবে যে। ...চা খাবেন?'

তাঁর ঘর থেকে ফেরার পথেই নিউজের হলটা পড়ে। সেখানেও তখন কাজ কম, নিউজ আসতে থাকে সন্ধ্যার পর থেকে, তাই সবাই এক জায়গায় বসে আড্ডা দিচ্ছে। নলিনাক্ষর তখনই

নিজের ঘরে যেতে ভালো লাগল না, সেও এসে সেখানেই একটা চেয়ার টেনে বসল।

কিন্তু বসতে-বসতেই চোখে পড়ল ধীরেনের টেবিলে একখানা ছবি পড়ে, ছবি আর বিজ্ঞাপনের 'ম্যাটার' একটু। ওরই কে পরিচিত লোক বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছে, টাকা আর 'ম্যাটার' ধীরেন বিজ্ঞাপন বিভাগে পাঠাচ্ছে—চিঠি দিয়ে।

অলস কৌতূহলেই ছবিটা তুলে নিল নলিনাক্ষ। সাত বছরের একটি মেয়ে হারিয়েছে, তার বাবা বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ভারি সুন্দর ফুটফুটে দেখতে মেয়েটি, দেখলেই কেমন মমতা হয়। খবরের কাগজের ছাপায় অবশ্য এর কিছুই বোঝা যাবে না—কিন্তু ওর ভারি মন-কেমন করতে লাগল। আহা, যাদের মেয়ে তাদের না জানি কী অবস্থায় দিন কাটছে, এই মেয়ে হারিয়ে!

ওর মুখ দেখেই বোধকরি মনের ভাবটা বুঝতে পারল ধীরেন, বলল, 'ভারি মিষ্টি মেয়েটি, না? ...কী যে হয়েছে আজকাল, দেখেছ পরপর কতগুলো নিরুদ্দেশ খবর বেরোল? আর এই এক এজগ্রুপ—ছ-সাত থেকে দশ-বারো। ছেলে মেয়ে দুই-ই। আশ্চর্য, এত হারায় কী করে।'

ভবেশ বলে উঠল, 'কী করে আবার! আজকালকার ইরেসপনসিবল মা-বাপ। বিশেষ করে মায়েরা। বেরুবে তো একেবারে বেহুঁশ—বিশেষ যদি বাজার করতে বেরোল তো কথাই নেই। শুধু যে শাড়ি কিনতে গেলেই পাগল হয় তাও নয় মশাই, আমি দেখেছি—যে কোনও জিনিস কিনতে গেলেই ওইরকম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়াও চাই—অথচ সেদিকে নজর রেখে বাজার করবে সে ক্যালিবার নেই।'

নলিনাক্ষ বলল, 'আচ্ছা, পুলিশ কিছু করতে পারে না! মিসিং স্কোয়াড তো খুব ভালো কাজ করে শুনেছি—।'

'সে তো একটু বড়, যারা পালায় তাদের ধরে,' ভবেশ বলল, 'এ হারানো, আর এইটুকু বাচ্চা। তাও ধরে বইকী। ...সেই মনে আছে, একটা বাচ্চাকে চুরি করে নিয়ে তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বার করে চোরাই হীরে পাচার করছিল—? সেটা খুব ধরেছিল কিন্তু।...এমনি তো বাচ্চাদের ধরার কোনও প্রশ্ন নেই, হারিয়ে যায় যারা—পথে-ঘাটে কেউ দেখল তো থানায় জমা দিয়ে গেল। তা করে, দুধ খাওয়ায়, ভাত খাওয়ায়, অনেক সময় অফিসাররা। বাড়ি নিয়ে যায়, একটা কেস তো জানি, থানার সিপাইরা চাঁদা করে মানুষ করছে।'

'সে তো দুগ্ধপোষ্য, দু-তিন বছরের ছেলেমেয়ে। এই এজগ্রুপের কেউ থানায় গেছে দেখেছেন? কই, আমার তো তেমন কোনও খবর চোখে পড়েনি।' ধীরেন উত্তর দিল।

সন্তবাবু এতক্ষণ ওদিকে বসে কাগজ পড়ছিলেন, এখন নাকটা একবার জোরে রগড়ে নিয়ে (এটা ওঁর মুদ্রাদোষ) যেন হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, 'আচ্ছা, এই যে সব এত বিজ্ঞাপন দেয়—এতে কি কোনও কাজ হয়? খুঁজে পায় কেউ? সে-খবর তো কেউ দেয় না আর! অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ! তুমিও যেমন। আবার এত পয়সা খরচ করে সে-কথা জানাতে যাচ্ছে—ওগো, তোমরা সব শোনো, বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার খুব কাজ হয়েছে—আমি বাচ্চাকে খুঁজে পেয়েছি। কার উদ্বেগ দূর করার জন্যে করবে বলো! এত কার মাথাব্যথা। যা রেট হয়েছে তোমাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের। কুনাল দত্ত তো আর মুফতে ছাপবে না!'

কে একজন ওদিক থেকে বলে উঠল, 'রেট এইরকম না হলে তোমাদের মতো গবেটদের এত মাইনে দিয়ে পুষত কী করে? মাইনের রেটটাও মনে করো। এখন নিউজ ট্র্যান্সলেট করা সাব-এডিটররা যা পাচ্ছে—শুনলে সেকালের নামকরা এডিটর—পাঁচকড়ি বাঁড়ুয্যের মতো ভেটারানরাও পাগল হয়ে যেত।'

নলিনাক্ষ আর সেখানে বসল না। তার মনের খাতায় সেই আঙুল-কাটা পা-কাটা ছেলেটার ছবি তো উঠেইছিল, তার পাশে এই মেয়েটার ছবিও যোগ হল। কী যেন নাম? পূর্ণিমা সমাদ্দার। বেচারি! ...আবারও ওই কথাটা মনে হল। অমন সন্তান হারিয়ে গেল—ওর বাবা-মার কী অবস্থা! গলা দিয়ে কি এরপর ভাত নামছে?

দুই

বাড়ি ফিরে রাত্রে খেতে বসেছে—অন্যমনস্ক হয়েই খাচ্ছিল, কানে গেল বউদি বলছেন, 'আচ্ছা, আমাদের এই সামনের বাড়ির মিস্টার চাকলাদার—এত পয়সা পায় কোথায় বলতে পারো?'

অন্যমনস্কভাবেই নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'কেন? এত পয়সা দেখলে কী করে? খুব কি খাওয়াচ্ছে তোমাদের?'

'আহা! আমাদের খাওয়াতেই বুঝি অনেক খরচ হয়? কথার ছিরি দ্যাখো। আমি দেখব কী, তোমাদের চোখ নেই? ওই ঢাউস গাড়ি কিনেছে কোন কন্‌সালেটের, ছিয়াত্তর হাজার টাকা না কি দাম, জানি নে বাপু—বউ তো বলে বেড়ায়। তাতেও কুলোয় না, স্ত্রীর, ছেলেমেয়েদের সব আলাদা গাড়ি। স্ত্রীর গাড়িও অস্টিন কেম্ব্রিজ, পুরো এয়ার-কন্ডিশান করা। ...আর খাওয়ানোর ব্যাপারই বা কম কী! এই তো ছোট মেয়ে অঞ্জুর জন্মদিনে কেটারার ডেকে পাঁচশো লোক খাওয়ালে! ওই ডিশ, কোন না ষোলো টাকা করে নিয়েছে ওরা। তা ছাড়াও ধরো দই-মিষ্টি আছে। নাতনীর পুতুলের বিয়ে হল—সানাই বাজিয়ে যজ্ঞি করে। এতখানি বয়সে শুনিনি তখনও! ...এই তো জানলা থেকে দেখতে পাই, যখনই পকেট থেকে টাকা বার করে—গোছা-গোছা একশো টাকার নোট বেরিয়ে আসে!'

বউদি বেশ শব্দ করেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন। আবারও একটু পরে বলেন, 'আচ্ছা, লোকটা করে কী? কই সে-কথা তো কখনও শুনিনি—?'

'কে জানে!' নলিনাক্ষ জবাব দিল, 'আমি কী করে জানব! ও নিয়ে মাথা ঘামানোর আমার দরকারই বা কী? করে একটা কিছু নিশ্চয়—ব্যবসা-ট্যবসা। চাকরিতে অত পয়সা হয় না।'

সত্যিই, কথাটা কিন্তু এতদিন ওর মাথায় যায়নি। কী করে—কীসের ব্যবসা যে, এত পয়সা? প্রায়ই তো বাইরে যায় দেখা গেছে। এই তো কিছুদিন আগেই সবাইকে নিয়ে সিমলে গিছল! এখান থেকে প্লেনে চণ্ডীগড় গিছল, সঙ্গে তিন-চারটে ঝি-চাকর সুদ্ধ। সে-খবরটা অবশ্য ওকে মিঃ চাকলাদারই দিয়েছেন, সেইসঙ্গে জ্ঞানও দিয়েছেন একটু, 'না মশাই, মিডল-ক্লাস মেন্টালিটি আমি বুঝি না। আফটার অল, এভরিথিং কনসিডারড অ্যান্ড রেকনড—প্লেনেই সস্তা পড়ে। তিনদিন ধরে গাড়িতে গেলে এতগুলো লোকের খাওয়ার খরচাই কত পড়ত! তা ছাড়া শরীরের ওপর দিয়ে ধকল যেত কতখানি ভাবুন তো! তা ছাড়া, আফটার অল, আমাদের সময়ের তো মূল্য আছে! বেকার কি লোফার তো নই!'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়েই যেন নলিনাক্ষ বলে, 'কে জানে, বোধহয় ফাটকা-টাটকা খেলে। শেয়ার মার্কেট ছাড়া অত পয়সা কীসে হবে?'

বউদি ধিক্কার দেন, 'কে জানে আর কে জানে! অতবড় খবরের কাগজে কাজ করছ—এই খবরটুকু বার করতে পারো না?'

নলিনাক্ষ উত্তর দেয়, 'কে কী দিয়ে ভাত খাচ্ছে, কে ফাটকা কি রেস খেলে টাকা রোজগার করছে—এইসব খবর খুঁজে বার করাই বুঝি খবরের কাগজের কাজ! এমন তো লাখ-লাখ লোক রোজগার করে। কাগজের কী এত গরজ সে-খবর বার করা। ...খবর আসে যেটা সেটা ছাপা হয়। ...আর আমি তো কলম লিখি, রিপোর্টার তো নই, নইলে না-হয় একদিন ইন্টারভিউ নিতাম একটা! আর, আফটার অল—আমার গরজই বা কী?'

মিঃ চাকলাদারের কথাটা মনে করেই 'আফটার অল' বলে নলিনাক্ষ, ওই শব্দটা না বলে উনি থাকতে পারেন না।

বলে নিঃশব্দে খানিকটা হেসে নেয়—কথাটা মনে পড়ে।

আপিসে যাতায়াতের পথে ওইখানটায় এসে প্রায়ই চেয়ে-চেয়ে দেখে নলিনাক্ষ। ছেলেটাকেই খোঁজে। কিন্তু এরপর বেশ ক'দিন আর দেখতে পেল না। বোধহয় জায়গা বদলে-বদলে ভিক্ষে করে, হয়তো এখানে চেষ্টা করে দেখেছে—প্রতিযোগিতা বেশি। হয়তো আর এদিকে আসবেই না। ...না দেখতে পেয়ে একটু যেন হতাশই হয়। ছেলেটাকে ওর দেখতেই ইচ্ছে করে—এমনি শুধুমাত্র কৌতূহল নয়।

দেখা মিলল একেবারে দিন সাতেক পরে। সেদিনটাও তেমনি অসহ্য গরম। তেমনি কেন—আরও বেশি। বেরোবার আগেই খবর পেয়েছে—১১০° উঠেছে, আগেকার হিসেবে। বেলা দেড়টা তখন। তাপটাও সেই সময়ই সবচেয়ে বেশি। ফলে রাস্তা কলকাতার হিসেবে জনবিরল। গাড়িতে-বাসে বসেও যেন খাবি খাচ্ছে লোক—রাস্তায় পিচ গলে তলতল করছে, গাড়ির চাকা আটকে আটকে যাচ্ছে। রিকশাওয়ালারা যা হোক করে জুতো জোগাড় করে পরে নিয়েছে বেশিরভাগ, যে যা পেরেছে। একজন তো—লক্ষ করে দেখল নলিনাক্ষ, একজোড়া ছেঁড়া কেডস বোধহয় কুড়িয়ে পেয়েছে কোথাও থেকে, তার পায়ের চেয়ে অনেক বড়—সে দড়ি দিয়ে সে-দুটো পায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়েছে—পাছে খুলে-খুলে যায়—এত কাণ্ড করেছে ওই জন্যেই—তবু কোনওমতে পায়ের তলাটা তো বাঁচবে।

এরই মধ্যে চোখে পড়ল ছেলেটা।

সেই জ্বলন্ত আঙরার মতো রাস্তায় খালি পায়ে তেমনি লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছে, আজ লাঠিও নেই একগাছা, এক পায়েই—যাকে ইংরিজিতে 'হপ' করা বলে—সেইভাবে চলছে। গলা পিচ লেগে পায়ের তলাটা জুতোর মতো হয়ে গেছে, তবু তাতে যে গরমটা লাগছে না তা নয়। সেদিনের মতোই দরদর করে ঘামছে। চুলগুলো রুক্ষু, নইলে মনে হত চান করে এসেছে কোথা থেকে। ছেঁড়া জিনের হাফ-প্যান্টটাও ভিজে উঠেছে; আজ গায়ে গেঞ্জি নেই, তার বদলে একটা ছেঁড়া ঝলঝলে জামা গায়ে—সেটা গায়ের সঙ্গে লেপটে গেছে।

ভারি মায়া হল নলিনাক্ষর। বাসটা দাঁড়িয়েই ছিল, এখন সিগন্যাল পেয়ে স্টার্ট দিতেই চট করে নেমে পড়ল। কোনওমতে তিন-চারটে গাড়ির ফাঁক দিয়ে গলে পশ্চিম দিকের পেভমেন্টে উঠে, ওরই মধ্যে একটু ছায়া খুঁজে নিয়ে ইশারা করে ডাকল ছেলেটাকে।

সাগ্রহেই ছুটে এল ছেলেটা। নলিনাক্ষর আগে মনে হয়েছিল একটা পুরো টাকাই দেবে ওকে অবাক করে দিয়ে, বলবে, এই রোদে আর ভিক্ষে করতে হবে না, ঘণ্টাখানেক কোনও গাছের ছায়ায় গিয়ে বসে থাকো। কিন্তু পকেটে হাত দিতে গিয়েও দিল না। চোখে পড়ল একটা আইসক্রিমের ঠেলাগাড়ি। কী ভেবে বলল, 'এই, আইসক্রিম খাবি?'

ছেলেটার সুন্দর চোখ দুটো লোভে জ্বলে উঠল। সেইসঙ্গে একটু অবিশ্বাসের ছায়াও যেন ফুটে উঠল—তার পাশাপাশি। তবে তারমধ্যেই প্রবল ঘাড় নাড়ল—খাবে।

আইসক্রিমওলাটাকে ডেকে স্টিক নয়, একটা কাপই দিতে বলল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মনে হল, এই গরম, এত ঘামের মধ্যে আইসক্রিম খাওয়া কি ঠিক হবে? যদি সর্দিগর্মি হয়ে যায়? গরিবের ছেলে ভিক্ষে করে খেতে হয়—জ্বর হয়ে পড়ে থাকলে একফোঁটা ওষুধও জুটবে না তো। খেতেই বা দেবে কে? ছেলেটা বোধহয় ওর মুখের সেই ভাবান্তর, সেই সামান্য ইতস্তত ভাবটাও লক্ষ করেছিল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না-না, আমার কিছু হবে না। এই তো—এই অবস্থায় গিয়ে ঠাণ্ডা জল খেয়ে এলুম এক জায়গা থেকে—'

নলিনাক্ষ দাম চুকিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম কী খোকা?'

'নাম!' একটু যেন ভুরু কোঁচকাল একবার। তারপর বলল, 'আপনি তো হিন্দু, না? আমার নাম প্রফুল্ল। আসলে আমাকে ডাকে কেলো বলে।'

'তা হিন্দু কি না জিগ্যেস করলে কেন?' নলিনাক্ষর কৌতূহল বেড়ে গেল।

'না, আমাকে বলে দিয়েছে, মুসলমান কেউ জিগ্যেস করলে হামিদ নাম বলতে। তা হলে তারা ভিক্ষে বেশি দেবে।'

'কে এসব বলে দেয়? তুমি থাকো কোথায়? কে আছে তোমার?'

এবার স্পষ্টই বোঝা গেল ওর বিপন্ন ভয়ার্ত ভাবটা। মুখ শুকিয়ে উঠেছে, হাতের মধ্যে অতবড় আইসক্রিমের কাপটা থাকা সত্ত্বেও।

বললে, 'থাকি? ওই বেনেপুকুরের কাছে একটা বস্তিতে।'

'তা তোমার এমন হল কী করে?'

'অ্যাকসিডেন্ট।' সংক্ষেপে বলল ছেলেটা। সাবধানেই উচ্চারণ করল শব্দটা। যেন কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। মনে করে-করে বলল।

নলিনাক্ষ বলল, 'তা তাতে তো সব ক'টা আঙুলই যাবে। কিংবা একধার থেকে। এমন মাঝের তিনটে আঙুল কাটল কী করে?'

কোনও জবাব দিল না ছেলেটা। ঘামছে তেমনি দরদর ধারে, মনে হল, বড়-বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরে পড়ছে আইসক্রিমের ওপর।

'তা তোমার কে আছে, বাড়িতে? মা-বাপ নেই? তোমাদের মতো ছেলেদেরও তো শক্তকর্ম শেখাবার ব্যবস্থা আছে—সেসব শিখলে আর এত কষ্ট করতে হয় না? শিখবে? দ্যাখো, তা হলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

ছেলেটা যেন পাঙাস হয়ে উঠল একেবারে। একবার ভয়ে-ভয়ে ওদিকের ফুটপাথটার দিকে চেয়ে—বাকি সবটা আইসক্রিম একসঙ্গে মুখে পুরে যেন একলাফে একটা দোতলা বাসের আড়ালে চলে গেল। ঠিক সেই সময়ই উত্তর দিকের লাইন ছেড়েছে। পর-পর কতকগুলো বাস, মিনি-বাস, গাড়ি, কোম্পানির ভ্যান—সার-সার চলল—গিয়ে খোঁজা সম্ভব নয় সে অবস্থায়—আবার যখন গাড়ি দাঁড়াবার পালা এল, তখন আর কোথাও দেখা গেল না ছেলেটাকে। ভিক্ষেও করছে না, যেন বাতাসে উবে গেছে।

বেশ একটু অবাক হয়ে গেল নলিনাক্ষ। হঠাৎ এত ভয় পেয়ে গেল কেন ছেলেটা? ওদিকে চেয়ে কী দেখল? কোনও লোককে দেখেই ভয় পেল না কি? সে শুনেছে এই সব ভিখিরিদের 'মেট' থাকে—তারাই এনে ছেড়ে দেয়, আবার বিকেলে ফিরিয়ে নিয়ে যায় ডেরায়, এ-ও সেই ব্যাপার না কি?

যেদিকে চেয়েছিল ছেলেটা, নলিনাক্ষও ভালো করে চেয়ে দেখল। কই, কেউ তো কোথাও নেই, পুব দিকের ফুটপাথটাই তো ফাঁকা। শুধু পানওলার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক বিড়ি টানছে। সাধারণ চেহারার, হিন্দুস্থানী মজুর বা দুধওলা—এইরকম শ্রেণীর লোক। সে এদিকে চেয়েও নেই, ওইদিকেই ফিরে বোধ হয় পানওলার সঙ্গে গল্প করছে। আর কোনও লোকই তখন চোখে পড়ল না ছেলেটা যাকে দেখে এত ভয় পেতে পারে।

আর মেট থাকলেই বা কী? তার জীবনের উন্নতিও বুঝল না ছেলেটা? নলিনাক্ষর ঠিকানাটাও তো জেনে নিতে পারত। কিংবা আবার কবে এখানে আসবে সেটা জানিয়ে দিতে পারত। কী বোকা ছেলেটা!

একটু ক্ষুণ্ণই হল নলিনাক্ষ। আসলে ছেলেটার কোনও উপকার করতে পারলে ভালো লাগত ওর। সেইজন্যেই কেমন যেন একটা অবুঝ অভিমানও বোধ হতে লাগল। তার আর কী, ও যদি নিজের ভালো না বোঝে নলিনাক্ষর কী এত মাথাব্যথা? গোল্লায় যাক! —এই কথাটা নিজেকে বারবার বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একেবারে বাসে উঠে লক্ষ করল—ওধারের ওই লোকটা পানওলার আয়নার দিকেই চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আয়নাটা বেশ বড় আর উঁচু; রাস্তার এদিকটা তাতে প্রতিবিম্বিত হতে কোনও বাধা নেই।

তিন

বউদির শরীর খারাপ, অনেকদিন ধরেই বলছেন। মৃদু অনুযোগই করছেন বলতে গেলে, দেবরের হৃদয়হীনতায়। এবার আর কিছু না করলেই নয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল দার্জিলিং। কিন্তু সেখানে পাঠানোর অসুবিধা অনেক। কাছাকাছি কোথায় পাঠানো যায় ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। ওর আপিসের নগেনবাবুর কে এক আত্মীয় বারোমাস পুরীতে বাস করেন। রিটায়ার্ড সরকারি কর্মচারী। অকৃতদার। একটি চাকর নিয়ে শুধু থাকেন। তিনি এবার তীর্থে যাবেন। বাড়িতে কাকে রেখে যান এই চিন্তায় পড়েছেন। লীজ নেওয়া বাড়ি। বারোমাস থাকেন বলে দুটো-একটা জিনিসও করেছেন। কেউ যদি না থাকে তো দরজা ভেঙে চুরি হয়ে যাবে! বুড়ো মানুষ—চাকরকে নিয়ে যেতে হবে। একা যেতে পারবেন না। তিনি ভালো একটি পরিবার খুঁজছেন, যারা মাসখানেক থাকবে অন্তত, আর ঘরবাড়ি নোংরা করবে না। ভাড়া তিনি চান না, তবে কেউ যদি দিতে চায় তো আপত্তিও করবেন না, যে যা দেয় খুশিমনেই তাই নেবেন। মোদ্দা ওই দুটি শর্ত, বাড়ি পরিষ্কার রাখা চাই, আর কাচের বাসন ব্যবহার করা চলবে না। কাটগ্লাসের দামি জিনিস তাঁর, বিলিতি প্লেট, জিনিসপত্র নষ্ট না হয়। কেউ কি তেমন লোক আছে নলিনাক্ষর সন্ধানে? নগেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন।

নলিনাক্ষর কাছে এটা দৈবপ্রেরিত বলেই মনে হল। ততক্ষণাৎ কথা দিয়ে দিল একেবারে। তারপর বাড়িতে এসে বউদিকে খবরটা বলল। রাত্রে 'কনফারেন্স' বসিয়ে স্থির হল, নলিনাক্ষ বউদিকে পৌঁছে দিয়ে প্রথম দিকে দিন দশেক থেকে আসবে, দাদা মাঝে দিন দশ-বারো গিয়ে থাকবেন, শেষের দিকে বউদির ভাই গিয়ে আর দশ-বারো দিন থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরবে। মাসখানেক লাগবার কথা নগেনবাবুর সেই পিসেমশাইয়ের; কুণ্ডু স্পেশালে যাবেন, মাপা দিন ওঁদের—তবু যদি দৈবাৎ কলকাতায় এক-আধদিন আটকে যান, তাঁর ফেরা পর্যন্ত বউদি থাকবেন এই বন্দোবস্ত আছে।

বউদির তো উৎসাহের অবধি নেই। তিনি কখনও পুরী যাননি। এমনিও গত দু-বছরে নাকি কোথাও বেরোতে পারেননি—তিনি ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন। নলিনাক্ষরও খারাপ লাগছিল না, চক্রতীর্থে প্রথম সারিতে বাড়ি। সোনার গৌরাঙ্গ আর রামকৃষ্ণ মঠের কাছে—বেশ জনবসতিও আছে, একেবারে নির্জন নয়।

কিন্তু পুরীতে পৌঁছে বউদির আনন্দ যেন একটু স্তিমিত হয়ে গেল। ওদের বাড়ি মাঝারি কেন, ছোটই, ওপরে দুটো নিচে দুটো ঘর। পিসেমশাইয়ের আর ওর চেয়ে বেশি লাগবেই বা কেন? নিচের ঘরটা তো অব্যবহার্যই পড়ে থাকে; কিন্তু ঠিক পাশেই এক বিরাট বাড়ি—কোনও এক মারোয়াড়ির—দেখা গেল তার পিছনে অতি পরিচিত এবং বউদির চোখের-বালাই খান-তিনেক ঢাউস-ঢাউস গাড়ি দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ মিঃ পরেশ চাকলাদাররা ইতিমধ্যেই সপরিবারে এসে গেছেন। দিন-চারেক আগে মোট-মাটারি নিয়ে রওনা হতে দেখেছে বটে—কিন্তু ওঁরা যে এত দেশ থাকতে এখানেই আসছেন তা কে ভেবেছিল? সাহেব মানুষ, অত ধনী—কাশ্মীর, নিদেনপক্ষে দার্জিলিং কি শিলং যাবেন এই-ই ভেবেছে।

বউদি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'আ গেল যা! মড়ারা এখানেও এসে জুটল। কোথায় ভাবলুম ক'টা দিন ওদের আর মুখ দেখতে হবে না, নিশ্চিন্তি থাকব—তা নয়। ঠিক এসে হাজির হয়েছে! ওই যে আমার মা ছড়া কাটেন না—"ওরে ও শাক-অম্বুলি কোন ঘাটে তুই পা ধুলি, আমি না আসতে তুই এলি!" তা এ-ও হল তাই! আপদ এসে একেবারে ঘাড়ের ওপর পড়ল!'

নলিনাক্ষ হেসে বলল, 'তা তোমারই বা অত রাগ কেন ওদের ওপর? কী করেছে তোমার?'

'না বাপু। ওদের ওই অত চাল আমার সহ্য হয় না। তা যা-ই বলো আর যা-ই ভাবো!'

গাড়ি থেকে নেমে মালপত্র নিয়ে থিতিয়ে বসে বাজারের দিকে যাচ্ছে—পরেশ চাকলাদারের সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল, 'এই যে, বা! আপনারাও এসে গিয়েছেন। খুব ভালো হল। ক'দিন আছেন তো। তবু চেনাশুনো লোক—একটু গল্পসল্প করা যাবে। ভগবানের ব্যাপার দেখুন মশাই, ওখানেও প্রতিবেশী, এখানেও কেউ জানি না অপরে কোথা যাচ্ছে—ঠিক পাশাপাশি বাড়িটি হয়ে গেল। আসবেন অতি অবিশ্যি। বিকেলের দিকে আসুন না, এখানেই চা খাবেন। বউদি-ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসুন—প্লিজ!'

তখনকার মতো 'হেঁ-হেঁ, দেখি, আসব বইকী—অবিশ্যি আসব—তবে আজ হবে কি না—হেঁ-হেঁ—' বলে কাটিয়ে চলে গেল নলিনাক্ষ।

বউদি শুনে মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, তা আর নয়! এলুম দুটো দিনের জন্যে জিরুতে, আজই গিয়ে ওঁদের দরবারে হাজরে দিতে হবে। আসলে ওঁর গিন্নি চালের কথা শোনাবার লোক পাচ্ছে না বোধহয়, পেট ফুলে মরে যাচ্ছে। দু-চোখের বালাই—এইসব হঠাৎ-বড়লোক লোকগুলো।'

বিকেলে বেরিয়ে মন্দির ও বাজার ঘুরে এসে বউদি আর কোথাও বেরোতে চাইলেন না। সমুদ্র তো এখান থেকেই দিব্যি দেখা যাচ্ছে, কাছে গিয়ে বেশি কি হাত বেরোবে? তা ছাড়া এই ঘোর কৃষ্ণপক্ষ—কী এমন দেখবেই বা মাথামুণ্ডু! চাঁদনী রাত হলেও না হয় কথা ছিল। ছেলেমেয়েকেও ছাড়তে রাজি নন তিনি, সমুদ্রের ধারে অনেক কিছু থাকে, পোকামাকড়—আর এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কী-ই-বা বুঝবে সমুদ্রের?

কিন্তু নলিনাক্ষর ধারণা অন্য। সে এর আগে বহুবার পুরী এসেছে, গোপালপুর-ওয়ালটেয়ার গেছে, সমুদ্র সম্বন্ধে নিজেকে সে অথরিটি ভাবে। তার বিশ্বাস, চাঁদনী রাতের শোভা বরং কিছুটা একঘেয়ে, অন্ধকার রাত্রের বৈশিষ্ট্য বেশি। বিশেষ যদি একটু মেঘলা থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বিদ্যুৎ-চমকের সঙ্গে ঢেউ ভাঙার ফসফরাস দীপ্তি যখন সেই অন্ধকারের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অগ্নিময় সর্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে—তখন তাকে ঈশ্বরেরই এক ভয়ঙ্কর রূপ মনে হয়।

বউদি অবশ্য ওকে যেতে বাধা দিলেন না, এক পেয়ালা চা খেয়েই টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়ল নলিনাক্ষ।

সমুদ্রতীর তখন একেবারেই জনবিরল। কেউ থাকবে তা সে আশাও করেনি অবশ্য। তার মতো পাগল কে আছে যে, এই অন্ধকারে বসে-বসে সমুদ্র দেখবে! আর তাতে সে দুঃখিতও নয়, এ গম্ভীর রূপ একা বসেই উপভোগ করতে হয়। তার কাছে কিছুই নেই, হাতঘড়িটাও বুদ্ধি করে খুলে রেখে এসেছে। চোর-ডাকাত ধরে কোনও ক্ষতি করতে পারবে না! এক এই টর্চ—তা তার জন্যে কেউ রাহাজানি করবে বলে মনে হয় না।

তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে, মন এটা-ওটা ভাবতে-ভাবতে সেই ভিখিরি ছেলেটো —প্রফুল্লর কথায় চলে গেল। নিত্যই উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখে কিন্তু এর মধ্যে আর একদিনও দেখতে পায়নি তাকে। কে জানে কেন—ছেলেটো যেন তাকে কী মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে।

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল—এলোমেলো চিন্তায়। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোনও হুঁশও ছিল না। দূরে মধুপুর হাউসের জোর আলোটার আভা এসে পড়েছে—তবে সেটা ওর এই শোভা উপভোগে খুব ব্যাঘাত করতে পারেনি। বরং ওর চারপাশের অন্ধকারটাকে যেন আরও গাঢ় করে তুলেছে। বসবার সময় বেছে-বেছে এইদিকটায় এসে বসেছে, রাঠোর-নিবাসের সামনের ঝাউগাছগুলোর আড়ালে। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে, মনে হচ্ছে, সে-অন্ধকার যেন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, সে ডুবে গেছে তার মধ্যে। এইসময় হঠাৎ মধুপুর হাউসের আলোটাও কে নিভিয়ে দিলে, আরও গাঢ়, আরও নিঃসীম হয়ে উঠল চারিদিক।

অকস্মাৎ, যেন সেই অন্ধকারেরই একটা অংশ—অন্ধকার মহাশূন্য থেকেই কায়া সংগ্রহ করে—যাকে বলে মেটিরিয়ালাইজ করা—একেবারে তার পাশে এসে ঝুপ করে পড়ল।

কোনও জীবিত প্রাণী? মানুষ? খুনে ডাকাত?

এসব কোনও কিছু ভাববারও অবসর ছিল না। নিদারুণ চমকে উঠল নলিনাক্ষ, ভয়ই পেয়ে গেল সে, অজানা অথবা দেহের সহজাত একটা আতঙ্ক। আর সেই ভয়ে তার গলা দিয়ে শুধু একটা অব্যক্ত জান্তব আর্তস্বর বেরিয়ে এল আপনা-আপনিই।

যে এসে বসেছে, সে বোধকরি এ-অবস্থাটা আগেই অনুমান করে নিয়েছিল। জানত এটা হবে। মানব মনের এ স্থূল অনুভূতিটা তার জানা-ই। সে ওর এই স্বর বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় বলে উঠল, 'চুপ, আমি এককড়ি।'

এককড়ি। হ্যাঁ, গলার আওয়াজটা সেইরকমই বটে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই—ধড়ে প্রাণ আসা যাকে বলে—আশ্বস্তও হল একটু। ক'টা মুহূর্তেরই ব্যাপার, কিন্তু কখনও-কখনও শুধু ব্রহ্মারই নয়, মানুষেরও এক পলকে এক যুগ কেটে যায়, যুগান্তের অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

এবার ভরসা করে তাকিয়ে দেখল, অন্ধকারেই যতটা দেখা সম্ভব—কারণ যে এসেছে সে আগেই—নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গেই চাপা গলায় বলে দিয়েছে, 'টর্চ জ্বালবেন না, দোহাই।'

সি. বি. আই. ইন্সপেক্টর দেবীবাবু, দেবীপদ বসু। মাত্র কিছুদিন আগেই নলিনাক্ষর প্রাণরক্ষা করেছিল। সেদিনের সে-দুঃস্মৃতি মনে পড়লে আজও—কী হতে পারত ভেবে—ভয়ে যেন হিম হয়ে যায় বুকের মধ্যেটা। সেই থেকেই, সেই উপলক্ষ করেই একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

এককড়ি নামটার মধ্যেও একটা রহস্য আছে। সেই ঘটনারই রহস্য। এখন সেটা কৌতুক রহস্যে পরিণত হয়েছে। ওর বন্ধু বরুণ একবার 'স্মাগলার'দের চক্রে পড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রেই এক লেডী-ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হয়—এই দেবীপদ বোস ভেতরের খবর নেওয়ার জন্যে এককড়ি নাম নিয়ে বরুণের বাড়ি চাকরের কাজ নেয়। সেই থেকেই এককড়ি নামটা ওদের মধ্যে চালু হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই সেটা উপভোগ করে। বরুণ সম্প্রতি চূড়ামণি বলে সাঁওতাল মেয়েটাকে বিয়ে করেছে—তাতে দেবীপদ উপহার দিয়েছে—'দাস শ্রীএককড়ি' এই সই করে।

চিনতে পারার পরই নলিনাক্ষ জড়িয়ে ধরেছিল দেবীপদকে, সেইভাবেই ধরে রেখে বলল, 'বাপরে, এমনভাবে ভয় পাইয়ে দিতে হয়? তা এখানে? আর এই অন্ধকারেই বা কেন, এমন ভূতের মতো?'

দেবীপদ বলল, 'কাজেই এসেছি। একটা খোঁজে। সেটা দিবাভাগে দৃশ্য নয়, আলোতেও নয়। তাই এই প্রেতাত্মার মতো অন্ধকারে ঘোরা।'

'কিন্তু যাদের দেখার জন্যে এত কাণ্ড—তারা জানে না আপনি পিছনে লেগেছেন?'

'জানে বইকী। এখনও আমরা এত সতর্ক হতে পারিনি যে, তাদের কাছে খবর পৌঁছবে না। সর্বত্রই পেড-ম্যান আছে ওদের। জানেন না, জহরলাল নেহরুর টাইপ-রাইটারের ব্যবহার করা কার্বন পেপারও চুরি যেত? তারাও আছে, আমরাও আছি। আমাদের পেছনে তারা আছে কি না তাও দেখার ব্যবস্থা আছে। ওই রামকৃষ্ণ মঠের ছাদে একজন আছে। এদিকের এক বাড়ির ছাদে আর-একজন, তাদের কাছে পাওয়ারফুল দূরবীন আছে। এই অন্ধকারেও আমাকে ফলো করছে তারা দূরবীন দিয়ে। ...তা আপনি হঠাৎ পুরীতে? বউদিও তো এসেছেন দেখছি।'

বলল নলিনাক্ষ কারণটা। বউদির চেঞ্জ দরকার, একটা বাড়িও পাওয়া গেল—ফার্নিশ্‌ড্—এসে পড়েছে। দিন দশেক থেকে ও চলে যাবে। দাদা আসবেন।

বলতে-বলতে মনে পড়ে গেল কথাটা। সেদিনেরই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, মানে

কলকাতায় আগের দিন দেখে এসেছে—ছবি দেওয়া বিজ্ঞাপন—কপালে কাটা দাগ, থুতনিতে একটা তিল আছে, সাত বছরের মেয়ে, ডাকনাম পারুল—আরও কী সব বিবরণ—খবর দিলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাবে। এখানে এসে সেই কথাটাই ভাবছিল। সেই প্রসঙ্গেই ভিখিরি ছেলেটার চিন্তায় চলে গিছল। কথার মধ্যেই তাই হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা দেবীবাবু, আজকাল প্রায়ই যে এত ছেলেমেয়ে হারাচ্ছে—এর ব্যাপারটা কী বলুন দিকি? খবরের কাগজ খুললেই একটা না-একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সুনীতিবাবুর ভাষায়—হোয়াট ইজ বিকজ অফ ইট? ডঃ সুনীতি চাটুয্যের রসিকতা এটা—কোনও দক্ষিণ দেশিয় ভদ্রলোক বলতেন—শিক্ষিত ভদ্রলোক।'

অন্ধকারেই যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখল এককড়ি। তারপর তেমনি হিসহিসে গলায় বলে উঠল, 'এই মরেছে! আবার বাঘের গর্তে পা দেবার তালে আছেন নাকি? এ কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খুব সাবধান! আপনি বুঝি ফ্যাসাদ না বাধিয়ে থাকতে পারেন না?'

'না-না, সেসব কিছু নয়। এমনি, পর-পর বিজ্ঞাপনগুলো চোখে পড়ে কিনা—তাই হঠাৎই মনে এল কথাটা। আপনিই বা ওসব ভাবছেন কেন?'

এবার নলিনাক্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখটা দেখার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা কথা মনে পড়ে যায় আবারও, 'আচ্ছা দেখুন—আপনি তো ঘোরেন-টোরেন খুব, চৌরঙ্গী আর সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডের মোড়ে যে সব ভিখিরি ট্রামে-বাসে-গাড়িতে ভিক্ষে করে—তাদের মধ্যে কালো মতো একটা ছেলে ছিল, তার নামও কেলো, তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস হবে—একটা পা কাটা, ডান হাতের তিনটে আঙুল নেই—তাকে আর মোটে দেখতে পাই না, আসা-যাওয়ার পথে চেয়ে-চেয়ে দেখেছি—দু-তিনদিন নেমে খোঁজও করেছি অন্য ভিখিরিদের কাছে, কেউই বলতে পারে না। আপনার চোখে পড়েছে কখনও? মনে পড়ছে এমন কারও কথা?'

দেবীপদ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হল যেন নিথর হয়ে গেল প্রসঙ্গটায়। হয়তো কিছুই না, মনে করারই চেষ্টা করছে। কিন্তু নলিনাক্ষর কেমন মনে হতে লাগল—এ নীরবতাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়, দেবীপদ হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠেছে কথাটা শুনে।

প্রায় মিনিট দুই-তিন পরে সত্যি-সত্যিই গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল দেবীপদ, 'কেন বলুন তো? তার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? শেষ কবে দেখেছেন তাকে? জানাশুনো ছিল, না এই পথেই দেখেছেন? নামই বা জানলেন কেমন করে?'

'বাবা! আপনি যে পুলিশের লাইনে চলে গেছেন এককথায়। রীতিমতো জেরা। এর মধ্যেও কোনও ভয়ানক কথা আছে না কি? আপনাদের স্বভাবটাই খারাপ হয়ে যায় এই কাজ করে-করে—না? সবেতেই সন্দেহ জাগে।'

এই বলে নিজেই যেন প্রসঙ্গটা হালকা করে নিয়ে খুলে বলল সব। প্রথম দিন দেখে মায়া হওয়ার কথা, শেষের দিনে আইসক্রিম খাওয়ানো, তার হঠাৎ পালিয়ে যাওয়া—সব। ইতিহাস শেষ হলে বলল, 'অন্য কোনও ইন্টারেস্ট নেই আমার, জাস্ট হিউম্যান ইন্টারেস্ট। ছেলেটাকে দেখলে আপনিও বোধহয় ব্যস্ত হতেন তার কিছু ভালো করার জন্যে!'

'আপনিও বলার মানে? কথাটায় অত জোর দিলেন কেন? পুলিশে কাজ করলে কি ইনহিউম্যান হয়ে যায় বলে আপনাদের ধারণা?' হেসেই বলল দেবীপদ, কিন্তু তারপর আবারও গম্ভীর হয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, 'হেস্টিংস-এর কাছে গঙ্গায় কাদার মধ্যে তার ডেডবডি পাওয়া গেছে দিন-দশেক আগে। কেউ গলা টিপে মেরে জলে ফেলে দিয়েছিল। কারণটা কী, ওইরকম ছেলেকে কে খুন করল ভাবছিলুম, এবার বুঝলুম। আপনিই কারণ।'

যেন গরম একটা কিছু ছ্যাঁকা দিল কে নলিনাক্ষকে। সে প্রায় চাপা আর্তস্বরে বলে উঠল, 'আমি! আমি তার মৃত্যুর কারণ!'

'হ্যাঁ, ওই আইসক্রিম খাওয়ানো আর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই কাল হয়েছে বেচারার। কেন যে আপনারা এত পরোপকার করতে যান।' তারপরই বেশ একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'বলছিলেন জড়াননি। এই তো বেশ জড়িয়েছেন দেখছি। বাঘের গর্তে শুধু নয়, তার চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছেন একেবারে। ...না, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

'তার মানে?'

কিন্তু সে-প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া যায় না! খুব চাপা, সামান্য একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাওয়া যায় কাছাকাছি কোথাও থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে যেন অশরীরী কোনও প্রাণীর মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দেবীপদ।

যেমন ভাবে হাওয়া থেকে মূর্তি পরিগ্রহ করার মতো এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই যেন হাওয়া হয়ে যায় আবার।

চার

ইংরেজিতে bewilderment বলে একটা শব্দ আছে—তার মানেটা যেন এতদিনে ঠিক বুঝতে পারল নলিনাক্ষ।

সে-রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা বা বিভ্রান্তি কিছুটা কাটতেই তিন-চারদিন সময় লাগল প্রায়। যত সে-কথা ভাবে, ততই যেন আরও গুলিয়ে যায় মাথাটা। অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, অবাস্তব মনে হয়। সত্যিই কি এককড়ি এসেছিল, না সারাদিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছে সে?

ওই ছেলেটার কথা যে বলে গেল? সেটা? ...আহা বেচারি! আচ্ছা, সত্যিই কি তার মৃত্যুর জন্যে নলিনাক্ষই দায়ী? ইস, কেনই বা দয়া করতে গিছল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর এ-বিপদের কী সম্পর্ক অনেক ভেবেও বুঝতে পারে না। ওকে কোনও কাজ দিলে ভিক্ষে ছেড়ে দেবে এইজন্যে? ভিক্ষেতে কি এত রোজগার হয় সত্যি-সত্যিই?

অনুতাপও হয়—আবার ভাবে, যদি সত্যিই তাই হয়—এমন কষ্ট করে ভিক্ষের খাওয়া খেয়ে বাঁচবে, তার ভেতরও এত শাসন, এত নিষ্ঠুরতা, এত চক্রান্ত থাকে তো তার মরাই ভালো হয়েছে, রেহাই পেয়েছে সে। এভাবে বেঁচে থেকে কী পেত সে জীবনে আর?

মুশকিল হয়েছে এই—কথাটা যে খোলসা করতে পারত সেই দেবীপদরও কোনও পাত্তা নেই আর। পথে-ঘাটে, মন্দিরে, বাজারে, সমুদ্রতীরে—কত চেয়ে-চেয়ে দেখে—কোথাও চিহ্নমাত্র দেখতে পায় না। সেই যে অন্ধকারে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, সেই কুকুর-কাঁদার শব্দে চমকে উঠে—একেবারেই যেন প্রেতমূর্তির মতোই মিলিয়ে গেল, লোক ও লোকালয় থেকে। কিছু বুঝিয়ে বলল না, পরিষ্কার করল না বক্তব্যটা—বরং আরও খানিকটা রহস্যেরই সৃষ্টি করে গেল। চাপা গলায় হিসহিস করার মতো শব্দে, ধমকের ভঙ্গিতেই বলে গেল, 'বাড়ি চলে যান এখনই। আর কোনওদিন এমনভাবে রাত্রে একা বেরোবেন না। উঠুন, উঠে পড়ুন। বেশিক্ষণ আপনাকে প্রোটেকশ্যন দিতে পারব না আর।'

এই কথাগুলো নিয়েই আরও বেশি ভাবছে। বাঘের চোয়ালের মধ্যে পা দিয়েছে বলে গেল। সে-ব্যাপারটাই বা কী? যাই হোক, সাবধানও হয়েছে, সমুদ্রের ধারে গেলেও বেলা থাকতে-থাকতে ফিরে আসে। একাও যায় না আর।...

কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় কেটে যেতেও যখন দেবীপদর কোনও খবর পেল না—তখন ব্যাপারটা একটু হাস্যকর বলেই মনে হল। হয় সে স্বপ্ন দেখেছিল, নয় তো দেবীপদই একটু তামাশা করে

গেল, অন্ধকারে বসে ছিল বলে একটু মজা করে গেল ভয় দেখিয়ে। আর সেও এমন বুদ্ধু—এই ক'দিন ভয়ে-ভয়ে সিঁটিয়ে আছে, কত কী ভাবছে। ছোঃ!

কিন্তু ঠিক যখন কথাগুলোকে নিতান্তই অবাস্তব, স্বপ্নদৃষ্ট বলে ভাবতে শুরু করেছে, সেইসঙ্গে মনের প্রশান্তি ফিরে পাচ্ছে একটু-একটু করে, একটি নিদারুণ খবর এসে আবার সব ওলোট-পালট করে দিল।

বউদির ভাইঝি দোলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দিন পাঁচেক আগে স্কুল থেকে হারিয়ে গেছে। ইস্কুলের গাড়ি-ছাড়ার সময় তাকে পাওয়া যায়নি, ইস্কুলের ঝি ভেবেছে কোনও বন্ধুর সঙ্গে তার গাড়িতে আগেই চলে গেছে। এমন নাকি এক-আধদিন গেছেও—বিশেষ বিপাশা বলে এক ব্যারিস্টারের মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব, তার বাবা যেদিন নিজে নিতে আসেন তখন তিনিই ওকে ডেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যান—এর মধ্যে যে একটা দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রশ্ন আছে, সেটা কারুরই মাথায় যায় না।

এদিকে বউদির দাদা রথীনবাবুরা ভাবছেন গাড়ির কোনও গোলমাল ঘটেছে—চাকা ফুটো হয়েছে বা স্টার্ট নিচ্ছে না—ফিরতে দেরি হচ্ছে। শেষে যখন সেসব সম্ভাবনার সময়ও কেটে গেছে তখন মেয়েরা পুরুষদের খবর দিয়েছে, তাঁরা আপিস থেকে ফিরে ইস্কুলে গিয়ে খবর নিয়েছেন—কর্তৃপক্ষ কেউ নেই, দারোয়ান কিছু বলতে পারেনি। তারপর অবশ্য প্রিন্সিপ্যালকে পাওয়া গেছে, তিনি তখনই ইস্কুলে এসে ঝিকে, ড্রাইভারকে ডেকে পাঠিয়েছেন—কিন্তু কেউই কোনও খবর দিতে পারেনি, তাদের ধারণার কথা জানিয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। অতঃপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এতদিন তাঁরাও ব্যস্ত ছিলেন, তা ছাড়া শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে, মিছিমিছি উদ্বিগ্ন করে কোনও লাভ নেই বলেই সঙ্গে-সঙ্গে খবর দেননি, কিন্তু আর দেরি করা উচিত নয় ভেবেই এই খবর পাঠাচ্ছেন। ইত্যাদি—।

নলিনাক্ষর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। দশ-এগারো বছরের মেয়ে দোলা। সুন্দর দেখতে, তেমনি বুদ্ধিমতী। পড়াশুনোতেও ভালো। ভারি মিষ্টি স্বভাব। বউদির বাপের বাড়ির সব ছেলেমেয়ের মধ্যে এই দোলাই ওর সবচেয়ে প্রিয়। কতদিন এসে থেকে গেছে। যখন আরও ছোট ছিল, ওর বিছানাতেই এসে শুত, বলত, 'গল্প বলো না একটা নলিনকাকু, তুমি তো কত গল্প লেখো। নতুন গল্প বলতে হবে কিন্তু'—গল্প শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ত।

সে অস্থির হয়ে উঠল। বউদি কান্নাকাটি করছেন। সেজন্যও যত না হোক—নলিনাক্ষর নিজের মনের তাগিদও কম নয়। অথচ কী-ই-বা করবে তাও ভেবে পায় না। বউদি বলছেন, 'তুমি একবার যাও, তোমার কত জানাশুনো, তুমি গিয়ে চেষ্টা করলে পুলিশ আরও অ্যাকটিভ হয়ে উঠবে।'

কিন্তু সে-ধরনের চেষ্টায় কতটুকু বেশি ফল হবে তা বুঝতে পারে না নলিনাক্ষ। এদের ফেলে যাওয়াই কি ঠিক হবে! আঃ, এই সময় যদি দেবীপদকে পাওয়া যেত—।

ভাবতে-ভাবতে মনে পড়ল কথাটা। একটা কথা বলেছিল, 'দিবাভাগে দৃশ্য নয়। রাত্রেই ঘোরে সেজন্যে।' যদি এখন পুরীতে থাকে রাত্রেই দেখা পাবে। আর, মুখে যাই বলুক, তেমন বিপদ বুঝলে ওর দিকেও নজর রেখেছে নিশ্চয়। বিপদে গিয়ে পড়লে অন্তত ধমক দিতেও সামনে আসবে।

সেদিন অমাবস্যা, আকাশে মেঘের ভাবও আছে, যাকে কবিরা সূচীভেদ্য অন্ধকার বলেন তাই। মূর্তিমান ব্যাঘাত হচ্ছে শুধু ওই মধুপুর হাউসের আলোটা। নলিনাক্ষ ওদিকটা এড়িয়ে, ছোট মন্দিরটাকে ডাইনে রেখে, একটা হেলে-পড়া বাড়ির পাশ দিয়ে নামল সমুদ্রর দিকে। টর্চ হাতে ছিল কিন্তু ইচ্ছে করেই জ্বালেনি। বিপদ যদি সত্যিই কিছু থাকে, টর্চ জ্বেলে নিজের উপস্থিতি না জানানোই ভালো।

দেখা গেল, ওর হিসেবে বা অনুমানে কিছুমাত্র ভুল হয়নি।

বাড়িটার সবটা হেলে-পড়া নয়, শেষের দিকে একটা আউটহাউস মতো ছিল, সেইটেই

হেলে পড়ে আছে দীর্ঘকাল, বসবাসের অযোগ্য হয়ে—কিন্তু ভেঙেও পড়ে যায়নি। বাড়িটা মাঝে মেরামত করিয়েছেন মালিক, এটায় হাত দেননি। ওরা যেদিন প্রথম আসে সেদিন এ-বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখেছিল, আজ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকার। বোধহয় কেউ নেই, যারা ছিল কলকাতায় ফিরে গেছে।

ওদিক দিয়ে নেমে ঠিক খোলা জায়গায় পড়েছে—সেই হেলে-পড়া ঘর থেকেই কে একজন নিঃশব্দে অথচ তীরবেগে বেরিয়ে এসে ওর হাত চেপে ধরল।

ভয় পাওয়ার কথা নয়, এইটের জন্যেই তো বলতে গেলে আসা—তবু বুকের মধ্যে একটা কাঁপুনি লাগে বইকী! সেটা বুঝেই যেন সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রায়-অদৃশ্য মূর্তি বলে ওঠে, 'আবার বেরিয়েছেন এইভাবে! বারণ করেছিলুম না।' অর্থাৎ দেবীপদ।

বিপদের মুখে 'আপনি'র দূরত্বটা আপনিই চলে যায়, ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে নলিনাক্ষ বলে ওঠে, 'তোমার খোঁজেই এসেছি ভাই। বাঁচালে। যেভাবে খুঁজেছি আর ভেবেছি তোমার কথা, জগন্নাথই দয়া করে বুঝি মিলিয়ে দিলেন।'

'শান্ত হোন, শান্ত হোন। বসুন এদিকটায়। পিছনে আমার লোক আছে, এখানে কিছু হবে না। ব্যাপারটা কী?'

খুলে বলল নলিনাক্ষ। দোলার হারানোর বিবরণ, এ-পর্যন্ত যা-যা খবর পাওয়া গেছে।

দেবীপদ চুপ করে বসে শুনল সব, কেবল দারোয়ান, ঝি আর ড্রাইভারের এজাহারগুলোর বেলায় দু-একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করেছিল, আর ইস্কুলের নামটা জেনে নিয়ে বলেছিল, 'ও, মিস দাশগুপ্ত? তাঁকে আমি জানি, অত্যন্ত রেসপনসিবল মহিলা।' —তারপর নলিনাক্ষর কথা শেষ হতে শুধু বলল, 'এগারো বছর বয়েস, সুন্দর দেখতে? তবু ভালো। কুয়ায়েট কি ওই রকম কোনও আরব কানট্রির আমিরের হারেমে চালান হয়েছে, নইলে বিক্রি করে দিত ক্রীতদাসী হিসেবে। আফ্রিকা কি ইটালীর কোনও খেতে বিনা মাইনেয় সারাদিন ভূতের মতো খাটতে হত—পাহারা আর চাবুকের মধ্যে—রাত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে শুতে হত।'

'সে কি! কী সব বলছ মাথামুণ্ডু? এখনও ক্রীতদাস কোথাও আছে নাকি?'

'আপনি না খবরের কাগজের লোক? ময়রারা সন্দেশ খায় না শুনেছি, তা এ-ও সেইরকম দেখছি যে।'

'তুমি বড্ড হেঁয়ালি করো ভাই।'

'আমি সত্যি আর স্পষ্ট কথা বলি, আপনাদের মন তৈরি নয় বলে বুঝতে দেরি হয়। আই অ্যাম পসিবলি এ লিটল অ্যাহেড অব ইউ। যা হোক, যা দরকার সব শুনে নিয়েছি, আপনি বাড়ি যান। আপনার জীবন আদৌ নিরাপদ নয়, এ জেনে রাখবেন। কে জানে দোলাকে অপহরণ আপনাকে শিক্ষা দেবার জন্যেই কি না! কেলোকে হারানোর শোধ।...যান, উঠুন।'

আর বসতে সাহস হল না নলিনাক্ষর। দেবীপদর সঙ্গেও কথা বলার সময় হল না। সে আগের দিনের মতোই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল চোখের নিমেষে।

সমুদ্রের ধার থেকে উঠে আসবার পথটা চাকলাদারদের বাড়ির সামনে দিয়ে। বাড়িটা পরিক্রমা করে নলিনাক্ষদের বাড়ি ঢুকতে হয়। উঠে আসতে-আসতেই দেখতে পেল, চাকলাদারের বড় ঢাউস গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। এত রাত্রে আবার কোথায় যাচ্ছে? নাইট-শো সিনেমায় না কি? বাজারহাট তো এতক্ষণে সব বন্ধ হয়ে গেছে। মন্দিরেও তো যেতে দেখে না বিশেষ—তবে?

গাড়িখানা দূরে চলে যাচ্ছে, নলিনাক্ষও নিজেদের বাসার দিকে মোড় ফিরছে—আর-একটা ব্যাপার খেয়াল হল। মনে হল, অনেকক্ষণ ধরেই শুনছে, কানে আসছে, অত লক্ষ করেনি—কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ। চেনা-চেনা। কীসের শব্দ এটা! শব্দটা দূরে সরে যাচ্ছে, একটু পরে আর

শোনা গেল না। গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গেই যেন যাচ্ছে শব্দটা...তবে কি গাড়িরই কোনও শব্দ উঠছে? ইঞ্জিনের—? আশ্চর্য, মনে হয় ঠিক যেন মানুষ গোঙাচ্ছে!

নিজেদের বাড়ি ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল নলিনাক্ষ।

কথাটা ভাসা-ভাসা ভাবেই মনে এসেছিল, কিন্তু সহজে ভেসে গেল না।

মানুষ? গোঙানি? সেইরকমই কিন্তু। চাপা গোঙানি একটা। মনে হচ্ছে যেন, গাড়ির কেরিয়ার থেকেই শব্দটা আসছিল।

না—বাতাসের শব্দ?

সমুদ্রের বাতাস বন্ধ দরজা-জানলায় বাধা পেয়ে এই রকম গোঙানির শব্দ করে বটে। এখানে ঠিক বোঝাও যায় না ছাই।

বাতাসেরই শব্দ নিশ্চয়।

কিন্তু, কিন্তু থেমে—যেন মিলিয়ে গেল কেন?

দরজায় ধাক্কা খেয়ে বাতাসের শব্দ যদি হয়, সমুদ্রের হাওয়া তো এখনও সমান বেগে বইছে। দরজাও তো বন্ধ আছে, যেগুলো ছিল!

আর—মনে হচ্ছিল যেন, ওই গাড়িটার সঙ্গে-সঙ্গেই দূরে সরে যাচ্ছিল।

কে জানে! অত আর মাথা ঘামাতে পারে না। আসলে এই সব ভেবে-ভেবেই মাথা গরম হয়ে উঠেছে। নিজেরই ছায়াকে ভূত দেখছে। বাতাসের শব্দে গোঙানি শুনছে। হয়তো সাইলেন্সার পাইপে ফুটো হয়েছে কোথাও, তারই শব্দ ওটা। মনটা ঠিক প্রকৃতিস্থ থাকলে আগেই বুঝতে পারত।

দেবীপদটা এমন ভয় দেখায়! মজা দেখে—না কি?

পাঁচ

পরের দিন বাজার থেকে ফিরে দেখল দাদা কমলাক্ষ পৌঁছে গেছেন। সেদিন ওঁর আসবার কথা নয়, এইজন্যই এসেছেন, দোলার ব্যাপারেই। তাঁরও বিশ্বাস, ভাইয়ের লেখক হিসেবে একটু নাম-ডাক হয়েছে, অতবড় কাগজে চাকরি করে—সে চেষ্টা করলে পুলিশ একটু বেশি মনোযোগ দেবে, আরও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

স্বামীকে দেখে বৌদি আরও কান্নাকাটি করছেন। 'এত দিন হয়ে গেল। সে কি বেঁচে আছে! দ্যাখো গে যাও, কোথায় কে মেরে পুঁতে দিয়েছে।'

কমলাক্ষ বারকতক বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'খামকা তাকে মেরে ফেলে কার কী লাভ বলো। গায়ে এক-গা গহনাগাঁটি থাকলেও বা কথা ছিল। বরং ওই নলিনের বন্ধু যা বলেছে সেই সম্ভাবনাই বেশি। কাবুলে কি জর্ডানে কি ইরানে চালান করে দিয়েছে—'

'সে তো মরারই সামিল হল, সে-বেঁচেথাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।'

বউদির কান্না বেড়েই যায়।

সেদিনই রাত্রের গাড়িতে যাবে কি না নলিনাক্ষ সেই আলোচনা হচ্ছে—হঠাৎ বাইরে মধুবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'নলিনাক্ষবাবু আছেন না কি?'

বিরক্ত হলেও বেরিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাতে হল। কারণ 'আছেন না-কি'টা কথার কথা, জানলা থেকে দেখেই ডেকেছেন ভদ্রলোক।

মধুবাবু ওদের পিছন দিকে গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়ি ভাড়া এসেছেন। নিজে যেচে আলাপ করেছেন সেই প্রথম দিনটিতেই। তারপর থেকে প্রায় রোজই আসেন। সুবিধের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকেন না। দুটো-চারটে কথা বলে—খুব দ্রুত ওদের হাঁড়ির খবর নিয়ে চলে যান—আর, কখনও নিজের বাড়িতে

যেতে বলেন না এদের। বউদি বলেন, 'বলবে কী! গেলে যদি চা খাওয়াতে হয়! লোকটা হাড়-কিপটে। আমি দেখেছি নুলিয়াগুলো মাছ নিয়ে যায়, দেখলেই ডাকে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনও দিন নিতে দেখলুম না। ওই দর করেই সুখ।'

মধুবাবু ভেতরে এসে বিনা আমন্ত্রণেই চৌকিটায় বসলেন। বললেন, 'ইনি কে? দাদা বুঝি? মুখ দেখেই বুঝছি। আজকের গাড়িতে এলেন? তা হ্যাঁ মশাই নলিনবাবু, শুনলুম আপনাদের না কি একটি মেয়ে হারিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তা আপনি কোথা থেকে শুনলেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে নলিনাক্ষ।

'বাড়িতে এঁয়ারা বলছিলেন। কোথা নাকি শুনেছেন। তাই বলি একবার সঠিক জেনে আসি।'

অগত্যা বলতে হল কথাটা। মধুবাবুর জেরায় সবই ·বল·তে হল—হারানোর পূর্ণ বিবরণ।

'সর্বনাশ! হারানো কি বলছেন। এ তো চুরি। চুরি করেছে মশাই। নাকে ক্লোরোফর্ম বা অমনি কিছু দিয়ে অজ্ঞান করে নিয়ে গেছে, কিংবা তোমার কাকু দাঁড়িয়ে আছে—গাড়ি নিয়ে এসেছে—এমনি কিছু বলেছে। তারপর মুখ চেপে ধরে জোর করে কোনও গাড়িতে তুলেছে। শুনেছি হিপনোটাইজ করেও নিয়ে যায় অনেক সময়। মনে আছে—একটা ষোলো বছরের ছেলে কলকাতা থেকে উধাও হয়, তাকে বর্ধমান ইস্টিশানে পাওয়া গেছল? কিছুই বলতে পারে না কী করে এল সেখানে! এ একটা বিরাট গ্যাঙ হয়েছে মশাই। তা হারিয়েছে তো কলকাতায়—না কি? কোথায় থাকত এরা?'

'এরা বোঁদেলের কাছে থাকত।' নলিনাক্ষকে বলতে হয়। ভালো লাগছে না কারুরই এই সব বকবকানি, কিন্তু উপায়ই বা কী? —'হারিয়েছে ইস্কুল থেকে, মানে ইস্কুলে এসেছিল, পুরো ক্লাসও করেছে। ইস্কুলটা ওর বালিগঞ্জে—দেশপ্রিয় পার্কের কাছে।'

'তা হলে সে এখনও কলকাতাতেই আছে হয়তো। হইচই খোঁজখবরটা যাকে বলে, থিতিয়ে না গেলে ওরা বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে না। জানে তো, এখন চারদিকে চোখ রেখেছে পুলিশ। লুকিয়ে রাখতে গেলে, মশাই, নিরাপদ জায়গা এই কলকাতাই। আপনি যান নলিনবাবু, আপনি গেলে কাজ হবে। ...অতবড় কাগজে তো কাজ করেন—দিন খানকতক চিঠি ছেপে, নামে বেনামে—দেখেন না, একজন এককলম লিখলেন অমনি তার পোঁ ধরে পঁচিশখানা চিঠি অমনি ছাপা হয়ে গেল! কার এত গরজ মশাই? ওসব ওই আপিসে বসেই লেখা হয়, ওসব আমাদের জানা আছে। তা আপনিই বা সে অ্যাডভান্টেজ নেবেন না কেন? চিঠি ছাপুন, কলম লিখুন, এডিটোরিয়াল লেখান—ঠিক পুলিশের টনক নড়বে। বড় খবরের কাগজকে মশাই বোধহয়, ভগবান কেন—ভূতও ভয় করে। হ্যাঁ—যা বলছি, ভেবে দেখুন। কাগজ—ও বড় সাংঘাতিক জিনিস।'

আশ্চর্য! কাল থেকে নলিনাক্ষও ঠিক এই কথাগুলোই ভেবেছে। মধুবাবুকে প্রথম-প্রথম যতটা 'ফোরটোয়েনটি' সবজান্তা দাদা মনে হত—এখন তো ততটা মনে হচ্ছে না। জানেন অনেক কিছুই। কী করেন কে জানে। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'কী করি? কী না করি তাই বলুন। যখন যা পাই—দু-পয়সা রোজগারের ধান্ধা। জ্যাক অব অল ট্রেডস মাস্টার অব নান—সেই অবস্থা আর কী!'

অবশ্য সেসব কথা এখন আর উঠিয়ে লাভ নেই। নলিনাক্ষ বলল, 'আমিও তো আজই যেতে চাই। কিন্তু টিকিট? যা ভিড় এখন চেঞ্জারবাবুদের। রিজার্ভেশ্যন পাওয়া যাবে সদ্য-সদ্য?'

মধুবাবুর অদম্য উদ্যম। বললেন, 'চলুন না দুজনেই স্টেশনে যাই। গিয়ে সিচুয়েশ্যনটা বুঝিয়ে বলি স্টেশনমাস্টারকে। তাতেও না পান—একটা রাত না হয় আনরিজার্ভড কামরাতেই চলে যাবেন। কী হয়েছে, ইয়ংম্যান, দাঁড়িয়ে গেলেই বা কী ক্ষতি? সন্ধের বাস হয়েছে একটা—তাতেও যেতে পারেন। তাতে অবিশ্যি বসে যেতে পারবেন।'

সত্যি-সত্যিই তিনি একরকম টানতে-টানতে নিয়ে গেলেন স্টেশনে। বিশেষ সুবিধে হল না। রিজার্ভেশ্যন ক্লার্ক ঘাড় নাড়লেন। কোনও বার্থ এমনকী সিটও নেই। মধুবাবু তাতে দমবার পাত্র নন, হুড়মুড় করে স্টেশনমাস্টারের ঘরে ঢুকে গেলেন। বেশ একটু উত্তেজিতভাবে ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে একটা লেকচার দিলেন—যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ যখন একটা জীবনমরণ সমস্যা তখন তাঁদের উচিত অন্য কারও রিজার্ভেশ্যন ক্যানসেল করিয়ে নলিনাক্ষকে দেওয়া।

স্টেশনমাস্টার খুব সহানুভূতি জানালেন, কিন্তু তাতে আসল কাজের কিছু হল না। বললেন, 'দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, কোথায় কোন প্যাসেঞ্জারকে বঞ্চিত করব—সে হয়তো দেখুন কোনও রাজ্যের কোনও মিনিস্টার কিংবা এম.এল.-এর আত্মীয়। এক কথায় আমার সাজা হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু মশাই, বাবুলাল, সে জেনেশুনে মিছে বলেনি, দেখতেই ভুল হয়েছিল, এক প্যাসেঞ্জারকে বলে দিয়েছে স্লিপার বার্থ খালি নেই, তারপর বুঝি সেই প্যাসেঞ্জারেরই চেনা কে এসে পেয়েছে—এই কেস। লোকটি বুঝি কোন মিনিস্টারের কে, সইয়ের বউয়ের বকুলফুলের বোনপো-বোয়ের বোনঝি-জামাই, এক কথায় ডিমোশান হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ট্রান্সফার—লোকটার কেরিয়ারটাই ডুমড। না, সেসব পারব না। দেখি লাস্ট মোমেন্টে যদি কেউ আসে ফেরত দিতে, আমি আপনাকে খবর পাঠাব।'

তিনি সামনের ব্লটিং প্যাডে নলিনাক্ষর নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন।

মধুবাবুর উৎসাহ কিন্তু তবুও স্তিমিত হল না। তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, 'না মশাই, এ কোনও কাজের কথা নয়। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ, যা হোক একটা জোড়াতালি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে আমাদের। চলুন, একবার বাসটা দেখে যাই—।'

বাস-এ সিট ছিল। তবে রিজার্ভ করতে চাইল না। আসলে ওরা না কি এত আগে রিজার্ভ করে না। সাতটায় বাস ছাড়বে, পৌঁছোবে সকাল ছ'টায়। ছাড়বার একঘণ্টা আগে টিকিট দেওয়া হয়। যারা আগে এসে 'কিউ' দেবে তারাই পাবে।

সেইমতোই চলে আসছিল নলিনাক্ষ, না হয় চারটেতেই আসবে বাস-স্ট্যান্ডে—কিন্তু মধুবাবু ছাড়বার পাত্র নন। অনেক বড়-বড় বুলি ছেড়ে, স্পেশ্যাল কেস, এই রকম ক্ষেত্রে আইন শিথিল করা উচিত বুঝিয়ে দিয়ে—তারপর, এসব মন্ত্রেও যখন কাজ হল না, তখন মধুবাবু ব্রহ্মাস্ত্রটি ছাড়লেন। 'কতবড় খবরের কাগজে কাজ করে তা জানেন? এডিটার। সম্পাদকীয় লেখেন। জরুরি কাজ, যদি আপনারা একটু কো-অপারেশন মানে সহযোগিতা না করেন—পরে পস্তাবেন। উনি হুড়ো দিলে তখন দেখবেন কলকাতা ভুবনেশ্বরের গভর্নমেন্ট আপনাদের নভুতো নছুতো করবে!'

তাতেই কাজ হল। মধুবাবু নিজের পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে জমা দিয়ে দিলেন, কথা রইল ছ'টার মধ্যে এসে বাকি টাকা জমা করে দেবে নলিনাক্ষ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা করতে হল না। চারটের সময় স্টেশন থেকে পোর্টার এল, 'এখনই কেউ টাকা নিয়ে আসুন—একটা স্লিপার বার্থ পাওয়া গেছে।'

এ খবরটা আর মধুবাবুকে দিল না নলিনাক্ষ। এতক্ষণের সাহচর্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে। ভারি নাছোড়বান্দা লোকটা, সবদিক দিয়েই। যেন কাঁঠালের আঠার মতো গায়ে লেপটে থাকে। আর—উনি যা বলবেন তাই করতে হবে, আর কেউ যেন কিছু বোঝে না! সেইটেই আরও অসহ্য। ওয়েলমিনিং হয়তো—কিন্তু ওয়েলমিনিং ফুল।

ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ট্রেনের ব্যবস্থাটা হয়ে গেল। পরের দিন আপিসে গিয়ে খবর পেল পুরী থেকে কলকাতা আসার নাইট-বাস ভদ্রকের কাছে অ্যাকসিডেন্টে পড়েছে। কে বা কারা এক জায়গায় রাস্তার খানিকটা খুঁড়ে রেখেছিল—সেটা একটা বাঁকের মুখ, একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে

সেটা দেখতে পায় ড্রাইভার, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে পাশে ধানের ক্ষেতে গড়িয়ে পড়ে যায়। তিনজন মারা গেছে, এগারোজন জখম—তার মধ্যেও তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মনে হচ্ছে জগন্নাথই তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, স্টেশনমাস্টারের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করিয়ে।

ছয়

বাড়ি ফিরে স্নানাহার সেরে একটু সকাল-সকালই আপিসের দিকে রওনা দিল নলিনাক্ষ। এখন গিয়ে অনেক কিছু করতে হবে—ম্যানিপুলেশ্যন যাকে বলে। দোলাকে যদি বাঁচাতে হয়—মৃত্যু বা তারও অধিক শোচনীয় ভাগ্যের হাত থেকে—তা হলে এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে পুলিশকে আরও সক্রিয় করে তোলা। আর তা করতে হলে খবরের কাগজে 'আন্দোলন' করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। দেবীপদ সব জেনেছে ঠিকই, কিন্তু তারও নিজস্ব কাজ আছে—খুবই বিপজ্জনক কাজ, তার কথার ভাবে যা মনে হল—সে আর এদিকে কতটুকু মনোযোগ দিতে পারবে?

বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে—দেখল সামনেই মিঃ চাকলাদারের গাড়ি—গাড়িতে মালিক স্বয়ং। সেটাও ছাড়ছে তখন।

একটু অবাকই হল নলিনাক্ষ। তারপরেই মনে পড়ল সেদিনের কথা। গাড়িটা বেরিয়ে চলে আসা। ঠিক তো—কাল তো একবারও চোখে পড়েনি। তার মানে তখনই কলকাতা ফিরেছে।

চোখোচোখি হতে বলল, 'এ কী, আপনি? পুরী থেকে চলে এসেছেন বুঝি? কবে এলেন টের পেলুম না তো।'

'না-না,' ভদ্রতার প্রতিমূর্তি মিঃ চাকলাদার সৌজন্যে গলে গেলেন যেন, 'সেভাবে এলে আপনাকে বলে আসতুম বইকী। মাই ফ্যামিলি ইজ স্টিল দেয়ার। আমি একটা জরুরি কাজে এসেছিলুম। এই এখনই আবার ফিরে যাচ্ছি। তা আপনি যে এরই মধ্যে ফিরলেন?'

বলতে গিয়েও কারণটা বলল না নলিনাক্ষ। বলল, 'আমার অল্প দিনেরই মেয়াদ ছিল। আজ আপিসে জয়েন করতে যাচ্ছি। অবিশ্যি বউদিরা এখনও থাকবেন কিছুদিন।'

আপিসে গিয়ে অনেক কাজ করল। ওর ওই বিপদের কথা শুনে সকলেই যথেষ্ট আনুকূল্য করল। তিন-চারজনে বসে তিন-চারখানা চিঠি লিখে ফেলল, সেগুলোর লেখকের নামটামও দিয়ে দিল নিজেরাই। ওদের যে সাপ্তাহিক, তার সম্পাদককে বলতে তিনি এই নিয়ে একটা ফিচার করবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। নলিনাক্ষ নিজের কলমেও লিখল। সেদিন সম্পাদকীয় যাঁর লেখবার কথা, বরুণ চক্রবর্তী, তাঁকেও অনুরোধ করে এল। তিনি বললেন, 'আজ যদি নাও যায়, কাল ঠিক যাবে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সকাল-সকাল আপিসে গিছল কিন্তু সকাল করে ফেরা হল না। দু-একটা টেলিফোন সেরে—সে-খবরটা কোনওমতে দাদাকে পাঠানো যায় যাতে, সে-ব্যবস্থা করতে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে এক কনস্টেবল। দেখে অবাকও যেমন হল একটু আশাও জাগল মনে। তা হলে কি কোনও খবর পাওয়া গেছে দোলার?

'কী ব্যাপার বলো তো? কোন থানা থেকে আসছ?'

সে-কথার উত্তর না দিয়ে লোকটা বলল, 'আপনার নামই তো নলিনাক্ষবাবু?'

'হ্যাঁ—কেন? কোনও খবর আছে?'

হাতের তালুটা এতক্ষণ আধমুঠো করা ছিল সিপাইটির। সে এবার সেটা মেলে ধরল ওর সামনে, তাতে নলিনাক্ষরই একখানা ছোট ফটো।

মুখে বলল, 'দেবীবাবু আজ রাত বারোটার সময় কলকাতা পৌঁছবেন। আপনাকে একবার ওঁর আপিসে যেতে হবে সেই সময়। উনি গাড়ি পাঠাবেন, ড্রাইভারের কাছে এই ফটো থাকবে, দেখে তবে সে-গাড়িতে উঠবেন।'

'দেবীবাবু—হঠাৎ?'

'তা জানি না। আমার ওপর যেটুকু হুকুম হয়েছে—আমি জানিয়ে গেলুম। তবে যা শুনলুম, আন্দাজ হয় আপনারই কোনও কাজে যাওয়া না কি দরকার। নমস্কার।'

মুখে নমস্কার বলেও স্যালিউট করে চলে গেল সে—পুলিশি কেতা-মতো।

লোকটা চলে যেতে নলিনাক্ষ দরজা বন্ধ করে ভেতরে এসে বসল। আশাও একটু হচ্ছে বইকী।

দেবীপদ যদি ওর কাজেই আসছে বলে থাকে—তা হলে দোলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। তার আর অন্য কী কাজ?...কিন্তু দেবীপদ এখানে না এসে ওখানে ডেকে পাঠাল কেন? আপিসেই বা ওকে ডেকে নিয়ে যাবার কী দরকার? কাউকে সনাক্ত করতে হবে?

ওদের কমবাইনড-হ্যান্ড রঘু চা দিয়ে গেল। 'আউর কুছ খাইবে বাবু' প্রশ্ন করল। 'কিছু খাবে না' শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল আবার।

চা খেতে-খেতে মনে পড়ল, পুরীতে একখানা চিঠি লেখা দরকার—টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে বটে—তবে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায়নি কিছু—কী-কী করেছে সে, কতদূর—। তারচেয়েও যেটা দরকার ব্লেড নেই একখানাও। তাড়াতাড়ি আসার সময় ব্লেডের প্যাকেটটাই আনা হয়নি। আগে সেটা আনাতে বা আনতে হবে। নইলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে এখনই, কাল আটটার আগে পাওয়া যাবে না। এই এক উৎপাত হয়েছে আজকাল, সাড়ে-সাতটা না বাজতে-বাজতে ঝাঁপ ফেলা শুরু হয়ে যায় দোকানে-দোকানে। তবু ওদের মোড়ের দোকানটা দোর ভেজিয়ে সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বেচাকেনা করে, তাই রক্ষা।

অন্য দিন হলে রঘুকে পাঠাত। কিন্তু বৌদিরা কেউ নেই, রঘুই রান্না করছে। যেতে হলে ওকেই যেতে হবে। ভাগ্যে ধড়াচুড়ো ছাড়েনি এখনও। বাইরের কাজটা সেরে এসেই একেবারে জামা প্যান্ট ছেড়ে স্নান করে নিশ্চিন্ত হবে—

ব্লেড কিনে ফিরছে, অন্ধকারে একটা গাড়ির আলো এসে পড়ল সামনের বড় রাস্তায়—বহুদূর পর্যন্ত। আর তাতেই চোখে পড়ল আগে-আগে যাচ্ছে চাকলাদারের বড় গাড়িখানা—যেটা আজই পুরী চলে যাওয়ার—এবং এতক্ষণে সেখানে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

তবু সন্দেহ থাকতে পারত একটু—কিন্তু পিছনের গাড়িখানা আর একটু এগিয়ে গেছে। আরও জোর আলো গিয়ে পড়েছে সামনের গাড়িতে। না, ভুল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। সেই গাড়িই। এমনকী ভেতরে পরেশ চাকলাদারের মাথাভর টাকটাও দেখা যাচ্ছে দিব্যি।

সকালেই যে পুরী যাচ্ছিল সে এখনও এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার মানে যাওয়ার কথাও ছিল না, ইচ্ছাও না। জেনেশুনেই মিছে কথা বলেছে লোকটা।

না, লোকটার চালচলন ক্রমশই যেন কেমন-কেমন হয়ে উঠছে।

বউদির ধারণা দেখা যাচ্ছে একেবারে অমূলক নয়। মেয়েরা মানুষ চেনে অনেক বেশি সহজে, নিজেদের সহজ বুদ্ধিতে চেনে বলে চেনাটাও সোজা—পুরুষেরা অনেক বিবেচনা ভদ্রতার পাকে বাঁধা থাকে বলেই দেরি হয়।

কিন্তু বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে ওর একটা খটকা লাগল। গাড়ির নম্বরটায় তখন তত নজর দেয়নি, মনেও হয়নি কথাটা—কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এটা চাকলাদারের সে-গাড়ির নম্বর তো নয়। তবে কি সে ভুলই দেখল? পরেশবাবুর গাড়ি নয় ওটা?...তাই বা কেমন করে হবে! ডান দিকে ওই যে একটু রং-ওঠা দাগ, মিঃ চাকলাদারের টাক—সবই তো মিলে যাচ্ছে। নম্বরটাই হয়তো কী

দেখতে কী দেখেছে। অত তাড়াতাড়ির মধ্যে, তা ছাড়া নজরটা ছিল আরোহীর দিকেই—।

বাড়ি ফিরে স্নান করে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে বসতেই যেন রাজ্যের ঘুম জড়িয়ে এল চোখে।

চোখেরও অপরাধ নেই, কাল রাত্রে ট্রেনে একটুও ঘুম হয়নি। স্লিপার নামেই, সারারাত দুটি মহিলা বকর-বকর করতে-করতে এসেছেন, নিজেদের বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি, জামাইরা মেয়েদের কত বাধ্য, আর বউগুলো ছেলেদের পর করে নিচ্ছে—মোটামুটি এ-ই বক্তব্য। এ ছাড়া একজনের ছেলের অসুখ; বাচ্চাটা সারারাত কেঁদেছে প্রায়।

একটা লোক—বোধহয় তার ঘুম হয় না রাত্রে—প্রত্যেক স্টেশনে দরজা খুলে নামছিল। কোনও কিছুই কেনার নেই। দেখারও না, অত রাত্রে কী-ই বা দেখবে? অথচ ট্রেন থামামাত্র সে এত ব্যস্ত হয়ে নামছে, যেন কী প্রচণ্ড দরকার। পাছে অবাঞ্ছিত কেউ উঠে পড়ে সেই ফাঁকে—নলিনাক্ষকেই ঘাড় তুলে লক্ষ রাখতে হচ্ছিল, কারণ তারই ভয়ের কারণ ছিল—দেবীপদর সতর্কবাণী তামাশা কি না সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছে না। এইভাবেই কেটেছে সারারাত, তার ওপর আজ সকাল থেকে একটানা নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে, বিশ্রাম দূরে থাক, একমিনিট স্থির হয়ে বসতে পারেনি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ন'টা বেজে গেছে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে—স্থির হয়ে বসার সঙ্গে-সঙ্গেই। যতক্ষণ মানসিক উত্তেজনা আর উদ্বেগ ছিল, সেই টানে কাজ করে গেছে, এখন মনের রাশ একটু আলগা হতেই স্নায়ু শিথিল হয়ে আসবে—সেটা স্বাভাবিক। এর ওপর পেটে খাবার পড়লে আর কোনওমতেই জেগে থাকা যাবে না।

ঘুমনো উচিতও—কিন্তু ওই এক ঝঞ্ঝাট রইল, রাত বারোটায় দেবীপদর গাড়ি। গাড়ি কেন তাও তো বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বললে সে-ই তো যেতে পারত। ...কী যে ব্যাপার—সত্যিই কি তার এত বিপদের ভয় আছে? নইলে ড্রাইভার ছবি দেখালে তবে সে গাড়িতে উঠবে—এত সাবধান হবে কেন দেবীপদ? আশ্চর্য! সে কার কী অনিষ্ট করে বসল এত যে, তার প্রাণ নেওয়ার জন্যে এত আয়োজন চলছে! দেবীপদর আবার একটু বেশি বাড়াবাড়ি—

তন্দ্রায় দেহের সঙ্গে-সঙ্গে অনুভূতিগুলোও শিথিল হয়ে আসছে। চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তাই। আধ ঘুমে আধ সচেতনতাতেই দেবীপদর সতর্কতা থেকে মনটা চলে গেল ছবিখানায়। সিপাইয়ের হাতের ছবি। কবেকার ছবি! খুঁজে বারও করেছে বটে দেবীপদ—

অকস্মাৎ যেন একটা ইলেকট্রিক শ্যক খাওয়ার মতো কথাটা আঘাত করল ওকে। মুহূর্তে মনটা সক্রিয় হয়ে উঠল আবার। সোজা হয়ে উঠে বসল চেয়ারে।

সত্যিই তো, এ-ছবি দেবীপদ কোথায় পেল? নলিনাক্ষর নিজের কাছেও তো নেই। একটা স্টুডিয়োতে তোলা। ও আর ওর এক বন্ধু সুরঞ্জন, একসঙ্গে তুলেছিল। সুরঞ্জনই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তার কে এক আত্মীয়র স্টুডিয়ো, তারই শখ নলিনাক্ষর সঙ্গে ছবি তুলে রাখবে।

স্টুডিয়োতেই ছিল এককপি, সেটা মনে আছে, অনেক ছবির সঙ্গে একটা শো-কেস মতো ফ্রেমে বাঁধানো, ওদের কৃতিত্বের নমুনা-স্বরূপ। এমন কিছু ছবি না, সুরঞ্জনের আগ্রহে ও অনুরোধেই তাঁরা টাঙিয়ে রেখেছিলেন। ওকেও দিয়েছিল সুরঞ্জন এককপি, সে কোথায় কবে হারিয়ে গেছে, খেয়ালও নেই।

ছবিটা মনে পড়ছে ওই জামাটার জন্যে। বড়-বড় স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট; মা কিনে দিয়েছিলেন, তারই পছন্দ করা। তাঁর জীবদ্দশায় ওর জন্য ওই শেষ জিনিস কেনা তাঁর। জামাটা তারপর বৃন্দাবনে বানরে ছিঁড়ে দেয়, ওর খুব আঘাত লেগেছিল তাতে, মায়ের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে গেল বলে।

সেই নেগেটিভ থেকে সুরঞ্জনকে বাদ দিয়ে কেউ ছবিটা প্রিন্ট করিয়েছে। নেগেটিভটা তারা এখনও রেখে দিয়েছিল তার মানে। কিংবা ছবিটা থেকেই কেউ নতুন করে নেগেটিভ করিয়েছে—

কিন্তু দেবীপদ এত কাণ্ড করতে যাবে কেন?

পরশুই তো তার সঙ্গে দেখা হল। সে তো কখনও ওর কাছে ছবি চায়নি। এত কাণ্ড করার কী দরকার ছিল! এসব করলই বা কবে?

আর—আবারও বিদুৎ-চমকের মতোই মনে পড়ে গেল, দেবীপদই তো গত বছরে ওর ছবি তুলেছে একখানা। তার কপিও দিয়েছে, বেশ ভালো ছবি। সেটা না পাঠিয়ে এত করে এ-ছবি জোগাড় করার মানে কী?

না, ব্যাপারটা গোলমেলে মনে হচ্ছে।

তবে কি দেবীপদর আশঙ্কাটাই ঠিক? এটাও ওকে ধরে নিয়ে যাওয়ারই একটা ষড়যন্ত্র?

শুধু দেবীপদর নাম করলে যদি ওর সন্দেহ হয়, তাই আর একটু বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা? বেশি আটঘাট বাঁধবার চেষ্টা—এত কাণ্ড করে একটা ফটো জোগাড় করা!

এই 'বেশি'টাই ভুল হয়ে গেল ওদের। জামাটা যে চিনতে পারবে, অত হিসেব করেনি।

ঘুম ছুটে গেল একেবারেই। খাওয়া-দাওয়ার পর হাত-পা মেলে বিছানাতেই শুয়ে পড়ল, কিন্তু তখন আর কিছুপূর্বের সে-তন্দ্রার জড়তা কি ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। একটা বই পড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু তার একটা বর্ণও মাথায় ঢুকল না। ওর বিপদটা যে সত্যি—দেবীপদর কল্পনা নয়—এইটে বুঝে উত্তেজনা ও অস্বস্তি, সেইসঙ্গে একটু যেন নিজের সম্বন্ধে একটা বর্ধিত মূল্যবোধ—ইংরেজিতে যাকে বলে 'সেনস অফ সেলফ ইম্পর্টেন্স'ও বোধ করছে। সে-অবস্থায় ঘুমনো কি অন্য কিছুতে মন দেওয়া সম্ভব নয়।

সাত

এমনকী সেই তথাকথিত পুলিশ-গাড়ি চলে যাওয়ার পরও ঘুমোতে পারল না আর। কেমন যেন একটু ভয়-ভয়ও করতে লাগল—গা-ছমছম করা যাকে বলে।

ভালো করে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিলে নিজে হাতে, ছাদের দোর, সদর দরজা ভেতর থেকে তালাবন্ধ করল। নিজের ঘরের দরজাও বন্ধ করে তাতে একটা ভারি চেয়ার ঠেকিয়ে রাখল, যাতে কেউ বাইরে থেকে কোনও কৌশলে খিলটা খুলে নিঃশব্দে না ঘরে ঢুকে পড়তে পারে। সকাল হলে রাত্রের এই ভয় পাওয়ার কথা মনে পড়ে লজ্জা করবে—তা জানে, কিন্তু এখন এই ভয়ের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে যে বিন্দুমাত্র ঘুমের সম্ভাবনা থাকবে না, সেও সত্যি। সহজ সত্যকে সোজাসুজি মেনে নেওয়াই ভালো।

গাড়ি ঠিক রাত বারোটায় এসেছিল। একজন পুলিশের উর্দিপরা ড্রাইভার এসে দরজার বেল টিপে স্যালিউট করে দাঁড়িয়েছিল, তার হাতে সেই ছবি। নলিনাক্ষ যথেষ্ট অমায়িকভাবেই তাকে এসে ভেতরে বসতে বলেছিল। ইচ্ছে ছিল ভেতরে ঢুকলেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে পুলিশে খবর দেবে। সি.বি.আই. অফিসেও খোঁজ করবে দেবীপদ এসেছে কি না।

কিন্তু ড্রাইভারটি খুব হুঁশিয়ার, বোধহয় এ সমস্ত পরিস্থিতি অনুমান করেই তাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। সে আর-একটা স্যালিউট করে বলেছিল, 'আজ্ঞে না, গাড়িতে কেউ নেই, গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুকুম নেই আমাদের। আমি আপনাকে জানিয়ে দিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব—এইরকম ইন্সট্রাকশ্যন আছে আমার ওপর।'

তখন ভদ্রভাবেই বলতে হয়েছিল নলিনাক্ষকে, 'আমার শরীর খুব খারাপ, এত রাত্রে যেতে পারব না। সেই কথাটাই জানিয়ে চিঠি লিখে দিতাম। তা তুমি যখন বসতে পারবে না, মুখেই বলে

দিয়ো।'

না, লোকটা অতঃপর রিভলভার কি ক্লোরোফর্ম প্যাড বার করেনি, অভিনয় সম্পূর্ণ করতে আর-একটা স্যালিউট করে চলে গিছল শুধু।

আরও সেইজন্যেই ঘুম আসেনি চোখে। কে এরা, তাকে জালে জড়াতে চায়, কী এদের মতলব, কতদূর পর্যন্ত তারা যেতে প্রস্তুত, সত্যিই তাকে খুন করবে কি না—এইসব এলোমেলো গা-শিরশির-করা চিন্তাতেই রাত কেটে গিছল।

সকালবেলার জন্য আর একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল।

চা খেয়ে দাড়ি কামিয়ে স্নান করতে যাবে—ইদানিং-অতি-পরিচিত একটি কণ্ঠের ডাক এসে পৌঁছল, 'ভাই নলিনাক্ষবাবু, বাড়ি আছেন না কি? আমি মধুসূদন সমাদ্দার।'

অগত্যা দোর খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হল। তবে খুশি যে হল না কিছুমাত্র, সেটাও মুখভাবে গোপন করার চেষ্টা করল না। শুষ্ক বিরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আপনি হঠাৎ? হাতে ব্যাগ, স্টেশন থেকে সোজাই না কি?'

ওর মুখভাবের বা কণ্ঠের বিরসতার মতো তুচ্ছ জিনিস দিয়ে মাথা ঘামাবেন, মধুবাবু তেমন দুর্বলচিত্ত মানুষ নন। ঘরে ঢুকে ব্যাগটা সাবধানে একপাশে রেখে একটা চেয়ারে বসে পড়ে 'ফোঃ' করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন, 'আর বলবেন না। আপনার বৌদি যা কান্নাকাটি করছেন, আর স্থির থাকা যায় না। ...হ্যাঁ, স্টেশন থেকে সোজাই, অন্য কোনও কাজ তো ছিল না। শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতেই—আজই আবার ফিরব—হেঁ হেঁ, ও-ব্যাগে একটা গামছা, লুঙ্গি, একখানা বিছানার চাদর আর একটা ফুলনো বালিশ—হেঁ হেঁ, একটু চা বলুন বরং, সোজাই আসছি তো—আজকাল এত ভোরে পৌঁছয়—পথেও কোথাও দাঁড়ায় না গাড়িখানা, চা-ফা আর জোটেনি—'

'তা বউদিই বা পাঠালেন কেন? আপনি এসে আর কী করবেন? এতদিনে যা কেউ পারল না, আপনি এসে তাই করে দেবেন?'

বিরক্তিটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরও।

'না-না। পাগল, তাই কখনও পারি। হেঁ হেঁ, এ তো আর ম্যাজিক নয় যে টুপির মধ্যে থেকে মেয়েটাকে বার করে দেব! না-না, বউদিও পাঠাননি ঠিক। ইনফ্যাক্ট আমিই এসেছি। আসলে আমি বড় টেন্ডার-হার্টেড—বুঝলেন না, মেয়েদের কান্না-ফান্না—।'

একটু অপ্রতিভভাবে হাসলেন মধুবাবু। কিন্তু তখন নলিনাক্ষর হাসিও ভালো লাগছে না। বিশেষ তার তখন মনে হচ্ছে সবটাই কৃত্রিম। সে আবারও তেমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে আসল প্রশ্নে ফিরে এল, 'তা আপনি কী করতে চান এখন? আপনার কোনও প্ল্যান আছে?'

কিছু না। কিছু না। আমার এমনকী বিদ্যাবুদ্ধি বলুন যে, আপনারা এত মাথা-মাথা লোক যা পারছেন না, আমি অমনি একটা চটপট প্ল্যান বাৎলে তাই করব, আপনাদের ওপর টেক্কা দেব! ...আমি জাস্ট—যদি কিছু না মনে করেন, একটা টিপস দিতে চাই। বেনেপুকুর এরিয়া জানেন তো? কখনও গেছেন? ওই যে গ্যাস-ক্রিমোটারিয়ামটা আছে—পার্ক সার্কাসেরই দিকটা আর কি—যাননি কখনও? ধ্যুস মশাই, গেছেন নিশ্চয়, খবরের কাগজে কাজ করেন, সাহিত্যিক লোক—কত ঘোরেন।...ওইখানে কিছু ট্যাঁশ ফিরিঙ্গি আর মুসলিম ব্রাদারদের বাস। আছে বইকী, ভালো লোকও বিস্তর আছে, যত ভালো মিস্ত্রী সবই তো ওইখানে। খুব বিশ্বাসী আর বিশ্বস্ত—তা নয়, ওইখানেই কোথাও, মশাই, এই ছেলে-চালানের কারবার হয়, আমি জানি। পারেন একটু তলে-তলে খবর নিতে? মানে খবর যে নিচ্ছেন তা যেন না কেউ জানতে পারে। গোখরো সাপ নিয়ে খেলা, মনে রাখবেন—'

অসহিষ্ণুভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে নলিনাক্ষ বলল, 'এ-খবরটা আপনি জানেন, অথচ পুলিশ জানে না? আশ্চর্য তো!'

কণ্ঠের ব্যঙ্গটা প্রচ্ছন্ন থাকে না বলাই বাহুল্য।

ওই তো ব্রাদার! অবিশ্বাস করছেন, ভাবছেন আমি গুল ঝাড়ছি। আরে মশাই, মহাভারত পড়েছেন? ইটস এ গ্রেট বুক। পৃথিবীর আর কোনও ভাষায় লেখা হয়নি এমন বই—হোলি স্যাংসক্রিটে যা হয়েছে—পড়েছেন তো? চক্রব্যূহ করে কৌরবরা রেডি—এসো, লড়ে যাও কে আসবে, বেগতিক দেখে অর্জুন ভায়া সরে পড়েছেন একদিকে—তা হোক, বলি এদিকেও তো মহা-মহা রথীরা ছিল, কই কেউ পারল? শেষে কার শরণাপন্ন হতে হল—না অভিমন্যুর, এ মিয়ার ল্যাড অফ সিকসটিন! দো ম্যারেড—হি'জ নাথিং বাট এ বয়। তাই না? করেক্ট্ মি ইফ আই অ্যাম রং! বলুন ঠিক কি না?'

'তা বেশ তো, পুলিশকেই এ সাজেসশ্যনটা দিয়ে আসি।'

'খেপেছেন! পুলিশের চোদ্দোগুষ্টিকে চেনে ওরা। সাদা পোশাকেই যাক আর খাকিতেই যাক,—পুলিশ ও পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে গেলেই ভোজবাজির খেলা হয়ে যাবে—উধাও। স্রেফ ইভাপোরেট করবে। বুঝলেন না? ...না-না, এ হল লখিন্দরের আয়রন রুম, সরু সুতোর মতো সেঁধুতে হবে, বড়-বড় কেউটে-গোখরোর কাজ নয়। বলি পড়েছেন তো বেউলোর ফেবলস? মনে আছে পরীক্ষিতের কথা—এগেন আই রেফার টু দ্য গ্রেট বুক—চারদিকে কড়া পাহারা, ফলের মধ্যে ঢুকে বসেছিল তক্ষক, কে ধরবে? ...না মশাই, শিশুর মতো ইনোসেন্ট অথচ ইনকুইজিটিভ—এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হবে। পুলিশ-ফুলিশের কম্ম নয়, পারলে আপনি পারেন। কাউকে বলবেন না। জানাবেন না। মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা না প্রকাশয়েৎ—"চন্দ্রগুপ্ত" নাটক দেখেছেন? গ্রেট ম্যান চাণক্য—তারই কথা। মন-মন-কাজে খোঁজ করতে শুরু করুন। তবে ওই যা বললুম, খুব সাবধান। ডেঞ্জারাস গ্যাঙ। সাপের চেয়ে সাংঘাতিক। শুনেছি ওর মধ্যে ইংরেজ আছে, ইহুদি আছে, মোসলমান, মারোয়াড়ি, বেহারি, জাপানি—সব আছে। মনে রাখবেন—ইউ হ্যাড বীন ওয়ার্নড, ডোন্ট সে দ্যাট আই ডিড নট এক্সপ্লেন টু ইউ দ্য পসিবিলিটি অব ডেঞ্জারস।'

এবার নলিনাক্ষ একটু নরম হল। লোকটা যা-ই বলুক, একটু যে জানে তাতে সন্দেহ নেই। সে বলল, 'বেশ তো, চলুন না, দুজনেই যাই?'

'আমি?' যেন আঁৎকে উঠলেন মধুবাবু, 'মশাই, আমি ছাপোষা লোক, জেনেশুনে ও বাঘের গর্তে পা বাড়াতে রাজি নই। বাপ রে! না-না, ও কাজে আমি নেই। ইয়েস আই অ্যাম এ কাওয়ার্ড, স্বীকার করছি। না-না, আমার গন্ধও না পায়। দোহাই আপনার—প্লিজ! উপকার করতে এসেছিলুম বলে আমার আবার নামটি করে বসবেন না। কারও কাছেই না—খুব আপনার লোকের কাছেও না। বাতাসে কান পেতে থাকে ওরা। টের পেলেই গলাটি কচ। কাটথ্রোট! কাটথ্রোট! ওরা কি মানুষ? ওরা সব পারে।

তারপর একটু থেমে, অকারণেই রুমালে মুখ মুছে নিয়ে আবারও একটা 'ফোঃ' শব্দ করে বললেন, 'শোনেননি, এই কালকের কাগজেই বেরিয়েছিল প্রতাপগড়ের কাছে এক জায়গায় একটা লোক হায়নার চামড়া পরে—? দেখেননি? বাচ্চাদের রক্ত বার করে নিয়ে বিক্রি করত! তারপর কামড়ে-খিমচে এমন করে রেখে যেত—সবাই ভাবত হায়নাই মেরে রক্ত খেয়ে গেছে। দাঁতের দাগ পর্যন্ত করে রাখত। ...এইখানে যতীনদাস রোডে আমার জানাশুনো এক পেয়ার—বোথ দ্য হাসব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ, দুজনেই আপিস যেত—এই এক মেয়েদের আপিস করা হয়েছে মশাই, হোম-লাইফ ফ্যামিলি-লাইফটাই নষ্ট হয়ে গেল—হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাচ্চাটা থাকে ঝিয়ের কাছে, দিন-দিন রোগা হয়ে যায়। এরা বোঝে না, কেবল ভালো-ভালো টনিক খাওয়ায়, খাবার খাওয়ায়—কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে পাড়ার এক তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে এক বুড়ি লক্ষ করে যে—এরা বেরিয়ে গেলে

দু-একদিন অন্তর কারা এসে রক্ত বার করে নিয়ে যায়, বিক্রি করে। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে—কী পিশাচ এরা ভাবুন তো! কাইন্ড-হার্টেড—চোর-ডাকাতেরা এদের কাছে মহাপুরুষ! আমেরিকায় শুনেছি আগে এক রক্তচোষা বাদুড় ছিল, তা তাদের খাদ্যই ওই, এরা মশাই টাকার লোভে—বুঝলেন না। এরা আরও খারাপ, আরও খারাপ।'

'তা জেনেশুনে আমাকে একা যেতে বলছেন?'

'সে আপনার রিস্ক। সেইজন্যেই তো সাবধান করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বাঘের গর্তেই পা দেওয়া, বাঘের চোয়ালের মধ্যেও বলতে পারেন। আমি কিন্তু একা পুলিশ ছাড়া যেতে বলছি না। মাইন্ড ইউ—তবে এও বলছি, পুলিশ নিয়ে গেলে কিচ্ছু হবে না, পাত্তাই পাবেন না কারও। আচ্ছা, চলি ভাই।'

শেষ মার যাকে বলে তাই দিয়ে—এই 'শেভিয়ান' হেঁয়ালিটি করে বিদায় নিলেন মধুবাবু। এতক্ষণ এত বকছিলেন বসে-বসে—কিন্তু এখন উঠেই চট করে ব্যাগটি হাতে নিয়ে অতি দ্রুত বাস-রাস্তার দিকে চলে গেলেন, একবার ওর দিকে আর তাকালেনও না।

দরজা বন্ধ করে ফিরতে-ফিরতে মনে পড়ল, এসেই চা চেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সেটাই খাওয়ানো হল না।

স্নান করতেই যাচ্ছিল বটে, মধুবাবু যখন ডাকলেন, কিন্তু এখন আর সে-কথা মনে রইল না। রঘুকে ডেকে এককাপ চা দিতে বলে স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ।

ও-লোকটা রীতিমতোই ভাবিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষীও হতে পারে। এক-একজনের স্বভাব থাকে গায়ে পড়ে মানুষের উপকার করা। উপকার করেই নিজের যে কিছু দাম আছে এ সংসারে, সেইটে নিজে অনুভব করে, খুশি হয়। আবার একশ্রেণীর 'সবজান্তা দাদা' থাকেন, তাঁদেরও সে-জ্ঞানটা লোককে জানানো দরকার, আর গায়ে-পড়ে না জানালে তাঁদের উপায় কী?

এও কি তাই, এই মধুসূদন সমাদ্দারের ব্যাপারটা?

কিন্তু সেইজন্যে পয়সা খরচ করে পুরী থেকে ছুটে আসবেন? উঁহুঁ, তা সম্ভব নয়। কোনও বিশেষ মতলব ছাড়া মানুষ গাঁটের পয়সা খরচ করে পরোপকার করে না।

সে-মতলবটা কী তা হলে?

ওকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া? সেদিন উনি জোর করে যে-বাসের টিকিট কাটালেন, সেই বাসটাই দুর্ঘটনায় পড়ল। কে বা কারা পাকা বাঁধানো রাস্তায় নালা কেটে রেখেছিল। ওই বাসটাই আসবে বলে এই কাজ করেছিল কি না কে জানে! সাধারণ লুটেরারা, গাড়ি বা লরি এই গাড্ডা দেখে থামলে লুটপাট করার জন্যেও করতে পারে, কিন্তু কই, আর তো কোনও গাড়ির কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে খবর বেরোয়নি কোনও কাগজে।

আবার, এই যে খবর দিতে এসেছেন—হ্যাঁ, ও-পাড়ায় ক্রিমিনালদের আড্ডা থাকা সম্ভব, তেমনি ওখানে সন্ধ্যার পর একা গিয়ে পড়লে, যদি তেমন কারও মতলব থাকে—সাবাড় করাও সোজা। একটা বিশেষ পাড়ার সন্ধান দিলে—চার ছড়িয়ে টোপ ফেলার মতো—ধরার সুবিধেও হয়। হয়তো সেইজন্যেই, ওই ফাঁদে ফেলার জন্যেই, এমন গায়ে-পড়ে খবর দিতে আসার গরজ। লোকটা হয়তো ওর সেই অদৃশ্য (এবং অকারণ, ও কার কী করেছে?) শত্রুদলের চর।

অনেক ভাবল, অনেক তোলাপাড়া, হিসেব করল মনে-মনে। যতই ভাবে ততই এই শেষের দিকের পাল্লাটাই ভারি বোধ হয়। গোড়া থেকেই লোকটাকে ভালো লাগেনি। অথচ এড়াবারও পথ পায়নি খুঁজে। খুব অভদ্রতা কি রূঢ় ব্যবহার করবে এমন অজুহাতও খুঁজে পায়নি ওঁর আচরণে।

কিন্তু এবার যে রীতিমতোই সন্দেহজনক হয়ে উঠছে ব্যাপারটা—তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। উনি এত কথা জানলেন কী করে, সেইটেই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল! খুব ভুল হয়ে গেছে।

অপ্রসন্নতা ও অস্বস্তি বেড়েই যায়। ঘরের মধ্যে কোথাও বিষাক্ত সাপ আছে একটা, অথচ তাকে দেখা কি মারা যাচ্ছে না—এই অবস্থায় সেই ঘরে বাস করতে গেলে যেমন একটা সভয় অস্বস্তি থাকে—সেইরকম। অথচ কী করবে তাও ভেবে পায় না।

যথাসময়েই আপিসে গেল বটে, কিন্তু কে জানে কেন, এতটা হেঁটে গিয়ে বাস ধরতে যেন সাহস হল না। রঘুকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়েই গেল। আপিসে পৌঁছে ধন্যবাদ দিতেই সময় কাটল। সহকর্মীরা অনেক করেছেন—চিঠিগুলো বেরিয়েছে সব, সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছে। ফলে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার দেখা করতে এলেন ওর সঙ্গে, আপিসেই। তাঁরা যে কী পরিমাণ সক্রিয় হয়েছেন—তারই একটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানালেন, 'কলকাতার বাইরে চালান করার কোনও পথ রাখা হয়নি আর, অবিশ্যি যদি সেদিন সেই বিকেলের মধ্যেই চলে গিয়ে থাকে তো আলাদা কথা—এখন প্রত্যেকটি স্টেশন—শুধু এখানকারই নয়, ওদিকে আসানসোল এদিকে খড়্গপুর পর্যন্ত—এয়ারোড্রোম, সব ওয়াচ করা হচ্ছে, প্রত্যেক ট্রেনে লোক যাচ্ছে। আপনি তো আবার সি.বি.আই-কেও অ্যালার্ট করেছেন—'

বাধা দিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করল নলিনাক্ষ, 'কীরকম? সেটা কে বললে?'

'আমরা স্যার সব খবর পাই। আপনার বন্ধু দেবীবাবু কোথা থেকে একটা নোট পাঠিয়েছেন এখানের আপিসে, টপ প্রায়রিটি দিতে ব্যাপারটাকে। আরও বলেছেন, আপনার বাড়িতেও একটু নজর রাখতে—কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা অর্থাৎ আপনার ওপর কোনও হামলা না হয়—।'

নলিনাক্ষ তখন আগের রাত্রের ঘটনাটা বিবৃত করে বলল, 'এটা আপনারা জানেন?'

ভদ্রলোক মুখে একটা 'ফিউ' ধরনের আওয়াজ করে বললেন (বোধহয় বিলেত থেকে শিখে এসেছেন এ-মুদ্রাদোষটা), 'আমার রিপোর্ট হচ্ছে, গাড়ি একখানা এসেছিল বটে, তা থেকে পুলিশের উর্দিপরা একজন লোকও নেমেছিল, তবে একমিনিট কথা বলেই চলে গেছে। আমরা ভেবেছি সি.বি.আই. থেকে কেউ এসেছিল। ...বাই জোভ! আপনি তো ভাবিয়ে দিলেন দেখছি! হাউ এভার, এটা বলে ভালো করেছেন। আমি চেক করছি ব্যাপারটা।'

তিনি যথারীতি নমস্কারাদি করে বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরবে বলে তৈরি হচ্ছে, লালবাজার থেকে আবার একটি ফোন।

'হ্যালো, নলিনাক্ষবাবু! আমি লালবাজার থেকে বলছি। মধুসূদন সমাদ্দার বলে কাউকে চিনতেন?'

'কেন বলুন তো? চিনতুম মানে—অল্প দু চারদিনের আলাপ। আমরা পুরী গিছলুম, পিছনের বাড়িতেই উনি ছিলেন। সেই সূত্রেই আজ সকালেও একবার দেখা করতে এসেছিলেন। কোনও বিশেষ পরিচয় ছিল না। কেন, কী ব্যাপার জানতে পারি না?'

'পারেন বইকী। সল্ট লেকের যে জমিগুলো রিক্লেমড হয়েছে, তারই একটা মাঠের মধ্যে তাঁর ডেডবডি পাওয়া গেছে, একটু আগে। পকেটে একটা সাধারণ ধরনের নোটবই ছিল। তারই মধ্যে একটা কাগজের টুকরোতে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা—।'

'হ্যাঁ, আমিই লিখে দিয়েছিলুম পুরী থেকে আসার আগে। উনিই চেয়েছিলেন। তা ডেডবডি—মানে অ্যাকসিডেন্ট?'

'না, সেখানে অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই। এক যদি হওয়ার পর কেউ এনে ফেলে দিয়ে না থাকে। মার্ডার বলেই সন্দেহ হচ্ছে।'

আট

অতঃপর আর মধুবাবুর আন্তরিকতা—'বোনাফাইডি'তে সন্দেহ করার কোনও কারণ থাকে না। যে বাঘের গর্তের কথা অত করে বলে সাবধান করে দিয়ে গেলেন ভদ্রলোক ওকে—তাঁরই ভাষায়—টিপস দিতে এসে—সেই গর্তে নিজেই যে পা দিচ্ছেন তা জানতেন না।

ওকে বাঁচাতে গিয়েই নিজের জীবনটি দিলেন হয়তো।

আসলে উনি কিন্তু সেই মেয়েটার কথাই ভেবে এসেছিলেন। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরোবে তা জেনেও।

সেই কারণেই, তাঁর ইঙ্গিত দেওয়া পাড়ায় যেতে একটা ভয় করে। অমন ঘাগী লোকই ঘায়েল হয়ে গেল, তার মতো আনাড়িকে তো ছারপোকা মারার মতো মেরে ফেলবে। সবচেয়ে বড় কথা—শত্রু কে, কেন শত্রু, সেটা জানা থাকলেও সাবধান হওয়া যায়, সেইটেই যে বুঝতে পারছে না।

এধারে একটির পর একটি দিন কেটে যাচ্ছে, না ফিরছে দোলা, না পাওয়া যাচ্ছে তার কোনও খবর। রথীনবাবুর স্ত্রী নাকি পাগলের মতো হয়ে গেছেন একেবারে।

অনেক ভেবে আবার একদিন চৌরঙ্গী তালতলার মোড়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। আজকাল কোনও-কোনওদিন ট্যাক্সি করে আসে, এলেও খানিকটা এসে নেমে পড়ে, আবার বাস ধরে। কোনওদিন বা সবটাই বাসে আসে। আজও তাই এসেছে।

বাস থেকে নেমে নিজের অজ্ঞাতেই একবার যেন উৎসুকভাবে চায়, বুঝি সেই খোঁড়া ছেলেটাকে খোঁজে—বেঁচে নেই জেনেও। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাস্তায় নেমে আসে, চারিদিকে চেয়ে দেখে। পুরনো, মানে আগে দেখা ভিখিরিদের মধ্যে সেই গন্নাখ্যাঁদা লোকটা আছে আজ। নাকের কাছে বিরাট একটা গর্ত, ওপরের ঠোঁটও কাটা, বড়-বড় কটা দাঁত বেরিয়ে আছে সামনে—বীভৎস দৃশ্য। একটা হাতও কাটা লোকটার, কনুই থেকে। বাকি হাতটায় লোহার বালা একগাছা, মাথাতে সামান্য একটু চুল চুড়ো-বাঁধা, গালে অল্প-অল্প দাড়ি। দেখলে মনে হয়, শিখ সাজারই চেষ্টা আছে একটা।

সেও অমনি আধা-চলতি বা দাঁড়ানো গাড়ির ফাঁকে-ফাঁকে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।

নলিনাক্ষকে একটু নিরাপদ জায়গায়ে গিয়ে দাঁড়াতে হল। তার ফল হল এই যে, লোকটা এদিকে আর চায়ই না, তার সব নজরটাই গাড়ি আর গাড়ির আরোহীদের দিকে। যাই হোক, নলিনাক্ষও পকেট থেকে একটা দশ নয়া বার করে প্রস্তুত ছিল, একবার এদিকে চাইতেই সেটা দেখিয়ে ইশারা করল।

ছুটেই এল লোকটা। পয়সাটা হাত থেকে নিয়ে আবার ওদিকে ফিরছে, নলিনাক্ষ বলল, 'দাঁড়াও, আরও পয়সা দেব।'

একটু অবাক হয়েই এদিকে তাকাল লোকটা, এবার দৃষ্টিতে একটু সন্দেহের ছায়াও। অন্তত নলিনাক্ষর তাই মনে হল। সে এবার একটা টাকা বার করে দেখাল। বলল, 'এইটে দেব। তুমি আমার ক'টা কথার জবাব দেবে?'

সে একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, 'আমাদের বাবু ছুটোছুটি করে ভিক্ষে করতে হবে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ তো কথা কইতে পারব না। কী বলবেন, চটপট বলুন।'

'এইখানে একটা কালো মতো খোঁড়া ছেলে ভিক্ষে করত, কেলো নাম—সে কোথায় গেল বলতে পারো?'

লোকটার বীভৎস মুখ ভয়ঙ্করতর হয়ে উঠল। বলল, 'জানি না।' বলে চলেই যেত, কিন্তু একটা টাকার মায়াও কম নয়। তাই যেতে গিয়েও ইতস্তত করতে লাগল।

সময় নেই বেশি তা নলিনাক্ষ বুঝল। সেও সোজা আসল প্রশ্নে চলে এল, 'তোমার এমন হাল হল কেন? কেউ করেছে, না অ্যাকসিডেন্ট!'

'ছোটবেলায় ঘা হয়েছিল। ডাক্তার কেটে দিয়েছে।'

'সে না হয় নাকে হতে পারে। হাতটা?'

'গাড়িতে কাটা গিছল।'

তারপরই হিসহিসিয়ে উঠল লোকটা, 'সরে পড়ো দিকি। এখান থেকে চলে যাও। আর এমনধারা শয়তানি করতে এসো না। নিজেও মরবে—আমাদেরও মারবে।

সে আর পুরো ওই একটা টাকার মায়াও করল না, প্রায় ছুটতে-ছুটতে গিয়েই ভিড়ে মিশে গেল।

অর্থাৎ সেই একটা আকারহীন পরিচয়হীন বিপদের ইঙ্গিত।

ভয় নয়—আজ যেন বিরক্তিই বোধ করতে লাগল নলিনাক্ষ। এমন করে ছায়ার সঙ্গে লড়াই করার থেকে বিপদকে চ্যালেঞ্জ করাই ভালো। তা-ই করবে সে।

আপিসে আসতে দেরি হয়ে গিছল এমনিতেই, তবু তখনই নিজের ঘরে যেতে ইচ্ছে করল না। জানে কিছুই কাজ নেই। থাকলেও সে একঘণ্টার ব্যাপার। ঘুরতে-ঘুরতে নিউজ-রুম বা নিউজ-হলেই গিয়ে পড়ল।

সেখানে যে মুখরোচক বা উত্তেজক কোনও প্রসঙ্গর আলোচনা চলছে—তা বাইরে থেকেই টের পেয়েছিল, এখনও ঢুকতেই সকলে মিলে সেদিনের মতো 'এই যে!' বলে একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

নলিনাক্ষ জোর করেই হালকা হতে চেষ্টা করে। বলে, 'দেখি ধীরেনদা, একটা আপনার ওই গাঁজা-মার্কা সিগারেট। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

গৌরীবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমরা জানতুম স্মাগলারদের রাঘব-বোয়ালরা সব শহর বোম্বাইমে রহতা হ্যায়। এখানে থাকলেও চুনো-পুঁটি, বড় জোর খলসে। তুমি বাবা তোমার পাড়াতে এই চীজ জাইয়ে রেখেছিলে এতদিন ছিপায়কে-ছিপায়কে—তাও রাঘব-বোয়ালও নয়, একেবারে তিমিমাছ...হোয়েল।'

'কীরকম? সে আবার কী? তাও বলি তিমিমাছ জাইয়ে রাখা যায় না—কৈ-মাগুরই থাকে।'

'না বাবা। তিমি না হলেও হাঙর-কুমির তো বটেই।'

'কিন্তু মানুষটা কে—তাই যে শুনলুম না ছাই।'

'বলি পরেশ—পরেশ চাকলাদার, তোমার পাড়ায় থাকে তো—না কি?'

'তা থাকে। কিন্তু সে আবার কী করল?' এবার আর তামাশার সুর বজায় রাখতে পারে না নলিনাক্ষ। হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে টেলিপ্রিন্টারের কাগজটার ওপর।

দেখল কথাটা ঠিকই। পরেশ চাকলাদার ধরা পড়েছে। ওই পরেশ চাকলাদারই যে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঠিকানাও মিলে যাচ্ছে, তা ছাড়া অ্যারেস্ট করা হয়েছে, পুরী, চক্রতীর্থর কাছ থেকে। সেখানেই তার শোওয়ার ঘরে তিন লাখ টাকার মতো সোনা পাওয়া গেছে, সোনার বিস্কুট, বিদেশি ছাপ-মারা। তা ছাড়াও পাওয়া গেছে গাড়ির লাইনিংয়ের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য। চাকলাদারকে আপাতত ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখান থেকে সম্ভবত কলকাতায় আনা হবে।

লোকটাকে দেখতে পারত না, এ ঐশ্বর্য সোজা-রাস্তায় আসে না তাও জানে—তবু নলিনাক্ষ

যেন একটা প্রচণ্ড হতাশা বোধ করে।

আসলে, যে-সন্দেহটাকে এতদিন মনে-মনে লালন করছিল, যেটাকে কেন্দ্র করে ওর তাবৎ জল্পনা-কল্পনা, সেইটেরই মূলোচ্ছেদ হয়ে গেল। আবার নতুন করে সমস্ত প্রশ্নটা ভাবতে হবে।

দুটি লোককে সন্দেহ করছিল—দুটিই গেল। এখন কে?

শত্রু জানা থাকলে, দৃশ্য হলে তবু বোঝা যায়, অলক্ষ্যে থাকলেই ভয় বেশি।

দেবীপদটাও যদি এখানে থাকত। হয়তো সে-ই ধরাল পরেশবাবুকে। কিন্তু এখনও কী করছে সেখানে? আরও কেউ বাকি আছে? যাবে না কি আর-একবার পুরীতেই? সেখানে অন্ধকারে বিপদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে যদি সে ছুটে আসে। এখানেই বা কে থাকে, সেও তো একটা সমস্যা। রঘুর ওপর ভরসা করে যাওয়া চলে না। তা ছাড়া দাদাকে জরুরি খবর দিয়ে না-হয় আনানো চলত—দাদা এলে তাঁকে রেখে সেইদিনই রওনা দেওয়া চলত—কিন্তু এ তো শুক্লপক্ষ চলছে। অত আলোয় দেবীপদ বেরোবে না।

কী করবে কিছুই যেন ভেবে পায় না।

শূন্য ক্লান্ত মনেই বাড়ি ফিরল সে। সত্যিই কেমন একটা বিমূঢ় অবস্থা তার। কিছু ভাবতেও পারছে না গুছিয়ে। পরামর্শ করবে এমনও তো কেউ নেই। সকলকে সব কথা বলা যায় না।

শুধু এইটে বুঝতে পারছে—কোনও জ্ঞাত তথ্য থেকে নয়, যাকে ষষ্ঠানুভূতি বলে তাইতেই—যে, সময় আর মোটে নেই। যেন চারিদিক থেকে একটা জাল গুটিয়ে আনছে কে।

অদৃশ্য অথচ অনুভূতিগোচর চক্রান্ত ও অনিষ্টের জাল। হয়তো বা মৃত্যুরই ফাঁদ সেটা।

রাত্রে দাদা ফোন করলেন, তাঁর ছেলে অর্থাৎ নলিনাক্ষর আপন ভাইপোকে সেইদিনই সন্ধ্যায় মন্দির থেকে কে একজন সরিয়ে নিয়েছিল।

ওঁরা বিমলার মন্দিরে ঢুকেছেন, সে যে যায়নি ভেতরে অত কেউ লক্ষ করেননি—বেরিয়ে এসে দেখলেন নেই। চেঁচামেচি কান্নাকাটি পড়ে গিছল, একটা আধপাগলা ভিখিরি আনন্দবাজারে ঢোকার মুখে বসে ছিল, আপনমনে বিড়বিড় করে বকছিল—সেই-ই হঠাৎ উঠে একটা অশ্রাব্য গালাগাল দিতে-দিতে এসে ওর দাদার হাতটা ধরে ইঙ্গিত করে—অতিরিক্ত অসংখ্য যেসব ছোট-ছোট মন্দির আছে বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে পাঁচিলের ধারে—তারই একটার দিকে।

ছোট, মনে হয় বহুদিনের পরিত্যক্ত মন্দির। পাণ্ডার ছড়িদার যেতে চাইছিল না, ওর দাদা ছুটে গিয়ে দেখলেন একটা রোগামতো লোক ছেলেটাকে নিয়ে ওই মন্দির আর পাঁচিলের মধ্যে গুটিসুটি হয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। এরমধ্যেই ছেলেটাকে অজ্ঞান করে দিয়েছে। অতঃপর মারধোর, পুলিশে দেওয়া, যা করবার সবই করা হয়েছে কিন্তু ওর বউদি খুব ভয় পেয়ে গেছেন, তিনি আর একা থাকতে চাইছেন না দাদাকে ছেড়ে। তাঁর যে ভাইয়ের যাওয়ার কথা ছিল, তার আর যাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়। অথচ গুহবাবু না এলে সকলে বাড়ি ছেড়ে আসাও উচিত মনে হচ্ছে না, 'ইট ইজ হেল্ড্ ইন ট্রাস্ট' দাদা বললেন।

অগত্যা দাদা আপিসে টেলিগ্রাম করছেন, ডাঃ দত্তকে দিয়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়েও পাঠাচ্ছেন, 'সিক রিপোর্ট' যাকে বলে—অতিরিক্ত ছুটির জন্যে। নলিনাক্ষ ওঁদের জন্যে বেশি না ভাবে, যেন সাবধানে থাকে, যদি আপিস থেকে কোনও দারোয়ানকে কিছু দিয়ে রাত্রে বাড়িতে রাখতে পারে তো আরও ভালো। ইত্যাদি—

বক্তব্য শেষ করেও আর-একটি কথা বলেন দাদা। সেই পাগলটাকে বকশিশ-স্বরূপ দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলেন, সে নেয়নি, গালাগাল দিয়েছে, ওঁর দিকে চেয়ে থুথু ফেলেছে—কিন্তু তার

মধ্যেই একফাঁকে বলেছে, 'ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমনভাবে বেরোও কেন, লজ্জা করে না! ঘরে রেখো, রাত্রে বেরিয়ো না আর।'

সময় ছ'মিনিটও পার হয়েছে, আর কিছু না বলে দাদা রিসিভার রেখে দিয়েছেন। নলিনাক্ষর কোনও প্রশ্ন করা কি আর কিছু জানার সময় হল না আর।

তার দাদা যতই অবাক হোন, সে হয়নি। সে বুঝেছে। আশ্বস্তও হল একটু।

এ দেবীপদরই কাজ। ওদের পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

দেবীপদর কাছে জীবনের ঋণ বেড়েই যাচ্ছে দিনের পর দিন।

নয়

পরের দিন সত্যি-সত্যিই আপিস থেকে বেরিয়ে ইলিয়ট রোডের ট্রাম ধরল সে। মধুবাবু গেছেন কিন্তু তাঁর উপদেশটা আছে; মধুবাবু মরে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি ওর দলের লোক। অর্থাৎ ওর কল্যাণাকাঙ্ক্ষীই ছিলেন। তাই, কোনওদিকেই যখন কিছু করা যাচ্ছে না—তাঁর কথাটা শুনতে দোষ কী? অবশ্য হুঁশিয়ার করেও দিয়ে গেছেন যথেষ্ট, বাঘের গর্ত বলে গেছেন—সে যতটা সম্ভব সাবধানেই এগোবে—তবে এরকম অনিশ্চিত অনির্দেশ্য বিপদের ভয়ে দিন কাটানোর চেয়ে বিপদের দিকে এগিয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

ট্রাম থেকে নেমে আস্তে-আস্তে হাঁটছে—ঠিক কোনদিক দিয়ে কীভাবে যাবে; কী খুঁজতে এসেছে, কাকে কী জিজ্ঞাসা করবে তাও তো জানে না—বেনেপুকুরের মোড়ের মাথায় হঠাৎ বরকত আলির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নলিনাক্ষর মনে হল, এ ঈশ্বরেরই যোগাযোগ, মনে হল, ঠিক এইরকম একটি লোককেই খুঁজছিল সে।

বরকত আলি লোকটিকে দেখলে আগেই যে জীবটির কথা মনে আসে, সে হল শকুনি। রোগা, লম্বা, কালো, শকুনির ঠোঁটের মতোই ধারালো বাঁকা নাক, দুটি ছোট-ছোট তীক্ষ্ণ চোখ। মুখের ভাব নির্বিকার, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে ঠোঁটের যে ভঙ্গি প্রকাশ পায় তাতেই বোঝা যায় যে। লোকটি নির্মমভাবেই নির্বিকার। মায়া-মমতা-দয়া প্রভৃতি দুর্বলতা বা চিত্তদোষ কখনওই ওর স্বার্থসিদ্ধিপথে অন্তরায় হতে পারবে না কোনওদিন।

বরকত আলির প্রাথমিক পরিচয় অবশ্য রাজমিস্ত্রী হিসেবেই। মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, ভালো রাজমিস্ত্রী। বুদ্ধিমান বলেই সেই সংকীর্ণ কর্ম-গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বুদ্ধিমান—এবং অত্যন্ত ফিকিরবাজ, জোগাড়েও খুব। এখন ঠিকেদারি করে, অনেক বড়-বড় কন্ট্র্যাক্টারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের কাছ থেকে ভালো কাজ কেড়ে নেয়। তার কারণ, যারা ওকে একবার কাজ দেয় তারা আর অন্য লোককে দিতে চায় না। কোনও জিনিসের জন্যে তাদের আর ভাবতে হয় না, কোনও কারণে, কোনও অবস্থাতেই বাড়ির মালিককে বিরক্ত করে না। আপনি রাতারাতি একটা গোটা ঘর বদলে অন্যরকম অন্য ছাঁদে করবেন? তাই হবে, বরকত আলি তো আছেই। শুধু টাকাটা ঠিকমতো দিয়ে গেলেই আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

এইটেই হচ্ছে বরকত আলির চরিত্রের প্রধান দোষ বা গুণ। টাকার জন্যে না পারে এমন কাজ নেই, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। কেউ যথেষ্ট টাকা দিলে নিজের হাতে পায়খানা সাফ করবে ও, অম্লানবদনে। টাকা না দিয়ে একটু সামান্য কাজও করানো যাবে না। তবে একবার হাত পেতে টাকা নিলে সে-কাজ—ততটুকু টাকার মতো কাজ—করে দেবেই সে।

নলিনাক্ষ ওকে দিয়ে বহুবার টুকরো-টাকরা বহু কাজ করিয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও অনেককে ওর কথা বলে দিয়েছে। ফলে ওর সঙ্গে এতদিনে একটু বন্ধুত্বের মতোও হয়ে গিয়েছে। ঠাট্টা-তামাশা, রসিকতাও চলে দেখা হলে। যেখানে টাকার প্রশ্ন নেই, সেখানে বরকত আলি সহৃদয় সহজ মানুষ, রস-রসিকতা সে-ও করে এবং বোঝেও।

প্রাথমিক বিস্ময় প্রকাশ ও কুশল প্রশ্নের পর নলিনাক্ষ হাত ধরে টানতে-টানতে একপাশে নিয়ে গিয়ে একেবারে একশো টাকার একখানা নোট পকেটে গুঁজে দিল। কী দিল তা খুলে দেখার প্রয়োজন নেই বরকত আলির, ও যেন গন্ধতে বুঝে নেয় কে কত টাকা দিচ্ছে। নলিনাক্ষ কত দিল সে-কথা না বলে 'আরও দেব আমার কাজ উদ্ধার হলে' বলল শুধু।

বরকত আলির প্রশান্ত মুখে একটি রেখাও ফুটল না। যেন সে নলিনাক্ষকে এবং এই প্রস্তাব আশাই করছিল, এমনি ভাব তার। শুধু প্রশ্ন করল, 'কাজটা কী?'

বলল নলিনাক্ষ। ভরসা করে বলেই ফেলল। কাউকে না-কাউকে তো বলতেই হবে, যদি খোঁজ করতে হয়। বরকত তো তবু পরিচিত লোক। টাকা নিয়ে কারও সঙ্গে বেইমানি করেছে এমন শোনেনি আজও। আর যাকে বলবে সে কেমন হবে তা কে জানে।

সব শুনে বরকত কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে। তারপর বলল, 'কাজ করে দিলে আরও দেবেন বলছেন; এ যা কাজ—যদি বা আমি করেও দিই, করার পর আমি নেবার জন্যে বা আপনি দেবার জন্যে জিন্দা থাকবেন কি না জানি না। নগদটাই বুঝি আমি। এ যা বলছেন একটা আড্ডা নয়, একটা দলও নয়। এমন অনেক। দুনিয়াময় ছড়িয়ে আছে। অবশ্যি এদের একটা আড্ডা আমি জানি, দেখিয়েও দেব কিন্তু টাকা আগাম চাই।'

বরকত আলির চক্ষুলজ্জা আছে—বা প্রয়োজনের সময় অপরের মনে তার কোন কথার কী প্রতিক্রিয়া হবে—তা বিবেচনা করে মোলায়েম 'চিনি মণ্ডিত' করে কথা বলবে—এমন অপবাদ তাকে শত্রুতেও দিতে পারবে না।

নলিনাক্ষও তা জানে, ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করে, 'কত টাকা?'

'একহাজার টাকা। একহাজার টাকার আমার খুব দারকার। কালকের মধ্যে চাই। আমি আমার জামাইকে পাঠাব ধার চাইছি বলে, আপনিও সেইভাবেই তার সঙ্গে কথা কইবেন, ভেতরের কথা বলার দরকার নেই। তারপর কাল এমনি সময় এখানে আসবেন, আমি ওই গলিটার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনার দিকে চাইব না, আপনিও আমার সঙ্গে কথা বলবার বা কিছু ইশারা করার চেষ্টা করবেন না—তা হলে আপনিও মরবেন, আমিও মরব। আপনি এলেই আমি ঠিক দেখে নেব, ভাববেন না। আমার কাঁধে একটা ছাতি থাকবে, আমি গলিতে ঢুকব, আপনি একটু দূর থেকেই আমার পিছু নেবেন। যে বাড়ির সামনে গিয়ে ছাতিটা নামিয়ে আবার তুলব—। কাঁধে—ছাতির ডগাটা হেলিয়ে দেখিয়েও দেব—সেই বাড়ি জানবেন।'

তারপর একটু থেমে, মুখের আনত অবস্থাতেই আশ্চর্য কৌশলে কপিশ শ্যেন দৃষ্টিতে চারিদিক দেখে নিয়ে গলাটা আর একটু নামিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনিও থামবেন না, আমিও থামব না। ওদিকে খানিকটা গিয়ে আমি ডাইনে চলে যাব, আপনি আর কিছুটা গেলে বড় রাস্তায় পড়বেন। তখনই সে বাড়িতে যাওয়ার কি খোঁজখবর করার চেষ্টা করবেন না, ফিরেও আসবেন না। বাড়ি-ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। পরের দিন কেন, অমন পাঁচ-সাত দিন পরে এলেও চিনতে পারবেন।...'

আরও একটু থেমে হুঁশিয়ারির সুরে বলল, 'তবে আগেই বলে দিচ্ছি, আমার কোনও দায়দায়িত্ব নেই। আমি নিজের চোখে কিছু দেখিনি, এ ধরনের কারবারের কথা শুনেছি, আর কিছু জানি না। আমার মামা সওকৎ ওই বাড়িতে একবার কাজে গিছল, সামনে একটা বাড়ি, এটা দোতলা, পিছনে তেতলা বাড়ি আছে একটা, এ-বাড়ি দিয়েই সে-বাড়ি যেতে হয়—। সামনের বাড়িতেই কাজ ছিল, ওর তো সবতাতে নাকগলানো অভ্যেস—একবার একফাঁকে ভেতর-বাড়িটায় ঢুকে গিছল—একটা

ফুটো দিয়ে দেখেছে, একটা ঘরে অনেকগুলো বাচ্চা, সার-সার ঘুমোচ্ছে। ও অত বুঝত না। কিন্তু যে ডেকেছিল ওকে, তার কীরকম সন্দেহ হয় একটা, অনেক জেরা করে যে ভেতরের ওই বাড়িটার দিকে কখনও কোনও সময় গিছল কি না। সওকৎ বলে, বাপরে, সে যা জেরা, উকিলের বেহদ্দ। তাতেই আমার কেমন মনে হয়েছিল—এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ওগুলো সেই সব চোরাই বাচ্চা। ঘুম নয়—আফিং ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে রেখেছে।'

তারপর একটু থেমে হঠাৎ যেন বাড়ি মেরামতের হিসেব দিতে লাগল, 'ইট ধরুন তিন হাজার, মাটি একটন—এ তো লাগবেই। তা ছাড়া ধরুন, বালি আছে লোহা আছে, দরজা-জানলা—পুরনো কিনলেও এক-একটা একশো টাকার কম নয়। আপনি যতই যা বলুন, চার হাজারের কমে ও ঘর নামবে না।

নলিনাক্ষ অবাক হলেও এক্ষেত্রে যে বিনা মতলবে বরকত কিছু বলছে না—সেটুকু বোঝার মতো উপস্থিত-বুদ্ধি তার নষ্ট হয়নি। অনেক কষ্টে, মনোযোগ দিয়ে হিসাবটা বোঝার চেষ্টা করছে, সেই ভাবটা বজায় রেখে আড়ে চেয়ে দেখল একটা মোটামতো লোক হেলতে-দুলতে একেবারে ওদের পাশ দিয়েই চলে গেল। অকারণেই—ওদিকে ঢের জায়গা পড়ে থাকা সত্ত্বেও।

সে-লোকটা চলে গেলে আবার তেমনি প্রশান্ত মুখেই—পিছন ফিরে কি এপাশ-ওপাশ না তাকিয়েই আগের কথার খেই ধরল বরকত, 'বাড়িটাতে বেশি লোক থাকে বলে কেউ জানে না, একটি লোক—নিয়মিত যেন কাজে বেরোয়, কাজ থেকে ফেরে, হিন্দুস্থানী লোক মধ্যে-মধ্যে—মধ্যে-মধ্যে কেন বেশিরভাগই—পুলিশের পোশাক পরে বেরোয়, তাতেই সকলে ধরে নিয়েছে পুলিশে কাজ করে। মধ্যে-মধ্যে সিপাইয়ের পোশাক পরা লোকও আসে, হেঁটে, সাইকেল করে—আপিসের চিঠি নিয়ে যেমন আসে সাধারণত তেমনিই—। কিন্তু আমার ভাগ্নে বাহার বলেছে আমাকে, একবার তার সামনে একদিন পড়ে গিছল, দুজন এসেছিল, তার মধ্যে একজনকে বাহার চেনে—তার চোদ্দোপুরুষে কেউ পুলিশ নয়, চোরাই ভাঙ-গাঁজা-কোকেনের কারবার করে। আরও আছে, অনেক ব্যাপার। বাহার সামনের বাড়িতে যায়, ওর সব অনেকরকম কাজকাম আছে—সে থাক, ও লক্ষ করেছে অনেক জিনিস। বাজারহাট আসে, লোকে মাথায় করে নিয়ে আসে। অনেক মাল আসে এক-একদিন কিন্তু তবু গাড়ি আসে না। বাড়ির মেয়েদের কেউ দেখেনি, তবে এক-আধদিন গভীর রাত্রে মাথায় কাপড় দিয়ে বেরোতে কি ঢুকতে দেখেছে মেয়েছেলে। একদিন শেষরাতে না কি অনেক কে সব এসেছিল, ওই মোড়ের মাথায় গাড়ি রেখে—আবার পরের দিন শেষরাত্রে বেরিয়েছিল। বাহারকে কাজে পড়ে দু-তিনদিন ওই সামনের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল—তাতেই দেখেছে। ...যাই হোক, যা বললুম, ঠিকমতো তাই করবেন, যদি উলটো-পালটা কিছু করেন—আমিও উলটো গাইব, আমার কাছে সাফ কথা।'

দশ

নলিনাক্ষ মন স্থির করেই ফেলল।

এটুকু সে বরকতকে এতদিনে চিনেছে, সে যা বলেছে, তার নড়চড় হবে না, টাকা ও এক পয়সা কমাবে না। ওরও যখন এটা জানা দরকার—টাকার মায়া করলে চলবে না।

সে একটি ন'শো টাকার সেলফ চেক লিখে পিছনে সই করে বরকতের জামাই পেয়ার আলিকে দিয়েছিল।

পেয়ার আলি এসেছে সকাল আটটায়—তখন অত নগদ টাকা কোথায় পাবে? সইসাবুদের কোনও দরকার নেই, পেয়ার আলিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেটা, কোনও ধরা-ছোঁওয়ার

মধ্যে পড়তে হবে না, তবু সন্দেহ ছিল বরকত যে ধাঁচের লোক, হয়তো এ চেক সে নেবে না, কাজও করবে না।

কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে ট্রাম থেকে নামতেই তার চেককাটা লুঙ্গি, আদ্দির শার্ট আর কাঁধে ছাতাটা দেখা গেল। এদিকে ফিরে নেই, ওর সামনে কোনও পানের দোকানও নেই যে আয়নায় দেখবে —তবু নলিনাক্ষ নামামাত্র সে চলতে শুরু করল। ধীরে-সুস্থে, মন্থর গতিতে। পিছন থেকে যা মনে হল, ইতিমধ্যে একটি জর্দা দেওয়া পান সংগ্রহ করেছে—বেশ মৌতাতের আমেজে চিবোতে-চিবোতে যাচ্ছে সেটা।

যথাস্থানে গিয়ে ছাতা একদিকে হেলে কাঁধ-বদল হল। নলিনাক্ষ বাড়িটা আড়ে দেখে নিল। দোতলা পুরনো বাড়ি। যেমন এ-পাড়ার বাড়ি হয়। জানলায় পর্দা ঝুলছে, বাইরে নিচে একদিকে এক লন্ড্রি, একপাশে কোনও একটা কী গুদোম মতো, চাবি দেওয়া রয়েছে। আর একটু চওড়া গলি হলে সেটাকে গ্যারেজ ভাবা চলত। কিন্তু এখানে সাধারণ মাপের গাড়ি ঘুরিয়ে ওখানে ঢোকানো শক্ত।

পিছনে তিনতলা বাড়িটা এখান থেকে দেখা যায় না। তার একটা সরকারি পথ নিশ্চয়ই আছে আগমন-নির্গমনের—হয়তো সেদিকটা বন্ধ থাকে কিংবা এমন কোনও ভাড়াটে বসানো আছে, যাদের সে ভাড়া নেওয়াটা নিতান্তই আবরণ মাত্র।

তখন আর দাঁড়ানো উচিত নয়। দাঁড়ালও না। ঠিকই বলেছিল বরকত, ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। উলটো দিকের বাড়িটাও দেখে নিয়েছে, সদর দরজায় কে চকখড়ি দিয়ে চারশ বিশ লিখে রেখেছে। তার বাইরের একটা ঘরে সামান্য মুদির দোকান একটা, তার সঙ্গে চিঁড়ে-মুড়ি-ডিমও পাওয়া যায়।

কোনও মতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আবার বেরিয়ে পড়ল। সারারাত ঘুমই হয়নি ভালোকরে—উত্তেজনায় ও আশঙ্কায়, শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। এ ধরনের কাজ, গোয়েন্দাগিরি কখনও করেনি, কীভাবে করবে তাও জানে না। বরুণের বেলায় যেটুকু করেছিল— না জেনে। এ যে কোন বিপদের মধ্যে পড়ছে কে জানে! বারবারই মনে হচ্ছে—পুলিশের কাছে সবকথা জানিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িটা দেখিয়ে দেয়। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ছে মধুবাবুর কথাটা। 'পুলিশের কম্ম নয়'। মধুবাবু তাকে টিপস দিতে এসে প্রাণটা দিলেন। তাঁর কথার মূল্য অনেক।

ওখানে যখন পৌঁছল তখন সাড়ে দশটা। গলিটা যেন কালকের সে-গলি নয়, রীতিমতো কর্মব্যস্ত, জনমুখর রাস্তা। বহু লোক নানা কাজে যাতায়াত করছে, ফিরিওলা হাঁকছে। এর মধ্যে কে কোন বাড়িটা লক্ষ করছে কিংবা কার দিকে চেয়ে আছে—তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না।

বেড়াতে-বেড়াতেই যাচ্ছিল, কাছাকাছি একটা পানের দোকান দেখে সিগারেট কেনার জন্যে দাঁড়াল। দু-একটা দামি সিগারেট চাইল ইচ্ছেকরেই—যা এ-পাড়ায় পাওয়ার কথা নয়। পানওলা লোকটির মনে সম্ভ্রম জাগাবারই চেষ্টা এটা। কাজও হল, লোকটি বেশ খাতির করে—সাজা পান থাকা সত্ত্বেও আলাদা করে একখিলি পান সেজে দিলে, প্যাকেট খুলে টাটকা সিগারেট বার করে দিলে। তারপর প্রশ্ন করল, 'বাবু কি এ-পাড়ায় থাকেন? আপনাকে তো কই দেখেছি বলে মনে পড়ছে না—?'

নলিনাক্ষ ধীরে সুস্থে পানটা একটু চিবিয়ে কায়দা করে নিয়ে ওরই দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরাতে-ধরাতে বলল, 'না, আমার এক বন্ধু—অনেকদিন দেখিনি, সিঙ্গাপুরে চাকরি করে—ছুটিতে

এসে এইখানে কোথায় উঠেছে। আমার জন্যে একটা ভালো বেতের ব্যাগ আনার কথা। চিঠি দিয়েছিল—সেটা হারিয়ে ফেলেছি। ঠিকানাও তাতেই ছিল। তার নাম তপন ভৌমিক, কে এক ডিসুজার বাড়িতে উঠেছে এসে, ওইখানেরই পরিচয়—এইটুকু মনে আছে।'

'ডিসুজা?' ভুরু কুঁচকে নামটা মনে করার চেষ্টা করল পানওলা। তারপর বলল, 'রাস্তার নাম মনে আছে?'

'তা হলে তো গোল চুকেই যেত। কিচ্ছু মনে নেই। এই পাড়া, এমনি একটা ধারণা আছে শুধু—'

'তা হলে তো বাবু বলা শক্ত। অনেক গলি, অনেক লোক। ডিসুজা অবিশ্যি ছিল একজন, এই গলিতেই, তা সে তো বহুত রোজ কাবার হয়ে গিয়েছে—ফৌত, মানে মারা গিয়েছে। সে পনেরো-ষোলো বছরের ওপর হবে তো কম নয়। আর তো কই, ফিরিঙ্গি যা দু-একঘর এ গলিতে আছে—ডিসুজা কেউ না। ফার্নান্ডিজ আছে, টমাস, ডিমেলো—না, ডিসুজা কেউ নেই।'

'যে ডিসুজা ছিল বলছ—সে কোন বাড়িতে থাকত?'

'ওই যে—' আঙুল দিয়ে সেই বাড়িটাই দেখিয়ে দেয়—যেটা কাল বরকত আলি ইশারা করে গেছে।

'তা ওখানে তার কেউ—মানে, ছেলেমেয়ে ফ্যামিলি নেই?'

'না বাবু। কিরায়ার বাড়ি তো। তারপর বহুত হাতবদল হয়েছে। ডিসুজার বিবি বুড়ো বয়সে আমাদেরই এক মোসলমানকে শাদি করে আলিগড় চলে গিয়েছে। সে-ছোকরা টাকার লোভেই বুড়িটাকে নিকে করেছিল—শুনেছি টাকা-পয়সা কেড়েকুড়ে নিয়ে বুড়িকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সে এখন আগ্রায় না টুণ্ডুলায় ভিক্ষে করে খায়। মেয়েটার আগেই শাদি হয়ে গিয়েছিল—দুটো ছেলে, তারা সব কে কোথায় চাকরি-বাকরি করে—জানি না।'

'তা ও-বাড়িতে কে আছে এখন?' খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন, তবু মনে হয় পানওলার চোখে একটু সন্দেহের ছায়া পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে, 'মানে, ওইখানেই এসে উঠেছে কি না—'

'না না, ও-বাড়ি তারপর বহুত হাতবদল হয়েছে। এক উড়িয়া কিনেছে। সে সব ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিচ্ছে টাকা দিয়ে দিয়ে। শুনছি হোটেল করবে। বুঝেছেন তো, হোটেলে আজকাল বহুত মুনাফা। এইসব গলিঘুঁজিতে হোটেল তো নামেই—আসলে দেদার রেণ্ডীর কারবার চালাবে।'

'অ।' আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও কারণ নেই। একটা ভুলই করে বসল। আনাড়ির কাণ্ড। মনে-মনে নলিনাক্ষ জিভই কাটল একবার। এত কথা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বলা ঠিক হয়নি। এরপর এখানে বেশি ঘোরাঘুরি করলে কি খোঁজখবর করলে এই লোকটারই সন্দেহ হবে।

এর মধ্যে আর একটি খদ্দেরও এসে দাঁড়িয়েছে পান ও বিড়ির। এ-পাড়ারই লোক মনে হয়, লুঙ্গির ওপর নাইলনের গেঞ্জি পরা। রোগা কালোমতো—মুখে 'মার অনুগ্রহের' দাগ। সেও আড়ে চাইছে ওর দিকে।

একরকম মরিয়া হয়েই বলে উঠল নলিনাক্ষ, 'এ-পাড়ায় বাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়?... কীরকম ভাড়া?...আমাদের ওদিকে যে ভাড়া হয়েছে—আমাদের ক্ষমতায় আর কুলোয় না।'

সেই রোগা লোকটিই আগু বেড়ে কথা বলল। পান খাচ্ছিল, খানিকটা পিচ ফেলে এসে বলল, 'বাড়ি আপনার দরকার? কেতো ভাড়া দিবেন? ক'খানা ঘর চাই আপনার? আমার নাম সোলেমান, আমি বাড়ি-ভাড়ারই দালালি করি। হেঁ—হেঁ—'

'কীরকম ভাড়া এ-পাড়ায় তাই জিজ্ঞেস করছি। আমি এখন যে বাড়িতে আছি বাগবাজারে, অনেকদিন আছি—ভাড়া কমই দিই অবিশ্যি, নতুন নিলে ওর চেয়ে বেশি দিতেই হবে, আশি টাকায় পুরো দোতলা নিয়ে থাকি—তিনখানা ঘর, রান্নাঘর। তার কমে আমার কুলোবে না।'

'এত সোস্তায় বাড়ি কোথা পাবেন? সে-বাড়ি ছাড়ছেন কেন?'

'বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, বাড়িওলা সারিয়ে দেয় না। তারা চাইছে আমরা উঠে যাই। তখন ওই ফ্ল্যাট সারিয়ে ভাড়া দিলে কম-সে-কম দুশো টাকা পাবে।'

'সো তো ঠিক বাত আছে বাবু। জাস্তিই পাবে। তা আপনি কেতো কিরায়া দিতে চান?'

অভিনয়টা নিখুঁত করারই চেষ্টা করে নলিনাক্ষ, 'আমি তো চাইব যত কম দিয়ে হয়। সে কথা নয়—সওয়া-শো'র বেশি দিলে আমার কষ্ট হবে। বোনের বিয়ে বাকি, একা রোজগার করি—বুঝলে না?'

'হাঁ, সো বাত বোলেন। সোওয়া-সোতে মিলবে এ-পাড়ায়। লেকিন আর কোথাও মিলবে না। বালিগোঞ্জ, ভোয়ানীপুর চোলেন—তিন কামরা ফিলাট সাড়ে তিনসো মাংগবে—কোম-সে-কোম।

কিন্তু—কিছু মনে কোরো না—এ-পাড়াতে কি আমরা থাকতে পারব? সেইথেকে যা দেখছি, তোমাদের সব বিহারি, মুসলমান, ফিরিঙ্গি, চীনে এইসবই তো দেখছি। আমরা হিন্দু—মেয়েছেলে নিয়ে বাস করতে পারব কি?'

'খুব! খুব! বহুত শৌখসে। এ-পাড়ায় কোনও দাঙ্গাহাঙ্গামা কি চোরির কথা শুনেছেন? আখবারে পড়িয়েছেন? এখানে কেউ কারও কথা নিয়ে থাকে না বাবু, যে যার আপনার-আপনার কাম করে —খায়-দায়, থাকে—।'

'তা—বাড়ি, মানে তোমার সন্ধানে আছে? এখন দেখাতে পারবে?'

'এখোন তো পারব না বাবু, একঠো জরুরি কাম আছে, এখনই মাটিয়াবুরুজ যাতে হোবে! আপনি যদি মেহেরবানি করে সন্ধ্যায় আসেন—বড্ড ভালো হয়।'

'বেশ, তাই আসব। কোথায় আসব বলো।'

'এই মোড়ে আমি থাকব বাবু। কিংবা এই দুকানে। রাত সাড়ে-সাতটার মধ্যে পঁহুছিয়ে যাব, জরুর। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা, তাই হবে।'

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলে একটু ভয়-ভয়ই করতে লাগল।

কীরকম লোক, কী মতলব—কে জানে!

একবার ভাবল, গিয়ে কাজ নেই। আবার মনে হল, এখানে এ-পাড়ায় যদি খোঁজখবর করতে হয়, এ-ঝুঁকি তো নিতেই হবে। নইলেই তো বরং—শুধু-শুধু ঘুরলে—সন্দেহ করবে লোকে। যদি সত্যিই শত্রুর দৃষ্টি তার দিকে থাকে—সে তো বুঝেই নেবে। এ তবু বাড়িভাড়ার নাম করে—এ-বাড়ি পছন্দ হল না, ও-বাড়ি—অনেকবার যেতে পারবে এই ছুতোয়। চাই কি, এই উপলক্ষে আরও দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ হলে ওই বিশেষ বাড়ির খবরও বার করতে সুবিধে হবে। সোলেমানকে সুযোগ বুঝে কিছু কবলালে, সেও খবর দিতে পারবে।

বিকেলে আপিস থেকে বেরোবার সময় মনে হল, এখানে কাউকে কিছু বলে যাবে কি না, অথবা বলে পরামর্শ চাইবে কি না। কিন্তু তেমন কারও কথাই মনে পড়ল না। এখানে বন্ধু বলতে কেউ হয়নি এখনও। ছোকরা যারা—মদ-হইহল্লা—এই নিয়েই আছে, 'বৃদ্ধ স্তাবৎ চিন্তামগ্ন' শঙ্করের ভাষায়, যে যার উন্নতি, কিসে কী সুবিধা আদায় করা যায়—রিটায়ার করার আগে কতটুকু রস নিংড়ে বার করে নিতে পারে কুনাল দত্তর, এই চিন্তাতেই মগ্ন। ছেলে-ভাইপো-ভাগ্নের চাকরির জন্যে ব্যস্ত।

সুতরাং কাউকেই কিছু বলা হল না।

যাওয়ার সময় আপিস-ক্যান্টিন থেকে একটু চা ও খাবার আনিয়ে খেয়ে নিল শুধু। যদি ফিরতে দেরি হয়, ও-পাড়ায় চা খাওয়ার কোনও জায়গা নেই।

বেরিয়ে ট্রামে উঠতে-উঠতে একটা কথা মনে পড়ল—'ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দার।' ওরও অবস্থা তাই। যাচ্ছে গোয়েন্দাগিরি করতে—একটা কোনওরকম হাতিয়ার নেই সঙ্গে। অথচ দেবীপদ বন্ধু ছিল, ধরে পড়লে একটা রিভলভারের লাইসেন্স পাওয়া কঠিন হত না। এমনিও যে চেষ্টাচরিত্র করলে পাওয়া যেত না তা নয়—চোরাই-মাল লুকিয়ে-চুরিয়ে বিস্তর বিক্রি হয়। ...কিছুই করা হল না, কথাটা মনেই পড়েনি, অথচ যাচ্ছে, মধুবাবুর ভাষায়, বাঘের গর্তে পা দিতে! বাঘের চোয়ালের মধ্যে, কে যেন বলেছিল না—দেবীপদই তো। এককড়ি। সে যদি থাকত, তাকে জানালেই আর এত কাণ্ড করতে হত না ওকে। কী যে হল ছোকরার।

মোড়ের মাথায় পৌঁছতেই দেখল সোলেমান, প্রসন্ন মধুর অমায়িক হাসিতে মুখটি রঞ্জিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তফাতের মধ্যে এ-বেলা গায়ে একটা জামা উঠেছে, হাফ-শার্ট একটা।

'আসুন বাবু। সালাম। ওঃ, কী যে করেছি আপনার জন্যি! মাটিয়াবুরুজ গিয়ে তো আটকে গিছলাম, আমার এক বুনের বর বহুত বদমাশ আছে, তারই তালাকের জন্যে ঘুরছি—সব ঠিক, আজ গিয়ে দেখি নানান ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে রাখছে। সেই মামলার কেজিয়া করতে-করতে দেখি পাঁচটা বাজে। কী করব, বলি ভোদ্দোরলোককে কোথা দেওয়া আছে—ইনগেজমেন্ট—খেলাপী হলে তো আমাকে জানোয়ার ভাববেন। তাতেই, যা কখনও করিনি, টাক্সি-মটর নিয়ে চলে এলাম। বাড়ি তো খোঁজে ছিল না, দু-ঘণ্টায় কত খুঁজব বোলেন। যাই হোক, দুটো ফিলাট দেখেছি, চলুন দেখিয়ে দিই—বাড়ি, বিশোয়াস রাখবেন, কালকের মধ্যে আউরও চার-পাঁচটা পাইয়ে যাব। আজ তো ই-দুটো দেখাই। একটার ভাড়া একশো-তিশ, একটার কিছু কম হোবে। লেকিন—গলা নামিয়ে বলে—উপরে কেরেস্তান থাকবে বাবু। দেখেন—আউর দেখাব। ইটা তো দেখেন—।'

খুশি হল নলিনাক্ষ। সে তো এখানে বারবার আসারই সুযোগ খুঁজছে। সে বললে, 'বলো তো কালই না হয় আসব—আজই যে ঠিক করতে হবে কোথাও একটা, এমন তো তাড়া নেই—। জলে তো পড়িনি একেবারে।'

গলিতে ঢুকতেই সেই পানওলা লম্বা একটা সেলাম ঠুকল, 'আসুন বাবু, একখিলি পান? সেজে রেখেছি আপনার জন্যে। আর সেই সিগারেটও, সকালে যা চাইছিলেন—।'

লোকটাকে হতাশ করতে মন চাইল না। এ হাতে থাকলে বিস্তর খবর পাবে। এসব জায়গায় এই পানওলারা অনেক খবর রাখে পাড়ার। সেও এগিয়ে গিয়ে বলল, 'দাও। সোলেমানের দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো? বেচারার তো বোধহয় খাওয়াও হয়নি—।'

'কুছু না, কুছু না। একঠো পান খাইবেন, কেতো দেরি হোবে? আমিও একঠো বিড়ি ধরিয়ে লিই।'

পান মুখে দিয়ে সোলেমানের সঙ্গে সেই গলি দিয়েই এগোল। বরকতের দেখিয়ে দেওয়া সে বাড়িটা ছাড়িয়ে গিয়ে একটা চার ফুট কানাগলি পড়ে। তার ভেতর না কি বাড়ি—কিন্তু সেইখানটায় গিয়েই নলিনাক্ষর মাথাটা প্রচণ্ডভাবে ঘুরে গেল। মনে হল, বিরাট ভূমিকম্প হচ্ছে, গলির নিচটা তার দিকে অর্থাৎ উপর দিকে উঠতে চাইছে। তারপরই সব অন্ধকার হয়ে গেল চোখের সামনে। সোলেমান তার অবস্থা বুঝে ধরে না ফেললে মাটিতে পড়ে যেত বোধহয়।

মনে হল, যেন আরও কে ওই কানাগলিটা থেকে বেরিয়ে এসে ওর আর-একটা হাত ধরল। টানছে যেন ওইদিকেই। সোলেমানও। তারপর আর কিছু মনে নেই। আর কিছু জানে না। সব অন্ধকার। গভীর সুষুপ্তি।

এগারো

মাথার মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা, তারপর প্রথম যে অনুভূতি হল নলিনাক্ষর, তা এই।

কিছুই বুঝতে পারে না, কেন এমন যন্ত্রণা সেইটেই ভাবতে চেষ্টা করে শুধু। চোখ খুলতে কষ্ট হয়—কিছুতেই যেন চাইতে পারে না, গভীর ঘুমে যেমন চোখের পাতা এঁটে থাকে, তেমনিই। হেমন্তের বা শীতের দিনে দুপুরে ঘুমোলে অনেক সময় এইরকম অবস্থা হয়, চেতনা থাকে, ওঠা উচিত এবার বোঝে—উঠতে চেষ্টাও করে কিন্তু চোখ থেকে ঘুম যেতে চায় না, চোখ খুলতে পারে না।

কেন এমন হচ্ছে ভাবতে গিয়ে মাথায় যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। সেই বমির ভাবটাও। চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকে আরও খানিকটা। পরে তার আস্তে-আস্তে কেমন একটা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যর অনুভূতি হতে থাকে। বড় কষ্ট। মনে হচ্ছে কোনও কঠিন জায়গায় শুয়ে আছে। আর আছেও বোধহয় অনেকক্ষণ একভাবে। নইলে এমন কষ্ট হবে কেন? তার বিছানাটা এত শক্ত হয়ে গেল কী করে? বউদি নেই, কেউ রোদে-টোদে দেয় না। রঘুটা কী করে? বকতে হবে ওকে—।

কিন্তু এটা বিছানা কি! কীরকম যেন লাগছে?

উঃ—কী গরম! যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হল, ঘামই গড়িয়ে চোখে পড়েছিল—অন্তত জ্বালাটা সেই রকম—বন্ধ পাতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে জ্বালা করে উঠল চোখটা। তাতেই হাতটা যেন আপনিই উঠে এল চোখের দিকে, (হাত এত ভারি বোধ হচ্ছে কেন? যেন অবশ হয়ে গেছে! প্যারালিসিস হল না কি?) হাতের উলটো পিঠ করে চোখটা মুছতে গিয়ে আরও খানিকটা ঘাম গেল বোধহয় চোখে—আরও জ্বালা—যার ফলেই বোধহয় ঘুমের সেই আচ্ছন্ন-করা ভাবটা কেটে গেল, একটু-একটু চোখ পিটপিট করতে-করতে—চোখ জ্বালা করলে যেমন একবার খোলে আবার বন্ধ করতে বাধ্য হয়—সেইভাবেই একসময় চোখটা খুলে ফেলল।

কিন্তু চোখটা পুরোপুরি যখন খোলা গেল—তখন বিহ্বলতা আরও বাড়ল।

সে কোথায় এসেছে, কোথায় আছে? এ কোন জায়গা? সে কি জেগে আছে—না ঘুমুচ্ছে এখনও? কিছুই বুঝতে পারছে না কেন? পাগল হয়ে গেল নাকি?

আবারও ক্লান্তভাবে চোখ বুজল সে। নিজেই। ইচ্ছে করেই। মাথার যন্ত্রণা তো আছেই, সেই গা-বমি ভাবটাও। এই বিহ্বলতা ও অনিশ্চয়তাতে যেন মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেছে।

চোখ বুজে পড়ে থাকতে-থাকতেই একটু-একটু করে মনে পড়ল সব। রঘু, রঘু কোথায়? সে চা দিচ্ছে না কেন?

এই রঘুর সূত্র থেকেই বউদি, পুরী, দোলা, তার আপিস, মধুবাবু—একটা চেনে-বাঁধা মটরমালার দানার মতো একটার পর একটা মাথায় এসে গেল। যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে উঠছে, অনুভূতি বা চেতনা পরিষ্কার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বোধহয়—তা হোক, সবই মনে পড়ছে এবার। বরকত আলি, পানওলা, সোলেমান। পান খাওয়া, তারপরই সব অন্ধকার হয়ে যাওয়া।

অর্থাৎ সে বাঘের গর্তেই পা দিয়েছিল, বোকার মতো, আহাম্মকের মতো। মধুবাবু, দেবীপদ কারও সতর্কবাণীতে কোনও কাজ হয়নি—বর্তমানে সে বাঘের চোয়ালের মধ্যেই, দাঁতটা শুধু যা বসাতে বাকি।

এবার ভালো করে চেয়ে দেখল। একটা নিশ্ছিদ্র নিরেট দেওয়ালওলা ঘরের মেঝেতে সে পড়ে আছে। বিছানা নেই, কোনও আসবাব নেই। কোথাও জানলা বা দরজা নেই। এককোণে একটা মাটির গামলা, বোধহয় প্রাকৃতিক কাজের জন্যে, আর একপাশে একটা টিনে—বোধহয় খানিকটা জল।

জানলা নেই, তবে সে দেখতে পাচ্ছে কী করে? নিশ্বাসের জন্যে বাতাসও তো দরকার?

ছাদের দিকে চাইতে সে-রহস্যটাও পরিষ্কার হল। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরায় যেমন ছাদে কতকগুলো ফুটো থাকে—তেমনিই আছে, মনে হয় ছাদটাও লোহারই। আর তেমনিই এককোণে একটা ফুটো দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালে, সাদা দেওয়ালে পড়ে সেটা প্রতিফলিত হয়ে একটা আলোর আভাস সৃষ্টি করেছে। আলো খুবই কম, বোধহয় দশ বাতি কি পনেরো বাতির বাল্‌ব্ আছে—কিন্তু নীরন্ধ্র অন্ধকারে তা-ই যথেষ্ট।

নিশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলেও বাতাস নেই। অসহ্য গুমোট, তাতেই যেন যন্ত্রণা বেশি মনে হচ্ছে। ঘামে জামা-প্যান্ট ভিজে জলের ধারার মতো মেঝেয় গড়াচ্ছে। এগুলো খোলা দরকার।

ওঠবার চেষ্টা করল—সমস্ত দেহ যেন কেমন ভারি আর অনড় হয়ে গেছে—পারল না প্রথমটায়। আরও অনেক পরে, অনেক চেষ্টায়, প্রথমে পাশ ফিরে তারপর একটা হাতে ও আর একটা কনুইতে ভর দিয়ে শেষ অবধি উঠে বসল।

কাল যে সাংঘাতিক বিষ খাইয়েছিল—তারই ফল নিশ্চয় এটা। সবাই সব জানে, শত্রুদলের (শত্রুই বা কেন, সে-প্রশ্নটাও থেকেই যাচ্ছে) পয়সা-খাওয়া লোক। পানগুলা জেনেশুনেই নিশ্চয় পানে বিষ মিশিয়েছে। অজ্ঞান-অচৈতন্য করার জন্যে। কী বিষ কে জানে? তার আরও কী কুফল ভোগ করতে হবে! এ মাথার যন্ত্রণা, এই বমি ভাব—এও নিশ্চয় সেইজন্যেই।

কিন্তু ঘটনাটা কাল ঘটেছে, তাই বা ভাবছে কেন? কাল কি ক'দিন আগে—তাও তো জানে না। দিন না রাত্রি এটা?

কে জানে, কে বলবে! এ কী অদ্ভুত অবস্থা! কী ওদের মতলব কে জানে! এরা কারা তাও তো জানে না! হায় রে তার বুদ্ধির অহঙ্কার! অন্ধকার যেমন ছিল তেমনিই রইল—মাঝখান থেকে প্রাণটাই গেল। দোলা কিছু তার আপন মেয়ে নয়, আপন ভাইঝিও নয়—মিছিমিছি কেন যে তার এত মাথাব্যথা পড়ল! আসলে সেই ছেলেটা, ভিখিরি ছেলেটাই যত নষ্টের গোড়া।

হাত-পা আর একটু নাড়বার মতো হতে জামা-গেঞ্জি সব খুলে ফেলল। হয়তো এই ভিজে জামা গায়ে থাকাতেই—ক'ঘণ্টা আছে এইভাবে কে জানে—সর্বাঙ্গে এত ব্যথা হয়েছে। আর এই মেঝেতে পড়ে থাকা। কে জানে মাটির নিচের ঘর কি না, মেঝেয় তো জল উঠছে। তবে খুব পুরনো নয়—বোধহয় নতুনই তৈরি হয়েছে ওদের জন্যে।

অসহ্য যন্ত্রণা মাথায়। যন্ত্রণায়, ভয়ে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়—'ওঃ' বলে একটা শব্দ করে উঠল নলিনাক্ষ। আবার বলে উঠল, 'মা, মাগো! আর যে পারছি না!'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি অতি-পরিচিত চাপাকণ্ঠে শব্দ এল, 'আরে! নলিনীবাবু নাকি!'

দেবীপদ! এককড়ি!

কিন্তু শব্দটা আসছে কোথা থেকে? কোথাও তো ফাঁক নেই একটাও! এক ওপরে ছাড়া। মনে হচ্ছে, সেইটেই যাতায়াতের পথও। সেকালের চাপা দরজার মতো।

'দেবীপদ? তুমি কোথায়? কোথা থেকে কথা কইছ?'

'চুপ। আস্তে কথা বলুন। ওই যে গামলা দেখছেন, ওটা সরান, দেখবেন একটা ছোট্ট নর্দমা। আমি আপনার পাশের ঘরে ওই নর্দমায় কান পেতে আছি। ওইদিকের দেওয়াল ঘেঁষে সরু নালার মতো কাটা আছে মেঝেতে, জল বেরোবার পথ। গামলাটায় ঢাকা আছে নর্দমাটা। চলে আসুন, এইখানে মুখ দিন, কথা বলার অসুবিধা হবে না।'

আশ্চর্য মানুষের মনের গতি, পরে ভেবে নিজেরই অবাক লাগে নলিনাক্ষর। সে প্রথম প্রশ্নই করে বসল, 'আচ্ছা এখন ক'টা বাজে বলতে পারো, দিন না রাত? আমি কতকাল আছি এখানে?'

'কেন, আপনার হাতে ঘড়ি নেই?'

'না, দেখছি না তো।'

'তা হলে যে ব্যাটা ধরেছিল আপনাকে, সেই নিয়েছে। আমারটা আছে। তবে বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল, আন্দাজে চালিয়েছি। মোদ্দা কুড়ি ঘণ্টা হয়ে গেছে। আপনি ক'টায় এসেছিলেন? সাড়ে সাত পৌনে-আট? তা হলে এখন বিকেল চারটে বাজে।'

'তুমি কীভাবে এলে এখানে? কত দিন আছ?'

'তা হল বইকী। সেই যে ভাঙা বাড়িটার পাশে দেখা হয়েছিল মনে আছে? পুরীতে? যেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেওয়ালটার এপাশে এসেছি, একটা চট দিয়ে আমার মাথাটা ঢেকে মুখে দড়ি বেঁধে দিলে—তারপর তিন-চার জন ধরে এনে নিমেষের মধ্যে চাকলাদারের গাড়ির ক্যারিয়ারে পুরে বন্ধ করে দিলে! ভেরী নীট ওয়ার্ক।... সবসুদ্ধ বোধহয় একমিনিটও না। আমার গাড়োলগুলি পাহারা দিচ্ছিলেন, মানে দেওয়ারই কথা, নজর রাখার কথা অন্তত—কেউ টের পেল না। ...আপনি ওই পথেই বাড়ি যাবেন জানি, তখনই উঠবেন—তাই যতটা পারি গোঁ-গোঁ করে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু আপনিও শুনতে পেলেন না—।

'শুনতে পেয়েছিলুম ঠিকই—কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার যে কল্পনাই করতে পারিনি। আপনার সঙ্গে অত পুলিশের লোক! আমি ভেবেছি বাতাসের শব্দ।'

নলিনাক্ষ খুলে বলল ওর অভিজ্ঞতা। তার পর থেকে কী-কী ঘটেছে তাও সংক্ষেপে বলল। মধুবাবুর কথা। ওর ভাইপো-চুরির কথা। পরেশ চাকলাদারের কথা। দেবীপদব নাম করে গাড়ি পাঠাবার কথা। কেন ও কীভাবে এখানে এল, তাও।

দেবীপদ চুপ করেই শুনে গেল। তারপর বলল, 'হুঁ। ঠিক-ঠিক মিলে যাচ্ছে। আমিও এসব শুনেছি—তবে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না। মানে সত্যি, না কি আমি কান পেতে আছি জেনেই বানিয়ে বলছে, সেইটেই ঠিক করতে পারছিলাম না।'

'তুমি শুনলে কী করে? তোমার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ আছে না কি? এ তো সেই মধ্যযুগের ডানজন।'

'তা বটে। তবে তত ভয়ানক নয়। আলোটা দিয়েছে দয়া করে আর এখনও ইঁদুরে তাড়া করেনি। মনে হয়, এটা অপেক্ষাকৃত নতুন।'

একটু অসহিষ্ণু হয়েই নলিনাক্ষ পুনশ্চ বলে, 'কিন্তু তুমি শুনলে কী করে তা তো বলছ না?'

'ঠিক এইভাবেই। এটা আমরা আছি মাটির নিচের ঘরে। ওপর থেকে সিঁড়ি ফেলে নামিয়ে দেয়; আবার যদি কোনওদিন আমাদের তুলতে হবে মনে করে তা হলে ওইভাবেই তুলে নেবে। তবে আমার এপাশের ঘরে মনে হচ্ছে একটা সিঁড়ি আছে। ঘরটাও বড়, ওদের কথার ভাবে যা মনে হয়—কারণ অনেক মাল আছে এতে। এটাই ওদের কনফারেন্স রুম-মতো, অনেক আলোচনা হয়, যেগুলো প্রকাশ্যে করা যায় না, মানে সামান্য দু-একজনের বাইরে যা কাউকে জানাবার নয়। নিরেট দেওয়াল মধ্যে, এই ভেবেই ওরা নিশ্চিন্ত আছে, নর্দমার কথাটা কারও মাথাতে যায়নি। তাতেই শিখলাম অনেক।'

'তা তুমি বেঁচে আছ কী করে? তোমাকে খাবার দেয়?'

'এখনও দিচ্ছে। বোধহয় তোমাকেও দিত, জ্ঞান হয়নি ভেবেই নিশ্চিন্ত আছে।'

'কীভাবে দিচ্ছে?'

'ওপরের চাপা দোর খুলে একটা তারের ট্রের মতো নামিয়ে দেয়। তাতে দুটি বস্তু থাকে একসঙ্গে—জল আর খাবার। আর একটু পরেই একটা গামলা নেমে আসে, সেটা নামিয়ে ঘরের গামলাটা তাতেই তুলে দিতে হয় নিজের হাতে। খুব সায়েন্টিফিক আর মেথডিক্যাল। তবে বেশিদিন খেতে দেবে না আর।'

'তার মানে?'

'মনে হয় তোমার—মানে আপনার জন্যেই—।'

'তোমারই হোক না, আমি তো তুমি করে নিয়েছি, তুমি এখনও দূরত্বটা রাখছ কেন?'

'তা বটে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে ওসব ফর্মালিটির দরকার নেই আর। যা বলছিলুম, ওরা তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিল, এবার না কি এখান থেকে সবাই চলে যাবে, ভেকেট করবে। মাল, মানুষ—যা নিয়ে যাওয়ার সব সরে গেলে তালাবন্ধ করে রেখে সরে পড়বে। আমরা এইখানে শুকিয়ে মরব। দীর্ঘকাল পরে কেউ, হয়তো যদি দোর ভেঙে ঢোকে—সে সম্ভাবনা কম, কারণ পরেশ চাকলাদারই এর মালিক—ঢুকলেও মাটির নিচের এ-মহলের সন্ধান পেতে দেরি হবে—আর যদিই পায়, দুটো কঙ্কাল থেকে কে কী বুঝবে?'

দেবীপদ খুব সহজভাবেই, যেন একটু কৌতুক করেই বলল, কিন্তু কল্পনায় দৃশ্যটা দেখে—এই মাটির নিচে হয়তো পঞ্চাশ কি একশো বছর পড়ে থাকবে কঙ্কালগুলো, কেউ জানতেও পারবে না—নলিনাক্ষ শিউরে উঠল। এই প্রথম, তার যেন কান্না পেয়ে গেল। কেন মরতে এ-কাজ করতে এল সে! এই শোচনীয়ভাবে তিলে-তিলে পলে-পলে শুকিয়ে মরা!

'কী, ভয় পেয়ে গেলে নাকি?'

'তোমার ভয় করছে না?'

'যেদিন থেকে এ-কাজে এসেছি সেদিন থেকেই তো মৃত্যুর হাত ধরেছি। কতবার মরতে-মরতে বেঁচেছি। এবার না হয় বাঁচতে-বাঁচতে মরব। শুধু-শুধু ভয় করে লাভ কী বলো?'

'কিন্তু পরেশ চাকলাদার তোমাকে ধরল কেন? সে তো—সে তো শুনলুম অন্য ব্যবসায়ে ছিল। হ্যাঁ, সেও ধরা পড়েছে জানো? স্মাগলিং-এর জন্যে, বমাল ধরা পড়েছে।'

'ধরা পড়েনি, ধরা দিয়েছে।'

'তার মানে?'

'তার মানে এই দায়, মধুবাবুকে খুনের দায়—এতগুলো থেকে বাঁচতেই ধরা দিয়েছে। কে জানে মধুবাবুর জন্যে ওর দলের লোকই নারাজ হচ্ছিল কি না, প্রাণের ভয়েই আরও ধরা দিয়েছে। এসব কাজ করার পর বাঁচতে গেলে পুলিশের ঘরে থাকাই সুবিধা।'

'মধুবাবুকে ও-ই খুন করেছে, না? লোকটাকে আমরা কিন্তু আগাগোড়া সন্দেহ করছিলুম।'

'কিচ্ছু ভুল করোনি। মধুবাবুই পালের গোদা। অর্থাৎ মানুষখেকো ব্যবসা তারই।'

'তার মানে? একই প্রশ্ন বারবার করছি—কিন্তু আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। এত যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার—'

'একটু জল খেয়ে নাও। মাথাতে একটু জল থাবড়ে দাও। জল কাল তোমার সঙ্গেই নেমেছে তা টের পেয়েছি। শুধু কাকে ধরে আনা হল সেটা ওদের কথাবার্তার মধ্যে ঠিক বুঝতে পারিনি।'

নলিনাক্ষ একটু সুস্থ হয়ে আবার নর্দমায় কান পাতলে দেবীপদ সংক্ষেপে—যতটা জানে—এই রহস্যের দ্বার উদঘাটন করল।

জানার দিক থেকেও একটু সুবিধা হয়ে গেছে। যে লোকটা খাবার দিতে আসে, ভবানী হালদার নাম, এর আগে একটা ডাকাতি মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল, প্রমাণ-সাক্ষী সবই ওর বিরুদ্ধে. দেবীপদই শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দেয়—আসল যারা-যারা ছিল খুঁজে বার করে। এর আগে এ-কাজ অনেকবার করলেও সে-ডাকাতিতে ভবানী ছিল না—কিন্তু হাতের কাছে একটা দাগী আসামী পেলে কে আর অত গরজ করে তারপরেও তদন্ত চালিয়ে যায়! সেই ডাকাতিতে মানুষ খুন হয়েছিল, যারা শেষে ধরা পড়ল তাদের সকলেরই 'লাইফ সেন্টেন্স' হয়েছে—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাকে বলে। তাতেই ভবানী হালদার ও-লাইন ছেড়ে দিয়েছে, এদের চাকরি করে। জাতে নমঃশূদ্র. বলে. 'ডাকাতিই আমাদের

জাত-ব্যবসা, তা বুড়ো হয়েছি, এখন একটুকু ভয় ধরেছে প্রাণে। এখানে আমি তো হাতে-কলমে কিছু করি না, যদি দৈবে ধরা পড়িও, বড় জোর কিছুদিন জেল হবে—ফাঁসির দড়ি তো আর পরতে হবে না গলায়।'

সেই ভবানীই কিছু-কিছু বলেছে। আর কিছু-কিছু নর্দমার ফুটোয় কান দিয়ে শুয়ে-শুয়ে শুনেছে দেবীপদ।

মানুষ-চালান ব্যবসাটা দু-রকম হয়। বয়স্কা মেয়ে চালান হয়, বয়স্ক পুরুষও চালান হয়—তেরো-চোদ্দো থেকে উনিশ-কুড়ি পর্যন্ত—এদের বিক্রি করে দেওয়া হয় বাইরে। পুরুষরা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করে, মেয়েদের দু-রকমেই খাটতে হয়। তবে এর চাহিদা এত নেই। আর ঝুঁকিও বেশি। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত ওয়াকিবহাল লোক ছাড়া এসব কাজ পারে না। মধুবাবুর এই ব্যবসাই বেশি ছিল। কেরালা থেকে গুজরাট, ওদিকে পাঞ্জাব, রাজস্থান—সর্বত্রই তার অংশীদার ছিল, মিলেমিশে কাজ করত। অর্গানাইজ করা যাকে বলে, সে ক্ষমতা না কি মধুবাবুর ছিল অসাধারণ। তাই লেখাপড়া তেমন না জানলেও সকলে তাকে কেন্দ্রশক্তি হিসেবেই দেখত।

এ ছাড়া আর-একটা ব্যবসা—ছোট ছেলেপুলে এনে বিকলাঙ্গ করে তাদের দিয়ে ভিক্ষে করানো। এরা ছোট বয়স থেকেই ওদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দেয়—এমন সব পদ্ধতি আছে ভয় দেখানোর যে—আতঙ্কটা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে, ভিক্ষার সব টাকা এনে মালিককে ধরে দেয়, পালাবার বা এ-অধীনতা ছিন্ন করার চেষ্টা মাত্র করে না। তা ছাড়া অনেকে জানেও না যে তাদের ইচ্ছে করে নৃশংসভাবে এইরকম করা হয়েছে—কাউকে কানা, কাউকে খোঁড়া, কাউকে গন্না-খ্যাঁদা, কারও বা হাত কেটে দেওয়া হয়েছে, কারও বা আঙুল। তারা জানে দৈব-দুর্বিপাকেই এমন অবস্থা হয়েছে তাদের, এরা দয়া করে না বাঁচালে বাঁচত না, তাদের কেউ কোথাও নেই, কেউ দেখার ছিল না, এরাই আশ্রয় দিয়েছে তাই বেঁচে আছে।

অবশ্য তা সত্ত্বেও কড়া নজর রাখতে হয়। অন্ধকার কালো পথে উপার্জনের নিয়মই এই। অহরহ সতর্ক সজাগ থাকতে হয়। দু-চারজন যে মাঝে মধ্যে বিদ্রোহ করার চেষ্টা না করে এমন নয়—সে-ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবেই কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। সেইরকমই দেওয়া হয়েছিল কেলোকে—প্রফুল্ল বা হামির্দ—সেই খোঁড়া ছেলেটিকে। অবশ্য তার দোষ ছিল না, কিন্তু এরা ভেবেছিল, নলিনাক্ষ আসলে পুলিশের স্পাই, টাকা দিয়ে আইসক্রিম খাইয়ে ওর কাছ থেকে খোঁজখবর আদায় করছে। কেলোর পরিণাম দেখেই এখন বহুদিন পর্যন্ত বাকি ভিখিরিরা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে।

মুশকিল হয়েছে এই, এইসব ব্যবসা 'ইন্টারন্যাশনাল গ্যাঙ' চালায়, এমনি একটা আবছা ধারণা আছে সকলের। পুলিশেরও। বিরাট ব্যাপার, সে কি আর আমাদের ধরা সম্ভব, এই ভেবে হাল ছেড়ে দিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু দেবীপদ যেটুকু জেনেছে, আসলে বহু দল, আলাদা-আলাদা ব্যবসা। ব্যবসার সম্পর্ক হিসেবেই কেরালার দলের সঙ্গে আসামের, রাজস্থানী দলের সঙ্গে তেহরাণের, বাংলার দলের সঙ্গে মার্কিন দলের যোগাযোগ। নিছক ব্যবসা। একটা দল হলে কবেই ধরা পড়ত। অনেক দল, আর এরা নিজেদের স্বার্থেই ব্যবসার একটা মোটামুটি সততা বজায় রেখে যায়—দু-একজন চালাকি করতে যায় না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই বাকি সকলে নিপুণভাবে তাকে খতম করে দেয়, সেই ভয়ে আবার কিছুদিন সবাই টিট থাকে। আর নিজেদের স্বার্থেই মন্ত্রগুপ্তিটা রক্ষা করে, কেউ কারও কথা ফাঁস করে না।

মধুবাবুর শক্তিও বেশি, উচ্চাশাও বেশি। তিনি মানুষের ব্যবসা থেকে কোকেন, মারিজুয়ানা, সোনা-হীরের চোরাকারবারে লিপ্ত হবেন সেটা স্বাভাবিক। মধুবাবু আসলে বহু দলের অভিভাবক উপদেষ্টা ছিলেন। সে হিসেবেও কিছু-কিছু পেতেন। কিন্তু লেখাপড়া, বিশেষ ইংরেজিটা কম জানতেন। সেইজন্যেই পরেশ চাকলাদারকে তাঁর দরকার হয়েছিল। চাকলাদার একটা বড় ব্যাঙ্কে কাজ করত,

সেখান থেকে লাখ তিনেক টাকা সরাতে গিয়ে ধরা পড়ে। আলিপুর না নিউ আলিপুর ব্রাঞ্চে— ডাকাতির আয়োজন করে। আয়োজন নিখুঁত। ভুল হয়েছিল একটা আনাড়ি লোককে দলে নেওয়ায়। দলের সুপারিশেই না কি নিতে হয়েছিল তাকে। তাতেই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ল।

সেই সময় এলেন মধুবাবু। নিজে যেচে এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিছু মোটা টাকারও দরকার হয়েছিল—সেও মধুবাবু পকেট থেকে খরচ করেন। সেইসঙ্গে একটি নিজের হাতে লেখা স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নেন পরেশকে দিয়ে—ভবিষ্যতে হাতে থাকবে বলে। সে স্বীকারোক্তি কোনও ব্যাঙ্কের ভলটে আছে। কোনও চালাকি করতে গেলেই সেটি পুলিশের হাতে চলে যেত। পুলিশকে গুলি করেছিল নিজের হাতে, সে জখম হয়েছিল—মরেনি, তবু 'অ্যাটেম্পট টু মার্ডার' আর সরকারি লোককে কর্তব্যপালনে বাধা দেওয়া, ডাকাতির চেষ্টা—এতগুলো চার্জে শাস্তি বড় কম হত না।

পরেশ চাকলাদার চলনে-বলনে পাক্কা সাহেব। ইংরেজি ছাড়াও ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান শিখে নিয়েছিল। ওদের ব্যবসার জন্যে এগুলো দরকার। মধুবাবু ওকে প্রথমে নিজের সহকারী হিসেবে নিলেন, শেষে অংশীদার করেছিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে খুব সাফ ছিলেন তিনি, শতকরা ত্রিশ টাকা দেবার কথা—পাই-পয়সা পর্যন্ত হিসেব করে দিয়ে দিতেন। কিন্তু পরেশ চাকলাদার চাইত যেমন উপার্জন তেমনিভাবে থাকতে—ধনীর মতো থাকার বড় শখ তার, আসলে সেইজন্যেই ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গিয়েছিল। কিন্তু মধুবাবু জানতেন এইভাবে পয়সা খরচ করতে থাকলে একদিন না একদিন লোকের চোখে পড়বে, তাদের চোখ টাটাবে। আর তাহলেই পুলিশেরও নজরে পড়বে।

তাই পড়েওছিল, দেবীপদ আসলে পরেশ চাকলাদারেরই পিছু নিয়েছিল। পরেশ যেমন নির্মম তেমনি বেপরোয়া, তাই দেবীপদ খুব সাবধানেই ছিল—তবু শেষরক্ষা হল না।

নলিনাক্ষর এ-জালে জড়াবার কথা নয়, সে নিজের অজ্ঞাতসারেই এসে পড়েছিল। প্রথম ওই ভিখিরি ছেলেটার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহ, ওরা ভুল বুঝে তাকে মারল। আর তার ফলটা অন্যভাবে এসে পড়ল নলিনাক্ষর ওপরই। ছেলেটা চেহারার জন্যেই বেশি রোজগার করত, সে উৎসটা বন্ধ হয়ে যেতে ওদের জাতক্রোধ হল নলিনাক্ষর ওপর। পরেশের সামনের বাড়িতে থাকে ও, ক্রমশ প্রকাশ পেল দেবীপদর বন্ধু। এর আগে বড় স্মাগলার গ্যাঙ একটাকে খতম করার মূলেও এই নলিনাক্ষই ছিল—অবশ্য সেও অজান্তে—কিন্তু কে আর অত খবর রাখছে—ওরা দুই আর দুইয়ে চার ধরে নিল। তারপর পুরীতে গিয়ে পড়া—এরা গিয়ে পড়ল দৈবাৎই। কিন্তু মধুবাবু ও পরেশ ধরে নিল যে দেবীপদর চর হিসেবেই গেছে নলিনাক্ষ। দেবীপদ যে পুরীতে আছে তা জানত—সুতরাং এটা ধরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিরাট একটা সোনার চালান ডেলিভারি নিতেই গিছল পরেশ, পরেশকে সামলাতে মধুবাবু।

মধুবাবু দেবীপদ আর নলিনাক্ষর উপস্থিতির কার্যকারণ ভেবে নিয়ে পরেশের ওপর চটে গেলেন খুব। তিরস্কার করলেন। ওর জন্যেই এদের চোখ পড়ল, নইলে এতদিন তিনি এত কারবার করছেন, কেউ তো সন্দেহ করেনি।

পরেশের যুক্তি হচ্ছে, যদি ভোগই না করলুম তো এত কাণ্ড কষ্ট করে, এত ঝুঁকি নিয়ে রোজগার করে লাভ কী? চিরদিন গর্তের মধ্যে থেকে ছুঁচোর জীবনযাপন করা—সে তো একটা দুশো টাকা মাইনের কেরানীও পারে। মধুবাবু বলেন, যথেষ্ট টাকা করে নিয়ে তুমি বিলেত-আমেরিকা যাও না, রিভিয়েরাতে গিয়ে ফূর্তি করো, এখানে ওসব চাল দেখাবার দরকার কী?

দোলাকে যে ধরে সে নিতান্তই দৈবের যোগাযোগ। নলিনাক্ষর আত্মীয় বলে জানত না ওরা।

জানার কারণও ছিল না। যখন জানল—পরেশ চেয়েছিল ফিরিয়ে দিতে, মধুবাবুই নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দ্য মিসচীফ ইজ অলরেডী ডান—এখন ফিরিয়ে দিলে আরও ঝুঁকি নেওয়া। মেয়েটা কতটা কী লক্ষ করেছে কে বলতে পারে। ছোটদের অবজার্ভেশন অনেক তীক্ষ্ণ, কী বলবে তা কে জানে। আর ঘাঁটিও না।'

সে-রাত্রে বাস অ্যাক্সিডেন্ট মধুবাবুরই ব্যবস্থা। শেষ মুহূর্তে যে নলিনাক্ষ ট্রেনে আসবে তা ভাবেননি। নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছে গেছে—এ-কথা শুনে তিনি স্থির থাকতে পারেননি। দেবীপদকে ধরা হয়েছে, এখন নলিনাক্ষকেও যদি এই খাঁচায় এনে পোরা যায় তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। এখান থেকে কাঠের বাক্স করে অনেক মাল ওরা চালান করে, তখন স্থির ছিল এদের দুজনকে সেইভাবে পাঠাবে। মাঝসমুদ্রে গিয়ে বাক্স দুটো ডুবিয়ে দেবে তারা।

সেইসঙ্গে মধুবাবু আর একটি নির্দেশ দিয়েছিলেন পরেশকে। এখানের 'অ্যাকটিভিটি', কাজকর্ম কিছুদিনের জন্যে বন্ধ রাখতে। পরেশকে বলেছিলেন উটকামণ্ডে গিয়ে একটা অ্যান্টিক জিনিসের দোকান খুলতে। মধুবাবু নিজে চলে যাবেন বাংলাদেশে, পাসপোর্ট করানোই আছে, তাতে বাধবে না। সেটাই পরেশের পছন্দ হয়নি। এখানে এখন বিস্তর কাজ—বিজনেস ওদের ভাষায়। অনেক টাকা আমদানি হচ্ছে, সব এদের হাতে ছেড়ে চলে যাবে, যদি এরপর ফিরে এলে পাত্তা না দেয়!

কিছুদিন ধরেই মধুবাবুর কর্তৃত্ব পরেশের অসহ্য লাগছিল, তা ছাড়াও, তার মনে হয়েছিল কাজকর্ম সব সে-ই করছে, মাঝখান থেকে সিংহভাগ নিচ্ছেন মধুবাবু। পরেশ চিরদিনই বেপরোয়া, সে দুম করে মধুবাবুকে খুন করে বসল। করল—মানে করালো। সেও আর-একটা ভুল। এ-বিষয়ে মধুবাবুর নীতি ছিল খুব পরিষ্কার : 'খুব দরকার না পড়লে মানুষ মেরো না। বিশেষ, যাদের পিছনে অনেক আত্মীয়-বান্ধব আছে তাদের একেবারে নাচার না হলে মারবে না। আর, মারতে হলে অনেককে জড়িয়ে মারবে, যাতে কেউ ব্ল্যাকমেল করায় সুযোগ না পায়।'

পরেশ নিজেকে খুব চতুর ভাবত। মধুবাবু নলিনাক্ষকে এই পাড়ায় এনে ফেলার জন্যে—পাড়ায় এলে খাঁচায় পুরতে আর কতক্ষণ—আত্মীয়তার ওই অভিনয়টা করতে গিছলেন, অনেকটা সফলও হয়েছেন—এটুকু মনস্তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল—কিন্তু সে-খবর পাবার পর পরেশের মনে হয়েছে যে, মধুবাবু সবটা বাংগলিং করছেন, তাঁর আর বাঁচার প্রয়োজন নেই। তার নিজের ভাষাতেই—পাশের ঘরে বসে বলেছে পরেশ, নিজে কানে শুনেছে দেবীপদ—'ভদ্রলোক বড় বেশি ওভারবিয়ারিং হয়ে পড়েছিলেন, এসব কাজে এ-ধরনের লোকের আর থাকা উচিত হত না।' এ পাড়ায় নলিনাক্ষ এলে কী করতে হবে তা মধুবাবু আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন। পরেশের মনে হয়েছিল, এই দুজন এবং মধুবাবু মরে গেলেই সে নিশ্চিন্ত।

কিন্তু মধুবাবুর মরার পর এদের এই জগতে খুব বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এতটা আশঙ্কা করেনি পরেশ, কল্পনাও করেনি। এদের ভালবাসা স্বার্থের ভালোবাসা অবশ্য, মধুবাবু তাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন, কেন্দ্রমণি। তিনি এভাবে হঠাৎ চলে যেতে এরা খুব অসহায় বোধ করল। তাদের ক্ষোভ ক্রমশ রুদ্ররূপ ধারণ করছে দেখে পরেশ ভয় পেয়ে গেল, চোরাই মাল এনে ঘরে তুলে পুলিশে খবর দিয়ে সাধ করে ধরা দিলে পুলিশে। একটা গোলমাল করে এ-দায় থেকে বছর খানেকের মধ্যে বেরোতে পারবে এ-ভরসা ওর আছে, ততদিনে এদিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সেও ভুল পরেশের, সে-গোলমাল মধুবাবুই করিয়ে দিতে পারতেন, তাঁরই যোগাযোগ বেশি ছিল। এসব বুঝতেনও ভালো। তাঁরই পরামর্শে ও বন্দোবস্তে পরেশের সব ক'টা গাড়ির তিন- চারটে করে নম্বর করানো ছিল, পুরী থেকে যখন নলিনাক্ষকে নিয়ে আসে তখন নির্জন রাস্তায় পড়ে অন্য

গাড়িতে তুলে দেওয়া হয় ওকে—সে-গাড়িতে পুলিশের ইউনিফর্ম পরা লোক ছিল—দেখলেও কেউ সন্দেহ করত না। পরেশ সোজা এসে এ-বাড়িতে উঠেছে—ওর গাড়ি যারা লক্ষ্য করেছে এখানে, তারা কিছুই সূত্র পায়নি।

এই পর্যন্ত বলে বোধহয় ক্লান্ত হয়েই চুপ করল দেবীপদ।

নলিনাক্ষ বলল, 'তারপর? আমাদের কী উপায় হবে?'

'বোধহয় কিছুই হবে না। মধুবাবুর মৃত্যু, পরেশ চাকলাদারের ধরা পড়া—এ-দুটোতে এরা খুব যেন শেকী হয়ে গেছে। এখানের চাটিবাটি গুটোচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলো—গোটা কুড়ি এখনও এ-বাড়িতেই আছে, আপনার দোলাও—তাদের ডিসপোজ করে এরা সরে পড়বে, আমাদের এখানে ফেলে। ইনক্রিমিনেটিং যা কিছু সব নষ্ট করা হচ্ছে কাল থেকে। কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে। প্রত্যেক গাড়িতেই দু-তিনটে করে নাম্বার প্লেট ছিল, সেগুলো অ্যাসিড দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে। এখানের ম্যানেজার একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান—অ্যান্টনী, তার সহকর্মী মঞ্জুর হোসেন—দুজনেই খুব শান্ত টাইপের লোক, কিন্তু একেবারেই নির্মম। তাদের কাছ থেকে কোনও হিউম্যান কনসিডারেশ্যন আশা করা নির্বুদ্ধিতা। এখন ভরসা শুধু দৈব—এক ভগবান যদি বাঁচিয়ে না দেন তো আর আমাদের বাঁচার কোনও আশা নেই। আজও আমার খাবার দিয়ে গিছল, চারখানা রুটি আর একটু আলুসিদ্ধ—কিন্তু তখনই হালদার জানিয়ে গেছে—আর বোধহয় দেওয়া যাবে না।'

বারো

এরপর দুজনেই চুপ করে গেল। দেবীপদ শ্রান্তিতে, নলিনাক্ষ অন্য কারণে। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর আসামীর কী অবস্থা হয়—আজ নলিনাক্ষ কিছুটা বুঝল। জীবন্ত সমাধি কথাটা শোনাই ছিল এতকাল, কথার-কথা হিসেবে। তার জীবনেই যে এই অবস্থা হবে, এই বয়েসেই—কে জানত!

সে নর্দমার কাছ থেকে সরে এসে ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজল।

না, ঘুম আসার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। মানসিক অবস্থা ঘুমের অনুকূল নয়। অন্য কারণও দেখা দিল। দুজনেই স্থির হয়ে আছে, এখানে অন্তিমকালের নীরবতা যাকে বলে—কাজেই মাথার উপরের সামান্য শব্দও কানে আসছে। কিছু-কিছু আগেও পাচ্ছিল, এখন যেন কাজকর্ম, বহু লোকের চলাফেরা, মালপত্র টানাটানি করার শব্দ আরও বেড়ে গেল। ভারি-ভারি জিনিসপত্র, কাঠের প্যাকিং বাক্স গোছ—সরাচ্ছে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে মেঝের ওপর দিয়ে—মনে হল। খিদেতে, বিষের প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে, তবু এইসব শব্দের অর্থ বুঝেই নলিনাক্ষ আরও যেন সেদিকে কান পেতে থাকে।

হিসেব মতো—মানে দেবীপদর ওই কুড়ি ঘণ্টার হিসেব যদি ঠিক হয়, রাত আটটা নাগাদ এই কর্মচঞ্চলতা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠল। তারপর আস্তে-আস্তে আবার যেন স্তিমিত হয়ে এসে সব নিথর হয়ে গেল। এ-নৈঃশব্দ্যের একটিই অর্থ হয়—এরা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পরে—রাত এগারোটা নাগাদ পাশের ঘরে খুট করে একটা শব্দ হল। যেন লোহার চাপা দোরটা খুব সন্তর্পণে খুলেছে কেউ। নলিনাক্ষ প্রায় গড়িয়ে এসে আবার নর্দমায় কান দিল।

'বোসবাবু, বোসবাবু!' চাপা গলায় কে ডাকছে।

'হালদার? বলো।'

দেবীপদ তো বেশ সহজভাবেই কথা কইছে, ওর কি একটুও ভয় হয়নি—সত্যিই? মনে-মনে বলে নলিনাক্ষ।

'বাবু, কী বলব, আমরা চলে যাচ্ছি। সব মাল চলে গেছে, ওপরতলায় চাবি দিচ্ছে—এখনই নিচে এসে পড়বে। মেন স্যুইচ অফ করা হবে, আর আলোও পাবেন না। আমার কাছে একটা বাড়তি টর্চ ছিল, আর দেশলাই। রাখুন—কী-ইবা হবে এতে, তবু ইঁদুর কি সাপখোপ এলে দেখতে পাবেন। আর এই এক প্যাকেট বিস্কুট। কিছু মনে করবেন না বাবু, আমি চললুম!'

'তুমি, তুমি কি কিছুই করতে পারো না? কোনওমতে বার করে দিতে—? এখন তো সবাই ব্যস্ত। অন্তত ওপরেও যদি রেখে যেতে পারতে! একদিন না একদিন এদের সকলকেই জবাবদিহি করতে হবে হালদার, সেদিন আমি তোমার দিকে হতে পারতুম।'

'সব জানি বাবু—কিন্তু চারদিকে কড়া পাহারা। আন্টুনী সায়েব নিজে এই সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা বাবু। আপনাদেরও বাঁচাতে পারব না, আমি নিজেও যাব।'

সে সরে গেল, চাপা দোরটা আবার বন্ধ করে দিয়ে।

আর একটু পরে হঠাৎই আলোটা নিভে গেল।

গাঢ়, নিঃসীম অন্ধকার। অন্ধকার যে এমন নিশ্ছিদ্র হতে পারে তা কে জানত!

নলিনাক্ষ না অন্ধকার দেখতে গিছল সমুদ্রের ধারে—শখ করে? মনে আছে—প্রথম যেদিন নামছে সমুদ্রের দিকে, সেই রাত্রিবেলা—ওই পরেশ চাকলাদারের মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শাখী বুঝি নাম মেয়েটার—বলেছিল, 'অন্ধকার দেখতে যাচ্ছেন? শখ বটে বলিহারি আপনার! অন্ধকার আবার কী দেখার আছে, ওটা মরবার জন্যে রেখে দিন না! আলো আর ক'দিনের, যে ক'টা দিন বাঁচি আলোতেই যেন কাটিয়ে দিতে পারি—আমি তো এই বুঝি!' তখন ডেঁপোমি মনে হয়েছিল। আজ কথাগুলোর অর্থ বুঝছে!

নলিনাক্ষ আর সামলাতে পারল না, সত্যিই হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। অনর্থক বুঝেই দেবীপদ ও-ঘর থেকে কোনও সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করল না।

ক্লান্তি তো ছিলই, অপরিসীম ক্লান্তি, অনাহারের দুর্বলতা। তার ওপর এই বুকফাটা কান্না। ফলে অবসন্ন হয়েই একসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নলিনাক্ষ। গভীর স্বপ্নহীন ঘুম, দীর্ঘ উপবাসের পর ঘুমোলে যেমন গাঢ় ঘুম হয়—তেমনিই। সেইজন্যেই ঘুম ভাঙতেও দেরি হল। শব্দ পাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই বোধহয়, প্রথম সেটা স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল, তারপর একসময় কথাটা মনে পড়ল——যে স্বপ্ন দেখে তার তো স্বপ্ন মনে হয় না। তবু তখনও চোখ খুলতে পারে না, চোখের পাতা যেন জুড়ে আছে। শেষে একসময় প্রচণ্ড কী একটা শব্দ, কে যেন কোনও দরজায় লাথি মারছে, চমকেই চোখ চাইল—

দেখল ঘরে আলো জ্বলছে আবার।

সত্যি? না স্বপ্ন দেখছে!

আশার আলো? জীবনের আলো?

মাথার ওপর বহু লোকের পায়ের শব্দ না? খুব চেঁচামেচি—সে-শব্দ এখানেও কিছুটা এসে পৌঁছচ্ছে। দরজায় লাথির পর লাথি মারছে কে। তারপর যেন পাশের ঘরে ওপরের চাপা দোর খোলার শব্দ, 'দেবীদা, দেবীদা—দেবীদা জেগে আছেন?'

দেবীপদ সাগ্রহে সাড়া দিল, 'কে প্রবীর? তোমরা এসেছ? তাই তো বলি—'

'হ্যাঁ দেবীদা, আমরা সবাই এসে পড়েছি। কমিশনার নিজে এসেছেন, আমাদের বড়সাহেব। আর ভয় নেই।'

'পাশের ঘর প্রবীর, আগে পাশের ঘর দেখো। নলিনাক্ষবাবুকে রেখেছে ওখানে, বড় কাতর হয়ে পড়েছেন।' দেবীপদ বলল, 'প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ওঁর পেটে কিছু পড়েনি।'

'এই দরজাটা—না? তাও তো বটে। এই তো দরজা একটা। খোলো-খোলো মোহন, চাড় দাও, চাবি খুঁজে খুলতে অনেক দেরি হবে। সিঁড়িটা ফেলে নেমে যাও দুজন, যদি অজ্ঞান হয়ে থাকেন তো ধরাধরি করে তুলতে হবে। শৈলেন, তুমি যাও, ব্র্যান্ডি আছে তোমার কাছে—। অফ কোর্স, আজ নলিনাক্ষবাবু শুড বি আওয়ার ফার্স্ট কনসিডারেশ্যন। হি ডিজারভস ইট। দেবীদা, সেবার আপনার জন্যে উনি বেঁচেছিলেন। এবার ওঁর জন্যে আপনি বাঁচলেন!'

এসব কি সত্যি, না স্বপ্ন দেখছে নলিনাক্ষ?

ওপরে এসে বসে, চা, খাবার ও ক'চামচ ব্র্যান্ডি খেয়ে একটু সুস্থ হলে দেবীপদ জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর? তখন যে কথাটা বললে প্রবীর—।'

'আপনাকে আপনার সঙ্গীরা মিস করেছিল অন্ধকারে। আপনি কোথাও ঘাপটি মেরে আছেন ভেবে পরের দিন সকাল পর্যন্ত কোনও খোঁজ করেনি। তারপর সন্দেহ হতে, চাকলাদারের গাড়ির কথা এখানে ফোন করে জানায়—এখানে আগেই নজর রেখেছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায়নি। অর্থাৎ ইউ ওয়ার লস্ট! ...আপনি হেরে গেলেন কিন্তু আপনার নির্দেশ হারেনি। আপনি বলেছিলেন নলিনাক্ষবাবুর ওপর নজর রাখতে, আমরা ফেথফুলি সে-নির্দেশ পালন করেছি। তাতেই—ওঁর এ-পাড়ায় অ্যামেচার গোয়েন্দাগিরির চেষ্টা, সন্ধ্যাবেলা সোলেমানের হাতে ধরা-পড়া—সব খবরই পেয়েছি। যে পিছু নিয়েছিল সে একা, সে যখন খবর দিলে তখনও আমরা এখানে এ-বাড়িতে এসে হানা দিতে সাহস করিনি, যদি খুন করে গুম করে দেয় ধরা পড়ার ভয়ে! তক্কে-তক্কে ছিলাম, সোলেমান শেষরাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে ওর মেয়েমানুষের বাড়ি যাচ্ছিল, সেখান থেকে অতর্কিতে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছি। রাত চারটের সময় জনমানব নেই, কেউ দেখেনি।'

'বাহবা! ঠিক করেছ। তারপর?'

'তারপর সোলেমানকে নিয়ে পড়া। সে কি সোজা, ভেরী হার্ড নাট টু ক্র্যাক। তখন দাদা, এই বড়সাহেবরা আছেন তাঁদেরও জানাচ্ছি, আমার চাকরিটা খাবেন না—উপায় ছিল না দেখেই থার্ড ডিগ্রি প্রয়োগ করলুম। তাও একটুতে হয়নি, লোকটার কী অসীম সহ্যগুণ কী বলব, শেষে যখন কুড়ি আঙুলে কুড়িটা পিন ফুটিয়ে বুকে বাঁশ দিয়ে ডলছি—কম্বলের ওপর দিয়ে অবিশ্যি, এই মোহন হাতটা একটু-একটু করে মোচড়াচ্ছে, তখন কাজ হল। সবই বলল, কিন্তু এই করতে-করতে সন্ধে হয়ে গেছে, যখন শুনলুম সমস্ত মাল ওরা আজই পাচার করবে, দুটো রোডওয়েজের লরিতে পুরে চট চাপা দিয়ে নিয়ে যাবে ভাইজাগ, মানে তাই বলে বেরোবে, তার আগেই—এদিকে জাহাজ রেডি আছে, এখান থেকে সে মাল নিয়ে ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করবে মোহানায়—এরা লরি থেকে নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে তুলবে, তখন একটু অপেক্ষা করাই ঠিক বিবেচনা করলুম। এতক্ষণই গেছে, একটুতে কী এসে যাবে! ওদের মাল বেরিয়ে গিয়ে রোডওয়েজের লরিতে উঠেছে, দুটো লরিতে এদের লোক, পিছনে মঞ্জুর মিঞা একটা ট্যাক্সিতে—ঠিক জায়গা বুঝে আমরা ঘিরে ধরেছি। তাই কি পারতুম, আমাদের এস. আই. আমেদ—সে বুদ্ধি করে রাইফেল চালিয়ে আগেই চাকাগুলো ফুটো করে দিয়েছিল, তাই। সেসব ব্যবস্থা করে এখানে আসছি—।'

'ছেলেমেয়েগুলো?' সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে নলিনাক্ষ।

'সেফ অ্যান্ড সাউন্ড। তবে 'সে পর্যন্ত থাকতে পারিনি, এখানে ছুটে এসেছি। অবশ্য একটু আগেই ফোন পেলুম, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বেশিরভাগই বেঁচে যাবে।'

তারপরই প্রবীর বলল, 'কিন্তু নলিনীদা, এর মধ্যে একটু রোম্যান্সও আছে। আপনারই ভাগ্য।'

'কীরকম? কীরকম?' দেবীপদও ঝুঁকে পড়ে।

'আজই সন্ধ্যার পর একটি নারীহস্তের চিরকুট আমাদের কমিশনার সাহেবের ঘরে পৌঁছয়, তাতে এই বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লেখা আছে—নলিনাক্ষবাবু এখানে মাটির নিচের ঘরে মৃত্যুমুখে—এখনই যেন তাঁকে উদ্ধার করা হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু সে আবার কে?' নলিনাক্ষ বিহ্বল হয়ে পড়ে, 'যাঃ! তুমি ঠাট্টা করছ!'

'না-না,' কমিশনার বলে ওঠেন, 'ঠিকই বলেছে। সে-চিঠি আছে। কাল দেখবেন, হাতের লেখা যদি চিনতে পারেন। তবে আমার যা সারমাইজ—যা শুনলুম সব কেসটা—পরেশ চাকলাদারের মেয়েই হবে।'

পরেশ চাকলাদারের মেয়ে? শাখী?

শাখী খবর দিয়েছে?

শাখী?

শাখী, নলিনাক্ষকে—নিজের বাবার শত্রুকে—বাঁচাবার জন্যে পুলিশে চিঠি দিয়েছে।

না-না, সে কেমন করে হবে।

এ যে অসম্ভব!

অথচ এঁরাও যেভাবে বলছেন, তামাশা বলেও তো মনে হচ্ছে না।

কিন্তু কেন? কী তার এত গরজ?

আবারও যেন মাথা গুলিয়ে যায় নলিনাক্ষর। আবার সেই যন্ত্রণাটা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর সেই যন্ত্রণা ও বিহ্বলতার মধ্যেই মন মনের ভেতর হাতড়ে বেড়ায়, কারণটার সূত্র খুঁজতে চেষ্টা করে। ধাঁধা বা হেঁয়ালির মতো দেখতে-দেখতে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে রহস্যটা—ক্রসওয়ার্ড পাজল-এর সূত্রের মতো অস্বস্তিকর। কোথায় যেন সমাধানের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না, সেইরকম।

এ-কাজ যে জন্যে করে মেয়েরা—কই শাখীর সঙ্গে ওর তো তেমন কোনও রোম্যান্সের—প্রেম তো দূরে থাক, অনুরাগেরও সম্বন্ধ ছিল না! কোনও পূর্বরাগের ভূমিকামাত্রও দেখা দেয়নি। অন্তত নলিনাক্ষর তরফে দেয়নি।

তবে—এখন যা একটু-একটু মনে পড়ছে—দু-একদিন শাখীর আচরণটা ওর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেছে।

একদিন নিজেই এসেছিল সে, সে-ই প্রথম; বউদির কাছে বোনার প্যাটার্ন-বই চাইতে। বউদি সাধারণভাবে, সোয়েটার ইত্যাদি বোনেন বটে কিন্তু তাঁর কাছে কোনও বই নেই, এমন কিছু অসামান্য কারিগরও নন। এ-আসাতে তিনি খুশিও হননি, তাঁর নিজেরই ভাষায়—'বড়লোকের মেয়ে, ঐশ্বয্যি দেখাতে আসা! হাড়পিত্তি জ্বালা করে। তা নয়—জাঁকের গল্প যেমন মা করে যায়, তেমনি ওরও করবার লোক চাই তো! কিংবা ছুতো করে খবর নিতে আসা, আমরা গরিব মানুষরা কেমন খাই দাই—।'

এ সবই বউদির রাগের কথা।

তবে ছুতোর কথাটা সত্যি। সেটা বোঝা গিছল দিন সাতেক পরেই।

বউদিই নিয়ে ওপরে উঠেছিলেন, ওর ঘরে ঢুকে বলেছিলেন, 'ঠাকুরপো, এহ সামনের বাড়ির পরেশবাবুর মেয়ে এসেছে একটু, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'আমার সঙ্গে? কেন?'

একটু বোধকরি রূঢ়ই শুনিয়েছিল নলিনাক্ষর গলা। সে তখন সবে কাগজ-কলম নিয়ে একটা গল্প ফেঁদে বসেছে—এই অকারণ ব্যাঘাতে বিরক্ত হয়ে উঠবে—সে তো স্বাভাবিক।

'নাও, অত মেজাজ দেখাতে হবে না (বউদি বিবেচনাবুদ্ধির—যাকে 'ট্যাকট' বলে ইংরেজিতে

—কিছুমাত্র ধার ধারেন না), ঢের লেখক হয়েছ! এও লেখে, ওর ইচ্ছে তুমি ওর দু-একটা লেখা একটু দেখে দাও। এখন না পারো, রেখে দাও, ধীরেসুস্থে দেখে দিয়ো।'

লাল হয়ে উঠেছিল শাখী, ঘেমে উঠেছিল সেই হেমন্তের দিনেও। হাত কাঁপছিল থরথর করে—লেখাটা টেবিলে রাখার সময় সেটাও নজরে পড়েছে। কিন্তু তার ভেতরও অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পায়নি, নবীন লেখকের সহজ লজ্জা, বলে ধরে নিয়েছে। বিশেষ অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে এ একটা নিদারুণ অবস্থা বইকী!

লেখা কিছুই হয়নি, দেখে মনে হচ্ছে সে সম্বন্ধে ধারণাও খুব স্পষ্ট নয় মেয়েটার। কিন্তু সে-কথা বলাও কঠিন। তাই ক'দিন পরে যখন লেখার খবর নিতে এসেছে তখন মিষ্টি করে অনেক ঘুরিয়ে বলতে হয়েছে, দু-একটা মামুলি উপদেশও দিতে হয়েছে।

তবে সেই সময়ই লক্ষ করেছে নলিনাক্ষ—ব্যর্থতাটা সহজেই মেনে নিয়েছে মেয়েটা এবং তখনই উঠে পালাবার চেষ্টা করেনি। এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎই অত্যন্ত ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন করেছে, 'আপনি বুঝি রোজ ব্যায়াম করেন?'

চমকে উঠেছে নলিনাক্ষ, ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেছে, 'আপনি কী করে জানলেন? কেউ বলেছে? বউদি বুঝি?'

'না-না। কেউ বলেনি। আমাদের ছাদের ওই কোণটা থেকে আপনার ঘরটা দেখা যায় যে একটু-একটু। তাতেই—। এতে কিছু দোষ আছে না কি?'

'না দোষ নেই। তবে এ দেখার বা এ নিয়ে আলোচনা করারই বা কী আছে, বিশেষ খালি হাতে করা—।'

'দেখার আছে বইকী। দেখেননি ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিকেলে ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা যখন ব্যায়াম করে কীরকম ভিড় জমে যায়। সুগঠিত দেহ তো খুব সুলভ নয়।'

এই পর্যন্তই।

সেদিন তখনই চলে গিছল। আর আসেনি। তবে দেখার ব্যাপারটা পরেও লক্ষ করেছে। ছাদ নয়, চিলেকোঠার ঘর থেকেই দেখে, দূরবীন দিয়ে। বিরক্ত হয়ে জানলা বন্ধ করে ব্যায়াম করেছে তারপর থেকে।

এরপর দু-একদিন পাড়ায় কোনও-কোনও ক্রিয়াকর্ম-বাড়িতে দেখা হয়েছে, ওদের বাড়িতেও এসেছে, দু-একবার। তবে অন্তরঙ্গ হবার কোনও চেষ্টা করেনি বিশেষ, হয়তো নলিনাক্ষর কঠিন অনমনীয় ভাবভঙ্গি দেখেই সাহস হয়নি। শুধু একদিন, ওদের পুরী যাওয়ার আগে পথে একদিন দেখা হয়েছিল—হাঁটতে-হাঁটতেই আসছিল, নলিনাক্ষও বাকি সামান্য পথটুকু পাশে-পাশে এসেছিল, কতকটা বাধ্য হয়েই।

সেই সময়ই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল, 'আচ্ছা নলিনদা, বাইবেলে আছে শুনেছি, "সিনস অফ দি ফাদার্স উইল ভিজিট টু দেয়ার চিলড্রেন"—ঠিক হয়তো বলতে পারছি না, এইরকমই কথাটা—আপনি তো জানেন—কিন্তু কেন? বাপ যদি পাপ করে সে জন্যে ছেলেমেয়েরা দায়ী হবে কেন? কেন তাদের সেইভাবে বিচার করা হবে? আমাদের শাস্ত্রে তো এ-কথা বলে না, রত্নাকরের মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্র তো সাফ জবাব দিয়েছিল, আমরা কি জানি তুমি কোথা থেকে কীভাবে রোজগার করছ! তবে কেন আমাদের সমাজ বাপ-মায়ের কাজ দেখে ছেলেমেয়েদের বিচার করবে!'

বিস্মিত হয়েছিল নলিনাক্ষ ওর উত্তেজনা দেখে। শুধু তাই নয়—মেয়েটা যে এত লেখাপড়া করে, এত ভাবে—তা দেখেও। ওদের বাড়ির পক্ষে যেন এটা বেমানান। সে উত্তর দিয়েছিল, 'না, বাইবেলের ও-কথাটার মানে এ নয় যে, তাদের দায়ী করা হয়—ওর অর্থ এই যে, বাপ-মায়ের পাপের ফল এদের ওপরও এসে পড়বে খানিকটা, এদের ভুগতে হবে। ...সামাজিক ধিক্কার—সেও সেই ভোগারই অঙ্গ একটা, নয় কি!'

আর কিছু বলেনি শাখী, মুখটা যেন অন্য দিকে ফিরিয়ে নিঃশব্দেই হেঁটেছিল বাকি পথটুকু —অবশ্য পথও বিশেষ আর বাকি ছিল না তখন।

আজ মনে হচ্ছে, কে জানে, হয়তো বা চোখে জল এসে গিয়েছিল মেয়েটার, সেটা চাপতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

এরপর পুরীতে দেখা হয়েছে এক-আধবার। সাধারণ স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা হয়েছে। সকলের সামনেই। কেবল একদিন মাত্র মিনিটখানেকের জন্যে নির্জনে দেখা হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়, নলিনাক্ষদের বাসার সামনেই, একা দাঁড়িয়েছিল, মনে হল সেখান থেকেই বেরিয়ে আসছিল, ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গিছল—যদিচ এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই, ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল—বলে উঠেছিল, চাপা কেমন একরকমের ভাঙা গলায়—'রাত্রে বেরোন কেন সমুদ্রের ধারে? অন্ধকারে একা যাওয়া বড় বাহাদুরি—না? বালির মধ্যে কত কী থাকতে পারে? জানেন এখানে খুব বিষাক্ত সাপ আছে, সন্ধের পর তারা বেরোয়?'

নলিনাক্ষ বিস্মিত হয়ে জবাব দিয়েছিল, 'সাপ! কই শুনিনি তো। তা ছাড়া আমি তো আলো নিয়ে যাই। আর ওই একদিনই তো—।'

কিন্তু সে-উত্তর নেবার জন্যে বোধহয় শাখী অপেক্ষা করেনি—কারণ, বলতে-বলতেই নলিনাক্ষ লক্ষ করেছিল, সে শূন্যকে উদ্দেশ করেই বলছে, তার সামনে কেউ কোথাও নেই আর। যেন অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে শাখী।

মন নিমেষে বহু দূর পৌঁছে যায়। এত দ্রুত গতি আলোরও নয়।

সমস্তটা ভেবে নিতে বোধহয় একমিনিটও লাগেনি। ফিলমের চেয়ে অনেক দ্রুত ছবিগুলো সরে-সরে গেছে স্মৃতির পর্দায়।

তার মধ্যেই কানে গেল, প্রবীর বলছে, 'বাই দ্য বাই, দেবীদা, আর একটি স্টার্টলিং নিউজ অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে, পরেশ চাকলাদার খুন হয়েছে।'

'অ্যাঁ!' দুজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল—দেবীপদ ও নলিনাক্ষ। 'সে তো হাজতে ছিল!'

'হ্যাঁ। হাজতেই খুন হয়েছে। এই একটু আগে খবর পেয়েছি।'

'খুন না আত্মহত্যা?'

'খুনই তো শুনছি। এখনই যাচ্ছি আমরা। আপনাদের উদ্ধার করাটা আগে দরকার বলে এখানেই এসেছি। এবার আপনারা বাড়ি গিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করুন—আমরা ওখানে যাই।'

দেবীপদ বলল, 'আমার বিশ্রাম লাগবে না। চলো, আমিও যাচ্ছি।'

শ্রান্ত নলিনাক্ষ চোখ বুজেই শুধু বলে দিল, 'মেয়েটার দিকেও একটু নজর রেখো, দেবীপদ। সেও না আত্মহত্যা করে বসে! কিংবা পারো তো কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দাও।'

'সে আমারও মনে হয়েছে।' যেতে-যেতেই উত্তর দিল দেবীপদ।